পুরোদস্তুর সাহেব, নয় মিলিটারী সাহেব! —কামান ভদ্রলোক—ইংরেজী ছুড়ে ছুড়ে কথা বলেন, গাল নেড়ে আর ঠোঁট বেঁকিয়ে। পোষাকের চেয়ে দাঁত-গুলো আরো ঝকঝকে। বাঁধান দাঁত বলে' ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। বেশীর ভাগ কথা বোঝা যায় না, খারাপ হাতের লেখার মত। প্রবাসযাত্রীর বাক্স-বিছানা বাঁধার মত সব সময় তৈরী হ'য়ে আছেন, পদমর্যাদা ব্যঞ্জক 'ব্যাজ'-গুলো যথাস্থানে যথাযথ আটকান আছে। একটা অদৃশ্য জিজ্ঞাসার চিহ্ন চৌধুরীর আগাগোড়া লেপটে আছে—ইনি কে?

বোনকে নিয়ে সমর ঘরে ঢুকতে চৌধুরী একবার কেবল চোখ তুলে চাইলে, অস্ফুটে বললে, yes! অর্থাৎ এসে বসতে পার।

ঘরে আরো দু তিনজন লোক ছিল, দাদার বয়েসী সবাই। পোষাকপরিচ্ছদে দাদার স্বগোত্র মনে হয়, বাণী বুঝতে পারে, ঘরে ঢোকবার আগে কি একটা আলোচনা হচ্ছিল তাকে দেখে বন্ধ হ'য়ে গেছে। হঠাৎ চুপ করে' যাওয়ায় স্তব্ধতা যেন টের পাওয়া যায়। বড় স্পষ্ট। আসন গ্রহণ করে সমর বললে, আমার বোন বাণী।

চৌধুরী স্মিতহাস্যে বললে I see! very good name।

বাণী মনে মনে চটে ওঠেঃ প্রশংসা করবার আর কিছু পেলেন না! এমনিতেই লোকগুলো সম্বন্ধে তার ধারণা ভাল নয়।

পাশ থেকে একজন আলাপের সুরটা আরো নিম্নগামিষ্ট করে' বলে, আপনার বোন!

বাণী বড় অস্বস্তি বোধ করে। এ তাকে দাদা কোথায় নিয়ে এল? কই এরা তো তেমন মজার লোক নয়। দাদা এদের মধ্যে পড়ে কেমন যেন মিইয়ে গেছে। চৌধুরীদের সম্বন্ধে যা শুনেছিল, কই তা তো কিছু দেখা যাচ্ছে না, বোঝাও যাচ্ছে না! ক্যাপ্টেন সমর দত্তর বোন হিসেবে তার অভ্যর্থনা কি স্বতন্ত্র হওয়া উচিত ছিল না? কে জানে, তাকে এখানে আনার দাদার উদ্দেশ্য কি? চৌধুরী বাড়ীতে মেয়েছেলে কি কেউ নেই? এ কি রকম! নিজেকে বড় বোকা বোকা মনে হয় বাণীর।

আলোচনাটা পূর্বের বিষয়ে ফিরে আসেঃ এখন তো যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবারকার কি গতি হ'বে? কে হাকিম হ'বে, কে পুলিশ সুপার হ'বে, কেইবা মিলিটারী থাকবে। তবে মিলিটারীতে থাকলে যে আর উন্নতি হবার আশা নেই সে-বিষয়ে সবাই একমত—এখন চড় চড় করে' 'আর্মি' কমাবে।

এরা এখন ভবিষ্যতের জন্যে বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছে। বর্তমানের অকুতোভয়তায়, উন্মাদনায়, নিষ্ঠুরতায় এরা নিজেদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে পারেনি। যে তিমির ভবিষ্যতের বিভীষিকায় বর্তমান প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছিল সেই তিমির ভবিষ্যৎ উদ্বাহু বন্ধনে সামনে ঝুলছে। যুদ্ধে গিয়েও এরা আখেরের জন্যে আজ বড় বিচলিত। কে জানে এরা আজ ভাবছে কি না, যুদ্ধ করে' লাভটা কি হ'লো? কার যুদ্ধ করলে?

একজন বললে, চৌধুরী নিশ্চয়ই 'আর্মি'তে থাকবে!

এবিষয়ে চৌধুরী খুব আশা পোষণ করে বলে মনে হ'লো না, কথার সুরটা যেন হতাশারঃ কিছুই বলা যায় না! uncertain. It depends—

বাঃ, মেজর হ'য়েছো—একটা consideration নেই! আর্মিতে না রাখে অন্য বড় পোষ্ট পাবে তো?

'It's doubter still, we are on Emergency' cadre.

আগে যা মনে হ'য়েছিল তার তুলনায় লোকটা দুর্বল। পোষাকের জমকাল ঘটায় সাধারণ মনটা ঢাকতে পারেনি।

মুশকিলে পড়বো আমরা, এদিকে বয়েস বেড়ে গেল—এখন ছেড়ে দিলে যাব কোথায়? কেরাণীগিরিও জুটবে না—আর একজন বলে।

চৌধুরী বললে, In case we are disbanded, Government should try to provide elsewhere. It's hopeful, Employment Exchange have started work।

বড় নৈর্ব্যক্তিক উক্তি—নিজের জন্য যেন চৌধুরী ভাবেন না। (ক্রমশঃ)

বক্সা ক্যাম্প

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

কমনরুমে কমিটির বিশেষ অধিবেশন তৎক্ষণাৎ বসিল, সদস্যদের ডাকার আর প্রয়োজনই ছিল না।

কমিটিতে প্রভু উবাচ, "ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা এই অধমের উপর যে গুরুদায়িত্ব চাপাইয়াছিলেন, আপনাদের আশীর্বাদে তাহা আমি পালনে সক্ষম হইয়াছি। সঙ্গের ঐ বাক্সটিই তার প্রমাণ।"

প্রভুর বিনয়ে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। শাস্ত্রেই আছে, ফলবান বৃক্ষ কখনও উদ্ধত হয় না, মহাপুরুষগণও তেমনি সর্বদা বিনয়ী হইয়া থাকেন। কমিটির মেম্বর নয়, তাহারাও সভায় উপস্থিত ছিলেন, সংখ্যায় তাহারাই ভারী। নেড়া মাথায় কম্ফর্টার জড়াইয়া অমর চ্যাটার্জি (দক্ষিণ কলিকাতা) আগাইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "দিন প্রভু, একটু পায়ের ধুলো দিন।"

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত প্রভুর ডান পা সম্মুখে সটান লম্বা হইয়া প্রসারিত হইল, চ্যাটার্জি খাবল মারিয়া পায়ের এক খামচা কাল্পনিক ধুলো লইয়া মাথায় মাখিলেন।

প্রভু বলিলেন, "কল্যাণ হোক। ওস্তাদ একটা সিগারেট ছাড় তো।"

সিগারেট ধরাইয়া একমুখ ধোঁয়া ধীরে ধীরে নাসাপথে বমন করিয়া প্রভু বলিয়া চলিলেন,—যাহা বলিলেন, তাহার বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ঝাঁকা মাথায় বাচ্চুসহ ঐ পোষাকে ডাণ্ডা হাতে সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন, অর্থাৎ ভয়ে একটু চমকে উঠলেন।

মুখে বললেন, "কি, ব্যাপার কি মিঃ দাশ-গুপ্ত? এ সব কি?"

"বলছি, ধৈর্য ধারণ কর," বলে আসন গ্রহণ করলাম। বাচ্চুকে বললাম, "ঝাঁকাটা চেয়ারের কাছে রেখে তুই বাইরে যা।"

তারপর আরম্ভ করলাম, "হে সাহেব, তুমি ক্ষুর ভিতরে দিতে পার না, কারণ উহা মারাত্মক অস্ত্র। তুমি স্টীক ভিতরে দিতে পার না, পাছে ঐ অস্ত্র সাহায্যে আমরা তোমাকে বা তোমার অফিসারদের লাঠিপেটা করি। বেশ—"

তারপর ঝাঁকা হতে ছোট-বড় গুটি পাঁচেক পাথরের খণ্ড তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ইহা কি বস্তু তাহা কি তুমি জান?"

"পাথর বলে মনে হচ্ছে।"

"ঠিকই মনে হচ্ছে। কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?"

"এ তো পাহাড়ের সর্বত্র পাওয়া যায়।"

"উত্তম। ক্যাম্পের ভিতরে পাওয়া যায়? —উত্তর দেও।"

মাথা নেড়ে বললেন,—"যায়।"

তারপর বড় পাথরটা দেখিয়ে বললাম, "এটা যদি ছুঁড়ে মারি এবং তা যদি তোমার মাথায় লাগে, তবে কি হয় বলতে পার?"

সাহেব বোকার মত তাকিয়ে রইলেন।

আমি বলে চললাম, "নাকে লাগলে নাক ভোঁতা হবে, রক্ত বন্ধ হবার আগেই তুমি শমন-সদনে প্রেরিত হবে। মাথায় লাগলেও ঐ একই পরিণাম।"

এইভাবে একটির পর একটি ক'রে সাহেবকে বস্তুপরিচয় শিক্ষা দিয়ে চল্লাম, বস্তুবিজ্ঞানও বলতে পারেন।

বল্লাম, "দেখ, এই ছুরি দিয়ে আমরা মুরগী জবাই ক'রে থাকি। এই মুরগীকাটা ছুরি দিয়ে তোমাকেও জবাই করা চলে কিনা, বল? এর নাম বঁটি, এ দিয়ে বড় বড় মাছ কোটা হ'য়ে থাকে, তেমনিভাবে মানুষ কর্তনও অনায়াসে হ'তে পারে। এর নাম খুন্তি, পেঁতলের বৈঠাও বলতে পার, তাক্ করে মারতে পারলে মাথা তোমার দু ফাঁক করে দেওয়া যায়; কোমরে কষে মারতে পারলে তোমাকে জমি নিতে হবে। এর নাম হাতা, এর কার্যকারিতাও পূর্ববৎ। তারপর এটা কি বলতে পার?"

"সোডার বোতল!"

"ছুঁড়তে জানলে বোমার কাজ দেয়। তাক্ যদি ঠিক হয়, তবে তোমার অত বড় মাথাটাই এই বোতল-বোমার এক আঘাতে ফুটিফাটা চৌচির হয়ে যাবে। বিশ্বাস হয় কি?

এমন সময় একগাল দাড়ি নিয়ে আমাদের মহর্ষি [illegible]গদীশ ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই থমকে দাঁড়া[illegible]। প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপার কি, শৈলেনবাবু?"

বল্লাম—চুপ, ডোনট্ টক্, কথা বলবেন না। শুনে যান।"

তারপরে লোহার ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে চেয়ার থেকে সমুত্থিত হলাম, সেটা মারাত্মক ভঙ্গীতে বাগিয়ে ধরতেই মহর্ষি দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। বল্লাম, "ভয় নেই, প্রয়োগ করবো না। শুধু দেখাব।"

সাহেবকে বল্লাম, "সাহেব এর নাম ডাণ্ডা, এতে ঠাণ্ডা না করা যায়, এমন ষণ্ডা মানুষের মধ্যে নেই। প্রত্যেক খাটিয়ার চার কোণায় চারটি ক'রে মোট দেড় শত খাটিয়ায় সর্বসাকুল্যে ছয়শত এই অস্ত্র আমাদের দখলে আছে। হকি স্টীকের চেয়ে এগুলি কি কম হিংস্র, না অস্ত্র হিসেবে কম কার্যকরী? চুপ করে থাকলে চলবে না, জবাব দাও।"

"বস, বস।"

"বসছি। সাহেব তুমি তো তুমি, ছোট খাটো একটা হাতীকে পর্যন্ত এ দিয়ে সাবাড় করা যায়, বুঝলে?"

মহর্ষি হেসে উঠলেন।

তাঁকে বল্লাম, "হাস্য করবেন না, সিরিয়াস কথা হচ্ছে।"

সাহেব হেসে বল্লেন, "You are a dangerous man, দাশগুপ্ত।"

বল্লাম, "না সাহেব, মোটেই ভয়ানক নই আমাদের মেয়েরা বলে থাকেন, সরল অঙ্গুলীতে ঘি উঠে না। কেউ কেউ বলে থাকেন, যেম কুকুর তেমন মুগুর। অর্থটা নিও, আবা গালাগালি ভেবে বস না যেন।"

সাহেব এবার হো হো করে হেসে উঠলেন

বল্লাম, "আমি এখন যাচ্ছি। বাক্সটার কি করবে?"

সাহেব বল্লেন, "জগদীশবাবু, তাহলে ও ভিতরেই পাঠিয়ে দেবেন।"

বল্লাম, "চলুন জগদীশবাবু।"

—"আপনি যান, আমি পরে পাঠি দিচ্ছি।"

—"না, এখনই। আমি ওটা সঙ্গে নি যেতে চাই।"

উপস্থিত সকলের দিকে চক্ষু পাতিয়া [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বাক্সটা এসে কিনা? কি বলেন আপনারা? এখন [illegible] সেক্রেটারীর চাকুরী পরিত্যাগ করলাম।"

সমর চ্যাটার্জি হাতজোড় করিয়া বন্দ[illegible] সুরে কহিল, "প্রভু হে, তুমি একটি অ[illegible] ঘুঘু।"

প্রভু ব্রাহ্মীস্থিতি হইতে সস্নেহে উ[illegible] "অমৃতম্ বালভাষিতম্। আর একটা সিগা[illegible] ছাড় দেখি।"

কথায় বলে যে, কস্তুরী মৃগ [illegible] লুকাইয়া রাখিতে পারে না। ফ[illegible] পারে না। গুণের দোষই এই যে, কখন [illegible] থাকে না, বাহির হইয়া পড়েই। গুণের স্ব[illegible] বুঝিতে গিয়া দার্শনিকেরা পর্যন্ত হিম্[illegible] খাইয়া গিয়াছেন। বস্তুকে গ্রেপ্তার ক[illegible] গিয়া কোনদিক দিয়াই দার্শনিকেরা [illegible] কায়দা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, প্র[illegible] ক্ষেত্রেই গুণটাকে সামনে ধরিয়া দিয়া নিজে সরিয়া পড়ে। ফলে মুশকিল বা ফ্যাসাদ সমুপস্থিত হয়। বস্তুকেই যা[illegible]

পাওয়া যায়, তবে বস্তুর বিচার দূরে থাক, গুণের ভিত্তিটাই যে লোপ পাইয়া যায়। তাই হার মানিয়া বলিতে হয় যে, মোট কথা, গুণের স্বভাবই প্রকাশিত হওয়া বা প্রকাশ পাওয়া।

বুদ্ধিতে শান দিয়া যদি তীক্ষ্ম করিয়া লওয়া যায়, তবে এও আবিষ্কার করা সম্ভব যে, সৃষ্টিতে বস্তু নাই শুধু প্রকাশ আছে, অর্থাৎ শুধু গুণই আছে। তাই সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে গিয়া আমাদের কবি অবাক হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন, "তুমি কেমন করে গান করহে গুণি!" বলা বাহুল্য, বস্তু বলিতে ঐ গুণীকেই বুঝায়। বস্তু চিরকাল আড়ালেই থাকে, সুতরাং সৃষ্টিতে ঐ গুণী বা স্রষ্টা চিরকালই অদৃশ্য হইয়া রহিলেন। গুণের গোলকধাঁধা পার হইয়া গুণীতে যিনি পৌঁছিতে পারেন, একমাত্র তাঁরই হিসাব মিলিয়া যায়। এদেশে তাঁকেই মুক্ত-পুরুষ বলা হয়। অর্থাৎ চৌদিককেতে গুণের যে-ফাঁদ পাতা আছে, তার এলাকার বাহিরে গিয়া তিনি নির্গুণ বা গুণমুক্ত হইয়া পড়েন। একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করিবার মত যে, যাঁকে গুণী বলা হইল, তাঁকে কিন্তু জানা গেল নির্গুণ। গীতা না ভাগবতে কোথায় যেন ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মকে "নির্গুণ গুণী" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

দেখিতেছি, কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িল, গুণের পিছনে ধাওয়া করিয়া একেবারে ব্রহ্মের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছি। দোষটা আমার নয়, কেঁচোরও নয়, দোষটা সাপের, কারণ কেঁচোর গর্তে সে বাসা লইয়াছে। এই সৃষ্টিতে সব গুণের গর্তে বস্তুর বদলে যদি ব্রহ্ম বাসা বাঁধিয়া থাকে, তবে বুদ্ধির খানাতল্লাসীতে ব্রহ্ম বাহির হইয়া পড়িবেই, সে জন্য আমাকে বা আপনাদের কাহাকেও দোষ দেওয়া ভুল।

গুণ থাকিলে তাহা চাপা থাকিবে না। এই বিশ্বাস বা ফর্মুলা লইয়া পৃথিবীতে চলিবার জন্যই কস্তুরী মৃগের কথাটা প্রবীণেরা এভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে দুঃখ করেন যে, তাঁদের মূল্য বা মর্যাদা পৃথিবী স্বীকার করিল না। আমাদের হাতের ফর্মুলার নিকষ পাথরে কষিয়া দেখিলে এই অভিযোগকে নাকি সুরের মেকী কান্না বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আমরা বাধ্য। গুণ আছে, অথচ তার প্রকাশ নাই, স্বীকৃতি নাই, এতবড় মিথ্যা কথা আর হইতেই পারে না।

অবশ্য, জোনাকী যদি তার এক কণা আলোর সম্পত্তি লইয়া নিজেকে সূর্যের সগোত্র বলিয়া সূর্যের সম্মান দাবী করে, তবে সে আলাদা কথা। অভিযোগ বা নাকি সুরের কান্না রাখিয়া শান্ত মনে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, গুণ থাকিলে তার প্রকাশ ও স্বীকৃতি দুইই আছে। গুণের তারতম্যে স্বীকৃতিরও তারতম্য ঘটে। সূর্যকে দেখার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়, তোমার হিরণ্ময় আবরণ অপসারণ কর, নইলে যে তোমাকে দেখা সম্ভব হয় না। আবার জোনাকীকে বলিতে হয়, তোমার পুচ্ছের আলোকবিন্দুটি জ্বালো নতুবা অন্ধকারে যে তোমার অস্তিত্বই মালুম হয় না।

জোনাকী হইয়া যদি সূর্যের সঙ্গে স্পর্ধা করিবার জেদ হয়, তবে সে রাস্তাও যে খোলা নাই, এমন নহে। ঐ গুণের খোলা রাস্তাটা অনুসরণ করিতে হয়। সকল গুণ যেখানে নিঃশেষে শেষ হইয়াছে, সেখানকার ছোঁয়া পাইলে পঙ্গু পর্বত পার হয়, বোবা বাগ্মী হয় এবং জোনাকীর জ্যোতিতেও সূর্য নিষ্প্রভ হয়। এখন একটা অতএব দিয়া বলা যাক, এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হইলাম যে, গুণ থাকিলে তাহা প্রকাশ হইবেই, তাকে চাপিয়া রাখার সাধ্য সৃষ্টিতে কারো নাই।

বকসা ক্যাম্পে আমরা মোট সংখ্যা ছিলাম প্রায় দেড়শ। ইহার মধ্যে কেহই আমরা গুণহীন বা তেমন নির্গুণ ছিলাম না। কারণ, গুণহীন বস্তু বা ব্যক্তি সৃষ্টিতে অসম্ভব, যেমন অসম্ভব আলোহীন সূর্য। এতগুলি গুণীর সমাবেশে স্থানটি রীতিমত সরগরম হইয়া থাকিত। কাহাকে রাখিয়া যে কাহাকে দেখি তাহা ঠিক করা এক দুরূহ ব্যাপার। কাহাকেও ছোট বলিয়া এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই, কারণ বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি যে, শিশি বড় দেখিলেই হয় না, ওজন দেখিতে হয়। বিপদ কি এক রকমের! যাহাকে বাদ দিব, সে-ই হয়তো এই ধরণের মস্তবড় একটা সার্টিফিকেট লোকের সামনে প্রামাণরূপে মেলিয়া ধরিবে, তখন সে দলিল অগ্রাহ্য করে কার সাধ্য। কবি কি খামকা কাঁদিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "তুমি আমায় ফেলেছ কোন ফাঁদে?" এই দেড়শত গুণীর সমাবেশ, গুণের গরমে বক্সা ক্যাম্প সরগরম, এর মধ্যে কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে বাছিয়া লইব, ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাইতেছি না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কথাটা সাধে কি উচ্চারণে এমন সঙ্গীন ঠেকে! এই রকম সঙ্গীন অবস্থাতেই তো ঐ শব্দটা প্রয়োগ করার বিধি আছে, যেমন নাভিশ্বাস উঠিলে কস্তুরীর ব্যবস্থা।

সেই কস্তুরীতেই ফিরিয়া আসা গেল, বাঁচা গেছে! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছি। কস্তুরী মৃগ গন্ধ লুকাইয়া রাখিতে পারে না, ধরা পড়িয়া যায়, অমর চাটার্জীও (দক্ষিণ কলিকাতা) আবিষ্কৃত হইয়া পড়িলেন। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মহেন্দ্র বানার্জী অমর চাটার্জিকে আবিষ্কার করিলেন। ইহা যে কত বড় আবিষ্কার, তাহা বক্সার বন্দীমাত্রেই স্বীকার পাইবেন। আপনারাও অনুগ্রহ করিয়া মানিয়া লউন যে, অমর চাটার্জী আবিষ্কৃত হওয়ায় বক্সার জীবনে আস্তা বস্তুটি দানা বাঁধিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

অমর চাটার্জী যদি স্বদেশী দলে না ঢুকিত, তবে বড়গোছের একজন কাপ্তান মানুষ হইতে পারিত, আমার ও আমার মত অনেকেরই ধারণা। প্রথমে ক্যাম্পে তার একটা নাম প্রচলিত হয় "মারফৎ।" কিন্তু এই নামটির আয়ু বেশী দিন ছিল না, পরে আর একটি নাম হয় "ওস্তাদ" এবং এটাই স্থায়ী হয়। অমর চাটার্জী একজন উঁচুদরের তবলচী, সেই সূত্রেই নামটি প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রথম দেখাতেই ভদ্রলোককে কতকটা চিনিয়া ছিলাম। প্রাতঃকৃত্যের পর বাথরুম হইতে উপরে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু মাঝ পথেই থামিতে হইল। বাদামী রংয়ের কুকুর দুইটা মাটী শুঁকিতে শুঁকিতে আগাইয়া আসিতেছে, পৃথিবীর গাত্রের ঘ্রাণ লইয়াই যেন সকল রহস্য আবিষ্কার করিবে। পিছনে আসিতেছেন সপরিষদ ফিণী সাহেব। পথের মধ্যে বাবুরা তাঁর গতিরোধ করিলেন। একজন দুইজন করিয়া বেশ ছোটখাটো ভীড় জমিয়া গেল। সাহেবের সংগে মুখোমুখী যার যা অভিযোগ বা বক্তব্যের লেনদেন চলিতে লাগিল। আমিও ভীড়ের কিনারায় স্থান গ্রহণ করিলাম এমন সময়ে---

এমন সময়ে পায়জামা পায়ে, ভি-কলার গেঞ্জি গায়ে, টাওয়েলের পাগড়ী-আঁটা ন্যাড়া মাথায় হাতে একটা নিমের দাঁতন লইয়া বেঁটেখাটো মজবুৎ চেহারায় এক ভদ্রলোক আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল।

জিজ্ঞাসা করিল, "শালা বাংলা জানে?"

শুনিয়া ভালো করিয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। কথাটা কিন্তু যথাস্থানে মানে শালার কর্ণে প্রবেশ করিল।

ফিণী সাহেব সংগে সংগে জবাব দিলেন, "হা, বাঙলা জানে।"

শুনিয়া বক্তা জিভ্ কাটিল, অর্থাৎ লজ্জা প্রকাশ করিল এবং মুখে বলিল---"এই সেরেছে।" এবং অন্যান্য সকলে হাসিটা কোন মতে চাপিয়া রাখিলেন।

কিন্তু বেঁটে ভদ্রলোক ইহাতে মোটেই অপ্রতিভ হইল না, আগাইয়া গিয়া ফিণী সাহেবের মুখোমুখী দাঁড়াইল।

তারপর বলিল, "বাঙলা তো জান সাহেব বুঝলাম। কিন্তু ধোবা কবে আসবে তা, কি জান?"

মিঃ ফিণী উত্তরে বলিলেন, "আমি জলপাইগুড়িতে লিখেছি ধোবার জন্য।"

—"তা ভালোই করেছ। কিন্তু কবে ধোবা আসবে, বলতে পার। কুড়ি দিন যায়, কাপড়-চোপড়ের কি অবস্থা হয়েছে বুঝতে পার না?"

সাহেব বলিলেন, "আমিতো লিখেছি—"

শেষ করিতে না দিয়াই বক্তা বলিয়া উঠিল, "ওসব লেখালেখি আমি বুঝি না। আমার জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, গেঞ্জি সমস্তই ময়লা হয়ে গেছে, তিন দিনের মধ্যে তোমার ধোবা যদি না আসে, তবে সোজা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকবে না।"

বলিয়াই দ'তন হাতে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং ভীড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া বাথরুমের দিকে আগাইয়া গেল।—শাসানিটুকুতে কাজ দিয়াছিল, দু দিনের মধ্যেই ক্যাম্পে রজকের আবির্ভাব হইল।

পরের দিন মহেন্দ্র বানার্জী আসিয়া আমাদের ব্যারাকে উপস্থিত হইলেন, কহিলেন, "পঞ্চাননবাবু, একটা নূতন মাল আবিষ্কার করেছি, খোঁজ পাননি এখনও? দাঁড়ান, নিয়ে আসছি," বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই দরজায় মহেন্দ্রবাবুর গলা শোনা গেল, 'পঞ্চাননবাবু, এনেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের গলা শোনা গেল, "আরে করে কি! আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি। হাতটা ছাড়ুন, নইলে লোকে মনে করবে যে পকেট মেরেছি। কথা দিচ্ছি পালাব না।"

ঘাড় ফিরাইয়া আমরা দেখিলাম, মহেন্দ্র ব্যানার্জি গতকল্যকার সেই "শালা বাঙলা জানে"—প্রশ্ন কর্তাকেই হাতটা ধরিয়া টানিয়া আনিতেছেন।

আমাদের সামনে তাকে হাজির করিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই নিন। ইনিই সেই মাল, নাম বর্তমানে মারফৎ।"

তারপর ঘণ্টা তিনেক বসিয়া আমরা জন পাঁচিশেক অমর চ্যাটার্জিকে ঘিরিয়া যত হাসি হাসিয়াছিলাম, সারা বছরেও তত হাসি আমরা হাসি নাই। এই আসরেই ওস্তাদ তার গ্রেপ্তারের কাহিনী বর্ণনা করে এবং ধরা পড়ায় তাহার কি উপকার হইয়াছে, তাহাও ব্যক্ত করে। ওস্তাদের ভাষা যথাসাধ্য মার্জিত করিয়া তার বক্তব্যটুকু পেশ করা যাইতেছে।

ওস্তাদ বলিল, "পুলিশে না ধরলে, শালা হোটেলওয়ালাই জেলে দিত।"

যতীনবাবু (দাশগুপ্ত) ওস্তাদেরই এক পাড়ার লোক, জিজ্ঞাসা করিলেন, "হোটেল-ওয়ালাটা আবার কে?"

"যে খেতে দেয়, লোকে ব'লে পিতা, আমি বলি হোটেলওয়ালা।"

"বাবা হয়ে তিনি তোমাকে জেলে দিতেন,"—বিস্মিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল।

উত্তর হইল, "কেন দেবে না শুনি? ব্যাটা আমার চরিত্রে সন্দেহ করতে শুরু করে-ছিল। খেয়ে দেয়েই বেরিয়ে পড়তুম, হোটেলে ফিরতে রোজই একটু রাত হোত। উড়ে চাকরটাকে ক' বাক্স যে গোল্ডফ্লেক সিগরেট ঘুষ দিয়েছি, এলে শব্দ না করে যেন দরজাটা খুলে দেয়। বিশ্বেস করবেন না, শালা জগরনাথ পাঁকে পড়েছি জেনে চাপ দিয়ে সিল্কের পাঞ্জাবীটাই মশায় একদিন আদায় করে নিল।" বলিয়া সিগারেটে এমন অগস্ত্য টানই ওস্তাদ দিল যে, মাথার আগুন গোড়ায় নামাইয়া আনিল।

পাঞ্জাবীর শোকটা ধোঁয়ার সঙ্গে বাহিরে উড়াইয়া দিয়া ওস্তাদ বলিয়া চলিল, "রাত তখন একটা হবে, ফিরে এসে জানালার নীচে দাঁড়িয়ে আস্তে ডাকলাম, এই মাগুনি, দোর খোল। ব্যাটা জেগেই ছিল, ঝাড়া আধঘণ্টা দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর উঠে এসে এমন শব্দ করে দরজা খুল্লে যে, ভয় পেয়ে বল্লাম, এই আস্তে, জেগে উঠবে।" বলিয়া পূর্ববৎ সিগারেটে মরীয়া হইয়া টান দিল।

পরে বলিয়া চলিল, "আর জেগে উঠবে! জেগে উঠেই তো ছিল, দোতালার বারান্দা হতে আওয়াজ এল, কে এলরে মাগুনি?

মাগুনি ঊর্ধমুখে জবাব দিল, দাদাবাবু আইলা।

উপর হতে ফের আওয়াজ এল, শুয়োর ব্যাটাকে জিজ্ঞেস কর যে, এটা কি রাঁড়ের বাড়ি পেয়েছে যে, যখন আসবে, তখনই দরজা খুলবে?"

এই পর্যন্ত আসিয়া অমর চ্যাটার্জি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট আবেদনের সুরে পেশ করিল, "ব্যাটাচ্ছেলের কথা শুনলেন? বলে কি না রাঁড়ের বাড়ি পেয়েছ? না, এমন বাড়িতে আর থাকব না, ঠিক করেই ফেল্লাম।"

অতঃপর ওস্তাদ তার প্ল্যান ও তার ফলাফল বর্ণনা করিয়া চলিল, "বাড়িউলী মানে গর্ভধারিণী জননী ব্যাংক থেকে টাকা তুলে আনতে দেয়, খরচার জন্য পঞ্চাশ তুলতে হবে। পঞ্চাশের আগে একটা সাত বসিয়ে নিয়ে এলুম সাড়ে সাতশ, পঞ্চাশ দিয়ে হাতে রইল সাতশ। সেদিনেই চলে এলাম দিদির কাছে এলাহাবাদ, জানেনই তো বিপদ কখনও একা আসে না। দিদি ভায়ের হাত দিয়েই ব্যাংক থেকে টাকা তুললেন, ফলে ঠিক ঐ একই কায়দায় হাতে এল পাঁচশ। ছোটখাটো একটা জমিদারই হয়ে গেলাম, কি বলেন?" বলিয়া আমাদের অভিমত চাহিল, না গর্ব প্রকাশ করিল ঠিক বুঝা গেল না।

—"এদিকে কলকাতায় বাড়িওয়ালা ফায়ার, এলাহাবাদে জরুরী চিঠি এল জামাইবাবুর কাছে, চোরকে আটক করে রাখ, ওকে আমি জেলে দেব। দিদির উত্তর গেল, চোর ভাগলবা, আমারও পাঁচশ গাপ করে সরেছে। ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গেলাম পুলিশের হাতে। ব্যাটা কি বলে জানেন?"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "না, কি বলেন?"

"বলে কিনা জানেন, পুলিশে না ধরলে আমিই ওকে জেলে দিতাম, ও চোরকে আমি ঘানি টানিয়ে ছাড়তাম। পুণ্যের জোর ছিল এখন তো মহাপুরুষদের আসরে এসে জুটেছি," বলিয়া আমরা যত মহাপুরুষ উপস্থিত ছিলাম তাহাদের সকলের উপর দিয়া দৃষ্টিটা ঝাঁটার মত মার্জনা করিয়া লইল। এখানে উল্লেখ থাকে যে, টাকাটা দলের কাজের জন্যই হস্তগত করা হইয়াছিল, ওটুকু ওস্তাদ ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া গিয়াছিল।

যতীনবাবু অমরের খবর জানিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফ্যামিলি-এলাউন্সের দরখাস্ত করেছিলে, তার কি উত্তর এল?"

প্রশ্নটির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া আমরা জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিলা[m] অনেকের চোখেমুখে বিরক্তিই দেখা দিল [...] এই আসরে আবার ওসব কথা কেন! কি[ন্তু] যতীন দাশের চোখে মুখে যেন একটা কৌতুকে[র] আভা পড়িয়াছিল।

মহেন্দ্রবাবু ওস্তাদকে কহিলেন, "ব[লে] ফেল না, এতটাই যখন পেরেছ, ত[খন] ওটুকুতে আর লজ্জা কেন?"

ওস্তাদ বলিল, "আজ থাক, আর একদি[ন] হবে।"

আমরা বলিলাম, "না, আর একদিন [নয়,] আজই শুনব।"

ওস্তাদ বলিল, "বেলা কত হয়েছে [খেয়াল] পান? বারোটা বেজে গেছে।"

"তা যাক, তুমি আরম্ভ কর।"

আনন্দের স্বভাবই এই, যে আধখানা [ভোগ] করিয়া বাকী আধখানা অন্য সময়ের [জন্য] রাখিয়া দেওয়া চলে না। আনন্দ ভোগে[র] বিতরণে হিসেবীদের স্থান নাই, উভয় ক্ষে[ত্রে] একমাত্র বে-হিসেবীদেরই অধিকার। খ[...] একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িয়া গেল। পরিষ্[কার] পরিচ্ছন্ন ধোপদুরস্ত জামা কাপড়ে যাতে [দাগ] না লাগে, তার জন্য যে সতর্কতা ও সাবধা[নতা] তাহাই সংসারী ও হিসেবী মানুষের স্ব[ভাব,] আর যখন বুক আনন্দে ভরিয়া যায়, তখন ধোপদুরস্ত জামা কাপড় শুদ্ধই ধুলোয় [...] গড়াগড়ি দিয়া থাকি, ইহাই মানুষের বেহি[সেবী] চরিত্র। আনন্দের স্বভাবই এই যে, সে হিসাব মানে না, সে বে-হিসেবী।

আমরাও আনন্দে আক্রান্ত হইয়া[ছিলাম,] বন্দিত্বের কথা, নাওয়া-খাওয়ার কথা [ভুল]ি হইয়াছিলাম, তাই বেলা বারোটা বাজিয়া [...] আমাদের পক্ষে বেলা হইতে পারে[নি।]

মদই হউক বা অমৃতই হউক, দুটোর নেশা আছে, একটাতে বুদ্ধি আচ্ছন্ন সমস্ত হিসাব বিস্মৃত হইতে হয়, একটাতে বুদ্ধি প্রোজ্জ্বল থাকিয়াও

হিসাবের চৌহদ্দীর বাহিরে চলিয়া নেশাতেই আমাদের সেদিন পাইয়া- আমরা যেন কলস উপুড় করিয়া বা মদ্য পানীয় আকণ্ঠ পান করিয়া লাম।

হইয়াই অমরকে আবার আরম্ভ হইল।

ওস্তাদ শুরু করিল,

"তখন প্রেসিডেন্সী জেলে, জ্বরে পড়ে আছি। প্রকৃতির আহ্বান ঠেলা উঠতে গিয়ে খাটিয়ার পায়াতে পাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বাবা। ব্যাটা ঘুঘুদাশ পাশের সীটে চেয়ারে বসে পড়ছিল।"

উপেন দাস প্রশ্ন করিল, "ঘুঘু দাশটি ন?"

চোখের ইঙ্গিতে যতীন দাশকে দেখাইয়া ওস্তাদ বলিল, "উনি। ব্যাটা হাড়ে হাড়ে তান, সাবধানে থাকবেন। বলে বসল, ন তো খুব বাবাগো, মাগো করছ, বাইরে তে এ-ভক্তি ছিল কোথায়? বল্লাম, থাম টা, তখন সময় পাইনি, এখন সেটা পুষিয়ে চ্ছি। ঘুঘুদাশের কথায় কিন্তু একটা কার হল।"

আমাদের বিভূতি ম্যাস্টর জিভের জড়তার গ যুদ্ধ শেষে বাকাটি মুক্ত করিয়া বাহিরে নিল, "কি উপকার হোল, প্রকাশ করেই বাবা।"

ম্যাস্টরও প্রায় ওস্তাদের পাড়ারই লোক। তাকে ধমকের সুরে ওস্তাদ থামাইয়া দিল, ম, কতবার বলেছি একখণ্ড সীসা মুখে খ," বলিয়া শ্রোতৃবর্গের অভিমুখে আবার ষ্টিটা মেলিয়া ধরিল।

বলিয়া চলিল, "ঠিক করলাম, শত হোক ন্মদাতা পিতা তো, এতকাল খোরাক-পোষাক যুগিয়েছে, নেকাপড়ার জন্যও চেষ্টা করেছে, ল" বলিয়া দক্ষিণের হস্তের অঙ্গুষ্ঠিটি আমাদের চোখের সম্মুখে উত্তোলন করিয়া ধরিল।

"ভাবলাম, ঋণশোধ যথাসাধ্য করতে হবে। দিলাম ঠুকে এক দরখাস্ত। পারিবারিক ভাতা চাই, বাড়ীর আমিই একমাত্র পুত্তুর; আমার আয়েই সংসারের নির্ভর ইত্যাদি সব ভালো ভালো পয়েণ্ট দরখাস্তে ঠেসে দিলাম। ঐ ঘুঘুদাশকে দিয়েই লিখিয়েছিলাম, ব্যাটা অপয়া!"

"ওর দিকে তাকিও না, বলে যাও তারপর?"

"তারপর? তারপর এস-বি'র এক নিস্‌পেক্টর বাড়িতে গিয়ে হাজির, দরখাস্তটার তদন্ত করতে গেছেন। সেদিন ভদ্রলোকের একটা ফাড়া গেছে।"

আমরা উৎকণ্ঠায় উদগ্রীব হইয়া উঠিলাম, অনেকেই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছিল?"

ওস্তাদ ধীরেসুস্থে বলিয়া চলিল—

"ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, অমরবাবু আপনার ছেলে?

হোটেলওয়ালা নামটা শুনেই ভিতরে ভিতরে হয়ে উঠেছেন, মুখে বল্লেন, না বলতে পারলেই সুখী হতাম, কিন্তু কেন?

ভদ্রলোক বল্লেন, তিনি দরখাস্তে বলেছেন যে, তাঁর আয়েই নাকি আপনার সংসার চলত।

হোটেলওয়ালা একেবারে ফেটে পড়ল, ভদ্রলোককে শেষ না করতে দিয়েই বলে উঠল, আপনি বেরোন, এক্ষুণি বেরিয়ে যান।

নিসপেক্টর তো অবাক। তিনি যত চেষ্টা করেন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে, হোটেল-ওয়ালা ততই তেতে উঠে, পাড়ার লোক দৌড়ে এল ব্যাপার কি!

হোটেলওয়ালা সবাইকে শুনিয়ে বল্ল, শোন তোমরা, উনি এসে বলছেন যে, ঐ হারামজাদা শুয়োর ব্যাটা নাকি আমাদের খাওয়াতো পরাতো, তার টাকাতেই নাকি সংসার চলত। তার হয়ে এই ইনি এয়েছেন খবর নিতে, ওকালতী করতে। যান, আপনি বেরিয়ে যান, আমাকে চটাবেন না। চটে গেলে আমি কী যে করব, তার ঠিক নেই। সোজা বলছি, আপনারা ওকে ছেড়ে দিয়ে দেখুন, ওকে আমি জেল খাটাই কি না। চোর, চোর, কতটাকা যে চুরি করেছে, তা আপনি জানেন মশায়? ব্যাটাচ্ছেলের আয়ে সংসার চলে! না, আপনি বেরোন, আমি দরজা বন্ধ করি, বলে নিস্‌পেক্টরের মুখের উপরই দরজাটা বন্ধ করেদিল।"

ওস্তাদের বলার ভঙ্গীতে এবং ভাষার গাঁথুনিতে শ্রোতাদের চোখের সম্মুখে অমরের পিতার ক্রুদ্ধ মূর্তি নিস্‌পেক্টরের অসহায় মুখের ছবি এবং দুইয়ে মিলাইয়া যে-পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছিল, তাহা একেবারে জ্বলজ্যান্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে আমাদের পেটে সত্যই সেদিন খিল ধরিয়া গিয়াছিল। একমাত্র বক্তাই এই হাসির ছোঁয়াচ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

হাসির ভীড়ের মধ্যে অমরের পত্রের কয়েকটি কথা চাপা পড়িয়া গেল, কোন মতে তাহা জোড়াতালি দিয়া একটা বক্তব্য মনে খাড়া করিয়া লইলাম।

অমর বলিতেছিল, "অদৃষ্টে নেই পুত্রের রোজগার খাওয়া, আমি চেষ্টা করলে কি হবে! নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারল, সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলল, আমি কি করব।" বলিয়া অমর উঠিয়া পড়িল।

আজ পিছনে ফিরিয়া তাকাইয়া ভাবিতেছি যে, সেদিন বৃদ্ধ হিমালয়ের ক্রোড়ে বসিয়া যত হাসি আমরা হাসিয়াছিলাম, তার কোন চিহ্নই কি সেই মৌন পাষাণের বুকে দাগ কাটে নাই। গ্রামফোনের রেকর্ডের রেখা হইতে সুরসঙ্গীত উদ্ধার করিবার কৌশল মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে, ঐ পাষাণের বুকের দাগ হইতে কোন উপায়েই কি সেদিনকার পুঞ্জপুঞ্জ আনন্দ-হাসিকে উদ্ধার করা সম্ভব নহে? স্মৃতির যাদুকাঠির ছোঁয়া দিয়া শুধু আমার কাছেই তাহা আমি পুনরুজ্জীবিত করিয়া লইতে পারি, কিন্তু সংসারের আর দশজনকে তো আর অংশীদার করিতে পারি না। অথচ শুনিতে পাই যে, ত্রিকালের কোন কিছুই নাকি হারায় না, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ত্রিকালের খণ্ড সীমানা পার হইয়া অনন্তকালে সত্যই নাকি তারা চিরবিদ্যমান। আমাদের জগতেই কেবল হৃদয়ের সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু জীবনের পথপ্রান্তে ফেলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু যে-জগতে সমস্ত সঞ্চয় চির অস্তিত্বে বর্তমান, সে-জগতের সন্ধান কালের সীমাবদ্ধ এই দৃষ্টিতে পাওয়ার তো উপায় নাই। শুনিতে পাই, কবি, গুণী, সাধক, প্রভৃতির প্রতিভা ও মনীষায় নাকি কদাচিৎ কদাচিৎ সেই অলৌকিক লোকের আলোক-আভাস ধরা পড়ে। কিন্তু আমরা তাহারা নই, তাই স্মৃতিই শুধু আমাদের একমাত্র সম্বল ও আশ্রয়। (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

বিজ্ঞান ও সমাজ

প্রবাসজীবন চৌধুরী

আণবিক বোমার বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিজ্ঞানের একটি নবযুগের সূত্রপাত হয় তেমনি বিজ্ঞান-দর্শনেও একটি বিপ্লবের সূচনা আসে। এতদিন বিজ্ঞান-চর্চাকে আমরা বিশুদ্ধ কৌতূহল নিবৃত্তির উপায় হিসাবেই ধরেছি; বলেছি এর সঙ্গে সামাজিক বা ব্যবহারিক মনোবৃত্তির সম্বন্ধ থাকতে পারে না। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক নিছক জানবার আগ্রহে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ ক'রে তার নানা নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন এবং সেইগুলির সাহায্যে প্রকৃতিকে অনেকটা আয়ত্তে আনেন। বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান পিপাসা মেটে এবং জ্ঞান থেকে শক্তি আসে। তবে এই শক্তিকে কোন্ দিকে নিয়োগ করতে হবে এ সমস্যা বৈজ্ঞানিকের নয়; বিজ্ঞান অনাসক্ত, সামাজিক লাভ-লোকসান সম্বন্ধে নির্বিকার। এই কথাই এতদিন বিজ্ঞান-দর্শনের বাঁধা বুলি ছিল। কিন্তু আজ এ প্রশ্ন তীব্র হয়েছে যে, সমাজের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান চর্চার হয়তো একটি গণ্ডী বেঁধে দিতে হবে, বিশুদ্ধ জ্ঞান সর্বাঙ্গভাবে কাম্য নাও হতে পারে। অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরে মানব-বুদ্ধির প্রবেশের আর প্রয়োজন নেই কারণ তার ফলে মানব-সভ্যতাই হয়তো একদিন লোপ পাবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে সাংঘাতিক হতে পারে তা আজ আমরা ঠেকে শিখেছি, কিন্তু প্রাচীন ধর্মমতে, বৈদিক ও খৃষ্টীয় উভয় মতেই,—এই জ্ঞান দানবীয়। মানুষের কাম্য এ জ্ঞান নয়, বরং মুক্তি বা ব্রহ্মলাভ। মুক্তি বা ব্রহ্ম লাভকে এক প্রকার জ্ঞানও বলা যেতে পারে, কিন্তু এই জ্ঞানচর্চাকে পরা-বিদ্যা বলা হয়েছে, কেননা এর দ্বারা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়-প্রকৃতির ঊর্ধ্বে একটি চৈতন্যময় জগতের অনুভূতি হয়। বিজ্ঞান চর্চাকে অপরা-বিদ্যা বলা হয়েছে। নিছক্ কৌতূহল-বৃত্তি ও তাহার নিবৃত্তির জন্য বিজ্ঞান চর্চা এবং তাহা দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করা,—এই সবের ঘোর নিন্দা আমরা পাই আমাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মগ্রন্থে। ইউরোপে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তথাকথিত ধর্মান্ধ মধ্য-যুগের অবসান হয় এবং বিজ্ঞানের আলো দেখা দেয়। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক অন্ধবিশ্বাস দূর হতে থাকে এবং প্রকৃতির অনেক রহস্য মানুষ উদ্ধার করে। এই জ্ঞানের সাহায্যে সে তার শক্তি বৃদ্ধিও যথেষ্ট করতে থাকে। তখন কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক ভাবতে পারেননি যে, এই বিজ্ঞান-চর্চাকে মানুষ কোন দিন নিন্দা করবে বা এর অপ্রতিহত অগ্রগতিকে কোন দিন থামতে বলবে। ইস্পাত দিয়ে ভাল হাতিয়ার হয়েছে, বারুদ দিয়ে বন্দুক, কিন্তু এর জন্য কেউ দায়ী করেনি বিজ্ঞানকে, করেছে মানুষের নীতিজ্ঞানের অভাবকে। কিন্তু আজ বৈজ্ঞানিক-দের মধ্য হতেই অনেকে বলেছেন যে, দরকার নেই আমাদের আণবিক জ্ঞান নিয়ে। তার অনেক ভাল সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক নিজে এই জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটা সম্বন্ধে নির্বিকার ও নিঃসহায়, তখন এই জ্ঞান-চর্চা থেকে নিরস্ত থাকাই তার উচিত। একটি বোমা তৈরী করে কি ভাবে তাকে বিস্ফোরণ করতে হবে তা সব দেখিয়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক বলেন যে, 'আমি কী জানি, আমি নিছক্ জ্ঞান অর্জন করি ও দান করি, এর ফলাফলের দায়িত্ব আমার নয়।' এই সনাতনী যুক্তি আজ আর চলছে না। সমাজ এখন আর এ যুক্তি মানতে চায় না। বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যেও অনেকেই এ যুক্তিতে আস্থাহীন।

সুতরাং বলতে হয় যে, বিজ্ঞান-দর্শনেও বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চা কি তা হলে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা হিসাবে অবাধ স্বাধীনতা পাবে না? এই বা কেমন হয়? জ্ঞান যে কখনও মানব-স্বার্থের বাধা হবে একথা আজকের মানুষ ভাবতে পারে না। আর তার জ্ঞান-পিপাসাকে সে কেমন করে দমন করবে? চোখ, কান বুঁজে থাকার মতই কষ্টকর এই বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরস্ত রাখা। এই আত্ম-নিগ্রহে মানুষের হয়তো একদিকে ও আপাততঃ কল্যাণ হতে পারে কিন্তু অপরদিকে ও যথার্থ-পক্ষে ক্ষতিই হবে।

তবে এ সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, বর্তমান সমস্যার উদ্ভাবনের জন্য দায়ী মানুষের বিজ্ঞান-চর্চার আধিক্য নয় বরং তার স্বল্পতা। বিজ্ঞান বলতে শুধু পদার্থ-বিজ্ঞান বোঝায় না। সমাজ-বিজ্ঞানও (যার মধ্যে নীতি-বিজ্ঞানও পড়ে) বিজ্ঞানবহির্ভূত নয়। অর্থাৎ সামাজিক ভাল-মন্দের বিচার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা যায় এবং আজকাল কিছু পরিমাণে হচ্ছেও। এই সমাজ বিজ্ঞানের অনুন্নত অবস্থাই হচ্ছে বর্তমান সংকটপূর্ণ সমস্যার কারণ। বিজ্ঞান মূলতঃ এক। এবং অনেকগুলি শাখা প্রশাখা থাকায় যেমন সুবিধা এই যে, এক একটির বিস্তৃত চর্চা হওয়া সুসাধ্য তেমনি এর মস্ত অসুবিধা এই যে, বিজ্ঞানের ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা ঘটে। এবং তার চেয়ে বেশী অসুবিধা এই যে, একটি শাখাকে অবহেলা ক'রে বৈজ্ঞানিক শ্রেণী কোন বিশেষ একটির ওপরই জোর দিতে পারেন। আজকের বিজ্ঞান এই পক্ষপাত দোষে দূষিত, ঐক্য ও সামঞ্জস্য হারিয়ে সে খুঁড়িয়ে চলছে। প্রতিটি শাখার সহিত অপরগুলির যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যোগ থাকা উচিত তা নেই। পদার্থ-বিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে এবং এই দুইয়ের মধ্যে একটি না-বোঝার বা ভুল বোঝার প্রাচীর উঠেছে। সুতরাং সমগ্র দৃষ্টিতে বিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণ করলে বলতে হয় যে, সে যথার্থই অনুন্নত অবস্থায়, এমনকি অসুস্থ বা বিকৃত অবস্থায়। ফলতঃ দেখতে পাই যে, জ্ঞান মানুষের অপকার করে না, জ্ঞানাভাবই তা করে তাই বিজ্ঞান-চর্চাকে বন্ধ রাখবার প্রশ্ন উঠতে পরে না। যে প্রশ্ন উঠতে পারে তা এই যে, বিজ্ঞান-চর্চা রীতিমত এবং সর্বাঙ্গভাবে হচ্ছে কি না।

তা হচ্ছে না, আর সেই জন্যই মানুষ আজ এই সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এ আমাদের সভ্যতার সংকট। এখন মানুষকে বুঝতে হবে যে, শ্রম-বিভাগের ও রুচি ভেদের তাগিদে সে বিজ্ঞানের অনেকগুলি ভাগ করেছে, এই বিভাগ এখন বিভেদে পর্যবসিত হয়েছে আর বিজ্ঞানকে খর্ব করেছে। বৈজ্ঞানিককে কেবল তার বিশেষ একটি বিজ্ঞান-শাখার বিশেষজ্ঞ হলেই চলবে না, তাকে সবগুলি শাখার সংশ্লেষণ করতে হবে। যে দুটি প্রধান শাখার যোগাযোগ স্থাপনে এখন সকল বৈজ্ঞানিককে চেষ্টাবান হতে হবে তারা হচ্ছে পদার্থ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান। পদার্থ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানের সহিত তার সামাজিক ফলাফলের যোগ নিবিড় ও অনস্বীকার্য। পদার্থ-বিদ্‌কে এ কথা বললে চলবে না যে তিনি কেবল পদার্থ-সম্বন্ধেই জানবেন, সে জ্ঞানের প্রভাব সমাজের ওপর কিরূপ হতে পারে তা তিনি ভাববেন না। আমরা বলব যে, তাহলে তাঁর পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানও অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে কারণ তিনি জানেন না যে, সেই জ্ঞান দ্বারা রূপান্তরিত পদার্থ (যেমন উড়ো জাহাজ বা বোমা) কি ভাবে পৃথিবীর (মানুষ সুদ্ধ) রূপ পরিবর্তন করতে পারে। যে বৈজ্ঞানিক বোমা তৈরী করতে পারেন অথচ আসন্ন যুদ্ধ (ও তাঁর

দেশ ও আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুকে) বাধা বিদার উপায় জানেন না, তিনি যথার্থই করুণার পাত্র। কারণ তিনি একজন দুইখণ্ডে বিভক্ত ব্যক্তি। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি একজন, আর সমাজের সভ্য হিসাবে তিনি ভিন্ন একজন: এই দুইজনের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র নেই বললেই হয়। এইরূপ দ্বিখণ্ডিত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকই দায়ী আজকের এই সভ্যতার সঙ্কটের জন্য। বৈজ্ঞানিককে হতে হবে সম্পূর্ণ মানুষ আর বিজ্ঞানকে হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর জ্ঞান। বিশেষজ্ঞকে হতে হবে সমন্বয়কারী। তাহলেই দেখা যাবে যে, আণবিক জ্ঞানের সাহায্যে বোমার বদলে সৃষ্টি হবে মানুষের শ্রমলাঘবকারী নানা যন্ত্র এবং মানুষের শত্রু (যেমন রোগের বীজাণু) দমনের নানা উপায়। হয়তো মানব-সভ্যতার বিকাশের মস্ত এক সহায় হবে এই আণবিক শক্তি।

জয়পুরে কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। কংগ্রেসের এই অধিবেশনের উপযোগিতা কি, তাহা লইয়া মতভেদের যথেষ্ট অবসর থাকিলেও তাহা আমাদিগের আলোচ্য নহে। তথায় বাঙলা সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এইক্ষেত্রে বাঙলা বলিতে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ বুঝিতে হইবে। কারণ, যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের ও তাঁহাদিগের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিব্রত অবস্থাই প্রধান বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা বলিয়াছিলেন, বাস্তুত্যাগীদিগের সমস্যা যদি সঙ্কটকালীন ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে ভারত রাষ্ট্রকে বিষম অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। যে সকল সংশোধন প্রস্তাবে ভারত সরকারের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল, সে সকলই হয় পরাভূত নহেত পরিত্যক্ত হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন—

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত প্রত্যেক হিন্দুকে পাকিস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং পাকিস্থানকে তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। পাকিস্থান যদি তাহা না করেন, তবে পাকিস্থানকে সেজন্য হিসাব নিকাশের দায়ী হইতে হইবে। এই সমস্যার সহিত ভারত রাষ্ট্রের শুভ অচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধ এবং ভারত রাষ্ট্র এ বিষয়ে অনবহিত থাকিতে পারিবেন না।

কিছুদিন পূর্বে সর্দার প্যাটেল বলিয়াছিলেন—পাকিস্থান যদি হিন্দুদিগকে তথায় তুল্যাধিকার লাভ করিয়া বাসের ব্যবস্থা করিয়া না দেন, তবে হিন্দুদিগের জন্য পাকিস্থানের নিকট আবশ্যক ভূমি দাবী করা হইবে। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—তাহাতে ভীতি প্রদর্শন চেষ্টা নাই—এমন কি যুদ্ধের সম্ভাবনার ছায়াপাতও নাই।

গত ২১শে ডিসেম্বর—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্ধৃত উক্তির পরেও মিস্টার নুরুল আমীন পাকিস্থানে বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—

অসংগত রাজনীতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এক দল লোকের কৌশলই পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগের বাস্তুত্যাগের জন্য দায়ী।

তিনি ভারত রাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহকে, দায়িত্বশীল জননায়কদিগকে ও ভারত সরকারের প্রধান ব্যক্তিকে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য উক্তির জন্য নিন্দা করিয়াছেন। ইহা যে সর্দার বল্লভভাইকে আক্রমণ তাহা বলা বাহুল্য।

মিস্টার নুরুল আমিন এমন কথাও বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা অতি সদয় ব্যবহার পাইয়া থাকেন—পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা তাহাতে বঞ্চিত।

বহরমপুরে গত ১৯শে ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জিলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মিলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-সচিব শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এই প্রদেশে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন—এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আজ যখন অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সর্বাপেক্ষা প্রবল সমস্যা তখন যে শিক্ষায় তাহার সমাধান হইতে পারে, ছাত্রদিগকে সেই শিক্ষা প্রদান করা সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কিন্তু কিরূপে তাহা হইবে, তাহা তিনি বলেন নাই। সেদিনও শিক্ষা-সচিব দুঃখ করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয়, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যতদিন সরকারী দপ্তরের ব্যয়বাহুল্য দূর করা না হইবে, ততদিন অর্থাভাব ঘুচিবে না।

বহরমপুরে যাদববাবু ট্রাক্টরে চাষ দেখিয়া বলিয়াছেন, যৌথ চাষ-ব্যবস্থায় যদি বিস্তৃত ক্ষেত্রে চাষ করা সম্ভব হয়, তবেই ট্রাক্টরে চাষ করিলে লাভ হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সে সুবিধা কোথায়?

আমরা আশা করি, যাদববাবু জানেন, মুর্শিদাবাদ জিলায় বেলডাঙ্গার চিনির কল বন্ধ হওয়ায় ইক্ষুচাষীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পশ্চিবঙ্গে আর একটি মাত্র চিনির কল (পলাশীতে) আছে। দর্শনা এখন পাকিস্থানে। ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গে ৬টি চিনির কল প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর করিলেও পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিভাগের ব্যবস্থায় এতদিনে একটি মাত্র কোম্পানী কল-প্রতিষ্ঠার অনুমতি পাইয়াছেন; এ বৎসর কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইতে পারে না। শিল্পবিভাগ যদি—কৃষকদিগের ও দেশের লোকের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগের অধীনে বেলডাঙ্গার কল চালাইবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে লোকের বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু তাঁহারা তাহা করা প্রয়োজন মনে করিতেছেন না। ইহা যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করিতে অক্ষমতার পরিচায়ক তাহা বলা বাহুল্য।

এবারও কৃষকগণ আবশ্যক সার পায় নাই। আর কৃত্রিম সারে জমির উর্বরতা অবশেষে নষ্ট হয় কি না, তাহার আবশ্যক পরীক্ষাও পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ করেন নাই। এই সকল ত্রুটির সংশোধনের প্রয়োজন যে অত্যন্ত অধিক, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সে বিষয়ে কি কোন চেষ্টা হইতেছে?

বহুদিন পূর্বে স্যার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার বলিয়াছিলেন, ইংরেজ এদেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে মানুষের মনের তিনটি প্রয়োজন পূর্ণ হয় না—শৃঙ্খলার প্রয়োজন, ধর্মের প্রয়োজন, সন্তোষের প্রয়োজন। ধর্মের বিষয় এখন আমরা আলোচনা করিব না; কিন্তু সন্তোষের ও শৃঙ্খলার অভাব যে সমাজকে বিব্রত করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হাণ্টার শিক্ষাকে যে অবস্থার উদ্ভবের কারণ বলিয়াছিলেন—আরও কয়টি সাম্প্রতিক কারণে তাহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পর পর দুইটি বিশ্ব-যুদ্ধে মানুষের পশুভাব যেমন প্রবল হইয়াছে, তেমনই সাম্প্রদায়িক বিরোধে মানুষের মনে হিংসার প্রাবল্য ঘটিয়াছে। আবার ধনসাম্যবাদের যে রূপ এদেশে—হিন্দু সমাজে—অপরিচিত ছিল, বিদেশের সহিত ঘনিষ্ঠতায় তাহাও এ দেশে দেখা দিয়াছে। যে সময় দেশে শান্তি ও উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত দেশ রক্ষা পাইতে পারে না, সেই সময় দেশে বিশৃঙ্খলার বিস্তার ঘটিতেছে। নানা বিভাগে আমরা তাহা লক্ষ্য করিতেছি। সম্প্রতি কলিকাতায় ট্রামের শ্রমিক-দিগের ধর্মঘট ঘটিয়াছে। শ্রমিকদিগের কতকগুলি অভিযোগ আছে। সে সকল সংগত কি না

এবং সে সকলের প্রতীকার সহজসাধ্য কি না, তাহা অবশ্যই বিবেচ্য ও বিচার্য। কিন্তু বিচার বিবেচনার ফল যদি উভয় পক্ষই নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন, তবেই তাহা সার্থক হয়। এক্ষেত্রে তাহা হইতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে মীমাংসার উপায় সরকারের করাই রীতি। কিন্তু শ্রমিকদিগের অভিযোগ, সরকার ধনিকদিগকে অনুগ্রহ করিতেছেন; আর সরকার সকল দোষ ধনসাম্যবাদীদিগের উপর দিয়া তাহাদিগকে দণ্ড দিয়া বিশৃঙ্খলা দমনের নীতি অবলম্বন করিতেছেন। ফলে বিশৃঙ্খলা বর্ধিত হইতেছে। কলিকাতায় ট্রাম ধর্মঘটে একাধিক ক্ষেত্রে বোমা ব্যবহৃত হওয়ায় লোক হতাহত হইয়াছে—ইহার শেষ কোথায়, তাহা বলা দুষ্কর। কিন্তু সরকার কি করিবেন, তাহা জানা যাইতেছে না। যে সকল কারণে বিশৃঙ্খলা উদ্ভূত হইতেছে, সে সকল কারণ দূর না করিলে সে স্থায়ী ফল লাভ হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা এক্ষেত্রেও দেখিতেছি, সরকারের আত্মশক্তিতে অতিপ্রত্যয় এবং সম্ভ্রম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা তাঁহাদিগকে লোকের সহযোগ পাইতে আগ্রহ প্রকাশে বিরত করিতেছে। তাঁহাদিগের মনে রাখা প্রয়োজন—বুদ্ধি ও কৌশল দপ্তরখানার চতুঃসীমায় বদ্ধ নহে এবং লোকমত গ্রহণ করিলে কোন সরকারের সম্ভ্রমহানি হয় না।

সে যাহাই হউক, বিশৃঙ্খলায় লোক নানাপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং সরকার তাহার প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। লোকের মনে অসন্তোষ বর্ধিত ও পুঞ্জীভূত হইতেছে। ইহার প্রতীকার প্রয়োজন।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলিকাতায় কয়টি সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছে। সর্বাগ্রে ললিতকলা প্রদর্শনীর উল্লেখ করিতেছি। কলিকাতায় এই প্রদর্শনী প্রথম পরলোকগত মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন লেডী রাণু মুখোপাধ্যায় ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, দিল্লীতে যে শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছে, তাহাতে প্রদর্শিত চিত্রাদি ভারত রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রদেশে প্রদর্শিত করিবার ব্যবস্থা করা হউক। প্রত্যেক প্রদেশের কথা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু একথা বলিতে পারা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ তাঁহার প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছে। বিশেষ, শিল্পপ্রদর্শনী ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ভারতীয় বাণিজ্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের 'ডীন,' অধ্যাপক এম কে ঘোষ ইহাতে সভাপতিত্ব করিয়া গিয়াছেন। এদেশের লোকের বিশ্বাস—"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস—তাহার অর্ধেক চাষ।" বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আজ যদি আমরা বাণিজ্যনীতির পরিবর্তন করিয়া আবার বাণিজ্য সমৃদ্ধ করিতে না পারি, তবে আমাদিগের দারিদ্র্য দূর হইবে না। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়—এই অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক গবর্ণর বা কোন সচিব—উদ্বোধনেও উপস্থিত ছিলেন না; তবে প্রধান-সচিব ও শিক্ষা-সচিব ইহার সাফল্য কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান-সচিব বিধানবাবু জনসাধারণের নিকট বাস্তুহারাদিগের জন্য কম্বল, কাপড়, জামা, টাকা প্রভৃতি প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—তাহাদিগের দুর্দশা শোচনীয় এবং এখনও বাস্তুহারারা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিতেছে। আমরা আশা করি তাঁহার আবেদন ব্যর্থ হইবে না।

একটি চীনা কবিতা

কানাই সামন্ত

চীনা মহাকবি লি-পো'র নামে জড়িত হয়ে একটি কবিতার কিম্বদন্তি কানে এসেছে। চোখে দেখি নি অচেনা চীনা অক্ষরে বা ইংরেজি অনুবাদে। তবুও না-দেখা না-পড়া কবিতারই একটি ভাষান্তরের চেষ্টা করা গেছে; সেটি পরে দেওয়া যাচ্ছে। তার পূর্বেই বলি, চীনা বা জাপানী কবিতা যে রকম হয়ে থাকে, তাতে মূল কবিতা খুব সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতময় হওয়া বিচিত্র নয়। এই যেমন—

ঘাসের ডগায় শিশির ঝলক।
সকাল বুঝি?
চোখের পলক।
ঘাসের ডগায় ডালিম ফুলি
রঙ ছোঁয়ালে। কে? গোধূলি?
মাতাল বটি। অলস যে নই।
কাজ করি তার সময় বা কই?

অথবা দৈনিনে, প্রথম যেভাবে ভাবানুবাদ করা গেছে সেইটিই হয়তো মূলের কাছাকাছি। যথা—

লি-পো

রমণীর ভালোবাসা? হৃদয়ের খেয়া
ঘাটে ঘাটে ঢেউ দোলা? হারজিৎ? প্রাণ-দেয়া-নেয়া?
সেসব এসেছি ফেলে পাছে।
সুরা, তিক্ত সুমধুর সুরা—
তা ছাড়া জীবনে কী বা আছে!

সে নেশার ঘোরে চেয়ে দেখি
ঘাসের ডগায় দোলে একি
আলোঝলা মণি!
পূবে এখনি
ভোর হল বুঝি!

চোখ বুজি।
চোখ খুলে ফের
চিহ্ন দেখি নেই শিশিরের
ঘাসের ডগায়;
একটু ডালিমফুলী
রঙের বাহার। বুঝি
এসেছে গোধূলি!

নেশাখোর এ অখ্যাতি লি-পো করে অবহেলা।
অলস বোলো না। কাজ করিবার বেলা কৈ?
দিন এল, দিন গেল ঐ!

পশ্চিম বঙ্গের অর্থকথা

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ

প্রদেশের শিল্পসম্পদ

সমগ্র বাঙলা দেশের বৃহদায়তন শিল্পসমূহের প্রায় ৯২% ভাগ শিল্প পশ্চিম বাঙলায় অবস্থিত। এই সকল বৃহদায়তন শিল্প পশ্চিম বাঙলার শিল্পসম্পদকে বৃদ্ধি করিতেছে। বৃহদায়তন শিল্প ছাড়াও বহু নাতিবৃহৎ শিল্প প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কিংবা কুটির শিল্প পূর্ব বাঙলার কৃষিপ্রধান অর্থনীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রসারলাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশেও ক্ষুদ্রায়তনশিল্প এবং কুটিরশিল্পের অভাব নাই। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশেও বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং কুটির শিল্পের প্রাধান্য সহজেই পরিস্ফুট হইবে। পূর্ব বাঙলার তুলনায় পশ্চিম বাঙলা যে অনেক বেশী শিল্পসমৃদ্ধ, তাহা বিশদ্‌ভাবে না বলিলেও চলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রদেশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গও শিল্পক্ষেত্রে খুব অগ্রসর নহে। আধুনিক শিল্পোন্নয়নের নিরিখে বিচার করিলে পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসর বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের এই পশ্চাদ্বর্তিতার মস্ত বড় প্রমাণ এই যে, ১৯৪৪ সালেও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে বৃহদায়তন শিল্প-কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮০১টি। প্রদেশের অধিবাসীদের ভিতরে ৬ লক্ষ ৭৩ হাজারেরও কম সংখ্যক লোক এই সকল কারখানায় জীবিকা উপার্জন করিয়াছে; অর্থাৎ প্রদেশে শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩% ভাগেরও কম হইবে। নাতি-বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা ধরিলে প্রদেশে শ্রমিকের সংখ্যা যে অনেক বেশী হইবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কিন্তু এই সকল শিল্প অনেক ক্ষেত্রেই "পরিপূরক সংস্থান" বলিয়া এই সকল শিল্পের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শ্রমিকের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে।

অবিভক্ত বাঙলা দেশের শিল্পসম্পদ যেমন পশ্চিম বাঙলায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, সেইরূপ পশ্চিম বাঙলার বৃহদায়তন শিল্পসমূহও কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্তী জিলার ভিতরে আবদ্ধ রহিয়াছে। পশ্চিম বাঙলার বৃহদায়তন শিল্পসমূহের এই কেন্দ্রীভূত অবস্থান প্রদেশের শিল্প-বিন্যাসের সর্বপ্রধান ত্রুটি বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে। সমগ্র প্রদেশে সামঞ্জস্য ও সংগতিপূর্ণ শিল্পবিকাশের সম্ভাবনাকে ইহা বিশেষভাবে ব্যাহত করিতেছে। ১৯৩৯ সালে সমগ্র বাঙলা দেশে বৃহদায়তন শিল্প কারখানার সংখ্যা ছিল ১৬৯৪ এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ লক্ষ ৬৬½ হাজার। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে শিল্প কারখানার সংখ্যা ছিল ১৫২৩ এবং শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩৩ হাজারের কিছু কম। অর্থাৎ অবিভক্ত বাঙলা দেশের শিল্প-কারখানার ৮৯.৯% ভাগ এবং শিল্প-শ্রমিকের ৯৪% ভাগের বেশী ছিল পশ্চিম বাঙলার অংশ। পশ্চিম বাঙলার এই শিল্প-সম্পদের অধিকাংশই আবার কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে কলিকাতা এবং হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা জিলায়। ১৯৩৯ সালে কলিকাতা এবং হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা জিলায় বৃহদায়তন শিল্প-কারখানার সংখ্যা ছিল ৯৬১ এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৬৫½ হাজারের বেশী। অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে পশ্চিম বাঙলার মোট বৃহদায়তন শিল্প-কারখানার ৫৬.৫% ভাগ অবস্থিত ছিল কেবলমাত্র কলিকাতা এবং হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা জিলায়; এই চারিটি স্থানে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও ছিল পশ্চিম বঙ্গের মোট শিল্প-শ্রমিকের ৮২% ভাগ।[১] ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১২২৮ এবং প্রায় ৬ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে বৃহদায়তন শিল্প-কারখানার সংখ্যা ছিল ১৮০১ এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার। কাজেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ১৯৩৯ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে যে শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়াছে, তাহাতেও কেন্দ্রীভূত শিল্প-বিন্যাসের বিশেষ কোন পরিবর্তনই সূচিত হয় নাই।[২]

পশ্চিম বাঙলার শিল্পসমূহকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—বৃহদায়তন শিল্প, নাতিবৃহৎ কিংবা মধ্যায়তন শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কুটীরশিল্প। বৃহদায়তন শিল্পসমূহের অধিকাংশেই সারা বৎসর কাজ চলিতে থাকে; কিন্তু যে সকল শিল্পে খাদ্য-পানীয়—নেশাজাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয় কিংবা কার্পাস বীজ, পাট প্রভৃতি পেষণ করা হয়, তাহাদের ভিতর কোন কোনটিতে বৎসরের কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে কাজ চলিতে থাকে; অন্যান্য সময়ে কাজ বন্ধ থাকে। পশ্চিম-বঙ্গে যে সকল প্রধান শিল্প রহিয়াছে, ১৯৪৭ সালে তাহাদের সংখ্যা ছিল ১,২২০। কিন্তু এই সকল শিল্পের সবগুলিই বৃহদায়তন শিল্পের মর্যাদা দাবী করিতে পারে না।

1. Bengal Industrial Survey Committee Report, 1948 P. 193.
2. Reports on the Administration of Factory Acts.

পাট-শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে যে সকল প্রধান শিল্প রহিয়াছে, তাহার ভিতরে পাট-শিল্পের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। ১৯৪৭ সালের হিসাব অনুসারে পশ্চিম বাঙলায় মোট ৮৭টি পাটকল আছে। এই সকল পাটকলে ১৯৪২ সালে দৈনিক প্রায় ২ লক্ষ ৮৮ হাজার শ্রমিক কাজ করিত। ১৯৪২ সালের পরে শ্রমিকের সংখ্যা কিছু হ্রাস পাইয়াছে সন্দেহ নাই; ১৯৪৪ সালে পাটশিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৬৭ হাজার। যাহাই হউক, প্রদেশের মোট ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার শ্রমিকের ভিতরে কেবলমাত্র পাট-শিল্পেই যে ২½ লক্ষের বেশী শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।[১] এই সকল পাটকলে একদিকে যেমন স্ত্রী-শ্রমিক এবং পুরুষ শ্রমিকের উভয়ই রহিয়াছে, তেমনি এই সকল শ্রমিকের ভিতরে সমর্থ, কিশোর এবং বালক সকল প্রকার শ্রমিকই রহিয়াছে। ১৯৪৪ সালে ৫৫ হাজার পূর্ণবয়স্ক পুরুষ এবং ৬ হাজার ৭ শত পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-শ্রমিক (অর্থাৎ মোট ৬২ হাজার পূর্ণবয়স্ক শ্রমিক) ছিল। কিশোর শ্রমিকদের ভিতরে পুরুষ-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯৮, স্ত্রী-শ্রমিক ছিল না বলিলেই চলে। বালক-শ্রমিকদের ভিতরেও স্ত্রী-শ্রমিক ছিল না; পুরুষ-শ্রমিকের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না,—মাত্র ৩২ জন ছিল।[২]

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে যে সকল পাটকল রহিয়াছে, তাহাতে ১৯৪৬ সালে ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার টন পাটদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার

(১) ১৯৪৬ সালে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ ৯০ হাজার। এই সংখ্যা কেবলমাত্র মিল সমিতির অন্তর্ভুক্ত মিলগুলি হইতে লওয়া হইয়াছে। এইরূপ মিলের সংখ্যা প্রদেশের মোট মিলের ৯৭% ভাগের বেশী হইবে না।

(2) Annual Reports on the Administration of Factories Act in Bengal.

ভিতরে চট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টন, থলি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টন এবং অন্যান্য পাটদ্রব্যের পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার টন। ১৯৪৭ সালে এই সকল পাটকলে ৫৬,২০১টি তাঁত ছিল এবং ১১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকু ছিল। এই সকল পাটকলে প্রতিদিন ২,০৪৯ টন কয়লা ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল পাটকল চালু রাখিবার জন্য ৬০ লক্ষ গাঁইটের বেশী কাঁচা পাটের প্রয়োজন। ১৯৩৬-৩৮ সালে ৭০ লক্ষ টনের বেশী কাঁচা পাট এই সকল পাটকলে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রতি বৎসর যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে (ভারতবর্ষ হইতে) বিদেশে রপ্তানি করা কাঁচা পাটের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৯১ হাজার গাঁইট। পশ্চিমবঙ্গের পাটকলসমূহে প্রতি বৎসর যে ৬০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা হইতে উৎপন্ন সকল পাটদ্রব্যই পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও প্রয়োজন হয় না। ১৯৩২-৩৩ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাবে দেখা যায়, এই সময়ে প্রতি বৎসর গড়ে ১০ লক্ষ ৮৬ হাজার টন পাটদ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টন পাটদ্রব্য বাহিরে রপ্তানি করা হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে মোট ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার টন পাটদ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে; তাহার ভিতর ৮ লক্ষ ১৭ হাজার টন পাটদ্রব্যই বাহিরে রপ্তানি করা হইয়াছে। সেই বৎসর ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য ভারতবর্ষে (ব্রহ্মদেশ ছাড়া) ব্যবহার করা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ হইতে কেবলমাত্র কাঁচা পাটই যে বাহিরে রপ্তানি করা হয়, তাহা নহে। পাটজাত দ্রব্যেরও একটি বৃহদংশ ভারতবর্ষের বাহিরে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল পাটদ্রব্যের একান্ত দরকার কেবলমাত্র তাহা প্রস্তুত করিতে ৩০ লক্ষ গাঁইটের বেশী কাঁচা পাট প্রয়োজন হইবে না।[1]

অবিভক্ত বাঙলার পাটশিল্পের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যাই ছিল রপ্তানি বাজারের ক্রমাবনতি। ১৯০৯-১০ সাল হইতে ভারতীয় পাটকলে ব্যবহৃত কাঁচা পাট অপেক্ষা বাহিরে রপ্তানির গুরুত্ব ক্রমাগত হ্রাস পাইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যদিও আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ সর্বদাই বেশী রহিয়াছে, তবুও রপ্তানির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই, অবিভক্ত বাঙলার পাটশিল্পের সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখিবার জন্য আধুনিক জগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার অনুকূলে বহু বিশেষজ্ঞই মত প্রকাশ করিয়াছেন।[2] কিন্তু বাঙলা দেশ বিভক্ত হইবার পরে পাটশিল্পের প্রধান সমস্যা হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি চালু রাখা। প্রদেশের কৃষি-সম্পদ আলোচনা করিবার সময়ে বলা হইয়াছে যে, প্রদেশের পাটকলগুলিকে চালু রাখিবার জন্য যে ৬০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট দরকার, প্রদেশের বর্ধিত উৎপাদনের হিসাব অনুসারে তাহার ৯% ভাগ মাত্র উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যে পাটদ্রব্যের প্রয়োজন, তাহার জন্য কেবলমাত্র ৩০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট প্রয়োজন। তাহা ছাড়া প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু না থাকিলে পশ্চিমবঙ্গে কাঁচা পাটের উৎপাদন বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ হইতে পারে; কারণ, ১৯৪৭-৪৮ সালের বর্ধিত উৎপাদনও ১৯৪০ সালের অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করিবার পূর্বেকার উৎপাদনের ৫৩% ভাগ মাত্র। তৃতীয়তঃ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পাটজাত দ্রব্যের প্রয়োজন মিটাইতে ৩০ লক্ষ গাঁইট অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ কাঁচা পাটই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রদেশের পাটকলগুলিকে পূর্ণ ক্ষমতায় চালু রাখিতে না পারিলে একদিকে বহু লোকের আর্থিক সংস্থান যেরূপ লোপ পাইবে, সেইরূপ বিদেশ হইতে আনীত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দিবার একটি প্রধান সম্পদকেও হারাইতে হইবে।

বৃহদায়তন পাটশিল্প ভিন্ন হস্তচালিত পাটবয়নশিল্পও অবিভক্ত বাঙলা দেশে এককালে প্রসারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু পাটকলের প্রতিযোগিতার ফলে এই সকল হস্তচালিত তাঁত বর্তমানে প্রায় মুমূর্ষু। তাহা ছাড়া দিনাজপুর ভিন্ন নূতন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের কোথাও এই শিল্প কোন কালেই বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পাটকলগুলি অন্যান্য বহু শিল্পের ন্যায় কেবলমাত্র ২৪-পরগণা, হুগলী, হাওড়া জিলার ভিতরে আবদ্ধ রহিয়াছে। এদেশের মোট ৮৭টি পাটকলের ভিতরে ৫৬টি ২৪-পরগণা জিলায়, ১৬টি হুগলী জিলায় এবং ২৫টি হাওড়া জিলায় অবস্থিত। এই সকল পাটকলে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হইতেও একই অবস্থা পরিস্ফুট হইবে। ১৯৪৪ সালে এদেশের ২ লক্ষ ৬৭ হাজার পাট-শ্রমিকের ভিতরে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার শ্রমিক ২৪-পরগণা জিলার পাটকলসমূহে, ৫২ই হাজার শ্রমিক হুগলীর পাটকলসমূহে এবং বাকী ৬২ হাজার শ্রমিক হাওড়ার পাটকলসমূহে নিযুক্ত ছিল।[1] এই সকল মিল ভিন্ন প্রদেশে যে সকল 'প্রেস' আছে, তাহার হিসাব লইলেও দেখা যায়, ২৪-পরগণার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। ২৪-পরগণা জিলায় ২৩টি, হাওড়া জিলায় ১০টি এবং কলিকাতায় তিনটি 'প্রেস' রহিয়াছে।

বস্ত্রশিল্প

পশ্চিমবঙ্গের তন্তুশিল্পের ভিতরে পাটশিল্পের পরেই বস্ত্রশিল্পের স্থান। ১৯৪৭ সালের হিসাব অনুসারে প্রদেশে মোট ৩১টি কল (সূতাকল ও কাপড়ের কল) আছে। ১৯৪৬ সালে প্রদেশে মোট ২৮টি কল ছিল। সেই সময়ে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ২২ হাজারের বেশী। এই সকল কলে যে মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। যে সকল টাকু এই সকল কলে বসান হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার; উহার ভিতর যে সকল টাকু কার্যতঃ ব্যবহৃত হইত, তাহার সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৬ হাজারের বেশী হইবে। এই সকল কলে যে ৮ হাজার ৮ শতের বেশী তাঁত ছিল, তাহার ভিতরে ৮ হাজার ২ শতের বেশী তাঁত প্রতিদিন ব্যবহৃত হইত। যে পরিমাণ তুলা এই সকল কলের জন্য বৎসরে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার গাঁইট (১ গাঁইট=৩২ হন্দর) হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৭ সালের ভিতরে ১৯৪৫ সালেই প্রদেশে বস্ত্রশিল্পের প্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। ১৯৪৫ সালে প্রদেশে কলের সংখ্যা ছিল ৩৭, শ্রমিকের সংখ্যা ২৯ হাজার ৪ শত; টাকুর সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার; তাঁতের সংখ্যা ১১ হাজার ২ শতের বেশী। সেই বৎসর ১ লক্ষ ৭১ হাজার গাঁইটের বেশী তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে।[1] পাটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের ন্যায় বস্ত্রশিল্পেও নিযুক্ত শ্রমিকের ভিতরেও পুরুষ-শ্রমিক, স্ত্রী-শ্রমিক এবং শিশু-শ্রমিক সকল প্রকার শ্রমিকই দেখা যায়। ১৯৪৪ সালে যখন বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার ৩ শত, তখন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ৭ শত, পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ১ শত; কিশোর-শ্রমিকদের

---

1. Compiled from the Annual Reports of the Indian Jute Mills Association.

2. Barker Dr. S. G. Report on the Jute Industry, 1935.

1. Annual Reports on the Administration of Factory Acts in Bengal.

1. Compiled from the statements of the Bombay Millowners' Association.

ভিতরে ৩০২ জন ছিল পুরুষ এবং ৩২ জন স্ত্রীলোক। অল্পবয়স্ক শ্রমিকদের ভিতরে ৬৫ জন ছিল পুরুষ এবং ২৬ জন স্ত্রীলোক।

উৎপাদনের দিক হইতে হিসাব করিলে দেখা যায়, অবিভক্ত বাঙলাদেশে প্রতি বৎসর ২২ কোটি গজ কাপড় মিল হইতে উৎপন্ন হইত। ইহার ভিতরে সাদা (ধৌত এবং ধৌত নহে) কাপড়ের পরিমাণ প্রায় ২১½ কোটি গজ হইবে এবং অবশিষ্ট ৭৫ লক্ষ গজেরও কম কাপড় রঙীন। পূর্ব বাঙলার উৎপাদন অবিভক্ত বাঙলার উৎপাদনের (কেবলমাত্র মিলের কাপড়) ২৫% ভাগের বেশি হইবে না। কাজেই অবিভক্ত বাঙলার উৎপাদনের হিসাব অনুসারে পশ্চিম বাঙলার উৎপাদনের পরিমাণ ১৬½ কোটি গজের কম হইবে না।

কিন্তু বাঙলাদেশের বস্ত্রশিল্পের কথা আলোচনা করতে গেলে তাঁতের কাপড়ের কথা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। অবিভক্ত বাঙলাদেশে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা, ১৯৪০—৪১ সালের হিসাব অনুসারে ১ লক্ষ ৩৬ হাজারের বেশি ছিল। ৮১ হাজারের বেশি তাঁতী পরিবারের প্রায় ১ লক্ষ ৯৭ হাজার জন লোক ইহাতে নিযুক্ত ছিল। এই সকল তাঁতে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ পাউণ্ড সুতা ব্যবহৃত হইয়াছে; উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৪৭ লক্ষ গজ এবং তাহার মূল্য ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকার বেশি হইবে। অবিভক্ত বাঙলাদেশের দেশীয় রাজ্যসহ উৎপাদন ১৪ কোটি ৮২ লক্ষ গজ ছিল। ১৯৪০—৪১ সালের পরে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন খুব বেশি বৃদ্ধি পায় নাই। বিভক্ত হইবার পূর্বে বাঙলাদেশের তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ১৬ কোটি ২০ লক্ষ গজ ছিল, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। অবিভক্ত বাঙলাদেশে তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল হুগলী, নদীয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং নোয়াখালি জিলা। এই সকল উৎপাদন কেন্দ্রের অধিকাংশই বর্তমানে পূর্ব বাঙলার অন্তর্ভুক্ত; পশ্চিম বাঙলার উৎপাদন অবিভক্ত বাঙলার মোট উৎপাদনের ৪৪% ভাগ (অর্থাৎ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ গজ) হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পশ্চিম বাঙলার মিলের কাপড় এবং তাঁতের কাপড়ের মোট উৎপাদন ২১ কোটি ৯০ লক্ষ গজ বা প্রায় ২২ কোটি গজ হইবে, দেখা যাইতেছে। কিন্তু প্রদেশের প্রয়োজন উৎপাদন অপেক্ষা অনেক বেশি। যে কোন সভ্যদেশে মাথাপিছু বাৎসরিক যে বস্ত্রের প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ ৫০ গজের কম হইবে না। বোম্বাই পরিকল্পনাতেও মাথাপিছু প্রয়োজন ৩০ গজ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বোম্বাই পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রয়োজন ৭৫ কোটি গজ হইবে। অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে যে মাথাপিছু ৩০ গজ কাপড়ের সংস্থান করা সম্ভব হইবে, এইরূপে মনে হয় না। বঙ্গীয় শিল্পতথ্য সংগ্রহ সমিতির হিসাব অনুসারে বাঙলাদেশে মাথাপিছু ব্যবহৃত বস্ত্রের পরিমাণ ১৭½ গজ হইবে। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সমিতির (খাটাউ সমিতি) মতে বাঙলা দেশে মাথাপিছু বস্ত্রের প্রয়োজন অন্তত ১৬½ গজ হইবে। পরিধানের এই ন্যূনতম প্রয়োজনও যদি স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে প্রদেশে অন্ততঃপক্ষে ৪১ কোটি ২৫ লক্ষ গজ কাপড় প্রতি বৎসর উৎপাদন করিতে হইবে। অর্থাৎ ন্যূনতম প্রয়োজনের হিসাব অনুসারেও বর্তমানে প্রদেশের ঘাটতির পরিমাণ ১৯ কোটি ৩৫ লক্ষ গজ কিংবা ২০ কোটি গজের কম হইবে না।(১)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, অবিভক্ত বাঙলাদেশে ১ লক্ষ ২৫ হাজার (সূক্ষ্ম সুতার) এবং ২ লক্ষ (মোটা সুতার) অর্থাৎ মোট ৩ লক্ষ ২৫ হাজার নূতন টাঁকু দেওয়া হইয়াছে। ইহার ভিতরে পশ্চিম বাঙলার অংশ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাঁকুর কম হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের এই সকল নূতন টাঁকু হইতে (৯০ হাজার সূক্ষ্ম এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজার মোটা) প্রায় ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ গজ কাপড় পাওয়া যাইবে, এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই বর্ধিত উৎপাদনের হিসাব অনুসারে প্রদেশের ন্যূনতম প্রয়োজন (মাথাপিছু ১৬½ গজ) মিটাইতে হইলে ৩ কোটি ৫ লক্ষ গজের বেশি কাপড় দরকার হইবে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই সকল টাঁকু চালু রাখিবার জন্য যে পরিমাণ সুতার প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য নহে। যুদ্ধপূর্বের হিসাব অনুসারে, প্রতি ৪ গজ বস্ত্র বয়ন করিবার জন্য ১ পাউণ্ড সুতার প্রয়োজন হইত।২ অর্থাৎ বাঙলাদেশের বস্ত্রকলসমূহকে চালু রাখিবার জন্য সেই সময়ে প্রতি বৎসর ৫ কোটি ১৫ লক্ষ পাউণ্ড সুতার প্রয়োজন হইত। কিন্তু বাঙলাদেশের নিজস্ব সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪ কোটি ১৪ লক্ষ পাউণ্ড। সেই সময়ে বিদেশ হইতে ২৩ লক্ষ পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে ২ কোটি ৩১ লক্ষ পাউণ্ড সুতা আমদানী করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও বাঙলাদেশের প্রয়োজন মিটান সম্ভবপর ছিল না। কারণ, তাঁতসমূহ ছাড়াই হোসিয়ারী দ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটি ৭১ লক্ষ পাউণ্ড সুতার প্রয়োজন হইত। যুদ্ধের পরে বাঙলাদেশের বস্ত্রকলসমূহে সুতার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি ৭১ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আরও ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড সুতার দরকার হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তাঁতবস্ত্র, হোসিয়ারী দ্রব্য প্রভৃতির জন্য আরও ৫ কোটি ৫২ লক্ষ পাউণ্ড সুতার দরকার হইয়াছে। অথচ প্রদেশের মোট সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৫ কোটি ৭ লক্ষ পাউণ্ডের বেশি ছিল না। অর্থাৎ প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় নিজস্ব উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬ কোটি ৭২ লক্ষ পাউণ্ড ছিল এবং এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য কেবলমাত্র বোম্বাই এবং মাদ্রাজ হইতেই ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ পাউণ্ড সুতা আমদানী করা হইয়াছে।১ বাঙলা দেশ বিভক্ত হইবার পরে সুতা সমস্যার গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কাজেই, পশ্চিম বাঙলার টাঁকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপ মনে করিবার যুক্তিসংগত কারণ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের রেশমশিল্পের কথা এইসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ দেশে ৬টি রেশম বয়নের মিল রহিয়াছে; এই সকল মিলে প্রায় ৭০০ তাঁত চালু আছে। জিলাসমূহের ভিতরে মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়াতেই এই শিল্প সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসারলাভ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়া জিলাতে প্রায় ৩ হাজার লোক এই শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে।

ভোগ্যপণ্য

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে ভোগ্যপণ্যের বহু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রধানত পূর্ববঙ্গের কৃষিশস্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই সকল শিল্প প্রসারলাভ করিয়াছে। বাঙলাদেশ বিভক্ত হইবার ফলে এই সকল শিল্পের প্রায় প্রত্যেকটিতে স্বভাবতঃই কাঁচামাল কিংবা মূল কৃষিশস্যের সমস্যা দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের এই সকল শিল্পের ভিতরে চাউলের কল, ময়দার কল, ফল ও দুগ্ধশিল্প এবং গুড় উৎপাদনের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চাউলের কল

১৯৪৪—৪৫ সালে অবিভক্ত বাঙলাদেশে ৪৫০টির বেশি চাউলের কল চালু ছিল। সেই সময়ে কলিকাতা এবং ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া জিলায় প্রদেশের চাউলের কলের মোট সংখ্যার ৮৮·১% ভাগ অবস্থিত ছিল। এই আটটি জিলার ভিতরে কেবলমাত্র দিনাজপুরের একাংশ ভিন্ন সকল

1. Bengal Industrial Survey Committee Report; Report by the Post-war Planning Committee on Textile.

(২) তথ্য সংগ্রহ সমিতির (ফ্যাকট ফাইণ্ডিং কমিটি) হিসাব অনুসারে ১ পাউণ্ড সুতা=৪·৭৮ গজ মিলের কাপড় কিংবা ৪·৫৭ গজ তাঁতের কাপড়। পৃঃ ৫৫।

1. Report of the Bengal Industrial Survey Committee Pp. 36-37.

জিলাই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। স্বভাবতঃই নূতন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে চাউলের কলের সংখ্যা পূর্ববঙ্গ প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশি হইবে। ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাঙলাদেশে চাউলের কলের মোট সংখ্যা ছিল ৪৯৭; ইহার ভিতর পশ্চিমবঙ্গের অংশ ৩৮৮টির কম কিছুতেই হইবে না। ছোট-বড় সকল প্রকার কলের সংখ্যা হিসাব করিলে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে চাউলের কলের সংখ্যা ৪১৮ হইবে। অবিভক্ত বাঙলাদেশে চাউলের কলগুলির অবস্থান পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, ধান সরবরাহ অপেক্ষা বাজারের সুবিধাই চাউল কলগুলির অবস্থান নির্ধারিত করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল চাউলের কল রহিয়াছে, তাহাতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ধানের ৮৫% ভাগ ছাটা যাইতে পারে।

ময়দার কল

১৯৪৪-৪৫ সালে অবিভক্ত বাঙলা দেশে ময়দার কলের সংখ্যা ছিল ১৫; এই সকল ময়দার কল চালু রাখিবার জন্য প্রদেশের নিজস্ব উৎপাদন ১১ লক্ষ মণ গম ছাড়াও বাহির হইতে প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ মণ কিম্বা ২ লক্ষ ২২ হাজার টন গম আমদানী করিতে হইত। অবিভক্ত বাঙলা দেশের অধিকাংশ ময়দার কলই পশ্চিম বাঙলায় অবস্থিত ছিল। বর্তমানে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশেই ১৬টি ময়দার কল আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে ৯৬ হাজার একরে গমের চাষ হইয়াছে; পশ্চিম বাঙলায় গম উৎপাদনের পরিমাণ সাধারণত দশ হাজার হইতে ১২ হাজার টন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাজেই পশ্চিম বাঙলার ময়দার কলগুলিকে যে বাহির হইতে গম আমদানী করিতে হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বাঙলা দেশ প্রধানতঃ অন্নভোজী বলিয়া ময়দার প্রয়োজন খুব বেশী নহে; অবিভক্ত বাঙলা দেশে মাথাপিছু সাংসারিক প্রয়োজন ১২ পাউন্ডের বেশী ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের নিকট (পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের তুলনায়) ময়দা অপেক্ষাকৃত প্রিয় খাদ্য। কাজেই, পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু প্রয়োজনও কিছু বেশী হইবে।

চিনি শিল্প

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে বর্তমানে ৪টি চিনির কল আছে। অবিভক্ত বাঙলায় চিনির কলের সংখ্যা ৯টি কিংবা ১০টি হইবে। অবিভক্ত বাঙলায় এই সকল চিনির কল প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ ৮০ হাজার মণ হইতে ৪ লক্ষ মণ চিনি উৎপাদন করিত। কিন্তু প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের এই পরিমাণ নিতান্তই সামান্য ছিল। ১৯৪০-৪১ সালে বাঙলা দেশ প্রায় ৩২ লক্ষ ৩৯ হাজার মণ চিনি বাহির হইতে আমদানী করিয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে যে সকল চিনির কল রহিয়াছে, তাহাতে প্রতি বৎসর ৯ হাজার টন চিনি উৎপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রদেশের প্রয়োজন অবশ্যই ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। প্রদেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু বার্ষিক ৬ পাউন্ড চিনির দরকার এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই হিসাব অনুসারে, প্রদেশের বার্ষিক প্রয়োজন ৬৭ হাজার টনের সামান্য কম হইবে; অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৫৮ হাজার টন হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের চিনির কলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা যদিও ৯ হাজার টন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলেও প্রকৃত উৎপাদন ৪ হাজার টনের বেশী হইবে না। কাজেই, বর্তমান উৎপাদন অনুসারে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৬৩ হাজার টন হইবে। পশ্চিম বাঙলায় চিনি-শিল্পের প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ এবং সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে ২৭—২৮ হাজার টন ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে, পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রদেশের চিনি শিল্পের প্রসারের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। ইহার ফলে প্রদেশে 'অ্যালকোহল' এবং 'স্পিরিট' উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করাও সহজসাধ্য হইবে।

তৈলের কল

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ছোট ছোট তৈল কলের সংখ্যা ধরিলে প্রদেশে প্রায় ১৭০টি তৈলের কল আছে, বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান; নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ২০ জনের কম। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে অন্ততঃপক্ষে ৪৩টি তৈলের কল আছে, যাহাকে বৃহদায়তন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। প্রদেশের কৃষিদ্রব্যের কথা আলোচনা করিবার সময়ে বলা হইয়াছে যে, বঙ্গদেশের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নহে, তাহা ছাড়া, বাঙলা দেশের তৈলবীজসমূহ নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া তাহাতে তৈলাংশও কম থাকে। এই কারণেই অবিভক্ত বাঙলা দেশে প্রতি বৎসর কেবলমাত্র রাই এবং সরিষাই ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন আমদানী করিতে হইত। এই সকল তৈলবীজ আমদানী করিবার ফলে বাঙলা দেশের তৈলকলসমূহের উৎপাদন খরচাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণেই অন্যান্য

প্রদেশের তৈলকলগুলির সহিত বাঙলা দেশের তৈলকলগুলির প্রতিযোগিতা করা কষ্টসাধ্য, হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে বাঙলা দেশে বাহির হইতে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টনের বেশী তৈল আমদানী করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে তৈল-কলসমূহও যে এই সকল সমস্যা হইতে মুক্ত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফল-সংরক্ষণ শিল্প

ফল ও শাকসব্জী সংরক্ষণের জন্য পশ্চিম বাঙলায় অন্ততঃপক্ষে ৬টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে। অবিভক্ত বাঙলা দেশে ১১টি প্রতিষ্ঠান "আচার-মোরব্বা" প্রভৃতি ফলজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিত। যুক্তপ্রদেশ কিংবা পাঞ্জাবের ন্যায় বাঙলা দেশে ফল-সংরক্ষণ শিল্প প্রসারলাভ করে নাই; তাহার প্রধান কারণ বাঙলা দেশের ফল-সম্পদ খুব বেশী নহে। তাহা ছাড়া, অতিরিক্ত ট্রেন মাশুল, স্থলপথে "শীতল-সংরক্ষণ ব্যবস্থার" অভাব, ফল-মূলাদি রাখিবার উপযুক্ত কাঁচের পাত্রের অভাব এবং দক্ষ কর্মীর অভাবের জন্যও এই শিল্প বিশেষভাবে প্রসার-লাভ করিতে পারে নাই। পশ্চিম বাঙলার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও এই সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছে। কিন্তু ফল-মূল ও শাকসব্জী সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময়েই বলা হইয়াছে যে, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে ও সরকারী সাহায্যের ফলে পশ্চম বাঙলায় ফল ও শাক-সব্জী সংরক্ষণ শিল্প দ্রুত প্রসারলাভ করিতে পারে।

দিয়াশলাই শিল্প

পশ্চিম বাঙলায় বর্তমানে ৬টি দিয়াশলাই'র কারখানা আছে। অবিভক্ত বাঙলায় ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাব অনুসারে ১২টি দিয়াশলাই'র কারখানা ছিল। সেই সময়ে এই সকল কার-খানায় ৪৫ লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই বাক্স প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইত। কিন্তু এই সকল কারখানা পূর্ণ ক্ষমতায় চালু থাকিলে প্রতি বৎসর ৯০ লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই বাক্স প্রস্তুত করা সম্ভব-পর ছিল। অবিভক্ত বাঙলা দেশের প্রধান দিয়াশলাই কারখানাসমূহের অধিকাংশই কলিকাতায় অবস্থিত ছিল। শুল্ক সমিতির হিসাব অনুসারে কেবলমাত্র কলিকাতার কারখানাসমূহই সেই সময়ে প্রতি বৎসর ৪২ লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই বাক্স প্রস্তুত করিতে পারিত; ১৯৪৪-৪৫ এই সকল কারখানাই প্রায় ৫০ লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই বাক্স প্রস্তুত করিয়াছে। শুল্ক সমিতির হিসাব অনুসারে, বাঙলা দেশে প্রতি ব্যক্তির গড়ে প্রতি বৎসর ৮টি দিয়াশলাই বাক্স প্রয়োজন। এই হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বৎসর প্রায় ১৪ লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই বাক্স প্রয়োজন। কাজেই—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, নিত্য-প্রয়োজনীয় এই পণ্যটিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যে কেবলমাত্র আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তাহা নহে; বাড়্তি উৎপাদন বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবানও হইতে পারে। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের দিয়াশলাই শিল্পের কয়েকটি দুর্বলতা অত্যন্ত বেশী পরিস্ফুট। প্রথমতঃ, প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের সংগঠনই অত্যন্ত ক্ষুদ্র; ফলে বৃহদায়তন শিল্পসংগঠনের সুযোগ-সুবিধা হইতে ইহারা বঞ্চিত হইতেছে। শুল্ক সমিতির হিসাব অনুসারে, আধুনিক শিল্প-সংগঠনের সুবিধা ভোগ করিতে হইলে একটি দিয়াশলাই কারখানার অন্ততঃপক্ষে দৈনিক ৫ হাজার গ্রোস বাক্স প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা থাকা চাই; ১০ হাজার গ্রোস প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা থাকাই বাঞ্ছনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, কলিকাতার দিয়াশলাই কারখানার অধিকাংশেরই এই ক্ষমতা নাই। ১৯৪৪-৪৫ সালের হিসাব অনুসারে, দি ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী কলিকাতার কারখানায় দৈনিক ৪৭১৪ গ্রোস, দি এসাভি ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী দৈনিক ৪০০ গ্রোস, দি ক্যালকাটা ম্যাচ ওয়ার্কস দৈনিক ৫ হাজার গ্রোস উৎপন্ন করিয়াছে। কলিকাতায় অবস্থিত বিদেশী এবং ভারতীয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহেরই এই অবস্থা; স্থানীয় উদ্যোগে যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হইতেছে, তাহাদের সংগঠন আরও ক্ষুদ্র। দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় প্রয়োজনের তুলনায়, উৎ-পাদনের পরিমাণ অধিক হইবার ফলে প্রদেশে প্রতিযোগিতার তীব্রতা অত্যন্ত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তৃতীয়তঃ, প্রদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহে, বিশেষতঃ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে, দক্ষ কারিগরের অভাব বিশেষ-ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী কারিগর নিয়োগ বহু ব্যয়সাধ্য। অথচ বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশী কারিগরদের শিক্ষার কোনই সুবিধা দেওয়া হয় না। চতুর্থতঃ, মাণিকতলা, উল্টাডাঙ্গা প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে দিয়াশলাই কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিছু কিছু প্রস্তুত হইলেও দিয়াশলাই কারখানার যন্ত্রপাতিসমূহ প্রধানতঃ বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়; এই সকল বিদেশী যন্ত্রপাতির অধিকাংশই ভারত-বর্ষে ব্যবহৃত কাঠ এবং ভারতীয় উৎপাদন প্রণালীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। এই সকল অসুবিধা ছাড়াও কলিকাতার দিয়াশলাই প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী অঞ্চলের কাঠের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার পক্ষে উপযোগী বহু কাঠ পাওয়া গেলেও স্বল্প খরচে এই সকল কাঠ দূরবর্তী অঞ্চল হইতে আনয়ন করিবার কোন সুবিধা না থাকিবার ফলে দিয়াশলাই প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রায়ই অধিক মূল্যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঠের উপর নির্ভর করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের দিয়াশলাই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের এই সকল অসুবিধা দূর করিতে পারিলে দিয়াশলাই শিল্প একটি উন্নতিশীল শিল্প হিসাবে প্রসার লাভ করিতে পারিবে।

...ঘ। শুনতে হয় : "কেন ইংরেজ জাতটাই তো গোমড়া মুখো। সারা ইয়ুরোপ এক ট্রেণে একই কামরায় গেলেও সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ জমাতে ইংরেজ জানে না। মুখের ওপর গাম্ভীর্যের মুখোস টেনে বসে থাকে, নয়তো খবরের কাগজ আড়াল দিয়ে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে। কেউ যেচে আলাপ করলে বড় জোর 'ফাইন্ ওয়েদার' বলে আবার থমথেমে হয়ে যায়।"

কথাটা ঠিক। বাইরে থেকে ইংরেজ যেমন অমিশুক এবং অসামাজিক বলে মনে হয়, অন্য কোনও জাতের মানুষ অমন হয় না। ফরাসীরা স্ফূর্তিবাজ, স্পেন-ইতালীর লোক দ্রাক্ষারসে স্নিগ্ধ হয়ে একটু বেশী কথা বলে। রুশ জাত না কি বাঙালীর মতনই; তর্ক আর আলোচনার গন্ধ পেলে আর কিছু চায় না, নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। তবে ইংরেজকে যতখানি অসামাজিক এবং রসজ্ঞানবর্জিত মনে হয়, ততখানি সে নয়। মাত্রাজ্ঞান, শোভনতা, রুচিজ্ঞানের আতিশয্য বশেই সে বেশী চুপ করে থাকে। নইলে তারও রসবোধ আছে, আছে অতিথিপরায়ণতা। প্রিস্টলি সাহেবের একটা চমৎকার প্রবন্ধ আছে ইংরেজ জাতীয় চরিত্রের ওপর। সে যাই হোক, ইংরেজ বাইরে কূপমণ্ডূক যদি বা হয়, ঘরে সে অন্য মানুষ। আমরা মনের মধ্যে ঘরের মধ্যে কূপমণ্ডূক। বাইরে ফড়ফড় করি, গায়ে পড়ে আলাপ জমাই, স্থানে অস্থানে অন্তরঙ্গতার দাবী জানিয়ে মাত্রাহীনতার পরিচয় দিই। কেউ সাড়া না দিলে, বিশেষ করে বিদেশীকে ধরে, বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতির বড়াই করি।

কিন্তু গায়ে পড়ে আলাপ-জমানোর চেষ্টা, একটা ক্ষীণ সূত্র ধরে খামকা নিজের পরিচয় দিয়ে আপনাকে জাহির করার চেষ্টা অথবা অকারণে অবান্তর প্রসঙ্গ টেনে এনে, সস্তা এবং পুরোনো রসিকতার সাহায্যে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা কিংবা দু মিনিটের আলাপে হৃদয়ের কবাট খুলে একেবারে গোপন পারিবারিক সংবাদ শুনিয়ে দেবার চেষ্টা এগুলো যত বড় হৃদয়বত্তার পরিচয় হোক না কেন, বিরক্ত না হয়ে তাদের প্রসঙ্গ মনে গ্রহণ করা রীতিমত কঠিন। যিনি পারেন, তিনি মহাপুরুষ।

আর যিনি অযাচিতভাবে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে চেষ্টা করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি কৃতকার্য হন না। উলটে অনেক সময়ে, অসহিষ্ণুতা এবং সন্দেহের উদ্রেক করে বসেন। হয়তো বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এসেছেন কারুর সঙ্গে দেখা করতে। এসেই যদি তিনি সূক্ষ্ম সুবিবেচনা না করে স্থূলভাবে নিজেকেই জাহির করতে শুরু করেন, তা হলে যাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে আসা, তিনি মনে মনে চটবেনই। যেখানে বিনয়-নম্রতার প্রয়োজন, সেখানে নিজের কথায় সাত কাহন করে

বিজ্ঞমুখের কথা

আপনারই বিচার বুদ্ধির বিজ্ঞাপন দিলে কাজ উদ্ধার হবে কি করে? আসল কথা—আমাদের প্রধান অভাব হচ্ছে 'ট্যাক্ট'। কথাটার মধ্যে এক পালিশের গন্ধ আছে। সোজা অপ্রিয় কথা এড়িয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে কাজ আদায় করার ইঙ্গিত আছে। তা থাকুক। আমরা বড় বেশী হৃদয় মেলে ধরি। আর একটু হৃদয় সঙ্কোচ করলে বাঙালীর বুদ্ধি সঙ্কোচ হবার আশঙ্কা নেই, ইংরেজ যেমন বেশী ফর্মালিস্ট, আমরা তেমনি বেশী 'সিন্সিয়ার', এই 'সিন্সিয়ারিটি' অথবা আন্তরিকতার আতিশয্যেই বাঙলার সমতট হৃদয় প্লাবিত। আরামে ও ভোজনে তৃপ্ত করে, মনে সুড়সুড়ি দিয়ে অনেক পরমাল আমরা চালান করতে শিখেছি। আমরা আন্তরিক, তাই ফুল শয্যার রাতে নববধূর কাছে সমস্ত অতীত একেবারে উজাড় করে দিই। পরের কষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। তাই হামলে পড়ে পরোপকার ব্রতে আত্মনিয়োগ করি। প্রতারিত হলে আত্ম দুঃখে বিভোর হয়ে পরকে ধরে আপনার বুদ্ধিহীন উদারতার জন্য আক্ষেপ করি। অযথা কষ্ট দিতে ভালোবাসি না। তাই সহযাত্রীকে চোখ রাঙাই আবার রেল কোম্পানীর কর্মচারীকে সামান্য একটু সুবিধা দানের কৃতজ্ঞতায় জলপানি দিই।

*   *   *   *

রেল কোম্পানীর উল্লেখ করতে গিয়ে মনে পড়ল আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। গায়ে পড়ে আলাপ জমানো আর অকারণে বেশী কথা বলে সহযাত্রীকে উত্যক্ত করা এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলবে রেল ভ্রমণে। ট্রেনের কামরায় যে অন্তরঙ্গতা ও সাহচর্য, তা যেন মনে হয় বহু জন্মের বন্ধুত্ব। অথচ কামরায় প্রথমে ওঠা নিয়ে দুই সহযাত্রীর মধ্যে যে বাক্য-যুদ্ধ হয়েছিল, সেটা যে কি আশ্চর্য উপায়ে মুষ্টিযুদ্ধে পরিণত হতে পায়নি, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। প্রথমে অশুদ্ধ অনর্গল ইংরেজি, তৃতীয় পক্ষের লজ্জা-দানে অতঃপর রাষ্ট্র ভাষার চোস্ত ব্যবহার। কিন্তু দশ পনের মিনিট পরেই দুজনে পাশাপাশি বসে সাংসারিক সুখ-দুঃখের অথবা ভাইপোর নরাধম, অকৃতজ্ঞ ব্যবহারের আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেছেন। কি করে এটা সম্ভব হয়, সেটা এখনও বুঝতে পারিনি। স্বাধীনতায় আমাদের কি লাভ হয়েছে, তা ঠিক জানি না—মানে এখনও পুরোটা সমঝাতে পারিনি। তবে ইংরেজ চলে গিয়ে আমাদের মুখ আর কলম যে বেপরোয়া হয়েছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে শিক্ষায়তনে, কর্মস্থলে যেটুকু নিয়মানুবর্তিতা অথবা সংযম-শালীনতার বালাই ছিল, এখন [illegible] সেটুকু [illegible] ভালোই হয়েছে। মন আর হৃদয় যা বলে, যা চায়, তাই করা বোধ হয় সঙ্গত। তাকে ঢেকে রেখে চাপা দিয়ে কাজ করলে 'সিন্সিয়ার' হওয়া যাবে না তো! আশা করি—এই সরল সত্য কথা নিরীহ মনে বললে দেশদ্রোহিতার অপবাদ কিনতে হবে না। দীনবন্ধু মিত্র থেকে শুরু করে রসরাজ অমৃতলাল, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লেখকই ইংরেজ-নবিশদের ব্যঙ্গ চিত্র এঁকেছেন। বর্তমান যুগে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালের পর যে নব্য বাঙলায় উৎকট স্বদেশিয়ানার জন্মলাভ হল, তার যথাযথ সরস চিত্র নিরপেক্ষ শিল্পীর তুলির প্রতীক্ষায় বসে আছে। অবশ্য একটা কথা ঠিক যে স্বাধীনতা হঠাৎ এসে পড়াতে এখনও আমরা ধাতস্থ হইনি। অগভীর খাতে দামোদরের প্রবল বন্যায় কেমন যেন চঞ্চল ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছি। দামোদর পরিকল্পনা কাজে পরিণত হলে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি আর কৃষি-লক্ষ্মীর উন্নতি সাধনে উদর-তৃপ্তির উপকরণ করায়ত্ত হলে এ রকম বেসামাল ভাবটা হয়তো কেটে যাবে!

তবু আকস্মিক অন্তরঙ্গতার উৎপাত কমবে কি? অযাচিত হিতোপদেশ?

মনে করুন—স্বাধীন দেশের রেল-কামরায় চলেছেন লম্বা সফরে। মাঝ পথের একটা স্টেশনে অনেক যাত্রী নেমে গেল। গাড়ীটা খালি খালি। মনে মনে ভাবছেন, বাঁচা গেল। একটু হাত-পা ছড়িয়ে আরামে যাওয়া যাবে। বিছানাটি টান করে পাতবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময়ে বহু তল্পি-তল্পা সমেত এবং কয়েকটি জীবন্ত পোঁটলা নিয়ে এক ক্ষীণকায় ভদ্রলোকের আবির্ভাব হল। অনেক সোরগোলের সৃষ্টি করে, আপনার মালপত্রগুলি এদিক ওদিক সরিয়ে দিয়ে তিনি কাছে এসে আপনার বিছানায় পা দুটি মুড়ে বসলেন। তারপর পরমাত্মীয়ের মতন হঠাৎ আপনাকে প্রশ্ন করলেন, "দাদা যে দেখছি একলা!" আপনি যতক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন, ততক্ষণে তিনি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন—তাঁর নাম-ধাম, গোত্র-নিবাস। কোথায় তিনি যাচ্ছেন আর কতদিনই বা সেখানে থাকবেন, ফেরবার পথে বর্ধমানে নেমে বড় মেয়েটাকে নচ্ছার শাশুড়ীর কবল থেকে কয়েকদিনের জন্য উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন—এ সব কথা বলা হয়েছে ইতিমধ্যে। মাইনেটা এবার তিনশো হল, তাই সেকেন্ড ক্লাশ পাশ মিলেছে। তবে রেলের চাকরিতে আর সুখ নেই দাদা, উপরি কমে গেছে। তার ওপর মেজ মেয়েটা, ঐ যে বসে আছে, যা বাড়ন্ত গড়ন...হাতে পাত্তর-টাত্তর আছে না কি?" বলেই 'ওগো'র কাছ থেকে ভারি পানের ডিবেটা নিয়ে একটি সগুণ্ডী বোটকা গন্ধের পান চুন-খাওয়া এঁটো হাতেই আপনার মুখে গুঁজে দিতে আসেন। তখন আপনি কী প্রতিদান দেবেন?

ভারতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনী

শ্রীঅনিল রায় চৌধুরী

সমসাময়িক এবং অতি-আধুনিক শিল্প-কলা প্রদর্শনীর ব্যাখ্যামূলক বিবরণ লেখা এক কথা: কিন্তু যে প্রদর্শনীতে খৃষ্টপূর্ব তিন সহস্র বর্ষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের শিল্প-নিদর্শনের স্থান দেওয়া হ'য়েছে তার বিবরণ লেখা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তবুও আমাদের অপূর্ব পূর্বকীর্তিস্বরূপ এই শিল্পকলা সমাবেশ কেবল চোখের দেখায় সমাপ্ত হ'তে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে মনে মানুষের সৌন্দর্যসৃষ্টির আলাপন। একথা সত্য যে, মানুষ তার নিজস্ব সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায়। শিল্পী তার ভাবের দ্যোতনাকে যখন রূপ দেয় চিত্রে কিংবা ভাস্কর্যে তখন এক পরম আনন্দে তার চিত্ত ভরে যায় এবং তাইতেই সে পায় তার কামনার চরম সফলতা।

দেশপালের প্রাসাদের সম্মুখে অনেকটা চত্বর জায়গা। সেখান থেকে সদর ফটক পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা, মাঝখানে মনুমেণ্ট। এই চত্বর জায়গার প্রান্ত থেকে আরম্ভ ক'রে এবং রাস্তার খানিকটা জুড়ে সাজান হ'য়েছে অপেক্ষাকৃত ভারী ভাস্কর্য-শিল্পের নিদর্শনগুলো। প্রদর্শনী দেখতে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হ'তেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। দর্শক প্রথমেই যে মূর্তিটির সম্মুখীন হয় সেটি একটি যক্ষের মূর্তি (কেঃ নঃ ৭০)। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর এই মূর্তিটির অধিকাংশই বিধ্বস্ত, কিন্তু যেটুকু সময়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, তা দেখেই এর বিশালতায় এবং শিল্পীর ভাস্কর্যে প্রাণশক্তির পরিচয়ে দর্শকের মন যুগপৎ আনন্দে এবং বিস্ময়ে ভরে যায়। সুদর্শনা যক্ষী এবং ভারুত-রেলিংগুলো দেখার পর দর্শক আর একটি মুণ্ডহীন মূর্তির সম্মুখীন হয়। এটি রাজবেশে সিদ্ধার্থের লাল পাথরের মূর্তি (কেঃ নঃ ৮৬)। পূর্বোল্লিখিত যক্ষের মূর্তির ন্যায় এটিও প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে দীপ্যমান। সম্পূর্ণ মূর্তি দেখবার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এরপর চোখে পড়ে 'মা এবং সন্তান' মূর্তিটি (কেঃ নঃ ৯০)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর এই মূর্তিটিও কালের ভ্রূকুটির হাত থেকে রক্ষা পায় নি। মা এবং সন্তান দুজনেই মস্তক-বিহীন, মার হাত দুটিও নেই। সুতরাং দর্শক 'মাতা সন্তানের' মূর্তিটিতে শিল্পীর ভাব-ব্যঞ্জনার পূর্ণ পরিচয় পায় না। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যদি মূর্তিটি অক্ষুণ্ন অবস্থায় আজ থাকত, দর্শকদের অনেকেই বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে এর সম্মুখে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন। এই সময়কার গোয়ালিয়র ফোর্টের জোড়াসিংহ মূর্তিটির দিকেও দর্শক খানিকক্ষণ না তাকিয়ে যেতে পারেন না। (কেঃ নঃ ১৫৫)। এ লাইনের অন্তে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হিন্দুর এই ত্রিমূর্তির একটি বড় 'প্যানেল' আছে (কেঃ নঃ ২১০)। এটি দ্বাদশ শতাব্দীর হোয়শালা ভাস্কর্যের একটি সুন্দর নিদর্শন। এই 'গ্রুপে' হোয়শালা ভাস্কর্যের আরও কতক-গুলো মূর্তি আছে। এই শ্রেণীর কাজগুলো

চত্বর থেকে দর্শক সিঁড়ি বেয়ে চলে

দেখতে সুন্দর হলেও অত্যধিক অলঙ্কারে এবং শিল্পীরা খুঁটিনাটির বর্ণনায় মন দেওয়ায় ভাস্কর্য হিসাবে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। এই 'গ্রুপের' অন্যান্য মূর্তির মধ্যে উড়িষ্যা হ'তে আগত 'একটি ঘোড়ার মাথা' (কেঃ নঃ ২১৭) এবং 'বোধিসত্ত্ব' (কেঃ নঃ ২৫৯) এ দুটি কাজ ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কিন্তু এ সমস্তকে ছাপিয়ে যে মূর্তিটি দর্শকের দৃষ্টিকে চুম্বকের মতন আকর্ষণ করে, সেটি মূল প্রাসাদের পাদদেশে রক্ষিত হয়েছে। মৌর্য ভাস্কর্য শিল্পের ইহা একটি অদ্ভুত নিদর্শন। মূর্তিটি একটি বৃহৎ ষণ্ডের। এই বৃহৎ ষণ্ডটি একদা একটি সুউচ্চ অশোক-স্তম্ভের শীর্ষদেশে শোভা পেত। লেখকের বর্ণনার অপেক্ষা সে রাখে না, প্রশংসার সে ঊর্ধ্বে, যে শিল্পী এমন কাজ করে ভাস্কর্য-শিল্পকে অমরত্ব দান করে গেছেন দর্শকের মন তাঁর ভেবে তাঁকে নির্বাক অর্ঘ্য প্রদান করে। আসেন প্রাসাদের অন্দর বারান্দায়। সেখানে খৃষ্টপূর্ব তিন সহস্র বৎসরের আমাদেরই

নটরাজ শিব

[খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দী : তিরুবলাংগাদু, চিত্তুর জেলা (মাদ্রাজ)]

প্রাচীন সভ্যতার শৈল্পিক নিদর্শন তিনি দেখতে পাবেন। মহেঞ্জোদারোর এবং হারাপ্পার সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রাপ্ত শিল্পভাণ্ডারের মধ্যে বিশেষ করে মাটির পাত্রগুলো দর্শককে অবাক করে' দেয়। সে যুগেও যে একটি সুরুচিসম্পন্ন সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকে না এই পাত্রগুলো দেখবার পর। মাটির পাত্রগুলোর গঠন এবং তাদের গাত্রের কারুকার্যগুলো এ যুগের শিল্পীকেও যুগপৎ আনন্দিত এবং বিস্মিত করে। মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরী নেকলেসটি (কেঃ নঃ ৫৭) এ যুগের যে কোন আধুনিক রুচিসম্পন্না নারীর কণ্ঠাভরণের উপযোগী। এ ছাড়া ব্রোঞ্জের তৈরি নর্তকী (কেঃ নঃ ১), পোড়া মাটির তৈরী ষাঁড় (কেঃ নঃ ৬), বানর (কেঃ নঃ ১০) এবং ব্রোঞ্জের মহিষ (কেঃ নঃ ১৩) দেখে সন্দেহ থাকে না যে, ব্রোঞ্জশিল্প এবং মূর্তিকলাশিল্প ভারতের শিল্প-ইতিহাসের প্রারম্ভেই অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বেও খুব উন্নতস্তরে পৌঁছেছিল। ইহা আর আশ্চর্য কি যে, পরবর্তীকালে এই ধাতু ভারতের মূর্তিকলা-শিল্প সৃষ্টিতে এরূপ সহায়ক হয়েছিল।

এরপর দর্শক অন্দর-বারান্দা থেকে দরবার 'হলে' উপস্থিত হন। হলে প্রদর্শিত অধিকাংশ ভাস্কর্যই খৃস্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভেই মথুরা নগরীতে ভাস্কর্য শিল্পে এক অদ্ভুত প্রাণ-স্পন্দনের সাড়া পড়ে যায় এবং তার পরিণাম-স্বরূপ এমন এক শিল্প গড়ে' ওঠে যা ভারতের ভাস্কর্যশিল্পের সুবর্ণ ইতিহাসের গোড়াপত্তন করে দেয়। মথুরাভাস্কর্য একটু আদিরস ঘেঁষা হতে পারে। মহাকাব্য মহাভারতের মতই মথুরাভাস্কর্য বিচিত্র এবং বৃহৎ কল্পনাপ্রসূত। 'দণ্ডায়মান বুদ্ধ' (কেঃ নঃ ১৩৪) এবং বিষ্ণু (কেঃ নঃ ১৪২) মথুরার এই দুইটি নিদর্শন দেখলেই তার প্রমাণ পাবেন। নারীমূর্তি মথুরা-ভাস্কর্যের একটি বিশিষ্ট অবদান। এত সুন্দর এবং লীলাময় ভাব আর কোন কালেই শিল্পীরা এমন ভাবে দিতে পারেনি। দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য মাত্র। দর্শক দরবার হলে ঢুকলেই এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাবেন।

বেলে পাথরের পূর্ণ আকারের বুদ্ধমূর্তি
[খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী : মথুরা]

রামপূর্ব অশোক-স্তম্ভের বৃষ-শীর্ষ
[খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী]

সন্তানের আদর

[খৃঃ একাদশ শতাব্দী : ভুবনেশ্বর]

দরবার 'হলের' সংলগ্ন দক্ষিণের অলিন্দে গান্ধার-ভাস্কর্য রাখা হয়েছে। গ্রীক প্রভাব প্রত্যেকটি মূর্তিতেই পরিস্ফুট। প্রত্যেকটি মূর্তিই চাঁচাছোলা এবং ভালভাবে শেষ করা। কিন্তু ভাস্কর্য হিসাবে দুর্বল, ভারতীশিল্পের পূর্বেকার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বিদেশী প্রভাবে আপাতদৃষ্টিতে মূর্তিগুলো হয়েছে সুশ্রী, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে নেমে গেছে অনেক ধাপ। উপবিষ্ট বুদ্ধের কয়েকটি 'স্টাকোর' কাজ আছে। এরা যদিও খুব উঁচু ধরণের ভাস্কর্যের নিদর্শন বলে নিজেদের দাবী করতে পারে না, কিন্তু বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ গান্ধার-শিল্প-রীতির এ কাজগুলোর দাম আছে।

গান্ধার-শিল্পের পাশের অলিন্দে রাখা হয়েছে গুপ্ত রাজত্বকালের অতুলনীয় ভাস্কর্য শিল্পের কাজগুলো। ভারতের ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে এমন সুন্দর ও মহৎ কাজ আর হয় নাই এবং আবার কোনদিন ভবিষ্যতে সে শুভদিন ফিরে আসবে কি না সন্দেহ আছে। কারণ আজ-কালকার শিল্পীদের সে সুবিধেও নেই, সে সাহসও তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। সে যা হ'ক গুপ্ত রাজত্বকালের এই শিল্পনিদর্শন-গুলো দেখে মথুরা-শিল্পরীতির মূর্তিগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। তফাৎটা এই যে, গুপ্ত-ভাস্কর্যের অতীন্দ্রিয় ভাব মথুরা-শিল্পরীতিতে নাই। সেখানেও বড় কাজ দেখা গেছে, কিন্তু অধ্যাত্ম ভাবটি প্রায়ই নেই। দুঃখের বিষয় গুপ্তভাস্কর্যের অধিকাংশই বিধ্বস্ত। এ বিভাগে অনেক ভাল ভাল কাজ আছে। (কেঃ নঃ ১৩৩) উপবিষ্ট বুদ্ধ, চতুর্থ শতাব্দী; (কেঃ নঃ ১৩৭) উপবিষ্ট বুদ্ধ, পঞ্চম শতাব্দী; (কেঃ নঃ ১৫০) আকাশপথে বিদ্যাধরগণ, পঞ্চম শতাব্দী; (কেঃ নঃ ১৫২) ময়ূরাসীন কার্তিকেয়, ষষ্ঠ শতাব্দী; (কেঃ নঃ ১৫৩) নারীর নিম্নার্ধ, ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী; (কেঃ নঃ ১৫৪) দ্বারী, ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী, এই কাজগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্য, শক্তি এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশ এই তিনের সঙ্গতিমূলক সমন্বয় হওয়াতেই এই প্রকার উৎকৃষ্ট কাজ সম্ভব হয়েছিল।

দর্শককে এবার দক্ষিণের 'ড্রয়িং রুমে' নিয়ে যাওয়া যাক। এক আশ্চর্য পরিবেশ থেকে তিনি আর এক আশ্চর্য পরিবেশে এসে পড়লেন। বস্তুতই দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলো এক একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। ভারত শিল্পের ইতিহাসে ব্রোঞ্জের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ব্রোঞ্জ মহেঞ্জোদারোর সময়েতেও শিল্পে ব্যবহৃত হ'ত, তবে সে ছিল ছোট কাজ। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলোর সৃষ্টি হয়। কি উপায়ে এসব কাজ করা হোত কৌতূহলী দর্শক তা জানতে চাইবেন। বেশীর ভাগ কাজই 'নির্গমন মোম' অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে 'লস্ট ওয়াক্স প্রসেস' বলা হয় সেই রীতিতে বানান হোত। এক কথায় মোমের ছাঁচের উপর ব্রোঞ্জ দিয়ে পরে ভেতর থেকে মোম গলিয়ে বার করে' নেওয়া হোত। দর্শকের কাছে এটা বড় কথা নয়, এই কাজগুলোর সৌন্দর্যই তাকে চুম্বকের মতন আকর্ষণ করে। শিল্পকলায় দ্রাবিড় জাতির অবদানগুলোর কথা সঙ্গীত এবং নৃত্য রসিকদের অজানা নেই। ব্রোঞ্জশিল্প তাদের অবদানের আর এক অধ্যায় মাত্র। স্থপতিশিল্পে দ্রাবিড় জাতির দানের বিষয় কিছু বলতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র। বস্তুতঃ ভারতের আজ যা কৃষ্টি এবং যে জন্য আমরা গৌরব বোধ করি, দ্রাবিড় এবং আর্য জাতির মিলনেই তা সম্ভব হয়েছিল। 'ড্রইং রুমের' মাঝখানে রাখা আছে ভারতের অতি বিখ্যাত নটরাজ মূর্তিটি, তার দুপাশে আরও দুটি নটরাজ মূর্তি। এ ছাড়াও অনেক কাজ আছে, যা দেখে মনে হয় নটরাজ ছাড়াও পৃথিবীর দরবারে পেশ করবার মতন ব্রোঞ্জের মূর্তি আমাদের আছে এবং যাদের আদর কোন অংশে কোন কালেই কম হবে না। বস্তুতঃ নটরাজ মূর্তি যেমনভাবে বাইরে বিজ্ঞাপিত, তাতে বাইরের লোকদের এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে আমাদের ব্রোঞ্জে অত বড় কিংবা ওর কাছা-কাছি আর কিছু দেখাবার নেই। সেটা সত্যই মস্ত ভুল। (কেঃ নঃ ৩১৩) শিব-পার্বতীর মূর্তিটি কত উঁচুদরের কাজ তা বোঝাবার দরকার হয় না। (কেঃ নঃ ৩০৭) শিব মূর্তিটি, (কেঃ নঃ ৩১০) দেবী, (কেঃ নঃ ৩১১) পার্বতী, (কেঃ নঃ ৩২৭) মহেশ্বরী; (কেঃ নঃ ৩৩৪) পার্বতী, (কেঃ নঃ ৩৩৫) চোল দেশের রাণী; (কেঃ নঃ ৩৩৭) কানাপ্পা নায়নার; (কেঃ নঃ ৩৩১) পার্বতী, প্রত্যেকটি মূর্তিই দর্শকের মনে এক অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি করে। মনে পড়ে

যার আমাদের ১৩০০ বছর আগেকার সংস্কৃতির কথা, যার এ এক মহতী অভিব্যক্তি। উল্লিখিত মূর্তিগুলো ছাড়াও আরও অনেক মূর্তি আছে যা সৌন্দর্যে এবং সৌষ্ঠবে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

চিত্রকলা

এরপর চিত্রকলা। দক্ষিণের "ড্রয়িংরুম" থেকে দর্শক লম্বা "ড্রয়িংরুম"টিতে আসবেন। দুই ঘরের মাঝখানের পথে অজন্তা গুহার ফ্রেস্কো আর্টের প্রতীকস্বরূপ কয়েকটি ছবির নকশা রাখা হয়েছে। অজন্তা এলোরার আর্টের আলোচনা নতুন করে করবার কিছু নেই, অনেক যশস্বী সমঝদার ব্যক্তি তার আলোচনা করেছেন এবং সাধারণেও তার কিছু কিছু খবর রাখেন। দর্শক এইসব ছবির রং, রেখা, এবং ছবিতে মানুষের অঙ্গসৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হবেন সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও যে জন্য অজন্তা এলোরা এত বড় সে হল এসব ছবির আত্মিক পরিবেশ।

লম্বা "ড্রয়িংরুমে" পর পর সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে রাজস্থানী, পাহাড়ী, মুঘল শিল্প-রীতির চিত্রসম্ভার। এত উচ্চাঙ্গের এমন চিত্র-সমাবেশ পূর্বে আমাদের দেশে হয়েছে বলে মনে হয় না। দর্শক এদের বিচিত্র রং-এর নেশায় মশগুল হয়ে যাবেন। অজন্তার কথা ক্ষণেকের জন্যে ভুলে যেতে হয় নতুন পরিবেশে এসে—রাজস্থানীবর্জিত একান্ত ভারতীয় আকৃতি ছবিতে দেখে—চিত্রগুলোর এমনই আকর্ষণ বাহুল্য-মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। ভারতীয় জীবনের ভাবরসের দিকটা তিনি উজ্জ্বল রং-এর এবং শক্তিমান রেখার সমাবেশে দেখতে পান। রাজস্থানী "মিনিয়েচার"গুলো সবই জলরঙা "টেম্পারাতে" আঁকা এবং শিল্পীর আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল রং সমাবেশ ক্ষমতার পরিচয় দেয়। রাগ-মালার ছবিগুলোই যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কয়েকটী ছবিতে শিল্পীরা পাশাপাশি গাঢ় নীল এবং লাল রং ব্যবহার করেছেন, অথচ এমন আশ্চর্যজনকভাবে এদের সমাবেশ করা হয়েছে যে, তার তুলনা হয় না। মনে হয় এই দুই রং পাশাপাশি না থাকলে যেন ঠিক হতনা এবং তাতেই যেন ছবির বর্ণচাতা অনেক বেড়ে গেছে। রঙ্গীন ছবি ছাড়াও এই বিভাগে কয়েকটী চমৎকার লাইন-ড্রয়িং আছে। যাদের ধারণা আমাদের দেশের শিল্পীরা ড্রয়িং-এ মন দিতেন না, তাদের এসব লাইনড্রয়িংগুলো দেখে আসা একান্ত আবশ্যক। (কে ঃ ন ঃ ৪০৫) নায়িকা; (কে ঃ ন ঃ ৪০৭) রাজকুমার; (কে ঃ ন ঃ ৪২৪) চরথা—লাইনড্রয়িং-এর এক একটি অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

মূল যে ভাবটীকে নিয়ে রাজস্থানী শিল্পরীতির অধিকাংশ ছবিই আঁকা হয়েছে সে হল কৃষ্ণ রাধার প্রণয়। অবশ্য শিল্পী কৃষ্ণ রাধার ভেতর দিয়েই মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে, পুরুষ এবং নারীর এই শাশ্বত সম্বন্ধকে রূপ দিয়েছেন চিত্রে। রাধা-কৃষ্ণের ভেতর দিয়ে রূপ পাওয়াতে একান্ত মাটির জিনিসও একটা আত্মিক আবরণ পেয়েছে। বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ আমাদের চিত্রকলা-শিল্পের পুনরুত্থানের অব্যবহিত পর পর্যন্তও, যাঁদের আমরা আধুনিক শিল্পীর ভেতর ধরতে পারি তাঁরাও, এই পথ অবলম্বন করে চলছিলেন। অতি-আধুনিক শিল্পীরা অবশ্য মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার যায়গায় এমন কিছু দিতে পারেননি যাতে ছবির আত্মিক গুণটি বজায় থাকে।

রাগমালার ছবিগুলোর বিষয়ে দর্শককে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই চিত্রগুলোকে নিছক রাগের বর্ণনা হিসেবে ধরলে ভুল করা হবে। রাগরাগিণী বাদ দিয়েও চিত্র হিসেবে এরা কত উঁচু দরের সে কথা মনে রাখাই হবে যুক্তিসঙ্গত এবং তখনই দর্শক দিতে পারবেন এদের উচিত দাম। এই ছবিগুলো এক একটি বিশিষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনা। ছবি দেখে শিল্পী কি ভাবটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা ধরতে হবে এবং সেটাই এসব ছবির ব্যাপারে শিল্পীর প্রাপ্য। এ কথা বলা কঠিন যে, যেসব শিল্পী এই রাগমালার ছবিগুলো এঁকেছিলেন মার্গসঙ্গীতে তাদের দক্ষতা কতটা ছিল। তবে ছবি দেখে বোঝা যায় যে অন্ততঃ রাগের অবয়ব সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান যথেষ্টই ছিল।

এরপর সাজান হয়েছে পাহাড়ী-শিল্পরীতির ছবিগুলো। রাজস্থানী এবং পাহাড়ী শিল্প-রীতির ছবিগুলোর মধ্যে প্রভেদ খুব কমই, সাধারণ লোকের পক্ষে ধরা কঠিন। দর্শক পাহাড়ী ছবিতেও সেই উজ্জ্বল রং-এর সমাবেশ এবং একই ভাবের দ্যোতনা দেখতে পাবেন। ছবির বিষয়বস্তু মানুষের আকৃতিও হুবহু না হলেও রাজস্থানী ছবির অত্যন্ত কাছাকাছি। তবে পাহাড়ীতে রাজস্থানীর রং-এর গাঢ়তা কমে গেছে, প্রকৃতির সমাবেশ অনেক বদলে গেছে, বিন্যাসে মুঘল চিত্রের ক্ষীণ আভাস আছে। চিত্র হিসাবে এই শিল্পরীতির কাজগুলোও উঁচু দরের। (কে ঃ ন ঃ ৪৬০) দোলনায় শ্রীকৃষ্ণ (কে ঃ ন ঃ ৪৮৮) উৎকণ্ঠিতা নায়িকা; (কে ঃ

প্রেমপত্র রচনারতা
[খৃঃ একাদশ শতাব্দী ঃ ভুবনেশ্বর]

নঃ ৪৯৬) সীতা; (কেঃনঃ ৫০০) রাধা সকাশে কৃষ্ণ; (কেঃনঃ ১০৪) স্নানের পর, (কেঃনঃ ৫০৭) রাধা-কৃষ্ণ, ছবিগুলো দ্রষ্টব্য।

মুঘল শিল্পরীতির চিত্রগুলো একটু স্বতন্ত্র। প্রভেদ ধরতে দর্শকের বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না, যদিও প্রদর্শনীতে এই বিভাগে এমন দু-তিনখানা ছবি আছে, যা দেখলে রাজস্থানী শিল্পরীতির বলেই ভ্রম হবে (কেঃ নঃ ৬০৬, ৬১৯)। মুঘল শিল্পরীতির চিত্রগুলোর বিশেষত্ব তাদের উপর পারস্য দেশের চিত্রকলার প্রভাব। গ্রীক আর্টের প্রভাবে যেমন গান্ধার শিল্পের সৃষ্টি, পারস্য আর্টের প্রভাবে তেমনিই মুঘল চিত্রের সৃষ্টি হয়। পারসিক প্রভাব আমাদের ছবিতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করে। এই শুভমিলনের ফলস্বরূপ একটি স্বতন্ত্র শিল্পরীতি গড়ে ওঠে এবং উত্তরকালে এক মহান চিত্রকলায় পরিণতি লাভ করে। পারসিক প্রভাব আমাদের নিজস্ব শিল্পকে খাটো করেনি বরঞ্চ ভাবের, রং-এর এবং বিন্যাসের ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গের বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলা তার শীর্ষস্থানে গিয়ে পৌঁছয় এবং এসময় বহু বিখ্যাত চিত্র তৈরি হয়। মুঘল ছবির বিশেষত্ব হল তার নিখুঁত কাজ, রং-এর কোমলতা, বিন্যাসের পারিপাট্য এবং তুলির রেখার বাহাদুরী। মুঘল এবং রাজপুত চিত্রের রেখায় পার্থক্য অনেক, বিশেষজ্ঞের কাছে তা অজানা নেই। মুঘল বিভাগের (কেঃ নঃ ৬০৫) উটের যুদ্ধ; (কেঃনঃ ৬০৯) সিংহ শিকার; (কেঃনঃ ৬১১) কুক্কুট' ৬৩১) বেগম নূরজাহান; (কেঃনঃ ৬৪৭) পোলো খেলা; (কেঃনঃ ৬৫০) রাজবাহাদুর এবং রূপমতী; (কেঃনঃ ৬৫২) পারশ্যের দ্বিতীয় শাহ আব্বাস এবং (কেঃনঃ ৬৫৩) দশটী হাতির দাঁতের তাস এবং এ ছাড়াও অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ আছে। শিল্পী দর্শকের দেখে সত্যই নয়ন সার্থক হবে।

পাশের ঘরে অর্থাৎ উত্তরের বৈঠকখানায় মুঘল শিল্পরীতির যে শাখা সুদূর দাক্ষিণাত্যে গড়ে উঠেছিল গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায়, তার সুন্দর নিদর্শন আছে। এদের বিষয়ে বিশদভাবে লেখবার প্রয়োজন। দর্শক, এ কাজগুলোও দেখে আনন্দ পাবেন। প্রদর্শনীতে পাল রাজত্বকালের তালপাতার উপর লেখা সেকালের চিত্রিত পুঁথিও রাখা হয়েছে। পশ্চিম ভারতের বহু চিত্রিত পুঁথিও দর্শকের দেখবার সৌভাগ্য হবে। এসব দেখে এই ধারণাই হয় কত যত্নে এবং অধ্যবসায়ে সে কালে এ জাতীয় পুঁথি লেখা হোত।

উড়িষ্যা এবং বাঙলার নিজস্ব ধারারও খানকতক ছবি আছে। সেগুলোও উপভোগ্য, বিশেষ করে শ্রীঅজিত ঘোষের কাছ থেকে আনা ছবিগুলো শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

এছাড়াও এই বিরাট প্রদর্শনীতে আছে কার্পেট, সিল্ক এবং সুতো দিয়ে তৈরি নানা প্রকার শাড়ী, ব্রকেড, চাদর, রুমাল পটকা এবং আরও অনেক রকমারি দ্রব্য—তিনশ বছরের আগেকার বস্ত্রশিল্পের নিদর্শন বৃহৎ মুঘল কার্পেটগুলো দেখবার মতন এবং এগুলো সবই জয়পুরের মহারাজার সম্পত্তি।

উত্তরের "ড্রয়িংরুমে" পুরনো কারুকার্য-খচিত অস্ত্রশস্ত্র রাখা আছে যা দেখে দর্শক বিশেষ আনন্দ পাবেন। শিল্পের নিদর্শন হিসেবেও এদের মূল্য যথেষ্ট। দর্শকের কৌতূহলী মন খুসি হয়ে বাড়ি ফিরবে।

এই বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা যাঁরা করেছেন তারা সমগ্র দেশবাসীর প্রশংসার পাত্র সন্দেহ নেই। চিত্রকলা বিভাগ ফাইন আর্টস সোসাইটির শ্রী ডি বর্দরির তত্ত্বাবধানে অতি সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে সাজান হয়েছে, অন্যান্য বিভাগের সজ্জাও সুন্দর।

আশা করি সরকার বাহাদুর প্রদর্শনীটি আরও দু-একটি বৃহৎ সহরে নেবার বন্দোবস্ত করবেন। নিদেনপক্ষে বহিরাগত দর্শকদের জন্য অল্পব্যয়ে অন্ততঃ দুদিন করে থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবেন এবং দিল্লীর বাইরের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যাতায়াতের এবং থাকবার সুবিধে করে দিয়ে তাদের এ সুযোগ নিতে বলবেন। এই গরীব দেশের সরকারের অন্যান্য স্বাধীন দেশের সরকারের চেয়ে দায়িত্ব চতুর্গুণ। একথা তাঁদের অজানা নেই।

কলিকাতা : ১৯৪১—৪৮

নির্মাল্য বসু

ট্রাম, বাস আর ফুটপাত আর জন-স্রোত,
—কলকাতা।
বুর্জোয়া ছায়া সৌধ বিন্ধ্য—বিজলী বাতির রূঢ় আলোক;
স্কাই স্ক্রেপার ও উদ্বাস্তু ও ফুটপাতে শোয় অনেক লোক।
এঁদো বস্তি ও বহু অলি গলি—ঠিকানাবিহীন খেলার ঘর—
বহু মানুষের বহু আশা আর জিজ্ঞাসা আর ভাবামুখর।

* * * * *

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা।
মহাভারতের—মহাএশিয়ার—মহাপৃথিবীর
নতুন সংজ্ঞা
—কলকাতা।

* * * * *

যান্ত্রিক দিন—নকল সূর্য—ঝাঁঝালো হাওয়ায় কী ঝঙ্কার!
দিগন্ত নেই।—চিমনীরা শুধু আকাশে করছে ধূমোদ্গার।
অনেক মেকি ও ফাঁকির পলিতে ললিত লালিত গড়া জীবন—
মিঠে সুর নেই—হট্টগোলের অতি সুতীব্র অনুরণন।
জানা অজানার—চেনা অচেনার—দেখা অদেখার অনেক ভীড়,
সে জনারণ্যে গুঞ্জন শুনি বহু চরণের পদাবলীর—
অনেক সুরের সিম্‌ফনি বাজে অর্কেস্ট্রা ও ঐক্যতান
এক নয় তবু অশ্রুত কোন মিল খুঁজে পায় আমার গান!

হকার—বেলুন—অন্ধ নাচার—আজব দেশ—
এরিয়ল উঁচু—আধিভৌতিক মূর্ছনা আর ধাতব রেশ।
বণিক লালিত রূপের বেসাতি—সভ্য, সকাম উপনিবেশ।
অনেক মিছিল, ঝাণ্ডা, স্লোগান,—প্রহরী, বুলেট, উঁচু সঙীন—
দিনরাত্রির সান্ধ্য আইনে উচ্ছৃঙ্খল বন্দী দিন।
—কলকাতা।

ভুখ্‌মিছিল ও বহু শহীদের টাট্‌কা রক্তে পিছল পথ—
—এ রাজপথ।

তাদের বুকের রক্তের রাগে
মৃত চেতনার অহল্যা জাগেঃ
হাজারো কণ্ঠে বহু ভাষা জাগেঃ
জিজ্ঞাসা—মহাজিজ্ঞাসা জাগেঃ
নতুন দিনের কবিতারা জাগেঃ
—আর জাগে রাঙা ভবিষ্যত।

* * * * *

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা।
মহাভারতের—মহাএশিয়ার—মহাপৃথিবীর
নতুন সংজ্ঞা
—কলকাতা।

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—**শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়**

[পূর্বানুবৃত্তি]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(এক)

কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে প্যারীতে হেলা ফেলায় দিন কাটাতে লাগ্‌লাম। বসন্তকালে প্যারী ভারী ভালো লাগে, 'সাঁসে লিজে'র চেসটনাট গাছে ফুল ধরেছে, আর পথের আলোর জৌলুষ যেন বেড়ে গেছে। বাতাসে একটা মদির চাঞ্চল্য, একটা স্বচ্ছ চলমান আনন্দ। এ আনন্দ ইন্দ্রিয়জ অথচ তার ভিতর স্থূলত্ব নেই, এতদ্দ্বারা প্রতি পদক্ষেপ অধিকতর লঘু হয়ে ওঠে, বুদ্ধি সচেতন থাকে। বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যে আমি বেশ আনন্দে ছিলাম, অন্তর ছিল স্মরণীয় অতীতের মধুর স্মৃতিতে ভরপুর, মনের দিক থেকে আমি যেন তারুণ্যের জ্যোতি ফিরে পেলাম। ভাবলাম এই আনন্দের পরিবর্তে শুধু কাজ নিয়ে মেতে থাকা নির্বুদ্ধিতা হবে, এই ধাবমান কালকে আর কোনো দিন হয়ত এমন পরিপূর্ণভাবে সম্ভোগ করতে পারবো না।

ইসাবেল, গ্রে, লারী আর আমি নাতি-দূরস্থ দর্শনীয় স্থানগুলিতে বেড়াতে যেতাম। আমরা চ্যানটিলি ও ভার্সাই, সেণ্ট জাবনেইন ও ফঁতেনব্লোতে গিয়েছিলাম। যেখানেই যেতাম সেখানে ভালোভাবে আমরা প্রচুর লাঞ্চ খেতাম। বিশাল শরীরের পরিতৃপ্তির জন্য অবশ্য গ্রে বেশী খেত আর পানও একটু বেশী করত। তার স্বাস্থ্য, লারীর চিকিৎসার গুণেই হোক, বা কালের প্রভাবেই হোক নিশ্চিত উন্নতিলাভ করেছিল। তার আর সেই প্রাণান্তকর মাথাধরা নেই, তা ছাড়া প্যারীতে এসেই ওর চোখে যে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিলাম, তা অন্তর্হিত হয়েছে। সে বিশেষ কথা বল্‌তে না, যখন বল্‌তে তা হয়ে উঠত দীর্ঘ বিলম্বিত কাহিনী। কিন্তু আমি বা ইসাবেল যখন যা-তা আলোচনা করতাম, তখন সে অট্টহাস্য করে উঠত। সে সব কথা গ্রে বেশ উপভোগ কর্‌ত। যদিচ সে তেমন মজার লোক নয়, তবু এমনই তার রসজ্ঞান ও এতই সহজে সে সন্তুষ্ট থাক্‌ত যে, তাকে ভালো না বেসে থাকা অসম্ভব। গ্রে সেই জতীয় মানুষ, যার সঙ্গে হয়ত একটি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা যাপনে ইতস্ততঃ কর্‌তে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে ছ মাস সানন্দে কাটাবার জন্য অনেকে উৎসুক হয়ে উঠবে।

ইসাবেলের প্রতি তার প্রেম একটা লক্ষ্য করার মত বস্তু; গ্রে ইসাবেলের সৌন্দর্যের প্রশংসা করত। ভাবত সে অতি চমৎকার, পৃথিবীর এক অপরূপ প্রাণী; তার একনিষ্ঠত্ব ও সারমেয়তুল্য একাগ্রতা অন্তর স্পর্শ করে। মনে হ'ত লারীও এই সান্নিধ্যে আনন্দ পায়। আমার ধারণা হ'ল, মনে মনে যা কিছু তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাক। উপস্থিত সে বিশ্রাম উপভোগ কর্‌ছে। আর সেই বিশ্রাম সুখ যথাসম্ভব আনন্দের সঙ্গেই সম্ভোগ কর্‌ছে। লারীও বেশী কথা বলত না, কিন্তু তাতে এসে যেত না কিছুই। তার সঙ্গ-পরশ-সুখই যেন সংলাপ হিসাবে যথেষ্ট—বাণী নয় পরশ। সে এতই সহজ, মনোরম ও আনন্দময় যে, সে যেটুকু দেয়, তার বেশী কেউ চায় না। আমি বেশ জান্‌তাম যে, একত্রে যে ক'টা দিন আমরা কাটাচ্ছি, তার সবটুকু আনন্দই লারী আমাদের মধ্যে আছে বলে। যদিও সে এতটুকু চমৎকার বা চটুল কথা বলেনি, তবু বোধ হয় তাকে না পেলে আমাদের সবকিছুই জোলো এবং নিষ্প্রাণ হ'য়ে উঠ্‌ত।

এই জাতীয় এক সফর থেকে ফেরার পথে একদিন এমন এক দৃশ্য চোখে পড়্‌ল, যা আমাকে কিঞ্চিৎ চমকিত করে তুল্‌লো। আমরা 'চারটরেসে' গিয়েছিলাম।

প্যারীতে ফির্‌ছি, গ্রে গাড়ী চালাচ্ছে, তার পাশে বসেছে লারী; পিছনের আসনে বসেছি আমি আর ইসাবেল। সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে আমরা শ্রান্ত, সামনের আসনের হেলান দেওয়ার জায়গাটির ওপর লারী তার একটি হাত ছড়িয়ে দিয়ে বসেছে। এই অবস্থার ফলে তার সার্টের হাতা উঠে গিয়েছে, তার সরু এবং সুদৃঢ় কব্জি আর পাতলা লোমে ঢাকা বাদামী রঙের হাতের নিম্নাংশ দেখা যাচ্ছে। সূর্যালোক তার ওপর প্রতিফলিত। 'ইসাবেলের স্থাণুর মতো অনড় অবস্থার জন্যই তার দিকে আমার নজর পড়্‌ল। আমি তার পানে তাকালাম। এমনই সম্মোহিত হয়ে বসে আছে সে যে, সহসা মনে হবে যেন, তার সম্মোহিত অবস্থা—তার নিঃশ্বাস পড়্‌ছে অতি দ্রুত। চোখ দুটি সেই শিরাবহুল কব্জি ও লোমশ বলিষ্ঠ বাহুর ওপর নিবদ্ধ। তার চোখে উদগ্র কামনার যে বুভুক্ষু দৃষ্টি লক্ষ্য করলাম, মানুষের মুখে এমনটি আর কখনও দেখিনি। যেন লালসার মুখোস। ইসাবেলের ঐ সুশ্রী মুখখানি যে এমন উচ্ছৃঙ্খল লালসায় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌তে পারে, তা স্বচক্ষে না দেখলে কোনো দিন বিশ্বাস করতেই পারতাম না। এই দৃষ্টি মানবিক নয় পাশবিক। তার মুখ থেকে সমস্ত সৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়েছে, যে মূর্তি দেখা যাচ্ছে, তা অতি বীভৎস এবং ভয়ংকর। সে মুখ দেখে গ্রীষ্মাতপ্ত কুক্কুরীর কথা মনে হয়। আমার কেমন বিশ্রী লাগ্‌লো। আমার উপস্থিতি সম্পর্কেও ইসাবেল অচেতন; অবহেলাভরে রাখা ঐ হাতখানি ছাড়া আর কোনো বিষয়েই সে সচেতন নয়। সেই হাতই ওর মনে উদ্দাম কামনার আগুন জেলে দিয়েছে সহসা যেন তার ঘোর কাট্‌লো—শিউরে উঠে ইসাবেল চোখ দুটি বন্ধ করে মোটরের এক প্রান্তে গা এলিয়ে দিল।

ইসাবেল বলে ওঠে—"একটি সিগারেট দিন।" এই কণ্ঠস্বর আমার অপরিচিত, অতি কর্কশ ও রূক্ষ।

সিগারেট কেস্ থেকে একটি সিগারেট বার করে দিলাম। লোভীর মত ইসাবেল সিগারেট টানতে থাকে। অবশিষ্ট পথটুকু সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকেই তাকিয়ে রইল। একটিও কথা বললে না।

বাড়ী পেঁছিবার পর গ্রে লারীকে বলে আমাকে হোটেলে পেঁছে দিতে। তারপর গাড়ীখানি সেই গ্যারেজে রেখে দেবে। ড্রাইভারের আসনে লারী বস্‌ল, তার পাশে আমি বস্‌লাম। ওরা পথ অতিক্রম করে যাওয়া সময় ইসাবেল গ্রের হাতখানি জড়িয়ে ধরে এবং এমনভাবে তার পানে তাকাল যা আমার দৃষ্টিপথে না এলেও তার অর্থ আমি বুঝ্‌লোম। অনুমান কর্‌লাম আজ রাতে গ্রে শয্যাসঙ্গিনী উদগ্র লালসায় আকুল হয়ে উঠ্‌বে, কিন্তু সে বুঝ্‌বে না কি তার কারণ এই আতিশয্যের কি হেতু।

জুন মাস শেষ হয়ে আসছিল। আমাকে রিভেয়ারায় ফিরতে হবে। এলিয়টের যে বন্ধু আমেরিকায় ফির্‌ছেন, তাঁরা 'ডিনার্দে' তাঁদের একখানি বাগিচা মাতুরিনদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়েদের স্কুলের ছুটি হলেই ওরা চলে যাবে। কাজের খাতিরে লা

প্যারীতে থাকছে। একটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড "সিত্রোয়ে" কিনছে এবং অগাস্টে একবার ওদের ওখানে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। প্যারীতে অবস্থানের শেষ রজনীতে ওদের তিনজনকেই ডিনারে আমন্ত্রণ করলাম।

সেই রাত্রেই সোফী ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল।

ইসাবেলের বাসনা হয়েছিল, কয়েকটি বেয়াড়া জায়গা ঘুরে দেখতে, আর আমার এ-বিষয় কিছু জানা শোনা থাকাতে আমাকেই তাদের পথনির্দেশক হ'তে বল্‌ল। এই প্রস্তাবটা আমার কিন্তু তেমন ভালো লাগেনি, কারণ, প্যারীতে এইসব মহলে অপর স্তরের দর্শক তারা পছন্দ করে না। তবু ইসাবেল ধরে বস্‌লে, আমি তাকে সতর্ক করে বল্‌লাম, তেমন ভালো লাগবে না। বিরক্তিকর মনে হবে, আর তাকে আজ সাধারণভাবে সাজসজ্জা করতে বল্‌লাম। আমরা দেরীতে ডিনার খেলাম, তারপর ঘণ্টাখানেক 'ফলিস বারজেরে' কাটালাম, তারপর বেয়াড়া আড্ডার পথে যাত্রা করলাম। নোতর দামের কাছে গুণ্ডা অধ্যুষিত এক সরাইখানায় ওদের সর্বপ্রথম নিয়ে গেলাম। এখানকার মালিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, একটা বড় টেবলে তিনি আমাদের জায়গা করে দিলেন, সেই টেবলে আরো অনেক কুখ্যাত ব্যক্তি বসেছিলেন, আমি কিন্তু সকলের জন্যই মদের অর্ডার দিলাম। আর পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করা হোল। জায়গাটি গরম, ধূমকলঙ্কিত ও নোংরা। এর-পর আমি ওদের স্ফীংকসে নিয়ে গেলাম—এখানে মেয়েরা তাদের সান্ধ্য পোষাকের অন্ত-রালে মগ্ন হয়ে সামনাসামনি দুটি বেঞ্চে বসে থাকে, তাদের স্তন, স্তনাগ্রচূড়া সবই প্রায় দৃশ্যমান। ব্যাণ্ড বাজার সঙ্গে ওরা একত্রে উঠে নাচ সুরু করে আর শ্বেত পাথরের টেবলে যে সব পুরুষেরা বসে থাকে, তাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায়। আমরা এক বোতল উষ্ণ স্যাম্পেন অর্ডার দিলাম। কতকগুলি স্ত্রীলোক আমাদের সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় ইসা-বেলের দিকে চোখ দিতে লাগ্‌লো। তার যে কি অর্থ তা ইসাবেল বুঝ্‌লো কিনা কে জানে।

তারপর আমরা রু দ্যু লাপ্পে গেলাম। অতি ঘিঞ্জি, নোংরা গলি, এর ভিতর ঢুকলেই যেন কেমন লালসার আভাস পাওয়া যায়। আমরা একটি 'কাফে'তে গেলাম, যথারীতি শীর্ণ ও ম্লান আকৃতির একজন তরুণ পিয়ানো বাজাচ্ছে, একজন শ্রান্ত বৃদ্ধ বেহালায় ছড়ি টানছে, আর তৃতীয় ব্যক্তি স্যাকসোফোনে বেতালা সুর ধরেছে। জায়গাটিতে ভীষণ ভীড়, মনে হয় যেন একটিও খালি টেবল নেই, কিন্তু 'মালিক' যখন বুঝলো যে, খরিদ্দার হিসাবে আমরা বায়কুণ্ঠ হব না, তখন বিনা আড়ম্বরে একজনকে উঠিয়ে দিল, আর একটি পূর্বে অধিকৃত টেবলে অপর দলের সঙ্গে বসিয়ে দিল, তারপর আমাদের বসার ব্যবস্থা করে দিল। যে দুটি প্রাণীকে সরিয়ে দেওয়া হল, তারা এই ব্যবস্থাটা তেমন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করলে না। আর আমাদের সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করল, তাকে সাধুবাদ বলা চলে না। বহু লোক নৃত্য করছে, জাহাজী লোকের ভীড়, তাদের মাথার টুপীতে লাল পালক গোঁজা, অধিকাংশ পুরুষের মাথাতেই টুপী আর গলায় রুমাল বাঁধা, বয়স্ক নারী, তরুণী মুখে রঙ মেখে ঘুরছে, খালি মাথা, পরনে খাটো ঝুলের ফ্রক, আর গায়ে রঙীন ব্লাউজ। সুর্মাটানা চোখওলা, খর্বাকৃতি ছোঁড়াদের জড়িয়ে পুরুষেরা নাচছে; মোটা স্ত্রীলোককে জড়িয়ে ধরে কঠোর দর্শনা নারী নাচে মেতেছে, আবার পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত নাচও হবে। ধোঁয়া, মদের গন্ধ ও স্বেদাপ্লুত গায়ের ভ্যাপ্‌সা বেয়াড়া গন্ধ নাকে লাগে। বিরাম-বিহীন সঙ্গীত চলেছে, আর সেই উচ্ছৃঙ্খল জনতা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মুখে ঘামে চক্‌চক্ করছে—অতি বীভৎস কাণ্ড। পাশবিক আকৃতির কয়েকটি বিরাটাকার পুরুষও রয়েছে—তবে অধিকাংশ লোকই বেঁটে খাটো আর অপরিপুষ্ট। যারা বাজনা বাজাচ্ছিল সেই তিনজনকে আমি লক্ষ্য কর্‌ছিলাম, তারা রবোটও (কৃত্রিম মানুষ) হতে পারত, এমনই যান্ত্রিক তাদের নৈপুণ্য, আমি মনে মনে ভাব্‌লাম, যখন ওরা সঙ্গীত অনুশীলন শুরু করে-ছিল, তখন কি আশা করেনি, উত্তরকালে দেশ-বিদেশের লোক তাদের যন্ত্র সঙ্গীতের সুর-ধ্বনি শুনে প্রশংসায় হাততালি দেবে। কদর্য-ভাবে বেহালা বাজাতে হলেও তার অনু-শীলনের প্রয়োজন। ঐ বেহালাবাদক কি ক্লেশ স্বীকার করে শেষ রাত পর্যন্ত এই কটুগন্ধ-ময় নরকে 'ফক্‌সট্রট' নাচের তালে বেহালা বাজাবে বলে এক দিনও অনুশীলন করেছে? সুর ঝঙ্কার থামলো, পিয়ানোবাদক মলিন রুমালে মুখের ঘাম মুছলো, নর্তকবৃন্দ টেবলের উপর আড় হয়ে বা উঁচু হয়ে বসলো। সহসা একটা মার্কিণী কণ্ঠস্বর শোনা গেল;

"খৃষ্টের দোহাই—"

ঘরের একটি টেবল থেকে একটি স্ত্রীলোক উঠে দাঁড়িয়েছে। তার পুরুষ সহচরটি তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বোঝা গেল, সে মদে চুরচুরে হয়ে আছে। সে আমাদের টেবলের সামনে এসে দাঁড়াল, একটু হেলে পড়ে বোকার মত বিড় বিড় করে কি বলল—বোধ হ'ল আমাদের উপস্থিতিতে সে আনন্দানুভব করছে। আমি আমার সহচর-দের দিকে তাকালাম। ইসাবেল তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, গ্রের মুখে একটা তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি—আর লারি এমনভাবে চেয়ে আছে যেন, সে তার চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

মেয়েটি বলে উঠ্‌লে "হ্যা লো।"

ইসাবেল বল্‌ল, "সোফী।"

সে হেসে উঠে বলে, "আর কে হতে পারে মনে কর, ভিনসেণ্ট একটা চেয়ার দাও না।"

তার কাছ থেকে সরে গিয়ে লোকটি বলে উঠ্‌ল—"নিজেই দেখে নাও।"

তার দিকে মুখ ফিরিয়ে থুতু ফেলে সোফী গাল দিয়ে ওঠে।

আমাদের পিছনে একটি মোটাসোটা প্রকাণ্ড চেহারার লোক বসেছিল, মাথায় তৈলাক্ত চুল, সার্টের হাত ওঠানো, সে বলে উঠ্‌ল—"এই নাও চেয়ার।"

তখনো টল্‌তে টল্‌তে সোফী বলে, "আশ্চর্য তোমাদের সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে গেল, হ্যালো লারী, হ্যালো গ্রে"—পাশের লোকটির দেওয়া সেই চেয়ারে সে বসে পড়্‌ল। সে চীৎকার করে ওঠে, "কই মুরুব্বী, আমাদের জন্যে মদ নিয়ে এস।"

আমি লক্ষ্য করেছিলাম মালিকের আমা-দের উপর নজর ছিল, সে এবার এগিয়ে এল।

অতি পরিচিতের ভঙ্গীতে সম্বোধন করে মালিক বলে, "তুমি এ'দের জানো না সোফী।"

মাতালের ভঙ্গীতে সোফী হেসে বলে ওঠে—"বাঃ, ওরা হলো আমার ছোটবেলার বন্ধু, আমি ওদের জন্য এক বোতল স্যাম্পেন কিনছি, দেখো যেন 'Urine de cheral' (ঘোড়ার মূত্র) দিও না, এমন জিনিস দিও যা বমি না করে গেলা যায়।"

লোকটি বল্‌ল, "আহা সোফী, তোমার বড় নেশা হয়েছে দেখ্‌ছি।"

"গোল্লায় যাও।"

লোকটি চলে গেল, এক বোতল স্যাম্পেন বিক্রী হওয়ায় সে খুশি হয়েছে—আমরা নিরা-পত্তার খাতিরে শুধু ব্রাণ্ডি আর সোডা খাচ্ছিলাম—সোফী আমার মুখের দিকে এক মুহূর্ত বোকার মত তাকিয়ে রইল।

আমি বল্লাম, "ইসাবেল তোমার বন্ধুটির পরিচয় কি?"

ইসাবেল তার নাম বল্‌ল।

সোফী বলে ওঠে, "ও! মনে পড়েছে, আপনি একবার সিকাগোয় এসেছিলেন—একটু কড়া লোক নয়?"

আমি হেসে বল্‌লাম, "হবে হয়ত।"

আমার তার কথা কিছুই স্মরণ ছিল না, তাতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, আমি ত' দশ বছর সিকাগোয় যাইনি, আর তখন বা তারপরে খুব বেশী লোকজনের সঙ্গে দেখা শোনাও হয়নি।

মেয়েটি বেশ লম্বা, আর দাঁড়ালে আরো বেশী লম্বা দেখায়। কৃশ বলেই তাকে এত

লম্বা দেখায়। তার গায়ে একটি উজ্জ্বল সবুজ সিল্কের ব্লাউজ, তবে সেটি কোঁচ্‌কানো আর দাগধরা, পরনে খাটো বুলের কালো রঙের স্কার্ট। চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা, সামান্য কোঁকড়ানো, তবে অবিন্যস্ত, আর তাতে হেনা রঙ দেওয়া। অত্যন্ত রঙ মেখেছে। গালের রুজ্‌ প্রায় চোখ পর্যন্ত লাগানো। চোখের ওপর ও নীচের পাতায় মোটা করে কাজল লাগানো। রঞ্জিত নখসমেত তার হাতটি অপরিচ্ছন্ন। অপর সব স্ত্রীলোকের চাইতেও তাকে নোঙরা লাগছিল। আমার সন্দেহ হল ও শুধু যে মদের নেশায় মাতাল হয়ে আছে, তা নয়, অন্য নেশাও করেছে। তবু তার মধ্যে যে একটা দুর্দান্ত আকর্ষণ আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না; সে উদ্ধত ভঙ্গীতে মাথাটি উঁচু রেখেছে, আর তার মেক্‌-আপের দৌলতে চোখের নীলত্ব আশ্চর্যরকম বেড়েছে। মদে চুর হয়ে থাকার ফলে ওর মধ্যে একটা দুঃসাহসিক নির্লজ্জতা রয়েছে। আমার মনে হল ওর সেই গুণটুকুই হয়ত পুরুষদের আকৃষ্ট করে তোলে। হেসে সোফী আমাদের আলিঙ্গন করলে।

সোফী বল্‌লে "আমাকে দেখে যে তোমরা খুব খুশী হয়েছ, তা বলতে পারছি না।"

মুখে ম্লান হাসি টেনে ইসাবেল সহজ গলায় বল্‌লে—"শুনেছিলাম, তুমি প্যারীতেই আছ।"

"আমাকে ত ডাকতে পারতে, টেলি-ফোনের কেতাবে আমার নাম রয়েছে।"

"আমরা বেশী দিন আসিনি।"

গ্রে অবস্থাটা হাল্‌কা করে নিয়ে বলে, "এখানে কেমন কাটছে সোফী—বেশ ভালো ত'?"

"চমৎকার। তোমাদের খুব লোক্‌সান হয়েছে না গ্রে?"

গ্রের মুখখানি গভীর লাল হয়ে উঠল। বলল, "হ্যাঁ।"

"কত ক্ষতি হয়েছে, বুঝতে পারছি, এখন সিকাগোয় অবস্থা অতি জটিল হয়ে উঠেছে। ভালো করেছ সুবিধামত চলে আসতে পেরেছ। কিন্তু ভগবানের দোহাই—ও, হত-ভাগা বেজন্মা, আমাদের মদ দিচ্ছে না কেন?"

"আসছে এই যে।" ভীড়ের ভেতর পথ করে নিয়ে ওয়েটার কয়েকটি গ্লাস ও ট্রের ওপর মদের বোতল নিয়ে আসছে দেখে আমি বল্লাম।

আমার মন্তব্যে, আমার দিকে ওর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বললে, "আমার শ্বশুর বাড়ীর সবাই আমাকে সিকাগো থেকে তাড়িয়ে দিল, বল্লে, আমি নাকি ওদের সুনাম নষ্ট করছি। এই বলে সে বর্বরের মত হাস্‌লো। "ওদের পাঠানো টাকাতেই আমার দিন চলে।"

স্যামপেন এল এবং বোতলে ঢালা হোল—কম্পিত হস্তে সোফী মুখে গ্লাসটি তুললে।

সোফী বলে, "গোমড়ো মুখোরা চুলোয় যাক্‌।" তারপর সে গ্লাসটি শেষ করে লারীর দিকে তাকিয়ে বলে, "লারী, তুমি ত' বিশেষ কিছুই বলছ না।"

একদৃষ্টিতে লারী তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সোফী আসা অবধি তার মুখের ওপর থেকে চোখ নামায়নি। সে নম্রভাবে হাস্‌ল... "আমি ত তেমন কথা বলতে পারি না।"

আবার সংগীত শুরু হ'ল, আর একটি লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এল, বেশ লম্বা ও সুদৃঢ় বাঁধনের গড়ন—প্রকাণ্ড টিকোলো নাক, মাথার চুলগুলি চক্‌চকে কালো, আর আছে কামুকের মত পুরু ঠোঁট। যেন অশুভ সাজানো রোলার মত দেখতে। উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তির মতই তার গলায় কলার নেই, কোটটি আঁটসাঁট এবং বোতাম আঁট-কানো, তাতে করে কোমর দেখা যাচ্ছে।

সে বলে, "এসো সোফী আমরা নাচব।"

"যাও যাও, আমি এখন ব্যস্ত, দেখছ্‌না আমার বন্ধুরা রয়েছেন?"

"তোমার বন্ধুরা চুলোয় যাক,—তোমাকে নাচতেই হবে।"

সে সোফীর হাতখানি ধরল, কিন্তু সোফী হাত ছিনিয়ে নিল। সে সহসা তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে—"আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।"

এর পর অশ্লীল ভষায় কথা কাটাকাটি শুরু হয়।

গ্রে বুঝতে পারে না ওরা কি বলাবলি করছে, কিন্তু অধিকাংশ সাধবী-স্ত্রীলোক নারী-সুলভ প্রকৃতিবশে অশ্লীল কথা সহজেই বোঝে, দেখলাম ইসাবেল সব কথা স্পষ্টই বুঝছে, ভ্রূকুটিতে তার মুখ কঠিন ও কঠোর হয়ে উঠল। লোকটি তার হাতটি উঠালো; শিঙের মত শক্ত শ্রমিকের হাত, সোফীকে সে চড় মারে আর কি, গ্রে তখন চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠে তার স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলে—"খুব হুঁশিয়ার।"

লোকটি থেমে দাঁড়িয়ে গ্রের মুখের পানে ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকায়।

সোফী তিক্তকণ্ঠে হেসে বলে—"সাবধান কোকো—ও তোমাকে মেরে ঠাণ্ডা করবে।"

লোকটি গ্রের প্রকাণ্ড চেহারা, দৈর্ঘ্য, দেহ ভার ও শক্তির পরিমাপ করে। সে বেয়াড়াভাবে কাঁধ নেড়ে আমাদের সম্পর্কে একটা অশ্লীল গালাগালি দিয়ে সরে পড়ে। সোফী মাতালের ভঙ্গীতে খিল্‌-খিল্‌ করে হাসে। বাকী সবাই নীরব। আমি তার গ্লাস ভর্তি করে দিলাম।

সমস্ত মদটুকু গলায় ঢেলে সোফী বলে "তুমি কি প্যারীতে থাক, লারী?"

"উপস্থিত মত।"

মাতালের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো কঠিন—আর একথা অস্বীকার করা যায় না যে যারা মাতাল হয়নি, তাদের পক্ষে অবস্থা বিশেষ অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। আমরা কয়েক মিনিটের জন্য একটু বিরত ভঙ্গীতে ভাসা ভাসা আলাপ চালালাম। তারপর সোফী তার চেয়ার ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়ায়, বলে "আমি যদি না যাই, তাহলে আমার বন্ধুটি পাগল হয়ে উঠবে। লোকটি একেবারে পশু।" তারপর টলতে টলতে বলে, "আচ্ছা ভাই আবার এসো, আমি প্রতি রাতে এখানে থাকি।"

নর্তকদের ভীড়ে পথ করে নিয়ে সোফী হারিয়ে গেল। আমরা আর তাকে দেখলাম না। ইসাবেলের মুখের ঘৃণার ছাপে আমি প্রায় হেসে ফেললাম। আমাদের মধ্যে কেউ কিছু কথা বলতে পারলো না। সকলেই নীরব রইলাম।

(ক্রমশ)
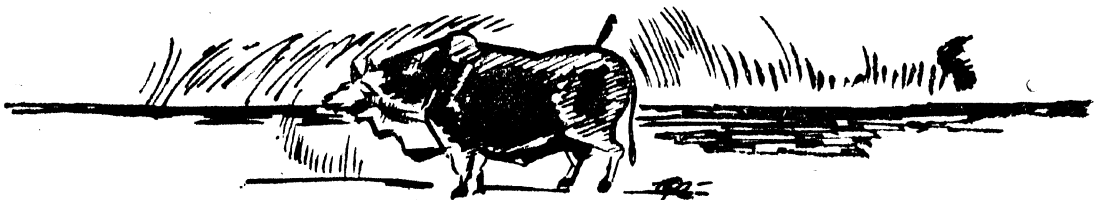
অনুবাদ সাহিত্য

সৃষ্টিছাড়া রশ্মি

পি এম এস্ ব্ল্যাকেট

[সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, বর্তমান বৎসরে পদার্থবিদ্যা পর্যায়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পি এম এস্ ব্ল্যাকেটকে। পুরস্কার যে যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে সকলেই একমত।

অধ্যাপক ব্ল্যাকেট ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সেবার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপরেও অধ্যাপক ব্ল্যাকেট ভারতবর্ষে এসেছিলেন দেশরক্ষা দপ্তরের উপদেষ্টারূপে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী পদক উপহার দিয়েছেন।

অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের পুরো নাম প্যাট্রিক মেনার্ড স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকেট, বর্তমান বয়স ৫১, বিবাহিত ও দুই কন্যার পিতা।

তিনি প্রথমে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। ১৯৩৩ সালে রয়েল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন। নভোরশ্মি সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণার জন্য রয়েল সোসাইটি ১৯৪০ সালে তাঁকে রয়েল মেডাল দান করেন। নভোরশ্মির আঘাতে পরমাণু ভেঙে ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত একটি সূক্ষ্ম কণিকা নির্গত হয় যার নাম পজিট্রন। এই পজিট্রন আবিষ্কারের জন্যই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক ব্ল্যাকেট এক নতুন সূত্র আবিষ্কার করেছেন যার ফলে বিশ্ব-রহস্যের অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হবে। অনেকের মতে তাঁর সূত্র নিউটনের ও আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত সূত্রের সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক ব্ল্যাকেট আরও বলেন, পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির উৎস তার কেন্দ্র নয়, বরঞ্চ উপরের স্তর, কেন না যতই গভীর প্রদেশে যাওয়া যায়, ততই চৌম্বক শক্তি হ্রাস পায়।

অধ্যাপক ব্ল্যাকেট একজন সুলেখক এবং সহজবোধ্য তাঁর ভাষা। গত মাসে তাঁর একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে, বইখানির নাম "মিলিটারি অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল কনসিকোয়েন্স অব্ অ্যাটমিক এনার্জি"। বইখানিতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাপানে এ্যাটম বোমা প্রয়োগ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

নভোরশ্মি সম্বন্ধে তাঁর লিখিত একটি প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ দেওয়া হ'ল। জনসাধারণের জন্য কি রকম সহজবোধ্য ভাষায় তিনি প্রবন্ধ রচনা করতে পারতেন, এটি তাঁর উৎকৃষ্ট একটি নমুনা]

১৯৪০—৪১ সালের শীতের যে কোনো রাত্রে বহু পরিবার শত্রুর বোমার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য লণ্ডনের টিউব পথে আশ্রয় গ্রহণ করত। গভীর টিউব পথগুলির নিম্নতম প্ল্যাটফর্মগুলি প্রায় একশত ফিট মাটির নীচে অবস্থিত। এত নীচে লণ্ডনবাসীরা নিজেদের নিরাপদ মনে করত। মাটির ওপর কিছু ঘটেছে এমন কিছুর সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাক, এই ইচ্ছাই ছিল সকলের। কেবলমাত্র সিঁড়ির গলিপথ ব্যতীত এত গভীর স্থানে আলো অথবা আওয়াজ প্রায়ই পৌঁছায় না। কিন্তু যদি কেউ সেই স্থানে একটি বিশেষ যন্ত্র নিয়ে যান তাহলে সেই যন্ত্রটির সাহায্যে তিনি দেখতে পাবেন যে আলো ও শব্দ ব্যতীত আরও কিছু আছে যা মাটির সেই গভীর প্রদেশেও পৌঁছয়। এরা হল কসমিক রে—এক স্বতন্ত্র ধরণের পরমাণবিক কণিকাদের এই নাম দেওয়া হয়েছে। প্রচুর বাধা অতিক্রম করবার শক্তি এদের আছে।

সুখের বিষয় এই রশ্মি হানিকর নয়। প্রতি মিনিটে এমন রশ্মি অনেকবার তোমার শরীর ভেদ করে অপর দিকে চলে যাচ্ছে, তোমার শরীর অথবা রশ্মি নিজেও তা লক্ষ্য করছে না অথবা বুঝতে পারছে না।

আরও সুখের বিষয় এই যে, এখনও পর্যন্ত কোনোও উদ্ভাবনক্ষম শত্রু এমন কোনো বোমা, শেল্ অথবা অপর কোনো হানিকর অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি যা কসমিক রশ্মির অনুরূপ ভেদনক্ষম।*

আমরা যদি নিরূপক যন্ত্রটি আরও গভীর দেশে নিয়ে যাই তাহলে সেখানেও কসমিক রশ্মি যন্ত্রটিতে ধরা পড়বে, যদিও তা গভীরতা অনুসারে কমতে থাকবে। তিন হাজার ফিট নীচে যেখানে যন্ত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে সেখানেও কসমিক রশ্মি নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে।

এত অধিক ভেদনক্ষমতা বিশিষ্ট কি এই রশ্মি? অনেক গবেষণার পর এখন জানা গেছে যে এতদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত এক আণবিক কণিকাসমন্বিত স্বকীয় গুণাগুণবিশিষ্ট এই রশ্মি। তাদের সর্বাপেক্ষা বিশেষত্ব হল তাদের কল্পনাতীত প্রভূত শক্তি। এই রশ্মির অস্তিত্ব জানবার জন্য কেবলমাত্র মাটির নীচেই অনুসন্ধান করা হয়নি, বহু উচ্চ আকাশেও অনুসন্ধান করা হয়েছে: বেলুন, বিমান ও পর্বতশিখরে, সমতল প্রদেশ, সমুদ্র, বিষুব রেখা অঞ্চল, উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরুতে, সর্ব সম্ভাব্য স্থানে। মানুষের যেখানে যাওয়া সম্ভব সেখানেই সে নিয়ে গেছে কসমিক রশ্মি ধরবার যন্ত্র, যেখানে সে যেতে পারেনি সেখানে অন্য উপায়ে সে যন্ত্র প্রেরণ করেছে।

আকাশে সর্বোচ্চে মানুষ উঠেছে কসমিক রশ্মির সন্ধানে, বেলুনে, ষাট হাজার ফিট অর্থাৎ প্রায় বার মাইল ঊর্ধ্বে। কসমিক রশ্মি নিরূপক যন্ত্র বিনা মানুষচালিত বেলুনে আরও ঊর্ধ্বে পাঠানো হয়েছে, বিশ মাইল উচুতে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গভীর প্রদেশে তারা যেমন ক্ষীণ, সেইরূপ উচ্চে তারা প্রখর থেকে প্রখরতর।

এই সমস্ত অনুশীলনের ফলে জানা গেছে যে আমাদের পৃথিবীতে সর্বদা এক শক্তিশালী অদৃশ্য আণবিক রশ্মি বর্ষিত হচ্ছে, দিন রাত্রি, শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই। সে রশ্মি আসছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহির্ভূত কোনো প্রদেশ থেকে সৌরজগতের বাইরে, নক্ষত্রমণ্ডলেরও, হয়ত আমাদের জানা জগৎসংসারের বাইরের কোন্ অজানা বিশ্ব থেকে।

কসমিক রশ্মির অধ্যয়ন আধুনিক বিজ্ঞানের এক রোমাঞ্চকর পরিচ্ছেদ। একজন মার্কিন লেখক এ বিষয়ে বলেছেন "আধুনিক বলবিদ্যায় কসমিক রশ্মি এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে, তার সূক্ষ্মতা, পর্যবেক্ষণের কোমলতা, বিশ্লেষণের সৌন্দর্য আর তাকে খুঁজে বার করবার জন্য বৈজ্ঞানিকবৃন্দের সাহসিক অভিযানের কাহিনীর জন্য।

কসমিক রে কে খুঁজে বার করবার একটি গল্প বলছি। অ্যাল্ডুইচে ভূগর্ভস্থ পরিত্যক্ত এক রেলপথে কসমিক রশ্মি মাপা হচ্ছে। মাটির শত ফিট তলদেশে থাকলেও বিভিন্ন দিক থেকে আগত রশ্মির প্রখরতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ধরা পড়তে লাগল। রশ্মির এই প্রখরতার পার্থক্য উপস্থিত বৈজ্ঞানিকদের ভাবিয়ে তুললে। অবশেষে অনেক পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে জানা গেল যে, কিংসওয়ের নীচে দিয়ে যে রেল লাইন চলে গেছে সেই দিক থেকে আসছে। ঘটনাক্রমে এই রেল লাইন কসমিক রশ্মির নিরূপক যন্ত্রের ওপরেই অবস্থিত থাকায় উপরিস্থিত মাটির স্তর অন্য স্থানের মাটির স্তর অপেক্ষা কম পুরু। এই কসমিক রশ্মির সাহায্যে আমরা লণ্ডনের ভূগর্ভের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম ঠিক যে রকমভাবে এক্স-রে সাহায্যে মানবদেহের

* দুঃখের বিষয়, এই প্রবন্ধ রচিত হইবার পর অ্যাটম বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে যা বিদীর্ণ হলে অত্যন্ত হানিকর তিনটি অদৃশ্য রশ্মি বিকীরিত হয়। যাদের নাম—অ্যালফা, বিটা ও গ্যামা।

কিছুদিন আগে সংবাদ দিয়েছিলাম যে এখানকার কালিকা থিয়েটার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী অবলম্বনে একখানি নাটক মঞ্চস্থ করতে উদ্যত হওয়ায় তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হ'য়েছে। তারপর 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামক একখানা ছবিরও অনুরূপ ভাগ্য হয়। তারপর দেখা গেলো যে কালিকা থিয়েটার 'যুগদেবতা' নামে একখানি নাটক মঞ্চস্থ ক'রেছে এবং তার বিজ্ঞাপনে মূল টাইটেলের চেয়ে, কোথাও বড় অক্ষরে কোথাও বা সমান অক্ষরে 'যুগাবতার, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী অবলম্বনে' এই কথাটি ব্যবহার করা হ'চ্ছে। আমরা নাটকখানি দেখিনি, কিন্তু বিজ্ঞাপন থেকে আমরা এইটাই বুঝতে পারছি যে, পরমহংসের জীবনী অবলম্বনে নাটক মঞ্চস্থ করতে দেওয়া হ'য়েছে তবে চরিত্রের নামধামগুলো বদলে দিয়ে; অর্থাৎ কোন্ মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বনে নাটকটি গঠিত হ'য়েছে তা বুঝতে লোকের অসুবিধে হবে না, কেবল সেই মহাপুরুষের একটি নতুন নামকরণ হ'য়েছে। 'স্বামী বিবেকানন্দের' বেলাতেও শুনলাম অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার হুকুম হ'য়েছে: অর্থাৎ ছবিখানিতে বিবেকানন্দের সব কিছুই থাকবে, থাকবে না শুধু নামটুকু, হয়তো টাইটেল দেওয়া হবে 'স্বামীজী' 'পরিব্রাজক' কি 'ভারত-জ্যোতি' এই রকম একটা কিছু। তার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, নাট্যকার বা চিত্র নির্মাতাদের এবার থেকে একটা অবাধ লাইসেন্স দেওয়া হ'লো। এখন থেকে তাঁরা মহাত্মা নাম দিয়ে মহাত্মাজীর জীবনী বা দেশ-গৌরব নাম দিয়ে নেতাজীর জীবনী অবলম্বনে দরকার মতো সত্যকে বিকৃত ক'রেও নিজেদের কল্পনা-প্রসূত উপাদান প্রবিষ্ট করিয়ে নাটক বা চিত্রনাট্য নিয়ে যদেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়ার স্বাধীনতা পেয়ে গেলো। ভালো কথা, সেদিন গুজরাটি সিনেমা পত্রিকা 'চিত্রপট'এ একখানি ছবির বিজ্ঞাপন দেখছিলুম। বিজ্ঞাপনটি দ্রষ্টব্য হ'লো এইজন্যে যে ছবিখানির নাম 'সুভাষচন্দ্র বসু' তুলছে কোন এক হীর পিকচার্স এবং পরিচালনা করছেন প্রাণভাই জানি ও কানুভাই আচার্য। ভাই-দুটি এ ছবি তোলার দুঃসাহস পেলো কোত্থেকে, আর তাদের অধিকারই বা দিলো কে ?

আমাদের এখানকার অভিনয় শিল্পীদের বহুজনের সম্পর্কে ইদানীং নানা-জাতীয় নালিশ খুব বেশী রকম শোনা যাচ্ছে। তাদের চারিত্রিক সব কিছু যদি তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহ'লে হয়তো বলবার কিছু থাকতো না, কিন্তু অনেকের আচরণ মাত্রা অতিক্রম ক'রে এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যার ফলে সমগ্র শিল্পেরই ক্ষতি সাধিত হ'চ্ছে। একটু নাম ক'রলেই কাজে হাজির হবার নির্দিষ্ট সময়কে অবজ্ঞা করাটাই হয় এদের প্রথম লক্ষ্য। এক একটি মিনিট পার হওয়া মানে প্রযোজকদের যে কতো ক্ষতি তা তারা গ্রাহ্যই করেন না; তার ওপর নানা ছুতোতে এবং আড্ডা ও গালগপ্পে সময় ব্যাপারে এমন একটা নিস্পৃহতা এরা দেখান যার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও পাওয়া যাবে না। নানাভাবে প্রযোজক ও পরিচালকদের নাস্তানাবুদ করা একটা উঁচুদরের বাহাদুরী মনে করেন এরা, এর ওপর অভদ্রতা ও অশিষ্টতার অতি জঘন্য পরিচয়ও কমজনের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। অনেকের দুর্ব্যবহারের তো তুলনাই হয় না। সবচেয়ে মজা হ'চ্ছে যে, শিল্পী হিসেবে যে যত নাম ক'রতে থাকে, এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে দুরাচারিতা ও বর্বরতার মাত্রাও তার তত বেড়ে যায়। সম্প্রতিকার একটি ঘটনার খবর আমাদের গোচরে এসেছে, একজন অতি জনপ্রিয় অভিনেতার সম্পর্কে। সম্ভ্রান্তবংশীয়া কোন এক প্রতিষ্ঠিতনামা অভিনেত্রী সহযোগে অভিনেতাটি গিয়েছিলেন কলকাতার বাইরে ছবি তোলার ব্যাপারে, অবশ্য অন্যান্য কলাকুশলী ও কর্মীরাও সঙ্গে ছিলেন। কর্মঅন্তে ফেরবার দিনে ট্রেনে জায়গার অভাবে উক্ত অভিনেতা ও জন দুই কর্মীকে একটি কামরায় এবং অভিনেত্রী মহিলাকে আর এক কামরায় সিট জোগাড় ক'রে দেওয়া হয়। মাঝপথে রাত্রে কোন একটি স্টেশনে ট্রেন থামতেই অভিনেতাটি মাতাল অবস্থায় অভিনেত্রীর কামরায় হাজির হয় এবং জোর ক'রে তাকে নিজের কামরায় নিয়ে যাবার জন্য জিদ্ ধ'রে টানাটানি ক'রতে থাকে- সে এক কুৎসিৎ ব্যাপার। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তার পাঁচজনের সহায়তায় অভিনেত্রী মহিলা সে যাত্রা তাঁর মান বাঁচাতে সক্ষম হন। এমন বর্বর ব্যক্তিও যে শিল্পীর ভেক্ নিয়ে চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে রয়েছে আজও, নিতান্তই তা দুর্ভাগ্যের কথা। টালিগঞ্জপাড়ার সব মহলেই এ ঘটনাটি সুবিদিত। সুতরাং এটা কি আশা করা যেতে পারে যে, উক্ত অভিনেতাপ্রবরকে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে এমনি নিঃসম্পর্ক ক'রে দেওয়া হবে যাতে ভবিষ্যতে তার পরিণতি আর সব হ'তে কোন রকম বর্বর ও অশিষ্ট আচরণে শঙ্কিত ক'রে তুলবেই ?

নূতন ছবির পরিচয়

পদ্মা প্রমত্তা নদী (রঙ্গশ্রী কথাচিত্র)—কাহিনী ঃ সুবোধ বসু; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, গীতিকার ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন ও তড়িৎ ঘোষ; আলোক চিত্র ঃ রামানন্দ সেন; শব্দ-যোজনা ঃ ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়; সুরযোজনা ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; ভূমিকায় ঃ দীপক, বিপিন গুপ্ত, জীবেন বসু, সাধন সরকার, বিশ্বনাথ, সিধু গাঙ্গুলী, সদানন্দ, শৈলেন পাল, দেবীপ্রসাদ, নরেশ বসু, অজিত, মাস্টার লক্ষ্মী, সিপ্রা, সুপ্রভা, প্রীতিধারা, শান্তা, রাধারাণী ছবি রায় প্রভৃতি।

ওরা ডিসেম্বর মুভীস্থানের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ ক'রেছে।

শহরের ছ'জন অধ্যক্ষকে দিয়ে ছটি বিভিন্ন চিত্রগৃহে ছবিখানিকে একই দিনে উদ্বোধন করিয়ে 'পদ্মা প্রমত্তা নদী' ইদানীংকার সাধারণ ছবির চেয়ে একটু বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে সক্ষম হয়। কিন্তু ছবিখানি দেখবার পর এই কথাই বলতে হয় যে, এ বছর যে রকম বাজে ছবির মিছিল চলেছে এখানিকেও দাঁড় করান না গেলেও এমন কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এতে নেই যার জন্যে এক ঝাঁক শিক্ষাব্রতীর সার্টিফিকেট জুড়ে দেবার দরকার ছিলো। ওটা এক রকম লোককে ধাপ্পা দেওয়াই হ'য়েছে বলা যায়—এর মধ্যে না আছে, শিক্ষক বা শিক্ষিতদের সম্বন্ধে কিছু, আর না বিশেষভাবে শিক্ষণীয় কিছু, তবে ছেলেখেলাপনা কিছু নেই এই যা। ছবির কাট্‌তি বাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রযোজক ফন্দী মন্দ করেন নি, কিন্তু দর্শকরা শিক্ষাব্রতীদের মত নয়, তারা প্রশংসা বিতরণ করে বুঝেসুঝে যাচাই ক'রে, তাই শিক্ষাব্রতীদের সার্টিফিকেটগুলো দেখা যাচ্ছে, প্রামাণিক মানদণ্ড ব'লে তারা যে স্বীকার ক'রে নেয়নি তা বোঝা যায় ছবিখানির প্রদর্শন দীর্ঘায়িত না হ'তে পারায় ছবিখানি কলকাতা থেকে বিদায় নিচ্ছে, সম্ভবতঃ এই আলোচনা বের হবার আগেই।

লোকের মত প্রথমেই বেঁকে যায় ছবির আরম্ভেই ভুয়ো পদ্মার দৃশ্য দেখে। পদ্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আছে এমন লোকের সংখ্যা বহু লক্ষ, তাছাড়া শুনে ও পড়েও বাঙলা দেশের আবালবৃদ্ধ সবারেরই পদ্মা সম্পর্কে একটা ধারণা আছে—পদ্মার ব্যাপকতা উদ্দামতা, হাজার হাজার জেলে ডিঙ্গি আর নৌকোর সারি, তার রাক্ষসী ক্ষুধার লোলুপতা মিশিয়ে একটা ছবি আঁকা আছে সবারেরই মনে। এখানে ছবিতে সে জায়গায় শান্ত ও মন্থরপ্রবাহী কলিকাতার গঙ্গার একটা কিনার মাত্র কি আর ছাপ দেবে !

ছবির নাম থেকে কাহিনী সম্পর্কে মুখ্যতঃ দুটি ধারণা জাগে। হয়, প্রমত্তা নদী পদ্মার ভাঙাগড়ার খেলা, যেখানে পদ্মাই হ'লো প্রধান চরিত্র—একদিকে ঘরবাড়ী জনপদ মানুষ, মানুষের বৈভব, মদোন্মত্ততা ও রোষ আর অপর দিকে পদ্মার প্রমত্ততা ও কোপ; এই

দুইয়ের অবলম্বনে একটা কিছু। আর না হয়তো, পদ্মারই মতো উদ্বেলিত ও প্রমত্ত একটি চরিত্রের কাহিনী, পদ্মারই মত যার উদ্দাম স্বভাব এবং পদ্মার সংগে ভাগ্যবিনিময় ক'রে চলে। ছবিতে কিন্তু যা পাওয়া গেল তাতে দুয়ের কোনদিকটাই পুরোপুরি খাটানো যায় না।

কাহিনীটি হ'চ্ছে রজত নামক একটি চরিত্রকে নিয়ে যার বাল্যের কথা ছবির প্রথমার্ধ, আর দ্বিতীয়ার্ধে চিত্রিত হ'য়েছে তার যৌবন-কালের ঘটনা। পদ্মার সংগে তার এইমাত্র যোগ যে, তারা থাকতো পদ্মারপাড়ে বীরগঞ্জে, নিজে-দেরই জমিদারীতে। রজতের ওরফে রাজার মা পদ্মার রোষের আতঙ্কেই মারা যায় এবং বীর-গঞ্জও কীর্তিনাশার গহ্বরে তলিয়ে যায়। পিতা দুর্গাপ্রসন্ন আবার ইমারৎ তুললেন পদ্মারই কোলে কোটাল-ভিটে। এখানে রাজাকে দেখি, অন্ধকারে মা-কালীর মন্দিরে যেতে, রাত্রে পদ্মার বুকে মাছ ধ'রতে লুকিয়ে পালিয়ে যেতে এবং একটা চড়ুইকে গুলীবিদ্ধ ক'রে তারপর অনু-শোচনায় বিদ্ধ অবস্থায় তার অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন ও বন্দুক প্রত্যর্পণ ক'রতে। তারপরেই পাই একেবারে কলকাতায় কলেজের ছাত্ররূপে রজতকে এবং এটা এমনি আকস্মিক ও যোগ-সূত্রহীন যে রজতই রাজার পরিণত অবস্থা কি না ভেবে ঠিক ক'রে নিতে হয়। তারপরের ঘটনাবলী পদ্মার সংগে রজতের চারিত্রিকযোগের কোন নিশানাই দেয় না। কলকাতায় তখন ১৯৩০ সালের ঢেউ, রজতের মধ্যেও তার দোলা লাগে। ছাত্রদের ওপর চললো লাঠিচালনা, রজত এগিয়ে যায় সেই নির্মম আক্রমণের সামনে। মাথার ওপরে আঘাতেও সে অকম্পিত দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো সুমিত্রা সংগ্রামিকা ও আন্দোলন সংগঠনকারিণী ছাত্র ও রাজনীতিক মহলে সুমিত্রাদি নামে প্রখ্যাত। বেটন বৃষ্টির মাঝখানেই সৃষ্টি হ'লো ওদের দুজনের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক: বোঝা গেলো এদের ভবিষ্যত জীবনের এইটাই ভূমিকা ব'লে বিতর্কের স্থান, কাল ও মাত্রা বিচার করা হয় নি। বলা বাহুল্য যে, রজত সুমিত্রার প্রেমে পড়লো এবং তার সেই মনের কথা সুমিত্রাকে জানাতে দ্বিধা ক'রলো না। কিন্তু দেশসেবার ব্রতে দীক্ষিতা সুমিত্রা তাকে ফিরিয়ে দিলে। ব্যর্থ হ'য়ে রজত, হুকুম করে আনা ঝড়-জলের মধ্যে বেরিয়ে পড়লো এবং পরে বৈপ্লবিক কাজে যোগ থাকার অপরাধে কারারুদ্ধ হলো। রজতের কারাবরণে সুমিত্রার মনে প্রেম উথলে উঠল এবং সে জেলেতে গিয়ে রজতের হাত দিয়ে নিজের মাথায় সিঁদুর পরে জানিয়ে এলো যে রজত ফিরে না আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা ক'রবেই। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর রজত সুমিত্রার বাড়ীতে গেলো, কিন্তু শুনলে যে সুমিত্রা ওর সংগে জেলে দেখা ক'রে আসার পরই নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়, তবে রজতের জন্যে একটি টুপী ও নিজের হাতে কাটা সুতোর বোনা কাপড় একখানা রেখে তারপর মারা গিয়েছে। সুতরাং রজত ফিরে গেলো পদ্মার কোলে তার নিজের গ্রামে।

পদ্মার প্রসংগ উহ্য রেখে দিলেও কাহিনীতে যা উপাদান রয়েছে তাতে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ একখানি ছবিই হওয়া উচিত ছিলো। বিশেষ ক'রে রজতের বাল্যকাল এবং কাহিনীর শেষের দিকের ঘটনাবলী দর্শকমনকে নাড়া দিতে পারতো যদি না পরিচালকের অহেতুক গতি-প্রিয়তা নাট্যরসকে জমাট বাঁধার অবকাশ থেকে বঞ্চিত ক'রতো। সবই কেমন যেন তড়িঘড়ীতে সেরে নেওয়া হ'য়েছে। বেটন বৃষ্টির মধ্যে বিলম্বিত বিতর্ক, প্রায় প্রকাশ্যভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব করা সত্ত্বেও সুমিত্রার গ্রেপ্তার না হওয়া, অপরিচিত রজত বৈপ্লবিকদের গুপ্ত আড্ডায় যাওয়া মাত্রই তাকে রিভলবার দেখিয়ে দেওয়ার মত অসতর্কতা, জেল থেকে দেখা ক'রে এসেই সুমিত্রা পড়লো ডবল নিউ-মোনিয়াতে কিন্তু সেই অবস্থাতেই তার দ্বারা একখানা ধুতির মত সুতো এবং একটা টুপী বোনা, কমপক্ষে বিশ বছরের পার্থক্য সত্ত্বেও মাইনক্যা মাঝির সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত চেহারা ইত্যাদি কতক কতক ঘটনা ও উক্তি গল্পের খাতিরে দরকার হ'লেও একটা মাত্রার মধ্যে থাকা উচিত ছিলো। সবায়েরই ভাষায় পূর্ববংগীয় টান কিন্তু রাজা বা দুর্গাপ্রসন্নের মধ্যে তার ব্যতিক্রম কেন ? সব কিছুই হয়তো মানিয়ে যেতো যদি শেষ পর্যন্ত গল্পের একটা প্রতি-পাদ্যও কিছু থাকতো।

সুমিত্রার দীপ্তিময় চরিত্র অভিনয়ে বেশ একটা মর্যাদা পেয়েছে। রজতের ভূমিকাভিনেতা দীপকের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব নেই, কিন্তু সম্ভবতঃ ব্যক্তিত্বের অভাব কেমন যেন ওকে বেমানান ক'রে দিয়েছে। মাষ্টার লক্ষ্মীর রাজা বরং রজতের চেয়ে বেশী ছাপ দিয়েছে। পর্দার পেশাদারী শহীদ-মাতা সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় সহজেই সহানুভূতি টেনে নিয়েছেন। সাধন সরকারের পাগলামী সংক্ষিপ্ত হ'লে গভীর ছাপ দিতো। ছোট ছোট ভূমিকায় জীবেন, নরেশ, অজিত, বিশ্বনাথ ও সিধু গাঙ্গুলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

গানগুলি উপভোগ্য, আবহ-সংগীতে বৈশিষ্ট্য নেই। আলোকচিত্র বাজার চলতি ছবির অনেকের চেয়ে ভালো, কতকগুলি দৃশ্য খুবই প্রশংসা-যোগ্য। শব্দ গ্রহণে কয়েকটি দৃশ্যের সংলাপাংশ পরিচ্ছন্ন নয়, নতুবা ভালোই বলা যেতো। দৃশ্য-সজ্জাদির দিকে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

জেমিনীর 'চন্দ্রলেখা'

গত ২৪শে ডিসেম্বর বসুশ্রী, বীণা ও ওরিয়েণ্টে মাদ্রাজের জেমিনী স্টুডিওর বিশাল চিত্রার্ঘ্য 'চন্দ্রলেখা' অত্যন্ত আড়ম্বরের সং মুক্তিলাভ করেছে। প্রথম দিনের এক প্রদর্শনীতে বাঙলার লাট ডাঃ কাট বসুশ্রীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। অভূতপূ প্রচারের ফলে সারা শহরে ছবিখানির জন্যে উদ্দীপনা এবং চিত্রগৃহগুলিতে যে বিরাট জ সমাগম সৃষ্টি হয়েছে, ভারতীয় চিত্র-জগ তা একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

মানুষের যত রকম উদ্দাম প্রবৃত্তি আ তার সবগুলিকে পরিতুষ্ট করার এমন বি চেষ্টা কোন ভারতীয় ছবিতে যে ইতিপূ হয়নি, এ কথা স্বীকার করতে হ নাচে, গানে, চুটকীতে, যৌন আবেদ সার্কাসে, ঘোড়দৌড়ে, তলোয়ার যুদ্ধে এব অসাধারণ উত্তেজক ছবি এই "চন্দ্রলেখ "কালোছায়া"র বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে এই ব যে, 'যতফিট ছবি ততো ফিট কূটচক্রান্ত'—'চ লেখা'র ক্ষেত্রে কথাটা ঘুরিয়ে বলতে হয়, যত ি ছবি তার দ্বিগুণ শত টাকা খরচ—প্রায় ি ঘণ্টার ছবি, যোগ করলে ঐ ৩৫ লক্ষ টা দাঁড়ায়। এবং সত্যিই যে ঐ বিপুল পরি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, ছবির প্রতিটি ফু তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চে করা হয়েছে। কাহিনী সাহিত্য রসসমৃদ্ধ সূক্ষ্ম কলাচাতুর্য কোথাও নেই, যুক্তিহীন ও অবান্তর দৃশ্য বা বস্তুর অবতারণাও কম নেই, কিন্তু সব সত্ত্বেও সুদীর্ঘ তিন ঘ কালের মধ্যে দর্শককে নিশ্বাস নেবার বির দেয় না কোথাও। দৃশ্য, সাজসজ্জা ও স পরিকল্পনা,—দিশী, বিলিতী, জাত-বিজা অদ্ভুত ও উৎকট সংমিশ্রণ—কিন্তু তব নিছক প্রমোদচিত্র হিসেবে সাধারণ দর্শ কাছে অতুলনীয় অবদান বলেই প্রতিভাত হ

ছবিখানি পরিচালনা করেছেন এস ভাসন; প্রমোদচিত্র তোলার কৃতিত্বে এই এ খানি ছবিতেই তিনি ভারতের সবাইকে ছাপি গিয়েছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে অসাধা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কমল ঘোষ—বিে করে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির দৃশ্য ইত্যাদি বহু দৃশে চিত্র গ্রহণ ভারতীয় নিরিখে অভূতপূর্ব কৃতি সি ই বীগ্‌সের শব্দ গ্রহণ একটি উল্লেখযো দিক। ছবিখানিকে সব দিক থেকে বিশাল ক উপস্থাপনের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

অভিনয়ে নাম ভূমিকায় রাজকুমারী গো থেকে শেষ পর্যন্ত লোকের দৃষ্টিকে টে রাখতে সমর্থ হয়েছেন—নাচ, গান, সার্কা যুদ্ধ সমস্ত বিষয়েই এমন চৌকশ অভিনে সমগ্র ভারতে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নে যাই হোক, পয়সা করার জন্যেই বিপুল অ ব্যয়ে ছবিখানি তৈরী হয়েছে এবং চিত্রামোদী যে রকম উৎসাহ তাতে সে বিষয়ে প্রযোজ বিরাট সাফল্যলাভ করতে পারবেন আশা ক যায়।

দেশী সংবাদ

২০শে ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা ও উহার উন্নতি সাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ৪২জন সদস্য লইয়া একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রারম্ভে উক্ত বোর্ডের হস্তে ৩০ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য প্রদান করা হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য উক্ত বোর্ডের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা থাকিবে।

কলিকাতায় ৬ষ্ঠ বার্ষিক যক্ষ্মাকর্মী সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যক্ষ্মারোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নিমিত্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষাদান, সংগঠন এবং প্রচারকার্যের সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। বোম্বাইয়ের ডাঃ আর বি বিলিমোরিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ কে এস রায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি এই প্রদেশে ৩।৪টি যক্ষ্মা প্রতিষ্ঠান, বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ এবং টি বি ক্লিনিক স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন। এই কার্যে আনুমানিক দেড় কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

গান্ধীনগরে (জয়পুরে) স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে এক স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেশের তরুণ তরুণীদিগকে সেবা দ্বারা নিজেদিগকে প্রকৃত স্বয়ংসেবক ও স্বয়ংসেবিকায় পরিণত হইতে এবং এক সুশৃঙ্খল জাতি গড়িয়া তুলিয়া বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার আহ্বান জানান।

২১শে ডিসেম্বর—করাচী হইতে পাকিস্থান বেতারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নুরুল আমিন বলেন যে, "এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোকের চক্রান্তের ফলেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বাস্তুত্যাগ করিয়াছে। ইহারা পাকিস্থান বিরোধী মনোভাব পোষণ করে এবং ভ্রান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত।"

কোর্ফা প্রজা ছাড়া অন্য লোকের খাস দখলে যে সকল চাষযোগ্য জমি রহিয়াছে, সেগুলি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিয়া পূর্ববঙ্গের গভর্নর এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

২২শে ডিসেম্বর—বিগত চারদিন কলিকাতায় ট্রাম চলাচল বন্ধ থাকার পর অদ্য সকালে সমস্ত লাইনেই ট্রাম বাহির হয়। কিন্তু জুলুমবাজির ফলে ট্রাম চলাচল ব্যাহত হয়। বেলা ১০ ঘটিকার সময় হেদুয়ার নিকট কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে একখানি ট্রাম গাড়ীর উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় ও গাড়ীটির ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ইহার কিছুকাল পরে কালীঘাট ট্রাম ডিপোয় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে সেখানকার এক দারোয়ানের স্ত্রী ও অপর এক ব্যক্তি আহত হয়।

করাচীতে পাকিস্থান ও ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের এক সভায় রেলওয়ের সাজ সরঞ্জাম ও গাড়ী বণ্টন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

২৩শে ডিসেম্বর—ভারতের আকাশ দিয়া ওলন্দাজ কে এল এম বিমান কোম্পানীর বিমান চালনার অধিকার সাময়িকভাবে বাতিল করিয়া ভারত সরকার এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

অদ্য প্রাতে শান্তিনিকেতনে শান্ত পরিবেশের মধ্যে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কাব্যময় হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বিশ্বভারতীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী—এই দুই মহাপুরুষ ও নব্য ভারতের স্রষ্টার চিন্তাধারা ও আদর্শের ঐক্যের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী উভয়েরই সাধনার ফল। অতঃপর পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু কবিগুরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া স্বাধীন ভারতে ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। ডাঃ কাটজুর বক্তৃতার পর ডাঃ অমরনাথ ঝা সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন।

কলিকাতা সিনেট হলে ভারতীয় বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী এম কে ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৪শে ডিসেম্বর—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আজ এক বিশেষ বিমানযোগে হায়দরাবাদ পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। পণ্ডিত নেহরু স্টেট কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক কমিটির সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে হায়দরাবাদ সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাবের আভাস দেন। তিনি স্টেট কংগ্রেসে দলাদলির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

কলিকাতার দীপক সিনেমা হলে নিঃ ভাঃ সংগীত সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন হয়। মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ এম আর জয়াকর উহাতে সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ জয়াকর সংগীতকলাকে ভগবৎ সত্যোপলব্ধির সহজতম পন্থা বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, এই একটি কলা যাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সাধনায় উন্নত হইয়াছে এবং সাহিত্য, দর্শন বা অন্য কোন পথ অপেক্ষা এই পথেই তাহাদিগকে ঘনিষ্ঠতর করা অধিকতর সম্ভব।

কলিকাতায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তপ্রদেশের গভর্নর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সমাবর্তন ভাষণ প্রসঙ্গে উপাধি গ্রহণার্থী চিকিৎসকবর্গকে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও প্রাদেশিকতা পরিহার করিয়া বিশ্বের মানব সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানান।

ভারত সরকারের ইস্তাহারে প্রকাশ, জম্মু প্রদেশে হানাদারদের কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ২০শে ডিসেম্বর নওশেরার দক্ষিণ-পূর্বে প্রতিপক্ষ কামান দাগিয়া ভারতীয় সৈন্যদলের অবস্থানঘাটি সমূহের উপর আক্রমণ চালায়। দুজন ভারতীয় সৈন্য নিহত ও ১০০ জন আহত হয়। পাকিস্থান হইতে নওশেরা এলাকা অভিমুখে প্রতিপক্ষীয় সৈন্য চলাচল অব্যাহত আছে। কাশ্মীরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনী হানাদারদের উপর সাফল্যমণ্ডিত আক্রমণ চালায়।

আজ কলিকাতায় সকল এলাকায় রাত্রি দশটা পর্যন্ত পূর্বেকার মত ট্রাম চলাচল করে। অবশিষ্ট ট্রাম কর্মিগণ কাজে যোগদান করায় ট্রাম চলাচলে এই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের উদ্বোধন কালে 'বন্দে মাতরম্' গীত হয়। এই সময় নেতৃবর্গ দণ্ডায়মান হন

কাশ্মীর-যুদ্ধ : তুষারাবৃত রণাঙ্গনে সৈনিকদের নিকট চিঠিপত্র বিলি। শিল্পী : কুনওয়াল কৃষ্ণ

২৫শে ডিসেম্বর—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আজ হায়দরাবাদ প্রাসাদে যাইয়া নিজামের সহিত দেখা করেন। উভয়ের মধ্যে এক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়।

হায়দরাবাদে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, হায়দরাবাদ রাজ্যে দ্রুত জনপ্রিয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু জনসাধারণকে তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হইতে হইবে।

আজ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং বারাণসীর খ্যাতনামা চিকিৎসক ক্যাপ্টেন এস কে চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৬শে ডিসেম্বর—শালবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অভিভাষণ দিতে গিয়া ভারতের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং বলেন যে, সৈন্যবাহিনীতে অতুলনীয় লোকবল আছে। কিন্তু ভারত যুদ্ধাস্ত্র ও সমর সম্ভারের ব্যাপারে স্বাবলম্বী নহে। এই অভাব পূর্ণ করিতেই হইবে।

কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে ডাঃ জে আর বি দেশাইএর সভাপতিত্বে নিঃ ভাঃ মেডিকাল লাইসেন্সিয়েটস সম্মেলনের ৩৬তম বার্ষিক অধিবেশন হয়।

নয়াদিল্লীতে নিঃ ভাঃ হিন্দু মহাসভা কাউন্সিলের বৈঠকে মহাসভার রাজনৈতিক কার্যকলাপ পুনরায় আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

২০শে ডিসেম্বর—ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের রাজধানী যোগ্যকর্তা অদ্য ওলন্দাজ সৈন্যদের হস্তগত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণ সহ অধিকাংশ প্রজাতন্ত্রী নেতা বন্দী হইয়াছেন। প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল সুদিরমান যোগ্যকর্তায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

২১শে ডিসেম্বর—ইন্দোনেশীয় গণতন্ত্রের প্যারিসস্থ মুখপাত্র বলেন যে, গণতন্ত্রী বাহিনী পুনরায় যোগ্যকর্তা দখল করিয়াছে।

বার্লিনে বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিন এলাকায় সরকারীভাবে একটি ত্রি-শক্তি সামরিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ডাবলিনে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট রিপাবলিক অব আয়ার্ল্যাণ্ড বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহার ফলে বৃটিশ রাজের সহিত আয়ার্ল্যাণ্ডের সর্বশেষ যোগসূত্রও ছিন্ন হইল।

২২শে ডিসেম্বর—জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হিদেকী তোজো ও অপর ছয়জন জাপ নেতাকে অদ্য সুগামো জেলে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর—চীনের নূতন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সান ফো কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন।

নিরাপত্তা পরিষদ অদ্য ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র উভয়পক্ষকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ এবং গত বৎসরের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমানায় উভয় পক্ষের সৈন্য দলকে সরাইয়া আনিবার নির্দেশ দিতে অনুরোধ করিয়াছে।

সিঙ্গাপুরে গণতন্ত্রী সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদে ঘোষিত হইয়াছে যে, ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার উদ্দেশ্যে সুমাত্রায় অস্থায়ী ইন্দোনেশীয় গণতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাভা মন্ত্রিসভার অর্থ-সচিব ডাঃ সফরুদ্দীন প্রবীরগণের নেতৃত্বে এই গভর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—বাটাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোনেশিয়ার ঊর্ধতন সাধারণতন্ত্রী মহল বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের শুভেচ্ছা কমিটির সদস্যগণকে ব্যক্তিগত ভাবে জানাইয়াছেন যে, সাধারণতন্ত্রী সৈন্যরা ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে স্থির করিয়াছে।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ২৪শে পৌষ, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 8th January, 1949. [১০ম সংখ্যা

কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতি

বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি ডক্টর লোজানোর চেষ্টা আপাতত ফলবতী হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আলোচনার জন্য তিনি এদেশে আসেন। নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া গিয়া তিনি যে প্রস্তাব করেন, তদনুযায়ী গত ১লা জানুয়ারী রাত্রি বারটা হইতে কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারত চিরদিনই শান্তি চাহে, পাকিস্থান প্রত্যক্ষভাবে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়া ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীরে হানা দেয় এবং তাহার ফলে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া ভারত এবং পাকিস্থান—এই দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘ বিরোধের সূত্রপাত হয়। ভারত রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতিতে পূর্বে সম্মতি প্রদান করে, কিন্তু পাকিস্থানই তাহাতে পূর্বে রাজি হয় নাই। এতদিন পরে সে তাহাতে সম্মত হইল। ফল কি হইবে, এখনও চূড়ান্ত রকমে বলা যায় না। বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে গণভোট গৃহীত হইবে এবং তদনুসারেই কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ণীত হইবে, এখন মোটামুটি এই কথাই বলা চলে। বস্তুত কাশ্মীরের জনসাধারণই যে সেখানকার সমস্যার সমাধানে একমাত্র অধিকারী, ভারত এ-নীতি পূর্ব হইতেই ঘোষণা করিয়াছে এবং সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থায় ভারতের সম্পূর্ণই সম্মতি ছিল; কিন্তু পাকিস্থান সেসব কোন যুক্তি না মানিয়া বলপূর্বক পররাজ্য কাশ্মীরে প্রবেশ করে এবং হানাদার দস্যুদলের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্থানের হস্তক্ষেপের পক্ষে একমাত্র যুক্তি এই যে, কাশ্মীরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান; সুতরাং কাশ্মীরের উপর পাকিস্থানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। পাকিস্থানের জন্য কাশ্মীর দরকার, কাশ্মীরের স্বার্থের জন্য নয়, কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতির নিয়ামকদের দৃষ্টিভঙ্গী আগাগোড়া এইরূপ চলিয়া আসিয়াছে। সেদিনও কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা এমন উৎকট জবরদস্তিমূলক মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, কাশ্মীরে ৩০ লক্ষ মুসলমান বাস করে বলিয়াই যদি পাকিস্থান এই স্থান দাবী করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের আগে আফগানিস্থান ও অন্যান্য মুসলমানপ্রধান দেশগুলির উপর নিজেদের দাবী উপস্থিত করিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করা কর্তব্য। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার স্থান পরাধীন অবস্থাতেই সম্ভব। বিদেশী বিজেতার দল নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য এই ভেদবাদকে জিয়াইয়া রাখে। রাষ্ট্রকে সুগঠিত, সমুন্নত এবং সংহত করা তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে না, সুতরাং তাহাদের নীতি ও প্রগতিবিরোধী শোষণ এবং পীড়নমূলক হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার উদার প্রতিবেশে রাষ্ট্রে এমন সাম্প্রদায়িকতার স্থান থাকা উচিত নয়। যাহারা রাষ্ট্রের স্বাধীনতার নামে সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তোলে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে মুষ্টিমেয়ের প্রভুত্বই রাষ্ট্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। ইহারা গণতান্ত্রিকতার বোধ-বিবর্জিত এবং উপদলীয় স্বার্থ-পিপাসায় অন্ধ। কাশ্মীরের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ প্রকৃত গণ-চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং সেজন্য প্রগতিবিরোধী সাম্প্রদায়িকতাকে তাহারা ঘৃণা করে। এইজন্যই পাকিস্থানী নীতির তাহারা পরিপন্থী এবং প্রাণ দিয়া সেই দুর্নীতির দুর্গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বস্তুত কাশ্মীরে দুই-জাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। পাকিস্থানী নীতির ধারক এবং বাহকগণ তাঁহাদের অভিসন্ধি লইয়া যতই অগ্রসর হইবেন, কাশ্মীরের জনসাধারণ ততই তাঁহাদের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিবে এবং কাশ্মীরের উপত্যকাভূমিতে মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার সব স্পর্ধা বিচূর্ণ হইবেই। কারণ এই যে, কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদীরা নৈতিক ভিত্তিতে সুদৃঢ় এবং এইজন্য রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও তাহাদের জয় সুনিশ্চিত। পাকিস্থান যদি মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার যুক্তিকে সম্বল না করিয়া গণতান্ত্রিকতাকে নৈতিক মর্যাদা দিত, তবে অনর্থক বিগত চতুর্দশ মাসে নির্দোষের রক্তপাতে কাশ্মীর সিক্ত হইত না এবং নির্যাতিতা নারীর আর্তনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইত না এবং বর্বরতামূলক এই ধরণের অনেক ব্যাপার হইতে বৃটিশের ভারতবর্ষ ত্যাগের পরবর্তীকালের এদেশের ইতিহাস মুক্ত থাকিত। বস্তুত পাকিস্থানী কূট চক্রীদের অন্ধকার পথে প্রযুক্ত তস্করাচরিত নীতির এমন সম্প্রসারণে তাহাদের লজ্জাই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। ইঁহাদের এতদিনে বোঝা উচিত ছিল যে, বিদেশী রাজনীতিকরা স্বার্থসিদ্ধির সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনে তাহাদের পিঠ চাপড়াইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা কেহই পাকিস্থানের বন্ধু নহে, অধিকন্তু সুযোগ পাইলে তাহারাই পাকিস্থানের বুকে ছুরি বসাইতে কসুর করিবে না। পাকিস্থানের রাষ্ট্র-নীতিকগণ যদি আজও এই সত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং কাশ্মীরের ব্যাপারের সন্তোষজনক সমাধানের পথে ভারতের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই এখনও তাঁহাদের আন্তরিক কামনা হয়, তবে সুখের বিষয় হইবে। অতীতের সব তিক্ত অভিজ্ঞতা

"বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্‌"

শিল্পীঃ শ্রীনন্দলাল বসু

গৃহকাজ

শিল্পীঃ শ্রীনন্দলাল বসু

নোকরাশি পাশা

মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরাশি পাশা গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের লিফটে আরোহণের সময় আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে মিশরের জাতীয় জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি তো হলই, সমগ্র মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতির উপর তাঁর মৃত্যু গভীর প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয়। তাঁর মৃত্যুতে ভারতেরও কম ক্ষতি হল না। স্বাধীন ভারতের প্রতি তিনি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা তাঁর গভর্নমেণ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। নভেম্বর মাসের গোড়ায় কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে ফেরার সময় আরব লীগের অতিথিরূপে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কায়রোতে একদিন অবস্থান করেছিলেন এবং তখন নোকরাশি পাশার সঙ্গে তার বিভিন্ন বিষয়ক হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল বলে জানা যায়। নোকরাশি পাশার এই হত্যাকাণ্ডকে একটা বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করলে ভুল হবে। মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতি বর্তমানে যে গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে, নোকরাশি পাশার হত্যাকাণ্ডকে আমরা তারই প্রতীক বলে মনে করি। এর পিছনে আছে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রজাল এবং বিশেষ ধরণের কতকগুলো ঘটনা থেকেই এই ষড়যন্ত্রজালের উদ্ভব হয়েছে।

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড মিশরের জাতীয় জীবনে নতুন কিছু ঘটনা নয়। একজন নিহত প্রধান মন্ত্রীর স্থলবর্তী হয়েই তিনি সর্বপ্রথম মিশরের প্রধান মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধকালে ১৯৪৫ সালের গোড়ায় মিশরের প্রধান মন্ত্রী আহমেদ মাহের পাশা আততায়ীর গুলীতে নিহত হন এবং সাদিস্ট দলের অধিনায়করূপে নোকরাশি পাশা মিশরের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। আহমেদ মাহের পাশার পূর্বেও মিশরে অপর একজন প্রধান মন্ত্রী নিহত হয়েছিলেন। তাঁর নাম হল বাট্রস ঘালি পাশা এবং তিনি নিহত হয়েছিলেন ১৯১০ সালে। মৃত্যুকালে নোকরাশি পাশার বয়েস হয়েছিল ৬০ বৎসর। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হবার পর নোকরাশি পাশা বৎসরখানেক এই আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছাত্র বিক্ষোভের ফলে ১৯৪৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি পদত্যাগ করেন এবং তাঁর পরিবর্তে সিদকি পাশা মিশরের প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৪৬ সালেরই ডিসেম্বর মাসে সিদকী পাশা নোকরাশি পাশার অনুকূলে প্রধান মন্ত্রী পদ ত্যাগ করায় নোকরাশি পুনরায় মিশরের প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন এবং মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি এই আসনেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে তাঁকে মিশরের কয়েকটি জাতীয় দাবী নিয়ে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করতে দেখেছি। প্রথম হল ১৯৩৬ সালের কুখ্যাত ইংগ-মিশরীয় চুক্তি রদবদল করার প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়ত মিশরের সঙ্গে বৃটিশ শাসিত সুদানের সংযোগ সাধনের প্রশ্ন। এ দুটি প্রশ্নের সম্বন্ধেই মিশরের জনমতের দাবী সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। ১৯৩৬ সালের চুক্তি বলে বৃটিশরা মিশরে স্থায়ী সৈন্য সংরক্ষণের যে অধিকার পেয়েছে তার দরুণ মিশরের জাতীয় সার্বভৌমত্ব বহুলাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে। আর সুদান নিয়ে বৃটিশরা চালিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ভেদপন্থার খেলা। নোকরাশি পাশা প্রথমে চেষ্টা করেন আপোষ আলোচনার পথে বৃটিশদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার। কিন্তু ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে আপোষ আলোচনা ভেঙ্গে পড়ে। তখন তিনি তাঁর জাতীয় দাবীকে নিয়ে যান সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের দরবারে। কিন্তু সেখানেও তিনি ব্যর্থকাম হন। তদবধি এ বিষয়টি অমীমাংসিতভাবেই পড়ে আছে। এর পরেই আসে প্যালেস্টাইনের প্রশ্ন। প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরব জগতের প্রতিক্রিয়া কত তীব্র তা আমরা জানি। আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম রাষ্ট্ররূপে মিশরও প্যালেস্টাইন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু পৃথিবীর বড় রাষ্ট্র কয়টির স্বার্থবাদী কূটনীতির ফলে প্যালেস্টাইনের সমস্যা ক্রমশ জট পাকিয়ে উঠছে। ফলে সংগ্রামরত অপর পক্ষ যেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি—তেমনি নবরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ইহুদীরাও আজ পর্যন্ত সর্ববাদিসম্মত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি।

নোকরাশি পাশার এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মর্মোদ্ঘাটন করতে হলে আরব জগত ও মিশরের জাতীয় জীবনের এই রাজনৈতিক পটভূমিকা স্মরণ রাখা কর্তব্য। বিশ্বসভ্যতার পক্ষে অত্যাবশ্যক তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্রগুলির দিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের শ্যেন দৃষ্টি আছে। সেইজন্যে মধ্যপ্রাচ্যে তারা যে সমস্যার জট পাকিয়ে তুলেছে তারই অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে এই জাতীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মিশরের কথাই ধরা যাক। মিশর গভর্নমেণ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করে ১৯৩৬ সালে ইংগ-মিশরীয় চুক্তিকেও নাকচ করে দিতে পারেন নি—সুদানকেও মিশরের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি। অথচ এ দুটি বিষয়ে মিশরের জনমতের দাবী সুস্পষ্ট। এই ধরণের সরকারী ব্যর্থতার ফলে মিশরের জাতীয় জীবনে একাধিক চরমপন্থী রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়েছে। নোকরাশি পাশার হত্যাকাণ্ডের জন্যে যে মোসলেম ব্রাদারহুড দলকে দোষী মনে করা হচ্ছে সে দলটি এমনই একটি প্রতিক্রিয়াপন্থী সন্ত্রাসবাদী দল। তাদের আদর্শ হল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ—তাদের উদ্দেশ্য মুখ্যত বৃটিশ বিরোধী হলেও কার্যত দেখা যায় যে তাদের আক্রমণ এসে পড়ে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী অন্যান্য শক্তির উপর—বিশেষ করে গভর্নমেণ্টের উপর। এদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দ্বারা এরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে কোন আঘাতই হানতে পারে না—সে আঘাত এসে পড়ে মিশরীয় গভর্নমেণ্টের উপর। এর একমাত্র ফল হয় জাতীয় জীবনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি। সম্প্রতি নবেম্বর মাসে বৃটিশদের উদ্যোগে সুদানে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে তার প্রতিক্রিয়ায় মিশরের জাতীয় জীবনে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্র বিক্ষোভ ছিল এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—এই আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের বিশেষ সংযোগ ছিল না। ৮ই নবেম্বর তারিখে ওয়াফদ দলের নেতা নাহাশ পাশার জীবননাশের চেষ্টা করা হয়। তা ছাড়া ছাত্রবিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ গ্রহণ করেছিল এবং তার ফলে মিশরের জাতীয় জীবনের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। এসব বিক্ষোভের পিছনে মোসলেম ব্রাদার-হুডের হাতই ছিল সর্বাধিক। এই দলের নেতারা প্রচার করতে শুরু করেছিলেন যে, রাজনৈতিক কারণে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করলে খারাপ কাজ করা হয় না। মোসলেম ব্রাদারহুডের এইসব সমাজবিরোধী দুষ্কার্যের জন্যে নোকরাশি পাশার গভর্নমেণ্ট এই দলটিকে অবৈধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকের ধারণা এই যে, নোকরাশি পাশার এই কাণ্ডের পিছনে মোসলেম ব্রাদারহুডের দলেরই ষড়যন্ত্র আছে। নোকরাশির হত্যার জন্যে দায়ী বলে যে ছাত্র যুবকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার বিচারের সময় অনেক রহস্যই উদঘাটিত হবে বলে আমরা আশা করি। মিশরের জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার অবসান ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে মিশরকে পূর্ণ সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা

না করতে পারলে এই ধরণের শোচনীয় হত্যা-কাণ্ড স্থায়ীভাবে নিবারণ করা সম্ভব হবে না।

চীনে নতুন পরিস্থিতি

চীনে যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে চলেছে আজ তার পরিণতি একটা সুস্পষ্ট রূপ নিতে চলেছে। চীনের সামরিক পরিস্থিতি আজ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এ গৃহযুদ্ধ আর দীর্ঘদিন চলতে পারে না। অতি শীঘ্রই এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে বলে আশা করার কারণ আছে। মাও সে তুং-এর কম্যুনিস্ট বাহিনী আজ যেভাবে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের কুওমিনটাঙের বাহিনীকে ঘিরে ধরেছে তাতে সকলের মনেই ধারণা জন্মেছে যে কুওমিনটাঙের পরাজয় সুনিশ্চিত। জাতীয় চীনের রাজধানী নানকিং-এর পতন আজও হয়নি সত্য—কিন্তু যুদ্ধের গতি অপরিবর্তিত থাকলে আর কিছুদিনের মধ্যেই নানকিং-এর পতন অবশ্যম্ভাবী। বিলম্বে হলেও মার্শাল চিয়াং কাইশেক আজ নিজের এবং নিজের দলের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চিয়াং কাইশেক নিজের প্রধান সহায় বলে মনে করে এসেছেন, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ তাঁকে প্রায় নিরাশ করে তুলেছে। এ অবস্থা যে শেষ পর্যন্ত হবে সে কথা চিয়াং কাইশেকের পূর্বেই বোঝা উচিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট প্রথম থেকেই চীনকে সাহায্য করে এসেছে—কিন্তু কোনদিনই চীনের জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে এ সাহায্য দেওয়া হয় নি। সেভাবে সাহায্য যদি দেওয়া হত এবং চিয়াং কাইশেক যদি সেই অর্থ সাহায্যের দ্বারা চীনের জাতীয় জীবনের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করতেন, তবে চীনের আজ এ অবস্থা হত না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো আর চীনের প্রয়োজনে সাহায্য করেনি—সাহায্য করেছে নিজের প্রয়োজনে। তা যদি না হত তবে আজ আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও চিয়াং গভর্নমেণ্ট কোন সাড়া পাচ্ছেন না কেন? সাহায্য পাবার আশায় মার্শাল চিয়াং কাইশেক তাঁর পত্নী মাদাম চিয়াং কাইশেককে পাঠিয়েছেন আমেরিকায়। কিন্তু মাদাম চিয়াং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কিংবা মার্কিন রাষ্ট্র-দপ্তরের কাছ থেকে আদৌ আশানুরূপ সাড়া পাননি। চিয়াং কাইশেক ইত্যবসারে ডাঃ সুন-ফোর প্রধান মন্ত্রিত্বে নতুন মন্ত্রিমণ্ডল স্থাপন করেছেন। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের ফলে অবস্থার কোন রদবদল হয় নি। ইত্যবসরে চিয়াং গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে চেষ্টা চলেছিল কোন তৃতীয় শক্তির মধ্যস্থতায় কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা আরম্ভ করার। কম্যুনিস্টদের হাতে বার বার পরাজয়ের ফলে চিয়াং গভর্নমেণ্টের আজ যে অবস্থা হয়েছে তাতে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সরাসরি আপোষ-আলোচনা আরম্ভ করার মত মুখ যেমন তাঁদের নেই, তেমনি সেরূপ আলোচনায় কোন সুবিধা পাবার আশাও তাঁদের নেই। তাই চিয়াং গভর্নমেণ্ট চেয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া কিংবা ইংল্যান্ড তাঁদের হয়ে আপোষ-আলোচনা আরম্ভ করুক। কিন্তু এই ত্রিশক্তির মধ্যে কেউ উৎসাহ না দেখানোয় চিয়াং গভর্নমেণ্ট বিপদে পড়েছেন। তাই এবার নিরুপায় হয়ে চিয়াং কাইশেক তাঁর নববর্ষের বাণীতে সরাসরি প্রস্তাব করেছেন যে, জাতীয় গভর্নমেণ্টে তাঁর উপস্থিতি যদি আপোষের পরিপন্থী হয়ে থাকে তবে তিনি পদত্যাগ করতে রাজী আছেন। অবশ্য এই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে, আপোষ সম্বন্ধে যদি কম্যুনিস্টদের আন্তরিকতা থাকে, তবেই তিনি পদত্যাগ করবেন। চিয়াং-এর পদত্যাগ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে নানারকম গুজব রটেছিল। এতদিন এইসব গুজবের পিছনে কোন সরকারী সমর্থন ছিল না। এইবার চিয়াং কাইশেকের নিজের মুখ থেকেই আমরা পদ-ত্যাগের প্রস্তাব শুনলাম। কিন্তু এই প্রস্তাবে এখন কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। তার কারণ সাফল্যের আনন্দে উৎসাহী কম্যুনিস্টরা বর্তমানে আপোষের জন্যে আগ্রহান্বিত নয়। কম্যুনিস্ট বেতার থেকে ইতিমধ্যেই চিয়াং কাইশেক সহ কুওমিনটাঙ দলের অনেক নেতা ও সমরনায়ককে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কম্যুনিস্টরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে জয়ী হবারই পক্ষপাতী।

কোটি কোটি মানুষের বাসভূমি চীনের ভাগ্যে আজ কি ঘটে না ঘটে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। চীনের জাতীয় জীবনের প্রতিক্রিয়া শুধু এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উপরেই হবে না, তার প্রতিক্রিয়া হবে সারাবিশ্বের উপর। চীন সম্বন্ধে আমেরিকা পূর্বাপর কি মনোভাব নিয়ে কাজ করেছে তা বোঝা দুষ্কর। যুদ্ধকাল থেকে আমেরিকা চীনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে এসেছে। এই সাহায্যের পরিমাণ অবশ্য কোনদিনই আশানুরূপ হয় নি। আমেরিকা ভাব দেখিয়েছে যে চীনকে কম্যুনিস্ট-দের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তার উদ্বেগের অন্ত নেই। আর আমেরিকার সে সাহায্যের উপর নির্ভর করে সমরাধিনায়ক চিয়াং কাইশেক কম্যুনিস্টবিরোধী অভিযানে মত্ত হয়ে উঠে-ছিলেন। মত্ততার ঘোরে তিনি আশে পাশে কোন দিকেই তাকাননি—দুঃখদুর্দশা প্রপীড়িত চীনে কোন অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা যেমন তিনি করেন নি—তেমনি তিনি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনায়ও কোন কান দেন নি। জাতীয় চীনের সমগ্র শাসন ক্ষমতাকে তিনি কুক্ষিগত করে রেখে-ছিলেন এবং তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন প্রতিক্রিয়াপন্থী জনস্বার্থ-বিরোধী। তাঁদের কুপরামর্শে পরিচালিত চিয়াং কাইশেকে আমরা একাধিকবার কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা ভেঙে দিতে দেখেছি। সেদিন একগুঁয়েমির ফলে সেসব আপোষ-আলোচনা ভেঙে না দিলে চিয়াং কাইশেকের গভর্নমেণ্টের পক্ষে যেমন সম্মানজনক সর্ত পাওয়া সম্ভব হত, তেমনই চীনের জাতীয় জীবনকেও এতটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হত না। যাক যা ঘটে গেছে তা নিয়ে বর্তমানে আর অনুশোচনা করে লাভ নেই। বর্তমানে চীনের ভাগ্যে কি ঘটে তা জানার জন্যেই বিশ্ব-বাসীরা উদ্‌গ্রীব। ২-১-৪৯

অনুবাদ সাহিত্য

প্রথম জাতক

হোয়ার্ড ফাস্ট

[হোয়ার্ড ফাস্ট হলেন তরুণ মার্কিন লেখক। এঁর 'ফ্রীডম রোড' আমেরিকার নিগ্রোদের নিয়ে এক অপূর্ব রচনা। সাহিত্যিক খ্যাতি যুদ্ধের সময় ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীন এবং বলিষ্ঠ মতবাদের জন্যে সাধারণের অভিনন্দন যেমন পেয়েছেন—তেমনি মার্কিনী গণতন্ত্রের কাছ থেকে নিষেধাজ্ঞা আর কারাদণ্ডের হুকুম এসেছে।]

ঘুম ভেঙে চোখ খুলতে চড়া রোদ এসে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ বুজলো: ডুবে যেতে চাইলো গভীর ঘুমের অবিচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে। কিন্তু চোখের পাতায় তীব্র রোদ আগুনে হলকার মতো জ্বালা ধরিয়ে দিল। এবার চোখ খুলে ঘুমের চেষ্টায় সে আর চোখ বুজলো না। বরং কান পেতে সে যেন অশ্রুতে নানাপ্রকারের কোলাহল শুনতে পেলো। সেই কোলাহল শুনতে শুনতে সমস্ত জড়তা কেটে গেল, মনে পড়লো সকাল হোয়েছে। মনে পড়লো এই সংসারে সে হোচ্ছে সব থেকে বড়ো। ছোট ছোট চঞ্চল, বেপরোয়া হিংসুটে ছয়টি প্রাণীর মধ্যে সেও একজন এবং তাদের বড়ো বলেই তার পরিচয়। তা না হোলে সে কেউ নয়, বলা যেতে পারা যায় এই যাত্রায় তার দাম কিছু নয়।

বয়স তার তেরো বছর। সাধারণ ছেলের চাইতে মাথায় সে অনেকখানি লম্বা, রোগা আর শ্রীহীন। তাছাড়া ভয়ানক ছটফটে সে। মুখের হাড়গুলো বেশ উঁচু, মুখের ভাব হোচ্ছে সম্পূর্ণ বোকা বোকা। কর্কশ, শিরা বের করা দুটো হাত সকল সময় দুষ্টামি করে বেড়াচ্ছে। বেড়াচ্ছে বললে ঠিক বলা হয় না; বলতে হয় দুষ্টামি খুঁজে বেড়াচ্ছে, বেড়াচ্ছে তিরস্কৃত হবে বলে।

ভাইবোনদের মধ্যে সেই হোল বড়ো। নাম হোচ্ছে জিম। তার থেকে এক বছরের ছোট বোন হোল জেনি। তারপর নবছরের ভাই বোন, আট বছর বয়স হোল পরের ভাই ক্যালের। ক্যালের পরে হোচ্ছে দু বছরের বোন লিজি আর পনের মাসের শিশু পিটার হোল ভাইবোনদের সব থেকে কনিষ্ঠ।

ঘুম ভেঙে যেতে জিমের আস্তে আস্তে মনে পড়লো কোথায় তারা আছে, কেমনভাবে আছে। মনে পড়লো কিসের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। সকালের এই আলো কি রূপ নিয়ে এসেছে। দিন আর রাত্রির বিশেষ কোনো অর্থ তার কাছে নেই। যা আছে তা হোল ওই আঠারোটা জিনিস বোঝাই বড়ো বড়ো ঘোড়া টানা গাড়ী। ওই হোল ওর পৃথিবী। এই পৃথিবীতে ঝগড়া করে, ভাব করে, ঘুমিয়ে, ঘুম ভেঙে জেগে উঠে তার দিন কাটছে। অতীত কিম্বা ভবিষ্যতের কোনো প্রশ্ন নেই। হয়তো কখনো মাত্র একটি মুহূর্তের জন্যে তার মনে পড়ে কোথায় তারা ছিল। তারপর মনে হয় কোথায় তারা চলেছে। কোথায় চলেছে সে সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ধারণা তার নেই। তার মনে নেই সেটা আঠারোশ বাহাত্তর সাল। সামনে বহুদূরে আকাশের রঙ যেখানে দিগন্তের ওপর ঝুঁকে পড়ে গাঢ় নীল হোয়ে গেছে, ওটা যে আকাশ নয় রকি পর্বতমালা, একথারও বিশেষ কোনো অর্থ তার কাছে নেই। এই যে আঠারোটি গাড়ী এই নিয়েই তার জগৎ, এরি মধ্যে সে হারিয়ে গিয়েছিল।

ঘুম ভাঙলো তার এইভাবে। সমস্ত অলসতা সরিয়ে রেখে ফুটে উঠলো রোদের তীব্রতা আর রান্নার গন্ধ। সচেতন হোয়ে উঠলো সে জেনির চাপে। তার পাঁজর এসে ওর হাতের কুনুই চেপে ধরেছে। একটা মুহূর্ত। তারপর সে সজোরে তার কুনুই দিয়ে বোনকে একটা ধাক্কা মারলো। জেনির ঘুম এই ধাক্কায় পাতলা হোয়ে এলো। আর একটা ধাক্কা দিতেই সে আচমকা কেঁদে উঠলো, উঠে যাও বলছি এখান থেকে।

জিম উঠে বসলো। তার রোদে পোড়া পাতলা মুখে একটা দুষ্টামির ছায়া ভেসে উঠলো। দুঠোঁট ফুলিয়ে শিস দিয়ে সে গাইতে শুরু করলো, আহা, সুসান্না লক্ষ্মী-মেয়ে, আমার জন্যে তুমি কেঁদো না......

জেনি পা ছুঁড়তে লাগলো। জিম তার ওপর শুয়ে পড়লো। আর সেই গানের সুর শিসের মধ্যে দিয়ে গেয়ে চললো। হঠাৎ তার চমক ভাঙলো পায়ের শব্দে। মুখ তুলে দেখলো মা এগিয়ে আসছে। লম্বা চওড়া মস্ত চেহারা হোচ্ছে মায়ের। কোলে তার ছোট শিশুটি। চলার ভঙ্গী তার অদ্ভুত, বলতে পারা যায় প্রায় নুয়ে পড়ে হাঁটছে সে। মায়ের এই অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাঁটবার পেছনে ইতিহাস আছে। জিমের সে সব কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো তার এই আঠারোখানা গাড়ী দিয়ে তৈরী পৃথিবীর কথা। এই পৃথিবী সমানে সম্মুখে এগিয়ে চলেছিল। আজ অকস্মাৎ তার গতি নিশ্চল হোয়ে গেছে। তারা একটা প্রাচীর রচনা করে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই প্রাচীরের পারে পরিখা খনন করা হোয়েছে। সেই খনিত পরিখার আশ্রয়ে তারা আত্মরক্ষা করছে, প্রতিহত করছে শত্রুর আক্রমণ। শত্রুর রূপটা জিম একবার ভেবে নিলো। চোখের সামনে তার ভাসলো কতোকগুলো বাদামী রঙের চেহারা, ভাসলো তাদের বিচিত্র চিত্রণ। আর মনে হোল সামনের ধূসর মাটিতে কতোকগুলো তীর এসে বিঁধে গেছে। গতিশূন্য হোলেও সেই তীরের প্রতিহত বেগের স্পন্দন এখনও মিলিয়ে যায়নি—থরথর করে কাঁপছে। শত্রুকে পরাজিত করার কল্পনা তার বোনকে হারিয়ে দেওয়ার চিন্তায় মিশে গেল। ফলে সব কথা ভুলে আনমনে সে শিস দিয়ে চললো, আহা সুসান্না, লক্ষ্মী মেয়ে, আমার জন্যে তুমি কেঁদো না—

—মা, আবার আমাকে ও মারছে।

—কোনো প্রতিবাদ না করে জিম আগেকার মতো শিস দিয়ে চললো। মা ধমকে উঠলো, এই শিস বন্ধ কর। তারপর ছোট ভাইটাকে কোল হোতে নামিয়ে দিলো। সবে সকাল হোয়েছে। তাহলে কি হয় মায়ের মুখে চোখে এরি মধ্যে বেশ ক্লান্তি ফুটে উঠেছে।

জেনি আবার অভিযোগ করলো, ও আমাকে মেরেছে।

—মিথ্যুক! সজোরে প্রতিবাদ জানিয়েই সে নীরব হোয়ে গেল। তার মুখে সেই বোকামির ভাব ফুটে উঠলো যা দেখলে লোকে অনায়াসে বুঝতে পারে কে মিথ্যা কথা বলছে। এবার সকলে ওকে বকবে। এমনও হয়, হয়তো সে সত্যি সত্যি মারেনি। কিন্তু জেনি এমন আরম্ভ করবে যে শেষাবধি না মেরে জিমের পরিত্রাণ থাকবে না। কি জন্যে সে এমন করলো, কেন সে এমন করলো একথা কেউ ভেবে দেখবে না। সকলে বলবে দোষ তার। কেন না সেই তো বড়ো। তাই এই তেরো বছরের লম্বা দেহটার দিকে তাকিয়ে সকলে কথা বলে। কই তার প্রাপ্য সম্মান, বা আসনের মর্যাদা তো দেবার বেলা কারোর মনে থাকে না। তাই না সে সকলকে ঘৃণা করে, ওদের অনুজ্ঞা মাথা পেতে নিতে পারে না।

—জিম! মা চীৎকার করে উঠেন। চীৎকার তো নয় আর্তনাদ, ওরে কারোকে মিথ্যুক বলে তুই নিজে মিথ্যাবাদী সাজিস না, আবার যদি

এমন শুনি তবে ঠেঙিয়ে তোকে মেরে ফেলবো। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মাটিতে মা শুয়ে পড়লো। লম্বায় মা অনেকখানি। তাই এই পরিখার মধ্যে তার দেহ সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত হোতে পায় না। সমস্ত দিন কোনো রকমে কুঁকড়ে দুমড়ে দেহটাকে রোদের আড়াল করে তাকে বেড়াতে হয়।

—দেখো মা, এইখানে আমাকে মেরেছে। জেনির অভিযোগ তখনও শেষ হয়নি। অন্যান্য ভাইবোনেরা জেনির অভিযোগে সায় দিলো। বেন বললো, আমি দেখেছি ও মারছে। জিম ইতিমধ্যে আবার শিস দিতে শুরু করেছে। মা তার গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিলেন, চুপ।

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো সে। তারপর সোজা বেরিয়ে গেল। গায়ে তার জামা কাপড় ঠিক আছে। তবে পা খালি। চড় খেয়ে তার কিছুমাত্র দুঃখ হয়নি। বরং মনে মনে সে বেঁচে গেল। মুখ হাত পা ধুতে হবে না। জামা কাপড়ও বদল করে পরতে হবে না। চড়টা বেশ জোরে লেগেছিল, তখনও গাল জ্বালা করছে। মনে মনে সে ঠিক করলো বেনকে একটি চড় কষিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে তার হাতে কতোখানি জোর আছে। মা পেছন হোতে চীৎকার করে উঠলো, মাথা নীচু কর।

জেনি তার বোকামি দেখে হেসে উঠলো।

মায়ের কথা উড়িয়ে দিয়ে সে সম্পূর্ণ সোজা হোয়ে দাঁড়ালো। মাথায় সে বয়সের অনুপাতে অনেক বেশি লম্বা। পরিখার পাড় ছাড়িয়ে অনেকখানি উঠে গেল তার মাথা। এই পরিখার মধ্যে মাথা নীচু করে রেখে অবশ্য আজ দুদিন তাদের আত্মরক্ষার পালা চলেছে। মাথা উঁচু করার ফলে তার চোখের সামনে কোনো কিছু আর আড়াল রইলো না। পরিষ্কার সে দেখলো নতুন ছাই ঢেলে পরিখার পাড় আরো উঁচু করা হোয়েছে। চারপাশে আঠারোটা চট ঢাকা গাড়ী লোহার শেকল দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। আর সেই গাড়ীর চাকার পেছনে বন্দুক নিয়ে এক একজন শুয়ে আছে।

—জিম, কর, শিগ্‌গীর মাথা নীচু কর বলছি। —মা চীৎকার করতে লাগলো।

জেনি মুখ বাঁকিয়ে বললো, অনেক বড়ো হোয়ে গেছে কি না, তাই নিজের ভালোও বুঝতে পারে না। তাই না মা?

—জিম এখানে ফিরে আয়।

মায়ের আদেশ শুনেও সে ইতস্তত করতে লাগলো। কি করবে সে। চোখমুখ তার লাল হোয়ে উঠতে লাগলো। পরিষ্কার বুঝতে পারলো অন্যান্য পরিবারের লোকেরা তাদের পরিখা হোতে এই ব্যাপার দেখে হাসছে আর তাদের ঘৃণা করছে।

—জিম, মা আবার ডাকলো।

আস্তে আস্তে সে ফিরে গেল। নতুন ছায়ের গাদা তার পায়ের আঙুলের চাপে ভেঙে যেতে লাগলো। মাথা নীচু করে সে এসে দাঁড়ালো। জেনি মুখ টিপে হাসলো, লিজি কিছু না বুঝেও এমন মুখের ভাব করলে যেন তার আর কিছু জানতে বাকি নেই।

—তোর মতোন ছেলে আমি আর দেখিনি। হ্যাঁরে, মাকে কি এমন করে যন্ত্রণা দিতে হয়? —মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

—কি করেছি আমি?—জিম যেন হঠাৎ জ্বলে উঠলো।

জেনি চোখ তুলে বললো, শোনো মা, শোনো ছেলের কথা। কি করেছেন উনি জানেন না।

চুপ।—জিম চীৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর মায়ের হাতের আর একটা চড় সশব্দে এসে পড়লো। তারপর মা একটা কলসী এগিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলো, দেখিস, জল যেন না পড়ে যায়।

কলসীটা নিয়ে পরিখা ছেড়ে সে উঠে পড়লো। মাথা সোজা করে চারপাশ দেখতে দেখতে সে চললো। চলার ভঙ্গীতে তার যেমন বেপরোয়াভাব তেমনি গভীর আগ্রহ রয়েছে চারপাশে কি হোচ্ছে দেখার। প্রথমে চোখে পড়লো শিকলে বাঁধা গোল করে সাজানো গাড়ীগুলো। তার নীচে রাইফেল হাতে ঘামে ভিজে ওঠা সতর্ক প্রহরীর দল। তার বাইরে শুরু হোয়েছে হলদে মাটির ঢেউ খেলানো স্তূপ। সেই মাঠ চলেছে দিগন্তের গায়ে যেখানে সেই অপূর্ব ঘন কালো নীল রঙ জেগে আছে। আর সেই রহস্যঘেরা নীল যবনিকার আড়ালে নাকি শত্রুরা আক্রমণোদ্যত হোয়ে রয়েছে। হঠাৎ তার মনে হোল কলসীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা রাইফেল টেনে নিয়ে ওই গাড়ীর তলায় প্রহরারত মানুষদের দলে গিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর যদি সে আহত হয়? বেশ তো লোকে তাকে বীর বলে জানবে।

তার সমস্ত কল্পনা চুরমার হোয়ে যায় মায়ের চীৎকারে, জিম, জিম, মাথা নীচু করে যা।

সমস্ত গাড়ী আর পরিখাগুলোর ঠিক কেন্দ্রস্থলে চট দিয়ে ঢাকা রয়েছে জলভাণ্ডার। সবশুদ্ধ আট পিপে জল। সব পরিখা থেকে ছেলেরা কলসী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলে কিশোর বয়স্ক। কোনো কাজ তাদের নেই। মায়ের আদেশে বাধ্য হোয়ে জল নিতে এসেছে। পাশ কাটানোর কোনো উপায় নেই কেননা মায়েদের ভয় হোচ্ছে জলের মাত্রা যে কোনো মুহূর্তে কমিয়ে দেওয়া হবে।

জল দিচ্ছিলেন মিঃ জনসন। এক হাত রয়েছে তাঁর জলের পিপের ওপর। মস্ত বড়ো গোঁফজোড়া সারা মুখে যেন ছায়া ফেলেছে। একটা বড়ো হাতা দিয়ে মেপে মেপে জল বের করছিলেন। এই হাতার দু হাতা করে জল প্রত্যহ প্রতিটি লোকের জন্যে দেওয়া হয়। মিঃ জনসন বোধ হয় আজ পর্যন্ত হাজারবার প্রতিটি পরিবারে কতো লোক আছে তা গণনা করেছেন। তবুও তাঁর সতর্কতার শেষ নেই। প্রতিটি হাতা জল দেওয়ার সময় কৃপণের মতো তাঁর হাত কাঁপে।

ছেলেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। পরস্পরের ওপর ঝুঁকে পড়ে তারা নানা রকমের কথা বলছিল, জিগ্যেস করছিল অনেক কিছু। পরিখার গর্তের অসমতলে সোজা হোয়ে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব। তাই সোজা হোয়ে দাঁড়াতে না পেরেও এমনভাব দেখাচ্ছিল যে তাদের কোনো ভয় নেই—সুযোগ পেলে তারা মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে।

—জ্যাক, আবার কি শিগ্‌গীর আক্রমণ হবে?

—আচ্ছা, আক্রমণে যদি আমাদের লোকেরা আহত হয়?

অত্যন্ত সংযতভাবে জল দিচ্ছিলেন মিঃ জনসন।

একজন জিগ্যেস করলো, কিছু জল দাও না জ্যাক, খাবো।

গোঁফজোড়াটা তুলে একটা ঘৃণা মেশানো চাহনী ছুঁড়ে দিলেন মিঃ জনসন। তারপর যেমন মেপে মেপে জল দিচ্ছিলেন তেমনি দিয়ে চললেন।

—ওরা সকলেই ঘোড়সওয়ার, না? আচ্ছা কিভাবে আসে ওরা?

মিঃ জনসন এইবার বোধ হয় রেগে গেলেন জিগ্যেস করলেন, এতো বাজে কথা তোমরা কোথা থেকে পাও?

জিমের পালা এলো। গম্ভীরকণ্ঠে সে বললো, সাত। —সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাকে খুব ভারি করলো। কারণ, তাদের পরিবার হোচ্ছে বেশ বড়ো। খুব কম পরিবার সাতজনের জন্যে জল চাইতে পারে।

ধীরে ধীরে জনসন জল মেপে দিলেন।

—কি সুন্দর জল! —জিম একটু ইতস্তত করে বললো, ভারি ঠাণ্ডা, আমি খাবার জন্যে একটু পাই না?

—খেতে পারো। তবে সেই খাওয়াটা চুরি হবে। —জনসন উত্তর দিলেন।

গাড়ীর নীচে যে লোকেরা রাইফেল হাতে শুয়েছিল তাদের দেখিয়ে জিম বললো, ওরা যখন ইচ্ছে জল খাচ্ছে।

—ওদের মতোন গাড়ীর তলায় তুমি শুয়ে থাকতে পারবে?

—বোধ হয় পারি।

—থুঃ। —মিঃ জনসন ঘৃণাভরে থুথু ফেললেন। জিমের মনে হোল আগুনের ঝলক লেগে তার দুটো কান পুড়ে গেল। সে পেছন ফিরে দুহাতে ভারি কলসীটা বয়ে নিয়ে চললো। জনসন ডেকে বললেন, সাবধান, জল যেন তোমার মায়ের কাছে পৌঁছায়।

জনসনের গোঁফজোড়া ঢাকা মুখের ঘৃণা মেশানো চাহনী, ছেলেদের হাসি, চড়া রোদ, ধুলো আর কাছাকাছি আঠারোটা পরিবারের কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে জর্জর করে ফেলতে লাগলো। তার ওপর জেনি তার দিকে ছুটে এলো, চীৎকার করে বলে উঠলো, দেখো, দেখো, জল ছলকে পড়ে যাচ্ছে। সংগে সংগে সে জিমের চারপাশে লাফাতে লাগলো।

জিম চীৎকার করে উঠলো, সরে যা, হাত ফসকে যাবে।

মা সতর্ক করে দিলেন, জিম—সাবধান!

মায়ের কথা কানে পেঁাছানোর আগেই সে পড়ে গেল। জল গড়িয়ে গেল বাদামী রঙের মাটির কাদা তৈরী করে। সে ভিজে গেল, জেনিও ভিজলো। কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর সে কেমন আবিষ্টের মতোন উঠে দাঁড়ালো। সমস্ত দেহ তার যেন পুড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে সব পরিখা হোতে প্রতিটি চক্ষু সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। শূন্য কলসীটা সে তুলে নিলো, একবার নেড়ে চেড়ে দেখলো। এমন সময় মা এসে সামনে দাঁড়ালো।

দেওয়ার মতো কোনো কৈফিয়ৎ তার নেই। নিশ্চল পাথর হোয়ে কলসীটা হাতে নিয়ে মাথা নীচু করে সে দাঁড়িয়ে রইলো। মুখ তুললো মায়ের কথায়, শুনলো মা বলছে, সাতজনের জল—মায়ের গলার স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ, প্রায় শোনা যায় না বললে হয়।

সে জানে প্রতিটি পরিখা হোতে প্রতিটি চক্ষু তার দিকে তাকিয়ে আছে। আরো জানে মা তার সামনে দাঁড়িয়ে। তবু তার মনে হোল কেউ নেই। এই সূর্যতপ্ত বিশাল প্রান্তরে সে নিরাশ্রয়, সে সম্পূর্ণ একাকী। নিজেকে সে আর শান্ত করে রাখতে পারে না। তার হাত পা কান পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতো তার করবার নেই।

মা আর একবার যেন নিজেকে শুনিয়ে বললো, সমস্ত দিনের জল।

—আমি মিঃ জনসনের কাছে যাচ্ছি—যদি তিনি—

—না, তোমাকে যেতে হবে না। আজ আমরা জল না খেয়ে কাটাবো।

মায়ের মুখের প্রতি তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হোল গলায় কি যেন আটকে গেছে। তার ইচ্ছে হোল চীৎকার করে সে কেঁদে ওঠে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে কাঁদতে পারলো না। হঠাৎ সে পেছন ফিরে পরিখা পার হোয়ে চললো। সকলে তার দিকে চাইছে সে জানে। কিন্তু সে কোনো দিকে না চেয়ে দ্রুতবেগে সকলকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। জনসন আর জলের পিপেগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে কাঠের চিহ্নিত তিনটে কবর সে অতিক্রম করলো। তারপর আরো এগিয়ে যেখানে চটের তাঁবুর নীচে সাতজন আহত লোক পড়ে ছিল, তাদেরও ছাড়িয়ে চলে গেল সে।

পরিখা খুঁড়ে বাইরে যে মাটি ফেলে দেওয়া হোয়েছিল সেই মাটির গাদায় পিঠ দিয়ে কতোক্ষণ যে সে বসে রইলো তার ঠিক নেই। হাঁটু দুটো গুটিয়ে হাতের বেড় দিয়ে খালি পা সেই আলগা মাটিতে ঢুকিয়ে নিস্তব্ধ হোয়ে সে বসেছিল। পেছন হোতে প্রখর রোদ এসে ঘাড়ে লাগছিল—ফলে সমস্ত ঘাড় যেন রক্ত জমে গাঢ় লাল হোয়ে গিয়েছিল। সেই আঠারোটা গাড়ীর আর পরিখার সংসার বোধ হয় তার কথা একেবারে ভুলে গেল। সূর্য আরো মাথার ওপর উঠলো—বেলা বাড়লো। সকাল বেলার খাবার তৈরী হোল। খাওয়া এক সময় শেষ হোল। সকলে জল খেলো। ওর দুঠোঁট তখন শুকিয়ে উঠেছে—ফেটে যাচ্ছে, গলায় বিন্দুমাত্র সরসতা নেই, সব কিছু জ্বলে গেছে। মনে হোল যা হোক একটা কিছু ঘটুক। যদি সে আক্রান্ত হয়, তাই হোক। এই আক্রমণ থেকে কেউ যদি তাকে রক্ষা করতে পারে ভালো, আর তা না হোলে যুদ্ধ করতে গিয়ে সে যেন মারা পড়ে। নিজের জন্যে তার দুঃখ বোধ হোতে লাগলো, করুণায় নিজেকে সে আরো ভালো বলে মনে করলো। আর সেই কারণে ভাইবোনদের ওপর বিদ্বেষ আরো বেড়ে গেল।

মুখ তুলে দেখলো যে মা তার দিকে আসছে। সেই অর্ধনত ভঙ্গীতে ঝুঁকে পড়ে নীচু হোয়ে সে আসছে। হাতে তার একটা রেকাবে সিদ্ধ বীন আর এক পেয়ালা জল। আস্তে আস্তে সামনে এসে সে জলের পেয়ালাটা ওর মুখের কাছে ধরলো।

—আমার জলতেষ্টা পায়নি।

—তা হোক। খা। মায়ের কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট সে ভিজিয়ে নিলো। তারপর শিস দিয়ে গাইতে শুরু করলো, আহা, সুসান্না, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না......

আগুনে যেমন সময় সময় দপ্ করে জ্বলে ওঠে, মা তেমনি কি বলতে যাচ্ছিল। কথাগুলো অবশ্য নতুন কিছু হোত না, সেই পূর্ব পরিচিত তিরস্কারের স্রোত বয়ে যেতো। কিন্তু না অকস্মাৎ নির্বাক হোয়ে মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হোল ওর এই উচ্ছল জীবন যাপনের মধ্যে আজ যেন সর্বপ্রথম কি সে খুঁজে পেয়েছে, মনে হোয়েছে বাইরে থেকে ওকে যেমন দেখায়, ও অন্তরেও তেমন নয়। মায়ের চোখের চাহনী পালটে গেলঃ একটা পরিতৃপ্তির আলো যেন আশ্বাসভরা নতুন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠলো।

আপন মনে মাথা নেড়ে মাটিতে সেই বীনের রেকাব আর জলের পেয়ালা নামিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। চলে যেতে যেতে কানে গেল জিম শিস দিচ্ছে, আমার বুকের ওপর ব্যাঞ্জো চেপে আমি আলবামা থেকে এসেছি...

সময় কাটতে চায় না। মাথার ওপর থেকে রোদও সরে না। সিদ্ধ বীনের রস শুকিয়ে গাগুলো গরমে ফেটে পড়লো। ধুলো পড়ে পড়ে পেয়ালার জলের রঙ গেল পালটে। সমস্ত পরিখার চাঞ্চল্য এক সময় নিস্তেজ হোয়ে পড়লো। মেয়েরা, ছোট ছেলেমেয়েরা পরিখার মধ্যে নীরব হোয়ে আক্রমণের আশঙ্কায় বসে রইলো। এইভাবে গত দুদিন তারা বসে আছে গাড়ীর আড়ালে গর্তের মধ্যে। একবার বিদ্যুতগতিতে আক্রমণ হোয়েছিল। ফলে মারা পড়েছে তিনজন, আহত হোয়েছে সাতজন। সেই থেকে প্রতীক্ষা চলেছে আক্রমণের। মাঝে মাঝে আশা জাগছে সাহায্য আসবে, মুক্তি পাওয়া যাবে। তারপর সে আশা মিলিয়ে যাচ্ছে, মনে হোচ্ছে মরণ ছাড়া এখান থেকে যাওয়ার ছাড়পত্র আর কেউ দিতে পারবে না। সূর্য কিন্তু সমানভাবে জ্বালাময়ী রোদ ঢেলে দিচ্ছে। ওর যেন কোনো গতি নেই, এদেরি মতোন কোথাও যাওয়ার পথ নেই।

প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে তার, আর ক্ষিধের থেকে জলতেষ্টা পেয়েছে অনেক, অনেক বেশি। বার বার সে সেই বীণ আর জলের প্রতি তাকিয়ে দেখলো। শিস দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত যখন আর গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোলো না, তখন ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে চুপ করে বসে রইলো সে।

সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লো। ক্ষুদ্র ছায়া দীর্ঘ হোতে দীর্ঘতর হোয়ে উঠতে লাগলো। প্রতীক্ষাকাতর, শ্রান্ত লোকেরা পরিখার মধ্যে নিশ্চল হোয়ে শুয়ে রইলো। সেই অখণ্ড স্তব্ধতা শুধু মাঝে মাঝে আহতদের আর্তনাদে অথবা মৃতদের পরিজনের কান্নায় ভেঙে যেতে লাগলো।

হামাগুড়ি দিয়ে বেন একবার তার কাছে এসেছিল। জিম তার দিকে ফিরেও চায়নি।

—সাতজনের জল নষ্ট করছো। বেন কথাটা মনে করিয়ে দিলো।

জিম ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিলো। ইচ্ছে হোল আবার শিস দিতে শুরু করবে।

—সাতজনের জল।

—শয়তান! গলা দিয়ে সব কথাটা বেরোলো না জিমের। গলা তার শুকিয়ে গেছে—তার ওপর ঘৃণা যেন আরও মর্মান্তিক হোয়ে উঠেছে।

হাসিতে বেনের মুখ ভরে গেল। আবার সে বললো, সাতজনের জল। তারপর যেমন সতর্কতার সংগে সে এসেছিল ঠিক সেইভাবে ফিরে গেল।

কোথা হোতে এক ঝাঁক মাছি এসে বীনগুলোর ওপর বসলো। দেখা গেল পিঁপড়েরাও দল বেঁধে আসছে। হঠাৎ জিমের পেটে কে মোচড় দিলোঃ ভীষণ ক্ষিধেয় বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে যাচ্ছে।

যখন সে জলের পেয়ালাটা তুলে নিলো, তখন ছায়া অনেক দীর্ঘতর হোয়ে গেছে। সে অত্যন্ত সাবধানে পেয়ালাটা বয়ে নিয়ে চললো। পাহারার পরিখার উঁচু মাটি পার হোয়ে অতি ধীরে ধীরে প্রায় বুকে হেঁটে চললো সে। সকল সময় কিন্তু তার সজাগ দৃষ্টি রয়েছে জলের পেয়ালার ওপর। আস্তে আস্তে সে ঘোড়া ও বলদের আস্তানা অতিক্রম করে ছটা কি সাতটা গাড়ীর পরে বাবাকে দেখতে পেলো।

বাবাকে সে কখনো পছন্দ করতো না। কেমন করে পারবে। বাবা হোল কাজের মানুষ। সকল সময় কাজ নিয়ে আছে সে। যখন লাঙলের কাজ রইলো না, তখন কাঠ চেলাই-এর কাজ শুরু হোলো। তারপর বানানো হোল কোদালের হাতল। কাজের ধারা এইভাবে বয়ে চলেছে। কাজ শেষ হোলে টেবিলে বসে নীরবে প্রচুর পরিমাণে খেতো। মিষ্টি কথা বলতে কিম্বা আদর করতে সে জানে না। দোহারা চেহারা—কখন লাঙল চালাচ্ছে, কখনো বা ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাচ্ছে। ভাইবোনদের বিরুদ্ধে যেমন তার অসন্তুষ্টি ছিল, তেমনি বাপকেও সে ভালোবাসতে পারতো না। সময় সময় মনে হোত বড়ো ছেলে হিসাবে বাবা তাকে নিয়ে খুশী হোতে পারেনি। হয়তো সেই কারণে স্বল্পভাষী মানুষ, কথার বদলে যখন তখন চড়-চাপড়টা জিমের ওপর বর্ষণ করা বেশি পছন্দ করতো।

এই হোচ্ছে তার বাবা। সেই বাবার কাছে কেন যে সে এইভাবে জল নিয়ে চললো, একথা ভাবতে তার আশ্চর্য লাগছে।

বাবার কাছে গিয়ে দেখলো সেই পরিচিত বাবা কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। গাড়ীর ছায়ার চাকার ফাঁকে রাইফেলের মুখ বার করে দিয়ে নিঃস্পন্দ হোয়ে যে পড়ে রয়েছে, সে অন্য জগতের মানুষ। জলের পেয়ালাটা জিম নাকের কাছে তুলে ধরলো ঃ একটা ধুলো মিশানো ঝাঁঝালো গন্ধে সমস্ত মস্তিষ্ক ভরে গেল। হঠাৎ তার মনে হোল বাবার কাছে অনেক কথা জানবার আছে। কেননা আজ অকস্মাৎ সে যেন এইখানে এসে বুঝতে পেরেছে কি রহস্যময় বন্ধন দিয়ে এই লোকটির সঙ্গে সে বাঁধা রয়েছে। মানুষের সঙ্গে কোথায় তার সংযোগ। কেন তার ভাইবোনেরা এসেছে, কেন তারা আজ পশ্চিমাভিমুখে এই বিপদসংকুল যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে। আর যাদের সে প্রচণ্ড ঘৃণা করে তারাই বা তার ভাইবোন হোল কেন?

রৌদ্রের তাপ তখনও ভীষণ। কিন্তু সেদিকে তার দৃকপাত নেই। ও তখন নিজের এই আবিষ্কারের মধ্যে তলিয়ে গেছে। ভুলে গেছে ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা, ভুলে গেছে সারা সংসারের কাছে সে অপাঙক্তেয়। সে আজ এই মুহূর্তে এক নতুন রহস্য রাজ্যের সিংহদ্বার উন্মোচিত করেছে, সে যেন পরমাত্মীয়দের খুঁজে খুঁজে বুকে তুলে নিচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বাবার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো। দেখলো বুকের তলা হোতে বাবা বাঁ হাত সরিয়ে নিলো। তারপর অতি সাবধানে আড়ষ্ট ডান পা টেনে সোজা করে দিলো। পা সোজা হোলে সমস্ত দেহটাকে সটান করে শুইয়ে ফেললো। অন্যান্য লোকেরা মাঝে মাঝে কথা বলছে। তার বাবা কিন্তু নীরব—নিঃশব্দে রাইফেল হাতে শুয়ে আছে।

হামাগুড়ি দিয়ে বাবার কাছে যেতে চাইলো সে। কিন্তু না, কোথা হোতে এক দুরতিক্রম্য বাধা এসে তাকে গতিহীন করে দিলো। এমন বাধাই এসেছিল যখন তার মা বাঁন আর জল দিতে এসেছিল। তার এই তের বছরের মধ্যে আজ সর্বপ্রথম দিন বাবা আর মায়ের দুঃখ যেন সে বুঝতে পারলো।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো দূরে হলদে মাটি ফুঁড়ে দলে দলে লোক বেরিয়ে আসছে। বুঝতে পারলো সে, ওই ওদের জন্যে এই স্বতন্ত্র পাহারা চলেছে। ছুটোছুটি করলো না, অথবা ভয় পেলো না সে। জলের পেয়ালাটা বুকের কাছে চেপে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে দেখলো ওই লোকগুলো ঘোড়া চালিয়ে চক্রাকারে সাজানো আঠারোখানা গাড়ীর দিকে সবেগে এগিয়ে এলো। বালুতীরের ওপর উদ্দাম তরঙ্গ যেমন বেপরোয়াভাবে লাফিয়ে পড়ে ঠিক সেইভাবে ওই ঘোড়সওয়ারেরা রাইফেলের দুর্ভেদ্য বাধা অগ্রাহ্য করে আক্রমণ শুরু করলো।

কতোক্ষণ ধরে লড়াই হোল সে কথা তার মনে নেই। কয়েক মিনিট হোতে পারে, কয়েকঘণ্টাও হোতে পারে। কিছুই তার মনে নেই। সে সময় বোধ হয় তার চেতনা ছিল না, জীবনের স্পন্দন যেন থেমে গিয়েছিল। বাবার সঙ্গে এক হোয়ে গিয়ে সে শুয়ে থাকার ভঙ্গী বদল করেছিল, নিশানা ঠিক করে বার বার গুলী ছুঁড়েছিল। তার বাবার মতোন সেও ভাইবোনদের জন্যে গভীর আশংকায় কেঁপে উঠেছিল, উদ্বেগে অভিভূত হোয়ে পড়েছিল। বার বার হানাদারেরা গাড়ীর কাছ বরাবর এগিয়ে এলো। বাবার কর্মঠ কর্কশ হাত দিয়েই বার বার তাদের লক্ষ্য করে তার রাইফেল গর্জে উঠলো। ছিন্নভিন্ন হোয়ে হানাদারেরা পালিয়ে গেল, তারপর আবার এলো। ভীষণ হুংকার তুলে আকাশ কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো, ছুঁড়লো অসংখ্য ছোট ছোট সূচ্যগ্রমুখী বর্শা। মাঝে মাঝে গুলী এসে তার আশেপাশে মাটিতে বিঁধে কাদা ছিটকে তুললো। একবার একটা তীর এসে ডান হাতের কনুয়ের পাশে মাটিতে ঢুকে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। আর এক ইঞ্চি সরে এলে মাটির বদলে ওর হাতে সেটা বিঁধে যেতো।

তার বাবার ঘাড়ের নীচে যখন তীরটা এসে বিঁধলো, তখন সে সম্পূর্ণ সজাগ। ঠিক কাঁধের ওপর তীর বেঁধার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হোল বাবার ঘাড় নয় তার নিজের দেহে ওই তীক্ষ্ণ শাণিত ফলা এসে বেগে বিঁধে গেছে, আর তারি আগুনের দাহ সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে।

বুকে হেঁটে সে সামনে এগিয়ে চললো হাতে তার জলের পেয়ালা। ধুলো পড়ে পড়ে জল হলদে হোয়ে গেছে ঃ পেয়ালার তলায় বালি জমে উঠেছে—একটা ধুলোর সর ভাসছে জলের ওপর।

উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হোয়ে গেছে বাবা। জিমের খালি পায়ে রাইফেলের নলটা ঠেকতে সে শিউরে উঠলো ঃ নলটা এখনও গরম। মনে মনে সে ভাবলো, কি আশ্চর্য, এখনও সে এমন কথা মনে করতে পারছে।

তাকে দেখে বাবা রীতিমতো বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হোয়ে উঠলো। কোনো রকমে সে বললো, একি জিম—তুমি এখানে এলে কেন?

বাবার মুখের প্রতি একবার মাত্র চেয়ে সে বুঝতে পারলো মৃত্যুর কালোছায়া ওই মুখে পর্দা টেনে দিচ্ছে। তবুও তার যেন কি হোল জিজ্ঞেস করবার, বলবার তার যে লক্ষ লক্ষ কথা ছিল সে সমস্ত মুখে না এনে আস্তে আস্তে সে বললো, আমি তোমার জন্যে জল এনেছি।

—এইখানে! ছিঃ, ছিঃ জিম, এখানে এই লড়ায়ের মধ্যে আসা কি তোমার উচিত হোয়েছে।

কি আশ্চর্য, জিম কাঁদতে পারলো না কেন জানে না, মনে মনে কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে এ জীবনে আর কোনোদিন সে কাঁদবে না। বাবার অভিযোগের উত্তরে নত কণ্ঠে সে বললো, আমার মনে হয় তোমার জলতেষ্টা পেয়েছে বাবা!

—জলতেষ্টা?

—আমার কাছে এক পেয়ালা জল আছে—যদি তুমি খাও।

অতি সাবধানে ধীরে ধীরে সে জলের পেয়ালা নামিয়ে রাখলো। চোখের ওপর তার সকালের সেই ঘটনা ভাসছে ঃ সাতজনের জল সে নষ্ট করেছে। কাঁধের নীচে দিয়ে একটা হাত গলিয়ে বাবাকে সে সামান্য উঁচু করে তুললো। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়লো যন্ত্রণায় বাবার মুখ কালো হোয়ে উঠছে।

—খুব লাগছে বাবা?

—ও কিছু না, জিম। বাবা আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে গাড়ীগুলোর বাইরে চেয়ে দেখলো। চোখে পড়লো লড়াই শেষ হোয়ে গেছে, হানাদারেরা পালিয়েছে। মাঠের ওপর

তোকগুলো সওয়ারহীন ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে কতোকগুলো মানুষ গড়াগড়ি দিচ্ছে।

—ও কিছু না, জিম। আপন মনে বাবা গুলো আর একবার বললো।

—আমি যে জল এনেছি বাবা।

আবার বাবার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হোয়ে লো। অস্পষ্ট স্বরে সে বললো, আচ্ছা কটু জল দাও।

বাবার ঠোঁটের কাছে জলের পেয়ালাটা তে তার আঙুলে বাবার লম্বা দাড়ি কলো। সংগে সংগে একটা অদ্ভুত শিহরণে র গা কেঁপে উঠলো ঃ মনে হোল এই তার বা।

—জলটা বড়ো মিষ্টি, জিম।

—সবটা খেয়ে ফেলো।

—একটু একটু লাগছে জিম, কেমন যেন শীত করছে।

—ও কিছু নয়, তুমি সেরে যাবে, বাবা।

—না, না, তোমায় ভাবতে হবে না জিম!

—না, বাবা, আমি মোটে ভাবিনি।

—আর একটু জল দেবে—

পেয়ালায় আর জল নেই। জিম বাবার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো। মুখের রেখাগুলো আরো স্পষ্ট, আরো গভীর হোয়ে উঠেছে, অপলক চোখের চাহনী লক্ষ্যহীন। সে আস্তে আস্তে বাবার নরম লম্বা দাড়ি, আর শুকনো ঠোঁটের ওপর আঙুল বুলিয়ে গেল।

—জিম!

মুখ তুলে সে দেখলো সকলে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কে জানে কতোক্ষণ হোল ওরা এসে দাঁড়িয়েছে। তার কিন্তু মোটে ভালো লাগলো না ওদের উপস্থিতি, মনে হোল ওরা যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে।

—জিম, উঠে এলে ভালো হয়।

মাথা নাড়লো জিম ঃ না। যা হয় হোক, তার মন বললো, এখানে বাবার কাছে থাকাই এখন উচিত।

—উঠে এসো জিম!

—না, আমি এখানে আছি, আপনারা মাকে ডেকে আনুন।

ওদের চোখের নীরব চাহনি কি যে জানালো তা সে বুঝতে পারলো না।

আর কোনো বাদপ্রতিবাদ না করে সে উঠে দাঁড়ালো। মনে মনে অবশ্য সে তখনও স্থির করতে পারছে না যাবে কি না। বুড়ো ক্যাপ্টেন ব্র্যাডি এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

পরিখার বাইরে মাঠে মা শুয়ে আছে—আগাগোড়া কম্বলে ঢাকা ওরা কম্বলটা সরিয়ে নিলো। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে দেখলো মায়ের মুখ গভীর শান্তিতে সুন্দর হোয়ে রয়েছে। দুটি চোখ নিমীলিত, মুখের ওপরের সেই সব ক্লান্ত রেখা মুছে গেছে। বাবার মুখের সঙ্গে কোনো তুলনা হয় না। ঠোঁট দুটি একটুও শুকিয়ে ওঠেনি। মনে মনে সে ভাবলো, কই কোনোদিন কি ওই ঠোঁট দুটি তাকে কেনো কঠিন কথা বলেছে। সে আস্তে আস্তে আঙুলের ডগা দিয়ে দুটি ঠোঁট স্পর্শ করলো। কি ঠাণ্ডা দুটি ঠোঁট। সেই শীতলতা ওর সারাদেহে ছড়িয়ে গেল—সে যেন ভয়ে জমে গেল। না, মা মারা গেছে বলে সে ভয় পায় না। তার ভয় হোচ্ছে অন্য জায়গায়, সম্পূর্ণ অন্য জাতের। এই মুহূর্তে সে বুঝতে পেরেছে মা বাবা তাদের কাছে কি ছিল। কেমন করে কি দুঃখ, বেদনা আর কষ্টের মধ্যে দিয়ে জন্ম হোতে তারা ওদের লালন করে চলেছিল, চলেছিল ওদের দুঃখের কালোরাত্রি পার করে পশ্চিমে পেঁছে সোনার সূর্যোদয়ের সুখ এনে দিতে।

—আমার খোঁজে পরিখার বাইরে এসেছিল। জিম অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো।

ক্যাপ্টেন ব্র্যাডি বললো, কেঁদে কোনো লাভ নেই, জিম।

জিমের চোখের সামনে একখানা ছবি ভেসে উঠলো। ছায়ার মতো অস্পষ্ট সে ছবি। ওরা জেনি, বেন, ক্যাল, লিজি সকলেই রয়েছে—তার ভাইবোন। এক রক্ত ওদের শিরায় বইছে, এক গর্ভে ওদের জন্ম। ওরা এক বৃক্ষের ফল, এক চিন্তার ধারা, এক ঈর্ষা, এক কুটিলতা ওদের জীবনে মুখরিত হোয়ে উঠেছে।

—না, আমি কাঁদি নি। জিমের গলার আওয়াজ অত্যন্ত গম্ভীর, বয়েসের অনুপাতে অতীব কঠিন। ভাইবোনদের দিকে আঙুল তুলে সে হুকুম করলো, এখান থেকে সব পালাও!

সন্ধ্যার দীর্ঘছায়া নেমে এসেছে। বিলীয়মান আলোয় গাড়ীগুলো অস্পষ্ট হোয়ে উঠছে। রৌদ্রদগ্ধ মাঠের বুকে অল্প অল্প বাতাস বইতে আরম্ভ হোয়েছে।

ভাইবোনদের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। তারপর ওরা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে সরে গেল। সরে যাওয়ার সময় জেনি কাঁদতে লাগলো, বেন-ভয় পেয়ে চুপ করে রইলো। ক্যাল শুধু পেছন ফিরে বার বার মায়ের মুখের প্রতি তাকাতে লাগলো। সে মুখ নির্বাক, নিশ্চল।

ক্যাপ্টেন ব্র্যাডি কথা বলতে শুরু করলো, ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই জিম। মানুষের মতোন তোমাকে সব সইতে হবে। হ্যাঁ, মানুষের মতোন সব—সব সইতে হবে। দেখো, আমরা কেউ ভাবিনি এমন ঘটতে পারে। আমরা নতুন কোনো জায়গায় নতুন ঘরবাড়ী তৈরী করতে বেরিয়েছিলুম। আমরা নতুন বাড়ীর স্বপ্নই দেখেছিলুম। আমার মনে হয় আমাদের কেউ এমন কিছু প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু আমরা যা ভাবতেও পারিনি তাই ঘটেছে। হ্যাঁ, তাই ঘটেছে। দেখো, যখন এমন প্রচণ্ড দুঃখের দিন আসে, তখন তাকে সহ্য করতে হয়, হাসিমুখে তার প্রতি তাকিয়ে দেখতে হয়। তা না হোলে সে দুঃখের হাত থেকে তোমার কোনো পরিত্রাণ নেই,—সে তোমাকে ভেঙ্গে চুরে নিঃশেষ করে দিয়ে যাবে।

—মা আমার খোঁজে বাইরে এসেছিল। —জিম আপন মনে বলতে লাগলো, মা জানতো আমি বাইরে বসে আছি, তাই আমাকে নেওয়ার জন্যে এসেছিল। আজ সকালে আমি সাতজনের জল নষ্ট করেছিলুম, তবুও আমার জন্যে জানি না কোথা থেকে এক পেয়ালা জল এনেছিল।

ভারি নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে কেঁপে উঠলো সে—মনে পড়লো তার বাবার কথা। মুখ নীচু করে সে বলতে লাগলো, আমি এক পেয়ালা জল দিতে তার কাছে গিয়েছিলুম। জীবনে কোনোদিন আমি অমন কাজ করিনি। কখনো, কোনোদিন আমি তার জন্যে কিছু করিনি। অন্তত আজ যেমন জল নিয়ে গিয়েছিলুম, তেমন কিছু। জল নিয়ে গিয়েও আমি তাকে দেওয়ার সাহস করে উঠতে পারিনি। ভয় হোচ্ছিল আমাকে সে বকবে, বলবে কেন আমি পরিখার বাইরে এসেছি। আমি বড়ো ভীতু—

ক্যাপটেন ব্র্যাডি বাধা দিলো। বললো, শোনো জিম, ওরা এখন চিরশান্তিতে ঘুমোচ্ছে। কেউ ওদের আর জাগাতে পারবে না, পারবে না শান্তিভঙ্গ করতে। কিন্তু দেখো আমাদের কাজ শেষ হয়নি। আমাদের খাবার কমে এসেছে, জলেও টান ধরেছে। হয়তো আবার আক্রমণ হবে, আবার নাও হোতে পারে। আমার মনে হয় এই লড়াইটা ওদের সকাল পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে রাখবে। এখান থেকে স্মিথের কেল্লা প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। আমরা আজ সারারাত ওই দিকে এগোতে চাই। হয়তো ভোরের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেঁছাবো, হয়তো পেঁছাতে পারবো না। কিন্তু যাত্রা আমাদের বন্ধ হবে না। তোমাকে এখন অনেক কিছু ভাবতে হবে। আমরা ঠিক করেছি তোমার ভাইবোনদের ভার কয়েকজনের ওপর দেবো। মানে প্রত্যেক গাড়ীতে একজন কি দুজন করে তোমাদের ছড়িয়ে দেবো—

—আমাদের নিজস্ব একটা গাড়ী আছে।

—ঠিক কথা। তবে কি জানো, অনেক দূর যেতে হবে। ভেবে দেখো জিম, অ-নে-ক দূর।

—না, আমার কাছে এমন কিছুই দূর নয়।

—জিম, এখন পাগলামির সময় নয়—

—পাগলামি। হোতে পারে আমি পাগলামি করছি। কিন্তু ক্যাপটেন, আমরা ভাইবোনেরা ছাড়াছাড়ি হবো না। আমাদের গাড়ী আছে, আমাদের ঘোড়া আছে। আমরা আমাদের গাড়ী করেই যাবো।

—ছোট বাচ্চাটার কি হবে?

—আমার মনে হয় জেনি ওকে দেখতে পারবে।

—আঃ জিম, ওরে মুখ্যু, আঃ কাকেই বা বলি, তুই দুধের ছেলে কোথাকার—

—হ্যাঁ, আমি দুধের ছেলে। তাই না মা আমাকে নেওয়ার জন্যে পরিখার বাইরে এসেছিল। আর এসেছিল বলেই না তাকে আমি হারিয়েছি। মা জানতো মরবে, তবুও সে এসেছিল।

—মুখ্যু, বোকা কোথাকার!

—ঠিক কথা ক্যাপটেন। তবে আমার ভাই-বোনদের আমি কোথাও যেতে দেবো না।

মুখ্যু, বোকা! তাই, তাই হবে। যাও গাড়ীতে ঘোড়া জোতো গে।

আশ্রয় পরিখা পেছনে ফেলে যখন সেই আঠারোখানা গাড়ী যাত্রা শুরু করলো, তখন মাঠের বুকে অন্ধকার ঘন হোয়ে উঠেছে। গাড়ীর সারিতে জিমের গাড়ীর সংখ্যা হোচ্ছে ষষ্ঠতম। তার হাতে চারঘোড়ার লাগাম রয়েছে। সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যেও তার কুৎসিত, অদ্ভুত রোদেপোড়া চেহারা দীর্ঘাকার নিয়ে সমুন্নত ভংগীতে জেগে উঠেছে। হাতে লাগাম নিয়ে ঘনপত্রী ছাতিম গাছের মতোন দৃঢ় এবং গম্ভীর হোয়ে সে বসে আছে। মনেপ্রাণে সে জানে গাড়ীর পাঁচটি অসহায়, সন্ত্রস্ত অথচ সন্দেহাকুল জীবনের সেই একমাত্র রক্ষাকর্তা, সেই একমাত্র পরিচালক।

ঘোড়ার ক্ষুরের সংগে গাড়ীর চাকার ঘড়ঘড়ানি জেগে উঠতেই সে সমস্ত দুঃখ আর শোক মুছে ফেলতে চাইলো। সমস্ত আশঙ্কা দু পায়ে মাড়িয়ে সে চাইলো এগিয়ে যেতে। হ্যাঁ, দুঃখ, শোক, আর আশঙ্কাকে জয় করতে হবে। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন ওরা যেন তার জীবনে আসন না পায়। আজ ভাইবোনদের মধ্যে ও আর কেউ নয়—ওদের দলছাড়া সে আজ অন্য মানুষ। একবার শুকনো ঠোঁটে সে জিভ বুলিয়ে নিলো। তারপর ঘোড়ার রাশ আলগা করে দিয়ে শিস দিয়ে চললো, আহা, সুসান্না লক্ষ্মী মেয়ে, আমার জন্যে তুমি কেঁদো না।...

অনুবাদক—সমীর ঘো[ষ]

বক্সা ক্যাম্প

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

সন্ধানী লোকেরা বলিয়া গিয়াছেন, 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই।' কারণ, 'মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।' সিঁদুর মাখা পাথর বা গাছ দেখিলেই যে লোকেরা প্রণাম করিয়া বসে, তার কারণও ইহাই। কে জানে, কোন্ দেবতা কোন্ ঘরমে বৈঠতা হ্যায়, তার তো নিশ্চয়তা নাই। বিশ্বাস করিয়া একটি প্রণাম জমা করিয়া রাখা গেল, হয়তো মিলিলে মিলিতেও পারে।

এত কথায় আমাদের আবশ্যক কি! যাঁহাকে শ্মশানের পিশাচ মনে করিতেছি, তাঁহার গায়ের ও জটার ছাই-ভস্ম মার্জনা করিয়া লইলে হয়তো দেখা যাইবে যে, তিনি আর কেহ নহেন—স্বয়ং শিব। অতএব, ছাই দেখিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে নাই, উড়াইয়া দেখিতে হয়।

ছাই উড়াইয়া আমরাও রত্ন পাইয়া গেলাম। রত্নটির নাম গোবিন্দ, পদবী আজ আর স্মরণে নাই। বক্সা ক্যাম্পে আমরা ছিলাম বাবু। বাবু থাকিলেই চাকর-বাকরও অবশ্যই থাকিবে। জেলে কয়েদীরাই বাবুদের ঠাকুর, চাকর, বেয়ারা ইত্যাদির কাজ সম্পাদন করিত। এখানে বাহির হইতে পাচক ও চাকর আমদানী করা হইয়াছিল। গোবিন্দ ছিল তাদেরই একজন। পরে অবশ্য জানা গেল যে, সে শুধু একজন নহে, বিশেষ একজন।

যে বাড়িতে রান্নাঘরের ব্যবস্থা ভালো, সে বাড়িতে স্বচ্ছল পরিবার বসবাস করিয়া থাকে, ইহা অনুমানেই মানিয়া লওয়া চলে। আর মানিয়া লওয়া চলে যে, সে পরিবারে সুখ বর্তমান। আমরা সুখী পরিবার ছিলাম। এই সুখের জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব একক দক্ষিণাদার (মিত্র)। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কবি কালীপদ-বাবু লিখিয়াছিলেন, 'ধরে নাই পেটে তবু দক্ষিণাদা, ডেটিনিউ সংসদে সকলের মা।' কথাটার মধ্যে একরত্তি বাড়তি নাই, একেবারে খাঁটি কথা। রন্ধন বিদ্যায় তিনি এতখানি পারঙ্গম ছিলেন যে, যে-কোন গৃহলক্ষ্মীকে এ বিদ্যায় তিনি পরাস্ত করিতে পারিতেন। আর স্নেহও ছিল মায়ের মত। মা সন্তানকে স্তন্য পান করাইয়া যে সুখ ও তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকেন, আমাদিগকে খাওয়াইয়া দক্ষিণাদাও অনুরূপ সুখ বোধ করিতেন।

রান্নাঘর যে এমন সাংঘাতিক ব্যাপার, তাহা কে আগে মনে করিতে পারিয়াছিল। চৌর্যবিদ্যাচর্চার এমন ক্ষেত্র আর দ্বিতীয়টি হইতে নাই। এই বিষয়ে হাতযশ যার যত বেশী, তার ক্ষমতাও তত অধিক, এমন কি, সিপাহীরা পর্যন্ত তার হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িত। সুতরাং এই বিদ্যায় যারা গুরু ও শিক্ষক, উভয় পক্ষকেই ঠেকাইবার জন্য দক্ষিণাদাকে ভোরে রান্নাঘর খোলা হইতে রাত্রে রান্নাঘর বন্ধ করা অবধি প্রায় সময়টাই এই মহলে থাকিতে হইত। তদুপরি ঠাকুর-চাকরদের মধ্যে নানা কারণে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়াই থাকি[ত]। অরাজকতা দমনের জন্যও দক্ষিণাদার রন্ধ[ন]শালায় উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল।

দক্ষিণাদা চাকরদের মধ্যে কাজ বিভ[াগ] করিয়া দিয়াছিলেন। গোবিন্দ পড়িয়াছিল চ[া]-টিফিন বিভাগে। ইতিমধ্যে গোবিন্দ সম্ব[ন্ধে] কানাঘুষা শোনা যাইতে লাগিল, গোবি[ন্দ] ঠাকুর-চাকরদের লইয়া মিটিং করে।

বিজয়বাবু (দত্ত) রাম অবতারকে একদি[ন] জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই, গোবিন্দ তোদের ' বলে রে?"

সে উত্তর দিল, "গোবিন্দ, বাবু লেখাপ[ড়া] জানে।"

—"সত্যি?"

—"হ্যাঁ, বাবু। মুদীর দোকানে খা[তা] লিখত।"

—"বটে?"

রাম অবতার বলিল,—"হ্যাঁ, বাবু। আমাদে[র] রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলে।"

ইহার পরে আর আপত্তি করে কাহ[ার] সাধ্য।

বিজয়বাবু কহিলেন, "গোবিন্দ খ[ুব] পণ্ডিত, না রে?"

রাম অবতার খুশী হইয়া গেল, বলি[ল] "গোবিন্দকে আমরা খুব মান্য করি।"

প্রভু-ভৃত্যের আলাপ নিজের সীটে বসিয়[া] শুনিতেছিলাম। গোবিন্দ সম্বন্ধে মনে ম[হা] শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া পড়িলাম।

কানে আসিল, বিজয়বাবু জিজ্ঞা[সা] করিতেছেন, "গোবিন্দ আর কি বলে?"

অর্থাৎ এই পণ্ডিত ব্যক্তিটি আস[লে] সরকারের স্পাই কিনা, এইটাই সোজা মান[ে] রাম অবতারের নিকট হইতে তিনি আদ[ায়] করিয়া লইতেছিলেন। উত্তরে বিজয়বাবু যা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হই[য়া]

আমিও কোনমতে উদাত্ত হাসির মুখে জোরসে ছিপি আঁটিয়া বসিয়া রহিলাম।

রাম অবতার সরল মানুষ, সরল মনেই আমাদের বোধগম্য হিন্দিতে যাহা বলিয়াছিল, তাহা এই, "গোবিন্দ বলে, সব বাবু সমান আছে না। কেউ কেউ বোমা মেরে এসেছে, কেউ কেউ সাহেব মেরে; লেখাপড়াও কেউ কেউ জানে। সব বাবু সমান আছে না। কত বাবু চুরি করে, কত বাবু স্ত্রিহরণ (স্ত্রীহরণ) মামলায় এসেছে, তার ঠিক নেই।" ইত্যাদি।

রাম অবতার বিদায় লইতেই ছিপি ছাড়িয়া দিলাম, অট্টহাসিতে ঘর দুজনেই ভরিয়া ফেলিলাম, শোন কথা, আমরা নাকি স্ত্রিহরণ মামলায় ধরা পড়িয়া আসিয়াছি।

বিজয়বাবু বলিলেন, "মহাপুরুষটির খোঁজ নিতে হোল।"

বিজয়বাবু যখন ঘরে বসিয়া খোঁজ লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন, ঠিক তখনই নীচে টিফিন-ঘরে গোবিন্দ এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। খবরটা একপ্রকার পাখায় ভর করিয়াই উপরে, নীচে, ব্যারাকে ছড়াইয়া পড়িল।

প্যারীবাবু (দাস) যখন চায়ের ঘরে ঢুকিয়াছেন, তখন ভোরের টিফিন-পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি বেঞ্চিতে বসিয়া হাঁক দিলেন, "গোবিন্দ, এক কাপ চা দাও।"

গোবিন্দ চায়ের ঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া লইল এবং উত্তর দিল, "বসুন, দিচ্ছি।"

সম্মুখে লম্বা টানা টেবিল লইয়া প্যারীবাবু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, গোবিন্দ এক কাপ চা আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল।

চায়ে চুমুক দিয়াই প্যারীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "চায়ে দুধ দেও নাই?"

—"না, দুধ নেই।"

—"হুঁ। সেদ্ধপাতা দিয়েই আবার চা করেছ?"

—"এক কাপ চায়ের জন্য আর নূতন প্যাকেট ভাঙ্গিনি, খানিকটা সেদ্ধ চা আবার গরম করে দিয়েছি।"

প্যারীবাবু আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তুমি মানুষ, না জানোয়ার? এ-চা মানুষে খেতে পারে?"

বলিয়াই হাতের পেয়ালাটা কাঠের মেঝেতে ছুড়িয়া মারিয়া উঠিয়া পড়িলেন, ঝনঝন শব্দ করিয়া পেয়ালাটা টুকরা টুকরা হইয়া গেল। প্যারীবাবুর চীৎকারে ও পেয়ালার শব্দে ঠাকুর-চাকর অনেকে ছুটিয়া আসিল।

গোবিন্দ প্যারীবাবুকে কহিল, "রাগ করে যে পেয়ালাটা ভাঙ্গলেন, এতে কার লোকসান হোল?"

প্যারীবাবু গোবিন্দের দিকে একবার অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পিছনে শোনা গেল যে, গোবিন্দ উপস্থিত পাচক ও চাকরদের বলিতেছে, "দেখলি তো লেখাপড়া জানার গুণ? তোরা হলে তো রেগে আমার মুখেই পেয়ালা ছুঁড়ে মারতিস।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গোবিন্দ শুধু সত্যবাদীই ছিল না, তার ন্যায়-অন্যায় বোধটাও প্রখর ছিল। কিন্তু তার এই নৈতিক চরিত্র, গাম্ভীর্য ও ধৈর্য ক্রমেই আমাদের অসহনীয় হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে একদিন গোবিন্দ চাকর মহলে ঘোষণা করিল যে, এর পরের বার আর সে চাকর হইয়া ক্যাম্পে আসিবে না; ডেটিনিউ হইয়াই আসিবে। ঘোষণাতে তার মর্যাদা উক্ত মহলে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। বাবুরাও গোবিন্দকে এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

দিন দশেক পরে ভোরে একটু দেরি করিয়া টিফিন-ঘরে ঢুকিয়াছি। দেখি, খাঁ সাহেব (আবদুর রেজাক খাঁ) ঘরে আছেন, একটা বেঞ্চিতে উবু হইয়া হাঁটুর উপর হাত দুইটা টান করিয়া বসিয়া আছেন। পাশে গিয়া স্থান গ্রহণ করিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘরে কেউ নেই নাকি?" বলিয়া টিফিন-ঘরের দরজার দিকে ইঙ্গিত করিলাম।

খাঁ সাহেব নিম্নস্বরে বলিলেন, "গোবিন্দ আছে।"

ডাক দিলাম, "গোবিন্দ?"

"আজ্ঞে," বলিয়া গোবিন্দ ভিতর হইতে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কহিলাম, "চা দেও।"

গোবিন্দ বলিল, "আপনি তো এই এলেন, উনি আধঘণ্টা বসে আছেন, চা পাননি।"

বিস্মিত হইলাম। কহিলাম, "দেওনি কেন?"

—"কেমন করে দেই?"

—"কেন?"

গোবিন্দ বলিল, "পরশুরাম বাজার আনতে গেছে।"

—"পরশুরামের কথা কে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি খাঁ সাহেবকে চা দেওনি কেন?"

গোবিন্দ বলিল, "না শুনলে আমি কি করব, আমি তো বলেছি—"

—"কি বলেছ?"

—"বলেছি, পরশুরাম বাজার আনতে গেছে, না এলে হবে না।"

আবার প্রশ্ন করিলাম, "কেন হবে না?"

উত্তর হইল, "কেমন করে হবে? কাপ-প্লেট ধোয়া নেই।"

শুনিয়া রক্ত মাথায় চড়িয়া বসিল, ধমক দিতে যাইতেছিলাম, খাঁ সাহেব হাতে চাপ দিয়া থামাইয়া দিলেন।

পূর্ববৎ নিম্নস্বরে কহিলেন, "কাপ-প্লেট ধোয়া পরশুরামের ভাগে পড়েছে কিনা, তাই। গোবিন্দের ভাগে পড়েছে চা তৈরি করা।"

ক্রোধকে যথাসাধ্য চাপিয়া রাখিয়া কহিলাম, "আধঘণ্টার মধ্যে তুমি নিজে একটা কাপ ধুয়ে চা দিতে পারতে না?"

"পারব না কেন? ইচ্ছে করলেই পারতাম।"

"এখন তবে দয়া করে সেই ইচ্ছেটা একবার কর।"

খাঁ সাহেব বলিয়া বসিলেন, "থাক গোবিন্দ, কষ্ট হবে, পরশুরাম আসুক।"

গোবিন্দ উত্তর দিল, "আর থাকবে কেন, আমিই কাপ ধুয়ে চা করে দিচ্ছি।" বলিয়া টিফিন-ঘরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আপন-মনে একা-একা কি যেন গোবিন্দ বলিতেছিল।

ডাকিয়া কহিলাম, "বলছ কি?"

উত্তর আসিল, "কি আর বলব। বলছি, আপনারাই নিয়ম করে কাজ ভাগ করে দেবেন, আপনারাই আবার তা ভাঙ্গবেন—"

সহ্যের সীমা অতিক্রম বহু পূর্বেই করিয়া গিয়াছিল। বুঝিতে পারিয়া খাঁ সাহেব আবার বাধা দিলেন, "থাক, ঘাটিয়ে কাজ নেই। চলুন, উঠে পড়ি।"

কথাটা বোধ হয় গোবিন্দের কানে গিয়া থাকিবে, ভিতর হইতে হুকুম আসিল, "উঠবেন না, চা হয়ে গেছে, খেয়েই যান।"

দুই কাপ চা লইয়া গোবিন্দ উপস্থিত হইল, আমাদের সম্মুখে তাহা ধরিয়া দিয়া যাইতে যাইতে মন্তব্য করিল, "না খেয়ে যদি চলে যেতেন, তবে দু-কাপ চা খামোকা নষ্ট হোত।"

চা-পান শেষ করিয়া দুইজনে বাহির হইয়া আসিলাম।

খাঁ সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "চীজটি কেমন বুঝলেন?"

"গোবিন্দ যদি না যায়, তবে অনেক বাবুকেই পাগল করে ছাড়বে, বলে রাখলাম।"

ব্যাপারটা দক্ষিণাদার কানে গেল। গোবিন্দ উপস্থিত ছিল না, চাকর-বাকরদের সম্মুখে তিনি মন্তব্য করিলেন, "ব্যাটাকে তাড়াতেই হোল দেখছি।"

কথাটা যথাস্থানে পেঁাছিতে বিলম্ব হইল না। গোবিন্দ শুনিতে পাইল যে, ম্যানেজার-বাবু তাহাকে তাড়াইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

খাবার-ঘরে দক্ষিণাদাকে ঘিরিয়া বাবুরা আড্ডা জমাইয়াছিল। অনেকের হাতেই প্লেট, আহারের পূর্বে চাখিয়া দেখিতেছে, মাংসটা কেমন হইয়াছে। এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া হাজির হইল।

দক্ষিণাদার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "আমাকে নাকি ছাড়িয়ে দেবেন?"

দক্ষিণাদা চটিয়া গিয়া বলিলেন, "দেবই তো।"

গোবিন্দ বলিল, "না, আমি নিজেই রিজাইন করব।"

শুনিয়া বাবুরা প্রায় বিহ্বল হইয়া গেলেন,

বলে কি, গোবিন্দ নাকি রিজাইন করিবে। ব্যাটা ইংরেজিও জানে দেখা যাইতেছে।

গোবিন্দ কহিল, "ডিসমিস করলে নাম খারাপ হয়, তাই আমি রিজাইন করব ঠিক করেছি।"

গোবিন্দকে অবশ্য ডিসমিস করা হয় নাই কিংবা সে-ও রিজাইন করিবার সুযোগ পায় নাই। বাড়ি হইতে মায়ের অসুখের খবর পাইয়া সে ছুটি লইয়া চলিয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে নাই।

পৃথিবীকে জলে আর স্থলে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। শুনিতে পাই যে, ইহার মধ্যে নাকি তিনভাগই পড়িয়াছে জলের দখলে, আর বাকী একভাগ পড়িয়াছে স্থলের অংশে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এই বিষম ভাগের নিশ্চয় একটা যুক্তিযুক্ত হেতু রহিয়াছে। হেতুটা বোধ হয় এই যে, সাত-সমুদ্রের লোনাজলে যদি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া না রাখা হইত, তবে গোটা পৃথিবীটাই পচিয়া উঠিত।

একভাগকে বাঁচাইবার জন্য তিনভাগের এই ব্যয়টাকে অপব্যয় মনে করিলে ভুল হইবে। এই অপব্যয়ের মধ্যে সৃষ্টির রহস্য বা সত্যটিই নিহিত আছে। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে সৃষ্টিতে অপ্রয়োজনই পরিমাণে ও মূল্যে অধিক। অথবা অর্থহীন একটা অপ্রয়োজন সৃষ্টিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে, যেমন মহাশূন্যের সীমাহীন কোলে কয়েক কোটি সৌরজগৎ এখানে-সেখানে ছিটেফোঁটার মত ফুটিয়া আছে— আছে কিনা, তাহাও মালুম হয় না। ভারতবর্ষের ঋষিরা একদা পরস্পরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সৃষ্টির উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি? তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, সৃষ্টির মূলে কোন উদ্দেশ্যই নাই, ইহা আনন্দ হইতে জাত, আনন্দে স্থিত এবং পরিণামে আনন্দেই অবসিত। মোট কথা, বিনা প্রয়োজনেই সৃষ্টি, এই কথাটাই আনন্দ শব্দ দ্বারা ঋষিরা বুঝাইয়া গিয়াছেন। আমি বিনা প্রয়োজনকে আনন্দ না বলিয়া অপ্রয়োজন বলিয়াছি, এই যা তফাৎ। অনেকে আবার ইহাকে লীলা বলিয়া থাকেন। যাঁর যেমন অভিরুচি!

আপনারা অবশ্যই বলিতে পারেন যে, এত ভূমিকার বা ভণিতার আবশ্যক নাই, কথাটা বলিয়া ফেলিলেই তো হয়। বেশ, তবে বলিয়া ফেলা যাইতেছে—

লিখিতে গিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, বক্সা বন্দিজীবনের প্রয়োজনীয় কথা বা কাহিনী এতাবৎ আমার কলমে তেমন আসিতেছে না। যাহা আসিতেছে, তাহা সমস্তই হাল্কা ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়।

কেন এমন হইল, তার উত্তরটাই ভূমিকায় ও ভণিতায় ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলাম। বলিতে চাহিয়াছিলাম, দোষটা আমার স্বভাবের অর্থাৎ স্মৃতির। বন্দিজীবনের ভয়ানক ব্যাপার, গুরুতর বিষয় সমস্তই বিস্মৃতিতে তলাইয়া গিয়াছে, শুধু হালকা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলিকেই স্মৃতি পরম মমতায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। যারা বা যে-সমস্ত ঘটনা বন্দিজীবনকে সহনীয় বা উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারাই স্মৃতিতে একান্ত সত্য ও প্রধান হইয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছে, আর বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা ও তার নায়কগণ বেমালুম স্মৃতি হইতে লোপ পাইয়াছে।

আমার স্বভাবের মধ্যে সঞ্চয়ী বলিয়া যে লোকটি রহিয়াছে, সে যে ঐতিহাসিক নহে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনের দিকেই তার পক্ষপাতিত্ব, তাই বিষয়বণ্টনে তিন ভাগেরও অধিক সে অপ্রয়োজনের ভাঁড়ারে ঠাসিয়া দিয়াছে। সেই স্বভাবটাই আমার স্মৃতিতে বসিয়া কলমের কর্ণধারী সাজিয়াছে। কাজেই আমি মানে কলমটা উক্ত কর্ণধারের হাতে মোচড় খাইয়া যন্ত্রবৎ চালিত হইতেছে।

আমার সমস্ত ভূমিকা, ভণিতা বা বক্তব্যের সার মর্ম,—আমার স্বভাবমত চলিবার ও বলিবার অনুমতিই আমি আপনাদের দশজনের দরবারে প্রার্থনা করিতেছি।

বিপ্লবী, সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদি নামে পরিচিত হইলেও আমরা ছিলাম বাঙালী, একথাটা স্মরণ রাখিতে আজ্ঞা হয়। আর দশজন বাঙালীর যে সমস্ত দোষগুণ থাকে, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত ছিলাম না। বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলিতে যদি সত্যই কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা আমাদেরও ছিল। তবু একটা বিষয়ে সাধারণ বাঙালী হইতে বিপ্লবীরা একটু স্বতন্ত্র ছিল। সেই স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য একটি কথায় ব্যক্ত করিলে বলিতে পারি—চরিত্র।

এই চরিত্র-শক্তিটুকু যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে বাঙলার ইতিহাস হইতে স্বদেশী ও বিপ্লব আন্দোলনের মূল ভিত্তিটিই অপসারিত হইবে এবং বাঙলাদেশের ইতিহাস ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের ইতিহাসের ভীড়ের সঙ্গে ঝাঁকের কই-এর মত মিশিয়া যাইবে। বিপ্লবীদের চরিত্র-শক্তির মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া দুইটি বিশেষ উপাদান আমার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে একাধারে সৈনিক ও সাধক দুইটি চরিত্রের সম্মেলন দেখা যায়। বিবেকানন্দের মানসরসেই ইহা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার গীতাই ছিল বিপ্লবীদের জীবনের আদর্শ ও পাথেয় একাধারে। পুরাতন বিপ্লবীদের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। গান্ধীযুগে যাঁহারা বিপ্লবীদলে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বহুক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত অভিমত প্রযোজ্য নহে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। তবু সকলকে একত্রিত করিয়া একই পটভূমিকায় দাঁড় করাইয়া দেখিলে দেখা নিশ্চয় যাইবে যে, সৈনিক ও সাধক দুইয়ের মিশ্রণে মূলত বিপ্লবীদের চরিত্র গঠিত। এই চরিত্রশক্তির বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিলে আর দশজন বাঙালী হইতে ইহাদের তেমন কোন পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ করিবার মত আমার দৃষ্টিতে পড়ে না।

বক্সা ক্যাম্পে বন্দীদের তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যুগান্তর, অনুশীলন ও বাদবাকী তৃতীয় পার্টি। ইহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন নেতার চরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু পরিচয় প্রদান করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা কিন্তু আমার নিজস্ব চোখে দেখা পরিচয়, ইহাকে চরিত্র-কথা বা ইতিহাস বলিলে ভুল হইবে। আমি ঐতিহাসিক নই, একথা ভূমিকাতেই কবুল করিয়া রাখিয়াছি।

(ক্রমশ)

অনুবাদক—**শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়**

[পূর্বানুবৃত্তি]
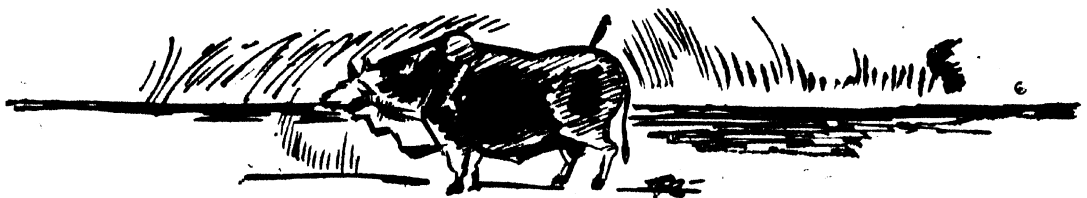
ইসাবেল সহসা বলে উঠ্‌ল ঃ "বড় নোঙরা জায়গা, আমাদের উঠে পড়া উচিত।"

আমি মদের ও সোফীর স্যাম্‌পেনের দাম দিয়ে উঠে পড়লাম। সমস্ত জনতা নাচের জন্য একত্রে জড়ো হয়েছে; আমরা বিনা মন্তব্যেই বেরিয়ে এলাম। তখন রাত দুটো বেজে গেছে, আমার মনে হ'ল বিছানা নেওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু গ্রে জানালো সে ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে, সুতরাং আমি প্রস্তাব করলাম যে, মন্‌তেমাতরের "গ্রাফে" গিয়ে কিছু খাওয়া যাক। মোটরে যেতে যেতে সবাই নীরব রইলাম। নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি গ্রে'র পাশে বসেছিলাম। যখন এই জম্‌কালো রেস্তোঁরায় পৌঁছলাম, তখনো অনেকে ছাতে বসেছিল। আমরা বেকন, ডিম আর বীয়রের অর্ডার দিলাম। বাহ্যতঃ ইসাবেল একটা তুষ্ণীভাব ফিরিয়ে এনেছে। প্যারীর এই সব কুখ্যাত অঞ্চলের সংগে আমার পরিচয়ের জন্য ইসাবেল আমাকে (হয়ত কিঞ্চিৎ শ্লেষ-ভরেই) অভিনন্দন জানালো।

আমি বল্‌লাম ঃ "তুমি ত' এইরকম চেয়েছিলে।"

"খুবই উপভোগ করা গেল—সন্ধ্যাটা চমৎকার কাট্‌লো।"

গ্রে বল্‌লে ঃ "নরক—উৎকট নোঙরা, তার ওপর আবার সোফী।"

ইসাবেল উদাসীনের ভংগীতে কাঁধ নাড়লো।

সে আমাকে বল্‌ল ঃ "ওকে আপনার মনে পড়ে না? আপনি প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ি ডিনারে আসেন সেদিন ও আপনার পাশেই বসেছিল। তখন অবশ্য ওর অমন লাল চুল ছিল না, মাথায় অতি নোঙরা অগোছালো চুল ছিল।"

আমি অতীতের কথা ভাবতে লাগলাম; একটি অতি অল্পবয়স্কা নীলনয়না মেয়ের কথা মনে আছে, তার চোখ দুটি প্রায় সবুজ বলা চলে, খুব সুন্দরী না হলেও, একটা তাজা স্বচ্ছ ভাব, তার মধ্যে এমন একটা লজ্জার ছাপ ছিল যা আমার ভারী ভালো লেগেছিল।

আমি বললামঃ "নিশ্চয়ই মনে আছে, আমার একজন মাসী ছিলেন তাঁর নাম ছিল সোফী।"

"বব ম্যাকডোনাল্ড নামে একটি ছেলের সংগে ওর বিবাহ হয়।"

গ্রে বল্‌ল ঃ "চমৎকার ছেলে।"

"আমার দেখা শ্রেষ্ঠ সুশ্রী ছেলেদের মধ্যে সে ছিল অন্যতম। সোফীর মধ্যে সে যে কি পেয়েছিল কোনদিন ভেবে পাই নি। আমার বিয়ের পরই ওদের বিয়ে হয়েছিল। সোফীর বাবার সংগে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর ওর মা চীন-দেশস্থ স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েলের একজনকে বিয়ে করেন। বাপের বাড়ির লোকজনদের সংগে সোফী মারভিনে থাক্‌ত, আমাদের সংগে তাই প্রায়ই দেখাশোনা হ'ত। কিন্তু বিয়ের পর ওরা একেবারে যেন কোনমতে আমাদের ভীড়ের ভিতর থেকে সরে গেল। বব ম্যাকডোনাল্ড উকিল ছিল, তবে তার তেমন পসার ছিল না, শহরের উত্তরাঞ্চলে ওরা একটা বাসা নিয়েছিল। কিন্তু সেটা কিছুই নয়। সোফীরা কারো সংগে দেখা সাক্ষাৎ করতো না, পছন্দই করতো না,—দুজনে দুজনকে নিয়ে এমন উন্মত্তের মত মেতে থাকতে আর কাউকে দেখি নি। দু'তিন বছর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বা একটি সন্তান হওয়ার পরেও দুজনে সিনেমায় গিয়ে এমনই গলা জড়িয়ে কোমর ধরে বসে থাকত, যে দেখ্‌লে সহসা মনে হত বুঝি প্রেমিক যুগল। সিকাগোতে ওরা একটা হাসি-তামাসার বস্তু হয়ে উঠ্‌ল।"

ইসাবেলের কথাগুলি লারি একমনে শুনছিল বটে, কিন্তু কোন মন্তব্য করে নি। তার মুখ-খানি দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছে।

আমি জান্‌তে চাইলামঃ "অতঃপর কি হ'ল?"

"একদিন রাতে ওরা ছোট খোলা মোটরে চড়ে সিকাগোয় ফিরছিল, ছেলেটিও সংগে ছিল। সর্বদাই ছেলেটিকে সংগে রাখতে হ'ত, কারণ বাড়িতে সাহায্য করার কেউই ছিল না, সোফী নিজ হাতেই সব কিছু করত, ওদের কাছে সেই ছিল স্বর্গ। একদল মাতাল বিরাট সেডান গাড়ি আশি মাইল স্পীডে চালিয়ে নিয়ে আসছিল, সোজাসুজি ধাক্কা লাগিয়ে দিল। বব আর খোকাটি তৎক্ষণাৎ মারা গেল, কিন্তু সোফীর শুধু 'কনকাসন' হল আর দু-একটি পাঁজরা ভেঙে গেল। যতদিন সম্ভব বব ও খোকার মৃত্যুসংবাদ ওর কাছে গোপন রাখা হল, কিন্তু অবশেষে বলতেই হল। শোনা গেছে সে এক ভয়ংকর অবস্থা, সোফী প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়, চীৎকারে জায়গাটা ফাটিয়ে দিতে লাগল, দিবারাত্র ওর প্রতি হাসপাতালের লোকজন লক্ষ্য রাখ্‌ত, একবার প্রায় জানলা গলিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল আর কি। আমরা অবশ্য যথাসম্ভব সাহায্য করেছিলাম, কিন্তু ও যেন আমাদের সইতে পারত না, ঘৃণা করত। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর ওকে একটা স্যানাটোরিয়মে রাখা হল, সেখানে প্রায় তিন মাস সে ছিল।"

—"আ-হা!"

"ছাড়া পাওয়ার পর মদ ধরল, আর মত্ত অবস্থায় যে কোন ব্যক্তির আহ্বানেই তার শয্যাসঙ্গিনী হত। ওর শ্বশুরকুলের পক্ষে সে এক ভয়ংকর অবস্থা। তারা বেশ ভদ্র ও শান্ত লোক, একটা কেলেংকারীতে তাদের ভারী ভয়, প্রথমটা আমরা সকলেই ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম—কিন্তু অসম্ভব। ডিনারে নিমন্ত্রণ করলে ঐ মদের গন্ধ প্লাসটারে চাপা দিয়ে আসত ও সন্ধ্যা শেষ হওয়ার পূর্বেই পালাত। তারপর এমন সব নোঙরা লোকজনের সংগে মিশতে লাগল যে, আমরা তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর দায়ে একদিন সোফী ধরা পড়ল। মদের আড্ডায় পাওয়া একটা ডাকুর সংগে ও ছিল, সেই সময় জানা গেল তাকে আবার পুলিসে খুঁজছে।"

আমি বল্‌লামঃ "কিন্তু ওর কি টাকাকড়ি ছিল?"

"ববের ইন্সিওরেন্স ছিল; যে মোটরটির সংগে ধাক্কা লেগেছিল, তাদেরও ইন্সিওর করা ছিল, সেখান থেকেও মোটা কিছু পেয়েছিল, কিন্তু বেশীদিন তা টেঁকল না, মাতাল জাহাজী লোকের মত সব টাকা ও ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে গেল। সোফীর ঠাকুমা কিছুতেই ওকে মারভিনে রাখতে রাজী হলেন না, তখন ওর শ্বশুরবাড়ির সবাই বলল, কিছু কিছু মাসোহারা দেওয়া হবে, যদি সে বাইরে গিয়ে থাকতে রাজী হয়, মনে হয় বর্তমানে সেই অবস্থাতেই ও রয়েছে।"

আমি মন্তব্য করলামঃ "দুই আর দুয়ে চার, এতদিনে বৃত্ত সম্পূর্ণ হল, এককালে পরিবারস্থ কুলাঙ্গারদের ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় পাঠান হ'ত; এখন দেখ্‌ছি তোমাদের দেশ থেকে য়ুরোপের দিকে পাঠানো হচ্ছে।"

গ্রে বলেঃ "সোফীর জন্য ভরী মনে কষ্ট হয়।"

ইসাবেল নিস্পৃহ ঠাণ্ডা গলায় বলে—"তাই নাকি? আমার কিন্তু হয় না। অবশ্য ঘটনাটি অতি নিদারুণ আর সোফীর সেই দুর্দশায় আমার চাইতে বেশী সহানুভূতি আর কেউ জানাতে পারে না—আমরা উভয়কে চিরদিনই জানি। কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ এই জাতীয় অবস্থা কাটিয়ে উঠে,—ও যদি টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে ওর স্নায়ুতে গোলমাল আছে, ও স্বভাবতই একটু বাতিকগ্রস্ত; এমন কি ববের প্রতি ওর ভালোবাসার ভিতরও একটা আতিশয্য ছিল। ওর যদি চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকত, তাহলে ও জীবনে কিছু করতে পারত।"

"যদি......তুমি একটু কঠোর হয়ে উঠেছ ইসাবেল—নয় কি?" আমি মৃদু আপত্তি জানাই। "আমার তা মনে হয় না—আমার যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান আছে, আর সোফীর কথা নিয়ে ভাবালু হয়ে ওঠার কোন কারণ আছে আমি মনে করি না—ভগবান জানেন গ্রে বা খুকীদের ওপর আমার মমতা বড় কম নেই, ওরা যদি মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়, তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব নিশ্চয়ই, কিন্তু অল্পকালের ভিতরই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠব,—তাই কি তোমারও অভিপ্রায় নয় গ্রে? না তুমি চাও প্রতি রাত্রে—নেশায় অন্ধ হয়ে প্যারী শহরে যার তার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে দিন কাটিয়ে দিই?"

গ্রে তখন একটা রসাত্মক কথা বলে ফেলল, ওর কাছে আর এমনটি শুনি নি।

"আমার চিতাশয্যায় মলিন পোষাক পরে তুমি ঘুরে বেড়াও এই অবশ্য আমি চাই, কিন্তু তা যখন এখন আর ফ্যাসন নেই, তখন আমার মনে হয় তোমার পক্ষে ব্রীজ খেলা শুরু করাই শ্রেয় হবে। তবে সে খেলায় সাড়ে তিন বা চারের বেশী কৌশল করে নো-ট্রাম্প ডেকো না।"

স্বামী এবং সন্তানদের প্রতি ইসাবেলের ভালোবাসা আন্তরিক হলেও যে তার ভিতর কামনাপরবশতা আছে, তা এই সময় আর ইসাবেলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না বিবেচনা করলাম। আমার এই মানসিক চিন্তা-ধারা হয়ত তার চোখে ধরা পড়ল, তাই সে সহসা রূঢ় ভঙ্গীতে আমার পানে তাকিয়ে বলে উঠল—"আপনি কি বলতে চান?"

"আমারও গ্রে'র অবস্থা, মেয়েটির দুর্দশায় আমি দুঃখিত।"

"ও আর মেয়ে নয়, ওর বয়স এখন ত্রিশ।"

"আমার মনে হয় স্বামী ও পুত্রের মৃত্যুতে ওর কাছে পৃথিবীর অবসান ঘটেছে। বোধ করি এর পর কি অবস্থা দাঁড়ায় তার জন্য ওর কোন মাথাব্যথাই নেই, তাই ও মদ ও উচ্ছৃঙ্খল সহবাসের চরম অধঃপতনের ভিতর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, যে জীবন ওর প্রতি এতই নির্মম ও নিষ্ঠুর তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা বোঝাপড়া করে নেবে,—সুখের সপ্তম স্বর্গে সোফী একদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই স্বর্গ থেকে বিদায়ের পর সাধারণ মাটির পৃথিবীতে সাধারণ লোকের ভীড়ে না থেকে ও সোজা নরকের নীচের তলায় নেমে গেছে। আমার মনে হয় ও ভেবেছে সুরলোকের সোমরস যদি না পাওয়া যায়, তাহলে 'জিন' (মদ) পান করেই ওর তৃষ্ণা মেটাবে।"

"এই ধরণের কথাই ত নভেলে লিখে থাকেন আপনি,—এ সব নিরর্থক ননসেন্স, আপনি নিজেও জানেন 'ননসেন্স' বলে। সোফী নোঙরার ভিতর গা ভাসিয়ে দিয়েছে তার কারণ সে জীবন তার ভাল লাগে। আরো অনেক স্ত্রীলোকও ত স্বামী-পুত্র হারিয়েছে, কিন্তু সেই কারণে তারা ত কলঙ্কিত চরিত্র ও অসতী হয়ে ওঠে নি। সৎ থেকে অসতের উৎপত্তি হয় না, যা অসৎ তা চিরদিনই অসৎ হয়েই আছে—যখন ঐ মোটর দুর্ঘটনায় ওর সব বাধা চুরমার হয়ে গেল, তখন ত ও নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারত। ওর প্রতি দয়া দেখিয়ে তা অনর্থক নষ্ট করবেন না—অন্তরে ওর যা চিরদিন প্রচ্ছন্ন ছিল এখন তাই প্রকাশ পেয়েছে।"

সমস্ত সময়টুকু লারী নীরবে ছিল। সে যেন পাঠগৃহে বসে আছে, আমার মনে হ'ল, আমাদের এই আলাপ-আলোচনা ওর কানেই পৌঁছায় নি। ইসাবেলের কথাগুলির পর কিছুকাল স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। লারী কথা বলতে শুরু করল, কিন্তু অদ্ভুত, সুরহীন তার কণ্ঠস্বর—যেন আমাদের কিছু বলছে না, প্রশ্ন করছে নিজেকেই; তার চোখ যেন অস্পষ্ট অতীতের সুদূরে ভেসে চলে গেছে।

"ওর যখন বয়স চোদ্দ, তখনকার কথা মনে পড়ে, লম্বা চুলগুলি সামনের দিকে টান করে আঁচড়ে পিছনে কালো ধনুকের মত খোঁপা বাঁধা হয়েছে, মুখখানি গম্ভীর ও দাগমণ্ডিত। সোফী ছিল অতি ধীমতি, আদর্শবাদী, উচ্চমনা মেয়ে। যা কিছু পেত সবই সে পড়ে ফেলত—আর আমরা বই সম্পর্কেই আলোচনা করতাম।"

ইসাবেল ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল: "সে আবার কবে?"

"ও, যখন তুমি তোমার মার সঙ্গে ঘুরে সামাজিকতা শিখে বেড়াচ্ছিলে, আমি ওর দাদা-মশায়ের বাড়ি যেতাম, ওদের বাড়ি একটা প্রকাণ্ড এলম্ গাছ ছিল, তার ছায়ায় বসে পরস্পরকে পড়ে শোনানো হ'ত। সোফী কবিতা ভালো-বাসত, অনেক কবিতা নিজে লিখেছে ও।"

"বহু মেয়ে অমন বয়সে এ রকম লিখে থাকে। হালকা জোলো কবিতা।"

"অবশ্য অনেকদিনের কথা, আর আমিও তেমন ভালো বিচারক একথা বলতে সাহস করি না।"

"তোমার বয়স তখন ষোলোর বেশী নয়।"

"অবশ্য কবিতাগুলিতে অনুকরণ ছিল। রবার্ট ফ্রস্টের প্রচুর ছায়া ছিল। কিন্তু আমার মনে হ'ত অত অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে তা অতি কৃতিত্বের পরিচায়ক। ওর কান ছিল অতি সূক্ষ্ম, আর ছন্দজ্ঞান ছিল অপূর্ব। গ্রামের শব্দ ও গন্ধ, বসন্তের প্রাথমিক কোমলতা বা বৃষ্টি-ভেজা মাটির গন্ধ ওর প্রাণে অনুভূতি জাগিয়ে তুলত।"

ইসাবেল বলে উঠল: "ও যে আবার কবিতা লিখতে জানতামই না কখনো।"

"ও এসব কথা গোপন রাখতো, ওর ভয় হ'ত তোমরা ঠাট্টা করবে, সোফী অতি লাজুক প্রকৃতির ছিল।"

"এখন আর সোফীর লজ্জা নেই।"

"যুদ্ধ থেকে যখন ফিরে এলাম, তখন ও বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছিল আর স্বচক্ষে শ্রমিকদের দুর্দশা সিকাগোয় দেখেছিল। কার্ল সাণ্ডবার্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সোফী মুক্ত ছন্দে দরিদ্রের নিদারুণ দুর্দশা ও শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ সম্পর্কে কবিতা লিখতে লাগল, বলতে কি কিঞ্চিৎ সাধারণ শ্রেণীর হলেও তার ভিতর আন্তরিকতা, কারুণ্য ও অভীপ্সা ছিল। আমার মনে হয় ওর প্রচুর শক্তি ছিল। সোফী নির্বোধ বা জোলো ছিল না, কিন্তু তার ভিতর একটা মনোহর শুচিতা ও মহৎ আত্মার ছাপ পাওয়া যেত। সেই বছর আমাদের পরস্পরের খুবই দেখাশোনা হয়েছিল।"

দেখলাম ইসাবেল ক্রমবর্ধমান বিতৃষ্ণার সঙ্গে কথাগুলি শুনছিল। লারী বোঝে নি যে, কথাগুলি ইসাবেলের বুকে ছুরির আঘাত হয়ে প্রবেশ করছে এবং ওর নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বলা প্রতি কথা সেই আঘাতের বেদনা বাড়িয়ে তুলছে। কিন্তু যখন সে কথা বলল তখন তার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল।

"হঠাৎ তোমার কাছে ও এত কথা জানালো যে?"

লারি তার মুখের পানে বিশ্বাসভরা চোখে তাকিয়ে বল্ল: "কি জানি! তোমাদের মত প্রচুর বিত্তশালিনীদের মধ্যে ও ছিল সবচেয়ে দরিদ্র, আর আমিও তাই। শুধু বব খুড়ো মারভিনে প্রাক্‌টিস্ করতেন বলেই ত' আমি ওখানে ছিলাম। মনে হয়, সেই সব কারণে সোফী আমাদের মধ্যে একটা সমতা খুঁজে পেয়েছিল।"

লারীর কোনো আত্মীয় ছিল না। আমাদের অনেকেরই মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোন থাকে যাদের আমরা হয়ত চিনি না মোটে,—কিন্তু আমরা যে মানবীয় পরিবারভুক্ত সেই জ্ঞানটুকু তাদের ভিতর থেকে পাই। লারীর বাবা ছিলেন বাপ-মার একমাত্র সন্তান, মা-ও একমাত্র মেয়ে, একদিককার পিতামহ অল্প বয়সে সমুদ্রে মারা যান, আর অপরপক্ষে মাতামহের ভাই-বোন কেউই ছিল না। লারীর

মত নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে বোধ হয় আর কেউ নেই।

ইসাবেল প্রশ্ন করল: "তোমার কি কখনো মনে হয়নি সোফী তোমার প্রেমে পড়েছে?"

"কখনো নয়।"—লারী হাসলে।

"—জেনে রাখো সে তোমার প্রেমে পড়েছিল।"

গ্রে তার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলে ওঠে, "যুদ্ধ থেকে আহত সৈনিক হয়ে ফেরার পর সিকাগোর অর্ধেক মেয়েই ত' লারীকে নিয়ে পড়েছিল।"

"পড়ার চাইতেও বেশী, সে তোমাকে পূজা করত, তুমি কি বলতে চাও লারী যে, সে সব তোমার জানা ছিল না?"

"নিশ্চয়ই জানতাম না, বিশ্বাসও করি না।"

"বোধ করি তোমার ধারণা ছিল ও অতি উচ্চমনা।"

"এখনও সেই ঝুঁটি বাঁধা কৃশ মেয়েটিকে মনে পড়ে, গম্ভীরমুখে কান্নায় কম্পিতকণ্ঠে যে কীট্সের Ode পড়ত, কান্নার হেতু হ'ল কবিতাটি চমৎকার। এখন সে কোথায় কে জানে?"

ইসাবেল কিঞ্চিৎ চমকে উঠে লারীর মুখের দিকে সন্দিগ্ধ ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি হানল।

"না, রাত অনেক হয়ে গেল—এতই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি যে কি করব জানি না—চলো এখন যাওয়া যাক্।"

(তিন)

পরদিন ব্লু ট্রেন ধরে রিভেয়ারা গেলাম ও দু-তিনদিন পরে এনটিবেতে এলিয়টের কাছে প্যারীর সংবাদ দেওয়ার জন্য গেলাম। তাকে মোটেই সুস্থ দেখাচ্ছে না। মনটিকাটিনীর পরিচর্যায় প্রত্যাশিত ফললাভ হয়নি, আর তৎপরবর্তী ভ্রমণ ওকে শ্রান্ত করে তুলেছে। ভেনিসে একটা দীক্ষাদানের বেদী সংগ্রহ করে যে ত্রিপট্ট চিত্র নিয়ে একদিন কথাবার্তা চলছিল, সেটি কিনতে ফ্লোরেন্সে গিয়েছিল। জিনিসগুলি ঠিকমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য 'প'তেন মার্সে' গিয়ে একটা বাজে সরাই-এ উঠেছিল, সেখানে অসহ্য গরম। এলিয়টের বহুমূল্য সংগ্রহাবলী এসে পৌঁছতে তখনও অনেক দেরী, এলিয়ট উদ্দেশ্য সিদ্ধি না করে ফিরতে দৃঢ়সংকল্প, তাই সে থেকে গেল। সব জিনিসের যথাযথ বন্দোবস্ত হওয়ায় তার আনন্দের আর সীমা রইলো না, আমাকে সগর্বে সেই দ্রব্যের আলোকচিত্র এলিয়ট দেখালো। ছোট হলেও গীর্জাটি মর্যাদামণ্ডিত, আর আভ্যন্তরীণ অলঙ্করণের সংযত ঐশ্বর্য এলিয়টের সুরুচির পরিচায়ক। এলিয়ট বলল:—

"রোমে একটি প্রাচীন ক্রিশ্চান যুগের পাষাণময় শবাধার দেখে লোভ হ'ল, অনেক ভাবলাম কিনব কি না, অবশেষে না-কেনাই স্থির করলাম।"

"প্রাচীন ক্রিশ্চান যুগের পাষাণময় শবাধার তোমার কি কাজে লাগবে এলিয়ট?"

"ভায়াহে নিজেকে রাখার জন্য—ডিসাইনটা জলভাণ্ডের সঙ্গে চমৎকার মানাবে, কিন্তু ঐ সব প্রাচীন খৃস্টানরা অদ্ভুত ছোট্ট প্রাণী ছিলেন, ওর ভিতর আমার শরীর খাপ খাবে না। আমি শেষ পর্যন্ত হাঁটুটা গর্ভস্থ ভ্রূণের মত মুখের কাছে গুঁজে পড়ে থাকব না—অতি অস্বস্তিকর অবস্থা!"

আমি হাসলাম, এলিয়ট কিন্তু বিষয়টি লঘুভাবে নেয়নি। সে বলে:

আমার তার চাইতে একটা ভালো আইডিয়া মাথায় আছে, আমি একটু কষ্ট করে সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করে ফেলেছি আর সেইটাই প্রত্যাশিত। সিঁড়ির গোড়ায় আমাকে কবর দেওয়ার সব ব্যবস্থা করেছি, তার ফলে গরীব চাষীরা যখন পবিত্র প্রার্থনায় যোগ দিতে আসবে, তখন আমার হাড় ক'খানার ওপর তাদের ভারী বুট নিয়ে চেপে দাঁড়াবে। একটু বোকামি মনে হচ্ছে না? একটা সামান্য পাথরের টুকরোয় আমার নাম, দু'একটা তারিখ এই সব থাকবে। "Si manumentums quoeris circumspiece" স্মৃতিচিহ্ন দেখতে চাও ত' চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেই জানতে পারবে।"

"আমি অন্ততঃ ঐ সামান্য উদ্ধৃতিটুকু বোঝার মত লাটিন জানি, এলিয়ট। তিক্ত গলায় বললাম।

"মাপ চাইছি ভায়া, উচ্চ শ্রেণীর অজ্ঞতায় এমনই অভ্যস্ত যে ভুলেই গিয়েছিলাম একজন লেখকের সঙ্গে কথা বলছি।"

বেশ ঠকলো।

এলিয়ট আবার বলে: "আমি যা বলতে চাই সেটা এই যে, আমার উইলে সব কিছু লিখে রেখেছি, এখন তোমাকে সেই সব ঠিক মত করা হ'ল কি না দেখতে হবে। আমি ঐ পেন্সন পাওয়া কর্নেল ও মধ্যবিত্ত ফরাসীদের ভীড়ের ভিতর রিভেয়ারায় কবরস্থ হতে চাই না।"

"তোমার ইচ্ছানুসারেই অবশ্য আমি কাজ করব। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ব্যাপারে এত আগে থেকে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে মনে করি না।"

"আমি এখন যেতে বসেছি,—আর সত্যি কথা বলতে কি যেতে আমার দুঃখও নেই... লানডরের সেই কবিতাটি কি?"

"I have warned my both hands...."

আমার স্মৃতিশক্তি তেমন প্রখর না হলেও, কবিতাটি ক্ষুদ্র তাই আমি আবৃত্তি করলাম:—

"I strove with none, for none was worth my strife,
Nature I loved, and, next to Nature, Art;
I warmed both hands before the fire of Life;
It sinks, and I am ready to depart."

সে বললে: "হ্যাঁ হাঁ এইটেই—"

একথা না ভেবে পারলাম না যে উদ্দাম কল্পনা ভিন্ন এলিয়ট কবিতাটি এই ভাবে নিজের সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে পারত না।

সে অবশ্য বল্লে: "এতদ্বারা আমার মনোভাব ঠিকমত প্রকাশ পেয়েছে, এর সঙ্গে শুধু এই ক'টি কথা যোগ করা যেতে পারে যে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সমাজেই আমি সর্বদা মিশেছি।"

"চতুষ্পদী কবিতার ভিতর ঐ লাইনটা ঢোকান শক্ত হবে।"

"সমাজেরই ধ্বংস হয়েছে, এককালে আমার আশা ছিল আমেরিকা য়ুরোপের ভূমিকা নেবে, এমন এক আভিজাত্য সৃষ্টি করবে যাকে সবাই সম্ভ্রম করবে—কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে সব আশা নির্মূল হ'ল। আমাদের দরিদ্র দেশ নিদারুণভাবে মধ্যবিত্তভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। তুমি হয়ত ভায়া বিশ্বাস করবে না, কিন্তু শেষবার যখন আমেরিকা গিয়েছিলাম একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে "ভাই" ব'লে সম্বোধন করল। বোঝো—"

কিন্তু যদিও রিভেয়ারা, ১৯২৯-এর অর্থনৈতিক সংকটের ফলে, আগেকার গৌরব হারিয়েছে তবু এলিয়ট যথারীতি পার্টি দিতে লাগল ও পার্টিতে যোগ দিতে লাগলে। এলিয়ট ইহুদী মহলে বড় যেত না, শুধু এক

রথচাইল্ডদের কাছে যেত, কিন্তু এখন ইহুদী সম্প্রদায়ই চমৎকার পার্টি দিয়ে থাকে; আর পার্টি হলে এলিয়ট না গিয়ে থাকতে পারে না। এই সব সম্মেলনে এলিয়ট কারো সংগে করমর্দন ক'রে, কারো বা হস্তচুম্বন ক'রে নির্বাসিত রাজন্যবর্গের মত নিস্পৃহভাবে ঘুরে বেড়াত, যেন এই জাতীয় মেলামেশায় সে বিব্রত হয়ে পড়েছে। নির্বাসিত রাজন্যবর্গ কিন্তু জীবনটা উপভোগ করে নিয়েছেন তাই এখন সিনেমা স্টারের সংগে পরিচিত হওয়াটাই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। আধুনিক কালের রীতিতে রংগমঞ্চ সংশ্লিষ্ট প্রাণীদের সামাজিক মর্যাদার সমতুল্য করাটাও এলিয়ট পছন্দ করত না, কিন্তু একজন অবসরপ্রাপ্তা অভিনেত্রী তারই বাড়ীর পাশে প্রকান্ড প্রাসাদ বানিয়েছেন, অতিথি সেবারও বন্দোবস্ত আছে। ক্যাবিনেটের সচিববৃন্দ, ডিউক বা মহীয়সী মহিলারা সেখানে এসে আতিথ্য গ্রহণ করেন, এলিয়ট সেখানকার একজন নিয়মিত যাত্রী।

সে আমাকে বলেছিল, "অবশ্য এখানকার ভিড়টা পাঁচমিশেলী, তবে কথা কইবার বাসনা না থাকলে কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সংগে কেউ কথা বলে না। উনি আমার প্রতিবেশিনী, সুতরাং মনে হয় আমার যথাসম্ভব সাহায্য করা উচিত। ও'র অতিথিরাও কথা কইবার যোগ্য একজন প্রাণীকে পেলে স্বস্তি বোধ করেন।"

মাঝে মাঝে ওর শরীরের অবস্থা মোটেই ভালো থাকত না, আমি তাই উপদেশ দিয়ে বললাম—সব ব্যাপার সহজভাবে নাও না কেন?

সে বলে, "ভায়াহে, এই বয়সে আর মুছে যেতে চাই না, তুমি কি বলতে চাও পঞ্চাশ বছর ধরে বড়মহলে ঘুরে এটুকু বুঝিনি যে কোথাও দেখা না গেলেই তোমাকে সবাই ভুলে যাবে।

ভাবলাম কি শোচনীয় স্বীকারোক্তি ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল তা কি ও বুঝলে! এলিয়ট সম্পর্কে আর হাসবার মতো মনোভাব আমার ছিল না, আমার কাছে এলিয়ট এক করুণার পাত্র মনে হ'ল। সমাজের খাতিরেই ও বে'চে আছে, পার্টি হ'ল ওর নাকের নিঃশ্বাস; কোনো পার্টিতে নিমন্ত্রণ না হওয়াটা ওর কাছে অপমানকর, একা থাকা শোচনীয় মনস্তাপের কারণ; আর এখন এই পরিণত বয়সে সে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে।

এইভাবে গ্রীষ্মকাল কাটলো। এলিয়ট রিভেয়ারার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত চষে বেড়িয়ে এই কালটা কাটালো। ক্যানে-তে লাঞ্চ, মণ্টিকারলোয় ডিনার, আর সকল সম্ভাব্য উদ্ভাবনীশক্তি প্রভাবে এখানে একটা টি-পার্টি আর ওখানে একটি ককটেল পার্টি সেরে বেড়ালো। যতই ক্লান্তিবোধ হোক, সর্বত্র ভব্য, সদালাপী ও রসগ্রাহী ভাবটুকু বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করত। সর্বদাই ওর কাছে গুজবের অভাব হ'ত না, অতি-সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারী সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরই ঠিক ওর কানে এসে সর্বাগ্রে পৌঁছাত। ওর উপস্থিতি অকিঞ্চিৎকর যদি বলেন, তাহলে আপনার দিকে ও সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে। ভাববে আপনি অতি-ইতর শ্রেণীর প্রাণী।

(ক্রমশ)

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

বাণী লক্ষ্য করে দাদা এ আলোচনায় যোগ দিচ্ছে না। কেমন যেন নিস্পৃহ হয়ে আছে। এদের মত থাকা না থাকায় দাদারও কি এমন কিছু যায় আসে না? দাদা কি তবে এদের থেকে ভিন্ন?

হঠাৎ বাণীর নজরে পড়ে উপস্থিত ঘরের মধ্যে যে কজন লোক আছে, এক দাদাকে বাদ দিয়ে সবার কাঁধে-বুকে-হাতে নানা রঙ বেরঙ-এর তকমা আঁটা। চৌধুরীর কাঁধে পিতলের রাজ-মুকুটটা বড় ঘসামাজা চকচকে। এদের হাত-পা নাড়াচাড়ায় তকমাগুলোও যেন কথা কইছে, আমাকে দেখ—আমাকে দেখ। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষকে মানুষ চিনতে পারে না বলেই কি ঐ চিহ্নগুলোর দরকার? পদ-মর্যাদাটা কি তকমার না, তকমাধারীর? যে সব সৈনিকের বুকে-কাঁধে-হাতে-পিঠে কোন চিহ্ন নেই তারা কি মর্যাদায় কম? চোখের ওপর লাল নীল হলদে রেখাগুলো বড় বিভ্রমের সৃষ্টি করেঃ একটা তারা! দুটো তারা! তিনটে তারা! একটা মুকুট! সিল্কের ফিতেয় পিস্‌-বোর্ড জড়ান ছোট, বড় মাঝারি ব্যাজ! মানে কি? মানে কি? সবার কাঁধে এক নয় কেন? ধুতি-চাদর পরে এদের মধ্যে দাদা আজ না এলে পারতো। দাদার কাঁধে কি চিহ্ন ছিল, বাণী মনে করতে পারে না। ক্যাপ্টেন হ'লে দেশী লোকে কি পায়? এদের মধ্যে কার সংগে পদমর্যাদায় দাদা এক?

হঠাৎ ঝড় বয়ে যাওয়ার মত একটি মহিলা ঘরে ঢুকলো। আঁচল খসে মেঝেয় লুটোচ্ছে, বাঁ-হাতে চকচকে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ ধরা, ডান হাতটা দাঁড় বাওয়ার মত প্রসারিত—মাথার চুল গুলো যদি পাকিয়ে কাঁধের আশেপাশে জড় করা না থাকতো তা হ'লে বোধ হয় গতির বেগে এতক্ষণে আলুলায়িত হ'য়ে পড়তো, মানাতোও বোধ হয়।

মহিলাটি একজনের পাশে সশব্দে বসে' আঁচলটা কুড়িয়ে নিয়ে কোলের ওপর রাখলেন, তারপর হ্যাণ্ডব্যাগটা বার করে আধবিঘত একটা রুমাল বার করে' বার কয়েক মুখ মুছলেন। যার পাশে বসেছিলেন তাকে ঠেলে দিয়ে বললেন, কাল এলেন না কেন? we had enough fun!

যাকে বলা হলো তিনি খুব গা করলেন বলে মনে হ'লো না। আগন্তুক মহিলার স্পর্শে একটু পাশ চেপে বসলেন কেবল। বললেন, তাই নাকি! Extremely sorry Miss Chowdhury!

বাণী চোখতুলে দেখলে, ভদ্রলোক উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকেই চেয়ে আছেন। বাণী চোখ নামিয়ে নিলে। মহিলাটি অকারণে হেসে ওঠলো অভিমানে না রাগে বোঝা গেল না। কে জানে কেন উনি হাসলেন।

মেজর চৌধুরী বললে, My sister রেবা।...ইনি ক্যাপটেন দত্তর বোন, you know Mr. Dutt?

মহিলাটি হেসে 'নিশ্চয়ই' বলে পরিচয়ের প্রীতিটা জানালে। সমরের দিকে চেয়ে আবার হ্যাণ্ডব্যাগ খুললে। সমর মাথাটা বার-দুই নেড়ে হাসবার চেষ্টা করলে।

ইতিমধ্যে বাণী আবার মুখ তুলেছে—আব-হাওয়াটা কেমন কেমন বোধ হচ্ছে, উপস্থিত প্রত্যেকেই খুশী হবার চেষ্টায় মনে মনে তৈরী হ'য়েছে। বাণীর মোটেই ভাল লাগছে না। ঘর ছেড়ে উঠে যেতেও পারে না—কি বিশ্রী চৌধুরীর বোন, সদ্য চুণকাম করার মত মুখটা সাদা আর লম্পটে!

রেবা অস্থির হ'য়ে উঠেছে ঃ ব্যাপার কি all quiet on the western front? Mr. Raha আপনি কিছু বলবেন না? Am I intruding?

রাহা সুপ্তোত্থিতের মত চমকে ওঠেঃ না না, কি মুশকিল! we are obliged rather!

রেবা আবার শব্দ করে হাসে। সমর ঠোক্কর দিয়ে বললে, কথা কইবে কি, চাকরি যাবার ভাবনা! চোখ ঘুরিয়ে রেবা বললে How silly! কি যে বলেন আপনারা! তবুও মনের মেঘ কাটে না, কিন্তু ঘরের আবহাওয়াটা যেন কিছুটা লঘু হ'য়ে ওঠে। এখন এ আলোচনা 'সিলি' ছাড়া আর কি! তোমরা যুদ্ধ করে' দেশকে বাঁচালে দেশ কখনো তোমাদের ভুলতে পারে? যে জন্যেই তোমরা যুদ্ধ করনা কেন, আদর্শের বাগাড়ম্বরে তোমাদের স্থান অনেক উচ্চেঃ A Soldier's life is life for the nation! সুতরাং

বাণী চেয়ে দেখে তার দাদা ছাড়া আর সবার মুখে কেমন একধরণের খুশী উপচে উঠেছে—বাইরের রোদ্দুরটা এতক্ষণে বোধ হয় ভাল করে' ফুটেছে। অনেক দূর থেকে মনে হয় গাড়ীঘোড়ার শব্দটা মৃদু আলাপের মত। যে ঘরে তারা বসে আছে দৈর্ঘে প্রস্থে বেশ বড়—চৌধুরীরা বোধ হয় খুব বড়লোক! রাস্তাটার নামও মনে পড়ছে, হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীট। বাণীর মনেই পড়ে না, এর আগে কোন দিন ঐ রকম রাস্তার নাম শুনেছে কি না! গেটের এক পাশে শ্বেতপাথরে হিজিবিজি অক্ষরে কি যেন লেখা আছে। বড়লোকরা যুদ্ধ করে কেন? চোখ ঘুরতে বাণীর নজর পড়ে, রাহার মাথার ওপর দিয়ে চৌধুরীর বোনের নিষ্প্রভ চোখ-জোড়া তার মুখের ওপর জ্বলছে। কি দেখছেন. উনি? বাণীকে? বাণী চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকায়—মাথার ওপর সিলিংটা কি উচুঁ!

চাকরি যখন রইল তখন চাকরির কথাই হোক। রাহা বললে, বুঝলে চৌধুরী, নামে আমরা মেজর ক্যাপ্টেন হ'লে কি হ'ব, মাইনের বেলায় কিন্তু দু-রকম—ওরা যা পায় তার তুলনায় আমরা আর কি পাই?

চৌধুরী স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে What more do you expect? We are soldiers made and they are born soldiers.

রাহা বলে, তাতে কি? we can follow death as much—

চৌধুরী মাঝখানেই বলে, Gallantry counts!

একজন হেসে বলে, তার মানে? আমরা কি গ্যালাণ্ট নই?

প্রশ্নটা অনেকের মনে লাগে ঃ তাই তো কথাটার মানে কি? সমরের হঠাৎ মনে হয় অরবিন্দবাবু সম্বন্ধে ঐ রকম একটা মন্তব্য করতে চেয়েছিল সে। যুদ্ধে না গিয়েও কি গ্যালাণ্ট হওয়া যায়? চৌধুরীর কথার মানে কি? হয়তো আভিধানিক মানের কথা চৌধুরীর মনে আছে? বীর? সাহসী? মৃত্যুঞ্জয়

হঠাৎ সমরের মনে হয়, দেশাত্মবোধের সংগে যেন 'গ্যালাণ্ট' কথাটার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে।

চৌধুরী বললে, still—

মনে সংশয় জাগাবার মত চৌধুরীর উচ্চারণ-ভঙ্গি। তাইতো!! বীর হয়েও বীর নয়, সাহসী হ'য়েও সাহসী নয় তারা? মানে কি? তাদের 'গ্যালাণ্ট্রির' সংগে তা হলে দেশের কোন সম্বন্ধ নেই? যুদ্ধক্ষেত্রে এই গালভরা কথাটার কি গভীর অর্থই না ছিল! আর আজ এই মুহূর্তে লোকালয়ের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার ক্রোড়ে অবসর বিনোদন করতে ক'রতে হঠাৎ উচ্চারিত ইংরেজী কথাটা দেশী সেনানায়কের

মুখে বিদ্রূপের মত শোনালে—রেশহীন নিঃশব্দ বিদ্রূপ !

তারা যোদ্ধা কিন্তু দেশের সংগে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই ! প্রবীরের কথাগুলি মনে পড়ে —দেশ মানে কি? দেশ মানে তুমি? দেশ মানে আমি? তুমি যুদ্ধ করেচ, আমি বক্তৃতা দিয়েচি, তাতে কি আমরাই দেশ হ'য়ে গেছি ? বড় মর্মান্তিক উপলব্ধি হয় প্রবীরের কথাটার। অপরের জমিদারী রক্ষে করতে যে সব লাঠিয়াল বর্শাফলকে জীবন দেয়, জীবন নেয়, তাদের কথা উত্তরকালে বাড়-বাড়ন্ত সেই জমিদারির ইতিহাস মনে রাখে কি? সেই সব জীবন-তুচ্ছ করা লাঠিয়ালদের মাটির অধিকার কোন দিন হয় কি? সত্যিকারের অধিকারটা আসে কিসে—লাঠিতে না, লাঠি কেনবার ক্ষমতায় ? দেশাত্ম-বোধ কার ?

বড় অদ্ভুত বিভ্রান্তকর প্রশ্ন এখন মনে জাগছে সমরের। মনের সক্রিয়তায় চোখের পাতা ভারি হয়ে ওঠে ঃ আশে-পাশে সব যেন কেমন আবছা আবছা দেখায়। হঠাৎ ঘুম পাওয়ার মত আশপাশের কিছুই যেন মনে ঢোকে না, ছোঁয় না—কি আলাপ করছে এরা? কেষ্টনগরের পটুয়ার হাতে গড়া পুতুল সৈনিকগুলো কথা কইছে না কি ? পুতুল এত বড় তৈরী হয় আজ কাল ?

রাহা তবুও চেয়ে আছে, চোখ না তুলে বাণী বুঝতে পারে। ভদ্রলোকের কাঁধে সুতোয় বোনা তিনটে তারা, ব্যাখ্যা কি? রেবার নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে অনেক জানা আছে। রাহার অনেকখানি কাছ ঘেঁ'যে রেবা এখন বসেছে—হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে ইতিমধ্যে অনেকবার মুখ-মোছা হ'য়ে গেল। রেবা তখন অমন করে' চাই-ছিল কেন? ও কি ভেবেছে—

চৌধুরীর কাঁধে ঐ চকচকে ক্ষুদে রাজ-মুকুটের কি মানে ? দাদার চেয়ে উনি বড় যোদ্ধা নাকি ? অনেক টাকা মাইনে পান ?

হঠাৎ নিস্তব্ধতাটা বড় অস্বস্তিকর লাগে—তার চেয়ে আরো পীড়াদায়ক রেবার হাত নেড়ে মাঝে মাঝে প্রসাধন করাটা ঃ এতগুলো যুদ্ধ ফেরৎ লোকের নগ্ন চোখের ওপর লজ্জা করছে না ওর? কথাবার্তা আলাপের অন্যমনস্কতায় ও জিনিসটা হয়তো অশোভন হতো না।

তাকে দাদা কেন এখানে নিয়ে এলো কে জানে। দাদার ওপর রেবার কোন লোভ আছে নাকি, না দাদারই রেবার ওপর—

রেবা অস্থির হ'য়ে উঠলো—উঠে দাঁড়াতে আঁচলটা আবার খসে গেল। বাণীর হঠাৎ মনে হ'লো চৌধুরীর বোন বেশ সুন্দরী—সাজ-গোছের কৃত্রিমতা না থাকলে ওকে হয়তো আরো সুন্দর দেখাতো। নারীর সৌন্দর্যের যে বস্তু মধ্যমণি তা ওর আছে, এখনো অদমিতই! এই স্খলিত চটুলতায়ই যেন ওকে মানায়। এতক্ষণ বসেছিল, কি রকম বুড়ি বুড়ি দেখাচ্ছিল—চিবুকের রেখা থেকে কটিদেশের রেখা সব কচ্ছপের পিঠের মত একাকার হয়েছিল। চোখ ঘুরিয়ে না দেখলেও বাণী স্পষ্ট বুঝতে পারে ঘরের সকলেই রেবার এই উপছে ওঠাটা নিশ্বেস বন্ধ করে লক্ষ্য করছে। আঁচলটা কুড়িয়ে নিতে এত দেরী হয় কেন ?

রেবা বললে, No, unbearable! হঠাৎ যেন কেমন হ'য়ে ওঠেচ সব!

রাহা হয়তো বুঝলে অভিযোগটা তাকে উদ্দেশ্য করে। সাড়া দিলে না, যেন বুঝতে পারে নি এমনিভাবে রেবার মুখের দিকে এক বার চাইলে। রেবা রাহাকে বুঝেচে কি না সে জানে। এতগুলো লোকের মধ্যে রেবার এই অস্থির অধীরতার মানে কারো কাছে স্পষ্ট নয়। রেবা খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, কিসের যেন
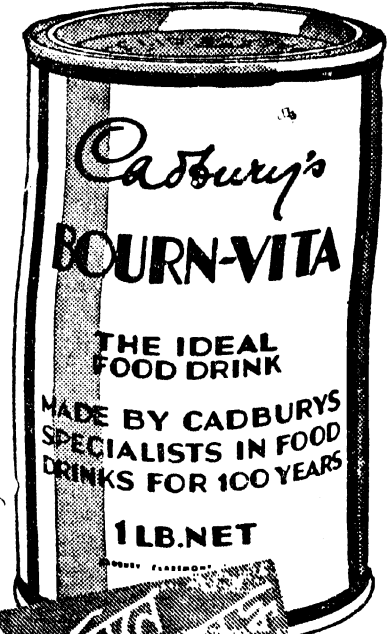
ক্ষা করলে। শেষটা যে বেগে এসেছিল চেয়েও ক্ষিপ্রগতিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ।

পিছন থেকে চৌধুরী ডাকলে ঃ রেবা --কোথা যাচ্ছিস ?

রাহা আরো চেপে সোফার ওপর বসে রইল। দেখলে, রাহা আবার সহজ হ'য়ে উঠেছে। লে গোড়াতে সে যা ভেবেছিল তা নয় কি? কোন জগতের জীব ? চৌধুরীর বোন এলই বা কেন আবার চলেই বা গেল !

সব চেয়ে বাণীর অবাক লাগে, দাদা যেন হ'য়ে গেছে--আলাপ করিয়ে দিতে এসে তা হ'য়ে বসে আছে। দাদার উদ্দেশ্য ?

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করা ছাড়া ন যেন আর কোন কাজ নেই। বুকের ধের হাতের পদমর্যাদা সূচক চিহ্নগুলো লির দাগের মত ধেবড়া। ঘরের দেওয়ালের য়ে অয়েল পেণ্টিং ছবিগুলো তবু বরং রিত্বব্যঞ্জক। চৌধুরীর পূর্বপুরুষরা কি যোদ্ধা লে? প্রতিকৃতিগুলো প্রায়ই গোঁফওলা, ঘোড়ায় ঢ়া। আশ্চর্য ছবিগুলোকে জ্যান্ত মনে হ'চ্ছে। ণী দু-একবার আড়চোখে চৌধুরীকে দেখে লে--দেওয়ালে টাঙান ছবির সঙ্গে ও'র কোন ল আছে ? চৌধুরী সাহেব বেশ লম্বা, পুরুষও বটে ! দাদা ছাড়া ও'কে আর সবার কে স্বতন্ত্র মনে হয়--বড় রাশভারী মনে 'চ্ছে। বেশ ভাল লাগচে এখন দেখতে াকটাকে।

বাণী অস্ফুটে বললে, দাদা ওঠ--এবার !

হঠাৎ ঠেলা খাওয়ার মত ঘরের নিঃশব্দ বহাওয়ার যেন চমক ভাঙল। যে যার আসনে কলে একবার নড়েচড়ে উঠল। রাহার কথাটা বেখাপ্পা শোনালে, সে কি, এর মধ্যে ঠবেন ?

চৌধুরী ধমক দেওয়ার মত বললে, এখানে স কি করবেন তবে? She feels ill at se--রেবাটা উঠে গেল!

কোন বিশেষ সঙ্গে বসে নিজে নিজে যে স্বস্তি বোধ করা যায় তা যদি কেউ আবার তে পেরে উল্লেখ করে তাহ'লে লজ্জার শেষ কে না--অস্বস্তিটা তখন অস্বস্তিকর রকমে ট হ'য়ে ওঠে। বাণীর অস্বীকার করবার ছটা গলা পর্যন্ত এসে আটকে গেল। সে ধুরীকে লক্ষ্য না করলেও চৌধুরী যে তাকে তক্ষণ আপাদমস্তক লক্ষ্য করেছে বুঝতে পারে--মনে কেমন একটা আশঙ্কা আনন্দ জাগে। দাদা কিসের জন্যে তাকে এখানে এনেছে ? বাণী সামনে তাকাতে পারে না--জানালার বাইরে অনেক দূরের আকাশটা এখনো ঘোলাটে, গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ না উঠলে এখন কলকাতাটাকে কলকাতা না মনে করা কি খুব কষ্টকর হতো !

রাহা বেচারা যেন কেমন হ'য়ে গেল। সব তাতে চৌধুরীর কথা বলা চাই। ও'কে বসতে বলে একটু ভদ্রতা করবার উপায় নেই। রেবাকে তো সে বসতে বলেনি ! আর বসে থাকাটা রাহার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে পড়ল। বললে, আচ্ছা, আমি উঠি।

দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে রাহা ফিরে এল। সমরকে লক্ষ্য করে বললে, চলুন না, এক সঙ্গে যাই--হঠাৎ চৌধুরী মুখতুলে এমনভাবে চাইলে রাহা দ্বিরুক্তি না করে পিছন ফিরে দৌড় দেবার মত করলে। শোনা গেল বললে, আচ্ছা তোমরা বস।

মুহূর্তে যে ঘটনাটা ঘটে গেল তার আকস্মিকতায় বাণী অবাক হয়ে যায়--ভদ্রলোক অমন করে' পালালেন কেন, চৌধুরীই বা অমন কটমট করে তাকালেন কেন? বাণী চেয়ে দেখলে রাহা বেরিয়ে যেতে ঘরের সবাই যেন হাসবার চেষ্টা ক'রছে। কৌতুকটা বুঝতে পেরে বাণী মনে মনে হাসলে--সত্যি ভদ্রলোক যেন কি ! কিন্তু কৌতুক হাসির মধ্যেও কেবলি মনে হ'তে লাগল ঃ ভদ্রলোক অমন করলেন কেন ? আর দাদার সঙ্গে যেতে চাইতে চৌধুরীরই বা রাগ হ'লো কেন ? রেবা কি ও'র জন্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে ? আগাগোড়া ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে। দেখেশুনে বাণীর যা মনে হ'চ্ছে তা যেন স্পষ্ট করে' বোঝান যায় না--উপস্থিত বীরপুঙ্গবদের হাসাহাসিতে রাহার ব্যবহারের যথাযথ ব্যাখ্যাও হয় না। এ'দের সান্নিধ্য সত্যই অসহ্য!

এক সময় চৌধুরী বললে,--childish!

সিগারেটের ছাই ঝাড়ায় চৌধুরীর মন্তব্যটা মিলিয়ে গেল। খেই হারানো আলাপের সূত্র ধরে টানবার মত মনের স্থৈর্য যেন এ'রা হারিয়ে ফেলেছে--পরস্পরকে পরস্পর দেখা ছাড়া এখন আর কোন কাজ নেই। মেজর চৌধুরীকেই কেবল দেখা যায়--ও'র সামনে এ'রা যেন কিছু নয়।

সমর উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাণীও ওঠে। একটু অপ্রস্তুতের মত সমর বলে, আজ উঠি, বেলা হয়ে গেল। একদিন সময় করে চৌধুরী সাহেব কি আমার ওখানে আসবেন ?

যতটা আগ্রহ দেখান উচিত চৌধুরীর জবাবে যেন ততটা আগ্রহ প্রকাশ পায় না ঃ Surely! why not! হঠাৎ বাণীর মনে হয় দাদার নিমন্ত্রণটা বড় মন-রাখা ভিক্ষার মত। যুদ্ধক্ষেত্রের মর্যাদাটা এখানে না-দেখালে এমন কি ক্ষতি ছিল ! উনি মেজর বলে' দাদা কি ও'কে খোসামোদ করছে, তাও ভদ্রলোকের দেমাক কি উদাস অবহেলার মত।

গেটের কাছে রেবার সঙ্গে দেখা হ'লো। হঠাৎ চেনা যায় না, সে মূর্তিই আর নেই। সমরকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করলে ঃ বললে--আবার আসবেন কিন্তু।

বেশ সপ্রতিভ আলাপ, এ যেন রেবার আর একরূপ। বাণী চেয়ে চেয়ে দেখে ইতিমধ্যে রেবা বেশবাসও অনেক বদলে ফেলেছে। খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে, সাদাসিদে করে' একখানি শাড়ি পরা--এমন একটা নির্লিপ্ত স্নিগ্ধতা এখন ওকে ঘিরে আছে যা মনকে সহজে টানে। খোলা চুলের পিঠে মুখাবয়বটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। ভাইবোন বেশ লম্বা।

সমর বললে, আসবো।

ও'কে নিয়ে আসবেন কিন্তু, আলাপ হ'লো না।--আলাপ না হওয়ার জন্যে রেবাকে এখন দুঃখিত মনে হ'লো।

বাণী বললে, আপনাকে কিন্তু আমাদের বাড়ী আসতে হ'বে।

সহসা রাস্তার মাঝখানে হৃদ্যতাটা যেন উপচে উঠেছে। এত সহজ কথাবার্তা ঘরের মধ্যে যেন রুদ্ধ ছিল--সোফাকৌচে বসার আড়ষ্টতায় পোষাক পরিচ্ছদের বন্ধনে স্বচ্ছন্দ আলাপটা ব্যাহত হ'য়েছিল। এখন চৌধুরীর বোন রেবা এটা মেনে নিতে স্বীকার করতে মনে আর কোন সংশয় জাগে না বা মন বিরূপ হ'য়ে ওঠে না। নিজের আত্মীয়ার মত হৃদ্যতার সঙ্গেই গ্রহণ করা যায়।

সমর বললে, নিশ্চয়ই আনবো।

রেবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে গেটটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালে রাস্তার মোড়ে অনেক দূরে এসে বাণীর মনে হ'লো চৌধুরী বাড়ীর গেটটা শব্দ করে সবে বন্ধ হলো ঃ কি'-ই-ও-ক্লিচ-চ। এতক্ষণ রেবা দাঁড়িয়েছিল তাদের জন্যে ? রাস্তা চলতে চলতে বাণীর একবার এমনি মনে এ'লো ঃ চৌধুরীর বোনের সঙ্গে দাদার বিয়ে হ'লে কেমন হয় ! খুব অসম্ভব কি ? মন্দ কি !

ক্রমশঃ

টাট্‌কা জল একবার মাত্র ফুটিয়ে ব্যবহার করবেন।
১
ভালো
চা
তৈরির
৫
টি
সহজ
নিয়ম
২
চা ভেজাবার আগে পট্‌টা গরম করে নেবেন।
৩
মাথা-পিছু এক চামচ আর ঐ সঙ্গে আর এক চামচ বেশি চা নেবেন।
৪
চা-টা তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ভিজতে দেবেন।
৫
কাপে চা ঢালার পর দুধ চিনি মেশাবেন।
চা
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্‌প্যান্‌শন্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
* ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও তামিল ভাষায় "চা তৈরির খুঁটিনাটি" নামে একখানা পুস্তিকা, ইণ্ডিয়ান্‌ টী মার্কেট একস্‌প্যান্‌শন্‌ বোর্ড, ৩১ নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় ভাষার উল্লেখ করে চিঠি লিখলেই বিনামূল্যে পাঠানো হবে।
ITX 313

পশ্চিম বঙ্গের অর্থকথা

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ

কাগজ শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে কাগজের মিলের সংখ্যা ১৪ হইবে; অবশ্য যে সকল মিলে "পেপার বোর্ড", "স্ট্র-বোর্ড" প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে কাগজের কারখানার অন্তর্ভুক্ত করিলেই এই সংখ্যা ১৪ হইবে। কেবলমাত্র কাগজ প্রস্তুত করিবার মিলের সংখ্যা অবশ্যই কম হইবে। ১৯৪৪ সালে সমগ্র ভারতবর্ষেই বৃহদায়তন কাগজের মিলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭। তাহার ভিতরে বাঙলা দেশে অবস্থিত মিলের সংখ্যা ছিল ৫; কিন্তু বাঙলা দেশের এই সকল মিলে সর্বভারতীয় উৎপাদনের প্রায় ৫০% ভাগ কাগজ প্রস্তুত হইত। কিন্তু এই উৎপাদন প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় যে অনেক কম ছিল, তাহা সেই সময়কার কাগজ আমদানী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙলা দেশে কুড়ি লক্ষ টাকায় ৮৫ হাজার ৭ শত হন্দর 'প্যাকিং' কাগজ, ৮৪২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকায় ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার হন্দর 'প্রিণ্টিং' কাগজ, ৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকায় ২৭ হাজার ৭ শত হন্দর লিখিবার কাগজ, ৬৫ হাজার টাকায় ১৩ হাজার ৬ শত হন্দর 'ব্লটিং' কাগজ এবং ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকায় ৯ হাজার হন্দর অন্যান্য কাগজ বাহির হইতে আমদানী করা হইয়াছে। কিন্তু কাগজ শিল্প সম্পর্কে বাঙলা দেশের এই পরনির্ভরতা সত্ত্বেও পশ্চিম বাঙলায় এই শিল্পটিকে গড়িয়া তুলিবার যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যে সকল অনুকূল অবস্থার উপরে কাগজ শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে, মোটামুটিভাবে তাহার সবগুলিই পশ্চিম বাঙলায় পরিলক্ষিত হইবে। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-২৪ পরগণার বনভূমি হইতে সহজেই প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বর্ধমান জিলার কয়লা খনি হইতে স্বল্প খরচায় শক্তি উৎপাদন করা সম্ভবপর। প্রদেশের অসংখ্য নদ-নদী থাকিবার ফলে জল সরবরাহের ব্যবস্থার কোন অসুবিধা হইবার কারণ নাই। কেবলমাত্র যানবাহন চলাচলের সুবিধার দিকে নজর রাখিয়া উৎপাদন-কেন্দ্র নির্বাচন করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন জিলায় যে বাঁশ পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্বল্প খরচে বাঁশের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কাগজের কারখানায় ব্যবহার করিতে পারিলে যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে। ১ প্রদেশের নদী, নালা, বিল, জলাভূমিতে যে সকল কচুরীপানা রহিয়াছে, তাহাও কাগজের কারখানাসমূহে, বিশেষত পেস্টবোর্ড প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হস্ত-প্রস্তুত যে সকল কাগজ পাওয়া যায়, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হুগলী জিলার সাহাবাজার, খাটিপুর, গঙ্গানগর, দেউলপাড়া, কলসা প্রভৃতি স্থানে, মুর্শিদাবাদ জিলার সামসেরগঞ্জ থানায় এই সকল কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল কাগজ উৎপাদন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সহজেই প্রদেশের সর্বত্র পাওয়া যাইতে পারে। কারিগরদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উপযুক্ত কাঁচা মাল ব্যবহার এবং উন্নততর ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহার দ্বারা সহজেই এই কুটীরশিল্পটিকে ভালভাবে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে।

কাঁচ শিল্প

পশ্চিম বাঙলায় বর্তমানে ২৮টি কাঁচ ও কাঁচ-দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে। অবিভক্ত বাঙলা দেশে কাঁচ শিল্প প্রধানত দুইটি প্রধান কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল : একটি কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্র, অপরটি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র। বিক্রয়ের সুবিধার জনাই কাঁচ শিল্প যে এই ২টি স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। অবিভক্ত বাঙলা দেশের এই দুইটি কেন্দ্রের ভিতরে কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙলা দেশে ১৯টি কাঁচ শিল্পের কারখানা ছিল; ইহাদের ভিতরে ১৬টি কারখানা কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল; এই সকল কারখানায় নিযুক্ত বাঙালী এবং অ-বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৩৮০। প্রায় ১৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার কাঁচের জিনিস এই সকল কারখানায় প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইত। এই সময়ে পূর্ব-বাঙলায়, অর্থাৎ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩; শ্রমিকের সংখ্যা ৫৭০। প্রতি বৎসর পূর্ব-বাঙলার এই সকল কারখানায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার কাঁচের জিনিসপত্র প্রস্তুত হইত। ১৯৪৩-৪৪ সালের এই হিসাব হইতে কাঁচ শিল্পে পূর্ব বাঙলার তুলনায় পশ্চিম বাঙলার প্রাধান্য সহজেই প্রমাণিত হইবে। যুদ্ধের সময়ে পশ্চিম বাঙলায় কাঁচ শিল্প অন্তত সাময়িক-ভাবে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে প্রদেশে ২৮টি কাঁচ ও কাঁচ-দ্রব্যের কারখানা আছে, পূর্বেই বলা হইয়াছে। উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি, উৎপাদনকারীদের উপযুক্ত সংগঠন, কারিগরদের উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং প্রদেশে টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা দ্বারা পশ্চিম বাঙলায় কাঁচ শিল্পের উন্নতি বিধান সহজেই করা যাইতে পারে।

1. Indian Forest Records, Vol. XIV Parts I-II.

চামড়ার কারখানা

পশ্চিম বাঙলায় বর্তমানে দশটি চামড়ার কারখানা আছে। ইহার ভিতরে ২৪ পরগণা জিলায় আটটি কিম্বা নয়টি কারখানা আছে এবং কলিকাতায় একটি কারখানা আছে। ১৯৪৪ সালের হিসাব অনুসারে ২৪ পরগণায় ৮,৪৪১ জন এবং কলিকাতায় ৫৮ জন এই কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের হিসাব অনুসারে ৮৪৯৯ জন ব্যক্তি চামড়া শিল্পের উপর নির্ভরশীল। ১৯৪৪ সালের পরে এই সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, এইরূপ মনে করিবার যুক্তিসংগত কারণ আছে।

সাবানের কারখানা

কাঁচ শিল্পের ন্যায় সাবান শিল্পও অবিভক্ত বাঙলা দেশে প্রধানত দুইটি কেন্দ্রে গড়িয়া উঠিয়াছিল : একটি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র, অপরটি কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্র। ইহাদের ভিতরে কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেবলমাত্র যৌথ কোম্পানী হিসাবে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাব লইলে দেখা যায়, ১৯৩৯-৪০ সালে অবিভক্ত বাঙলা দেশে মোট ১২০টি সাবানের কারখানা ছিল। ইহার ভিতরে কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্রে কারখানার সংখ্যা ছিল ৭২; ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের সংখ্যা মাত্র ৪৮। এই সকল প্রতিষ্ঠানে মোট ৫১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছিল : কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের গড়ে মূলধন ছিল ৬৪ হাজার চারশত টাকা, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মাত্র নয় হাজার তিনশত টাকা। কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট প্রায় দুই হাজার ছয়শত কর্মী নিযুক্ত ছিল; ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭১৫। উৎপাদন ক্ষেত্রেও দেখা যায়,

কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি বৎসর ৭৪১৯ টন প্রসাধন-সাবান এবং ২২,৮৬৬ টন কাপড়-ধোয়া সাবান প্রস্তুত হইয়াছে; ইহাদের আর্থিক মূল্য ছিল যথাক্রমে ৬৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা এবং ৬৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে প্রতি বৎসর ২৬১ টন প্রসাধন-সাবান এবং ১০১৪ টন কাপড়-ধোয়া সাবান প্রস্তুত হইয়াছে; ইহাদের আর্থিক মূল্য ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। পশ্চিম বাঙলা এবং পূর্ব-বাঙলায় সাবান উৎপাদনের এই হিসাবে অবশ্য কেবলমাত্র যৌথ কোম্পানীগুলিকে ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ব্যক্তিগত স্বত্ত্বাধিকারে এবং অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বহু সাবানের কারখানা কাজ করিতেছে। তাহা ছাড়া, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র এবং কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্র ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার বহু স্থানে ছোট ছোট সাবানের কারখানা রহিয়াছে। যাহাই হউক, পূর্ব-বাঙলার তুলনায় পশ্চিম বাঙলায় সাবান শিল্প যে অনেক বেশি প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা উপরের হিসাব হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে শ্রমিকের মজুরী তুলনায় কম; সাবান উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় চর্বি সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য। কিন্তু কলিকাতা-হাওড়া কেন্দ্রের বিশেষ সুবিধা এই যে, সাবান উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় উপকরণ অত্যন্ত সস্তায় বাহির হইতে আমদানী করা সম্ভবপর। বর্তমানে প্রদেশের অধিবাসীরা মাথাপিছু ½ পাউন্ড প্রসাধন-সাবান এবং ½ পাউন্ড কাপড়-ধোয়া সাবান ব্যবহার করে। জীবনধারণের মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহৃত সাবানের পরিমাণও যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে সাবান শিল্পের প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

রসায়ন ও রঞ্জন শিল্প

১৯৪৪ সালের হিসাব অনুসারে পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশে রাসায়নিক দ্রব্য, বিভিন্ন রং প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কারখানার সংখ্যা ছিল ১৩৩; এই সকল কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২০,৪৭১। এই সকল কারখানার মধ্যে বর্ধমান জিলায় ৮টি, বীরভূম জিলায় ৩টি, বাঁকুড়া জিলায় ৩টি, মেদিনীপুর জিলায় ১টি, হাওড়া জিলায় ২২টি, হুগলী জিলায় ৭টি, ২৪ পরগণা জিলায় ৭৩টি, কলিকাতায় ১৪টি, মুর্শিদাবাদ জিলায় ২টি কারখানা অবস্থিত ছিল। এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও ২৪ পরগণা জিলায় সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল; ১৯৪৪ সালে ২৪ পরগণায় প্রায় ১৪ হাজার ৭ শত; হাওড়া জিলায় ২ হাজার ৪½ শত; হুগলী জিলায় প্রায় এক হাজার দুই শত শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল। কেবলমাত্র রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, এইরূপ কারখানার সংখ্যা ১৯৪৭ সালের হিসাব অনুসারে পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশে ৭১টির বেশি হইবে না। অবিভক্ত বাঙলা দেশে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা ছিল, তাহাদের সঠিক উৎপাদন নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। উৎপাদনের যে হিসাব মোটামুটিভাবে পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, বাঙলা দেশের এই সকল প্রতিষ্ঠান বাৎসরিক ১১১৭০ টন (সর্বভারতীয় উৎপাদনের ৫৩% ভাগ) সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড প্রস্তুত করিতে পারে। তাহা ছাড়া অ্যালকোহল এবং কস্টিক সোডা উৎপাদনের পরিমাণও সর্বভারতীয় উৎপাদনের ২৫% ভাগ এবং ১৭% ভাগ হইবে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে সকল ছোটবড় কারখানা রহিয়াছে, তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করাও সহজ নহে। তবে অবিভক্ত বাঙলার রসায়ন-দ্রব্যের কারখানার অধিকাংশই পশ্চিম বাঙলায় অবস্থিত; কাজেই মোট উৎপাদনেরও বৃহদাংশই যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের হইবে তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

অন্যান্য শিল্প ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে বর্তমানে ৩৮৭টি ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের কারখানা আছে। ১৯৪৪ সালে ইহার সংখ্যা আরও বেশি ছিল; সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে প্রায় ৪০৯টি প্রতিষ্ঠান ছিল। জিলাসমূহের ভিতরে ২৪ পরগণা জিলায় ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের কারখানার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি ১৮২টি ছিল। ২৪ পরগণা জিলার পরেই হাওড়া জিলার স্থান—হাওড়া জিলায় কারখানার সংখ্যা ১৫৪ ছিল। তাহা ছাড়া বর্ধমান জিলায় ১৩টি, বাঁকুড়া জিলায় ২টি, মেদিনীপুর জিলায় ৬টি, হুগলী জিলায় ৩টি, কলিকাতায় ৪৪টি, নদীয়া জিলায় ২টি, জলপাইগুড়ি জিলায় ১টি এবং দার্জিলিং জিলায় ২টি কারখানা ছিল। এই সকল কারখানায় নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার। ইহার ভিতরে ২৪ পরগণা জিলায় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬৩ হাজার ৩ শত; হাওড়া জিলায় ৩৩ হাজার ৮ শত; মেদিনীপুর জিলায় ৮ হাজার ৭ শত; বর্ধমান জিলায় প্রায় ৬ হাজার ৭ শত এবং কলিকাতায় ৩ হাজার ১ শত।

পশ্চিম বাঙলায় বর্তমানে ১২টি বিজলী-পাখার এবং ৪টি বিজলী-বাতির কারখানা আছে। যুদ্ধের পূর্বে ইহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪টি এবং ৩টি। প্রদেশে এ্যালুমিনিয়াম, তামা এবং পিতলের কারখানার সংখ্যা ১৮ হইবে। অবিভক্ত বাঙলা দেশে কাঁসা এবং পিতলের কাজে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল ১১,৩৩৯। সেই সময়ে প্রদেশে প্রতি বৎসর ৭৫,৩৭০ মণ পিতলের জিনিস এবং ৫১,২৩৯ মণ কাঁসার জিনিস প্রস্তুত হইত। ইহাদের আর্থিক মূল্য ছিল যথাক্রমে ২১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং ৩২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া কাঁসার জিনিসের জন্য বিখ্যাত। প্রদেশে কাঁসা ও পিতল শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে শিল্পের ক্রমাবনতি অত্যন্ত বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় শিল্প তথ্যসংগ্রহ সমিতির হিসাব অনুসারে, প্রতিটি শ্রমিকের মাসিক আয় মাত্র ২২ টাকা অথচ মহাজনদের মাসিক আয় ২৫০ টাকার কম হইবে না। প্রদেশের অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বিস্কুটের কারখানা, রঙ এবং বার্ণিশের কারখানা, লোহা এবং ইস্পাত গলাইবার কারখানা, সেলাইর কলের কারখানা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৪৭ সালের হিসাব অনুসারে, ১০টি বিস্কুট এবং মিঠাইর কারখানা, ১৫টি রঙ এং বার্ণিসের কারখানা, ১৪টি কাঠের বাক্সের কারখানা, ১৮টি লোহা-ইস্পাত গলাই-বার কারখানা, ১টি বাইসাইকেলের কারখানা, ১টি সেলাইর কলের কারখানা আছে।

অন্যান্য অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদ : রাস্তা ও পথ

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের কৃষি সম্পদ, প্রাণি সম্পদ, বন সম্পদ, খনিজ সম্প এবং শিল্প সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করা হইল। কিন্ত এই সকল ছাড়াও আরও কয়েকটি অর্থ নৈতিক শক্তি ও সম্পদ রহিয়াছে, যাহা প্রদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য। এ সকল শক্তি ও সম্পদের উপর প্রদেশের ভবিষ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নও বিশেষভাবে নির্ভ করিতেছে। যে কোন দেশের অর্থনীতি যান-বাহন এবং লোক চলাচলের জন্য রাস্ত ঘাট, জিনিসপত্র আনা-নেওয়া এবং লোক যাতায়াতের জন্য ট্রেন-পথ ও নৌ-পথের গুরু অবশ্য স্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে সকল পাকা রাস্তা সরকারী পাব্লিক ওয়ার্ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, তাহার প মাণ, ১৯৪৭ সালের হিসাব অনুসারে, ১,১ মাইল হইবে। ইহা ছাড়া, যে সকল প রাস্তা ডিস্ট্রিক্ট এবং লোক্যাল বোর্ডের ত বধানে রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ, ১৯ সালের হিসাব অনুসারে, ২,৪৬২ মাইল হই অর্থাৎ প্রদেশে মোট ৩৬০২ মাইল পাকা র রহিয়াছে। বনগাঁ এবং গাইঘাটা থানার র এবং যে সকল রাস্তা সাময়িকভাবে (১৯ সালে) সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে তাহা ধরিলে প্রদেশের পাকা রাস্তার পরি আরও কিছু বেশী হইবে। পশ্চিমবঙ্গ প্র ১৯৪৪ সালের হিসাব অনুসারে, ৮, মাইল কাঁচা রাস্তা এবং ১৩,১০৮' গ্রাম্য রাস্তা ডিস্ট্রিক্ট এবং লোকাল বে

তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রদেশে মোট ৩১,৭৬০ মাইল কাঁচা রাস্তা রহিয়াছে। এই সকল রাস্তা ছাড়াও যে সকল রাস্তা অন্যান্য তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে এবং যে সকল নূতন রাস্তা ১৯৪৪ সালের পরে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা ধরিলে প্রদেশে কাঁচা রাস্তার পরিমাণ নিশ্চয়ই অনেক বেশী হইবে। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় প্রদেশের পক্ষে ৩,৬০২ মাইল পাকা রাস্তা যে নিতান্তই অপর্যাপ্ত; তাহা বিশদ্ভাবে না বলিলেও চলে। প্রদেশের জেলাসমূহের ভিতরে বর্ধমান জেলায় পাকা রাস্তার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী—৫৬২ মাইল হইবে; বর্ধমান জেলার পরেই মেদিনীপুর জেলার স্থান—মেদিনীপুর জেলায় ৫৪৮ মাইলের বেশী পাকা রাস্তা রহিয়াছে। মালদহ জেলায় পাকা রাস্তার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম—৪১ মাইলের বেশী হইবে না। দিনাজপুর জেলায় পাকা রাস্তার পরিমাণও মাত্র ৪৮ মাইল হইবে। প্রদেশের জেলাসমূহের ভিতরে কাঁচা রাস্তার পরিমাণ পূর্বেকার নদীয়া জেলায় সর্বাপেক্ষা বেশী ; প্রদেশের মোট ৩১,৭৬০ মাইল কাঁচা রাস্তার ভিতরে কেবলমাত্র নদীয়া জেলাতেই ৬৪০৩ মাইল কাঁচা রাস্তা রহিয়াছে; ২৪ পরগণা জেলাতেও ৫১৭৪ মাইল কাঁচা রাস্তা রহিয়াছে; দার্জিলিং জেলায় কাঁচা রাস্তার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম—৩৩২ মাইলের বেশী হইবে না। জলপাইগুড়ি জেলাতেও কাঁচা রাস্তার পরিমাণ খুব বেশী নহে—৫০৬ মাইলের বেশী হইবে না।১

পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য নদ, নদী, খাল ও নালা রহিয়াছে। সমগ্র প্রদেশে জলপথের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। মোটামুটিভাবে যে হিসাব পাওয়া যায়, তাহাতে প্রদেশে প্রায় ৫৫০ মাইল জলপথ আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; ইহার ভিতরে ৪২০ মাইল পথে সারা বৎসর চলাচল করা সম্ভবপর। প্রদেশে মোট ১৯৩১ মাইল রেলপথ আছে। ইহার ভিতরে "ব্রড গেজ" ৩৭৭ মাইল, "মিটার গেজ" ১৫৩৬ মাইল এবং "ন্যারো গেজ" ১৮ মাইল।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে লোক ও যানবাহনের চলাচলের জন্য যে রাস্তা রহিয়াছে, তাহা যে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপর্যাপ্ত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং রাস্তা পথের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কার্যকারণ সম্পর্ক রহিয়াছে। আগামী বিশ বৎসর প্রদেশের আর্থিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ রাখিয়া যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনায় যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আগামী ২০ বৎসরে প্রায় ৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩,১৭৮ মাইল নূতন রাস্তা নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার ভিতরে সর্বভারতীয় যোগাযোগের রাস্তার জন্য মাইল প্রতি ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৬২০ মাইল রাস্তা, প্রাদেশিক যোগাযোগের জন একই ব্যয়ে ১০৪৫ মাইল রাস্তা, জেলার ভিতরে যোগাযোগের জন্য মাইল প্রতি ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ২৭৬৬ মাইল প্রধান রাস্তা এবং মাইল প্রতি ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে, ২৭০৬ মাইল অন্যান্য রাস্তা এবং গ্রামের অভ্যন্তরে যোগাযোগের জন্য মাইল প্রতি ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৬০৩২ মাইল নূতন রাস্তা নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনাতে আগামী পাঁচ বৎসরে প্রদেশের যে রাস্তা-পথের প্রয়োজন হইবে, তাহারও একটি হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় আগামী ৫ বৎসরে মোট ২০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫২৯ মাইল নূতন রাস্তা নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। পরিকল্পনা অনুসারে, মাইল প্রতি ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ২৯৮ মাইল সর্ব ভারতীয় যোগাযোগের জন্য নূতন রাস্তা, একই ব্যয়ে ৫৪৬ মাইল প্রাদেশিক যোগাযোগের নূতন নূতন রাস্তা, মাইল প্রতি ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫৩৪ মাইল জেলার প্রধান রাস্তা, মাইল প্রতি ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে জেলার অন্যান্য রাস্তা এবং মাইল প্রতি ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১০ মাইল গ্রাম্য রাস্তা নির্মাণ করিতে হইবে। (২)

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

যে কোন দেশের অর্থনীতিতে অধিবাসীদের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে অধিবাসীদের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা নিতান্তই অপর্যাপ্ত। ১৯৪২ সালের হিসাব অনুসারে, সমগ্র প্রদেশে সরকারী খরচায় ১৫টি, স্থানীয় অর্থ সাহায্যে ৩২১টি, ব্যক্তিগত সাহায্যে ৬০টি, ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে ২০৪টি এবং গ্রামসমূহে ২৪টি হাসপাতালে চিকিৎসা চলিতেছে। এই সকল হাসপাতালে মোট ৫৬৫০ জন রোগী (৩৩৬৭ পুরুষ এবং ২,২৮৩ স্ত্রী) ভর্তি করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১৯৪২ সালে এই সকল হাসপাতালে মোট ৯৪,৬০২টি রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে এবং ৩,৭৭৭,০৮৩টি রোগীকে বহির্বিভাগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।৩ কিন্তু ১৯৪২ সালের পরে প্রদেশে হাসপাতালের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সময় বহু হাসপাতালের ব্যবস্থা সাময়িকভাবে করা হইয়াছিল; যুদ্ধের পরেও এই সকল হাসপাতালগুলিকে চালু রাখা হইয়াছে।৪ এই সকল হাসপাতালে ৬,১৫০ জন রোগী ভর্তি করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, ১৯৪২ সালের পরে যে সকল নূতন হাসপাতাল নির্মাণ করা হইয়াছে কিংবা পুরাতন হাসপাতালকে পুনর্গঠন কর হইয়াছে, তাহাতে বর্তমানে প্রদেশের হাসপাতালসমূহে ১৪ হাজারের বেশী রোগী ভর্তি করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, এইরূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে। কিন্তু প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় এই চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতান্তই সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইতে বাধ্য। জনস্বাস্থ্য তদন্ত ও উন্নয়ন কমিটির (ভার কমিটি) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম বাঙলায় মোট ২৫জন তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসক, ৩৪৩৩ জন অন্যান্য চিকিৎসক, ১৫২৮৪জন অন্যান্য কর্মচারী এবং ২৬৮৪১জন রোগীকে ভর্তি করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।৫

শিক্ষা

পশ্চিম বাঙলা প্রদেশে শিক্ষিতের হার ২০·৩৭% ভাগ হইবে; ২১ বৎসরের নিম্নে যাহাদের বয়স, তাহাদের ভিতরে শিক্ষিতের সংখ্যা ১৪·৭৬% হইবে; ২১ বৎসরের ঊর্ধে শিক্ষিতের হার ২৫·৬৩% ভাগ হইবে। শিক্ষিতের হার কলিকাতায় সর্বাপেক্ষা বেশী—৫৩·৮৬% ভাগ হইবে। জেলাসমূহের ভিতরে হাওড়া জেলায় শিক্ষিতের হার সর্বাপেক্ষা বেশী—২৮·২৭% হইবে। হুগলী জেলায় শিক্ষিতের হার—২৩·২১% ২৪ পরগণা জেলায় ১৯·৩৬% এবং মেদিনীপুর জেলায় ১৮·১৯%। প্রদেশের মোট ১৩৫২১টি প্রাইমারী স্কুলে বর্তমানে ৯১৬,৬৬৮টি ছাত্রছাত্রী পড়িতেছে। ইহাদের ভিতরে ১২·৮৬৮টি স্কুলে ৮৩২,৯২৮টি ছাত্র এবং ৬৫৩টি স্কুলে ১৬৩,৭৪০টি ছাত্রী পড়িতেছে। প্রদেশের মোট ৯৭৪টি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ১২৪,৫৪৩টি ছাত্রছাত্রী পড়িতেছে। পশ্চিম বাঙলায় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭১৮; ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৫৭,৪৩২। ইহা ছাড়াও মাদ্রাসা, টোল প্রভৃতি যে সকল বিদ্যায়তন প্রদেশে রহিয়াছে, সেই সকল বিদ্যালয় ধরিলে প্রদেশে মোট স্কুলের সংখ্যা ১৬,৭০৬ হইবে; মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার হইবে। ১৯৪৭ সালের হিসাব অনুসারে প্রদেশে ৯টি সরকারী কলেজ, ১০টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ৩৪টি

1. Compiled from Annual Resolution Reviewing the Reports on the working of District and local Boards; Statistical Abstract, West Bengal, 1948.

2. Post War Reconstruction Programme in Bengal.

3. Compiled from Annual Report on the working of Hospitals and Dispensaries in Bengal.
Statistical Abstract, West Bengal, 1948 p. 31-32.

4. Auxiliary-Government & Famine Relief Emergency Hospitals.

5. Report of the Health Survey & Development Committee, 1946.

কলেজ সরকারের কোন সাহায্য ছাড়াই চলিতেছে। প্রদেশে মোট ৬টি ট্রেনিং কলেজ রহিয়াছে; ইহার ভিতরে ২টি সরকারী এবং ২টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। কারিগরী শিক্ষার জন্য প্রদেশে ৪টি সরকারী এবং ৩টি বেসরকারী কলেজ রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও বিশেষ কারিগরী শিক্ষার জন্য ২টি সরকারী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই প্রসংগে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪৭ সালের পরে এক বৎসরের ভিতরে পশ্চিমবংগ প্রদেশে স্কুল-কলেজের সংখ্যা, বিশেষত কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।১

প্রদেশে আয়তন এবং অধিবাসীদের প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলে পশ্চিম বাঙলার শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্তই অনুন্নত এবং ত্রুটিবহুল বলিয়া অবশ্যই বিবেচিত হইবে। প্রদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেরূপ নানা দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ, অন্যদিকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্তই নগণ্য। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যে সকল পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে, তাহাদের নিরিখে প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যে দুইটি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, তাহা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা এবং সার্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইটি পরিকল্পনার কোনটিকেই সর্বতোভাবে আধুনিক প্রয়োজনের এবং বর্তমান অবস্থার পক্ষে উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

তাহা হইলেও এই দুইটি পরিকল্পনাতেই মূলত বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার বহুক্ষেত্রেই ইহাদের প্রস্তাবকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সার্জেণ্ট পরিকল্পনা অনুসারে বুনিয়াদী শিক্ষাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছেঃ প্রাথমিক স্তর ও পরবর্তী স্তর। প্রাথমিক স্তরে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালকেরা শিক্ষালাভ করিবে; মাধ্যমিক স্তরে তাহারা ১১ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত তিন বৎসর শিক্ষালাভ করিবে। কিন্তু যাহারা মেধা, বুদ্ধি ও উচ্চাভিলাষ দ্বারা উচ্চ শিক্ষালাভের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহারা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়াই উচ্চ শিক্ষার স্তরে প্রবেশলাভ করিবে।

কারিগরী শিক্ষার জন্য টেক্‌নিক্যাল এডুকেসন কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, *তাহাতে তিন প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছেঃ প্রাথমিক কারিগরী, শিল্প কিংবা বাণিজ্য বিদ্যালয়; উচ্চ কারিগরী বিদ্যালয় এবং উন্নত কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। শেষোক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরীতে নিযুক্ত* কর্মীদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

যাহাই হউক, সার্জেণ্ট পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবংগ প্রদেশে প্রায় ১৫৬২৫০ জন শিক্ষকের প্রয়োজন; ইহার ভিতরে ৮৭৪০৯ জন শিক্ষক প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য, মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ৪১৮০০ জন শিক্ষক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ২৬০৪১ জন শিক্ষক প্রয়োজন। সার্জেণ্ট কমিটির হিসাব অনুসারে, বুনিয়াদী শিক্ষা, প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা এবং শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য মোট প্রায় ২১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে; তাহা ছাড়া বিদ্যালয়-গৃহ প্রভৃতি নির্মাণ করিবার জন্য এককালীন প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে; অর্থাৎ নূতন শিক্ষা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে পশ্চিমবংগ প্রদেশে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অবশ্য পরিকল্পনাটি যখন সম্পূর্ণ কার্যকরী হইবে, কেবলমাত্র তখনই ২১ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে; তাহার পূর্বে নহে। তাহা ছাড়া এই খরচা হইতে ছাত্রদের নিকট হইতে প্রাপ্য মাহিনাও বাদ দিতে হইবে। ১

জলসেচন ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাব অনুসারে সমগ্র পশ্চিমবংগ প্রদেশে মোট ১৬,৪৭,৫৩১ একর জমিতে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালে ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলনায় বেশী জমিতে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন করা হইয়াছে। সরকারী হিসাবে দেখা যায়, সেই বৎসর মোট প্রায় ১৮ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে জল সেচন করা হইয়াছে। যে সকল বিভিন্ন উপায়ে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার ভিতরে খাল বা নালার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৪৩-৪৪ সালে ২৪৪,২৭৭ একর জমিতে সরকারী খালের সাহায্যে জল-সেচন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জল-সেচনের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন গ্রামে-পল্লীতে যে সকল খাল কাটা হইয়াছে, তাহার গুরুত্বও সামান্য নহে। ১৯৪৩-৪৪ সালে এই সকল খালের সাহায্যে ২০৯,৫৫৭ একর জমিতে জল-সেচন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পুষ্করিণীর সাহায্যে ১৮,৮৫৩ একর জমিতে, কূপের সাহায্যে ১৮,৮৫৩ একর জমিতে এবং অন্যান্য উপায়ে ৩৬৭,৪৭২ একর জমিতে জল-সেচন করা হইয়াছে। *কৃত্রিম জল-সেচন ব্যবস্থা দ্বারা যে সকল শস্যক্ষেত্রে জল-সেচন করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ধানের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী জমিতে জল-সেচন করা হইয়াছে।* ১৯৪৩-৪৪ সালের ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে ধান, ১৩২ হাজার একর জমিতে গম, ৬১ হাজার একরের বেশী জমিতে বিভিন্ন প্রকার ডাল, প্রায় ৩৩ হাজার একর জমিতে অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং প্রায় ২৪ হাজার একর জমিতে ইক্ষু জল-সেচ ব্যবস্থার সুবিধা পাইয়াছে। প্রদেশের জেলাসমূহের ভিতরে বাঁকুড়া জিলায় জল-সেচ ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসারলাভ করিয়াছে; বাঁকুড়ার পরে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং বীরভূম জিলার স্থান। ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাব অনুসারে, বাঁকুড়া জিলার ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার একরের বেশী জমিতে, বর্ধমান জিলার ৩ লক্ষ ১৬ হাজার একরের বেশী জমিতে, মেদিনীপুর জিলার ২ লক্ষ ৫৫ হাজার একরের বেশী জমিতে এবং বীরভূম জিলার ২ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জমিতে জল-সেচন করা হইয়াছে।১

---

1. Statistical Abstract, West Bengal, 1948.

সম্প্রতি পশ্চিমবংগ সরকার শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি প্রচেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে সকল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমানে প্রদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন চলিয়াছে।

1. Sergent Committee Report; Report of the Technical Education Committee.

1. Compiled from the Annual Irrigation Revenue Report, Bengal; Season and Crop Report of Bengal.

পশ্চিম বাঙলার মুমূর্ষু নদীসমূহের জলপ্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, কৃষিক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করিবার জন্য, বন্যা ও প্লাবনের আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য এবং সর্বোপরি স্বল্প খরচায় জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার জন্য প্রদেশে যে বহুমুখী ও ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল, তাহা গ্রহণ করা হয় নাই, বলাই বাহুল্য। সুখের বিষয়, প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সম্প্রতি কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনার ভিতরে দামোদর-কোশী পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা এবং ময়ূরাক্ষী বাঁধ পরিকল্পনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দামোদর পরিকল্পনা

প্রদেশের নদী-সম্পদ আলোচনা করিবার সময়ে বলা হইয়াছে যে, দামোদর নহে বহু উপনদী জলধারা মিশাইতেছে। এই সকল উপনদীর সংখ্যা নয়ের কম হইবে না; তাহা ছাড়া, প্রধান উপনদী বরাকরেও পাঁচটি উপনদী জলধারা মিশাইতেছে। দামোদর নদ তাহার উপনদীসহ প্রায় ৮,৫০০ বর্গ-ফুট জমির উপর প্রবাহিত হইতেছে।

এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে মানভূম-ছোট নাগপুরের পার্বত্যভূমি এবং বাঙলার সমভূমি—এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বর্ধমানের নিকটে দামোদর নদ যদি প্রতি সেকেণ্ডে ২ লক্ষ ঘন ফুটের বেশী জল নিঃসারিত করে, তাহা হইলেই দামোদরের দক্ষিণ তীর প্লাবিত হইবার আশঙ্কা দেখা যায়। কাজেই পরিকল্পনাতে এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে জলধারা কখনও প্রতি সেকেণ্ডে ২ লক্ষ ঘন ফুটের বেশী না হয়। আটটি বাঁধের সাহায্যে দামোদরের অতিরিক্ত জলপ্রবাহকে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল বাঁধের ভিতরে কেবলমাত্র দুইটি বাঁ: দামোদরের উপরে সোনালপুরে এবং আইজারে নির্মিত হইবে। ইহা ছাড়া, বরাকরের উপরে তিনটি বাঁধ নির্মিত হইবে। সোনালপুরের এবং আইজার বাঁধ ছাড়া অন্যান্য বাঁধগুলি কোনার, বোকারো, বারমো, তিলাইয়া, দেওলবাড়ী এবং মালমো নামক স্থানে নির্মিত হইবে। সব কয়টি বাঁধের সাহায্যে যে জল জমা করা হইবে, তাহার পরিমাণ ৪৭ লক্ষ একর ফুট হইবে। ফলে ৬ হাজার বর্গমাইলে ১½ ফুট পরিমাণ জল সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে। বাঁধ ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে এই জল সরাইয়া লইতে হইবে; তাহাতে দামোদরে প্রায় ৪০ সপ্তাহ ধরিয়া জল প্রবাহিত হইবে। কিন্তু এই সময়ে ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার একর জমিতে জল সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে। জল-সেচন এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও এই ব্যবস্থার ফলে দামোদরে যে জল সারা বৎসর থাকিবে, তাহাতে জলপথে হুগলী নদীর সহিত সংযোগ রক্ষা সহজসাধ্য হইবে। অর্থাৎ দামোদর পরিকল্পনার বহুমুখী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সাহায্যে একই সঙ্গে বন্যা নিবারণ, জল-সেচন, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে।(১) পরিকল্পনা অনুসারে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মোট ২৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে; এই ব্যয়ের ভার পশ্চিম বাঙলা, বিহার এবং কেন্দ্রী সরকার সমান অংশে বহন করিবেন। জল-সেচ ব্যবস্থার জন্য মোট যে ১৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, তাহা বাঙলা এবং বিহার সরকার জল ব্যবহারের অনুপাতে বহন করিবেন। তাহা ছাড়া, বন্যা নিবারণের জন্য যে ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে, তাহা পশ্চিম বাঙলা এবং কেন্দ্রী সরকার সমান হারে বহন করিবেন; কিন্তু কেন্দ্রী সরকার এই বাবদ কোনমতেই ৭ কোটি টাকার বেশী ব্যয় করিবেন না। অর্থাৎ ২০ বৎসর মেয়াদী এই পরিকল্পনায় সর্বসমেত ব্যয় হইবে ৫৫ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনা হইতে খরচা বাদে যে আয় হইবে কিংবা যে ঘাটতি দেখা দিবে, তাহা বিভিন্ন সরকারের নিকট মূল পরিকল্পনায় স্ব স্ব অংশের অনুপাতে যাইবে।

মহানদী পরিকল্পনা দ্বারা প্রধানত উড়িষ্যার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে; কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে পশ্চিম বাঙলায় কিছু কিছু পরোক্ষ সুবিধালাভ করিবে। পরিকল্পনায় সম্বলপুরের ৯ মাইল উত্তরে মহানদীর উপরে হীরাকুণ্ডা বাঁধ নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাতে প্রায় ৫০ লক্ষ একর ফুট পরিমাণ জল সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হইবে এবং ১১ লক্ষ একরে জল সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে। পরিকল্পনার ফলে বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদন ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন বৃদ্ধি পাইবে, ছত্রিশগড় পর্যন্ত ২৫ মাইল মহানদীর জলপথে গমনাগমন করা সম্ভব হইবে এবং প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করিতে ৬ হইতে ৭ বৎসরের ভিতরে মোট ৪৭½ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

মোর বা ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা দ্বারাও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রভূত উপকার হইবে। প্রদেশের নদী-বিন্যাস আলোচনা করিবার সময়ে ময়ূরাক্ষী নদীর বর্তমান সমস্যা বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনা ছাড়াও ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলে কৃষির উন্নতির জন্য এবং ভৈরব-মাথা-ভাঙা প্রভৃতি মুমূর্ষু নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য কেন্দ্রী সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা রহিয়াছে।

(১) পরিকল্পনা অনুসারে ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে এবং বাৎসরিক ধান উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে।

কথা শেষ

পশ্চিমবঙ্গের অর্থকথা এইখানেই শেষ করা হইল। এই আলোচনায় নূতন প্রদেশ পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদের একটি বস্তুনিষ্ঠ হিসাব দিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে; ইহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। প্রদেশের অর্থনীতির মূল উপকরণ এবং সম্পদের ভিতরে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে বলিয়া সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব, এমন কি প্রদেশের আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যের আলোচনাও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। অথচ, যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনায় সরকারী আয়-ব্যয় এবং বহির্বাণিজ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে বাধ্য। ইহা হইতেই বর্তমান আলোচনার মূল উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে। প্রদেশের মূল অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদের হিসাব সংগ্রহ করিতে গিয়া কেবলমাত্র প্রদেশের বিভিন্ন প্রয়োজনের পরিমাণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া অধিবাসীদের প্রয়োজন অনুসারে প্রদেশের সম্পদকে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; কি করিয়া চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান দূর করা যাইতে পারে, সে সম্পর্কে কোন আলোচনাই করা হয় নাই; তাহা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়-বস্তু। প্রদেশের অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদের যে তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহাও সকল ক্ষেত্রেই অধুনাতম তথ্য, এইরূপ দাবী করাও সঙ্গত হইবে না। বহুক্ষেত্রে ১৯৪০ সালের তথ্যকেই মূলত ভিত্তি করিয়া হিসাব করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সরকারী উৎসাহ এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অভাবে জনসাধারণ সংখ্যাতত্ত্ব-সচেতন নহে। বর্তমান আলোচনার বহুক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব ইচ্ছা করিয়াই পরিহার করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক আলোচনাতেও আমরা যে তথ্য-সচেতন নহি, তাহার সর্বাপেক্ষা বাস্তব প্রমাণ এই যে, বঙ্গ-বিভাগের ফলে বাঙলাদেশের অর্থনীতির বনিয়াদে এত বড় ভাঙন দেখা দিয়াছে অথচ নূতন অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবার জন্য পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের একটি নির্ভরযোগ্য এবং সম্পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব এখন পর্যন্ত সরকারী কিংবা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানই গ্রহণ করিলেন না। যাহাই হউক, নূতন প্রদেশের আর্থিক কল্যাণ এবং জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের কথা যাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তা করেন, তাঁহারা এই বিষয়ে অতঃপর অবহিত হইবেন, এই আশা লইয়াই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

ভূতের গল্পটা বেশ জমে উঠেছিল। উল্লাসকর মিত্র বলছিলেনঃ

...আমাদের ঘরের দেয়ালে ঠিক জানলার নীচেই প্রথমে একটা ছোট ছায়া দেখা গেল। বাঁ দিকের কোণে লম্বা একটা বাতিদানে লিকলিকে সরু একটা বাতি জ্বলছিল। ঘরে দ্বিতীয় কোনো আলো নেই। বাতির শিখা কাঁপছিল বটে, কিন্তু কোথা থেকে যে হাওয়া আসছিল, তা কেউ জানে না। দরজা-জানলা সব বন্ধ, আর শীতকালের রাত্রে অতো হাওয়াই বা আসবে কোথা থেকে? ঘরের মধ্যে আমরা তো আর পাখা খুলে দিয়ে বসিনি।

...বেশ দেখা গেল যে ছায়াটা কাঁপছে। কম্পমান শিখার সামনে স্থির জিনিসেরও ছায়া কেঁপে থাকে; এ কথা আমাদের সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু জিনিসটা কোথায়? ঘরের সম্ভব অসম্ভব কোনো জায়গাই আমরা খুঁজে দেখতে বাকি রাখিনি। এমন কি, বাতির ওপারের কোণগুলোও চার জোড়া সতর্ক পুরুষের চোখের চৌকিদারি থেকে রেহাই পায়নি।

...এমন সময় মনে হলো, অনেক দূর থেকে যেন একখানা নৌকো ভেসে আসছে। দাঁড়ের ঝুপঝাপ শব্দ শোনা গেল, সেই সঙ্গে ঢেউ-এর উপর ঢেউ পড়লে যে রকম আওয়াজ হয়, ঠিক তেমনি। দাঁড়ের শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে মনে হলো। আর জলের অন্য শব্দটা ক্রমশঃ

সেই ছায়ার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তীব্রতায় হঠাৎ ভীষণ বেড়ে গেল।

...বললে, বিশ্বাস করবে না জানি, তবু যা হয়েছিল সেটা বলি। আমার কপালে জলের ঝাপটা লাগলো, বুঝতে পারলাম! তবু বিশ্বাস হলো না। কিন্তু ভয়কে ঠেকাবো কি করে? ভয় তো আর বিশ্বাসের মতো যুক্তিকে সমীহ করে আসে না। ভয়ে আমার গলা বেধে গেল। চোখের সামনে দেখলাম অনিমেষ আর ধীরানন্দ পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে, কঠিন হয়ে বসে আছে। ওরা কেউই অন্যের দিকে তাকিয়ে নেই। নীহার অনেকটা তাজা ছিল। কিন্তু সেও আমার দিকে তাকিয়ে নেই, বুঝতে পারলাম। জানলার নীচে সেই ক্রমবর্ধমান ছায়াটার আকর্ষণী শক্তি সকলের মনকে গ্রাস করতে আরম্ভ করেছে তখন। একবার মনে হলো, ওদের গায়ে ঠেলা দিয়ে দেখি। কিন্তু কি জানি কেন, ঠেলা দিতে শেষ পর্যন্ত হাত সরলো না।

মনে আছে, উল্লাসকর মিত্রের এই গল্প শুনতে শুনতে আমাদের সকলের চোখ উত্তেজনার বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। মানুষের মনে ভয়ের যে স্বাভাবিক এক পিপাসা আছে, সেই তৃষ্ণাই তিনি মিটিয়েছিলেন সেদিন। তবু সব কথা যে বিশ্বাস করেছিলাম, তা নয়। শ্রাবণের আকাশ কলকাতার লোকালয়ে সেদিন ভেঙে পড়েছিল। ঈষৎ আলোকিত দোতলার সেই কামরায় আমরা পাঁচটি প্রাণী এই ষষ্ঠ ব্যক্তির 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা' যথোচিত মন দিয়ে শুনতে শুনতে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলাম।

কখন যে নীচে "কলিং বেল" বেজেছে, কখন বাড়ির চাকর দীনু সদর দরজা খুলে দিয়ে অতিথিকে ঘরে নিয়ে এসেছে, কখন দরজা বন্ধ করে আমাদের বৈকালীন আড্ডার সপ্তম সভ্য অরবিন্দ সেন চওড়া সিঁড়ির উপর দুপ্ দুপ্ শব্দ করে হেঁটে এসেছে, কিছুই জানতে পারিনি। গল্পের হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বাস্তব পরিবেশ থেকে আমরা কতো দূরে যে চলে গিয়েছিলাম সেদিন! উল্লাসকর রহস্যের গিঁট বাঁধতে বাঁধতে গল্পটাকে যেখানে চূড়ান্ত মোড় ফিরিয়েছিলেন সে জায়গাটাও বেশ মনে পড়ছে আজঃ

"...জানি, একে তোমরা বলবে ইলিউশান কিংবা হ্যালিউসিনেশান—একটা বিভ্রম। আজিও সেই কথা বলেই মনকে বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু এই ঘটনার ঠিক তিন বছর পরে যা ঘটেছিল, তার সঙ্গে এর যে একটা অচ্ছেদ্য যোগ আছে, সে কথা আমাকে বিশ্বাস করতেই হয়।

"...তখন চুর্নী নদীর ধারে সরকারী বাঙলোয় থাকি,—তোমরা তো জানো, আমি কিছুদিন ল্যান্ড কাস্টমস্ অফিসার হিসেবে সরকারী কাজও করেছি। সে সময়ে একদিন খবর পেলাম, বঙ্গোপসাগর থেকে একদল লোক বিলাতি মদ আর বিদেশী ঘড়ি, রেশমী কাপড় এবং আরো টুকিটাকি জিনিসপত্তর নিয়ে সোজা পূর্ববঙ্গে ঢুকে পড়ছে। সুন্দরবন অঞ্চলে আমাদের কাজের চাপ ছিল বরাবর। সেবার এই দলটাকে ধরবার জন্যে আমাদের আরো নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

"...আমি আর নীহার দুজনেই ছিলাম এক বিভাগে। চুর্ণীর একেবারে কোলের উপর আমাদের বাসা ছিল। সেখান থেকে কুড়ি মাইল রাস্তার উপর আমাদের নজর রাখতে হতো।

"..একদিন বেলা তিনটে নাগাদ নৌকো নিয়ে দুই বন্ধুতে বেরিয়ে পড়লাম। কোনো কাজ ছিল না সেদিন। নদীর দুধারে সবুজ গাছের সমান্তরাল দুই রেখা, আর মাথার উপর অন্তহীন নীল আকাশ,—প্রকৃতির স্তব্ধ বিস্তার আমাদের সম্মোহিত করেছিল বোধ হয়, কারণ, প্রায় দুঘণ্টা একই নৌকোয় পাশাপাশি বসে থেকেও আমরা বিশেষ কোনো কথাবার্তা বলিনি। মাঝি আর তার সাকরেদ অবিশ্যি গল্পগুজবে ব্যস্ত ছিল। তাদের আলাপের এলোমেলো টুকরো মাঝে মাঝে আমাদের দুজনেরই কানে আসছিল। কিন্তু শোনবার মত সেও বিশেষ কিছু নয়,—অত্যন্ত মামুলী কথা,—পাট বুনতে বুনতে ছেলেটা মরেছে সাপের কামড়ে,—সব সাপের বিষ নেই—ছেলেমেয়ে আল্লার জিনিস—রাণাঘাটের বাজারে ছেলের শ্বশুরের দোকান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

"...নীহারকে তোমরা অবশ্য দেখনি। কিন্তু আমাকে তো দেখেছ। আমার প্রকৃতিতে চিন্তাশীলতার প্রতি আসক্তি যে কোথাও নেই, সে তো তোমরা জানোই। আর নীহারও ছিল ডানপিটে গোঁয়ার। তবু নৌকোর পাটাতনে আমরা দুই বন্ধু দুটি অপরিচিত সহযাত্রীর মতো স্থির হয়ে বসেছিলাম। আমাদের পারিবারিক অশান্তিও তখন ছিল না,—চাকরিতেও দুজনেরই সুনাম ছিল। মন খারাপ থাকবার কোন কারণই ঘটেনি তখন। যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম তাও তো বলেছি—তোমরা যাকে বলো প্রমোদ-ভ্রমণ। তবু কেন যে দুজনের মনই একসঙ্গে অমোন বিষন্ন হয়ে পড়লো, কে বলবে!

"...কতক্ষণ যে রেলের পুলের নীচে দিয়ে আমাদের নৌকো চলে এসেছে, সে খেয়াল আমাদের মধ্যে একজনেরও ছিল না। হঠাৎ এক সময়ে মনে হলো জলের উপর আকাশের তারার ছায়া ঝলমল করছে। মাথা তুলে দেখলাম চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেই গো-ধূলির ধূসর নদীতীর অদ্ভুত বিষন্ন মনে হলো। . অনেক দূরে থেকে একটা গুরু গুরু শব্দ ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমরা দুজনে একই সঙ্গে মাঝিদের জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কিসের শব্দ?'

"...কোনো উত্তর পেলাম না। শুধু নদীতে ঝুপ্ ঝুপ্ দুটো বাড়তি শব্দ হলো, —তারপর নৌকোটা হঠাৎ চরকির মতো পাক্ খেতে লাগলো।

"...দুজনের মধ্যে কে বেশী চেঁচিয়েছিলাম, জানি না। তারপর কে কোন্ দিকে যে ভেসে গেলাম, তাও ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে ঠান্ডা জলের স্রোতে প্রাণের দায়ে হাত-পা ছুঁড়েছি—সে রকম একটা অভিজ্ঞতা এখনো মনে করতে পারি। আমার ধুতি পাঞ্জাবী ভিজে শপ্‌শপ্ করছে—নাকের মধ্যে, মুখের মধ্যে অবাঞ্ছিত জল ঢুকে যাচ্ছে,—শ্বাসের কষ্টে সমস্ত শরীর অভাবনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছে, এ সব স্মৃতিও এখন মনে আছে। নেই—সেই মাঝিরা, আর, নীহার।

"...আমাকে জল থেকে কারা টেনে তুললো, —সেই রাত্রেই রেলের পুলের গুমটি থেকে ডাউন নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে আমার অর্ধচেতন দেহ কারা তুলে দিয়ে গেল, সে সব কথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলেই বাদ দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু প্রাসঙ্গিক ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখো। জলের দুর্ঘটনা একটা ঘটলো তো! আর, সে দুর্ঘটনা চারজনের জীবনে একসঙ্গে ছায়া ফেলেছিল। ওরা সকলেই মারা গিয়েছিল, —না, মাঝিদের কোনো দোষ ছিল না, ওরাও তো ডুবেছিল,—আর নীহারও। একা আমিই কেবল বেঁচে গিয়েছিলাম। কেন যে বাঁচলাম, সে আমি আজও জানি না। অবিশ্যি অনিমেষ আর ধীরানন্দ সেখানে ছিল না। কিন্তু চার সংখ্যাটা ঠিক ছিল, মাঝিদের দুজনকে নিয়ে নৌকোয় আমরা চারজনই ছিলাম।"

মনে আছে উল্লাসকরের এই গল্পের অনুরণনে কলকাতার সেই শ্রাবণ মাসের বৈকাল যখন ঘরের অন্ধকারে স্পন্দিত হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে বন্ধ দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলে ভিতরে এসেছিল অরবিন্দ সেন।

দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে প্রথমেই সে সুইচ টিপে জোর আলোটা জেলে দিল। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসবার আয়োজন করতে করতে বললে, 'তোমাদের আড্ডায় একটা ছেদ পড়লো বটে, কিন্তু খাঁটি সত্য যে গল্পের চেয়ে কোনো অংশেই হীন নয়, তার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে এসেছি।'

—সাধু! সাধু!

আমরা সকলে এক সঙ্গে সম্মতি জানালাম। আমাদের সেই আড্ডার ঐ ছিল অভিবাদনের ভাষা।

চেয়ারে আরাম করে বসে অরবিন্দ গল্প শুরু করলেঃ '...পকেটমারদের সঙ্গে নিপুণ অস্ত্র চিকিৎসকের তুলনা চলতে পারে। কথাটা নতুন নয়, তোমাদের সকলের মনেই ও কথা কোনো না কোনো সময়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমি ওদের কৌশলের কথা বলছি না, বলছি সেই কৌশলের ফলের বিষয়ে। অস্ত্র

চিকিৎসার মতো পকেটমারারও একটা ভালো দিক আছে।

...অর্থাৎ ওরা ছুরি দিয়ে কাটে না, ব্লেড দিয়ে কাটে,—অথবা কোনো অস্ত্র না নিয়ে শুধু ঈশ্বরের দেওয়া হাত দিয়েই কাজ সেরে ফেলে,—দাঁড়িয়ে কিংবা বসে,—ট্রামে-বাসে ওঠবার সময়ে কিংবা নামবার সময়ে,—ঠিক কখন কিভাবে ওরা অন্যের পকেট আত্মসাৎ করে, সে বিষয়ে কোনো আলোচনা আমার এ গল্পের মধ্যে পাবে না। শুধু পকেট কাটবার পরে প্রথম আবিষ্কারের যে চেতনা সেখান থেকেই এ গল্পের সূত্রপাত।

সহসা একটা ভৌতিক পরিবেশ থেকে উৎপাটিত হতে আমাদের কারও ইচ্ছা ছিল না, সত্যি। কিন্তু অরবিন্দ এমন সহজ আত্ম-প্রতিষ্ঠা সাধনে অভ্যস্ত ছিল যে, ওকে আমরা বাধা দিতে পারলাম না।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ আরও বেড়ে গেল। ঘরের ভিতর খটখটে শুকনো দেয়াল, মেঝে, ছাদ বিদ্যুতের আলোয় ঝকঝকে হয়ে রইলো। উল্লাসকরের গল্প থেকে অরবিন্দের গল্পে লাফ দেবার সময়ে আমার মনের মধ্যে এই ঘর ও বাহির ঘটিত অতি পরিচিত বিভেদটাও হঠাৎ ভারি আশ্চর্য মনে হলো। আমরা সকলেই আবার নতুন আগ্রহে শুনতে লাগলাম :

'...ঠনঠনে পর্যন্ত বাস এসে থেমে গেল। রাস্তায় এতো জল জমেছে যে, 'ডবল ডেকার'ও অচল; একবার ভাবলাম দোতলার কোণ ঘেঁষেই চুপচাপ বসে থাকি। পকেটে হাত দিলাম সিগারেটের খোঁজে। বুক পকেটটা শূন্য। পাশ পকেট,—শার্টের নীচের ফতুয়ার পকেট,—কোথাও সিগারেট নেই। মনিব্যাগটাও উড়ে গেছে। না, তোমরা এখনি 'আহা', 'উহু' করো না, তাতে আমার এক ফোঁটাও দুঃখ হয়নি। সাতাশ টাকা পাঁচ আনার বদলে কি পেয়েছি দেখো :

মনে আছে, মরক্কো-চামড়ায় বাঁধা সবুজ রঙের ছোট খাতাটা অরবিন্দর হাতে উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল্ করে উঠেছিল।

'...বাসে বসেই আমি এটা শেষ করে এসেছি। এখন তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পারো।

আমরা সবাই এক সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মতো সেই খাতাটার উপর ঝুঁকে পড়েছিলাম। কিন্তু সাতজনে কাড়াকাড়ি করলে তো আর পড়া যায় না। বোধ হয় সেই জন্যেই একটা মীমাংসা করবার প্রেরণায় অরবিন্দ আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল : 'এ খাতা আমি ওকেই উপহার দিতে চাই, কারণ এতে যে জিনিস জমা আছে, তার অধিকার একমাত্র সাহিত্যিকই ভোগ করতে পারে। অবিশ্যি অন্যের জিনিস অন্য আর একজনকে উপহার দেওয়া চলে কি না সে সমস্যা তর্কসাপেক্ষ। বিনাতর্কে ওকেই দেওয়া উচিত।'

উল্লাসকর মিত্র ছিলেন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সংগী তিনি বললেন, 'তথাস্তু।'

ফলে, সেই সবুজ মলাট বাঁধা ডায়ারি আজও আমার সম্পত্তিভুক্ত হয়ে আছে। সেদিন প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত যেমন তাদের পড়িয়ে শুনিয়েছিলাম, আজ এইমাত্র তেমনি পড়ে শোনালাম নিজের মনকেই। অক্ষরগুলো সোজা সোজা তেমনি ভেসে আছে শাদা কাগজের গায়ে। তবে কালিটা জ্বলে গেছে জায়গায় জায়গায়। কাগজের উপর তারিখ ছাপা নেই, লেখার শিয়রে সব জায়গাতেই তারিখ আছে।

জানি, সে অন্য লোকের জীবন, অন্য জাতের ছবি। উল্লাসকরের গল্পও আর এক জগতের কাহিনী। তবু মৃন্ময়ীর সর্বশেষ খবরটি আজ সকালের ডাকে আমার হস্তগত হবার পর থেকে আজ এই দুই পৃথক গল্পের পৃথক সূত্রে জট পাকিয়ে মনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা দলা বেঁধে আছে। চোখে এক ফোঁটা জলও আসেনি, বুকের ভিতরটা কেবল থেকে থেকে নিষ্ফল, নিরুত্তর জিজ্ঞাসায় টন্ টন্ করে উঠছে। সে কি শুধু শোক? —শুধু বিচ্ছেদের যন্ত্রণা? মনে আছে সেই রাত্রে যখন এই দিনপঞ্জীর প্রথম পাঠ শুরু হয়, তখন উল্লাসকর তাঁর স্বভাবিক ভারি গলায় বলেছিলেন, 'অরবিন্দ ভায়া ঘরে ঢুকেই একটা গল্পের ঘোষণা করেছিলেন। আমার প্রশ্ন এই যে, এই মরক্কো পেটিকার মধ্যেই কি সে গল্প লুকোনো আছে?'

সমান কায়দায় পাল্টা জবাব দিয়েছিল অরবিন্দ :

'See K and Ye shall find.'

আজ আর প্রথম পাঠের সে কৌতূহল নেই, দীর্ঘ সান্নিধ্যের আসক্তি নিয়ে হরফগুলোর উপর শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি।

২৩।৩

প্রথম পৃষ্ঠা

শুধু পাথর আর পাথর। বাইরে যেমন ধুলো, ভেতরটা তেমনি পরিষ্কার। ছবিতে যে ঝাউগুলো দেখেছিলাম, সেগুলো নিশ্চয় অনেকদিন আগে মরে গেছে। নতুন ঝাউ-এর চারা লাগিয়েছে পুরানো লাইন বেঁধে।

পাথরের জাফরির মধ্যে ধুপের গুগ্গুলের, ফুলের গন্ধ। কী ঠাণ্ডা।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

২৫।৩

মাল্টা কতোদূর দেশ—কে জানে! আজ আকাশ ঠিক দেশের শরৎকালের মতো। শ্বেত পাথরের পিন্ডীগুলো আমার মোটেই ভালো লাগে না।

তৃতীয় পৃষ্ঠা

২৭।৩

ভারি মজার নাম—টুন্ডলা। মণি মাসীর ননদের নাম কুন্তলা। আজ সকালে এখানে এসে পর্যন্ত কেবলই তার কথা মনে পড়ছে। আমার কথা কেনই বা ভেবে মরবে সে?

এদিকে মা'র উৎপাত বেড়েই চলেছে। আজ সকালে ইস্টিশানে নেমেই এক আতরওলার মাথা থেকে ঝুড়ি ফেলে দিয়েছে। তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি ঝামেলা। রবীনদা থানা পর্যন্ত ছুটে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

৪

১৪।৪

আমরা আজ কলকাতায় ফিরলাম।

গরমে মা'র অসুখ ভীষণ বেড়েছে। নতুন খেয়াল চেপেছে এবার; বলছে, আমার বিয়ে দেবে কোনো ডাক্তারের সংগে।

বিজনদার চিঠি এসেছে, ভূমধ্যসাগরের প্রশংসায় ভরা।

৫

১৫।৪

আজ কাকাবাবু একজন জ্যোতিষীকে এনেছিলেন। সাধারণ ভন্ডের মতন অসাধারণ চেহারা নয়—খুব গরীব অথচ লেখাপড়া জানা বাঙালি যেমন হয়, তেমনি। লোকটি অতীতের কথা ঠিক ঠিক বলে গেল।

লুকিয়ে চুপি চুপি কাকাবাবুকে যে কথা বলেছে, সে-ও আমি আড়াল থেকে শুনেছি : মা মারা যাবে সামনের পৌষ মাসে, আর আমার কপালে আছে বৈধব্য।

৬

১।১০

মার কথা খাতায় লিখলেই মা'র অসুখ বেড়ে যায়। তাই এতোদিন লিখিনি।

দার্জিলিং-এ আর থাকা চললো না, তাই আমরা ফিরে এলাম। ভগবানের দয়ায় মা এখন প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। বিজনদা আজ এসেছিলেন। একটু আগে চলে গেছেন।

এর পর কয়েক পাতায় শুধু কয়েকটা অঙ্ক, কিছু যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ; তারপর পুরো একপাতা কেবল লাল কালিতে লেখা 'কালী' নামের নামাবলী। তারপর আবার যেখানে লেখা শুরু হয়েছে, সেইখানেই নতুন পত্রাঙ্ক দেওয়া যায়।

৭

১।১

আমি কারও কথা মানবো না মানবো না, মানবো না। এই তো গেলাম মার সংগে, কে আমাকে আটকাতে পেরেছে? মাথা খারাপ হবে কেন? বিজনদার বৌ-এর মাথা খারাপ হোক। মার মাথা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন ঘুমোতে হবে। কোন্ ঘুম? দার্জিলিং-এর ঘুম—শ্বেত পাথরের সুড়ংগের মধ্যে ঘুম। আমি ঘুমোবো না। কে আমাকে আটকাবে?

শেষের লেখাগুলোও অস্পষ্ট নয়, এলোমেলো হরফে লাইনে ভাগ করা নয়—আগের মতন একই রকম ঋজু, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন।

তারপর একখানা পাতায় কিছুই লেখা নেই। পরের পাতায় পুরুষের কাঁচা হাতের বাঙলা হরফ সারি সারি সাজানো রয়েছে:

১।১।৪০

তোমার তোরংগের মধ্যে এ-খাতা লুকোনো ছিল। সেদিন তোমারই শাড়ি খুঁজতে গিয়ে পেয়েছি।

তোমার মাথার কথাটা নীতেশবাবু বিয়ের ঘটকালির সময় চেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্যে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। তোমাকে পেয়ে আমার জীবন কানায় কানায় ভরে উঠেছিল।

তোমার মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল—সেতো তুমি সুস্থ অবস্থাতেই বুঝেছিলে। আমি ডাক্তার। মনের ডাক্তারি জানি না—শরীরের ডাক্তারি করি। সে বিদ্যা তোমার কাজে লাগবে না।

জ্যোতিষীর কথাও ফলতে যাচ্ছে। আমার আজ সকাল থেকে শরীর খারাপ লাগছে। আয়নায় দেখলাম নিজের মুখ। ডাক্তারি পরিভাষা লেখবার দরকার নেই—সাধারণ ভাষায় একে বলে 'প্লেগ'।

আমার মৃত্যু হলে তোমার বড় অযত্ন হবে—একথা মনে করবার অহমিকা এখনো আছে। তাই দেহের চেয়ে মনের যন্ত্রণায় বেশি ভুগছি। কাশীতে তোমার কোনো আত্মীয় আছেন কিনা, জানি না, আমার কেউ নেই।

পাটনার সিভিল সার্জন আমার বন্ধু, তাকে চিঠি লিখে দিয়েছি আজই সকালে, তাছাড়া একটু আগে তারও করেছি। সে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে—তোমার তোরংগে এই খাতা আর আমার 'ইন্সিওরেন্স পলিসি' রেখে দিলাম। তুমি ভালো হলে দাবী করলেই টাকাটা পাবে, যদি তা না হয়, তাহলে তোমার মৃত্যুর পরে টাকাটা রাঁচির হাসপাতালে যাবে।

আরো অনেক কথা ছিল—কিন্তু সময় নেই। আছাড়া স্নানের ঘরে তুমি ঘটি-বালতি আছড়াচ্ছ, শুনতে পাচ্ছি। মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না, কিন্তু—

কলমের দীর্ঘ একটা আঁচর পাতার শেষ পর্যন্ত নেমে এসেছে। তারপর আর কিছুই লেখা নেই।

এই লুপ্তনাম দম্পতীর দিনপঞ্জীর সংগে আমার জীবনের যদিও কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই—যদিও উল্লাসকরের সেই ভৌতিক কাহিনী একটি আষাঢ়ে গল্পমাত্র মনে হয়, তবু আজ সকালে আমার সম্বন্ধী—মৃণ্ময়ীর বৈমাত্রেয় ভাই রমণীমোহনের চিঠি পাবার পরে অকারণে—এক দুরতিক্রম্য কুসংস্কারের মতো মনের গভীর জান্তব হাহাকারের মধ্যে সেই কথাগুলোই দলা বেঁধে ঘুরছে। রমণীমোহন লিখেছে:

কান্দী

প্রণামন্তে নিবেদন,

জামাইবাবু, আমাদের চরম দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কাল বৈকালে দিদি ও মা ময়ূরাক্ষী নদী পার হইবার সময়ে নৌকাডুবির ফলে মারা গিয়াছেন। সংগে এই দুর্ভাগাও ছিল। আমাকে মাঝিরা রক্ষা করিয়াছে। অন্য আরও দুইজন আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে এক পাগলীর আকস্মিক চঞ্চলতার জন্যই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

আপনি পত্রপাঠ আসিবেন। ইতি—

সেবক,
রমণী।

দেশলাই-এর কাঠিগুলো মিইয়ে গেছে। নতুন একটা আনবার উৎসাহও যেন ফুরিয়ে গেছে। তবু সবুজ মরক্কোর খাতাখানা আজ পুড়িয়ে ফেলতেই হবে। মৃণ্ময়ীর গলার আওয়াজ দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে: 'যতো সব অলক্ষুণে কান্ড—খাতাটা কি আমার সতীনের? কি হবে ওটা যত্ন করে রেখে?'

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

প্র·না·বি?.....

দেবযানী

রবীন্দ্রনাথ 'বিদায়-অভিশাপ'এর মূল কাহিনীটি মহাভারতের কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল কাহিনীর রূপান্তরকালে একাধিক গৌণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কচের ব্যবহারে পুরুষোচিত মর্যাদা ও সম্ভ্রম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দেবযানীর চরিত্রে কোন পরিবর্তন কবি করিতে পারেন নাই, করিবার প্রয়োজনও ছিল না, দেবযানীর উদ্দেশে যেন তিনি বলিয়াছেন, 'যেমন আছো তেমনি এসো।' মহাভারতের কাহিনীটি কতকাল আগে কল্পিত হইয়াছিল জানি না, ধরা যাক, পাঁচ হাজার বৎসর, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দেবযানীর কিছু মাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। সে আজও যেমন আধুনিকী, সেদিনও তেমনি আধুনিকী ছিল, সে প্রাচীনতম আধুনিকী, দেবযানী সব চেয়ে পুরাতন 'মডার্ন উয়োম্যান।'

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা প্রভৃতি যেসব নারীকে আমাদের দেশে আদর্শ বলা হয়, দেবযানী কোনক্রমেই তাহাদের দলভুক্ত নয়। তাহাকে আদর্শ পত্নী, আদর্শ প্রণয়িনী বা আদর্শ মাতা বলিবার উপায় নাই, সে আদর্শ-হীনতায় আদর্শ। দুর্দাম প্রণয় পিপাসা তাহাকে নাক বরাবর ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, কোন বাধাই সে মানিতে প্রস্তুত নয়, বেচারী কচ কোনরকমে পালাইয়া বাঁচিয়াছে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটে নাই। শর্মিষ্ঠার কৌশলে সে একটি কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অনুকম্পাবশত যযাতি তাহাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিল, অমনি দেবযানী বলিয়া বসিল এবারে আমাকে বিবাহ করো, আমার পাণিগ্রহণ তো করিয়াছ। হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিলে যে পানিগ্রহণ করা হয়—বেচারী যযাতির তাহা জানা ছিল না, এমন হইলে কে আর পরোপকারে প্রবৃত্ত হইবে! এরূপ ব্যবহার নিশ্চয় নারীত্বের আদর্শ নয়। কিন্তু নাই বা হইল আদর্শ। প্রাচীন ভারতীয় নারী সমাজের মধ্যে সে সম্পূর্ণ একক! কোন পুরুষের তাহাকে ভাল না লাগিলে বুঝিতে হইবে সে সম্পূর্ণ পুরুষ নয়। পৌরুষের পরীক্ষার স্থল দেবযানীর চরিত্র। তাই বলিয়া তাহাকে বিবাহ! না সেরূপ বলিতেছি না। ভালো লাগা ও ভালোবাসা এক পদার্থ নয়।

কচ দেবযানীকে ভালোবাসিত, কিন্তু তাহার তো স্বাধীনতা ছিল না, সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তাহাকে স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে, দেবযানীকে লইয়া ঘর পাতিয়া বসিলে তাহার চলিবে না। শুক্রাচার্যের তপোবন হইতে কচের বিদায় মুহূর্তে সমাগত। দেবযানীর নিকটে সে বিদায় লইতে আসিয়াছে। দেবযানী এই ক্ষণটির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সে একেবারে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো হতভাগ্য কচের ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িল। প্রথমেই লম্ফটা দেয় নাই, কিছুক্ষণ শিকারের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া ওঁৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, কিছুক্ষণ শিকারের চারিদিকে চক্রাকারে আবর্তন করিয়াছিল, কিছুক্ষণ সে অগ্রিম শিকারসুখ অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু কচ পালাইবার উদ্দেশ্যে পা তুলিবামাত্র বাঘিনী তাহার ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িল—তাহার অন্তস্তমস্থল হইতে আর্ত হুঙ্কারে নিঃসৃত হইল—

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

....

নিঃসৃত হইল—

আজ মোরা দোঁহে একদিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহ সখা চিনে'
যারে চাও! বলো যদি সরল সাহসে
'বিদ্যায় নাহিক সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ,' নাহি ক্ষতি
নাহি কোন লজ্জা তাহে। রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন।

দেবযানীর এই স্পর্ধিত আহ্বান, এই উদ্ধত অভিনয়, নারী মহিমার এই অভ্রভেদী গৌরীশৃঙ্গ—অকস্মাৎ ঊর্ধ্বোত্থিত হইয়া স্বর্গ-লোককে কি ঈর্ষাময় বেদনার শূলে বিদ্ধ করে নাই? এই মুহূর্তে দেবযানীর যে বিরাট স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে—তাহার দিকে তাকাইবার উপায় কি? কঠিন তুষারপুঞ্জে প্রতিফলিত রবি রশ্মির মতো চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। সত্যই ইন্দ্র আর ইন্দ্র নহে, দেবযানী তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার সিংহাসন-খানি দখল করিয়া বসিয়াছে।

কচ তাহাকে কত রকমেই না ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কর্তব্যের আহ্বান, ধর্মের ব্রত, পুরুষের আদর্শ! কিন্তু না, দেবযানী ভুলিবার নয়। অবশেষে কচকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সে দেবযানীকে ভালোবাসে—তাই বলিয়া বিবাহ! না, তা হইবার নহে। কিন্তু 'প্লেটোনিক প্রেমে' ভুলিবার পাত্র দেবযানী নহে। সে যে নিতান্ত মৃন্ময়ী—মাটির সমস্ত দোষ এবং সমস্ত গুণ তাহার দেহে নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে। সে জানে সংসারে যেটুকু হাতে হাতে পাওয়া গেল সেইটুকুই যথার্থ পাওয়া। তাহার অধিক যাহা সে তো কেবল কল্পনা, সে তো কেবল অনুমান। মৃত্যু নির্ঝরের ধারে যাহার বাস, দেহের প্রমা ব্যতীত তাহার সান্ত্বনা কোথায়? বিধাতা তাহাকে গড়িবার সময়ে মাটি ছাড়া আর কোন উপাদান ব্যবহার করেন নাই। যখন সে দেখিল কচ নিতান্তই বিদায় হইবে, তাহার মোহে কিছুতেই ধরা দিবে না, তখন আহত নারী চিত্তের সমস্ত আক্রোশ ও ঈর্ষা, সমস্ত অবলুণ্ঠিত মহিমা ও ব্যর্থ প্রণয়-বজ্রাগ্নি পরিপূর্ণ একখানি মারাত্মক বিদ্যুতের প্রচণ্ডতা তাহার মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িয়াছে—

তোমা-'পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
এই মোর অভিশাপ—যে-বিদ্যার তরে
সম্পূর্ণ হবে না বশ,—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে র'বে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

এই চরিত্র ও ব্যবহার নিশ্চয়ই আদর্শ ন —কিন্তু তবু যে এত ভালো লাগে, তার কার মানুষ আদর্শকে ভক্তি করে আর ভালোবাসি বেলায় অনেক সময়েই অনাদর্শকে বাছিয়া ল মর্ত্যবাসী আমরা দেবযানীর দুঃখের ভাগ তাহাকে কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু দ হইতেই বোঝা ভালো, নতুবা কূপ হইতে হা ধরিয়া তুলিলে পানিগ্রহণ করিবার জন্য মেয়ে জেদ করিয়া বসে তাহাকে দূরে হই ভালোবাসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দেবযানীর অনুরূপ প্রাচীন সাহিত্যে নি বলিয়াছি—রবীন্দ্র সাহিত্যে তাহার একটি জু আছে। সে বাঁশরী নাটিকার নায়িকা "শ্রীম বাঁশরী সরকার বিলাতি য়ুনিভার্সিটিতে প করা মেয়ে। রূপসী না হলেও তার চ তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুত শক্তিতে সমুজ্জ্বল, আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য বাঁশরী সরকারের আকৃতি ও প্রকৃতি দেবযানী উপরে আরোপ করা অন্যায় হইবে না দুজনেরই ধমনীতে একই রক্তপ্রবাহ বহমা অবস্থা ভেদে বাঁশরী দেবযানী হইয়া উঠি পারিত, কাল ভেদে দেবযানী বাঁশরীতে পরিণ হইয়াছে। বাঁশরী নাটিকা বিদায়-অভিশাপে উপাদানে রচিত—কেবল কালের একটা দুস্ ভেদের ফলে নাটিকাটি বিদায় অভিশাপে পরিবর্তে 'বিদায়ে বরদান' হইয়া উঠিয়াছে।

বাঁশরী ভালবাসিত তেজস্বী ক্ষত্রিয় রা সোমশঙ্করকে। বিবাহের বাধা ছিল না, বি বাধা হইয়া দেখা দিল সোমশঙ্করের গু সোমশঙ্কর কঠিন ব্রতচর্যায় উদ্যত। গু ভয় বাঁশরীকে বিবাহ করিলে ব্রতের উপ বাঁশরীর জয়লাভ ঘটিবে, তাই সে সুষমা ন একটি মেয়ের সঙ্গে সোমশঙ্করের বিবাহ স্থি করিল। অভিমানিনী তেজস্বিনী বাঁ সোমশঙ্করকে আঘাতদানের উদ্দেশ্যে ক্ষিত ভৌমিক নামে একজন অভাজন সাহিত্যব

...াহ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। এমন ...য়ে নিজের বিবাহের পূর্ব মুহূর্তে সোম...কর বাঁশরীর কাছে বিদায় লইবার জন্য ...সিয়াছে—

সোমশঙ্কর

তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র ...তে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জানো।

বাঁশরী

তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন?

সোমশঙ্কর

সে কথা বুঝতে যদি নাও পারো, তবু দয়া ...রো আমাকে।

বাঁশরী

তবু বলো। বুঝতে চেষ্টা করি।

সোমশঙ্কর

কঠিন ব্রত নিয়েছি, একদিন প্রকাশ হবে, ...জ থাক্, দুঃসাধ্য আমার সঙ্কল্প, ক্ষত্রিয়ের ...াগ্য। কোন এক সংকটের দিনে বুঝবে সে ...ে ভালোবাসার চেয়েও বড়ো। তাকে সম্পন্ন ...রতেই হবে প্রাণ দিয়েও।

বাঁশরী

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে ...ারতে না?

সোমশঙ্কর

নিজেকে কখনো তুমি ভুল বোঝাওনি বাঁশি। ...ুমি নিশ্চিত জানো তোমার কাছে আমি দুর্বল। ...য়তো একদিন তোমার ভালবাসা আমাকে ...টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে।

বাঁশরী

সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বুঝেছেন। তোমার ...চেয়েও তোমার ব্রতকে আমি বড় ক'রে দেখতে ...পারতুম না। হয় তো সেইখানেই বাধতো সংঘাত। ...আজ পর্যন্ত তোমার ব্রতের সঙ্গেই আমার শত্রুতা।

কচ ও দেবযানীর সংলাপের সুরটা আলাদা, বিষয়টা বাঁশরী-সোমশঙ্করের সংলাপের অনুরূপ। সোমশঙ্করের ভালবাসা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া বাঁশরী প্রসন্ন মনে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। দেবযানী তাহা পারে নাই। তৎসত্ত্বেও দুজনেই একই ধাতুতে গঠিত। বাঁশরী বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে—আর শুক্রাচার্যের কন্যার চরিত্রেও পাশ্চাত্য দেশের উপাদান আছে। বাঁশরী যখন জানিল বিবাহ যাহাকেই করুক সোমশঙ্কর তাহাকেই ভালবাসে, তখন তাহাকে আঘাত করিবার প্রয়োজন আর রহিল না, ক্ষিতীশ ভৌমিকের সহিত বিবাহের প্রস্তাব সে নাকচ করিয়া দিল। ইহাই বাঁশরী নাটিকার কাহিনী।

দেবযানী ও বাঁশরী অনুরূপমাত্র, একরূপ নয়, তার কারণ বাঁশরী আমাদের আর সকলের মতোই নীতির জগতের অধিবাসী। এটা ভালো, ওটা মন্দ—এই দ্বন্দ্ব অনেক পরিমাণে তার দেবযানীর প্রচণ্ডতাকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছে, দেবযানীতে যে ঝাঁজ পাই, বাঁশরীতে তা পাই না। আর দেবযানী সেই আদিম জগতের ব্যক্তি, যেখানে সুনীতিও নাই, দুর্নীতিও নাই, সে এক অনীতির জগৎ, যাহার স্মৃতিটুকুও মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে বিদায় অভিশাপের মর্মন্তুদ আর্ত হাহাকারে চকিতের মধ্যে সেই ভোলা দিনের আভাস মনে প্রবেশ করিয়া মানুষকে আত্ম-বিস্মৃত করিয়া দেয়। মনে পড়িয়া যায় আমরা সকলেই সৃষ্টির কোন্ এক ব্রাহ্মমুহূর্তে এমনি অনীতির জগতে বিচরণ করিতাম। দেবযানীর মধ্যে আমাদের সেই হারানো সত্তাকে দেখিতে পাই, বুঝিতে পারি দেবযানী আমাদের প্রাক্-পৌরাণিক রূপ। যে-কারণে প্রাগৈতিহাসিক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হই, দেবযানীর প্রতিও ঠিক সেই আকর্ষণ! কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তো প্রাগৈতিহাসিক হইতে চাই না, তেমনি দেবযানীও হইতে চাই না, দেবযানীর শিকারেও পরিণত হইতে চাই না। দূরত্বেই ইহার আসল রস—দূর হইতেই দেবযানী রমণীয়। *

মালিনী

রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকখানি আশানুরূপ লোকপ্রিয় নয়। চারটি মাত্র দৃশ্যে বর্ণিত সংহত, সংযত, সর্ব-প্রকার অবান্তর বিষয়বাহুল্যহীন কাব্য-নাট্যখানিতে (পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৯) স্ফটিক-শিলাখণ্ডের দীপ্তি, কাঠিন্য এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে শীতলতা লক্ষিত হয়। এমন বস্তু লোকপ্রিয় না হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ পাঠক পরিসরের ব্যাপ্তি চায়, বহু বিষয়ের শিথিলতা চায় এবং মাঝে মাঝে জিরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে নমনীয় উপত্যকার আশ্রয় চায়। মালিনী নাটকে এ সব কিছুই নাই। ফলে মালিনীর পাঠক সংখ্যা স্বল্প।

কিন্তু এই কাব্যখানি কবিত্বগুণে এবং চরিত্র-পরিকল্পনায় এক অভিনব বস্তু। রাজকুমারী মালিনীর চরিত্রটিকেই লওয়া যাক।

ওস্তাদ খেলোয়াড় যেমন তীক্ষ্ম তলোয়ারের উপর দিয়া হাটিয়া যায়, না কাটে তাহার পা, না যায় সে পড়িয়া, অথচ দুয়েরই আশংকা অবিরল, তেমনি মালিনী চরিত্র—বরাবর নাটিকার কাহিনী প্রবাহিত, কোথাও এতটুকু স্খলন নাই; কোথাও এতটুকু পতন নাই। যেখানে আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, সেখানেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা। মালিনীর অনুরূপ চরিত্র কবি দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করেন নাই, কোন কোন ক্রীড়াকৌশল আছে যাহার পৌনঃপুন্যং সম্ভব নহে।

মালিনী নাটকের প্রথম তিন দৃশ্যে মালিনীর এক মূর্তি পাই, চতুর্থ দৃশ্যের মালিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীর অবনমন ঘটিয়াছে। প্রথম দিকে যাহাকে দেখি তুষার নদী, যাহার জ্যোতিদীপ্তিতে চোখ ঝলসিয়া যায়, চতুর্থ দৃশ্যে সে হইয়াছে ঝরণা, কেবল তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ নয়, সে যেন আমাদের গ্রামেরই অঙ্গীভূত। তুষার নদীকে কবে কে আপন মনে করিতে পারিয়াছে। প্রথম দিকে মালিনী ছিল দেবী, শেষের দিকে সে হইয়াছে মানবী। মালিনী চরিত্রের বিবর্তনে ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার ব্যাপার।

প্রথম দিকের মালিনীর হৃদয়ে নবধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে। এই আবির্ভাব শব্দটির উপরে বিশেষ জোর দিতে চাই। সেই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে কাশীরাজ্যে, মালিনী কাশীরাজের কন্যা, বিদ্রোহ ঘটিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ রাজার কাছে মালিনীর নির্বাসন দণ্ড প্রার্থনা করিয়াছে। হঠাৎ বিদ্রোহী জনসমুদ্রের দিগন্তে অবরোধমুক্ত রাজকন্যার আবির্ভাব জনতাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছে। যে মূঢ়ের দল তাহার নির্বাসন চাহিয়াছিল, তাহারাই মুগ্ধ হইয়া মালিনীকে লোকমাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এমনি মালিনীর লোক-পরিচালন-ক্ষমতা।

বিদ্রোহীদের নেতা দুই বন্ধু ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়। তাহারা মূঢ় নয়, মুগ্ধও হয় নাই। ক্ষেমঙ্কর সুপ্রিয়কে দেশে রাখিয়া বিদেশে যাত্রা করিল, পররাজ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কাশীরাজের কলঙ্ক দূর করিবে এই আশাতে। ক্ষেমঙ্কর-হীন সুপ্রিয় ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। ক্ষেমঙ্করের অনুপস্থিতিতে সে মুগ্ধতমরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। রাজকন্যার সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটিল, পরিচয় অচিরকালের মধ্যে প্রণয়ে পরিণত হইল—প্রণয়টা একতরফা নয়। কর্তব্যবোধে, প্রণয়ের অনুরোধে সুপ্রিয়র কত বিচিত্র কাজকেই না কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, রাজার কাছে ক্ষেমঙ্করের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দিল। রাজা অনায়াসে আসন্নপ্রায় ক্ষেমঙ্করের সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বন্দীভাবে লইয়া আসিল। সুপ্রিয় রাজ্য রক্ষা করিয়া দিল—কাজেই তাহার কিছু পুরস্কার প্রাপ্য। কোন্ পুরস্কার সে চায়? সে কি রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক? সুপ্রিয় ইতস্ততঃ করিয়া বন্ধুর মুক্তি প্রার্থনা করিল। কিন্তু সুপ্রিয় ও মালিনীর বিবাহ রাজার যে অনভিপ্রেত নয় তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আর বিস্ময়ের এই যে মালিনীর তাহাতে আপত্তি নাই। মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতক, নবধর্মের ভূতপূর্ব শত্রু সুপ্রিয়কে বিবাহের প্রস্তাবে মালিনী দ্বিধামাত্র করিল না—একবার মৌখিক লজ্জাও প্রকাশ করিল না। যে-কাজ করিতে

---

* রবীন্দ্রনাথের বিদায়-অভিশাপ

একজন সাধারণ মানবকন্যা অন্ততঃ করি-কি-না-করি ভাবিত, মালিনী অনায়াসে তাহা স্বীকার করিয়া লইল। এই কি নাটকের পুরোভাগের দেবী মালিনী? চতুর্থ দৃশ্যে সাধারণ মানবীর স্তরেরও নীচে যেন সে নামিয়া গিয়াছে! এমন কি করিয়া হইল?

এবারে 'আবির্ভাব' শব্দটার উপর জোর দিবার কথা স্মরণ করিতে বলি। মালিনীর জীবনে নবধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে, সাধনার দ্বারা তাহাকে লাভ করিতে হয় নাই। যতদিন আবির্ভাবের দীপ্তি উজ্জ্বল ছিল মালিনী দেবী ছিল, সেই দীপ্তি ম্লান হইবার সঙ্গেই সে মানবী হইয়া পড়িয়াছে। উজ্জ্বল বাতিটা নিভিয়া গেলে ঘর একটু বেশি অন্ধকার মনে হয়, বাতি যত বেশি উজ্জ্বল, নিভিবার পর ঘর তত বেশি অন্ধকার। প্রান্তভাগের মানবী পুরোভাগের দেবীর তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত। ইহাই স্বাভাবিক—এমন না হইলেই অদ্ভুত হইত এবং কবি-কল্পনা স্বকর্তব্যচ্যুত হইত।

নবধর্ম যাহারই হৃদয়ে দেখা দেয়—আবির্ভূত হইয়াই দেখা দেয়। সেটা ইচ্ছাধীন নয়। সেই আবির্ভাবকে অর্থাৎ পাড়িয়া পাওয়াকে সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা আপন করিয়া লইতে হয়। কিন্তু জীবনে লালন করিয়া তুলিবার আগে তাহাকে জীবনে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে সব সময়ে আবির্ভাব সুফল দেয় না—অন্ততঃ দীর্ঘকাল নিশ্চয় দেয় না। জীবনের জটিল ক্ষেত্রে আবির্ভাবটাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য সাধনারও আবশ্যক। বাল্মীকির কবি-কল্পনার শিখরেও একদিন এমনি একটি আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, আদি শ্লোকটি আদি কবির আবির্ভাবলব্ধ; কিন্তু রামায়ণ কাব্য তো আবির্ভাব নয়, সে যে সাধনা। আবির্ভাবের ধনকে সাধনের দ্বারা তিনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন। মালিনী করে নাই, কেহ তাহাকে বলিয়াও দেয় নাই। তাহার গুরু, কাশ্যপ তখন তীর্থপর্যটনে নিষ্ক্রান্ত, তিনি উপস্থিত থাকিলেও শিষ্যাকে হয়তো সতর্ক করিয়া দিতে পারিতেন।

চতুর্থ দৃশ্যে যে মালিনীকে দেখি আবির্ভাবের দীপ্তি তাহার ললাট হইতে অপগত আর সেই সঙ্গে তাহার পূর্বতন লোকচালন ক্ষমতা, সূক্ষ্ম কাণ্ডজ্ঞান সমস্তই অপসৃত। সে এমনি অসহায় যে, পূর্বতন শত্রু সুপ্রিয়ের পরামর্শ ও নির্দেশ ব্যতীত এক পা অগ্রসর হইতেও অক্ষম। ইহাকেই বলিয়াছি মালিনীর অবনমন।

মালিনীর চরিত্রের অবনমন পরিকল্পনাতেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা। মানব মনোজ্ঞ মহাকবির দ্বারাই একমাত্র ইহা সম্ভব। সেই সম্ভাবনার পরিণাম মালিনী চরিত্র।

প্রথম দৃশ্যে মালিনীর মুখে নবধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া মহিষী বলিতেছেন:—

শুনিলে তো মহারাজ? এ কথা কাহার?
শুনিয়া বুঝিতে নারি! এ কি বালিকার?
এই কি তোমার কন্যা? আমি কি আপনি
ইহারে ধরেছি গর্ভে?

রাজা বলিতেছেন:—

যেমন রজনী
উষারে জনম দেয়। কন্যা জ্যোতির্ময়ী
রজনীর কেহ নহে, সে যে বিশ্বজয়ী
বিশ্বে দেয় প্রাণ।

দেখা যাইতেছে, কন্যার অপূর্বতায় পিতা-মাতা উভয়েই মুগ্ধ।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখিতে পাইব, মালিনীর অকস্মাৎ দর্শনে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণও সমান মুগ্ধ—

একি অপরূপ রূপ! একি স্নেহজ্যোতি
নেত্রযুগে!

তাহারা ভাবিয়াছিল, স্বর্গের দেবী ভক্তের আহ্বানে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখন শুনিল যে, তাঁহারই নির্বাসনের জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রার্থনা জানাইয়াছে, তখন তাহারা বলিয়া উঠিল—

ধিক্ পাপ রসনায়।
শতভাগে ফাটিয়া গেল না বেদনায়,
চাহিল তোমার নির্বাসন!

সকলে সমবেত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

জয় জননীর
জয় মা লক্ষ্মীর। জয় করুণাময়ীর।

সব দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারি, মালিনীর চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে কোথাও একটা অলৌকিক কিছু আছে। সে অলৌকিকত্ব আবির্ভাবজাত।

চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীর সে ব্যক্তিত্ব আর দেখি না। সে তখন উপবন ছাড়িয়া এবং সুপ্রিয়কে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে অনিচ্ছুক। জনতার সম্মুখে দাঁড়াইবার শক্তি তাহার চলিয়া গিয়াছে। এখন সে সুপ্রিয়কে বন্ধু, ও মন্ত্রগুরু হইবার জন্য মিনতি করিতেছে; সুপ্রিয়-রূপ যষ্ঠিখানাকে ভর করিয়া ছাড়া চলিতে সে এতই অশক্ত। আর চূড়ান্তভাবে সুপ্রিয়ের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব যখন আসিল, তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রাজা বলিলেন—

বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার
যখনি রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায় তার
তপন উদয় হতে দেরি নাই আর।
এ-রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠিছে ভরি, বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল, দেবী নারে, দয়া নারে,
ঘরের সে মেয়ে।

এখানেই মালিনীর চরিত্রের চূড়ান্ত অবনমন। আকাশের চন্দ্র ছিঁড়িয়া পড়িয়া উদ্যানের চন্দ্রমল্লিকায় পরিণত হইল। চন্দ্র অধিকতর সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু চন্দ্রমল্লিকা যে মানুষের নিজের। পুরোভাগের মালিনীর ছবি পটে বাঁধাইয়া রাখিবার যোগ্য—প্রান্তভাগের মালিনী যে একেবারে ঘরের মেয়ে। যাঁহারা দেবীচৌধুরাণীর পুকুরঘাটে বাসন-মাজার দৃশ্যকে অবাস্তব বলিয়া থাকেন, তাঁহারা এবারে কি বলিবেন?

মালিনীর অবনমন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেই কি বোঝা যায় না মালিনীর নবধর্ম কত ঊর্ধ্বোত্থিত? সে তুঙ্গতায় কেহ অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না। সংসারে যেমন নবধর্ম আছে, তেমনি মাধ্যাকর্ষণও তো বিদ্যমান বস্তুত মাধ্যাকর্ষণ টানিয়া নামায় না, ঠেলিয়া তুলিয়া দেয়, মাধ্যাকর্ষণে মালিনীকে যত বেশি নীচে নামাইয়াছে, তাহার নবধর্মকে কি তত বেশি ঊর্ধ্বে উঠাইয়া দেয় নাই? মালিনী নিজে নামিয়া পড়িয়া নবধর্মকে উচ্চতর লোকে উঠিতে মুক্তি দিয়াছে, বেলুনের ভারা খসিয়া গিয়া তাহাকে ঠেলিয়া যেমন আরও উঁচুতে তুলিয়া দেয়। কবি এক অপূর্ব কৌশলে মালিনীর আদর্শের জয় ঘোষণাই করিয়াছেন এ কলাকৌশল মহাকবি ছাড়া আর কাহারো কল্পনায় আসিত না। *

---

* রবীন্দ্রনাথের মালিনী

বিজ্ঞমুখের কথা

গায়ে পড়ে আলাপ যেমন মানুষের কাছে বিরক্তিকর লাগে, গায়ে পড়ে কৈফিয়ৎ দিতে আসাটাও তেমনি রীতিমত অস্বস্তিকর। যিনি কৈফিয়ৎ দিতে আসেন, তিনি নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে অপ্রস্তুত বোধ করেন কিংবা কোনও কারণে আপনাকে একটু দোষী মনে করেন। তাই কৃতকর্মের সাফাই না করলে তাঁর অস্বস্তি। কিন্তু তিনি যতই আত্মস্ফালনের চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর ত্রুটির কিছুমাত্র লাঘব হয় না। বরঞ্চ বেড়েই চলে। তার চেয়ে তিনি যদি দয়া করে একটু নীরব থাকেন, তাহলে ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে। তাঁর সত্যিকারের ত্রুটি অতখানি প্রকট হয়ে ওঠে না। আর যাঁরা শুনছেন, তাঁদেরও অকারণ স্নায়ু-পীড়া ঘটে না। আসল কথা, এই কৈফিয়ৎ দিতে আসাটা এক রকম 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স'। যদি কোনও কারণে তাঁর আচরণটা ভদ্রজনোচিত না হয়ে থাকে, তাহলে একটু চুপ করে থেকে যাতে ভবিষ্যতে এমন আর না হতে পারে, সেই চেষ্টায় মন দিলে ফল ভালো হয়। নইলে যাঁরা ইতিমধ্যে বিরক্ত হয়ে আছেন, তাঁরা অকারণ ভূমিকায় আর বহু বাক্যব্যয়ে আত্ম-সমর্থনের চেষ্টায় আরও উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠেন।

ট্রামে-বাসে কত লোক স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় পা মাড়িয়ে দেয়, ধাক্কা দেয়। আমরা সাধারণ পথচারী সেটা গায়ে মাখি না। কারণ চলতি পথের যান-বাহনের মধ্যে প্রাইভেট মোটর গাড়ির নিঝঞ্ঝাট আরামটুকু প্রত্যাশা করাই অন্যায়। কিন্তু সাধারণ একটু ভদ্রতা-জ্ঞান অথবা 'সিভিক সেন্স' প্রত্যাশা করা বোধ হয় অসংগত নয়। পয়সা বেশি খরচ করে ট্যাক্সি চড়তে পারছি না, এটা অবিশ্যি খুবই দুঃখের বিষয়। আর শহরে অসম্ভব লোকাধিক্য হয়েছে, যার জন্য অর্ধেক লোক ফুটবোর্ডে, ম্যাডগার্ডে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে—এটাও প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু তাই বলে সকলের অসুবিধা সমানভাবে ভাগ করে না নিয়ে নিজের সুবিধাটুকু বাগিয়ে নেবার চেষ্টাটা যদি অশোভনভাবে প্রকাশ হয়, তাহলে সেটা শুধু চোখেই লাগে না, মনেও লাগে। উপরন্তু যিনি সকলের সামনে আপন স্বার্থপরতার দৃষ্টান্তটি জাহির করলেন, তিনি যদি কাজটা এমন কিছু খারাপ হয়নি, এই মর্মে একটি বক্তৃতা ফাঁদেন, তাহলে শ্রোতা এবং দর্শকের মন অসহিষ্ণু এবং বিরক্ত হবেই। কারণ বিপদে অথবা অসুবিধায় পড়লেও সাধারণ মানুষ শারীরিক অস্বস্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবটুকু প্রফুল্ল চিত্তেই সহ্য করতে প্রস্তুত হয়—যদি সংসর্গটা সৎ হয়। কিন্তু মানসিক বিরক্তি এসে যায়, যখন দেখি, নির্লজ্জতা এবং অভব্যতার চাক্ষুষ নিদর্শন। দুনিয়াটা শক্তের ভক্ত—একথা অনেকটাই খাঁটি। কিন্তু তাই বলে যিনি অপকর্ম করেন, উপরন্তু চোখ রাঙান অর্থাৎ যা বলছি তাই শোনো এবং মেনে নাও—এইভাবে কথা কন, তাঁকে দুনিয়ার লোক মেনে নিতে রাজি হয় না, হবেও না। গায়ের জোর যার কম, সে ব্যক্তি চুপ করে থাকবে—এই পর্যন্ত। কিন্তু অপরের গা-জুরিটাও মনে মনে সহ্য করবে না, এটা ঠিক। যিনি অকারণে চেঁচামেচি করেন, অভদ্রতা করে পাঁচটা বাজে তর্কের সৃষ্টি করেন, ব্যুলি করে আত্মসমর্থনের দাবী করেন, তাঁর সাহসটা আসলে কাপুরুষের বদসাহস।

কথাটা শুধু পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, মেয়েদের ক্ষেত্রেও। এমন স্ত্রীলোক আছেন, আপনারা অনেকেই হয়তো দেখেছেন—যাঁরা অল্প উত্তেজনাতেই তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দেন। অন্যায় করেন, অথচ এমন ভাব দেখান যেন এই গলাবাজি নিতান্তই স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। শান্ত এবং শান্তিপ্রিয় আত্মীয় অথবা আত্মীয়াকে শ্লেষ বাক্যে জর্জরিত করে ঈর্ষা-নীচতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে হয়তো বড় গলায় বলেন, ভবিষ্যতে ভালোর জন্যই আর সাংসারিক শান্তি-শৃঙ্খলার জন্যই অপ্রিয় এবং কটু কথা বলাও মাঝে মাঝে দরকার। অথচ এঁরা অন্যের কথা, এমন কি, মৃদু ইঙ্গিত পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পারে না। আসলে এসব মানুষের মর্যাদা-জ্ঞান খুবই কম।

* * *

এই কৈফিয়ৎ আর সাফাই অর্থাৎ ভজাভজির ব্যাপারটা শুধু সংসারের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজের বিস্তৃত সংস্পর্শেও ওর নজির দেখা যায়। বেশির ভাগ দেখা যায় এমন সব জায়গায়, যেখানে লোক-সমাগম বেশি অর্থাৎ সিনেমায়, সভা-সমিতিতে, পোস্ট অফিসে কিংবা ট্রাম-বাস, ট্রেন-স্টীমারে মানুষের এই প্রবৃত্তিটা কেমন যেন বিসদৃশভাবে আত্মপ্রকাশ করে। অপরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে নিজের একটুখানি সুবিধা বাগিয়ে নেবার এই নিরন্তর এবং আপ্রাণ চেষ্টা বহু সময়েই হয়তো আপনার চোখে পড়েছে এবং বিরক্তির উদ্রেক করেছে। তার ওপর এই সুবিধা-সন্ধানী লোলুপ ব্যক্তি যদি বক্তা প্রকৃতির হন, গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে নিজের চালাকি এবং কৌশলের সমর্থন করেন, তাহলে তাঁর এই নির্বোধ বাহবা নেবার ভব্য প্রয়াসটাকে কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক দর্শক অথবা শ্রোতা বরদাস্ত করতে পারেন না। সকলেরই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আশা করি। চলতি পথে কত দৃশ্যই চোখে পড়ে মানুষের। যেগুলো খারাপ লাগে, সেগুলো কিছুটা হেসে উড়িয়ে দিতে হয়, নয়তো চোখ বুজে এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু ওরি মধ্যে কয়েকটা ঘটনা মনের মধ্যে গেঁথে থাকে যা সহজে ভোলা যায় না।

যাচ্ছি বাসে চড়ে। এক হাতে একটি বড় প্যাকেট। অপর হাতে ব্যালেন্স রক্ষার চেষ্টায় মাথার ওপরে লোহার ডাণ্ডা আঁকড়ে আছি। কনডাক্টর দু-একবার টিকিটের জন্য কাছে এল। কিন্তু কি করি? অন্য দিন পয়সা হাতেই রাখি, এলেই দিয়ে দিই। আজ দুটো হাতেই আবদ্ধ। ব্যাগ বার করে পয়সা গুণে দেওয়া সত্যিই অসম্ভব। ছুটন্ত বাসের আঁকা-বাঁকা গতির মধ্যে টাল সামলে আর হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে থেমে পড়ার অবসরে একটি হাতও পকেট খুঁজে পাচ্ছে না। ইত্যবসরে সামনের এক সীট থেকে এক ভদ্রলোক উঠলেন। ভাবছি ঐ জায়গাটা দখল করে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে পয়সা বার করব। কিন্তু ঐ নিমেষের ভাবনার অবকাশে এবং চকিতে পলক ফেলার অবসরেই পিছনের এক ভদ্রলোক কি অদ্ভুত কায়দায় কনুই দিয়ে আমাকে ঠেকিয়ে রেখে পাশ কাটিয়ে এবং পা মাড়িয়ে দিয়ে ঐ জায়গাটুকুর সঙ্গে এঁটে গেলেন তা ভালো করে বুঝতেই পারলুম না।

কিন্তু ব্যাপারটা গড়ালো আরো কিছু দূর। পাশেই আর একটি সীট খালি হতে বে-দখল-কারী ভদ্রলোক এক গাল আপ্যায়নের হাসি হেসে বললেন, 'বসুন না, এই যে জায়গা হয়েছে।' অযাচিত আহ্বানের প্রত্যুত্তরে কিছু না বলেই বসে পড়লুম। তবু ভদ্রলোক রেহাই দিলেন না। বলে চললেন, 'আপনার পেছনেই ছিলুম। ভদ্রলোক উঠবার চেষ্টা করতেই আমায় এগিয়ে আসতে হল। আপনি ইতস্তত করছেন দেখে মনে হল, আপনিও বুঝি নামবেন। তাছাড়া দেখছেন তো, হাতে এই থলে নিয়ে... কিছু মনে করেন নি তো?'

বিরস বদনে বললুম, 'নাঃ—তাতে আর কি হয়েছে? তবে আপনি যে রকম হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লেন, তাতে মনে হল......মানে অবাক্ হয়ে গিছলুম, এই আর কি।'

'ও কথা আর বলবেন না মশাই! ভিড়ের মধ্যে কত কষ্ট আর কসরৎ করে একটু জায়গা করে নিতে হয়, বুঝলেন না......

'তা বুঝেছি। তবে সবাই যদি ধীরে-সুস্থে......'

'তা যদি বলেন, অনেক কথাই এসে যায়। কি জানেন—তাড়াহুড়ো করাটা আমাদের জাতের স্বধর্ম।'

বললুম, 'এতো তুচ্ছ কথায় জাত আর ধর্ম এনে ফেলবেন না। ওটা হল ব্যক্তিগত স্বভাব অথবা প্রবৃত্তি।' ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হয়ে গেলেন। বললেন, 'এটা কি এমন নীচ প্রবৃত্তি হল মশাই?'

বলতে বাধ্য হয়েছিলুম, 'কথাটা যদি পছন্দ না হয়, ফিরিয়ে নিয়ে বলছি—উঞ্ছবৃত্তি।'

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিদিগের জন্য কম্বল প্রভৃতির জন্য সাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ আমরা গতবার করিয়াছি। অনেকদিন পূর্বে—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এক সভার সার আলবিয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—(ভারতবর্ষে) ইংরেজদিগের সকল কাজেই বিলম্ব ঘটে। বিধানবাবুর আবেদনে সেই কথা আমাদিগের মনে পড়িল—সকল কাজ বিলম্বে করা কি এদেশের জাতীয় সরকার তাঁহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন? নহিলে, বিধানবাবুর এই আবেদন এত বিলম্বে হইল কেন? কারণ, তিনি কার্যভার গ্রহণ করার পরে এক শীত গিয়াছে—বর্ষার ধারাও বাস্তুহারারা মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে—দ্বিতীয় শীতেরও অর্ধেক প্রায় শেষ হইল। ইতোমধ্যে এমন অভিযোগও শুনা গিয়াছে যে, কোন কোন আশ্রয়-শিবিরে শীতে শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। সে অভিযোগ সত্য কিনা, আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু শিয়ালদহে ও কাঁচড়াপাড়ায় রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে শিশু প্রসূত হইয়াছে ও মরিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেরূপ ব্যাপার আর কোথাও কখন ঘটিয়াছে কিনা, তাহা আমরা জানি না।

তবে বিধানবাবুর এই আবেদনের জন্য আমরা তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছি। বিধানবাবু বলিয়াছেন—আগন্তুকদিগের দুর্দশা অত্যধিক এবং সরকার তাহাদিগের জন্য যথাসাধ্য করিলেও এখনও অনেক কাজ করিবার রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, তিনি বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গ হইতে এখনও হিন্দুরা চলিয়া আসিতেছেন।

অনেকে এখনও তাঁবুতে বাস করিতেছেন। অর্থাৎ যে এক বৎসরে সরকারের ছাড়ে কলিকাতায় বহু সিনেমা ও গৃহ নির্মিত হইয়াছে—এমন কি "নগর" বলিয়া পরিচিত গৃহও নির্মিত হইতেছে, সেই এক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ববঙ্গের সর্বহারাদিগের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই—এমন কি তাঁহারা নিজ ব্যয়ে গৃহ নির্মাণের জন্য উপকরণ লাভের অনুমতিও অনেক ক্ষেত্রে লাভ করেন নাই।

বিলম্বে হইলেও এই আবেদন সর্বতোভাবে সঙ্গত। আমাদিগের দুঃখ এই যে, যে সকল প্রতিষ্ঠান সেবার কার্যের জন্য প্রসিদ্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজও সে সকলের সহযোগ প্রার্থনা করেন নাই। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ—এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহযোগেও সাহায্য কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে।

বিধানবাবুর আবেদনে সর্ববিধ সাহায্য পশ্চিমবঙ্গে সাহায্যদান ও পুনর্বসতি বিভাগের কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে। আমরা আশা করি, বিধানবাবু অনুসন্ধানফলে জানিয়াছেন, সরকারের সাহায্য বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হায়দরাবাদে যাইয়া ঘোষণা করিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রীর তহবিল হইতে তথায় আশ্রয়প্রার্থীদিগের সাহায্যার্থ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইবে। হায়দরাবাদ এখনও স্বতন্ত্র রাজ্য হইলেও হায়দরাবাদের আশ্রয়প্রার্থীদিগের সাহায্যলাভে আমরা আনন্দিত। প্রধান মন্ত্রীর তহবিলে যথেচ্ছা ব্যয় করিবার জন্য কত টাকা বাজেটে বরাদ্দ থাকে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা কি আশা করিতে পারি যে, সে তহবিল হইতে বিধান বাবুর আবেদনে উল্লেখযোগ্য অর্থ প্রদত্ত হইবে? পশ্চিমবঙ্গ ভারত রাষ্ট্রের অংশ—সীমান্তে অবস্থিত এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের দুর্দশা যে দেশবিভাগের ফল, তাহা কংগ্রেসের সম্মতিতেই হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গকে আশ্রয়প্রার্থীদিগের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইলেও পশ্চিমবঙ্গ বহু অর্থব্যয়ে সর্বাগ্রে গান্ধীজীর স্মৃতিস্তম্ভ রচনার গৌরব লইতে পারিয়াছে। যখন সেই স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন-জন্য পণ্ডিত জওহরলাল কলিকাতায় আসিবেন, তখন হয়ত তিনি একবার শিয়ালদহ স্টেশনে যাইবার সময় পাইবেন এবং আশ্রয়প্রার্থীদিগের জন্য সাহায্যদানও ঘোষণা করিবেন। তিনি তাহা করিলে যে ঐ স্তম্ভনির্মাণকার্য যাঁহার উদ্যোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে সেই সচিবও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন ও সেই কার্য চারিদিকে সংক্রমিত হইবে। বিধানবাবু সত্যই বলিয়াছেন, বাস্তুহারাদিগের জন্য করিবার অনেক কাজ রহিয়াছে। হয়ত প্রায় সব কাজই অবশিষ্ট রহিয়াছে; কারণ এখনও গ্রাম-পরিকল্পনা হয় নাই—যে সকল অতিলোভী ব্যক্তি লাভের সম্ভাবনা বুঝিয়া জমী কিনিয়া রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন, তাঁহারা সমাজের অনিষ্টকারী—তাঁহারা সেই জমী যে দামে কিনিয়াছেন, সেই দামে সরকারকে বিক্রয় করিতে, বাধ্য করা আমরা প্রয়োজন ও সরকারের কর্তব্য মনে করি। ঐ সকল লোভী অনায়াসে চাষের জমী কিনিয়া তাহা বাসের জন্য বিক্রয় করিবার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহারা অনেকে সচিবদিগের বন্ধু! তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সরকারকে সতর্ক হইতে হইবে। সরকারকেই গ্রাম গঠন করিতে হইবে—গ্রামে স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বিবেচনা করিতে হইবে—জলনিকাশের ও পানীয় জল সরবরাহের—পথের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপায় হইলে যাহাতে গ্রামে শিল্প প্রতিষ্ঠা হয় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

আর যাহাতে চাষের উপযুক্ত জমী পতিত না থাকে, সে জন্য সরকারকে নিয়ম করিতে হইবে—নিয়মভঙ্গ অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এ বিষয়ে আমাদিগের যে ত্রুটি নাই, তাহা নহে। 'পতিত' জমী যে স্থানে গৃহসংলগ্ন বা গৃহের নিকটবর্তী সে স্থানে তাহাতে শাক-সব্জীর চাষ করা প্রয়োজন—গোপালনে মনোযোগী হইতে হইবে। জমীতে যত দিন বেড়া দেওয়া সম্ভব না হয়, ততদিন মান ও ছোট কচুর চাষ সহজেই হইতে পারে—কচুগাছ গরুতে ও ছাগলে খায় না। যাহাকে ইংরেজীতে 'কিচেন গার্ডেন' বলে, তাহাতে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সরকার অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন কর—এই প্রচেষ্টায় যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহা যে অপব্যয় মাত্র হইয়াছে, তাহা, বোধহয়, সরকারও অস্বীকার করিবেন না। কেন যে অপব্যয় হইয়াছে, তাহার কারণ কি সরকার অনুসন্ধান করিয়া প্রতীকারের পথ গ্রহণ করিবেন?

যদি সেচের সুব্যবস্থা হয়, তবে যে এক বাঁকুড়া জিলাতেই আরও বহু সহস্র লোকের স্থান হইতে পারে, তাহা বলা যায়। যতদিন দামোদর পরিকল্পনায় বাঁকুড়ার নদীতে জল অধিক আসিতে পারে—ততদিনে পুষ্করিণী খনন ও পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন অনায়াসে করা যায়।

পাট বাঙলার সম্পদ। পাটে বাঙলায় যত অর্থাগম হয়, তত আর কোন কৃষিজ দ্রব্যে হয় না। পাটকলগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গে—কলিকাতার উপকণ্ঠে ভাগীরথীর দুই কূলে। কিন্তু পূর্ববঙ্গেই অধিক ও উৎকৃষ্ট পাট হইয়া থাকে। সেই জন্য পশ্চিমবঙ্গে পাটকলগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে আশঙ্কানুভব করিয়াছেন। এবার পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে সে আশঙ্কা, অপনীত না হইলেও প্রশমিত হইবে। গবেষণা ও পরীক্ষাকল্পে চুঁচুড়ার (হুগলী জিলা) সরকারী কৃষিক্ষেত্রে যে উৎকৃষ্ট পাট ('বিনসুরা গ্রীন') উৎপন্ন করা হইয়াছিল, বাঙলা বিভাগের সময় হিন্দু সরকারী কর্মচারীদিগের অসতর্কতায় তাহার সঞ্চিত সব বীজ পাকিস্থান লইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে উৎকৃষ্ট পাটের বিশেষ অভাব

লক্ষিত হইয়াছিল। এবার সেই অভাব বহু পরিমাণে দূর হইয়াছে এবং ২৪ পরগণা জিলার কোন কোন স্থানে যে পাট উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ও ঔজ্জ্বল্যে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে আমরা একটি কথা সরকারকে বলা প্রয়োজন মনে করি। যদি পূর্ব-বঙ্গ হইতে আবশ্যক পরিমাণ পাট আমদানীর অসুবিধা ঘটে, সেই আশঙ্কায় কলওয়ালারা ও বিদেশে রপ্তানীকারীরা সেই পাট অতিরিক্ত অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন। মূল্য যদি ঐরূপ অস্বাভাবিক অধিক হয়, তবে পাটের পরিবর্তে ব্যবহার্য দ্রব্যের যে উৎপাদন চেষ্টা হইতেছে, তাহা আরও প্রবল হইবে এবং সে চেষ্টা যদি সফল হয়, তবে কৃত্রিম নীল রং উৎপাদনে এদেশের নীলের যে সর্বনাশ হইয়াছে, পাটেরও তাহাই হইতে পারে। সেইজন্য যাহাতে অল্প মূল্যেই পাটের বীজ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, সরকারের সেই ব্যবস্থা করা কর্তব্য। হরিণঘাটায় বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যে জমী সরকার কৃষির জন্য অধিকার করিয়াছেন, তাহার একাংশে অবশ্যই এই পাটের বীজ উৎপন্ন করা যায়। মূল্যের অল্পতাই যখন পাটের আদরের প্রধান কারণ, তখন সরকারের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য।

গত ২৫শে ডিসেম্বর 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গান সম্বন্ধে যে মতভেদ আলোচনায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার নিরশন জন্য বিশ্বভারতীর কয়জন বিশিষ্ট সভ্য কয়খানি পত্র প্রচার করিয়াছেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিয়াছেন—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ব্যক্তিদিগের নিকট ঐ সকল পত্র প্রেরণ করা সঙ্গত হয় নাই; কারণ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কোন কথা বলা বাহুল্য। অতুলবাবু বড় উকীল হইলেও রাজনীতিতে অভিজ্ঞ নহেন। কারণ—

"Gratitude may occasionally be met with in private life, but it is a negligible quantity in politics."

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী লিখিয়াছেন, যদি পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথের কথা বলা বাহুল্য হইত, তবে তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারিত না, কিন্তু তাঁহাদিগকে সে কথা বলাই প্রয়োজন। যে ১৬ মাস ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছুই করা হয় নাই। ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভের পর রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ছুটি ঘোষিত হয় নাই; অথচ নানা স্তরের নানা রাজনীতিকের জন্মদিনে যে সব অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এশিয়ান রিলেশানস সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখও করা হয় নাই। অথচ যে আন্তর্জাতিকতার বিস্তার জন্য ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম কেবল য়ুরোপে, আমেরিকায়, চীনে ও জাপানে নহে, পরন্তু তখনও অবজ্ঞাত যবদ্বীপ, শ্যাম প্রভৃতি প্রাচ্য দেশসমূহে আন্তর্জাতিকতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিকতাই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির একমাত্র আশাস্থল, সে সম্বন্ধে তাঁহার গদ্য ও পদ্য বহু রচনা হইতে কেহ একটি ছত্রও উদ্ধৃত করেন নাই। ইহার কারণ অবশ্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আমরা জানি, আজ পর্যন্ত ভারত সরকার কোন বাঙালীকে বিদেশে রাষ্ট্রদূত করেন নাই। অথচ যে ৩ জন ভারতীয় ভারতের প্রকৃত রাষ্ট্রদূত তাঁহারা ৩ জনই বাঙালী—রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর কলিকাতায় কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ পরিদর্শন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—দরিদ্রগণ অধিক অর্থ দিয়া চিকিৎসা করাইতে পারেন না বলিয়াই যে তাহাদিগকে যে কোনরূপ সুলভ চিকিৎসা দিতে হইবে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজী যদি সরকারের কাছে—এ্যালোপ্যাথির মতই আদর ও সাহায্য পাইতে চাহে, সে কেবল ব্যয়সাধ্যতার অভাবজন্য নহে—তাহারাও রোগ চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া। রাজকুমারী বলিয়াছেন, ভারত সরকার হোমিওপ্যাথিও চিকিৎসা-পদ্ধতি বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন কি না, তাহা এখন বিবেচনাধীন। কবিরাজী সম্বন্ধে কি তাহাই? আমাদিগের মনে হয়, স্বাস্থ্য-মন্ত্রী যদি হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী মতে পরিচালিত হাসপাতালগুলির কার্য-বিবরণ পাঠ করেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সুবিধা হয়। যে স্থানে ব্যয়ের অল্পতা উপকারিতার সহিত সম্মিলিত হয় তথায় যে 'সোনায় সোহাগা' হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি যেমন আদর পাইয়াছে, কবিরাজী তেমনই এদেশে বহুকাল হইতে সমাদৃত এবং এখনও সে আদর দূর হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিরাজী হাসপাতালসমূহ সম্বন্ধে কোন কোন পরিকল্পনা করিতেছেন বলিয়া শুনা যায় বটে, কিন্তু কোন কল্পনানুযায়ী কাজ করা হইতেছে না। আমরা কিন্তু জানি, মাদ্রাজে কবিরাজী চিকিৎসা সরকারের দ্বারা অবজ্ঞাত নহে। পশ্চিমবঙ্গে তাহার অনুরূপ ব্যবহার লাভের কি কারণ থাকিতে পারে?

কলিকাতায় যে সম্মেলনে কুষ্ঠরোগ দূর করিবার বিষয় আলোচিত হয়, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ডক্টর কাটজু বলিয়াছেন, চিকিৎসা ব্যাপারে আমাদিগের পক্ষে অন্ধভাবে প্রতীচীর অনুসরণ করিলে চলিবে না—আমাদিগের সামাজিক ব্যবস্থা, রীতিনীতি, জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও সরকারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা তাঁহার মতের অনুমোদন করি। তাঁহার মত এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে রাজকুমারী অমৃত কাউরের মত বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতে হয়, এই দরিদ্রদেশে লোক যাহাতে অল্পব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারে, সে ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য।

বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে ও শ্রীসুনীল মিত্র।

আমরা বিদ্যাসাগর কলেজের ১৯৪৮ সালের বার্ষিক সাহিত্যপত্র "বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা" উপহার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। ছাত্র ও অধ্যাপকগণের বহু চিত্তাকর্ষক রচনায় পত্রখানি সমৃদ্ধ। পত্রখানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কেবল সাহিত্যচর্চাই করা হয় নাই, কৃষি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রবন্ধের দ্বারা পত্রখানার বৈচিত্র্যসাধন করা হইয়াছে। প্রবন্ধাদি বাঙলা, ইংরাজি ও হিন্দী ভাষাতে রচিত।

নমামি—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী (গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের কথা-চিত্র)। প্রকাশক—শ্রীবিমলারঞ্জন চন্দ্র। বিমলারঞ্জন প্রকাশন, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। দাম দেড় টাকা।

মুখবন্ধে গ্রন্থকার পুস্তকখানির পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার বেশীর ভাগই বাস্তব ঘটনা অল্পটুকু কল্পনা, অর্থাৎ পুস্তকখানি মুখ্যত ইতিহাস, গৌণত গল্প। বাস্তব ঘটনাকে রসরাজ্যের ভাবনার মধ্যে লইয়াই ইতিহাসকে প্রাণময় বিকাশে রূপায়িত করিবার কৃতিত্ব গ্রন্থকারের আছে। পুস্তকখানাতে অগ্নি যুগের ঘটনা অবলম্বন করিয়া নয়টি গল্প লিখিত হইয়াছে। ছোট গল্পের রসধর্মে এগুলি সমুত্তীর্ণ হইয়াছে। ভাষা সুষ্ঠু, সংযত গতিতে সংবেদনের মুখ্য ধারায় মনকে নাড়া দেয় এবং ঘটনার গণ্ডি হইতে তাহাকে মানবতার বৃহত্তর আদর্শের বেদনায় উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। বিপ্লবী আন্দোলনের রোমাঞ্চকর পরিপ্রেক্ষায় মনোধর্মের এই সত্য সমীক্ষা গল্পগুলি সার্থক করিয়াছে। গ্রন্থকার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সে আন্দোলনের প্রাণতত্ত্বকে পরিস্ফুর্ত করিয়া তুলিয়া তিনি বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'নমামি' 'রুদ্র চপল' 'অজয়-অমর', "সিঁড়ি" গল্প কয়েকটি সাহিত্যে স্থায়ী হইবার যোগ্য। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

বৌদ্ধ ধর্মঃ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত। প্রকাশক—পূর্বাশা লিমিটেড। পি-১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি একত্রে সংকলন করিয়া এই গ্রন্থখানা প্রকাশ করা হইয়াছে। মোট সতেরোটি প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের আদি কথা, উহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং এই ধর্মাবলম্বী লোক-সঙ্ঘের সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ইতিহাস অতি গভীর ভাবে অথচ সহজ ভাষায় এই সকল প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের সংকলয়িতা প্রবন্ধগুলিকে যে ভাবে সাজাইয়াছেন, তাহাতে উহাদের পৌর্বাপর্য অতি উত্তম ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। বিষয়ের তত্ত্ব, ভাব ও প্রতিপাদ্যের দিক হইতে এরূপে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হওয়ায় পাঠকদের বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এইরূপ মূল্যবান প্রবন্ধাবলী এতদিন পর্যন্ত প্রাচীন সাময়িক পত্রাদির পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ ছিল। সংকলয়িতা বহু শ্রম স্বীকার করিয়া এই সকল প্রবন্ধ সংগ্রথিত করিয়া যে গ্রন্থখানা প্রকাশ করিলেন, বাঙলা সাহিত্যে তাহা স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হইবে। বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে এমন সুন্দরভাবে আলোচনা বাঙলা ভাষাতে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় সাধারণতঃ ধর্মের তথ্যটাকেই বড় করিয়া দেখান হয় এবং উহা বিশ্লেষণ করিয়া কাজ সমাধা করা হয়। তাহার ফলে ঐ সকল আলোচনা কতকটা গণ্ডিবদ্ধ হইয়া পড়ে। শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় নূতন আলোকপাত করিবে। কারণ, তিনি ধর্মের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটা মুখ্য ভাবে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধগুলিতে তত্ত্বের দিকটা প্রচ্ছন্ন অথচ সর্বাঙ্গীন ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ গ্রন্থখানা মূলতঃ ঐতিহাসিক হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে ধর্মের তত্ত্ববস্তুও প্রায় সবটাই পাঠকের বোধগম্য হইবে। হিন্দুধর্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম দূরবর্তী নহে; ইহার মূলবস্তুও আর্যধর্মেরই প্রতিবেশী। আর্যধর্ম বুদ্ধকে অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া সদ্ধর্ম তাঁহাকে নিজের ক্রোড়েই টানিয়া লইয়াছে। কাজেই হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য হইবে এই ধর্মের ইতিহাস ও তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা। কিন্তু এই চেষ্টা একেবারেই বিরল। নতুন এমন একখানি মূল্যবান গ্রন্থ এতদিন অপ্রকাশিত থাকিত না। আমরা গ্রন্থের সংকলয়িতা তথা প্রকাশক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। বিষয়বস্তু এবং ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সব দিক দিয়াই গ্রন্থখানা আকর্ষণযোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থের পুরোভাগে শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি আছে। এইরূপ সদ্‌গ্রন্থের প্রচার অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

জাতবেদাঃ—শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মা প্রণীত ও শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, উপনিষদ রহস্য কার্যালয়; ৬৪, কালী ব্যানার্জির লেন, হাওড়া। মূল্য আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩০।

'জাতবেদা' তত্ত্ব সম্বন্ধীয় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মার তিরোধানের পর তাঁহার লিখিত কাগজপত্রাদি হইতে গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করিয়া যথাযথভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। অধ্যাত্মবিদ্যায়, এরূপ একখানি মূল্যবান গ্রন্থ জনসমীপে উপস্থিত করার জন্য প্রকাশক ও সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদার্হ। 'জাতবেদা' গ্রন্থখানাকে এক কথায় বেদতত্ত্বের সার সংকলন বলা যাইতে পারে। কারণ, আত্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুদের নিকট গ্রন্থখানার মাধ্যমে বেদের মূল বস্তু অতি সুচারুরূপে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানা সম্বন্ধে আরও উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, বেদকে জ্ঞান ও ধ্যানের বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্বসূরীরা যে ভাবে উহার জটিলতাকে সরলাকৃত করিয়া গিয়াছেন, মোটামুটি সেই ভাবেই আলোচ্য গ্রন্থের তত্ত্বজ্ঞ গ্রন্থকার বেদ তত্ত্বকে ঠিক প্রাণের জিনিসে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। এজন্য ভূমাতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য সাধারণ লোকের মনেও এই গ্রন্থ পাঠে ঔৎসুক্য জাগরিত হইবে।

আলাপনী—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস এম এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ ক্যাম্প, রোহিণী রোড, দেওঘর। মূল্য সাড়ে পাঁচ আনা।

শ্রীঅনুকূল ঠাকুরের সঙ্গে কতকগুলি আলোচনা এই পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

২৫৪/৪৮

যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের অতিআধুনিক কবিতা

[১৯১৮—১৯৪৭]

শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

ভবিষ্যদ্বাণী করা সব সময়েই বিপদজনক। তবুও গত ত্রিশ বছরের ইংরাজী কবিতার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে, সে যুগটাই ছিলো একটু 'লিরিক্যাল্'; অনেক সুন্দর সুন্দর বর্ণনাত্মক এবং উপহাসমূলক কবিতা, এই যেমন মোসফিল্ডের সব কবিতা, সে যুগে মোটেই পড়া হয়নি। সে যুগটা ছিল যেন 'Sick hurry and divided aims'এর যুগ, 'রেডি-মেড' সিনেমা আর রেডিওর সস্তা চটকদার আমোদেই সে

সিসিল ডে লুইস

যুগের লোকগুলোর মাথা গিয়েছিল নষ্ট হয়ে! সবাই হাল্কা আমোদে গা ভাসিয়ে দিয়ে বেশ সুখেই ছিলো একরকম!

প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক বিশ্বের কিছুটা প্রসারতা লাভ ঘটে এলিজাবেথান যুগে। মানুষের ছোট্ট সীমাবদ্ধ কল্পনার নবচেতনাও বৃদ্ধি পায় অনেকখানি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার হচ্ছে আরো বড়, আরো মহৎ। বিংশ শতাব্দীর সুদূরপ্রসারী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি মানুষকে আরো অনেকখানি সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে গিয়েছে, যদিও সবখানিই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়নি। এইসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষকে প্রচুর দোলা দিয়েছে, অগ্রগমনের অজস্র প্রেরণা দিয়েছে, তবুও অনেকে বলছেন যে এতে নাকি মানুষ সত্যিই নিজেকে তেমন সমুজ্জ্বল করে তুলতে পারেনি। মন যখন চিন্তা করে:

"Bliss is it in this dawn to be alive
But to be young is very Heaven."

তখন মনে হয় স্পষ্টই যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করে নেওয়ার কাছে মানুষের নিজের চিত্তজয় করায় যে পরাজয় তা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর! বিজ্ঞান আর যুদ্ধ মানুষের মনে এনেছে ধূসর বৈরাগ্যের হতাশা, সে পথ চিত্তজয়ের পথ নয়, সে পথ আত্মবিশ্বাসের পথ নয় বা সে পথ মহত্তর কিংবা বৃহত্তর জগতেরও নয়। সে জগতে খালি হানাহানি, অবিচার আর অমানুষিক অত্যাচার। সেখানে শুধু অসাম্য, সেখানে পদে পদে শুধু মানুষের অশান্তি। তাই এই যুগ প্রধানত গীতিধর্মী হলেও তাতে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে: হিংসা, হতাশা, ভয়াবহ আশা আর ব্যর্থতা। পাখীর গানের মধ্যেও ঝড়ের আহ্বান, গান সেখানে কেবল গান নয়, সমরসংগীত; সে গানও যে কোন গানের চেয়ে নিকৃষ্ট তা নয়; সে গানও পৃথিবীকে শান্তি, স্বস্তি, আশা দিয়ে ঘিরে রাখতে পারে।

অন্যদিকে চলেছে আর এক রকমের কবিতা, (কবিদের সার্বজনীন যা রূপ) সে কবিতা হচ্ছে প্রাকৃতিক কবিতা। প্রকৃতির জয়গান করে সেই সব কবিতার জন্ম। সে কবিতার প্রাণ-ফুল, পাখী কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক নমনীয় ভাবধারা। সমসাময়িক বিশ্বের গভীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে তাঁদের 'এস্কেপিষ্ট'ই বলা যায়—যেমন বলা যায় Eldorado-এর কবিদের:

"Out to seek an Age of Gold
Beyond the Spanish Main."

টমাস হার্ডি তাঁর একটি কবিতায় এই ঐতিহাসিক সত্যকে প্রকটভাবে প্রকাশ করেছেন:

"Only thin smoke without flame
From the heaps of couch-grass:
Yet this will go onward the same
Though Dynasties pass."

আজকের কবিতায় কিন্তু মানুষের সমস্যার কোন সমাধান নেই, কবিতা থেকে মানুষ আজ সান্ত্বনা পাচ্ছে খুব কম। আধুনিক কবিতায় তার কোন চেষ্টাই নেই। অবশ্য কবিদের যে সমসাময়িক সমস্যার সমাধানের রাস্তা বাৎলে দিতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই—কবিদের কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেই জটিল তর্কের সৃষ্টি হবে।

গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে প্রথম যুদ্ধ-কবিতা লেখেন কবি Rupert Brooke, তাঁর লেখা 'The Soldier' হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ জাতের যুদ্ধ-কবিতা, এই রকম কবিতা হলো Tulian Grenfell-এর Into Battle। এই সব কবিতার প্রতিটি লাইন দেশাত্মবোধে উজ্জ্বল, প্রতিটি লাইনই পাঠকের মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা এনে দেয়। এই রকম খাঁটিজাতের উত্তেজক কবিতা Thomas Hardy'র Men who March Away:

"Press we to the field ungrieving
In our heart of hearts believing
Victory crowns the just.
Hence the faith and fire within us
Men who march away."

যুদ্ধের তীব্রতা, পাশবিকতা আমরা স্পষ্টই অনুভব করতে পারি এঁদের কবিতা থেকে। জীবনের এই যে অনিশ্চয়তা এর থেকেই আসে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা, বিদ্বেষ, আদর্শের

ষ্টিফেন স্পেণ্ডার

ওপর বিতৃষ্ণা। মানুষের মন হয়ে যায় একেবারে cynical. তবুও মানুষ যুদ্ধ থেকে শেখে হাতে হাত মেলাতে, একতাবদ্ধ হতে, সমানতালে চলতে। একমন এক প্রাণ হয়ে গড়ে ওঠে সংঘবদ্ধতায়, ঢিলেমীর জায়গা দখল করে ক্ষিপ্রতা, প্রাণের চঞ্চলতায় জড়তার ঘটে বিসর্জন।

"Was there love once? I have
forgotten her,
Was there grief one? grief yet is
mine.
Other loves I have, men rough, but
men who stir.
More grief, more joy, than love of
thee and thine.
Faces cheerful, full of whimsical
mirth,
Lined by the wind, burned by the
gun;
Besides enraptured by the abounding
earth,
As whose children we are breathren
one."

(Fulfilment: Robert Nichole)

যুদ্ধকবিদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীভুক্ত হচ্ছেনঃ সিগ্‌ফ্রিড স্যাসুন, যাঁর কবিতাতে যুদ্ধের আবর্জনা ছন্দের মধ্যে ধরা পড়েছে। তাঁর হাতে যুদ্ধ কবিতা রূপ নেয় সহজেই আর সেই অনাবিল রচনা পড়ে পাঠকের মনে সত্যিই যেন একটা খুশির জোয়ার আসে। এ'র পর ঃ আইজাক রোজেনবার্গ, ইনি অবশ্য যুদ্ধের আগেও সুন্দর কবিতা লিখতেন। যুদ্ধের পর এ'র মধ্যে এলো বিপুল পরিবর্তন আর সেই পরিবর্তনেই আমরা মুগ্ধ। উইলফ্রিড ওয়েন কলম দিয়ে যেন যুদ্ধের ফুলকি ফোটান। যুদ্ধের ভয়াবহতার সত্যিকারের বিচিত্র ছবি আমরা এ'র কাছ থেকে পেয়েছি। এ'র কবিতার সব থেকে বড়গুণ হোলো ঃ কোথাও উচ্ছ্বাস নেই, বাহুল্য নেই, আর নেই কথার আধিক্য।

ডবলিউ এইচ অডেন

সহজ সরল ভাষায় সূক্ষ্ম অনুভূতিটুকু জাগিয়ে দিতে ইনি অদ্বিতীয়। তাঁর মতে ঃ

"Poetry is in the Pity."
The truth untold
The pity of war, the pity war
distilled."

এই হোলো কবি ওয়েনের কাব্য। সত্যকে অনাবৃত করাই হোলো তাঁর প্রথম এবং প্রধান কাজ। ইনি বিশ্বের বন্যস্বরূপ সকলের চোখের সামনে নগ্ন করে দিয়েছেন নির্দয়ভাবে। তাঁর কাজ অনেকটা যেন ওয়াল্ট হুইটম্যানের মত। সংগ্রামের পরই শান্তি। ধ্বংসের ডমরু বাজিয়ে দিয়ে শেষে কবিরা সৃষ্টির বাঁশি ধরেছেন ঃ

"Great peace;
For a space let there be no roar
of wheels and voices, no din
of steel and stone and fire.
Let us cleanse ourselves from the
sweat and dirt.
Let us be hushed, let us breathe
The cold sterile wind from colourless
space."
(Retreat: Richard Aldington)

সংগ্রাম মানুষের মনে স্পষ্টই বিরক্তি এনেছে। তাই শান্তির প্রার্থনা। স্তব্ধ এমন কোন একটা জগতে মানুষ আজ যেতে চায় যেখানে কোন রকম উৎকট শব্দে পৃথিবী খণ্ডিত হচ্ছে না—যেখানে মানুষ বুকে ভরে বিশুদ্ধ বাতাস টেনে নিতে পারে। কিন্তু আজকে কি আমরা সে রকম ঠাণ্ডা জগত কোথাও পাবো, যেখানে ধুলোর মত বা ঘামের মত যুদ্ধকে মুছে দেওয়া যাবে ?

যুদ্ধোত্তর কালের কবিদের আমরা দুটো ভাগ করতে পারি ঃ যাঁরা যুদ্ধের আগের গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন, আর যাঁরা ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সমস্ত দৃষ্টিকোণই পালটে ফেলেছেন।

১৯২২ সালে এলেন টি এস এলিঅট 'waste land'-এর মধ্যে। যুদ্ধের পটভূমিকাতেই এই কাব্য গ্রন্থের সৃষ্টি। প্রথম প্রকাশিত হয়েই সর্বশ্রেণীর পাঠককে দোলা দিল সমানভাবে। কাব্য জগতে এক নোতুনের জোয়ার এলো চারিদিক তোলপাড় করে। ঐতিহাসিক যুগ থেকে যে কবিতা চলে আসছে এ'র কবিতা তার থেকে স্পষ্টই একটা ব্যতিক্রম। 'The waste land' শুধু বলে দিচ্ছে আজকের যুগ কত নিরস সত্যের যুগ। তাছাড়া তাঁর কাব্যের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে নানা ধরণের মনস্তত্ত্বের জটিল ব্যাখ্যার, ফ্রয়েডিয়ান্ দর্শিত নানারকম অবচেতন মনের কথার।

এই রকম শ্মশান থেকে আর এক নতুন জাতের কবিরা এসেছেন ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে। টি এস এলিঅটের পন্থা অনুসরণ করে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন স্টিফেন্ স্পেণ্ডার, সি ডে লুইস, ডবলিউ, এইচ অডেন আর লুই ম্যাক্‌নীস্। এলিঅটের অনুসরণে হলেও এ'দের চারজনের কবিতার দর্শন ভিন্ন। এ'রা মানুষের আত্মার এবং মহত্ত্বের ওপর বিশ্বাসী। মানুষের মধ্যেই এ'রা দেবতার প্রতিষ্ঠা চান। এলিঅটের, রবার্ট ব্রিজেসের এবং হপকিন্সের ব্যবহৃত ছন্দে, প্রতীকে, শব্দ-কোষের ওপর নিজস্ব পাণ্ডিত্যের ছোঁয়াচ দিয়ে এ'রা কবিতা লেখেন। আধুনিক কবির কবিতা হচ্ছে ঃ অপ্রত্যক্ষ ইংগিত, অর্ধ-সংকেত, মূর্তি-ময়ী প্রতীকী আর গভীর জগতের অস্পষ্ট ছায়া।

এসব কথা ছেড়ে দিয়েই নির্ভয়ে এবং উচ্চ-কণ্ঠে বলা যায় যুদ্ধোত্তর যুগে ইংরাজী সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কবি হলেন ডবলিউ বি য়েট্‌স্। আগের যুগে ইনি ছিলেন খাঁটি-জাতের একজন গীতিকার। মধ্য-জীবনে ইনি আইরীশ লোক-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেন। যুদ্ধোত্তর কালের য়েট্‌স কিছুটা জন-ডন-এর আর কিছুটা হিন্দু-দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত (যেমন প্রভাবান্বিত জর্জ রাশেল এবং জেম্‌স্ ষ্টিফেন)। য়েটসের কবিতা হচ্ছে অল্পবিস্তর নীতিমূলক রূপক কবিতা, তবুও তা গীতি-ধর্ম থেকে বিচ্যুত নয়।

আর একদল কবি হচ্ছেন ব্যক্তিগত কবি। তাঁরা সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন

টি এস এলিঅট

থাকতে ভালোবাসেন, তাঁরা কোন দলেরই নন। এ'রা সময়ের বা গোষ্ঠীর গণ্ডী থেকে সব সময়েই তফাতে থাকেন। এ'দের কবিতা থেকে বোঝা যাবে না যে সময়ের বা জীবনের কী দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এ'রা রাজনৈতিক চেতনাকে অর্থহীন বলেই উড়িয়ে দিতে চান, এ'দের মতে রাজনীতি কেবল অশান্তিই এনে দেয় মানুষের জীবনে। এই দলে পড়েনঃ রয় ক্যাম্পবেল, প্রকৃতির সন্তান ডবলিউ এইচ ডেভিস, যিনি অর্ধচেতনায় এলিজাবেথান যুগের গান গেয়েই কাটিয়ে দিলেন ! ছন্দ যাদুকর ওয়াল্টার ডি লা মেআর, যাঁর কলমে প্রকৃতির সৌন্দর্যই কেবল ফোটে; বিবয় বিবাগী আর উদাসীন এ ঈ হৌস্‌ম্যান। ডি এইচ লরেন্স, যিনি মানুষের চেতনা এবং সুকুমার বৃত্তির উদ্বোধক; বিংশ শতাব্দীর ঈশা হার্বার্ট পামার; বিদগ্ধ সংযমী রুথ পিটার। আর তীক্ষ্ম প্রগতিবাদিনী আনা উইকহাম্।

বড়দিন সংখ্যায় সহযোগী "স্টেটসম্যান" কলিকাতার রাস্তার দুইটি যুধ্যমান বলীবর্দের ছবি ছাপিয়াছেন।—"John

Bull-এর অভাবে অন্তত মুলতানী Bull—যাহোক কোনরকমে বড়দিনের জলুস বজায় রেখেছে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

এবারে বড়দিনে রাণী জুলিয়ানার শান্তির বাণীটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অন্তত একটি পুরস্কার বিতরণে নোবেল পুরস্কার কমিটিকে যে আর মাথা ঘামাইতে হইবে না, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলাম।

* * * * *

মহিলাদের অভ্যর্থনা সভায় শ্রীমতী সরোজিনী বলিয়াছেন—

"The only thing that counts in life is the sincerity of love and the pattern of your desire to serve humanity."

—"কিন্তু তাঁদের Pattern Book-এ শ্রীমতী সরোজিনী বর্ণিত এই Patternটি খুঁজে পেয়েছেন কি?" —প্রশ্ন বলা বাহুল্য খুড়োর।

* * * * *

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে প্রদেশপাল একাদলের খেলায় বাঙলার ক্রিকেটের মাটিকে যাঁরা নেহাৎ গোবরে-মাটি মনে করিয়াছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অবাক হইয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, গোবরেও পদ্মফুল অর্থাৎ "পঙ্কজ" ফোটে এবং Uphill task হইলেও গোবর্ধন-গিরি ধারণ করিবার "গিরিধারী" আমাদের আছে।

* * * * *

চিকিৎসক সম্মেলনে শ্রীমতী সরোজিনী বলিয়াছেন—

"Medical profession must be shared by all peoples in all countries."

—শ্যামলাল বলিল—"অন্য দেশের কথা জানিনে, আমাদের দেশে অনেক হাতুড়ে ইচ্ছে করেই এই গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে!!"

* * * * *

প্রসঙ্গত একটি সংবাদ মনে পড়িয়া গেল। শুনিয়াছি যুক্তরাষ্ট্রের Illinois University-র ভাইস-প্রেসিডেন্ট নাকি বলিয়াছেন—"Prayer too can cure sick." কথাটা নূতন কিছু নয়, আমাদের দেশে মানৎ আর সিন্নী-চিকিৎসার চলই বরং বেশি।

* * * * *

Christmas Spirit দুষ্প্রাপ্য হইলেও একবারে অপ্রাপ্য যে নয়, তার নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। বড়দিনের প্রাক্কালে জেনারেল

তোজোর ফাঁসীতেও ক্ষমাধর্মই সগৌরবে সূচিত হইয়াছে। —"যীশু কি বলেছেন, তা তিনি জানেন না, তুমি তাকে ক্ষমা করো ভগবান"—প্রার্থনা করিলেন খুড়ো।

* * * * *

Parliament stood on Sword"—একটি সংবাদের শিরোনামা। ব্যাপারটা কিছুই নয়, শুনিলাম পার্লামেণ্টের ভিতের তলা খুঁড়িয়া নাকি একটি বহু প্রাচীন তরবারি পাওয়া গিয়াছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম, চোরাবালি ছাড়া কিছুই পাওয়া যাইবে না।

পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন—"কেহই যুদ্ধ চায় না।" খুড়ো বলিলেন—এখানেই পণ্ডিতজীর হার হলো, তিনি

সব খবর রাখেন, কিন্তু মুনাফাখোরদের খবর রাখেন না। এরা যুদ্ধের জন্য রোজ কালীঘাটে পুজো দিচ্ছে।

* * * * *

Window in Stomach"—অন্য একটি Caption. সংবাদে বলা হইয়াছে যে, Ohio University-র জনৈক ডাক্তার নাকি একটি গরুর পেটে একটি "জানালা স্থাপন" করিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"গরুর পেটে না হয়ে আমাদের পেটে হলেই হতো ভালো, কেননা, হাওয়া আমাদের প্রধান আহার, সুতরাং জানলা-দরজার প্রয়োজন আমাদেরই বেশি।

* * * * *

নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী শুনিলাম যুক্তরাষ্ট্র সম্মেলনকে একটি খাঁচা-বন্ধ কাঠবিড়ালীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বেশ সুযোগ্য তুলনাই হয়েছে, লঙ্কাকাণ্ডের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর দান সামান্য হলেও অবিস্মরণীয়।"

* * * * *

আমাদের মৎস্য-মন্ত্রী শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় সুন্দরবন সফরে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—সুন্দরবন এলাকায় মাছের অভাব নাই, অভাব মাছ আমদানীর যানবাহনের। খুড়ো নিজের মন্তব্য জুড়িয়া বলিলেন—"যানবাহনের অভাব, তাই মাছের অভাব—Q. E. D."

বিশ্বের পতাকা দিয়ে তৈরী আজব পোষাক!

আপনারা সবাই জানেন যে, প্যারিসের প্যালে দ্য প্যালো প্রাসাদে উনো বা বিশ্ব-রাষ্ট্র সভার তৃতীয় অধিবেশন চলছিল—আর

পতাকা দিয়ে তৈরী পোষাক

সেই মরশুমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও এসে উনোর আসরকে রীতিমত জাঁকিয়ে তুলেছিলেন। সেখানে কে কি বললেন, কবে কোন্ সভায় কেমন বক্তৃতা হলো—সেসব খবর তো খবরের কাগজেই পেয়েছেন। কিন্তু আমি এই 'উনোর' (U. N. O.) আসর থেকে যে খবরটা এনেছি, সেটা নিশ্চয়ই পাননি। জানেন কি, ঐ উপলক্ষ্যে গত ৬ই ডিসেম্বর মাদামুয়েসেল বাস্তিয়েরী খুব বুদ্ধি খাটিয়ে বিশ্ব-রাষ্ট্রের সদস্য জাতিগুলির বিভিন্ন পতাকার রঙ ও প্রতীকগুলিকে কাজে লাগিয়ে এক অদ্ভুত পোষাক তৈরি করে নিয়ে সেটিকে গায়ে দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। এই পোষাকটির নীচের দিকের স্কার্ট বা ঘাগড়া অংশটির বেড়ই হচ্ছে সাড়ে উনত্রিশ গজ। বুঝুন, তাহলে গোটা পোষাকটিতে কতখানি কাপড় লেগেছে। মাদামুয়েসেল বাস্তিয়েরীর পোষাকে ভারতের পতাকাও স্থান পেয়েছে, অতএব এর পর আপনাদের দুঃখ করার কিছু থাকতে পারে কি?

ঘরের লক্ষ্মী একেই বলে

সম্প্রতি আমেরিকার মিনেসোটোর অন্তর্গত হ্যারিসনাডিনের অধিবাসীরা তাঁদের প্রতিবেশিনী মিসেস মেরী বেকারকে ৪৬০ ডলার দামের এক তড়িৎ-চালিত হুইল-চেয়ার বা চাকা লাগানো চেয়ার উপহার দিয়েছেন। কারণ মিসেস বেকারের পা দুটি ইনফ্যাণ্টাইল প্যারালিসিস বা শৈশবীয় পক্ষাঘাতে পঙ্গু ও অকর্মণ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি গত আঠার বছর ধরে চাকা-লাগানো চেয়ারে বসে বসেই রান্না করেছেন, বাসন মেজেছেন, জামা কাপড় ইস্তির করেছেন এবং এইভাবে তাঁর চারটি প্রাণীর পরিবারকে সেবা দিয়েছেন। পঙ্গু হয়েও এই নারী—নারীর কর্তব্য যেভাবে পালন করেছেন—তাতে তাঁর প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীরা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ঐ শ্রদ্ধার উপহারটি নিবেদন করেছেন। আমাদের দেশে হাত-পা সজীব থাকা সত্ত্বেও যেসব গৃহিণী 'ঠুঁটো জগন্নাথে' পরিণত হচ্ছেন—তাঁদের কাছে এ খবরটা তেমন যুৎসই হবে কি?

রাজকন্যা এলিজাবেথের খোকা!

রাজকন্যা এলিজাবেথের খোকা বা ইংলণ্ডের ভাবী রাজা যুবরাজ প্রিন্স চার্লস ফিলিপ আর্থার জর্জ জন্মগ্রহণ করেছেন এক মাস আগে—এ খবরটি আপনারা পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর ছবি বড় একটা কেউ এখনও দেখেন নি, সেটাই এবার যোগাড় করেছি। এই ছবিটি বাকিংহাম প্রাসাদে তোলা হয়েছে মাত্র কদিন আগে—তুলেছেন ফটোগ্রাফার সিসিল বীটন।

ইংলণ্ডের ভাবী রাজা

বাঙলা ছবির সালতামামী

যুদ্ধ, দাংগা ও দেশ ভাগাভাগির হাংগামার পর ১৯৪৮ অপেক্ষাকৃত সুস্থির বছর, অন্তত ১৯৪৭ সালের চেয়ে তো নিশ্চয়ই। সেই আনুপাতিক হিসেব ধরে বাঙলা চিত্রশিল্পের খুব একটা মনোরম ছবি আঁকা গেলো না। প্রথমেই বলে রাখি যে, ১৯৪৮ সাল সমগ্রভাবে বাঙলা চিত্রশিল্পের প্রভূত প্রসার ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়েই এসেছিলো, কিন্তু ওপরের স্তরের ব্যবসাদারদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা বাঙলা ছবির স্বাভাবিক প্রসারকে খর্ব করে দিতে দ্বিধা করেনি। বছরটাকে বিশ্লেষণ করে দেখলেই বোঝা যাবে যে এখানকার প্রদর্শক-পরিবেশক গোষ্ঠী কি রকম নির্দয়ভাবে বাঙলার চিত্রশিল্পকে উৎখাত করায় প্রবৃত্ত হয়েছে।

১৯৪৮ সালে মোট বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে ৩৯খানি, অর্থাৎ তৎপূর্ব বছরের চেয়ে মাত্র ১১খানি বেশী। আর সে জায়গায় হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করেছে ১১৫, যা ১৯৪৭ সালে ছিলো মাত্র ৬৩; অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ডবল। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, বাঙলা ছবির জন্য একান্তভাবে নির্মিত চিত্রগৃহেও ঠাঁই করে দেওয়ার জন্যেই হিন্দী ছবি এতটা বাড়তে পেরেছে। বাঙলা ছবির পথ প্রশস্ততর করার চেয়ে হিন্দী ছবির নগদবাজার প্রদর্শকদের এমনি প্রলুব্ধ করেছে যে, এ বছরে নতুন ৪টি চিত্রগৃহের মধ্যে বাঙলা ছবি দেখাবার উদ্দেশ্যে যে ৩টির উদ্বোধন হয় তারাও শেষ পর্যন্ত হিন্দী ছবির খরিদ্দার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউই একথা একবার ভেবে দেখলো না যে, বাঙলা ছবি তৈরীর সংখ্যা এতো বেড়ে গিয়েছে যে, ৩৯খানি ছবি মুক্তিদান করার পরেও কমপক্ষে আরও প্রায় ৫০খানি ছবি চিত্রগৃহের অভাবে তৈরী হয়েও পড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ এর জন্যে আটক পড়ে গেলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য, মোটামুটিভাবে প্রায় ৭০—৭৫ লক্ষ টাকা। বাঙলা চিত্রশিল্পের পক্ষে এই বিশাল চাপ সহ্য করা সম্ভব হয় কি করে। বাঙলা চিত্রশিল্পের প্রসারের গতি এই ধাক্কাতেই পশ্চাদগামী হয়ে পড়াই তো স্বাভাবিক। বাঙলার প্রদর্শকরা এতদূরে অদূরদর্শী ও লোভান্ধ হয়েছেন আজ যে তারা হিন্দী ছবির ক্ষেত্রকে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রশস্ততর করে দেওয়ায় উদ্যোগী হয়েছেন। বাঙলা ছবি যেখানে চিত্রগৃহের অভাবে জমে যাচ্ছে সেখানে বাঙলা ছবির নির্দিষ্ট ক্ষেত্র উল্টে তারা কেড়ে নিচ্ছেন হিন্দীর স্বপক্ষে। তার ওপর চিত্রগৃহে নিম্নতম বিক্রীর হারকে হিসেবের বাইরে অনেক উঁচুতে চড়িয়ে দিয়ে বাঙলা ছবির স্থায়িত্ব তথা আয়ও তারা জোর করে কমিয়ে দিয়েছেন। তাই এ বছর অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত ছবির পক্ষেও পূর্বাপর বছরের
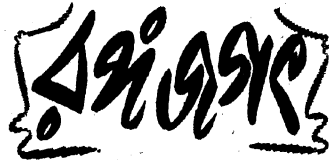
অর্থকরী কোন ছবির মত উপার্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কলকাতা ও শহরতলী থেকেই বাঙলা ছবির প্রায় অর্ধেক আয় করে নিতে হয়—এখন সব ছবির ভাগ্যে সে তুলনায় সিকি ভাগও ঘটছে না। তার প্রভাব গিয়ে পড়ছে চিত্রনির্মাতাদের ওপরে—আয়ের অনুপাতে ছবির ব্যয়ের পরিমাণ বেঁধে দিতে উৎকর্ষের কথা মন থেকে একেবারে উড়িয়েই দিচ্ছেন তারা। বাঙলার চিত্রশিল্পের প্রতি যদি ব্যবসায়ীদের সত্যকারের টান থাকতো তো এ বছর ঐ প্রায় ৫০খানি জমে যাওয়া ছবির মধ্যে বাঙলা চিত্রগৃহগুলিতে আরও যে প্রায় ১২ খানির মুক্তি সম্ভব ছিলো তা তারা সফল করে তো তুলতোই, উপরন্তু বাকীগুলোর জন্যে হিন্দী চিত্রগৃহগুলিতে হানা দিয়ে হোক, অথবা বাঙলার চিত্রশিল্পের অধিকতর প্রসার ও সমৃদ্ধিকে অব্যাহত করে তোলার প্রচেষ্টায় দরকার বুঝে শহরের সমস্ত চিত্রগৃহেই নির্দিষ্ট সংখ্যক বাঙলা ছবির চলা বাধ্যতামূলক করে তুলতোই। স্থানীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসারে পৃথিবীশুদ্ধ সব দেশেই এই ব্যবস্থা কায়েম আছে—কোথাও সরকারী আইন করে আর কোথাও বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিজেদেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। বছরে যতগুলি বাঙলা ছবি তোলার ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতা পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হবে না কেন? ছবি তৈরী হলেই চাই তার মুক্তির ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা করতে প্রদর্শকদের কাউকেই কোনরকম লোকসান ভোগ করতে হচ্ছে না, কেবল চিত্রনির্মাতাদের সংগে তাদের সহযোগ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুললেই কাজ হবে।

বছরের গোড়ার দিকে স্টুডিওগুলিতে চিত্রনির্মাতাদের যে ভীড় আরম্ভ হয়েছিল প্রদর্শকদের সহযোগিতার অভাবে বছরের শেষের দিকে তা এমনি হ্রাস পেয়ে যায় যে দুটো স্টুডিওকে শেষ পর্যন্ত একরকম নিষ্কর্মা হয়ে পড়তে হয় আর বাকীগুলোতেও কাজ কমে যায়। যে জায়গায় বছরে দেড়শোখানি ছবি তোলার মত সাজসরঞ্জাম ও লোকবল রয়েছে সেখানে পূর্ব বৎসরের জের সমেত শতখানেক মাত্র ছবি তৈরী হলে কর্মহীন দিন অনেক হয়ে পড়ে। তাই বছরের শেষ তিন মাসে বহু কলাকুশলী ও কর্মীদের বেকার হয়ে পড়তে হয়েছে এবং অনতিবিলম্বে প্রদর্শন ব্যবস্থার সুরাহা না হতে পারলে আগামী বছর কাজ যে আরও কম হবে তার আভাস ভাল করেই পাওয়া যাচ্ছে। শেষের তিন মাসে মাত্র খানচারেক ছবির মহরৎ হয়েছে অথচ '৪৭ সালে ঐ সময়ে অনেক বেশী হয়েছিল।

বছরের গোড়াতে পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট কর্তৃক উক্ত রাষ্ট্রে চালানী ছবির ওপর ট্যাক্স ধার্য নিয়ে মাস তিনেক এখান থেকে ছবি পাঠানো বন্ধ হয়েছিলো। প্রথমে ভারত থেকে প্রেরিত ছবির ফুট পিছু দু আনা কর ধার্য হয়েছিলো, তারপর সেটা কমিয়ে তিন পয়সা করে দেওয়ায় আবার যথারীতি ছবি পাঠানো চালু হয়। একখানি ছবি যতবারই পাঠানো হবে ট্যাক্সও দিতে হবে ততবারই—এই ট্যাক্সটা বাঁচাবার জন্যে বড় বড় পরিবেশকদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকাতে তাদের শাখা অফিস স্থাপন করেছে যাতে ওখান থেকেই সমগ্র পাকিস্থান এলাকায় ছবি বিতরণ করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্থান এলাকায় ছবির প্রদর্শনস্বত্ব বিক্রীও করা হয়েছে পাকিস্থানের অধিবাসীদের দ্বারা গঠিত নতুন পরিবেশকদের কাছে। পাকিস্থানের সংগে ব্যবসা নিয়মিতভাবে চললেও আয় আগের চেয়ে প্রায় চার আনা ভাগ কমে গিয়েছে। পূর্ব পাকিস্থানে এখন মোট চিত্রগৃহের সংখ্যা ১৩০। ভারত থেকে চালানী প্রত্যেক ছবিরই ঢাকায় স্বতন্ত্রভাবে সেন্সর করা হয় এবং আলাদা ছাড়পত্র নেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের অন্তর্গত নানা অব্যবস্থা, অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতা এবং উৎকর্ষ ও প্রসারের পথে বিবিধ বিঘ্ন ইত্যাদির বিষয় চিন্তা করে পশ্চিম বাঙলার সেন্সর বোর্ড সেন্সর আইন সংশোধন করে অবস্থা ভাল করার একটা চেষ্টা করে। কিন্তু বাঙলার চিত্রশিল্পের স্বনিয়োজিত পাণ্ডাগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থের হানি আশংকা করে প্রস্তাবিত বিলের অন্তর্ভুক্ত বহু ভাল দিককে চাপা দিয়ে কেবলমাত্র মন্দদিকটা নিয়ে নির্জলা মিথ্যা উক্তির সাহায্যে এবং চলচ্চিত্র শিল্পের আভ্যন্তরীণ এবং বিভিন্ন দিকের অবস্থা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ একদল লোককে মুখপাত্র করে এমনি হৈচৈ তোলে যাতে বিলটা চাপা পড়ে যায়। তার বদলে চিত্র ব্যবসায়ীরা গভর্নমেণ্টকে ওদের নিয়ে একটা সাব কমিটি গঠন করতে বাধ্য করে। এই সাব কমিটি কেন, এবং গত ছ'মাস ধরে কি করেছে কেউ ঘুণাক্ষরেও জানে না, কিন্তু শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই তার রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। সে রিপোর্ট যে কি হবে আগে থেকে অনুমান করা কি শক্ত?

১৯৪৮ সালের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কালোবাজারী পন্থার ব্যাপকতা। বলতে গেলে একমাত্র সরবরাহক প্রতিষ্ঠানটিরই কাছে কাঁচা ফিল্ম পাওয়া যায় না, কিন্তু কালোবাজার থেকে পাওয়া গিয়েছে যত খুশী পরিমাণ তাঁদেরই মাল। প্রদর্শকদের কাছে ডান হাতে সই করতে হয়েছে এক, আর বাঁহাত দিয়ে বাড়িয়ে দিতে

হয়েছে আর এক থলি। বাঙলা ছবির বারো-মাসি প্রোগ্রামের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ প্রণ করে সেই সব স্বাধীন প্রযোজকদের সব রকম স্যোগ-স্বিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা এ বছরের একটা বৈশিষ্ট্য। ওরা নির্ৎসাহ হয়ে সরে গেলে বাঙলা ছবির বাজার রাখবে কে? —না, এখানকার প্রদর্শকরা চান না বাঙলার চিত্রশিল্প বিশাল হয়ে উঠ্‌ক?

বাঙলা ছবির ব্যবসায় উন্নতি সম্পর্কে চিত্র-ব্যবসায়ীরা যে কত উদাসীন, তার আরও উদাহরণ প্যাওয়া যায়। প্রচার ব্যাপারে বিম্খতা এবং সংবাদপত্রগ্লির সঙ্গে যতদ্র সম্ভব অসহযোগিতা বাঙলা ছবিকে জনপ্রিয় হওয়ার পথে যথেষ্ট বিঘ্নের স্ষ্টি করেছে। বাঙলা ছবিকে বাঙালী দর্শকদের মধ্যেই সীমাবন্ধ করে রাখার চেষ্টা অব্যাহত আছেই—অ-বাঙালীদের আকর্ষণ করে বাঙলা ছবির দর্শক করে নেওয়ার জন্যে কোন চেষ্টাই কেউ করেনি। অথচ ছবি বাড়লে দর্শক না বাড়ালে চলবেই বা কি করে?

টিকিট বিক্রীর বর্তমান ব্যবস্থাও ছবির স্থায়িত্বকে অনেকখানি কমিয়ে দিচ্ছে। গত বছর গ্ন্ডাদের স্বারা টিকিট বিক্রীর প্রকোপ নিয়ে জনসাধারণ প্রচণ্ড গোলমালের স্ষ্টি করে, যার ফলে কিছ্দিনের জন্যে প্রদর্শকরা প্রতিবাদকল্পে চিত্রগ্হ বন্ধ করে দেয়। তারপর তাঁরা টিকিট বিক্রীর যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তাতে গ্ন্ডাদের হাত থেকে রেহাই সম্প্র্ণ না হলেও খানিকটা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তার জন্যে ব্যবসার ক্ষতি হলো কিনা, তা নিয়ে প্রদর্শকরা চিন্তা করলেন না মোটেই। তার কারণ, প্রদর্শকরা ব্ঝলেন যে, ছবি যতো তাড়াতাড়ি চলে যায়, তাঁদের ততই লাভ, যেহেতু অনবরত নতুন ছবি তাঁরা দেখাতে পারবেন। আমাদের অধিকাংশ হচ্ছে কম পয়সার খরিন্দার। আজকালকার টিকিট বিক্রীর রীতিতে বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই কম-দামের টিকিট কেনাই হয়েছে ঝকমারি ব্যাপার —ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারিতে দাঁড়িয়ে টিকিট কেনার মত সময় সকলের থাকবার কথা নয়। কাজেই সপ্তাহে যে কম দামের টিকিটে তিন-খানি ছবি দেখা বরাদ্দ করে রাখে তাকে বেশি দামের টিকিট কিনে একখানি ছবি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। তারপর দ্বিতীয় ছবি-খানি দেখবার সঙ্গতি করে নিতে না নিতেই সেখানি হয়তো বিদায় গ্রহণ করে। প্রদর্শকরা এ অবস্থায় আরও একটা স্যোগ নিচ্ছেন নিম্ন শ্রেণীর আসন কমিয়ে বেশি দামের টিকিটে তা অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে। ফল হচ্ছে এই, প্রথম সপ্তা দ্য়েকের হ্জ্বগ কমে গেলে চিত্রগ্হে বিক্রী একেবারে ঝপ্ করে পড়ে যাচ্ছে। তখন দেখা যাচ্ছে যে, ভীড় কমলে কমদামের টিকিট কিনবে বলে যাঁরা ঠিক করে ছিলেন, কমদামের আসন পর্যাপ্ত না হওয়ায় তাঁদের জন্যে সেই বেশি দামের আসনই খালি থেকে যাচ্ছে, যার জন্যে পয়সা খরচ করলে অন্য কয়েকখানি ছবির মায়া ত্যাগ করতে হয়, নয়তো এ ছবির মায়া ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র কম দামের টিকিটের চেষ্টা করতে হয়, হিন্দী বা ইংরেজী যেখানেই তা সম্ভব হোক না কেন। টিকিট বিক্রীর এই অস্বাভাবিক বেমক্কা ব্যবস্থা ছবির স্থায়িত্ব কমিয়ে দিতে বাধ্য ক'রছে। আগে নিম্নতন শ্রেণীর খরিন্দারের পক্ষেও দিনকতক আগে থাকতেই কোথায় কবে ছবি দেখবে তা ঠিক ক'রে টিকিট কিনে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব ছিলো। এখন একেবারে উচ্চশ্রেণীর খরিন্দার ছাড়া আর কার্র পক্ষে তা সম্ভব নয়। বর্তমান টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা প্রদর্শক-দের অতিরিক্ত লাভের কারণ হওয়ায় ছবির এক্সপ্লয়টেশনের এই একটি প্রধান দিক নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামানো দরকার মনে করেন না।

চিত্রগ্হের কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ ও ব্দ্ধি নিয়ে এ বছর অধিকাংশ চিত্রগ্হেই ধর্মঘট ও গোলমালের স্ষ্টি হয় এবং অনেক-গ্লিকে বাধ্য হ'য়ে কিছ্কালের জন্যে বন্ধও ক'রে দিতে হয়। পরে মালিক ও কর্মীদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান মিলে চিত্রগ্হের আয় হিসেবে বেতন নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়ার পর মিটমাট হ'য়ে যায়।

ছবি তৈরীর হিসেবে দেখা যায় যে, ৩৯টি ছবি যা ম্ক্তিলাভ ক'রেছে স্টুডিও হিসেবে তা ভাগে পড়েঃ ইন্দ্রপ্রী ১৭, কালী ফিল্মস ৫, ন্যাশনাল ও ইস্টার্ন টকীজ প্রত্যেকে ৪, রাধা ৩, নিউ থিয়েটার্স ও বেঙ্গল ন্যাশনাল প্রত্যেকে ২ এবং এ্যাসোসিয়েটেড ও ইন্দ্রলোক প্রত্যেকে ১ খানি। শ্রীভারতলক্ষ্মী, অরোরা ও ক্যালকাটা ম্ভিটোনে কাজ হ'লেও কোন ছবি ম্ক্তিলাভ করেনি। নতুন স্টুডিও র্পশ্রী ও প্র্ণ-উদ্ঘাটিত ইস্ট ইন্ডিয়া তোড়জোড়েই ব্যস্ত থেকেছে, কোন ছবি তোলা হয় নি।

ম্ক্তিপাওয়া সম্প্র্ণ চিত্রসংখ্যার শতকরা ৯৬ ভাগেরও বেশী হ'চ্ছে স্টুডিও ভাড়া নিয়ে তোলা এবং শতকরা ৭৫ ভাগ হ'চ্ছে স্বাধীন প্রযোজকদের। সবশ্দ্ধ ৩৪টি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ছবিগ্লি পাওয়া গিয়েছে এবং মোট পরিচালক সংখ্যা হ'চ্ছেন ৩৫, চারজন দ্'খানি ক'রে ছবি উপহার দিয়েছেন।

ছবির আয় অভাবনীয় রকম হ্রাসে সন্ত্রস্ত হ'য়ে প্রযোজকরা ব্যয়ের অঙ্ক এতো নীচে নামিয়ে দিয়েছেন যার স্বারা ভাল ছবি তোলা একেবারেই অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—বাঙলা ছবির প্রতি লোকের শ্রন্ধা হারানোর এও একটা কারণ। খরচ কমাতে গিয়ে সমস্ত বিষয়েই সস্তায় কাজ সারার চেষ্টা অত্যন্ত প্রকট।

বাঙলা ছবির নামকরা পরিচালকদের মধ্যে জন দ্ই ছাড়া প্রায় প্রত্যেকের কাছ থেকেই এবছরে ছবি পাওয়া গিয়েছে। মোট ৩৫ জন পরিচালকের মধ্যে অনেককাল পরিচালক হ'য়েছেন এবং কমপক্ষে তিনখানিরও বেশী ছবি উপহার দিয়েছেন এমন পরিচালকের সংখ্যা ১৫; বর্তমান বছরের অবদান নিয়ে সবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টা এমন পরিচালক ১০, আর একেবারে প্রথম হাতে খড়ি হ'য়েছে ১০ জন পরিচালকের। প্রতিভার বিচারে আমাদের দেশের মানদণ্ডে প্রথম শ্রেণীর পরিচালক ৩, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬, তৃতীয় শ্রেণীর ১০ আর কোন শ্রেণীতেই ধরা যায় না ১৬ জন পরিচালককে।

একেবারে প্রথম ব্রতী যে ১০জন পরিচালক এসেছেন, তাদের কেউই এমন সামান্য কৃতিত্বও কোনদিকে দেখাতে পারেননি যাতে প্নরায় তাদের হাতে ছবি তোলার ভার দেওয়া যায়। যাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সেই ১০ জনের মধ্যে মাত্র একজন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, অবশ্য তার প্রথম প্রচেষ্টায়ও অনন্যসাধারণ ছবিই হ'য়েছিলো; অন্য আর চারজনকে দিয়ে কাজ চলে যায় এইমাত্র, আর বাকী পাঁচজন প্রথম অবদানে যেমন ম্র্তিমান ব্যর্থতা ছিলে এবারেও বদলাননি মোটেই স্তরাং প্নরায় কাজ আশা করা অন্যায় তাদের। প্রনো অভিজ্ঞ পরিচালকদের মধ্যে পাঁচজনের একেবারে অবসর গ্রহণ করা উচিত। মোট তা'হলে পরিচালক হ'য়ে থাকবার যোগ্য হ'চ্ছেন মা ১৯ জন।

প্রখ্যাত সাহিত্যস্ষ্টি অথবা সাহিত্যিকের রচনা অবলম্বনে কাহিনী গঠন ক'রে নেওয় হ'য়েছে এমন ছবির সংখ্যা ১৯, বাকী স ছবির জন্যে বিশেষভাবে মৌলিক রচনা। রক বিচারে, সামাজিক হচ্ছে ৩৩, রহস্যম্লক ৩ র্পক ১ খানি ও অন্যান্য ২। পৌরাণিক ব ধর্মম্লক ছবি একেবারেই নেই। কোন রাজ-নীতিক আন্দোলনকে বিষয়বস্তু ক'রে তোলা ছবির সংখ্যা মাত্র ২ কিন্তু রাজনীতির যোগাযোগ রাখা হয়েছে তেমন কাহিনী হচ্ছে ৮টি। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ১৯টি কাহিনীর মধ্যে ভাল ছবি হয়েছে ৪টি; চলনসই পর্যায়ের ৭টি, বাকী পরিচালনা দোষে অপাঙক্তেয়।

সমষ্টিগতভাবে উৎকর্ষের স্ট্যান্ডার্ড নেমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২·৮২তে—গত বছরে তা ছিল ১৭·৮৫, আর দশবছর আগে ১৯৩৯ সালে ছিল প্রায় ৪৩·৭৫। মাত্র ৫ খানি উল্লেখ-যোগ্য অবদান ছাড়া কোনরকমে চলনসই পর্যায়ে ফেলে দেওয়া যায় এমন ছবি ১৪ খানি। এ বছরে ব্যবসাতে সাফল্যলাভ করেছে মাত্র ৬ খানি ছবি।

১৯৪৮ সালে বাঙলা চিত্রশিল্পের কোন বিষয়েই স্লক্ষণ দেখা যায়নি। তবে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের ঝোঁক চলচ্চিত্রশিল্পের ওপর পড়েছে দেখে আশা করা যায় যে, নতুন বছরে অবস্থা উন্নততর হবে।

'অভ্যুদয়' (হিন্দী)

কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের যুগান্তকারী নৃত্যনাট্য 'অভ্যুদয়'এর হিন্দী রূপান্তর গত রবিবার, ২রা জানুয়ারী রক্সীতে ভারতীয় নাট্য-কলা কেন্দ্র কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়েছে। মূল বাঙলা থেকে হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন শ্রীপুষ্কর। নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন বালকৃষ্ণ মেনন; সংগীত পরিচালনা জীতেন গলুই, গান হীরক রায়; শিল্প পরিকল্পনা বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও ব্যবস্থাপনা কল্যাণ গাঙ্গুলী। নৃত্যনাট্যটি পরিবেশনের উদ্যোক্তা হচ্ছেন ধীরেন ঘোষ।

বিভিন্ন দিকে অংশ গ্রহণ করেছেন, নৃত্যে—বালকৃষ্ণ মেনন, অমরেন্দ্র, দিলীপকুমার, অমিয় সাহা, নিখিল সেনগুপ্ত, ধীরেন্দ্র, অধীর বিশ্বাস, ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালু-শঙ্কর, মণি গাঙ্গুলী, রূপলাল, দিপ্তী ঘোষ, স্মৃতি চক্রবর্তী, রুণু সেনগুপ্তা, সুধা ঘোষ, চন্দ্রা সেনগুপ্তা ও প্রীতি চক্রবর্তী; কণ্ঠসংগীতে—হীরক রায়, দিলীপকুমার রায়, গোপাল বসু, হিতব্রত রায়, অলোক দেবরায়, শিবব্রত রায়, প্রতিভা কাপুর, সরযু রায় ও গৌরী চক্রবর্তী; যন্ত্রসংগীতে—জীতেন গলুই, অনিল দত্ত, সন্তোষ মিত্র, ধনঞ্জয় মল্লিক, বাদল ধর, কমলেশ মৈত্র, জয়দেব গড়াই, সন্তোষ চন্দ্র ও সুশীল সরকার।

'অভ্যুদয়' ইংরাজ আমলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মর্মবাণী। নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে ভারতীয় নাট্যকলার এক অপূর্ব সৃষ্টি। দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার জন-সাধারণ কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের পরিবেশনে নৃত্যনাট্যটি উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। বর্তমানে ভারতীয় নাট্যকলা-কেন্দ্র অ-বাঙালী দর্শকদের জন্য এটি হিন্দীতে রূপান্তরিত করেছেন। মূল রচনাকে যথা-সম্ভব অক্ষুন্ন রাখারই এতে চেষ্টা করা হয়েছে, গান-নাচ সর্বদিক থেকেই।

সেদিনের অনুষ্ঠানের নৃত্য-ভাগটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পীদের প্রায় প্রত্যেকেরই দেহসৌষ্ঠব ও নৃত্যভঙ্গী সুধীদের প্রশংসনীয় দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। মাইক বসাবার দোষে গানের কথাগুলি স্পষ্ট না বুঝতে পারায় অনেকখানি রসহানি হয়েছে। আশা করা যায়, পরবর্তী অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নজর দেবেন। সূত্রধারের ভাষণ নৃত্য-নাট্যটির প্রধান অঙ্গ; পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের আবৃত্তি কিন্তু নাট্যরস সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারেনি। তবুও নৃত্য-নাট্যটির গ্রন্থনেই এমনি এক যাদুকরী প্রভাব সুস্পষ্ট আছে যে, দর্শক বা শ্রোতার মন আবেগে ভরে ওঠেই। আমাদের বিশ্বাস, প্রথম অনুষ্ঠানের দোষ-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিলে এই হিন্দী রূপান্তরটিও মূল বাঙলার মতই জনপ্রিয় হতে পারবে। 'অভ্যুদয়' দেখা মানে জীবনের একটি দামী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাখা—ভারতীয় নাট্য-কলা কেন্দ্র হিন্দী ভাষাভাষীদের সে সুযোগ এনে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদার্হ। এই প্রসঙ্গে মূল বাঙলাটির পুনরনুষ্ঠানের জন্য কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

খেলাধুলা

ক্রিকেট

কলিকাতার ইডেন উদ্যান মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পশ্চিম বাঙ্গলার গভর্নরের দলের সহিত তিন দিন ব্যাপী খেলায় যোগদান করিয়া অমীমাংসিত-ভাবে খেলা শেষ করিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গলার গভর্নরের দল বাঙলার অধিকাংশ উদীয়মান খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত হয়। খেলায় বাঙ্গলার বোলার এন চৌধুরী ও ব্যাটসম্যান পি রায় অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এন চৌধুরী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে একাই ৬টি উইকেট ১০৫ রানে দখল করেন। অপর দিকে পি রায় গভর্নরের দলের প্রথম ইনিংসে শতাধিক রান করিয়া শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে ওয়ালকট ও বোলিংয়ে ক্যামেরন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রথমেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ব্যাটিং করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রথম দিনের খেলা শেষ হইবার ১৩ মিনিট পূর্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২৫৫ রানে শেষ হয়। এন চৌধুরী ও গিরি-ধারীর মারাত্মক বোলিংই ইহা সম্ভব করে। এই দিন সময় থাকা সত্বেও পশ্চিম বাঙলার গভর্নর দল খেলা আরম্ভ করেন না। দ্বিতীয় দিনে খেলা আরম্ভ করিয়া গবর্ণর দলের বিপর্যয় দেখা যায়। ৮টি উইকেট ১৪৮ রানে পড়িয়া যায়। এই সময় পি রায় ও গিরিধারী একত্রে খেলিয়া অবস্থার পরিবর্তন করেন। দিনের শেষে গভর্নরের দলের ৮ উইকেটে ২০১ রান হয়। পি রায় ৫০ রান ও গিরিধারী ৩০ রান করিয়া নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনের সূচনায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পি রায় ও গিরিধারীকে আউট করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু ইহারা দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া রান তুলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের কিছু পরে পশ্চিম বাঙলার গভর্নরের দলের প্রথম ইনিংস ৩১৫ রানে শেষ হয়। পি রায় ৩২০ মিনিট নির্ভুলভাবে ব্যাট করিয়া ১০১ রান করিয়া নট আউট থাকেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংসে ৬০ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও দিনের শেষে ২ উইকেটে ১২৪ রান করে। কেরু ৫২ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

খেলার ফলাফল:—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে:—২৫৫ রান (ওয়ালকট ৯৭, ক্যামেরন ৪০, এন চৌধুরী ১০৫ রানে ৬টি ও গিরিধারী ৬৫ রানে ৩টি উইকেট পান)।

পশ্চিম বাঙ্গলার গভর্নরের দলের প্রথম ইনিংস:—৩১৫ রান (পি রায় নট আউট ১০১, গিরিধারী ৮৮, মুস্তাক আলী ৩৪, আর নিম্বলকার ৩৮, জোন্স ৮০ রানে ৩টি, ক্যামেরন ৭৮ রানে ৪টি ও গডার্ড ৫০ রানে ২টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস:—২ উই: ১২৪ রান (কেরু ৫২, ওয়ালকট নট আউট ২১, গিরিধারী ৪৭ রানে ২টি উইকেট পান)।

গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে খেলা

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকগণ মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে বোম্বাইতে একটি দুই দিন ব্যাপী ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সহিত ভারতীয় দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। উভয় দলেই বাছাই করিয়া খেলোয়াড় খেলিবে। খেলাটি পঞ্চম টেস্ট ম্যাচের পর অনুষ্ঠিত হইবে। পাতিয়ালার মহারাজা, বরোদার যুবরাজ, বিজয় মার্চেন্ট, আমীর ইলাহি প্রভৃতি বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ এই খেলার অংশ গ্রহণ করিবেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এই খেলায় সম্মতি দিয়া-ছেন। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি ভাণ্ডারের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রস্তাবিত খেলার সংগৃহীত অর্থ ৩০শে জানুয়ারীর পর হইলেও গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কণ্ট্রোল বোর্ডের সভ্যগণের ব্যবস্থা ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তবে খেলাটি বোম্বাইতে না হইয়া যদি কলিকাতায় হইত অর্থ সংগ্রহের দিক দিয়া ভাল হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বোম্বাইর মাঠে ইতিপূর্বেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দুইটি খেলায় যোগদান করিয়াছে। পঞ্চম টেস্ট খেলাও বোম্বাইতে হইবে। ইহার পর গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে খেলা দেখিবার জন্য সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের আর বিশেষ উৎসাহ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। এই খেলায় অধিক অর্থ যাহাতে সংগৃহীত হয় তাহার দিকেই উদ্যোক্তাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

নিখিল ভারত টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ

নিখিল ভারত জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা এই বৎসর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের সকল অঞ্চলের খেলোয়াড়গণকেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেখা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে বাঙলার খেলোয়াড়গণই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের টেনিস খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড যে বাঙ্গলা অপেক্ষা নিম্ন স্তরের ইহাও খেলায় প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গলার উদীয়মান খেলোয়াড় দিলীপ বসু দীর্ঘকাল প্রচেষ্টার পর এইবার প্রতি-যোগিতায় সিঙ্গলস ও ডাবলস চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন।

খেলার ফলাফল:—

পুরুষদের সিঙ্গলস

দিলীপ বসু—৩-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৮-৬ গেমে সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস

মিসেস কে সিং—৩-৬, ৯-৭, ৬-৩ গেমে মিস পি খান্নাকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

দিলীপ বসু ও নরেন্দ্রনাথ ৭-৫, ৬-২, ৬-৪ গেমে সুমন্ত মিশ্র ও রমারাওকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল

সুমন্ত মিশ্র ও মিসেস মোদী ৭-৫, ৬-৪ গেমে দিলীপ বসু ও মিসেস কে সিংকে পরাজিত করেন।

দেশী সংবাদ

২৭শে ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হয়। অদ্যকার অধিবেশনে খসড়া শাসনতন্ত্রের তিনটি অধ্যায় গৃহীত হয়। এই তিনটি অধ্যায় যথাক্রমে প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থীর যোগ্যতা, প্রেসিডেন্টের যোগ্যতা সম্পর্কিত সর্ত এবং তাঁহার আনুগত্য শপথ গ্রহণ সম্পর্কে।

২৮শে ডিসেম্বর—আসামের গভর্নর স্যার আকবর হায়দরী পরলোকগমন করিয়াছেন। ইম্ফল হইতে ৩০ মাইল দূরে একটি সুটিং ক্যাম্পে সহসা রক্তের চাপ বৃদ্ধির ফলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ার পূর্বেই প্রাণত্যাগ করেন।

ভারতীয় গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্রের পাঁচটি অনুচ্ছেদ গৃহীত হইয়াছে। অনুচ্ছেদ-গুলির একটিতে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। পরিষদ আরও স্থির করিয়াছেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নের একজন সহকারী প্রেসিডেন্ট থাকিবেন এবং প্রেসিডেন্টের পদ সাময়িকভাবে শূন্য হইলে অথবা প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে তিনি ভারতীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

অদ্য মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়।

২৯শে ডিসেম্বর—আজ কলিকাতায় সিনেট হলে নিখিল ভারত কুষ্ঠ কর্মী সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী সম্মেলনে সভা-নেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

৩০শে ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে শ্রীআত্মাচরণের বিশেষ আদালতে মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে। প্রায় মাসখানেক পর মামলার রায় দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অদ্য ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশনে ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত এইচ সি মুখার্জি গণ-পরিষদের কার্যাবলী ও বিধান সংক্রান্ত ২৬নং বিধান অনুসারে শ্রীযুত মহাবীর ত্যাগী কর্তৃক আনীত মুলতুবী প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দেন। ইন্দোনেশিয়ায় ও মিশরে সাম্প্রতিক আক্রমণ সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্টের মনোভাব আলোচনার জন্য শ্রীযুত ত্যাগী এই মুলতুবী প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন।

অদ্য কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে নেপাল প্রজাতন্ত্র কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিরূপে শ্রীযুত মহেন্দ্রবিক্রম শা নেপালে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানান।

৩১শে ডিসেম্বর—ভারত সরকারের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভারতের রাষ্ট্রপাল একটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের যে কোন ব্যক্তির প্রদত্ত আয়ের হিসাব অনুযায়ী সাময়িকভাবে আয়কর নির্ধারণ করিতে এবং অবিলম্বে আয়কর আদায় করিতে ক্ষমতা দিয়াছেন। উক্ত ইস্তাহারে এই অর্ডি-ন্যান্সটিকে "মুদ্রাস্ফীতি রোধ ব্যবস্থা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

১লা জানুয়ারী হইতে ভারতের সর্বত্র বস্ত্র রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হইবে এবং এইসঙ্গে বস্ত্রের নূতন মূল্যহারও প্রবর্তিত হইবে। প্রকাশ, নূতন মূল্যতালিকা অনুযায়ী সব প্রকার বস্ত্রের মূল্য গত আগষ্ট মাস হইতে যে মূল্যহার চালু আছে তাহার তুলনায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব এবং আন্দামান সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানকারী প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এবং উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বসবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

১লা জানুয়ারী—গতকল্য রাত্রিতে পশ্চিম বঙ্গের আবগারী বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত মোহিনী-মোহন বর্মণ মির্জাপুর স্ট্রীটস্থ একটি হোটেলে গুলীর আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হন। প্রকাশ, শ্রীযুত বর্মণের বহুদিনের পুরাতন আরদালী রাজেন্দ্রনাথ রায় তাঁহাকে গুলী করিয়া পরে নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। উভয়কেই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আজ হাসপাতালে উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে।

১লা জানুয়ারী—কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতির আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্ট ও পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট নিজ নিজ পক্ষের যুদ্ধরত সৈন্যকে অস্ত্র সম্বরণের নির্দেশ দিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার পর জম্মু ও কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ সম্পর্কে কাশ্মীর কমিশনের কয়েকটি প্রস্তাব ভারত ও পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট স্বীকার করিয়া লওয়ায় যুদ্ধবিরতির আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অদ্য মধ্যরাত্রির এক মিনিট পূর্বে ইহা কার্যকর হইবে।

২রা জানুয়ারী—ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জম্মু ও কাশ্মীরের সকল রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ১লা জানুয়ারী মধ্যরাত্রে যুদ্ধবিরতির আদেশ কার্যকরভাবে পালন করিয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, পর্যবেক্ষকগণ অদ্য মধ্যাহ্ন পর্যন্ত যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন রণাঙ্গনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং এ যাবৎ কোনও ঘটনা ঘটে নাই।

মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় পুত্র ও দক্ষিণ আফ্রিকার "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রের সম্পাদক শ্রীমণিলাল গান্ধী গতকল্য নয়াদিল্লীতে পৌঁছেন। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জাতীয় দল কর্তৃক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এশিয়াবাসী ভূমিস্বত্ব আইনের প্রয়োগ কঠোরতর করা হইয়াছে।

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উড়িষ্যা গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

অদ্য হইতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী-ভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ আরম্ভ করে। গত বৎসর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় পার্লামেণ্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে ডিসেম্বর—প্যারিসে নিরাপত্তা পরিষদে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে ইউক্রেন ও সোভিয়েটের উভয় প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইয়াছে।

২৮শে ডিসেম্বর—মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোক্রাশী পাশা কায়রোতে স্বরাষ্ট্র ভবনে লিফট-এ আরোহণকালে জনৈক আততায়ীর গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

২৯শে ডিসেম্বর—গতকল্য মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোক্রাশী পাশা আততায়ীর হস্তে নিহত হইবার পর অদ্য ইব্রাহিম আবদুল হাদি পাশার নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ হেরল্ড বিলী আজ নিরাপত্তা পরিষদে বলেন, কায়রোর বৃটিশ দূতাবাস হইতে তার আসিয়াছে যে, ইসরাইলের সৈন্যরা মিশর আক্রমণ করিয়াছে।

৩১শে ডিসেম্বর—সাংহাই-এর সংবাদে প্রকাশ, জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটনাইবার জন্য কম্যুনিস্টরা ইয়াংসি নদীর তীরবর্তী ৬৫০ মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গন ব্যাপিয়া ১০ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইশেক প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ চীনে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী আছেন। তিনি আজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, শান্তিপূর্ণভাবে গৃহ-যুদ্ধের মীমাংসা করিতে কম্যুনিস্টরা যদি আন্তরিকতা দেখায় তাহা হইলে তিনি পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সূচীপত্র

ध्यानी बुद्ध [सिंहल]

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ২রা মাঘ, ১৩৫৫ সাল। [সংখ্যা
Saturday, 15th January, 1949.

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

আমরা মিত্রের দৃষ্টিতে যেন জগৎকে দেখি, বিশ্ববাসীও যেন আমাদিগকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করে, জগতের প্রথম প্রভাতে ভারতের ঋষিকণ্ঠে এই মঙ্গল মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে, ভারতের মানব-মৈত্রীর সেই কল্যাণ-সাধনা অসত্য এবং অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়। হিংসা ও দ্বেষে সমাজ-দেহ জর্জরিত হইতে থাকে। ধর্মের নামে অধর্মের দৌরাত্ম্য মানুষের নীতি-বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। পৌরহিত্যের হিংস্র বুভুক্ষার যজ্ঞানলে পশুবলির পৈশাচিক বীভৎস লীলা চলিতে থাকে। দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, গতিতে দৈন্য, ভীতিতে অবসন্ন মানুষের জীবনধারা একান্ত অসহায়ত্বের অনাত্ম-প্রতিবেশে শুকাইয়া যায়। শান্তি কোথায়? আশ্রয় কোথায়? পথের সন্ধান কে দিবে? ভারতের দুর্যোগময় এই দুর্দিনে দুইটি তরুণ সন্ন্যাসী রাজগৃহের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। উপতিষ্য এবং কোলিত অজ্ঞাতের অভিসারে বাহির হইয়াছে। তরুণের প্রাণধর্ম তাহাদের দেহে ও মনে প্রচুর। মুখমণ্ডল তাহাদের সে প্রচুর প্রাণবলে উদ্ভাসিত। তাহারা চায় মুক্তি, তাহারা চায় জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি, তাহারা চায় শান্তি, তাহারা চায় আনন্দ। গতানুগতিক জীবনের গ্লানি তাহারা বহন করিবে না। আড়ষ্টকর সংস্কারের সব প্রভাব তাহারা ছিন্ন করিবে। তাহারা প্রতিষ্ঠা করিবে তাহাদের পূর্ণ অধিকার। সর্বস্ব, এমন কি, জীবন যদি সেজন্য দিতে হয় তাহাও স্বীকার। অসহায়, দুর্বল নিয়তি এবং কুসংস্কারের অন্ধ আবর্তে পতিত অগণিত নরনারীর অন্তরে তাহারা আশার সঞ্চার করিবে। সমাজ-জীবনে তাহারা বলিষ্ঠ শক্তির উদ্বোধন করিবে। তরুণের এই অভীষ্ট যাহাতে পূর্ণ হয়, সে পথ দেখাইবার মত কেহ আছেন কি? আছেন কি আর্ত, পীড়িত, পতিত নরনারীর এমন একান্ত বন্ধু, অত্যন্ত আপনার? বস্তুত তরুণদ্বয়ের দুর্দম অভিসার ব্যর্থ হয় নাই। তাহাদের সত্য সন্ধানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সংস্কারের নাগপাশ সত্যই ছিন্ন করিল। আঁধারের রাজ্যে আলো ফুটিল। স্নিগ্ধ এবং কোমল হাস্যে দিগন্ত উজ্জ্বল হইল। ভগবান বুদ্ধ দূর হইতে ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অনুগত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ইহারাই আমার অগ্রশ্রাবকের পদ লাভ করিবে।" দেবতার প্রেমবাহু প্রসারিত হইল। তিনি তরুণদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া সুধামাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি? অতীতে যে বুদ্ধগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তোমরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছ কি? তরুণদ্বয় নয়নজলে ভগবান তথাগতের চরণ ধৌত করিলেন। তাঁহারা প্রণত হইয়া বলিলেন, হাঁ, চিনিয়াছি প্রভু। আমাদের চিত্তের সব সংশয় দূর হইয়াছে। তাঁহাদের মুখ হইতে এই মহামন্ত্র উদ্গীত হইল--

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

তরুণদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম উপদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, বৎসগণ, তোমরা আজ মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে। কিন্তু মনে রাখিও, বাহিরের বন্ধন দৃঢ় নয়। লৌহময়, কাষ্ঠময় এবং রজ্জুময় বন্ধন অতি তুচ্ছ বন্ধন, কামনাই প্রকৃত বন্ধন। তৃষ্ণাই মানুষের সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই বন্ধন হইতে মুক্তি সহজসাধ্য নয়। ঋষিগণ এই বন্ধনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মুক্তির আনন্দ সাগরে মগ্ন হন। সমরাঙ্গনে যে পশুবলে জয়লাভ করে, হিংসা ও বিদ্বেষের বন্ধনের গ্লানিতে সে নিজে অভিভূত হয়। জয়-পরাজয় পশ্চাতে ফেলিয়া তোমরা আলোর পানে চলো। মৈত্রীর স্নিগ্ধ ধারায় জীবনকে নিমজ্জিত করিয়া বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হও। অগ্র শ্রাবকদ্বয় চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, প্রভো, ধর্মের পথ অতি সুদুর্গম। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন মানুষের মন সেখানে যাইতে পারে না। আসক্তির বন্ধন বুদ্ধির জোরে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। মন যেখানে বিলীন হইয়া যায়, বুদ্ধির সেখানে গতি নাই। অনির্বাণ সেই নির্বাণের রাজ্যে মানুষ কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? জড় মনের তৃষ্ণার আগুন কেমন করিয়া নিভিবে? বিষয়াসক্তির স্নেহ ক্ষয় করিয়া উদার পরম শান্তির মধ্যে সে কেমন

করিয়া নিজেকে লয় করিয়া দিবে? আপনার মৈত্রী এবং করুণার সংবেদনই তাহার একমাত্র সম্বল। সেই সংবেদনই আসক্তির বন্ধনকে ছিন্ন করিতে সমর্থ। সুতরাং আপনিই ধর্মের স্বরূপ। আপনার উপদেশ মানুষের অন্তরের আঁধারকে দূরে করিবে এবং জগৎকে শান্তির পথ দেখাইবে। শারীপুত্র এবং মহামৌদগল্যায়ন গুরুদত্ত এই নামে আখ্যাত অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের কণ্ঠ হইতে ত্রিশরণতত্ত্ব উদ্গীত হইল। তাঁহারা ভগবান্ তথাগতের চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি

অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া ভগবান্ বুদ্ধের বাণী পুনরায় ধ্বনিত হইল। তিনি বলিলেন, অহিংসাই পরম ধর্ম এবং সেবাই অহিংসার স্বরূপ। মূঢ় যাহারা তাহারা এই ধর্ম বিস্মৃত হয়। জড় বুদ্ধিতে তাহারা কামনা এবং বাসনারই সেবা করিয়া থাকে এবং অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারের ভিতর গিয়া পড়ে। ইহারা বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও নিজে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারে না। ইহারা মাতাপিতার সেবা করে না, স্ত্রীপুত্রকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করে না এবং দানে কুণ্ঠহস্ত হয়। পরকে দান করিবার শক্তি তাহাদের নাই; এজন্য তাহারা চিরদিন নিজেরাও শক্তিহীন দুর্বল থাকে এবং মহা ভয়ে আচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। ধার্মিক যে সে সঙ্ঘশক্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। তাহার জীবন বায়ুর মত মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ। এমন অনাসক্ত সেবার মহিমাতেই সঙ্ঘজীবন গঠিত হয়। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই সমান অধিকার এই জীবনে রহিয়াছে। এখানে জাতিগত বা শ্রেণীগত কোন ভেদ নাই। কামনার বহ্নিজ্বালা যাহাদের নিভিয়াছে, তাহাদের অন্তরে অনাবিল শান্তির পারাবার উথলিয়া উঠে। তাহারাই সুখী হয়। হে ভিক্ষুগণ, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য দেশদেশান্তর বিচরণ করিয়া এই কল্যাণময় ধর্মের প্রচার কর। অগ্রশ্রাবকদ্বয় ভগবানের চরণে প্রণত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, প্রভো, আপনিই সঙ্ঘশক্তির আধার। আপনার বচনই চিন্ময় জীবনের জ্যোতি লইয়া সঙ্ঘ-জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবে। সব তৃষ্ণার হেতুকে নষ্ট করিবে এবং আর্যপথ উজ্জ্বল করিয়া ধরিবে। সুতরাং আপনিই সঙ্ঘ। তাঁহারা ভগবানের চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

ত্রিশরণতত্ত্ব ব্যক্ত হইল এবং মানুষের নবজীবন তাহাতে দীপ্তি-লাভ করিল। ভিক্ষুগণ জগৎগুরুর বাণী বহন করিয়া দেশে দেশে ছুটিলেন। আর্যধর্মের এবং সত্যধর্মের পবিত্র জ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঊষার আলোকের রেখায় জগৎ জাগিল। পশুত্বের গ্লানি কাটাইয়া মানুষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। মানবের যুগাগত অন্ধ কুসংস্কারে বদ্ধ জীবনে মুক্তির এক দিব্য ছন্দ জাগিল। শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য মানুষের মনন-মহিমায় সুন্দর হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আসিল এই শক্তি? আকাশে কাহার বাণী ধ্বনিত হইল? ভিক্ষুগণ উৎকর্ণ। তাঁহারা শুনিলেন, ভগবান তথাগতেরই কণ্ঠ—আমার সঙ্ঘের ভার আমি নিজেই বহন করিতেছি। শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের মত আমার সুযোগ্য অগ্রশ্রাবকের উপরও আমি সে ভার সমর্পণ করিতে পারি না। আমারই প্রেরণা, আমারই শক্তি তাঁহাদের ভিতর দিয়া কাজ করিয়াছে। তাঁহারা উভয়ে যথাক্রমে আমার দক্ষিণ এবং বাম হস্তস্বরূপ। জানিও, যতদিন পর্যন্ত জগতের একটি প্রাণীও দুঃখ এবং কষ্ট পাইবে ততদিন পর্যন্ত বোধিসত্ত্বের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। ভিক্ষাপাত্র হস্তে দুয়ারে দুয়ারে তিনি ঘুরিবেন। বিশ্বের শান্তি ও মৈত্রী কামনা করিবেন। ভগবান্ তথাগতের এই বাণী ভারতের অন্তরদলকে পরিপূর্ণ মহিমায় বিকসিত করিয়াছিল। ভারত জগতের জ্ঞানগুরুর মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। ভারতের অন্তর শতদলের সৌন্দর্য এবং মাধুর্য সুধা পানে জীবন ধন্য করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের জিজ্ঞাসুদল দুর্দম লালসায় দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। পরে আসে ভারতের দুর্গতির দিন, পরাধীনতার রাত্রি এবং সভ্যতার নামে এখানে শত্রুদের ডাকাতি আরম্ভ হয়। কিন্তু মানব-মঙ্গল এবং মৈত্রীর সে বাণী স্তব্ধ হয় নাই। মহামানব গান্ধীজীর জীবন-বীণায় সে গীতি ঝঙ্কৃত হইয়াছে। শারীপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়নের পূতাস্থি বহনকারিগণের কণ্ঠে স্বাধীন ভারতের মুক্ত আকাশে আবার নূতন সুরে সে সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। ভগবান্ বুদ্ধের প্রধান শিষ্য শ্রেষ্ঠ অর্হৎদ্বয়ের এই পবিত্র অস্থি ভারতের বড় আদরের ধন। বহু দুঃখে ভারত ইহা হারাইয়াছিল এবং বহু ভাগ্যবলে সে তাহা ফিরিয়া পাইল। আমাদের সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ এই উপসম্পদ গ্রহণ করিবার অধিকার মানব-প্রেমের পুণ্যপীঠ বাঙলা লাভ করিয়াছে, এজন্য আমরা ধন্য, আমাদের দেশ ধন্য। আজ অযুতকণ্ঠে বন্দনাগান উঠুক—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
ভিক্ষুং শরণং গচ্ছামি।
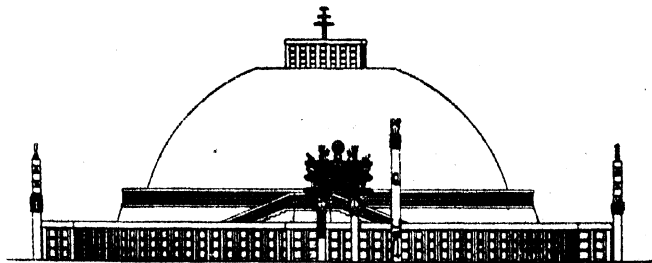
ঐ নামে একদিন ধন্য হ'ল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি॥
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমার স্মরণ
নব প্রাতে উঠুক কুসুমি'॥

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।
খুলে যাক রুদ্ধ দ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি'
এনে দিক অজেয় আহ্বান॥

বুদ্ধের বাণী

এই ভূমণ্ডলে ঘৃণা দ্বারা কদাপি ঘৃণা পরাস্ত হয় না, কিন্তু প্রেমের দ্বারা ঘৃণা পরাস্ত হইয়া যায়।

যে ব্যক্তি উদ্দীপ্ত ক্রোধানলকে প্রশান্ত করিতে পারে তাহাকেই আমি পরিচালক বলিব। অপর লোকে কেবল বলগামাত্র ধারণ করিয়া রাখে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অশ্বকে ফিরাইতে পারে না।

অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে এবং উপকারের দ্বারা অপকারকে জয় করিবে।

ধর্মের প্রসাদ প্রসন্নতাকে বৃদ্ধি করে, ধর্মের মধুরতা সুমধুরভাবে উচ্চতর করে, ধর্মের সুখ চিত্তকে আরও সুখী করে।

জন্মের দ্বারা কেহ নীচ জাতি বা ব্রাহ্মণও হয় না কেবল কার্যের দ্বারা মনুষ্য নীচ বা ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।

জীব হিংসা করিবে না, পরদ্রব্য অপহরণ করা অনুচিত, মিথ্যা কথা মহাপাপ, সুরা পান করা উচিত নহে, পরস্ত্রীকে পবিত্র নয়নে দর্শন করিবে, রজনীতে আহার করিবে না, পুষ্পমালা বা সুগন্ধ দ্রব্য চুয়া চন্দনাদি ব্যবহার করিবে না এবং ভূমিতে সামান্য শয্যায় শয়ন করিবে।

আত্মাই দুষ্ক্রিয়া করে, আত্মাই দুষ্ক্রিয়ার ফলভোগ করে, আত্মাই দুষ্ক্রিয়া পরিহার করে, আবার আত্মাই আপনাকে বিশুদ্ধ করে। পবিত্রতা অপবিত্রতা আত্মার; অতএব কেহ কাহাকে পবিত্র করিতে পারে না।

এই ধরণীতলে বিশ্বাসই মানবের পরম সম্পদ, ধর্মাচরণই সর্বোৎকৃষ্ট সুখ, সত্যই সকল বস্তু হইতে সুমধুর, দিব্যজ্ঞান লাভই শ্রেষ্ঠ জীবন।

বিশ্বাসের দ্বারা মনুষ্য ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে। অনুরাগের দ্বারা জীবনজলধি পার হইবে, সাধন সহকারে দুঃখ জয় করিবে। নির্মল জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য বিশুদ্ধ হয়।

যে গৃহস্থ বিশ্বাসী ও যে চতুর্বিধ ধর্মে (অর্থাৎ সত্য ন্যায়, দৃঢ়তা ও উদারতাতে) বিভূষিত, এতাদৃশ ব্যক্তি মৃত্যুকালে শোক বা দুঃখে মুহ্যমান হয় না।

অজ্ঞানের অনুগত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও মাননীয় ব্যক্তিকে সম্ভ্রম করা পরম ধর্ম।

পিতামাতার সেবা করা, স্ত্রী-পুত্রকে সুখী করা ও শান্তির অনুসরণ করাই পরম ধর্ম।

শ্রদ্ধা, বিনয়, সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং যথাসময় ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ প্রকৃত শান্তি।

কষ্টসহিষ্ণু ও দীনাত্মা হওয়া, সাধুসঙ্গ ও ধর্মচর্চা করা যথার্থ সুখ।

আত্মবশ ও পবিত্রতা, উচ্চ সত্যজ্ঞান ও নির্বাণ-উপলব্ধি জীবের একান্ত কর্তব্য।

জীবনের পরিবর্তন ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে যাহার চিত্ত বিচলিত না হয় এবং যে হৃদয় শোক, দুঃখ ও ইন্দ্রিয় অতীত ও স্থির তাহার ধর্ম উচ্চ ধর্ম।

প্রত্যেক বিষয়ে যাহারা পর্বতসমান অটল ও প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা নিরাপদ তাঁহারাই প্রকৃত সাধু।

ধরিত্রীর মত প্রশস্ত হও; কারণ, যদি ধরিত্রীর মত প্রশস্ত হইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে মন সুখে দুঃখে আলোড়িত হইবার ভয় দূর হইবে। পৃথিবীপৃষ্ঠে লোকে পরিচ্ছন্ন অপরিচ্ছন্ন সব বস্তুই নিক্ষেপ করে। কিন্তু পৃথিবী তাহাতে ক্রুদ্ধ, বিরক্ত বা দ্বেষপরায়ণ হয় না। তুমিও পৃথিবীর মত উদার

গান্ধারে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি

হইতে চেষ্টা কর। বিশাল পৃথিবীর মত হওয়া অর্থই হইল সুখ-দুঃখ সমশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার ভয় মুক্ত হওয়া।

পবিত্রভাবে জীবনযাপন না করা এবং যৌবনে ধর্মসম্পদ অর্জন না করা ঠিক যেন মৎস্যবিহীন পুষ্করিণীতে মৎস্যান্বেষণ-রত বৃদ্ধ বকেরই সামিল। পবিত্র জীবনযাপন না করা এবং যৌবনকালে ধর্মসম্পদ আহরণ না করা তীরবিহীন জীর্ণ ধনুকের সঙ্গেই তুলনীয়।

আসক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত না হওয়াই হইল উচ্চতম ও পবিত্রতম ত্যাগ; লোভ, ঘৃণা এবং বিভ্রান্তি হইতে মুক্তিলাভই হইল উচ্চতম ও পবিত্রতম শান্তি; সার এবং সৎপরায়ণতাই হইল উচ্চতম ও পবিত্রতম সত্য। ইহাই নির্বাণ।

মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সব্বপাণিনং
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমম্।

[হে মহাকরুণাময়, তুমি সর্বজীবের হিতার্থে সর্বজনের পরম কল্যাণের
জন্য উত্তম সম্বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছ।]

কলিকাতা মিউসিয়মে রক্ষিত প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি

ভগবান বুদ্ধ

জওহরলাল নেহরু

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এক বিবর্তনের মুখে ভারতের চেহারা পরিবর্তনের সময়ে দেশে এল বৌদ্ধধর্মের আলোড়ন; পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাধল তার সংঘাত, ধর্মক্ষেত্রে কায়েমি স্বার্থবাদের সঙ্গে ঘটল এর সংঘর্ষ। এতদিন তর্ক ও বিতণ্ডায় ভারত ছিল আচ্ছন্ন, তার জায়গাতে এক প্রচণ্ড তেজঃসম্পন্ন সত্তার হ'ল আবির্ভাব—লোকের মনে তাঁরই আসন হ'ল প্রতিষ্ঠিত, তাদের অন্তঃকরণে তাঁরই স্মৃতি হয়ে থাকল অমলিন। কূট দার্শনিক বিচার-বিতর্ক নিয়ে লোকে ছিল মশগুল। তিনি যে বাণী নিয়ে এলেন, তাদের নিকট পুরনো হলেও তা খুবই নূতন এবং মৌলিক বলে প্রতীয়মান হ'ল, বুদ্ধিজীবীদের ধারণা-বৃত্তিকে তা সহজেই আকৃষ্ট করল: লোকের অন্তরের গভীরে সে বাণী অণুপ্রবিষ্ট হল। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলে দিলেন, 'সর্বদেশে যাও, সর্বজনার নিকট এই বাণী প্রচার কর। তাদের বলে দাও যে, দরিদ্র আর নীচের সঙ্গে ধনবান আর উচ্চের কোনো পার্থক্য নেই, সকলেই তারা সমান; বলে দাও, সকল নদী যেমন সাগরে গিয়ে মেশে, তেমনি সব জাতি এই ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়।' তাঁর এই বাণী বিশ্ব-কল্যাণের বাণী, সর্বমানবের মৈত্রীর বাণী। তাতে বলা হয়েছে, 'এই বিশ্বে হিংসাকে কখনো হিংসা দ্বারা প্রশমিত করা যায় না। প্রেমের দ্বারাই হিংসা প্রশমিত হয়।' তাতে আরো বলা হয়েছে, 'ক্রোধকে দয়ার দ্বারা জয় কর, অমঙ্গলকে মঙ্গলের দ্বারা জয় কর।'

এ আদর্শ পুণ্যাচার ও আত্মসংযমের আদর্শ। 'যুদ্ধক্ষেত্রে একটিমাত্র লোক সহস্র ব্যক্তিকে পরাজিত করতে পারে: কিন্তু যিনি নিজেকে জয় করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ বিজয়ী।' 'জন্মের দ্বারা নয়, কেবল আচরণের দ্বারাই নীচ বা ব্রাহ্মণ হয়ে থাকে।' পাপীকেও ভর্ৎসনা করতে নেই, কেননা, 'যে ব্যক্তি পাপাচরণ করেছে, তাকে কটু কথা শোনালে তার অপরাধজনিত ক্ষতস্থানে লবণের প্রক্ষেপ দেওয়া হয় মাত্র।' 'অপরের উপর বিজয়ী হওয়ার পরিণাম দুঃখকর—কারণ, 'বিজয় থেকেই দ্বেষের উৎপত্তি, কারণ যে বিজয়ী সে অসুখী।'

ঈশ্বর কিংবা পরলোকের কোনো নজির না দেখিয়েই এবং কোনো ধর্মীয় অনুশাসন ব্যতিরেকেই বুদ্ধ এই সকল মত প্রচার করেছিলেন। তিনি যুক্তি, ন্যায় এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেছেন আর লোককে ডেকে বলেছেন, তোমরা যার যার মনের মধ্যেই সত্যবস্তুর অন্বেষণ কর। তিনি এই রকমও বলেছেন বলে জানা গিয়েছে যে, 'কেবল যে শ্রদ্ধার বশেই লোকে আমার বিধান গ্রহণ করবে তা হবে না। স্বর্ণের যেমন অগ্নিতে পরীক্ষা হয়, তেমনিভাবে তারা আগে পরীক্ষা ক'রে তারপর আমার মত গ্রহণ করুক।' সত্যবস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞতাই সর্বদুঃখের কারণ। ঈশ্বর আছেন কি না, ব্রহ্ম অস্তিত্বশীল কিনা তা নিয়ে তিনি কিছুই বলেন নি। তিনি তাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করেন নি। জ্ঞান যেখানে প্রবেশপথ খুঁজে পায় না, অস্তিত্ববিচার সেখানে মুলতুবী রাখতেই হবে। শোনা যায়, একটি প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন, 'ব্রহ্ম বলতে তাঁকে যদি সকল জ্ঞাত-বস্তুর সহিত সম্পর্কাতীত বোঝায়, তা হলে কোনোরূপ জ্ঞাত বিচারবুদ্ধির দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা চলেই না। অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কই নেই এমন বস্তুর যে আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে তা আমরা জানব কি করে? আমরা তো জানি সমগ্র বিশ্ব-জগৎ বস্তুপরম্পরা সম্বন্ধেরই একটা শৃঙ্খল মাত্র। এই সম্বন্ধ থেকে বিচ্যুত একটা কিছু যে রয়েছে বা থাকতে পারে, আমরা তা জানি না।' কাজেই, যাকে আমরা পাই না কিংবা যার সম্বন্ধে আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট জ্ঞান নেই, তারই মধ্যে যেন আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ করে না রাখি।

আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বুদ্ধদেব কোনো সুস্পষ্ট উত্তর দেন নি। আত্মাকে তিনি অস্বীকার করেন নি—কিন্তু স্বীকারও করেন নি। এ বিষয়ে তিনি কোনো আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হতে চান নি, যদিও প্রশ্নটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁর সময়ে, ব্যক্তির আত্মা ও ব্রহ্মের আত্মা, অদ্বিতীয় সত্তা ও একেশ্বরবাদ এবং অন্যান্য দার্শনিক অনুমানরাশিতে লোকের মানস ছিল পরিপূর্ণ। ঈশ্বর-বাদের সব রকম দার্শনিক বিচার-বিতর্কের বিরুদ্ধেই বুদ্ধ তাঁর মন সংগঠিত করেছিলেন। তবে, তিনি একথা বিশ্বাস করতেন যে, শাশ্বত একটা প্রাকৃতিক বিধি, একটা মহাজাগতিক কারণ রয়েছে; পূর্ব-ব্যবস্থিত নিয়ম অনুযায়ী পর পর প্রত্যেক অবস্থার বিবর্তন হচ্ছে: তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, পুণ্য ও সুখ এবং পাপ ও যন্ত্রণা—এদের মধ্যে আত্মিক যোগসূত্র রয়েছে। * * * *

বুদ্ধের চিন্তাপ্রণালীকে বলা যায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেরই প্রণালী; অধিকন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নব্য বিজ্ঞানের এই আধুনিকতম বিষয়টির কত গভীরে প্রবিষ্ট ছিল একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মানুষের জীবনকে বিচার করতে কিংবা পরীক্ষা করতে কোনো শাশ্বত সত্তার নজির খাড়া করা হয়নি, কেননা, যদি এরূপ কোনো সত্তার অস্তিত্ব থেকেও থাকে, আমাদের ধারণা তাকে নাগাল পায় না। মনকে দেখা হয়েছে দেহেরই অংশরূপে, মানসিক বলসমূহের এক সংমিশ্রিত রূপ হিসেবে। এইভাবে দেখান হয়েছে যে, ব্যক্তিসত্তা হচ্ছে একরাশি মানসিক অবস্থার সংমিশ্রণ; আর আত্মা হচ্ছে ঠিক যেন ধারণারাশির একটা স্রোত। 'আমরা বলতে যা কিছু সবই হচ্ছে যা আমরা ভাবনা করেছি তারই ফল।'

জীবনের দুঃখরত ও কৃচ্ছ্রসাধনার উপর বুদ্ধ বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। শিষ্যদের বলেছেন, 'দীর্ঘকাল তোমরা এই দুঃখ নিয়ে কাটিয়েছ, চারি মহাসমুদ্রে যত জল, তার চাইতেও বেশি জল তোমাদের চোখ দিয়ে ঝরেছে।'

এই যাতনাভোগের চূড়ান্ত অর্থাৎ শেষ পরিণতির মধ্যে দিয়েই নির্বাণে উপনীত হতে হয়। নির্বাণ আসলে কি, তা নিয়ে লোকের মধ্যে মতভেদ আছে। কারণ, তুরীয় অবস্থাকে বর্ণনা করা মানবের এই অকিঞ্চিৎকর ভাষা দিয়ে একেবারেই অসম্ভব। আমাদের গণ্ডি-বদ্ধ মনের ধারণা দিয়েও তাকে ভাষা দেওয়া সম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেন, নির্বাণ হচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাওয়া। শোনা যায় বুদ্ধ এও অস্বীকার করেছেন, বরং বলেছেন নির্বাণ হচ্ছে কর্মেরই ঘনীভূত রূপ। এ বস্তু মিথ্যা বাসনার অবসান, একে বিধ্বংস বলা চলবে না।

বুদ্ধের পথ হচ্ছে আত্মসমাদর ও আত্মবিমর্দন এই দুই বস্তুর চরম অবস্থার মধ্য পন্থা। আত্মনিগ্রহে বুদ্ধের নিজের যে অভিজ্ঞতা আছে, তার থেকে তিনি বলেছেন যে, যে-ব্যক্তি নিজের শক্তি হারিয়েছে সে সত্য পথে অগ্রসর হতে পারে না। এই মধ্য পন্থা হচ্ছে আর্যদের অষ্টাঙ্গিক পন্থা। এই সকল পথ ধরে মানুষ যদি আত্মজয়ে সক্ষম হয়, তবে তার আর কোনো পরাজয়ের ভয় থাকে না।

কথিত আছে, এক সময়ে বুদ্ধ কতকগুলি শুষ্ক বৃক্ষপত্র হাতে নিয়ে প্রিয় শিষ্য আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর হাতে যে-সকল পত্র রয়েছে, এ ছাড়াও আরো পাতা আছে কি না। আনন্দ উত্তর দিলেনঃ শরৎকালের পাতাগুলি চতুর্দিক থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে,—তাদের গুণে শেষ করা যায় না এমন পাতা অনেক রয়েছে।' অতঃপর ভগবান বুদ্ধ বললেনঃ 'ঠিক এইভাবেই আমি তোমাদের এক মুষ্টি-সত্যবস্তু দিলাম, কিন্তু এ ছাড়াও অন্যান্য সহস্র সহস্র সত্যবস্তু রয়েছে যা নাকি গুণে শেষ করা যায় না।'

সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন

ভগবান বুদ্ধের দুইজন প্রধান শিষ্যের দেহাবশেষ ভারতে আনা হইল। ১৩ই জানুয়ারী সিংহল হইতে উহা কলিকাতায় আনা হইয়াছে এবং মহাবোধি সোসাইটির হস্তে অর্পণের পূর্বে উহা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৪ই জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন।

এই দুইজন বৌদ্ধসন্ন্যাসীর নাম সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন (পালি ভাষায় সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান); বর্তমান বিহার প্রদেশ তাঁহাদের জন্মভূমি। তাঁহারা পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

উভয় সন্ন্যাসীপ্রবরই জীবনের দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অক্লান্তভাবে বুদ্ধের বাণী প্রচারে রত থাকেন এবং বৃদ্ধ বয়সে প্রভু বুদ্ধের অগ্রে লোকান্তরিত হন। অতঃপর একই বৎসরে ভগবান বুদ্ধও পরিনির্বাণ লাভ করেন।

ইহাই শিষ্যদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাঁহাদের এই চিতাভস্ম ভারতবাসী-মাত্রেরই নিকট পবিত্র ও শ্রদ্ধার বস্তু সন্দেহ নাই।

আজি হইতে প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত সাঁচির প্রধান স্তূপের মধ্যে এই চিতাভস্ম প্রথম আবিষ্কৃত হয়। উহার আবিষ্কারকর্তা জেনারেল কানিংহাম। নির্বিঘ্নে রক্ষা করার জন্য তৎকালীন ভারত সরকার উহা ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তদবধি উহা ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়মে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইতে থাকে।

ভারতের মহাবোধি সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীবলী সিংহ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারত সচিবকে উক্ত দেহাবশেষ ভারতে প্রত্যর্পণ করিতে বলেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইহাতে সম্মত হন। স্থির হয় যে, ভারতে আনয়নকালে উহা কিছুকালের জন্য সিংহলে রাখা হইবে। তদনুযায়ীই উহা এখন সিংহল হইতে ভারতে আনা হইল।

কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থিত মহাবোধি মন্দিরে ঐ দেহাবশেষ ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাখিয়া অতঃপর উহা সাঁচিতে নিয়া একটি নূতন বিহারে রক্ষা করা হইবে।

সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের চিতাভস্ম কলম্বোতে স্টীমারে তোলা হইয়াছে। সিংহলের মহাবোধি সোসাইটির সদস্যগণ উহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন

সারিপুত্র (সারিপুত্ত) মৌদ্গল্যায়ন (মোগ্গল্লান) ভগবান বুদ্ধের সর্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। অবশ্য আনন্দ, উপালী, মহাকাশ্যপ প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দ বুদ্ধের অপরাপর শিষ্যের অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু এই দুইজনের স্থান ছিল সকলের অগ্রে। প্রভু বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক বলিতে এই শিষ্যদ্বয়কেই বুঝাইত। তন্মধ্যে সারিপুত্র ছিলেন ধর্ম-সেনাপতি নামে অভিহিত। মৌদ্গল্যায়নের স্থান ঠিক তাঁহার পরেই।

এই দুইজন একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন; আশৈশব তাঁহারা বন্ধু ছিলেন; শৈশবের খেলাধূলাও একসঙ্গেই করিয়াছিলেন এবং ঐহিক সুখভোগের প্রতি নির্লিপ্ত এবং ধর্মাচরণের দুর্বার পিপাসা উভয়ে একই সময়ে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন। একই সঙ্গে সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী ধর্মাচরণের পর লোকান্তর গমনও তাঁহারা প্রায় সমসময়েই করিয়াছিলেন। সুখে দুঃখে, ধর্মচর্চা ও কৃচ্ছ্র-সাধনে ইঁহাদের মত এমন বন্ধুত্ব ও মৈত্রীবন্ধন আর দেখা যায় নাই। উঁহারা উভয়েই বুদ্ধদেব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

সারিপুত্রের অপর নাম ছিল উপতিষ্য। যে গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় তাহারও নাম উপতিষ্য (বা মহাসুদর্শন জাতকের মতে, নাল বা নালন্দা, মতান্তরে কলাপিনাক বা নালক গ্রাম)। ইহা নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী। সারিপুত্র জাততে ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম ছিল বঙ্গান্ত ব্রাহ্মণ এবং মাতার নাম ছিল রূপসারি। মাতার নাম হইতেই তিনি সারিপুত্র আখ্যা লাভ করেন। সারিপুত্রের চুন্দ, উপসেন ও রেবত নামে আরও তিন ভ্রাতা এবং চালা, উপচালা ও শিশুপচালা নামে তিন ভগ্নী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরে বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করেন।

মৌদ্গল্যায়নের অন্য নাম ছিল কোলিত। তিনি রাজগৃহের নিকটবর্তী কোলিত গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার মাতার নাম ছিল মৌদ্গলী (পালিতে মোগ্গলী)। মাতৃনাম অনুসারে তাঁহারও নাম হয় মৌদ্গল্যায়ন। তাঁহারা উভয়ে শৈশব-কালে পরস্পরের প্রতি অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন।

এরূপ বর্ণিত আছে যে, একদিন দুই বন্ধু মিলিয়া এক অভিনয় দেখিতে যান, সেখানে অভিনয়ের মাধ্যমে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া উভয়ে গৃহত্যাগের সংকল্প করেন। এইভাবে তাঁহাদের মনে বৈরাগ্যের অঙ্কুর ও প্রব্রজ্যার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়।

সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন প্রথমে সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্ত নামে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট প্রার্থিত বস্তু লাভে বিফল হইয়া অপর সদ্গুরু লাভের আশায় সমগ্র জম্বুদ্বীপ ভ্রমণ এবং জ্ঞানীবৃন্দের

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের চিতাভস্ম সাঁচিস্তূপের অভ্যন্তরে এই দুইটি পাত্রমধ্যেই পাওয়া গিয়াছিল

সহিত ধর্মালোচনা করিলেন, কিন্তু তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া পুনরায় প্রব্রজ্যার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। এবার স্থির করিলেন যে, উভয়ে পৃথকভাবে পরমতত্ত্বের সন্ধানে ভ্রমণ করিবেন এবং যিনিই প্রথমে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান লাভ করিবেন তিনিই অপরজনকে তাহার সংবাদ দিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া দুইজনে দুই বিপরীত দিকে যাত্রা করিলেন।

কিছুদিন ভ্রমণের পর একদিন প্রাতঃকালে সারিপুত্র স্থবির অস্সজিৎ নামে বুদ্ধের এক শিষ্যের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহার আকারপ্রকার দেখিয়া সারিপুত্রের ধারণা হইল যে, তাঁহার নিকটই তিনি পরম তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার মনে তৎপ্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি স্থবির অস্সজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কাহার শিষ্য?' অস্সজী উত্তর দিলেন, 'আমি শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণের শিষ্য। তাঁহার সমস্ত ধর্মমত ব্যক্ত করিবার সাধ্য আমার এখনও জন্মে নাই, তবে সংক্ষেপে এই বলিতে পারি যে,

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ,
তেসঞ্চ যো নিরোধো
এবং বদী মহাসমণো।

কারণ হইতে এই বিশ্বমাঝে উৎপাদিত হয় যাহা,
কারণ তাহার প্রভু তথাগত করেছেন সুনির্ণয়।
সে কারণ পুনঃ কিরূপে নিরুদ্ধ করিবে মানবগণ,
সে মহাশ্রমণ নিজ প্রজ্ঞাবলে করেছেন প্রদর্শন।"

উক্ত গাথা শ্রবণমাত্র সারিপুত্র স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং স্রোতাপন্ন হইলেন। অতঃপর তিনি মৌদ্‌গল্যায়নকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং অস্সজীর নিকট হইতে শ্রুত শ্লোকটি তাঁহার সম্মুখে আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া মৌদ্‌গল্যায়নও বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার সংকল্প করিলেন ও স্রোতাপন্ন হইলেন।

(২)

বৌদ্ধ ধর্ম সাধনা পর পর চারিটি স্তরে ভাগ করা, স্তরগুলি এইঃ ১. স্রোতাপন্ন, ২. সকৃদাগামী, ৩. অনাগামী, ৪. অর্হত্ব। স্রোতাপন্ন অর্থ নির্বাণ স্রোতে আপন্ন অর্থাৎ নির্বাণ লাভের প্রয়াসে যত্নপরায়ণ। সকৃদাগামী অর্থ যাহাকে নির্বাণলাভ করিবার জন্য আর একবার আসিতে হইবে, অর্থাৎ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। অনাগামী অর্থ যাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। এই জন্মই যাহার শেষ জন্ম এবং এই জন্মেই যে অর্হত্ব লাভ করিবে। এই অর্হত্ব লাভই চতুর্থ বা শেষ স্তর।

যাহাই হউক, মৌদ্‌গল্যায়ন সপ্তাহ মধ্যে এবং সারিপুত্র এক পক্ষে অর্হত্ব লাভ করিলেন। তাঁহারা পূর্বতন গুরু সঞ্জয়ীর নিকট গিয়া তাঁহাকেও স্রোতাপন্ন হইবার জন্য অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সঞ্জয়ী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তবে সঞ্জয়ীর পাঁচশত শিষ্য তাঁহাদের অনুগমন করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। তখন তাঁহারা সদলবলে প্রভু বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য বেণুবনে উপস্থিত হইলেন। প্রভু বুদ্ধ তাঁহাদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদানপূর্বক এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করিয়া তাঁহাদিগকে সংঘভুক্ত করিয়া লইলেন।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন যেদিন সংঘে প্রবেশ করেন, ভগবান বুদ্ধ সেই দিনই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই দুইজনকে তাঁহার প্রধান শিষ্যপদে অভিষিক্ত করা হইল। তদুপরি উঁহারা যথাক্রমে পক্ষকাল ও সপ্তাহকাল মধ্যে অর্হত্ব লাভে সক্ষম হইলেন এবং বুদ্ধ তাঁহাদিগকেই অগ্রশ্রাবকের পদ প্রদান করিলেন। তাহাতে অন্যান্য ভিক্ষুদিগের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইল। কিন্তু ভগবান তথাগত এই বলিয়া ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, অতীত বুদ্ধেরাও এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; জন্মে জন্মে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই নবাগত ভিক্ষু দুইজন প্রভু বুদ্ধের নিকট এই পদ লাভ করিবার জন্য অনেক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ, 'থেরগাথা' নামক গ্রন্থে সারিপুত্রের পূর্ব ও ইহ জন্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, "লক্ষাধিক অসংখ্যকল্প পূর্বে সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—সরদ। মৌদ্‌গল্যায়ন তখন জনৈক কুটুম্বিক গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম দিনসিরিবড্‌ঢ। সরদ যাবতীয় সম্পত্তি দান করিয়া হিমালয়ের লম্বক নামে পর্বতে চলিয়া যান। তথায় তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার ৭৪ হাজার শিষ্য ছিল। তখন অনোমদর্শী বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশে সরদ তাপস প্রথম অগ্রশ্রাবক পদ প্রার্থনা করেন ও তাঁহার ৭৪ হাজার শিষ্য অর্হৎফল লাভ করেন। পরে সিরিবড্‌ঢও বুদ্ধের নিকটে দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক
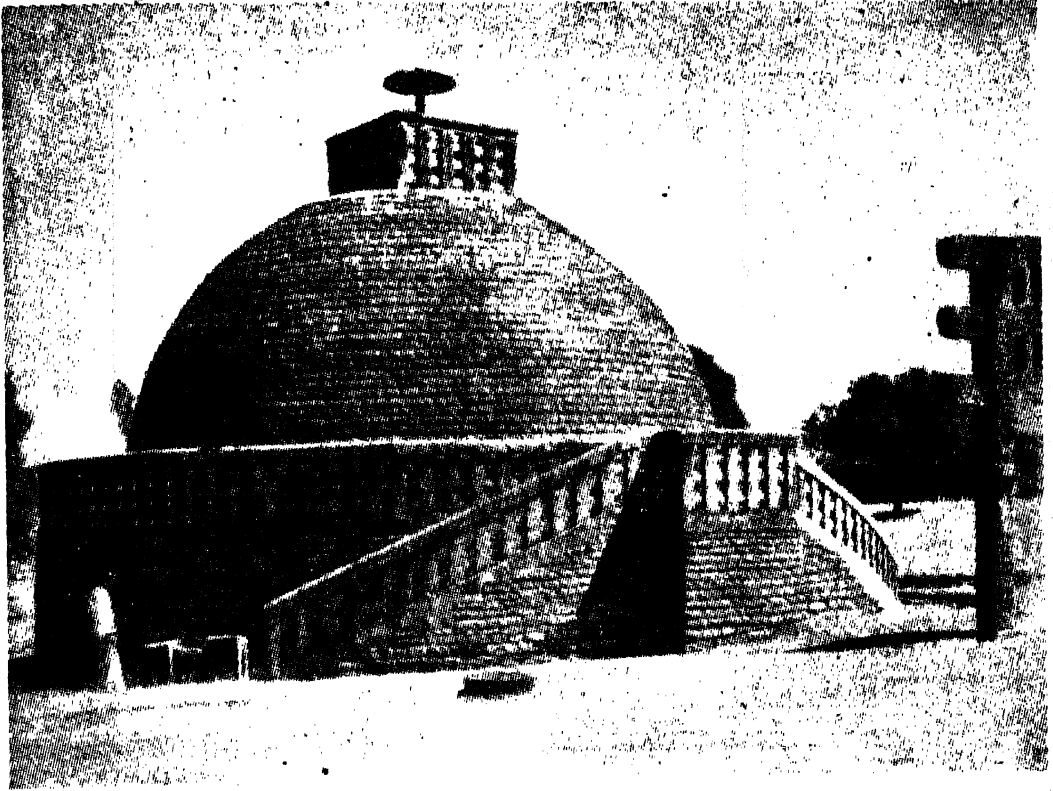
সাঁচি—প্রধান স্তূপ

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের চিতা-ভস্ম এই স্তূপেরই অভ্যন্তরে আবিষ্কৃত হয়
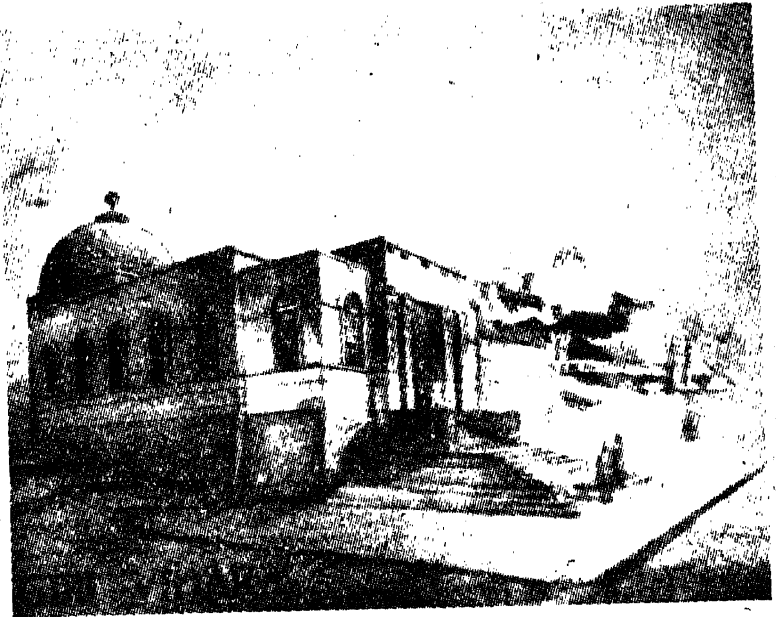
প্রস্তাবিত চৈত্যগিরি বিহার

এইখানেই চিতাভস্ম রাখা হইবে। প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বিহার নির্মাণ করা হইতেছে

পদ প্রার্থনা করেন। তৎপর সরদ রাজগৃহের অনতিদূরে উপতিষ্য গ্রামে ও সিরিবড্ঢ কোলিত গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, গৃহত্যাগ, সঞ্জয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও ত্যাগ এবং তথাগতের শরণ গ্রহণ করিলেন।"

৩

বুদ্ধদেব সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে আদর্শ শিষ্যরূপে গণ্য করিতেন এবং অন্যান্য শিষ্যদিগকেও তাঁহাদেরই 'আদর্শ' অনুসরণ করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন। এই শিষ্যদ্বয় বুদ্ধের পরম বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। সংঘের তত্ত্বাবধানের ও ইহার পবিত্রতা রক্ষার সকল ভার বুদ্ধ এই দুজন সন্ন্যাসীপ্রবরেরই হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত এই মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতেন। ধম্মপদ অট্ঠ কথায় বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে দেবদত্ত যখন সংঘমধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া পাঁচ শত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া গয়াশীর্ষ পর্বতে চলিয়া যান, তখন তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বুদ্ধ এই দুইজনকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারাও তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে সফলকাম হইয়াছিলেন।

সারিপুত্র অত্যন্ত সুকৌশলে বিরুদ্ধবাদীদিগের কূটতর্ক খণ্ডন করিতে পারিতেন।

তাঁহার অগ্রশ্রাবক পদ প্রাপ্তিতে অপরাপর যে-সকল শিষ্য ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, ভগবান বুদ্ধ তাহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করার পর নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ গাথাটি বলিয়াছিলেনঃ—

সব্ব পাপস্স অকরণম্
কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিয়োদপনম্;
এতং বুদ্ধানসাসনম্।

সর্ববিধ পাপ হতে সতত বিরতি
পুণ্যের সঞ্চয়ে সদা মনের আসক্তি,
সচিত্তের সযতনে নির্মলীকরণ;
এই সার ধর্ম শিক্ষা দেন বুদ্ধগণ।

সারিপুত্র বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন। বিশেষত অভিধর্মে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ত্যাগী বলিয়া মনে করিতেন। বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্র 'চতুরার্য'—১. সত্য ও দুঃখ—অর্থাৎ জড়-জগতের সব কিছুই দুঃখময় এই জ্ঞান; ২. সমুদয়—অর্থাৎ এই দুঃখের কারণ ও উৎপত্তিস্থল, ৩. এই দুঃখ নিরোধ এবং ৪, নিরোধগামী অষ্টাঙ্গিক মার্গ—এই চতুরার্য সত্য সারিপুত্র অত্যন্ত সরল ও চিত্তাকর্ষকভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। ভিক্ষুগণ কোন সংকটে পড়িলে তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতেন। বৌদ্ধ গ্রন্থাদির বহুস্থানে ভিক্ষুগণকে তাঁহার উপদেশ প্রদানের উল্লেখ আছে। সংযুত্ত নিকায়ের টীকায় এক স্থলে আছে, বুদ্ধ যখন তাবতিংশ স্বর্গে ধর্মপ্রচার করিয়া সকাশ্য নামক স্থানে অবতরণ করেন, সেই সময়েই সারিপুত্রের জ্ঞানের পরম পরীক্ষা হয়। বুদ্ধদেব সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং একমাত্র সারিপুত্রই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর কেহই উহা পারেন নাই।

সারিপুত্র সংঘের বিধিনিষেধ অতিশয় যত্নের সহিত পালন করিতেন। সংঘের নিয়ম ছিল কোন সন্ন্যাসী একাধিক সামন বা শিক্ষার্থীকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবেন না। সারিপুত্র কোন একটি পরিবার দ্বারা বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছিলেন,—সেই পরিবারের একটি বালককে বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি উপসম্পদা দান করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে স্বয়ং বুদ্ধ এই নিয়ম শিথিল করায় তিনি উক্ত উপসম্পদাপ্রার্থী বালককে তাহার প্রার্থিত বস্তু দান করিলেন।

অন্যত্র উল্লেখ আছেঃ সারিপুত্র একবার উদরের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িলে, মৌদ্গল্যায়ন তাঁহাকে রসুন ভক্ষণের পরামর্শ দেন। কিন্তু ভিক্ষুর রসুন ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া তিনি কিছুতেই উহা খাইতে রাজি হন নাই। অবশেষে স্বয়ং বুদ্ধ তাঁহাকে উহা খাইতে বলিলে, ঔষধরূপে তিনি উহা গলাধঃকরণ করেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার করুণা ছিল এবং তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। জাতকের বহু গল্পে তাঁহার এই সকল গুণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সংঘের নিয়মানুবর্তিতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। ধম্মপদ টীকায় বর্ণিত আছে, যে-সংঘারামে তিনি বাস করিতেন তথাকার অন্যান্য ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় বাহির হইলে তিনি সমস্ত সংঘারাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেন। কোন স্থান অপরিচ্ছন্ন দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি সম্মার্জনী দ্বারা সেই স্থানের আবর্জনা মোচন করিতেন।

আচার্যদের প্রতি সারিপুত্রের অবিচলিত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিজে বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ে অমৃতের সন্ধান পাওয়ার পরেই পূর্বগুরু সঞ্জয়ীকে সংঘে যোগ দানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। যে স্থবির অস্সজীর নিকট তিনি বৌদ্ধধর্মের শরণ লইবার পরামর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পথপ্রদর্শক সেই গুরুজীর প্রতি তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা চিরদিন অম্লান ছিল। এরূপ লিখিত আছে যে, অস্সজী যে-দিকে আছেন বলিয়া তিনি জানিতেন, প্রতি রাত্রে শয়নের পূর্বে সেই দিকে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন এবং সেই দিকে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিতেন।

৪

মৌদ্গল্যায়নের 'ইদ্ধি' অর্থাৎ ঋদ্ধি শক্তি বা বিভূতির বল অত্যন্ত প্রবল ছিল। ঋদ্ধি-বলে তিনি ধ্যান ইত্যাদি বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্রিয়া ব্যতীত কেবলমাত্র চর্মচক্ষেই প্রেতযোনি ও অন্যান্য অশরীরী আত্মাদের দেখিতে পাইতেন এবং আকাশমার্গে বিভিন্ন লোকে গমন ও তথাকার সংবাদাদি আনয়ন করিতে পারিতেন। তিনি আরও নানা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামাত্র দেবলোকে ও নরকে যাইতে পারিতেন, কি কারণে দেবতারা সুখ এবং নরকবাসীরা দুঃখ ভোগ করেন তাহা জানিতেন এবং লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া বৌদ্ধ শাসন গ্রহণ করিত। বিমান বথু নামক গ্রন্থে তাঁহার এইরূপ বিভিন্ন লোকে পরিভ্রমণের উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে, তিনি দেবলোকের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সংযুত্ত ও মজ্ঝিম নিকায় এবং সুত্ত নিপাতেও তাঁহার ঋদ্ধি শক্তির বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে। একবার 'মিগার মাতু পাসাদে' বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন উপরিস্থিত প্রকোষ্ঠে—তাহা সত্ত্বেও, নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠে ভিক্ষুগণ প্রগল্ভভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। তখন বুদ্ধের অনুরোধে মৌদ্গল্যায়ন ভিক্ষুদিগকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার বিপুল পদভারে সেই গৃহ কম্পিত ও মর্মরধ্বনি উত্থিত করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে শক্রের অর্থাৎ ইন্দ্রের অহংকার চূর্ণ করিবার এবং তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার বৈজয়ন্তপুরীও তিনি কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। নন্দোপানন্দ নাগের দমনে তাঁহার ঋদ্ধি শক্তির উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। অপর কোন শিষ্যই মৌদ্গল্যায়নের ন্যায় এত শীঘ্র ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উন্নীত হইতে পারিতেন না। এইজন্য ভগবান বুদ্ধ অন্য কোন শিষ্যের প্রতি এই নাগ দমনের ভার অর্পণ না করিয়া মৌদ্গল্যায়নের প্রতিই অর্পণ করিয়াছিলেন।

ঋদ্ধিশক্তির দিক দিয়া অসীম ক্ষমতাপন্ন হইলেও মৌদ্গল্যায়নের জ্ঞানের দিক দিয়াও কিছুমাত্র অনুপপত্তি ছিল না। জ্ঞানী হিসাবে সারিপুত্রের পরেই তাঁহার স্থান ছিল। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভিক্ষুদিগকে নানা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বহু বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইবে। এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে শাক্যগণের নবনির্মিত বিতর্কগৃহে উপদেশ প্রদান করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং মৌদ্গল্যায়নকে ভিক্ষুদিগের নিকট কিছু বলিবার জন্য আদেশ দেন। ভগবান বুদ্ধের আদেশানুসারে মৌদ্গল্যায়ন ভিক্ষুদিগের নিকট কামনা ও তাহা হইতে মুক্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতা শেষ হইলে, ভগবান বুদ্ধ তাঁহার উপদেশ প্রদান ক্ষমতার অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন দুইজনের পরস্পরের প্রতি গভীর প্রীতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। উভয়েই পরস্পরের গুণগ্রাহী ছিলেন। ভগবান বুদ্ধের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অসীম ভালবাসা দুইজনকে আরও দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। সারিপুত্র বুদ্ধের সকল শিষ্যের প্রতিই বন্ধুভাবাপন্ন হইলেও, মৌদ্‌গল্যায়ন ও আনন্দের প্রতি তিনি সমধিক আকৃষ্ট ছিলেন। বুদ্ধপুত্র রাহুলকেও তিনি যারপরনাই স্নেহ করিতেন। এক সময়ে সারিপুত্রের জ্বর হইলে মৌদ্‌গল্যায়ন মন্দাকিনী-সরোবর হইতে পদ্মের মৃণাল আনিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। গৃহস্থগণের মধ্যে অনাথপিণ্ডদকে সারিপুত্র সমধিক শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার অসুস্থ অবস্থায় তিনি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বহুবার তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তাহার উল্লেখ আছে।

বুদ্ধের যখন ৭৯ বৎসর বয়স, সেই সময়ে সারিপুত্র কার্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে নির্বাণ লাভ করেন। সংযুক্ত নিকায়ে লিখিত আছে তিনি স্বীয় জন্মস্থান নালক গ্রামেই পরলোকগত হন। ইহা ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের কয়েক মাস পূর্বের কথা। সারিপুত্রের নির্বাণ লাভের এক পক্ষ পরে কার্তিকী অমাবস্যাতে মৌদ্‌গল্যায়নেরও পরিনির্বাণ ঘটে।

মৌদ্‌গল্যায়নের পরিনির্বাণ সম্পর্কে বৌদ্ধ গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছেঃ তাঁহার অনন্যসাধারণ ঋদ্ধির ক্ষমতায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিত এবং বৌদ্ধ শাসন গ্রহণ করিত। ইহার দরুণ তীর্থিকেরা অনেক সময়ে বৌদ্ধদিগের নিকট অপদস্থ হইতেন। শেষে তীর্থিকেরা মৌদ্‌গল্যায়নের প্রাণবধের সংকল্প করিলেন। কারণ, তাঁহারা ভাবিলেন, মৌদ্‌গল্যায়ন নিহত হইলে বুদ্ধের প্রভাব কমিয়া যাইবে। তাঁহারা কয়েকজন ঘাতককে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিয়া মৌদ্‌গল্যায়নের হত্যার জন্য নিযুক্ত করিলেন এবং মৌদ্‌গল্যায়ন যে গুহায় অবস্থান করিতেছিলেন তাহার নাম বলিয়া দিলেন। ঘাতকেরা গুহা বেষ্টন করিল; কিন্তু মৌদ্‌গল্যায়ন সেদিন কুঞ্চিকার রন্ধ্রপথে পলায়ন করিলেন। পরদিনও এইরূপ হইল এবং মৌদ্‌গল্যায়ন আকাশ মার্গে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু শেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পূর্বজন্মার্জিত পাপ ফল ভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতীত এক জন্মে তিনি অন্ধ মাতাপিতাকে বনমধ্যে সিংহ শার্দুলের কবলে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, এখন তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে, স্বয়ং বুদ্ধও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি আর পলায়নের চেষ্টা হইতে বিরত রহিলেন। ঘাতকেরা তাঁহার গুহায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার অস্থিগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিল এবং তিনি মরিয়াছেন স্থির করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তখনও তিনি মরেন নাই। লোকে যেমন কর্দম-নির্মিত ভগ্নপাত্রের অংশগুলি যোড়ে, তিনিও ঋদ্ধিবলে সেইরূপ নিজের ভগ্নাস্থিগুলি জুড়িলেন এবং আকাশপথে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রভু আমার নির্বাণ প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে।" বুদ্ধ বলিলেন, "বেশ, তুমি নির্বাণ লাভ কর; তবে আমাকে একবার ভগন শুনাইয়া যাও। কারণ, অতঃপর আর কাহারও মুখে এরূপ মধুর কথা শুনিতে পারিব না।" অতঃপর মৌদ্‌গল্যায়ন পরিনির্বাণ লাভ করিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যুর এক পক্ষকাল পূর্বে সারিপুত্র পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে প্রভু বুদ্ধ তাঁহার উদ্দেশ্যে এক প্রশস্তিবাণী উচ্চারণ করেন। এই দুই শিষ্যকে বুদ্ধ যে কতখানি ভালবাসিতেন তাহার প্রমাণ জাতক গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁহাদের মৃত্যুর পর কয়েক মাস মাত্র বুদ্ধ জীবিত ছিলেন। তারপর তাঁহারও মহাপরিনির্বাণ লাভের দিন সমুপস্থিত হয়।

এই দুই প্রিয় শিষ্যের মৃত্যুতে বুদ্ধ এতদূর বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তখনই তিনি স্থির করিলেন, "আমিও কুশীনগরে পরিনির্বাণ লাভ করিব।" মহাসুদর্শন জাতকে তাঁহার এই পরিনির্বাণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, উপর্যুপরি দুইজন অগ্রশ্রাবক ইহলোক ত্যাগ করিলেন দেখিয়া শাস্তা (ভগবান বুদ্ধ) নিজেও পরিনির্বাণ লাভের সংকল্প গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষাচর্যা করিতে করিতে কুশীনগরে উপনীত হইলেন এবং শালবৃক্ষদ্বয়ের অন্তর্বর্তী উত্তরশীর্ষ মঞ্চকে "আর এখান হইতে উঠিব না" এই সংকল্প করিয়া শয়ন করিলেন।

সারিপুত্রের নির্বাণ যাত্রা

সারিপুত্রের নির্বাণ-যাত্রার যে বিবরণ পালি থেরগাথা গ্রন্থের তিংস নিপাত বর্ণনা

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের পবিত্র চিতা-ভস্ম। ক্ষুদ্র কৌটার মধ্যে শ্বেতচূর্ণ-সমূহই মহাস্থবিরদ্বয়ের দেহাবশেষ

অংশে লিখিত আছে এখানে তাহা সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

ভগবান বুদ্ধ তখন সুগন্ধ গন্ধকুটীরে। এমন সময় সারিপুত্র ব্রত করিতে আসিলেন। এ ব্রত জীবনের শেষ ব্রত। মনোমত সেবা করিয়া তিনি বিশ্রামার্থ স্বীয় কক্ষে গিয়া পদপ্রক্ষালনাদির পর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেদিনকার ধ্যানপ্রভাবে অতীত অনাগত বহু বিষয় তাঁহার পরিদৃষ্ট হইল। সহসা তাঁহার মনে এক বিতর্ক জাগিল, প্রথমে বুদ্ধগণ পরিনির্বাণ লাভ করেন, না অগ্রশ্রাবকদ্বয়? তিনি যোগনেত্রে দেখিতে পাইলেন, বুদ্ধের পূর্বে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ই নির্বাণপ্রাপ্ত হন। তারপর স্বীয় পরমায়ু সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন, আর মাত্র সাত দিন তিনি এই মরলোকে অবস্থান করিবেন। অতঃপর নির্বাণস্থানের কথা চিন্তা করিতে করিতে আপন মাতার কথা মনে পড়িল। তাঁহারা ভ্রাতা-ভগিনীতে সাতজন অর্হৎ, অথচ তাঁহাদের মাতা এই সাত অর্হতের মাতা হইয়াও ত্রিরত্নে অপ্রসন্না। মাতার কিরূপে মুক্তি হইবে? স্থবির যেন দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন তাঁহার ধর্মোপদেশ ব্যতীত বৃদ্ধা মাতার মুক্তিপথ প্রদর্শক আর কেহই নাই। কিন্তু বৌদ্ধ শাসনের প্রতি মাতার অনুরাগ নাই।

...রের সাদরে প্রেম হইয়া অপনীত ...কুলের নরনারী দেবলোক ...করিয়াছেন, ...তাঁহার মাতার ভ্রান্ত ধারণাটুকু (মিথ্যা-...টি) তিনি দূর করিতে পারিলেন না।

এইভাবে তাঁহার মনে নানা চিন্তার উদয় ...। স্থির করিলেন, মাতার ভ্রান্ত ধারণা ...ন করিয়া, যে ঘরে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া-...ছেন সেই ঘরেই পরিনির্বাণ লাভ ...রবেন।

সারিপুত্র তাঁহার বিছানাখানি তুলিয়া ...লেন, বিশ্রাম কক্ষখানি মার্জনা করিলেন, ...বার দ্বারে দাঁড়াইয়া চিরদিনের মত কক্ষ-...নি দেখিয়া লইলেন, এই তাঁহার অন্তিম ...দিন, পুনরায় এই কক্ষে আর পদার্পণ ...টিবে না।

তারপর পাঁচশত শিষ্য সমভিব্যাহারে শেষ ...দায় গ্রহণের জন্য বুদ্ধসকাশে আসিয়া ...বেদন করিলেন—

...মোদানি ভবিস্সামি লোকনাথ মহামুনি,
...মনাগমনং নত্থি পচ্ছিমা বন্দনা অয়ং।
...বিতং অপ্পকং মযুহং ইতো সত্তাহমচ্চয়ে।
...ক্খি পোয়্যামহং দেহং ভারমোচাপনং যথা।
...নুজানাতু মে ভন্তে ভগবা অনুজানাতু
সুগতো,
...রিনিব্বানকালো মে ওসসট্ঠো আয়ু-
সংখারো।

জীর্ণ এবে লোকনাথ ওহে মহামুনি,
যাতায়াত শেষ মোর, নমি যোড় পাণি।
আয়ু মোর অল্পমাত্র সপ্তদিন পরে,
ভারবৎ নিক্ষেপিব দেহ রবে পড়ে।
অনুজ্ঞা প্রদান কর হে বুদ্ধ সুগত,
নির্বাণ আসন্ন মম আয়ু হল গত।

বুদ্ধের অনুমতি লাভ করার পর সারিপুত্র বুদ্ধের চরণে মস্তক রাখিয়া শেষ বিদায়ের মত আবার বন্দনা করিলেন এবং শেষ যাত্রার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

পুত্র আসিতেছেন শুনিয়া সারি ভাবিলেন বোধ হয় বাল্যকালে প্রব্রজিত হইয়া পুত্র বৃদ্ধকালে আবার গৃহী হইবার বাসনায় ফিরিয়া আসিতেছেন।

অতঃপর মাতৃগৃহে সারিপুত্রের অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদানের কথা 'থেরগাথা' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এই সকল অতিমানবীয় গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার মাতার মনে পুত্রের প্রতি যেমন বিশ্বাস জন্মিল তেমনি পুত্রের ভগবান তথাগত—যাঁর প্রভাবে পুত্র এতখানি ক্ষমতাবান হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার প্রতিও অসীম শ্রদ্ধা জাগিল। মাতার মনের পরিবর্তন বুঝিতে পারিয়া পুত্রের মনে হইল এখনই ধর্মোপদেশ দিবার সুসময় উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপাসিকে, কি চিন্তা করিতেছ?' সারি উত্তর দিলেন, 'যদি তোমার এত গুণ থাকে, কি জানি ভগবান বুদ্ধের কত গুণই না জানি আছে, তাহাই ভাবিতেছি।'

অতঃপর স্থবির মাতাকে বুদ্ধের নবগুণ সংযুক্ত ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণী প্রিয় পুত্রের ধর্মোপদেশ শ্রবণে স্রোতাপন্ন ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সেই দিন কার্তিকী পূর্ণিমা। সূর্যোদয়ের সংগে সংগেই ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র বিমান ধাতুতে বিলীন হইয়া গেলেন। তন্মুহূর্তেই শিষ্যবৃন্দ মহাপূজার আয়োজন করিয়া সমারোহের সহিত তাঁহার দাহকার্য সম্পাদন করিলেন।

তাঁহার পাত্র-চীবর ও পুটলিবদ্ধ ধাতু (দেহাবশেষ) ভগবান বুদ্ধের নিকট আনীত হইল। ভগবান জ্যেষ্ঠ অগ্রশ্রাবকের ধাতুগুলি হাতে লইয়া পঞ্চশত গাথায় স্থবিরের গুণাবলী কীর্তন করিলেন এবং শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে একটি চৈত্য নির্মাণ করাইয়া সেই পবিত্র ধাতুগুলি নিধান করাইলেন। ইহার ঠিক চৌদ্দ দিন পরেই কালশৈল পর্বতে দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক মৌদ্গল্যায়নও পরিনির্বাণ লাভ করিলেন এবং ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ধাতু লইয়া বেণুবন বিহারের পূর্বদ্বারে নিধান করাইলেন।

ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু, প্রেসিডেন্ট ব বো, স্যার ইউ থুইন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের চিতাভস্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন

বুদ্ধের দুই অগ্রশ্রাবকের জন্ম হইয়াছিল রাজগৃহে, নির্বাণও হইল রাজগৃহে।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের ভাষণ

সারিপুত্রের ভাষণ

একদিন জেতবন বিহারে সারিপুত্র ভিক্ষুদের নিকটে স্বীয় চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে অর্হৎ ফল প্রকাশ পূর্বক কতকগুলি গাথা ভাষণ করেন। পালি 'থেরগাথা' গ্রন্থের তিংস নিপাত বন্নানা অংশে সেসব লিখিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার কতকগুলি দেওয়া হইল।

পল্লঙ্কেন নিসিন্নস্‌স জন্নুকেনাভিবস্‌সতি,
অলং ফাসু বিহারায় পহিতত্তস্‌স
ভিক্‌খুনো।

পদ্মাসনে উপবেশন করিলে দুইটি জানু যদি বৃষ্টিজলে না ভিজে, ন্যূনপক্ষে এইরূপ ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়াও ভিক্ষু সাধনাবলে সিদ্ধকাম হইতে পারে।

যো চ পপঞ্চং হিত্বান নিপ্পপঞ্চপথে রতো,
আরাধয়ি সো নিব্বানং য়োগক্‌খেমং
অনুত্তরং।

যে তৃষ্ণাদি প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া নির্বাণের পথস্বরূপ আর্যমার্গে রত, সে যোগক্ষেম অনুত্তর নির্বাণ লাভ করিয়াছে।

অনঙ্গনস্‌স পোসস্‌স নিচ্চং
সুচিগবেসিনো,
বালগ্‌গমত্তং পাপস্‌স অব্‌ভামত্তং'ব
খায়তি।

নিত্য শুচি অন্বেষণকারী পবিত্র পুরুষের পক্ষে কেশাগ্র পরিমাণ পাপও মেঘখণ্ডের ন্যায় বোধ হয়।

নগরং য়থা পচ্চন্তং গুত্তং সন্তরবাহিরং,
এবং গোপেথ অত্তানং খণো বে মা
উপচ্চগা;
খনাতীতা হি সোচন্তি নিরয়ম্হি
সমপ্পিতা।

যেমন প্রত্যন্ত নগরের ভিতর-বাহির শত্রুর ভয়ে সুরক্ষিত করে, তেমনি নিজেকেও রক্ষা কর, সুক্ষণ অতিক্রম করিও না, যাহারা সুক্ষণ অতিক্রম করে, তাহারা নরকে গিয়া শোক করিয়া থাকে।

চক্কানুবত্তকো থেরো মহাঞ্ঞাণী সমাহিতো,
পথবাপগ্‌গি সমানো ন রজ্জতি ন
দুস্‌সতি।

শাস্তার দেশিত ধর্মচক্রের অনুবর্তনকারী সারিপুত্র স্থবির মহাজ্ঞানী সমাহিত ও পৃথিবী, জল, অগ্নি, সদৃশ তিনি নির্বিকার, কোন বিষয়ে তিনি আকৃষ্ট হন না।

পঞ্ঞাপারমিতং পত্তো মহাবুদ্ধি মহামতি,
অজলো জলসমানো সদা চরতি নিব্বুতো।

তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা প্রাপ্ত, মহাবুদ্ধিশালী, মহামতি, অজড় হইয়াও জড়তুল্য অর্থাৎ পরিচয় না দিয়া ক্লেশ-পরিদাহ অভাবে নিত্য শান্তভাবে অবস্থান করেন।

স্থবির মৌদ্‌গল্যায়নের ভাষণ

থেরগাথা গ্রন্থের সট্‌ঠি নিপাতে মৌদ্‌গল্যায়ন সম্পর্কিত যে গাথা আছে, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ভগবান বুদ্ধ একদা জেতবন মহাবিহারে আর্য-সংঘের মধ্যে স্থবির মৌদ্‌গল্যায়নের গুণাবলী প্রকাশ করিয়া ঋদ্ধিশালীর প্রধান স্থানে তাঁহাকে নিয়োগ করিলেন। স্থবির মৌদ্‌গল্যায়ন শ্রাবকপারমী জ্ঞান লাভ করিয়া যখন যাহা গাথা ভাষণ করিয়াছেন, তাহা সংগীতাচার্যগণ পরে ভাষণ করিয়াছেন।

শিষ্যদের প্রতি উপদেশ

আরঞ্ঞকা পিণ্ডপাতিকা উঞ্ছাপত্তাগতে রতা,
ধুনাম মচ্চুনো সেনং নলাগারং'ব কুঞ্জরো।

মাতঙ্গ যেমন নলাগারকে দলিত করে, আমিও তেমনভাবে মৃত্যুসৈন্যকে ধ্বংস করিব।

রুক্‌খমূলিকা সাততিকা উঞ্ছাপত্তাগতে
রতা,
দালেমু মচ্চুনো সেনং নলাগারং'ব কুঞ্জরো।

আমি বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিব, সতত বীর্যপরায়ণ হইব, পিণ্ডাচরণে সন্তুষ্ট থাকিব, হস্তীর নলাগার দলনের ন্যায় মৃত্যুসৈন্যকে দলিত করিব।

কোনো প্রলোভনকারিণী গণিকাকে উপদেশ

অট্‌ঠি কংকালকুটিকে মংসন হারূপ
সিব্বিতে,
ধীরত্থু পুরে দুগ্‌গন্ধে পরগত্তে মমায়সে।
গূথভস্তে তচোনদ্ধে উরগণ্ডি পিসাসিনি,
নব সোতানি তে কায়ো য়ানি সন্দন্তি
সব্বদা।
তব শরীরং নবসোতং দুগ্‌গন্ধকরং
পরিবন্ধং,
ভিক্‌খু পরিবজ্জয়তে তং মীলহঞ্চ
য়থাসুচিকামো।

এই দেহ অস্থিকংকালময় কুটীর সদৃশ মাংসযুক্ত, নবশত স্নায়ুদ্বারা শেলাই করা কেশলোমাদিদ্বারা দুর্গন্ধ পূর্ণ, তাই দেহের প্রতি ধিক্, কুকুর-শৃগাল কৃমিকুলের আধার ভূত এই দেহের প্রতি কেন মমতা করিতেছ? তোমার শরীরের নবদ্বার দিয়া রাত্রিদিন অশুচি ক্ষরিত হইতেছে। তোমার শরীর নব-স্রোতযুক্ত, দুর্গন্ধকর, পরিবন্ধনভূত। ভিক্ষু এই অশুচিপূর্ণ দেহকে পরিবর্জন করিবে।

আকাসম্হি হলিদ্দিয়া য়ো মঞ্ঞেথ রজেতবে,
অঞ্ঞেনবাপি রঙ্গেন বিঘাতুদয়মেব তং।
তদাকাসসমং চিত্তং অজ্‌ঝত্তং সুসমাহিতং,
মা পাপ চিত্তে আসাদি অগ্‌গিকন্ধং'ব
পক্‌খিমা।

যে ব্যক্তি আকাশকে হরিদ্রাবর্ণে বা অন্য কোন রঞ্জনযোগে রঞ্জিত করিতে চায়, তাহার সেই কর্ম চিত্তদুঃখ আনয়ন করে মাত্র। কোন বিষয়ে অলগ্ন হেতু আমার চিত্ত আকাশ-সদৃশ, আমার চিত্ত সুসমাহিত, তাই আমার মত ব্যক্তিকে পাপচিত্তে আসক্ত করিও না, পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ঝম্প দিয়া পুড়িয়া দেহ ত্যাগ করে, তুমিও সেইরূপ আমার নিকট দুঃখিত হইবে।

সারিপুত্র সম্বন্ধে

ইমঞ্চ পস্‌স আয়ন্তং সারিপুত্তং
সুদস্‌সনং,
বিমুত্তং উভতোভাগে অজ্‌ঝত্তং
সুসমাহিতং।
বিসল্লং খীণসংযোগং তেবিজ্জং
মচ্চুহায়িনং,
দক্‌খিণেয়্যং মনুস্‌সানং পুঞ্ঞক্‌খেত্তং
অনুত্তরং।

অরূপ সমাপত্তির দ্বারা রূপকায় হইতে ও মার্গদ্বারা সমকায় হইতে এই উভয় ভাগ বিমুক্ত, সুসমাহিত চিত্তযুক্ত সুদর্শন সারিপুত্র আসিতেছেন, তাঁহাকে দেখ। কামরূপ শল্য বিহীন, কামাদিযোগক্ষীণ, ত্রিবিদ্য, মৃত্যুধ্বংস-কারী, মনুষ্যদের দাক্ষিণ্যের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র স্থবিরকে দেখ।

সারিপুত্তোব পঞ্ঞায় সীলেনুপসমেন চ,
য়োপি পারঙ্গতো ভিক্‌খু এতাব পরমো
সিয়া।

যিনি প্রজ্ঞায়, শীলে, ক্লেশ উপশমে নির্বাণ পরাগত ভিক্ষু, তাঁহার চেয়ে সেই সারিপুত্র স্থবিরই অতিশয় শ্রেষ্ঠ।

আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়

কোটিসত সহস্‌সস্‌স অত্তভাবং খণেন
নিম্মিনে,
অহং বিকুব্বনাসু কুসলো বসীভূতোম্হি
ইদ্ধিয়া।
সমাধি বিজ্জাবসি পারমিং গতো
মোগ্‌গল্লান গোত্তো অসিতস্‌স সাসনে,
ধীরো সমুচ্ছিন্দি সমাহিতিন্দ্রিয়ো
নাগো য়থা পূতিলতং'ব বন্ধনং।

আমি মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ কোটি দেহ নির্মাণ করিতে পারি, কেবল মনোময় ঋদ্ধিতে নহে, সমস্ত ঋদ্ধিতেই নিপুণতা লাভ করিয়াছি। সবিতর্ক সবিচার সমাধি প্রভৃতিতে ও পূর্বনিবাসজ্ঞান বিদ্যা প্রভৃতিতে পারমীর চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি তৃষ্ণাদি রহিত শাস্তার শাসনে মৌদ্‌গল্যায়ন গোত্রীয় নামে পরিচিত, যেমন নাগ অক্লেশে গুলঞ্চ লতার বন্ধনকে ছেদন করে, তেমনি আমিও ধীর সমাহিত চিত্তে সমস্ত ক্লেশবন্ধনকে সমুচ্ছেদ করিয়াছি।

সকল কলুষ-তামস হর, জয় হোক্ তব জয়!
অমৃতবারি সিঞ্চন কর' নিখিল ভুবনময়।
জয় হোক্ তব জয়!
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি
ধ্বংস করুক তিমিররাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি' অপগত কর' ভয়।
জয় হোক্ তব জয়!
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

মোহমলিন অতি দুর্দিন, শঙ্কিত চিত পান্থ,
জটিল গহন পথ সঙ্কট সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ,
দুর্গতিভয় করহ হরণ;
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়।
জয় হোক তব জয়!
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বক্সা ক্যাম্প • অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

বক্সা বন্দিশিবিরে আবদ্ধ কতিপয় বিশিষ্ট বিপ্লবীর সঙ্গে এবার আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিবার দায়িত্ব লইতেছি।

দুইটি কথা অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন,—প্রথম, ইহা শুধু পরিচয়, ইংরেজীতে যাকে বলে introduction, কাজেই এই পরিচয়কে জীবনী বা ইতিহাস মনে করিবেন না। দ্বিতীয়, এই পরিচয়ে শ্রেণী বিভাগ বা তারতম্য কিছু করা হয় নাই; কে বড় কে ছোট, কার দান বেশী কার দান কম ইত্যাদি কোন প্রশ্নকেই এই পরিচয়ে আমল দেওয়া হয় নাই। এই পরিচয়ে মূল্য নির্ধারণের কোন মনোভাব বা প্রচেষ্টাই স্বীকৃত হইবে না, আমার চোখে দেখা ও কলমে বলা এই পরিচয়, তাহার অধিক কোন মূল্য ইহার মধ্যে আপনারা যেন আবিষ্কারের চেষ্টা না করেন। আর সাধারণভাবে একটি কথা মনে রাখিবেন যে, ইহাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন, ত্যাগে, দুঃখবরণে ও তেজস্বিতায় মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের যাঁহারা সমতুল্য।

আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করাইবার পূর্বে ইঁহাদিগকে আমি সারিবন্ধভাবে দাঁড় করাইয়া লইলাম।

প্রথমেই যাঁহার সঙ্গে আপনি করমর্দন করিতেছেন, যদি অপরাধ না নেন, তবে বলিতে পারি যে, করমর্দন না করিয়া যাঁহাকে নমস্কার বা প্রণাম করা আপনার উচিত, তাঁহার নাম ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বিপ্লবী ও সরকারী উভয় মহলে যিনি মহারাজ নামে পরিচিত। সমস্ত বিপ্লবীদের প্রতিনিধিরূপে মহারাজকে গ্রহণ করিতে পারেন। সৈনিক ও সাধকে মিশাইয়া যে উপাদানে বিপ্লবীদের চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে, মহারাজের মধ্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ। শান্ত, ধীর ও গম্ভীর পুরুষ। গীতার অনাসক্ত পুরুষ বলিয়া এঁকে আমি মনে করি। পুলিন দাসের পর প্রকৃতপক্ষে ইনিই অনুশীলন পার্টির ধারক ও বাহক ছিলেন এবং ইঁহাকে অনুশীলন পার্টির মেরুদণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইঁহার চরিত্রশক্তি বিরুদ্ধ দলেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। দ্বীপান্তর, কারাদণ্ড এবং জেল আইনের যাবতীয় শাস্তি মহারাজের জীবনের উপর দিয়া গিয়াছে। আন্দামানে প্রেরিত হইবার পূর্বে মহারাজের 'জেল হিস্টরী' টিকিটে শেষের দিকে এই কয়টি লাইন লিপিবদ্ধ ছিল—

"He was one of the leaders of the Revolutionary Party—was suspected in 14 murders and dacoities. Very dangerous."

আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতাম যে, সরকারী কর্মচারীকে খুন করিবার পর মুহূর্তেই ইনি ছুঁচে সুতা ভরিতে পারেন, এমনই মহারাজের নার্ভ। ইহা অত্যুক্তি নয়, সত্যই মহারাজ চরিত্রের সংযমে ও শক্তিতে এমনই সংহত ও আত্মস্থ ব্যক্তি। ১৯০৮ হইতে ১৯৪৬ সালের মধ্যে দীর্ঘ ৩০টি বছরই মহারাজ জেলে কাটাইয়াছেন। পৃথিবীর কোন দেশের কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক কারণে এত দীর্ঘকাল জেলে কাটাইয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। এদিক দিয়া পৃথিবীর ইতিহাসেই মহারাজের একটি বিশিষ্ট আসন রহিয়াছে।

রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতি বিপ্লবীদের কর্মপন্থার মধ্যে অবস্থার চাপে ও প্রয়োজনে গৃহীত হইয়াছিল। এই দুই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ও চেষ্টায় যিনি বাঙলার সমস্ত বিপ্লবীদের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন, অতঃপর তাঁহার সঙ্গেই আপনাদের পরিচয় করাইতেছি। আমাদের বীরেনদার (চাটার্জী) পরিচয় পূর্বেও কিছুটা প্রদত্ত হইয়াছে। ইনিও অনুশীলন পার্টির সদস্য। গৌরকায় সুপুরুষ। গলার আওয়াজ বাঘের মত, এঘরে ডাক দিলে ওঘরে চেয়ারে বসিয়া চমকাইয়া উঠিতে হয়। যৌবনে এই ব্রাহ্মণতনয় কতবার যে মাঝি হইয়া নিশীথ রাত্রে ঝড়ের পদ্মা পাড়ি দিয়াছেন, সে রোমাঞ্চকর কাহিনী বাঙলার বিপ্লবী ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় নিশ্চয় গ্রহণ করিতে পারে। একক বীরেনদার হাতে কম করিয়াও ১৮টি পুলিশ কর্মচারী ও গোয়েন্দা নিহত হইয়াছে, এদিক দিয়া বাঙলার বিপ্লবীদের মধ্যে ইঁহার জুড়ি নাই। আর ডাকাতি, এদিক দিয়াও বীরেনদার জুড়ি বিপ্লবীদের মধ্যে তো নাইই, পেশাদার ডাকাতদের মধ্যেও আছে বলিয়া মনে হয় না, থাকিলেও খুব বেশী নাই।

বীরেনদার একটি কীর্তি শ্রবণ করুন। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর, সার্কুলার রোডে গীয়ার পার্কে (অধুনা লেডিস পার্ক) সন্ধ্যার সময়ে নরেন সেনের নেতৃত্বে অনুশীলন পার্টির একটি গোপন জমায়েৎ হয়। কিছুক্ষণ পরেই সন্দেহজনক ব্যক্তিদের পার্কের বাইরে ঘুরাফেরা করিতে দেখা গেল। যে যেভাবে পারে সরিয়া পড়িবার অনুমতি পাইল। বীরেনদা রেলিং টপকাইয়া পার্কের দক্ষিণদিকের গলিতে পড়িতেই এক গোয়েন্দা কর্মচারী তাঁহাকে বাহু বন্ধনে বুকে বাঁধিয়া লইল। এই অপ্রত্যাশিত প্রেমালিঙ্গন বীরেনদার আদৌ আরামপ্রদ বোধ হইল না। কোথা হইতে এক আপদ আসিয়া উপস্থিত। বয়সটা তখন তরুণ, শরীরে তখন অসুরের শক্তি, তদুপরি লাঠি খেলা, কুস্তি ইত্যাদিতে বেশ একটু অধিকার অর্জিত, সুতরাং এক ঝটকায় এই প্রণয়বন্ধন মুক্ত করিয়া বীরেনদা অন্ধকারে সরিয়া পড়িলেন।

কিন্তু মনে তখন চিন্তা, আসলে দুশ্চিন্তা মাথা ধরার মত চাপিয়া আছে যে, বন্ধুদের কি হইল। পার্শিবাগান গলি দিয়া বীরেনদা আবার সার্কুলার রোডে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, দলের নেতা নরেন সেনকে ধরিয়া পুলিশ দারোগার দল মারধর করিতেছে। নিরপরাধ ব্যক্তির উপর অত্যাচার পথচারী বীরেন চাটার্জী সমর্থন করিতে পারিলেন না।

আগাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ক্যা হুয়া, এই ভদ্রলোককে তোমরা মারতে হ্যায় কাহে। চোর হ্যায়, না ডাকু হ্যায়?"

পিছন হইতে বলিষ্ঠ বাহুতে এক ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে ভল্লুকী আলিঙ্গনে বীরেনদাকে জাপটাইয়া ধরিলেন। বীরেনদা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ব্যাটা লালমুখো এক সাহেব। বিদেশী বন্ধুর বাহুবন্ধন, দেশী লোক নয় যে, এক ঝটকায় মুক্তি আদায় হইবে। সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা কর্তব্য। যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কষিতেই কাঁধের উপর দিয়া উঠিয়া আসিয়া লালমুখো সাহেব পুঙ্গব একটা অতিকায় লাসের মত ফুটপাতে চিৎ হইয়া পড়িলেন। এই লাশটি আর কেহই নহেন, বাঙলার পুলিশের ভবিষ্যৎ আই জি মিঃ লোম্যান। তখন এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব ক্যালকাটা পুলিশ।

পরবর্তীকালে লোম্যান যখন আই-বির বড় কর্তা, তখন বীরেনদার সঙ্গে একবার দেখা হইলে পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার মস্তবড় একটা ক্ষতি করেছ চাটার্জী।"

"কি ক্ষতি আমি আবার করলাম?"

"রাগবী খেলাটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। সেদিনের পর আর ও খেলায় আমি যোগ দিতে পারি নাই।"

বীরেনদা কহিলেন, "কেন? কি হয়েছিল?"

"এমন প্যাঁচ দিয়েছিলে যে, ডান হাতের কব্জিটা চিরকালের জন্য জখম হয়ে গেছে।"

বীরেনদা অনুতপ্ত সুরে উত্তর দিলেন, "পিছন থেকে ধরতে গেলে কেন? সামনে থেকে ধরলে ল্যাং মেরে সরে পড়তাম, তাতে বড় জোর ঠ্যাংটায় একটু ব্যথা পেতে।"

বীরেনদা বয়স্ক ব্যক্তি, কিন্তু বন্দিসমাজে সকল বয়সেরই তিন বন্ধু। আড্ডা, হৈ হৈ ইত্যাদির মধ্যেই আছেন, খেলাধুলাতেও

তরুণদের মতই আসক্তি। এত বড় কর্মী, অথচ কখনও কোনদিন তাঁহার মধ্যে সামান্যতম গর্বের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। নিজেই একদিন এক আড্ডায় আপসোসের ভঙ্গীতে বলিলেন, "না, আমার অদৃষ্টই খারাপ, নেতা আর হওয়া হোল না, রবি (সেন), মহারাজ, জ্ঞানবাবু, প্রতুলবাবু এ'রাই পথ আটকে রাখলেন। আমি নূতন একটা দল খুলব।"

আমরা বলিলাম, "আছি আমরা আপনার দলে।"

"হে', তবেই হয়েছে। দুদিনেই ঘাঁটি ভেঙ্গে যাবে, তোমরা তো প্রত্যেকেই এক একটি লীডার। না বাপু, এত ধাক্কা সামলানো আমার সাধ্য নয়।" বলিয়া প্রস্তাবিত পার্টিটা জন্মিবার আগেই তিনি ভাঙিগয়া দিলেন।

অতঃপর যে দীর্ঘকায় ব্যক্তি একমাথা চুল লইয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া যাইতেছে। তিনি আমাদের মাস্টার মশায়, বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ। জ্ঞানী ও গম্ভীর ব্যক্তি, অথচ রসিকতার রোগ বা স্বভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। পড়াশুনা নিয়াই থাকেন, বেশীর ভাগ সময় শ্রীঅরবিন্দের বইই পড়েন। বন্দিদেরও পড়াশুনায় সাহায্য করেন। জেল জীবনের অত্যাচারে একেবারে চলৎশক্তিশূন্য হইয়াছিলেন। অধুনা চলাফেরা করিতে পারেন। তবে সিঁড়ি ভাঙিগয়া উঠা-নামার সময়ে অপরের সাহায্য লইয়া থাকেন। সভা-সমিতিতে মাস্টার মশায়ের সভাপতিত্বের আসনটীতে একরূপ একচেটিয়া অধিকারই ছিল।

বাঙলা দেশে তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। সুভাষচন্দ্র ও সেনগুপ্ত উভয় নেতারই সম্মানীয় ব্যক্তি তিনি ছিলেন। স্বাস্থ্য ভাঙিগয়া গিয়াছে, কিন্তু সে ক্ষতি মানসিক স্বাস্থ্যে ও তেজে ভগবান পূরণ করিয়া রাখিয়াছেন। বিখ্যাত বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা মাস্টার মশায়েরই শিষ্য।

মাস্টার মশায়ের আর একটি পরিচয় আছে, যাহা বাইরের লোকে জানে না। তিনি শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য না হইয়াও অনুরক্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি নিজেও একজন গুপ্ত-যোগী। মাঝে মাঝে কাহারও মুক্তির খবর, কিংবা পারিবারিক কোন আসন্ন ঘটনা মাস্টার মহাশয় বলিয়া দিতেন এবং তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিত। বেণুবাবু (রায়) একদিন মাস্টার মহাশয়কে সোজা জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ভবিষ্যতের কথা কেমন করে বলেন?"

উত্তরে মাস্টার মশায় দুই ভুরুর সংগমস্থলে আঙ্গুল রাখিয়া বলেন, "এখানে একটা পাখী এসে বসে, সেই আমাকে বলে দেয়।"

তারপর যোগ করেন, "এস্থানটিকে কি বলে জান? একে আজ্ঞাচক্র বলে। এখানে একটি আকাশ আছে, সে আকাশ খুলে গেলে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখা যায়।"

আমি নিজে এই বিষয়ে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে কোন আলাপ করি নাই। কিন্তু মাস্টার মশায়ের যোগসাধনা ব্যাপার সম্বন্ধে শুনিয়াছি যে, তিনি নাকি একটি বিপজ্জনক পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন। মাস্টার মশায়ের মত নাকি এই যে, এই দেহকে সজ্ঞানে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আলোক বা জ্যোতির্লোকে পৌঁছানো যায় এবং যে কোন পথ দিয়াই দেহ-উত্তরণ সম্ভব। মাস্টার মশায় চিরাচরিত পন্থায় আজ্ঞাচক্রে বা হৃদয়ে ধ্যান বা মন-সংযম না করিয়া পায়ের পথেই নাকি মনকে চালনা করিবার পন্থা ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, ঐ পথে যোগীদের পরিভাষায় 'শেষপাতাল' পার হইয়া জ্যোতির্লোককে উত্তীর্ণ হইবেন। অনেকের মতে মাস্টার মশায়ের চলৎশক্তি ও দৈহিক শক্তির বিপর্যয়ের নাকি এই যৌগিক প্রক্রিয়াই বিশেষ কারণ। আমি নিজে অবশ্য এই মত পোষণ করি না। আমার ধারণা, জেলের অত্যাচারই মাস্টার মশায়ের দৈহিক অসুস্থতার মূল কারণ। মাস্টার মশায় একদিন সুভাষচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, তখন উভয়েই স্টেট প্রিজনার, "এমন ঘুম দিব যে, মুক্তির ঠিক আগের দিন জাগব।" এই ঘুম অর্থে তিনি যে সমাধিকেই বুঝাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য তেমন ঘুম তিনি দেন নাই।—একদিক দিয়া বাঙলার বিপ্লবী সমাজে মাস্টার মশায়ের সমতুল্য ব্যক্তি আর দ্বিতীয় কেহ নাই, আমার বিশ্বাস।

তাঁহারই পাশে যে দীর্ঘ ও বলিষ্ঠকায় ব্যক্তিকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন যে, স্বাধীন দেশে জন্ম লইলে ইনি নিশ্চয় জেনারেল বা ফিল্ড মার্শাল হইতেন, তাঁহার নাম রবিবাবু (সেন)। ইনি অনুশীলন পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা বলিয়া পরিচিত। অত বড় দেহের মধ্যে যে মনটি বসবাস করিতেছে, তাহাতে ঘোরপ্যাঁচের কোন হাঙ্গামা নাই। তেজস্বী নির্ভীক ব্যক্তি। চলনে বলনে একটা আন্তরিকতা সর্বদাই পরিস্ফুট। অল্প বয়সের বিপ্লবীদের মধ্যে যা কিছু একটা করিবার যে তীব্র বেগ ও জ্বালা থাকে, বয়স বৃদ্ধিতেও সেই জ্বালা ইঁহাকে ত্যাগ করে নাই। যাঁহারা সৈনিক ধাঁচের, তাঁহারাই বিশেষভাবে ইঁহার অনুরক্ত হইতেন। রবিবাবুর পরিচয় পূর্বে কিছু প্রদত্ত হইয়াছে। পরেও তাঁহার দেখা আপনারা আবার পাইবেন।

একটা খবর এখানে পেশ করিয়া রাখিতেছি যে, এই ভীমকায় ব্যক্তিটি ভোজনে প্রকৃতই বৃকোদর সদৃশ ছিলেন। ইনি ছিলেন পাঁঠার যম, দক্ষিণাদা একদিন ইঁহাকে সামনে বসাইয়া মাংস খাওয়াইয়াছিলেন। পরিমাণ দেখিয়া আমার তো ভিরমিই লাগিয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, প্রয়োজনীয় সময় দিলে প্রমাণ সাইজের একটা পাঁঠার সবটুকু মাংসই তিনি একা গ্রাস করিতে পারেন। বাঙালীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শক্তির বড়াই অবশ্যই তিনি করিতে পারেন।

তাঁহারই পাশে এবং তাঁহারও চেয়ে ইঞ্চিকতক লম্বা যে ভীমকায় ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান দেখা যাইতেছে, তিনি আর কেহ নহেন, সন্তোষ দত্ত। স্কুলে থাকিতেই দেহের অস্বাভাবিক শক্তির জন্য অল্প বয়স সত্ত্বেও ডাকাতি ইত্যাদিতে অংশ নিতে পারিয়াছিলেন। ১৯১১।১২ সালে পূর্ণ দাসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে ফরিদপুর জেলে আবদ্ধ অবস্থায় ইনি এক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ করিলে তিনি এই বয়সেও লজ্জিত হইয়া পড়েন। ল্যাঙ্গোটি আঁটিয়া তিনি বদ্ধ ঘরের মধ্যে ব্যায়ামে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে জনৈক জেল কর্মচারী বদ্ধ দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। নেতৃস্থানীয় এক বিপ্লবীর সঙ্গে কি লইয়া কথা বলিতে বলিতে ভদ্রলোক উদ্ধত মেজাজে অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করিয়া বসেন। শুনিয়া বয়সে অল্প, কিন্তু দেহে পূর্ণ ভীমকায় সন্তোষ দত্ত "তবেরে" আওয়াজ ছাড়িয়া ল্যাঙ্গোটি আঁটা নগ্ন সজ্জায় ছুটিয়া আসিলেন, আসিয়াই লোহার গরাদ দেওয়া আবদ্ধ দরজাটা দুই হাতে ধরিয়া এমন ঝাঁকানিই দিয়াছিলেন যে, জেল কর্মচারী বোমা খাওয়া মানুষের মত দূরে ছিটকাইয়া পড়িলেন, ভাবিলেন দরজাটা ভাঙিগয়া দানবসদৃশ সন্তোষ দত্ত নির্গত হইলেন বলিয়া। তাই উঠিয়া মরি-কি-বাঁচি করিয়া দৌড় দিলেন এবং জেলগেটে উপস্থিত হইয়া তবে তিনি থামিলেন। সন্তোষবাবুর লজ্জার কারণ এই যে, ঐ লোহ দরজা ভাঙ্গা দ্বাপরের ভীম অথবা ত্রেতার মহাবীর কারো পক্ষে সম্ভব নহে, অথচ কলির ভীমের এ হুঁশ ছিল না। তাই নিষ্ফল আক্রোশে লোহ গরাদের উপরই তিনি শক্তিটা নিরর্থক ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সন্তোষবাবুকে এই আখ্যায়িকার পরে অন্ততঃ আর একবার আপনারা দেখিতে পাইবেন।

জাহাজের গায়ে জালি বোটের ন্যায় সন্তোষবাবুর গা ঘেঁষিয়া যে বেঁটে ক্ষীণকায় ব্যক্তিকে দেখিয়া আপনি ভাবিতেছেন যে, ইনি নিশ্চয় কোন গ্রাম্য কবিরাজের কম্পাউণ্ডার, তাঁহার নাম যতীন রায়। চেহারায় আপনি আকৃষ্ট হন নাই। নাম শুনিয়াও আপনি বিশেষ কিছু আকৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। কিন্তু পোষাকী নামের খাপ হইতে যদি এ'র আটপৌরে নামটা টানিয়া বাহির করিয়া দেখাই; তবে আপনাকেও সচকিত হইতে হইবে। ইনি বরিশালের ফেগু রায়, ওরফে ফেগু ডাকাত। এই নাম শ্রবণে বরিশাল জেলায় এক সময়ে হিন্দু-মুসলমান কোন

গৃহস্থই রাত্রিবেলা ঘরের বাহির হইত না, ঘরের মধ্যে হাঁড়ি মালসাতেই নৈশকৃত্য সারিয়া রাখিত। বরিশাল জেলার বৃদ্ধদের জিজ্ঞাসা করিলে ফেগু ডাকাতের খবর আপনারা পাইতে পারেন। ইনি চা, পান, সিগারেট কোন নেশাই করেন না, অপরে যে করে তাহাও পছন্দ করেন না। যাঁর নামে গ্রামবাসীদের মনে এত আতঙ্ক সঞ্চারিত হইত, তাঁর নিজের মনটি কিন্তু অদ্ভুত। বন্দিশিবিরে দেখিয়াছি যে, যে দলের যে কেহই রোগে পড়িয়াছে, ফেগু রায় তার শিয়রে রাত জাগিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। খাদশূন্য ব্যক্তি, চরিত্রে নিষ্পাপ। জীবনে কথার খেলাপ ইনি করেন নাই। দধীচির হাড়ের খবর রাখি না, কিন্তু ফেগু রায়ের হাড়েরও বজ্র তৈরী হইতে পারে, আমার বিশ্বাস।

তাঁহারই পাশে মজবুত গঠন, চওড়া বুক ও সাধারণ বাঙালীর দৈর্ঘ্য লইয়া যিনি দণ্ডায়মান, তাঁহার চোখের ও চোয়ালের দিকে নিশ্চয় আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইনি সুরেশচন্দ্র দাস, বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে কর্মী সংঘের নেতারূপে যিনি একদা একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়াছেন। চোয়ালে চরিত্রের দৃঢ়তা ব্যক্ত, চোখের দৃষ্টির সারমর্ম, 'কারো কাছে আমি কোন প্রত্যাশা করি না।' সত্য কথা— স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কাহাকেও শুনাইতে ইনি দ্বিধা করেন না এবং বক্তব্য মোলায়েম বা প্রিয় করিয়া পেশ করিবার কোন বাহুল্যোই ইনি ভাষাকে ভারাক্রান্ত করেন না। দলের বা বে-দলের দুঃখ-দারিদ্র্যে এ'র মত বান্ধব খুব কমই আছে। পথচারী পথিকের সঙ্গে ইনি যে-ভাষায় ও ভাবে আলাপ করিবেন, স্বয়ং বড়লাটের সঙ্গেও সাক্ষাৎকালে তাহার ঈষৎ মাত্র পরিবর্তন ইনি করিবেন না, অর্থাৎ একই পোষাকে ও মূর্তিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বপাত্রের সম্মুখীন ইনি হইবেন। সংগঠন শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দলের ভার এই জাতীয় ব্যক্তিই বহন করিয়া থাকেন। দেশের জননেতারা ই'হাকে বেশ একটু সমীহ এবং ভয় করিয়াই চলিতেন। সুরেশদা যুগান্তর পার্টির অন্যতম নেতা।

তাঁহার পাশেই দীর্ঘকায় যে ভদ্রব্যক্তি দণ্ডায়মান, তিনি ময়মনসিংহের জ্ঞানবাবু (মজুমদার), অনুশীলন পার্টির অন্যতম মাথা, ইংরেজীতে ব্রেন। কপালে বুদ্ধির চিহ্ন অতীব ব্যক্ত। জীবনে যে স্বল্প কয়টি বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে লোকে তেমন ভালোবাসে বলিয়া আমার ধারণা নাই। আমি কিন্তু মনে মনে জ্ঞানবাবুর জন্য একটা শ্রদ্ধাযুক্ত ভালোবাসাই বোধ করিতাম। যেদিন জ্ঞানবাবুকে খেলার মাঠে দেখি, তখনই আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। ফুটবল খেলায় এই বয়স্ক, ধনী, উকীল ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে উ'চুদরের স্টাইল দেহের গতিভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি আবিষ্কার করিলাম যে, ইনি আসলে বুদ্ধিজীবী নহেন, এ'র সত্তার গভীরে একজন আর্টিস্ট একাকী বসবাস করিয়া থাকে। জ্ঞানবাবুর এই পরিচয় তাঁহার বন্ধুদের নিকটও হয়তো অজানা রহিয়া গিয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর আসনে জ্ঞানবাবুকে উপবিষ্ট দেখিলে আমি অন্তত অযোগ্য ব্যক্তির উচ্চ-পদাধিকার বলিয়া তাহা মনে করিতাম না। এখানে উল্লেখ থাকে যে, বড় বড় ডাকাতিতে জ্ঞানবাবু অংশ গ্রহণ করিতেন।

জ্ঞানবাবুর পাশে যিনি দণ্ডায়মান, দেখিলেই যাঁহাকে স্মার্ট, চট্‌পটে, সর্ব অবস্থায় সদা প্রস্তুত ও সপ্রতিভ বলিয়া মনে হইবে, তাঁহাকে আপনারা নিশ্চয় চিনেন ও জানেন। তিনি ভূপতিদা (মজুমদার)। বয়স্কদের মধ্যে ফুটবল খেলায় ই'হার জুড়ি নাই। যৌবনে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় ছিলেন। আসরে গল্প জমাইতে ভূপতিদার সমকক্ষ ব্যক্তি সকল সমাজেই খুব কম আছে। এ'র ইংরেজী ভাষার উপর দখল অনেকেরই ঈর্ষার উদ্রেক করিবে। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জির ইনি সহকর্মী ও যুগান্তর পার্টির অন্যতম নেতা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, তখন সিঙ্গাপুরে গোপনে গমন করেন। সেখানে বন্দী হন এবং ঠিক বলিতে পারি না, সিঙ্গাপুর দুর্গ হইতে হয়তো ইনি পলায়নই করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রতা এ'র চরিত্রে নাই। চরিত্রে ভূপতিদা ছিলেন আসলে কবি ও সাহিত্যিক। আনন্দই ছিল ই'হার বিধিদত্ত সাধনা, কিন্তু তার বদলে ইনি দেশের স্বাধীনতাকেই তরুণ বয়সে জীবনের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করেন। জেল জীবনে ভূপতিদাকে পাশে পাওয়া মানে দুঃখ, চিন্তা ও ভাবনার হাত হইতে রেহাই পাওয়া। এই খেলোয়াড় আর্টিস্টকে শুধু একা আমিই নয়, দল-নিরপেক্ষভাবে আরও অনেকেই নিজের পরম নিকট-আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল।

তাঁহার পাশেই গৌরকায় যে সুদর্শন ব্যক্তিটিকে দেখিতেছেন, তাঁহাকে আপনাদের না-চেনার কথা নহে। ইনিই প্রতুলবাবু (গাঙ্গুলী), দীর্ঘদিন যাবত অনুশীলন পার্টির মুখপাত্ররূপে পরিচিত। রাজনীতি ব্যতীত জীবনে প্রতুলবাবুর যে অন্য কোন আকর্ষণ আছে, তাহা আমার মনে হয় নাই। অবশ্য দুপুরে পাশার আসরে তিনি অবতীর্ণ হইতেন। অনুশীলন পার্টির নেতৃবর্গের মধ্যে জনসাধারণের নিকট প্রতুলবাবুর নামই সমধিক পরিচিত। প্রতুলবাবুকে কখনও উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া বিপ্লবীমহলে প্রতুলবাবুর প্রসিদ্ধি আছে। আমার ধারণা দলগঠনে ই'হার স্বাভাবিক নৈপুণ্য রহিয়াছে।

প্রতুলবাবুর পাশেই চশমা চোখে যে ভদ্রলোককে দেখিতেছেন, ইনিই অরুণবাবু (গুহ)। ই'হার নামের সঙ্গে আর একটি নাম অবশ্যই যুক্ত হইবে—তিনি হইলেন ভূপেন দত্ত। ঐ কিছুদূরে যিনি জীবনবাবুর (চ্যাটার্জি) পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। অরুণবাবু ও ভূপেনবাবু দুই বন্ধু। এই বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য বলিয়াই সকলে মনে করে। অরুণবাবু বয়সে বড় এবং প্রকৃতিতে দুই বন্ধুর খুব সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই। অরুণবাবুর মুখে আমি হাসি দেখি নাই, আর ভূপেনবাবুর মুখে একটি মৃদু সুন্দর হাসি সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। অরুণবাবুকে লোকে এড়াইয়া চলিত, ভূপেনবাবুর পাশে লোক আপনা হইতেই আগাইয়া যাইত। দলের বাহিরের লোকের সঙ্গে অরুণবাবু তেমন মেলামেশা করেন না। পার্টির লোকের সমস্ত রকম সুবিধা-অসুবিধার খবর ইনি তন্ন তন্ন করিয়া লইতেন। পার্টিই অরুণবাবুর ধ্যান ও জ্ঞান। পার্টির স্বার্থ ও সুনাম ইনি যেন যক্ষের মত পাহারা দিতেছেন, এমনই মনে হইত। বাহিরের লোকের কাছে এ'র হৃদয়ের পরিচয় কিছু নাই, কিন্তু পার্টির লোকের নিকট এ'র হৃদয় অবারিত। অরুণবাবুর প্রকৃতির লোকের হাতেই পার্টির ক্ষমতা স্বাভাবিক নিয়মে গিয়া ন্যস্ত হইয়া থাকে। সুযোগ পাইলে অরুণবাবু যে ভবিষ্যতে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইবেন, এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। ইনি যুগান্তর পার্টির অন্যতম নায়ক।

এই সুযোগে অরুণবাবুর বন্ধুর পরিচয়ও সারিয়া রাখা যাইতেছে। যে কয়জন ব্যক্তির পড়াশুনা খুব বেশী বলিয়া জেলে খ্যাতি ছিল, ভূপেনবাবু তাঁহাদেরই একজন। ভূপেনবাবু ছাত্রহিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, ইংরেজী ভালো লিখিতে পারেন বলিয়া বন্দিমহলে স্বীকৃত। ভূপেনবাবুকে দেখিলেই আমার মনে স্বল্পবাক ও স্মিতহাস্যমণ্ডিত এক তেজস্বী মূর্তি উদ্ভাসিত হইত। ভূপেনবাবু সত্যিকার তেজস্বী ব্যক্তি, তাঁহাকে ভাঙা চলে কিন্তু নোয়ানো চলে না। তেজ, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের সংমিশ্রণে ভূপেনবাবুর যে চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু ভূপেনবাবু স্বভাবে লাজুক। এই শক্তিমান পুরুষ ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতিতে কি অংশ গ্রহণ করিবেন, বক্সা ক্যাম্পে বহুবার এই কথা আমার মনে জাগ্রত হইয়াছে।

তাঁহার পাশেই দীর্ঘনাসা বেঁটে খাটো যে ভদ্রলোক ফতুয়া গায়ে বিড়িমুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিই জীবনবাবু (চ্যাটার্জি)। মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে বিপ্লবের গুপ্তকেন্দ্রগুলি বহুলাংশে ই'হারই সৃষ্টি। ইনি নিরভিমান, সত্যিকার ত্যাগী, ধন-যশ-ক্ষমতার লোভ ই'হার

(শেষাংশ ৪৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কোয়ান্টাম থিওরি বা শক্তির কণাবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দেশ ও কালের পটভূমিতে জড় ও শক্তির লীলাখেলা, এই হলো বাইরের জগৎ সম্পর্কে পদার্থ বিজ্ঞানের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং প্রধানতঃ দেশ, কাল, জড় ও শক্তি এই সত্তা চতুষ্টয়ই বৈজ্ঞানিকের জগৎ-রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পাঠ গ্রহণ ক'রে থাকে। এ ছাড়াও যে দু'টি বিরাট সত্তা প্রধান চরিত্রকাররূপে এদের পার্শ্বে বিশিষ্ট স্থান অধিকারে সমর্থ হয়েছে বা হয়েছিল তারা হলো বর্তমান সভ্যজগতে সুপরিচিত তড়িৎপদার্থ এবং হাইগেন্‌স্‌ পরিকল্পিত আলোক-তরঙ্গবাহী ইথর-সমুদ্র।

এই সকল সত্তার রূপ কল্পনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে জাগে ওদের গঠনপ্রণালীর কথা। এদের মধ্যে জড়দ্রব্য কল্পিত হয়ে এসেছে, আমরা জানি, দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব থেকেই, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অবিভাজ্য কণার সমষ্টিরূপে যারা নাম গ্রহণ করেছে অ্যাটম্‌ বা পরমাণু; কিন্তু শক্তি-পদার্থও যে কণা-ধর্মী এ হলো মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিকের জগৎ-চিত্র সহসা এক অভিনব রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু কেবল জড় ও শক্তি সম্পর্কেই নয়, উক্ত প্রত্যেক পদার্থেরই গঠনের প্রশ্নটা এক সময়ে না এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। প্রত্যেকের সম্বন্ধেই জিজ্ঞাস্য হয়েছে—পদার্থটার গঠনে আণবিকতা (Atomicity) আরোপ করতে হবে না ওকে গ্রহণ করতে হবে ধারাবাহিক বা ক্রমভঙ্গহীন সত্তারূপে?

প্রথমতঃ দেশের কথাই ধরা যাক্‌। দেশের চিত্র পরিকল্পনায় আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের যুগ থেকেই এই বিরাট সত্তা কল্পিত হয়ে এসেছে একটি একটানা বা ক্রমভঙ্গহীন সন্ততি (Continuum) রূপে। যে সকল বিন্দুর সমবায়ে গঠিত হয়েছে এই দেশ তাদের ক্ষুদ্রতারও যেমন অন্ত নেই, সেইরূপ পরস্পর-সংলগ্নতারও অবধি নেই। আবার কাল (Time) সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা খাটে। যদিও প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে জীনোর সময় পর্যন্তও কাল-প্রবাহকে কেউ কেউ কল্পনা করেছেন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণের সমষ্টিরূপে তবু শেষ পর্যন্ত এ কল্পনা টেকেনি। বস্তুতঃ দেশকে ক্রমভঙ্গহীন সত্তারূপে কল্পনা ক'রে কালের গঠনে ক্রমভঙ্গ (discontinuity) আরোপ করা যায় না—বর্তমান যুগে বিশেষ ক'রে যায় না এই জন্য যে, আইন্‌স্টাইন্‌-প্রচারিত আপেক্ষিকতত্ত্বে পরিকল্পিত জগৎ-চিত্রের সঙ্গে এরূপ পরিকল্পনা আদৌ খাপ খায় না। আপেক্ষিকতাবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই যে, দ্রষ্টা বিশেষের অনুভূতিতে যে সত্তা নিছক দেশ বা নিছক কাল-রূপে আত্মপ্রকাশ করে, আপেক্ষিক বেগ সম্পন্ন ভিন্ন জগতের দ্রষ্টা তাকে কতকটা তার দেশের কোঠায় এবং কতকটা তার কালপ্রবাহে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে বাধ্য হয়। সুতরাং দেশকে ক্রমভঙ্গহীন সত্তারূপে কল্পনা ক'রে কালের গঠনে ক্রমভঙ্গ আরোপ করা যায় না। আবার আলোক-তরঙ্গের লীলাভূমি ইথরকেও বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করে' এসেছেন দেশ ও কালের মতই একটি ক্রমভঙ্গহীন সন্ততিরূপে যার ঠিক পাশাপাশি অবস্থিত দু'টো অংশের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ফাঁক নেই—কারণ তা হ'লে ঐ ফাঁকের ভেতর দিয়ে আলোক-তরঙ্গ অগ্রসর হবে কি ক'রে তা বোঝা যায় না।

কিন্তু জড়ের সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না। জড়দ্রব্যের ভেতরকার গঠনের যে চিত্র বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে সে হলো আণবিকতার চিত্র; আর এই চিত্র কল্পিত হ'য়ে এসেছে প্রাচ্যে কণাদের সময় থেকে এবং পাশ্চাত্য জগতে ডিমোক্রিটাসের যুগ থেকে। আধুনিক বিজ্ঞান জড়দ্রব্যের অভ্যন্তরে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে প্রথমেই যে ক্ষুদে কণাগুলির সাক্ষাৎ পায় তারা নাম গ্রহণ করেছে 'অণু,' অণুর ভেতরে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান সূক্ষ্মতর কতগুলি পরমাণু এবং প্রত্যেক পরমাণুর ভেতর দেখতে পান পরমাণুর চেয়ে বহুগুণে ক্ষুদ্র এক বা একাধিক ইলেকট্রন্‌ ও প্রোটন-কণা। অণু ও পরমাণুগুলি বিশেষ বিশেষ কারবারের পক্ষে—যথাক্রমে ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ব্যাপারে—অবিভাজ্য পদার্থ-রূপে প্রতিপন্ন হ'লেও কেউ এরা জড়ের বিভাজ্যতার শেষ সীমা নির্দেশ করে না। এই সীমার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পরমাণুর অন্দরমহলে ঢুকে ইলেক্‌ট্রনদের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করলে,—কারণ, ইলেক্‌ট্রনকে দু' টুকরা করার মত অস্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি। মোটের ওপর জড়ের গঠনের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হ'লে বলতে হয়, জড়দ্রব্য মাত্রই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার সমষ্টি, যাদের পারস্পরিক ব্যবধানও খুবই ক্ষুদ্র। কিন্তু কণাগুলির ব্যাস এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবধানের তুলনায়ও বহুগুণে ক্ষুদ্র। কোন কণা একান্ত অবিভাজ্য, কেউ বা কিঞ্চিৎ বৃহত্তর ও বিভাজ্য। কেউ বা স্থির কেউ বা চঞ্চল; আবার চঞ্চল কণাগুলির মধ্যে কেউ সম্পন্ন করছে ধাবন-গতি, কেউ বা বিচিত্র তাল ও বিচিত্র ভঙ্গীর ঘূর্ণন ও কম্পন গতি।

আবার তড়িৎ-পদার্থের অভ্যন্তরে দৃষ্টি প্রসারিত করেও আমরা অনুরূপ চিত্রেরই সাক্ষাৎ পাই। শতাধিক বর্ষ পূর্বে তড়িৎ জিনিসটা কল্পিত হ'তো ক্রমভঙ্গহীন ও ভারহীন সরিল পদার্থ (weightless fluid) রূপে; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি—ফ্যারাডে কর্তৃক বৈদ্যুৎ-বিশ্লেষণের নিয়মের আবিষ্কারের পর থেকে—জড়দ্রব্যের মত তড়িৎ-পদার্থেরও আণবিক গঠন স্পষ্ট ধরা পড়লো এবং তড়িতের ক্ষুদ্রতম কণাগুলি ইলেক্‌ট্রন্‌ নাম গ্রহণ ক'রে যুগপৎ জড় ও তড়িতের বিভাজ্যতার সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দিল।

বাকি রইলো শক্তি-পদার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান শক্তি-সত্তার একাধিক রূপ আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে। জড়-শক্তিই শক্তির একমাত্র রূপ নয়; আবার এক মূর্তি পরিত্যাগ ক'রে ভিন্ন মূর্তি গ্রহণ শক্তি-পদার্থের একটা বিশিষ্ট ধর্ম। একই শক্তি, কখনো তাপ রূপে, কখনো আলোক রূপে, কখনো বৈদ্যুৎ-শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে। কিন্তু যে মূর্তিতেই শক্তির আবির্ভাব ঘটুক, ওর গঠনে, দেশ ও কালের মত, ধারাবাহিকতা আরোপ করবো, না জড় ও তড়িতের মত ওকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কণার সমষ্টিরূপে কল্পনা করবো এ প্রশ্ন উঠতে পারে, এবং এই প্রশ্নই খুব বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে, যখন শক্তি-পদার্থের শোষণ ও বিকিরণ প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ ম্যাকস্‌ প্লাঙ্ক শক্তির কণাবাদ নামক তাঁর বিখ্যাত মতবাদ প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্তও শক্তি-সত্তা কল্পিত হয়ে এসেছে ধারাবাহিক পদার্থরূপে, যার ক্ষুদ্রতম অংশের ক্ষুদ্রতার অন্ত নেই, সুতরাং যার বিভাজ্যতারও সীমা পরিসীমা নেই। ফলে, তাপালোক রূপে তেজের (শক্তির) বিকিরণ এবং শোষণ সম্বন্ধে পুরানো যুগের চিন্তাধারা নিম্নোক্তরূপ চিত্র অঙ্কনে অভ্যস্ত হয়েছিল :

সূর্যের কম্পমান অণুপরমাণুগুলি ওদের কম্পনগতি-সম্পন্ন করে যেমন ধারাবাহিকভাবে সেইরূপ তাপ ও আলোক-তরঙ্গরূপে ঐ কম্পন-শক্তি চতুর্দিকে বিকিরণও করে ধারাবাহিকভাবে। বিকিরণ ব্যাপারটা ঘটে নিউটনীয় কণাবাদের নির্দেশ অনুযায়ী গোলাগুলী বর্ষণের মত খাপছাড়াভাবে নয়, পরন্তু হাইগেন্‌সের কল্পনা অনুযায়ী ইথর সমুদ্রে ক্রমভঙ্গহীনভাবে তরঙ্গ তুলে এবং কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁক না রেখে। আবার এই তরঙ্গগুলিই যখন ওদের শক্তি-সম্ভার বক্ষে বহন করে পৃথিবীতে (এবং অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহে) উপস্থিত হয় এবং ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে ওদের আগমন বার্তা আমাদের জানাতে থাকে তখন ধরাপৃষ্ঠে ওদের শোষণও ঘটে ধারাবাহিকভাবে। কি তাপালোক রূপে আবির্ভাবের প্রণালীতে, কি বিকিরণে বা শোষণে কোথাও কোন ক্রমভঙ্গ নেই। এই হলো শক্তি-পদার্থের চালচলন সম্বন্ধে পুরানো যুগের মত এবং এই মত অনুসরণ করেই তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির সর্বপ্রকার লীলাবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দান সম্ভব বলে মনে করতেন। কিন্তু তেজ বিকিরণ সম্পর্কেই একটা বিশিষ্ট ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পুরানো গতিবিজ্ঞানকে অপ্রত্যাশিতভাবে ঠেকে পড়তে হলো; আর তার ফল হলো এই যে, শক্তিসত্তার গঠন সম্পর্কে পুরানো মত বদলে গেল, জড়দ্রব্যের মত শক্তি-পদার্থেরও আণবিক গঠন স্বীকৃত হলো এবং আলোর গঠন সম্বন্ধে নিউটনের কণাবাদ আবার ফিরে এলো—যদিও কিছুটা ভিন্ন আকারে। এই পরিবর্তন ঘটলো, আমরা পূর্বেই বলেছি, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে (১৯০০ খৃষ্টাব্দে) জার্মান বৈজ্ঞানিক প্লাঙ্কের গবেষণা থেকে, আর এর ফলে বৈজ্ঞানিকের জগৎ চিত্র সহসা এক বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ অভিনব রূপ গ্রহণ করলো যা' ড্যালটন্‌ পরিকল্পিত পরমাণু জগতের চিত্রের তুলনায়ও বহুগুণে বৈচিত্র্যপূর্ণ। যে ব্যাপারের ব্যাখ্যাদান উপলক্ষে তেজ বিকিরণ প্রণালীতে ধারাবাহিকতার বদলে খাপছাড়াভাব আরোপ করার প্রয়োজন হলো সে হলো বিকিরিত রশ্মির বর্ণছত্রের (spectrum-এর) অন্তর্গত পর পর সজ্জিত

বর্ণগুলির ভেতর বিকিরিত শক্তির ভাগ বাঁটোয়ারার প্রণালী সম্পর্কে। কিন্তু ব্যাপারটা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে হলে কয়েকটা গোড়ার কথা জানা আবশ্যক। সুতরাং প্রথমতঃ আমরা ঐ কথাগুলিরই আলোচনা করবো।

দরজার ফাঁক দিয়ে সূর্যের সাদা আলো ঘরে ঢুকে সামনের দেয়ালে গিয়ে পড়েছে। এই আলোতে গলায় গলায় ভাব নিয়ে মিশে রয়েছে বিভিন্ন রঙের ঢেউ এবং এরা এগিয়ে চলেছে সবাই একই বেগে ও একই পথে। এই রশ্মিপথে একটা কাচের কলম রাখলে, ওর ভেতর ঢুকে, বিভিন্ন রঙের ঢেউগুলির বেগ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এবং ফলে ওরা বিভিন্ন মাত্রায় বেঁকে গিয়ে এবং এইরূপে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা পথে কাচের কলমটা থেকে বেরিয়ে আসে। এর ফলে হয় এই যে, সামনের দেয়ালে সাদা আলোর পরিবর্তে এখন দেখতে পাওয়া যায় রামধনুর মত একটি রঙিন চিত্রপট যার অন্তর্গত বর্ণগুলি (রক্ত, পীত, সবুজ, নীল, বেগুনি প্রভৃতি) পাশাপাশি হয়ে সেজে রয়েছে এবং অলক্ষ্যে প্রত্যেক রঙ পরেরটার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আবার প্রত্যেক বর্ণের ভেতর রয়েছে কড়ি কোমল ভেদে সহস্র রঙ। এক রক্তবর্ণের ভেতরই দেখা যায় কতনা রক্তিমার লাল রঙ —কেউ গাঢ় লাল, কেউ অপেক্ষাকৃত তরল বা ফিকে। এইরূপ অসংখ্য রঙের পর পর বিন্যাস। আবার রঙের এই সরু সরু ফালিগুলির প্রত্যেকটার সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে রয়েছে এক একটা বিশিষ্ট কম্পন সংখ্যার বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ।

আমরা এও জানি যে, এই রঙিন চিত্রপটের লাল প্রান্ত থেকে বেগুনি প্রান্তের দিকে এগিয়ে চললে রঙগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave-length) প্রতি ধাপে একটু করে কমে যায় এবং ওদের কম্পন-সংখ্যা (vibration frequency) ঐ অনুপাতে একটু করে বেড়ে যায়। একথাও আমাদের জানা আছে যে, বর্ণছত্রের এই দৃশ্যমান রাজ্য ছাড়িয়েও ওর উভয় দিকে বিস্তার লাভ করেছে ওরই দুটো অদৃশ্য অংশ যাদেরকে বলা যায় যথাক্রমে ওর লাল-উজানী ও অতি-বেগুনি (Infra-red এবং ultra-violet) প্রদেশ এবং যাদের ভেতর ঠিক একই ধারা অনুসরণ করে পর পর সেজে রয়েছে ক্রমবর্ধমান (বা বিপরীত দিক থেকে দেখলে ক্রমক্ষীয়মান) কম্পন-সংখ্যার অদৃশ্য রঙগুলি।

এখন বর্ণছত্রের দৃশ্যমান অংশের দিকে তাকালে খালি চোখেই আমরা দেখতে পাই যে, ওর ঔজ্জ্বল্য সকল স্থলে বা ছত্রের সকল রঙের পক্ষে সমান নয়। গোটা বর্ণছত্রটাকে যদি ওর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আড়ভাবে ফালি দিয়ে খুব সরু সরু অংশে ভাগ করে নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে যে, ওর এক ফালি বেগুনি রঙের তুলনায় এক ফালি হলদে রঙের ঔজ্জ্বল্য অনেকটা বেশি। এর থেকে বোঝা যায় যে, সূর্যের নৃত্যপরায়ণ অণু পরমাণুগুলি থেকে বিভিন্ন বর্ণের তরঙ্গগুলি যে শক্তিসম্ভার সঙ্গে নিয়ে আসে তা সকল তরঙ্গের পক্ষে সমান নয়, পরন্তু তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য ও কম্পন-সংখ্যা ভেদে, সুতরাং বর্ণছত্রে ওদের অবস্থান ভেদে বেশি কম হয়ে থাকে। প্রশ্ন এই, পরপর সজ্জিত এই সকল রঙের ভেতর—প্রত্যেক রঙের প্রত্যেক ফালির ভেতর—বিকিরিত শক্তির বিন্যাস ঘটে কি নিয়ম অনুসরণ করে? ছত্রের লাল-উজানী প্রান্ত থেকে অতিবেগুনি প্রান্তের দিকে যেতে রঙের ফালিগুলির কম্পন-সংখ্যা যে ক্রমাগত বেড়ে চলে এ আমাদের জানা আছে; কিন্তু কম্পন-সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিতে রঙগুলির তেজের মাত্রা ক্রমে বাড়তে থাকে, না ক্রমে কমতে থাকে, না খানিক দূর পর্যন্ত বেড়ে গিয়ে আবার ক্রমে কমে আসে? সংক্ষেপে বলতে গেলে রঙগুলির কম্পন-সংখ্যার সঙ্গে ওদের তেজের মাত্রার সম্বন্ধ কি, এই হলো প্রশ্ন।

বাইনু ও জীনস্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ পুরানো বিজ্ঞানের চিন্তাধারা অনুসরণ করে' এবং বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে এ প্রশ্নের উত্তরদানে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের গবেষণার ফল পরস্পরের সঙ্গে কিম্বা প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে মিললো না। বাইনের গণনাপ্রণালী থেকে প্রতিপন্ন হলো যে কম্পন-সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিতে বর্ণগুলির তেজের মাত্রা ক্রমে কমতে থাকবে, আর জীনস্ এবং র‍্যালের হিসাবের ফল হলো ঠিক তার উল্টা—কম্পন-সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে রঙগুলির তীব্রতা ক্রমে বেড়েই চলবে। অন্যপক্ষে সত্যকার অবস্থা হলো না-এটা, না-ওটা, অথচ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুটোর কোনোটাকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করার মতও নয়। সত্যকার অবস্থা আবিষ্কৃত হলো প্লাঙ্কের পরীক্ষা থেকে। তাঁর পরীক্ষা থেকে জানতে পারা গেল যে, কম্পন-সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিতে অর্থাৎ বর্ণছত্রের রঙের ফালিগুলি ধরে ক্রমাগত চড়া রঙের দিকে (বা ছত্রের অতি-বেগুনি প্রান্তের দিকে) অগ্রসর হতে থাকলে রঙগুলির তেজের মাত্রা প্রথমটা বাড়তে থাকে, কিন্তু একটা বিশিষ্ট কম্পন-সংখ্যার রঙের ফালিতে পেঁৗছে বৃহত্তম হয়ে দাঁড়ায় এবং তারপর থেকে আবার ক্রমে কমতে থাকে। যে নিয়মের নির্দেশ অনুসারে এই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তাও প্লাঙ্কের গবেষণা থেকে জানতে পারা গেল। এই নিয়ম অত্যন্ত জটিল এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। কেন এই উদ্ভট নিয়ম পুরানো বিজ্ঞানের চিন্তাধারা অনুসরণ করে তার উত্তর পাওয়া গেল না। প্লাঙ্কই সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণা ও পরীক্ষালব্ধ নিয়মটার একটা সঙ্গত ব্যাখ্যাদানে সক্ষম হলেন; কিন্তু এজন্য তাঁকে এই অভিনব কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল যে, শক্তি-পদার্থের আদান-প্রদান (বা তেজের শোষণ ও বিকিরণ)— ব্যাপারে ধারাবাহিকতার পরিবর্তে আরোপ করতে হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সসীম মাত্রায় গ্রহণ ও বিতরণের ভাব, যেমনটা ঘটে অর্থের আদান-প্রদান ব্যাপারে—যখন আমরা গোটা গোটা মুদ্রাখণ্ড (টাকা, পয়সা, সিকি, দুয়ানি প্রভৃতি) নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কারবারে লিপ্ত হই। মনে মনে অবশ্য আমরা একটা টাকা বা পয়সাকে বহু কোটি ভাগে, এমন কি অসংখ্য ভাগেও ভাগ করতে পারি, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে যেমন এই সকল কাল্পনিক মুদ্রা নিয়ে কারবার করা চলে না, কারবার করতে হয়, শত ক্ষুদ্র হলেও সসীম মুদ্রাখণ্ড নিয়েই, প্লাঙ্কের মতে শক্তির সরবরাহ ব্যাপারটাও সম্পন্ন হয়ে থাকে সেইরূপ; শত ক্ষুদ্র হলেও, সসীম শক্তি-কণার আদান-প্রদানের আকারে অথবা রাসায়নিক মিলন ও বিচ্ছেদ ব্যাপারে পরমাণুর চেয়ে কোন ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিত্ব যেমন কোন পাঠ গ্রহণ করতে পারে না শক্তি-পদার্থের আদানপ্রদানও সেইরূপ ওর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সসীম অংশের চেয়ে ক্ষুদ্রতর মাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে না। কেন পারে না সেই কথাই আমাদের বুঝতে হবে।

তার পূর্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ণছত্রে তেজবণ্টনের নিয়ম আবিষ্কার কল্পে প্লাঙ্ক যে বর্ণছত্র নিয়ে পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করেছিলেন তা সৌরবর্ণছত্র নয়, তা হলো যাকে বলা যেতে পারে, গহ্বর-কিরণ (Cavity radiation) সম্পর্কীয় বর্ণছত্র। গহ্বর-কিরণের খুঁটিনাটির কথা আমরা পরে তুলবো। এখানে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, গহ্বর-কিরণ-জাত বর্ণছত্র সৌর বর্ণছত্র থেকে কিছুটা ভিন্ন এবং অপেক্ষাকৃত সাধারণ প্রকৃতির। উভয় বর্ণছত্রে মোটামুটি মিল থাকলেও সম্পূর্ণ মিল নেই। পূর্বোক্ত উদাহরণে সহজ বর্ণনার অনুরোধে আমরা সৌরবর্ণছত্রের উল্লেখ করেছি, কিন্তু ছত্রের ভেতর শক্তি-বিন্যাসের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারের জন্য যে ধরণের বর্ণছত্র নিয়ে পরীক্ষা সম্পাদনের প্রয়োজন, তার গোটাকতক বিশেষত্ব থাকা দরকার। প্রথমতঃ বর্ণগুলির ছত্রের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বিন্যস্ত হবে। দ্বিতীয়ত ওর রঙের সাজের কোন রঙই বাদ যাবে না, কিম্বা ওর চিত্রপট সৃষ্টি করতে গিয়ে কোন রঙের রশ্মিরই কাচের কলমে ঢুকবার আগে পথেই অপঘাত মৃত্যু ঘটবে না। তৃতীয়তঃ বর্ণছত্রের গঠন বৈচিত্র্য রশ্মি বিকিরণকারী পদার্থের উপাদান নিরপেক্ষ হবে। সৌর-কিরণ-জাত বর্ণছত্র এই সকল বিশেষত্ব দাবী করতে পারে না। সৌর বর্ণছত্রের বর্ণ-সমাবেশ কেবল সূর্যের উষ্ণতার ওপরেই নয়, পরন্তু যে সকল মূল পদার্থের (হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, সোডিয়াম, লোহা, তামা প্রভৃতির) সমবায়ে সূর্যদেহ গঠিত হয়েছে, তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ওপরেও নির্ভর করে। অধিকন্তু সৌর বর্ণছত্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে সকল সরু সরু কালো রেখার অস্তিত্ব বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে, তা যেমন ঐ ছত্রের অন্তর্গত বর্ণসমূহের বিন্যাসে ধারাবাহিকতার অভাব জ্ঞাপন করে, সেইরূপ সূর্যদেহ নিঃসৃত বিভিন্ন রঙের রশ্মির ভেতর বিশেষ বিশেষ বর্ণের (বা বিশেষ বিশেষ কম্পন-সংখ্যার) আংশিক অভাবও নির্দেশ করে—যা ঘটেছে বলে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, সূর্যের বহিরাবণ স্বরূপ বায়ুমণ্ডল কর্তৃক ঐ সকল রঙের আংশিক শোষণের ফলে। আবার কেবল সৌর বর্ণছত্রে নয়, অন্যান্য উষ্ণ পদার্থের বর্ণছত্রেও এই সকল ত্রুটি অল্পাধিক মাত্রায় বিদ্যমান।

এই ত্রুটি অনেকটা এড়ানো যায়, যদি মসী-কৃষ্ণ উষ্ণপদার্থ নিঃসৃত কিরণমালা নিয়ে পরীক্ষা-কার্য সম্পন্ন করা যায়। আদর্শ কৃষ্ণ পদার্থের একটা বিশিষ্ট গুণ এই যে, এই সকল পদার্থ শোষণও করে যেমন সর্বপ্রকার কম্পন-সংখ্যার সকল রঙের ঢেউ, খুব গরম হলে বিকিরণও করে সেইরূপ, কোথাও কোন ফাঁক না রেখে, সকল কম্পন-সংখ্যার ও সকল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সবগুলি রঙ, যাদের তীব্রতা বা তেজের মাত্রা নির্ভর করে শুধু কৃষ্ণ পদার্থটার উষ্ণতার ওপর—ওর বস্তু বা উপাদানের ওপর আদৌ নয়। গরম অবস্থায় আদর্শ কৃষ্ণপদার্থ যে সকল রশ্মি বিকিরণ করে ইংরেজিতে তাদেরকে বলা হয় Black body radiation। আমরা ওকে বলবো 'কৃষ্ণ-কিরণ'।

কিন্তু খাঁটি কৃষ্ণ পদার্থ জগতে দুর্লভ, সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণকে এমন এক শ্রেণীর তাপালোক রশ্মি নিয়ে পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করতে হয়েছিল, যা সর্বতোভাবে কৃষ্ণ-কিরণের সমধর্মী অথচ যা উৎপাদনের জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয় না। একেই আমরা বলেছি গহ্বর-কিরণ। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই : একটা ফাঁপা গোলক। গোলকটা যে পদার্থেরই তৈরী হোক তাতে কিছু যায় আসে না। খুব গরম করলে এই গোলকটা তার অভ্যন্তরদেশে যে তেজ বিকিরণ করে, সেই আটকা পড়া তেজ-পুঞ্জকেই বলা যায় গহ্বর-কিরণ। যদি পরীক্ষায় এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, গোলকটার ভেতর থেকে বাইরে কিম্বা বাইরে থেকে

ভেতরে তাপ চলাচল করতে না পারে তবে গোলকের ভেতর তাপের শোষণ ও বিকিরণের ফলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থা হয় যে, তখন গোলকটার বিভিন্ন অংশের এবং ওর অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতা ঠিক সমান সমান হয়ে দাঁড়ায় এবং তারপর থেকে গোলকের অন্তর্গত কোন স্থানের উষ্ণতারই আর হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে না। ইচ্ছা হলে গোলকের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন উপাদানের নানা জড়দ্রব্য রাখা যেতে পারে কিম্বা ওর ভেতর তেজ-তরঙ্গবাহী ইথর ভিন্ন আর কিছু নাও থাকতে পারে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত উক্ত উষ্ণতা-সাম্যের অবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই অবস্থার গহ্বর-কিরণকে বলা যায় সাম্যাবস্থার গহ্বর-কিরণ এবং ওর উষ্ণতাকে বলা যায় সাম্যাবস্থার উষ্ণতা (equilibrium temperature)।

এখন এ সম্পর্কে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে (১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) প্রাউস্ট যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন তাও এখানে উল্লেখের প্রয়োজন। সাধারণের ধারণা এই যে, প্রথম প্রথম অর্থাৎ যখন তপ্ত গোলকটার অন্তর্গত বিভিন্ন পদার্থের উষ্ণতা অসমান থাকে এবং এই অবস্থায় ওদের পরস্পরের মধ্যে তাপের আদান প্রদানের (বা শোষণ ও বিকিরণের) ফলে ঠাণ্ডা জিনিসগুলি গরম ও গরম জিনিসগুলি ঠাণ্ডা হতে থাকে তখন শোষণ কার্যটা সম্পন্ন হয় শুধু ঠাণ্ডা পদার্থগুলি দ্বারা এবং গরম পদার্থগুলি করে শুধু বিকিরণ। প্রাউস্ট বললেন এ ধারণা ভুল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থ-হীন। সত্যকার অবস্থা এই যে, তখন গোলকের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থই যুগপৎ শোষণ ও বিকিরণ করতে থাকে; কিন্তু তখন ঠাণ্ডা জিনিস-গুলি শোষণ করে বেশী এবং বিকিরণ করে তার চেয়ে কম মাত্রায়, আর গরম জিনিসগুলি যে হারে শোষণ করে বিকিরণ করে তার চেয়ে বেশী মাত্রায়। তাই তখন ঠাণ্ডা জিনিসগুলি গরম এবং গরম জিনিসগুলি ঠাণ্ডা হতে থাকে। আবার এইরূপ ক্রিয়ার ফলে ঠাণ্ডা-গরম-ভেদ ঘুচে গিয়ে যখন গোলকটার অন্তর্গত সকল পদার্থই সমান উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় তখনও প্রত্যেকেই ওরা আগেকার মতই যুগপৎ শোষণ ও বিকিরণ করতে থাকে; কিন্তু তখন পদার্থ বিশেষ যে হারে যে যে রঙের রশ্মি বিকিরণ করে শোষণও করে ঠিক সেই হারে এবং সেই সেই রঙের রশ্মিই। এরি জন্য এই অবস্থায় গোলকের অন্তর্গত কোন পদার্থের বা কোন স্থানের উষ্ণতার আর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। মোটের ওপর গোলকের ভেতরকার সমগ্র প্রদেশটা তখন একটা স্থায়ী সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়—একটা উষ্ণতা-সাম্যের অবস্থা, অথচ যে অবস্থায় শোষণ বা বিকিরণ কার্যের বিন্দুমাত্র বিরাম নেই। এই হলো প্রাউস্টের মতে তেজের শোষণ ও বিকিরণ সম্পর্কে সাম্যাবস্থার চিত্র এবং আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ কল্পনারই আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

এই মতবাদ এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুমোদন করে যে, যে সকল বিভিন্ন রঙের রশ্মি নিয়ে সাম্যাবস্থার গহ্বর-কিরণ গঠিত হয়ে থাকে ঐ সকল বর্ণ বা ওদের কম্পন-সংখ্যার ভেতর ক্রম ভঙ্গ থাকবে না, পরন্তু তা হবে, যাকে বলা যেতে পারে সার্বিক কিরণ (full radiation); অধিকন্তু ঐ সকল বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে হারাহারি ভাবে তেজ বণ্টন ব্যাপারে রশ্মি বিকিরণকারী গোলকটার কিম্বা ওর অন্তর্গত পদার্থসমূহের আকৃতি, আয়তন বা উপাদানের কোন প্রভাব থাকবে না—প্রভাব থাকবে কেবল বর্ণগুলির কম্পন-সংখ্যা এবং ওদের সাম্যাবস্থার উষ্ণতার। বস্তুতঃ এইরূপ মতই প্রচার করে গেছেন প্লাঙ্কের গুরুস্থানীয় বৈজ্ঞানিক কির্কফ। এ সম্পর্কে কির্কফের নিয়মটাকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে—শূন্যগর্ভ কোন একটা তপ্ত ও বদ্ধপাত্রের অভ্যন্তর-দেশে ঐ পাত্র থেকে যে সকল তাপালোক রশ্মি বিকিরিত হয় উষ্ণতা সাম্যের অবস্থায় ঐ রশ্মি-পুঞ্জের গঠনোপাদান (রশ্মিগুলির কম্পন-সংখ্যা ও তেজের মাত্রা) ঐ পাত্রটার কিম্বা ওর অন্তর্গত কোন পদার্থের আকৃতি, আয়তন বা উপাদানের ওপর আদৌ নির্ভর করে না—নির্ভর করে শুধু ওদের সাধারণ উষ্ণতার ওপর। এই হলো সাম্যাবস্থার গহ্বর-কিরণের বিশেষত্ব। এরি জন্য বর্ণছত্রের বিভিন্ন রঙের ভেতর তেজ বণ্টনের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারের জন্য প্লাঙ্ক এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সূর্যকিরণের পরিবর্তে গহ্বর-কিরণের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। এ ছাড়াও গহ্বর-কিরণ নিয়ে পরীক্ষা করার পক্ষে যে বিশিষ্ট প্রয়োজনটা কারণ-রূপে উপস্থিত হয়েছিল তা এই যে, উক্ত তপ্ত পাত্রটার উষ্ণতা আমরা ইচ্ছামত কমাতে বাড়াতে পারি এবং এইরূপে বিভিন্ন উষ্ণতার গহ্বর-কিরণ-জাত বর্ণছত্রের মধ্যে তেজবণ্টনের নিয়ম পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার করতে পারি, কিন্তু সৌর-কিরণ-জাত বর্ণছত্রের পক্ষে একথা খাটে না।

মোটের ওপর আমাদের এইরূপ একটা চিত্র কল্পনা করতে হবে। তপ্ত গোলকটা থেকে ওর অভ্যন্তরস্থ ইথরীয় প্রদেশে বিভিন্ন বর্ণের রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে আবার ইথরীয় প্রদেশ থেকে গোলকটা নানা বর্ণের রশ্মি শোষণও করছে। এইরূপে জড় ও ইথরের মধ্যে শক্তির আদান-প্রদান হচ্ছে। গোলকটার অণু-পরমাণুগুলি সর্বশ্রেণীর কম্পন-গতি সম্পন্ন করছে—কেউ মৃদু কম্পন, কেউ দ্রুত কম্পন। কম্পনের প্রসার (amplitude) কারো বেশী, কারো কম। ফলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের, বিভিন্ন কম্পন-সংখ্যার ও বিভিন্ন শক্তিমাত্রার তরঙ্গসমূহ উৎপন্ন হচ্ছে। উষ্ণতা সাম্যের অবস্থায় গোলকের কোন একটা অণু বা পরমাণু যে বর্ণের (বা যে কম্পন-সংখ্যার) তেজ বিকিরণ করছে ঐ জড়-কণাটা শোষণও করছে ঠিক সেই বর্ণই এবং সেই হারেই। এইরূপে জড় ও ইথরের মধ্যে ঠিক সমান হারে প্রত্যেক বর্ণের রশ্মির শোষণ ও বিকিরণ হচ্ছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, উষ্ণতা সাম্যের অবস্থায় তপ্ত গোলকটার অণু পরমাণুগুলি যে সকল শক্তি-মাত্রা নিয়ে যে যে কম্পন-গতি সম্পন্ন করছে বিকিরিত কিরণসমূহের ভেতরেও সেই সকল শক্তি-মাত্রার সেই সেই কম্পন-গতিই বিভিন্ন রঙের রশ্মিরূপে মূর্ত হয়ে উঠছে। সুতরাং গহ্বর-কিরণের বর্ণসমূহের ভেতর তেজ বণ্টনের চিত্র গোলকটার বিভিন্ন পরমাণুর ভেতর শক্তি বণ্টনের চিত্রেরই প্রতিলিপি মাত্র। গোলকের অন্তর্গত মোট শক্তির মাত্রা সুরুতে যা ছিল এখনও তাই আছে; কিন্তু ঐ শক্তিটাই এখন জড় ও ইথরের মধ্যে এমনভাবে বিভক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যে, জড় ও ইথরের মধ্যে পূর্ণোদ্যমে শক্তির আদান প্রদান সত্ত্বেও উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি কোথাও ঘটছে না এবং গহ্বর-কিরণমালার গঠন-বৈচিত্র্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। আমরা এও দেখতে পাচ্ছি যে, যদি তপ্ত গোলকটার বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে শক্তি বণ্টনের সাধারণ নিয়ম জানতে পারা যায় তবে তার থেকে বিকিরিত রশ্মিসমূহের বিভিন্ন রঙের মধ্যেও তেজ বণ্টনের সাধারণ নিয়মটা জানা যাবে।

পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য পূর্বোক্ত তপ্ত গোলকটার গায়ে সরু একটা ছিদ্র করতে হয় এবং তার ভেতর দিয়ে যে সকল বিভিন্ন রঙের রশ্মি দল বেঁধে বেরিয়ে আসে কাচের কলমের সাহায্যে তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্ণছত্রের আকারে ছড়িয়ে নিতে হয়। তারপর ঐ ছত্রের অন্তর্গত রঙের সরু সরু ফালিগুলির তেজের মাত্রা বিশিষ্ট ধরণের তেজমাপক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করতে হয়। এই পরীক্ষা কেবল ছত্রটার দৃশ্যমান অংশেই নয়, ওর লাল-উজানী এবং অতি-বেগনি প্রদেশেও সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষার ফল এই যে, উষ্ণতা-সাম্যের অবস্থায় এই রঙের ফালি-গুলির তেজের মাত্রা নির্ভর করে প্রথমতঃ ঐ উষ্ণতার ওপর এবং দ্বিতীয়তঃ ওদের কম্পন-সংখ্যার ওপর। আরো দেখা যায় যে, সাম্যাবস্থার উষ্ণতা যাই হোক না কেন কম্পন-সংখ্যার ক্রম-বৃদ্ধিতে প্রথম প্রথম বর্ণগুলির তেজের মাত্রা বাড়তে থাকে; কিন্তু একটা বিশিষ্ট রঙ (বা বিশিষ্ট কম্পন-সংখ্যা) ছাড়িয়ে যেতে আবার ক্রমে কমতে থাকে। যে নিয়ম অনুসারে এই হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে প্লাঙ্কের পরীক্ষা থেকে তা ঠিকমত আবিষ্কৃত হলো। এই নিয়ম নির্দেশক সূত্রটা অত্যন্ত জটিল; সুতরাং সাধারণতঃ একটা রেখা-চিত্রের সাহায্যে এই নিয়মের অর্থ ও আকারটাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। আমরাও এখানে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করবো।

পার্শ্বের (ক) চিহ্নিত চিত্রে যে বাঁকা রেখা-গুলি দেখা যাচ্ছে তা বিভিন্ন উষ্ণতার পক্ষে, বর্ণ-ছত্রের প্রত্যেক রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘের সঙ্গে (সুতরাং
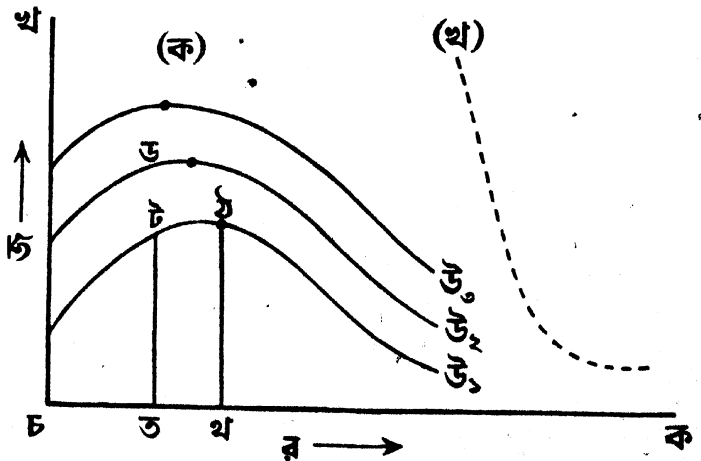
ওর কম্পন-সংখ্যার সঙ্গেও) ওর তেজের মাত্রার সম্বন্ধ নির্দেশ করছে। এদেরকে আমরা বলবো তেজ-তরঙ্গ রেখা (Intensity-wave length curve)—এক একটা উষ্ণতার পক্ষে এক একটা রেখা। এই চিত্রে পরস্পরের লম্বভাবে অবস্থিত 'চক ও 'চথ রেখাদ্বয় যথাক্রমে বর্ণগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও তেজের পরিমাণ দেখিয়ে দিচ্ছে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেড়ে চলেছে, বুঝতে হবে, 'র চিহ্নিত শর-রেখা বরাবর, আর তেজের মাত্রা বাড়ছে 'জ চিহ্নিত শর-রেখাক্রমে। চিত্রের অন্তর্গত কোন একটা বাঁকা রেখা ধরে ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকলে প্রত্যেক ধাপে যেমন 'চক' দিকে একটু করে সেইরূপ 'চথ' দিকেও একটু করে এগোতে হয়। 'চক' দিকে (বা 'র' শরচিহ্ন ক্রমে) এগোনোর অর্থ বর্ণ-ছত্রের ক্রমবর্ধমান তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (বা ক্রমক্ষীয়মান কম্পন-সংখ্যার) অভিমুখে অগ্রসর হওয়া আর 'চথ' দিকে (বা 'জ' শরচিহ্ন ক্রমে) অগ্রসর হওয়ার অর্থ প্রতি ধাপে ক্রমবর্ধমান তেজের মাত্রার সাক্ষাৎ পাওয়া। চিত্রের অন্তর্গত কোন একটা বক্ররেখার কোন একটা বিন্দু থেকে 'চক' রেখার ওপর একটা লম্ব টানলে—যেমন সর্বনিম্ন রেখাটার 'ট' বিন্দু থেকে 'টত' লম্ব টানলে—ঐ বিন্দুটার যে পাদদ্বয় ('চত' ও 'তট') পাওয়া যায় ওরাই যথাক্রমে বর্ণ-বিশেষের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও তেজের মাত্রা নির্দেশ করে বলে বুঝতে হবে। একথা প্রত্যেক বক্ররেখার প্রত্যেক বিন্দু সম্পর্কেই খাটে। বিভিন্ন উষ্ণতার পক্ষে বিভিন্ন রেখা; কিন্তু প্রত্যেকটা রেখাই, ওর বিশিষ্ট উষ্ণতার পক্ষে, বর্ণছত্রের প্রত্যেকটা রঙের (বা রঙের ফালির) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ওর তেজের মাত্রার সম্বন্ধ জ্ঞাপন করছে এবং তা করছে ওর বাঁকবার ধরণ বা চেহারার ভেতর দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সর্বনিম্ন উষ্ণতার পক্ষে যে বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 'চত' তার তেজের মাত্রা 'তট'; কিন্তু যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 'চথ' তার তেজের মাত্রা 'থঠ' পরিমিত। এইরূপ প্রত্যেক উষ্ণতার প্রত্যেক বর্ণের পক্ষে।

চিত্র থেকে দেখা যায় যে, সবগুলি বক্ররেখার চেহারা প্রায় একই প্রকারের। এর থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন রঙের ভেতর তেজ বণ্টনের প্রণালী উষ্ণতা ভেদে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন হলেও মোটের ওপর প্রায় একই প্রকারের। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্রমবৃদ্ধিতে তেজের মাত্রা প্রথমটা বেড়ে গিয়ে আবার ক্রমে কমে আসতে থাকে। তবু সকল উষ্ণতার পক্ষে ঠিক এক নিয়মে নয়। কারণ (ক) চিত্র থেকে দেখা যায় যে, উষ্ণতা বেশী হলে প্রত্যেক রঙের (বা প্রত্যেক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তেজের মাত্রা খানিকটা করে বেড়ে যায়—যেমন সর্বনিম্ন উষ্ণতার পক্ষে যে রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 'চত' এবং তেজের মাত্রা 'তট' পরিমিত তার পরের ধাপের উষ্ণতার পক্ষে সেই রঙ ও সেই আকারের তরঙ্গেরই তেজের মাত্রা 'তড' পরিমিত বা অপেক্ষাকৃত বেশী, অথচ ঠিক উষ্ণতার অনুপাতে বেশী নয়। চিত্র থেকে এও দেখা যাবে যে, উক্ত বক্ররেখাসমূহের শীর্ষ বিন্দুগুলি—যা বিভিন্ন উষ্ণতার পক্ষে বৃহত্তম তেজের মাত্রা নির্দেশ করে—উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে একটু করে বাঁদিকে সরে যাচ্ছে এবং তার দ্বারা উষ্ণতার সঙ্গে তেজের মাত্রার সম্বন্ধটা যে ঠিক সমানুপাতের সম্বন্ধ নয় তার ইঙ্গিত দান করছে। এইরূপে সকল উষ্ণতার ও সর্বশ্রেণীর তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে প্লাঙ্ক যে গাণিতিক সূত্র রচনা করলেন তাই হলো গহ্বর-কিরণ-জাত বর্ণছত্রের পর পর সজ্জিত বর্ণসমূহের মধ্যে তেজ বণ্টনের নিয়ম নির্দেশক সূত্র।

কিন্তু কোন নিয়মেরই একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না, বিশেষতঃ নিয়মটা যদি—যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে—জটিল ও অপ্রত্যাশিত হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ক্রম বৃদ্ধিতে (বা কম্পনসংখ্যার ক্রমিক হ্রাসে) বর্ণ-গুলির তেজের মাত্রা বাড়তে বাড়তে আবার কমে কেন, উষ্ণতা ভেদে এই হ্রাস বৃদ্ধির ধরণ আবার কতকটা খাপছাড়া ভাবে বদলে যায় কেন, এ সকল প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু আমরা প্রথমেই বলেছি যে, পুরানো বিজ্ঞানের চিন্তাধারা অনুসরণ করে এর উত্তর পাওয়া যায়নি। প্লাঙ্কই সর্বপ্রথম তাঁর পরীক্ষালব্ধ নিয়মটার একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা-দানে সক্ষম হয়েছিলেন, আর তার জন্য তাঁকে পুরানো বিজ্ঞানের কোন কোন মতবাদ সংশোধন করে নিতে হয়েছিল এবং তা ছাড়াও এই অভিনব মত প্রচার করতে হয়েছিল যে, তেজের শোষণ ও বিকিরণ ব্যাপারে ধারাবাহিকতার পরিবর্তে আরোপ করতে হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সসীম মাত্রায় আদান প্রদানের ভাব, অথবা টাকাকড়ির লেন দেনের মত যেন থেকে থেকে ও গণে গণে নেওয়া দেওয়ার ভাব।

পুরানো মতের সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছিল কেন সেই কথাই আমরা প্রথমে বলবো। গহ্বর-কিরণের সাম্যাবস্থার চিত্রটা আবার কল্পনা করা যাক্। তপ্ত গোলকের কম্পমান পরমাণুগুলি গোলকের অন্তর্গত ইথরীয় প্রদেশে তেজ বিকিরণ করছে। জড়-পরমাণুগুলি যা দিচ্ছে ইথর কণাগুলি তাই নিচ্ছে আবার ইথর-কণাগুলির দানও জড়-পরমাণুগুলি শোষণ করছে। আদান-প্রদান উভয় শ্রেণীর কণার দলের মধ্যেই হচ্ছে এবং হচ্ছে ঠিক সমান হারে। তাই যেমন জড়-পরমাণুর সমাজে সেইরূপ ইথর-কণার সমাজেও এসে পড়েছে একটা স্থায়ী সাম্যাবস্থা—একটা শক্তি সাম্যের অবস্থা। মোটের ওপর যা দেখা যায় তা হলো শক্তির আদান-প্রদানকার্যে রত খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু'দল কণা, যার একদল হলো জড়-পরমাণু এবং অপর দল ইথর-কণা। পরমাণুগুলির তুলনায় ইথর-কণাগুলি খুবই ক্ষুদ্র সন্দেহ নেই; কিন্তু উভয় দলের মধ্যে এখন শক্তির ভাগ বাঁটোয়ারা ঘটেছে এমন স্থায়ী রূপ নিয়ে যে, এই ভাগাভাগির চিত্রটাই আমাদের কাছে এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে—কণাগুলির কে ছোট, কে বড় বা কোনটা ইথর-কণা, কোনটা জড়-কণা তা আমাদের নজরে পড়ছে না। এই কণা-গুলি কেউ বা ঘুরছে, কেউ কাঁপছে, কেউ বা সোজাসুজি ধাবন-গতি সম্পন্ন করছে। কেউ স্বাধীন-ভাবে ছুটতে পারে শুধু একটা দিকে, কেউ পারে দু'দিকে, কেউ বা পারে সম্মুখ-পশ্চাৎ, ডাহিন-বাম ও ঊর্ধ্বাধঃ এই তিন দিক ধরেই; আর এই দিকত্রয়ই হলো আমাদের ত্রিপাদ দেশের অন্তর্গত তিনটা স্বাধীন বা পরস্পর-নিরপেক্ষ দিক। ঘূর্ণন গতি সম্বন্ধেও ঐ কথা। কেউ ঘুরতে পারে এই রেখা-ত্রয়ের মাত্র একটাকে বেষ্টন করে, কেউ পারে দুটা বা তিনটা রেখাকেই অক্ষ-রেখা (Axis) রূপে গ্রহণ করে। এই সকল চঞ্চল কণা যুগপৎ স্থিতি ও গতিশক্তির আধার; কিন্তু ওদের সমগ্র শক্তিটাই আবার ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে সবগুলি চঞ্চল কণার সবগুলি স্বাধীন গতির* মধ্যে। যখন সাম্যাবস্থা ঘটে তখন এই সকল স্বাধীন গতির মধ্যে মোট শক্তির ভাগ বাঁটোয়ারা সম্পন্ন হয় কি নিয়ম অনুসরণ করে তাই এখন আমাদের দেখতে হবে।

পুরানো গতিবিজ্ঞান এ সম্বন্ধে যে নিয়ম মেনে নিয়েছিল তা হলো বোলটজম্যান-প্রচারিত শক্তির সমবণ্টনের নিয়ম (equipartition principle of Energy)। এই নিয়মের নির্দেশ এইরূপঃ যখন রকমারি গতিসম্পন্ন কতকগুলি চঞ্চল কণা—কণাগুলি আকারে, উপাদানে বা বস্তুমানে পরস্পরের সমান হোক বা না হোক—নিজেদের মধ্যে ঠোকা-ঠুকি বা অন্য কোনরূপ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত একটা গতি-সাম্যের ও উষ্ণতা-সাম্যের অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন কণাগুলির মোট শক্তি ওদের বিভিন্ন স্বাধীন গতির মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক ভাগের শক্তির মাত্রা সাম্যাবস্থার উষ্ণতার সমানুপাতিক হয়ে থাকে; অর্থাৎ সাম্যাবস্থার উষ্ণতাকে যদি 'উ' বলা যায়, তবে প্রত্যেকটা স্বাধীন গতির ভাগে শক্তির মাত্রা দাঁড়ায় গিয়ে (ক×উ) পরিমিত—যেখানে 'ক' হলো কণাগুলির আকৃতি, আয়তন ও বস্তু নিরপেক্ষ একটা নির্দিষ্ট রাশি। এই বিশিষ্ট রাশিটাকে বলা যায় বোলটজ্ম্যানের ধ্রুবক (Boltzman's Constant)।

এই নিয়ম এই তথ্য জ্ঞাপন করে যে, সাম্যা-বস্থার চঞ্চল কণাগুলির মধ্যে শক্তির ভাগবাঁটোয়ারা ব্যাপারে ওদের আয়তন বা বস্তুর কোন প্রভাব নেই, ওরা জড়কণা না ইথর-কণা সে প্রশ্নও ওঠে না। বাঁটোয়ারার ধরণটা নির্ভর করে শুধু সাম্যাবস্থার উষ্ণতার ওপর এবং কণাগুলির স্বাধীন গতির সংখ্যার ওপর। যে শ্রেণীর কণার স্বাধীন গতির সংখ্যা বেশী তাদের ভাগে শক্তির মাত্রাও সেই অনুপাতে বেশী হয়ে থাকে; কারণ উক্ত নিয়ম অনুসারে সব-গুলি স্বাধীন গতির পক্ষেই শক্তির মাত্রা সমান এবং প্রত্যেকের পক্ষেই (ক×উ) পরিমিত। এই হলো পুরানো বিজ্ঞানের মতে, বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন প্রকৃতির চঞ্চল কণার মধ্যে, শক্তি-সাম্যের অবস্থায় শক্তি বণ্টনের চিত্র। এই চিত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, এরই ছাপ পড়ছে গিয়ে গহ্বর-কিরণ-রাজির অন্তর্গত বর্ণসমূহের ভেতর—ওদের পরস্পরের মধ্যে তেজ বণ্টন ব্যাপারে।

এখন গহ্বর-কিরণ সম্পর্কে এই নিয়ম প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, যে সকল জড়-কণা (অণু ও পরমাণু) নিয়ে তপ্ত গোলকটার জড়দেহ গঠিত হয়েছে, তারা খুব ক্ষুদ্র হলেও অসীম ক্ষুদ্র নয়। অন্যপক্ষে, গহ্বর-কিরণের লীলাভূমি ইথর-কণাগুলির ক্ষুদ্রতার অন্ত নেই। এজন্য জড়-পরমাণুদের তুলনায় ইথর-কণাগুলির সংখ্যা এবং ফলে ওদের স্বাধীন-গতির সংখ্যাও বহু কোটি গুণে বেশী—এত বেশী যে তার ইয়ত্তা নেই। সুতরাং বোলট্জ্ম্যানের নিয়ম মেনে নিলে আমাদের বলতে হয় যে, জড় ও ইথরের মধ্যে মোট শক্তির ভাগাভাগিতে ইথরের ভাগেই পড়বে সিংহের অংশ এবং জড়ের ভাগে পড়বে বলতে গেলে—শূন্য। এর অর্থ এই যে, শক্তিহীন হয়ে শেষ পর্যন্ত গোলকটা এত ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে যে, ওর উষ্ণতাকে তখন নির্দেশ করার প্রয়োজন হবে শূন্য অঙ্ক দ্বারা। কিন্তু এ হোলো সত্যকার অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। শেষ পর্যন্ত

---

* কোন একটা কণার স্থিতি ও গতির অবস্থা নির্দেশের জন্য কতকগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ পরিমাপের প্রয়োজন। এদের সংখ্যা দ্বারা কণাটার স্বাধীন গতির সংখ্যা (degrees of freedom) নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। একটি মাত্র কণার ধাবন বা কম্পন গতির পক্ষে স্বাধীন গতির সংখ্যা হলো ৩; কারণ, কোনরূপ বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন না হতে হলে আমাদের ত্রিধা বিস্তৃত দেশের ভেতর কণাটা তিনটা পরস্পর-নিরপেক্ষ দিকে উক্ত গতি সম্পন্ন করতে পারে। কণার সংখ্যা বেশী হলে ওদের মোট স্বাধীন গতির সংখ্যা ঐ অনুপাতে বেড়ে যায়; আবার কোন কণাকে আটকে ধরলে বা ওর চলবার পথে বাধা সৃষ্টি করলে ওর স্বাধীন গতির সংখ্যা কমে যায়।

শক্তির মাত্রা কিম্বা উষ্ণতার মাত্রা—কি গোলকটার জড়দেহে, কি ওর অভ্যন্তরস্থ ইথরীয় প্রদেশে—একেবারে শূন্য হতে পারে না এবং হয়ও না।

কিন্তু এইরূপ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েও সহসা বৈজ্ঞানিকগণ পুরাতন চিন্তাপ্রণালী ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। তাঁরা কল্পনা করলেন ইথর-কণাগুলি অসংখ্য হলেও ওদের স্বাধীন গতির সংখ্যা অসংখ্য নয়, পরন্তু জড়-পরমাণুদের স্বাধীন গতির সংখ্যার সংগে তুলনীয়। তাঁরা যুক্তি তুললেন যে, গহ্বর-কিরণের অন্তর্গত তাপালোকের তরঙ্গগুলি যখন গোলকটার ভেতরকার দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, তখন এই প্রতিফলিত তরঙ্গশ্রেণীর সংগে সম্মুখগামী তরংগগুলির যে ঠোকাঠুকি বা কাটাকাটি (Interference) ঘটে, তাতে করে গোলকের ভেতর কতকগুলি বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের ও বিশিষ্ট কম্পন-সংখ্যার তরংগই—যাদেরকে বলা যায় স্থিরতরঙ্গ (Stationary waves)—স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম হয়। এইরূপ স্থির তরঙ্গ, আমরা জানি পুকুরের জলেও সৃষ্টি হয়ে থাকে যখন জলের ভেতর ক্রমাগত কলসী দোলানো যায় এবং তার ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন দিকগামী তরঙ্গগুলির সংগে তীর থেকে প্রতিফলিত তরংগসমূহের ক্রমাগত মেলামেশা ও ঠোকাঠুকি হতে থাকে। এর ফল হয় এই যে, নির্দিষ্ট কম্পন-সংখ্যার ও নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কতকগুলি বিশিষ্ট তরঙ্গমূর্তিই জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। এইরূপ বিচার প্রণালী অবলম্বনে হিসাব করে তপ্ত গোলকটার অন্তর্গত বদ্ধ তরংগগুলির, তথা ইথর-কণাগুলির স্বাধীন গতির সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা গেল। কিন্তু হিসাবে দেখা গেল যে, সীমাবদ্ধ হলেও এই সকল স্বাধীন গতি ইথরীয় প্রদেশের সর্বত্র সমভাবে বিন্যস্ত হয় না, পরন্তু তরঙ্গগুলির কম্পন-সংখ্যা ভেদে (বা বর্ণভেদে) ঐ সকল কম্পন সংখ্যার বর্গের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। এর অর্থ এই যে, ইথরীয় প্রদেশের যে স্থানে তরংগবিশেষের (বা বর্ণবিশেষের) কম্পন-সংখ্যা 'ন', সেখানে এক পরিমিত এক টুকরা আয়তনের ভেতর স্বাধীন গতির সংখ্যা হবে (খ × $ন^3$)—যেখানে 'খ' হলো একটা নির্দিষ্ট রাশি। 'খ' এর মূল্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে শুধু ইথর-তরঙ্গগুলির নির্দিষ্ট বেগের দ্বারা—যার মাত্রা হলো সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ।

এইরূপে গহ্বর-কিরণের অন্তর্গত প্রত্যেক তরঙ্গ-মূর্তির সংগে সুতরাং ওর বর্ণছত্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটা রঙের ফালির সংগে সংশ্লিষ্ট স্বাধীন গতির সংখ্যা সীমাবদ্ধ হল এবং ওর মূল্যও জানতে পারা গেল। আবার বোলট্‌জম্যানের নিয়ম থেকে আমরা দেখতে পাই যে, উষ্ণতা-সাম্যের অবস্থায় প্রত্যেকটা স্বাধীন গতির সংগে গ্রথিত হয়ে রয়েছে (ক × উ) পরিমিত শক্তি মাত্রা। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, বর্ণছত্রের যে স্থানটায় বর্ণবিশেষের কম্পন-সংখ্যা 'ন' পরিমিত, সেখানকার এক পরিমিত এক টুকরা আয়তনের ভেতর যতটা শক্তি বিন্যস্ত হবে, তার পরিমাণ হবে উক্ত রাশিদ্বয়ের গুণ ফলের সমান। সুতরাং ঐ শক্তি বা তেজের মাত্রাকে যদি 'জ' বলা যায়, তবে আমরা লিখতে পারি :

জ = (ক × খ) উ × $ন^3$ .....(১)

এই হলো গহ্বর-কিরণ-জাত বর্ণছত্রের পর পর সজ্জিত বর্ণসমূহের মধ্যে তেজ বণ্টনের প্রণালী সম্পর্কে জীনস্‌ ও র‍্যালের সূত্র এবং এই সূত্রে পাওয়া গেল, আমরা দেখলাম, পুরানো যুগের চিন্তাধারা পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করে—শক্তি-পদার্থের গঠনে ও বিকিরণ-প্রণালীতে ধারাবাহিকতা আরোপ করে এবং শক্তির আধারস্বরূপ চঞ্চল কণাগুলির বিভিন্ন গতিমূর্তির মধ্যে শক্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা ব্যাপারে বোলট্‌জম্যানের সমবণ্টনের নিয়ম প্রয়োগ করে।

উক্ত সূত্রের নির্দেশ এই যে, বর্ণছত্রের প্রত্যেক বর্ণের তেজের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ঐ বর্ণটার কম্পন-সংখ্যা (ন) এবং গহ্বর-কিরণরাজির উষ্ণতা (উ) দ্বারা। একটা বিশিষ্ট উষ্ণতার পক্ষে—ঐ উষ্ণতা যাই হোক না কেন—বিভিন্ন বর্ণের তেজের মাত্রা, ওদের কম্পন-সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিতে ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে এবং বাড়বে কম্পন-সংখ্যার বর্গের অনুপাতে—সুতরাং বেশ বড় বড় ধাপে। এর অর্থ এই যে, বর্ণছত্রের লাল-উজানী প্রান্ত থেকে অতি বেগনি প্রান্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পর পর যে সকল রঙের ফালি পার হয়ে যেতে হবে তাদের তেজের মাত্রা—(খ) চিত্রের নির্দেশ অনুসারে ক্রমে বেড়েই চলবে এবং শেষ পর্যন্ত অসীম হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ও এই চিত্রের সংগে (ক) চিত্রের বা প্রকৃত অবস্থার আদৌ মিল নেই; অথবা অপেক্ষাকৃত সত্য কথা এই যে, বর্ণছত্রের লাল-উজানী প্রান্তের দিকে উভয় চিত্রের কিছুটা দূর পর্যন্ত মিল থাকলেও বাকি সমগ্র অংশের পক্ষে পরস্পরের মধ্যে মিল নেই। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পুরানো বিজ্ঞানের যুক্তিপ্রণালী অনুসরণ করে ইথরীয় প্রদেশের অন্তর্গত স্বাধীন গতির সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও তার ফলে যে সূত্রটা পাওয়া যায়, তাকে বর্ণছত্রে তেজ বণ্টনের নিয়ম নির্দেশক নির্ভুল সূত্ররূপে গ্রহণ করা যায় না।

আবার পুরানো বিজ্ঞান অনুসরণ করেই কিন্তু ভিন্ন দিক থেকে বিচার করে বাইন যে সূত্র গঠন করলেন, তার নির্দেশ হলো জীনসের সিদ্ধান্তের বিপরীত—অর্থাৎ কম্পন-সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিতে বর্ণগুলির তেজের মাত্রা বেড়ে না গিয়ে ক্রমে কমতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত শূন্যে পরিণত হবে। সুতরাং এই সূত্রদ্বয়ের কোনটাই বাস্তব অবস্থা জ্ঞাপনে সক্ষম হলো না। তবু উভয় সূত্রেই কিছুটা সত্য রয়েছে এও আমাদের মানতে হয়। কারণ, জীনসের সূত্র এবং তার প্রতীকস্বরূপ (খ) চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রতম শক্তি মাত্রার সাক্ষাৎ পাবার কথা বর্ণছত্রের লাল-উজানী প্রান্তের দিকে, যেখানে বর্ণগুলির কম্পন সংখ্যা ('ন'এর মূল্য) খুবই কম। আর বাইনের সূত্র জানালো যে তা ঘটবে ছত্রের অতিবেগনি প্রান্তের দিকে, যেখানে বর্ণগুলির কম্পন-সংখ্যা খুবই বেশী। (ক) চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এই উক্তি দ্বয়ের উভয়ই প্রকৃত অবস্থার সংগে মিলে যাচ্ছে। কিন্তু বৃহত্তম শক্তিমাত্রার অবস্থান সম্পর্কে এই সূত্রদ্বয়ের কোনটার সিদ্ধান্তই ঠিক নয়, পরন্তু পূর্ণমাত্রায় বেঠিক। সত্যকার অবস্থা এই যে, বৃহত্তম শক্তিমাত্রাটা অসীম হবে না, হবে সসীম এবং তার স্থান নির্দিষ্ট হবে—(ক) চিত্রের নির্দেশ অনুযায়ী—বর্ণছত্রের উভয় প্রান্তের মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায়।

এর থেকে বোঝা গেল যে, জীনস্‌ ও বাইনের সূত্রের কোনটারই প্রকৃত অবস্থার সংগে আগাগোড়া মিল না থাকলেও উভয়ের মধ্যেই কিছুটা সত্য নিহিত রয়েছে এবং নির্ভুল সূত্র হবে তাই, যা উভয় সূত্রকে কুক্ষিগত করেই বর্ণছত্রের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত সত্যকার তেজবণ্টন প্রণালীর ব্যাখ্যাদানে সক্ষম হয়। একই সূত্র অথচ ওকে জীনসের সূত্রের সংগে মিলে যেতে হবে বর্ণছত্রের লাল-উজানী প্রান্তের দিকে এবং বাইনের সূত্রের আকার ধারণ করতে হবে ওর অতি-বেগনি প্রান্তে। সহজেই বোঝা যায় যে, সূত্রটা হবে অত্যন্ত জটিল এবং তা গড়ে উঠবে কোন নূতন কল্পনাকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করে। এইরূপ সূত্র গঠনই সম্ভব হয়েছিল প্লাঙ্কের গবেষণা থেকে, কিন্তু আমরা বহুবারই বলেছি, এজন্য তাঁকে শক্তির গঠন ও আদান-প্রদান সম্পর্কে অভিনব চিন্তাপ্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। কি করে তার ফলে (ক) চিত্রের অনুযায়ী নির্ভুল সূত্র গঠন সম্ভব হয়েছিল, সূক্ষ্ম হিসাবের গাণিতিক খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে, অতঃপর তার একটা মোটামুটি আভাস দিতে আমরা চেষ্টা করবো। এজন্য যে যুক্তিপ্রণালী অনুসরণ করার প্রয়োজন সংক্ষেপে তা নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে:—

যদিও জড় ও ইথরের মধ্যে তাপালোকরূপে শক্তির আদান-প্রদান ব্যাপারে পুরানো বিজ্ঞানের কোন কোন সিদ্ধান্ত আমাদের মেনে নিতে হয়—মানতে হয় যে, উষ্ণতা সাম্যের অবস্থায় তপ্ত গোলকটার কম্পমান পরমাণুদের মধ্যে এবং বিকিরিত রশ্মিসমূহের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে শক্তির ভাগ বাটোয়ারা ঘটে একই নিয়ম অনুসরণ করে এবং এই বাটোয়ারার চিত্র দ্বয়ের একটা অপরটার প্রতিচ্ছায়া মাত্র, তবু একথাও স্বীকার্য যে, পুরানো বিজ্ঞানের চিন্তাপ্রণালীর ভেতর কোথাও না কোথাও গলদ রয়েছে; কারণ, অন্যথায় জীনস্‌ ও বাইনের সূত্রের সংগে প্রকৃত অবস্থার একটা গরমিল ঘটতো না। হয় শক্তি সরবরাহ প্রণালীর পুরাতন চিত্রটা কিম্বা চঞ্চল কণাগুলির বিভিন্ন গতিমূর্তির মধ্যে শক্তির সমবণ্টনের নিয়মটা অথবা কোনটাই সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সুতরাং যদি পুরানো চিন্তা প্রণালী ত্যাগ করে নিম্নোক্ত অনুমানগুলির আশ্রয় গ্রহণ করা যায় যে :

(১) যখন জড় ও ইথরের মধ্যে তাপালোকরূপে শক্তির আদান-প্রদান (শোষণ ও বিকিরণ) হতে থাকে তখন ব্যাপার দুটা ঘটে ধারাবাহিকভাবে নয় পরন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সসীম শক্তি-কণার শোষণ ও বর্ষণের আকারে;

(২) দ্বিতীয়তঃ যদি আনুষঙ্গিকভাবে এও অনুমান করা যায় যে, এই সকল শক্তি কণার শক্তির মাত্রা সকল কণার পক্ষে সমান নয়, পরন্তু বিকিরিত রশ্মিগুলির বর্ণ বা কম্পন সংখ্যা ভেদে বদলে যায় এবং ঐ সকল কম্পন সংখ্যার সমানুপাতিক হয়ে থাকে; অর্থাৎ যে বর্ণের কম্পন সংখ্যা বেশী তার সংগে সংশ্লিষ্ট শক্তিকণাটার শক্তিমাত্রাও সেই অনুপাতে বেশী হয়ে থাকে;

(৩) অধিকন্তু যদি প্রমাণ করা যায় যে, যখন গোলকটার ভেতর, ওর কম্পমান পরমাণুগুলি থেকে, উক্ত প্রণালীতে বিকিরণ ঘটে তখন গহ্বর কিরণসমূহের মধ্যে বিকিরিত শক্তিকণাগুলির মোট শক্তির ভাগ বাটোয়ারা ব্যাপারে বোলটজম্যানের সমবণ্টনের নিয়ম (প্রত্যেকটা স্বাধীন গতির ভাগে (ক × উ) পরিমিত শক্তি বিন্যাসের নিয়ম) খাটে না, পরন্তু তা সম্পন্ন হয়ে থাকে একটা ভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করে—যার নির্দেশ এই যে, বিন্যস্ত শক্তির মাত্রা সবগুলি স্বাধীন গতির পক্ষে সমান নয় এবং কারুর পক্ষে (ক × উ) পরিমিতও নয়; আর তা কেবল গহ্বর-কিরণরাজির উষ্ণতার ওপরেই নির্ভর করে না, পরন্তু বিকিরিত রশ্মিগুলির বর্ণ বা কম্পন সংখ্যার ওপরেও নির্ভর করে এবং ফলে বর্ণ হতে বর্ণান্তরে যেতে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে বদলে যায়;

তবেই জীনস্‌ ও বাইনের সূত্র দুটার অন্তর্গত আংশিক সত্যকে মেনে নিয়েই বর্ণছত্রের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তি বিন্যাসের নিয়মটার একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা দান সম্ভব হতে পারে।

কারণ তাহলে আমরা—উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় অনুমান অনুসরণ করে'—বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন মাত্রার শক্তি-কণাগুলিকে, বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রার (যেমন—পয়সা, টাকা, গিনি প্রভৃতির) সঙ্গে তুলনা করতে পারি এবং গোলকটার কম্পমান পরমাণুগুলিকে—যারা শক্তি-সরবরাহ ব্যাপারের অধিনায়ক এবং ঐ সকল ছোট বড় মুদ্রাখণ্ডের মূলে মালিক তাদেরকে—তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করে' নিতে পারি। এদেরকে বলা যেতে পারে যথাক্রমে পয়সার কারবারী গরীব শ্রেণী, টাকার কারবারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং গিনির কারবারী ধনিক শ্রেণী। গরীব শ্রেণীর পরমাণুরা লেন দেন করে শুধু পয়সা বা ক্ষুদ্রতম শক্তিমাত্রা নিয়ে। সুতরাং উক্ত দ্বিতীয় অনুমান অনুসারে ওরা বিকিরণ এবং শোষণও করে খুব মৃদু কম্পনের (বা বৃহত্তম দৈর্ঘ্যের) তরঙ্গগুলি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কারবার শুধু টাকা বা মাঝারি মাত্রার শক্তি-কণা নিয়ে সুতরাং এদের বিকিরণ ও শোষণকার্য সম্পন্ন হয় মাঝারি কম্পন-সংখ্যার ও মাঝারি আকারের তরঙ্গসমূহের মাধ্যমে। আর গিনির মালিক ধনিক শ্রেণীর পরমাণুরা টাকা বা পয়সা স্পর্শই করে না। টাকা পয়সা এদের ঘাড়ে উড়ে আসতে পারে, কিন্তু জুড়ে বসতে পারেনা,—পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সুতরাং গিনির মালিক হয়েও এদের একটা বা দুটো পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই। গিনিই হলো এদের সমাজের ক্ষুদ্রতম মুদ্রা—মূল্যে বা শক্তির আদান প্রদানের ক্ষুদ্রতম মাপকাঠি। বিজ্ঞানের ভাষায়, এরা হলো বৃহত্তম শক্তি-কণার কারবারী। এরা বিকিরণ এবং শোষণও করে' থাকে বৃহত্তম কম্পন-সংখ্যার খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি; কারণ দ্বিতীয় অনুমানের এই হলো নির্দেশ।

এখন শোষণের কথা বাদ দিয়ে শুধু বিকিরণের চিত্রটাই ফুটিয়ে তোলা যাক। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, গরম গোলকটার অণুপরমাণুগুলি বিভিন্ন কম্পন-সংখ্যার, বিচিত্র ভঙ্গীর ও বিভিন্ন মাত্রার কম্পন-গতি সম্পন্ন করছে—কেউ খুব ধীরে ধীরে, কেউ অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে, কেউ খুবই তাড়াতাড়ি। এর ফলে গোলকটার ভেতর মোটের ওপর তিন শ্রেণীর তরঙ্গ বা তিন শ্রেণীর রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে—(১) মৃদু-কম্পন-জাত ক্ষুদ্রতম শক্তিমাত্রার বড় বড় তরঙ্গগুলি (২) মাঝারি কম্পন-সংখ্যার সুতরাং মাঝারি-শক্তিমাত্রার মাঝারি আকারের তরঙ্গনিচয় এবং (৩) বৃহত্তম কম্পন-সংখ্যার সুতরাং বৃহত্তম শক্তিমাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্মিমালা। আর এই বিকিরণ ঘটে যথাক্রমে গরীব শ্রেণীর, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং ধনিক শ্রেণীর পরমাণুদের শক্তির ভাণ্ডার থেকে। আবার এই বিভিন্ন আকারের তরঙ্গের দল যখন কাচের কলমে বিশ্লিষ্ট হয়ে পেখম মেলে আত্মপ্রকাশ করে, তখন ঐ বর্ণছত্রের বিভিন্ন রঙের ভেতরেই পর পর লিখিত হতে থাকে—এই তিন শ্রেণীর তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা এবং প্রত্যেক কম্পন-সংখ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শক্তি-মাত্রার সঠিক বিবরণ—যার প্রত্যেকটাই আমরা প্রথমেই বলেছি, উপযুক্ত যন্ত্রযোগে মেপে বের করা যায়।

সহসা মনে হতে পারে যে, ক্ষুদ্রতম শক্তি-মাত্রাগুলি বিন্যস্ত হবে বর্ণছত্রের লাল-উজানী প্রান্তে, যেখানে বর্ণগুলির কম্পন-সংখ্যা খুবই কম; কারণ তাহলো ক্ষুদ্রতম কম্পন-সংখ্যার গরীব পরমাণুদের দানের ফল,—যারা দান করে খুব কৃপণ হস্তে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-কণাগুলি; আর বৃহত্তম শক্তি-মাত্রাগুলি লিখিত হবে ছত্রের অতি-বেগনি প্রান্তে যেখানে বর্ণগুলির কম্পন-সংখ্যা খুব বেশী, কারণ তাহলো বৃহত্তম কম্পন-সংখ্যার ধনী পরমাণুদের দানের ফল, যাদের দানের মাপকাঠি বেশ বড় বড় বা বৃহত্তম শক্তি মূল্যের শক্তি-কণাগুলি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুদ্রতম শক্তি-মাত্রাগুলি বিন্যস্ত হয় বর্ণছত্রের উভয় প্রান্তেই এবং বৃহত্তম শক্তি-মাত্রার স্থান হয় মাঝামাঝি একটা জায়গায় যেখানকার বর্ণগুলির কম্পন-সংখ্যা খুব বেশীও নয় খুব কমও নয়, এবং যা নির্দেশ করে মাঝারি কম্পন-সংখ্যার মধ্যবিত্ত পরমাণুদের দানের ফল, অর্থাৎ যাদের দানের মাপকাঠি খুব ছোটও নয়, খুব বড়ও নয়।

কেন এমন হয়? এর উত্তর এই যে, শক্তি বিকিরণকারী পরমাণুদের দানের মাপকাঠি যেমন বিবেচনার বিষয় সেইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর পরমাণুদের সংখ্যা-বলও আমাদের তুলনা করতে হবে এবং গড়-কষা গণিতের সাহায্য গ্রহণে, প্রত্যেক শ্রেণীর গড় দানের মাত্রা হিসাব করতে হবে। এখন গরীব শ্রেণীর সঙ্গে ধনিক শ্রেণীর তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, গরীব শ্রেণীর পরমাণুদের সংখ্যা-বল খুবই বেশী, কিন্তু ওদের প্রত্যেকেরই দানের ক্ষমতা অত্যন্ত কম—নেই বললেই চলে। সুতরাং দলে ভারী হলেও ওদের গড়-পড়তা দানের মাত্রা হবে নগণ্য। ফলে বর্ণছত্ররূপ দানের তালিকায় এদের দানের মাত্রা (বা বিকিরিত শক্তির মাত্রা) লিখিত হবে ছত্রটার লাল-উজানী প্রান্তের দিকে, অর্থাৎ (ক) চিত্রের অন্তর্গত 'চক' রেখাটার 'ক' প্রান্তের দিকে—যেখানে বর্ণগুলির কম্পন-সংখ্যা খুবই কম। এর জন্য বর্ণছত্রের লাল-উজানী প্রান্তের রঙের ফালিগুলির মধ্যে যে সকল শক্তি-মাত্রা তেজ মাপক যন্ত্রে ধরা পড়ে তা এত সামান্য যে পরিমাপ করাই কঠিন।

অন্য পক্ষে ধনিক শ্রেণীর পরমাণুদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, এরা অর্জন করে যেমন মোটা মোটা শক্তি মাত্রা বিতরণও করে সেইরূপ দরাজ হাতে। কিন্তু হ'লে কি হয়, সংখ্যায় এই শ্রেণীর পরমাণু গরীব শ্রেণীর তুলনায় এবং এমন কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায়ও নগণ্য। বস্তুতঃ সংখ্যা বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে আমাদের এইরূপই সিদ্ধান্ত করতে হয়। ফলে দরাজ হাতে দান করেও ধনী পরমাণুদের গড়পড়তা দানের মাত্রা হবে গরীব শ্রেণীর দানের মতই নগণ্য। কিন্তু এই সকল বৃহত্তম শক্তিমাত্রার শক্তিকণাগুলির কম্পনসংখ্যা খুব বেশী বলে ওদের এই নগণ্য দানটিই লিখিত হবে বর্ণছত্রের অতি-বেগনি প্রান্তের দিকে, যেখানটায় বৃহত্তম কম্পন-সংখ্যার বর্ণগুলির স্থান হবার কথা। মোটের উপর বর্ণছত্রের কি লাল-উজানী প্রান্তে, কি অতি-বেগনি প্রান্তে একটা মোটা রকমের দানের অঙ্ক লিখিত হবে না; পরন্তু (ক) চিত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক উষ্ণতার পক্ষেই বৃহত্তম শক্তি মাত্রা চিহ্নিত হবে বর্ণছত্রের মাঝামাঝি কোন একটা স্থানে—যেখানে বর্ণগুলির কম্পন-সংখ্যা মাঝামাঝি মাত্রায় এবং যে স্থানটা শক্তির যোগান পাচ্ছে মধ্যবিত্ত অবস্থার পরমাণুর সমাজ থেকে যাদের সংখ্যা-বল খুব বেশী না হ'লেও নিতান্ত সামান্য নয় এবং যাদের দানের হাত খুব বড় হ'লেও তুচ্ছ করার মত নয়। এই ধরণের যুক্তিপ্রণালী আশ্রয় করেই প্লাঙ্কের পক্ষে গহ্বর-কিরণ-জাত বর্ণছত্রে তেজ বণ্টন প্রণালীর ব্যাখ্যা দান এবং তদনুযায়ী সূত্র গঠন সম্ভব হয়েছিল।

এই আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, বর্ণছত্রের বিভিন্ন রঙের ভেতর শক্তি বিন্যাসের প্রণালীটাকে আমরা আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ প্রণালীর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আমাদের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে যেমন গরীবদের অর্থ দ্বারা নয়—তাদের লোক-বল বেশী হ'লেও দানের ক্ষমতা নিতান্ত নগণ্য ব'লে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর অর্থ দ্বারাও নয়—ওদের দানের মাপকাঠি খুব বড় হ'লেও সংখ্যায় ওরা নগণ্য ব'লে; পরন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থ দ্বারা, যাদের লোক-বল এবং অর্থ-বল কোনটাই নগণ্য নয়, সেইরূপ গহ্বর কিরণ-জাত আদর্শ বর্ণছত্রের রঙের সাজের ভেতরেও বৃহত্তম শক্তি-মাত্রার বর্ণগুলি ওদের শক্তিসম্ভার 'আহরণ ক'রে থাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরমাণুদের শক্তিভাণ্ডার থেকে যাদের কম্পন-সংখ্যা খুব বেশীও নয়, খুব কমও নয় এবং যাদের প্রতি বিকিরণে বিতরণের মাপকাঠিও তুচ্ছ করার মত নয়। এরই জন্য বর্ণছত্রে বৃহত্তম শক্তি-মাত্রাগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, না—ওর লাল-উজানী, না—ওর অতি-বেগনি প্রান্তে, পরন্তু মাঝামাঝি একটা জায়গায় যেখানে শুধু মাঝারি কম্পন-সংখ্যার ও মাঝারি আকারের তরঙ্গগুলিরই স্থান হ'তে পারে।

এইরূপে বর্ণছত্রে শক্তি-বিন্যাস-প্রণালীর একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, ছত্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে বর্ণগুলির তেজের মাত্রা খানিকদূর পর্যন্ত বেড়ে গিয়ে আবার কমে আসে কেন তা বোঝা গেল, যে নিয়মে এই হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে তার মূল সূত্র (যাকে বলা যায় 'প্লাঙ্কের সূত্র') আবিষ্কৃত হলো, এবং যে সকল রেখা-চিত্রের সাহায্যে এই সূত্রটাকে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা যায় তা অঙ্কিত হলো। কিন্তু সকলেরই মূলে রয়েছে, আমরা দেখলাম, এক অভিনব ও বিরাট পরিকল্পনা। শক্তি-সত্তার গঠন সম্বন্ধে পুরানো মত ত্যাগ করে' শক্তির রূপ-কল্পনায় আমাদেরকে জড়ের গঠনের অনুরূপ ক্রম-ভঙ্গের চিত্র অঙ্কিত করতে হবে অথবা শক্তির শোষণ ও বিকিরণ ব্যাপার দুটোতে অন্ততঃ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সসীম মাত্রায় থেকে থেকে গ্রহণ ও থেকে থেকে বিতরণের ভাব আরোপ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে, সমগ্র জগৎ-যন্ত্রের ক্ষুদে চাকাগুলি চলছে যেন এক একটা ঝাঁকানি দিয়ে বা ভেক-লম্ফনের মত ছোট ছোট ধাপে লাফিয়ে লাফিয়ে। এই ধরণের বহু কল্পনাকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে এবং শক্তির ভাগবাটোয়ারা ব্যাপারে সমবণ্টনের নিয়মটাকে বাতিল করে' এবং তৎ-পরিবর্তে একটা নূতন নিয়ম প্রবর্তন করে' প্লাঙ্কের পক্ষে উক্ত জটিল নিয়ম আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু প্লাঙ্কের গবেষণার ফল কেবল একটা মাত্র বিচ্ছিন্ন ব্যাপারের ব্যাখ্যাদানেই সীমাবদ্ধ হয়নি পরন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে' ক্ষুদ্রের চালচলন সম্পর্কীয় ব্যাপারে, প্লাঙ্কের মতবাদ যথেষ্ট আলোকপাতে সমর্থ হয়েছে। সেকথা আমরা অন্যত্র বলবো। বর্তমানে এই মতবাদের মূল কথাগুলি গোটাকত নিয়ম বা সূত্রের আকারে প্রকাশ করা সঙ্গত হবে; যথা :

(১) যখন কোন জড়-পরমাণু (বা জড়দ্রব্য) তাপ ও আলোকরশ্মি রূপে বা অন্য কোন আকারে তেজ বিকিরণ (বা শোষণ) করতে থাকে তখন এই ব্যাপার দু'টো সম্পন্ন হয় একটানা বা ধারাবাহিক-ভাবে নয় পরন্তু পরম্পরাবিচ্ছিন্ন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-কণার বর্ষণের (বা শোষণের) আকারে—অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা যারা খুব ক্ষুদ্র হলেও সসীম এবং যাদের চেয়ে ক্ষুদ্রতর শক্তি-মাত্রা শক্তির আদান প্রদান ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ করতে পারেনা। এইরূপ অবিভাজ্য শক্তি-কণাগুলিকে বলা

যায় শক্তির 'কোয়াণ্টাম'। রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে যে পার্ট গ্রহণ করে জড়-পরমাণু, শক্তির আদান প্রদান ব্যাপারে সেই ধরণের পার্টই সম্পন্ন করে থাকে শক্তির কোয়াণ্টামগুলি।

(২) কোন একটা জড়কণা এক বা একাধিক পূর্ণসংখ্যক কোয়াণ্টাম বিকিরণ ও শোষণ করতে পারে কিন্তু কোন কোয়াণ্টামের কোন ভগ্নাংশ (আধা কোয়াণ্টাম, সিকি কোয়াণ্টাম, দেড় কোয়াণ্টাম প্রভৃতি) বিকিরণও করতে পারেনা শোষণও করতে পারেনা।

(৩) বিভিন্ন মূল পদার্থের (হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতির) পরমাণুগুলির ওজন যেমন ভিন্ন হয়ে থাকে সেইরূপ বিভিন্ন মূল রঙের (রক্ত, পীত, নীল প্রভৃতির) কোয়াণ্টামগুলির শক্তি-মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে কিন্তু একই বর্ণের সকল কোয়াণ্টামেরই শক্তির মাত্রা সমান সমান হয়ে থাকে।

(৪) যে রঙের কম্পন-সংখ্যা বেশী তার কোয়াণ্টামগুলির শক্তি-মাত্রাও সেই অনুপাতে বেশী হয়ে থাকে। বেগুনি রঙের কম্পন-সংখ্যা লাল রঙের কম্পন-সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ, সুতরাং এই নিয়ম অনুসারে বেগুনি কোয়াণ্টামগুলির শক্তি-মাত্রাও লাল কোয়াণ্টামের* শক্তি-মাত্রার প্রায় দ্বিগুণ। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, যদি বর্ণ বিশেষের কম্পন-সংখ্যাকে 'ন' দ্বারা এবং ওর কোন একটা কোয়াণ্টামের শক্তি-মাত্রাকে 'শ' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা যায় তবে আমরা লিখতে পারি ঃ

$$শ = প \times ন \text{..................} (২)$$

এই সূত্রের অন্তর্গত 'প' হলো একটা নির্দিষ্ট রাশি। এই সূত্র এই তথ্য প্রকাশ করে যে, কোয়াণ্টামটার শক্তি-মাত্রা (শ) এবং কম্পন-সংখ্যা (ন) যাই হোক না কেন ওদের অনুপাতটা সর্বদা একই মূল্য জ্ঞাপন করে থাকে, এই মূল্য সসীম এবং 'প' হলো তারই প্রতীক। এও বুঝতে হবে যে, কোয়াণ্টামটা তাপ-রশ্মি, আলোক-রশ্মি বা রঞ্জন-রশ্মির কোয়াণ্টাম হোক কিম্বা যে স্থানে ও যে ভাবেই ওর আবির্ভাব ঘটুক ওর শক্তি এবং ওর কাঁপুনির মধ্যে একটা বিশিষ্ট অনুপাতের মর্যাদা বজায় রেখেই ওকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। এই নির্দিষ্ট অনুপাতকে ('প'কে) বলা যায় প্লাঙ্কের ধ্রুবক (Planck's Constant)।

এই গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবকের মাপকাঠির সঙ্গেও আমাদের কিছুটা পরিচয় স্থাপনের দরকার। এজন্য ২নং সমীকরণটাকে আমরা একটু ভিন্ন আকারে প্রকাশ করবো। এই সূত্রের অন্তর্গত 'ন' রাশিটা কম্পন-সংখ্যা নির্দেশ করে, কিন্তু আমরা জানি, কম্পন-গতিমাত্রেরই যেমন একটা বিশিষ্ট কম্পন-সংখ্যা রয়েছে সেইরূপ একটা কম্পন-কালও রয়েছে। কম্পন-সংখ্যাটা আমাদের জানিয়ে দেয় প্রতি সেকেণ্ডে কতবার কম্পন ঘটছে এবং কম্পন-কালটা বলে দেয় প্রতি কম্পনে কত সেকেণ্ড সময় লাগছে সুতরাং ওদের একটাকে উল্টে দিলেই অপরটার মূল্য পাওয়া যায়। এর থেকে দেখা যায় যে, যে কোয়াণ্টামের কম্পন-সংখ্যা 'ন' তার কম্পন-কালকে 'গ' বললে ২নং সমীকরণের 'ন' স্থানে আমরা (১÷গ) লিখতে পারি এবং ফলে ঐ সমীকরণটাকে নিম্নোক্ত আকারেও প্রকাশ করতে পারি ঃ

$$শ \times গ = প \text{..............} (৩)$$

এই সূত্র থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে 'প'এর মাপকাঠি নির্দিষ্ট হবে শক্তি এবং কালের ('শ' ও 'গ'এর) গুণ ফল দ্বারা। ফরাসী পরিমাপ প্রণালীতে শক্তির মাপকাঠিকে বলা হয় 'আর্গ' এবং কালের মাপকাঠি হলো সেকেণ্ড। সুতরাং যে মাপকাঠিতে 'প'এর মূল্য নিরূপিত হবে তার নাম হবে 'আর্গ-সেকেণ্ড'। প্লাঙ্ক এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার ফল মিলিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে যে, ফরাসী মাপকাঠিতে 'প'এর সঠিক মূল্য হলো $৬\cdot৫৫ \times ১০^{-২৭}$ আর্গ-সেকেণ্ড—একটা খুব ক্ষুদ্র রাশি সন্দেহ নেই, তবু সসীম। এই অতি ক্ষুদ্র রাশিটাকে ক্রিয়ার পরমাণুও (Atom of Action) বলা হয়। কোয়াণ্টাম বা শক্তির পরমাণুর সঙ্গে ক্রিয়ার পরমাণুর পার্থক্য রয়েছে। কোয়াণ্টাম (বা 'শ') হলো শক্তি-স্তরের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং তা শক্তির কম্পন-সংখ্যা ভেদে বদলে যায় এবং ক্রিয়ার পরমাণু (প) হলো শক্তি ও কালের গুণ ফলটা যে সত্তা নির্দেশ করে তার ক্ষুদ্রতম মাপকাঠি এবং তা শক্তির মূর্তিভেদে কিম্বা কম্পন-সংখ্যা ভেদে বদলায় না। সর্বপ্রকার জাগতিক পরিবর্তনে শক্তির লীলাবৈচিত্র্য নানা রঙে ও নানা ঢংয়ে প্রতি মুহূর্তে আমাদের নয়ন সমক্ষে মূর্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে যে কর্মতৎপরতা তাই হলো জাগতিক পরিবর্তন মাত্রেরই একটা সাধারণ রূপ; আর ক্রিয়ার পরমাণু (প) হলো তারই সাধারণ মাপকাঠি। এই অতি ক্ষুদ্র রাশিটার ক্ষুদ্র অথচ সসীম মূল্যই বৈজ্ঞানিকের জগৎ-চিত্রকে একটা অপ্রত্যাশিত ও সম্পূর্ণ নূতন আকার দানের জন্য পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

২নং সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, যদি 'প'-এর মূল্য সসীম না হয়ে অসীম ক্ষুদ্র অর্থাৎ একেবারে শূন্য পরিমিত হতো তবে যে কোন কম্পন সংখ্যার বা যে কোন বর্ণেরই কোয়াণ্টাম হোক, ওর শক্তি মূল্যও ('শ'এর মূল্য) হতো শূন্য পরিমিত। এরূপ ক্ষেত্রে পর পর মুহূর্তে বিকিরিত কোয়াণ্টামগুলির ক্ষুদ্রতার কোন সীমা পরিসীমা থাকতো না অর্থাৎ শক্তির বিকিরণ ঘটতো ধারাবাহিকভাবে। পুরোনো বিজ্ঞান এইরূপ দাবীই জানিয়ে এসেছে এবং তার জন্য শক্তির সমর্থনের নিয়মটাও এ যাবৎ আমল পেয়ে এসেছে। প্লাঙ্কের গবেষণা 'প' রাশিটাকে (ক্রিয়ার পরমাণুকে) সসীমতা দান করে বিরামহীন ধারায় শক্তির নির্গমন অসম্ভব প্রতিপন্ন করলো এবং এইরূপে জাগতিক ঘটনাসমূহের পারম্পর্যে একটা খাপছাড়া ভাব এবং কার্য-কারণ শৃঙ্খলের বন্ধনে একটা শিথিলতা এনে ফেললো—একটা অনিশ্চয়তার ভাব যা স্পষ্ট করে কিছু জানাতে চায় না এবং যেটুকু জানায় তা হলো ঘটনা বিশেষের ঘটা বা না-ঘটা সম্বন্ধে একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত মাত্র। এই মতবাদ এও আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, জগৎ যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে—কি সৌরজগতে, কি নক্ষত্র জগতে—সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে একই মাত্রার ও একই প্রকৃতির ক্রিয়া-পরমাণু বা একই ঢংএর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার ভাব; আর এর জন্যই আমাদের বুঝতে হবে, জড় জগৎ থেকে শক্তিক্ষয় ব্যাপারটা মহাসমারোহে সম্পন্ন হতে পারছে না এবং 'শেষের সে দিনের' আগমনটাও অপেক্ষাকৃত ধীরে সুস্থেই সম্পন্ন হতে পারছে।

পূর্বোক্ত বিচার প্রণালী থেকে এও দেখা যাবে যে, কেবল বর্ণচত্রে শক্তি বিন্যাসের নিয়মের ব্যাখ্যা-দানের জন্য বস্তুতঃ শক্তি পদার্থে আণবিক গঠন আরোপ করার প্রয়োজন হয় না—প্রয়োজন হয় শুধু শক্তির শোষণ ও বিকিরণ ব্যাপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সসীম মাত্রায় আদান প্রদানের ভাব স্বীকার করা। এমনও হতে পারে যে, যে শক্তিটা শোষণ ও বিকিরণের সময় পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে আহৃত ও নির্গত হয়, তাই আবার তার অব্যবহিত পর মুহূর্তেই বিচ্ছিন্ন কণাসমূহকে সংহত করে এবং ওদের পৃথক ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন করে ক্রমভঙ্গহীন একাকার রূপ ধারণ করে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যে শক্তি শোষণ ও বিকিরণ ব্যাপারে কণামূর্তি ধারণ করে তাই আবার ইথরের ভেতর দিয়ে দূরদেশে সঞ্চালিত হবার সময় অগ্রসর হতে থাকে ক্রমভঙ্গহীন তরঙ্গ মূর্তিতে। বস্তুতঃ বহু বৈজ্ঞানিক এইরূপ মতই পোষণ করে থাকেন এবং এর অনুকূলে তাঁরা যুক্তি দেখান এই যে, শক্তি সঞ্চালন ব্যাপারে ধারাবাহিকতা কিম্বা হাইগেনস্ পরিকল্পিত তরঙ্গবাদ স্বীকার না করলে আলোর নিবর্তন, ব্যাবর্তন (Interference, Diffraction) প্রভৃতি ব্যাপারের একটা সঙ্গত ব্যাখ্যাদান সম্ভব বা সহজ হয় না। আলোতে আলোতে কাটাকাটির ফলেই এ সকল ব্যাপার ঘটে, কিন্তু এজন্য আলোর রশ্মিগুলিকে অগ্রসর হবার প্রয়োজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতগুলি কোয়াণ্টামের প্রবাহের আকারে নয় পরন্তু একটানা তরঙ্গ-প্রবাহের ক্রমভঙ্গহীন মূর্তি নিয়ে। অন্য পক্ষে আইনস্টাইন বিকিরিত শক্তিতেও আণবিক গঠন আরোপ করার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি আলোর কোয়াণ্টাম সম্বন্ধে যে মতবাদ (Light-Quantum theory) প্রচার করলেন তাতে এই মত ব্যক্ত হলো যে, বিকিরিত শক্তিকেও অন্ততঃ আলোক রশ্মিরূপে বিকিরিত শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্তি কণার সমষ্টিরূপে। বিভিন্ন রঙের আলোর পক্ষে বিভিন্ন মাত্রার শক্তিকণা, যাদের কম্পন-সংখ্যা প্লাঙ্কের নিয়ম (২নং সমীকরণ) অনুসারে ঐ সকল শক্তি মাত্রার সমানুপাতিক হয়ে থাকে। এই সকল শক্তিকণা বা আলোর কোয়াণ্টামগুলি একটা বিশিষ্ট নাম গ্রহণ করেছে ফোটন। বিকিরিত আলোর শক্তিতে আণবিক গঠন আরোপ করার পক্ষে যে ব্যাপারটি বিশিষ্ট কারণরূপে উপস্থিত হয়েছিল তা হলো ফটো-তড়িৎ (Photo-electricity) সম্পর্কীয় ব্যাপার। এর দ্বারা প্লাঙ্কের মতবাদের মূল কথাগুলি বিশেষ সমর্থন লাভ করলো। এ ছাড়াও যে দুটো বিশিষ্ট ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে প্লাঙ্কের মতবাদকে সমর্থন করলো তার একটা হলো কঠিন পদার্থের পারমাণবিক তাপ (Atomic heat) সম্পর্কীয় এবং অপরটা হলো, যাকে বলা যায়, গ্যাসের অবনয়ন (degeneration of gases)।

---

* বেগুনি বা লাল কোয়াণ্টাম বলতে বুঝতে হবে বেগুনি বা লাল রঙের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোয়াণ্টাম।

(৪৮৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মনে স্থান লইতে পারে নাই। আদর্শ চরিত্রের জন্য জীবনবাবুকে শ্রদ্ধা আমরা সকলেই জানাইতে বাধ্য। দরদ ও সহানুভূতিতে হৃদয় এঁর পূর্ণ। অনলস কর্মশক্তি দিয়া ভগবান এঁকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কারাজীবন-যাপনে এর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছে। জীবন-বাবুকে যদি নাম দিতে হয়, তবে আশুতোষ বা ভোলানাথ নামই তাঁহার উপযুক্ত। অল্পেই ইনি সন্তুষ্ট এবং স্বভাবে ইনি বৈরাগী।

(ক্রমশ)

ভারতের খসড়া শাসন পদ্ধতি

শ্রী নির্মল ভট্টাচার্য

প্রদেশের সহিত কেন্দ্রের সম্বন্ধ

খসড়া শাসন পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম বাঙলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি গবর্ণর-শাসিত কতকগুলি প্রদেশ; আজমীর, মাড়োয়ারা, কুর্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং মহীশূর, ভূপাল, কাশ্মীর, বরোদা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য নিয়ে গঠিত হবে। অর্থাৎ এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রাংশের সংযোগে ভারতের নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি হবে। খসড়া শাসনপদ্ধতি অনুসারে এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রাংশগুলি কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কে গ্রথিত থাকবে। এই পার্থক্যের ঐতিহাসিক কারণ আছে। সেই কারণ অনুসন্ধান কর্তে হ'লে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন হবে।

গবর্ণর-শাসিত বর্তমান প্রদেশগুলি ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ ক'রেছিল। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় এই অংশগুলিকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছিল। আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভারত সরকার প্রদেশের কাজে মোটামুটিভাবে হস্তক্ষেপ করেন নি। প্রদেশগুলিতে অনেকটা পরিমাণ দায়িত্বমূলক শাসনপদ্ধতিও প্রবর্তিত হ'য়েছিল। তাই মন্ত্রিমণ্ডলী ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশের ভোটে পদত্যাগ করতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু চীফ কমিশনার-শাসিত ছোট ছোট প্রদেশগুলি অর্থাৎ আজমীর-মাড়োয়ারা ও কুর্গ, শুধু যে আয়তনে ক্ষুদ্র তা নয়; তাদের শাসন ক্ষমতাও ছিল সংকীর্ণ। গবর্ণর জেনারেলের নির্দেশ অনুযায়ী চীফ কমিশনারগণ এই শ্রেণীর ছোট ছোট প্রদেশগুলির শাসনতন্ত্র পরিচালনা করে এসেছেন।

আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় রাজন্যবর্গের দ্বারাই শাসিত হ'য়েছে। দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার হাতে দেশীয় রাজন্যবর্গ শাসনভার ছেড়ে দেন নি, তাদের স্বাধিকার ও আত্মকর্তৃত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন। বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্যে খুব বেশি হস্তক্ষেপ করেন নি; কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদের তাগিদ ও প্রয়োজন মাফিক মাঝে মাঝে ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রেছেন মাত্র।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বৃটিশ আমলে, আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা ও কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, গভর্নর-শাসিত প্রদেশ, চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির ভিতর একটা প্রকৃতিগত বিভেদ বর্তমান ছিল। এই ঐতিহাসিক কারণেই এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রাংশগুলিকে নবগঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পৃথক পৃথক শাসনক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব করা হ'য়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, সুইটজারল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রসমূহে সকল রাষ্ট্রাংশগুলিকেই সমান ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছে; তাদের শাসনব্যবস্থাও একই প্রকারের এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সকল অংশগুলিই একই সম্বন্ধে আবদ্ধ। রাশিয়াতে অবস্থা ভেদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগুলি বিভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী। ইউনিয়ন রিপাবলিক বা যুক্তরাষ্ট্রাংশ; অটনমাস রিপাবলিক বা স্বায়ত্তশাসনমূলক রাষ্ট্রাংশ; অটনমাস রিজিয়নস্ বা স্বায়ত্তশাসনমূলক অঞ্চল ও ন্যাশনাল এরিয়া বা জাতিমূলক অঞ্চল—এই চার প্রকারের প্রদেশ নিয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হ'য়েছে। রাশিয়াতে উল্লিখিত চার শ্রেণীর রাষ্ট্রাংশ (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর অংশের ন্যায়), কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বিভিন্ন সূত্রে গ্রথিত।

গভর্নর-শাসিত প্রদেশ ও চীফ কমিশনার-শাসিত ছোট ছোট প্রদেশগুলি বৃটিশ ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেগুলি যে ভারতীয় ইউনিয়নের অংশীভূত হ'য়েছে তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশীয় রাজন্যবর্গ-শাসিত ছোট-বড় অনেক রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশীভূত হ'তে স্বীকৃত হ'য়েছে এবং দেশরক্ষা, চলাচল ও বৈদেশিক সম্বন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শাসন মেনে নিতে প্রস্তুত হ'য়েছে। আবার কতকগুলি দেশীয় রাজ্য নিজেদের সত্তার সম্পূর্ণভাবে বিলোপসাধন ক'রে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হ'য়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে ভারতের বর্তমান মন্ত্রিসভার কৃতিত্ব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

গঠনপদ্ধতির দিক থেকে দেখতে গেলে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রাংশগুলিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত ক'রলে খুব সুবিধা হয় কারণ তাদের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরস্পর থেকে বিভিন্ন। কিন্তু শাসনতন্ত্রের খসড়ায় সবগুলিকেই ষ্টেট বা রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা হ'য়েছে। খসড়ার প্রথম তপশীলে তিনটি বিভিন্ন দফায় বিভিন্ন শ্রেণীর রাষ্ট্রাংশগুলির তালিকা দেওয়া হ'য়েছে। কোন একটি শ্রেণীর রাষ্ট্রকে উল্লেখ করতে হ'লে তপশীল ও দফা উল্লেখ করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। এর দ্বারা কোন লাভ হয় না অথচ জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রথম তপশীলের প্রথম দফায় মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিম বাঙলা, সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার, পূর্বপাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ-বেরার, আসাম ও উড়িষ্যার নাম উল্লেখ করা হ'য়েছে। খসড়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে এই সকল প্রদেশের শাসনতান্ত্রিক সম্বন্ধ কিরূপ হবে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। এই আলোচনা দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতি ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

কেন্দ্রীয় ও অংশীভূত রাষ্ট্রের মধ্যে শাসনসংক্রান্ত বিষয়গুলির সুস্পষ্ট বিভাগ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মূলনীতি। কতকগুলি বিষয়ে পাকাপাকিভাবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনের ভার দেওয়া হয়; অন্য কতকগুলি বিষয়ে রাষ্ট্রাংশ বা প্রদেশগুলিকে অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বা অংশীভূত সরকারের কোনটিকেই অন্যের শাসনপরিধিতে সাধারণত হস্তক্ষেপ ক'রতে দেওয়া হয় না। খসড়া শাসনতন্ত্র অনুসারে যে সকল বিষয় কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভাগে পড়েছে তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন। সপ্তম তপশীলের প্রথম দফায় কেন্দ্রীয় বিষয়ের তালিকা দেওয়া হ'য়েছে। দেশ রক্ষা, সৈন্য, নাবিক ও বৈমানিক নিয়োগ, অস্ত্রশস্ত্রাদি, আণবিক শক্তি, যুদ্ধোপযোগী শিল্প, বৈদেশিক বিভাগ, যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপন, বৈদেশিক ব্যবসাবাণিজ্য, পৌরনীতি, ডাক, টেলিগ্রাফ ও বেতার, বিমানপথ, বিমান নির্মাণশিল্প, সামুদ্রিক বাণিজ্য, রেলপথ, ব্যাঙ্ক, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, মুদ্রানীতি, বীমা, আদমসুমারি, আফিং, পেট্রোল, সার্ভে বা পরিমাপ বিভাগ, উত্তরাধিকার কর, রপ্তানী ও আমদানি শুল্ক, লিমিটেড কোম্পানীর উপর কর স্থাপন প্রভৃতি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হ'য়েছে। সপ্তম তপশীলের দ্বিতীয় দফায় রাষ্ট্রাংশ বা প্রদেশগুলিকে তেমনি পৃথকভাবে নির্দিষ্ট বিষয়ে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এই দফার প্রধান বিষয়গুলি এইরূপ— পুলিশ ও প্রাদেশিক শান্তিরক্ষা, প্রাদেশিক বিচার বিভাগ, জেল বিভাগ, প্রাদেশিক নিয়োগ বিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রদেশের আভ্যন্তরীণ চলাচল, জল সরবরাহ, সেচ বিভাগ, কৃষি, বন বিভাগ,

মৎস্য বিভাগ, আবগারী, সমবায়, নানাপ্রকার অভ্যান্তরীণ কর স্থাপন প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিষয়ের তালিকা ছাড়া সপ্তম তপশীলে আরও একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। উভয় সরকারই ঐ তালিকায় উল্লিখিত বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারী। অর্থাৎ এ সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনপরিষদগুলিকে সমান্তরাল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার সংগে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে যদি উল্লিখিত কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনের সহিত বা কেন্দ্রীয় আইনের কোন অংশের সহিত প্রাদেশিক আইনের বিরোধ ঘটে তবে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ থাকবে; কিন্তু কোন বিরোধ না থাকলে দুই প্রকার আইনই প্রচলিত হ'তে বাধা থাকবে না। এই বিষয়গুলি সপ্তম তপশীলের তৃতীয় দফায় তালিকাভুক্ত হয়েছে; যথা—ফৌজদারী আইন, দেওয়ানী আইন, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ; উত্তরাধিকার আইন; সম্পত্তি হস্তান্তর, সংবাদপত্র, শ্রমিক-হিতসাধন, বেকার আইন, শ্রমিক ইউনিয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, আর্থিক পরিকল্পনা, নাবালক ও উন্মাদ সম্বন্ধীয় আইন প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রের ভিতর বিষয় বিভাগ ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা অনেকটা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের ব্যবস্থার অনুরূপ।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে শাসন ক্ষমতার উপরোক্ত বিভাগের মূলতত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক। আধুনিক জগতে দুই প্রকারের যুক্তরাষ্ট্র আছে। এক শ্রেণীর যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করে কেন্দ্রকেই শক্তিশালী করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রদেশগুলিকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার অর্পণ করে কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের আজ্ঞাবাহী করে রাখা হয়েছে। ক্যানাডার শাসনতন্ত্র এই পন্থা অবলম্বন করেছে। দ্বিতীয় ধরনের যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারের হাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার অর্পণ করা হয়; তাই তাদের শাসন ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত ও শাসনশক্তিগুলিকে কেন্দ্রের অধীনতা স্বীকার কর্তে হয় বটে; কিন্তু প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্র এই শ্রেণীভুক্ত। আমাদের খসড়া শাসনতন্ত্র ক্যানেডার পদ্ধতি অনুসরণ করেছে এবং কেন্দ্রকে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলেছে। এমনকি প্রয়োজন হলে প্রাদেশিক তালিকার একাধিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করতে পারে, যদি কেন্দ্রীয় উর্ধতন আইন সভা দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করে যে, জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য প্রাদেশিক কোন কোন বিষয় কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতাধীন করা আবশ্যক।

আমাদের দেশে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করা ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা খুবই সমীচীন। প্রথমত ভারতবর্ষ এখনও যুদ্ধোত্তর সংকটজনক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। দুর্নীতা, চোরা কারবার, কালোবাজার ও মুনাফাখোরদের সমাজ বিধ্বংসী আচরণ সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে রেখেছে। এই সমস্যার সমাধান কর্তে হলে সর্বভারতীয়

ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত সাম্প্রদায়িক সম্ভাব ও প্রীতি রক্ষা এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করে তোলার জন্য ভারত ইউনিয়নের সকল অংশে একই প্রকারের শাসন-নীতি অবলম্বন করা দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বিষয়ে প্রদেশগুলির উপর নির্ভর করা সমীচীন নয়। তৃতীয়ত প্রাদেশিক সংকীর্ণতা নিবারণকল্পে, কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। চতুর্থত নূতন রাষ্ট্রকে উদার আন্তর্জাতিকতার ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর্তে হলে শাসন পরিচালন ক্ষেত্রে কেন্দ্রকেই শক্তিশালী করা সমীচীন। পঞ্চমত জনগণকে ভারতীয় জাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে একতা স্থাপন কর্তে হলে প্রদেশকে শাসন ব্যবস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতা প্রদান করা বিপজ্জনক। ষষ্ঠত ভারত, পূর্ব এশিয়া ও বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে যে দুর্যোগ উপস্থিত, তার কবল থেকে উদ্ধার পেতে হলে, সমস্ত প্রদেশের ভারতীয়দের এক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠনমূলক কার্যে লিপ্ত হতে হবে। তাই খসড়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ভার দেওয়া হয়েছে এবং প্রদেশগুলিকে অনেকাংশে কেন্দ্রের আজ্ঞাবাহী পদে স্থাপিত করা হয়েছে তা খুবই সমীচীন সন্দেহ নাই। নানা বিষয়ে কেন্দ্রকে ক্ষমতাহীন করার দরুণ বিগত দুই মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে নানা শাসন-সংকটের উদ্ভব হয়েছিল। এমন কি ১৯২৯—৩১ সালের বিশ্ব-আর্থিক সংকট নিবারণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বার বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

প্রদেশ ও কেন্দ্রের সম্বন্ধের আর একটি দিকও লক্ষ্যণীয়। সেটি হচ্ছে কর বণ্টন ব্যবস্থা। কতকগুলি কর আছে যা ভারত ইউনিয়ন স্থাপন করবে; কিন্তু প্রাদেশিক সরকার সেগুলি আদায় ও গ্রহণ করবে। স্ট্যাম্প করের কিয়দংশ এবং ওষুধ ও গন্ধদ্রব্যের দরুণ আবগারী কর এই শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি কর স্থাপন ও সংগ্রহের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের কিন্তু এই খাতের সম্পূর্ণ আয় প্রদেশেরই প্রাপ্য—যথা কৃষি জমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তি বিষয়ক উত্তরাধিকার কর। তৃতীয়ত, কোন কোন কর স্থাপন ও আদায়ের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, কিন্তু ঐ করের উপস্বত্ব প্রদেশ ও কেন্দ্রের ভিতর বণ্টনের ব্যবস্থা আছে, যেমন আয় কর। চতুর্থত, কেন্দ্র প্রয়োজনানুযায়ী যে কোন প্রদেশকে অর্থ সাহায্য করতে পারবে। নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পাঁচ বৎসর পরে এবং তার পর প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ভারতের রাষ্ট্রপাল পাঁচজন সভ্য দ্বারা গঠিত কমিশন নিযুক্ত করবেন ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিভাবে কর কেন্দ্র ও প্রদেশের ভিতর ভাগাভাগি হবে অথবা কেন্দ্র প্রদেশগুলিকে কি পরিমাণ সাহায্য করবে—সেই সকল বিষয়ে এই কমিশন সুপারিশ করবে এবং সেই সুপারিশ বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় আইনসভা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবে। কেন্দ্রীয় সরকার আবশ্যক অনুসারে প্রদেশকে ঋণদান কর্তে পারে বা প্রদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋণের জন্য জামিন হিসেবে দাঁড়াতেও পারে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক দিক দিয়েও কেন্দ্র ও প্রদেশের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য সম্পর্কে আরও দু-একটি ধারা আলোচনা করা প্রয়োজন। যদি কোন প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা অচল হয়, তাহলে গভর্নর বা প্রদেশপাল জরুরী অবস্থার ঘোষণা করে সমগ্র শাসন ক্ষমতা, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর হাত থেকে নিজের হাতে নিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপালকে সে বিষয় জানাতে গভর্নর বাধ্য থাকবেন। গভর্নর জেনারেল বা রাষ্ট্রপালের নির্দেশানুযায়ী সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

আবার যদি ভারতের রাষ্ট্রপাল স্বয়ং রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রাংশের কোন আকস্মিক বিপদ লক্ষ্য করে জরুরী অবস্থার ঘোষণা করেন তাহলে প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়ন করার অধিকারী হবে।

ভারত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপাল বিভিন্ন প্রদেশের ভিতর শাসনতান্ত্রিক সাহচর্য বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে কমিশন নিযুক্ত করতে পারেন; অথবা যদি কোন প্রদেশ নদীর জল সরবরাহ ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ অন্য প্রদেশের বিরুদ্ধে আনয়ন করে, তবে সেই বিষয় মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রপালকে কমিশন নিয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। উপজাতি অথবা অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেও গভর্নর জেনারেলের বা রাষ্ট্রপালের কমিশন নিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে।

প্রাদেশিক সর্বোচ্চ রাষ্ট্র কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের ক্ষমতা কম নয়। খসড়া শাসনতন্ত্রের একটি প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক মনোনীত চারজন ব্যক্তির মধ্যে রাষ্ট্রপাল একজনকে গভর্নর বা প্রদেশপাল হিসাবে নিযুক্ত করবেন এবং কোন কারণে যদি প্রদেশপাল শাসনকার্যে অক্ষম হয়ে পড়েন তাহলে মধ্যবর্তী সময়ের জন্য গভর্নর জেনারেল বা রাষ্ট্রপালই ক্ষেত্রানুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। রাষ্ট্রপাল হাইকোর্ট বা প্রাদেশিক সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ করবেন।

খসড়া শাসনতন্ত্রের নবম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের আদর্শে সর্বতোভাবে পালন করবে ও শাসন ক্ষমতা এমনভাবে পরিচালনা করবে যা দ্বারা কেন্দ্রীয় শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রদেশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। কেন্দ্রকে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রত্যক্ষভাবে সর্বভারতীয় শাসনক্ষেত্রে ও পরোক্ষভাবে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার নানা বিষয়ে কৃতিত্ব, মর্যাদা ও সম্মানের আসন প্রদান করা হয়েছে। খসড়া শাসন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রদেশ ও কেন্দ্রের যে পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রস্তাবিত হয়েছে, তা দেশকে একতা ও কল্যাণের পথেই নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সূচিত করছে।

বিক্ষুমুখের কথা

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল তাকে বাধ্য হয়ে ভদ্রতার মুখোস পরে এমন লোকের সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা করতে হয় কিংবা এমন মানুষ নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারে বাস করতে হয়, যাকে দেখলে শরীর আতঙ্কে বা বিরক্তিতে শিউড়ে ওঠে। কিন্তু কিছু করবার নেই। নিরুপায়। অক্ষম আক্রোশের অনির্বাণ আগুনে নিজেই দগ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

সভ্যতার কৌমযুগে মানুষ দল বেঁধে বাস করত। কেননা, তখন দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে পরিবার, কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী, আবার কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে একটি ছোট সমাজ। সেই সব সমাজ দলবদ্ধ হয়ে একটি জাতি বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হত। তখনকার দিনে এমন সঙ্ঘবদ্ধ জীবন ছিল যে, গোষ্ঠী বা সমাজ বা দলের বাইরে কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত না। প্রাচীনকালে প্রত্যেক সুসভ্য দেশের ইতিহাসেই এই জিনিসটি লক্ষ্য করা যায়। ভারত, মিশর, চীন, গ্রীস ও রোম—সর্বত্রই গোষ্ঠী ও সমাজের নেতৃত্বে এবং নির্দেশে ব্যক্তির জীবন চালিত হত। কৃষি-সভ্যতার যুগে এ-প্রথার বিকাশ হয়। গোষ্ঠীপতি, গ্রামবৃদ্ধ, সমাজের নায়ক—এ'রাই সেকালের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁদেরই সুচিন্তিত নির্দেশে জমি বিলি এবং কৃষি-ক্ষেত্র বণ্টন করা হত এক-একটি পরিবারের আয়তন ও চাহিদা অনুসারে। জীবন ছিল সমষ্টিগত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থান বা অবসর ছিল না বললেই হয়। পরিবারের যিনি কর্তা, অথবা গোষ্ঠীর যিনি চালক, তাঁর মতামত না মেনে উপায় ছিল না। কেননা, পিতৃ-তন্ত্র-চালিত পরিবার ও সমাজের অনুশাসন অমোঘ, অলঙ্ঘ্য।

বর্তমানে পরিবার-বন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে গিয়েছে। য়ুরোপ, এমনকি, প্রাচ্য ভূখণ্ডে বহু সংরক্ষণশীল সমাজেও পারিবারিক জীবন-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে কিংবা পেতে বসেছে। কাজটা ভাল অথবা মন্দ, পরিবর্তনটা নিষ্প্রয়োজন অথবা ন্যায্য ও স্বাভাবিক, তার বিচার করবেন সমাজতত্ত্বজ্ঞ চিন্তাশীল ভাবুক ও লেখক সম্প্রদায়। আমরা শুধু দেখি, সমাজ-গঠনের ধারা ধীরে ধীরে বদলেছে এবং প্রধানত অর্থনৈতিক সমস্যার চাপেই সে বদলটা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয় বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কেন এই পরিবর্তন দরকারী মনে হয়েছিল, সেটা জানা দরকার। কৌমযুগের প্রথম দিকটায় অধিকাংশ দেশেই গোষ্ঠী আর সমাজপতিদের নেতৃত্ব স্বীকার করা হয়েছিল উপায়ান্তর ছিল না বলে। কিন্তু ক্রমশ বিরক্তির ভাব ঘনিয়ে উঠতে লাগল। ব্যক্তি যখন স্বাধিকার খোঁজে, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] আর

স্বাতন্ত্র্যবিরোধী সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বন্দী থাকতে আর রাজি হয় না—তখন পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে কৃষি-সভ্যতার যুগ অস্তমিত হয়ে এল। যন্ত্র-শিল্পের ক্রমোন্নতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ উপার্জন, সম্পত্তি সঞ্চয় সহজ হতে লাগল। বৃহৎ গোষ্ঠীর স্বৈরাচার তখন অঙ্গীকার করে নেওয়া কষ্টসাধ্য। ওরি মধ্যে উদ্যমী ও উৎসাহী ব্যক্তিরা পৃথক পরিবার স্থাপন করতে শুরু করল আপনাকে কেন্দ্র করে। কেউ-বা দেশেই রইল স্থানান্তরে সরে গিয়ে। কেউ-বা দেশান্তরী হল ভালো জমি, নূতন জায়গা, আর ভাগ্যোন্নতি লাভের আশায়। এইভাবে বৃহৎ সভ্যতার গোষ্ঠী-পরিবারভুক্ত অসন্তুষ্ট এবং সাহসী লোকের দল পারিবারিক জীবনের কঠোর বন্ধন কাটিয়ে দূর দেশে গিয়ে ঘর-সংসার পাতল। গড়ে উঠল ঔপনিবেশিক বসতি। রাষ্ট্রনায়করা বাধা দিল না, বরঞ্চ উৎসাহ দিল আপনাদেরই স্বার্থের খাতিরে। বিশিষ্ট শ্রেণী ও সমাজের হাতে তখন শক্তি এসেছে। নিঃসম্বল, ভূমিস্বত্বহীন অসন্তুষ্ট মানুষ দলবদ্ধ হলেই জিজ্ঞাসা ধূমায়িত হবে বিপ্লবে। পরে সুবিধামত রাষ্ট্র এগিয়ে এসে সেই সব ঔপনিবেশিক বসতিগুলির বাণিজ্য-সম্পদ্ রক্ষার অছিলায় করায়ত্ত করে নেবে।

আড়াই হাজার বছরেরও আগে এই আন্দোলন শুরু হয়। গ্রীসে তার প্রথম সূত্রপাত। রোম্যান সাম্রাজ্যবাদে তার স্বাভাবিক রূপান্তর। কত কাল কেটে গিয়েছে। মাঝে কত নূতন আন্দোলন ও পরীক্ষা চলল, এল আবার প্রতিক্রিয়া। ব্যক্তিতন্ত্রের পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মোটামুটি আমরা ঠিকই আছি। পরিবারের বন্ধন শিথিল হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতের দেশে বংশগৌরব আর কুল-জ্ঞান, যাব যাব বলে, কিন্তু আজও টিঁকে আছে। যৌথ পরিবারের সুবিধা-অসুবিধা জেনে মানুষ ইচ্ছা এবং অনেকটা মনের জোরেই অশান্তির কেন্দ্র থেকে সরে এসে পুরানো সমাজে ভাঙন ধরিয়েছে। কিন্তু কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি। মনের মধ্যে 'কনডিশনড্ রিফ্লেক্স'গুলো এখনো রয়ে গেছে। শুধু এদেশে নয় বিদেশেও। য়ুরোপে তো যৌথ সংসারের বালাই নেই। কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে, মধ্য য়ুরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, বিশেষ করে বলকান প্রদেশে, এখনও গৃহধর্মের জের মেটেনি। গ্রামাঞ্চলে পিতৃতন্ত্রের এবং গোষ্ঠী-জীবনের প্রাধান্য আজও রয়েছে কিছু কিছু।

এর প্রধান কারণ হল ভয়। যেদিন মানুষ গুহা ছেড়ে মাটিতে বাসা বাঁধে, সেদিন জঙ্গলের ভয় কেটে গিয়ে নতুন সব ভয় এসে তার মনকে অধিকার করে। সেই সব প্রাথমিক ভয়, আদিম মনের ভয় আমাদের রক্তধারায় এবং মজ্জার মধ্যে মিশে আছে এবং আছে বলেই আমরা দল বাঁধি, দল ভাঙ্গি, নতুন দল গড়ি, শ্রেণী-স্বার্থের চেতনায় এবং আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে শারীরিক আর মানসিক গণ্ডি রচনা করি। একটা ভয় যায়, আর একটা ভয় আসে। হিংস্র শ্বাপদের ভয় কেটে যায়, আসে মানুষের ভয়। নৃতত্ত্বে যে সাম্যের কথা লেখা আছে, সেটা পুঁথির কথা। আসলে মনের মধ্যে অনেক রকম ভয় জড়িয়ে জটিল জুজুর সৃষ্টি করেছে, যেখানে অচেতন, অবচেতন, সচেতন মনের অত্যাচার, নিরোধ, দমন মিলে এমন একটা জটিল পরিমণ্ডল রচনা করেছে যে, সাময়িক ও সাহসী চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলি সম্পূর্ণভাবে দূর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই আজও দুটো জিনিসের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে। একদিকে মন চাইছে স্বাধীনতার প্রসার, ব্যক্তিত্বের প্রসার—যেটা আত্মবিকাশের সাহায্য করতে পারে। ঠিক উল্টো দিকে টানছে আর একটি পুরানো আদিম প্রবৃত্তি 'হার্ড ইনস্টিংট'—যেটা একত্র দল বেঁধে বাস করতে অজানা বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মনকে আহ্বান করে। একাকীত্বের ভয়, অনিশ্চিতের ভয়, সামাজিক অসাম্য আর আর্থিক বৈষম্য—এইগুলো মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ অথবা শ্রেণীবদ্ধ করে তোলে।

যেসব ছেলেমেয়ে বহুদিন পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে মানুষ হয়েছে, যে পরিবারে কর্তার অসীম কর্তৃত্ব, তাদের মনের মধ্যে একদিন না একদিন অসন্তোষ ঘনিয়ে ওঠে। কিন্তু বহু দিন ধরে আওতায় প্রতিপালিত হওয়ার ফলে নিজস্ব পদার্থ বিশেষ কিছুই থাকে না, আত্মনির্ভরতা যায় কমে। কোনও কিছু সৎসাহসিক কাজ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। অথচ যৌথ পরিবারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে। এইটাই স্বাভাবিক। ছোট্ট অথবা বড় সংসারে একত্র বাস করে পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা, শত অসুবিধা এবং ব্যক্তিগত সমস্যায় অশান্তি বহন করার মধ্যেও একটা তৃপ্তি আছে—যেটা মর্ফিয়ার প্রভাবের মতই কাজ করে। প্রায়ই দেখা যায়—দুজনের মধ্যে বনছে না, কিংবা আর্থিক তারতম্যের ফলে একজনের উপর চাপ পড়েছে, পরিবারের কোনও কোনও দায়িত্বহীন ব্যক্তি নিশ্চিন্ত আরামে কানে তুলো দিয়ে ভর পেটে দিবানিদ্রা দিচ্ছে, কোনও শান্ত মহিলার ওপর অযথা উৎপীড়ন হচ্ছে, কোনও নিরীহ ভদ্রলোককে কৌশলে শোষণ করা হচ্ছে। তবু সংসার আর সমাজের অছিগিরিকে আঘাত করবার মতন যথেষ্ট উদ্যম থাকে না......

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—**শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়**

(পূর্বানুবৃত্তি)

(চার)

এর পর শরৎকাল পড়ল। এলিয়ট স্থির করল ইসাবেল, গ্রে আর মেয়েরা কেমন আছে দেখবার জন্য এবং সেই সঙ্গে শহরে তার উপস্থিতিটুকু জাহির করার উদ্দেশ্যে প্যারী যাওয়া উচিত। তারপর লণ্ডনে গিয়ে কিছু জামা কাপড় তৈরী করাবে ও সেই সূত্রে দু' চারজন পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে। আমার নিজের উদ্দেশ্য ছিল সোজা লণ্ডনে যাওয়া, কিন্তু এলিয়ট ধরে বসল তার সঙ্গে মোটরে প্যারী যাওয়ার জন্য। অপছন্দ করার মত প্রস্তাব নয় বলে আমি তার অনুরোধ মেনে নিলুম আর প্যারীতে, গিয়ে দু' চারদিন না কাটিয়ে যাওয়ার কোনো হেতু পেলাম না। আমরা বেশ ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম, যে সব জায়গায় খাওয়ার জিনিস ভালো পাওয়া যায়, সেই সেই জায়গায় থামতে লাগলাম; এলিয়ট নিজের কিডনীর কি একটা গণ্ডগোল থাকায় "ভিসি" পানীয় ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করত না, কিন্তু সর্বদাই আমার আধ বোতল মদ ও নিজে পছন্দ করে বেছে দিত এবং সেই দ্রাক্ষারস পানান্তর আমার আনন্দে (স্বয়ং উপভোগে অক্ষম থাকলেও) সে প্রকৃত সন্তোষ লাভ করত। এতই তার ঔদার্য যে, আমার ভাগের খরচের টাকা দেওয়ার সময় তার সঙ্গে রীতিমত অনুনয় বিনয় করতে হ'ত। যদিচ অতীতে যে-সব হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, তাদের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আমি কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, তবু স্বীকার করব এইবারকার যাত্রাটুকু আমার ভালো লেগেছিল। আমরা যে-সব অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গেলাম, সেগুলিতে শারদীয় সৌন্দর্যের সবেমাত্র পরশ লেগেছে, সুতরাং অতি চমৎকার দেখাচ্ছিল। ফ'তেন রোতে লাঞ্চ খেয়ে অপরাহ্নের পূর্বে প্যারী পৌঁছাতে পারলাম না। এলিয়ট আমাকে একটি প্রাচীন ধরণের ভদ্র হোটেলে নামিয়ে দিয়ে কাছাকাছির ভিতর 'রিজে' চলে গেল।

আমরা ইসাবেলকে আমাদের আগমন বার্তা পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলাম, সুতরাং হোটেলে পৌঁছে ওর একটি ছোট চিঠি পেয়ে বিস্মিত হইনি তেমন, বিস্মিত হলাম তার বক্তব্য বিষয়টুকুতে—

"পৌঁছানো মাত্র সোজা এখানে চলে আসবেন। একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটেছে। এলিয়ট মামাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন না। ভগবানের দোহাই যত শীঘ্র সম্ভব আসবেন।"

কৌতূহল আমারও বড় কম ছিল না, কিন্তু আমাকে মুখ হাত ধুয়ে একটা পরিষ্কার সার্ট পরতে হ'ল। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে রু দ্য সেণ্ট গুইলায়ুমে ওদের বাসায় গেলাম। আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল, ইসাবেল ত' লাফিয়ে উঠল।

"কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আপনার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছি।" তখন পাঁচটা বেজেছে আর আমার জবাব দেওয়ার পূর্বেই বাটলার চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। ইসাবেল হাতটা মুঠো ক'রে অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। আমি ত' কল্পনাই করতে পারলাম না—ব্যাপারটা কি?

"আমি ত' এই ফিরছি, ফ'তেন রোতে লাঞ্চ খেতেই অনেক সময় কেটে গেল।" ইসাবেল বলল: "হা ভগবান! কি বিড়বিড়ে লোকটা, পাগল করে দিলে আমাকে।

লোকটি চায়ের ট্রে, টি-পট্, চিনির পাত্র, চায়ের কাপ প্রভৃতি টেবলে রাখল; তারপর সত্যিই বিরক্তিকর বিলম্বিত ভঙ্গীতে সেগুলি রুটি, মাখন, কেক ও পিঠা প্রভৃতির সঙ্গে সাজিয়ে রাখলে; তারপর যাওয়ার সময় দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

"লারী যে সোফী ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে বিয়ে করছে!"

"সে আমার কে?"

রাগে জ্বলে উঠে ইসাবেলের চোখ দুটি, সে চীৎকার করে বলে—"ন্যাকামী করবেন না, আপনি যে নোংরা কাফেতে নিয়ে গেছলেন, সেখানকার সেই পাঁড় পাতাল মাগীটাকে মনে নেই। ভগবান জানেন, অমন একটা বিশ্রী কাফেতে কেন আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন, গ্রে ভারী বিরক্ত হয়েছিল।"

তার এই অন্যায় রাগ উপেক্ষা ক'রে আমি বললাম—"ও তোমার সেই শিকাগোর বান্ধবীর কথা বলছ? তা কি ক'রে এ-সব জানলে?"

"কেমন ক'রে জানব? লারী নিজেই কাল বিকেলে এসে বলে গেল, সেই থেকে আমি পাগলের মত হয়ে আছি।"

"বসে আমাকে এক কাপ চা করে দিয়ে কথাগুলো বল্লে ভালো হ'ত না?"

"নিজে ক'রে নিন।"

চায়ের টেবলের পাশে জন্ অত্যন্ত বিরক্তি-ভাবে আমার চা ক'রে নেওয়া দেখতে লাগল। আগুন পোহাবার জায়গাটির পাশে একটি সোফায় আরাম ক'রে বসলাম।

"দিশার্দ থেকে ফেরার পর ওর আর তেমন দেখা পাইনি আমরা। অর্থাৎ ওখানে সে দু' চারদিনের জন্য এসেছিল, কিন্তু আমাদের বাসায় না উঠে একটা হোটেলে উঠেছিল। প্রতিদিন সমুদ্রতীরে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে আসত, ছেলেরা ত' ওকে নিয়ে পাগল, সেণ্ট ব্রিয়াকে আমরা গল্‌ফ্ খেলতাম। গ্রে একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করল—মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়েছিল?

সে বলল: "হাঁ, অনেকবার দেখেছি।"

আমি বললাম, "কেন?"

ও বললে: "একজন পুরানো বন্ধু ত' বটে।"

আমি বললাম, "আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে ওর পিছনে আর সময় নষ্ট করতাম না।"

"তারপর ও হাসল, ও যে কিভাবে হাসে, তা ত' আপনি জানেন। একটা ভারী মজার কথা বলা হ'ল, অথচ মোটেই মজার কথা নয়।"

সে বলল, "তুমি ত আমি নয়।"

"আমি কাঁধ নেড়ে আলোচনার গতি পরিবর্তন করলাম। এ বিষয়ে আর ভাবিনি। কিন্তু ও যখন সোফীর সঙ্গে বিয়ের কথা জানাল, তখন যে আমার কি অবস্থা হ'ল, তা ত' বোঝেন।"

আমি বললাম, "সে পারবে না লারী, সে করতে পারবে না।"

ও বলল—"আমি কিন্তু বিয়ে করব"—এমন ভঙ্গীতে বলল, যেন আর এক প্লেট আলু চাইছে। তারপর বলল—"তুমি ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো।"

আমি বল্লাম, "তোমার অতিরিক্ত আবদার তুমি পাগল হয়েছ, সে অতি খারাপ, খারাপ খারাপ।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তোমার এই ধারণার হেতু কি?"

ইসাবেল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার মুখে পানে তাকাল।

"সে দিন রাত মদে ডুবে থাকে আর যে ডাকুক না কেন অবলীলাক্রমে তার শয্যাসঙ্গিনী হয়।"

"তদন্থারা এই বোঝায় না যে, ও খারাপ, বহু সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত—মাতাল হ'য়ে থাকেন এবং উদ্দাম জীবন পছন্দ করেন।—এ-সব হ'ল হাতের নখ কামড়ানোর মত একটা বদ্ অভ্যাস, কিন্তু এর চেয়েও খারাপ ব'লে ত' আমার জানা নেই। যে মানুষ মিথ্যা বলে, প্রবঞ্চনা করে ও নির্মম—তাকেই আমি খারাপ বলি।"

"আপনি যদি ওর পক্ষে কথা বলেন ত' আপনাকে খুন করব।"

"লারীর সঙ্গে ওর কি ক'রে আবার দেখা হল?"

"টেলিফোনের কেতাবে সোফীর ঠিকানা লারী পেয়েছিল, সেই ঠিকানায় দেখা করতে যায়। ও নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আর ঐভাবে জীবন কাটায় যে, তার অসুখ হবে এ আর বিচিত্র কি! লারী ডাক্তার ডেকে আনে, দেখাশোনা করার জন্য একটা লোক ঠিক করে দেয়—এই সব। এইভাবেই ব্যাপারটা শুরু হয়। লারী বলে ও নাকি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। নির্বোধ, বলে কিনা সোফী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে।"

"লারী গ্রের ব্যাপারে কি করেছিল মনে নেই? তাকেও ত' সারিয়ে দিয়েছিল, কেমন সারিয়ে দেয়নি?"

"সে আলাদা ব্যাপার। গ্রে সারাতে চেয়েছিল, কিন্তু ও ত' আর তা চায়নি।"

"তুমি কি ক'রে জানলে?"

"কারণ স্ত্রী-চরিত্র আমার জানা আছে। স্ত্রীলোক যখন ওর মত টুকরো টুকরো হ'য়ে পড়ে, তখনই তার শেষ। সেখান থেকে সে আর ফিরতে পারে না। আজ যা সোফীর অবস্থা—তার কারণ চিরদিনই ওর ঐ স্বভাবই ছিল। আপনার কি মনে হয়, ও লারীর কাছে টিকে থাকবে? কিছুতেই নয়। একদিন না একদিন সে ভেঙে পড়বে। ওর রক্তে যে এই ধারা বইছে ও চায় একটি পশু-প্রকৃতির মানুষ, তাতেই ওর প্রাণে উত্তেজনা জাগে; সোফী তাই খোঁজে। লারীকে ও নরকে নামিয়ে নিয়ে যাবে।"

"আমার মনে তার খুবই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কি ক'রে তুমি কি করবে? ও ত' সজ্ঞানে এর ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।"

"আমি অবশ্য কিছুই করতে পারি না, কিন্তু আপনি পারেন।"

"আমি?"

"লারী, আপনাকে ভালবাসে, আর আপনি যা বলেন, তা শোনে। একমাত্র আপনারই ওর ওপর যা কিছু প্রভাব খাটে। আপনি পৃথিবীটা জানেন। ওকে গিয়ে বুঝিয়ে বলুন এতখানি নির্বোধের মত কাজ যেন না করে। বলুন যে এতে ওর সর্বনাশ হবে।"

"ও শুধু বলবে, এতে আমার মাথা ঘামানোর কিছু নেই, আর কথাটা বাজে হবে না।"

"কিন্তু আপনি ত' ওকে ভালবাসেন, ওর ভালো মন্দে আপনার ত' একটা আগ্রহ আছে। আপনি চুপ ক'রে বসে থেকে ওকে ত' আর বয়ে যেতে দিতে পারেন না।"

"গ্রে ওর প্রাচীনতম ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। আমার অবশ্য মনে হয় না কোনো ফল হবে। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে গ্রেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী।"

সে অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে বলল: "ও গ্রে!"

"তুমি ত' বুঝছ যতটা খারাপ মনে হচ্ছে সব ব্যাপারটি হয়ত এতখানি খারাপ হবে না। আমি দু তিনজনকে জানি স্পেনে একজন আর পূর্বাঞ্চলে দুজন— বেশ্যা বিয়ে করেছিল, এখন তারা বেশ চমৎকার স্ত্রী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ নিরাপত্তা পেয়ে তারা তাদের স্বামীদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আর কি জানো পুরুষের কি মনে ধরে তা তারা জানে।"

"আপনি আমাকে জ্বালালেন, আপনি কি বলতে চান আমি আমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিলাম লারী একটা উৎকট কামোন্মাদিনী স্ত্রীলোকের হাতে গিয়ে পড়বে বলে!"

"তুমি কি করে তোমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিলে?"

"আমি এক এবং একটি মাত্র কারণে লারীকে ছেড়েছিলাম যে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব না।"

"ও সব কথা ছাড়ো ইসাবেল, একটা চৌকস হীরে ও স্যাবল কোটের লোভে তুমি ওকে ছেড়েছিলে।"

এই কথাগুলি আমার মুখ থেকে নির্গত হতে না হতেই আমার মাথার দিকে রুটি ও মাখন পূর্ণ একখানি প্লেট উড়ে এল, শুধু ভাগ্যক্রমে আমি প্লেটখানা ধরে নিলাম – কিন্তু রুটী ও মাখন মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। আমি উঠে প্লেটখানি টেবলে রেখে দিলাম। বল্লাম:

"তোমার এলিয়ট মামা ঐ 'ক্রাউন ডার্বি' মার্কা প্লেট ভাঙলে আর রক্ষা রাখতেন না। ডরসেটের তৃতীয় ডিউকের জন্য ওগুলি তৈরী হয়েছিল, আর সত্যি জিনিসগুলি অমূল্য।"

সে বলে উঠল: রুটী ও মাখন তুলে রাখুন।"

পুনরায় সোফায় বসে পড়ে বললাম: "তুমি নিজে তোলো।"

উঠে পড়ে রাগে ফুলে উঠে সেই ছত্রাকার জিনিসগুলি কুড়োয় ইসাবেল।

বর্বর ভঙ্গীতে ইসাবেল বলে: "আর আপনি ইংরেজ ভদ্রলোক বলে গর্ব করেন।"

"না না ও কাজটা জীবনে করিনি।"

"এখান থেকে চলে যান, আর আপনাকে দেখতে চাই না, আপনাকে দেখলেও ঘৃণা হয়।"

"আমি অবশ্য দুঃখিত, কারণ তোমার আকৃতি চিরদিনই আমাকে আনন্দ দিয়েছে। কেউ কি তোমাকে কখনো বলেছে যে, তোমার ঐ নাকটি ন্যাপলস ম্যুজিয়মে রক্ষিত সাইকীর নাকের সমতুল, আর ভার্জিনীয় সৌন্দর্যের ঐ হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্তি! তোমার পা দুটো চমৎকার—লম্বা ও সুগঠিত—ও দুটি দেখে চিরদিনই আমার বিস্ময় লাগে, কেন না তুমি যখন ছোট ছিলে তখন ও দুটি মোটা এবং ধ্যাবড়া ছিল, কি করে যে কি করলে জানি না।

সে ক্রুদ্ধ গলায় বলল: "দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আর ভগবানের দয়া।"

"কিন্তু তোমার হাত দুটি মনোহর, এত সরু, আর এত সুন্দর দেখা যায় না।"

"আমার ধারণা ছিল আপনার কাছে ও দুটি খুব বড় ঠেকে।"

"না দৈহিক গড়ন ও দৈর্ঘ্য অনুসারে নয়, যে অপূর্ব মাধুরীভরে তুমি ও দুটি ব্যবহার কর—তা চিরদিনই আমার কাছে বিস্ময়কর। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে বা আর্ট হিসাবে যখনই তুমি হাতদুটি ব্যবহার কর তখনই তার ভঙ্গীতে ও আন্দোলনের ভিতর সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে। তোমার কথার চাইতেও ঐ হাতদুটি অধিকতর ব্যঞ্জনাময়, এলগ্রেসোর ছবির মতই ঐ হাত দুটি লাবণ্যমণ্ডিত; সত্যি কথা বলতে কি ঐ হাত দুটি দেখলে আমার এলিয়টের সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী মনে পড়ে যে তোমাদের একজন স্পেনীয় মাতামহী ছিলেন।"

ইসাবেল বিরক্তিভরে আমার দিকে তাকায়। বলে:

"কি বলছেন? এই প্রথম এ কথা শুনছি।"

খানিক্ষণ তাকে কাউণ্ট ডি লরিয়া আর কুইন মেরী সম্মানিতা পরিচারিকার বিবরণ বল্লাম, তাঁরই দৌহিত্রী বংশে নাকি এলিয়টের জন্ম। ইতিমধ্যে ইসাবেল তার লম্বা আঙ্গুলগুলি ও সুরঞ্জিত ও সুচর্চিত নখগুলি পরিতৃপ্ত ভঙ্গীতে দেখতে থাকে।

সে বলল: "একজন না একজনের বংশ থেকে মানুষের উৎপত্তি হবেই।" তারপর মৃদু হেসে আমার মুখের পানে দুষ্টোমিভরা চোখে তাকাল, সে দৃষ্টির ভিতর রাগ বা তিক্ততার চিহ্নমাত্র নেই, — ইসাবেল বলে "আপনি একটি আস্ত শয়তান।"

সত্য কথা যদি বলা যায় তাহলে মেয়েরা অতি সহজেই যুক্তি দেখতে পায়।

ইসাবেল বলে: "এমন এক এক সময় আসে যখন আমি সত্যি আপনাকে মোটেই অপছন্দ করি না,—"

ইসাবেল আমার পাশের সোফায় এসে বসল, তারপর আমার হাতটি নিজের হাতে জড়িয়ে চুমো দেওয়ার জন্য আমার ওপর ঝুঁকে পড়ল। আমি গাল সরিয়ে নিলাম।

আমি বল্লাম "লিপস্টিকের দাগে আমার গালটা চিহ্নিত করতে চাই না। যদি একান্তই

চুমা খেতে চাও, তাহলে আমার ঠোঁটে চুমা দাও, দয়াময় বিধাতা ঐ জায়গাটি চুমার জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছেন।"

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে ইসাবেল হাত দিয়ে আমার মাথাটি ধরে ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁটের ওপর এক পুরু রঙের ছাপ লাগিয়ে দিল। সে অনুভূতি মোটেই অতৃপ্তিকর নয়।

বল্লাম ঃ "এখন ত' চুমা খাওয়া শেষ হল, এখন বলোত কি চাও।"

"উ প দে শ।"

"আমি সাগ্রহে উপদেশ দেব, কিন্তু আমার ত' মনে হয় না তুমি তা মেনে নেবে। একটি মাত্র কাজ তুমি করতে পার—আর মন্দের ভালো হিসাবেই সেই পন্থাটাই শ্রেয় মনে হয়।"

পুনরায় ক্ষেপে গিয়ে ইসাবেল আমার গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর ফায়ার প্লেসের ধারে রক্ষিত অপর একটি চেয়ারে বসে পড়ে বলেঃ

"আমি বসে থেকে লারী উচ্ছন্নে যাবে, দেখতেঁ পারব না। ঐ নোঙরা স্ত্রীলোককে যাতে ও বিয়ে করতে না পারে তার জন্য আমি কিছু করতে আর বাকী রাখবো না।"

"তুমি সফল হতে পারবে না, দেখো ও প্রবল অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত, মানব-হৃদয়ের মধ্যে অতীব শক্তিমান এই ভাবাবেগ।"

"আপনি কি বলতে চান যে, লারী সোফীর প্রেমে পড়েছে?"

"না—তুলনা হিসাবে কথাটি অকিঞ্চিৎকর।"

"তুমি কি নিউ টেস্টামেন্ট্ পড়েছ?"

"মনে ত হয়।"

"মনে নেই যীশু কিভাবে জনহীন অঞ্চলে গিয়েছিলেন ও চল্লিশ দিন উপবাস করেছিলেন? তারপর যখন ক্ষুধার্ত হলেন, তখন শয়তান এসে বল্ল, তুমি যদি বিধাতার তনয় তাহলে এই পাথরগুলি রুটি বানিয়ে দাও দেখি। কিন্তু যীশু লোভ সংবরণ করলেন। তারপর সেই শয়তান যীশুকে এক মন্দির শীর্ষে নিয়ে গিয়ে বল্ল ঃ তুমি যদি বিধাতার তনয় হও তাহলে এখান থেকে ঝাঁপ দাও। কারণ দেবদূতদের ওপর তাঁর শরীর রক্ষার ভার, তারাই যীশুকে রক্ষা করবে। পুনরায় যীশু সংযত রইলেন। তারপর এক উচ্চ গিরিশিখরে যীশুকে নিয়ে গিয়ে সেই শয়তান পৃথিবীর রাজ্যাবলী দেখাল এবং বল্ল যদি শুধু শয়তানের পদতলে পড়ে তার উপাসনা করে তাহলে ঐসব রাজত্ব সে যীশুকে দান করবে। কিন্তু যীশু বল্লেন ঃ শয়তান তুমি দূর হও। — সরল প্রাণ ম্যাথু বর্ণিত কাহিনীর এইখানেই শেষ। কিন্তু এই শেষ নয়, শয়তান অতি চতুর, সে পুনরায় যীশুর কাছে এসে বল্লে ঃ কিন্তু তুমি যদি অপমান ও লজ্জা গ্রহণ করো, কণ্টক মুকুট মাথায় পরো এবং ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে মরণ বরণ করতে পারো, তাহলে তুমি মানব-সমাজকে ত্রাণ করতে পারবে। মহত্তর প্রেমের এই হল উপযুক্ত ব্যক্তি, প্রিয়জনের জন্যই সেই মানুষ তাঁর জীবন বিসর্জন করে। যীশুরও জীবনাবসান ঘট্ল। হাসতে হাসতে শয়তানের পেটে খিল ধরে গেল, কারণ শয়তান জান্ত—মুক্তিদাতার নাম নিয়েই মানুষ পাপ করে যাবে।"

ইসাবেল অশ্রদ্ধার ভঙ্গীতে আমার পানে তাকিয়ে বলে ঃ "এ সব আবার আপনি পেলেন কোথায়?"

"কোথাও নয়, এমনই ঝোঁকের বশে আবিষ্কার কর্লাম।"

"কথাগুলি শুধু নির্বোধের মত নয়—গ্লানিকর।"

"আমি শুধু এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম যে, আত্মত্যাগ জিনিসটা এমনই মানুষকে অভিভূত করে ফেলে যে, তার কাছে লালসা বা বুভুক্ষা অতি তুচ্ছ। ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ পরিণতির জন্য আত্মত্যাগ তার শীকারকে ধ্বংসের পথে চালিত করে। লক্ষ্যবস্তুর জন্য কিছু এসে যায় না, তার মূল্য থাকতে পারে আবার অতি অকিঞ্চিৎকর হতেও পারে। কোনো মদিরায় এত মাদকতা নেই, কোনো প্রেম মানুষকে এভাবে বিধ্বস্ত করে না, কোনো পাপ এতদূর প্রবলভাবে মানুষকে তাড়িত করে না। মানুষ যখন আত্মবলিদান দেয় তখন সে বিধাতার চেয়ে বড়ো, কেননা, যে বিধাতা অনন্ত ও সর্বশক্তিমান, তিনি কি করে আত্ম-বলিদান দেবেন? বড়জোর তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানটি বলিদান দিতে পারেন।"

ইসাবেল বলে ওঠে, "হা ভগবান, কি বাজে বকতে পারেন।"

আমি সে কথায় মন দিই না। বলিঃ

"যদি সে এমনই এক প্রবল আবেগে অভিভূত হয়ে থাকে, কি করে তুমি মনে ভাবতে পারো যে, সুবিবেচনা বা শুভবুদ্ধি লারীকে প্রভাবিত করতে পারে? এতদিন ধরে ও কিসের সন্ধানে ঘুরে মরছে তোমার জানা নেই, আমিও জানি না, শুধু অনুমান করতে পারি। এই দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, যা কিছু অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে, ওজনের পাল্লায় ওর এই বাসনার (শুধু বাসনা কেন তার চাইতেও বেশী) কাছে কিছুই নয়। সে বাসনা হ'ল বাল্যে যাকে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ বলে জান্ত সেই ব্যাপিকা ব্যাভিচারিনীর পবিত্র আত্মাকে ত্রাণ করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা। আমার মনে হয়, তোমার কথাই ঠিক, ও এক অসম্ভব কাজে হাত দিয়েছে। ওর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে এই পতিতার সকল যন্ত্রণার তীব্রতা ও স্বয়ং ভোগ করবে; ওর জীবনের কর্ম—যাই হোক্ না কেন, তা অপূর্ণ রয়ে যাবে। ইতর পারিস একিলেশের পায়ে তীরের আঘাত হেনে তাকে হত্যা করেছিল। মাথার চার পাশের জ্যোতিটুকু লাভ করার জন্য সাধুদেরও যে পরিমাণ দৃঢ়তা থাকে লারীর চরিত্রে সেটুকুরও অভাব আছে।

ইসাবেল বলে, "আমি ওকে ভালোবাসি। বিধাতা জানেন, ওর কাছে আমি কিছুই ত' চাইনি, কিছু প্রত্যাশাও করি না। আমার মতো নিঃস্বার্থভাবে ওকে কেউ ভালোবাসতে পারবে না। আর সে আজ কি অসুখীই না হতে চলেছে"

ইসাবেল কাঁদতে থাকে, ভাবলাম এতে ওর মঙ্গল হবে, তাই সেই অবস্থাতেই তাকে থাকতে দিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে যে ভাব আমার মনে উদিত হয়েছিল সেই বিষয়েই অলসভাবে চিন্তা করতে লাগলাম, কল্পনা-বিলাস। খৃষ্টনীতি থেকে যে যুদ্ধের উদ্ভব হয়েছে, ক্রিশ্চান ক্রিশ্চানের প্রতি যে নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতা ও বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে, তাদের ভিতর যে-অসহিষ্ণুতা, ভণ্ডামি, করুণাহীনতা প্রকাশ পেয়েছে, সেই সব লক্ষ্য করে, হিসাব-নিকাশের খতিয়ান শয়তান নিশ্চয়ই প্রসন্ন চিত্তে দেখেছে—এই অনুমান না করে আমি পারলাম না। আর যখন শয়তান ভাবে যে, নক্ষত্রখচিত আকাশের সৌন্দর্য মানুষের পাপের গুরুভার কলঙ্কিত করে তুলেছে, উপভোগ্য পৃথিবীর চলমান আনন্দরাশি বিষাদের কালো ছায়ায় ঢেকে দিয়েছে তখন সে নিশ্চয়ই মুখ টিপে, হেসে বলেঃ শয়তানকে তার প্রাপ্য দাও।

কিছু পরে ইসাবেল তার ব্যাগ থেকে রুমাল আর আয়না বার করে নিজের মুখখানি দেখে চোখের কোণগুলি সাবধানতার সঙ্গে মুছে নেয়। সহসা সে বলে ওঠে, "আপনি বড় সহানুভূতিপ্রবণ—না?"

আমি বেদনাকাতর দৃষ্টিতে তার পানে তাকালাম, কোনো উত্তর দিলাম না। ইসাবেল তার মুখে পাউডার লাগাল, ঠোঁট দুটি আবার রাঙিয়ে নিয়ে বল্লঃ—আপনি এইমাত্র বল্লেন, এতকাল লারী কি করছে সে বিষয়ে আপনার একটা ধারণা আছে, তার অর্থ কি?"

"এ আমার অনুমান মাত্র, আমার ভুলও হ'তে পারে। আমার মনে হয়, সে কোনো দর্শনের সন্ধানে আছে, কিংবা ধর্মতত্ত্ব, কিংবা এমন একটা জীবন-নীতি যা ওর হৃদয় ও মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে।"

কয়েক মুহূর্ত ইসাবেল কথাগুলি ভাবল—তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল।

"মারভিন, ইলিনয়ের একজন গ্রাম্য ছেলের এই মনোভাব হবে একি বিস্ময়ের কথা নয়?"

"মাসাচুসেটসের লুথার বারাবাঙ্ক যদি বীজহীন লেবু বা মিচিগানের খামারে জন্মে, হেনরী ফোর্ড যদি টিনের গাড়ি আবিষ্কার করতেন তাহলে তা যেমন বিস্ময়ের কারণ হ'ত না, এও তেমনই তার চেয়ে বিস্ময়ের কথা নয়।"

"ও সব হ'ল ব্যবহারিক বিষয়। এসব আমেরিকার ঐতিহ্য।"

আমি হাসলাম।

"সবচেয়ে ভালোভাবে কি ক'রে থাকা যায় সেই শিক্ষা করার চাইতে অধিকতর ব্যবহারিক আর কি হ'তে পারে?"

ইসাবেল তন্দ্রাজড়িত ভঙ্গিতে বলেঃ

"আমাকে কি করতে বলেন?"

"তুমি ত' লারীকে একেবারে হারাতে চাও না—চাও কি?"

ইসাবেল মাথা নাড়ল।

"তুমি ত' জানো ও কি রকম সৎ, ওর স্ত্রীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশ না করলে ও কিছুতেই তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। তোমার যদি বুদ্ধি থাকে তাহ'লে সোফীর সঙ্গে তুমি বন্ধুতা করবে। অতীত ভুলে গিয়ে তুমি যেমন মনোরম হ'তে পারো, তেমনই মনোরম হয়ে উঠবে। সোফীর যখন বিয়ে হবে, তখন নিশ্চয়ই কিছু নূতন পোষাক-পরিচ্ছদ কিনতে হবে, তুমি কেন ওর কেনাকাটায় সাহায্য করার প্রস্তাব জানাও না! আমার ত' মনে হয়, সোফী এ প্রস্তাবে লাফিয়ে উঠবে।"

ইসাবেল চোখ ছোট করে আমার কথাগুলি শুনছিল। আমি যা বলছিলাম তা সে গভীর মনোযোগ ভরে শুনছিল। কয়েক মুহূর্ত সে চিন্তা করতে লাগল, কি তার মনের ভিতর চলছিল অনুমান করতে পারিনি, তারপর ও আমাকে চমকিত করে বললঃ

"ওকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করবেন? গতকাল লারীকে যা বলেছি তারপর অবশ্য একটু বিসদৃশ ঠেকবে।"

"যদি ওকে বলি তাহ'লে কি তুমি ওর সঙ্গে ভব্য ব্যবহার করতে পারবে?"

"ওঃ, স্বর্গের দেবীর মতো ব্যবহার করব।" ইসাবেল মনোরম হেসে জবাব দেয়।

"আমি এখনই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।"

ঘরেতেই একটা ফোন ছিল। আমি সোফীর নম্বর খুঁজে বার করলাম। ফরাসী টেলিফোন সম্পর্কে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন যে, লাইন পেতে কি পরিমাণ ধৈর্যের প্রয়োজন, যথারীতি বিলম্বের পর সোফীকে পেলাম। আমার নাম বললাম।

বল্লাম, "এইমাত্র প্যারী পেঁৗছে জানলাম, তোমার আর লারীর বিবাহ স্থির হয়েছে। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, আশা করি, তোমরা খুব সুখী হবে।" আমি একটা চীৎকার সামলে নিলাম, কারণ ইসাবেল আমার নরম বাহুমূলে বিশ্রী চিমটি কাটলো। আবার বলি, "আমি অল্প কয়েকদিন এখানে থাকব, তুমি আর লারী আগামী পরশুদিন রিজে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে, আমি গ্রে, ইসাবেল ও এলিয়ট টেমপেলটনকেও নিমন্ত্রণ করছি।"

"আমি লারীকে জিজ্ঞাসা করছি, ও এখানেই আছে।" তারপর একটু থেমে বলে, "হ্যাঁ, আমরা সানন্দে যাব।"

আমি একটা সময় স্থির করে দিলাম, একটা ভদ্র মন্তব্য করলাম, তারপর রিসিভারটি যথাস্থানে রেখে দিলাম। ইসাবেলের চোখে একটা এমন ভাব লক্ষ্য করলাম যা আমার মনে ঈষৎ সংশয়ের ছায়াপাত করলো।

আমি জানতে চাইলামঃ "কি ভাবছ? তোমার ও চোখের চাউনি আমার ভালো ঠেকে না।"

"তাই নাকি! আমি দুঃখিত। আমার ত' ধারণা ছিল, আমার ঐটুকুই আপনার পছন্দ ছিল।"

"ইসাবেল তোমার কোনো কুমতলব নেই ত' —সেই কথাই ভাবছ নাকি!"

ইসাবেল চোখ বিস্ফারিত করে বলেঃ

"আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি কোনো মতলবই আমার নেই। এখন লারীর হাতে পড়ে সোফীর কি রকম সংস্কার হয়েছে তা দেখার জন্য আমি আকুল হয়ে আছি। মুখে এক গাদা রঙ মেখে সে 'রিজে' এসে হাজির না হ'লেই বাঁচি।" (ক্রমশ)

বাঘ

শ্রীগিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়

দুধ খাবার পরে মুখ সারা দিনভর
আলসেমি ঝিম্ চোখে বাঘ শুয়ে রয়;
ডালে-ডালে-বোনা ছাদ, রোদ তারপর,
বাদামী সবুজ রাত জঙ্গলময়।
ঘুম-ভাঙা চোখে কভু তাকায় হঠাৎ
জ্বলে ওঠে পোখরাজ পীত রোশনাই,
প্রবালের লাল হাঁয়ে শঙ্খের দাঁত
ঝক্‌মক্ করে ওঠে তোলে যেই হাই।
ধারালো গরম দাঁতে ঝড়ে পড়ে লাল
রেশমের আঁশ যেন কাঁপে চিক্ চিক্,
মাঝ-ফাটা জিভ তার, নিঃশ্বাস ঝাল
ঝাঁঝে তার মরে যায় পোকা ঝিক্‌মিক্।
গোঁফ সে সোনার তার, চামড়া নরম
জাফ্‌রানি মখমল কালো ডোরাময়,

বাদামী সবুজ বন গুমোট গরম
দিন-ভর ঝিম চোখে বাঘ শুয়ে রয়।
রক্তের ঝিমে কভু জাগে আহ্লাদ
বাঘিনীর ঘাড় চাটে, কামড়ায় কান;
দিন শেষ, ঝিম শেষ, বনশেষে চাঁদ—
শিরায় শিরায় নামে হিংসার বান।
রাত আসে শিকারের আসে মরশুম,
ডাল-পালা চুঁয়ে পড়ে জোছনার জল;
বাঘগুলি ঘোরেফেরে চোখে নাই ঘুম;
আলো-ছায়া আলপনা আঁকা বনতল।
দশদিক নিঃঝুম, কখন হঠাৎ
জঙ্গল কেঁদে ওঠে তীক্ষ্ণ ব্যথায়,
জোছনায় জ্বলে ওঠে নখ চোখ দাঁত,
লালের জোয়ার বয় আলো ও ছায়ায়।

গান্ধীবাদ ও কুটীরশিল্প

শ্রীমনকুমার সেন

"বাদ" বা "ইজম" বলতে আমরা কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীবিশেষের যে বিশেষ মতবাদ বুঝে থাকি, "গান্ধীবাদ" এরূপ কোন "বাদ" নয়। আগত ও অনাগত কালের সর্বদেশের সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সত্য, প্রেম ও অহিংসার শাশ্বত ভিত্তির উপর পৃথিবীতে নূতন সভ্যতা পত্তনপ্রয়াসী যে কর্মনীতি তাহাই "গান্ধীবাদ" নামে খ্যাত। মহাকর্মী গান্ধীই এই কর্মনীতির দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, তাই আমরা একে "গান্ধীজম্" বলে থাকি, নতুবা এই কর্মনীতিকে আমরা 'হিউম্যানিজম্' বা "মানবতাবাদ" বলে আখ্যাত করলেও কিছুমাত্র ভুল হবে না। আধুনিক সভ্যতার ও অভ্যস্ত চিন্তাধারার গণ্ডীমুক্ত করে মানবজীবনকে প্রকৃত সুখ ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই গান্ধীবাদের উদ্দেশ্য। যন্ত্রের উন্মাদনা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠুক, তার প্রতিভা তার মানবীয় বৃত্তিগুলো স্বভাব-স্ফূর্ত হয়ে তার জীবনকে সর্বতোভাবে কল্যাণমুখী করে তুলুক গান্ধী-দর্শনের ইহাই গোড়ার কথা। মহাভারতের ইতিহাসে সত্য, প্রেম, অহিংসা কিছু নূতন কথা না হলেও মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বদাই তার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব এবং সে প্রয়োগের কল্যাণময় পদ্ধতি মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহারে, জাতির সহিত জাতির সম্পর্কে রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে শাশ্বত কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে পারে—এই অভিনব কলা-কৌশলের প্রথম প্রবর্তক ও সার্থক প্রয়োগকারী গান্ধী। এই পদ্ধতির, এই পথের গতিভঙ্গী, রীতি, কর্মকৌশল সকলই চিরাচরিত পথ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই চলতি মাপকাঠিতে সেই পদ্ধতিকে বুঝতে গেলে, সেই পথের হিসাব নিতে গেলে সেটা শুধু হেঁয়ালী হয়েই দাঁড়াবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাই 'গান্ধীবাদ' অনেকের কাছেই একটা হেঁয়ালী, একটা অতি অসম্ভব 'এক্সপেরিমেন্ট' ছাড়া আর কিছুই নয়। গান্ধীজী ছিলেন কর্মযোগী, 'গান্ধীবাদ' আগাগোড়া কর্মের সুরে গাঁথা। এই কল্যাণ কর্মসাধনা করতে হলে ত্যাগ চাই, ভোগীর মোহ ছাড়িয়ে ত্যাগীর উদারদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া চাই। আজিকার দিনের জগতে মানুষের কর্ম-চাঞ্চল্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব বিকাশ, সৃষ্টির বহুতর বৈচিত্র্য সব কিছুর দৃষ্টি ভোগের প্রতি নিবদ্ধ। ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ বাড়িয়ে মানুষের নিত্য নূতন চাহিদা মিটানোই আধুনিক কর্ম-প্রচেষ্টার অন্তিম লক্ষ্য। সেখানে মানুষের চাইতে মানুষের ভোগের ও বিলাসের উপকরণ, 'জীবনে'র চাইতে 'জীবনযাত্রা'র মান—'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লাইফ'-এর চাইতে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং' প্রেয় ও শ্রেয়ঃ। সুতরাং এ যুগের দৃষ্টিতে 'গান্ধীজম্' স্বভাবতঃই একটি অতিঅসম্ভব হেঁয়ালী।

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক মতবাদ আধুনিক নীতিবিবর্জিত অর্থনীতির আপোষহীন প্রতিবাদ। মানুষের শাশ্বত সুখ ও কল্যাণের পথ আধুনিক অর্থনীতি নির্দেশ করতে পারে নি, করেছে চরখাকেন্দ্রিক গান্ধীজীর গঠন-কর্মসূচী।

আধুনিক অর্থনীতির মূল কথা মুনাফা। অগ্রে পণ্যের উৎপাদন করে তৎপর তার চাহিদার সৃষ্টি করা এবং এমনি করে বহুলোক বহুতর পণ্যের বিক্রয় করে মুনাফা করা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্য। এ ব্যবস্থায় প্রয়োজনানুযায়ী পণ্যের উৎপাদন হয় না, উৎপাদন করে প্রয়োজন বা চাহিদার সৃষ্টি করা হয়। জাপানের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্পোন্নত জাপান তার শিল্পপণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করতে থাকে। যতই দিন যেতে থাকে জাপান বুঝতে পারে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে না পারলে পণ্যের বাজার আশানুরূপ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না! তখুনি তার লুব্ধ হিংস্র দৃষ্টি পড়ল চীনের উপর—কারণ চীনই ছিল তার পণ্যের প্রধান বাজার। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিদেশী পণ্য ক্রয় করার অর্থ হচ্ছে বিদেশী শাসনশক্তিকে আমন্ত্রণ করা। একই সময়ে আমরা বিদেশী পণ্য চাইব কিন্তু বিদেশী শাসন চাইব না এ অসম্ভব। গলিত শব যেখানে শকুনি সেখানে ঘুরে ফিরে আসবেই, কাজেই সর্বোত্তম পন্থা হল শব পুঁতে ফেলা। বিদেশী পণ্য এই গলিত শবমাত্র। প্রশ্ন হবে, তাহ'লে কি দেশ-বিদেশের মধ্যে পণ্যের আদান-প্রদান হবে না? হবে নিশ্চয়ই, তবে সেটুকু শুধুই উদ্বৃত্ত পণ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী রেখে বাকীটুকু আমরা বিদেশে রপ্তানী করতে পারি, তার নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে ব্রহ্মদেশ উদ্বৃত্ত চাল বিদেশে রপ্তানী করতে পারে। এমনি করে বাড়তি ও ঘাটতি দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের আদান-প্রদান হবে শুধুই পারস্পরিক সুবিধার জন্যে, লাভের জন্যে নয়।

অগ্রিম উৎপাদন করে' উৎপন্ন পণ্যের জন্য চাহিদা সৃষ্টির কথা আমরা বলেছি। সাধারণতঃ প্রচার বা বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই চাহিদা সৃষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং এই প্রচার অভিযানে অনেক ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জন বা অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এতে প্রত্যক্ষভাবে হিংসার উদ্ভব হয়না সত্য, কিন্তু মিথ্যার উপর ভিত্তি বলেই এই ব্যবস্থা সর্বথা পরত্যাজ্য।

ভোগ্য পণ্য ছাড়াও যে মানবজীবনের কাম্য কিছু থাকতে পারে—এবং প্রকৃতপক্ষে জীবনের আর কোন মহত্তর উদ্দেশ্যও যে আছে—আমরা তা' ভুলে গেছি। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যে মানুষের ব্যক্তিত্ব নেই, তার চরিত্রও নেই—সে মৃত, জীবন্মৃত। মানুষের প্রতিভা, সহজাত মানবীয় বৃত্তিগুলোর স্বাভাবিক স্ফুরণের মধ্য দিয়েই মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে তার সত্যিকারের মনুষ্যত্ব। প্রতিভার ও সহজাত বৃত্তির এই স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে নিত্য নূতন রূপ অভাব পূরণের প্রয়োজন নেই; বস্তুতঃ জীবনযাপন প্রণালী যতো সহজ সরল হয় ব্যক্তিত্ব লাভের এই সাধনাও ততোই সুসাধ্য হয়ে ওঠে। 'জীবনযাত্রা'র মাপ নয় 'জীবনে'র মাপ উঁচু করাই এই সাধনার লক্ষ্য। 'স্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লাইফ' ও 'স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর এই মূলগত বৈষম্যটুকু স্মরণ রাখা দরকার। আমাদের মত দেশে যেখানে খেয়ে পরে বেঁচে থাক্‌বার মতো ন্যূনতম উপাদানটুকুও মিলছে না, সেখানে 'লিভিং' বা বেঁচে থাকাটাই প্রধান কথা, 'লিভিং-এর স্ট্যাণ্ডার্ড' উঁচু করবার প্রশ্ন গৌণ প্রশ্ন। আর 'লিভিং-'এর স্ট্যাণ্ডার্ড' উন্নততর করার অর্থেও আমরা বুঝে থাকি ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি, জীবনের গুণগত অবস্থা নয়। সুতরাং 'স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর কথা না তুলে 'সহজ জীবন' ও "জটিল জীবন" বলাই সঙ্গত। ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ ও সংখ্যা দিয়েই যদি জীবনের "স্ট্যাণ্ডার্ড" যাচাই করতে হয় তাহলে তো মিঃ চার্চিলের 'স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং' গান্ধীজীর চাইতে কতো বেশী উন্নততর। সুতরাং আমাদের কাম্য হচ্ছে সহজ সরল উন্নততর, 'স্ট্যাণ্ডার্ডের' জীবন। শত সহস্রাধিক পণ্যের বেড়াজালে যে জীবন আবদ্ধ তাকেই আমরা জটিল জীবন বলব। এরূপ 'জটিল' জীবনের মানুষের প্রতিভা স্ফূর্ত হতে পারে না, মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশ তাতে ব্যাহত হয়ে পড়ে।

সকল মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পূর্ণ ব্যবস্থা করাই গান্ধী পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য। এগুলি আমাদের অত্যাবশ্যক এবং আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা সহজলভ্য। প্রকৃত কল্যাণমূলক কোন পরিকল্পনায় ভিন্নতর কোন উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব নয়।

এই পরিকল্পনার কর্মনীতি হবে এমন, এরূপ প্রণালীতে কাজ চালাতে হবে, যাতে করে উৎপাদন ও বণ্টন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে সমান-তালেই চল্‌তে থাকবে। তা না হ'লেই একদিকে সম্পদ স্তূপীকৃত হতে থাক্‌বে অপর দিকে দেখা দেবে চরম দুঃখ ও দারিদ্র্য।

উৎপাদনের দুটি উপায় আছে, অধিক যন্ত্র ও অল্প কায়িক শ্রম এবং অধিক শ্রম ও অল্প যন্ত্রপাতি। আমাদের দেশে "মূলধন" বা "যন্ত্রপাতি" দুটিরই অভাব কিন্তু শ্রমশক্তির কিছুমাত্র অভাব নেই। আমাদের টাকা নেই লোক আছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অবস্থা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে লোকশক্তিরই অভাব মূলধন বা যন্ত্রের অভাব নেই সুতরাং ওদেশগুলোর সঙ্গে তুলনা-মূলক বিচার করবার আগে ওদের সঙ্গে ভারতের এই মৌলিক পার্থক্যটা ভেবে দেখা দরকার। কাজে কাজেই এদেশের শিল্প-পরিকল্পনা সার্থক করতে হলেও ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সেই পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

ভারতের কোটিপতির সংখ্যা ধরে নেওয়া যায় এক সহস্র। সম্পদশালী এই এক সহস্র কোটিপতিকে দিয়ে ভারতবাসীর ভারতকে যাচাই করা চলে না। সুতরাং আমাদের সমস্যা হচ্ছে দেশের সম্পদ এই ত্রিশ কোটির মধ্যে সুসমবণ্টন করা। এমন কি সুসমবণ্টনের দ্বারা উৎপাদন ছাড়াও সম্পদের মূল্য বাড়ানো চলে। একটা সহজ দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। লক্ষপতির হাতে একটি টাকা আর দৈনিক মজুরের হাতে একটি টাকা এই দুটি টাকার মূল্যে প্রভেদ অনেক। লক্ষপতির টাকাটি দিয়ে যে সিগার কেনা হ'বে মজুরের হাতে পড়লে তার দ্বারা সে তার উপবাসী স্ত্রী-পুত্রের ক্ষুন্নিবৃত্তি করাবে। কাজেই টাকার চলতি মূল্য আর মানবিক মূল্য (human value) সম্পূর্ণ আলাদা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই নিখিল ভারত গ্রাম শিল্প সংঘের সভাপতি অধ্যাপক জে সি কুমারাপ্পা বলেছেন যে, সরকারী নীতি এমনভাবে নির্ধারণ হওয়া উচিত যাতে গরীবের কাছ থেকে সংগৃহীত কর ধনীর সুখ-সুবিধার্থে ব্যয়িত না হতে পারে। পক্ষান্তরে ধনীর স্ফীত তহবিল দরিদ্রের জন্যে বণ্টিত হলে সমাজে ধনসাম্য আসবে। এবং এমনি করে উৎপাদন না বাড়িয়েও জাতীয় সম্পদ বাড়ানো সম্ভব হবে।

কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থা আধুনিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থায় যে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন সেটা দেশের মোট অর্থেরই একটা আবদ্ধ অংশ। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে চলতি মুদ্রা থেকে টাকা আটকে রেখেই ক্রমে ক্রমে এই বিরাট তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে। জলপ্রবাহে বাঁধ সৃষ্টি করার ন্যায় মুদ্রার স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করে, সুসম বণ্টন ব্যাহত করেই মূলধনের সৃষ্টি। সময় সময় মন্দা-বাজার বা চড়া-বাজার বলে আমরা যা শুনে থাকি এবং অনুভব করে থাকি সেটা শুধু এই মূলধনেরই কলাকৌশল। মূলধন বল্‌তে এ স্থলে শুধু টাকা নয়, টাকার দ্বারা ক্রয়যোগ্য দ্রব্য সমাগ্রীও বুঝতে হবে। কালোবাজারের এবং চোরাবাজারের কল্যাণে এই আবদ্ধ সম্পদের গতি প্রকৃতি আমরা গত মহাযুদ্ধের সময় থেকেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

যে মিল-মালিকের মিলে দশ হাজার টাকার কাপড় তৈরী হয়, মজুরী বেতন ইত্যাদিতে তিনি হয়ত ব্যয় করলেন তিন হাজার টাকা, অর্থাৎ বাজারে দশ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় ছাড়া হ'লেও ক্রয়শক্তি ছাড়া হল মাত্র তিন হাজার টাকার। স্বভাবতঃই সে মাল আর সম্পূর্ণ কাট্‌তি হতে পারে না। এমনি করে বিভিন্ন মিলে, বিভিন্ন স্থানে মাল স্তূপীকৃত হতে থাকে এবং মন্দা-বাজার বা depression-এর সৃষ্টি হয়। এ depression থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যই হয় যুদ্ধ। সুতরাং পাশ্চাত্য অর্থনীতির এই কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থায় যুদ্ধ একটা প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদনের এই প্রণালী যতদিন থাক্‌বে যুদ্ধ কোনক্রমেই এড়ানো যাবে না।

কেন্দ্রীভূত শিল্পপণ্যের উৎপাদন ব্যয় কুটীর শিল্পজাত পণ্যের চাইতে কম এ যুক্তি যাঁরা প্রদর্শন করেন তাঁদের বাস্তব-বিচারের অভাব রয়েছে। কেন্দ্রীভূত শিল্পোৎপাদনে আমরা মূল্য হ্রাসের কথাই বল্‌ব কিন্তু কুটীর-শিল্পের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধিই প্রয়োজন। পণ্যের মূল্য হ্রাস করা যেতে পারে দুই প্রকারে যথা, (১) কাঁচা মালের মূল্য হ্রাস করে, এবং (২) কর্তৃপক্ষের মুনাফা নিয়ন্ত্রিত করে। কাঁচামালের মূল্য হ্রাস করা আদৌ সমীচীন নয়, সুতরাং মূল্য হ্রাস করতে হ'লে মুনফাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। একশত টাকা মূল্যের গহনা যে ব্যক্তি চুরি করে এনেছে তার পক্ষে সেটা পনেরো টাকায় বিক্রী করেও পনেরো টাকা লাভ করা সম্ভব কারণ গহনার কোন ব্যয়ই তাকে বহন করতে হয়নি।

সীমাবদ্ধ বাজারে কুটীর শিল্পজাত পণ্যের লেনদেন হয়ে থাকে। সুতরাং বর্ধিত মূল্যের দ্বারা কুটীরশিল্পী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কারণ মূল্যস্ফীতির জন্য যে অর্থের প্রাচুর্য ঘটবে সেটা কোন ব্যক্তি বিশেষের মুনফা হবে না, সহজ সরল প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের মধ্যে সে অতিরিক্ত অর্থ হস্তান্তরিত হবে। চরখার মূল্যে বৃদ্ধি পেলে ছুতোর এবং কর্মকারের মজুরীও বৃদ্ধি পাবে এবং বর্ধিত মজুরী পেলে বর্ধিত মূল্যে আহার্য, পরিধেয় সংগ্রহ করতেও তাদের কষ্ট হবে না। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কুটীর শিল্পজাত যে সম্পদ সেটা বর্ধিত মূল্যের মাধ্যমে জন-সাধারণের মধ্যে বণ্টিত হয়ে গেল।

গান্ধীজী পরিকল্পিত এই মানবিক অর্থ-নীতির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের সম্পদ গ্রামেই সীমাবদ্ধ রেখে লোকশক্তির পূর্ণ নিয়োগ করা। নিষ্কর্মা অলস মানুষের বৃত্তি-গুলো ক্রমেই নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তার অধোগতি হয়, নৈতিক অধঃপতন ঘটে। গান্ধীজী বলেছেন, "তিন কোটি মানুষের শ্রমের স্থলে যদি মাত্র ৩০,০০০ মানুষের মেহনতের দ্বারা আমার দেশের সমস্ত প্রয়ো-জনীয় পণ্য উৎপন্ন হয় তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ঐ তিন কোটি মানুষকে যেন বেকার বসে থাকতে না হয়।" ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে লোকশক্তির কত অপচয় হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ভারতীয় কৃষক বৎসরের প্রায় ৬ মাস অলস বসে থাকে, গান্ধীজী এই লক্ষ লক্ষ অলস জীবন্ত যন্ত্রগুলোকে সক্রিয় করতে চেয়েছেন।

নোয়াখালীর একটি প্রার্থনান্তিক সভায় তিনি বলেছিলেন, "কোন পরিকল্পনা যদি দেশকে তার কাঁচামাল থেকে বঞ্চিত করে এবং শ্রেষ্ঠ যে লোকশক্তি তাকে উপেক্ষা করে তবে সে পরিকল্পনা ধ্বংসশীল এবং তার দ্বারা মানব-সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।" পৃথিবীর সর্বপ্রধান শিল্পোন্নত দেশ আমে-রিকাও যে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্য ও অবনতি দূর করতে পারেনি তার কারণ এই সর্বজনীন লোকশক্তির উপেক্ষা।

শিক্ষক, ছাত্র, উকিল, ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী লেখক—সকল শ্রেণীর সকল লোকের কায়িক শ্রম করা উচিত বলে গান্ধীজী মনে করেন। এই শ্রমের দ্বারা শুধু যে বস্তুর উৎপাদন হল তাই নয়, শ্রমিকের মনেও তার এক কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার হয়ে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে বস্তুর চাইতেও মানুষের উপর শ্রমের এই শুভ প্রভাব অধিকতর মূল্যবান।

অনেকের কাছেই আজও একথা অস্পষ্ট যে সত্য ও অহিংসার প্রতিষ্ঠাই গান্ধী পরিকল্পিত কুটীরশিল্পের উদ্দেশ্য। আধুনিক শোষণমূলক উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষ যেভাবে দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে পড়ছে এবং দ্রুত সত্যের পথ থেকে সরে যাচ্ছে তাতে কুটীরশিল্পের সম্প্রসারণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই এর প্রতি-রোধের একমাত্র উপায়। অনেকের ধারণা, অর্থ-নীতিতে নীতিবাদের কোন স্থান নেই। কিন্তু ভাল-মন্দের বিচার করবার ও অন্যের প্রতি কর্তব্যকর্ম করবার প্রবৃত্তি আছে বলেই মানুষ মনুষ্যত্বের দাবী করতে পারে, তা না হ'লে পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়?' আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে বলেই মানুষ, মানুষ। মানুষের কল্যাণের জন্য রচিত অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনায়ও এই বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য।

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমর কিছুতে সহ্য করতে পারে না, বাণীর সঙ্গে অরবিন্দের আর কোন সম্বন্ধ থাকে। একটা অবুঝ নৈতিকতা মনটাকে সংস্কার-ধর্মী আর বিরূপ করে রাখে। সব কিছু বুঝতে পারলেও কিছু না বোঝার গোয়ার্তুমি মনকে পেয়ে বসে। বাণী-অরবিন্দের ব্যাপারটা যত না লজ্জার, তার সহস্র গুণ অপমানের আর অপরাধের মনে হয়। ইতিপূর্বে ভালবাসা সম্বন্ধে সমর নিজে যা কিছুই ভাবুক না কেন, এখন ওটাকে মস্ত অপরাধ বলে মনে হয়। যুবক-যুবতী ভালবাসবে কেন? এ শুধু ভুল নয় মারাত্মক ব্যাধি। বাণীর চেয়ে বেশি রাগ আর আক্রোশ হয় অরবিন্দের ওপর—বোনটাকে ভুলাবার তার কী অধিকার আছে? ভদ্রলোকের জানা উচিত ছিল, বোঝা উচিত ছিল, বাণীর মাথার ওপর অভিভাবক আছে; তাছাড়া বাণীর ভালমন্দ বোঝবারই বা কি ক্ষমতা হয়েছে। যত সব 'ইরেসপনসেবল্ আনথিঙ্কিং' ছোকরা! বুঝিয়ে বলে কিছু হবে না, গালে চড় মেরে বোঝাতে হবে, সমঝে দিতে হবে। একটা আহত মর্যাদাবোধ সমর কিছুতে ভুলতে পারে না।

অথচ ভালবাসার অযৌক্তিকতা বা অনভিপ্রেয়তা নিয়ে বোনকে কিছু বলাও যায় না। দোষ বাণী করেছে একশ'বার, কিন্তু সে-দোষের কি কৈফিয়ৎ চাইবে? বলবে, কেন কার হুকুমে তুই ভালবাসলি? এত বড় হৃদয়হীনের পরিচয় কি করে দেবে—নিজের মনে তো এখনো সংশয় আছে! বাণী যদি মুখের ওপর বলে বসে, আমার ইচ্ছে—তখন? ভালবাসা হুকুম মানে না, কেন'র বড় ধার ধারে না, এতো জানা কথা। তবুও বোনটাকে এই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত করবার ইচ্ছে যেন সমরকে পেয়ে বসে—কোনমতে ওদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে যেন অভিভাবক ভায়ের কর্তব্য করা হবে। না, না, এসব উচিত নয়—এ স্বৈরাচার চলবে না।

আজকাল সমর অষ্টপ্রহর বোনকে কাছে কাছে রাখে। কারণে-আকরণে বাণীর দাদার ধারে কাছে থাকা চাই। অনেকটা নজরবন্দীর মত। মা-বাবা দাদার হঠাৎ এই মতি-পরিবর্তনে খুশি হন। যাহোক বড়ছেলের তাঁদের সব দিকে নজর, প্রবীরের মত নয়। বাণীর কিন্তু এদিকে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পড়াশোনা ছাড়া আর কোন সময়ই সে কারো সঙ্গ চায় না, ভালও বাসে না। প্রথম প্রথম দাদাকে অসহায় ভেবে দরকারে-অ-দরকারে দাদার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রেখে যেন বাণী ভুল করেছে। দাদা মোটেই অসহায় নয়—যত সহজ ভালমানুষ ভাবা গিয়েছিল, তত সহজ ভাল-মানুষ তো নয়ই। কেন দাদা তার সমস্ত অবসর এমন করে জুড়ে থাকবে। প্রবাস থেকে যুদ্ধ করে ফেরায় যেটুকু নতুনত্ব দাদার মধ্যে ছিল, তা তো অনেকদিন ফুরিয়ে গেছে, আর কেন? দাদা কি বোঝে না সে কথা। ভয়ের চেয়ে দাদার ওপর যেন বাণীর এখন অশ্রদ্ধাই হয়—একি জ্বালা শুরু হলো। কেবল এটা নয় ওটা; ওরকমভাবে নয় এরকমভাবে—আজ এখানে, কাল ওখানে চল। চৌধুরী সাহেবের বোনের মত চালচলনে কেতাদুরস্ত করতে পারলে যেন সমর খুশি হয়। প্রথম প্রথম একটা কৌতুকের মত দাদার কর্তৃত্বটা বাণী গ্রহণ করেছিল—সাময়িক খেয়াল ভেবে ভালই লেগেছিল, এখন কিন্তু সেটা মর্মান্তিক অনুশাসনের মত মনকে তিক্ত করে দিচ্ছে, স্বাধীনতা হরণ করছে। সময় সময় বাণীর মনে হয়, সে যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছে—দাদা যেন তাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে, যার সংস্কার জ্ঞান হওয়া থেকে আদৌ প্রীতিকর নয়। তাদের বকুল-বাগানের ছোট্ট পরিবেশে আবাল্য পরিচিত আত্মীয়স্বজন, মানুষ-জন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মান-অভিমান আর দাদার যোদ্ধ-জীবনে পরিচিত আলাপী বন্ধুবান্ধব তাদের সামাজিক গণ্ডি কত না পার্থক্য। এক জায়গায় কেবল আত্মীয়তা আর এক জায়গায় কেবল আত্মম্ভরিতা। চৌধুরীদের বাড়ি প্রথম দিন আলাপ করতে যাওয়ার কথা বাণী ভুলতে পারে না—কেবল বসে থেকে অস্বস্তি ভোগ করা—নিজ নিজ হৃদয়ের বক্ষ-স্পন্দন শোনা। সেদিন এক কাপ চা না পাওয়ার দুঃখ হয়তো ভোলা বাণীর পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। নিজেকে হারিয়ে না ফেললেও সে-পরিবেশে নিজেকে যেন খুঁজে পাওয়া যায় নাঃ বাণীর সম্বন্ধে কজন সেদিন সচেতন ছিল? অপরপক্ষে নিজেকে দ্রষ্টব্য করাবার জন্যে চৌধুরীর বোনের সেদিন কি না চেষ্টা! রেবা যে ঘর ছেড়ে উঠে গেল, সেকি কেবল বিরক্তিতে না অপমানে? রাহার ব্যবহার একেবারে দুর্বোধ্য—বেচারা তাদের সঙ্গে আসতে চেয়ে কি ধমক খেল চৌধুরীর কাছে! আর চৌধুরী তো গাম্ভীর্যের, অহঙ্কারের পাহাড়বিশেষ!

মুখ ফুটে দাদাকে এসব কথা বলা যায় না। সমরও বোঝবার কোন চেষ্টা করে না। বাণীর আশ্চর্য লাগে, এই কদিনে তার এমন দাদারও কি পরিবর্তন। এই সেদিনও ঘর থেকে একবারও নড়তো না, এখন কারণে-অকারণে বাইরে বাইরে কাটিয়ে আসে দিনের বেশি ভাগ সময়। ছোড়দার সম্বন্ধে দাদার আর কোন আগ্রহ নেই—যেন যা করছে করুক গে আমার কি!

এ সময় একদিনও যদি অরবিন্দ আসতো বাণী নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলতে পারতো। অরবিন্দ কি কিছু ব্যবস্থা করতে পারতো না? এক-এক সময় মনে হয়, অরবিন্দ জেনে-শুনে ডুব দিয়েছে—সমরকে সে দূর থেকে ভয় করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু কিসের তার ভয়—কেন ভয়? অরবিন্দ কি এত কাপুরুষ! দাদার সামনা-সামনি একদিন এসে সে কি বলতে পারে নাঃ এই আমি এসেছি—আপনার কি বলবার আছে, বলুন মুখের ওপর বলতে পারে না, আমি বাণীকে ভালবাসি?

কোলের ওপর বই খুলে রেখে খোলা জানালার বাইরে বাণীর চোখ দুটো উদাস শূন্য হয়ে ওঠে—প্রথম শীতের শহুরে আকাশটা কেমন ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট কালো রেখায় উড্ডীন পাখীর গতি ওঠে-পড়ে—গলি মুখের ডালপালা ভাঙা কৃষ্ণচূড়া আর আদ্যি কালের নারকেল গাছটার মাথাটা যেন অনেক দূর মনে হয়। দূরাগত নগরের সমস্ত কোলাহল যেন শূন্যমণ্ডলটায় পর্যন্ত উঠে দুর্বোধ্যতায় ভারি হয়ে ঝুলছে, ঘোলাটে নৈসর্গিক চন্দ্রাতপ ছিঁড়ে সূর্যোদয় হবে নাকি

এমনি বসে থাকতে বাণীর ভালই লাগে এমনি সময়ে-অসময়ে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে কিভাবে পরীক্ষা দিয়ে বইয়ের পড়া মুখস্থ করে। অরবিন্দ যদি আর না আসে কোনদিন সেকি ভুলে যেতে পারবে অলকাদির মত অলকাদির মনের কথা সে বলতে পারে না কিন্তু এই কদিনে অরবিন্দের অসাক্ষাতে তার যা হচ্ছে, তা বোঝবারও যেন ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। কেবল একটা ভয়ের আচ্ছন্নতা মনকে জুড়ে আছে সর্বক্ষণ। বাবা হয়তো যাকে স্বীকার করেন, ছোড়দা যাকে সমাদর করে আজ দাদা যদি তাকে অপমান করে অস্বীকার করে? অরবিন্দ আসুক, দাদাকে বলুক বাণীকে আমি ভালবাসি। তাদের কাউকে কোন ভয় নেই—কোন কারণেই তারা ভয় পাবে না মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করার বড় ইচ্ছে হয়—এ স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে একদিন যেখানে দু চোখ যায় চলে যাবে কিন্তু একলা যাবার অভিমানে বিদ্রোহের সমস্ত উত্তাপ নষ্ট হয়ে যায়; অরবিন্দ যদি আর না আসে, তাহলে সে যাবেই-বা কোথায়? ইদানীং দাদার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটলে

মন কিছুতে ভরে না— অদ্ভুত শূন্যতা সময় সময় বোধ করা যায়।

মনে মনে এদের ওপর বাণী যতই বিরূপ থাকুক না কেন, সত্যি সত্যিই চৌধুরী সাহেব যেদিন তাদের বাড়ি এলো, বাণী খুশিই হলো, নিজেদের বড় সম্মানিত মনে করলে। চৌধুরী সাহেব যে তাদের বাড়ি আসবে, এ অভাবনীয়। বিশেষ করে চৌধুরীর মত লোক।

মিলিটারী পোষাকে সেদিনের চেয়ে আজ যেন ভদ্রলোককে মানিয়েছে। দরজা খুলেই বাণী থতমত খেয়ে গেলঃ একি ইনি! মানে?

চৌধুরী সাহেব হেসে জিগ্যেস করলে, দাদা আছে?

বাণীও হাসলে—কেন নিজেই যেন বুঝতে পারলে না। অস্ফুটে বললে, আছে। আসুন।

চৌধুরী ঘরে ঢুকতে দরজা বন্ধ করে দিতে গিয়ে বাণীর হঠাৎ বড় ভয় করে। বিনা কারণে আশ্চর্য হয়। যার আগমন অপ্রত্যাশিত তাকে সামনে উপস্থিত দেখে ভয় পায় কেন। চৌধুরী দাদার চেয়ে বড় যোদ্ধা বলে নয়, চৌধুরী বড়লোক বলে?

দরজা বন্ধ করে পিছন ফিরে সামনে এগিয়ে আসতে দেখলে, চৌধুরী সাহেব ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে টাঙান সুভাষ বোসের ছবির দিকে আলগোছা দৃষ্টি বোলাচ্ছে।

বাণীর পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ নামিয়ে চৌধুরী বললে, পেন্সিল স্কেচ? বেশ হয়েচে।

বাণী একটু যেন লজ্জা পায়। কিন্তু এখনো তো চৌধুরী কই জিগ্যেস করলে না, কে এ'কেছে। তাহলে আরো লজ্জায় পড়তো, বাণীর আরো ভালো লাগত। ভদ্রলোক বড় চাপা।

খানিকক্ষণ পরে চৌধুরী যেন নিজেকে বললে, Subhas Bose. Netaji! Azad Hind Fauz!

কথাটা বিদ্রূপের না শ্রদ্ধার, বাণী ধরতে পারে না। ভদ্রলোকের মুখের কোন পরিবর্তন হয়নি বাণী লক্ষ্য করলে। আজকের আর পাঁচজনের মত উনিও হয়তো শ্রদ্ধাবনত। বাণী আশা করলে, চৌধুরী সাহেব হয়তো আরো কিছু বলবেন—সুভাষ বোসের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব কাহিনীর নতুন কোন সংবাদ। দেশাত্মবোধের গরিমাময় হৃদয় পূর্ণ করা ইতিহাস।

চৌধুরী সাহেব আর কিছু না বলে সটান ওপরে উঠে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাণী বললে, দাদা কে এসেচেন দেখ!

চৌধুরী সাহেবকে অভ্যর্থনা করতে সমর বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভদ্রলোককে কোথায় বসতে দেবে? খাটে বসাবে, না চেয়ারে বসাবে, না নিজের ইজিচেয়ারটা ছেড়ে দেবে? ব্যস্ততাটা হঠাৎ দিশেহারার মত। কথা রাখতে আগে থেকে না জানিয়ে চৌধুরী যেন না এলেই পারতো।

দাদার ব্যস্ত-সমস্ত ভাবটা বাণীর বড় দৃষ্টিকটু লাগল। এত ব্যস্ত হবার কি আছে।

চৌধুরীও বোধ হয় বুঝে অপ্রস্তুত হল একটুঃ Needn't worry! চৌধুরী সাহেব চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

সমরের ব্যস্ত ভাব তখনো কাটেনি। বাণীর দিকে চেয়ে বললে, চায়ের ব্যবস্থা কর।

হঠাৎ কথাটা অপ্রস্তুতের মত নিঃশব্দ প্রতিধ্বনিতে ঘরময় ছোটাছুটি করে—আতিথেয়তার ও উপকরণ যেন বলা-কওয়ার অপেক্ষা রাখে না।

চৌধুরী বললে, থাক থাক, Just now I took—

সমর তাড়া দিলেঃ না না, তুই যা, কি যে বলেন—

চৌধুরীর যেন আর বলবার কিছু নেই এমনিভাবে হাত ঘুরিয়ে নেড়ে বললে, Then, as you like it.

বাণী যেতে যেতে দেখলে হাতের বেঁটে লাঠিটা চৌধুরী সাহেব ঠ্যাঙ-এর তলায় চেপে ধরে আছেন। এতক্ষণ যেন বাণীর দিকেই চেয়ে চেয়ে কি দেখছিল, চোখাচোখি হ'তে ঈষৎ হাস্‌লেন। বাণী তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। চৌধুরী কি সত্যিই গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারি লোক? হঠাৎ সন্দেহটা বিদ্যুৎ ঝলকের মত বাণীর মনে আসে।

কিছুক্ষণ পরে চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাণী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গেল। স্পষ্ট শুনতে পেলে চৌধুরী সাহেব সমরকে জিগ্যেস করছেঃ Do you believe these stories? সমর জিগ্যেস করলে, কি? What stories?

—Exploits of Azad Hind Fauz—their heroic deeds.

সমর যেন ইতস্ততঃ করলে, কি জবাব দিলে শোনা গেল না।

চৌধুরী সাহেব বলতে লাগলেনঃ

—Facts! All sentimental rubbish—meaningless!

সমর চৌধুরীকে সমর্থন করার সুরে বললে, ওতেই কিন্তু দেশ মেতে উঠেছে—ওছাড়া আর কোন কথা নেই, ছেলে বুড়ো সবাই। আমি আপনি আর কি করলুম!

চৌধুরী সাহেব ফুৎকার দিলেন, Funny! Let Red Fort decide their fate.

সমর চুপ করে রইল, এ'কদিন ধরে দেশের এই মাতামাতি নিয়ে তারও মনে নানা প্রশ্নের উদয় হ'য়েছে—কেন এই উদ্দীপনা? যুদ্ধশেষে বিজয়ী ব্রিটিশ সিংহের সামনে এ মাতামাতি আর কতক্ষণ!—এখন এক থাবায় শেষ করে দেবে! তবুও মাঝে মাঝে কেন জানি না সমরের মনে হ'য়েছিল, সে যদি পর্যুদস্ত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেনা-নায়ক হ'তো তা হ'লে তার গৃহ প্রত্যাগমন কত না আনন্দ উৎসবে মুখরিত হ'য়ে উঠতো। প্রবীর অমন মাতব্বরি করতো না—অলকা যেখানেই থাকুক না ছুটে আসতো। আজ তার যুদ্ধে যাওয়া বৃথা। শুধু সৈনিক হওয়ায় শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না, সৈনিকের দেশাত্ম বোধটাই শ্রদ্ধার, শ্লাঘার। তাদের যুদ্ধ করায় দেশকে রক্ষা করার সদিচ্ছা ছিল নাকি? Why, why did they fight? A mercenery soldier! না, না।

চৌধুরী সাহেব খোঁচা দিলেন, vanquished still arguing! হেরে গিয়ে বড়াই দেখনা! cowards become heroes!

সমর বললে, বাদ দিন ওকথা—দেখুন না দুদিনে সব কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে! It is better—

কথার মাঝখানে চৌধুরী বাধা দিয়ে বললে, Did you or I do nothing? we defended India in her worst calamity. How they forget? I wonder!

সমর বললে, ঐ তো মজা! কাকে বোঝাবেন, যুদ্ধে না গিয়ে এরা সবজান্তা হ'য়ে বসে আছেন—যেন মস্ত অপরাধ করেচি আমরা!

চৌধুরী উত্তেজিত হ'য়ে বললে, I tell you Mr. Dutta. These I.N.A. men will be hanged.

চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে বাণী প্রতিবাদ করলেঃ কখনো না!

পিছন থেকে আচমকা ঠেলে দিলে যেমন লোকে চমকে ওঠে সমর-চৌধুরী তেমনি চমকে উঠলো। দুজনের কেউই বাণীকে ঘরে ঢুকতে লক্ষ্য করেনি। বাণীর প্রতিবাদের যুক্তিহীনতার চেয়ে তার স্পর্ধাটাই যেন বেশী লাগে। হঠাৎ ঘা খাওয়ার মত দুজনে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হ'য়ে থাকে।

চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে হেসে চৌধুরী সাহেব বললে, না কেন? How do you know Miss Dutt?

বাণী মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলে, যাঁরা দেশকে ভালবাসে তাঁদের ফাঁসি হয় না।

চৌধুরী হো হো করে' হেসে উঠলঃ There are thousand and one instances before. Loving and hanging are not rare.

বাণী একটু যেন থতমত খেয়ে যায়—সে কি ভুল বললে? ভদ্রলোক হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে বড়! মুহূর্তের জন্যে পুনরায় দীপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেঃ দেশ সহ্য করবে না—সহ্য করারও একটা সীমা আছে।

চৌধুরী পূর্বের মত হেসে বললে, But deserters are no patriots.

হঠাৎ মুখটা বন্ধ করে' দেওয়ার মতই যেন চৌধুরীর কথাটা—কি উত্তর দেবে বাণী ভেবে পায় না। ওদিকে [illegible]

দিতে চৌধুরী সাহেব যেন গোঁফের আড়ালে হাসছেন, মনে হ'চ্ছে। লোকটাকে শুনিয়ে দেবার মত জবাব মুখের কাছে আসছে না—'ডেসারটারস' কথাটা বাণী এই প্রথম শুনলে যেন!

চৌধুরী বললে, দেশোদ্ধার ক'রতে গেলে অমন সুবিধে মত দলে ভিড়ে পড়লে হয় না—অত সস্তা নয়।

চৌধুরীর কথার খোঁচাটা বাণীকে লাগে—গলার স্বরটা বিকৃত হ'য়ে ওঠেঃ কি করলে হয়? ইংরেজের হ'য়ে বন্দুক ধরলে? পায়ে ধরে সিংগীর থাবার কাঁটা বার করে দিলে?

এতদূর শ্লেষ চৌধুরী আশা করেনি, ভাবতেও পারেনি এতটুকু মেয়ের মুখে অমন ধারা জবাব যোগাবে। মুখ ভোঁতা হ'লেও চৌধুরী খোলস বজায় রাখে। অপ্রস্তুতের হাসিটা চায়ের চুমুকে লুকতে চেষ্টা করে।

হঠাৎ বাণীর মুখ বড় খুলে যায় উত্তর প্রত্যুত্তরের নেশা যেন পেয়ে বসে, নিজে কি বলে নিজেই হয়তো বোঝে নাঃ গোলামি করতে করতে বন্দুকটা ঘুরিয়ে ধরাটা কি অন্যায়?

চৌধুরী বলে, শুধু অন্যায়ই নয় crime। মিলিটারী আইন অনুসারে Court martial হওয়া উচিত।

কিন্তু পরাধীন দেশের আইনে তাদের ফুলের মালাই প্রাপ্য। দেশের লোক আর সাধে মেতেছে। বাণীর মনে হয় এইবার চৌধুরী সাহেব চিট হ'য়ে যাবে।

চৌধুরী কিন্তু ফুৎকার দেয়ঃ শ্রেফ্ হুজুক. The British Administration will not tolerate. It's a matter of two or three days!

বাণীর রোক চেপে যায় যেন হার-জিত খেলা আরম্ভ হ'য়েছে। বলে—কখনো না, তাদের মানতেই হবে—মানতে বাধ্য হবে।

চৌধুরী বললে, আপনি তাদের চেনেন না, পরে দেখবেন।

বাণী বলে, দেখা খুব আছে—সামনে ঠেলে দিয়ে পিছিয়ে আসতে ওরা খুব ওস্তাদ! ওদের ভয়ের সে যুগ চলে গেছে!

চৌধুরী খুসী হয় কি না বোঝা যায় না, সমরকে বলে, Dutt your sister is very spirited.

সমর কোন উত্তর না দিয়ে যেন বাণীর পক্ষে spirit দেখান অপরাধের স্বীকার করে নেয়। দাদার চুপ করে' থাকাটা বাণীর ভাল লাগে না। বড় অপমানিত বোধ করে, বলে, কেন মেয়েদের তর্ক করা আপনি পছন্দ করেন না?

চৌধুরী হেসে বলে, oh, no no, I quite appreciate. যাই বলুন, আপনাদের ওই I. N. A. men are sheer bunkum! Don't be outwitted Miss Dutt.

বাণী পুনঃ জবাব দিতে উদ্যত হতেই সমর বলে ওঠেঃ আঃ বাণী থাম্, ঢের তর্ক করেছিস্!

সমরের বাধা দেওয়ায় চৌধুরীই যেন বেশী অপ্রস্তুত হয়। তাড়াতাড়ি বলে, না না Don't interrupt her. Let her say what she would.

বাণী চুপ করে যায়। মনে মনে বড় ক্ষুব্ধ আর অপমানিত বোধ করে। চৌধুরীর শেষের কথায় যেন 'আহা, বলবে বলুক না' গোছের ভাব,—তর্কটা এতক্ষণ উনি তা হলে 'সিরিয়সলি' করেন নি, ছেলেমানুষকে প্রশ্রয় দিয়েছেন? বাণী যা বলেছে কিছুই গায়ে মাখেন নি। সমরকে বাধা না দিতে বলায় এই ইঙ্গিতই যেন প্রচ্ছন্ন আছেঃ ছেলেমানুষের কথায় রাগ করতে আছে কখনো! যতই বাণী ভাবে যে চৌধুরী সাহেব তার ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দিয়েছে ততই ক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্বটা ভেতরে ভেতরে মারমুখো হ'য়ে উঠে। চৌধুরীকে এমন রূঢ় কথা বলতে ইচ্ছে করে যার জ্বলায় উনি অস্থির হ'য়ে উঠবেন, জীবনে ভুলতে পারবেন না। যুদ্ধে গিয়েছিলেন বলে' ওরাই একেবারে সবজান্তা হয়ে আছেন। কে ও'দের পোছে?

চৌধুরী হেসে বাণীর আনত মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বলুন।

বাণী অনেক কিছুই বলতে পারে, অনেক কিছুই বলবার ইচ্ছে তার প্রবল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু কি ভেবে শেষ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারে না। চোখ দুটো একবার তুলে নামিয়ে নিলে। কে জানে এতে বাণী বলতে চাইলে কিনা, আপনাদের সংগে কথা কইবার আমার প্রবৃত্তি নেই—কোন লাভ নেই আপনাদের সংগে মিছে তর্ক করে।

সমর যেন সবার চেয়ে বেশী অস্বস্তি ভোগ করছিল। ভাই-বোনগুলো যা তৈরী হ'য়েছে বলবার নয়। সব ব্যাপারে মাতব্বর হ'য়ে উঠেছেন, ও'দের মত আর কেউ বোঝেন না। ভদ্রলোকদের সামনে মান রাখা দায় হয়ে পড়ে। আই-এন-এ কি হ'লো না হলো তোর এত খোঁজে দরকার কি, তা ছাড়া তুই মেজর চৌধুরীর চেয়ে বেশী বুঝিস! আশ্চর্য এরা এই সেদিনের ছেলে মেয়ে ঘরে বসে জগতের সব খবর জেনে ফেলেছে—ওদের জানাবার বোঝাবার মত লোক যেন জন্মায় নি!

বড় ভায়ের মর্যাদাটা যেন বাণী তর্ক করে লঙ্ঘন করেছে। সমর বিরক্ত হ'য়ে বলে বাদ দিন্ চৌধুরী—they are too impertinent—যত সব বোগাস!

আর এক তিলও দাঁড়াবার প্রবৃত্তি বাণীর থাকে না। দাদাকে আজ নতুন করে' চিনলে সে। ও'রা যা-তা বলবেন আর সবাই মুখ বুজে সহ্য কবরে! কেন? বেশ রাগ দেখিয়েই বাণী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

চৌধুরী সিগারেট ধরিয়ে ফুৎকার দিলে
This I. N. A. I tell you will spoil them What a fun!

সমর বললে, দেশের লোকও যেন কি, একটু কিছু পেলেই হ'লো। এ্যাদ্দিন কোথায় ছিল সব? কেবল হুজুগ!

কে জানে কেন আজকের আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বকাহিনীর উদ্দীপনায় এর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। দেশের চিত্ত জয়ে সৈনিক হিসেবে নিজেদের দানের কথা এরা আজ ব ভাবছে, ক্ষোভটা এদের সেই জন্যেই হয়তে যুদ্ধে যাওয়ার আগে কি কোনদিন এর ভেবেছিল, ফিরে এসে কোনদিন এমন ক ভাবতে হবে? কোন কিছু তাদের সপক্ষে বলবার নেই আজ? কি অপরাধ করেছে তারা

যাবার সময় চৌধুরী সাহেব নীচের ঘ একবার থমকে দাঁড়াল। সুভাস বোসে ছবিটার দিকে চোখ তুলে চাইলে যেন। হয়তে ভাবলে, সকালটা কাটল মন্দ নয়! যারা যুদ্ধে কিছু বোঝে না তারাও বেশ মেতে উঠেছে যুদ্ধের কথা কইছে!

সমর লক্ষ্য করে বললে, আমার বোনে আঁকা! ভাল হয়নি?

দরজার কাছে এগিয়ে এসে চৌধুরী বললে I see, কেন বেশ ভালই তো হ'য়েছে। Your sister is an artist too very goo

যাক্ তা হলে চৌধুরী কিছু মনে করেনি সমর কেমন বোকার মত হাসলে। রাস্তায় নে চৌধুরী উপদেশ দিলেঃ
Let her try other subjects—Landscapes. Nature study etc.

সমর দরজা বন্ধ করে' বোনের খোঁজ কর পেলো না। কাত্যায়নী দেবী বললেন, এই ছিল, গেল কোথায়? সব সময় খিঙ্গীপনা আরো তোর জন্যে অমন হ'য়েছে।

সমর মাকে বললে, জান মা, আজ এসেছিল! মস্তবড় মিলিটারী অফিসার, খ বড় লোকের ছেলে। বাণী যেমন তর্ক জু দিয়েছিল আমি তো ভেবেছিলুম ভদ্রলো বোধ হয় রাগ করলেন। না, রাগ করেননি, ব বাণীর প্রশংসাই করে' গেলেন।

কাত্যায়নী দেবী কোন উত্তর করলেন না ছেলের মুখের দিকে একবার চাইলে কেবল। কি নিয়ে মেয়ে প্রগলভ প্রকাশ করেছে জানবারও তাঁর ই হ'লো না। একবার কেবল বললেন, তুই দেখ!

হঠাৎ সমরের মনটা যেন খুব হাল্কা হ' গেছে—লঘু পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উপ উঠে গেল। সমর যদি আরো কিছুক্ষণ মা সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো তা হ'লে হয় বুঝতে পারতো তার বন্ধুটী বড় মিলিটা অফিসার বলে' কাত্যায়নী দেবীর কোন আগ্র নেই। কে জানে 'আজাদ হিন্দের' কাহি অন্দর মহলে প্রবেশ করে অন্তঃপুরিকা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়েছে কিনা। (ক্রমশ

পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কে জয়পুরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন, দুই রাষ্ট্রে যে সম্মেলনে আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সুফল ফলিবে—এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কেন নিরাশার অভিব্যক্তি হয় তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। কিন্তু আমরা বলিতে পারি, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতাই সেই হতাশার কারণ। তিনি যে সকল আলোচনায় নির্ভর করিয়া মনে করিয়াছেন, অবস্থার উন্নতি হইবে, সে সকলের পরবর্তী কয়টি ঘটনার উল্লেখ আমরা করিতেছি:—

(১) শ্রীহট্ট জিলার ছাতক হইতে প্রেরিত সংবাদ এইরূপ—

গত ৩রা ডিসেম্বর নোয়ারাই গ্রামের চূণ ব্যবসায়ী শ্রীপ্রসন্নকুমার দেবনাথের পুত্র ছাতক বাজারে শাকসব্জী কিনিতে যাইয়া একজন মুসলমান বিক্রেতার একটি মূলা ভাঙ্গিয়া ফেলে। বিক্রেতা পুত্রকে গালি দিয়াছে শুনিয়া প্রসন্নকুমার আসিয়া বিক্রেতাকে গালি দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করে ও বলে, সে গালি না দিয়া মূলার মূল্য চাহিলেই পারিত। হাতে বচসা হয় এবং বিক্রেতাও আর কয়জন মুসলমান প্রসন্নকুমারকে মারিতে উদ্যত হয়। প্রসন্নকুমার ভয় পাইয়া দৌড়াইয়া হাজি আলী রাজা চৌধুরী নামক একজন প্রতিপত্তিশালী মুসলমান ব্যবসায়ীর দোকানে যাইয়া আশ্রয়প্রার্থী হয়। আক্রমণকারীরা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তথায় যায় ও সিদ্ধান্ত করে, প্রসন্নকুমারকে পাদুকাঘাত করিতে হইবে। সেই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা হয়। প্রকাশ, ঘটনার পরে প্রসন্নকুমার গৃহাদি বিক্রয় করিয়া স্থানত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছে।

এইরূপ অবস্থায় প্রসন্নকুমারের ও তাঁহার মত হিন্দুদিগের স্থান ত্যাগ ছাড়া আর কি উপায় থাকিতে পারে?

(২) ফরিদপুরের সংবাদে প্রকাশ—দারীপুরের মহকুমা কর্মচারী থানায় মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার অজুহাতে কার্তিকপুর ও চণ্ডগামাণিকের ১২ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে বিনা সমনে গ্রেপ্তারের পরওয়ানা বাহির করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ৪ঠা ও ৯ই সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির হইয়া জামিন দিয়াছেন। কিন্তু সরকার ৩।৪ তারিখ অতীত হওয়ার পরেও তাঁহাদিগের পক্ষের সাক্ষীদিগকে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারী করেন নাই। গত ১৯শে নবেম্বর তারিখেও সরকার পক্ষের সাক্ষীরা উপস্থিত না হওয়ায় জানুয়ারী মাসের জন্য মামলা মুলতুবী করা হয়। এই ১২ জনের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষালের বয়স ৭৫ বৎসর এবং অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার ও কার্তিকপুর হাইস্কুলের মেম্বার ও শ্রীরণজিত সেন সরকারের বয়স ৭০ বৎসর এবং তিনি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।

সরকার যদি তাঁহাদিগের পক্ষীয় সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিতে না পারেন, তবে কেবল দিনের পর দিন ফেলিয়া মামলা "সজীব" রাখা কি লোককে বিব্রত করা মাত্র নহে?

পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুদিগের গৃহ অকারণে অধিকার করার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে।

ভারত সরকার ও পাকিস্থান সরকার নিজ নিজ রাষ্ট্রে অপহৃতা নারী ও শিশুদিগের উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—

গত জুলাই মাস পর্যন্ত ভারত সরকার ভারত রাষ্ট্রে ৯ হাজার ৪ শত ২৩ জন অপহৃত নারীও শিশুর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন; আর পাকিস্থানের সরকার সে রাষ্ট্রে ৫ হাজার ৫ শত ১০ জনের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানে যে বহু হিন্দু নারী অপহৃতা হইয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে কোন মুসলমান নারী হরণের সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তাহা সকলেই জানেন। ভারত বিভাগের পূর্বেই নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় যাহা হইয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা আচার্য কৃপালনীর, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর, কুমারী মুরিয়েল লেস্টারের ও ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীর বিবৃতিতে পাইয়াছি।

পণ্ডিত জওহরলাল কি এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন?

পূর্ববঙ্গ হইতে আগন্তুকদিগের সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। কিন্তু তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও ভারত সরকারের অবস্থার উন্নতি হইলেও পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের অবস্থার উন্নতি প্রতিপন্ন হয় না। এক বৎসর পূর্বে প্রধান সচিবের পদ অধিকারকালে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন, যে সকল লোক পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের বাসাদির সুব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এই এক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারেন নাই।

আমরা যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিব্রতাবস্থা বুঝিতে অসম্মত তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা যে স্থানে অর্থব্যয় করিয়া আগন্তুকদিগকে বাসের ও চাষের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতেছেন না—এমন মনে করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কাজে যাহাই হউক, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র প্রভৃতি লইয়া ফাটকা খেলা আইন বিরুদ্ধ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু জমী লইয়া ফাটকা খেলা নিবারণের কোন চেষ্টাই হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব যদি কলিকাতার উপকণ্ঠে যে কোন গ্রামে একবার গমন করেন, তবে তিনি দেখিবেন—গ্রামের মধ্যে বাস্তু আগাছায় পূর্ণ, পুষ্করিণীর জল অপেয়, বংশবন সূর্যালোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অবস্থিত—আর গ্রামের বাহিরে "কলোনীর" পরিকল্পনা হইতেছে—জমীর মূল্য ২০ গুণেরও অধিক হইয়াছে। যে কোন "কলোনী"র বিষয় অনুসন্ধান করিলেই ইহা জানা যায়। অবস্থা যেরূপ হইতেছে, তাহাতে সুপরিকল্পিত গ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার যদি বাসের যোগ্য সব "পতিত" জমী ন্যায়সংগত মূল্যে ক্রয় করিয়া বণ্টন করেন, তবে ভাল হয়। আর এই কার্যের ভার সচিব বিশেষের উপর অর্পণ না করিয়া স্থানীয় লোক, সরকারী কর্মচারী ও জনগণের কার্যে অভ্যস্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত সমিতির উপর ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়।

আগন্তুকদিগের বাস ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, খাদ্যাভাব স্থায়ী হইয়া পড়িবে এবং মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইবে। ফলে "মুদ্রাস্ফীতি" নিবারণের কোন উপায় হইবে না। এই বিষয়ে আবশ্যক চেষ্টা হইতেছে না। সেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এক বাঁকুড়া জিলায় কত "পতিত" জমী "উঠিত" হয়, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিসাব করিয়া দেখিবেন? এবার যে কলিকাতার বাজারে শাকসব্জীর মূল্য বাড়িয়াছে, তাহা কি সরকার লক্ষ্য করিয়াছেন? যে কৃত্রিম সার ব্যবহৃত হইতেছে এবং যাহা প্রস্তুত করিবার জন্য বিহার সরকার বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তাহাতে "গুণ হৈয়া দোষ হৈল" হইতে পারে, তাহাও বিবেচ্য। তাহাতে জমী "জ্বলিয়া" যায়। যে জমীতে প্রচুর পরিমাণে বালি বা নূতন মৃত্তিকা অথবা স্বাভাবিক সার প্রদত্ত হয়, তাহাতেই এমোনিয়ার প্রয়োগে ক্ষতি হয় না। অথচ স্বাভাবিক সারের পরিমাণ বৃদ্ধির উপায় করা হইতেছে না। যতক্ষণ গ্রামেও কৃষক জ্বালানীর জন্য কয়লা বা কাঠ না পাইবে, ততদিন সে অনন্যোপায় হইয়া গোবর জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিবে। অথচ এ বিষয়ে দ্বিমত নাই যে—"What a man gets out of his land depends upon what he puts into it."

এই সার সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় জবালানী কাঠ সরবরাহ ভার যদি রাজকুমারের দল লাভ করেন, তবে গ্রামের কথা আর না বলাই ভাল।

যে সার সহজপ্রাপ্য তাহাও কিভাবে নষ্ট হয়, তাহার দৃষ্টান্ত কলিকাতাতেই পাওয়া যায়। কলিকাতায় যে সকল গরু মহিষের খাটাল আছে, সেগুলি লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন বিব্রত—খুঁটি, বিচালী, গোবর অবাধে ড্রেণে ঢালিয়া দেওয়ায় ড্রেন বন্ধ হয়। অথচ সেই গোবর প্রভৃতি যদি রক্ষা করিয়া বিক্রয় করা হয়, তবে শহরের উপকণ্ঠে কৃষকগণ তাহা আদর করিয়া কিনিবে। উহাতে যে জমীর উর্বরতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতে পারে, সে ধারণা কি কৃষি বিভাগের নাই? ঐ মূল্যবান সার নষ্ট করা হইতেছে।

অনেক কৃষকের বিশ্বাস, কৃত্রিম সারমাত্র ব্যবহারে কেবল যে জমীর উর্বরতা নষ্ট হয়, তাহাই নহে; পরন্তু যে কয় বৎসর তাহা নষ্ট না হয়, সে কয় বৎসরও জমীতে উৎপন্ন শাক-সব্জীর স্বাদ ক্ষুণ্ণ হয়। এই বিশ্বাস কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা পরীক্ষার দ্বারা বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি কথার উল্লেখ করিব। পূর্বে কোন কোন কৃষিবিদ্ আমেরিকা হইতে নানারূপ উৎকৃষ্ট বীজ আনাইয়া শাকসব্জীর চাষ করিতেন। সে সকল বীজের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেগুলি হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদ নানারূপ রোগ হইতে অব্যাহতি পায়। কপির "পাণ্ডু" (ইয়েলো) রোগ সে সকলের অন্যতম। কিন্তু আমেরিকা হইতে আমদানী বীজের দাম ডলার মুদ্রায় দিতে হয় বলিয়া সরকার তাহার আমদানীতে বাধা দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, তাহা কি তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন?

সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আশা দিয়াছেন, বাস্তুহারাদিগের বাসের ব্যবস্থা করা হইবে। তিনি এলাহাবাদে এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যুক্তপ্রদেশে এই সমস্যা প্রবল নহে। কেবল পাঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে আগত হিন্দুদিগকে যুক্তপ্রদেশেও স্থানদান করা হইতেছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদিগের সম্বন্ধে সেরূপ আয়োজন যে হইতেছে না, তাহাই পরিতাপের বিষয়। পূর্ববঙ্গে এখন আর হিন্দুদিগের উপর বিভাগের পূর্ববর্তী কালের অত্যাচারের মত ব্যাপক ও উগ্র অত্যাচার হইতেছে না বটে, কিন্তু অন্যরূপ অত্যাচার চলিতেছে। সেইরূপ অত্যাচারের মধ্যে প্রধান —নারীহরণ ও নারীর উপর অত্যাচার। সেই অত্যাচারের স্বরূপ সম্বন্ধে, বোধ হয়, পণ্ডিত জওহরলালের বা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জানা নাই। যে গ্রামে এইরূপ দুই চারিটি ঘটনা ঘটে, সেই গ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী সকল গ্রাম হইতে হিন্দুরা পলায়ন করিয়া অন্যত্র গমন করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। অভিযোগ এই যে, থানায় সংবাদ দিলে প্রতীকার হয় না—অথচ দুর্বৃত্তগণের অত্যাচার বর্ধিত হয়। কেবল বক্তৃতায় বা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারে না। সে বিষয়ে যে ভারত রাষ্ট্রের পরিচালকদিগকে সতর্ক হইতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গে নানাদিকে বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলা লক্ষিত হইতেছে। অতি তুচ্ছ কারণেও যে হাঙ্গামা হইতেছে তাহা দেখা যায়। সেদিন শিবপুরে (হাওড়া) বোটানিক্যাল গার্ডেন্সে যে স্থানে বাইক চালান নিষিদ্ধ সেই স্থানে বাইক চালনার প্রতিবাদ করায় কতকগুলি তরুণের সহিত দ্বারবানদিগের হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। সেদিন উল্টাডাঙ্গায় (কলিকাতা) কতকগুলি লোক কয়লা বোঝাই রেলগাড়ি হইতে যখন কয়লা লইয়া "পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে" যাহা হয় তাহাই করিতেছিল, তখন পুলিশ তাহাতে বাধা দেওয়ায় হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। এ সকল যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম অমান্য করিবার আগ্রহের পরিচায়ক, সে আগ্রহ সমাজের শান্তির শত্রু। শিক্ষার দ্বারা যে ভাবকে সংযত ও সংহত করিতে হয় ইহা সেই ভাব উপেক্ষা করা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যাঁহারা অভাবকেই এইরূপ ব্যবহারের কারণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা রোগের নিদান নির্ণয় করিতে-ছেন বলিয়া মনে করা যায় না। কিছুদিন হইতে—বিশেষ যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা—এই সকলের মধ্য দিয়া মানুষের কাল কাটিয়াছে এবং তাহার ফলে সে সভ্যতার দ্বারা পুষ্ট সংযম হইতে বিচ্যুত হইতেছে। শিক্ষা-পদ্ধতিরও যে ইহাতে কোন দায়িত্ব নাই, তাহা বলা যায় না। সমাজের কল্যাণের জন্য এই ভাবের পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন।

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্য মনোনয়ন শেষ হইয়াছে। বাঙলা হইতে মনোনীত সদস্য একজন—ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও মনোনীত হইবেন —কারণ, বাঙলার অবস্থা এখনও অস্বাভাবিক এবং বাঙলার সমস্যা জটিল, তাঁহারা হতাশ হইয়াছেন।

মাত্র কয়দিনের ব্যবধানে বহরমপুরে প্রাথমিক শিক্ষকদিগের ২টি স্বতন্ত্র সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষকদিগের পারিশ্রমিক যে যৎসামান্য এবং তাঁহাদিগের আরও সংগত অভিযোগ আছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তাঁহারাও যে একযোগে কাজ করিতে পারিতেছেন না, ইহা বিস্ময়ের ও দুঃখের কারণ। নূতন প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ যে প্রতিষ্ঠানটি পূর্ববর্তী তাহার সভাপতি একই ব্যক্তি স্থায়ী হইয়া আছেন এবং সে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ প্রতিষ্ঠানটির সুযোগ লইয়া ব্যবসা করেন—তাঁহারা পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া সেগুলি প্রতিষ্ঠানের হিতার্থ বলিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত করিতে বলেন, কিন্তু তাহার আয়ে প্রতিষ্ঠান লাভবান হয় না—লাভ ব্যক্তিগত হয়; এবং প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র ব্যক্তিগত। প্রতিষ্ঠানের নাম লইয়াও বিরোধের উদ্ভব হইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কোন্ প্রতিষ্ঠানকে মানিয়া লইবেন, তাহাই এখন বিবেচ্য হইয়াছে। বাঙলা বিভক্ত হইবার পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও শিক্ষকদিগের অবস্থা যে স্বতন্ত্ররূপ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের একযোগে কাজ করিবার উপায় করিয়া দিলে ভাল হয়। তাহা না হইলে আত্মরক্ষায় ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে উদ্যম ব্যয়িত হয়, তাহা অপব্যয়িত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ব পাঞ্জাবের নূতন লোকগণনা হইবে। নূতন লোকগণনার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবেন না। বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের কয়টি জিলা যেমন বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, তেমনই ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গত লোকগণনা নানা অনাচারে দুষ্ট হইয়াছিল—সাম্প্রদায়িকতা তখন সত্য বিকৃত করিতে উৎসাহী হইয়াছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের গত লোকগণনার বিবরণও বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য নহে।

গণপরিষদে স্থির হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে ব্যবস্থা পরিষদ ২ স্তরে বিভক্ত হইবে—উচ্চ ও নিম্ন। আসামে, উড়িষ্যায় ও মধ্যপ্রদেশে একটি পরিষদেই কাজ চলিবে। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কত অল্প তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

গত ৭ই জানুয়ারী কলিকাতায় প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছে। প্রমথবাবু ময়মনসিংহ সন্তোষের জমীদার ছিলেন—তাঁহার ভ্রাতা মহারাজা মন্মথনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রমথবাবু যৌবনে সাহিত্য-সেবায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠায়ও উৎসাহী ছিলেন।

ট্রামে-বাসে

ইংরেজী নববর্ষে কাশ্মীরে Cease-fire-এর আদেশে সকলেই খুব উল্লসিত হইয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন,—fire-এর বদলে আর কি দিয়া

কাশ্মীরের প্রচণ্ড শীত কাটাইবার ব্যবস্থা হয়, আমরা তা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

* * * *

নববর্ষের বাণীতে মাদাম চিয়াং কাইশেক বলিয়াছেন,—
"With God's help we shall pace our fate with courage."

বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন,—"মাদাম অনেক পরে বুঝলেন যে, আমেরিকার সাহায্যের চেয়ে ভগবানের সাহায্যটাই বড়।"

* * * *

একটি সংবাদে জানা গেল, রাষ্ট্রপাল রাজাজী নাকি দিল্লীতে একটি 'বাল-মেলা'র উদ্বোধন করিয়াছেন। "দিল্লীর ভাষণ-গুলোকে অমৃতময় করতে এমন বাল-ভাষিতমের ব্যবস্থাই সবচেয়ে আগে দরকার"—মন্তব্য করিলেন বৃদ্ধ খুড়ো।

* * * *

বাস্তুহারাদের বসতির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত প্রাসাদোপম গৃহ বা সিনেমা হাউস নির্মাণ বন্ধ করিবার জন্য পণ্ডিত নেহরু পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সিনেমা হাউসগুলিও তো Full, সেখানকার উদ্বাস্তু-দের কি গতি হইবে—প্রশ্ন করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

শুনিলাম, 'মাসীর' জাহাজে করিয়া ইতি-মধ্যেই বিলাতের ডাবল-ডেকার বাসটি কলিকাতায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। সেটিকে এখনও কেন রাস্তায় ছাড়া হইতেছে না এ প্রশ্ন অনেকেই করিতেছেন। খুড়ো বলিলেন,—"ট্রামে-বাসে ধূমপান একবার বন্ধ না হলে সে বাস ছাড়া হবে না বলে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করেছেন।" খুড়োর এ সংবাদকে গাঁজা মনে করিয়া অনেকেই দেখিলাম বিড়ি, সিগারেট ধরাইলেন—একবারে কোম্পানীর অনুরোধের বিজ্ঞপ্তির নীচে বসিয়াই। গাঁজার প্রয়োজন কার বেশী তাই ভাবিতে লাগিলাম।।

* * * *

বাংলাদেশে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় নাকি পশুর সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে—বলিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সাহে। "চারিদিকের হালচাল দেখে কিন্তু শ্রীযুত সাহের উক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না।" বলিলেন, বিশুখুড়ো।

* * * *

শুনিলাম, বন্য হস্তীকে কি করিয়া ধরা হয়, পণ্ডিত নেহরু নাকি মহীশূরে গিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিতজী চিরকালই হস্তী সম্বন্ধে কৌতূহলী। শ্বেত হস্তীকে কি করিয়া 'কুইট্' করাইতে হয়, তার কায়দা পণ্ডিতজী মহীশূরের মাহুতদের চেয়েও নিশ্চয়ই বেশী জানেন।

* * * *

'BLANKETS for fish'

একটি সংবাদ শিরোনামা। "এদ্দিন পর বেচারীদের শীতের হাত থেকে বাঁচার একটা ব্যবস্থা হলো, রামরাজিতে দেখছি মাছদেরই পোয়াবারো"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

বিলাতের রেল কর্মীরা নাকি পরস্পর পরস্পরের চুল ছাঁটিয়া দেয়, ইহাতে চুল ছাঁটাইওয়ালাদের ব্যবসার ক্ষতি হয় বলিয়া তারা এ ব্যাপারে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। "তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি, কিন্তু এই প্রসঙ্গে চুলোচুলির ব্যাপারটার দিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার"—এই বলিয়া খুড়ো তার টাকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

* * * *

MARKET has no regrets at passing of 1948

একটি সংবাদের শিরোনামা। শ্যামলাল বলিল,—"আমরাও এ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়িনি

আর উনপঞ্চাশ সালের জন্যেও উল্লসিত হইনি—শালগ্রামের শোয়া-বসা সমান।"

* * * *

শুনিলাম, মেজর সি কে নাইডু একটি মেয়েদের ক্রিকেট টিম গঠনের পক্ষে মত দিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন,—"Googly ballটা এঁদের ক্রিকেট ছাড়াও বেশ আসে।"

* * * *

প্রসঙ্গত আমাদের জনৈক সহযাত্রী একটি মজার গল্প বলিলেন। দুইটি সঙ্গিনী সারাদিন ক্রিকেট খেলা দেখিয়া বাড়ি ফেরার পথে নাকি একজন অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ ভাই, কে জিতল ভাই?"

* * * *

খুড়ো আর একটি 'মজার' খবর শুনাইলেন। বলিলেন,—"ক্রিকেট তো শেষ হয়ে গেছে, স্টেডিয়ামের প্রসঙ্গটা আবার ফুটবলের প্রাক্কালে তোলা হবে বলে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করেছেন। —জয় হিন্দ"

একটি খারাপ প্রভাবের সঙ্গে অপর একটি খারাপ প্রভাব যুক্ত হলে তাতে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় সহজেই অনুমেয়। কিন্তু একটি সুরুচির সঙ্গে আর একটি সুরুচি যুক্ত হলেও কি তা ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের সহায়ক হয়ে উঠবে? বিষয়টি আর একটু খোলাখুলি ভাবে বলা যাক—নিউ থিয়েটার্সের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার ভারতের চিত্র-জগতের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি; তাঁর স্মরণীয় কৃতিত্ব হচ্ছে ভারতীয় ছবিকে সুরুচিপূর্ণ করেও জনপ্রিয় করে তোলা। শ্রীছটুভাই দেশাইও হলেন কলকাতার চিত্রজগতের আর একজন কৃতী পুরুষ যিনি সুরুচিপূর্ণ হিন্দী ছবি আমদানী করে কলকাতায় হিন্দী ছবির প্রসারবৃদ্ধিতে সকলের চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুরুচির প্রতীক এরা দুজন হাতে হাত মেলাতেই কিন্তু যুক্ত ফল হয়ে দাঁড়িয়েছে "খিড়কী"—মানে, অশ্লীল বলে যে ছবিখানি কয়েকটি প্রদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়েছে এবং অন্যান্য জায়গায় ছবিখানির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সত্রপাত হয়েছে। ছবিখানি সপ্তাহ দুই হলো মুক্তিলাভ করেছে ঐ দুই সম্মানিত ব্যক্তিরই যুগ্মপ্রচেষ্টায় গঠিত ক্যালকাটা পিকচার্সের পরিবেশনায় শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের চিত্রগৃহ চিত্রা ও নিউ সিনেমাতে। মুক্তিলাভ করার আগে ছবিখানি বিশেষভাবে সেন্সর করা হয় এবং

"লা দেও চুনরীয়া খাদী কী
জয় ব'লো মহাত্মা গান্ধী কী
দে দে এক চৌয়ান্নী চাঁদী কী
জয় ব'লো মহাত্মা গান্ধী কী"

বলে কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী-সমন্বিত নৃত্যগীতের একটি দৃশ্য বাদ দেওয়ার পর ছবিখানি প্রদর্শনের ছাড়পত্র পেয়ে যায়; অর্থাৎ সেন্সরের মতে ছবিখানিতে আপত্তিকর কিছু আর রইলো না। কিন্তু নীচের দৃষ্টান্তগুলোকে তাহলে কি বলা যায়? যেমন—যৌন আবেদন উদ্ধতা অপর্যাপ্তবেশা একদল তরুণীকে দেখে তরুণদের গান যাতে তারা এমন 'গোলিয়া'র কথা উল্লেখ করছে যে 'গোলিয়া' (বটিকা) সকালে সেবন করলে সন্ধ্যেবেলা বাঘের মত লড়বার শক্তি এনে দেয়। ছেলেরা শাসাচ্ছে যে মেয়েদের সরু সরু কোমরে শ'দেড়শো দোলন খায়; মেয়েরা তাদের নগ্ন কোমর দুলিয়ে পাল্টা প্রতিবাদ জানাচ্ছে যে, (শ'দেড়শো নয়) চার পাঁচশো। তারপর, নারীর বেশে মমতাজ আলীর সম্পূর্ণ পুরুষবর্জিত মেয়েদের আবাসে ওঠা এবং পুরুষ পরিচয়েই নারীর পোষাক পরে মেয়েদের সঙ্গে নাচগান মেয়েলী ঢঙে। ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে যা যুক্তিতে অশ্লীল ও রুচি-বিগর্হিত না বলে পারা যায় না। প্রায় ১২ হাজার ফিট ছবির মধ্যে গোড়াকার হাজার খানেক এবং শেষের হাজার তিনেক ফিট বাদে সমস্ত অংশটাই হচ্ছে পুরুষদের মেয়েলীয়ানা, মেয়েদের পুরুষালীয়ানা, অপর্যাপ্তবেশা মেয়ের দল ইত্যাদি নানা ভাবের অর্থপূর্ণ ভঙ্গী ও অভিব্যক্তির দ্বারা প্রোৎসাহিত আদিরসের প্রবল উচ্ছ্বাস। তাই শ্রীবীরেন্দ্র সরকার ও ছটুভাইকে এবং সেন্সরের সভ্যদের প্রশ্ন করে জানতে ইচ্ছে করে যে, তারা তাদের ভাইবোন, স্ত্রীপুত্রপুত্রীকে ছবিখানি দেখবার সুপারিশ করতে পেরেছেন কি? না এক সঙ্গে বসে ছবিখানি দেখতে পেরেছেন?

সত্যিই, রুচির কি অদ্ভুত বিবর্তন!

নূতন ছবির পরিচয়

অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে তলিয়ে যেতে আলোর এক একটা স্ফুলিঙ্গ যে রকম আশার সঞ্চার করে, বাঙলা ছবির অধোগমনের মুখেও মাঝে মাঝে এমন এক একটা স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হ'য়েছে। যাতে উৎকর্ষে বাঙলা ছবি ভারতে তার শ্রেষ্ঠত্বের আসন আরো কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছে। এমনি দু'টি স্ফুলিঙ্গ হ'চ্ছে গত বছরের দুটি বিদায়ী অভিনন্দন : বসুমিত্রের 'কালোছায়া' ও এসোসিয়েটেড পিকচার্সের 'সমাপিকা'। দোষ-ত্রুটি, ছেলেমানুষী ও কোন কোন দিকের অনুৎকর্ষ থেকে ছবি দু-খানি ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তবুও গুণের ভাগটা এতো বেশী যার জন্যে দুখানি ছবিই অনন্য সাধারণ ব'লে পরিগণিত হবার যোগ্যতা দেখিয়েছে। এই সংখ্যায় কালোছায়া ছবিটির আলোচনা করা হোলো, আগামী সংখ্যায় 'সমাপিকা' ছবিটির আলোচনা করা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী সপ্তাহ হইতে 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীকালীচরণ ঘোষ লিখিত নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু মহাশয়ের জীবনী ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইবে।

কালোছায়া (বসু মিত্র প্রডাকসন্স)—কাহিনী ও পরিচালনা: প্রেমেন্দ্র মিত্র; চিত্র-গ্রহণ: বিভূতি দাস; শব্দযোজনা: পরিতোষ বসু; আবহ সঙ্গীত: অমিয়কান্তি; শিল্প নির্দেশ: নির্মল বর্মণ; ভূমিকায়: শিশির মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা, সিপ্রা দেবী প্রভৃতি। ছবিখানি গোল্ডেন ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনে ২৪শে ডিসেম্বর মিনার-বিজলী-ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

'কালোছায়া' ভারতীয় চিত্র-জগতের একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। সাধারণ যে সমস্ত উপাদানের সমন্বয়ে আমাদের ছবি তৈরী হ'য়ে এসেছে এবং যেসব বিষয় ও বস্তু ছবির অঙ্গ-পূরণ ক'রে এসেছে এতকাল 'কালোছায়া'তে তার বেশীর ভাগেরই অনুপস্থিতিটাই হ'চ্ছে সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়। প্রযোজক ও পরিচালকের বাহাদুরী হ'চ্ছে এইজন্য যে তা করেও তাঁরা একটি পরিচ্ছন্ন এবং অত্যন্ত জমাটি নাটক সৃষ্টি ক'রতে পেরেছেন। প্রেম নেই, মিঠিমিঠি বুলি নেই, নাচ বা গান আদপেই নেই এমন কি মাত্র একটি ছাড়া কোন নারীর চেহারাও নেই। ঘটনাস্থলও বলতে গেলে একটি বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ সহজেই লোকের মনকে আঁকড়ে ধরবার যেসব উপায় তার কিছুই ছবিখানিতে নেই। এত সব বাদের ওপরে আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ ইত্যাদি কলকৌশলের দিকও হ'চ্ছে একেবারেই সাধারণ পর্যায়ের। এতদিকের এত অসুবিধেতেও কিন্তু 'কালোছায়া' চিত্রজগতের একটি বিশিষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদান হয়েই আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। ছবিখানি হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পরিচালকের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব আর তার

বিন্যাসের চাতুরীতে এমনি একটা সম্মোহনী শক্তি উজ্জীবিত হ'য়েছে যা ছবির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের সমস্ত চেতনাকে বশীভূত ক'রে রাখতে সমর্থ হয়। কালোছায়া তাই সাধারণ উপভোগ্য ছবির দলেতে পড়ে না— 'কালোছায়া' দেখা মানে হচ্ছে ছবি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

'কালোছায়া' নিছক ডিটেকটিভ গল্প। আজকালকার সামাজিক রাজনীতিক বা কোন দিকের কোন 'ইজম' অথবা সমস্যার নামগন্ধ নেই, উদ্দেশ্যমূলকও কিছু নেই, আর কোন বিষয়ের আদর্শ নিয়ে মাতামাতিও নেই। এথেকে তত্ত্ব, তথ্য বা জ্ঞানও কিছু সঞ্চয় করার সুযোগ নেই। দেখার পর মন ভারীও হয় না, হাল্কাও হয় না; আবার ওর কিছুটা নিয়ে আলোচনা করার মতো খোরাকও মনে জমে থাকে না, কিন্তু বৈচিত্র্যের একটা দারুণ অনুভূতি মনকে পেয়ে বসে। একদিক থেকে ছবিখানি অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো অসাধারণ একটি প্রতিভার নিষ্কৃতি পরায়ণতারই নিদর্শন। তাই সিনেমার যে প্রধান সার্থকতা, মানুষকে দৈনন্দিন বাঁধাধরা জীবনের ঝামেলা থেকে একটা সাময়িক নিষ্কৃতি এনে দেওয়া সেদিক থেকেই 'কালোছায়া' সার্থক সৃষ্টি হ'তে পেরেছে।

কাহিনীতে নায়ক হচ্ছে গোয়েন্দা সুরজিত আর দুর্বৃত্ত হ'চ্ছে রাজীবলোচন যে অন্য ভাইদের ফাঁকি দিয়ে পিতার সম্পত্তি একাই ভোগ করার জন্যে দুরভিসন্ধিতে মেতে ওঠে। আর চরিত্র হচ্ছে: অণিমা, আসলে যে রাজীবলোচনের নিরুদ্দিষ্ট ভাই পীতম্বরের পুত্রী এবং সে এসেছে তার পিতামহের আসল উইলটা উদ্ধার করার জন্যে নার্সের ছদ্মবেশে; দীননাথ হ'চ্ছে রাজীবের বড় ভাই, পিতার জীবিতকালে কলকাতায় গিয়ে পয়সাকড়ি উড়িয়ে দিতে থাকে আর সেই সুযোগে রাজীব পিতা যজ্ঞেশ্বরকে দিয়ে নিজের নামে সব সম্পত্তি লিখিয়ে নেয়। কিন্তু পরে যজ্ঞেশ্বর পীতাম্বরের স্ত্রী ও কন্যার সংবাদ পেয়ে মরবার আগে সব ছেলেকে সমান অংশ দিয়ে স্বতন্ত্র উইল ক'রে যান। শেষ বয়সে দীননাথ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে রাজীবের কাছে সাহায্যের জন্যে আসে; রাজীবের সঙ্গে দীননাথের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য, রাজীব তাই দীননাথকে হত্যা ক'রে নিজে দীননাথের বেশ গ্রহণ করে এবং রাজীবলোচনই নিহত প্রচার ক'রে দেয়। সে রাত্রে আর একটি খুন হয়, বাড়ীর সরকার। রাজীবের ডাক্তারের চালচলন দেখে সুরজিত তাকেই সন্দেহ করতে থাকে। এই ডাক্তার কিন্তু আসলে হ'চ্ছে পীতাম্বর, ছদ্মবেশে এসে রয়েছে। মূল চরিত্রের মধ্যে আর আছে রাজীবলোচনের চীনা পাচক ও সুরজিতের ভৃত্য বলরাম। দারোগা, পুলিস, এটর্ণী ইত্যাদি আর কয়েকটা আনুষঙ্গিক চরিত্র আসছে একেবারে শেষে। ঘটনাস্থল বলতে সুখচর নামক একটি স্থানে জঙ্গল পরিবৃত নিভৃত স্থানে দুর্গপ্রতীম একটি প্রাচীন অট্টালিকার অভ্যন্তর। এ ছাড়া আছে আরম্ভে ও শেষে কলকাতায় সুরজিতের দপ্তর এবং পরিশিষ্টে থানা এবং পলায়নরত কালোছায়ারূপী রাজীবলোচনকে ধরতে পথের দৃশ্য। এই হ'লো ছবির মোট উপাদান।

ঘটনা ব'লতে আছে, দীননাথ ও সরকারকে খুন, কালোছায়ার সঙ্গে সুরজিতের বার-দুই সংঘর্ষ, কালোছায়াকে ধরবার জন্যে হুটোপাটি, সন্দেহযুক্ত হ'য়ে ধরা পড়ার পর পালিয়ে আসার সুযোগ ক'রে নিতে ডাক্তার কর্তৃক থানার গারদে বিষ সেবনে আত্মহত্যার ভাণ এবং শেষে কালোছায়াকে ধরবার জন্যে মোটরের দৌড়। কোন ভূমিকা নেই, ছবির একেবারে প্রারম্ভ ফুটটি থেকেই কাহিনী আরম্ভ হ'য়ে যায়। তারপর প্রচণ্ডগতিতে রহস্যের একটা অদ্ভুত মায়াজাল বুনে ছবি এমনিভাবে এগিয়ে যায় যে শেষের দু-তিনশো ফিট আগে পর্যন্ত লোককে অবরুদ্ধ শ্বাসে সচকিত হ'য়ে থাকতে বাধ্য করে। বিন্যাসের কৌশল গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সাসপেন্স অটুট রেখে যেতে সমর্থ হ'য়েছে এবং পরিচালক লোকের মনটা সম্পূর্ণরূপে এবং সারাক্ষণ নিজের আয়ত্তে ধরে রেখে দেওয়ার অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিচ্ছিন্নভাবে ধ'রলে নিতান্তই নীরস ও অসার এ রকম কয়েকটি চরিত্র ও ঘটনাকে জড়িয়ে দম ফেলারও সময় পাওয়া যায় না এমন একটি কাহিনীর সৃষ্টি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিভাকে জয়যুক্ত করেছে।

ছবিখানির সাফল্যের প্রধান নির্ভর ছিল অভিনয়শিল্পীদের ওপর এবং বলা যায় যে তাদের প্রায় সকলেই এ বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ ক'রে উল্লেখ্য হচ্ছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য যিনি একধারে দীননাথ ও রাজীব চরিত্র রূপায়িত ক'রেছেন। চরিত্রাভিনেতা হিসেবে এই তার প্রথম প্রচেষ্টা নয়, কিন্তু এ ছবিতে তিনি তার চলচ্চিত্র শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রানুগ আঙ্গিক ও বাচনিক অভিব্যক্তি এবং রূপসজ্জা তাকে একজন প্রকৃত উঁচুদরের শিল্পীর আসন ক'রে দিয়েছে। অণিমার ভূমিকায় শিপ্রার নামটাই এর পর মনে আসে। নির্ভীক, কর্তব্যে দৃঢ়চেতা দীপ্ত অণিমা চরিত্রটি তারও উজ্জ্বল কৃতিত্ব। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রূপায়িত ডাক্তার বা পীতাম্বরের চরিত্রে একটা কৃত্রীমতা অতি রূক্ষভাবে প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, নয়তো দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত ব্যক্তিত্ব ও অভিনয় ভঙ্গী তার মধ্যে পাওয়া যায়। চীনা পাচকের ভূমিকাটির অবতারণা রহস্যমূলক আবহাওয়াকে ঘনীভূত ক'রে তোলার চিরাচরিত চরিত্র হিসেবে তাছাড়া হাল্কারস সৃষ্টির কাজেও একে খাটানো হ'য়েছে এবং চরিত্রের রূপদানে শ্যাম লাহা পরিণত শিল্পপ্রতিভার পরিচয়ও দিয়েছেন।
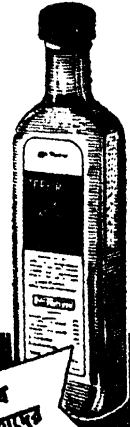
কিন্তু ঐ কাজের জন্যে কোন দেশী চরিত্রের পরিকল্পনা বোধ হয় বেশী সহজগ্রাহ্য ও যুক্তিযুক্ত হ'তো। নবদ্বীপ হালদারের বলরামও হাল্কা রসসৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। সুরজিতের ভূমিকাটিকে শিশির মিত্র মানিয়ে গিয়েছেন, এই পর্যন্তই।

নাট্যরসকে পুঞ্জীভূত করার কাজে আবহসংগীতের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। ঘটনাকে মূর্ত করে তোলায় এবং যথাযথ আবহাওয়া সৃষ্টিতে অমিয়কান্তির সংগীত পরিচালনা প্রশংসনীয়। নির্মল বর্মণের শিল্প নির্দেশনও রহস্যমূলক কাহিনীর চরিত্রানুগ হ'য়েছে। আলোকচিত্র উন্নততর হওয়া উচিত ছিল, সমতার বড় অভাব। পরিশিষ্টে মোটর দৌড়ের দৃশ্যটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। শব্দ গ্রহণ নিন্দনীয় না হ'লেও বিশেষ প্রশংসারও নয়—আপেক্ষিক দূরত্ব ও সমতার দিক থেকে বৈষম্য পাওয়া যায়।

'কালোছায়া' বাঙলা চিত্র জগতের একটি স্মরণীয় প্রচেষ্টা, তবে কোন ত্রুটিই নেই বললে ভুল হবে। গুপ্ত সুড়ঙ্গের দরজাটা চট্ ক'রে খুলে ফেলায় দেখে মনে হলো যেন অণিমার কাছে তা সুবিদিত ছিল, কাহিনী কিন্তু তা বলে না; অথবা ধরা পড়ার পর রাজীবের কথামত তার নির্দিষ্ট পাত্র থেকে তাকে ব্র্যান্ডী খেতে দেওয়া এবং রাজীব মরতেই বিনা পরীক্ষায় ব্র্যান্ডীতে সায়েনাইড মেশানো ব'লে উল্লেখ করার মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় একজন সুচতুর গোয়েন্দা বা দারোগার থাকাটা উচিত নয়। খুব মারাত্মক না হ'লেও ছোটখাটো আরও কয়েকটি ত্রুটি পাওয়া যায়; কিন্তু ঘটনাস্রোতকে তা ব্যাহত করে না। ছবিখানি মনের খোরাক জোগায় না বটে, কিন্তু দুঘণ্টা একেবারে আত্মবিস্মৃত ক'রে রাখার শক্তি তার অসাধারণ।

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় টেস্ট খেলাও কলিকাতায় অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। দিল্লী ও বোম্বাইতে প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলার ফলাফল নির্ধারিত হয় নাই। কলিকাতার তৃতীয় টেস্ট খেলারও একই পরিণতি ঘটিল। ইহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। তবে প্রথম দুইটি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মাত্র প্রথম ইনিংস খেলিয়া ভারতীয় দলকে "ফলো অন" করিতে বাধ্য করে। কিন্তু তৃতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে তাহার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু এই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে দ্বিতীয় ইনিংস প্রায় সম্পূর্ণ খেলিতে হইয়াছে। ইহাতে বলা চলে যে, ভারতীয় দল পূর্বের দুইটি টেস্ট খেলার তুলনায় তৃতীয় টেস্ট খেলায় উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম হইয়াছে। ইহা আনন্দের ও সুখের বিষয়। আগামী ২৭শে জানুয়ারী হইতে মাদ্রাজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতীয় দলের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ আরম্ভ হইবে। ভারতের সকল ক্রীড়ামোদী ঐ খেলার ফলাফল জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবেন ইহা বলাই বাহুল্য। চতুর্থ টেস্ট খেলার জন্য ভারতীয় দল গঠন করা হইয়াছে। বিশেষ সুখের যে, ঐ দলে বাঙলার আরও একজন উদীয়মান খেলার শ্রীমান এন চৌধুরী স্থান পাইয়াছেন। ইনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাঙলার প্রদেশ পালের পক্ষে খেলিয়া কৃতিত্বপূর্ণ বোলিং করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৬টি উইকেট তিনি দখল করেন। সেই কৃতিত্বই খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলের খেলোয়াড় মনোনীত করিতে বাধ্য করে। আমরা আশা করি, শ্রীমান চৌধুরী চতুর্থ টেস্ট খেলায় পূর্বের ন্যায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন।

চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল

চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের মনোনীত করা হইয়াছে:—

অমরনাথ (অধিনায়ক), পি সেন, আর মোদী, বিজয় হাজারে, এইচ আর অধিকারী, ডি জি ফাদকার, মুস্তাক আলী, গোলাম আমেদ, ভিনু মানকড়, এন আর রেগে ও এন চৌধুরী।

দ্বাদশ ব্যক্তি:—পি উমরিগার।

অতিরিক্ত—কিষেণচাঁদ ও এম মন্ত্রী।

তৃতীয় টেস্ট খেলার বিবরণ

তৃতীয় টেস্ট খেলাতেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জয়ী হয় ও ব্যাটিং গ্রহণ করে। খেলা আরম্ভ করিয়া প্রথম দুইটি উইকেট ২৮ রাণের মধ্যে পড়িয়া যায়। ইহার পর ওয়ালকট ও উইকস একত্রে খেলিয়া দ্রুত রাণ তুলেন। ১০৯ রাণে ওয়ালকট আউট হন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ৩ উইকেটে ১৩৮ রাণ হয়। উইকস ৫৬ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। চা পানের পূর্বেই উইকস ১৬২ রাণ করিয়া আউট হন। ইনি ২৫টি বাউণ্ডারী করেন। চা পানের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৬ উইকেটে ২৯১ রাণ হয়। দিনের শেষেও দেখা যায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিক রাণ করিতে পারে নাই। ৭ উইকেটে ৩৩৯ রাণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় দিনের সূচনায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৩৬৬ রাণে শেষ হয়। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। মাত্র ১২ রাণ হইলে প্রথম উইকেটের পতন হয়। মোদী খেলায় যোগদান করিলে দ্রুত রাণ উঠিতে আরম্ভ

করে। দিনের শেষে ভারতীয় দল মাত্র ২ উইকেটে ২০৪ রাণ করে। মোদী ৭৮ রাণ ও হাজারে ৫৯ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে ভারতীয় দল ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মধ্যাহ্ন ভোজের ১৫ মিনিট পূর্বে ২৭২ রাণে ইনিংস শেষ করে। ফার্গুসন ও গডার্ডের বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৯৪ রাণে অগ্রগামী হইয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। তৃতীয় দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১২০ রাণ করে। উইকস ৬২ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

চতুর্থ দিনের সূচনায় উইকস শতাধিক রাণ করিয়া পৃথিবীর টেস্ট খেলায় এক নূতন অধ্যায় রচনা করেন। ইতিপূর্বে কোন খেলোয়াড়ই টেস্ট খেলায় উপর্যুপরি পাঁচবার শতাধিক রাণ করিতে সমর্থ হন নাই। উইকস সেই কৃতিত্ব অর্জন করে। ইহার পরে এই ইনিংসে ওয়ালকটও শতাধিক রাণ করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৯ উইঃ ৩৩৬ রাণ হইলে গডার্ড ডিক্লেয়ার্ড করেন। ভারতীয় দল ৪৩০ রাণ পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। চতুর্থ দিনের শেষে কেহ আউট না হইয়া ৬৬ রাণ হয়। মুস্তাক আলী ৪৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

পঞ্চম বা শেষ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ভারতীয় দলের দুটি উইকেট পতন সম্ভব করিতে পারে না। মুস্তাক আলী শতাধিক রাণ করেন। মোদী ৮৭ রাণ করেন। হাজারে ও অমরনাথ শেষ পর্যন্ত খেলিয়া নট আউট থাকেন। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

খেলার ফলাফল:—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস:—৩৬৬ রাণ (উইকস ১৬২, ওয়ালকট ৫৪, মন্টু ব্যানার্জি ১২০ রাণে ৪টি, গোলাম আমেদ ৯৪ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংস:—২৭২ রাণ (মোদী ৮০, মুস্তাক আলী ৫৪, হাজারে ৫৯, ফার্গুসন

৬৫ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস:—৯ উ ৩৩৬ রাণ (ওয়ালকট ১০৮, উইকস ১০১, ৩৪, মানকড় ৬৮ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস:—৩ উইঃ ৩: রাণ (মুস্তাক আলী ১০৬, মোদী ৮৭, হাজা নট আউট ৫৮, অমরনাথ নট আউট ৩৪, গোমে ৪৭ রাণে ১টি, গডার্ড ৪১ রাণে ১টি এ্যাটকিনসন ৪২ রাণে ১টি উইকেট পান।)

এশিয়ান ক্রিকেট সম্মেলন

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের প্রচেষ্টায় ভারতীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিভাগের সহায়ত কলিকাতায় এশিয়ান ক্রিকেট সম্মেলন অনুষ্ঠি হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই সম্মেলনে ভারত প্রতিনিধিদের সহিত বর্মা, মালয়, সিংহল পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। সভায় এশিয়ান ক্রিকেট সম্মেলন নামে এব প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। মিঃ এ এস ডিমো সভাপতি ও এম জি ভাবে সম্পাদক নির্বা হইয়াছেন। ইহারা দুই বৎসর উক্ত পদে অধি থাকিবেন। ইহার পর পর্যায়ক্রমে সম্মেল অফিস পাকিস্থান, সিংহল, মালয় ও বম স্থানান্তরিত হইবে। ঐ সময় উক্ত দেশের ক্রি বোর্ডের যিনি সভাপতি ও যিনি সম্পা থাকিবেন তিনিই পদাধিকার বলে সম্মেল সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইবে। ১৯ সাল পর্যন্ত যোগদানকারী পাঁচটি দেশের ক্রিকেট দলের ভ্রমণ ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:—

১৯৪৯-৫০ সাল—সিংহল দল ভারত পাকিস্থান ভ্রমণ করিবে। ১৯৫০-৫১ সা ভারত ও মালয় যথাক্রমে পাকিস্থান ও সিং ভ্রমণ করিবে। ১৯৫১-৫২ সাল—পাকিস্থান করিবে।

১৯৫২ সাল—সিংহল দল মালয় করিবে।

বিহার গভর্নর দল পরাজিত

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও বিহার গভর্নর দ ত্রিদিনব্যাপী খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইনিংস ও ৯৮ রাণে জয়ী হইয়াছে। ইহা ও ইণ্ডিজ দলের ভারত ভ্রমণের তৃতীয় জয়ল ইতিপূর্বে মধ্যপ্রদেশ গভর্নর দলকে ৬ উই ও হোলকার দলকে দশ উইকেটে পরা করে।
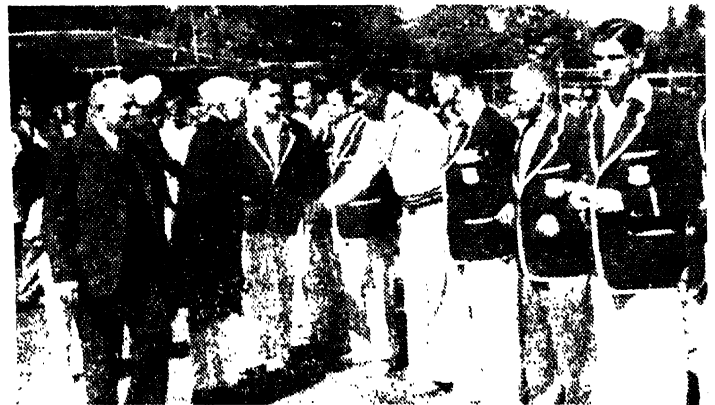
পশ্চিম বাঙলার প্রদেশপাল মাননীয় ডাঃ কাটজুর সহিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

দেশী সংবাদ

৩রা জানুয়ারী—আজ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে স্যার কে এস কৃষ্ণণের সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। দেশ ও বিদেশের প্রায় ছয় শতাধিক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

৪ঠা জানুয়ারী—অদ্য ভারতীয় গণপরিষদে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পার্লামেণ্টের ভবিষ্যৎ নিম্ন পরিষদ অর্থাৎ লোকপরিষদে বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্র হইতে ভোটারগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত পাঁচ শতাধিক সদস্য থাকিবেন না। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে লোকপরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন হইবে।

বোম্বাইয়ে ভারত সরকারের রেলওয়ে সচিব শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার ও নিঃ ভাঃ রেলকর্মী সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণের মধ্যে আলোচনা আজ শেষ হয়। রেলওয়ের কর্মী সঙ্ঘের প্রধান চারিটি দাবী—(১) মাগ্‌গী ভাতা, (২) সুলভ খাদ্যশস্য ভাণ্ডার, (৩) বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যে পরিণত করা এবং (৪) বেতন কমিশনের সুপারিশে যে সকল অসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে সন্তোষজনকভাবে আলোচনা হয় এবং এইরূপ অনুভূত হয় যে, এ সম্পর্কে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

৫ই জানুয়ারী—কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নূতন সদস্যদের নাম অদ্য ঘোষণা করেন। তাঁহাদের নামঃ—(১) পণ্ডিত নেহরু, (২) সর্দার প্যাটেল, (৩) মৌলানা আজাদ, (৪) ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, (৫) মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই, (৬) পণ্ডিত পন্থ, (৭) শ্রী এন জি রঙ্গ, (৮) শ্রী এস কে পাতিল, (৯) শ্রী কামরাজ নাদার, (১০) শ্রীদেবেশ্বর শর্মা, (১১) শ্রী গোকুলভাই ভাট, (১২) ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, (১৩) সর্দার প্রতাপ সিং, (১৪) শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী, (১৫) শ্রীজগজীবন রাম, (১৬) শ্রীরাম সহায়, (১৭) শ্রীনিজ লিঙ্গাপ্পা, (১৮) শ্রীকালা বেঙ্কট রাও, (১৯) শ্রীশঙ্কররাও দেও। শেষোক্ত দুইজন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন।

৫ই জানুয়ারী—১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধনার্থে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক আনীত বিলটি অদ্য ভারতীয় গণপরিষদে গৃহীত হইয়াছে। এই সর্বপ্রথমবার ভারতীয় আইন সভায় ভারত শাসন আইনের রদবদল করা হইল। এই সংশোধন বিলটিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কয়েকটি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার এবং সেইগুলিকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। শিল্প নীতিকে কার্যে রূপদান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে আরও অধিক ক্ষমতা দিবার ব্যবস্থাও এই বিলে করা হইয়াছে।

৬ই জানুয়ারী—কাশ্মীর নিরপেক্ষ ও অবাধ গণভোট সম্পর্কে কাশ্মীর কমিশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন এবং ভারত ও পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট যাহাতে সম্মতি জানাইয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিবরণ অদ্য প্রকাশ করা হইয়াছে,

ইন্দোনেশিয়া সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট নয়াদিল্লীতে যে বৃহত্তর এশিয়া সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, আগামী ২০শে জানুয়ারী উহার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। সর্বশুদ্ধ ২০টি রাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একমাত্র শ্যাম দেশ সম্মেলনে যোগ দিবে না বলিয়া জানাইয়াছে।

৭ই জানুয়ারী—ভূপাল রাজ্য হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ভূপাল রাজ্যকে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপার লইয়া যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, তাহাতে পুলিশ ও মিলিটারীর গুলী চালনার ফলে ব্যারিলিতে ৮ জন নিহত হয় ও ৭১ জন আহত হয়।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, লেঃ জেনারেল কারিয়াপ্পা আগামী ১৫ই জানুয়ারী ভারতীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতির কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

লেঃ জেনারেল শ্রীনাগেশ জেনারেল কারিয়াপ্পার স্থলে ওয়েস্টার্ন কম্যাণ্ডের অস্থায়ী জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং নিযুক্ত হইবেন।

৮ই জানুয়ারী—ভারতীয় গণ-পরিষদে ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর একটি প্রস্তাব এবং প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের গঠন সম্বন্ধে ডাঃ আম্বেদকর কর্তৃক উত্থাপিত একটি ধারা গৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫০ সালে যাহাতে যতদূর সম্ভব শীঘ্র আইনসভাসমূহে নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্য নির্বাচন হইতে পারে, সেজন্য পরিষদ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিতেছেন।

পশ্চিম বঙ্গের অ-সামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন আজ ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের জন্য রেশন দোকানগুলি মারফৎ আকাঁড়া চাউল সরবরাহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৯ই জানুয়ারী—আজ নয়াদিল্লীতে নবগঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আগামী ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন সম্পর্কে অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আসন্ন এশিয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেন।

খ্যাতনামা সাংবাদিক "বম্বে ক্রনিক্যাল" পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৪ঠা জানুয়ারী—দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে ইউনিয়নে প্রবেশের লিখিত অনুমতি-পত্র ব্যতীত ভারত এবং পাকিস্থানের অধিবাসীদের বিমানযোগে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের মধ্য দিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

৫ই জানুয়ারী—ওলন্দাজবাহিনীর পক্ষ হইতে অদ্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সুমাত্রায় ইন্দোনেশিয়ান সাধারণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা বন্ধ হইয়াছে।

৬ই জানুয়ারী—একপক্ষকাল নিস্তব্ধ থাকার পর উত্তর চীন ও ইয়াংসি—চীনের এই দুইটি রণাঙ্গনে পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদ দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের নেগেভ এলাকায় যুদ্ধ বিরতির যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, অদ্য ইসরাইল মন্ত্রিসভার অধিবেশনে তাহা নীতিগত ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

৭ই জানুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ট্রুম্যান অদ্য মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ জর্জ মার্শালের পদত্যাগ সংবাদ ঘোষণা করেন এবং প্রাক্তন সহকারী রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডীন এ্যাকেসনকে তাঁহার স্থলবর্তী নিযুক্ত করেন।

নানকিংএর সংবাদে প্রকাশ, শক্তিশালী কম্যুনিস্ট সৈন্যদল অদ্য নানকিং ও সাংহাই-এর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের জনৈক সরকারী কর্মচারী জানাইয়াছেন যে, ৬ই জানুয়ারী বেলা ২টা হইতে যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে মিশর ও ইসরাইল গভর্নমেণ্ট সম্মত হইয়াছে বলিয়া জানান হইয়াছে।

৭ই জানুয়ারী—অদ্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে হল্যাণ্ডের প্রতিনিধি ডাঃ ভান রয়েন পরিষদকে জানান যে, মিঃ সুকর্ণ, ডাঃ হাত্তা, মিঃ শারীর ও অন্যান্য সাধারণতন্ত্রী নেতৃবৃন্দকে সর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

৮ই জানুয়ারী—গতকল্য ইহুদী জঙ্গী বিমান পাঁচটি বৃটিশ বিমানকে দক্ষিণ প্যালেস্টাইনে গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে। অদ্য বৃটিশ বিমান দপ্তর হইতে এই মর্মে বৃটিশ বিমানসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, মিশর এলাকায় যে কোন ইহুদী বিমানকে শত্রু বিমান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৯ই জানুয়ারী—চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যদল তিয়েনৎসিনের কেন্দ্রস্থলের দুই মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়া পূর্বপ্রান্তীয় অস্ত্রশালা অঞ্চল দখল করিয়াছে। নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনী নানকিং হইতে ৮০ মাইল পূর্ববর্তী হোয়াং চিয়াও দখলের পর ইয়াংসী নদীর রক্ষাব্যূহ আক্রমণের নূতন উদ্যোগ করিতেছে।

হাইফার সংবাদে প্রকাশ, ইসরাইল হইতে ইংরেজ নাগরিকদের অন্যত্র অপসারণ করা হইতেছে।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ]　শনিবার, ৯ই মাঘ, ১৩৫৫ সাল।　Saturday, 22nd January, 1949.　[১২শ সংখ্যা

ভারতের শক্তির উৎস

সম্প্রতি কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্তী ব্যারাকপুরে দুইটি বিরাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উভয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠানের সম্ভ্রম এবং সৌষ্ঠব বর্ধন করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য শারীপুত্ত এবং মৌদ্গল্যায়নের পূতাস্থির ভারত প্রত্যাবর্তন এবং ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটের প্রতিষ্ঠা এই উভয় অনুষ্ঠানেই একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী, ধনী, নির্ধন অন্তরে গভীর আবেগ লইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছে। শহরের যানবাহনের গতিবিধির নানারকমের অসুবিধা ও অগণিত নরনারীর আগ্রহকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। এই সব অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতি জড়িত আছে, আনুষঙ্গিক আড়ম্বরের আকর্ষণও আছে, এ সব কথা অনেকে অবশ্য বলিতে পারেন; কিন্তু আমাদের মতে সেগুলি একান্তই পরোক্ষ। রাজনীতি এখনও এদেশের সমাজের সর্বস্তরে আন্তরিকতায় গভীর আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি যেখানে তেমন আলোড়ন তুলিয়াছে, সেখানে অন্য একটি শক্তি বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে। ত্যাগ, সেবা এবং মহানুভবতার আদর্শই সেখানে বড় হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের চরিত্রের অনুধ্যানে এদেশের জনসমাজে সেই আত্মনিষ্ঠ প্রাণরসই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজীর জীবনব্যাপী অহিংসা এবং প্রেমের সাধনা তাহাদের জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। বুদ্ধ-শিষ্যদ্বয় কিংবা মহামানব মহাত্মাজী কেহই অস্ত্রবলে রাজনীতির সঙ্গে তাঁহাদের প্রভাব বিজড়িত করেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহারা প্রেম এবং মৈত্রীর মন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন; ভেদ-বিভেদ বিস্মৃত হইয়া বিশ্বমানবকে আপনার করিবার বাণী শুনাইয়াছেন। বস্তুত ভারতের আত্মারই এই বাণী। যুগ-যুগান্তরের বহু বিপর্যয়ের ভিতর দিয়াও ভারতের আত্মা মহান্ মানব-সংস্কৃতির মূলীভূত এই একান্ত সত্যকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সাময়িক ঘটনাচক্রের আবর্তের ধূলিঝঞ্ঝায় ভারতীয় আত্মার এই সংস্থিতির সূত্রটি সমাচ্ছন্ন হইলেও সে সূত্র ছিন্ন হয় নাই। সংবেদনের পথে একটা নাড়া পাইলে এখনও সে সত্যে বিধৃত শক্তির সাড়া পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূত্রে এ পরিচয় আমরা এখনও পাইতেছি। কিন্তু ইহার সার্থকতা কি? হিংসা-বিদ্বেষে জগৎ আজ বিভ্রান্ত হইয়া চলিয়াছে, স্বার্থ-সংকীর্ণ জীবনের দৈন্য ব্যক্তি এবং সমাজকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, অবাস্তব আত্মতত্ত্ব এ অবস্থায় কে শুনিবে? প্রেম ও মৈত্রীর মহান্ উপদেশ অনুসরণ করিবার সার্থকতা মানুষের মনে কেমন করিয়া একান্ত হইবে? সুতরাং ঐ সব কথা না তোলাই অনেকের মতে এখন ভাল। যাঁহারা এমন তর্ক তুলিবেন, তাঁহাদের উত্তরে আমরা বলিব, তাঁহারা যদি অন্য পথ বড় বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সেই পথে তাঁহারা চলিতে পারেন, কিন্তু ভারতের বিপুল জনসমাজ তাঁহাদের কাজে সাড়া দিবে না। হিংসা, দ্বেষ পারস্পরিক অসূয়ার পাশববৃত্তিকে ভারত-সংস্কৃতি একান্ত করিয়া লইতে পারিবে না। ভারতের বিপুল জন-সমাজে ত্যাগ এবং সেবার আদর্শই উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিবে এক বৃহত্তর নবসৃষ্টির প্রেরণা দিবে। কলিকাতা এবং ব্যারাকপুরে এই যজ্ঞ সেদিনই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আত্মসমাহিত ভারতের সংস্কৃতির এই সম্পদ সামান্য নয়। মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্রজীবনের বাস্তব সার্থকতার দিক হইতেও ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। মানুষকে যদি সত্যই মানুষ হইতে হয় এবং আরণ্য জীবনের বিভীষিকা হইতে মানব-সমাজকে মুক্ত করিতে হয়, সুদূর অতীতে ভগবান তথাগত সে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী নিজেদের জীবন-সাধনায় সে আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন, বিশ্বমানবকে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। স্থায়ী শান্তিই যদি আমাদের কাম্য হয়, ভারতের সাধক এবং মনস্বী মহামানবদিগকেই আমাদের গুরুত্বে বরণ করিতে হইবে। বৈদেশিক মতবাদের পথে জাতির অন্তর স্পর্শ করা যাইবে না। সে পথে বিশ্বমানব সমাজের দৃষ্টিতে মর্যাদা লাভ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বমানবের কাছে ভারতের আত্মার বাণীটি লইয়া যদি আমরা অগ্রসর হই, তবেই বিশ্ব আমাদিগকে মর্যাদা দিবে, সম্মান দিবে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের অন্তর একান্তভাবে ভারতের আত্মশক্তির এই জাগরণের দিকেই উন্মুখ হইয়া আছে।

ভারতের মহাতীর্থ

সেদিন ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটের উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পতিতপাবনী জাহ্নবীর বন্দনা-গান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী আবেগের সঙ্গে বলেন, এই গঙ্গা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের সহস্র সহস্র বৎসরের শিক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে। এই গঙ্গাতীরেই ভারতের মহাভারত—ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সেই গঙ্গা, যাহার তটে তটে কত বৃহৎ সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস লিখিত রহিয়াছে। যুগ-যুগান্তের কত বড় বড় সাম্রাজ্য এই গঙ্গা-তীর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার ধ্বংস হইয়াছে। এই মহানদীর তীরেই আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ রোধে যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন। এই

গঙ্গাতীরেই একদিন ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহারা কলিকাতা নগরীর পত্তন করিয়াছিল। আবার এই গঙ্গার তীরেই ব্রিটিশ শাসন হইতে ভারতের স্বরাজ লাভের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিতজীর এসব উক্তিতে অতিরঞ্জন কিছু নাই। ভাগীরথী-সভ্যতার বিস্তৃত আলোচনা আমরা এখানে উত্থাপন করিতে চাহি না; এখানে শুধু এইটুকুই বলিব যে, বৈদেশিক শাসন এবং সভ্যতার প্রভাব হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার সাধনা ভাগীরথীর তটভূমিতে, বিশেষভাবে এই কলিকাতা শহরকে কেন্দ্র করিয়াই সমুদ্ভূত হয়। ভারতের সংস্কৃতির শক্তিময় স্বরূপ এইখানেই বৈপ্লবিক বেগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই দিক হইতে কলিকাতা নগরী ভারতের ইতিহাসে একটি মহাতীর্থ। কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী গঙ্গার পূর্ব কূলের কথাই বলি। এই উপকূলেই ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাদিগকে অমৃতের বাণী শুনাইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বর পুণ্য-তীর্থভূমি। স্বামী বিবেকানন্দ এইখান হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া মুক্তির অমোঘ-বাণী বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিয়াছিলেন। সুদূর অতীতের দিকে তাকাইলে অনেক কথাই মনে পড়িবে। ব্যারাকপুরের অদূরে গঙ্গার এই তটভূমিতে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়ায় কবি কর্ণপুরের বীণা ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। এই গঙ্গাতীরে তৎকালীন কুমারহট্ট এবং বর্তমান হালিশহরে সাধক কবি রামপ্রসাদ প্রেমে বিভোর হইয়া মায়ের নামগান করিয়াছিলেন, খড়দহ প্রভু নিত্যানন্দের পুণ্যস্মৃতি আজও বহন করিতেছে এবং পাণিহাটি বৈষ্ণব যুগের প্রেমের সাধনায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বরাহনগর মহাপ্রভুর পদরেণু বহন করিয়া পবিত্র হইয়াছে। ভারতের আত্মার পুনর্জাগরণের এই ঐতিহাসিক ধারায় গান্ধীঘাট অতঃপর অন্যতম তীর্থস্বরূপে নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে। সহস্র সহস্র নরনারী এখানে আসিয়া নূতন জীবনের প্রেরণা পাইবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় সমুন্নতির ইতিহাসে গাঙ্গেয় সাধনার যে বীজ কলিকাতার উপকণ্ঠভাগে উপ্ত হইয়াছিল, ব্যারাকপুরের গঙ্গাতীরে গান্ধীঘাটে সংরোপিত বোধিদ্রুমের পত্রপল্লব বিস্তারে সেই সাধনা এবং সেই সংস্কৃতির মাহাত্ম্য সম্প্রসারিত হইবে। এই অনুষ্ঠানটিকে এই দিক হইতে বাঙলার সংস্কৃতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তিস্বরূপে গ্রহণ করিতে হয়।

ভারত-পাকিস্থান বৈঠক

কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতির পর ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে আরও কয়েক দফা পারস্পরিক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। গত ১৫ই জানুয়ারী ভারতের নব-নিযুক্ত প্রধান সেনাপতি এবং পাকিস্থানের প্রধান সেনাপতি স্যার ডগলাস গ্রেসীর মধ্যেও আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, পাকিস্থান সরকার জম্মু এবং কাশ্মীর হইতে তাঁহাদের সেনাবাহিনী অপসারণ করিয়া আনিবেন, সেই সঙ্গে হানাদারদিগকে সরাইয়া লওয়া হইবে এবং আজাদ কাশ্মীর সেনাদলে পাকিস্থানের যে সব সেনানী কাজ করিতেছেন, তাঁহারা চলিয়া আসিবেন। কাজ ভালভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু পাকিস্থানী কূটনীতি এ ক্ষেত্রেও শেষটা তাহার স্বভাবসিদ্ধ বেয়াড়া গতি ধরিয়াছে। আজাদ কাশ্মীরের বেনামীতে পাকিস্থান সরকার কাশ্মীরকে ভাগ করিয়া লইবার দুরভিসন্ধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য একান্ত অসঙ্গত এই জিদ্ তাঁহারা পরিত্যাগ না করিলে মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। করাচীতে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় এবং বিনিময় সম্বন্ধে সম্প্রতি চুক্তি হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের সম্বন্ধে এই বৈঠকে বিশেষভাবে কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু ব্যাপকভাবে যেখানে দেশত্যাগ ঘটিয়াছে, সেই প্রদেশের সম্বন্ধে করাচীর চুক্তি বলবৎ হইবে। কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতির পর পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শান্তি এবং নিরাপত্তার দিকে পূর্ব পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট সর্বাধিক উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা ছাড়া এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যেও সংযমের ভাব অনেকটা ফিরিয়া আসিবার মত প্রতিবেশ সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে, ইহাও আশা করা যায়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কলিকাতায় আসিয়া পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদিগকে এই দিক হইতে আশ্বাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি পূর্ব-বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদিগকে নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে অনেকেই সেজন্য উৎসুক আছেন। কেহই স্বেচ্ছায় নিরাশ্রয় এবং নিঃস্ব অবস্থা বরণ করিয়া লয় না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাবের উপরই তথাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শান্তি এবং নিরাপত্তা বিশেষভাবে নির্ভর করে, শাসকদের উপরও ততটা নয়। পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট সাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দিবার নীতি পরিত্যাগ করিয়া সর্বজনীন মর্যাদার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয়তা গঠনের উপর জোর দিলে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার মোহ অল্পদিনের মধ্যেই দূর হইতে পারে। ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই; কিন্তু পাকিস্থান সাম্প্রদায়িকতার রাষ্ট্রনীতিকে এখনও আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। ইহার মূলে প্রধানত একটি কারণ আছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের নিয়ামকগণ ভারতকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নিজেদের রাষ্ট্রকে তাহারা সংহত রাখিবার প খুঁজিতেছিলেন। কাশ্মীরের যুদ্ধ স্থগিতে পর ভারতের প্রতি এই অবিশ্বাসের ভাব তাহ দের অনেকটা কাটিয়া যাওয়া উচিত। বস্তু সাম্প্রদায়িকতার ভ্রান্ত এবং প্রগতিবিরোধ পথে সংখ্যাগরিষ্ঠের মনে রাষ্ট্রের প্রতি দর চাঙ্গা করিয়া রাখিবার কৌশল প্রয়োগ করিবা প্রয়োজন এমন আর নাই। পাকিস্থানে নিয়ামকগণ যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এখ রাষ্ট্রে সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জ প্রগতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্রতী হন এব এক্ষেত্রে তাঁহাদের আকাতর ভাব কাটিয়া গি থাকে, তবে ভারত ও পাকিস্থান সম্প্রীতির পথে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইবে।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি—

বাঙলার প্রদেশপাল ডক্টর কৈলাসনা কাটজু গত ২১শে জানুয়ারী শরৎচন্দ্রের জন্ম স্থান দেবানন্দপুর পরিদর্শনে গমন করেন শরৎচন্দ্র তাঁহার সাধনায় বাঙলার প্রাণকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং সেই প্রাণরে জাতির সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দিক হইতে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা সম্পর্কে বিশেষ দায়ি আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি, তাঁহার সে দায়িত্ব প্রতিপালনে আন্তরিকভাবে অগ্রস হইবেন। গত ১৭ই জানুয়ারী শরৎচন্দ্রে একাদশ বার্ষিক স্মৃতি-সভার সভাপতি স্বরূপে শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস এ সম্বন্ধে কয়েক উল্লেখযোগ্য কথা বলিয়াছেন। সজনীবাবু উক্তি আমরা সর্বাংশে সমর্থন করি। সত্যঃ মৃত পল্লীতে একটা সৌধ নির্মাণ করিয়া বিদ্য সাগর, মধুসূদন বা শরৎচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষা চেষ্টা করার কোন সার্থকতা নাই। সে পথে তাঁহাদের প্রতি সম্যক্ মর্যাদাও রক্ষিত হয় না বাঙলার পল্লীকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবা আন্তরিকতা শরৎ-সাহিত্যে ওতপ্রোত রহিয়াছে পল্লীকে উপেক্ষা করিয়া শরৎ-সাহিত্য লই যদি আমরা আস্ফালন করি, তাহা হইলে শরৎ চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বৃথা হইবে শরৎ-স্মৃতি সমিতি দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রে স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ২৫ হাজা টাকা সাহায্যের আবেদন করেন। এই টাব আজও সংগৃহীত হয় নাই। দেশবাসীর পক্ষে ইহা লজ্জার কথা। আমরা আশা করি এতদুদ্দেশ্যে উপরোক্ত অর্থ সত্বরই সংগৃহী হইবে এবং স্মৃতি সমিতি তাঁহাদের পরিকল্প কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্ত এই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থানের উন্নতি সাধনের জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। দেব নন্দপুর এবং তাহার আশেপাশের পল্লী অঞ্চ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দের প্রতিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাঙলার পল্লী আজ

জন্য শিক্ষিত তরুণেরা যদি উন্মুখ হয় এবং পল্লীবাসীকে সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধায় আপনার করিয়া লইতে পারে, তবেই শরৎচন্দ্রের সাধনার প্রতি তাহাদের মর্যাদা প্রদর্শন সার্থক হইতে পারে। পল্লী সংগঠন এবং উন্নয়নের এই কাজ সরকারের পরিকল্পনার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তাঁহারা সে কাজে সর্বাধিক উদ্যোগী হউন এবং স্বদেশসেবাও স্বাজাত্যবোধের প্রগাঢ় প্রেরণাকে রাষ্ট্র সাধনায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়া এদেশের তরুণচিত্তকে তাঁহারা সংগঠন কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুন। পল্লীর দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মর্মবেদনা শরৎচন্দ্র সমস্ত অন্তর দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; সমাজে যাহারা উপেক্ষিত এবং অবজ্ঞাত তাহাদের মানস-মাধুরী তিনি প্রাণরসে সঞ্চারিত করিয়াছেন। ইহাদের সেবাতেই শরৎচন্দ্রের পূজার যাথার্থ্য রক্ষিত হইবে। বলা বাহুল্য, আমাদের রাষ্ট্র-জীবনে বাহিরের বক্তৃতা এবং উপদেশের বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বক্তৃতার দিন আর নাই। নিভৃত সেবার অনপেক্ষ এবং আত্যন্তিক তৃপ্তির কাছে নাম, যশ এবং পদ ও প্রতিষ্ঠা-লালসার অন্তহীন দৈন্য এবং স্থিতিহীন অসারতার মূর্খতাময় গ্লানি শরৎ-চন্দ্রের সংবেদনশীল জীবন-সাধনা আজ উন্মুক্ত করিয়া তুলুক। সমাজের প্রাণময় সত্তায় আমরা নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যদি জীবনকে উদার এবং সম্প্রসারিত করিয়া তুলিতে পারি, তবেই দেশ বাঁচিবে এবং জাতিও বড় হইবে। শরৎচন্দ্র এই শিক্ষাই আমাদের দিয়াছেন। আমরা যেন তাহা বিস্মৃত না হই।

বর্বরতার বিক্ষোভ—

বিদ্বেষ প্রচারের বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সম্প্রতি যে ভীষণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। সেখানে ভারতীয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় অধি-বাসীদের ভিতর দাঙ্গায় শত শত লোকের প্রাণ-হানি ঘটিয়াছে। উন্মত্ত আফ্রিকানেরা লগুড়াঘাতে হত্যা করিয়াছে, আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা ভারতীয়দের সমগ্র পরিবারকে গৃহমধ্যে খুন করিয়াছে। এই সব উন্মত্ত বর্বরদের নিধন-লীলার বিভীষিকা সমগ্র ভারতীয় সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ভারতীয়েরা প্রাণভয়ে অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নিধন, লুণ্ঠন এবং অমানুষিক নির্যাতনের এই সংবাদে সমগ্র ভারতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা এই ব্যাপারের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেণ্টকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করিব। সত্য বটে, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে ভারতীয়দের এই সঙ্ঘর্ষ ঘটে নাই; কিন্তু যে নীতিকে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তাহারই বিষময় পরিণতি। তাঁহারা ভারতীয়-দিগকে মানুষের মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রনীতিতে ভারতীয়দিগকে নিন্দিত এবং ধিক্কৃত করিবার কৌশলই অবলম্বিত হইতেছে। বিদ্বেষ বিদ্বেষকে সংক্রামিত করে। শুধু তাহাই নয়, উৎকট উপদলীয় চক্রান্তও এই ব্যাপারের মূলে আছে। মালান গভর্নমেণ্ট কৃষ্ণাঙ্গদিগকে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকাবাসীরা এখন ভারতীয়দের সঙ্গে যাহাতে যোগ দিতে না যায়, দাঙ্গা উস্কাইবার জন্য তেমন অভিসন্ধি খাটানো হইয়াছে। দাঙ্গা দমনে পুলিসের তৎপরতার বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ডারবানের রাজপথ ভারতীয়দের রক্তে আপ্লুত হইবার অনেক পরে শান্তিরক্ষার অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে একদিন ভেদনীতির পথে যে শয়তানী আরম্ভ করিয়াছিল, মালান গভর্নমেণ্টও সেই হিংস্র এবং বীভৎস বর্বরতাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। ব্রিটিশের ভেদনীতির ফলে ভারতের ধূলা রুধিরাক্ত হইয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ভারতীয়েরা তেমনই পশুর মত মরিতেছে। জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ নরনারী এবং শিশুর শবদেহের পূতিগন্ধে আকাশ ভারাক্রান্ত হইতেছে। আন্তর্জাতিক নীতির মর্যাদা রক্ষার দোহাই দিয়া যেসব নীতিবাগীশেরা পরাজিত, অসহায় এবং শরণাগত শত্রুকে কোতল করে, এই ধরণের নরঘাতক হিংস্রতা তাহাদের নৈতিক বুদ্ধিকে পীড়িত করে না। ভণ্ডামি আর কত দূর থাকিতে পারে? যাহারা মানুষকে মানুষের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে চায় এবং বর্ণ-বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া তোলে, এই সব অনর্থের নৈতিক দায়িত্ব হইতে তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। আমরা ইহাই বুঝি। ইহারা পশু, ইহারা অমানুষ। এই শ্রেণীর অমানুষদের প্রভাব হইতে মানব-সমাজকে মুক্ত করিতে না পারিলে আরণ্য বর্বরতার বিভীষিকা পৃথিবীর বুক হইতে দূর হইবে না। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এবং প্রভুত্ব পিপাসায় অন্ধ বর্বরতাকে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র হইতে উৎখাত করিবার জন্য মানবাত্মার বৈপ্লবিক জাগরণেই এই অবস্থার প্রতীকার হইতে পারে, অন্য কোন পথে নয়। সে শক্তিকে উদ্বোধন করিবার গুরুতর দায়িত্ব নানা দিক হইতে ভারতের উপরই আসিয়া পড়িতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নির্যাতন, নিগ্রহ এবং হত্যা সে কঠোর কর্তব্য প্রতিপালনে আমা-দিগকে উদ্বুদ্ধ করুক। মানবতার মর্যাদা রক্ষার

দিতে কুণ্ঠিত না হই এবং দুর্বলতাকে অন[illegible] প্রশ্রয় না দেই। যদি বাঁচিতে হয়, তবে মানু[illegible] মর্যাদা লইয়া বাঁচিতে হইবে। স্বাধীন ভারত মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে। প্রস্তুত থাকিতে পারে। পরীক্ষার আসিয়াছে।

মহাজাতি সদন.

মহাজাতি সদন নির্মাণ এবং তাহা পূর্ণ[illegible] করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ[illegible] আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন। ১[illegible] জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভবনের পরিচালনা[illegible] একটি ট্রাস্টী বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা হই[illegible] প্রাদেশিক সরকার মহাজাতি সদনের [illegible] বোর্ডকে বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা দিবে[illegible] কলিকাতা কর্পোরেশনও মহাজাতি সদনের [illegible] বোর্ডকে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা সাহ[illegible] করিতে পারিবেন এবং সময় সময় তাঁহা[illegible] বিবেচনা মত আরও অর্থসাহায্য করি[illegible] অধিকার তাঁহাদের থাকিবে। নেতাজী সুভ[illegible] চন্দ্রের আরব্ধ কার্য উদযাপনের জন্য পশ্চি[illegible] বঙ্গ সরকারের এই কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্ব[illegible] উদ্যোগী হওয়াতে আমরা সুখী হইয়া[illegible] বস্তুতঃ একাজ ইহার আগেই সম্পন্ন হও[illegible] উচিত ছিল এবং এতদিন পর্যন্তও কাজ সম্প[illegible] না হওয়া আমাদের পক্ষে নিন্দারই বি[illegible] হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নেতাজীর নিজের [illegible] স্মৃতিরক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁ[illegible] জীবন-সাধনাই তাঁহার স্মৃতিকে জাতির অন্ত[illegible] সমুজ্জ্বল রাখিবে। কিন্তু যে কাজ তিনি আ[illegible] সহকারে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্‌যাপ[illegible] করিবার ভার জাতির উপরই আসি[illegible] পড়িয়াছে। সে কর্তব্য পালন না করিলে জাতি[illegible] পক্ষে অপরাধ হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র নি[illegible] এই ভবন নির্মাণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এ[illegible] স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইহার উদ্বো[illegible] করিয়াছিলেন, এ কথা জাতি ভুলিতে পারে ন[illegible] জাতির অন্তরের সমগ্র শ্রদ্ধা এই উদ্যমের স[illegible] যুক্ত রহিয়াছে। তাহাদের হৃদয়ের দ[illegible] রহিয়াছে। আমরা আশা করি, মহাজাতি সদন[illegible] সত্বরই পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করিয়া জাতির [illegible] শ্রদ্ধা এবং সে দরদের যথার্থ মর্যা[illegible] রক্ষিত হইবে। বাঙালী নেতাজ[illegible] সুভাষচন্দ্রকে হৃদয়ে স্থান দিয়া[illegible] তাঁহার আরব্ধ ব্রত প্রতিপালনে[illegible] দায়িত্বও বাঙালী সর্বান্তঃকরণে ব[illegible] করিবে। মহাজাতি সদন বাঙলার রাষ্ট্র এ[illegible] সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশে সহায়ক হই[illegible] সুভাষচন্দ্রের আশা সার্থক করিয়া তুলু[illegible] আমরা ইহাই কামনা করি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

২৩শে জানুয়ারী ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তিথি। এই দিবস ভারতের বিপ্লবী সন্তান সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্লবের প্রবৃত্তিকে বাঙলার সংস্কৃতির প্রাণশক্তি বলা যাইতে পারে। এ দেশের মাটিতে ইহার বীজ স্মরণাতীতকাল হইতেই পুষ্ট হইয়া আসিতেছে। বাঙলার বৈষ্ণব প্রেমের স্পর্শে বৈপ্লবিক প্রেরণায় অন্তরের সুধার অম্বুধি উছলাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে। জীর্ণ সংস্কারের সকল গণ্ডি ভাঙিয়া চুরিয়া—তুড়িয়া উড়াইয়া দিয়া সে আগাইয়া গিয়াছে। শাক্তেরা বলি ছাড়া কোন কথা বলে না। বস্তুত প্রবল প্রাণধর্মই বঙ্গ-সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের মূলে রহিয়াছে। প্রাণ নিত্য নূতনকে সৃষ্টি করিতে চায় এবং নবসৃষ্টির রস-প্রাচুর্যে নিজকে নিঃশেষে দান করাই তাহার ধর্ম। যাহা জীর্ণ, যাহা মলিন, যাহা অনুদার এবং সংকীর্ণ তাহাকে ধ্বংস করিবার পথেই প্রাণ আপনাকে পরিস্ফূর্ত করে। সে পরতে পরতে নিজকে উৎসর্গ করিয়া দেয় এবং জীবন-রসের যৌবন-প্লাবনে সুন্দরকে মাধুর্যের রাজ্যে অভিষিক্ত করে। নদী মেখলা বাঙলায় ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া রসের এই বিচিত্র খেলা বহু যুগ হইতে চলিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের জীবনে বাঙলার এই বৈপ্লবিক প্রাণপূর্ণ প্রকৃতির বৈভব অপূর্ব মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং যুগান্তের দৈন্য ও গ্লানিকে অপসারিত করিয়া প্রচণ্ড বীর্যে দিগন্ত উজ্জ্বল করিয়া তোলে। বিপ্লবী বাঙলার বীর সন্তানের চরিত্রের সেই দীপ্তি, সেই দ্যুতি এবং সেই জ্যোতিঃ জগতের চোখ ধাঁধাইয়া দেয়।

সুভাষচন্দ্রের প্রাণবল কোনদিন পরাভব মানে নাই। গতি তাহার দুর্দম, তাহার বেগ পদে পদে প্রচণ্ড বিলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। ভাঙিয়া-চুরিয়া জড়াইয়া মাখিয়া তাঁহার প্রাণের তরঙ্গ উদার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে উদ্দাম ভঙ্গীতে বহিয়া চলিয়াছে। পথের বাধা গ্রাহ্য করে নাই; বিশেষভাবে পথের হিসাবও রাখে নাই। অভীষ্ট যেখানে প্রাণধর্মে ঘনিষ্ঠতা লাভ করে, তখন পথের হিসাব এমনই পরোক্ষ হইয়া যায়। পথের ধূলা সাধককে স্পৃষ্ট করে না, পরন্তু তাঁহার প্রাণধর্মের মহিমাকেই পরিস্ফুট করে। যেখানে তাপ নাই, সেইখানেই হিসাব; সাধ্য-সত্যের অভিব্যক্তি যেখানে খণ্ডিত, সেইখানেই যুক্তি এবং লৌকিক নীতির বিচার। প্রাণ যেখানে আত্মসংস্থিত, গতি সেখানে অনাহত, নীতি সেখানে সাময়িকতার সব প্রভাব হইতে বিনির্মুক্ত, বিনিশ্চিত এবং জীবন সেখানে নিত্য। পরাজয়ের কোন গ্লানি অনন্ত-জীবনের উৎস-রসে নিষিক্ত তেমন প্রাণময় লোকে নাই। সুভাষচন্দ্র এমনই অপরাজেয় প্রাণ-গৌরবের অধিকারী ছিলেন।

এদেশের তত্ত্বদর্শী সাধকগণ এই প্রাণধর্মের জয়গান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যে পর্যন্ত মন আত্মতত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় অর্থাৎ আপনার বোধ ব্যাপক না হয়, পরাভব সেই পর্যন্তই সম্ভব। এই আপনার বোধ যেখানে বৃহতের বেদনায় বলিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই, সেখানে বুদ্ধির ক্রিয়া সংস্কারোপহত দুর্বলতারই নামান্তর। তেমন বুদ্ধির কোন কসরতেই পরাভবকে অতিক্রম করা যায় না। বৃহতের প্রজ্ঞানঘন আকর্ষণ বিচারকে ডুবাইয়া যখন অনুভূতিকে জাগাইয়া তোলে, তখন সেই অনুভূতির আলোকেই বুদ্ধি সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় এবং ব্যবসায়াত্মিকা হইয়া উঠে। সুভাষচন্দ্রের জীবনে এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অসংমূঢ় প্রভাবে প্রকট হইয়াছে এবং পথের হিসাব, যুক্তির মাপের দৈন্যকে উন্মুক্ত করিয়াছে।

পদে পদে যুক্তিবুদ্ধির মাপকাঠি লইয়া সুভাষচন্দ্রকে চলিতে হয় নাই। আত্মনিষ্ঠ প্রগাঢ় সংবেদনে তিনি সমষ্টি-মনকে আকর্ষণ করিয়া নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সে আসন হইতে কেহ তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। সুভাষচন্দ্রের প্রাণময় সাধনা ভেদের মধ্যে অভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যুক্তি বা বিচারে যেখানে দুর্বলতা একান্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেও বল এবং বীর্য জাগাইয়া তুলিয়াছে। নেতৃত্বের এইখানেই সার্থকতা।

প্রকৃতপক্ষে পথের বিচার করিয়া কোনদিনই নেতৃত্বের অধিকারী হওয়া যায় না। কতকগুলি বাছা বাছা নৈতিক সূত্র বা যুক্তি ধরিয়া চলিয়া সমষ্টিমনকে আকর্ষণ করা সম্ভবও নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ দান করিতে গিয়া মানুষের মনের গূঢ় ধর্মের বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, মনের কোণে স্বার্থের বীজ গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে। কর্মের পথে কিছুদূর চলিতে গেলেই সেই স্বার্থ-চেতনা ক্রমে দানা বাঁধিয়া উঠিয়া কামনার সৃষ্টি করে। কামনার পথে কণ্টক উপস্থিত হইলেই ক্রোধের উদ্ভব হয়। ক্রোধ মনকে অন্ধ করিয়া ফেলে। মন সে—গিয়া পড়ে এবং নেতৃত্বের যত স্পর্ধা জীবনে একান্ত বঞ্চনাই বহন করিয়া আনে। নেতৃত্বাভিমানী তেমন ব্যক্তিদের জীবন এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে।

সুভাষচন্দ্র হিসাবের খাতা সামনে রাখিয়া নেতা হন নাই। দেশ এবং জাতির দীর্ঘ পরাধীনতার বিপুল ব্যথা তাঁহার মনস্বিতাকে পরিস্ফূর্ত করিয়া নেতৃত্বের মহনীয় মর্যাদায় তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি এবং প্রকৃতিতে সুভাষচন্দ্রের সাধনা বলিষ্ঠ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে এবং সুভাষচন্দ্রের প্রাণমহিমা পরাভবের গ্লানি হইতে জাতির সমষ্টিমনকে আত্মোৎসর্গের অগ্নিময় সমারম্ভে উদ্ধার করিয়াছে। পথের হিসাবে যে আঁধার কাটে নাই, সুভাষচন্দ্রের অবদানে তাহা কাটিয়াছে। যজ্ঞের আগুন যখন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে এবং ভারতের স্বাধীনতার শত্রু দৈত্যদলের বল বাড়িয়াছে, তাহাদের কূটনীতির খেলা পাক খুলিয়াছে, সুভাষচন্দ্রের প্রাণের তাপে আগুন তখন দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়াছে। বস্তুত ভারতের স্বাধীনতার জন্য শেষের দিকের সংগ্রাম সুভাষচন্দ্রের জ্বলন্ত প্রাণের ঐকান্তিক অবদানই সার্থক করিয়াছে। সুভাষ-চন্দ্রের বীর্যবলের ব্যাপ্তি-শক্তির দৃপ্তলীলার বিভীষিকাতেই নরশোণিতলোলুপ রাক্ষস পলাইয়াছে, শঙ্কিতচিত্ত পিশাচদের দল পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জ্যোতির্ময় যজ্ঞ-পুরুষরূপে নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র মহাকালের ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষায় উত্তরোত্তর উজ্জ্বল এবং অপরিম্লান প্রভাব বিস্তার করিবেন।

জয় নেতাজীর জয়! সুভাষচন্দ্রের পরাজয় নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজেরও পরাজয় ঘটে নাই। দিল্লীর লালকেল্লার উপরে আজ জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। সে পতাকা আজাদ হিন্দ ফৌজের শোণিতোৎসবের প্রাণময় বৈভবই বিস্তার করিতেছে। সুভাষচন্দ্রের প্রাণবল ঐতিহাসিক তথ্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করিয়াছে। বিশ্ববাসীর কানে তাঁহার জয়ধ্বনিই বাজিতেছে এবং পরাজয়ের কথা তলাইয়া গিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠ নীরব হয় নাই, হইবেও না। তাঁহার অভয় মন্ত্র বিশ্বের পতিত, পীড়িত এবং পরাধীন মানবসমাজকে যুগ যুগ মুক্তির সাধনায় অনুপ্রাণিত করিবে। বাঙলার সুভাষচন্দ্র, ভারতের সুভাষচন্দ্র বিশ্ববাসীর আপনার জনস্বরূপে প্রেম, মৈত্রী এবং আত্মীয়তার সরল উদার অকৃত্রিম অহিংসার চিদৈশ্বর্য-পূর্ণ মাধুরীতে মণ্ডিত হইয়া চিরদিন জগতের বন্দনা লাভ করিবেন।

ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা

গান্ধীঘাটের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সমবেত জনতার একাংশ। পণ্ডিতজী ২রা মাঘ এই ঘাটের উদ্বোধন করেন

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

সুভাষের জীবনে অপরের প্রভাব

মানুষের জীবনে পিতামাতার দোষগুণ বহু পরিমাণে সন্তানকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। জন্মসূত্রে সন্তান যাহা লাভ করে, তাহা ছাড়াও সংসারে মাতাপিতার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী শিশু জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিতে থাকে এবং তাহার জীবন সেইভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে। সাধারণভাবে এই নিয়মই কার্যকরী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম যে নাই, তাহা কেহ বলিবেন না।

সেইভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, অনেক মানুষ বহু দুঃখ কষ্ট এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেকে কায়ক্লেশে বাঁচাইয়া পরে দেশের মধ্যে "পাঁচজনের একজন" হইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া দৈন্য অভাব বহুলোককে যে তাহার স্বভাবজাত নির্দিষ্ট স্থান লাভে বঞ্চিত করিয়া নিষ্ঠুরভাবে লোকচক্ষের অন্তরালে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া "হত্যা" করিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সুভাষের জীবনে সকল দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিবার বহু সুযোগ একসঙ্গে বর্তমান ছিল। যদি পিতৃবংশ পরিচয় মানুষকে সংযত রাখিয়া অতীতের গৌরবময় স্থান সমধিক গৌরবোজ্জ্বল করিবার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে জাগাইয়া দেয়, তাহাতে সুভাষের অভাব ছিল না।

সাক্ষাৎভাবে মাতাপিতার চরিত্র, সাংসারিক আবহাওয়া যদি মানুষের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে প্রথম আদর্শরূপে তাহাকে আগাইয়া লইয়া যাইবার সহায়ক হয়, তাহা হইলে সুভাষ এবিষয়ে অপরাপর বহু মহাপুরুষ অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান।

অর্থানুকূল্য যদি মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইয়া তাহাকে শিক্ষালাভ, স্বাস্থ্য লাভ মাত্রের জীবন লাভের নিত্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ করিয়া দেয়, তাহা হইলেও বলিতে হয়, সুভাষের অদৃষ্ট এ বিষয়ে সুপ্রসন্ন ছিল।

সুতরাং সুভাষ যাহা হইয়াছে, অর্থাৎ আজ তাহার যে পরিচয় পাইয়া প্রতি গৃহে প্রতি বিপণীতে, প্রতি পূজামণ্ডপে শোভাযাত্রায় তাহার আলেখ্য রাখিয়া দেশবাসী তাহাকে যে সম্মান দান করিতেছে, সেই সম্মানের অধিকারী হইবার সুযোগ তাহার জীবনে বহু পরিমাণে বর্তমান ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া অর্থস্বচ্ছলতার সহিত মাতাপিতা বর্তমান থাকিয়াও বহু লক্ষ লোক সুভাষের মত কীর্তিমান হয় না; এমন কি সুভাষের জন্মদিনে, হয়ত জন্ম সময়েও যত লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সকলেই সুভাষের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

কিন্তু মানুষের জীবনে অপর মানুষ যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে মহাপুরুষদের জীবনে যে সকল লোকের প্রভাব অসাধারণভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা লইয়া আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত। সুভাষের প্রসঙ্গে কয়েকটি লোকের নাম বিশেষ করিয়া মনে আসে। কোন সময়ে কোন বন্ধু বা অপরিচিত ব্যক্তির একটি বাক্য মানুষের জীবনের গতি ফিরাইয়াছে, তাহার হিসাব পাওয়া কঠিন; কিন্তু যে সকল লোক অপরের জীবন নিজের ছাঁচে গড়িবার সাহায্য করিয়াছেন, তাহা জানিতে আনন্দ আছে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে সেইরূপ কয়েকটি লোকের কথা জানা আছে। তন্মধ্যে তাহার পিতা জানকীনাথ ও মাতা প্রভাবতীর স্থান সর্বোপরি। তাহার পর ধর্ম ও কর্মজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ, রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও জাগতিক কূটনীতি ও ইংরেজের শত্রুতায় এরে বা আয়র্লণ্ডের নেতা এমন্ ডি ভ্যালেরার স্থান। এই সকল মহামানবদের সহিত তাহার বহু আত্মীয় বন্ধু, রাজনীতি ক্ষেত্রের সহকর্মী নানাভাবে তাহার জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তন্মধ্যে তাহার মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রয়োজন। তাহা ছাড়া যাহারা জানকীনাথকে সুভাষ-জনক বলিয়া তাঁহার একমাত্র পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা জানকীনাথের মহান চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহাতে সাধারণ লোকের কোনও দোষ নাই। জানকীনাথ নিজেকে কখনও প্রচার করিয়া যান নাই। সংবাদপত্র পাঠ ছাড়া এই প্রচার যন্ত্রের মহিমায় তিনি কখনও আকৃষ্ট হন নাই। তাঁহার অতি মহৎ কার্য সকলের অলক্ষ্যেও সাধিত হইত এবং তিনি তাহা গোপন রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। জানকীনাথের জীবনী সমস্ত বাঙ্গালীর আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা চলিতে পারে। বাঙলার ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের নিকট জানকীনাথের চরিত্র সম্যক্ পরিচিত হইলে এবং তাহার অনুকরণে চরিত্র গঠিত হইলে বাঙালী জীবন মধুময় হইবে; জানকীনাথ ত্যাগ, তিতিক্ষা, বিনয়, সত্যবাদিতা, দানশীলতা, সৎ সাহস এবং নিঃশত্রু কর্মজীবনের মূর্ত প্রতীক। তাঁহার কালে এরূপ চরিত্রের মহাপুরুষ বিরল ছিল না, কিন্তু

তাহার মধ্যেও জানকীনাথের চরিত্র সমুজ্জ্বল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, জনসাধারণ তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ জানে না। একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, যে তাঁহার স্বনামধন্য সন্তানরা কেহই তাঁহার সমস্ত গুণের এমন কি অধিকাংশ গুণেরও অধিকারী হইতে পারেন নাই। আজ তাঁহাকে জানিবার দিন আসিয়াছে, কিন্তু যিনি নিজেকে মোটেই জানিতে দেন নাই, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যাওয়ার বিশেষ অসুবিধা আছে। তাহা সত্ত্বেও এ চেষ্টায় আনন্দ আছে।

সুভাষের আদর্শ পল্লী

জানকীনাথ ও তাঁহার বংশধরদিগের পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে জানকীনাথের গ্রাম, তাঁহার আবির্ভাব-পূর্বকালের এবং সমসাময়িক সাংস্কৃতিক অবস্থার কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। জানকীনাথ সর্বপ্রকারে তাঁহার পল্লীর মঙ্গলামঙ্গলের সহিত জড়িত, তাঁহার গ্রামের যে গৌরবময় কালের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সুভাষের জীবনী আলোচনা করিতে গেলেও তাহার পিতার জন্মভূমি এবং তাহার আদর্শ পল্লীর কথা বিশদভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। জানকীনাথের পল্লী, ২৪ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রাম, সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান নহে: কিন্তু তাহার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতৃদেবের সহিত সে প্রায়ই কোদালিয়ায় যাতায়াত করিত এবং কোদালিয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের কীর্তি-সমুজ্জ্বল কাহিনী শুনিয়া সে উহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের কথা সে মহা উৎসাহে উল্লেখ করিত; গ্রামের বন্ধু-বান্ধবদের নিকট বারে বারে গ্রামের অতীত গৌরবের কথা জিজ্ঞাসা করিত; এবং সময় পাইলে যাঁহাদের পাইয়া গ্রাম ধন্য হইয়াছে, তাঁহাদের বাস্তুভিটা দেখিয়া বেড়াইত। সুভাষ যে আত্মজীবনী লিখিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে গ্রাম ও পিতৃপুরুষদের পরিচয় বিশদভাবে দিতে চেষ্টা করিয়াছে। সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ করিয়াছে এবং নিজেও বহু শ্রম করিয়াছে। কোদালিয়া প্রভৃতি গ্রাম আবার যাহাতে অতীত গৌরবের কিয়দংশও লাভ করিতে পারে তাহার জন্য জানকীনাথ ও তাঁহার দেশবরেণ্য পুত্রদ্বয়, শরৎচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র অকুণ্ঠ চেষ্টা ও অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

গ্রাম পরিচয়

কোদালিয়া গ্রামটি আয়তনে অতি ক্ষুদ্র এবং পার্শ্ববর্তী আর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম চাংড়িপোতার সহিত মিলিয়া রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির একটি বিভাগ বা ওয়ার্ড বলিয়া পরিচিত। কেবল কোদালিয়ার পরিচয় দিতে গেলে আর যে কয়টি গ্রাম মিলিয়া একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে ঐ অঞ্চল পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের নামগুলিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলিকাতার দক্ষিণে বর্তমান সহরের সীমানার মাত্র দশ মাইলের মধ্যে কোদালিয়া অবস্থিত এবং রাজপুর হরিনাভি জগদ্দল মালঞ্চ ও মাহিনগর মিলিয়া পরস্পরের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই সঙ্গে এড়াচি ও গাজিপুর দুইটি অতি ক্ষুদ্র পল্লী পড়ে, কিন্তু তাহাদের কোনও স্বতন্ত্র পরিচয় অনাবশ্যক।

আদি গঙ্গা জানকীনাথের শিশু অবস্থায় স্রোতস্বিনী নদী ছিল। ইহা একদিকে হুগলীর সহিত যুক্ত এবং অপর দিকে রাজপুর প্রভৃতি গ্রামের পশ্চিম সীমা দিয়া সরাসরি দক্ষিণে গিয়া উত্তরভাগে পড়িয়াছে। এখন এ নদী মজিয়া গিয়া দীর্ঘ জলা হইয়া পড়িয়া আছে এবং স্থানীয় লোকে ইহার গর্ভ হইতে মাটী উঠাইয়া স্থানে স্থানে বিভিন্ন পুষ্করিণীতে পরিণত করিয়াছে এবং ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা, মুখুজ্জের গঙ্গা প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া আছে। কোদালিয়ার পূর্ব সীমা বাহিয়া কলিকাতা-ডায়মণ্ডহারবার রেলপথ এবং গ্রামের জলনিকাশের পথ বন্ধ করিয়া পশ্চিমদিকের মজিয়া যাওয়া নদীর সাহচর্যে সমস্ত গ্রামগুলিকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছে এবং ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

জানকীনাথের বাল্যকালে গ্রামের এই অবস্থা ছিল না। সন্নিকটবর্তী অপরাপর গ্রাম হইতে কোদালিয়ার একটি বিশেষত্ব ছিল বা এখনও কতক পরিমাণে বর্তমান আছে। গ্রামে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন শিল্পকার্যে রত ছিল এবং তাহারা এই ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র "পাড়া" করিয়া থাকিত; এক পাড়ার মধ্যে অপর জাতি কখনই দেখা যাইত না।

গ্রামটী ব্রাহ্মণ-প্রধান এবং তাঁহাদের প্রধান কাজ ছিল বিদ্যাচর্চা যজন যাজন প্রভৃতি। কোদালিয়ায় বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বতন্ত্র স্থানে তাঁহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রায় সবই বৈদিক শ্রেণীভুক্ত; মাত্র এক ঘর রাঢ়ী ব্রাহ্মণের বাস, গ্রামের গোয়ালাদের পৌরোহিত্য করাই তাঁহাদের উপজীবিকার প্রধান উপায় ছিল। আর এক শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহারা পতিত অচ্ছ্যুতকে মন্ত্রাদি দান এবং তাহাদের নিকট দান গ্রহণ করায় গ্রামের বৈদিক সমাজের নিকট ব্রাহ্মণের সম্মান হইতে কথঞ্চিৎ বঞ্চিত ছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহারা 'চক্রবর্তী' উপাধি ধারণ করিতেন, পরে মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি রাঢ়ী শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণের উপাধি গ্রহণ করিয়া সেই সমাজভুক্ত হইয়া যান।

গ্রামের মধ্যে বহু শিল্পের সমাবেশ ছিল এবং সমাজে যাহা প্রয়োজন তাহার সমস্তই গ্রামের মধ্যেই উৎপন্ন হইত। যোগী বা তাঁতী, কুম্ভকার, স্বর্ণকার; কর্মকার; শঙ্খকার; সুবর্ণ বণিক সমাজে অভাব ছিল না; উপরন্তু ইঁহাদের মধ্যে বিশেষতঃ স্বর্ণকার সমাজ দোল, দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা প্রভৃতি মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। গোয়ালা সমাজ কোদালিয়ায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। একই সমাজ এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে কোনও বাধানিষেধ না থাকিলেও তাঁহারা গাঁদি, হাটুই, চল, আউলি, জাটী, হেয়ো ও খ'য়ে প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইঁহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র 'পাড়া' এবং এক পাড়ার মধ্যে অপর শ্রেণীর গোয়ালা দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্রামের প্রয়োজনে কালু, চুনুরী (শামুকের চূণ প্রস্তুতকারী) কায়পুত্র (বা কাওরা), কৈবর্ত (প্রধানত সূত্রধর) ক্ষৌরকার, রজক, শৌণ্ডিক ও গ্রাম প্রান্তে চর্মকার ও মুসলমানদিগের বাস। গ্রামে সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের সিন্নী বা শির্ণির সময় মুসলমানের প্রয়োজন এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত আসিলে যেমন করিয়া বাড়ির বৃদ্ধা গৃহিণীরা তাঁহাদের পদ প্রক্ষালন করিয়া দেন, এই দিন মুসলমান "গাজী"-কে সমান সম্মান প্রদর্শন করা হইত।

হিন্দু সমাজের এই সকল বিভিন্ন শ্রেণী গুণ কর্ম বিভাগ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া অতি সুখে কালাতিপাত করিতেন। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর মধ্যে বসবাস করেন নাই; এমন কি প্রায় দেড় শতাব্দীর ইতিহাসে স্থান পরিবর্তন করিয়া এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর পাড়ায় বাস করিতে আসেন নাই। এই যে সমাজ বিন্যাস এবং গ্রামের নানা অংশে নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিল্পীর সমাবেশ, ইহা কোদালিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য।

জানকীনাথের জন্মকাল

জানকীনাথের জন্মকালে এই সমস্ত শিল্পই সমৃদ্ধ ছিল এবং কোদালিয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিকে অর্থস্বচ্ছলতা দান করিয়াছিল। ইহার ফলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে বিদ্যাচর্চার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার উপর ইহা সংস্কৃতির কেন্দ্র কলিকাতা নগরীর অতি নিকটে অবস্থিত; এবং সেই সূত্রে বাঙলার পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ আরোপিত হওয়ায় কোদালিয়া, চাংড়িপোতা প্রভৃতি গ্রাম সকল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র বলিয়া সহজেই খ্যাতিলাভ করে।

জানকীনাথ ১৮৬০ সালের ২৮শে মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। সুভাষকে লইয়া সাত পুরুষের নাম ধরিলে রত্নেশ্বরকে প্রথম পাওয়া যায়। রত্নেশ্বরের পুত্র রামচরণ, তাঁহার পুত্র রামহরি। রামহরির পুত্র প্রাণমোহন এবং প্রাণমোহনের পুত্র হরনাথ। হরনাথের দুই বিবাহ: প্রথমা স্ত্রী, মনোমোহিনী ও দ্বিতীয়া, কামিনী। মনোমোহিনীর পিত্রালয় কলিকাতার ইণ্টালীতে এবং কামিনীর পিত্রালয় কোদালিয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম হরিনাভিতে।

মনোমোহিনীর জীবিতকালেই হরনাথ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। শুনা যায় বিবাহের কিছুকাল পর হরনাথের পিতা, প্রাণমোহন পুত্রবধূ আনিবার জন্য ইণ্টালীতে বৈবাহিক আবাসে উপস্থিত হন। কোন এক বিশেষ কারণে বৈবাহিক মহাশয় কয়েক দিন বাদে তাঁহার কন্যাকে শ্বশুরালয়ে অর্থাৎ কোদালিয়ায় পৌঁছিয়ে দিবার প্রস্তাব করায় প্রাণমোহন রাগ করিয়া চলিয়া আসেন তিনি হরনাথের পুনর্বার বিবাহ দিবা সঙ্কল্প করেন এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের কামিনী সহিত পুত্রের বিবাহ দেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা রঙ্গ কৌতুক হিসাবে উল্লেখ করা চলে। যদি বৈবাহিকের সহিত প্রাণমোহনের মনোমালিন্য না ঘটিত, তাহা হইলে হরনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব কখনই উঠি না। হরনাথ ও কামিনীর বিবাহে জানকীনাথ, জানকীনাথ প্রভাবতীর বিবাহে সুভাষের জন্ম সম্ভব হইয়াছে। বৈবাহিকের বিতণ্ডা কামিনী সহিত হরনাথের বিবাহ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল তাহা না হইলে ভারতের জাতীয় ইতিহাস অন্য ভাবে লেখার প্রয়োজন হইত।

মনোমোহিনী তাঁহার সপত্নী কামিনী অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা ছিলেন। যখন কামিনীর প্রথম পু যদুনাথ ও দ্বিতীয় পুত্র কেদারনাথ জন্মগ্রহ করিয়াছে, ততদিন মনোমোহিনী কেবল পরিণ বয়স্কা নয়, পরিণতবুদ্ধি যুবতী হইয়াছে তিনি তাঁহার সমস্ত অবস্থা উপলব্ধি করি পিত্রালয়ের কাহাকেও না বলিয়া পূজনীয় শ্বশু মহাশয়কে পত্র দেন। তাহার বক্তব্য, তাঁহ পিতার সহিত মতান্তর হইতে পারে, কিন্তু ইহা মনোমোহিনীর নিজের কোনও অপরাধ নাই; তি

হিন্দু ঘরের কন্যা ও বধূ, সুতরাং শ্বশুরে ও স্বামীর সেবার অধিকার তাঁহার আছে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া প্রাণধন যেন পুত্রবধূকে পিত্রালয় হইতে লইয়া আসেন।

পত্র পাইয়া প্রাণধন বিচলিত হইলেন। ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তিনি এক নিরপরাধ বালিকার উপর কতদূর অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া অনুশোচনা ভোগ করিতে লাগিলেন। কোদালিয়া হইতে ইণ্টালী বেশী দূরে নয়। কিন্তু সে সময়ে যানবাহনের বিশেষ অসুবিধা ছিল। তিনি কাঁধে চাদর ফেলিয়া পুত্রবধূ আনিতে চলিয়া গেলেন। বাড়ির লোকে সমস্ত খবর, তাঁহার মনের বেদনা জানিত না। তিনি যখন পুত্রবধূ লইয়া ফিরিলেন, তখন সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ পাইল।

জানকীনাথের বংশতালিকা :—
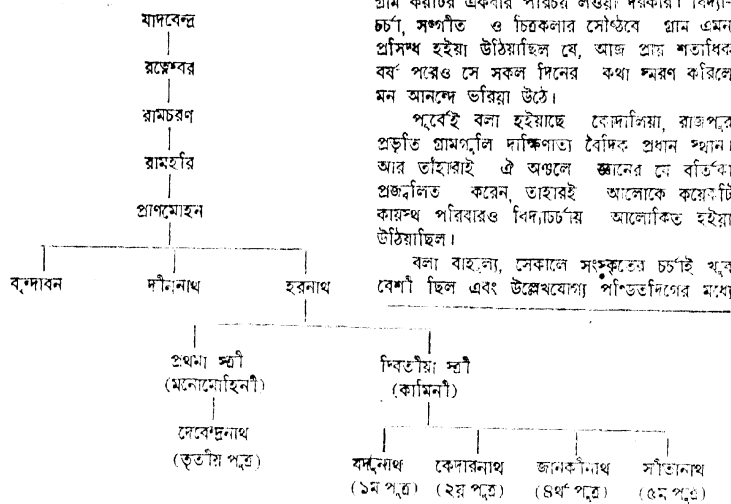
মনোমোহিনী আসিবার পর দুই সপত্নীতে হরনাথের সংসার করিতে লাগিলেন। কালক্রমে মনোমোহিনীর এক পুত্র জন্মে, নাম দেবেন্দ্রনাথ। জানকীনাথ কামিনীর তৃতীয় পুত্র, চতুর্থ পুত্র সীতানাথ বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জানকীনাথের বাল্যকাল

হরনাথ সওদাগরী অফিসে চাকুরি করিতেন। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার সংসারে অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটে। মনোমোহিনী পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া ইণ্টালীতে পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। হরনাথ কোদালিয়ায় থাকিয়া পুত্রদের লালন পালন করিতে লাগিলেন। সংসারে খুবই অভাব, সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। বৃন্দাবন জয়নগর মিত্রবাবুদের জমিদারীতে কর্ম করিতেন। তিনি সংসারে যাহা পাঠাইতেন, তাহাতে কোনও রকমে সংসার চলিয়া যাইত। অভাবের মধ্যেও হরনাথ পুত্রদের লেখাপড়ার যতদূর সম্ভব সুযোগ করিয়া দিতেন এবং পুত্রেরা একে একে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি এ্যাংলো সংস্কৃত (Harinavi A. S. School) স্কুলে পড়িতে লাগিলেন।

অর্থাভাবে যদুনাথ শীঘ্রই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। কেদারনাথ হরিনাভি স্কুল হইতে ১৮৬৮ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। জানকীনাথ তখন স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র। কেদারনাথ কার্যোপলক্ষে কলিকাতা চলিয়া আসিবার পর জানকীনাথ আরও কয়েক বৎসর হরিনাভি স্কুলে পড়িতে থাকেন।

এদিকে ইণ্টালীতে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ মেধাবী ছাত্র বলিয়া স্কুলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিলেন। কেদারনাথ কলিকাতা আসিবার পর জানকীনাথের পড়ার ব্যাঘাত হইতে থাকে এবং এই অবস্থার প্রতি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন তিনি কোদালিয়া হইতে জানকীনাথকে কলিকাতা লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিলে জানকীনাথ কলিকাতায় পাঠের জন্য কোদালিয়া হইতে চলিয়া আসেন।

গ্রামের তৎকালীন অবস্থা

জানকীনাথের শৈশব ও কৈশোর কোদালিয়ায় কাটিয়াছে, সেই সময় কোদালিয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রাম কয়টির একবার পরিচয় লওয়া দরকার। বিদ্যাচর্চা, সঙ্গীত ও চিত্রকলার সৌষ্ঠবে গ্রাম এমন প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, আজ প্রায় শতাধিক বর্ষ পরেও সে সকল দিনের কথা স্মরণ করিলে মন আনন্দে ভরিয়া উঠে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে কোদালিয়া, রাজপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি দাক্ষিণাত্য বৈদিক প্রধান স্থান। আর তাঁহারাই ঐ অঞ্চলে জ্ঞানের যে বর্তিকা প্রজ্বলিত করেন, তাহারই আলোকে কয়েকটি কায়স্থ পরিবারও বিদ্যাচর্চায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, সেকালে সংস্কৃতের চর্চাই খুব বেশী ছিল এবং উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে গৌরহরি চূড়ামণি ও ভরতচন্দ্র শিরোমণির নাম এ তালিকার প্রথম দিকেই আসিয়া স্থান অধিকার করে।

গৌরহরি প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পিতাঠাকুর। অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহার নিকট বহু পণ্ডিত আনিয়া সমবেত করিত এবং তিনি নিজ বাটীতে বসিয়া তাঁহাদের শিক্ষা দান করিতেন। কোনও বিষয়ে কলিকাতায় তাঁহার উপস্থিতি প্রয়োজন হইলে তিনি কদাচ সম্মত হইতেন না। পুত্র আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ পিতার উপযুক্ত সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইলেও প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও বিদ্যা গভীরতায় পিতার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। আনন্দচন্দ্র বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিজ ভাষ্য দান করিয়াছেন। বেদান্তসার, ষটচক্রনিরূপণ প্রভৃতি গ্রন্থ বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তিনি বহু দিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকত্ব করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ বশত ব্রাহ্ম ধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন।

কোদালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত লাঙ্গলবেড়িয়া গ্রামের পণ্ডিতপ্রবর ভরতচন্দ্র শিরোমণির নামের সহিত অনেকেই পরিচিত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরূপে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। উত্তরাধিকার আইনের "দায়ভাগ" বিষয়ে তাঁহার অদ্বিতীয় জ্ঞান ছিল এবং দায়ভাগ আইন সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন উঠিলে তাঁহার মীমাংসা চরম বলিয়া গৃহীত হইত। তিনি দায়ভাগের উপর কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের সহিত মনুসংহিতার পরিচয় করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে কুল্লুক ভট্ট টীকা সমেত সমস্তই অনুবাদ করেন।

দেশের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন স্বনামধন্য পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তাঁহার সামান্য পরিচয় দিতে গেলেও বহু কথা লিখিতে হয়। ১৮৩২ সালে ছাত্ররূপে ভর্তি হইয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। বিখ্যাত সোমপ্রকাশ পত্রিকা তাঁহার অক্ষয়কীর্তি; ১৮৫৮ সালে চাংড়িপোতা হইতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিলেও তিনি বাঙালা ভাষায় বহু পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা সেই যুগে অগাধ পণ্ডিত সমাজেও তাঁহাকে বহু সম্মানিত স্থান দান করিয়াছিল। তাঁহার ব্যাকরণ, ইতিহাস, নীতি পুস্তক, গদ্য ও পদ্য কাব্য, দর্শন প্রভৃতি পুস্তকাদি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ; কল্পদ্রুম পত্রিকা সে যুগের বহু অভাব দূর করিয়াছে। সোমপ্রকাশের ভাষা ভবিষ্যৎ বঙ্গভাষার সূচনা দিয়াছে। প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় তদানীন্তন গভর্নমেণ্টকেও সচেতন করিয়া রাখিয়াছিল।

তাঁহার দৃষ্টি ছিল স্থানীয় যুবকমণ্ডলীকে ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রের জন্য তৈয়ারী করা। তাঁহার চেষ্টার পূর্বে ঐ অঞ্চলে ইংরাজি ধরণের উচ্চ শিক্ষার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বিক্ষিপ্ত ছিল; প্রতিপক্ষের বিরোধিতার মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যাহত হইয়া পড়িত। দ্বারকানাথ তদানীন্তন কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র এক সঙ্গে করিয়া "হরিনাভি স্কুল" নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখন যে বাটীতে বিদ্যালয় অবস্থিত, সেই ভবনে ১৮৬৬ সালে মাদুর পাতিয়া ছাত্ররা বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করেন এবং সেই বৎসর হরিনাভি স্কুলের ছাত্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুই জন ছাত্র উত্তীর্ণ হন।

সংস্কৃত ও ইংরাজী বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন হইত বলিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্কুলের নাম পরে "এ্যাংলো-সংস্কৃত" রাখিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার পূর্বে তাৎকালিক তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছয়মাস ছাত্ররা রঘুবংশ ভট্টিকাব্য প্রভৃতি কাব্যের সমস্ত সর্গ পাঠ সমাধা করিতেন। সে যুগের হরিনাভি স্কুলের ছাত্রদের সংস্কৃত বিদ্যার জ্ঞান অসাধারণ ছিল।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজে স্কুলের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং প্রতিষ্ঠার পর নিজেই সম্পাদক হইয়া কার্য পরিচালনা করিতেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে নিজে বেতন পাইতেন, তাহা লইয়া বাড়ি যাইবার পূর্বে বিদ্যালয় ভবনে প্রবেশ করিয়া শিক্ষকদের বেতন দিয়া রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরিতেন। তাঁহার অনুপ্রেরণা দেশকে বিদ্যানুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল।

জানকীনাথ হরিনাভি স্কুলে কয়েক বৎসর পাঠ করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অন্য স্থানে আলোচনা করা যাইবে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎকালীন ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত দেখিয়া বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নির্বাচন করিতেন; বলা বাহুল্য তাঁহারই উৎসাহে ঋষিকল্প স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত ও শিবনাথ শাস্ত্রী হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক হইয়া গিয়াছেন।

দ্বারকানাথের সমসাময়িক বহু পণ্ডিত গ্রাম সমষ্টিকে মহিমান্বিত করিয়াছেন। সকলের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু সংক্ষেপতঃ উল্লেখ না করিলে জানকীনাথের জ্ঞানোন্মেষের কাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা হওয়া সম্ভব নয় সেই জন্য মাত্র নামগুলির উল্লেখ করা গেল।

হরিনাভির নামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটকে রাম-নারায়ণ), নাটককার ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ প্রণেতা, কোদালিয়ার রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপ রাজার সভাপণ্ডিত, রাজপুরের রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক, হরিনাভির প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, ও রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মঙ্গলকাব্য প্রণেতা, চাংড়িপোতার অভয়াচরণ তর্কালংকার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক এবং কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অন্যতম অনুবাদকর্তা, রাজপুরের গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং বাঙ্গলা ও সংস্কৃত বহু গ্রন্থ প্রণেতা, কোদালিয়ার রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ মেট্রো-পোলিট্যান (বর্তমানে বিদ্যাসাগর) ও রিপন কলেজের অধ্যাপক ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, চাংড়ি-পোতার তারাকুমার কবিরত্ন, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, রাজপুরের হরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, হরিনাভির কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, মেট্রোপোলিট্যান কলেজের সহঃ অধ্যক্ষ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ঐ গ্রামের পণ্ডিত মতিলাল ভট্টাচার্য, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক এবং উদয়পুরের শিক্ষা বিভাগের প্রধান, কোদালিয়ার উমাচরণ তর্করত্ন (সার্বভৌমবাড়ী) রিপন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, হরিনাভির দীননাথ ন্যায়রত্ন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি বহু পণ্ডিত জানকীনাথের জন্মের কয়েক বৎসরের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বিদ্যাচর্চায় জীবন যাপন করিয়া দেশের যশ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

যাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্গত। একজন কায়স্থ যুবক এই সঙ্গে বিরাট পাণ্ডিত্য লইয়া ধীরে ধীরে আপনার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার নাম রমানাথ (ঘোষ) সরস্বতী। ইনি জানকীনাথের মাসীপুত্র এবং কোদালিয়ার প্রান্তে হরিনাভিতে জানকীনাথের (ও রমানাথের) মাতুলালয়ে জন্ম-গ্রহণ করেন। জানকীনাথের পাঁচ বৎসর আগে ১৮৫৫ সালে রমানাথের জন্ম হয়। রমানাথ ও রমানাথের সহাধ্যায়ী ও পরম বন্ধু কোদালিয়ার শ্যামাচরণ ঘোষ ১৮৭০ সালে হরিনাভি স্কুলে একসঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গভর্নমেণ্টের বৃত্তি লাভ করেন। রমানাথ সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সরস্বতী উপাধি লাভ করেন এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া ঢাকা চলিয়া যান। ইঁহারা বৃত্তিলাভ করিলে গভর্নমেণ্ট হইতে সাহায্য বা "এড্" পাওয়া যায় এবং স্কুলের নাম হরিনাভি এডেড্ (Aided) স্কুলে পরিবর্তিত হয়।

রমানাথের চরিত্রের দৃঢ়তা সকলকে বিস্মিত করিত। তিনি ইংরাজিতে ঋগ্বেদের অনুবাদ করিতে কৃতসংকল্প হন। তখন তাঁহার মাতা এবিষয়ে ঘোরতর আপত্তি করেন। ম্লেচ্ছ ভাষায় হিন্দুর শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অনূদিত হইলে বিশেষ করিয়া শূদ্রের পক্ষে (রমানাথ কায়স্থ সন্তান, অতএব 'শূদ্র') বিশেষ অকল্যাণকর হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। রমানাথ অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ ও ব্যাকরণ প্রভৃতি রচনার সহিত ঋগ্বেদের প্রথমাংশের অনুবাদ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ২৬ বৎসর বয়স ছিল এবং তাঁহার শোকার্ত জননী দীর্ঘ জীবন ধরিয়া পুত্রের অসমসাহসিকতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে উমেশচন্দ্রকে সহকর্মী-রূপে পাইয়াছিলেন ইহা দেশের পরম সৌভাগ্য এবং অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। প্রকৃত পক্ষে গ্রামের মঙ্গলের জন্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিবার কথা। উমেশচন্দ্রের বিষয় একটু বিশদভাবে না জানিলে যুবকদিগের চিন্তাধারা কোন পথে চলিতেছিল তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না।

উমেশচন্দ্র ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ, বাঙ্গলা ১২৪৭ সালে ৩রা পৌষ মজিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া তিনি বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়া বিধিপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬০-৬১ সালে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইয়া দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন, কিন্তু মস্তিষ্কের ও চক্ষুর পীড়ার জন্য পাঠ বন্ধ করিতে বাধ্য হন। শিক্ষকতার দ্বারা জীবিকা উপার্জনের জন্য ১৮৬২ সালে জয়নগর স্কুলে কর্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মতবাদের জন্য সেখানে বেশী দিন বাস করিতে পারেন নাই, সুতরাং কলিকাতায় ট্রেণিং একাডেমীতে অস্থায়ী কার্য সংগ্রহ করিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আসেন। ইহার পর হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা করিতে করিতে দত্তপুকুর নিবাধই স্কুলে চলিয়া যান। যখন বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও স্থানীয় প্রাতঃ-স্মরণীয় জমিদার গোলকনাথ ঘোষ রাজপুরে এ্যাংলো-ভার্ণাকুলার স্কুলের যুগ্ম সম্পাদক সেই সময় ১৮৬৬ সালে দত্ত মহাশয় ঐ স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন। ইতোমধ্যে প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ সম্পর্কে সম্পাদক-যুগলের মধ্যে মনো-মালিন্য হওয়ায় বর্তমান বিদ্যালয় ভবনে বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় সতেরটি ছাত্র লইয়া মাদুর পাতিয়া হরিনাভি স্কুল নাম দিয়া স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। উমেশচন্দ্র ব্রাহ্ম বলিয়া স্থানীয় লোকের মহা আপত্তি সত্ত্বেও বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তখন বলিয়াছিলেন তাঁহার স্কুলের জন্য যতক্ষণ একজনও উপযুক্ত ব্রাহ্ম শিক্ষক পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ তিনি অন্য শিক্ষক রাখিবেন না। সে যুগে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত কত উদার ছিল তাহা এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ১৮৬৮ সালে পরে আলিপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবহার-জীব এবং হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের পিতা, দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করিলে উমেশচন্দ্র প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

উমেশচন্দ্র হিন্দু স্কুলে থাকাকালীন বামা-বোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এই সময় পত্রিকা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল।

উমেশচন্দ্র হরিনাভিতে বাস করিবার সময় তাঁহার ধর্মপ্রাণতা, চরিত্রের মাধুর্য্য ও পবিত্রতা, পরোপকার প্রবৃত্তি, সরল অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে সকলের নিকট নিতান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ব্রাহ্ম হইলেও সেই যুগে সকল শ্রেণীর লোকের বিশেষ শ্রদ্ধার্জন করিয়া-ছিলেন এবং কয়েকজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও ছাত্র লইয়া নিয়মিত উপাসনা করিতেন। উমেশচন্দ্রের নিজের ভাষায় "স্কুলের ছাত্ররা আমার প্রতি বড়ই অনুরক্ত। তাহারা ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইল।......বালকরা আমার ইচ্ছা মত সব করিতে প্রস্তুত। ইহাদের সহায়তায় হরিনাভি সমাজ বেশ জম জমাট হইয়া উঠিল। উপাসনা গৃহে লোক ধরিত না, আমাকেই বেশী দিন উপাসনা করিতে হইত—ছাত্ররা বেশ সঙ্গীত করিত। ইহারা আমার এতদূর অনুগত হয় যে, এক সময় ইহাদের কয়েকটি লইয়া বারাসত, নিবাধই প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন পূর্বক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা যায়। ...ছেলেরা জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়াছিল—পিতামাতার ক্লেশ হইবে বলিয়া উপবীত ত্যাগ করে নাই—কিন্তু অনেকেই করিতে উদ্যত। তাহাদের অভিভাবকরা এসকল দেখিয়া বিরক্ত হইলেও আমার প্রতি ভালবাসা এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-বশতঃ বাহ্যে কিছু বলিতেন না।"

উমেশচন্দ্রের বর্ণনা হইতেই পাওয়া যায় গ্রামে ব্রাহ্মভাবের বন্যা বহিতেছিল। জানকীনাথ তখন সাত আট বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। কিন্তু এই চিন্তাধারা অপেক্ষা উমেশচন্দ্রের মধুর চরিত্রের প্রভাব হইতে কেহই মুক্ত ছিল না। উমেশচন্দ্র হরিনাভি স্কুলের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন এবং ছাত্রদের এবং কখনও কখনও গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীদিগের অসুখে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তত্ত্ব লইতেন। উমেশচন্দ্রের ভক্ত ছাত্রের মুখে শুনিয়াছি, এক সময় মাত্র তিনজনে দূর হইতে শব বহন করিয়া আনিতেছিল, পথে তাহার অত্যন্ত ক্লান্ত, উপরন্তু তিনজনের পক্ষে মৃতদেহ বহন করিবার আর সামর্থ্য ছিল না। উমেশচন্দ্র সেই পথ দিয়া কার্যোপলক্ষে যাইতেছিলেন। তিনি লোক তিনটির অবস্থা বুঝিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতে চাহিলেন তিনি যে ব্রাহ্ম এবং জাতিভেদ মানেন না সুতরাং শবস্পর্শে তাহাদের আপত্তি আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাহাদের যে অবস্থা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় ছিল না, সাগ্রহে সম্মতি দান করিল। উমেশচন্দ্র রাস্তার ধারে গাছে জামা ফতুয়া সংলগ্ন করিয়া জুতা ছাড়িয়া শব বহন করিয়া শ্মশান ঘাটে গিয়া উপস্থিত। দরিদ্রের বন্ধু, সহায় সম্বল উমেশচন্দ্র তখন জনসাধারণের হৃদয়ে দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

যখন উমেশচন্দ্রের জনপ্রিয়তা মধ্যগগনে উপনীত হইয়াছে, সেই সময় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাগিনেয় শিবনাথ উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ইহাতে উমেশচন্দ্রের উপর স্থানীয় লোকের বিরাগ উপস্থিত হয় এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার হইতে বিরত হইতে বিশেষ অনুরোধ করেন। ইহাতে সম্মত না হইয়া উমেশচন্দ্র কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন্নগর স্কুলে চলিয়া যান।

উমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "কার্য পরিত্যাগ করা হইল—স্কুলের ছাত্রগণ কাঁদিয়া আকুল। মাস্টার ও ছাত্র পরস্পরের অশ্রুজল মিশাইয়া যে বিদায় দৃশ্য তাহা অবর্ণনীয়।"

তিনি হরিনাভির সংস্রব ত্যাগ করেন নাই, কর্মত্যাগ করিয়াছিলেন মাত্র। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া হরিনাভিতে পাকা ইমারত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও অপরিসীম জনপ্রিয়তা না থাকিলে একার্য কখনই সম্ভব হইত না। ১৮৭৪ হইতে ১৮৭৮ সাল তিনি সোমপ্রকাশ, ছাপাখানা প্রভৃতি লইয়া গভীরভাবে জড়িত হইয়া পড়েন এবং ১৮৭৭-৭৮ সাল হরিনাভি (এ্যাংলো-সংস্কৃত) স্কুলে দ্বিতীয়বার প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য করিয়াছিলেন। হরিনাভি ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্কুল তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার পূর্বতন ছাত্রদিগের সম্ভব হইলেই আনন্দে শোকে দুঃখে অংশ গ্রহণ করিতে ছুটিতেন। ১৮৮৭ সাল হইতে হরিনাভি স্কুল মহাদুর্দিনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, কিন্তু উমশেচন্দ্র সর্বসময় সুপরামর্শ দিয়া যতদূর সম্ভব গোলোযোগ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন।

প্রাক্তন ছাত্রদিগের উপর কি অগাধ প্রেম ছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ১৮৬৯ সালে উমেশচন্দ্র প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৮৭০ সালে জানকীনাথের মাসীপুত্র রমানাথ এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্যামাচরণ ঘোষ প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভ করেন। স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা ঐ স্কুলের সম্পাদক হন, শ্যামাচরণ তন্মধ্যে প্রথম। ১৯০৬ সালের শেষে শ্যামাচরণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন উমেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। কিন্তু সংবাদ পাইবামাত্র তিনি কোদালিয়ায় শ্যামাচরণের নাবালক সন্তানদিগকে দেখিবার জন্য ছুটিলেন। অপর উদ্দেশ্য শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উমাচরণকে সান্ত্বনা দেওয়া। উমাচরণও উমেশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র। তিনি বাটীর সন্নিকটে গিয়া বহুকষ্টে অতি ধীর পদক্ষেপে পৌঁছিলেন। শ্যামাচরণের এক পুত্রকে কোলে বসাইয়া তিনি শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, মুখে বাক্য নাই। বালকের মস্তক ও পৃষ্ঠদেশে যতই হাত বুলাইতে থাকেন, বর্ষার ধারার ন্যায় তাঁহার নয়নবারি বালকের সমস্ত দেহ ভিজাইয়া সিক্ত করিতে লাগিল। এমন গভীর সমবেদনা কেহ দেখে নাই। শ্যামাচরণের বৃদ্ধা জননী তখনও জীবিতা। শোকাবেগ দমন করিয়া তিনি উমাচরণকে লইয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন। উমাচরণ তখন বৃদ্ধ, কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উমেশচন্দ্রের নিকট তিনি বালকের মত বসিয়া তাঁহার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উমেশচন্দ্র যখন বিদায় লইলেন, তখন যেন বাড়ী হইতে শোকভার লাঘব হইয়া গিয়াছে।

উমেশচন্দ্র ভারত সংস্কারক ও বামাবোধিনী পত্রিকা পরিচালন করেন। তিনি সিটি স্কুল ও কলেজ এবং মূকবধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কিছুকাল সিটি কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করিয়া গিয়াছেন। উমেশচন্দ্রের বিদায়ের পর তিন বৎসরের মধ্যেই হরিনাভি স্কুল বঙ্গমাতার আর এক সুসন্তানকে প্রধান শিক্ষকরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। ১৮৭৩ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রধান শিক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করেন এবং তিন বৎসর বিদ্যালয় ভবনের এককোণে অবস্থিত পর্ণকুটীরে বাস করিয়া শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আপন ভাগিনেয়, (১২৫৩, ১৯শে মাঘ) ইং ১৮৪৭ সালে ৩১শে জানুয়ারী মজিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী হইয়া ১৮৭৯ (?) সালে ২২শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশ্যভাবে ধর্মান্তরে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, ইহা উপলক্ষ্য করিয়া হরিনাভিতে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, কারণ তখন উমেশচন্দ্রের চেষ্টায় ব্রাহ্মভাব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। হরিনাভিতে বাস উপলক্ষে তিনি সমস্ত জনহিতকর কার্যের সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে একই কালে প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদকরূপে স্কুলের সেবা করিতে হইয়াছে এবং প্রধান শিক্ষক হিসাবে যে অর্থ পাইতেন, তাহার অধিকাংশই সম্পাদক হিসাবে চাঁদা দিয়া বিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হইত। তিনি সেই সময় "সোম প্রকাশের" সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার চরিত্রবত্তা এবং নীতির প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠার ফলে সময় সময় অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি বরাবরই আপন কর্তব্যে অটল ছিলেন।

তাঁহার সময় ঐ অঞ্চলে যাত্রাগানের বিশেষ প্রচলন ছিল এবং দুএকজন শিক্ষক তাহাতে অভিনেতারূপে আবির্ভূত হইতেন। তিনি ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে ইহাতে ছাত্রদিগের মধ্যে শিক্ষকের প্রতি পেশাদার যাত্রার লোকদিগের প্রতি যেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব থাকে, সেইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা। স্কুল কমিটির মধ্যে ইহা লইয়া বিশেষ মতদ্বৈধ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তির নিকট সকল মত পরাজয় স্বীকার করে। ইহাতে তিনি কোনও কোনও শিক্ষক এবং যাত্রার দলের সমর্থক স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোকদিগের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠেন।

এই কাল ঐ অঞ্চলের মাহেন্দ্রক্ষণ; এদিন ইহার পূর্বে আসে নাই; ভবিষ্যতে আর আসিবে বলিয়া মনে হয় না। বিদ্যার সহিত চিত্রশিল্পের চর্চা হইয়াছে এবং হরিনাভির কালীকুমার চক্রবর্তী অঙ্কিত চিত্র সকল ঠাকুরবাড়ী, শোভাবাজার রাজবাড়ী প্রভৃতি অভিজাত গৃহে মহাসম্মানে সুরক্ষিত হইত। কথকতা তখন পল্লীর প্রাণ এবং পুরাণাদি গ্রন্থের তত্ত্ব প্রচারে ইহা অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ছিল। এই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে ছিলেন কৃষ্ণমোহন শিরোমণি; তাঁহার মত প্রসিদ্ধ কথক তৎকালে বঙ্গদেশে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন কি না সন্দেহের বিষয়। অপর দুই পণ্ডিত রামসেবক বিদ্যারত্ন ও রাধাকান্ত তর্কবাগীশ কথক হিসাবে অতুল যশের অধিকারী ছিলেন।

দেশ বিশ্রুত গায়ক অঘোর চক্রবর্তী ছিলেন রাজপুরের অধিবাসী। গায়ক হিসাবে তাঁহার পরিচয় এস্থানে দিতে যাওয়া বাতুলতা হইবে। সেই সময় ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গানের চর্চায় "দক্ষিণ দেশ" বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিল। সেই সঙ্গে পাখোয়াজ চর্চা হওয়াই স্বাভাবিক। জানকীনাথের নিকট-আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ কালীপ্রসন্ন বসু পাখোয়াজ বাজনায় এমন পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে তাহা প্রায় দুর্লভ। প্রৌঢ় বয়সে যখন তিনি কলিকাতার কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া গ্রামে বাস করিতেছিলেন, তখন বিশ্वविখ্যাত গায়ক বিশ্বনাথ মাঝে মাঝে কোদালিয়ায় গিয়া উপস্থিত হইতেন কারণ তাঁহার "গান পাইয়াছে" এখন কালীপ্রসন্ন ছাড়া কাহারও পাখোয়াজের সহিত তাঁহার গান "জমে" না বলিয়া তিনি মোটরযোগে কোদালিয়ায় গিয়া উপস্থিত হইতেন।

তদানীন্তন গ্রামগুলির সাংস্কৃতিক অবস্থার কথা সকল দিক হইতে আলোচনা করিতে গেলে, স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা প্রয়োজন। তবে জানকীনাথের কৈশোর যৌবনের ক্ষেত্র এবং তাঁহার উপর ঐ সকলের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা একান্ত প্রয়োজনবোধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কৈশোর ও যৌবন

অভাবের সংসারে থাকিলে যেরূপ হইয়া থাকে জানকীনাথের ক্ষেত্রে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার পাঠের নানারূপ ব্যাঘাতের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানোন্মেষের কালে গ্রামে বিদ্যা ও অপরাপর সংপ্রবৃত্তির চর্চার কথাও অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে একটা বিষয় এইখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য। গ্রামের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চরিত্র, উদার ধর্মমত প্রভৃতির যে অনুশীলন চলিতেছিল, জানকীনাথের জীবনে তাহা বিশেষ ছাপ রাখিয়া যায়। বিশেষ করিয়া তাঁহার বাল্যে অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা তিনি জীবনে কখনও ভুলেন নাই।

তাঁহার বাল্যকালে গ্রামের মধ্যে জাতিভেদে বিশেষ উচ্চনীচ বলিয়া পার্থক্য ছিল না; তাহার উপর সকল সঙ্গীর মধ্যে এমন একটা আত্মীয়তার ভাব জন্মিত যে নিতান্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি বাসর ছাড়া জাতিতে জাতিতে বিভেদ বিশেষ ধরা পড়িত না। জানকীনাথ অপর সকল বালকদের মত খেলার সঙ্গীদের সহিত তাহাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সুদর্শন, মিষ্টভাষী, নম্র এবং কোমলহৃদয় বালক সকল গৃহস্থের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে। "কর্তাদের" আদেশে তখন বাড়ির পরিচারকদিগকে দাদা, কাকা, জ্যাঠা প্রভৃতি গুরুজনদিগের বয়সে সম্পর্কে আত্মীয় সম্বোধন করিতে হইত এবং সেই রূপ আচরণে যাহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেন সা[...] জীবন তাহা কাটিয়া ওঠা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভ[ব] হইত না। জানকীনাথ মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্য[ন্ত] এ সকল "সম্পর্ক"কে সম্মান দিয়াছেন এ[...] যথোচিত সম্মানদানে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই।

গ্রামের মমতা

ইটালীতে দেবেন্দ্রনাথের নিকট থাকিয়া বিদ্যাল[য়ে] পাঠকালে প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তে বাড়ি আসিতে[ন] এবং পূজা বা গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামে বাস করিতে[ন] সুতরাং কলিকাতায় থাকা তাঁহার নিকট প্রবা[স] বাসের ন্যায় ছিল; গ্রামকে তিনি নিতান্ত আপন করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং গ্রামও তাঁহাকে অ[তি] ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল; তাঁহ[ার] বয়োবৃদ্ধির সহিত, গ্রামের সমস্ত উৎসব আন[ন্দ] শোক বিপদ যেন তাঁহার নিজের বলিয়া মনে করি[তে] লাগিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার চরি[ত্রের] মাধুর্য এবং দেবভক্তি ও ধর্মপ্রাণতা সকলকে আকৃ[ষ্ট] করিয়া ফেলিয়াছিল।

কলিকাতায় পাঠ

কলিকাতা আলবার্ট স্কুল হইতে ১৮৭৭ সা[লে] তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন। এই সময় ব্রহ্মান[ন্দ] কেশব সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন তথাকার প্র[ধান] শিক্ষক ছিলেন। বাল্যে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশ[য়ের] ব্রাহ্ম প্রভাব হইতে কোন যুবকই মুক্ত ছিল [না] তাহা বলা হইয়াছে। জানকীনাথ তখন কৈশোর [...] হইতেছেন; আবার যৌবনের মুখে তিনি ব্রাহ্মভা[বের] মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। এই প্রভাব হইতে তি[নি] কখনও মুক্ত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহার চরি[ত্র] বহুগুণে তখনকার ঋষিকল্প ব্রাহ্ম নেতাদিগের নি[কট] হইতে প্রাপ্ত।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার [...] পড়াশুনা হইবে কি না, ইহা লইয়া বিশেষ সম[স্যা] উপস্থিত হয়। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ দে[খি]য়া তাঁহাকে পড়া হইতে নিবৃত্ত হইবার কথা বলি[তে] কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। অতিকষ্টে কয়ে[ক]

টাকা সংগ্রহ করিয়া তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে এফ্. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। ছয়মাস যাইতে না যাইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন অর্থসংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কলেজের মাহিনার সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি সেখান হইতে জেনারেল এ্যাসেমব্লী (General Assembly)তে, বর্তমান স্কটিশ চার্চেস কলেজ, আসেন। কিন্তু কেবল কলেজের মাহিনা হইলেই চলে না, কলিকাতায় আহার ও বাসেরও অসুবিধা ক্রমে দেখা দিল। যে ভরসায় তিনি এফ্. এ. পড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমেই বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে এককালে তাঁহার পড়া বন্ধ করিয়া দিবার ইচ্ছা হয়।

কটক যাত্রা

দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত সংবাদ জানিতেন না; কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলেজে পড়িতেছেন, তিনি পাঠের সংবাদই লইতেন; অপর সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। জানকীনাথও তাঁহাকে সকল কথা জানান নাই। ক্রমে কলিকাতা বাসের অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিলে দেবেন্দ্রনাথকে তাহা জ্ঞাত করা হয়। ভ্রাতার পাঠের এরূপ অসুবিধা হইতেছে, অথচ তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই, ইহাতে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ জানকীনাথকে কটকে গিয়া র‍্যাভেন্‌স কলেজে ভর্তি হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সম্ভবত ১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসে জানকীনাথ কটকে পেণীছেন এবং ঐ বৎসরই প্রথম বিভাগে এফ্. এ. পাশ করিয়া মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কটক কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া উড়িষ্যায় চলিয়া যান; সেখান হইতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিবার জন্য আসেন এবং তথা হইতে র‍্যাভেন্‌স কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক হইয়া পুনরায় কটকে চলিয়া যান।

দেবেন্দ্রনাথ

"বৈমাত্র ভ্রাতা" কথাটা বলিলে বাঙালীসমাজে এবং সাহিত্যেও যে বিরূপ একটা ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতাদিগের বিষয় আলোচনা করিলে সে ধারণার পরিবর্তন করিতে হয়। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দুজন যদুনাথ ও কেদারনাথ এবং অনুজ জানকীনাথ কখনও মনে করিতে পারেন নাই যে দেবেন্দ্রনাথ সহোদর নহেন। ভ্রাতৃপ্রেমের কোথাও একটু ত্রুটী কেহ দেখে নাই, উপরন্তু সাংসারিক স্বার্থে ও সামাজিক ব্যবহারে দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে অপর ভ্রাতাদিগের সহিত অভিন্ন হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত তেজস্বী, সত্যবাদী এবং ধর্মভীরু ছিলেন। তাঁহার মধুর চরিত্র সকলকে বশীভূত করিত; কেহ তাঁহাকে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া কোনও কাজ করিতে দেখেন নাই, অথচ তিনি যাহা ন্যায় বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত হইতেও কেহ দেখে নাই। শিক্ষার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল এবং তখনকার দিনে ইংরাজি সাহিত্যে এম্. এ. প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করাতে শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য সরকারী কাজে নিয়োগের সম্ভাবনা সত্ত্বেও শিক্ষকতাই উপজীবিকার পথ নির্বাচন করিয়া লন।

তাঁহার যখন বিবাহ হয়, তখন বধূ নিতান্ত বালিকা, আর তিনি তখন কৃতবিদ্য পুরুষ। কয়েক সপ্তাহ গেলে তিনি পত্নীর সহিত আলাপসূত্রে জানিলেন, তাঁহার মতে পত্নী "অশিক্ষিতা"। তাঁহার চেষ্টা হইল যাহাতে সর্বরকমে পত্নীকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে তাঁহাকে নিয়মিত পাঠের জন্য ব্যবস্থা করিলেন। বালিকা বধূ প্রথমে উহা উপেক্ষা করিলেন কারণ গৃহস্থের সংসারে তখনও বিদ্যার প্রয়োজন বোধ করা হইত না এবং প্রচারের বিশেষ কোনও চেষ্টাও ছিল না। স্বামীর নিকট পড়িতে হয়, পড়া দিতে হয়, সংসারের লোকের কাছে সঙ্গীদের কাছে জানাজানি হইলে নিতান্ত লজ্জায় পড়িতে হইবে এরূপ জ্ঞানও বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন তাঁহার সমস্ত চেষ্টা, উপরোধ, অনুরোধ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহশীল এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তিনি যদি চেষ্টা করিয়া আপনার সহধর্মিণীকে শিক্ষাদানে অক্ষম হইলেন, তাহা হইলে অন্য স্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে কত অসুবিধা হইতে পারে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন শীতকাল, এক রাত্রে দেবেন্দ্রনাথের মাতা ঘরের বাহির হইয়া দেখিলেন, পুত্রের ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ, বধূ বাহিরে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন। তিনি ইহাকে সাধারণ দাম্পত্য কলহ মনে করিয়া পুত্রকে ডাকিয়া বধূকে ঘরের মধ্যে দিয়া গেলেন। পরে তিনি শুনিলেন ইহা বধূ পাঠে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় এবং পূর্বদিন প্রদত্ত পাঠ তৈয়ারী করিয়া না রাখার শাস্তি। মাতা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তখনকার সাধারণ মাতার ন্যায় পুত্রের এই উৎকট বিদ্যা প্রসার প্রচেষ্টা কিছু সংযত করিয়া বধূকে মুক্তি দিবার অনুরোধ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে সম্মত হইলেন না। কালক্রমে সেই স্ত্রী ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়া সর্বপ্রকারে স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোনও কোনও বালক পাঠ বলিয়া দিবার অভাবে শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইতেছে, ইহা জানিতে পারিলে, তিনি তাহার শিক্ষকতা করিতেন। এইভাবে তাঁহার দীর্ঘ কর্মজীবনে ছাত্রদিগের মধ্যে অদ্ভুত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি অতি গভীর; বাঙলা ভাষার প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল। তাহা ছাড়া তিনি আচারে ব্যবহারে, সাধারণ কাজকর্মে খাঁটি বাঙালী ছিলেন। বিদেশীর অনুকরণে পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, তাই বলিয়া তিনি কোথাও রূঢ়তা প্রকাশ করিয়া আপনার মতামত ব্যক্ত করিতেন না। ভাষার মধ্যেও তিনি ইংরাজি কথার চলন অপছন্দ করিতেন। একবার কোদালিয়ায় জানকীনাথ প্রতিষ্ঠিত "কামিনী ঔষধালয়" নামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাৎসরিক উৎসবের সময় দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। প্রাত্যহিক উপস্থিত রোগীর সংখ্যা জানিতে চাহিলে যুবক বলিল, "average"-এ ৪৪ বা ৪৫ অথবা এইরূপ কোনও সংখ্যা। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "বাবা, 'এ্যাভারেজের' কি বাঙলা নেই?" তিনি ইংরাজিতে যখন পত্রাদি লিখিতেন, তখন অবশ্য কোনও প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু আত্মীয় স্বজনকে এমন কি যেখানে বাঙলা পত্র চলে, সেরূপ ক্ষেত্রে কখনও ইংরাজি পত্র লিখিতেন না, এবং বাঙলা পত্রে একটিও ইংরাজি শব্দ দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাঁহার দিনে সরকারী চাকুরী করিয়াও তাঁহার দেশপ্রীতি ছিল অতল। তবে তাঁহার মত ধীর স্থির স্বভাবের লোকের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া বা নেতৃত্ব করা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

সত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে তদানীন্তন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম নেতৃবর্গের মধ্যে স্থান দান করিয়াছিল। তিনি অসত্য বাক্য বা অসত্য আচরণের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। এখানে একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিলে তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। একবার তিনি খেয়া পার হইয়া সন্ধ্যার সময় নৌকাওয়ালাকে একটি দুয়ানি দিয়া বাড়ী আসেন। রাত্রে তাঁহার মনে পড়ে যে, ঐদিন তিনি কার্যসূত্রে একটি অচল দুয়ানি পাইয়াছিলেন এবং তাহা পয়সার থলির মধ্যে রাখিয়াছিলেন। তিনি একপ্রকার আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে সন্ধ্যার মুখে ভুলক্রমে সেই অচল দুয়ানি দেওয়া হয় নাই ত। তখনই বিছানা হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অনুমান সত্য। সে রাত্রে তিনি অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। খেয়াঘাট তাঁহার বাসা হইতে অনেক দূরে। নৌকাওয়ালার বিবরণ দিয়া লোক পাঠাইয়া তিনি তাঁহার ভুল সংশোধন করিবার চেষ্টা করেন। বিফল হইয়া তিনি একদিন নিজে গিয়া খোঁজ করিয়া নৌকাওয়ালাকে ধরিলেন এবং শুনিলেন এক বাবু সন্ধ্যার সময় একদিন একটা দুয়ানি দিয়াছিলেন, তাহা একটু অসুবিধা হইলেও যথাকালে "চলিয়া" গিয়াছে। ইহা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন এবং নৌকাওয়ালাকে একটা ভাল দুয়ানি দিয়া যেন ঋণমুক্ত হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু কথা লিখিবার রহিয়াছে কিন্তু ইহা তাহার উপযুক্ত স্থান নহে। এককথা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে জানকীনাথ তাঁহার মহৎ গুণের জন্য যত লোকের কাছে ঋণী, তাহার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরকালে দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যক্ষ হইয়া কর্মে অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্র মহলে তিনি যে জনপ্রিয়তা ভোগ করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই বর্ণনাতীত। (ক্রমশঃ)

আমাদের নেতাজী

মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী ভারতবাসীর কাছে স্মরণীয় দিন। এই শুভ-দিনটিতে ভারতমায়ের কোল আলো করে যে সুসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের সবচেয়ে প্রিয় নেতা, আমাদের নেতাজী। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে বীরগণ সর্বস্ব পণ করে, নানা কঠোর নির্যাতন সহ্য করেও নিজেদের সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হন নি, সেই সাধকগণের মধ্যে যিনি ছিলেন অন্যতম, অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেও, অদম্য উৎসাহ নিয়ে, বিদেশে মুক্তিফৌজ গঠন করে, বীর বিক্রমে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই নির্ভীক, ভারত মায়ের দুলাল ছেলের জন্মদিনে আমরা জানাচ্ছি, আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা! এই শুভদিনটিতে যদি তাঁকে আমাদের মধ্যে পেতাম, তাঁর গলায় জয়মাল্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কণ্ঠে বলতে পারতাম, নেতাজী, আমাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করো—তবেই পেতাম পরিপূর্ণ শান্তি। কিন্তু তাতো হবার নয়!

নেতাজীর কর্মজীবন দেশবাসীর কাছে নূতন নয়! শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যেও তিনি দেশসেবার এক বিরাট ইতিহাস রচনা করেছেন! অসীম কর্মশক্তি ও অধ্যবসায় নিয়ে তিনি বারংবার বৃটিশ সাম্রাজ্যকে যে আঘাত করেছেন তারও তুলনা নাই। বৃটিশের গুপ্তচরের সদা জাগ্রত চোখে ধূলি দিয়ে তিনি একা এগিয়ে চলেছিলেন বিপদ-সঙ্কুল অজানা পথে! পথশ্রমে শ্রান্ত, ক্লান্ত, কপর্দকহীন মুশাফির প্রাণভরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছুটেছেন দেশ হতে দেশান্তরে। কতো বিনিদ্র রজনী, কতো অনাহার, কতো পিচ্ছিল সেই চলার পথ! এ যেন সত্য ঘটনা নয়। এ যেন রূপকথার সেই রাজপুত্রের মৃত্যুপণ বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করার জন্য! বন্দিনী মায়ের সন্তান তিনি। জীবনে আরাম, বিলাস, নামের মোহ, অর্থের প্রলোভন কিছুই তাঁর দৃঢ় মনের সঙ্কল্প টলাতে পারে নি, তাই তো তিনি ছুটেছিলেন সকল বিপদ উপেক্ষা করে—মায়ের মুক্তির জন্য, শত্রুর মৃত্যুবাণটি হস্তগত করার জন্য।

বিদেশী স্বাধীন রাষ্ট্র চিনতে পারলে মর্ম-পীড়িত এই মহামানবকে। তাই তারা এগিয়ে এলো। স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সম্মান দিয়ে তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করলে সম্বোধন করলে বন্ধু বলে। তিনি আবার ফিরে এলেন, মুশাফির বেশে নয়—সঙ্গে এলো তাঁর লক্ষ লক্ষ সাথী, মায়ের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানিবৃন্দ। বিদেশের ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী অর্থ সামর্থ্য, তাদের সর্বস্ব নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো—। ভারতের দ্বারে এসে তিনি হানা দিলেন সিংহবিক্রমে! তাঁর সেই আক্রমণের তীব্র বেগ সহ্য করা বৃটিশের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠলো। তবু, নানা ছলে ও কৌশলে তারা সেই আক্রমণ প্রতিহত করলো। সেই যুদ্ধে আমাদের পরাজয় বরণ করে নিতে হোল; কিন্তু সেই পরাজয়ই ভারতগগনে এনে দিলে স্বাধীনতার অরুণালোকের প্রথম রশ্মিরেখা। পরাজিত হয়েও আমরা জয়ী!

নেতাজীর নানা বৈচিত্র্যময় জীবন কাহিনী বলে শেষ করা যায় না। এতো শুধু শোনাবার কাহিনী নয় এ যে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবার জিনিস! তাই তো দেবতার দুর্লভ আসন তিনি পেয়েছেন ভারতবাসীর হৃদয়ে। রণক্ষেত্রে আমাদের সর্বাধিনায়করূপে তিনি যে জীবন যাপন করেছেন তারই দু একটা কথা আমি বলবো। সমগ্র বাহিনীর তিনি ছিলেন প্রিয় নেতাজী। সৈনিক জীবনের কঠোরতায় আমরা অভ্যস্ত ছিলাম—কর্তব্য ছিলো সবার উপরে। সর্বাধিনায়করূপে তিনি ছিলেন কঠোর; কিন্তু ব্যবহার ছিলো অতি মধুর! দোষীকে সাজা

সিংগাপুরে প্রথম অবতরণের পর নেতাজী কর্তৃক আজাদ হিন্দ বাহিনী পরিদর্শন

দতে তিনি ইতস্ততঃ করেননি, আবার কর্তব্য-রায়ণ সৈনিককে নিজের হাতে পরিয়ে দয়েছেন জয়মাল্য, সম্বোধন করেছেন বন্ধু লে। স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি নিজেকেও একজন সৈনিক বলেই ভাবতেন—এমন কি তাঁর পোষাকে অফিসার জনোচিত পদমর্যাদার কোন নিশানাই থাকতো না। ফৌজের প্রত্যেকের সংবাদ তিনি রাখতেন। সিপাহীরা ঠিকমতো খাবার পায় কিনা, অসুখে তাদের ঠিকমতো চিকিৎসা হয় কিনা, অফিসারদের কাছে তারা ঠিক ব্যবহার পায় কিনা—তার খোঁজ তিনি নিজে নিতেন। একদিন বিকালে সিপাহীরা খেতে বসেছে হঠাৎ তাঁর গাড়ী এসে থামলো। গাড়ী থেকে নেমেই তিনি সিপাহীদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে তারা কি খাচ্ছে দেখলেন—এমন কি একজনের কাছ থেকে একটু তরকারী নিয়ে মুখে দিয়ে স্বাদ পরীক্ষা করলেন। তারপর যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন। অফিসাররা ব্যস্ত হয়ে এসে শুনলে তিনি চলে গেছেন! এই জন্যই সিপাহীরা জানতো তাদের সর্বাধিনায়ক, তাদের জন্য কতোটা ব্যাকুল—। তাই তো তারা তাঁকে হৃদয়ের সঙ্গে ভালোবাসতো, তাঁর হুকুমে হাসিমুখে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তো। মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকের মুখে শুনেছি, 'হায় নেতাজী', "হায় নেতাজী"! নানা বিপদে, নানা বিপর্যয়ে আমরা তাঁকে আমাদের পাশে পেয়েছি। তিনি পিছনে থেকে আমাদের চালনা করেন নি। তিনি ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের হতাশায় তিনি নূতন উদ্যম এনে দিয়েছেন—ব্যথায় দিয়েছেন সান্ত্বনার প্রলেপ। পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে আমরা যখন হতাশ ও ম্রিয়মান হয়ে পড়েছি, তখনও আমাদের নেতাজীর মুখে বিষাদ কালিমা ফুটে ওঠে নি। তাই তো মনে পড়ে, সুদূর বর্মার এক আমবাগানে, অন্ধকারে গোপন সভায় তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর—"বন্ধুগণ! জীবন যখন উৎসর্গ করেছি পরাজয়ে ভীত হবার কোনও কারণ নেই! জীবনের মূল্য আমাদের কতোটুকু! বর্মা থেকে ভারতবর্ষে ফেরার পথে যে চার লক্ষ ভারতবাসী মারা গেছে তাদের জন্য ভারতের কতোটুকু ক্ষতি হয়েছে অথচ তারা যদি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতো, তবে আমাদের কতো শক্তি বৃদ্ধি হোত।" তাঁর বাণী শুনে আমরা মনে বল পেয়েছি আবার নূতন উদ্যম নিয়ে যুদ্ধ করেছি। তিনি নিজে কোনদিন বিচলিত হন নি—আমাদেরও বিচলিত হতে দেন নি। তাই তো সিপাহী থেকে সুরু করে প্রত্যেক অফিসারের তিনি প্রিয় হতে পেরেছিলেন। তাই তো আজও সকলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তিনিই তো, শিখিয়েছিলেন যে, আমরা ভারতবাসী। জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, সব কিছুর উপরে দেশ। নানা জাতি সমন্বয়ে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ কোনদিনই শেখেনি সাম্প্রদায়িকতা। সেখানে তো পরস্পর পরস্পরকে "জয় হিন্দ" বলেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। শ্রী বা জনাব নিয়েও কোন প্রশ্ন তো ওঠে নি। নিজের অসীম ত্যাগ, দুর্জয় সাহস, সরল মনের গভীর সাধনা তাকে মহামানবে পরিণত করেছিল।

সেই মহামানবের স্বপ্ন আজ কতকাংশে সফল হয়েছে। দ্বিধাখণ্ডিত হলেও ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। "চলো দিল্লী" বলবার প্রয়োজন আমাদের মিটেছে: কিন্তু যে সর্বস্বত্যাগী, আমাদের স্বাধীনতার পথে সাথী ছিলেন, আমাদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন, তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই! তবু তাঁকে স্মরণ করেই আমরা আনন্দ পাই। তাঁর সকল আদর্শ কার্যে পরিণত করতে পারলেই তাঁকে জানানো হবে সবচেয়ে বড়ো শ্রদ্ধা। তাঁর অমরবাণী 'জয় হিন্দ' চিরদিন ভারতের উপর জাগ্রত থাকুক— 'জয় হিন্দ'।
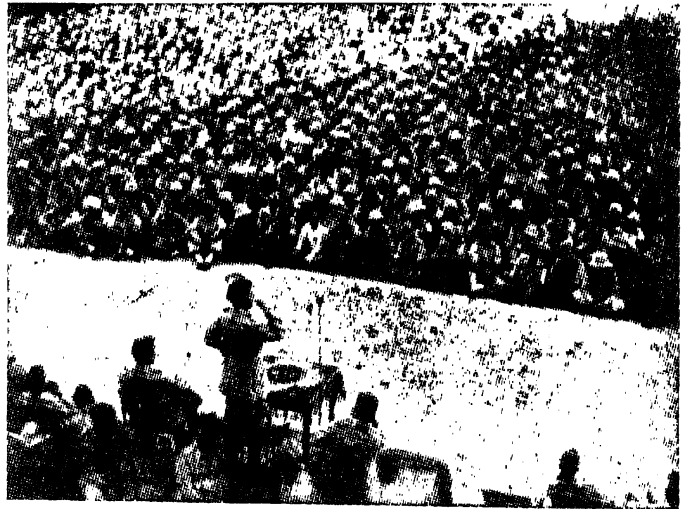
সিংগাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে নেতাজীর প্রথম বক্তৃতা

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

পরিচয়ের পালা এখনও শেষ হয় নাই, আপনাদের একটু কষ্ট করিয়া আরও কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

ঐ যে ঢিলা ও লম্বা হাফসার্ট গায়ে হৃষ্টপুষ্ট বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, তাঁহার নাম হেমচন্দ্র ঘোষ। নিজে কুস্তিতে ওস্তাদ এবং ইতিহাস-অধ্যয়নেই এঁর বিশেষ আসক্তি। নিজের একক চেষ্টায় ইনি যে-দলটি গঠন করিয়াছিলেন, বাঙলার বিপ্লবের ইতিহাসের বিশেষ একটি অধ্যায় তাঁহাদের দানে সমৃদ্ধ। মূলে ইনি যুগান্তর পার্টির লোক। এঁর দলের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিবার সুযোগ তাঁহারা পাইয়াছেন। এঁর দলই "বি ভি" (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার) ও "শ্রীসংঘ" এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এই দুই ভাগের তিনজন ব্যক্তির উল্লেখ করিতেছি, তাহা হইতেই হেমবাবুর পরিচয় পাইবেন—ভূপেনবাবু (রক্ষিত রায়), সত্যবাবু (গুপ্ত) ও অনিলবাবু (রায়)। প্রথম দুইজনই বিখ্যাত বি-ভির নেতা। ১৯৩০ সালে মেদিনীপুর জেলার কয়টি ম্যাজিস্ট্রেট এই দলের হাতেই প্রাণ দেয়। লোম্যান হত্যাকাণ্ড, রাইটার্স বিল্ডিং-এ জেল বিভাগের আই-জির হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত প্রমুখ বিখ্যাত বিপ্লবীগণ এই বি-ভিরই সদস্য। ফল দিয়া বৃক্ষের পরিচয়, এই সংকেতটুকু প্রয়োগ করিলেই হেমবাবুর প্রকৃত পরিচয় আপনারা পাইবেন।

দুই বন্ধুর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় এক সঙ্গেই করাইতেছি। তাঁহারা হইলেন ভূপেনবাবু (রক্ষিত) ও সত্যবাবু ((গুপ্ত), বিনয়-দীনেশ-বাদল এই ত্রয়ীর নেতা। সত্য গুপ্তের মানসিক গঠন সৈনিকের, চরিত্রেও তিনি সৈনিক। নির্ভীক, তেজস্বী ব্যক্তি তিনি। বিপ্লবীদের মধ্যে মিলিটারী মানুষ বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে। সাধারণের নিকট তিনি মেজর গুপ্ত বলিয়া পরিচিত। সরল মনখোলা মানুষ, কথার মারপ্যাঁচের কোন ধার ধারেন না, কিছু একটা করিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট।

আর ভূপেনবাবু শান্ত, সংযত ও স্বল্পবাক্। শিক্ষা অর্থে যদি মনের সুরুচিকে বুঝায়, তবে ডেটিনিউদের মধ্যে ভূপেনবাবুর সমকক্ষ ব্যক্তি খুব কমই আছে। এত মার্জিত ও ভদ্ররুচির মানুষ আমি নিজে বেশী দেখি নাই। এঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বয়স্কদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্পের মানুষ বলিয়া এঁর খ্যাতি আছে। ভূপেনবাবুর প্রকৃত পরিচয় তিনি সাহিত্যিক, তিনি গুণী, তিনি সুন্দরের উপাসক। সুন্দরের উপাসক কেন যে প্রলয়ংকর শংকরের পূজারী হইলেন, এ প্রশ্ন আপনারা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

এখন আমরা যাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি, তাঁহার নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তিনি অনিলবাবু, পূর্বোক্ত শ্রীসংঘের নেতা। স্বাস্থ্য দেখিয়া যাহা আপনার মনে হইয়াছে, তাহা ঠিকই, ইনি কুস্তিগীর পালোয়ান ব্যক্তি। এ গেল বাহ্যিক পরিচয়, চোখ থাকিলেই নজরে পড়ে। ইনি সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী ও সাহিত্য রসিক, কবিতা ও প্রবন্ধ উভয় বিভাগেই লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি আছে, সংগীত শাস্ত্রেও পড়াশুনা নাকি গভীর, দর্শন ইত্যাদিতে বিশেষ অনুরাগ, এক কথায়, অনিলবাবুর মধ্যে বিভিন্ন ও বিপরীত বহু বিষয়ের একটা সমাবেশ রহিয়াছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ইনি। যদিও বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনে প্রবীণদের তুলনায় নবাগন্তুক বা নবীন, তথাপি বিশেষ সম্ভাবনা লইয়াই ইনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সর্বদাই মনে হইয়াছে যে, ইনি পথ ভুল করিয়া আসিয়া পড়িয়াছেন। এঁর স্থান বিপ্লবের ক্ষেত্র নহে, এঁর প্রকৃত স্থান ছিল দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ইনি স্বধর্মচ্যুত, এই ধারণা আমার মনে বরাবরই আমি পোষণ করিয়াছি।

এখন আপনাদের আমি যুগান্তর পার্টির 'ত্রিশূলের' সঙ্গে পরিচয় করাইতে চলিয়াছি। 'ত্রিশূল' কথাটির ব্যাখ্যা আবশ্যক। ছ' নম্বর ব্যারাকটি একান্তভাবে যুগান্তর দলের দখলে ছিল। ভোরের দিকে ছ' নম্বরে নয়নাঞ্জনবাবুর সীটে বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম, এমন সময় দরজার দিকে দৃষ্টি দিয়াই নয়নাঞ্জনবাবু একটু জোরে বলিয়া উঠিলেন—"ত্রিশূল"। কোণের সীট হইতে ভূপেন মজুমদারের গলার আওয়াজ শুনিলাম—"শাল?" নয়নবাবু উত্তর দিলেন, "শেল।" ইতিমধ্যে পূর্ণবাবু (দাস) ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছেন। ব্যাপারটা অনুমানেই কতকটা বুঝিয়াছিলাম যে, ইঁহারা সাংকেতিক ভাষায় একে অপরকে সতর্ক করিতেছেন। চুরুট-সিগারেটের অভ্যাস অনেকেরই ছিল, তাহা ছাড়া নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার বিষয় ও বক্তব্যও সব সময়ে গুরুজনদের শ্রুতি-যোগ্য নহে, তাই যুগান্তর পার্টির প্রথমতম ত্রয়ীর একত্রে 'ত্রিশূল', আর পৃথক্‌ভাবে শাল, শেল ও শূল এই সাংকেতিক নাম ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত। 'শাল' হইলেন মনোরঞ্জনবাবু (গুপ্ত), 'শেল' পূর্ণবাবু এবং 'শূল' হইলেন মধুদা ওরফে সুরেনবাবু (ঘোষ)।

শালের সঙ্গে পরিচয় করুন। বাঙালদের ভাষায় শাল শব্দের একটি বিশেষ অর্থ রহিয়াছে, যেমন শাল দিয়াছে বা শাল ঢুকিয়াছে। শুধু গোঁজ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারও অধিক কিছু শালে আছে। মনোরঞ্জনবাবু প্রকৃতই শালসদৃশ। যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে ইনি যুগান্তর পার্টির স্তম্ভসদৃশ। অকপট মানুষ, দুর্দমনীয় সংকল্প এঁর চরিত্রের মূল উপাদান। চোখ-মুখের ভাব দেখিলেই বুলডগের কথা মনে আসে, বোমার আঘাতে এঁর মুণ্ড ছিন্ন করা চলে, কিন্তু এঁর কামড় আলগা করা চলে না। এঁর সংকল্প শক্তিতে ইনি দলের আদর্শস্থানীয়। ১৯৩০ সালে এঁরই নেতৃত্বে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের শংকর মঠের মানুষ ইনি এবং যতীন মুখার্জীর সহকর্মী। নিরভিমান ব্যক্তি, দলের প্রধানতম এক স্তম্ভ হইয়াও ইনি দলাদলিতে অনভ্যস্ত এবং ১৯২৮ সালে অনুশীলন-যুগান্তর দুই পার্টির একত্রীকরণে এঁর আন্তরিক চেষ্টা বহুলাংশে দায়ী। বরিশাল জেলায় বিপ্লব আন্দোলনের এঁকে প্রাণ বা মূলঘাঁটি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

এবার শেলের সঙ্গে পরিচয় করুন। পূর্ণ দাস নামটি জনসাধারণের নিকট অপেক্ষাকৃত পরিচিত। ফেগু-ডাকাতের মত এঁরও নিজ জেলায় ডাকাত বলিয়া এক বিভীষিকা উৎপাদক পরিচয় প্রচারিত। ইনি যুগান্তর পার্টির একদিক দিয়া সর্বাধিক বলিষ্ঠ স্তম্ভ। যুগান্তর পার্টির সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে ইঁহার একক দান সকলকে ডিঙাইয়া গিয়াছে। বালেশ্বরে বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জীর চারজন সঙ্গীর মধ্যে তিনজনই এঁরই শিষ্য। ইনিই বিখ্যাত চিত্তপ্রিয়-নীরেন্দ্র-মনোরঞ্জনের নেতা। বিপ্লবীদের মধ্যে দীর্ঘদিন জেলবাসে ত্রৈলোক্য মহারাজ যেমন পুরোভাগে, জেলে-গমনের সংখ্যা বা বারে তেমনি ইনিই পুরোভাগে। এঁরও জেল-জীবন ত্রিশ বছর না হইলেও খুব কম নহে, পঁচিশ বছরের উপরে তো বটেই। বিপ্লবীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথমে গান্ধীজীর নন্‌কোয়পা-রেশন আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সময়ে বিখ্যাত 'শান্তি সেনা' প্রতিষ্ঠান তিনি গঠন করেন, সারা বাঙলায়, সকল জেলায় এবং আসামেও ইঁহারই নিয়ন্ত্রিত প্রায় ২০ হাজার

শান্তি সেনা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙলার বিপ্লবীদের মধ্যেই শুধু নহে, সারা বাঙলাতেও এ'র মত সংগঠন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই। এদিক দিয়া পূর্ণ দাস প্রকৃতই প্রতিভা।

এবার আপনারা শূলের সম্মুখীন হউন। শূল শুনিয়া ভয় পাইবেন না, এ'র আসল পরিচয় এ'র ডাক নামটির মধ্যেই ব্যক্ত—মধু ঘোষ। চোখেমুখে স্মিত হাসি, পরম আত্মীয়ের মত ব্যবহার, এ'র বৈশিষ্ট্য। যাদুগোপাল মুখার্জী সর্বজনস্বীকৃত নেতা হইলেও কর্মক্ষেত্রে সুরেনবাবুই পার্টির নেতা। এ'র মধ্যে সৈনিকের চেয়ে সাধকই অধিকতর অভিব্যক্ত। বাঙলা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যে কতিপয় ব্যক্তি বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত, সুরেন-বাবু তন্মধ্যে অনত্যম। ১৯২৩ সালে ইনিই ছিলেন দেশবন্ধুর প্রকৃত পরামর্শদাতা বা দক্ষিণ হস্ত। বিবাদ মিটাইতে, সমস্যার সমাধান করিতে সকলকে একত্রিত করিয়া একযোগে কাজ করিতে সুরেনবাবুর সহজাত নৈপুণ্য ছিল। এ'র বন্ধু-প্রীতি অনুসরণ করিবার মত বস্তু। পরে ইনিই দীর্ঘ কয়েক বৎসর বাঙলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। সুরেনবাবুর আর একটি পরিচয় আছে, বিপ্লবী হইয়াও চরিত্রে ইনি ব্রাহ্মণ। জেল জীবনেই স্বপ্নে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন এবং মুক্তির পরে পণ্ডিচেরীতে স্থায়ী আশ্রমবাসীরূপে বসবাস সংকল্প ইনি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা ও অবস্থার চক্রান্তে কর্মজীবন হইতে ইচ্ছা সত্ত্বেও ইনি মুক্ত হইতে পারেন নাই। অনুশীলন-যুগান্তর উভয় দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মধুদাকেই আমি সর্বাধিক আপনজন রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম দলের বিরোধ সত্ত্বেও। আমার মনে হয় রাজনীতি হইতে আশ্রম জীবনেই মধুদার সত্যিকার স্থান।

পরিচয়ের পালা শেষ করিয়া আনিয়াছি, এখন আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হইলেই আপনাদের ছুটি। ভদ্রলোকের নাম পঞ্চানন চক্রবর্তী, জন্মে ব্রাহ্মণ, কিন্তু স্বভাবে ক্ষত্রিয়। এ'কে মহাক্ষত্রিয় আখ্যা দিতে অন্ততঃ আমার কোন দ্বিধা নাই। আমার সমগ্র জীবনে এ'র মত তেজস্বী ও নির্ভীক পুরুষের সাক্ষাৎ পাই নাই। সাহসের জন্য এ'কে সাধনা করিতে হয় নাই, ভয়শূন্য হইয়াই ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিপদ দেখিলে এ'র একটা স্বাভাবিক উৎসাহ ও আনন্দ জন্মিয়া থাকে। এই কারণে দেশ-বন্ধুর বিশেষ স্নেহ ইনি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ'র জীবন ঘটনাবহুল। ১৯২৩ সালে এ'র সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের উক্তি ছিল—"The most turbulant youngman of Bengal." এই মহাক্ষত্রিয়ের মধ্যে একজন সাহিত্যিক ও দার্শনিক লুক্কায়িত রহিয়াছে। বাঙলার জেল-আইনের একটি বিশেষ সংশোধনের সঙ্গে এ'র নাম জড়িত। ব্যাপারটি এই—

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে ৬ শতের উপর বন্দী ফরিদপুর জেলে আবদ্ধ করা হয়। জেলে স্থানাভাব দেখা দেয়, তিন শত বন্দীর থাকিবার মত জায়গায় এই বৃহৎ সংখ্যাটিকে ঠাসিয়া ভরা হয়। ফলে স্বদেশীদের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের ঠোকাঠুকি, তার ফলে একদিন সন্ধ্যাকালে শ কয়েক বন্দী বাঁকিয়া বসিলেন যে, তাঁহারা ঘরে বন্ধ হইবেন না। জেলার বিপদে পড়িলেন, অনুনয় বিনয়ে কোন ফল দিল না, অবশেষে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোন করেন। উত্তর পাইলেন,

"Go home and get sound sleep. I have managed German prisoners. They are Bengali Babus. I am coming tomorrow morning."

ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ হগ সাহেব, পরে যিনি আসামের গভর্নর হন।

পরদিন ভোর বেলা তিনি সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী লইয়া জেলে ঢুকিলেন। জেল-গেটে জেলারকে হুকুম দিলেন whipping Triangle খাটাইতে।

তারপর তিনি বন্দীদের মহলে প্রবেশ করিয়া এক হুলস্থূল কাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন। মুখে তাঁর একমাত্র হুকুম—'সেলাম দেও।' পরে সকলকে জেলের ঘরে জোর করিয়া ঠেলিয়া বন্ধ করিলেন, বাহিরের সশস্ত্র পুলিশের সাহায্যে। শ'দেড়েক বন্দীকে বাছিয়া আনিয়া জেল অফিসের সম্মুখে খোলা মাঠে আনিয়া রৌদ্রে সারিবন্ধভাবে দাঁড় করাইলেন।

এই সময়ে পঞ্চাননবাবু প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া হাজির হইলেন। ব্যাপারটা অনুমানেই বুঝিয়া লইলেন, সম্মুখে বেত-মারার কাঠের খাঁচাটা তিনঠ্যাংয়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে। আসিয়াই পঞ্চাননবাবু সারি-বন্ধ বন্দিদের লাইন ভাঙিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং ঠেলিয়া নিজেই একধার হইতে লাইন ভাঙিতে লাগিয়া গেলেন।

মিঃ হগ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটা কে?"

জেলর বলিলেন, "স্যার, এই সেই পঞ্চানন চক্রবর্তী।"

"হুঁ। পাকড়াও।"

হুকুমমত জনচারেক সিপাহী পঞ্চানন-বাবুকে জাপটাইয়া ধরিল।

সাহেব বলিল, "সেলে নিয়ে যাও।"

আবার বন্দিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। সাহেব প্রত্যেকের সম্মুখে গিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সেলাম দেবে কি না?"

সকলেই নিরুত্তর। সাহেব নিজেই বাছিয়া ত্রিশজনকে লাইনের বাহিরে লইয়া আসিলেন। তারপর জোড়া জোড়া করিয়া তাহাদিগকে বসাইলেন। একের পিছনে অপরে এইভাবে ১৫ জোড়া বন্দী তেপায়া কাঠের খাঁচাটাকে সম্মুখে রাখিয়া রৌদ্রে উপবিষ্ট রহিলেন। প্রথম জোড়ার একটিকে আপনারা চিনিবেন, তিনিও বর্তমানে বকসাক্যাম্পে আছেন, নাম বিজয় দত্ত, পঞ্চাননবাবুর বন্ধু। শক্তিতে ও দেহে ইনি আমাদের রবিবাবু ও সন্তোষ দত্তেরই সম-শ্রেণীর।

বিজয় দত্তের জুড়িকেই গিয়া মিঃ হগ প্রথমে বলিলেন, "খাড়া হও।"

যিনি খাড়া হইলেন, তিনি একটি স্কুলের হেড-মাস্টার, নাম সুরেন্দ্র সিংহ।

মিঃ হগ বলিলেন, সেলাম দিবে কিনা বল?"

হেড-মাস্টার উত্তর দিলেন যে, নিজেদের মধ্যে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবার সুযোগ দিতে হইবে, গান্ধীজীও "আদর্শ কয়েদী" বলিয়া যে আচরণের পরামর্শ দিয়ে-ছেন, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ বন্দিরা পাইবে।

মিঃ হগের অত ধৈর্য ছিল না, ধমকের সুরে বলিলেন, "আবি বল।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "এইভাবে বলিলে সেলাম দেওয়া সম্ভব নহে।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অতঃপর হেড-মাস্টারকে উলঙ্গ করিয়া কাঠের তেপায়া খাঁচাটার উপর তোলা হইল, হাত, পা, কোমর যথারীতি বন্ধনও করা হইল।

আয়োজন সমাপ্ত হইলে সাহেব হুকুম দিলেন "পঞ্চানন চকরবর্তীকে নিয়ে এস।"

সেল হইতে পঞ্চাননবাবুকে বাহির করিয়া আনা হইল, তিনি আসিয়া সাহেবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সমস্ত আবহাওয়াটা আতঙ্কে ও ভয়ে থম্ থম্।

সাহসের অভাব না হইলেই যে শরীরিক সহ্য শক্তি বেশী হইবে, এমন কোন কথা নাই। দীর্ঘবেত সপাং শব্দে হেড-মাস্টার মশায়ের দেহে কষিয়া বসিতেই তিনি এমন মর্মান্তিক আর্ত-চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, সমস্ত স্থানটিরই যেন হৃদপিণ্ড হঠাৎ ধক্ করিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সাহেবের মুখে একটা দানবীর চাপা-হাসি প্রকাশিত হইল।

পরে শুনিয়াছি যে, এই চীৎকারে জনৈক বয়স্ক উকীলের (তিনি সেলে বন্ধ ছিলেন।) নাভির নীচের স্নায়ুবন্ধন শিথিল হইয়া কাপড় ভিজাইয়া দিয়াছিল। নেতাদের মধ্যে পূর্ণ দাস, তমিজদ্দিন খাঁ (বর্তমানে পাকিস্থান গণ-পরিষদের সভাপতি) সুরেন বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিগণও এই চীৎকারে যে ভয়, আতঙ্ক ও ত্রাস জেলের সর্বত্র বিস্তা-রিত হইয়াছিল, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা মত তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন।

পনর বেত মারার পর হেড-মাস্টারকে তিন-ঠ্যাংয়ের বেতমারার ত্রিভুজ হইতে মুক্ত করিয়া নামানো হইল। তিনি বহু পূর্বেই সংজ্ঞা

জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল।

পৈশাচিক তৃপ্তি ও দানবীয় দৃঢ়তা লইয়া হগ সাহেব অতঃপর পঞ্চাননবাবুর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

কহিলেন, "সেলাম দেবে ?"

পঞ্চাননবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে যে আমার সেলাম চাও ?"

উত্তর হইল, "আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।"

পঞ্চাননবাবু বলিলেন, "তুমি তো একটা ক্ষুদ্র ম্যাজিস্ট্রেট ! তোমার সমস্ত ব্রিটিশ-জাতিকে নিয়ে এস।"

হগ সাহেব কাঠের খাঁচাটার দিকে হাতের ছড়িটা দিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "দেখেছ ?"

পঞ্চাননবাবু হগ সাহেবের মুখের উপর সোজা দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "বেত ? বেতের কথা কি বলছ। তোমার বেয়নেট ও বুলেট নিয়ে এসে প্রশ্ন কর, তারপর দেখ সেলাম পাও কিনা।"

সাহেব হুকুম দিলেন, "অলরাইট টাঙ্গাও।"

দীর্ঘ বেত সপাং সপাং শব্দে পঞ্চাননবাবুর উপর পড়িতে লাগিল, সাহেব গণিয়া চলিলেন, এক, দো, তিন...। চৌদ্দকে ভুল করিয়া সাহেব পনর গণিলেন। একটি শব্দও পঞ্চাননবাবুর মুখ হইতে নির্গত হয় নাই, সংখ্যা গণনায় ভুল বোধ হয় এই কারণেই হইয়া থাকিবে।

দুই হাতের দুই পায়ের, ও কোমরের বন্ধনী খুলিয়া লইতে রক্তাক্ত দেহে পঞ্চানন-বাবু নামিয়া আসিলেন। টলিতে টলিতে মিঃ হগের সম্মুখে আসিয়া একেবারে তাঁহার মুখোমুখী দাঁড়াইলেন।

তারপর বলিলেন, "well Mr. Hogg, have you got your salaam ?"

মিঃ হগ নিরুত্তর তারপর হাতের টুপিটা মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে তিনি জেল-গেটের অভিমুখে রওনা হইলেন। যতদিন তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, আর ফরিদপুর জেলে প্রবেশ করেন নাই।

এই ঘটনা ভারতবর্ষের মহানায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, গান্ধীজী তাঁহার 'Young India' তে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করিয়া পরিশেষে মন্তব্য করিলেন, "জালিওয়ানালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য তত দুঃখ আমার হয় না, কিন্তু পাঞ্জাব সেদিন বুকে হাঁটিয়াছিল বাঁশের দণ্ডে স্থাপিত টুপিকে সেলাম করিয়াছিল, একটি প্রতিবাদও পাঞ্জাবে সেদিন হয় নাই। আজ ফরিদপুর জেলে এক তরুণ বাঙালী অন্যায় অসম্মানের সম্মুখে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"না, এ হুকুম মানি না।"

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ইহার কয়েক মাস পরে কলিকাতা আসেন, দেশবন্ধু তখন দেখতে চাই।"

দিন কয়েক হয় পঞ্চাননবাবু আলিপুরে জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন, দেশবন্ধুর গৃহে বৃদ্ধ পণ্ডিতজী পঞ্চাননবাবুর এক ফটো তুলিয়া লন, বলেন, "এই ফটো আমি আমার টেবিলে রাখব।"

ক্ষেত্রে "সরকার সেলাম" প্রয়োগ নিষিদ্ধ হয়, যত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীই হউক কোন ক্ষেত্রেই সেলাম দিবার জেল আইন রাজনৈতিক বন্দীদের অতঃপর আর পালনীয় নহে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

(ক্রমশঃ)

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

কিছুক্ষণ পরে বাণী এসে কাত্যায়নী দেবীর সামনে দাঁড়াল। হাতের কাজ করতে করতে কাত্যায়নী দেবী মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, কিরে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? তোর দাদা এই খুঁজছিল যে!

বাণী কোন কথা বললে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কাত্যায়নী দেবী ভাল বুঝলেন না। জিগ্যেস করলেন, কিরে অমন করে আছিস যে—কি হ'লো! দাদা বকেছে নাকি।

তবু বাণী নিরুত্তর থাকে—যেন কিছু বলবার আছে বলতে পারছে না। অবুঝ ভয় পাওয়া শিশুর মত বাণীর চাহনী উদ্‌ভ্রান্ত। কিন্তু বাণীর ভয় কাকে? দাদার বন্ধু তো তাকে প্রশংসা করেই গেছে! কাত্যায়নী দেবী মেয়েকে আর প্রশ্ন করেন না। বললেন, বস এখানে।

নিজেকে যতটা নিস্পৃহ আর নির্লিপ্ত ভাবা যায় তা নয়। যতই নিজের ভালবাসার ব্যাপারে ইদানিং সমর বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের চেষ্টা করে ততই যেন একটা বেহিসাবী মানসিকতা থেকেই যায়ঃ কি আর হয়েছে! অমন তো হয়! এতে আর দুঃখ করবার কি আছে ইত্যাদির পরও যেন মনে একটা কিন্তু থাকেই। সমরের মনটা এখন ভুল হচ্ছে জেনেও কোন অংকফল কষে বার কয়ার চেষ্টার মত। নানা প্রশ্নে মনকে সংশয়োত্তীর্ণ করেও সংশয় আশংকার শেষ থাকে না—আশা কিছু না করলেও আশার চিন্তাটা মনকে একেবারে ছেড়ে যায় না। পাওয়া-না-পাওয়ার প্রশ্নটা কখনো মান-অপমানে, কখনো বা হার-জিত প্রশ্নে পর্যবসিত হয়। কিছুতে মন থেকে অভিমানটাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায় না। অথচ, এখন আর কার ওপর যে অভিমান! দুর্বল জ্বরের রোগীর মত নিজের হৃদয়তাপে নিজেই দগ্ধ হওয়া কেবল।

মান-অপমানের প্রশ্নটা সময় সময় এত বড় করে' প্রতিভাত হয় যে, ক্ষতি করবার একটা অদম্য ইচ্ছে প্রবল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কার ক্ষতি ক'রবে সমর? লাভ ক্ষতির মধ্যে নিজেকে আজও জড়ালেও যাকে নিয়ে এই হিসেব সে তো অনেক দূরে সরে গেছে। পারবে কি সমর তার কোনও ক্ষতি করতে? অভিনেত্রীর জীবনে অমন অনেক সমরের আসা-যাওয়া হ'য়ে গেছে, তার কি? বিরূপ মনটা এত চেষ্টা করেও কঠিন হয় না কেন? ভালবাসার বিশ্বাস ভঙ্গের পরও আর কি প্রত্যাশা সে করতে পারে? একদিন ভালবাসার জানাজানিটা যে সলজ্জ পুলক সঞ্চার করেছিল আজ তো তার স্মৃতিমাত্র জ্বালাই আনে, তবু সে জ্বালা উপভোগ করবার এত উন্মুখতা কেন? একি পুরুষোচিত?

যে কারণেই অলকা সরে যাক, তাদের ভালবাসার অমর্যাদা করুক, অলকা যে অলকাই একথা মাঝে মাঝে মনে হয় আর আহত ক্ষুব্ধ মনটা অযথা ঘৃণা পোষণ করে' অলকার অতীত রূপকে মসীলিপ্ত করতে চেষ্টা করেঃ অভিনয় করছেন, যত সব নাড়াবোনে! ছাই, ছি ছি ভদ্রঘরের মেয়ের শেষ পর্যন্ত এই দুর্মতি! খারাপ না হ'লে আবার এ রকম হয় নাকি—ছি!

প্রচলিত সামাজিক নীতিবোধের কষ্টি-পাথরে কষে কষে অলকাকে মনে মনে হেয় করে। ছোট করে' যেন অনেকটা শোধ নেওয়া যায়। অমন একটা যা তা মেয়েছেলের ভালবাসার জন্যে এত কেন? ছি ছি, আগে জানলে সমর কখনো ফাঁদে পা দিতো? ছলনাময়ী, কুহকিনী, সুবিধাবাদিনী! অলকা আরো যেন উচ্ছন্নে গেলে সমর খুশী হতো—ঐ সব মেয়ের আর কি পরিণতি হতে পারে? এখন অভিনয় করছে, এর পর যা ক'রবে তা তো জানাই আছে! বড় যেন বাঁচা বেঁচে গেছে সমর—সামাজিক জীবনের একটা দুরপনেয় কলঙ্কের হাত থেকে বড়জোড় রক্ষা পেয়েছে! তবুও—

হাল্কা করার চেষ্টায় মনটা কিন্তু সব সময় ভারিই হয়ে থাকে। কোন কিছুতে আর তেমন উৎসাহ পাওয়া যায় না—চলছে চলুক গোছের ভাব। খাওয়া-বসা-শোয়া-বেড়ান-ভাবা যেন আর পূর্বের মত অর্থপূর্ণ মনে হয় ন। কিন্তু বোনের ওপর দৃষ্টিটা সব সময় সজাগ হ'য়ে থাকে—ভালবাসা হৃদয়াবেগটা কেবল খারাপই নয়, একটা গর্হিত অনুচিত কাজ, কিছুতেই সমর সহ্য করবে না। বোনকে সামনে বসিয়ে পড়াশোনা দেখিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ সংস্কারে পাওয়া মনটা বোনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক বিভীষিকাপূর্ণ চিত্র আঁকে—শুধু তিরস্কারে বোনকে কি এখন ফেরান যাবে? অনেক চেষ্টা করেও সমর কিন্তু বোনকে এ বিষয়ে সামনা-সামনি কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেনি। কেবল একটা বিজাতীয় ক্রোধ সংগোপনে মনের মধ্যে বেড়ে ওঠে। দুনিয়ার সকল প্রেমিক প্রেমিকার ওপর একটা ঈর্ষা যেন বিলাপের মত সর্বক্ষণ মনকে আচ্ছন্ন করে থাকে। আবার বাণী পড়াশোনার ভুলচুকের জন্যে একটুতে যে পরিমাণ তিরস্কার পায় তার চেয়ে বেশী আবার অহেতুক ভ্রাতৃস্নেহও পায়। এটা কেনা, ওটা কেনা, এটা দেখান, ওটা দেখান, এখানে যাওয়া ওখানে যাওয়া সব সময় লেগেই আছে। বিরক্ত হ'লেও বাণীর সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই—দাদার সাম্প্রতিক ধরণটা সে ঠিক বুঝতে পারে না। ছোড়দার কথা নিয়ে দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়েও দাদা আর মাথা ঘামায় না। তাকে নিয়েই দাদার এখন যত মাথা ব্যথা। কি যে মুশকিল!

ইতিমধ্যে একদিন অরবিন্দ এল একলা। হয়তো প্রবীরের খোঁজেই এসে থাকবে। অরবিন্দকে দেখে বাণীর যেন হঠাৎ বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল, কিছু আন্দাজ করতে না পারলেও পরে বাণীর মনে হ'য়েছিল প্রায় দশ পনের মিনিট সে অরবিন্দের মুখের দিকে ঠায় চেয়েছিল, যেন অচেনা অদ্ভুত একটা লোক তাদের বাড়ি এসেছে। যত কথা বলবার ছিল, যত কথা না বলবার ছিল, সব যেন এই লোকটার আবির্ভাবে বুকে জমে বরফ হ'য়ে গেল। একটা ভয়ের ভাবনা সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেললে। লোকটাকে চিনতে পেরেই বাণীর ইচ্ছে হ'য়েছিল বলে, পালাও, শীগ্‌গির।

দরজা খুলে বাণীকে ঠায় মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে হেসে অরবিন্দ বললে, কি অবাক হ'য়ে গেলে যে! ব্যাপার কি?

কথা যখন কইতে পারলে বাণী অস্ফুটে বললে, ছোড়দা নেই।

বাণীর ইতস্তত ভাব দেখে অরবিন্দর যেন খটকা লাগে। জিগ্যেস করে, ছোড়দা নেই তা কি হয়েচে—বড়দা আছেন তো! চল তাঁর সঙ্গে আলাপ করে' আসি।

তবু বাণী এগোয় না। অরবিন্দ নিজেই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে। বাণী কিছু না বলে পিছু পিছু আসে। বাইরের ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে দালানে পড়তে বাণী বললে, দাদা ওপরের ঘরে আছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে অরবিন্দ বাণীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, বাণীর মুখটা কেমন থমথম করছে। আগাগোড়া ব্যাপার যেন কেমন রহস্যাবৃত মনে হয়। বাণী তো এই কিছু দিন আগেও এমন ছিল না। অরবিন্দর পায়ের শব্দ গলির মোড় থেকে বাণী বোধ হয় শুনতে পেত, কেউ টের পাবার আগে কখন নিঃশব্দে বাইরের ঘরের দরজা অল্প একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকতো। তারপর অরবিন্দ ঘরে ঢুকলে খিল খিল করে' হেসে উঠতো। বাণী দরজা বন্ধ করে পিছন ফিরে সামনের দিকে এগিয়ে আসবার আগেই অন্ধকার ঘরে অরবিন্দ তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতো—এমনি কতদিন! অরবিন্দর যেন খেয়াল হয়। তাড়াতাড়ি বাণীর হাত ধরতে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাণী কিন্তু

[illegible]
আর কি করতে পারে অরবিন্দ! অবশ্য বাণীর সম্বন্ধে তার কোন শিরঃপীড়া ঘটবার কারণ ঘটেনি, এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত।

খানিক্ষণ পরে ওপর থেকে বাণীর ডাক পড়লো। সমর ডাকলে, বাণী! বাণী! একবার ওপরে শুনে যা! যতটুকু খুশী হ'য়ে লঘুপদে দাদার ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল বাণী সেভাবে এগিয়ে গেল না। কেন যে তার এ সঙ্কোচ এত ভয় নিজেই বুঝতে পারে না। তবে কি সমর আজ অরবিন্দকে সামনে পেয়ে অপমান করবে বলে' বাণীর এই সলজ্জ সঙ্কোচ গ্রস্ত ভাব? আজ যেন এক বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যাবে। দাদা তাদের দু'জনকে হয়তো অপমানই করে বসবে! এ বাড়ির অভিভাবক হিসেবে কৈফিয়ৎ তলব করে বসবে।

ওপর থেকে ডাকের পর ডাক আসে। কণ্ঠস্বরে যদি ভয় ক্রোধ প্রকাশ পায় তা হ'লে দাদার এ ডাকে কোন ভয় নেই। বাণীর বেশ মনে হ'চ্ছে দাদা এমনি কোন প্রয়োজনে ডাকছে। তা ডাকুক, কিন্তু তবুও অরবিন্দের বা উপযাচক হ'য়ে দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসা কেন---ছোড়দা যখন নেই তখন যে-পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে গেলেই তো পারতো! দাদাকে তো চেনে না! যেমন তার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে যাওয়া, এর পর কোন কথা শুনলে সে কিছু জানে না। এত নির্বোধও লোকে হয়!

ভয় নেই কিন্তু বাণী ভরসাও কিছু পায় না। সমরের ঘরের দোরগোড়ায় এসে অপেক্ষা করে---কিছুতেই ঢুকতে সাহস পায় না। ঘরে অরবিন্দ যদি না থাকতো তা হ'লে এতটা ইতস্তত সে হয়তো করতো না। তাছাড়া ওদের দুজনের আলাপও যদি কিছু সে শুনতে পেত। মনে হ'চ্ছে, ঘরে দুজনেই গম্ভীর হ'য়ে বসে আছে। ইতিপূর্বে কিছু বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে নাকি? এখনি ঘরে ঢুকলে যেন যত রাজ্যের লজ্জা এসে বাণীকে ছেঁকে ধরবে। সে লজ্জা থেকে অরবিন্দ তাকে রক্ষা করতে পারবে না আজ। রাগটা যেন অরবিন্দর ওপরই বাণীর বেশী হয়। এতদিন পরে এসে এমন ঢং করবার কি দরকার--- দাদার সঙ্গে আজ দেখা না করলেই কি হ'তো না! আজকাল অরবিন্দর যেন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

বেশীক্ষণ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ঘরে ঢুকতে সমর কাছে ডাকলে, আয়, এখানে আয়! কাছে-ডাকার সুরটা বেশ আশ্বস্তির মনে হ'লো বাণীর। তবে কি দাদা সব ভুলে গেছে? তাদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে দাদার রুচিতে বেধেছে এতক্ষণ মিথ্যে মিথ্যে কি ভয়টাই না সে করছিল---কোন মানে হয় না। কিন্তু আড়চোখে অরবিন্দকে দেখে বাণীর ভয় সংশয় ঘোচে না। ও অমন মুখ করে বসে আছে কেন---যেন বাণীকে এই

[illegible] কে জানে, এর আগে দাদার সঙ্গে ওর কি কথা হ'য়ে গেছে। হঠাৎ বাণীর এ বাড়িতে অরবিন্দর প্রথম প্রথম আসার কথা মনে পড়েঃ লোকটা ছোড়দার সঙ্গে আসতো যেত, আশেপাশের কিছুই যেন ওর নজরে পড়তো না, এমন নির্লিপ্ত ভাব দেখাত যাতে লোকটার সম্বন্ধে মনে মনে বাণী নানারূপ ধারণা করতো---অদ্ভুত লোক, বিশ্রী লোক, অহঙ্কারী আরো কত কি! তারপর একদিন, মনে করতে বাণীর এখন গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করতে একটু সঙ্কোচ-ভরে অরবিন্দর পিছু পিছু বাণী এগিয়ে এল--- সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বাণী বজায় রেখেছিল। ওপর থেকে নীচে নেমে আসতে আসতে বাণীর মনে অনেক বলতে না-পারা কথা হোঁচট খেয়েছিল। অব্যক্ত কথার বেদনায় সেই মুহূর্তে অনেক মুহূর্তে অপচয়ের কথা মনে হয়েছিল--- অনেক সুযোগ যেন হাত ফসকে সরে সরে যেতে লাগল। এমন বেদনাকর ভোঁতা অনুভূতি যেন বাণী আর কোনদিন ভোগ করেনি। কথা বলার, আলাপ করার শেষ সুযোগ চলে গেল। অরবিন্দ গলিতে নামতে বাণী দরজার কপাট দুটো দুহাতে টেনে এনে সবে বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ অরবিন্দ একটা কাণ্ড করে' বসলে---দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। বাণী ভয় পেয়ে অবাক হ'য়ে সরে দাঁড়াল---আবার কি দরকার হ'লো ভদ্রলোকের? তারপর---ভাবতে যতটুকু সময় লাগে, চোখের পাতা ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, ব্যাধের শর সন্ধানে যেটুকু সময় লাগে তার চেয়েও ত্বরিত গতিতে অরবিন্দ আড়ষ্ট বাণীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু খেলে। সে তড়িৎ-প্রবাহ বাণী এখনো অনুভব করতে পারে স্পষ্ট, অনাস্বাদিত, অত্যাশ্চর্য, অসম্ভব! অরবিন্দ আর দাঁড়ায়নি, দরজাটা হাট করে খুলে রেখে হয়তো দৌড়ই দিয়েছিল। সামলাতে বাণীর অনেক সময় লেগেছিল---একি করে গেল লোকটা? বাণী কি এতদিন ধরে তাকে ঐ কথাই বলতে চেয়েছিল নাকি? এই অদ্ভুত লোক, এই অহঙ্কারী লোক? না জানি, কি না কি! অনেকক্ষণ বাইরের ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল বাণী সেদিন---ভয়ে, আনন্দে না লজ্জায় ঠিক বুঝতে পারেনি, এর পর কি করবে সে যেন ভাবতে বৃথাই চেষ্টা করেছিল। সামনেটা হঠাৎ উজ্জ্বল আলোকময় বড় চোখ-ধাঁধান। তারপর কয়েকদিন অরবিন্দ কিন্তু আসেনি। বাণী শুধু শুধু ছটফট করেছে, ছোড়দার আশেপাশে ঘুরেছে কিন্তু কিছুতে জিগ্যেস করতে পারেনিঃ অরবিন্দবাবু আসবেন না আর? কিন্তু যেদিন আবার অরবিন্দ সত্যি সত্যি এলো, বাণী সহজে সামনে আসতে পারেনি। ছোড়দা কত ডেকেছে সেদিন। বাণী মনে মনে নিশ্চয়ই জানতো লোকটা আবার নির্লজ্জের মত একটা কাণ্ড করে বসবে। সেদিনের সে অরবিন্দ আর আজকের এই অরবিন্দ, বাণী চিনতে পারে কি? এখন যদি কিছু লজ্জার ঘটে তা হ'লে উনি কি তাকে ঢাকবেন---দাদার সামনে নিজের দোষ স্বীকার করতে পারবেন? দাদা যদি কিছু জিগ্যেস করে বাণী অকুতোভয়ে অকপটে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে' দেবে।

বাণী আড়চোখে অরবিন্দকে দেখে নিলে। না, ও বেশ সপ্রতিভই আছে। দাদার কাছ থেকে তা হ'লে কোন ভয় নেই। কেন যে মিথ্যে বাণী এত কথা ভাবছে।

সমর বললে, অরবিন্দবাবু এসেছেন, একটু চায়ের ব্যবস্থা কর্। কি বলেন? অরবিন্দ কি বললে বাণী শুনতে পেলে না---চোখ তুলে দেখলে লোকটার মুখটা যেন সম্মতিসূচক হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। এতে হাসবার কি কারণ ঘটলো বাণী বুঝতে পারে না---তাই বোধ হয় মনে মনে বেশী লজ্জা পায়, ক্রুদ্ধ হয়। ছোড়দা নেই, কি করতে এসেছে?

চা নিয়ে ফিরে এসে বাণী দেখে, দাদা আর অরবিন্দ দিব্যি গল্প করছে। যেন ওদের মধ্যে অনেকদিনের চেনাশোনা। বাণী তো ভাবতে পারে না, এ কি করে সম্ভব হয়। আবার অরবিন্দের জন্য মনে মনে গর্ব অনুভব করে, আচ্ছা আলাপ জমাতে পারে! দাদার মত লোকও কেমন জমে গেছে।

একটা কিন্তু বাণীর খুব আশ্চর্য লাগে, যতবার সে ঘরে এল-গেল একবারও অরবিন্দ চোখ তুলে লক্ষ্য করলে না। যেন বাণীর সঙ্গে তার কোন চেনাপরিচয়ই নেই। কে তো কে, কিম্বা লক্ষ্য করাটা অশোভন। দাদা বরং ডেকে কাছে বসিয়েছে---বাণীর সন্দেহ হয়, দাদা তাদের পরখ করবে কি না। হঠাৎ সব যেন কেমন গুলিয়ে যায়। অস্বস্তিতে ঘরে ঠায় বসে থাকতে পারে না; বার বার উঠে যায়, ফিরে আসে। কেবলি মনে হয়, সে উঠে গেলেই তার অবর্তমানে দাদাতে অরবিন্দতে তার সম্বন্ধে কোন গোপন কথা হয়ে যাবে---দাদা হয়তো অরবিন্দকে এ বাড়িতে বাণীর সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করে দেবে, হয়তো অরবিন্দ এমন কথা বলবে, যা সে কোনদিন শোনবার আশা করে না। এখন বাণী কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না---না দাদাকে, না অরবিন্দকে। ভয়ের কিছু নেই জেনেও কেন যে এত ভয় হয় তবুও, আশ্চর্য!

ওদিকে সমরের সঙ্গে অরবিন্দর অনেক কথাই হয়। অরবিন্দরা কি করে না করে, খুঁটিয়ে সংবাদ নেয়। প্রবীরের সঙ্গে সমর যেভাবে কর্তব্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছিল, অরবিন্দর সঙ্গে কিন্তু সে রকম কিছু তর্ক করে না। নতুন মানুষ হিসেবে যেন কৌতূহলটা প্রকাশ পায়। প্রবীরের মতই অরবিন্দ বেকার, প্রবীরের মত কি যেন বড় একটা কিছু করে।

অন্তত ওরা তো তাই ভাবে। 'অরবিন্দকে মুখোমুখি দেখে সমরের পুষে-রাখা আক্রোশটা যেন লজ্জায় মাথা হে'ট করে—ছোকরার মুখশ্রী মনকে আকৃষ্ট করে। একে যদিই বাণী ভালবেসে থাকে, তাহ'লে কি আর এমন অন্যায় করেছে, ভালবাসতে না পারলেও মনে না রাখবার মত মুখ তো এ নয়। শুধু প্রবীরের বন্ধু বলে' নয়, অরবিন্দর নিজস্ব একটা পরিচয় প্রথম দৃষ্টিতেই স্বীকার করে নিতে হয়। বেকার হ'লেও এসব লোকের ব্যক্তিত্ব যেন অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমাকে দেখ না বললেও এরা যেন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম।

আলাপ করতে করতে সমর যখন জিগ্যেস করলে, আপনিও কি প্রবীরের দলে নাকি? 'মানে, এই চাকরি-বাকরির ওপর চটা!

অরবিন্দ হেসে জবাব দিলে, বরং উল্টো, চাকরিই আমার ওপর চটা।

সমর জিগ্যেস করলে, সে কি রকম? মানে চাকরি আপনি পান নি, এই তো?

নিমকহারামী করবো না, যুদ্ধের বাজারে একটা চাকরি মিলেছিল—উড়ো খৈ, বরাতে সইলো না। সাধে আর বলি, চাকরিই আমাদের ওপর চটা।

কে জানে সত্যিই এরা চাকরি সম্বন্ধে এত নির্লিপ্ত কি না। সমর তো ভেবেই পায় না, দেশের কোন যুবক চাকরি সম্বন্ধে এত উদাসীন হ'তে পারে। এই ক বছরে দেশের যুবক চিত্তে সত্যিই কি এ হেন পরিবর্তন এসেছে? চাকরিটা আর পরমার্থ ধর্মকর্মানি নয়? তার অবর্তমানে দেশের এতটা আর্থিক উন্নতি সমর ভাবতে পারে না। আর যেন অরবিন্দকে কিছু জিগ্যেস করা যায় না। কি ভাবচে ও? নিজের প্রশ্নটা যেন নিজের কানে বড় বেখাপ্পা শোনায়—যেন অরবিন্দর সামনে হৃদয়ের দীনতা প্রকাশ পাবেঃ বড় চাকরিগত প্রাণ বাঙালী, মিলিটারী হ'লে কি হবে সমরের।

অরবিন্দ নিজে থেকে বলে, সে এক মজার ব্যাপার, দিব্যি চাকরি করছিলাম, ওয়ার এফর্টকে দমে ভারি করতে আমাদের মত শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানদেরও ডাক পড়েছিল—কোথায় যুদ্ধ, কিছুই টের পাইনা! দশটা পাঁচটা অফিস করি আর মাস গেলে মাসকাবারি কামাই করি। বেশ চলছিল, আমারও কিছু বলবার ছিল না, ওদেরও কিছু বলবার ছিল না। মনে মনে জানতুম, war is on, helping the war efforts. একদিন হ'লো কি—যে অফিসে কাজ করি হঠাৎ আমার এক সহপাঠী অফিসার হয়ে দিল্লী থেকে এলেন, আমি কেরানী, তিনি বড় অফিসার, দুবেলাই উঠতে-বসতে দেখা হয়। ঠিক বুঝতে পারতুম না, দেখা হ'লে কে আগে মুখ ফিরিয়ে নিতো, তিনি না আমি। মনে মনে কেমন অশান্তি ভোগ করতে লাগলুম। অফিসারটিই একদিন ডেকে আমার লজ্জা ভেঙে দিলেন—মানে, কাছে বসিয়ে কুশল জিগ্যেস করলেন—লঞ্চের ভাগ দিলেন। অর্থাৎ এইবার আমাকে আর পায় কে! কিন্তু বেশী দিন নয়!

হঠাৎ অরবিন্দ চুপ করে গেল। কি যেন ভেবে নিলে। সমরও বেশ আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠেছে। অরবিন্দ বলতে লাগল ঃ একদিন দেখি কি, আমার যিনি সরাসরি সাহেব, আমার সহপাঠী বন্ধু অফিসারকে হাত কচলে মাথা চুলকে তোয়াজ করছেন। অথচ এই সাহেবটির দাপটে সেকশনে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, এই বুঝি চাকরি গেল! যে কারণেই হোক আমরা ভয়ে ভয়ে চলতুম। এরপর আর চাকরি করা যায় আপনি বলুন?

সমর কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না। জিগ্যেস করলে, কেন? চাকরিতে তো আপনার সুবিধে হ'তো? বড় সাহেব যখন আপনার বন্ধু—

অরবিন্দ হেসে বললে, ঠিক ঐ জন্যেই অসুবিধে হ'লো। যখনি ভাবতুম যে লোকটা আমার ওপর তম্বি করে সেই লোকটাই আবার আমার মত একজনের কাছে মিউ মিউ করে—তখনি একটা ভুলে-যাওয়া মর্যাদা নিজের ভেতর হাহাকার করে উঠতো, কেন, কেন সম্বন্ধটা আমাদের এমন হ'বে? অবস্থাটা তো উল্টে যেতে পারতো।

সমর চুপ করে রইল। ভাবলে এ 'সেন্টি-মেন্টালিটির' কি মানে হয়। জাতটা এই করে উচ্ছন্নে যাবে। ছেলেটিকে যতটা বুদ্ধিমান মনে হয়েছিল তা নয় তা হলে।

একদিন একেবারে চরমে উঠলো। অফিস থেকে বেরিয়ে আমি আর আমার অফিসার বন্ধুটি সিগ্রেট ধরিয়ে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করচি এমন সময় আমার সেকসনের সাহেব এসে পাশে দাঁড়ালেন—আমার বন্ধুটিকে 'উইস' করলেন। আমাকে বোধ হয় লক্ষ্য করেও লক্ষ্য করলেন না, আমার তখন 'সর্সেমিরে' অবস্থা, হাতের সিগ্রেটটা ফেলতে পারি না। ঢোক গিলে মুখের ধোঁয়াটাও গলা দিয়ে নামিয়ে দিতে পারি না। কি করি—সিগ্রেটটা ফেলে দেব, না, আমার বন্ধুর মত গ্যাঁট হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়বো, কিছু ঠিক করতে পারছিলুম না। পেট কামড়ানর মত একটা অস্বস্তি মাঝে মাঝে সমস্ত অঙ্গটা হিম করে দিচ্ছিল। কি করা উচিত? অফিসের বাইরেও অফিসটা টেনে আনা উচিত কি? কিছুতেই সহজ হ'তে পারছিলুম না—একটা 'গিল্টি কনস্যান্স' খোঁচাতে লাগল। বাড়ী এসে সেদিন অনেক ভাবলুম—একি! চাকরি করি বলেই কি মনের এই বিকৃতি, সম্বন্ধবোধের এমন রুগ্ন মানসিকতা? কেন এমন হয়? এর পরও আরো মজা ঘটলো; আমার সেকসনের সাহেবটি অতঃপর দেখি আমার ওপর সদয় হয়ে উঠলেন—একদিন জিগ্যেস করলেন, বোস সাহেব বুঝি আপনার বন্ধু? হ্যাঁও বলতে পারলুম না, নাও বলতে পারলুম না—বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলুম। এর পর আর মানিয়ে চলা অসম্ভব হ'য়ে পড়লো।

সমর জিগ্যেস করলে, শুধু এই জন্যেই চাকরি ছেড়ে দিলেন? আশ্চর্য!

সমরের শেষের উক্তিটা যেন অরবিন্দর তিরস্কারের মত মনে হ'লো। কোনটা আশ্চর্যের—ও অবস্থায় চাকরি করা, না, চাকরি করতে না-পারা? অরবিন্দ বললে, সত্যিই কি আপনি আশ্চর্য হ'চ্ছেন? কি করবো আমার বন্ধুটিই শেষ পর্যন্ত আমার সর্বনাশ করলে।

এরকম কথা সমররা কোন দিন শোনেনি। চাকরি ক'রতে ক'রতে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে লালায়িত হ'য়ে কোনদিন দীনতার কথা ভাবে নি। অরবিন্দদের মত করে ভাবাটা কি স্বাভাবিক, না রুগ্ন মনের পরিচয়, আর চাকরি ছাড়াই বা গতি কি? সমরের একবার ইচ্ছে হ'লো জিগ্যেস করে—চাকরি না করে করবেন কি? শুনি আপনি যেভাবে ভাবেন অমন কেউ ভাবে না! কি ভেবে চুপ করে অরবিন্দের মুখের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ মনে হ'লো অরবিন্দ এত কথার অবতারণা করেছে শুধু তাকে একচোট নেবার জন্যে। প্রকৃত পক্ষে তার চাকরি এমনি গেছে। সমরের কান দিয়ে যেন আগুন ছোটে, যেন মর্মান্তিক উপহাস করেছে অরবিন্দ।

ঘরে ঢুকে বাণী দেখলে, সমর জানালার বাইরে চেয়ে আছে। অরবিন্দ ঘরের কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আপাততঃ কি যেন গুণছে। হঠাৎ বাণীর বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে—তাহ'লে শেষ পর্যন্ত যা ভয় করেছিল তাই হ'লো, ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবে নাকি? যা বোঝাপড়া করবার ও'রা করুক! তাকে তো আর কেউ কিছু বলবে না।

(ক্রমশঃ)

"অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাংলা"

শ্রীকানাইলাল বসু

প্রবন্ধটির নাম হইতেই একটি ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে তাহার অর্থনৈতিক ইতিহাস। ভারতের ইতিহাসে পূর্বাপর সকল সময়েই বাঙলা একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে, অংশ গ্রহণ কালে এবং ১৯৪৭ সালের আগষ্টে ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের অংশীদার রূপে পরিচিত হইবার সময় বাঙলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলাকে চিরদিনই অধিক দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে আমরা যে বাঙলাকে পাইয়াছি তাহাকে ৩০ বা ৪০ বৎসর পূর্বেকার বাঙলার সহিত কোনমতেই তুলনা করা চলে না। বর্তমান বাঙলার সহিত ১৮৯১ বা ১৯০১ সালের বঙ্গের প্রভূত প্রভেদ বিদ্যমান। এই প্রভেদ আয়তন, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক দ্রব্যসম্ভার ইত্যাদি—সর্বত্রই বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বাঙলা অতীত বাঙলার কঙ্কাল মাত্র।

অতীত ও বর্তমান বাঙলার অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে অতীত বঙ্গের তুলনায় আমরা কোথায় উপনীত হইয়াছি।

আলোচনার প্রারম্ভেই আসে আয়তনের কথা। ১৮৯১ সালে বাঙলার মোট আয়তন ছিল ১,৮৭,৩৭৭(১) বর্গ মাইল। পরবর্তী দশ বৎসরে ইহা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯০১ সালে মোট আয়তন দাঁড়ায় ১,৮৯,৮৩৭ বঃ মাঃ। অর্থাৎ মোট ২,৪৬০ বর্গ মাইল আয়তন বাড়িয়াছিল। ১৮৯১-১৯০১ সালে বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর এবং তদন্তর্গত দেশীয় রাজ্যের কিয়দংশ বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূল বঙ্গের (Bengal Proper) আয়তন ১৮৯১ সালে ছিল ৭০,৫৩৮ এবং ১৯০১ সালে ছিল ৭০,১৮৪ বর্গ মাইল। অনুরূপভাবে বঙ্গেতর প্রদেশগুলির মোট আয়তন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৮৯,৮৭৩ এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ছিল ৯২,৬৯০ বঃ মাঃ। ঐ দুই খৃষ্টাব্দে দেশীয় রাজ্যগুলির আয়তন ছিল যথাক্রমে ২৬,৯৬৬ ও ২৬,৯৬৩ বঃ মাঃ। তাহার পর ১৯০১-১১ খৃষ্টাব্দের বাঙলার আয়তনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অংশগুলি বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বিশেষতঃ বিহারের সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, পাটনা, গয়া, সাহাবাদ এবং মুঙ্গের; উড়িষ্যার কটক, বালেশ্বর এবং পুরী; ছোটনাগপুরের হাজারীবাগ, রাঁচি, পালামৌ, মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগনা, আঙ্গুল; ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলি উল্লেখযোগ্য। পূর্বতন বঙ্গ হইতে ১,০৫,৭৪৫ বর্গ মাইল কমাইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাঙলার আয়তন করা হইয়াছিল ৮৪,০৯২(২) বঃ মাঃ। ইহার ফলে বাঙলা অর্থনৈতিক দিক হইতে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র দুই একটি পরিবর্তন ব্যতীত ১৯১১ হইতে ১৯৪১ পর্যন্ত বাঙলার আয়তন মোটামুটি এক রকমই ছিল। ১৯২১, '৩১ ও '৪১ খৃষ্টাব্দের সঠিক আয়তন(৩) ছিল যথাক্রমে ৮২,২৭৭; ৮২,৯৫৫; এবং ৮২,৮৭৬ বর্গ মাইল। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া স্বাধীন হইলে বাঙলা আর একটি গুরুতর আঘাত পায়। সরকারী ভাষা অনুসারে বাঙলার নাম পরিবর্তন করিয়া "পশ্চিমবঙ্গ" এবং "পূর্ব পাকিস্থান" (পূর্ববঙ্গ) রাখা হয়। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ছিল ২৯৫৩৩(৪) বঃ মাঃ মাত্র। বাঙলার ৪৯,২২৭(৫) বঃ মাঃ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি পৃথক বৈদেশিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়। কুচবিহার দেশীয় রাজ্য ব্যতিরেকে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ২৮,২১৫ বঃ মাঃ; ইহা প্রাক্তন (১৯৪১) বাঙলার(৬) ৩৬·৪% মাত্র। এমনকি কয়েকটি জেলাকে পর্যন্ত উভয় অংশের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

অতীত ও বর্তমান বাঙলার মাথাপিছু গড়পড়তা জমির(৭) হিসাব সবন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মাথা-পিছু জমির পরিমাণ ছিল ৭,৭৬৩(৮) বঃ গজ। ইহা কমিতে কমিতে ক্রমে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মাথাপিছু ৪,২৪৩ বঃ গজ দাঁড়ায়। ১৯০১, '১১, '২১ ও '৩১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ছিল ৭,৫০০; ৫,৫৭১; ৫,৩৩১; ৫,০৩৬ বঃ গঃ। পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু জমির পরিমাণ আরও কম—মাত্র ৪,১২৪(৯) বঃ গজ। কুচবিহার রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিলে ইহা ৪,৫৮২ বঃ গজ দাঁড়ায়। ত্রিপুরা রাজ্যকে যোগ করিলে ইহা একটু কমিলেও পূর্বলিখিত সংখ্যা অপেক্ষা কিছু বেশী থাকে—৪,৩৭৫ বঃ গজ।

বর্তমানে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জেলাগুলিকে, যথা—মানভূম, সিংহভূম, পূর্ণিয়া সাঁওতাল পরগনা—পশ্চিম বঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতেছে জেলাগুলির আয়তন যথাক্রমে ৪,১৩১, ৩,৯০৫; ৪,৯৯৮ এবং ৫,৪৮০ বঃ মাঃ এবং একত্রযোগে ইহাদের আয়তন ১৮,৫১৪(১০) বঃ মাঃ। তাহা হইলে বর্ধিত বঙ্গের (বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী জেলা সহ) আয়তন হইবে ৪৮,০৪৭(১১) বঃ মাঃ এবং মাথাপিছু জমির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫,০১৯ বঃ গঃ।

অর্থনৈতিক দিক হইতে জনসংখ্যার মূল প্রণিধান যোগ্য। জীবন ধারণের মান ইহার উপর বেশ কিছু নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উৎসের বৃদ্ধি না হইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি মাথাপিছু আয় কমাইতে বাধ্য।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বৃহত্তর বঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল ৭,৪৬,৭৩,৭৯৮(১২)—ইহার মধ্যে মূল বঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৩,৮২,৭৭,০৯৪; দেশীয় রাজ্য ৩৩,২৬,৮৩৭ এবং বহির্বাঙলা (বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর) ৩,৩০,৬৯,৮৭৩। ১৯০১ সালে মূল বঙ্গের জনসংখ্যা ২৯,৮২,৪৪৪ বাড়িয়াছিল, দেশীয় রাজ্য ৪,২১,৭০৭ এবং বহির্বঙ্গ ৪,১৫,০১১। ১৯০১ সালে বৃহত্তর বঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল ৭,৮৪,৯৩,৪১০। এই দশ বৎসরে বৃহত্তর বঙ্গের জনসংখ্যা ৩৮,১৯,৬১২(১৩) বাড়িয়াছিল। বৃহত্তর বাঙলা খণ্ডিত হইবার পর ১৯১১ সালে বাঙলার জনসংখ্যা কমিয়া ৪,৬৩,০৫,৬৪২(১৪) হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২১, '৩১ ও '৪১ সালের আদমসুমারীতে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াছিল—সংখ্যাগুলি(১৫) যথাক্রমে ৪,৭৫,৯২,৪৬২; ৫,১০,৮৭,৪৪৪ এবং ৬,০৪,৬০,৩৭৭ ছিল। ১৯১১ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে বাঙলার জনসংখ্যা ১,৪১,৫৪,৭৩৫ বাড়িয়াছিল।

বাঙলা বিভাগের পর পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যা ২,১১,৯৬,৪৫৩(১৭) (১৯৪১এর আদমসুমারী হইতে)। মধ্যবর্তী সাত বৎসরের মধ্যে এই সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। ১৯৪১-এর হিসাব অনুযায়ী কুচবিহার ধরিলে পশ্চিম বঙ্গের মোট জনসংখ্যা ২,১৮,৩৭,২৯৫। অবিভক্ত বাঙলার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী ৩,৮৫,৯৭,০৬২(১৮) লোককে এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের (পূর্ব পাকিস্থানের) অধিবাসী বলিয়া ধরা হয়।

প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি বাঙলায় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই হিসাবে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রতি বর্গমাইলে লোক বসতি ছিল মাত্র

৩১৯(১৯) জন। ১৯৪১ সালের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ইহার দ্বিগুণ—প্রতি বর্গ-মাইলে ৭৩০ জন। মধ্যবর্তী ১৯০১, '১১, '২১, '৩১ সাল গুলিতে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪১৩, ৫৫৬, ৫৮১ ও ৬১৫। দেশীয় রাজ্যগুলি বাদ দিয়া ১৯৪১ সালের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে লোক-বসতি ছিল ৭১৫ জন। কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যদ্বয় যোগ করিলে ইহা হয় ৬৭৬ এবং কেবলমাত্র কুচবিহার যোগ করিলে হয় ৭০৮।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগনা ও পূর্ণিয়া জেলার জনসংখ্যা যথাক্রমে ২০,৩২,১৪৬; ১১,৪৪,৭১৭; ২২,৩৪,৪৯৭ ও ২৩,৯০,১০৫ এবং একত্র যোগে ৭৮,০১,৪৬৫(২০)। প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি যথাক্রমে ৪৯২; ২৯৩; ৪০৮ এবং ৪৭৮।

এক্ষণে মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া এবং কুচবিহার দেশীয় রাজ্য সহ পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা হইবে ২,৯৬,৩৮,৭৬০(২১)। এবং প্রতি বঃ মাইলে লোকবসতি হইবে ৬১৭ যাহা বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গের বর্গমাইল পিছু লোকবসতি ৭০৮(২২) এর নিম্নে।

বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কৃষি এই ব্যাপারে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। ১৯০৬-০৭ সালে বঙ্গে মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ছিল ৩,৫৩,৯৮,৫০০(২৩) একর। ১৯১০-১১ সালে ইহা ১২,৬৮,০০০ একর বর্ধিত হয় এবং মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৬৬,৬৬,৫০০ একর। পরে বাঙলার আয়তনের হ্রাস হইলে কর্ষণযোগ্য ভূমিও কমিয়া যায় এবং ১৯২০-২১ সালে এই সংখ্যা হয় ২,৮৯,৭০,৭২৪ একর। ১৯৩০-৩১ সালে এই প্রদেশের কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ১০,৬৩,২৬৫ একর বৃদ্ধি পায় এবং মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৯০,৩৩,৯৮৯ একর।

কর্ষণযোগ্য ভূমির ন্যায় বঙ্গের অরণ্য অঞ্চলেরও অনুরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ১৯০৬-০৭ এবং ১৯১০-১১ সালে বঙ্গের অরণ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৭,৯৭,১১২ এবং ৬২,৮৬,৩৯৩ একর। এবং ১৯২১ এবং ১৯৩১ সালে মোট অরণ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪২,৭১,৪৭১ এবং ৪৫,৯৪,৪৫৭ একর। উপরের হিসাবগুলি হইতে দেখা যায় যে কর্ষিত এবং অরণ্যভূমি উভয় ক্ষেত্রেই বাঙলাকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। ১৯০৬-০৭ সালের তুলনায় ১৯৩০-৩১ সালে কর্ষণ যোগ্য ভূমির মোট ক্ষতির পরিমাণ ৬৩,৬৪,৫১১ একর। অনুরূপ হিসাবে অরণ্য অঞ্চলের ক্ষতির পরিমাণ ১২,০২,৬৫৫ একর। কর্ষণযোগ্য ভূমির ক্ষতির অর্থ সরকারের ভূমিকর হ্রাস এবং জনসাধারণের পক্ষে খাদ্যদ্রব্য এবং আর্থিক হানি এবং অরণ্য অঞ্চল হ্রাসের অর্থ বনজ সামগ্রীর হ্রাস। ১৯৪১ সালের হিসাব অনুযায়ী কুচবিহার সহ পশ্চিম-বঙ্গের মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ হইল ১,২২,৩৪,৬৪৪ একর কিন্তু ১৯৩১ সালের হিসাব অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্থানের কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ মোটামুটি ১,৬৮,০০,০০০ (২৪) একর। ১৯৩১ সালের বঙ্গের মোট ৪৬,০০,০০০ একর কর্ষণযোগ্য ভূমি একটি পৃথক রাষ্ট্রে হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। এই ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গের নিকট নিশ্চয়ই গুরুতর হইবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মোট অরণ্য অঞ্চলের পরিমাণ ১৬,৯২,৭৪৪(২৫) একর। ১৯৪১ সালের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের গড়পড়তা মাথা পিছু কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ১·৬(২৬) বিঘা। ১৯৩১ সালের অবিভক্তবঙ্গে এই সংখ্যা ছিল ১·৭(২৭) মাত্র। এইক্ষেত্রে ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে ১৯০৬-০৭ সালে বৃহত্তর বঙ্গেও মাথা পিছু গড়পড়তা ভূমির পরিমাণ ১·৪(২৮) বিঘার অধিক ছিল না।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগনা ও পূর্ণিয়া জেলাগুলিতে মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৬৫,৮১,৭৪৭ একর। ইহার মধ্যে মানভূম ১৫,৯৪,১০৬ সিংহভূম ৯,১৩,০৫৪ সাঁওতাল পরগনা ১৮,৮২,০০০ এবং পূর্ণিয়া ২১,৯২,৫৮৭ একর। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জেলা চারটিসহ পশ্চিমবঙ্গের কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ হইবে ১,৮৮,১৬,৩৯১(২৯) একর। এবং তাহা হইলে মাথা পিছু গড়পড়তা ভূমি হইবে ১·৯ বিঘা। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সহিত তুলনায় বর্ধিত বঙ্গে মাথা পিছু ·৩ বিঘা করিয়া জমি লাভ হইবে।

জলসেচের হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, ১৯১৩-১৪ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৩২৪ মাইল মাত্র। এই সময়েই বিহার উড়িষ্যার এই সংখ্যা ছিল ১৬০৬ মাইল। বঙ্গবিভাগের প্রশ্ন বাদ দিয়াও দেখা যায় যে, তাহার আয়তন হ্রাস করার ফলে বাঙলা সেচব্যবস্থায় যথেষ্ট ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে।

বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা বহুলাংশে তাহার কৃষিজদ্রব্যাদির উপর নির্ভর করে, যথা, খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, ইক্ষু, তন্তু, বনজ ঔষধ এবং পশুখাদ্য।

বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের ১৯৪৩-৪৪ সালে বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্যের জন্য নিযুক্ত জমির পরিমাণ দেওয়া গেল, খাদ্যশস্য ৯১,৭৬,৯৭৪ একর, তৈলবীজ ২,৫৭,৪১৯ একর, ইক্ষু ৭৩,৩৯৯ একর, তন্তু ২,৮৪,৩৬৯ একর, ঔষধ ২,০৫,৬১৭ এবং পশুখাদ্য ৩৭,০৬৫ একর। ১৯০৬-০৭ সালের বঙ্গের হিসাবের সহিত ১৯৪৩-৪৪ সালের বঙ্গের (পশ্চিম) তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ছয়টির মধ্যে পাঁচটি (ইক্ষু ব্যতীত) বিষয়েই বঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একর হিসাবে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ২৪,৯১৯ একর। ক্ষতি হইয়াছে খাদ্য শস্যে ২,৬৫,১৫,১২৬ একর, তৈলবীজ ১৯,৪৮,৬৮১ একর, তন্তুতে ৭,৫৬,৩৩১ একর, ঔষধে ১,৯০,০৮৩ একর এবং পশুখাদ্যে ২৪,২৩৫ একর।

তেরটি প্রধান প্রধান কৃষিদ্রব্যের মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষতি হইয়াছে আটটিতে এবং লাভ হইয়াছে মাত্র পাঁচটিতে। আবাদী জমির হিসাবে তাহার ক্ষতির পরিমাণ ধান্যে, জোয়ারে, সরিষাতে, ইক্ষুতে, তুলাতে, পাটে, তামাকে এবং পশুখাদ্যে যথাক্রমে ৭৭,৩৫,৮৭২ একর; ৩৮২ একর, ৫,২২,৩৩৪ একর, ৩৩,৪১৬ একর, ৫৫,১০০ একর, ২২,৫০,০৭২ একর, ২,১৪,১৪২ একর এবং ২০,৮০৬ একর। আবাদী জমির হিসাবে পশ্চিম বঙ্গের লাভ হইয়াছে গমে, যবে ভুট্টাতে তিলে এবং চায়েতে যথাক্রমে ৬৮,৯৩৮ একর, ১,৫০৪ একর, ৬৩,৬৫৪ একর, ৩৬,৯৯২ একর এবং ১,৪১,৫৫৬ একর।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জেলাগুলিতেও প্রধান প্রধান কৃষিজ দ্রব্যের জন্য আবাদী জমির পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়ায় তাহা জানা প্রয়োজন। ধান্যের জন্য মানভূমে ১,১৯,৯০০ একর, সিংহ-ভূমে ৫,৭৮,৩০০ একর, সাঁওতাল পরগনায় ৮,৯৯,৪০০ একর এবং পূর্ণিয়াতে ১৩,১১,০০০ একর জমি চাষ করা হয়। গমের জন্য ঐ চারটি জেলায় যথাক্রমে ৫,০০০, ৩,০০০, ৯,৮০০ এবং ২৪,০০০ একর জমি ব্যবহৃত হয়।

তিলের জন্য মানভূম বাদে যথাক্রমে ৭,০০০, ৩১,২০০, ১২,৭০০ একর। মানভূমে ১২,৫০০ একর সাঁওতাল পরগণায় ৭,২০০ একর এবং পূর্ণিয়াতে ১২,৪০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। তুলার চাষ হয় মানভূম, সিংহভূম এবং সাঁওতাল পরগনাতে যথাক্রমে ৫,৩০০, ৭,০০০, ১১,৫০০ একর। পূর্ণিয়ায় ২৭,১০০ একর জমিতে ডাল চাষ হয়। অন্যতম প্রধান শস্য সরিষার জন্য মানভূমে ৩৭,৭০০ একর সিংহ-ভূমে ২০,০০০ একর; সাঁওতাল পরগণায় ৫৬,৪০০ একর এবং পূর্ণিয়ায় ১,৫৪,৫০০ একর জমি চাষ হয়। ঐ চারটি জেলায় এক-যোগে তামাক, পশুখাদ্য, জোয়ার, ভুট্টা, তিল ও পাটের জন্য যথাক্রমে ৩৫,১০০; ৭,৬০০; ১০,৩০০; ১,২১,৮০০; ২০,৬০০ এবং ২,০০,৪০০ একর ব্যবহৃত হয়।

এই প্রসঙ্গে বর্ধিত বাঙলার অবস্থা কি হইবে তাহা স্মরণ করা প্রয়োজন। ধান্যের জন্য আবাদী জমি হইবে ১,০৩,৩১,৬৬৪ একর, গমের জন্য ১,৪৭,৭১৯ একর; তিল ৫০,৯০০ একর; ইক্ষু ১,৩৩,১৪২ একর; তুলা ২৫,৩০০ একর এবং পাট ৫,৮৯,৫৭৪ একর। বঙ্গবিভাগের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজ উৎপন্ন

দ্রব্যের যে ক্ষতি হইয়াছে বাধ্যত বঙ্গে তাহার কিছু পূরণ আশা করা যাইতে পারে।

১৮৯১ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে বাঙলা খনিজ দ্রব্যেও সমৃদ্ধ ছিল। এই প্রদেশে বহুপ্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যাইত, যথা—কয়লা, লৌহ, অভ্র, তাম্র, টাংস্টেন, স্বর্ণ ইত্যাদি। বাঙলার আয়তন ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে এই সকল সম্পদও তাহার হস্তচ্যুত হয় এবং বাঙলার অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন তথা ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮৯১ সালে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল ১৭,৪৭,১২২ টন। ১৯০১ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৫৪,৮৭,৫৮৫ টন। প্রদেশের আয়তন কমিবার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমাণও কমিয়া ৩৮,৫৮,৫৭৪ টনে দাঁড়ায়। কিন্তু বাঙলা ক্রমশঃ এই অবস্থার উন্নতি করিতে থাকে এবং ১৯২১ এবং '৩১ সালে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪২,০৭,৪৫২ টন এবং ৬৩,১৬,৫২৮ টন। ১৯০১ সালে উত্তোলিত আকরিক লোহের পরিমাণ ছিল ৪৩,৬২৯ টন। ঐ বৎসরেই ১১,৮৭০ টন অভ্র এবং ৩,৪৯,৫২২ টন সোরা উত্তোলিত হয়। ১৯১১ সালে উত্তোলিত সোরার পরিমাণ হঠাৎ কমিয়া ৫,৩৮৫ টনে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯২১ সালে ইহার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয় এবং সংখ্যাটি পেঁছে ৭,০৪৪ টনের কোঠায়। ১৯৩১ সালে ইহার উৎপাদন পুনরায় অস্বাভাবিক রকম কমিয়া যায়। পূর্ববর্তী অন্যান্য বৎসরের অনুপাতে তাহাকে নগণ্য বলা যাইতে পারে। ১৯০১, '১১, '২১ ও '৩১ সালে উৎপাদিত সাধারণ লবণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১২; ২৮; ৩০; এবং প্রায় নগণ্য (insignificant) টন। ১৯১১ সালে বিহার এবং উড়িষ্যায় উত্তোলিত বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের হিসাব দেখিলেই এই প্রদেশের ক্ষতির সম্যক ধারণা করা যাইবে। ১৯১১ সালে উত্তোলিত আকরিক তাম্রের পরিমাণ ছিল ২,২০৭ টন, কয়লা ৭৬,১০,৩৩০ টন এবং সোরা ১,১৬,৩৬০ টন। ১৯১১ সালে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় উত্তোলিত আকরিক লোহের মোট পরিমাণ ছিল ৩,৪২,৩৪২ টন এবং ১৯২০ সালে ছিল ৫,১৭,৩৭৭ টন। কেবল ১৯০৭ এবং ১৯১১ সাল ব্যতীত বঙ্গে কয়লার টন প্রতি গড় উত্তোলন খরচ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৮৯১, ১৯০১, '০৭, '০৮, '১১ এবং '১৭ সালে টন পিছু কয়লা উত্তোলনের খরচ ছিল যথাক্রমে ২৷৴৹, ২৷৷৵৹, ৩৴৹, ৩৸৹, ২৷৷৶৹ এবং ৩৸৶৹। ১৯৩৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল ৭৫,৯১,৪৯৫ টন এবং ১৯৪০ সালে আরও বাড়িয়া ৮৪,৫৩,০৮২ টন হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার পর এই সংখ্যা ক্রমশ কমিতে কমিতে '৪৩ সালে ৬৬,৮৮,৮৫৬ টন দাঁড়ায়। অর্থাৎ '৪০ সাল হইতে মোট ১৭,৬৪,২২৬ টন কম। ১৯৪১ ও '৪২ সালের সংখ্যাদ্বয় ছিল যথাক্রমে ৭৯,৩৬,৮০৩ এবং ৭৬,৩৮,৭৯৪ টন। ১৯০১ সাল হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে আয়তন হ্রাস করার ফলে কয়লা সম্বন্ধে বাঙলার যে ক্ষতি হয় বাঙলা তাহা ক্রমশ সামলাইয়া উঠে। ইহা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে, ১৯৪৭ সালে পুনরায় বঙ্গদেশ খণ্ডিত করা হইলে কয়লা সম্বন্ধে বাঙলাকে আর কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গের সহিত যোগ করিলে পশ্চিমবঙ্গের খনিজ দ্রব্যের অবস্থা অবশ্যই কিছু উন্নত হইবে। কারণ ১৯১১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, মানভূমে ১৯৪টি কয়লা খনি এবং সিংহভূমে ২টি লৌহ খনি, ১টি তাম্রখনি এবং একটি চূণ উৎপাদন-কেন্দ্র ছিল।

এইবার ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাব ধরা যাক। ১৯০১-এর তুলনায় এই প্রদেশে কোন কোন বিষয়ে কলকারখানা কমিয়া গিয়াছে; যেমন পোতাশ্রয়—৩, চিনি কল—৭, গালার কারখানা—১, ছাপাখানা—৫, এবং চামড়ার কারখানা—১। বাকী সমস্ত বিষয়েই ১৮৯১ হইতে ১৯১১ সালের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ধিত সংখ্যাগুলি নিম্নরূপ—

সুতাকাটা এবং বয়ন শিল্প কারখানা—১, পাটকল—২১, দড়ির কারখানা—১, লৌহ এবং পিতল কারখানা—৮, ট্রাম মেরামতের কারখানা ৩, ময়দার কল—৪, বরফ কল—১, তামাকের কারখানা—২, হাড় চূর্ণ করিবার কারখানা—১, রাসায়নিক কারখানা—১, রংয়ের কারখানা—১, তেলের কল—৭, গাড়ী প্রস্তুতের কারখানা—১, পটারী—১, পাট বাঁধাই কল—৮৯। ১৯০১-১১ সালের মধ্যে বঙ্গের আয়তন হ্রাসের ফলে বঙ্গের কিছু কল-কারখানার ক্ষতি হয়। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কলকারখানাগুলি তাহাকে হারাইতে হয়। ১৯১৭ সালের হিসাবে তখন বঙ্গে ছিল, লৌহ ও পিতলের কারখানা—২, রেলওয়ে কারখানা—৫, ময়দার কল—৩, বরফের কল—১, চিনির কল—৯, তামাকের কারখানা—৩, চাউলের কল—৮, গালার কারখানা—৪৩, তেল কল—১৭, ছাপাখানা—৯, আসবাবের কারখানা—২, পাথর কারখানা—২৭, টালির কারখানা—৬, চামড়ার কল—১, পাট বাঁধাই কল—৪, বৈদ্যুত যন্ত্রশিল্প কারখানা—৩, জলকল—১, পশম কল—১, লৌহ এবং ইস্পাত কারখানা—৩, চূণের কারখানা—৫, এবং বাক্স নির্মাণ কারখানা—৫। ১৯০৪-০৫ সালে বঙ্গে কাপড়ের কল, পাট কল, এবং কাগজ কল ছিল যথাক্রমে ১৩টি, ৩৬টি এবং ৩টি। ১৯১১-১২ সালে শুধু পাটকল বাড়িয়া ৫৬টি হইয়াছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে অপর দুটির কোনো পরিবর্তন হয় নাই। বঙ্গায় কারখানা বিষয়ক আইনের অন্তর্গত কারখানার সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯০৩, ১৯১১, এবং ১৯২১ সালে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ২,৫১; ২,২৪৮; এবং ৩,৯৫৭টি হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আলোচনা করিলে তাহা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯৪৪ সালে খাদ্য পানীয় এবং তামাকের কারখানার মোট সংখ্যা ছিল ২৭৮, কাপড়ের কল ১৫৬, খনিজ দ্রব্য সংক্রান্ত ৩৩, রাসায়নিক—১৩৩, কাগজ এবং ছাপাখানা—১১৮, চামড়া—৯, কাঠ, পাথর এবং কাঁচ—৯৮। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কারখানা সহ মোট সংখ্যা ছিল—১,৮০১। এখন দেখা যাক বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চল যোগ করিলে পশ্চিম বাঙলার এই বিষয়ে কি লাভ হইবে? ১৯১১ সালে সাঁওতাল পরগণায় ২টি তেলকল, ৭টি গালার কারখানা এবং ১১টি পাথর কল ছিল। মানভূমে ১টি ইষ্টক কারখানা, ২৪টি গালার কারখানা, ২টি যন্ত্রপাতির কারখানা এবং ২টি তেলকল; সিংহভূমে ১টি পশম কল, ২টি লৌহ এবং ইস্পাত কারখানা, এবং তিনটি গালার কারখানা; পূর্ণিয়ায় ৮টি পাট বাঁধাই কল, ৩টি রেলওয়ে কারখানা এবং ৮টি নীলচাষ কারখানা ছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্যের দিক হইতে দেখিলে একটি বিষয় স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ১৮৯১-১৯০১-এর পর বঙ্গের আয়তনের হ্রাস হওয়ায়, ইহার বহির্বাণিজ্যের বহু পরিবর্তন সাধন হইয়াছে। নিম্নের সংখ্যাগুলি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ১৮৯১ সালে সরকারী ও বেসরকারী মালপত্র ও ধন-সামগ্রী মোট আমদানীর পরিমাণ ছিল, ৩০,৯৭,২২,১৫৬ টাকা। ১৯০১ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৪০,৪৮,৭৮,৫২৭ টাকা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১০-১১ সালে আমদানীর মূল্য ৪০,০৬,৪০,৪৬৫ টাকা কমিয়া মাত্র ৪১,৯৮,০৬২ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু পরের ত্রিশ বৎসরে এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। ১৯২১, ১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালে যথাক্রমে ইহার মূল্য ছিল, ১,৫৬,৬৪,৫৪,৮৮৯; ৫৬,১৩,৬৭,৫৭৩ এবং ৫৫,৯২,৫২,৮৫২ টাকা। উন্নতি হইলেও অঙ্কগুলি ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী। ১৮৯১ সালে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল, ৩৭,৪৪,০২,৪৮৬ টাকা এবং ১৯০১ সালে, ৫৫,৯৯,৬০,৪৭৬ টাকা। ইহার পর ১৯১০-১১ সালে বঙ্গের আয়তন হ্রাসের ফলে অবস্থা খারাপ হইয়া যায় এবং মোট রপ্তানী মূল্য হয়, ৬,১১,১৮,৫২৫ টাকা। ১৯২১, ১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯১,৮৭,২৭,৯৪০; ৮৭,৪৫,২১,২৭১ এবং ১,০৫,৩০,০৪,৬৮৭ টাকা। ১৯৩১ সাল ব্যতীত মোটামুটি অঙ্কগুলির গতি উর্ধাভিমুখী। আমদানী ও

রপ্তানী উভয়বিধ ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুলি ১৯১১ হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত বাড়িয়াছিল। এবং বিশেষতঃ রপ্তানী বাড়িয়াছিল ১৯৩১ পর্যন্ত। কিন্তু আমদানীর ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ কমিতে থাকে। ১৯৩১ সালের পর রপ্তানীও কমিতে থাকে এবং ১৯৪১ সালে ৮৫,৩১,১৬,৬৫৪ টাকা কমিয়া যায়। যাহা হউক ১৯৪৩-৪৪ সালে এই সংখ্যা আরও ৫,৭৯,০৩,৮০৩ টাকা বাড়ে। ১৯৪১ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বন্দরের আমদানী রপ্তানীর হ্রাসবৃদ্ধি যাহা ঘটিয়াছিল তাহার মূল কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান কোথায়? ১৯৪১ সাল হইতে বাঙলা দেশে মাত্র দুইটি বন্দর ছিল, কলিকাতা, চট্টগ্রাম। বঙ্গ বিভাগের ফলে আমরা দ্বিতীয়টি হারাইয়াছি। কলিকাতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে,—এবার চট্টগ্রামের কথা আলোচনা করা যাক।

চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১১-১২ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে ৩,৭৫,৮৬,৯৯৫ টাকার, অর্থাৎ ইহা প্রায় শতকরা ৫০০% ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রপ্তানীর ক্ষেত্রে ১৯২০-২১ সাল ব্যতীত অন্য সব বৎসরেই ইহার গতি উর্ধ্বের দিকে। ১৯১১।১২ সালে এই বন্দরের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য ছিল ৫,৯৮,৭৮,০০০ টাকা, এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ইহা বাড়িয়া হয় মোট ৯২,৩০,৪৭,৫৯৪ টাকা। চট্টগ্রাম অধুনা ভিন্ন-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমরা এই বন্দরের বৃহৎ আয়টি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহার সহিত আমরা যদি নারায়ণগঞ্জের পাট বাণিজ্যের হিসাব ধরি, তাহা হইলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশী হইবে।

ভূমিকর এবং ডাক টিকিট বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের দুটি প্রধান আয়ের পথ। এই বিষয়ে বঙ্গের অতীত ও বর্তমান অবস্থা দেখা যাক। ১৯০৩-৪ সালে বাঙলার আদায়ীকৃত মোট ভূমিকর ছিল ৪,১০,০৩,০৮০ টাকা। বঙ্গের আয়তন হ্রাস হওয়ায় এই আয়ও কমিয়া যায় এবং ১৯১১ সালে হয় ২,৯৮,১৯,৮৬১ টাকা। কিন্তু ১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালে ইহা অবশ্য বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৩,০৮,৯৩,১০২ টাকা এবং ৫,৫৮,৯৪,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। টিকিট বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ১৮৯১ এবং ১৯০৩-০৪ সালে যথাক্রমে ছিল ১,৫১,০০,৪৬০ টাকা এবং ১,৯৮,৩৫,৫১৪ টাকা। ১৯১১ সালে এই সংখ্যা কমিয়া ১,৬৩,৩৭,৮০২ টাকা হয়। কিন্তু পরে ইহা বাড়ে এবং ১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালে যথাক্রমে ৩,১২,৯৪,৪৩০ টাকা ও ২,৫১,৫৮,০০০ টাকা হয়। ১৯১১ সালের হিসাবে প্রতি বর্গমাইল ভূমির জন্য কর ছিল ৩৫৪ টাকা। এ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া অধুনা বিহারের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গের তৎকালীন ভূমির আয় নির্ধারণ করা সহজ হইবে। ১৯৪৫-৪৬ সালে যুক্ত বাঙলায় ভূমি হইতে আয় ছিল ৩,৮৭,১৫,০০০ টাকা এবং ইহার মধ্যে বর্তমানে মাত্র ১,৮১,৬১,২৬৬ টাকা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে। বাকী ২,০৫,৫৩,৭৩৪ টাকা পূর্ব পাকিস্থান পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গ মাইল ভূমির জন্য কর ছিল ৫০৩ টাকা। ঐ সালে দেশীয় রাজ্য ধরিয়া হিসাব করিলে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭৪ টাকা। ১৯১০-১১ সালের হিসাবে বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলের ভূমিকরের মধ্যে সাঁওতাল পরগণা—৪,৪৪,০৮৬ টাকা, পূর্ণিয়া—১১,৭৩,২১৪ টাকা, মানভূম—৮১,৩৭৭ টাকা এবং সিংহভূম—১,৩৮,৮০৭ টাকা দিয়াছিল। এই সংখ্যাগুলি পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইলে, মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,৯৯,৯৮,৭৫০ টাকা।

যুক্ত বাঙলায় ডাক টিকিট বাবাদ প্রাপ্ত অর্থের মোট পরিমাণ ছিল ৪,০২,৯৫,০০০ টাকা, বর্তমানে ইহার মধ্যে পূর্ব পাকিস্থান পাইয়াছে ২,২১,৩৩,৭৩৪ টাকা এবং পশ্চিম-বঙ্গ পাইয়াছে ১,৮১,৬১,২৬৬ টাকা। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলির মধ্যে ১৯১০-১১ সালের হিসাবে, টিকিট বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল, সাঁওতাল পরগণা—১,৪০,৩৭২ টাকা, পূর্ণিয়া—৪,৫১,০২৫ টাকা, মানভূম—২,৬৪,৬৬৭ টাকা এবং সিংহভূম—৩৫,৬৩৭ টাকা। ইহাদের সম্মিলিত পরিমাণ ছিল ৯,৩১,৭০১ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের সহিত এই সংখ্যা যুক্ত হইলে মোট দাঁড়াইবে ১,৯০,৯২,৯৬৭ টাকা।

উপসংহারে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান বাঙলার অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলার নৈতিক অবস্থা ১৮৯১ সাল, ১৯০১, ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৪১ ও ১৯৪৭ স ১৫ই আগস্টের পূর্বেকার অবস্থার তু অনেক খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বিহ অন্তর্গত বাঙলা ভাষাভাষী জেলাসমূহ— মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা পূর্ণিয়া যদি বর্তমান পশ্চিম বাঙলার স সংযুক্ত করা হয় তাহা হইলে এই অর্থনৈ অবনতির কিছুটা পূরণ হওয়া সম্ভব।

১। তন্মধ্যস্থ সকল দেশীয় রাজ্য সমেত
২।৩ কুচবিহার ও ত্রিপুরা (দেশীয় রাজ্য) স
৪। কুচবিহার সমেত। ইহার তিনটি ব আছে—(১) হিসাবের সুবিধা (২) রাজ্যের সংলগ্ন জেলাগুলি পশ্চিমব অন্তর্ভুক্ত ও (৩) এই রাজ্য ভার ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে।
৫। ও ৪। —১৯৪১-এর আদমসু অনুযায়ী
৬।৭। তন্মধ্যস্থ সকল দেশীয় রাজ্য সমে
৮। তন্মধ্যস্থ সকল দেশীয় রাজ্য ব্যতীত
৯। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী
১০। কুচবিহার সমেত
১১।১২ তন্মধ্যস্থ সকল দেশীয় রাজ্য সমে
১৩।১৪। ত্রিপুরা ও কুচবিহার সমেত
১৫। তন্মধ্যস্থ সকল দেশীয় রাজ্যের লোকস সমেত
১৬।১৭। দেশীয় রাজ্যগুলি ব্যতীত
১৮। তন্মধ্যস্থ সকল দেশীয় রাজ্য সমেত
১৯।২০। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনু
২১। কুচবিহার সমেত
২২। তন্মধ্যস্থ সকল দেশীয় রাজ্য সমেত
২৩। ত্রিপুরা সমেত
২৪। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী
২৫। কুচবিহার সমেত
২৬। কুচবিহার ও ত্রিপুরা সমেত
২৭। তন্মধ্যস্থ সকল দেশীয় রাজ্য সমেত
২৮। কেবলমাত্র কুচবিহার সমেত
২৯। যন্ত্রশক্তি চালিত

বিক্ষমুখের কথা
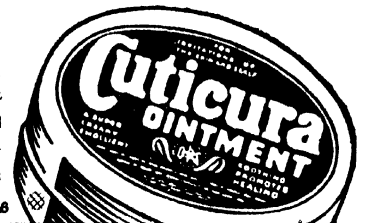
সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যৌথ সংসারের শৃঙ্খলে ফাট্ ধরেছে। পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে আমরা কেউই রাজি নই, অন্ততঃ মনে-মনে। কিন্তু এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা নিরুপায়। প্রথমতঃ স্বতন্ত্র সংসার রচনায় যে আনুষঙ্গিক হাঙ্গামা বা অসুবিধা আছে, সেটা বহন করতে মন স্বভাবতই দ্বিধাগ্রস্ত হয়। যাঁরা বৃহৎ পরিবারের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন ও জেনেছেন একান্নবর্তী পরিবারে বাস করায় যেটুকু নিশ্চিন্ততা, তার দায়িত্ব বোধ হয় তার চেয়ে বেশী। এ ছাড়া স্বার্থপরতা, নীচতা, কুশ্রীতা প্রভৃতি জীবনের কদর্য দিকটা অনেক সময়েই এমন প্রকট হয়ে ওঠে এবং তাতে নিজের ও ছেলেমেয়েদের মনে এতটা গ্লানি ও কুশিক্ষার উদাহরণ জমে উঠে ভবিষ্যতে চরিত্র-গঠনের পথে এমন কতকগুলো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, যে গুরুজনস্থানীয় আত্মীয় আত্মীয়ার মনঃকষ্টের কারণস্বরূপ হলেও পৃথক পরিবার স্থাপন করাই যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

শুধু এক সংসারে বাস করেই যে কুশিক্ষা হয়, একথা অবশ্য বলা চলে না। তবে অপ্রীতিকর দৃশ্য আর প্রসঙ্গ কিংবা বয়স্থ ব্যক্তিদের সাংসারিক আলোচনা আর সাধারণ অন্তঃপুরিকাদের সারিকি হাল-চাল ছোটদের অল্প বয়সে এত পাকিয়ে তোলে যে, তাদের কথা শুনলে মধ্যে মধ্যে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তবে বাপ-মায়ের সঙ্গে ছোট সংসারে থেকেও যে ছেলেমেয়েরা খারাপ হতে পারে, এটাও সত্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে—সংসার বলতে তিনজন। বাপ মা ও ছেলে। ত্রিসীমানায় কোনও কুপ্রভাব নেই। তবু কুশিক্ষায় ছেলে ভরপুর। বাপ-মা সাধারণ শিক্ষাদানে আর গোটা দুই তিন গৃহশিক্ষক রেখে আর ভাল স্কুল কলেজে পড়িয়ে, ভাল খাইয়ে-পরিয়ে নিজেদের কর্তব্যের কোনও ত্রুটি করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিথ্যায়, প্রবঞ্চনায়, আলস্যে আর দায়িত্বহীনতায় ছেলে মানুষ হল না। বেয়াড়া এবং অকর্মণ্য সন্তানের জনক-জননী বাকি জীবনটা আক্ষেপ করে আর নিজেরা ধর্মকর্মে মন দিয়ে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। পাঁচজনে বলাবলি করে, এমন ভদ্র পরিবারে এমন অভদ্র সন্তান হয় কি করে ...... সবই প্রাক্তন ...... কর্মফল।

কিন্তু কেউই ভাবতে পারেন না যে, এটা পূর্বজন্মের কর্মফল নয়,—ইহকালেই স্বকৃত কর্মের ফল এবং বাপ-মাই অনিচ্ছাকৃত অবহেলায় অথবা স্নেহবশতার আতিশয্যে কিছুটা বুঝে এবং কিছুটা অবুঝ হয়ে ছেলের সর্বনাশ করেছেন। যখন শাসনের প্রয়োজন ছিল, তখন আদর আর স্নেহের অনুশাসন কার্যকরী হয়নি। যে সময়ে সন্তানকে স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা দিতে হয়, সে সময়ে তাকে হাতে-হাতে সমস্ত জিনিস জুগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ছেলে যখন যা চেয়েছে, তাই সে পেয়েছে এবং করা হয়েছে। কার্যত তার মানসিক অধঃপতন আর চরিত্র-শৈথিল্যের জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী তার পিতা ও মাতা। এখন মৌখিক অনুযোগে নতুন করে সংস্কার সাধন অসম্ভব হয়ে ওঠে। ছেলেবেলা থেকে সন্তানকে পুতুলের মতন সাজিয়ে পাউডার মাখিয়ে, খাইয়ে ও শুইয়ে যে তৃপ্তি—তারি ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে অতৃপ্তি। আসল কথা এই, ছোটদের আমরা নিষ্প্রাণ পুতুল মনে করি। তাদের ছেড়ে দিই না, একলা হতে দিই না, আপনা-আপনি কাজ করতে কিংবা বাইরে বেরুতে দিই না। আমাদেরই মনের ইচ্ছা ও সাধ মেটাই তাদের দিয়ে। বাপ ও মা নিজেদের রুচি ও ধারণামত মানুষ করতে গিয়ে হয় এতো বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন, নয়তো সন্তানের ফুটন্ত মন আর স্বাধীন চিন্তা এবং উদ্যমকে এতটা অবদমিত করে নষ্ট করে ফেলেন যে, পরে মনোমত চরিত্র-গঠন হলো না বলে আক্ষেপ করার কোনও অর্থ থাকে না। ছেলেমেয়েরা আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব-সংস্কার, বিশ্বাস-ধারণার প্রতিবিম্ব হয়ে উঠুক, এইটেই সব বাপ-মা মনে মনে কামনা করেন। সেই মত কাজ করেন আর ছেলেমেয়েরা যদি অন্যপথে পা বাড়াবার চেষ্টা করে, তখনই অভিভাবকের আহত অভিমানে তাঁরা নীরব ও গম্ভীর হয়ে যান, নয়তো খিট-খিট শুরু করেন। এইভাবে স্বাধীন সত্তার বিকাশটুকু অঙ্কুরেই শীর্ণ হয়ে যায়। আর একটি কথা। অনেক বাড়ীতেই দেখা যায় : বাপ-মা কষ্ট করে, আত্মবঞ্চনা করে ছেলেমেয়ে মানুষ করেন। কিন্তু যে সময়ে যেটুকু করা দরকার অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা যখন শুরু হয়, তখন যে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, সেটুকু না করে ভবিষ্যতের ভাবনায় অর্থ সঞ্চয় করেন। এ অর্থ-সঞ্চয় কি নিরর্থক নয়? জীবনের গোড়ায় যখন ছেলেমেয়ের শিক্ষা আর চরিত্র গঠনটাই বড় কথা, তখন সে শিক্ষা মামুলিভাবে সেরে দিয়ে তার স্বাবলম্বন বৃত্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে, তার উন্মেষিত মনের সুকুমার বৃত্তি কোন্ পথে ও ধারায় বিকশিত হতে চায়, সে তত্ত্ব না বুঝে সাধারণ শিক্ষাদানে আপনার দায়িত্ব সম্পন্ন করে নিয়ে, অজানা-ভবিষ্যতের অনাবশ্যক চিন্তায় পুঁজি সঞ্চয় করার কি কোনো মানে হয়? ছেলে তো বুঝবেই, কোনো মতে তালি-চাপা দিয়ে ফাঁকা শিক্ষার ঘুণধরা বনিয়াদের ওপর দুটো পা নিয়ে একটু দাঁড়াতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গণ্ডী অন্তত লাফিয়ে পার হওয়া যেতে পারে। তারপর একমাত্র ছেলে হলে তো কথাই নেই। অচিরেই বিবাহ, ফুলশয্যা, নতুন জীবনের মাদকতা, বাপ-মায়ের আড়ালে নির্বিরোধ গতানুগতিক জীবনের নিশ্চিন্ত দায়িত্বহীনতা। সন্তানাদি হলে মানুষ করবেন নতুন ঠাকুরদা ও ঠাকুমা। এবং তাঁদের দেহান্তে সঞ্চিত অর্থ যখন হাতে এসে পৌঁছুবে, তখন ইতিমধ্যে বিরক্ত এবং অবসন্ন অল্প বয়সেই সংসার-পীড়িত নাবালক সাবালকটি কোনও মঠে গিয়ে সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়ে গুরুদেবের পাদপদ্মে আশ্রয় খুঁজবে, না কি শনিবার রেসের মাঠে টিপ্ দেখে কদম-চাল ঘোড়ার পায়ে সে টাকা বাঁধা রাখবে—কেউই বলতে পারে না।

সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে বহু সন্তানের মধ্যে কয়েকটি সন্তান গড়িয়ে গড়িয়ে মানুষ হয়, হয়তো তার মধ্যে থেকে কৃতী ও মেধাবী ছাত্র বেরিয়ে আসে তা জানি। কিন্তু সেটা সব সময়ে হয় না। যদি বা হয়, তা হলে পিতৃদত্ত দশ বিশ হাজার কোম্পানীর কাগজ আর একখানি পৈতৃক বাড়ীর মধ্যে আত্মাপুরুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। যে অর্থটুকু তার পিতা-মাতা অনেক বাঁচিয়ে ও ভেবে-চিন্তে সঞ্চয় করে গিয়েছেন, সেটা অর্থহীন মনে হয় বাড়ীর মধ্যে গোয়াল ঘরের দিকে তাকিয়ে। ভাই-বোনদের দায়িত্ব তখন বোঝার মতন ঘাড়ে চড়ে বসে। অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মানুষগুলি আর অভিমানিনী জননীকে নিয়ে সেই মানুষ-হওয়া পুত্রটি তখন চোখে অন্ধকার দেখে! বিবাহিত হলে তো কথাই নেই। জটিলতার সূত্রে পরলোক পর্যন্ত বন্ধকী রাখতে হয়। তাই তার মনে হওয়া স্বাভাবিক—পিতা যদি এভাবে অর্থসঞ্চয় না করে সকলকেই সাধ্যমত কিছু কিছু শিক্ষা দিয়ে পায়ের ওপর দাঁড়াতে শেখাতেন, তাহলে ভালো হত। আমাদের সমাজ গঠনের ভিত্তিটা খারাপ নয়। তবে আপনাদেরই অবহেলায় এবং নিষ্কর্মতায়, লোকাচার আর চক্ষুলজ্জার খাতিরে সেই মূল ভিত্তিটার ওপর এতো ডালপালা, আগাছা-আবর্জনার সৃষ্টি করেছি যে, সেই বহু পুরাতন দীর্ণ ঐতিহ্যের বনিয়াদ আর খাড়া থাকতে পারছে না। অথচ সেটাকে ভেঙ্গে সারিয়ে, কালোচিত পরিবর্তনের সঙ্গে তার সংস্কার সাধন করবার মতন আমাদের উদ্যম অথবা সাহস নেই। যখন দেখি—মনঃপুতভাবে সংসার চলছে না, সমাজের হাওয়া বদলানোর ফলে ছেলেমেয়েরা অন্যপথে চলতে চায়, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, অর্থাৎ—এক কথায় মধ্যবিত্ত সংসারের যাবতীয় বিড়ম্বনা বর্তমান অথচ কোনো সুরাহা হচ্ছে না,—তখন নিজেরা পুরাতন প্রথাকে আঁকড়ে থাকি, স্মৃতির রঙীন কাঁচে কল্পিত আদর্শের প্রতিবিম্ব দেখি। গলদ কোথায়, কর্তব্য কি, —এ কথাগুলো ভেবে সেইমত চলতে ভরসা পাই না। অকারণে বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার সামাজিক গতির মুণ্ডপাত করি ......

চাঁদমণি ..... শ্রীনিশাপতি মাঝি

নাম চাঁদমণি। গায়ের রঙ আকাশের চাঁদের মতো নয়। দেহের গড়ন অনেকটা চাঁদেরই মতো—গোলগাল। কালো পাথর কুঁদে তাকে গ'ড়েছে কোন্ এক অজানা ঈশ্বর।

শুকনো নদী। বালি অনেকটা খুঁড়লে জলের দেখা পাওয়া যায়। দূর পল্লী থেকে এখানে আসে ওরা জল খুঁজতে। চাঁদমণি এসেছিল। সর্দার কন্যা চাঁদমণি। কলসীতে জল ভ'রে কালো পাথরের মূর্তি সোজা চলেছে ঘর-মুখে।

আমিও চললাম ওর পিছনে পিছনে। এক-বারও ফিরে তাকালো না সে। সোজা চলতে লাগলো। লম্বা রাস্তার শেষে ওর ঘর। অনেকক্ষণ ধ'রে এই পথ দিয়ে চললাম

কলসীতে জল ভ'রে সোজা চলেছে ঘরমুখো

দু'জনে। চাঁদমণি আগে আগে, আমি পিছনে। কাঁখে কলসী জলে ভরা—চাঁদমণি চলেছে একমনে।

ঘরে পোঁছে উঠোনে কলসী নামালো সে। তারপর পিছন ফিরে আমার দিকে চেয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। শাদা শাদা দাঁতে যেন চাঁদের হাসির বাঁধ দিল ও খুলে।

স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। চাঁদ-মণি কাছে এসে মাথা নীচু ক'রে নিঃসংকোচে প্রণাম করলো আমায়। বললাম, 'বাপ কোথায় ?'

কোনো উত্তর না দিয়ে সে ঘরের মধ্যে চ'লে গেল। বসবার জন্য ঘর থেকে একটা মাচুনী এনে উঠোনে নামিয়ে রেখে বললো, 'বস্'।

তকতকে ঝরঝরে উঠোন। ঘরের দেয়ালে নানা-রকমের ছবি আঁকা। শিকারীর নানা-ভঙ্গীর ছবি। তাকিয়ে তাকিয়ে তা-ই দেখ-ছিলাম, আর মনে মনে হয়ত এই পল্লীবাসী-দের রুচির তারিফ করছিলাম। চোখ ঘুরিয়ে তাকালাম ঘরের চালের দিকে।

আমার রকম দেখে ওর বোধ হয় মজা লাগছিল। খুশির ভঙ্গিতে কোমরে হাত দিয়ে একটু বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ও মুচকে মুচকে হাসছিলো একমনে। তার দিকে সোজাসুজি না তাকালেও তাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম স্পষ্ট—আবছায়া সন্ধ্যায় যতটা স্পষ্ট দেখা সম্ভব, হয়ত তার চেয়ে একটু বেশি স্পষ্টই তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। কুচকুচে কালো শরীর ঘিরে একটা ধবধবে শাদা শাড়ী। হাতে আর পায়ে রুপোর গড়া গয়না, গলায় দস্তার হাঁসুলী। হাঁসুলী ঘিরে লাল বনফুলের একটা মালা তার গলা জড়িয়ে আছে। নাকে হাতে আর বুকে উল্কি আঁকা। মাথায় একরাশ চুল, হাল্কা বাতাসে ফুর ফুর ক'রে উড়ে চোখে-মুখে পড়ছে। মাটি মেখে আজই হয়ত মাথা সাফ ক'রেছে। গলায় যে ফুলের মালা, তারি কয়েকটা মাথার চুলে গুঁজেছে চাঁদমণি।

চমকে উঠলাম। হল্লা শুনতে পেলাম। এবার ওরা তবে আসছে। ডিম ডিম ক'রে মাদল বাজার আওয়াজ এসে বাজতে লাগলো কানে। সে শব্দ ক্রমেই কাছে আসতে লাগলো। চাঁদমণি কান খাড়া করে শুনলো সেই শব্দ। বললো, 'আসছে।'

বললাম, 'কয়েকটা কথা আছে। সেরেই যাব তবে।' কোনো জবাব দিলোনা চাঁদমণি। দেখতে দেখতে উঠোন ভ'রে গেলো এক পাল জোয়ানে। উন্মত্তের মতো তারা দল বেঁধে মাদল বাজাতে ও সেই সঙ্গে নাচতে লাগলো। ওই উন্মত্ত ভিড়ের দিকে তাকালাম। মনে ক'রেছিলাম, জটা নিশ্চয় আছে, কিন্তু অন্ধকারে কারু মুখই দেখা গেল না। প্রাণ ভ'রে মদ খেয়ে এসেছে সবাই। তাইতেই হয়ত ফুর্তি তাদের বেড়ে গেছে এত। ওরা নাচতে নাচতে চাঁদমণিকে উদ্দেশ ক'রে গেয়ে গেয়ে বলতে লাগলো, তোর নাগর পালায়নি, লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে নিশ্চয় আছে সে, নইলে দেখা যাবে না কেন ?

জটা মাঝি। লিখতে পড়তে শিখেছে সে। আমার কাছেই তার বর্ণপরিচয় ও বোধোদয়। দিন-কতক আগে সে নিজের ভাষায় সাঁওতাল-দের এক সভায় বক্তৃতা পর্যন্ত দিয়েছে। প্রাণের মধ্যে তার এতটা তেজ ও তাপ যে লুকিয়ে ছিলো, আগে তা বোঝা যায় নি। সভার এই বক্তৃতায় তার কথাগুলি স্ফুলিঙ্গের মতো বের হ'য়েছিল সেদিন। সভায় যারা উপস্থিত ছিল, তারা উত্তেজিত ও উল্লসিত তো হ'য়েই ছিল, নিভৃতে আর একজনের প্রাণ গর্বে নেচে উঠে-ছিল সেদিন। সে চাঁদমণি। তার স্বামী মানুষকে এভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে, সে-ও তা বোঝেনি আগে। সেদিনের সভার বক্তৃতাই জটার গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে। ভয়-ডর কোনোদিনই কাউকে সে করেনি, কিন্তু সেই-দিন থেকে সে যেন আরো নির্ভীক হয়ে উঠলো।

চাঁদমণি পাতা জড়ো ক'রে আগুন ধরিয়ে দিলো তাতে। সেই আলোতে দেখা গেল, জটার বুকের নিচে মাদল। নেচে নেচে সে বাজাচ্ছে গানের তালে তালে। পাতার আগুন ক্রমে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠছে, নাচের তেজও বেড়ে উঠছে সেই অনুপাতে। ছেলে বুড়ো মেয়ে একে একে সবাই যোগ দিলো নাচে। এ-নাচ উৎসব-নৃত্য তো নয়, এ নাচ যেন যজ্ঞ-নৃত্য। আত্মাহুতি দেবার জন্যে এ-যেন পরম প্রস্তুতি।

রাতদুপুর পর্যন্ত একটানা চললো নাচ। ইতিমধ্যে কখন যে চাঁদমণি গিয়ে ঢুকেছিল রান্নাঘরে, কেউ জানতেই পারেনি তা। নাচ থামবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদমণি খাবার বিলি আরম্ভ করে দিলো।

খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে একে একে সবাই চলে গেলো। ওরা হয়ত চেয়েছিলো, আমিও চলে যাই। কিন্তু এই গভীর রাত্রে আমি যাব কোথায় ? এখান থেকে আমার ডেরা অনেক দূর—পাঁচ ক্রোশ পথ। তবু উঠি উঠি করছিলাম, জটা বললো, 'যাবে কোথায় ? আমার ঘরে কি ঠাঁই নাই ?

জানতাম আছে। কিন্তু যেটুকু ঠাঁই আছে, তাতে ওদের দুজনের হয়ত কুলায়, কিন্তু এই পরম রমণীয় রাত্রে, যে রাত্রে আকাশ ভরে জ্যোৎস্নার পুলকিত উৎসব শুরু হয়েছে, সে রাত্রে আমি যে উপদ্রব ও উদ্বৃত্ত বিশেষ, তা কি আমি বুঝিনি ? তবু থাকলাম। বারান্দার এক পাশে বিছানা পাতা হলো আমার জন্যে।

জটা বললো, 'আমরা তৈরি। লড়াই এবার শুরু হলো বলে। ডাক যেই পড়বে, ঝাঁপ দেব আমরা। পরদেশী শাসন আর শোষণ বরদাস্ত করব না কখনো।'

কথাগুলো হয়ত ওর প্রাণের, কিন্তু ভাষাটা আমার কাছ থেকে শেখা। নিজের ভাষা অন্যের মুখে শুনে আরাম পেলাম, উৎসাহও বোধ হলো অনেক।

জটা বললো, 'আমি কি একলা আছি। সারাটা গাঁ আছে, আর আছে—'

'দাঁত দিয়ে কামড়ে তুলে দিল ওই মুখপুড়ী'

মুচকি হেসে বললাম, 'আবার কে আছে?'

'কেন, চাঁদমণি।'

কবে তার গায়ে কাঁটা ফুটে গিয়েছিল একদিন, সেই কাহিনী সগর্বে বলতে শুরু করলো জটা। কাঁটার কাহিনী এত আহ্লাদের সঙ্গে বলার কারণ বুঝিনি আগে, শেষে যখন সে উপসংহারে এলো তখন বললাম, 'তারপর তুললি কি করে?'

"দাঁত দিয়ে কামড়ে তুলে দিলো ওই মুখপুড়ী।" চাঁদমণির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো জটা।

বললাম, "যা শো গিয়ে। রাত হয়ে গেছে অনেক।"

"এই চাঁদের রাতে কি ঘুম আসে, না, ঘুমাতে হয়?"

"তবে কি করবি?"

"দ্যাখো না।"

দেখলাম, ওরা দুজন বারান্দা থেকে উঠোনে নামলো, তারপর ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নার বন্যায় যেন সাঁতার দিতে দিতে একটু বাদেই অদৃশ্য হয়ে গেলো। একা পড়ে রইলাম আমি চাঁদমণিদের বারান্দায়। ঘুম আসি আসি করেও যেন আসতে চায় না। হঠাৎ বাঁশীর শব্দ শুনতে পেলাম। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে সেই শব্দ। এরি মধ্যে এত দূরে চলে গেছে ওরা দুজন। এই নিভৃত পল্লীতে জীবন্ত দুটি আত্মা নিমেষে আমার কাছে সঙ্গীত হয়ে বেজে উঠতে লাগলো।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনে। চোখ খুলে দেখি, সকাল হয়ে গেছে। তীর-ধনুক হাতে নিয়ে উঠোনে চাঁদমণি দাঁড়িয়ে। বললো, "ভাঙলো ঘুম? কত শিকার হয়ে গেলো আমাদের—ব্যাং, সাপ, কাঠবেড়াল।"

"জটা কই?"

"আসছে। পাতা কুড়াচ্ছে। এগুলো পুড়িয়ে খেতে হবে তো?"

গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বসলাম। কাল বিকালে যাকে দেখেছি, কলসী নিয়ে রমণীসুলভ চারুত্বে সারা গাঁ উজ্জ্বল করে দিয়েছিল, আজ ভোরে সেই বীরাঙ্গনার মতো দাঁড়ালো এসে চোখের সামনে।

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তীর বল্লম সব ছুঁড়তে শিখেছি। কী বলেছিল জটা সেই বক্তৃতায়? ফুস্ মন্তরে ভুলে গেছ বুঝি সব?"

ভুলিনি কিছুই। নারীদেরও তৈরি হতে বলেছিল সে। বলেছিল, কারো ওপর কারো নির্ভর করা চলবে না। যদি দেশ বাঁচাতে চাও, তবে শেষ হতে শেখো—জটার মুখের এই তো একমাত্র রা। গাঁয়ে গাঁয়ে নয়, ঘরে ঘরে সে এই ধ্বনি করে বেড়িয়েছে। সাড়া তবে পেয়েছে জটা মানি। প্রাণ যাবে, তবু মান যাবে না। ঝুটা শাসন বরবাদ করতেই হবে।

আগুন তো ধিকিধিকি জ্বলে উঠেছে তাহলে। এখন একটু ফুঁ পেলেই তবে এ জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে।

ক'দিনের মধ্যেই আগুন লেলিহান শিখা

মাঝামাঝি। সাঁওতাল পল্লীতে নৃত্য-গীত থেমে গেছে, এখন বাজছে রণদামামা। পল্লীতে পল্লীতে চোখের ইসারা হয়ে গেছে, শালপিয়ালের বনের নিভৃতে নিভৃতে প্রাণের প্রবাহ বয়ে চলেছে একটানা। তার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। জটা গাঁয়ে গাঁয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে উল্কার মত বেগে। বলে বেড়াচ্ছে—ন্যায় বিচার চাই আমরা। জমি-জায়গা, গরু-বাছুর, স্ত্রী-পুত্র সকলের মায়া ত্যাগ করতে হবে সকলকে। শপথ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বিদেশী শাসনকে প্রথমে উচ্ছেদ করতে হবে, তারপর নিজেদের শাসন করবো নিজেরা।

জ্বলে উঠলো থানা আর কাছারী, ছিঁড়ে গেলো টেলিগ্রাফের তার, রেলের লাইন শত খণ্ড হয়ে গেলো এক নিমেষে। আত্মাহুতির সেই উৎসবে পল্লীর অন্তরাত্মা যেন মহা-সমারোহে যোগ দিল।

জটা গা ঢাকা দিয়ে ছিল অনেকদিন। কিন্তু বেশি দিন এ ভাবে থাকা চলে না। যারা প্রাণ দিয়েছে তারা তো চলেই গেছে, কিন্তু যারা পিছে পড়ে রইলো—তাদের প্রাণে নূতন করে প্রেরণা জাগাবার জন্যে সে শেষ চেষ্টা করার জন্যে বদ্ধপরিকর হলো। জটা থানায় গিয়ে ধরা দিলো।

এ সংবাদে সাড়া পড়ে গেলো দিকে দিকে। চাঁদমণি খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলো অনেক ক্ষণ। তার ইচ্ছে হলো, থানায় গিয়ে একবার দেখে আসবে জটাকে। অনেকদিন সে দেখেনি তাকে। কিন্তু তার বাপ নিষেধ করলো তাকে, বললো, "ওর মধ্যে যাস্‌নি তুই।"

"ক্যানে?"

"কাজ নেই।"

কাজ নেই মানে? এটাও যদি কাজের কাজ না হয়, তাহলে জীবনে আর এমন কাজ কী বা আছে তার?

সর্দার কড়া নজর রাখলো মেয়ের ওপর। তার চোখের আড়াল হতে দেয় না এক মুহূর্ত। বলা যায় না, ওই আহম্মকটার টানে তার মেয়ে আগুনে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়ত।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো কত দুঃসংবাদ এসে পৌঁছতে লাগলো চাঁদ মণির কানে। শেষে মারাত্মক খবরটাও এলে একদিন। জটার ফাঁসী হবে। ফাঁসী হবে? কে কিসের জন্যে। যারা গুলী ছুঁড়ে ছুঁ হাজার হাজার জোয়ানের আর শিশুর প্র কাড়লো, তারা আজ বিচার করছে, তারা জ সেপাই সেজে সাজা দেবার মালিক সেজে বুঝি। না, চাঁদমণি এ হতে দেবে না। সে ওদে হাত থেকে ছিঁড়ে-কেড়ে নিয়ে আসবে জটাকে

সর্দার বললো, "পাগলি! ভুলে যা, ভু যা—"

চাঁদমণি বললো, "ভুলতেই চাই।"

মেয়েকে নিয়ে সর্দার চললো জেলখানায়। শেষ দেখা দেখিয়ে আনবে তাকে। সর্দারের সংগে জেলারের ইসারা ইংগিত যে হয়ে গেছে, কে তা জানতো আগে! চাঁদমণি বাপের সংগে সংগে চললো জেলে। তার প্রাণে পুলক জাগছে, সেই সংগে আবার মুষড়ে পড়ছে মন।

একটা কথা বললেই নাকি খালাস হয়ে যাবে জটা। চাঁদমণি ব্যগ্র হয়ে জেলারের দিকে এগিয়ে সুধালো, "কী কথা?"

"শুধু স্বীকার করবে—জটা হাতবোমা তৈরি করতো।"

চাঁদমণি বললো, "এই কথা বললেই খালাস।"

"হ্যাঁ, বেকসুর।"

"সর্দার চাঁদমণিকে একটা গুতো দিয়ে বললো, "বল্ না।"

চাঁদমণি একটু ভাবলো, কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললো, "আগে ওকে দেখ্তে দাও। ওকে এর মধ্যে ফাঁসী দিয়ে দিয়েছ কি না, কে জানে!"

"ফাঁসী? দুৎ!" জেলার হাসলেন, "ফাঁকি ফাঁকি—বাজে খবর। দ্বীপান্তর দেওয়া হবে, কিন্তু যদি—"

চাঁদমণি বললো, "যদিতে কোনো বিশ্বাস নেই বাপু, আগে ওকে দেখতে দাও।"

জেলার সম্মত হলেন। সংগে সংগে চললো সর্দার, আগে আগে চাঁদমণি।

এ কি? তার জটা ভদ্দরলোক হয়ে গেছে। পরনে তার ধোয়া ধুতি, সে একটা চেয়ারে বসে আছে। চাঁদমণি তাকে দেখামাত্র প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল আর কি তার গায়ের ওপর, কিন্তু সর্দার রুখ্লো, চাঁদমণির হাত চেপে ধরে রইলো।

ফর্সা হয়ে গেছে অনেক, জটা শুকিয়ে গেছে। চাঁদমণি শুধালো, "ভালো আছিস্।"

জটা মাথা নেড়ে জানালো—না।

"কী হয়েছে রে—মন খারাপ?"

"অসুখ।" জটা অস্পষ্টভাবে বললো।

জেলার বললেন, "টি বি, মানে যক্ষ্মা।"

এমন জোয়ান, এমন মজবুত মানুষ; তাকে এই কালরোগে ধরলো কী করে—বুঝতে পারলো না চাঁদমণি। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছু বলতে পারলো না। তার দুনিয়া ক্রমে যেন ফিকে হয়ে আসছে। সে নিজেও নিস্তেজ হয়ে পড়ছে যেন ক্রমশ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদমণি বললো, "উপায়?"

"কিসের উপায়?" জেলার সুধালেন।

"কী করে বাঁচাবো একে?"

জেলার মুচকি হেসে বললেন, "বাঁচিয়ে লাভ কী, ও ত বিশ বছরের জন্যে দ্বীপান্তর যাবে।"

"যাক্ যাক্ যাক্—চাইনে বাঁচতে।" ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলো জটা।

জেলার বললেন, "বলো, হাতবোমা তৈরি করতো ও?"

কালো পাথরের মূর্তিটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "না, করতো না। মেরে তো ফেলেছই, এখন খালাস দিয়ে লাভ? কিন্তু যদি ওকে পেতাম, অসুখ সারিয়ে দিতাম নিশ্চয়। আমার গাছ-গাছাড়ির রস ও ব্যামো এক নিমেষে ভালো করে দেয়।"

সর্দার বললো, "তবে বল্ না—"

"কী বলবো—মিছে কথা? কখনো তৈরি করেনি ও। কারো হাতে ও হাতিয়ার দেয়নি, সবার প্রাণে ও নতুন মন্ত্র দিয়েছিল শুধু।"

জেলার চাঁদমণির কথা কান দিয়ে শুনলেন। বললেন, "বিচার ওর শেষ হয়নি এখনো। বলা যায় না, পেলেও পেতে পারে ছাড়া। পরশু আসিস।"

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও ছোট। জটা আর চাঁদমণি পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে বসে গুণ গুণ করে গান করে। বন-বাদাড় থেকে শিকড় আর মূল কুড়িয়ে এনে চাঁদমণি তাকে ওষুধ খাওয়ায়। বলে, "সেরে উঠবি তুই। আমার হাতের ওষুধের কি দাম নেই।"

জটা ম্লান হেসে বলে, "জ্যান্ত হয়ে উঠতে হবেই আমাকে।"

পশ্চিমবঙ্গের (ও পূর্ব পাঞ্জাবের) লোক-গণনার কার্য যে প্রয়োজন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ডক্টর আম্বেদকর স্বীকার করিয়াছেন, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনা রাজনীতিক উদ্দেশ্যদুষ্ট সুতরাং নির্ভরযোগ্য নহে। দুঃখের বিষয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ লোকগণনার পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন, সেরূপ গণনা শেষ করিয়া পরিষদে সদস্য নির্বাচন করিতে হইলে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন সম্ভব হইবে না। তবে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন, নিদর্শনমূলকভাবে লোকগণনা করা হইবে। সেরূপ গণনা যে সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। লোকগণনা কেবল রাজনীতিক উদ্দেশ্যেই করা হয় না—ভোটের ব্যাপারে তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তাহা বিজ্ঞানসম্মত এবং তাহাতে যেমন ব্যক্তির বিষয় জানিতে পারা যায়, তেমনই জাতির উন্নতির জন্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় জানা যায়। গত গণনার সময় যে মুসলিম লীগ সরকার নানারূপ হীন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনা একান্ত প্রয়োজন। কিভাবে মুসলিম লীগ গণনার কার্য করিয়াছিলেন, তাহা পরলোকগত নৃপেন্দ্র-নাথ সরকার তাঁহার বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ণাঙ্গ লোকগণনা যদি এখনই সম্ভব না হয়, তবে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পূর্বে নিদর্শনমূলকভাবে গণনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ গণনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভিত্তি যদি নির্ভরযোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার উপর সৌধ প্রতিষ্ঠা কখনই সমীচীন হইতে পারে না। তেমনই লোকগণনা যদি নির্ভরযোগ্য না হয়, তবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সরকার যে সকল ব্যবস্থা করিবেন, সে সবই ত্রুটিপূর্ণ হইবে। কিন্তু প্রথম কথা—এক বৎসরে কি পশ্চিমবঙ্গের মত একটি স্বল্পপরিসর প্রদেশে পূর্ণাঙ্গ লোকগণনার ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছিলেন, যে সকল নরনারী গত ২৫শে জুনের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই নাম রেজেষ্টারী করা হইবে। তাঁহাদিগের এইরূপ নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ হয় এবং তাঁহারা সেই নির্ধারণের পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। এখন সরকার স্থির করিয়াছেন, ঐ তারিখের পূর্বে যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন, ১৫ই জানুয়ারীর পরে আর তাঁহাদিগের নাম রেজিষ্টারী করা হইবে না। প্রথমে নাম রেজিষ্টারী করা ব্যয়সাধ্য করায় লোকের তাহাতে বিলম্বও ঘটিয়াছিল। কিন্তু গত ২৫শে জুনের পর হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের পশ্চিমবঙ্গের আনুগত্য স্বীকার করিবার

অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে ত? আমাদিগের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে এখনও হিন্দুদের আগমন অনিবার্য। সম্প্রতি নিম্ন-লিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে:—

খুলনা জিলা কংগ্রেস সীমান্ত নির্ধারণ সমিতির সদস্য শ্রীশরৎচন্দ্র দাশ উভয় রাষ্ট্রের গভর্নর প্রভৃতির নিকট ঐ জিলার ডুমুরিয়া থানার এলাকায় কয়খানি গ্রামে সংখ্যালঘিষ্ঠ (অর্থাৎ হিন্দু) সম্প্রদায়ের অধিবাসীদিগের নির্যাতন সংবাদ জানাইয়াছেন। নির্যাতন পুলিশ ও আনসার বাহিনী একযোগে করিয়াছে। তারে বলা হইয়াছে, উহারা হিন্দু-দিগের গৃহ লুণ্ঠন ও শস্য নষ্ট করিয়াছে এবং কয়টি ক্ষেত্রে নারীর উপর পাশবিক অত্যাচারও হইয়াছে।

আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে ঐ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানরাও নিরাপদ নহেন। তথায় বহু লোককে কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া ভয় দেখান হইতেছে।

যদিও পূর্ব পাকিস্থানের প্রধান সচিব বলিয়াছিলেন, তিনি যশোহরে ডক্টর জীবনরতন ধরের অধিকৃত গৃহ ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন, তথাপি ম্যাজিস্ট্রেট সেই নির্দেশানুযায়ী কাজ করিতে বিলম্ব করিতেছেন এবং শ্রীরঞ্জনকুমার মিত্র দিগরের মামলায় সরকার পক্ষ হইতে কেবলই "দিন ফেলিয়া" বিলম্ব করা হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যখন বলিয়াছিলেন, অন্তত ১৫ লক্ষ হিন্দু পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে উপনীত হইয়াছেন, তখন পূর্ব পাকিস্থানের প্রধান সচিব বলিয়া-ছিলেন, সে উক্তি সত্য নহে—উহার একচতুর্থ-সংখ্যক হিন্দু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু পরিচালিত সংবাদপত্রাদির প্রচারকার্যের ফলে পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু গত ১০ই জানুয়ারী কলিকাতায় বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটে বিধানবাবু বলিয়াছিলেন, গত ৫।৬ বৎসরে কলিকাতার লোকসংখ্যা ২২ লক্ষের স্থানে ৬৬ লক্ষ হইয়াছে।

যদি কেবল কলিকাতাতেই লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষেরও অধিক বাড়িয়া থাকে, তবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তাহা কিরূপ হইয়াছে? বনগ্রাম,

বর্ধিত লোকসংখ্যার হিসাব কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুঝেন নাই?

বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের যে অনুষ্ঠানে বিধানবাবুকে গান্ধী স্মৃতি-ভাণ্ডারের জন্য টাকা দেওয়া হয়, তাহাতে তিনি কলিকাতায় ভূগর্ভ রেলপথ প্রতিষ্ঠার বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় সেইরূপ যানের ব্যবস্থা যে প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করা সঙ্গত, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে একবার এই বিষয় বিবেচিত হইয়াছিল। কলিকাতায় মাত্র কয় ফুট জমীর নিম্নেই জল পাওয়া যায়। সেইজন্য কেহ কেহ মনে করেন, কলিকাতায় ভূমির তলে রেলপথ নির্মাণ নিরাপদ হইবে না—পথ স্থানে স্থানে নামিয়া যাইতে পারে। যাঁহারা এই মতের সমর্থক তাঁহারা বর্তমান পথের উপরে—ঊর্ধ্বে রেলপথ রচনার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আমেরিকায় এইরূপ পথ আছে। সে সময় তাহাতে "আবরু" নষ্ট হইবার যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, বোধ হয়, আজ আর তাহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইবে না। আমাদিগের বিশ্বাস, সেই অনুসন্ধানের রিপোর্ট এখনও সরকারের দপ্তরে পাওয়া যাইতে পারে। কারণ, যদিও মিস্টার জিন্না কলিকাতা পাকিস্থানের জন্য দাবী করিয়াছিলেন এবং 'আজাদ' প্রভৃতি সেই সুরে বাজনা করিয়াছিলেন, তথাপি কলিকাতা যখন পশ্চিমবঙ্গেই রহিয়া গিয়াছে, তখন কলিকাতার প্রস্তাবিত পথ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্থানের দপ্তরখানায় যাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বিধানবাবু বলিয়াছেন, কলিকাতার লোক-সংখ্যা যেরূপ বর্ধিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল যানের সংখ্যা বাড়াইলেই হইবে না। ট্রামের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া বাড়াইতে অনুমতি প্রদান-কালে কেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাড়ির সংখ্যা বাড়াইবার সর্ত করেন নাই, তাহা বিস্ময়ের বিষয়।

সরকারী বাসগুলি কি আবশ্যক যত্নে রক্ষিত হয় না? ইহার মধ্যেই সেগুলি বিবর্ণ হইতেছে—আর কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এগুলিতে লাভ হইতেছে কিনা, তাহাও বলা যায় ন। যদি লাভ না হইয়া লোকসান হয়, তবে যে সে ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গের লোকের তাহা বলা বাহুল্য—সচিবগণের ক্ষতি কেবল পরোক্ষভাবে—অর্থাৎ তাঁহারাও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী সেইজন্য প্রত্যক্ষ ক্ষতি অল্প নহে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত অসমাপ্ত "মহাজাতি সদন" গৃহ এবং উহা যে জমীর উপর অবস্থিত (কলিকাতা কর্পোরেশনের) সেই ভূমিখণ্ড লইয়া অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিবেন।

উহা সম্পূর্ণ হইলে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনানুযায়ী কার্যে ব্যবহৃত হইবে। উহা তখন কংগ্রেস ভবনরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল এবং উহা কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা উহার ভিত্তি সংস্থাপনকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনিই উহার নামকরণও করিয়াছিলেন। উহার সম্পাদকরূপে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মিত্র এতদিন উহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং উহাকে বৃটিশ সরকারের কবল হইতেও রক্ষা করিয়াছেন। এইবার তিনি প্রত্যার্পিতন্যাস হইবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার "মহাজাতি সদন" পরিচালন জন্য একটি সমিতি গঠিত করিবেন। তাহাতে সরকারের কয়জন প্রতিনিধি থাকিবেন, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে সরকার যখন অর্থ দিবেন, তখন তাঁহাদিগের প্রতিনিধি-সংখ্যা হয়ত তাঁহারা অধিক দাবী করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি গৃহের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। "মেটকাফ হল" অধিবাসীদিগের অর্থে নির্মিত হয় ও কলিকাতার জনসাধারণের লাইব্রেরী তাহাতে অবস্থিত ছিল। লর্ড কার্জন সেই লাইব্রেরীর পুস্তকাদি "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী"ভুক্ত করিয়া উহা অধিকার করেন। তাহার পরে কিন্তু এই গৃহ ভারত সরকার অন্য কাজে ব্যবহার করিতেছেন। উহার উদ্ধার করা আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। "মেটকাফ হলে" পূর্ববৎ কলিকাতার একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কারণ, "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী" দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব বার বার হইয়াছে—এখন হয়ত পাকিস্থান উহাতে অংশ দাবী করিবে। সে অবস্থায় কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ লাইব্রেরী থাকা প্রয়োজন।

এই সঙ্গে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের কথাও আলোচ্য। উহা ভারত সরকারের সম্পত্তি ছিল —এখনও আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যখন ভারতবর্ষে ও পাকিস্থানে বিভক্ত হইয়াছে, তখন পাকিস্থান যে উহার অংশ দাবী করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে পাকিস্থান যে "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" প্রস্তরস্ত সংগ্রহ লাভ করিয়াছেন, তাহার পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ কি দাবী করিতে পারে তাহাও বিবেচ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরা বস্তু সংগ্রহ সম্বন্ধে কি হইবে, তাহাও বলা যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না যে, ভারত রাষ্ট্রকে এখন হইতে পুরা বস্তু এবং শিল্পজাত দ্রব্যের সংগ্রহে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি দ্রব্যগুলি রক্ষা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দ্রব্যের জন্য আবেদন করেন, তবে যে অনেক স্থান হইতে সংগ্রহযোগ্য দ্রব্য পাইতে পারেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তাঁহারা স্বকাগার করিয়াও সেইরূপ আবেদন ফলে বহু সংগ্রহযোগ্য পুস্তক ও পুঁথি পাইতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙলা ভাষায় লিখিত এক নির্দেশে সরকারের সকল বিভাগকে জানাইয়া দিয়াছেন—১৫ই জানুয়ারী হইতে "কলিকাতা গেজেটে" ঘোষণা—"যথাসম্ভব" বাঙলায় করিতে হইবে এবং 'গেজেটে' ইংরেজী অপেক্ষা বাঙলায় অধিক ঘোষণা প্রকাশিত হইবে। বলা হইয়াছে, এখনও 'গেজেটে' যথেষ্ট পরিমাণ ঘোষণা বাঙলায় প্রকাশিত হইতেছে না। সেইজন্য সরকারের সকল বিভাগকে অনুরোধ করা হইতেছে, বাঙলায় ঘোষণা যেন ক্রমে অধিক হয় এবং ঘোষণার জন্য বাঙলা স্বাভাবিক ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়—ইত্যাদি।
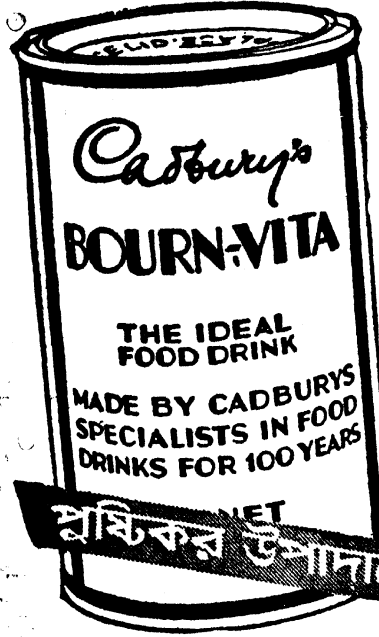
যাহার প্রয়োজনীয়তা কেন এই নির্দেশ প্রদত্ত হইয়া থাকুক না আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু যে সকল চাকুরীয়া—সিভিল সার্ভিসে চাকরী পাইয়া মোচাকে "কেলাকে ফ্রুল" বলিতেন—যাঁহারা "ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েত বিলাতী কুকুর" বিলাতীর অনুরক্ত ভক্ত তাঁহারা কি বিশুদ্ধ বাঙলা লিখিতে শিখিয়াছেন? তাঁহারা আফিস প্রভৃতিতে খদ্দর ব্যবহার করেন, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা "পলিসী" সূত্রে। এখনও তাঁহারা "নেকটাই"-এর আদর করেন। তাঁহারা যদি মাতৃভাষায় ঘোষণা লিপিবদ্ধ করেন, তবে তাহা যাহাদিগের জন্য উদ্দিষ্ট, তাহারা বুঝিতে পারিবে ত? ঘোষণা বাঙলায় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আবার অতিরিক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিতে ও সেই সকল কর্মচারীর জন্য নূতন দপ্তরখানা করিতে হইবে না ত?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙালী ছাত্রদিগের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস রচনার ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? যখন মাতৃভাষার সাহায্যেই প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হইবে, তখন এই সকল বিষয়ে অবহিত হইতে বিলম্ব কি সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করা যায়?

'গেজেটে' বাঙলা অধিক ব্যবহারের দিকে যে সরকারের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাহা আমরা সুখের বিষয় বলিয়াই বিবেচনা করি।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যগণ কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কয়টি কলেজ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা "শান্তিনিকেতনে"ও গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেভাবে পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অনেক ত্রুটিই তাঁহাদিগের দ্বারা লক্ষিত হইতে পারে না। ভারত রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপনা ও অন্যান্য ব্যবস্থার পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন সম্বন্ধে মত প্রকাশই এই কমিশনের উদ্দেশ্য। ইতঃপূর্বেও কমিশন কাজ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় নাই। এখনও পশ্চিমবঙ্গে সরকারের কতকগুলি কলেজ আছে। সরকারী কলেজের প্রয়োজন কিছু আছে কিনা, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন অবশ্য উচ্চশিক্ষার বিষয় বিবেচনা করিবেন। উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু আজ যে দেশে প্রাথমিক ও সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী শিক্ষার বিস্তার সাধনের প্রয়োজন অধিক, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সে বিষয়ে যে আবশ্যক উদ্যম প্রযুক্ত হইতেছে, তাহা মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন, তাহা প্রদেশের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নহে। সরকারের শাসনব্যয়েও যে প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে তাহা কি অপব্যয় পর্যায়ভুক্ত করা যায় না?

গত ১৪ই জানুয়ারী গৌতম বুদ্ধের প্রধান শিষ্য—সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান দুইজনের অস্থির অবশেষ সাঁচীতে প্রেরণ পথে কলিকাতায় নীত হইয়াছে। ঐ পূতাস্থি বৌদ্ধ প্রথানুসারে স্তূপমধ্যে রক্ষিত ছিল। সাঁচীর স্তূপ পরীক্ষাকালে কানিংহাম কর্তৃক উহা আবিষ্কৃত হয় ও বৃটেনে প্রেরিত হয়। এতদিন পরে উহা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতবর্ষে আসিল। উহা রক্ষার জন্য সাঁচীতে একটি মন্দির নির্মিত হইবে। উহা আপাতত মহাবোধি সভার ব্যবস্থায় কলিকাতায় থাকিবে। গৌতম বুদ্ধ রাজ্য, পত্নী, পুত্র সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া মোক্ষমার্গের সন্ধান ত্রিতাপতপ্ত মানবকে দিয়াছিলেন। তাঁহার এই শিষ্যদ্বয়ও সন্ন্যাসী হইয়া আধ্যাত্মিকতার দ্বারা মানবমণ্ডল জয় করিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিদ্বয়ের পূত অস্থি আজ রাজোচিত আড়ম্বর সহকারে কলিকাতায় নীত হইল। আমরা প্রার্থনা করি, বুদ্ধদেবের আদর্শ আবার তাঁহার দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করুক এবং সেই আদর্শ আবার এই পুণ্যভূমি হইতে সমগ্র জগতে ব্যাপ্তিলাভ করুক।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কলিকাতায় আসিয়া গত ১৫ই জানুয়ারী বারাকপুরে গান্ধীঘাটের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। এই সঙ্গে যদি বারাকপুরের নাম "সুরেন্দ্রনগর" করা হইত, তবে এদেশে জাতীয়তার জনকের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইত।

মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ হরিশচন্দ্র সরকারের মৃত্যুর সংবাদ আমাদিগকে ব্যথিত করিয়াছে। তাঁহার পিতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকার শিক্ষাব্রতী ছিলেন। পিতা সতীশচন্দ্র যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন, পুত্র হরিশচন্দ্র তখন তথায় ছাত্র। হরিশচন্দ্র কলেজ ত্যাগ করিয়া জাতীয় কলেজে যোগ দেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে অর্থনীতিক শিক্ষালাভ করিয়া এদেশে আসিয়া চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে মনোনীত হন। কিন্তু পিতার ও পুত্রের সম্বন্ধে পুলিশের মন্তব্যে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি একাধিক ভারতীয় ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীতে দক্ষতা সহকারে কাজ করিয়াছিলেন।

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৫)

আমার ছোট্ট পার্টি'টা তেমন মন্দ জমলো না। গ্রে আর ইসাবেল সর্বপ্রথম এসে হাজির, পাঁচ মিনিট পরে এল লারী আর সোফী ম্যাক্‌ডোনাল্ড, ইসাবেল আর সোফী পরস্পরকে আবেগভরে চুম্বন করল আর তাদের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে গ্রে আর ইসাবেল অভিনন্দন জানালো। সোফীর আকৃতির প্রতি ইসাবেল যেভাবে চোখ দিচ্ছিল, আমি তা লক্ষ্য করলাম। সে দৃষ্টিতে আমি বিস্ময়াহত হলাম। সেদিনের সেই হুল্লোড়ের ভিতর রুদ্ধ দ্য লাপে বেয়াড়া রকম রক্তমাখা অবস্থায়, সবুজ কোট গায়ে, হেনারঞ্জিত চুলে সোফীকে যখন দেখেছিলাম, তখন তার অত্যন্ত মদালস অবস্থা সত্ত্বেও কেমন একটা আকর্ষণীয় ভাব তার মুখে দেখেছিলাম। কিন্তু এখন ওকে কেমন যেন জোলো দেখাচ্ছে, ইসাবেলের চাইতে দু-এক বছরের ছোট হলেও তার বয়স অনেক বেশী বলে মনে হচ্ছে। এখনও তার মাথার সেই চমৎকার হেলান আছে বটে, কিন্তু কেন জানি না, সে ভঙ্গী অতি করুণ মনে হচ্ছে। চুলের স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, যখন চুলগুলি রঞ্জিত করা হ'ত, তখনকার সেই অপরিচ্ছন্ন ভাবটুকু এখনও অবশ্য আছে। ঠোঁটে সামান্য একটু রঙ ছাড়া তার সারা দেহে আর কোথাও প্রসাধনের চিহ্ন নাই। তার গাত্রচর্ম কর্কশ, তার ভিতর একটা অস্বাস্থ্যকর ম্লানিমা মেশানো। ওর চোখদুটি কি অদ্ভুত সবুজ দেখাত মনে পড়ল, কিন্তু এখন তা ধূসর ও বিবর্ণ। সে একটি লাল রঙের পোষাক পরেছে, নিঃসন্দেহে তা নূতন, সেই সঙ্গে মানানসই হ্যাট, জুতা, আর ব্যাগ ব্যবহার করছে। স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ সম্পর্কে আমি অবশ্য তেমন কিছু জানি বলতে পারি না, তবু এই উপলক্ষ হিসাবে ওর এই পোষাক কিঞ্চিৎ আতিশয্যমণ্ডিত এবং বেয়াড়া ঠেকল। বুকের ওপর একখণ্ড কৃত্রিম জড়োয়ার গহনা বসিয়ে দিয়েছে। কালো সিল্কের পোষাকে সজ্জিত, পরিষ্কার মুক্তার হারশোভিত ইসাবেলের পাশে তাকে অতি-সাধারণ ও কুবেশধারিণী মনে হয়।

আমি কক্‌টেলের অর্ডার দিলাম, কিন্তু লারী ও সোফী তা প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর এলিয়ট এসে পেঁাছল—বিরাট দেউড়ি অতিক্রম করে আসতে গতি প্রতিপদে ব্যাহত হতে লাগল, পরিচিত লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে কারো বা করমর্দন করতে হয়, কারো হাতে চুমা খেতে হয়, এমন ভাবে এলিয়টের যেন 'রিজ'টা ওর নিজস্ব বসতবাড়ি আর অভ্যাগতবৃন্দ ওর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাতে সে অতীব আনন্দিত। সোফীর স্বামী ও পুত্রের মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও লারীর সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়েছে এই সংবাদটুকু ছাড়া তাকে আর কিছু বলা হয়নি। অবশেষে যখন এলিয়ট আমাদের কাছে এসে পেঁাছল, তখন সে তার মনোহর ঔদার্যমণ্ডিত ভঙ্গীতে ওদের অভিনন্দিত করল, এই ভঙ্গীটুকু প্রকাশে ওর কৃতিত্ব অসীম। আমরা সবাই ডাইনিং রুমে উঠে গেলাম, আমরা চারজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক হওয়ায় আমি গোলটেবলটিতে ইসাবেল আর সোফীকে মুখোমুখি বসালাম। গ্রে এবং আমার মাঝে রইল সোফী, তবে সাধারণভাবে কথা কইবার পক্ষে টেবলটি বেশ ছোট। আমি ইতিমধ্যেই লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছিলাম, মদ্য পরিবেশক মদ্য তালিকা নিয়ে এসে হাজির।

এলিয়ট বলে "তুমি মদের সম্বন্ধে কিছুই জানো না ভায়া, এলবার্ট ঐ 'ওয়াইন কার্ড'টা আমাকে দাও।" তারপর পাতাগুলি উলটিয়ে বলে "আমি নিজে ভিসি ওয়াটার ভিন্ন কিছুই খাই না বটে, কিন্তু লোকে যে আজে-বাজে মদ খাবে এ আমার সহ্য হয় না।"

মদ্য পরিবেশক এলবার্ট আর এলিয়ট উভয়ে পুরাতন বন্ধু, একটা প্রচণ্ড আলোচনা চলার পর আমার অতিথিদের কি মদ দেওয়া উচিত তা ও'রা স্থির করলেন। তারপর সোফীর দিকে তাকিয়ে এলিয়ট বলেঃ

"কোথায় হনিমুন করতে যাবে ঠিক করলে?"

ও পোষাকের পানে তাকিয়ে যে ভাবে ভ্রূ ভঙ্গী করে আমার দিকে এলিয়ট চোখ ফেরাল তাতে বুঝলাম এ বিষয়ে তার মত সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

সোফী বলে "আমরা গ্রীসে যাচ্ছি।"

লারী বললঃ "আমি গত দশ বছর ধরে গ্রীসে যাব মনে করছি, কিন্তু কোনো না কোনো কারণে কিছুতেই আর পেরে উঠিনি।"

উৎসাহ প্রকাশ করে ইসাবেল বলে ওঠে—"এই সময়টা এখানে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে।" আমার সঙ্গে ইসাবেলেরও মনে পড়ল যে বিবাহের পর ইসাবেলকে লারী ঐখানেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল। মনে হল লারীর পক্ষে গ্রীসে মধুচন্দ্রিকা যাপন করাটা একটা স্থির সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

আলাপ-আলোচনা তেমন সরল ভাবে প্রবাহিত হল না, আর যদি ইসাবেল না থাকত তাহলে আমার পক্ষে দাঁড় ঠিক করে টানা কঠিন হত। ইসাবেলের সেদিনকার ভাবভঙ্গী ছিল অনুপম। যখনই স্তব্ধতা বিরাজ করার সম্ভাবনা জাগত এবং নতুন কোনো একট প্রসঙ্গ ভেবে ঠিক করার জন্য আমাকে মাথা খুঁড়তে হত তখনই ইসাবেল তার স্বতোৎসারিত কলগানে মুখরিত হয়ে উঠছিল। আমি তা[illegible] কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। সোফী খু[illegible] অল্পই কথা বলছিল, তাও ওকে কিছু বললে তার জবাবে কিছু বলছিল মাত্র এবং যেটু[illegible] বলছিল তাও অতি কষ্টে। তার ভিতর থেকে যেন প্রাণশক্তি অন্তর্হিত হয়েছে। মনে হ[illegible] তার ভিতর কোন একটা কিছুর মৃত্যু ঘটে[illegible] এবং লারী তার ওপর যে বোঝা চাপিয়েছে ত[illegible] ভার বহন করা তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠেছে[illegible] সোফী মদও খায় এবং সেই সঙ্গে আফি[illegible] জাতীয় কোনো নেশা করে আমার এই সন্দে[illegible] যদি সত্য হয়, তাহলে মনে হয় তার আকস্মি[illegible] পরিবর্জনে ওর স্নায়ু অবসন্ন হয়ে গেছে[illegible] মাঝে মাঝে আমি ওদের চাউনি ল[illegible] করছিলাম। লারীর চোখে একটা কোমলতা উদ্দীপনার ছাপ দেখা গেল, কিন্তু সোফ[illegible] দৃষ্টিতে একটা বেদনাভরা আকুলতার আবে[illegible] পরিস্ফুট। মধুর প্রকৃতি বশতঃ সহজাত বু[illegible] প্রভাবেই হয়ত গ্রে আমার চিন্তাধারা বুঝে[illegible] —কেননা, সে সোফীকে বলতে লাগল ল[illegible] তাকে কি ভাবে নিরাময় করেছে ভয়ঙ্কর [illegible] ধরার হাত থেকে—কতখানি সে তার ও[illegible] নির্ভর, কত সে ঋণী লারীর কাছে।

গ্রে বলতে থাকে "আমি এখন মাছির স্বচ্ছ ভঙ্গিতে কাজ করতে পারি। এ[illegible] কোনো কাজ পেলেই আমি কাজে যোগ [illegible] অনেকগুলি ব্যাপার আমার ঝুলছে, শ[illegible] দু'একটার মীমাংসা করতে পারব মনে [illegible] আবার স্বদেশে ফিরতে পারলেই বাঁচি।"

গ্রে অবশ্য ভালো মনেই কথাগুলি [illegible] ছিল, কিন্তু যা বলল তা তেমন চাতুর্য

বলতে পারি না, যে প্রক্রিয়ায় থেকে লারী সুস্থ করেছে সেই প্রক্রিয়ায় সোফীর মদের নেশা ছাড়িয়ে থাকে (আমার ত মনে হয় তাই ঘটেছে)।

এলিয়ট বলেঃ এখন আর তোমার মোটেই মাথা ধরা নেই, গ্রে?"

"তিন মাসের ভিতর আর কোনো আক্রমণ হয়নি, আর যদি বুঝি তার উপক্রম হচ্ছে, তাহ'লে আমি তার মন্ত্রঃপূত ওষুধ হাতে ধরি ও তখনই সুস্থ হয়ে উঠি।" এই বলে পকেট থেকে লারী প্রদত্ত সেই প্রাচীন মুদ্রাটি বার করে গ্রে বলে "কোটি কোটি ডলারের বিনিময়েও এই জিনিসটি আমি হাত ছাড়া করছি না।"

আমাদের লাঞ্চ শেষ হল, কফি পরিবেশিত হল। মদ্য পরিবেশক এসে জানতে চাইলে আমরা কোনো মদ চাই কি না। এক গ্রে ছাড়া সবাই অস্বীকার করল—গ্রে একটু ব্রান্ডি পান করতে চাইল। বোতলটি যখন এল এলিয়ট সেটি দেখার জন্য জেদ ধরল।

তারপর বলল, "হ্যাঁ আমি এটা অবশ্য নিতে বলি, এতে তোমার ক্ষতি হবে না।"

ওয়েটার বললঃ "আপনার জন্য একটু দেব মঁসিয়ে?"

"বাপরে! আমার পক্ষে ওসব নিষেধ!"

এর পর এলিয়ট বিস্তারিত ভাবে তার কি অসুখ, কিডনী সংক্রান্ত ব্যাপারে সে কি রকম ভুগছে এবং ডাক্তার তাকে সর্বপ্রকার মদ্যপানে বিরত থাকতে আদেশ দিয়েছেন।

"মঁসিয়ে যদি এক ফোঁটা জুব্রভকা পান করেন তাহলে কিছু ক্ষতি হবে না, কিড্‌নীর পক্ষে তা উপকারী। আমরা পোল্যান্ড থেকে সম্প্রতি একটা চালান পেয়েছি।"

"তাই নাকি, সত্যি! আজকাল ওসব পাওয়াই কঠিন। দেখি একবার বোতলের আকৃতিটা।"

মদ্য পরিবেশক লোকটি বেশ ভব্য এবং ভঙ্গী বেশ মর্যাদামণ্ডিত, গলায় একগাছি সরু রুপোর চেন ঝোলানো, জুব্রভকা আনতে সে চলে গেল। এলিয়ট আমাদের বোঝাতে লাগল জুব্রভকা হল পোলিস রীতির ভড্‌কা, কিন্তু তার চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

"শীকারের জন্য যখন রাৎসীউইলদের ওখানে ছিলাম, তখন অনেক পান করেছি। পোলিস প্রিন্সরা যখন গেলাস নামিয়ে রাখত সে একটা দর্শনীয় বস্তু; পুরো গ্লাস শেষ করেও তাদের মাথার একগাছি চুলও শিহরিত হত না। আমি এতটুকুও অতিরঞ্জিত কথা বলছি না। অবশ্য তারা উচ্চ বংশের লোক, হাতের নখ পর্যন্ত তাদের আভিজাত্যমণ্ডিত। সোফী একটু চেখে দেখ, ইসাবেল তুমিও; ও এমন এক জিনিস যে, এ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকা চলে না।"

মদ্য পরিবেশক বোতলটি নিয়ে এল। লারী, সোফী এবং আমি প্রলুব্ধ হলাম না, কিন্তু ইসাবেল একটু দেখতে চাইল। আমি একটু বিস্মিত হলাম, কারণ স্বভাবতঃ সে মদ্যপান পরিমিত ভাবে করত, ইতিমধ্যে তার দুটি ককটেল ও দু-তিন গ্লাস মদ্যপান শেষ হয়েছে। ওয়েটার ফিকে সবুজ একটা তরল পদার্থ গ্লাসে ঢেলে দিল, ইসাবেল আঘ্রাণ নিতে লাগল।

"ওঃ কি মধুর গন্ধ!"

এলিয়ট বলে ওঠে "কি বলিনি, এক রকমের গাছের শিকড় ওরা ওতে মেশায়, তার জন্যই অমন সুন্দর স্বাদ। সঙ্গী হিসাবে আমি এক ফোঁটা পান করব, একবার খেলে হয়ত আমার তেমন ক্ষতি হবে না।"

"কি চমৎকার খেতে, মাতৃদুগ্ধের মত মিষ্টি। এত অপরূপ জিনিস আর কখনো খাইনি।"

এলিয়ট ঠোঁটের ডগায় গ্লাসটি ধরল। বলেঃ

"ওঃ পুরানো দিনের কথা মনে পড়ছে, তোমরা যারা কখনো রাৎসীউইলদের সঙ্গে থাকোনি তারা বুঝবে না যে থাকা কাকে বলে। সে এক অপূর্ব স্টাইল, অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক রীতি, মনে হবে যেন মধ্য যুগে চলে গেছ। স্টেশনে ছয় ঘোড়ার গাড়ি ও লোকজন তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। আর ডিনারে প্রত্যেকের পিছনে উর্দীপড়া একজন করে পরিচারক।"

পোলিস পরিবারের বিলাস বাহুল্য পার্টির জাঁক-জমকের কথা বর্ণনা করে চলে এলিয়ট। অসমীচীন হলেও আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগল। যেন আগাগোড়া ব্যাপারটি মদ্য পরিবেশক ও এলিয়টের ভিতর সাজানো যার ফলে পোলিস অভিজাতবর্গের সঙ্গে তার মাখামাখির বিশদ বর্ণনা করার সুযোগ এলিয়ট পাচ্ছে। ওকে থামাবার কিছু নেই।

"আর এক গ্লাস নেবে ইসাবেল?"

"না, সাহস হয় না, কিন্তু জিনিসটা স্বর্গীয়, এই তথ্যটুকু জেনে ভারী আমোদ হল, গ্রে আমাদের কিছু সংগ্রহ করে রাখা উচিত।"

"আমি বাসায় কিছু পাঠিয়ে দেব।"

ইসাবেল উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে "ও মামা, পাঠিয়ে দেবে? না তোমার করুণার তুলনা নেই। গ্রে তুমি একটু চেখে দেখ, যেন সদ্য কর্তিত ধানের খড়ের গন্ধ, যেন বাসন্তী ফুলের সৌরভ, ল্যাভেন্ডারের স্নিগ্ধতা, যেন চন্দ্রালোকে বসে গান শুনছি।"

ইসাবেলের পক্ষে এত বাজে বকা একটু অস্বাভাবিক, ভাবলাম ওর একটু নেশা বেশী হয়ে গেল না কি,—পার্টি ভাঙল, আমি সোফীর সঙ্গে করমর্দন করলাম।

"কবে তোমাদের বিবাহ হবে সোফী?" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"আগামী সপ্তাহের পরের সপ্তাহে, আপনি বিয়েতে আসছেন ত?"

আমি হয়ত তখন প্যারীতে থাকব না, আমি কালই লন্ডনে চলে যাচ্ছি।"

আমি যখন সকলের কাছে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন সোফীকে একপাশে নিয়ে গিয়ে ইসাবেল কি বলল, তারপর গ্রের কাছে এসে বললঃ

"ওঃ গ্রে, আমি এখনই বাড়ি ফিরছি না, মালিনোতে একটা সজ্জা প্রদর্শনী হবে আমি

সোফী বলল "হ্যাঁ, হলে ভালোই হয়।"

ওর দেখা দরকার।"

সোফী বলল "হ্যাঁ হলে ভালোই হয়।"

আমরা বিদায় নিলাম। সেই রাত্রে সুজান রুভেয়ারকে নিয়ে ডিনারে গেলাম ও পরদিন লন্ডন যাত্রা করলাম।

(ছয়)

এক পক্ষকাল পরে এলিয়ট 'ক্লারিজে' এল, কিছু পরেই আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এলিয়ট অনেকগুলি সুটের অর্ডার দিয়েছে, বিস্তারিত ভাবে কেন এবং কি জন্য সেগুলি তার প্রয়োজন তা জানালো। একটু ফাঁক পেতেই আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম ওদের বিবাহ উৎসব কেমন ভাবে কাটল।

সে গম্ভীর ভাবে বলল: "বিয়েই হ'ল না শেষ পর্যন্ত।"

"তার মানে?"

"বিবাহের তিনদিন আগে থেকে সোফী নিরুদ্দেশ। লারী তাকে সর্বত্র খুঁজেছে।"

"কি আশ্চর্য কাণ্ড! কেন কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছিল?"

"না—না, তা নয়, মোটেই সে সব কিছু নয়, সব স্থির, আমার সম্প্রদান করার কথা, বিয়ের পরই ওরা ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস ধরবে এই স্থির। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহলে বলব লারী বেঁচে গেছে এক রকম।"

অনুমান করলাম, ইসাবেল ওকে সব বলেছে।

প্রশ্ন করলাম, "ঠিক কি হয়েছিল?"

"আচ্ছা, মনে আছে সেদিন রিজে ত' আমরা একত্রে লাঞ্চ খেলাম তোমার সঙ্গে। ইসাবেল ওকে নিয়ে মালিনো গেল। সোফী যে পোষাকটা পরেছিল মনে আছে? বিশ্রী! কাঁধ দুটো দেখেছিলে? ঐ দেখেই পোষাকের দোষ-ত্রুটি ধরা যায় কিভাবে কাঁধটা ফিট করেছে দেখলেই সব ধরা পড়ে। অবশ্য ও বেচারা 'মালিনো'র দামী পোষাক কোথায় পাবে? আর ইসাবেল, জানো ত' ওর করুণার শরীর, আর যাই হোক ওরা হল ছোট বেলাকার বন্ধু সব, তাই সে একটা পোষাক উপহার দিবে ঠিক করেছিল, অন্ততঃ বিবাহ করার উপযুক্ত একটা পোষাক। স্বভাবতঃই সোফী সে প্রস্তাবে সানন্দে মত দিয়েছিল। যাই হোক, দীর্ঘ কাহিনী সংক্ষেপে বলতে গেলে বলি—ইসাবেল ত' একদিন তিনটার সময় তার বাসায় সোফীকে আসতে বলেছিল, উভয়ে একত্রে গিয়ে কি রকম মানায় পাকাপাকি ভাবে দেখতে যাবে। সোফী ঠিক এল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইসাবেলের একটি মেয়েকে ডেনটিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছিল, তাই সে চারটের পূর্বে ফিরতে পারল না, যখন ফিরল, তখন দেখে সোফী চলে গেছে। ইসাবেল ভাবল হয়ত ক্লান্ত হয়ে ও একাই 'মালিনো'তে চলে গেছে, তাই সে সেখানে দৌড়ল, কিন্তু ও সেখানে যায়নি। অবশেষে ইসাবেল ওর আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল, ওদের সেদিন একত্রে ডিনার খাওয়ার কথা, ডিনারের সময় লারী আমাকে ও সর্বাগ্রে তার কাছে জানতে চাইল সোফী কোথায়।

"কিছু না বুঝতে পেরে ওর বাসায় টেলিফোন করল, কিন্তু কোনো জবাব পাওয়া গেল না। সুতরাং লারী বলল, নিজেই সেখানে গিয়ে দেখবে। ততক্ষণ ওরা ডিনার বন্ধ রাখল, শেষ পর্যন্ত কেউই না আসাতে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে ডিনার শেষ করল। রু দ্য লাপ্পেতে ওভাবে তোমরা ওকে দেখার পূর্বে ও যে কি জীবন-যাপন করেছে তা নিশ্চয়ই জানো: তোমার কিন্তু ওদের ওখানে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। যাই হোক, লারী ত সারারাত সোফীকে তার পুরাতন আড্ডাগুলিতে খুঁজে বেড়াল, কিন্তু কোথাও তাকে পেল না। বাসায় বার বার গেল, কিন্তু দরোয়ান জানালো সে আসেনি। তিনদিন ধরে লারী ওকে খুঁজলো—কোথাও নেই, চতুর্থ দিনে বাসায় খোঁজ করতে যেতে দরোয়ান বলল সোফী এসে পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে চলে গেছে।"

"লারী কি খুব মুষড়ে পড়েছে?"

"আমি তাকে দেখিনি, তবে ইসাবেল বলল, একটু মুষড়েছে বৈ কি!

"সোফী কোনো চিঠি-পত্রও দেয়নি ত?"

"কিছু না।"

আমি সমস্ত ব্যাপারটি ভাবলাম।

বললাম: "তোমার কি মনে হয়?"

"ভায়া হে, ঠিক তোমার যা মনে হয় আমারও তাই, সোফীর সইলো না, আবার মাল টানতে শুরু করল আর কি।"

তাই সম্ভব, কিন্তু সব জড়িয়ে কেমন যেন বিস্ময়কর। বুঝলাম না—ঠিক এই সময়েই ও নিরুদ্দেশ হল কেন।

"ইসাবেল ব্যাপারটা কি ভাবে নিয়েছে?"

"সে অবশ্য দুঃখিত, তবে সে বুদ্ধিমতী মেয়ে, বলল, সর্বদাই তার মনে হত অমন মেয়েকে লারী যদি বিয়ে করত তাহলে সর্বনাশ ঘটত।"

"আর লারী?"

ইসাবেল তার প্রতি অতি করুণাপরবশ, সে বলে সবচেয়ে মুশকিল এই যে, লারী এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে না, সে ঠিক সামলে উঠবে দেখো, ইসাবেল বলে, লারী কোনো দিনই সোফীকে ভালোবাসেনি, একটা ভ্রান্ত মহত্ত্বের গরিমায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই কাণ্ডটা করছিল আর কি।"

বুঝলাম, যে ঘটনাবলীতে ইসাবেল প্রচুর আত্মতৃপ্তি অনুভব করছে, সে বিষয়ে সে বাহ্যতঃ একটা সাহসিক ভঙ্গী বজায় রেখেছে। আমি জানতাম অতঃপর যখন তার সঙ্গে দেখা হবে সে বলতে ছাড়বে না যে সে আগাগোড়াই জানতো যে ঠিক এমনটাই ঘটবে।

(ক্রমশঃ)

নেতাজী জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী

বেলেঘাটা ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে আগামী ২১শে জানুয়ারী রবিবার রামবাগান ময়দানে নেতাজীর কার্যাবলী সম্বলিত এক মৃৎশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে। প্রদর্শনীর খোলার সময় প্রত্যহ বেলা ১-৩০ মিঃ হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। স্থান—রামবাগান ময়দান, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড। প্রদর্শনী ২১শে জানুয়ারী হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক

—দেশ—

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬৷৷০

ঠিকানা:—আনন্দবাজার পত্রিকা

১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।

কুকুররাও ফুটবল খেলছেন!

সম্প্রতি লণ্ডনের বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে বার্টরাম মিলস্ ক্রীস্‌মাস সার্কাসে কুকুরদের ফুটবল খেলা দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই কুকুরদের ফুটবল খেলার দলটিকে যিনি শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করেছেন তাঁর নাম মিঃ স্টিফেনসন। এই ফুটবল খেলা রীতিমত উপভোগ্য হয়েছিল। কারণ কুকুররা দিব্যি প্রতিপক্ষের কুকুর খেলোয়াড়দের পা থেকে বল কেড়ে নিচ্ছিল, পাশ কাটিয়ে বল পাশ করছিল, মায় হেডও করছিল। ছবিতে দেখবেন হাল্কা ছোট শরীরের একটি কুকুর খেলোয়াড় বলটিকে হেড করে প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলেছে। সাবাস! কুকুর খেলোয়াড়ের দল। মানুষরা কুকুরের মত আঁচড় কামড় নিয়ে মেতেছে—দেখেই বোধ হয় ওরা ফুটবল খেলায় মন দিয়েছে। এরপর হয়তো ওরা তাস, পাশা, দাবাও খেলবে।

সাবাস! কুকুর ফুটবল খেলোয়াড়!

আকাশ থেকে প্যারাসুট বৃষ্টি!

সম্প্রতি আমেরিকার জর্জিয়া প্রদেশের ফোর্ট ডেনিংএর লসন ফিল্ডে আমেরিকার ৮৩নং বিমানযাত্রী সৈন্যবাহিনীর কৌশল কেরামতি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে একটি খেলায় সৈন্যবাহক 'ফেয়ারচাইল্ড' শ্রেণীর এক একটি বিমানে ৪২ জন করে সৈন্য নিয়ে খুব উচুঁতে উঠে যায়, তারপর তাদের প্যারাসুটের সাহায্যে একসঙ্গে শূন্যপথে নামিয়ে দেয়। ফলে দেখা গেল, সমস্ত আকাশটা ছেয়ে যেন প্যারাসুট বৃষ্টি হচ্ছে। আমেরিকার বিমানযাত্রী ভাবী সৈনিকরা প্যারাসুটের সাহায্যে কতখানি দক্ষতার সঙ্গে নামতে শিখেছে—সেটি দেখাবার জন্যই এই ব্যবস্থা হয়েছিল। একসঙ্গে এত সৈন্যকে এর আগে কেউ আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখেনি। সেদিনকার সে দৃশ্যটা যে কতখানি রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছিল—তা আপনারা বুঝতে হয়তো পারবেন সঙ্গের ছবিটা দেখেই।
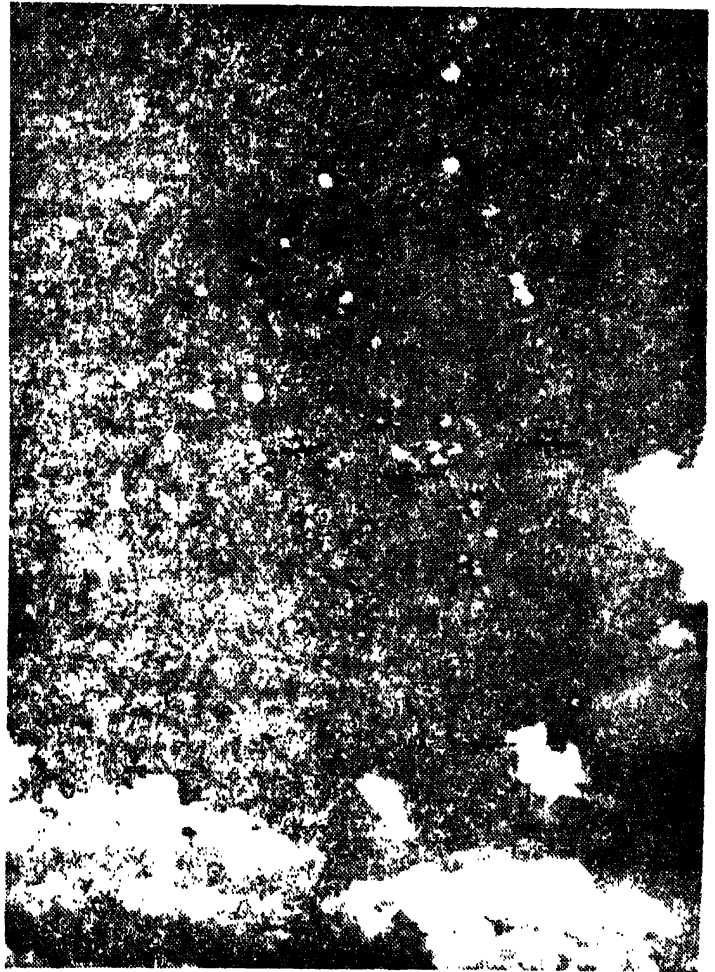
সিগারই যাঁর খাদ্য!

সম্প্রতি আমেরিকায় ফিনল্যাণ্ডের প্রাচীন ও বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও সুর রচয়িতা জিন্ সিবিলিয়াসের তিরাশী বছরের জন্মদিনের উৎসব পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে—"আমাকে সিগারই পাঠাবেন—ঐগুলিই আমার খাদ্য।" এর ফলে তিনি বিভিন্ন রকমের ৮৩ বাক্স সিগারই উপহার পেয়েছেন। এই উপহারগুলি তাঁকে যাঁরা পাঠিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে আছেন টালুলা ব্যাংকহেড, মিসেস্ কর্নেলিয়াস ভ্যাণ্ডারবিল্ট, কারমেন্ মিরাণ্ডা, টমাস জে ওয়াটসন্, সার্জ কুসোভিস্কি, ম্যারিয়া এণ্ডারসন, আর লরেন্স টিবেট প্রভৃতি স্বনামখ্যাত শিল্পী ও অভিনেতৃবর্গ।

আকাশ থেকে প্যারাসুট বৃষ্টি!

চতুর্থ শ্রেণীর আসনলোপ চেষ্টা

কলকাতার প্রদর্শক মহলের বর্তমান হাব-ভাব ও কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে যে, অচিরেই কলকাতার সিনেমা গৃহগুলি থেকে চতুর্থ শ্রেণীর (ছ'আনার) আসনকে সম্পূর্ণ লোপ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ দরিদ্র লোকেদের কাছে মাঝে মাঝে প্রমোদ আহরণের যে সুযোগটুকু বর্তমানে আছে তা থেকে তাদের বঞ্চিত হতে হবে। চিত্র ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান বি এম পি এ'তে শোনা গেলো, এ বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে একটা সিদ্ধান্ত করে দেবার জন্যে। প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষেই হচ্ছে সংখ্যাধিক্য এবং এটা যখন চিত্র ব্যবসায়ীদের নিজেদেরই পকেট ভারী হওয়ার ব্যাপার তখন প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ে অচিরেই কার্যকরী হবে বলেই অনুমান করা যায়। সিদ্ধান্তটি পাকাপাকিভাবে গৃহীত হলে কলকাতার সর্বনিম্ন মূল্যের আসন হবে, খুব সম্ভবতঃ দশ আনা।

এই মূল্য বৃদ্ধির হেতু হিসেবে প্রদর্শকরা নিঃসন্দেহে বলবেন যে, এখন বাজার মন্দা, ছবির আয়ও তাই কমে গিয়েছে—কাজেই ছ'আনার মতো সস্তা দামের টিকিট রেখে তাদের আর পোষাচ্ছে না। কিন্তু মন্দা বাজারকে ভালো করে তোলার এই উপায়ই তারা শ্রেয়ঃ বলে ধরে নিলেন কি করে? তারা জানেন ভালো করেই যে আমাদের দেশের বেশীর ভাগের লোকেরই আয় হচ্ছে খুবই কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই বেশীর ভাগ লোককেই ছবি দেখার পর্যাপ্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিতই করে আসছেন। ছ'আনার শ্রেণীতে যে সংখ্যক আসন নির্দিষ্ট আছে, তা কোন চিত্রগৃহেরই মোট আসন সমষ্টির এক-দশমাংশের বেশীতে পড়ে না, বরং অধিকাংশ চিত্রগৃহেই কম। তারপর গত ক'বছর ধরেই সমস্ত চিত্রগৃহের মালিকরাই নিম্নের অন্যান্য সব ক'টি শ্রেণীরই আসনসংখ্যা কমিয়ে সেই অংশ উঁচু দামের শ্রেণীর সঙ্গে সরাসরিভাবে জুড়ে দিয়ে বসেছেন। কোন কোন চিত্রগৃহের এই আসন চালাচালি এত বেশী হয়েছে যে, দু'তিন বছর আগে যেসব চিত্রগৃহে হাউসফুল হলে যত টাকা উঠতো, এখন তা তার দেড়গুণেও দাঁড়িয়ে যেতে পেরেছে। অর্থাৎ এই নতুন ব্যবস্থায় চিত্রগৃহের মালিকরা ইতিমধ্যেই বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে ছবি দেখাটা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার করে তুলেছেন। অর্থাৎ চিত্রগৃহের মালিকদের অনবধানতাই পৃষ্ঠপোষক কমিয়ে দিতে বাধ্য করেছে এবং ছবির বাজারকেও টেনে নিয়ে গিয়েছে বর্তমানের এই মন্দা অবস্থার মধ্যে। তাই দু'তিন বছর আগে ছবির যে আয় ছিলো এবং যতটা জনপ্রিয়তা সম্ভব ছিলো এখন তা

কমে গিয়েছে, মন্দার বাজার ধরলেও, আনুপাতিক সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশী।

আমাদের দেশে ছবির প্রভূত সংখ্যক বেশী পৃষ্ঠপোষকই হচ্ছে অতি অল্প রোজগেরে লোক। তাদের ছবি দেখার ঝোঁক যতই প্রবল হোক না কেন, আয়ের মাত্রাকে ছাপিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয় কিছুতেই। বর্তমান ব্যবস্থায় তাদের সাধ্যকে মানিয়ে যেতে পারে, অথচ তারা তাদের ঝোঁক মতো ছবি ক'খানি দেখে কুলিয়ে উঠতে পারে, তেমন পরিমাণ অল্প মূল্যের আসন মোটেই নির্দিষ্ট নেই। তারা তবু ঝোঁক মেটাচ্ছে, কিন্তু আংশিকভাবে বেশী দামের টিকিট কিনতে হচ্ছে বলে। ফলে তাদের পক্ষেও দু-তিন বছর আগের মতো সংখ্যক ছবি দেখা হয়ে উঠতে পারছে না—ছবির স্থায়িত্ব তথা আয়ও যে কমে যাবে, তাতে আর বিচিত্র কী?

আমাদের চিত্র-ব্যবসায়ীরা যে সর্ববিষয়ে সবরকম হিসেবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চিরকাল উল্টো রাস্তা ধরেই চলেন, বর্তমানের এই ছ' আনার টিকিট লোপ করে দেওয়ার প্রস্তাব তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেশীর ভাগ লোকের কাছে আজ ছবি দেখাটা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই ছবিঘরগুলিতে পৃষ্ঠপোষকের সমাগম হ্রাস পেয়ে গিয়েছে। তা রোধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, যাতে কম রোজগেরে লোকেদের অর্থাৎ আমাদের সস্তার দর্শক শ্রেণীর বেশীর ভাগ অংশ যাদের নিয়ে, তাদের পক্ষে ছবি দেখা সাধ্যে যাতে কুলিয়ে যেতে পারে, সে ব্যবস্থা করা অর্থাৎ কম দামের আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া। অন্যথায় তার ফলও হবে উল্টো। এটা তো সহজেই বোঝা যায় যে, ছ' আনার টিকিট লোপ করে দেওয়া মানে পৃষ্ঠপোষককে দশ আনার অর্থাৎ তার বরাদ্দের ডবল খরচ করতে বাধ্য করানো, তার মানে দুখানি ছবির জায়গায় তার পক্ষে একখানির বেশী দেখা সম্ভব হচ্ছে না। সেটা মন্দা অবস্থাকে আরো নীচের দিকেই টেনে নিয়ে যাবে।

কম দামের আসন কমিয়ে দিয়ে চিত্র-ব্যবসায়ীরা বাজারকে নিজেরাই মন্দা করে ফেলেছেন; আরও কমাতে যাওয়া তাঁদের আত্মহত্যারই সামিল হবে। এখন ছবির বাজারকে সুদৃঢ় করতে যাওয়ার প্রধানতম উপায় হচ্ছে যত বেশী সম্ভব পৃষ্ঠপোষক বাড়িয়ে যাবার সুযোগ করে নেওয়া, সেটা সম্ভব হবে কম দামের আসন বাড়িয়ে দিলে, কমিয়ে নয়।

শান্তারামের বাঙলা ছবি

পুরোপুরি সমর্থিত না হলেও কয়েকটি ইতস্তত ব্যাপার সংলগ্ন করে অনুমান করা বোধ হয় ভুল হবে না যে, বম্বের বিখ্যাত পরিচালক ভি শান্তারাম তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রাজকমল কলামন্দিরের হয়ে অতঃপর যে হিন্দী ছবিখানি তুলবেন, তার একটি বাঙলা সংস্করণও সঙ্গে সঙ্গে তুলে যাবার অভিপ্রায় করেছেন। কাহিনীটি অবশ্য ওধারেরেই একজনের লেখা, তবে বাঙলা সংলাপাংশ এখানকার কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিককে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হবে। তাছাড়া বাঙলা সংস্করণটির পরিচালনায় এখানকার একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি শান্তারামের সহযোগিতা করবেন বলে ঠিক হয়েছে।

নূতন ছবির পরিচয়

সমাপিকা (এ্যাসোসিয়েটেড পিকচার্স)—কাহিনীঃ নিতাই ভট্টাচার্য; গানঃ শৈলেন রায়; পরিচালনাঃ অগ্রদূত; আলোকচিত্রঃ বিভূতি লাহা; শব্দযোজনাঃ যতীন দত্ত; সুরযোজনাঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প নির্দেশকঃ সত্যেন চৌধুরী; ভূমিকায়ঃ জহর গাঙ্গুলী, বিপিন গুপ্ত, কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, ভূপেন চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, কালী সরকার, জয়নারায়ণ, শ্যাম লাহা, পরু মল্লিক, আদিত্য, ফণি বিদ্যাবিনোদ, আদল, পঞ্চানন, সুনন্দা, রেণুকা, সুপ্রভা প্রভৃতি।

ছবিখানি প্রাইমার পরিবেশনে ৩১শে ডিসেম্বর থেকে রূপবাণী ইন্দিরায় দেখানো হ'চ্ছে।

বাঙলা ছবির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অনুৎকর্ষের মধ্যেও গত বছর এককভাবে যে ক'খানি ছবি বাঙলা চিত্রশিল্পের মর্যাদাকে বরং বাড়িয়ে যেতে সক্ষম হ'য়েছে 'সমাপিকা' সেই কতিপয়ের অন্যতম। ছবিখানির কৃতিত্বে প্রথম উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে পরিচালক অগ্রদূত গোষ্ঠি সম্পর্কে তাদের ইতিপূর্বেকার ছবি 'স্বপ্ন ও সাধনা' তেমন একটি কিছু অবদান হ'য়ে ওঠেনি যাতে পাঁচজন বিশিষ্ট কলাকুশলীকে নিয়ে গঠিত এই অগ্রদূত গোষ্ঠিটি লোকের কাছ থেকে অভিবাদন পাবার যোগ্য হ'তে পারে। 'সমাপিকা'র পর কিন্তু তারা ধারণা বদলে দিতে পেরেছেন এবং সত্যিকারের প্রগতিশীল ও জন-অভিপ্রেত বিষয়বস্তু অবলম্বনে ছবি তোলায় তাদের যে দক্ষতা আছে তা তারা প্রমাণ ক'রেছেন।

কাহিনীটি হ'চ্ছে সাম্প্রতিক কতকগুলি প্রোজ্জ্বল প্রশ্ন নিয়ে যা দরিদ্র মানুষের

জীবনকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে রেখে দিয়েছে এবং যার ভিত্তি শোষণের দ্বারা সমৃদ্ধি লাভের সক্রিয় প্রতিবাদের ওপর। অনেক বিষয়ে অনেক কথা যা মানুষের মনে আজ গুমরে রয়েছে, দেশের ও সমাজের মঙ্গল এবং অমঙ্গল-কারী বিভিন্ন ধরণের চরিত্র যাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বলবার এবং চলবার জন্যে জনমন উদগ্রীব সেই সব একান্ত পরিচিত বিষয় ও ব্যক্তিই হচ্ছে কাহিনীটির উপাদান।

ছবির প্রথম দৃশ্যেই দেবীপুরের স্টেশনে কাহিনীর প্রায় সমস্ত মুখ্য চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে যায়। নায়িকা অজিতা এসেছিল পিতৃবন্ধু সাংবাদিক নিবারণবাবুকে নিয়ে যেতে। গেটের মুখেই তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায় নায়ক সশব্যস্ত আত্মভোলা শিবু ডাক্তারের সঙ্গে, যে এসেছে দেবীপুরের কুলী বস্তীতে ডাক্তারী করার জন্যে। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে তার সঙ্গে দেখা হয় ওখানকার বড় ডাক্তার ও লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মহেশ রায় আর স্থানীয় জমিদার রাধামাধবের পুত্র সুশোভনের সঙ্গে যে এসেছিলো ওখানকার স্কুলের পারি-তোষিক বিতরণ উপলক্ষে; অজিতা সেই স্কুলেরই শিক্ষয়িত্রী। এরপর আসছে অজিতা-দের বাড়ী আর তার পিতা যোগেশবাবু যিনি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে বাস ক'রছেন; সম্প্রতি 'শোষণ ও সমৃদ্ধি' নামক একটি পাণ্ডু-লিপি রচনা ক'রেছেন এবং সেই সূত্রে নিবারণ-বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এখান থেকে যেতে হ'চ্ছে দাতব্য চিকিৎসালয়ে যেখানে মহেশ ডাক্তার রোগীকে বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসার জন্যে নির্মমভাবে এমন পারিশ্রমিক চাইলেন যা গরীবের অসাধ্য। প্রত্যাখ্যাতদের মধ্যে শিউশরণ ওখানকার কম্পাউন্ডারের পরামর্শে শিবু ডাক্তারের কাছে যায়। সীজেরাইন অপারেশনের মধ্যে শিবু ডাক্তার একজন সহকারির সাহায্য চায়। শিউশরণ ছুটে চলে অজিতার সন্ধানে। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী উৎসব শেষে সুশো-ভন গানের জন্যে অজিতাকে প্রশংসা জানালে। ফিরতি পথে শিউশরণ অজিতাকে তার কথা জানালে এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে শিবু ডাক্তারের কাছে হাজির হ'লো। ওখানে গানের জন্য শিবু ডাক্তারের তীব্র শ্লেষ অজিতার জীবনপথের মোড় ঘুরিয়ে দিলে। মনে মনে অজিতা শিবু ডাক্তারকে গুরু বলে মেনে নিলে এবং নার্সিং শেখা সাব্যস্ত ক'রলে। বাড়ীতে ফিরে মহেশ, সুশোভন ও নিবারণকে তার পিতা বলছেন শুনতে পেলে যে অজিতার সঙ্গে বহুপূর্বে শিবব্রত রায় নামে এক মেধাবী ডাক্তারের বিয়ের কথা হ'য়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক কারণে শিবব্রত আন্দামানে নির্বাসিত হওয়ায় তা আর হয়ে ওঠেনি। অজিতা নার্সিং শিখতে কলকাতায় গেলো এবং রাধামাধবের বাড়ীতে গানের টিউশনী নিলে। নিবারণবাবু 'শোষণ ও সমৃদ্ধি' প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে দিতে ব্যর্থ হওয়ায় অজিতা নিজে প্রকাশকের কাছে যায়; দেখা গেল 'অগ্রগামী' প্রকাশকের মালিক সুশোভন এবং সে যোগেশবাবুর বইখানি প্রকাশের ভার নিলে। ইতিমধ্যে সুশোভন ও অজিতার মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে উঠলো। সুশোভনের মা চাইলেন অজিতাকে পুত্রবধূ করেন, সুশোভনও অজিতাকে ভালবাসে। অজিতা কিন্তু শিবব্রতের পরিচয় পেয়ে যায় এবং তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায় হয়তো ভালবাসাও। দেশে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন যুদ্ধ শুরু হয়। শোষক সম্প্রদায়ের তরফ থেকে মহেশ ডাক্তারকে প্রার্থী মনোনীত করা হয়, আর জনগণের প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়ায় অজিতা, শিবু ডাক্তারের আশীর্বাদ নিয়ে। পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে মহেশ ডাক্তার শিবব্রত ও অজিতার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করলে। কলকাতার পথে অজিতার পিছনে গুণ্ডা লাগলো। পালাবার পথে অজিতার সঙ্গে শিবব্রতের দেখা এবং সে তারই বাড়ীতে আশ্রয় নিলে। সেই গভীর দুর্যোগময় রাত্রে অজিতার প্রতি শিবুর অন্তরের সুপ্ত প্রেম উদ্ভাসিত হ'লো। দেবী-পুরে ফিরে আসতে মিথ্যা খুনের মামলায় মহেশ ডাক্তার শিবব্রতকে গ্রেপ্তার করাল কিন্তু অজিতার সাক্ষ্যে শিবব্রত ছাড়া পেয়ে গেলো। নির্বাচনের দিন অজিতারই নামে বিপক্ষ দলের গুণ্ডারা কুৎসা রটনা করাতে সুশোভন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফলে সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে মহেশ ডাক্তারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও শিবু ডাক্তার সুশোভনের ওপর অস্ত্রোপচার করে—শিবু ডাক্তার তখন জানতে পারলে সুশোভনের ভালোবাসার কথা, কিন্তু অজিতাকে ভুল বুঝলে। সকালে অজিতার বিজয় বার্তা এলো, সুশোভনও বিপদমুক্ত জানা গেলো, আনন্দের হাওয়া বয়ে গেলো। শিবু ডাক্তার তার জীবনের ব্যর্থতার চিন্তায় বিমূঢ়ভাবে পথ চলতে গাড়ী চাপা পড়ে গেলো আর যাবার সময় তার অসমাপ্ত কাজের ভার দিয়ে গেলো অজিতার ওপর।

সাম্প্রতিক বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ব'লে চরিত্র ও ঘটনাবলী দর্শক মনে আবেগ সৃষ্টি করে গিয়েছে আগাগোড়াই অনেকগুলি ভুলচুক থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু একটা কথা স্বীকার ক'রতে হবে যে কোন রকম সস্তা জিনিস দিয়ে লোককে আকর্ষণ করার চেষ্টা হয়নি কোথাও। প্রাণস্পর্শী সংলাপ; শোষণ, অসামাজিকতা ও দুরাচারিতার ওপর শ্লেষ ও সুসংযত বিদ্রূপ; বাস্তবানুগ ঘটনা এবং আদর্শবাদী ও সহৃদয় চরিত্রের সুস্থ সমাবেশ ছবিখানিকে জনসাধারণের মনোমত ক'রে তুলবে মনে হয়। ছবির কয়েকটি জায়গা অত্যন্ত বিসদৃশ লেগেছে সব চেয়ে বেশী—মুমূর্ষুকে অবজ্ঞা ক'রে সটান দাঁড়িয়ে শিবু ডাক্তার ও অজিতার মধ্যে সুদীর্ঘ সংলাপের [illegible] বিলাপ অশোভনীয়ভাবে যুক্তি ও ধৈর্যকে যেন থাপ্পড় মেরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অজিতা ও সুশোভনের পরস্পরের প্রেমের কথা ধারণা ক'রে নেবার পর শেষ দৃশ্যে অজিতাকে সুশো-ভনের কাছে ছেড়ে চলে যাওয়াই তো শিবু ডাক্তারের পক্ষে যথেষ্ট ছিলো, তারপরেও তাকে মোটরের তলায় ফেলে রাস্তার মাঝে নিশ্চুপ অলস জনতার সমক্ষে অজিতার বিলাপ দৃশ্য পর্যন্ত না এলেই বোধ হয় সুষ্ঠুতর পরিণতি হ'তো।

অভিনয়াংশ সমগ্রভাবেই প্রাণস্পর্শী। অজিতার ভূমিকাটি রূপায়িত করেছেন সুনন্দা; এটা তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলা যায়। দরিদ্রবৎসল, সেবাধর্মী অথচ তেজস্বিনী আদর্শ নারীত্বকে তিনি মূর্ত ক'রে তুলেছেন। শিবু ডাক্তার হচ্ছেন জহর গাঙ্গুলী, তারও এটা স্মরণীয় একটা কৃতিত্ব। এদের দুজনেরই অভিনয় সবচেয়ে দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে দুর্যোগময় রাত্রে শিবু ডাক্তারের আসল পরিচয় এবং তার সুপ্ত প্রেম অজিতার কাছে সম্পূর্ণ-রূপে ব্যক্ত হ'য়ে পড়ার দৃশ্যটিতে। প্রতিবাদ-এর নায়ক পূর্ণেন্দু তাঁর সম্পর্কে ধারণা বদলে দিতে পেরেছেন; ওতে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা দেখা গিয়েছিলো বর্তমান ছবিতে সুশোভনের ভূমিকায় তিনি তা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন। বিপিন গুপ্ত, জয়নারায়ণ, কালী সরকার, ভূপেন চক্রবর্তী ও শ্যাম লাহা তাদের অভিনয়প্রতিভার যথাযথ পরিচয় দিয়ে-ছেন। সুপ্রভা মুখোর্জিকৃত সুশোভনের মা প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। ছোট ছোট অন্যান্য সব ভূমিকাগুলিরই অভিনয়ে বেশ একটা সুসমঞ্জস পাওয়া যায়।

ছবির বিভিন্ন বিভাগের কলাকুশলীদের সমন্বয়ই হ'চ্ছে অগ্রদূত। সম্মিলিতভাবে তারা যেমন পরিচালনা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তেমনি কলাকৌশলের বিভিন্ন দিকেও অসাধারণত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। আলোকচিত্রে অবশ্য কয়েকটি দৃশ্য অতি সাধারণ হয়েছে এবং শব্দ গ্রহণেরও ত্রুটি কোথাও কোথাও পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্রের বিচারে তা উপেক্ষা করা যায়। শিল্প নির্দেশনায়ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। সর্ববিষয়েই অল্প-বিস্তর গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে একমাত্র সংগীতের দিকটা ছাড়া। প্রারম্ভে টাইটেলের প্রস্তাবনা সংগীতই মনকে মুষড়ে দেয়, গানের সুর বা আবহ সংগীতও কোনোরকমে চলনসই। গানগুলির রচনা ভালো, কিন্তু এতে একখানি ছাড়া কোনটিই সুপ্রযুক্ত হয়নি, তার ওপর প্রত্যেকখানিই গাইবার সময় ঠোঁটের অমিল বিরক্তিরই উদ্রেক ক'রেছে এর জন্যে দোষ অবশ্য পরিচালনারই।

যাই হোক বহু বিষয়েই 'সমাপিকা' একটি উল্লেখযোগ্য অবদান এবং তার জন্যে অগ্রদূত অভিনন্দন লাভ ক'রবেন।

ট্রুম্যানের নয়া বিধান

নতুন বছরের গোড়ায় গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে মার্কিন কংগ্রেসের সম্মুখে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট উপস্থাপিত করেছেন। ডলারের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের আয়তন দেখে ঘাবড়ে যাবারই কথা। এবার বাজেটে মোট আয় ধরা হয়েছে ৪০৯৮ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার—আর ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪১৮৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। সুতরাং এটি ঘাটতি বাজেট এবং ঘাটতির পরিমাণ ৮৭ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার। এই ঘাটতি নিয়ে অবশ্য উদ্বেগের কোন কারণ নেই। বর্তমান পৃথিবী যে অব্যবস্থিত দুর্দশার মধ্য দিয়ে চলেছে এবং তার দরুণ আমেরিকাকে যেভাবে ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে, তাতে এ ঘাটতি আদৌ আশংকাজনক নয়। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বার্লিনে বিরোধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে বিমান ব্যয় হয়েছে, তারই তো পরিমাণ ৭।৮ কোটি ডলার। আগামী বৎসরেও এই ধরণের অপ্রত্যাশিত ব্যয়ভার বহনের জন্যে আমেরিকাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। বর্তমান বছরে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে, তার অর্ধেকেরও বেশি ব্যয়িত হবে দেশরক্ষা ও বিদেশে সাহায্য প্রেরণের খাতে। এই দুটি খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হল ২১০০ কোটি ডলার। আগামী বৎসরে ইউরোপ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় সাহায্যের খাতে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৫০ কোটি ডলার—চলতি বৎসরে এ ব্যয়ের মোট পরিমাণ ৪৬০ কোটি ডলার হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ যেভাবে জড়িয়ে পড়েছে তাতে এই ধরণের ব্যয়-বরাদ্দ করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। বিশ্বের নেতৃত্ব করতে হলে তার জন্যে এ ধরণের মূল্য দিতে হবে বৈকি! দেশরক্ষার খাতে যত ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিকালীন বাজেটে তার তুলনা পাওয়া যায় না। এর ফলে আমেরিকার জাতিগঠনমূলক কাজ স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হবে। কিন্তু এ ছাড়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের গত্যন্তরই বা ছিল কই ? যুদ্ধোত্তর পৃথিবী আজ সুস্পষ্ট দুটি-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—কম্যুনিজম আজ আত্ম-প্রসারে দৃঢ়সংকল্প। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তি কয়টির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া হবে এবং সেই পথে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। এ অবস্থায় আমেরিকাকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী নিয়ে তৈরী থাকতে হবে বৈকি। তবে নিছক সামরিক শক্তির দ্বারা কম্যুনিজমের গতিরোধ করা যাবে কিনা—সে হল অন্য কথা।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে বাজেট উপস্থাপিত করেছেন তাকে মোটামুটি তাঁর পূর্বগামী প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নব-বিধানের অনুগামী বলতে পারি। অবশ্য দুইটি ক্ষেত্রে পরিবেশের বিভিন্নতা আছে অনেকখানি। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যখন তাঁর অর্থনৈতিক নববিধান প্রবর্তন করেছিলেন তখন আমেরিকা প্রায় অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের সম্মুখীন হয়েছিল—জিনিসপত্রের দাম পড়ে গিয়েছিল, বেকার সমস্যা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পণ্যে বাজার ভর্তি থাকলেও জনগণের ক্রয়-শক্তি ছিল না। বর্তমানেও আমেরিকা অর্থনৈতিক ব্যাধিবিমুক্ত নয়—তবে সে ব্যাধির স্বরূপ ভিন্ন। আজ আমেরিকায় চলেছে ইনফ্লেশনের যুগ। এই ইনফ্লেশনের সংকট মুক্ত হতে হলে মার্কিন শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আজ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন শিল্পপতিরা এই নিয়ন্ত্রণ প্রথার বিরোধী। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ডেমোক্রাটিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাব্লিকান দলও ছিল নিয়ন্ত্রণ প্রথার বিরুদ্ধে। তাই রিপাব্লিকান দলের পিছনে মার্কিন শিল্পপতিরা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, রিপাব্লিকান দল নির্বাচনে হেরে গেছে এবং প্রতিনিধি পরিষদে ও সেনেটে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী ট্রুম্যান আজ নিজের কর্মনীতি বাস্তবে পরিণত করতে দৃঢ়-সংকল্প। আমরা তাঁর বাজেটের মধ্যে সেই ইঙ্গিতই দেখতে পেলাম। ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর অধিকতর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, বাজেট ঘাটতি আংশিকভাবে পূরণ ও ইনফ্লেশন দূরীকরণের জন্যে শিল্প বাণিজ্যের উপর অধিকতর করনির্ধারণ—এই বাজেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে মার্কিনশিল্প-ব্যবসায়ীদের মধ্যে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশা করি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এতে দমবেন না। তিনি গত চার বৎসর কাল প্রেসিডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও কংগ্রেসে তাঁর ডেমোক্রাটিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। তাই তাঁকে আমরা একাধিক বার বলতে শুনেছি যে রিপাব্লিকান দলের বাধা দানের ফলে তিনি তাঁর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারছেন না। এবার আর সে অজুহাত চলবে না। তাঁর মধ্যে কতটা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আছে তাঁর এবারের কার্যক্রম থেকেই আমরা তার প্রমাণ পাব। আরম্ভটা তিনি ভালই করেছেন—এখন শেষরক্ষা হলেই হল।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের কূট-নীতিই সাময়িকভাবে বিজয়ী হয়েছে বলা চলে। ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে স্বস্তি পরিষদ প্রথম থেকেই যে দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে আসছেন তাতে এই পরিণতি যে ঘটবে তা প্রায় জানা কথা। পুলিশী ব্যবস্থার নামে ডাচরা ইন্দোনেশিয়ায় যে দস্যুবৃত্তি করেছে তাতে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও তারা ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। ফলে ডাচরা নিজেদের অন্যায় লোভকে সংযত করার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি। স্বস্তি পরিষদের যুদ্ধবিরতির নির্দেশ সত্ত্বেও ডাচরা সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘটায় নি। তারা তাদের সুবিধা মত যাভা ও সুমাত্রায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার সম্পূর্ণ করে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে এবং এখনও যুদ্ধ-বিরতির ছদ্মাবরণে রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে নিজেদের পুলিশী কার্যক্রম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। রিপাব্লিকের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেবার যে নির্দেশ স্বস্তি পরিষদ দিয়েছেন সে নির্দেশও প্রতিপালিত হয় নি। একথা স্পষ্টভবে ডাচ প্রতিনিধি ডাঃ ভ্যান রোয়েন স্বস্তি পরিষদের নিউ ইয়র্ক অধিবেশনে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে বর্তমান অবস্থায় ইন্দোনেশিয়ার জতীয় নেতৃবৃন্দের অবাধ গতিবিধি নতুন বিপদ সৃষ্টি করতে পারে বলে তাঁদের সুমাত্রার অদূরে বাঙ্কা দ্বীপে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। একদিকে স্বস্তি পরিষদে ইন্দোনেশিয়া প্রসঙ্গ নিয়ে চলেছে আলোচনা, অপর দিকে রণক্ষেত্রে ডাচরা সমগ্র ইন্দোনেশিয়া গ্রাস করে চলেছে। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের প্রতিনিধিরা স্বস্তি পরিষদের আলোচনায় জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশিয়ার প্রতি প্রচুর মৌখিক সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ডাচদের অন্যায় অভিযান বন্ধ করার জন্যে একটু চেষ্টা তাঁরা করেন নি। এরই নাম হল কূটনীতিক ন্যায় বিচার।

অন্যায় সামরিক আক্রমণের পক্ষে ইন্দোনেশিয়া বিজয় প্রায় সম্পূর্ণ করে ডাচ প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ড্রীস গেছেন ইন্দোনেশিয়ায় শান্তির বাণী বহন করে। তাঁর ইন্দোনেশিয়া গমনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তিনি ইন্দোনেশিয়ায় ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গঠন সম্বন্ধে আপোষ আলোচনার জন্যে গেছেন। এ আপোষ আলোচনার অর্থ কি তা বুঝতে কারও বিলম্ব হবে না। এ আপোষ আলোচনার অর্থ হল সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার বুকে ডাচ

সাম্রাজ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা আংশিকভাবে হস্তান্তর করার ইচ্ছাও যদি ডাচদের থাকত, তবে তারা বহুপূর্বেই শান্তিপূর্ণ পথে রিপাব্লিকের সঙ্গে একটা আপোষরফা করতে পারত। কিন্তু তা তারা করে নি। সুতরাং তারা চায় যে ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে তারা যে তাঁবেদার রাষ্ট্রের সৃষ্টি করবে—ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীরা তাকেই স্বীকার করে নিক। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ যারা একবার পেয়েছে তারা যে ডাচদের এই ছেলে ভুলানো খেলায় ভুলবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে অচল অবস্থা পূর্বের মতই থেকে যাবে। পাশ্চাত্যের স্বার্থবাদী শক্তিপুঞ্জ যে ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা সমাধানে আদৌ ইচ্ছুক নয়, গত মাসখানেকের ঘটনা থেকে আমরা তা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীরা স্বস্তি পরিষদের কাছ থেকে কোন ন্যায় বিচারই প্রত্যাশা করে না। স্বার্থবাদী শক্তিপুঞ্জের পরোক্ষ সমর্থনে ডাচরা আপাততঃ বিজয়ী হলেও তাদের এ বিজয়কে আমরা আদৌ চূড়ান্ত বলে মনে করি না। একজন জাতীয়তাবাদী দেশ প্রেমিকও যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তিতে থাকতে পারবে না। আমরা ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের এই সামরিক বিজয়ের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার আগামী অশান্তির বীজই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেটা তো প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন হল যে কোন প্রকারে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সাম্রাজ্যবাদের অবসান। আমাদের চোখের উপরে ডাচ সাম্রাজ্যবাদ যদি এইভাবে বিজয়ী হয়, তবে সেটা সমগ্র এশিয়ার পক্ষে হবে অশুভ সূচক। এশিয়ার বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন বিলুপ্ত করতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে ডাচ সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় সাধনে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীদের সর্বাংশে সাহায্য করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই পণ্ডিত নেহরু দিল্লীতে এশিয়ার জাতিপুঞ্জের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছেন। এই সম্মেলনের ফলাফলের উপর ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করছে। সমগ্র এশিয়া তাই আজ দিল্লীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। আমরা আশা করি এই সম্মেলন থেকে ডাচদের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান বন্ধ করার জন্যে একটা কার্যকরী পন্থার উদ্ভাবন সম্ভব হবে।

ইঙ্গ-ইস্রাইল বিরোধ

গত ৭ই জানুয়ারী তারিখে কয়েকটি ইস্রাইলী জঙ্গী বিমান কর্তৃক কয়েকটি বৃটিশ বোমারু বিমান ভূপাতিত করার ব্যাপার নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বৃটিশ পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, বৃটিশ বিমানগুলি মিশর-ইসরাইল সীমান্তে পর্যবেক্ষণ কার্যে রত থাকার সময় মিসরীয় ভূমির উপর ইসরাইলী জঙ্গী বিমানবহর সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ও অতর্কিতে এই আক্রমণ চালিয়েছিল। অপর দিকে ইসরাইল রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে যে, বৃটিশ বিমানগুলি আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করে যুদ্ধমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে ইসরাইলের সীমা অতিক্রম করেছিল বলেই ইসরাইলী বিমানবহর তাদের উপর আক্রমণ চালাতে বাধ্য হয়েছিল। এ ব্যাপারে কোন পক্ষের দোষ বেশী তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। তবে কূটনৈতিক দিক থেকে এ ব্যাপারে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইতিমধ্যেই বিশ্বের দরবারে হতমান হয়েছেন। তাঁরা এ সম্বন্ধে ইসরাইল গভর্নমেণ্টের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইস্রাইলের রাষ্ট্রনায়করা সে প্রতিবাদ এই বলে অগ্রাহ্য করেছেন যে, ইস্রাইল আজ পর্যন্ত রাষ্ট্র হিসাবে বৃটেনের স্বীকৃতি যখন পায়নি—তখন ইসরাইলের কাছে সরাসরি প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কোন আইনগত অধিকারই নেই বৃটেনের। তাঁরা বলেন যে, এ আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্যে বৃটেনই দায়ী এবং তাঁরা সরাসরি এ সম্বন্ধে স্বস্তি পরিষদের কাছে বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে বৃটেন যে কর্মপন্থার অনুসরণ করেছে সে সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে ও খাস বৃটেনেও পত্র পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

ইঙ্গ-ইসরাইল বিরোধের এই কারণ আজও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। মিশর-প্যালেস্টাইন সীমান্তে বৃটিশ বিমানবহর কি করতে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে বৃটিশ বিমান দপ্তর থেকে কোন সন্তোষজনক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ইসরাইল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই নয়া রাষ্ট্রকে ভাল চোখে দেখেন নি। তার একমাত্র কারণ বৃটিশদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি। মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ। এর সঙ্গে বৃটিশদের তৈলস্বার্থ গভীরভাবে বিজড়িত। মিশর, ট্রান্সজোর্ডান প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বৃটিশদের যে সব বিশেষ চুক্তি সে সব চুক্তি বর্তমানে এই সব দেশের মনঃপূত না হইলেও বৃটিশরা এক তরফাভাবে নিজেদের স্বার্থের খাতিরে এই সব চুক্তির উপর বিশেষ জোর দেয়। প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যেহেতু আরব জগৎ সন্তুষ্ট হতে পারেনি— তাই বৃটিশ গভর্নমেণ্টও আরব জগৎকে সন্তুষ্ট করার আশায় এই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে আসছেন। প্যালেস্টাইন নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন মতবিরোধ অত্যন্ত তীব্র ও স্পষ্ট। সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের প্যারী অধিবেশনে প্যালেস্টাইন সম্পর্কিত নীতি সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিন আপোষ হয়ে যাওয়ায় আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে, অতঃপর হয়তো প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে এ দুটি রাষ্ট্রের মতবিরোধ দেখা দেবে না। এখন দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের সে আশা ফলপ্রসূ হবার নয়। এই নতুন ইঙ্গ-ইসরাইল বিরোধের পরিণতি কি হবে বলা শক্ত। বিমান ভূপাতিত করার ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশদের মর্যাদা অনেকখানি কমে গেছে বলে মনে হয়। বৃটিশ বিমান দপ্তরের ঘোষণায় প্রকাশ যে, আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্যে সংগ্রাম করতে পারে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট বৃটিশ বৈমানিকদের নির্দেশ দেওয়া ছিল। তা সত্ত্বেও তারা ইহুদীদের কাছে পরাজিত হয়েছে। তা ছাড়া একজন আহত বৃটিশ বৈমানিক তেল আভিভে স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের বিমানবহর ইসরাইল সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। আরও প্রকাশ যে, বৃটিশরা ট্রান্সজোর্ডানের সাহায্য করার নামে মধ্যপ্রাচ্যে অধিক সৈন্য ও নৌবাহিনী আমদানী করেছে। এদিকে আবার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সালিশীর মাধ্যমে রোডসে মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে নতুন যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। প্যালেস্টাইনে বৃটিশ নীতি নিয়ে আজ খাস বৃটেনেও অসন্তোষ ও বিক্ষোভের অভাব নেই। আমাদের মনে হয় যে, বৃটেন যদি সরাসরি ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে না চায় তবে তাকে অবিলম্বেই নিজের প্যালেস্টাইন নীতি সংশোধিত করতে হবে।

১৬-১-৪৯
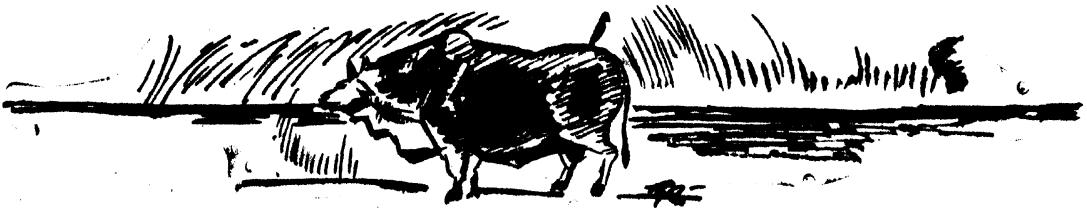
আপনার গাড়ীর জন্য এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে…
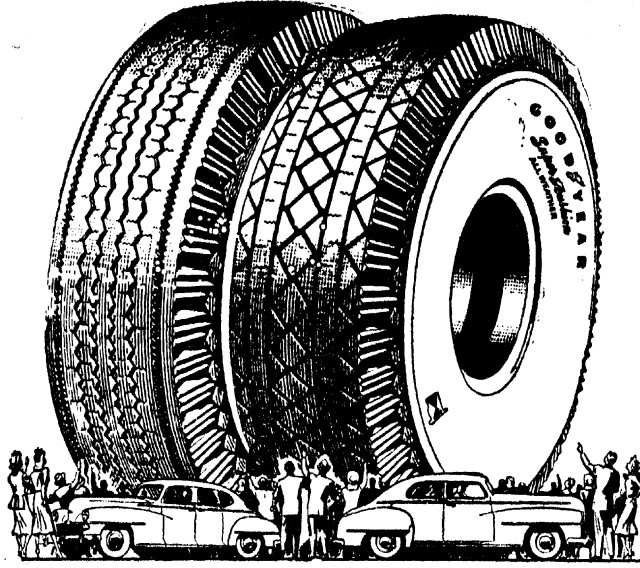
সম্পূর্ণ নূতন কম-চাপের টায়ার !

আধুনিকতম মডেলের গাড়ীসমূহ বিশেষ বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক, নূতন সুপার-কুশনগুলি অধিকতর বড় ও নরম এবং ঐগুলিতে অধিকতর বায়ু ধরে।

নূতন বা পুরাতন আপনার যে রকম গাড়ী হউক না, উহাদের সকলের পক্ষেই ইহা অত্যাশ্চর্য কাজ দিবে। আপনার গুডইয়ার ডীলারের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

নূতন Super Cushion

প্রস্তুতকারক

GOODYEAR

সমগ্র পৃথিবীতে অন্য কোন মেক-এর চাইতে গুডইয়ার টায়ারই অধিক লোক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অভিনেত্রী

ইলিয়া এরেনবুর্গ

লিজা বেলোগোরেন্দকায়াকে হঠাৎ একদিন জানানো হলো যে তাকে ফ্রন্টে যেতে হবে। শুনে আনন্দে তার আঁখিদুটি জলে ভরে উঠল। অনেকদিন ধরে এটাই সে চাইছিল। কিন্তু সত্যিকারের আদেশ আসার পর তার মনে একটা সন্দেহের উদয় হলো। সারা দেশে যখন যুদ্ধের দামামা বাজছে, বেতার মারফৎ কত নগরীর ধ্বংস কাহিনী প্রচারিত হচ্ছে, শিশু হত্যার নারকীয় কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে, তখন কি কল্পিত প্রিয়ার স্বগতঃ উক্তি কারো ভাল লাগবে? "মানবের সমস্ত জীবন যখন অন্ধকারে আছে ঢেকে তখনই আমি সর্বপ্রথম উপস্থিত হচ্ছি সাধারণের সম্মুখে" লিজা তার ডায়রীতে লিখল।

ক্ষুদ্র একটি শহরে তাদের প্রথম অভিনয় আরম্ভ হল। শহরটি ছিল অত্যন্ত নিরালা—কিন্তু শরণার্থীদের আগমনে তা হয়ে উঠেছে জনাকীর্ণ। জীবনের পথে তারা যেন এখানে এসে বাসা বেঁধেছে, ভুলে যেতে চেষ্টা করছে আপন অতীতকে। তাদের কোন-না-কোন আত্মীয় ফ্রন্টে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। ডাকপিয়নের পদধ্বনি তাদের কাছে ভাগ্যদেবতার পদধ্বনির মত মনে হচ্ছে। সেনাদল পশ্চাদপসরণ করছিল। পার্টির নগর কমিটির সামনে দাঁড়িয়ে হাজারো লোক একান্তভাবে যুদ্ধের বৃত্তান্ত শুনছিল। বাড়ীর মেয়েরা ওদিকে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করতে লেগে গিয়েছিল সর্বস্ব পণ করে।

যে প্রেক্ষাগৃহে লিজা অভিনয় করল সেখানে সাধারণত পুরনো ধরণের বিয়োগান্ত নাটক আর মেলো-ড্রামা নাটক অভিনয় হতো। নানা প্রশ্ন জাগতো লিজার মনে। পাদপ্রদীপের ঔজ্জ্বল্য, মেক-আপ, নায়িকার উক্তি, "ভালবাসতে পারলে তুমি অজর...অমর...", প্রভৃতি সব কিছুই তার কাছে ব্যর্থ মনে হত, তাকে লজ্জিত করে তুলত। অভিনয়ে অবসর পেলেই লিজা গিয়ে দর্শকদের সঙ্গে মিশে তাদের আলাপ আলোচনা শুনত। দর্শকরা খাওয়ার সমস্যা, আহত স্বামীপুত্রের কথা, জার্মানদের কথা আলোচনা করত। লিজা সেখান থেকে ধীরে ধীরে চলে যেত তার অন্ধকার কুঠরীতে। নানা বয়সের স্ত্রীলোকের মাঝে বসে সে লিখত আপনার ডাইরী: "আর যে নিজেকে ছলনা করতে পারি না।"

এখনও কেন সে অভিনয় করছে? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার জন্যে একান্তভাবে চিন্তা করতে লাগল। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তার যুক্ত থাকার কারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়—এ হচ্ছে আর্টের প্রতি একটা অন্ধ শ্রদ্ধা। ওর মা ওকে এসব ছেড়ে দিতে বলতেন, কিন্তু লিজা তা পারত না। মাঝে মাঝে নিজেকে মনে হত এ্যানা কারেনিনা অথবা টুর্গেনিভের "য়্যাসিয়া" অথবা চলচ্চিত্রের অন্ধ ফুল-বালিকার মত। ওকে সবাই উদাসীন আর নিস্পৃহ বলে মনে করত। এ নিয়ে চিন্তা করে সে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। নীল-নয়না এই ক্ষুদ্র অভিনেত্রীর জগতে আপনার বলতে কেউ ছিল না। ওর মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। বন্ধুরা ওর কাছে বড় একটা ঘেঁষত না। কারণ ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে ওরা অসোয়াস্তি অনুভব করত। যুদ্ধের আগে জনৈক ইঞ্জিনীয়ার ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেন। লিজার ইঞ্জিনীয়ারকে ভাল লেগে যায়। বোধ হয় রাতের অন্ধকার, জেসমিনের মৃদুসৌরভ আর যৌবনু মদিরা তার মনকে প্রেম-অভিসারিকা করে তোলে। ইঞ্জিনীয়ার ওর হাতদুটো তুলে নিতেই হাত ছাড়িয়ে ও অন্য আলোচনা আরম্ভ করে দেয়। 'এ-ও অভিনয়।' মনে পড়তেই তার ভারী হাসি পেল। এর পরে ওদের আর সাক্ষাৎ হয়নি।

অভিনয় করে বলে নিজেকে সে বহুবার তিরস্কার করেছে। রঙ্গমঞ্চের প্রতি অভিসম্পাত দিয়েছে। কিন্তু যখনই সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছে, তাকিয়েছে প্রেক্ষাগারের দিকে তখনই ভুলে গেছে সব কিছু।

সবাই বলত যে ওর ভিতর প্রতিভা রয়েছে—একদিন ও সত্যিকারের অভিনেত্রী হয়ে উঠবে। কিন্তু লিজার মনে হত অভিনেত্রীর সব গুণ ওর নেই। নিজের অভিনয়াংশ সম্বন্ধে যত সে ভাবত, ততই সে মূল অভিনয় থেকে দূরে সরে যেত। মাঝে মাঝে সে পরিচালককে দোষারোপ করত। নানা অংশে অভিনয় করতে দিত ওকে। কখনও তাকে প্রেমিকা যুবতীর ভূমিকায়, আবার কখনও তাকে প্রচারিকা নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হত। প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করতে যেয়ে তার মনে হত যে প্রেমের কোন অস্তিত্ব নেই। জগত আজ ভিন্ন ধরণের বীর দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে। নানা বিপরীত চিন্তাধারা লিজার মনকে আলোড়িত করত। তারই প্রকাশ হত তার ডাইরীতে: "জীবন আজ এমন দুর্বহ হয়ে উঠেছে যে সেখানে আর্টের কোন ঠাঁই নেই।

এবার তাকে ফ্রন্টে যেতে হবে। সে হাটিতে লাগল। তার অজ্ঞাতে ওষ্ঠে ফুটে উঠল হাসি। ভাবতে লাগল সে: "এ কি সত্য? মহান আর নিষ্কলুষ মানুষের মনে ক্ষণিকের জন্য হলেও আমি কি আনন্দ দিতে পারব।"

দারুণ উত্তেজনার মধ্য দিয়া অভিনেতারা যাত্রা করল। এসে তারা উপস্থিত হল গন্তব্য স্থানে। যে বর্ণনা এতদিন তারা পড়েছে খবরের কাগজে, তাই চোখে পড়তে লাগল তাদের—সে-ই ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহ, আগুনেপোড়া গাছপালা, বরফে কালোদাগ এবং ভস্মের মধ্যে মাতাপুত্রের মৃতদেহ। কোনমতে রক্ষা পাওয়া একটা কুটীরে তারা আশ্রয় নিল। ভাঙা বাড়ী—তারই পাশে বসেছিল ব্যথাদীর্ণ এক নারী। গালদুটো ভেঙে গেছে তার—চোখ বেরিয়ে এসেছে। লিজাদের দেখে বেরিয়ে এলো সে—বলতে লাগল মর্মন্তুদ এক কাহিনী: "ওদের ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম ছেলেকে বরফের পেছনে, কিন্তু জমে যাবার ভয়ে বাড়ী নিয়ে এলাম। এমনি সময় ঢুকল এসে কতকগুলো জার্মানপশু। ঢুকেই হুকুম দিল আমাদের বেরিয়ে যাবার। আমি তাকে ঘরে ঢুকতে বাধা দিলাম। আমাকে সরিয়ে দিয়ে ছেলের মাথায় আঘাত করল। ছুটে গেলাম ছেলের কাছে—কিন্তু ততক্ষণে ওর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।..." চুল্লীর আগুন খুঁচিয়ে দিতে দিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল মহিলাটি। সব দেখেশুনে লিজা ভুলে গেল সব। এই ব্যথাতুর আবেষ্টনীতে সব কিছুই গেল নিঃশেষে মিলিয়ে। উত্তপ্ত কুটীরের জীর্ণ শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে সে ভাবছিল: "আর হাসি কিংবা কথা নয়—এবার বন্দুক ধরতে হবে।" পরদিন প্রাতে চোখে পড়ল তার মৃতদেহ, ভাঙ্গা মোটর-গাড়ী আর বিকলাঙ্গ ঘোড়া। স্ট্রেচারে করে আহতদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তার সম্মুখ দিয়ে। নীরবে তারা তাকিয়েছিল উন্মুক্ত শীতের আকাশের দিকে। দেখে দেখে মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ সে গায়ক বেলস্কিকে জিজ্ঞেস করল: "আমরা কেন এসেছি এখানে? ওরাতো দুদিনেই আমাদের তাড়িয়ে দেবে।"

স্কুল ভবনে যন্ত্র সঙ্গীতের আয়োজন হল জার্মানরা এটাকে অস্ত্রাগার হিসাবে ব্যবহার করেছিল। অভিনেতাদের সাজঘরে টমিগান খালি টিন আর জার্মানদের নথিপত্র ভরা ছিল লিজা তার তুলোভরা কামিজ আর ফেল্ট বু খুলে লম্বা রেশমী গাউন পরল। শুষ্ক ওষ্ঠে

রঙ লাগাতে বারবার তার হাত কেঁপে যাচ্ছিল। কিন্তু সত্যিকারের ভয় থেকে সে যে অভিনয় করল তা দর্শকদের মোহিত করল। তারা একান্ত একাগ্রতার সঙ্গে অভিনয় দেখতে লাগল। দর্শকদের প্রায়ই স্যাপার্স বাহিনীর লোক। গতদিনও তারা 'মাইনের' সন্ধানে বরফে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরেছে। অভিনয় করতে গিয়ে লিজা কেমন নার্ভাস বোধ করতে লাগল। প্রেম ও আনুগত্যকে সে গালি দিতে লাগল। পার্ট করতে করতে হঠাৎ সে বুঝতে পারল যে, ঐ সব দাড়ি-না-কামানো, শীর্ণ লোকগুলি তার প্রতিটি কথা গিলছে। ওরা হাততালি দিয়ে ওকে প্রশংসা জানাচ্ছিল। প্রত্যুত্তরে ও শুধু ম্লান ও অসহায়ের হাসি হাসছিল। অভিনয় শেষে বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে সে উপস্থিত হল। বেল্‌স্কির প্রশ্নের জবাবে ও বলল, "জানিনা ঠিক...বোধহয় কোন ভুল হয়নি।"

এরপর বিমানঘাঁটি, হাসপাতাল আর বনের মাঝে ওদের অভিনয় হল। সাইরেনের কর্কশ ধ্বনিতে প্রায়ই অভিনয় বন্ধ করে দিতে হচ্ছিল। যুদ্ধের অনেক কিছুই সে দেখে নিল। বোমা-গুলি কি করে ফাটে সে-ও দেখল। চট্‌চটে কাদায় শুয়ে থাকতে কেমন লাগে তা ও জানতে পারল। ট্রেঞ্চে রাত্রি কাটাতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। কামানের গুলীর শব্দ তার কাছে ঘরের গোলমালের মত সহজ হয়ে উঠল। কোন মোটা এক জেনারেলের সঙ্গে সে মদ্যপান করল। মদ্য-পান করতে করতে জেনারেল বলছিলঃ "জান, থিয়েটার দেখেত আমি খুব ভালবাসি? সার্লোভিস্কে যতগুলি নূতন নাটক অভিনীত হয়েছে সবই আমি দেখেছি।" গোল্ড স্টার পদক-প্রাপ্ত জনৈক তরুণ বৈমানিক লিজাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে বলল, "তোমায় দেখলে আমার মানসীর কথা মনে পড়ে।"

একদিন যুদ্ধক্ষেত্রের শেষ অভিনয় রজনী শেষে লিজা মেজর ডোরোনিনের সঙ্গে নিজের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছিল। যুদ্ধের আগে ডোরোনিন রসায়নের ছাত্র ছিল। পথ চলতে চলতে তারা বসন্তকাল, টলস্টয় জীবনের শৈশবকাল সম্বন্ধে আলাপ করতে লাগল। নীরবতা তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করছিল বলেই তারা আলাপ করছিল।

মাত্র চারদিন তাদের পরিচয়। ডোরোনিন অভিনেতাদের থাকার জায়গা করে দিয়েছিল—সে থেকেই ওদের আলাপ। ও দেখতে তেমন সুন্দর না হলেও ওকে লিজার ভাল লেগে গেল। এ সম্বন্ধে লিজা চিন্তা করেছে। নিজের মনেই বলেছে, "ওর মত তো অনেককেই দেখেছি...।" পরক্ষণেই নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলেছে, "না, না, ওর মত আর কাউকে আমি আগে দেখিনি। অবশ্য দেখতে ও খুব সাধারণ, তাছাড়া অভিনেতাও নয়। তবু ওর মধ্যে কি যেন বৈশিষ্ট্য আছে। "তোমাকে যদি লিজা বলি, নিশ্চয় তুমি আমার উপর রাগ করবে না?" যখন ও একথাগুলি বলছিল তখন কি সুন্দরই না ওকে দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ডোরোনিন বলল, "তাহলে কাল তুমি চলে যাচ্ছ?" প্রত্যুত্তরে লিজা শুধু ওকে চুম্বন করল। কক্ষচ্যুত তারার মত কালো আকাশে সবুজ আলোর ঝলক দেখা গেল।

ঘরে ফিরে লিজার কাছে সব কিছুই অদ্ভুত আর অপরিচিত মনে হল। কারো কোন কথা শুনতে তার ভাল লাগছিল না। "নাঃ, আজকের বিজ্ঞপ্তিতে কোন সংবাদই নেই। কোন শহরই দখল হয়নি।" জনৈক অভিনেতার এই উক্তি শুনে লিজা জ্বলে উঠল ঃ "একথা বলতে তোমার লজ্জা হল না। হাজার লোক সেখানে লড়াই করছে আর মরছে, সে কথা জান না?" থিয়েটার কেমন যেন প্রাণহীন হয়ে উঠছিল, দর্শকরা বিরক্তি অনুভব করছিল, দর্শকদের আনন্দ ধ্বনিতে তেমন প্রাণ ছিল না আর। অভিনয় শেষ হবার আগেই চলে যাবার জন্য তারা অস্থির হয়ে উঠত কোট নেবার জন্য। অথচ এদেরকে কি ভাবেই না কল্পনা করেছে লিজা!

ডোরোনিনের সংবাদ নেই অনেকদিন। ও কি লেখে তা দেখবার জন্যে লিজার প্রথমে কোন পত্র দিতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু তারপরেই মনে হল, বোধ হয় ও খুব কাজে ব্যস্ত তাই পত্র দিতে পারছে না। নিশ্চয় ওরা শত্রুর দিকে এগুচ্ছে, ভাবল লিজা। তাই নিজের অন্তরের সমস্ত আবেগ, উচ্ছ্বাস ও ভাব গোপন রেখে ছোট্ট এক পত্র দিল ডোরোনিনকে। আবেগমণ্ডিত হলেও তিক্ততাময় এক জবাব এল। লিজা রাগে চিঠিটা কুটি কুটি করে ফেলল। ডোরোনিন লিখেছে যে, জীবন হচ্ছে অদ্ভুত। যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচয় বলেই পরস্পরকে ভাল লেগেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তাকে ওর অত্যন্ত সাধারণ মনে হবে। কারণ, সে অভিনেত্রী—সম্মুখে তার ঝঞ্ঝাসঙ্কুল জীবন—আর সে, মানে ডোরোনিন হবে সাধারণ রসায়নবিদ, অবশ্য বুলেট বা মাইন যদি বাধা সৃষ্টি না করে।"

চিঠি পড়ে লিজার ইচ্ছে হল তার মন থেকে ওর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেয়। কি হবে আর ওর কথা ভেবে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল, "নাঃ, ও ঠিকই বলেছে। অভিনয় করতে গিয়ে ভাবাবেগে ভেসে গেছি। বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করার মত সামর্থ্যও আমার ছিল না।" কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল, "ও আমাকে ভালবাসে না বলেই ওসব লিখতে পেরেছে। মরার অভিনয় করা আর মরা যে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস আজই তা উপলব্ধি করলাম।" সপ্তাহকাল ধরে তার মধ্যে চলল এমনি অন্তর্দ্বন্দ্ব। তারপর ওকে লিখল আবেগভরা এক পত্র। নিবেদন করল তার প্রতি ওর প্রেম। লিখলঃ "তুমি যদি চাও তবে অভিনয় আমি পরিত্যাগ করব। আর্ট ছেড়েও আমি বাঁচতে পারব, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে নয়......" চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলেই শঙ্কায় সে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। "অভিনয় করার সুযোগ হারালাম চিরজীবনের জন্য," আপন মনে বলল লিজা।

জবাবের প্রতীক্ষায় রইল সে অনেকদিন। অনিশ্চিত একটা ভয় আর আনন্দের মধ্যে যে চিঠি সে ডাকে দিয়েছিল, তাই ফিরিয়ে দিল ডাকহরকরা অতি শান্তভাবে। তারই লেখা খামের এক কোণে লেখা রয়েছে যে প্রাপক আর ঐ ইউনিটে নাই। অসাড় হয়ে পড়ে রইল সে সারাদিন। সেদিনের অভিনয় হল তার অতি নীচুস্তরের। সব কেমন যেন ঘুলিয়ে গিয়েছে তার। সে বুঝতে পেরেছে যে, ডোরোনিন আর বেঁচে নেই। জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। তার চলাফেরা, খাওয়াদাওয়া এমন কি অভিনয়ও অবাস্তব বলে মনে হল।

পরে পিয়ন তাকে আর একটা চিঠি দিয়ে গেল। সে পড়তে লাগলঃ "প্রিয় কমরেড, তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দেব। তোমার ফিয়াসে মেজর ডোরোনিন আমাদের হাসপাতালে মারা গেছেন। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে আমরা যথাসাধ্য করেছি—কিন্তু কঠিন আঘাত পেয়ে-ছিলেন তিনি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি। তোমাকে পত্র দেবার জন্য তিনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন। তার হাতঘড়িও তোমাকে পাঠাতে বলে গেছেন। বৃদ্ধা হয়েছি—সন্তানের দুঃখে মনটা কেঁদে উঠছে। তোমার এই দুঃখের সময় কাছে থাকতে পারলাম না বলে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করছি।"

লিজা দুদিন বাড়ি থেকে বেরুল না অসুস্থ বলে সবাইকে জানিয়ে দিল। তৃতীয় দিন বেরিয়ে এমন এক অংশে অভিনয়ে অবতীর্ণ হল, যা সে কোনদিন পছন্দ করে নি লিজার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অভিনয় করতে করতে সে যখন বলতে লাগল, "ভাল বাসতে পারলে পৃথিবী তোমার বশে আসবে তোমার মৃত্যু হবে না কোনদিন।" শুনে সমস্ত দর্শক বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল। তারপর তারা ভয়ানকভাবে তাকে অভিনন্দিত করল। টেবে মাথা, বিষণ্ণবদন ডিরেক্টর বললেন, "লিজা, তুমি এবার সত্যিকারের অভিনেত্রী হয়ে উঠেছ।"

বাড়ি ফিরে সে, অপরিচিতার পত্রখানা হাজারোবার পড়ল। তারপর ডোরোনিনের ঘড়ির দিকে তাকাল। কাঁটাটা ধীরে ধীরে ঘুরছিল। হঠাৎ তার মনে হল, "বোধ হয় অভিনয় করাই আমার বিধিলিপি।"

অনুবাদক—মৃত্যুঞ্জয় রায়

কলিকাতায় পণ্ডিত জওহরলালজীর সভায় তাঁর ভাষণ সহজে শুনিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের

নাকি Audition apparatus দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "এই যন্ত্রটি গভর্নমেণ্টকে দেওয়ার ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল সকলের আগে, কেননা বধিরতা রোগটা তাদের বেশী" —মন্তব্য বলা বাহুল্য বিশুখুড়োর।

* * * *

রাষ্ট্রপাল রাজাজী ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে বলিয়াছেন,—"চরিত্রই সবচেয়ে মূল্যবান।"

"কিন্তু এই পণ্যটির চাহিদা একদম নেই বলে ব্যবসায়ীরা বহুদিন আগেই এটিকে বস্তাবন্দী করে গুদোমে ফেলে রেখেছে"—বলিলেন খুড়ো।

* * * *

DELHI is in the grips of cold spell —একটি সংবাদ। কাশ্মীরের সঙ্গে দিল্লীর সংযুক্তির জন্য এই শীতের প্রচণ্ডতা অনুভূত হইতেছে কি না বলা শক্ত।

* * * *

TITLES for sale under Finish Government—
একটি সংবাদ।

"আমরা কি হারাইতেছি ভারত সরকার তা জানেন না"—বিজ্ঞাপনী ভাষায় মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, গান্ধীজীর মৃত্যু-বার্ষিকীতে কেহ যেন কোন বক্তৃতা না দেন। **এই নির্দেশ কাহারও কাহারও পক্ষে মৃত্যুর সমানই হইবে!**

* * * *

এলাহাবাদের এক জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন,—দুই হাজার দুইশত টাকা ব্যয়ে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি তৈরীর ব্যবস্থা হইতেছে।

খুড়ো বলিলেন,—"অতটা কি সইবে, তার চেয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যাতে ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে যেতে না হয় সে ব্যবস্থা করে দিলেই আমরা খুশী।"

* * * *

মহিষাদলের একটি মৎস্য প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী সভায় বাঙলার প্রদেশপাল ডাঃ কাটজুর হাতে একটি আধমণী জীবন্ত মৎস্য

দেওয়া হয়। তিনি স্মারক চিহ্ন হিসাবে মৎস্যটির গলায় একটি সুতো বাঁধিয়া দেন এবং পরে তাকে জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

শ্যামলাল বলিল,—"মাছটাকে ধরে রাখার উদ্বোধন হলেই বরং আমরা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আশান্বিত হতে পারতাম।"

* * * *

মস্কোর এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে এক ব্যক্তির Heart নাকি Stomachএর স্থানে এবং Stomach Heartএর স্থানে চলিয়া যায়।

"আজকালকার দিনে Hearty meal পেতে হলে এ রকম পরিবর্তনই বাঞ্ছনীয়"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * * *

এলাহাবাদের সংবাদে জানা গেল সেখানে একদিন নাকি দুইটি উড়িষ্যাবাসীকে একটা গাছের ডালে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের নামানো যায় না। শেষে একজন হঠাৎ ডাল হইতে পড়িয়া গেলে সঙ্গীটিও বাধ্য হইয়া নামিয়া আসে। তাদের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কেহই বুঝিতে পারেন নাই।

আমরাও প্রথমে পারি নাই। খুড়ো আমাদের বুঝাইয়া বলিলেন,—এরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা দেখার জন্যে আগে থেকেই গাছের ডালে স্থান করে নিয়েছিল, সেখানেও স্টেডিয়াম নেই কি না!

* * * *

রাজাজী অন্য এক সম্মেলনে বলিয়াছেন,—"আধুনিক ডাক্তারের শিক্ষা-দীক্ষা আমার নেই, তবু মুখ দেখলেই আমি রোগের কথা বলে দিতে পারি এবং পারি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।" খুড়ো মন্তব্য করিলেন—"আশা করি, রাজাজী আমাদের জন্য হাতুড়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাটি করবেন না।"

* * * *

"FACES cannot be made beautiful by the application of lipstick and cosmetics"—
এই উক্তিও রাজাজীর।

এ কথার প্রতিবাদ করার অধিকার যাদের তারা অ-বলা!

* * * *

কলিকাতা করপোরেশনের বাজেট সভার একটি সংবাদ—No provision for "new works." খুড়ো বলিলেন,—"সে আর কি হবে, পুরনো কাজই যে অনেক জমা হয়ে আছে!"

সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লানের পূতাস্থি পুনর্গ্রহণ অনুষ্ঠান

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের পক্ষ হইতে সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লানের পূতাস্থি গ্রহণ করেন। চিত্রে—সন্ন্যাসীদ্বয়ের পূতাস্থিপূর্ণ মঞ্জুষা হস্তে পণ্ডিত নেহরুকে দেখা যাইতেছে

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদ্বয়ের পূতাস্থি গ্রহণ অনুষ্ঠানে নানা দেশের বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। উপরের ছবিতে ভুটানের প্রতিনিধিদিগকে দেখা যাইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে ভুটান রাজপরিবারের লোকও আছেন

দেশী সংবাদ

১০ই জানুয়ারী—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হয়। এই অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের ব্যবস্থাসমূহ কার্যকরী করিতে এবং জয়পুর কংগ্রেস অধিবেশনে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যসূচী বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে কংগ্রেসের সকল প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের সহযোগিতা আহবান করা হইয়াছে। শ্রমিকদের সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি বিশ্লেষণ করিয়া আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীরাজাগোপালাচারী বোম্বাইয়ে ভারতীয় বণিক সভার হলে মহাত্মা গান্ধীর একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বক্তৃতাপ্রসংগে দ্রব্যমূল্যের স্থিতি বিধান সম্পর্কিত ভারত সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করেন। রাষ্ট্রপাল বলেন যে, ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি হইল দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস করা। বর্তমানে মূল্যস্তরে দ্রব্যমূল্যের স্থিতি বিধানের অভিপ্রায় সরকারের নাই এবং বর্তমান মূল্যস্তর বজায় রাখিতেও তাঁহারা চাহেন না।

মাদ্রাজের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রী জি এ নটেশন ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১১ই জানুয়ারী—মুন্সীগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, গত ৭ই জানুয়ারী রাত্রে টংগীবাড়ী থানার অধীন ময়না গ্রামের কামাখ্যাচরণ চৌধুরীর বাড়ীতে ডাকাতি করার কালে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ইহার ফলে উক্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন বাস্তুত্যাগ করিতে শুরু করিয়াছে।

ইন্দোনেশীয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্নমেণ্ট ২০শে জানুয়ারী এশিয়া সম্মেলনের জন্য বিভিন্ন দেশকে যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, তন্মধ্যে ১২টি দেশের গভর্নমেণ্ট এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১২ই জানুয়ারী—ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লানের পূতাস্থি বহন করিয়া ভারতীয় নৌবহরের স্লুপ "তীর" অদ্য কলিকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে আগমন করিয়াছে।

কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া অদ্য মাদ্রাজে অন্ধ্র মহাসভার সম্বর্ধনার উত্তরে বলেন যে, একই ভাষাভাষী লোক লইয়া একাধিক প্রদেশ গঠন করা চলিতে পারে—কিন্তু বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক লইয়া একটি প্রদেশ গঠন করা চলে না।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কররাও দেও বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট ইস্তাহার প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে অগোণে গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করার জন্য কংগ্রেস কর্মীদিগকে নির্দেশ দিয়া ইস্তাহারে কতকগুলি প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৩ই জানুয়ারী—আজ প্রাতে গংগাতীরে অবস্থিত ভারতীয় স্লুপ "তীর" হইতে পশ্চিমবংগের প্রদেশপাল ডাঃ কে এন কাটজু এক মাংগলিক ও ভাবোদ্দীপক অনুষ্ঠানে ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় শ্রীসারিপুত্ত ও মহামোগ্‌গল্লানের পূতাস্থি গ্রহণ করেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আজ বিমানযোগে কলিকাতায় আগমন করিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। লাটপ্রাসাদে সাংবাদিকগণের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসংগে পণ্ডিত নেহরু আসন্ন এশিয়া সম্মেলন সম্পর্কে বলেন যে, এই সম্মেলন আহবানের পশ্চাতে ইউরোপীয় দেশসমূহ অথবা আমেরিকার বিরুদ্ধে এশিয়া ব্লক গঠন করিবার কোন কল্পনা নাই। পূর্ববংগের আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই সমস্যার একমাত্র প্রকৃত সমাধান হইতেছে, তাহাদের দেশে ফিরিয়া গিয়া স্ব গৃহে বাস করা।

বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি এবং অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ে তিন দিনব্যাপী আলোচনার পর আজ করাচীতে ভারত-পাকিস্থান সম্মেলন শেষ হয়।

১৪ই জানুয়ারী—অদ্য কলিকাতা গড়ের মাঠে এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় অর্হৎ সারিপুত্র ও মহামোগ্‌গল্লানের পূতাস্থি ভারতের মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হস্তে অর্পণ করেন।

১৫ই জানুয়ারী—লেঃ জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা অদ্য জেনারেল বুচারের স্থলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। লেঃ জেনারেল কারিয়াপ্পা ভারতের প্রথম ভারতীয় প্রধান সেনাপতি।

১৫ই জানুয়ারী—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য প্রাতঃকালে ব্যারাকপুরে ভাগীরথীর তীরে গান্ধীঘাটের উদ্বোধন করেন। পণ্ডিতজী তৎপূর্বে গান্ধীঘাটের নিকটে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বোধিদ্রুম চারা রোপণ করেন।

কাশ্মীর কমিশনের গত ১৩ই আগস্টের প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে অদ্য উভয় ডোমিনিয়নের সেনাপতিগণ নয়াদিল্লীতে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক বৈঠকে সমবেত হন। সম্মেলনে যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে তিনটি প্রধান বিষয়ে মতৈক্য হইয়াছে।

দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার ২৭১ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার "মহাজাতি সদন বিল" নামে যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার মর্ম আজ প্রকাশিত হইয়াছে। বিলের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাড়াতাড়ি জমি এবং তদুপরি মহাজাতি সদন নামে সাধারণ্যে পরিচিত অসমাপ্ত ইমারত দখল, মহাজাতি সদনের নির্মাণ কার্য সমাপ্তকরণ, উহার পরিচালনা ও ব্যবহার এবং একটি ট্রাস্টী বোর্ড গঠনের বিধান এই বিলে করা হইয়াছে।

১৬ই জানুয়ারী—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বার্দোলীতে এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসংগে ডারবানের মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সর্দারজী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ভারত স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয়রা এক দূর দেশে নির্যাতিত হইতেছে।

জব্বলপুরে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশ সীমান্তে নর্মদা তীরবর্তী বোরাস গ্রামে মকরসংক্রান্তি মেলায় ভূপাল রাজপুলিশের বেপরোয়া গুলীচালনার ফলে দশজনের অধিক লোক নিহত ও আড়াইশতাধিক লোক আহত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১১ই জানুয়ারী—কম্যুনিস্টদের সহিত যুদ্ধ শেষ করিবার উদ্দেশ্যে চীন গভর্নমেণ্টের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ আজ সর্বসম্মতিক্রমে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির আবেদন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১২ই জানুয়ারী—"নিউইয়র্ক টাইমস"এর নানকিংস্থিত সংবাদদাতা তিয়েনসিনের আত্মসমর্পণের খবর দিয়াছেন।

নানকিংএর বিশ্বস্ত মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, পতনোন্মুখ নানকিং গভর্নমেণ্ট একটি মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইসেকের অনুমোদন লইয়া ভাইস প্রেসিডেণ্ট শীঘ্রই শান্তি আলোচনার জন্য কম্যুনিস্টদের সহিত প্রথম সরকারী সংযোগ সাধন করিতে পিপিং গমন করিবেন।

প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারীভাবে মন্তব্য করিতে গিয়া বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দ্বারা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা দেখা দিয়াছে। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া উচিত বলিয়া বৃটিশ সরকার মনে করেন।

অদ্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার দীর্ঘ সময়ব্যাপী এক বৈঠক হয় এবং এই সময় প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃটিশ মন্ত্রিসভায় মতদ্বৈধের সম্ভাবনা লইয়া নানারূপ জল্পনাকল্পনা চলিতে থাকে। কোন এক পত্রিকার সংবাদে বলা হয় যে, মিঃ আর্নেস্ট বেভিনের মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিরুদ্ধে অর্থসচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার কতিপয় সদস্য "বিদ্রোহ" করিয়াছেন।

১৫ই জানুয়ারী—ডারবানের সংবাদে প্রকাশ, ডারবান শহরে ভারতীয় ও আফ্রিকানদের মধ্যে দুই দিন ব্যাপী দাংগার ফলে তিনশত লোক নিহত হইয়াছে। গত রাত্রে একখানি চলন্ত বাসের মধ্যে জনৈক ভারতীয় স্টোরকীপার এবং জনৈক আফ্রিকানের মধ্যে কলহের ফলে এই দাংগা আরম্ভ হয়। দাংগা বিস্তার লাভের সংগে সংগে দলবদ্ধ আফ্রিকানগণ শত শত ভারতীয়কে আক্রমণ করিয়া ধ্বংসলীলা চালাইতে থাকে। ভারতীয়দের শত শত গৃহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র আফ্রিকান উন্মত্ত হইয়া ভারতীয়গণের সমগ্র পরিবারকে গৃহমধ্যে হত্যা করিয়াছে। শত শত ভারতীয় গৃহহীন হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে জাতিবিদ্বেষের ইহা প্রচণ্ডতম অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তি।

বৃটিশ বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উত্তর চীনের বৃহত্তম শিল্প শহর তিয়েনৎসিনের পতন ঘটিয়াছে।

১৬ই জানুয়ারী—চীনের রাজধানী নানকিং-এর ১১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত পেংপু শহর কম্যুনিস্ট সৈন্যদল কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

ক্রিকেট

ক্রিকেট খেলার জয়পরাজয় অনেকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে—দলের শক্তির উপর নহে, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল এলাহাবাদের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পূর্বাঞ্চলের খেলায়। পূর্বাঞ্চলের জয়লাভ যে সম্পূর্ণ ভাগ্যের জয়, ইহা অন্য কেহ স্বীকার না করিলেও আমরা ইহা না বলিয়া পারি না। উভয় দলের খেলোয়াড়গণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল বোলিং, ব্যাটিং ফিল্ডিং সকল বিষয়েই পূর্বাঞ্চল দল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শক্তিশালী দলের জয়লাভ ছিল সুনিশ্চিত, কিন্তু ফল দেখা গেল অন্যরূপ। পূর্বাঞ্চল দল ১০ উইকেটে জয়ী হইল। এমন কি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে প্রথম ইনিংস ১১৮ রাণে শেষ করিয়া "ফলো অন" পর্যন্ত করিতে হইল। অথচ ইহার পূর্বে এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলই ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত দলকে পর পর দুইটি টেস্ট খেলায় "ফলোঅন" করিতে বাধ্য করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের বিপর্যয় সৃষ্টি করিলেন এমন দুইজন বোলার গিরিধারী ও গাইকোয়াড়, যাঁহাদের এইবারের কোন টেস্ট খেলাতেই ভারতীয় দলের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মনোনীত করা হয় নাই। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় ইনিংসেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ইনিংস ১৮৪ রাণে শেষ হইল কেবলমাত্র সুটে ব্যানার্জির মারাত্মক বোলিংয়ের জন্য। অথচ এই খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে অপর কয়েকটি খেলায় যোগদান করিয়া কি বোলিং কি ব্যাটিং কোন বিষয়েই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বর্তমান বাঙলার খেলোয়াড় বি ফ্রাঙ্ক অনায়াসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে শতাধিক রাণ করিয়া দলের রাণসংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করেন। ইনিও পূর্বের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে খেলিয়া সুবিধা করিতে পারেন নাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলেই বলা চলে যে, পূর্বাঞ্চল দল সৌভাগ্যবলে জয়ী হইয়াছেন। তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পূর্বাঞ্চল দল ভারত ভ্রমণকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে প্রথম পরাজিত করিয়া ভ্রমণ ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিলেন। ইহা ভারতীয় ক্রিকেট উৎসাহীদের আনন্দের ও গর্বের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, যুক্তপ্রদেশ ক্রিকেট ইতিহাসে এইরূপভাবে বৈদেশিক ক্রিকেট দলকে বিপর্যস্ত হইতে ইতিপূর্বেও দেখা গিয়াছে। ১৯৩৩ সালে জার্ডিন পরিচালিত এম সি সি দলকে কাশীতে যুক্তপ্রদেশ দলের সহিত খেলিয়া ১০ রাণে পরাজয় বরণ করিতে হয়। ১৯৩৫—৩৬ সালের যুক্তপ্রদেশ দল ১৩৭ রাণে ইনিংস শেষ করিয়া রাইডারের পরিচালিত অস্ট্রেলিয়া দলকেও মাত্র ৮৯ রাণে ইনিংস শেষ করিতে বাধ্য করে। ১৯৩৭—৩৮ সালে লর্ড টেনিসন দলকেও প্রথম ইনিংসের খেলায় যুক্তপ্রদেশের দলের পশ্চাতে পড়িতে হয়। এই সকল ঘটনা বর্তমান থাকিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের শোচনীয় পরাজয় পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইল ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

খেলার বিবরণ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জয়ী হইয়া পূর্বাঞ্চল দলকে ব্যাটিং করিবার অধিকার দেয়। সারাদিন ব্যাট করিয়া পূর্বাঞ্চল দল ৬ উইকেটে ২৪৫ রাণ করে।

বি ফ্রাঙ্ক ১২৩ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। গিরিধারী ১৬ রাণ ও জগদীশলাল ২১ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের ৪০ মিনিট পূর্বে পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ২৯৮ রাণে শেষ হয়। গডার্ড ৫৪ রাণে ৪টি ও জোন্স ৫৫ রাণে ৪টি উইকেট দখল করেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া চা-পানের পাঁচ মিনিট পূর্বে ১১৮ রাণে ইনিংস শেষ করে। গিরিধারী ৩১ রাণে ৫টি ও গাইকোয়াড় ৪০ রাণে ৫টি উইকেট পান। পূর্বাঞ্চল দল ১৮০ রাণে অগ্রগামী হইয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে "ফলো অন" করিতে বাধ্য করে। দিনের শেষে ২ উইকেটে ৫১ রাণ হয়। ওয়ালকট ৩৭ রাণ ও গডার্ড ৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়গণ পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আপ্রা[ণ] চেষ্টা করেন। কিন্তু সুটে ব্যানার্জির বল বিশে[ষ] কার্যকরী হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের অল্প পরেই ১৮[৪] রাণে ইনিংস শেষ হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইনিং[স] পরাজয় হইতে কোনরূপে অব্যাহতি পায়। পূর্বাঞ্চ[ল] দলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ করিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১০ উইকেটে পরাজিত হয়।

পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস:—২৯৮ রাণ (বি ফ্রাঙ্ক ১২৩, পি রায় ৩৮, গিরিধারী ৩১, জগদীশ লাল ৩৩, জোন্স ৫৫ রাণে ৪টি, গডার্ড ৫৪ রাণে ৪টি ও ট্রিম ৪০ রাণে ২টি উইকেট লাভ করে)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস:—১১৮ রা[ণ] (কেরু ২০, গোমেজ ১৯, ওয়ালকট ১৮, গাইকোয়া[ড়] ৪০ রাণে ৫টি ও গিরিধারী ৩১ রাণে ৫টি উইকে[ট] পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস:—১৮৪ রা[ণ] (ওয়ালকট ৪৩, গোমেজ ৪৩, ক্রিশিয়ানী ৩[..] সুটে ব্যানার্জি ৬৭ রাণে ৭টি উইকেট পান)।

পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস:—৬ রাণ (কো[ন] আউট না হইয়া), (সুটে ব্যানার্জি ৬ রাণ ন[ট] আউট)।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ষোড়শ বর্ষ
শনিবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৫৫

Saturday, 29th January, 1949

মহাত্মা-তর্পণ সংখ্যা

সেই পরম সত্যকে আমি জানিয়াছি। আদিত্যবর্ণ পরম পুরুষের সত্তাকে আমি একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়াছি—অন্ধকার আর নাই। মৃত্যুকে আমি অতিক্রম করিয়াছি'—ভারতের তত্ত্বদর্শী সাধকগণের উদ্গীত এই অভয় মন্ত্র আজ আমরা অনুধ্যান করিব। জাতির জনক, আমাদের সকলের পিতা মহামানব গান্ধীজীর বিয়োগ-বেদনাকে আমরা ভুলিতে চেষ্টা করিব। মহামানব যাঁহারা, তাঁহারা মৃত্যুর অতীত। কাল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারা কালজয়ী। মৃত্যুর পথে তাঁহারা অমৃতত্বেই অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন এবং মৃত্যুতে তাঁহাদের বিজয়-লাভই ঘটিয়া থাকে। ৩০শে জানুয়ারী, গান্ধীজীর তিরোভাব-তিথিতে মৃত্যুঞ্জয়ী সেই মানব-দেবতাকে আমরা বন্দনা করিব।

আততায়ীর অস্ত্র মহাত্মাজীর ন্যায় মহামানবকে আঘাত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের দিব্য-জীবনের মহিমাই তেমন আঘাতে প্রদীপ্ততর হইয়া উঠে। বিড়লা ভবনে এক বৎসর পূর্বে গান্ধীজীর অঙ্গে যে অস্ত্র বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে আহত করিতে পারে নাই। রাজঘাটে যমুনার কূলে অস্তগামী সূর্যের ঈষদালোকে সে সন্ধ্যায় যে চিতার আগুন জ্বলিয়াছিল, অনির্বাণ জীবনের বীর্যময় প্রেরণাই আজও তাহা সঞ্চার করিতেছে। ৩০শে জানুয়ারীর সে রাত্রির দুর্যোগময় অন্ধকার গান্ধীজীর অভয় হাস্যকে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। সে হাসি প্রেতের বিভীষিকা দূরে করিয়াছে। বাপুজীর অভাবের বিয়োগ-বেদনাকে জ্যোৎস্না ধারায় ভাসাইয়া দিয়া সে স্নিগ্ধ স্মিত ছন্দ আমাদের দুর্বলতা নাশ করিয়াছে। উদার হাস্যময় সেই মহান্ পুরুষের দিব্যলীলার অভয় এবং আপ্যায়নই আজ আমরা সকল অন্তর দিয়া গ্রহণ করিব।

আপনাকে যে আত্মোপলব্ধির অনাহত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই, আঘাত তাহার পক্ষেই সত্য। পক্ষান্তরে আপনাকে যিনি হারাইয়াছেন, সকলকে যিনি আপনার করিয়া জানিয়াছেন, কে তাঁহাকে আঘাত করিবে? তাহার পক্ষে পর কোথায়? নিজের মর্ত্যদেহকে পরার্থে তিনি উৎসর্গ করেন। তিনি দেহের

মহাত্মা গান্ধীকী জয়

সীমাকে অতিক্রম করিয়া আত্মমহিমায় সকলের অন্তর-রাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। যুগে যুগে এমন মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহারা প্রাণময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্ব-মানবকে আজও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন। প্রভাস ক্ষেত্রের বেলাভূমিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মর্ত্যলীলা সম্বরণ করেন, তখন অর্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, অর্জুন শোক করিও না। আমি যাইতেছি না, জগতের সকলের হইয়া থাকিবার জন্যই আমি দেহ উৎসর্গ করিতেছি। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, জগতের সেবার জন্যই আমার এই দেহ। এই দেহ তাহাদিগকে পরম কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করুক। প্রেমের দেবতা যীশু মানব-মঙ্গল ব্রতে ক্রুশ কাষ্ঠে দেহ দান করেন। দানের ভিতর দিয়া তাঁহার মহাপ্রাণতার প্রভাবে তিনি আজও বিশ্বের অন্তর-রাজ্য অধিকার করিয়া আছেন। ইঁহাদের মৃত্যু সত্য নয়—অমৃতত্বই সত্য। আমরা অমৃতের অধিকারী মহামানব গান্ধীজীর মহিমাই আজ কীর্তন করিব।

গান্ধীজীর মৃত্যু নাই। তিনি আমাদের নিকট হইতে দূরেও নহেন। এই দূরত্ববোধ ভ্রান্তি মাত্র। ভারতের তত্ত্বদর্শী সাধকদের প্রদর্শিত পথে আমরা সেই নৈকট্য একান্ত করিয়া লইব। গান্ধীজীর গভীর প্রীতি এবং প্রেমের কথা ভাবিব। সে প্রেম সত্য এবং নিত্য। ঋষিদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা আজ পবিত্র ঋক্‌মন্ত্রে প্রার্থনা করিব, "সূর্য ও চন্দ্র প্রেমের পথেই বিচরণ করিতেছেন। আমরাও সেই শুভ পথে চলিব। যিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়াও পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে কল্যাণ দান করেন; যিনি দূর দেশে বাস করিয়া আমাদের মঙ্গল সাধন করেন, তাঁহাকে নিকটে আনিব। যিনি অজ্ঞাতলোকে থাকিয়াও আমাদিগকে অনুদিন একান্ত স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন, অহিংসার পথেই আমাদিগকে জানিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা মনে-প্রাণে মিলিত হইব।" আমাদের এ সাধনা সত্য হোক।

বাপুজীর সমগ্র জীবনের সাধনা আমাদের অন্তরে নিত্য সম্বন্ধে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। আমরা কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? আমরা ভুলিলেও সে স্নেহ, সে প্রেমের প্রভাব অনাহতই থাকিবে। ভুলিতে চাহিলেও ভোলা যাইবে না। মানব-মঙ্গলময়, কাব্যময় এবং ছন্দোময় জীবনের সে আপ্যায়ন অমোঘ বীর্যেই জাতিকে সঞ্জীবিত করিবে। কার্পণ্যহীন সে দানের লাবণ্য ভারতের আত্মার শতদলে উচ্ছল এবং উজ্জ্বল হইয়াই ফুটিবে। গান্ধীজীর করুণা রাত্রিকে মধুময় করিবে। তাঁহার মৈত্রীর পরম মাধুরীতে আমাদের ঊষাকাল মধুময় হইবে, পৃথিবীর ধূলি, আকাশ এবং জাতির পিতৃপুরুষগণ সকলেই বৈদিক সত্যের মূর্তিতে মধুর হইয়া উঠিবেন। নিন্দা, ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের মনের প্রসারতা বৃহত্তর হইবে। আমরা মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইব। দিব্য জীবনের ইহাই ধর্ম। গান্ধীজী আমাদিগকে মানবতার নূতন ধর্মে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই জ্ঞানদাতা গুরুর চরণে শির নত করিতেছি।

অন্ধকার এখনও চারিদিক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। হিংসার আগুন দিক-চক্রবালে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ভারতের আত্মা কি জাগিবে না? জগতের এই দুর্যোগ সন্ধিক্ষণে গান্ধীজীর আবির্ভাব এক বিচিত্র এবং বিস্ময়কর ব্যাপার। চারিদিকে হিংসার আবর্ত উঠিয়াছে, বিদ্বেষের আগুন প্রেতের বিভীষিকা ছড়াইয়া চারিদিকে পাক খেলিয়াছে, ঘাতকের অস্ত্র গর্জিয়াছে, নির্দোষের অশ্রু বহিয়াছে, ধ্বংসের এমন ভৈরব তাণ্ডবলীলাকে উপেক্ষা করিয়া কৌপীন-সম্বল ভারতের মহামানব একা আর্তরক্ষাব্রতে অবিচল স্থৈর্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অদ্বিতীয় তিনি, আত্মমহিমায় তিনি অনপেক্ষ। তিনি বিশ্ববাসীকে প্রেমের বাণী, অহিংসার কথা শুনাইয়াছেন। তিনি প্রাণ-মহিমায় সকলকে পবিত্র জীবনের পরম মাধুর্যে আকর্ষণ করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। অচঞ্চল নির্ভীক, উদার

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ—" **শিল্পী: বিনায়ক মাসোজি**
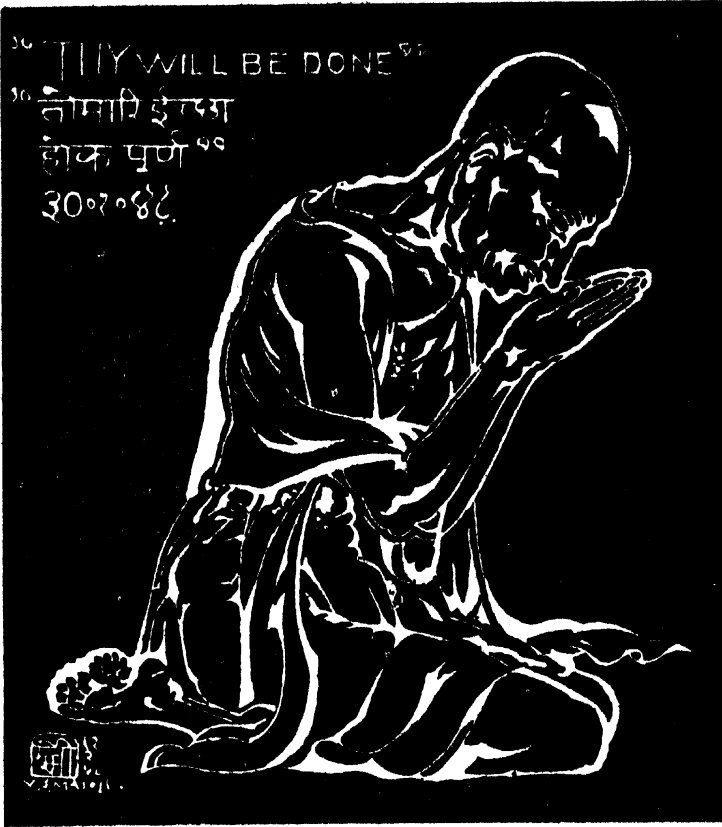
কণ্ঠের সে ধ্বনিতে সূর্য, চন্দ্র বুঝি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সব বিপর্যয়ের মধ্যেও বিরাট সেই পুরুষের প্রাণশক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছে। অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। অনৈক্যের ভিতর ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভারতের সর্বত্যাগী এই মহামানবের স্নিগ্ধ দেহের তপঃশুদ্ধ প্রভাবে অসুরও আত্মস্থ হইয়াছে। হিংস্র শ্বাপদ মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা নত করিয়াছে। নিতান্ত যে অবিশ্বাসী, তাহার মনেও বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"। বাপুজীর জীবনব্যাপী সত্যাগ্রহ এই তত্ত্বকে পরিস্ফূর্ত করিয়াছে। সত্যের মহিমায় প্রদীপ্ত সেই সত্যসংগ পুরুষ আজ আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

মহাপুরুষগণের আবির্ভাব যেমন বিচিত্র, তাঁহাদের তিরোভাবও অপরিম্লান প্রাণের মাধুর্যের প্রাচুর্য-প্রভাবে তেমনই পরিব্যাপ্ত। এমন জীবনের ঘাটতি নাই, ক্ষয় নাই। গান্ধীজীর তিরোভাব জগতের ইতিহাসে এই বিশিষ্টতা লইয়া স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। গান্ধীজী বীরের জীবন যাপন করিয়াছেন এবং বীরের মৃত্যুই তাঁহার কাম্য ছিল। বীরের মৃত্যুই তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন। যে সত্যকে তিনি সমগ্র জীবনে অবলম্বন করিয়াছিলেন, আত্মোৎসর্গের অনির্বাণ মহিমায় এবং অমৃতত্বের অমোঘ ছন্দে বিশ্ব-মানব-চেতনায় তিনি তাঁহার স্পন্দন প্রজ্ঞানঘনতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। জীবন-শিল্প-সাধনায় এই কুশলতত্ত্ব পরিস্ফুট দুর্বল লাভ করিতে পারে না। এদেশের সাধকেরা বলিয়াছেন, তৃষ্ণা শূন্য না হইলে এমন কৌশল জীবনে জাগে না। তৃষ্ণা রহিত ইঁহারা কুশল। ইঁহারাই প্রবল। গান্ধীজীর জীবন শিল্প-সাধনায় এই কুশলতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার প্রাণ-মহিমা অমর মৃত্যু বরণের পথে ব্যাপ্ত জীবনে বিস্তারী বিপুল কল্লোল তুলিয়াছে; সকল গণ্ডি সব সীমাকে অতিক্রম করিয়া তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এমন জীবন কে কোথায় অস্বীকার করিবে? কে এমন মৃত্যুঞ্জয়ী দেবতার অর্চনায় অর্ঘ্য আহরণ না করিবে?

গান্ধীজীকে আমরা হারাইয়াছি, একথা ভুলিব। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের বিচিত্র ছন্দোময় গতির ভিতর দিয়া তাঁহার দিব্য জীবন-লীলাকেই আমরা বড় করিয়া দেখিব। সুপ্ত ভারতের আত্মাকে তিনি জাগাইয়াছেন। ভারতের আত্মনিষ্ঠ সাধনা, ভয়কে অতিক্রম করিয়া জয়লাভ করিবার যে যোগ আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম; গান্ধীজী সেই পুরাতন যোগকে নূতন করিয়া আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনে জাগ্রত করিয়াছেন। আমরা পরাধীনতার চাপে পশুত্বের প্রভাবে নির্জিত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। পশুবলের দ্বারা যাহা সম্ভব হইত না, গান্ধীজীর অহিংসার সাধন-সম্পদে তাহা সম্ভব হইয়াছে। সূচীভেদ্য অন্ধকারের রাজ্যে সহস্র সূর্যের প্রভা বিদীর্ণ হইয়াছে। এ জ্যোতি নিভিবে না। গান্ধীজীর পবিত্র চরিত্রের পরম মাহাত্ম্য আমাদের ভবিষ্যতের আলোক হইয়া থাকিবে। অমৃতলোকে প্রতিষ্ঠিত বাপুজীর দিকেই আমরা এখনও আপদে-বিপদে এবং সংকটের মুহূর্তে তাকাইব। তাঁহার কাছেই বেদমন্ত্রে প্রার্থনা করিব —হে জ্যোতির্ময় পুরুষ, আমাদের সকল প্রকার দুঃখ শোক ও তাপ পরাস্ত কর— যাহা ভদ্র ও কল্যাণময় আমাদিগকে তাহা দাও।"

বাপুজী আমাদের সঙ্গেই আছেন আমরা তাঁহাকে হারাই নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজপথে উদ্ধত শ্বেতাঙ্গের আঘাতে মূর্ছিত হইয়াও যে মহামানব ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আততায়ীকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, আজও ডারবানের এবং পিটার মারিস্‌বার্গের পথে পথে তাঁহার পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি আর্ত, পীড়িত এবং নিগৃহীত ভারতীয় নরনারীদিগকে তিনি সেখানে গিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন। তাহাদের অশ্রু মুছাইতেছেন। আশ্বাস জাগাইয়া বলিতেছেন, ভয় নাই, সত্য জয়ী হইবে এব আসুরিকতার পরাজয় সুনিশ্চিত। নোয়াখালি পল্লীপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যিনি একদিন প্রেম এবং অহিংসার মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, তাঁহা গতির বিরাম ঘটে নাই। আজও তিনি নিরাশ্রয় নিঃস্ব নরনারীর কুটীর-দ্বারে আসিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছেন। মানব বেদনার সব অনুভূতির আলোকে বাপুজী জ্যোতির্ময় মূর্তিই আমাদের চোখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের আন্তরিকতা উদ্দীপ্ত করিয়া বাপুজীর ত্যাগময় পু জীবনের প্রভাব বৃহতের সাধনায় আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। গান্ধীজীর এই নি আবির্ভাব আমাদের পক্ষে আরও সত্য হোক তাঁহার নৈকট্যের সে একান্ত উপলব্ধিতে রাক্ষ ও অসুরের দল দূরে পলায়ন করুক—"ত সান্নিধানাদপযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্যশেষান্যসুরা সর্বে।"
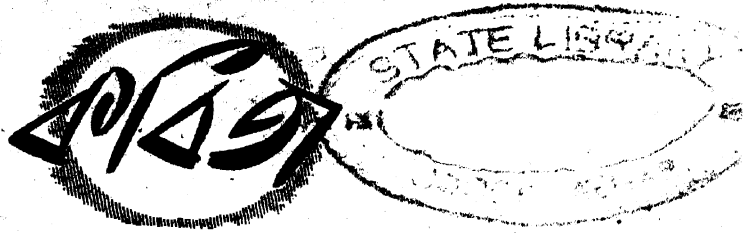
ত্রিশে জানুয়ারী

দিনেশ দাস

নৈঋতে যেই নিবু-নিবু হয় সল্‌তে
বায়ুকোণে দেখি কর্পূর-দীপ জ্বলতে,
চীন-অঙ্গনে ফুলঝুরি হ'লে চূর্ণ
মিশরে ফিনিক্স ডানা ঝেড়ে উঠে ভ'রে তোলে মহাশূন্য,
গ্রীসের ভস্মে
রোম জেগে ওঠে শস্যে ঃ
শতকের বাঁকে এই ওঠা-নামা দেখলুম,
বারেবারে শুধু হাসলুম।

তিনটি বুলেট অন্ধ
ফানুসের মত ফাঁপা পৃথিবীকে ক'রে দিল শতরন্ধ্র,
এক নিমেষেই মিশর-চীনের-উজ্জয়িনীর শীর্ষ
হ'য়ে গেল অদৃশ্য,
সেদিন প্রথম গোটা পৃথিবীর বিরাট পতন দেখলুম—
আমার চোখের জল এত লোনা
ত্রিশে জানুআরী জানলুম।

তিনটি বুলেট ?
লাখো গুলি যদি একসাথে ওঠে গ'র্জে
অণু-বোমা যদি ফেটে ফেটে প'ড়ে দম্ভের আতিশয্যে
সূর্যের মুখ কালো ক'রে দেয় মূঢ়তম উপহাস্যে—
প্রলয়ে জ্বলবে কার স্মিতহাসি প্রসন্ন ঔদাস্যে
কার খোলাবুক জাগবে সেদিন করুণায় বাৎসল্যে ?
সে-বুকে কখনো কোনো সৈনিক
কোনো আধুনিক-মন্ত্রে
বুলেট কি পারে বিঁধতে ?
মিথ্যে !
শতকে শতকে শয়তানী দেখে আস্‌ছি—
হাসছি !

[প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ]

আজ ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস। এতদিন যে স্বাধীনতা দেখি নাই বা যাহা উপলব্ধি করি নাই, তাহার জন্য যখন সংগ্রাম করিতেছিলাম এই দিনটিকে পালন করার মধ্যে একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল। আর এখন? এখন আমরা স্বাধীনতা হাতে পাইয়াছি, আর মনে হইতেছে যেন আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়াছে। আপনাদের যদি নাও ভাঙ্গিয়া থাকে, আমার ভাঙ্গিয়াছে।

আজ আমরা কিসের উৎসব করিতেছি? নিশ্চয়ই আমাদের ভুল-ভাঙ্গার উৎসব নয়। আজ আমরা এই আশা লইয়াই উৎসব করিতে পারি যে, দেশের পক্ষে যাহা ছিল সর্বাধিক অকল্যাণ তাহার অবসান হইয়াছে। এখন গ্রামের নগণ্যতম ব্যক্তিকেও এই কথাই আমরা বুঝাইয়া দিতে যাইতেছি যে, স্বাধীনতার অর্থ পরদাসত্ব হইতে তাহার সম্পূর্ণ মুক্তি। ভারতবর্ষের ছোট বড় শহরগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আমরণ পরিশ্রম করিতেই যাহার জন্ম, ভারতের সেই ক্ষুদ্রতম পল্লীবাসীও যেন ইহাই উপলব্ধি করিতে পারে যে, আজ আর সে কাহারও গোলাম নহে। সুপ্রযুক্ত পরিশ্রমের ফলে সে যে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিবে, তাহাই হইবে তাহার শ্রেষ্ঠ দান আর শহরবাসীরা আজ তাহার ব্যবহারে প্রশংসামুখর হইবে, কেননা তাহারাই ত ভারতের মাটির শ্রেষ্ঠরত্ন। স্বাধীনতার অর্থ সকল শ্রেণীর আর সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার; সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর—তাহারা সংখ্যায় যত অল্পই হউক বা তাহাদের প্রভাব যত কমই হউক—সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভুত্ব কখনও নহে।

এই কল্যাণ কামনাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া আমরা আমাদের অন্তরকে যেন কলুষিত না করি। অথচ ধর্মঘট ও নানা আইনবিরোধী কার্যকলাপের দ্বারা এই কল্যাণকামনাকে আমরা দূরে ঠেলিয়া দিয়া আমাদের অন্তরের মলিনতা ও দুর্বলতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কি করিতেছি? শ্রমিকরা নিজেদের শক্তি ও মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হউক। শ্রমিকের তুলনায় ধনিকের মর্যাদাও নাই শক্তিও নাই। খুব সাধারণ লোকেরও কিন্তু এসব আছে। সুগঠিত গণতান্ত্রিক সমাজে আইন ভঙ্গ করা বা ধর্মঘট করার উপলক্ষ্য বা প্রয়োজন হয় না। এইরূপ সমাজে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার অনেক আইনসম্মত পন্থা আছে, কিন্তু গোপন বা প্রকাশ্য হিংসাত্মক কাজ নিষিদ্ধ। কাপড়ের কলে, কয়লার খনিতে বা অন্যান্য স্থানে ধর্মঘটের দ্বারা সমগ্র সমাজের আর্থিক ক্ষতি হইতেছে এবং সেই ক্ষতির হাত হইতে ধর্মঘটকারীরাও নিস্তার পাইতেছে না। আমাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিয়া লাভ নাই যে, আমার মুখে একথা শোভা পায় না, কারণ অনেকগুলি ধর্মঘট সাফল্যের সহিত আমিও পরিচালনা করিয়াছি। তথাপি আমার এই উক্তির সমালোচক যদি কেহ থাকে, তবে তাঁহার একথা ভুলিলে চলিবে না যে, তখন স্বাধীনতাও ছিল না, আর এখনকার মত আইনকানুনও ছিল না। ক্ষমতাসন্ধানী রাজনীতির উত্তেজনা অথবা প্রাধান্য লাভের যে প্রচেষ্টা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রাজনৈতিক জগতকে ক্লিষ্ট করিতেছে, তাহার হাত হইতে আমরা মুক্ত থাকিতে পারিব কিনা জানি না। আজিকার এই আলোচ্যবিষয় শেষ করিবার পূর্বে, আসুন, আমরা এই আশার কথা বলি যে, যদিও ভৌগোলিক ও রাজনীতিক দিক হইতে আমরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছি, তথাপি অন্তরে আমরা চিরকাল বন্ধু ও ভ্রাতার ন্যায় থাকিব, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও শ্রদ্ধা করিব এবং বহির্জগতের কাছে আমরা একই থাকিব

—নয়াদিল্লী, ২৬ জানুয়ারী, ১৯৪৮

গান্ধীজির বাণী

অহিংসা

হিংসা প্রতিরোধের অস্ত্রই অহিংসা।

অহিংসা কেবল বীরেরই ধর্ম।

অহিংসা একটি অতুলনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র।

মানবের জ্ঞাত যাবতীয় শক্তির মধ্যে অহিংসার শক্তি সর্বাধিক।

অহিংসা অর্থ সীমাহীন প্রেম; আবার অহিংসা অর্থ দুঃখ-বরণের সীমাহীন ক্ষমতা।

অহিংসা শত্রুর প্রতিও বিশ্বাস উৎপাদক; অহিংসার পশ্চাতে কোন অভিসন্ধি থাকিতে পারে না।

যাহারা সর্বভয়মুক্ত, পূর্ণ অহিংসা কেবল তাহাদেরই ধর্ম।

সূর্য যেমন সকল অন্ধকার দূর করে, অহিংসা তেমনই ঘৃণা, ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি দূর করে।

অহিংসার জন্য যাহারা জীবনদানে প্রস্তুত, কেবলমাত্র তাহাদের দ্বারাই অহিংসার প্রচার সম্ভব।

সত্য

আমার জীবনের ভিত্তিই হইল সত্য; এই সত্য হইতেই পরে ব্রহ্মচর্য ও অহিংসার উদ্ভব।

সত্য ও অহিংসার সেবক হিসাবে আমার কর্তব্যই হইল নগ্ন সত্যের প্রকাশ।

আমার দেশ বা ধর্মের মুক্তির বিনিময়েও আমি সত্য ও অহিংসাকে বলি দিতে প্রস্তুত নহি।

অহিংসা অবাধ; সহিষ্ণুতাও বাধা-বন্ধহীন। জীবনের পরে আর কোন হিংসা অহিংসা নাই।

ঈশ্বর

ভগবানের প্রতি যাহার জ্বলন্ত বিশ্বাস আছে, ভগবানের নাম মুখে নিয়া সে কখনও অসৎ কাজ করিতে পারে না।

এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপর বিশ্বাস আছে বলিয়াই মানবতার উপরও আমার বিশ্বাস আছে।

সত্যকেই আমি ভগবানরূপে সেবা করিয়া থাকি: ইহা ভিন্ন আমার নিকট অপর কোন ভগবান নাই।

লক্ষ লক্ষ বাক্যহারা মানবের অন্তরে যে ভগবান বাস করেন, তাঁহাকে ছাড়া আর কোন ভগবানকে আমি মানিতে প্রস্তুত নহি।

ভগবান আমাদের অভ্রান্ত ও শাশ্বত চালক।

এই লক্ষ লক্ষ মানবের মধ্য দিয়াই আমি ঈশ্বররূপে সত্যের বা সত্যরূপে ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকি।

ঈশ্বরের দণ্ড সরাসরিভাবে নামিয়া আসে না।

ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে সর্বপ্রাণীর মধ্য দিয়া দেখিতে হইবে; অর্থাৎ সকল সৃষ্ট-জীবের মধ্যেকার ঐক্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

ভগবানের সহস্র নাম থাকিতেও তিনি অনামী।

ভগবান অহিংসার বর্মস্বরূপ।

ভগবানে ভয় থাকিলেই আমরা মানুষের ভয় হইতে মুক্ত থাকিতে পারিব।

ভগবানের উপর নির্ভর করা আর অস্ত্রের উপর নির্ভর করা এক সঙ্গে চলিতে পারে না।

মানবতা

ভারতভূমির সেবা করিতে যাইয়া আমি ব্যাপকভাবে মানবতারই সেবা করিতেছি।

আমার দেশপ্রেমে সর্বমানবের মঙ্গলেচ্ছার স্থানই পুরোভাগে। আমার নিকট দেশপ্রেম ও মানবতা অভিন্ন।

মানবের জান্তব দিকটা সহিংস; কিন্তু আত্মিক দিকটা অহিংস।

মানব যদি যুদ্ধবিগ্রহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর সুশৃঙ্খল চলার কোনই বাধা ঘটিবে না।

সমাজের উপর নির্ভরতাই মানুষকে মানবতাবোধের শিক্ষা দিয়া থাকে।

বিপদ ও ভীতি-বিক্ষোভের মধ্যে বাস করিতেই মানবের জন্ম।

মানব যতই উপরের দিকে অগ্রসর হইবে, তাহাকে ততই বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং ঐ সকলকে বরণ করিয়া নিতে হইবে।

ভারতভূমি

সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই আমি ভারতের জাগরণ চাহিয়াছি। অন্যান্য জাতিকে ধ্বংস করিয়া ভারত জাগিয়া উঠুক, ইহা আমি চাই না। ভারতের সম্মান রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা মানবতারই সম্মান রক্ষা করিতেছি।

জাগ্রত ও স্বাধীন ভারত বেদনাদীর্ণ বিশ্বকে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী প্রদান করিবে।

স্বাধীন ভারতের কোন শত্রু থাকিতে পারে না।

ভারতবর্ষ মানবতার জন্য মৃত্যুবরণে অনুপ্রাণিত হইবে;

ভারতভূমি তাহার সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পল্লীর মধ্যেই বাঁচিয়া আছে।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমি বাঁচিয়া আছি; উহার স্বাধীনতার জন্যই আমি মরিব; কারণ, ভারতভূমি আমার সত্যেরই অংশ।

ভারত যেন একটি অগ্নিকুণ্ডের উপর নির্মিত গৃহ; কারণ ইহার লোকজন নিত্যদিন বেদনার আগুনে দগ্ধ হইতেছে; খাদ্যক্রয়ের সামর্থ্যের অভাবে ইহা ক্ষুধার অনলে আত্মাহুতি দিতেছে।

ভারতের যে জাতীয়তা, তাহাতে সঙ্কীর্ণতা নাই, আক্রমণোদ্যোগ নাই, তেমনি ধ্বংসের প্রবৃত্তিও নাই।

জীবন

আমার জীবনই আমার বাণী।

মৃত্যুর উপর স্থায়ী জয়লাভই জীবনের নামান্তর। জীবন হইতেছে পরীক্ষার এক সীমাহীন ক্রম।

নিজে বাঁচ, অন্যকে বাঁচিতে দাও; কারণ পারস্পরিক ক্ষমা ও সহনশীলতাই জীবনের বিধি। পরস্পরের সহিত শান্তিতে জীবন কাটানোই শ্রেষ্ঠ স্বাভাবিক কর্তব্য।

জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঠ নিতে হয়, জ্ঞানবৃদ্ধদের কাছ থেকে নয়, তথাকথিত অজ্ঞ শিশুদের কাছ থেকে।

জীবনে আমি সন্ধিরই পক্ষপাতী, কিন্তু এই সকল সন্ধি আমাকে লক্ষ্যের নিকটতর করার উপযোগী হওয়া চাই।

যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই জীবন; হিংসা কেবল ধ্বংস-পথেরই চালক।

অস্পৃশ্যতা

অস্পৃশ্যতা একটা বহুমুখী দানব; উহা নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

অস্পৃশ্যতার এই দানব ভারতের সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরকে নখরাঘাত করিয়াছে। এই ছদ্মমার্গ হিন্দুধর্মের গভীরে শিকড় অনুপ্রবেশ করাইয়াছে। এই অস্পৃশ্যতা দূর করা প্রকৃষ্ট আধ্যাত্মিক কর্ম।

অস্পৃশ্যতা পাপ-বিশেষ; ইহা অপরাধও; হিন্দুগণ যদি এই বিষধরকে সময়ে ধ্বংস না করে, তবে উহা হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিবে।

ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটের উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী সিংহল হইতে আনীত বোধিদ্রুমের চারা রোপণ করিতেছেন

মহাত্মাজী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
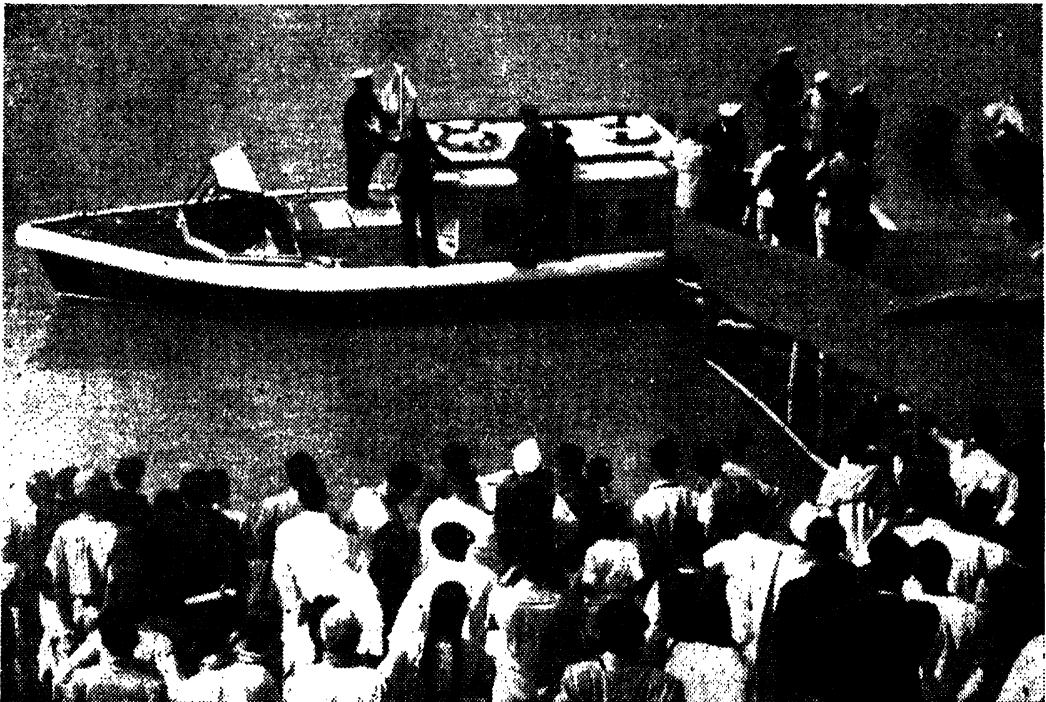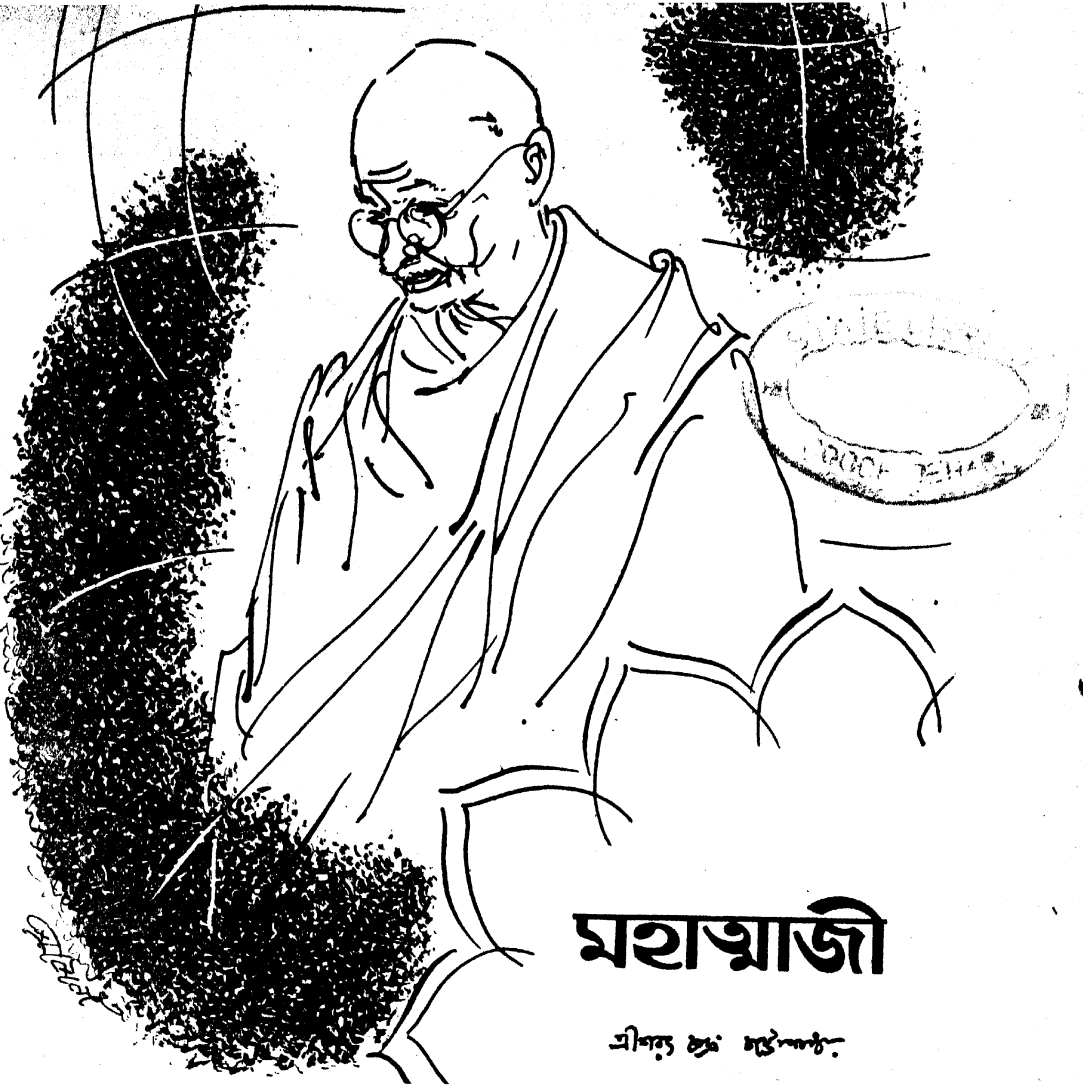
মহাত্মাজী আজ রাজার বন্দী। ভারতবাসীর পক্ষে এ সংবাদ যে কি সে কেবল ভারতবাসীই জানে! তবুও সমস্ত দেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। দেশব্যাপী কঠোর হরতাল হইল না, শোকোন্মত্ত নর-নারী পথে-পথে বাহির হইয়া পড়িল না, লক্ষ-কোটী সভা-সমিতিতে হৃদয়ের গভীর ব্যথা নিবেদন করিতে কেহ আসিল না—যেন কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই,—যেমন কাল ছিল আজও সমস্তই ঠিক তেমনি আছে, কোনখানে একটি তিল পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয় নাই—এমনি ভাবে আসমুদ্রহিমাচল নীরব হইয়া আছে। কিন্তু এমন কেন ঘটিল? এত বড় অসম্ভব কাণ্ড কি করিয়া সম্ভবপর হইল? নীচাশয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা যাহার যাহা মুখে আসিতেছে বলিতেছে, কিন্তু প্রতিদিনের মত সে মিথ্যা খণ্ডন করিতে কেহ উদ্যত হইল না। আজ কথা কাটাকাটি করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত কাহারও নাই! মনে হয় যেন তাহাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীরতম বেদনা আজ সমস্ত তর্ক-বিতর্কের অতীত।

যাইবার পূর্বাহ্নে মহাত্মাজী অনুরোধ করিয়া গেছেন, তাঁহার জন্য কোথাও কোন হরতাল, কোনরূপ প্রতিবাদ-সভা, কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা লেশমাত্র আক্ষেপ উত্থিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন আদেশ। কিন্তু তথাপি সমস্ত দেশ তাঁহার সে আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছে। এই কণ্ঠরোধ, এই নিঃশব্দ সংযম, আপনাকে দমন করিয়া রাখার এই কঠোর পরীক্ষা যে কত বড় দুঃসাধ্য একথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, তবুও এ আজ্ঞা প্রচার করিয়া যাইতে তাঁহার বাধে নাই। আর একদিন যেদিন তিনি বিপন্ন দরিদ্র উপদ্রুত ও বঞ্চিত প্রজার পরম দুঃখ রাজার গোচর করিতে যুবরাজের অভ্যর্থনা নিষেধ করিয়াছিলেন, এই অর্থহীন নিরানন্দ উৎসবের অভিনয় হইতে সর্বতোভাবে বিরত হইতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন সেদিনও তাঁহার বাধে নাই। রাজরোষাগ্নি যে কোথায় এবং কতদূরে উৎক্ষিপ্ত হইবে ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু কোন আশঙ্কা কোন প্রলোভনই তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা কত বজ্রপাত কত দুঃখই না বহিয়া গেল, কিন্তু একবার যাহা সত্য ও কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যুবরাজের উৎসব সম্বন্ধে শেষ দিন পর্যন্ত সে আদেশ তাঁহার প্রত্যাহার করেন নাই। তার পর অকস্মাৎ

একদিন চৌরিচোরার ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিল। নিরুপদ্রব সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস টলিল,—তখন একথা সমস্ত জগতের কাছে অকপট ও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে তাঁহার লেশমাত্র দ্বিধা বোধ হইল না। নিজের ভুল ও ত্রুটি বারম্বার স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ রাজশক্তির সহিত আসন্ন ও সুতীব্র সংঘর্ষের সর্বপ্রকার সম্ভাবনা স্বহস্তে রোধ করিয়া দিলেন। বিন্দুমাত্রও কোথাও তাঁহার বাধিল না। সিন্ধু হইতে আসাম ও হিমাচল হইতে দক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত হইতে সমস্ত অসহযোগপন্থীদের মুখ হতাশ্বাস ও নিষ্ফল ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল বিলম্বে দিল্লীর নিখিল-ভারতীয়-কংগ্রেস-কার্যকরী সভায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত লাঞ্ছনার যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। একদিন যে তিনি সবিনয়ে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন—I have *lost all fear of men জগদীশ্বর ব্যতীত মানুষকে আমি ভয় করি না—এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে নয়, একান্ত অনুকূল সহযোগী ও ভক্ত অনুচরদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া দিলেন।* রাজপুরুষ ও রাজশক্তির অনাচার ও অত্যাচারের তীব্র আলোচনা এদেশে নির্ভয়ে আরও অনেকে করিয়া গেছেন, তাহার দণ্ডভোগও তাঁহাদের ভাগ্যে লঘু হয় নাই, তথাপি ভয়হীনতার পরীক্ষা তাঁহাদিগকে কেবল এই দিক দিয়াই দিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাপেক্ষাও যে বড় পরীক্ষা ছিল,—অনুরক্ত ও ভক্তের অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও বিদ্রূপের দণ্ড—একথা লোকে এক প্রকার ভুলিয়াই ছিল—যাবার পূর্বে দেশের কাছে এই পরীক্ষাটাই তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইল, অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া যাইতে হইল যে সম্ভ্রম, মর্যাদা, যশঃ, এমন কি জন্মভূমির উপরেও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে ইহা পারা যায় না। কিন্তু এত বড় শান্তশক্তি ও সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠার মর্যাদা ধর্মহীন উদ্ধত রাজশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিল। মহাত্মাকে সেদিন রাত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিছুকাল হইতে এই সম্ভাবনা জনশ্রুতিতে ভাসিতেছিল, অতএব, ইহা আকস্মিকও নয়, আশ্চর্যও নয়। কারাদণ্ড অনিবার্য। ইহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ভাবিবার কথা আছে। ভাবনা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিজের জন্য নয়, এ চিন্তা সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত দেশের জন্য। যিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহার কোথাও কোন কিছু নাই, আর্তের জন্য পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী,—এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে যাহার অপরাধে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে হইল। দেশের মঙ্গলেই রাজশ্রীর মঙ্গল, প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ—শাসনতন্ত্রের এই মূল তত্ত্বটি আজ এদেশে সত্য কি না, এখানে দেশের হিতার্থেই রাজ্য পরিচালনা, প্রজার ভাল হইলেই রাজার ভাল হয় কি না, ইহা চোখ মেলিয়া আজ দেখিতে হইবে। আত্মবঞ্চনা করিয়া নয়, পরের উপর মোহ বিস্তার করিয়া নয়, হিংসা ও আক্রোশের নিষ্ফল অগ্নিকাণ্ড করিয়া নয়,—কারারুদ্ধ মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারি মত শুদ্ধ ও সমাহিত হইয়া এবং তাঁহারি মত লোভ, মোহ ও ভয়কে সকল দিক দিয়া জয় করিয়া। অর্থহীন কারাবরণ করিয়া নয়,—কারাবরোধের অধিকার অর্জন করিয়া।

হয়ত ভালই হইয়াছে শাসনযন্ত্রের নাগপাশে আজ তিনি আবদ্ধ। তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিত বিশ্রামের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু দেশের ভার যখন আজ দেশের মাথায় পড়িল,—একটা কথা যে তিনি বারবার বলিয়া গিয়াছেন, দানের মত স্বাধীনতা কোনদিন কাহারও হাত হইতে গ্রহণ করা যায় না, গেলেও তাহা থাকে না, ইহাকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জন করিতে হয়—তাঁহার অবর্তমানে আপনাকে সার্থক করিবার এই পরম সুযোগটাই হয়ত আজ সর্বসাধারণের ভাগ্যে জুটিয়াছে। যাহারা রহিল তাহারা নিতান্তই মানুষ, কিন্তু মনে হয় অসামান্যতার পরম গৌরব আজ কেবল তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

আরও একটা পরম সত্য তিনি অত্যন্ত পরিস্ফুট করিয়া গেছেন। কোন দেশ যখন স্বাধীন, সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন দেশাত্মবোধের সমস্যাও খুব জটিল হয় না, স্বদেশপ্রেমের পরীক্ষাও একেবারে নিরতিশয় কঠোর করিয়া দিতে হয় না। সে দেশের নেতৃস্থানীয়গণকে তখন পরম যত্নে বাছাই করিয়া না লইলেও হয়ত চলে। কিন্তু সেই দেশ যদি কখনও পীড়িত রুগ্ন ও মরণাপন্ন হইয়া উঠে, তখন ঐ ঢিলাঢালা কর্তব্যের আর অবকাশ থাকে না। তখন এই দুর্দিন যাঁহারা পার করিয়া লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করেন, সকল দেশের সমস্ত চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদিগকে পরার্থপরতার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়। বাক্যে নয়, কাজে, চালাকির মারপ্যাঁচে নয়, সরল সোজা পথে স্বার্থের বোঝা বহিয়া নয়, সকল চিন্তা সকল উদ্বেগ সকল স্বার্থ জন্মভূমির পদপ্রান্তে নিঃশেষে বলি দিয়া। ইহা অন্যথা বিশ্বাস করা চলে না। এই পরম সত্যটিকে আর আমাদের বিস্মৃত হইলে কোনমতে চলিবে না। এই পরীক্ষা দিতে গিয়াই আজ শত সহস্র ভারতবাসী রাজকারাগারে। এবং এই জন্যই ইহাকে স্বরাজ আশ্রম নাম দিয়া ও তাঁহারা আনন্দে রাজদণ্ড মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন।

প্রজার কল্যাণের সহিত রাজশক্তির আজ কঠিন বিরোধ বাধিয়াছে। এই বিগ্রহ এই বোঝাপড়া কবে শেষ হইবে সে শুধু জগদীশ্বরই জানেন, কিন্তু রাজায় প্রজায় এই সংঘর্ষ প্রজ্বলিত করিবার যিনি সর্বপ্রধান পুরোহিত আজ যদিও তিনি অবরুদ্ধ, কিন্তু এই বিরোধের মূল তথ্যটা আবার একবার নূতন করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। সংশয় ও অবিশ্বাসই সকল সদ্ভাব, সকল বন্ধন, সকল কল্যাণ পলে পলে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। শাসনতন্ত্র কহিলেন এই, প্রজাপুঞ্জ জবাব দিতেছে, না এই নয় তোমার মিথ্যা কথা; রাজশক্তি কহিতেছেন, তোমাকে এই দিব এতদিনে দিব, প্রজাশক্তি চোখ তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে কোনদিন কিছু দিবে না—নিছক বঞ্চনা করিতেছ।

"কে বলিল?"

"কে বলিল! আমার সমস্ত অস্থিমজ্জা, আমার সমস্ত প্রাণশক্তি, আমার আত্মা, আমার ধর্ম, আমার মনুষ্যত্ব, আমার পেটের সমস্ত নাড়ি-ভুঁড়িগুলো পর্যন্ত তারস্বরে চীৎকার করিয়া কেবল এই কথাই ক্রমাগত বলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শোনে কে? চিরদিন তুমি শুনিবার ভাণ করিয়াছ, কিন্তু শোন নাই। আজও সেই পুরোনো অভিনয় আর একবার নূতন করিয়া করিতেছ মাত্র। তোমাকে শুনাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় জগতের কাছে আমার লজ্জা ও হীনতার অবধি নাই, কিন্তু আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। তোমার কাছে নালিশ করিব না, শুধু আর একবার আমার বেদনার কাহিনীটা দেশের কাছে একে একে ব্যক্ত করিব।"

ভূতপূর্ব ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব সেবার যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন এই বাঙলা দেশেরই একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী তাঁহাকে একখানা বড় পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহার মস্ত একটা জবাবও পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আগাগোড়া ভাল ভাল ফাঁকা কথার বোঝায় ভরা চিঠিখানির ফাঁকিটুকু ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই এবং বোধ করি মনেও থাকে না। কিন্তু এপক্ষের মোট বক্তব্যটা আমার বেশ স্মরণ আছে। ইনি বার বার করিয়া এবং বিশদ করিয়া ওই বিশ্বাস অবিশ্বাসের তর্কটাই চার পাতা চিঠি ভরিয়া সাহেবকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বিশ্বাস না করিলে বিশ্বাস পাওয়া যায় না। যেন এত বড়

নূতন তত্ত্বকথা এই ভারতভূমি ছাড়া বিদেশী সাহেবের আর কোথাও শুনিবার সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ আমার বিশ্বাস সাহেবের বয়স অল্প হলেও এ তত্ত্ব তিনি সেই প্রথমও শুনেন নাই এবং সেই প্রথমও জানিয়া যান নাই। কিন্তু জানা এক এবং তাহাকে মানা আর। তাই সাহেবকে কেবল এমন সকল কথা এবং ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, যাহা দিয়া চিঠির পাতা ভরে, কিন্তু অর্থ হয় না।

কিন্তু কথাটা কি বাস্তবিকই সত্য? জগতে কোথাও কি ইহার ব্যতিক্রম নাই। গভর্নমেণ্ট আমাদের অর্থ দিয়া বিশ্বাস করেন না, পল্টন দিয়া বিশ্বাস করেন না, পুলিশ দিয়া বিশ্বাস করেন না, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু শুধু কেবল এইজন্যই কি আমরাও বিশ্বাস করিব না এবং এই যুক্তিবলেই দেশের সর্বপ্রকার রাজ-কার্যের সহিত অসহযোগ করিয়া বসিয়া থাকিব? গভর্নমেণ্ট ইহার কি কি কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন জানি না, খুব সম্ভব কিছুই দেন না, দিলেও হয়ত ওই মণ্টেগু সাহেবের মতই দেন যাহার মধ্যে বিস্তর ভাল কথা থাকে, কিন্তু মানে থাকে না! কিন্তু তাঁহাদের অফিসিয়াল বুলি ছাড়িয়া যদি স্পষ্ট করিয়া বলেন, তোমাদের এই সকল দিয়া বিশ্বাস করি না খুব সত্য কথা, কিন্তু সে শুধু তোমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত।

আমরা রাগ করিয়া জবাব দিই, ও আবার কি কথা? বিশ্বাস কি কখনও একতরফা হয়? তোমরা বিশ্বাস না করিলে আমরাই বা করিব কি করিয়া?

অপর পক্ষ হইতে যদি পাল্টা জবাব আসিত, ও বস্তুটা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে একতরফা হওয়া অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিকও নয়। তাহা হইলে কেবলমাত্র গলার জোরেই জয়ী হওয়া যাইত না। এবং প্রতিপক্ষ সাধারণ একটা উদাহরণের মত যদি কহিতেন, পীড়িত রুগ্ন ব্যক্তি যখন অস্ত্র চিকিৎসায় চোখ বুজিয়া ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন বিশ্বাস বস্তুটা একতরফাই থাকে। পীড়িতের বিশ্বাসের অনুরূপ জামিন ডাক্তারের কাছে কেহ দাবী করে না এবং করিলেও মেলে না। চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, তাঁহার সাধু ও সদিচ্ছাই একমাত্র জামিন এবং সে তাঁহার নিছক নিজেরই হাতে। পরকে তাহা দেওয়া যায় না। রোগীকে বিশ্বাস করিতে হয় আপনারই কল্যাণে, আপনারই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য।

এপক্ষ হইতেও প্রত্যুত্তর হইতে পারে—ওটা উদাহরণেই চলে বাস্তবে চলে না। কারণ অসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করিবারও জামিন আছে, কিন্তু তাহা ঢের বড় এবং তাহা গ্রহণ করেন চিকিৎসকের হৃদয়ে বসিয়া ভগবান নিজে। তাঁর আদায়ের দিন যখন আসে, তখন না চলে ফাঁকি না চলে তর্ক। তাই বোধহয় সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজশক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি মারামারি, কাটাকাটি, অস্ত্রশস্ত্র বাহুবলের ধাব দিয়া যান নাই, তাঁর সমস্ত আবেদন নিবেদন অভিযোগ অনুযোগ এই আত্মার কাছে। রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে, তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই। এবং সহানুভূতিই যখন জীবের সকল সুখ-দুঃখ, সকল জ্ঞান, সকল কর্মের আধার, তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আজ স্বার্থ ও অনাচারে ইহা যত মলিন যত আচ্ছন্নই না হইয়া থাক, একদিন ইহাকে নির্মল ও মুক্ত করিতে পারিবেন এই অটল বিশ্বাস হইতে তিনি এক মুহূর্তও বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু লোভ ও মোহ দিয়া স্বার্থকে ক্রোধ ও বিদ্বেষ দিয়া হিংসাকে নিবারণ করা যায় না, তাহা মহাত্মা জানিতেন। তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে, আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি দিতেই এই ধর্ম-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা। ইহাকেই তিনি বীরের ধর্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্ধত অবিচারের জাঁতা-কলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে, ইহার একমাত্র সমাধান গুলী-গোলা-বন্দুক-বারুদ কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে এই পর সত্যকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই অহিংসা ব্রতকে মাত্র ক্ষণেকের উপায় বলিয়া নয়, চিরজীবনের একমাত্র ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এইজন্যই তিনি ভারতীয় আন্দোলনকে রাজনীতিক না বলিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টায় দিনের পর দিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছিলেন। বিপক্ষ উপহাস করিয়াছে, স্বপক্ষ অবিশ্বাস করিয়াছে, কিন্তু কোনটাই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, কিন্তু মানুষ ইংরাজদের কোনদিন কোনদিন আত্মোপলব্ধির প্রতি আজও তাঁহার বিশ্বাস তেমনি স্থির হইয়া আছে।

কিন্তু এই অচঞ্চল নিষ্কম্প শিখাটির মহিমা বুঝিয়া উঠা অনেকের দ্বারাই দুঃসাধ্য। তাই সেদিন শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু যখন মহাত্মাজীর কথা—

"I would decline to gain India's Freedom at the cost of non-violence, meaning that India will never gain her Freedom without non-violence."

তুলিয়া ধরিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, "মহাত্মাজীর লক্ষ্য—সত্যাগ্রহ, ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ এই লক্ষ্যের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু মূল লক্ষ্য নহে," তখন তিনিও এই শিখার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অপরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা যে কত বড় সত্যবস্তু এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আগ্রহও যে কত বড় স্বরাজসাধনা তাহা তিনিও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সত্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মূল ডাল প্রভৃতি নাই, সত্য সম্পূর্ণ এবং সত্যই সত্যের শেষ। এবং এই চাওয়ার মধ্যেই মানবজাতির সর্বপ্রকার এবং সর্বোত্তম লক্ষ্যের পরিণতি রহিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই, এমন করিয়া চাহিয়াছেন, যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়। তাহার ক্ষুব্ধ চিত্তের কৃপণের দেয় অর্থ নয়, তাহার দাতার প্রসন্ন হৃদয়ের স্বার্থকতার দান। অমন কাড়াকাড়ির দেওয়া নেওয়া ত সংসারে অনেক হইয়া গেছে, কিন্তু সে ত স্থায়ী হইতে পারে নাই,—দুঃখ কষ্ট বেদনার ভার ত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে কোথাও ত একটি তিলও কম পড়ে নাই! তাই তিনি আজও সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন, পণ করিয়াছিলেন মানবাত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ দান ছাড়া হাত পাতিয়া তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

সর্বান্তঃকরণে স্বাধীনতা বা স্বরাজকামী যখন তিনি ইংরাজ রাজত্বে সর্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বিস্তর কটু কথা শুনিতে হইয়াছিল। বহু কটূক্তির মধ্যে একটা তর্ক এই ছিল যে, ইংরাজ রাজত্বের সহিত আমাদের চিরদিনের অবিচ্ছিন্নবন্ধন কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। নিরুপদ্রব শান্তির জন্যই বা এত ব্যাকুল হওয়া কেন? পরাধীনতা যখন পাপ এবং পরের স্বাধীনতা অপহরণকারীও যখন এত বড় পাপী তখন যেমন করিয়া হউক ইহা হইতে মুক্ত হওয়াই ধর্ম। ইংরাজ নিরুপদ্রব পথে রাজ্যস্থাপন করে নাই এবং রক্তপাতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই, তখন আমাদেরই শুধু নিরুপদ্রবপন্থী থাকিতে হইবে এতবড় দায়িত্ব গ্রহণ করি কিসের জন্য! কিন্তু

মহাত্মাজী কর্ণপাত করেন নাই, তিনি জানিতেন এ যুক্তি সত্য নয়, ইহার মধ্যে একটা মস্তবড় ভুল প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বস্তুতঃ একথা কিছুতেই সত্য নয় জগতে যাহা কিছু অন্যায়ের পথে অধর্মের পথে একদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে আজ তাহাকে ধ্বংস করাই ন্যায় যেমন করিয়া হোক তাহাকে বিদূরিত করাই আজ ধর্ম। যে ইংরাজ রাজ্যকে একদিন প্রতিহত করাই ছিল দেশের সর্বোত্তম ধর্ম, সেদিন তাহাকে ঠেকাইতে পারি নাই বলিয়া আজ যে-কোন-পথে তাহাকে বিনাশ করাই দেশের একমাত্র শ্রেয়ঃ একথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। অবাঞ্ছিত জারজ সন্তান অধর্মের পথেই জন্মলাভ করে অতএব ইহাকে বধ করিয়াই ধর্মহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করা যায় তাহা সত্য নয়।

[নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২৯]

গান্ধীজীর শিল্পদৃষ্টি

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

'গান্ধীজীর শিল্প দৃষ্টি।' কথাটা প্রথমে একটু অদ্ভুতই শোনাবে। কটিবাস-পরিহিত, মুণ্ডিত-মস্তক, নিরাবরণ দেহ, প্রায় অনাবৃত পদ মানুষ একটি, অন্য শিল্পচর্চা দূরে থাকুক, নিজের পোষাকে পরিচ্ছদে, নিত্য ব্যবহার্য উপকরণে আয়োজনেও যিনি নিতান্তই অনাড়ম্বর, একেবারে বহুলতাবর্জিত, তাঁর ত্যাগপূত জীবন মহনীয় নিশ্চয়ই, দেবতার মতই তিনি পূজ্য, কিন্তু রসের ব্যাপারে তো তিনি পাষাণ দেবতারই মত সংবেদনশূন্য, আর নিঃস্পৃহ। গান্ধীজীর জীবন সম্বন্ধে সাধারণ মনের এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। কাজেই গান্ধীজীর একটা শিল্পদৃষ্টি আছে এবং তা আলোচনার বিষয়ীভূত হতে পারে এতে অনেকের মনে একটু বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়তো করবে।

কিন্তু তাঁরাই যদি একটু নিবিষ্ট হয়ে কথাটা চিন্তা করেন তা'হলে বুঝতে পারবেন, কথাটা শশবিষাণের মত অলীক কিছু নয়। অন্যান্য দশটা কথার মতই বাস্তবভিত্তিক। কেন?—তারই সামান্য দু'একটা সূত্র এখানে ধরবার চেষ্টা করবো।

একটা উপমা নিয়ে আরম্ভ করা যাক। কুমোরের হাতে একতাল মাটি এল। কুমোর তাকে গুঁড়িয়ে, জলে ভিজিয়ে, মেখে নমনীয় করে নিজের মনের মত করে একটি মূর্তি তৈরী করলো। নিজের মনের ভাবকে ফুটিয়ে তুললো রূপে। কুমোর শিল্পী। এমনি করে চিত্রকর কতকগুলো রঙকে, ভাস্কর একখণ্ড পাথরকে, গীতকার গলার আওয়াজকে নিয়ে যে রূপসৃষ্টি করলেন, আমরা তাকে বললাম শিল্প। চিত্রকর, ভাস্কর, আর গীতকার—যাদের সাধনায় রঙ, পাথর আর আওয়াজের শুষ্ক সত্তা রসনিষেকে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো তাদের আমরা বলি শিল্পী।

আরও একটা উপমার আমদানী করা যাক। মরসুমী ফুলের রঙের বাহার আমাদের চোখকে তৃপ্ত করে, মন বলে ওঠে চমৎকার। সেই রঙের মহোৎসবকে আমরা সুন্দর বলে অভিনন্দিত করি। একটা গাছে ফুটে রয়েছে সাদা সাদা বেল ফুল। রঙের বৈচিত্র্য নেই, অনেকের চোখে হয়তো গড়নেও তার কোন বিচিত্রতা ধরা পড়বে না। কিন্তু তবু বেলফুলের নিটোল নিখুঁত গড়ন, তার শুচিস্নিগ্ধ শুভ্রতাও সুন্দর নয় কি? তা দেখেও কি চোখ বলে ওঠে না বাঃ! আরও কাছে এগিয়ে যাও, তার দিব্যগন্ধের মাধুর্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আমোদিত হোক—মন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠবে এ শুধু সৌন্দর্য নয়—এ যে সুষমা। কাজেই দেখতে পাচ্ছি যে, সৌন্দর্য শুধু রূপের ফুলঝুরির মধ্যেই নিহিত নেই, শুচিশুভ্র নিরাভরণতার মধ্যে, নিরাড়ম্বর সহজ বিকাশের মধ্যেও একটা সৌন্দর্য আছে, এবং সে সৌন্দর্য যখন মাধুর্যের মহিমায় মণ্ডিত হয়, তখন সে উন্নীত হয় সুষমার স্তরে। অবশ্য রূপরসাস্বাদনেও রুচিভেদ, আর অধিকারী ভেদ মানতেই হবে।

যিনি জড় উপকরণকে রূপের মহিমায় বিকশিত করে তোলেন, তাঁকে তো আমরা বিনা দ্বিধায়ই শিল্পী অভিধা দিয়ে থাকি। কিন্তু যিনি কাদামাটির মতই অপরিণত জীবনকে একাগ্র নিষ্ঠা, নিরলস সাধনা, সূক্ষ্ম মাত্রাবোধ আর পরিচ্ছন্ন সংযম দিয়ে সুঠাম সুসমঞ্জস করে গড়ে তোলেন, বিকশিত করে তোলেন তাতে সুশুভ্র শুচিতা, জ্বালাহীন উজ্জ্বলতা, অতীক্ষ্ণ ঋজুতা, মাধুর্যানুলিপ্ত কাঠিন্য, দৈন্যহীন সারল্য, আর অনুগ্র সংযম, তিনিও কি শিল্পী নন? তার সাধনার সে সৃষ্টি কি শিল্পবস্তুর মহিমায় মহিমান্বিত নয়? পটে, পাথরে, বা মাটিতে যাঁর ভাব রূপ পেলো তিনি যদি শিল্পী হন, তাহলে যাঁর ভাবের শ্বেত পদ্মটি জীবনের অনুপম মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠলো; তিনিও যে শিল্পী, শুধু শিল্পী নন শ্রেষ্ঠ শিল্পী; সহজ যুক্তিতে ও সরল বিচার বুদ্ধিতে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে হয়। অন্য দেশের কথা জানিনে, আমাদের দেশের মনীষীরা কিন্তু জীবনশিল্পের যিনি শিল্পী তাঁকেই বলেছেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাঁর সৃষ্টিকেই বলেছেন প্রকৃত সৌন্দর্য। একথার পরিপোষকতার জন্য দুএকটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেছেন—আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈ-র্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। অর্থাৎ আত্মসংস্কৃতিই শিল্প। যজমান শিল্পের ছন্দে আত্মারই সংস্কার করে।

আত্মসংস্কার সাধন করা,—জীবনকে ছন্দোময় করে তোলাই যে শিল্পসাধনা বৈদিক ঋষি সে কথাটা স্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেন। জীবনশিল্প সাধনার প্রসঙ্গে বৈদিক ঋষির ছন্দ কথাটার প্রয়োগ শুধু সার্থক নয় অপরিহার্য। ছন্দ বলতে বুঝায় নিয়মানুগ গতি বা স্পন্দন। কোন কোন ভারতীয় দার্শনিকের মতে সমস্ত জগতেরই সৃষ্টি হয়েছে ছন্দ থেকে। আর বিশ্ব জগৎ বিধৃতও হয়ে আছে ছন্দে। এই বিশ্বছন্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দ মিলনই জীবনশিল্পের সাধনা। যিনি বিশ্ব-বীণকরের হাতে বাঁধা বীণার তারের সঙ্গে নিজের জীবনবীণার তারগুলোকে যতটা সুরসংগতে বাঁধতে পারবেন তাঁর জীবন শিল্পের সাধনা সেই পরিমাণেই সার্থক হয়ে উঠবে, সেই পরিমাণে তাঁর জীবন হবে সুন্দর, হবে সুষমাময়। ছন্দের সঙ্গে সুন্দর কথাটার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। বেসুরো যা, যা কিছু এলোমেলো তাকে কোন অরসিকও সুন্দর বলতে সম্মত হবেন না নিশ্চয়ই। রসশাস্ত্রের অনুপম গ্রন্থ 'উজ্জ্বল নীলমণি' প্রণেতা শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী একটি মাত্র বাক্যে সৌন্দর্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে অতি সহজেই সৌন্দর্যের মূল তত্ত্বটি ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন—'ভবেৎ সৌন্দর্যমঙ্গানাং সন্নিবেশঃ যথোচিতম্।' অর্থাৎ যে অঙ্গের যেখানে সন্নিবেশ করা দরকার তাকে যদি ঠিক সেই জায়গায় সন্নিবিষ্ট করা যায় তাহলেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা হয়। একথা যেমন চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, কাব্য, সঙ্গীত সম্বন্ধে খাটে তেমনি খাটে জীবন সম্বন্ধেও। বিশ্বচ্ছন্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দকে এক সুসম সঙ্গতে যিনি বাঁধতে পেরেছেন, তাঁর জীবনকেই বলা চলে সত্যকার সুন্দর জীবন, আর যিনি নিরলস সাধনার দ্বারা সেই সুছন্দ জীবনকে গড়ে

তুলেছেন, তিনিই সত্যকার শিল্পী। জীবনকে বিশ্বছন্দের সঙ্গে মেলাতে গেলে, দেহ মন আত্মার অনন্ত বৃত্তিগুলোর যথাযথ সন্নিবেশের কথাই এসে পড়ে। কারণ শীতের হাওয়ায় যেমন গাছের শ্যামল শোভা বিশীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে ছন্দহীন বিশৃঙ্খল জীবনের নিঃশ্বাসেও সৌন্দর্যের পাপড়িগুলো তেমনি শোভাহীন হয়ে যায়।

এই কথাটিই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপম ভাষায় বলেছেন তাঁর 'সৌন্দর্য বোধ' শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলেছেনঃ—সৌন্দর্য মূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণ মূর্তি এবং মঙ্গল মূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ। তিনি আরও বলেছেনঃ—বস্তুতঃ সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতি লাভ করিতেছে, সেখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে। সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে, সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনই জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ শাদাসিধা হইয়া থাকে, সেটা সৌন্দর্যবোধের অভাব হইতে হয় না প্রকর্ষ হইতেই হয়।

যাঁর জীবনে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মেলন সাধিত হয়েছে সেই অসামান্য মানুষ যে কেবল নিজের জীবনকেই এক অপূর্ব শিল্প সত্তাকে পরিণত করেছেন, তা নয়, মানুষের শিল্পী মনকেও তা এমনভাবে নাড়া দিয়েছে যে, তার ফলে কাব্য চিত্র ভাস্কর্য পেয়েছে প্রকর্ষের আস্বাদ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই আবার কথাটা বলা যাক—"মানুষের মধ্যে যাঁহারা নরোত্তম, ধরাতলে যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রকাশ, তাঁহারা আমাদের মনকে এতদূর পর্যন্ত টান দেন, সেখানে আমরা নিজেরাই নাগাল পাই না। এইজন্য যে রাজপুত্র মানুষের দুঃখমোচনের উপায় চিন্তা করিতে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য, কত চিত্র রচনায় লাগাইয়াছে, তাহার সীমা নাই।"

এতক্ষণ যে কথাগুলো বলতে চেয়েছি তা হল এই যে, জীবনকে যিনি সুন্দর ও মহৎ করে গড়ে তুলেছেন, বিশ্বছন্দের সঙ্গে যিনি নিজের জীবনের ছন্দকে সামঞ্জস্যের সুষমায় মিলিয়ে দিতে পেরেছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং তাঁর সাধনাই প্রকৃত শিল্পসাধনা। সেই সঙ্গে একথাও বলতে চেয়েছি যে, প্রকৃত যে সৌন্দর্য রঙচঙের ঘটা, প্রসাধনের আড়ম্বর, বা অলঙ্করণের প্রাচুর্যের মধ্যে তা নিহিত নেই, তা রয়েছে সহজ সংযত সারল্য আর শুচিশুভ্র রিক্ততার মধ্যে। এবং এদিক দিয়ে বিচার করলে মহাত্মা গান্ধীর জীবন একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি আর তিনি মহত্তম শিল্পীদেরই একজন।

দিলীপকুমার মহাত্মাজীর উক্তি বলে যা' লিপিবদ্ধ করেছেন, এ প্রসঙ্গে সে কথাগুলো উল্লেখযোগ্য। দিলীপকুমার বলেছিলেন যে, মহাত্মাজী যেরূপ কৃচ্ছ্রসাধনার জীবন যাপন করেন তাতে জনসাধারণের এই ভাবাই তো স্বাভাবিক যে তাঁর শিল্পপ্রীতি নেই। উত্তরে মহাত্মাজী বলেন,—"কিন্তু কেন তারা বুঝবে না যে, সন্ন্যাসই হল জীবনের সব চেয়ে বড় শিল্প?" সন্ন্যাসকে শিল্প বলাতে দিলীপকুমারও একটু চমকিত হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন—"সন্ন্যাস-শিল্প?" উত্তরে মহাত্মাজী যা বললেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বললেন, "নয়? শিল্প আসলে কী? না, সরল সুষমা বটেতো? আর সন্ন্যাস কী? না, সরলতম সুষমাকে প্রতিদিনের জীবনে পরম সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা—সব চোখধাঁধান কৃত্রিমতা ও ভাণ বাদ দিয়ে প্রতিপদে খাঁটী থাকার সাধনা। তাই তো আমি প্রায়ই বলি যে সাচ্চা সন্ন্যাসী যে কেবল শিল্পের সাধনা করে তাই নয়—তার জীবনটাই অখণ্ড শিল্পকারু।"

একথা যাঁরা মেনে নেবেন, তাঁদের মনেও এ প্রশ্ন জাগবে এবং জাগাই স্বাভাবিক যে, সাধারণ কথায় আমরা যাকে শিল্প বলি, আমাদের চিত্রকর, ভাস্কর, সুরকার, বা কবির মনের সাধনা যাতে রূপ গ্রহণ করে, সেই শিল্পগুলো সম্বন্ধে মহাত্মাজী কি বলতে চেয়েছেন, কি দৃষ্টিতেই বা তিনি সেগুলোকে দেখেছেন। যাঁরা মহাত্মাজীর লেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন তাঁর কোন লেখার ভেতরে এ সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ কোন অভিমত তিনি প্রকাশ করে যান নি। শিল্প সম্বন্ধে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা' তাঁর বিশাল রচনাসম্ভারের নানা স্থানে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়িছে। ১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনের তদানীন্তন ছাত্র শ্রীরামচন্দ্রনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে এবং ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। প্রথম আলোচনার বিবরণ মহাত্মাজীর নিত্য সহচর মহাদেব দেশাই ১৯২৪ সালের ১৩ই নবেম্বরের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। দিলীপকুমার তাঁর তীর্থঙ্কর গ্রন্থে মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা বিবৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর এই বিবরণ মহাত্মাজী দেখে দিয়েছেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মহাত্মাজীর শিল্পদর্শন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মহাত্মাজী শিল্পকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন তার একটা মোটামুটি পরিচয় এই প্রবন্ধ দুটোতে পাবেন। তাঁর শিল্প-দর্শন সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেতে হলে তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো বাণীগুলোকে একত্রে গ্রথিত করে তা নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেরূপ বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভবপর হবে না। এখানে আমরা কেবল তার শিল্প-দর্শনের মূল কথাগুলো সংক্ষেপে বোঝবার চেষ্টা করবো।

শ্রীমতী আগাথা হ্যারিসন এক সময়ে মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করেছিলেন "আপনি কি মানুষকে বলবেন না যে, ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমিতে ফুলের চাষ করো? দেহের পক্ষে যেমন খাদ্য আবশ্যক আত্মার পক্ষেও তো রঙ ও সৌন্দর্যের প্রয়োজন তেমনি!" এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী যা লিখেছিলেন তার থেকেই অল্প-কথায় তাঁর শিল্পদৃষ্টির একদিককার একটা আভাস পাওয়া যাবে। তিনি বলেছিলেন—

—"No I won't. Why can't you see the beauty of colour in vegetables? And then, there is beauty in the speckless sky. But no, you want the colours of the rainbow which is a mere optical illusion. We have been taught to believe that what is beautiful need not be useful and what is useful cannot be beautiful. I want to show that what is useful can also be beautiful."

অর্থাৎ না, আমি বলবো না। শাকসব্জীর মধ্যে তোমরা রঙের সৌন্দর্য দেখতে পাও না কেন? তাছাড়া, নির্মেঘ আকাশেরও তো সৌন্দর্য রয়েছে। কিন্তু না, তোমরা রামধনুর রঙ, যা দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র, তাই চাও। আমাদের এই বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে যে, যা সুন্দর তাকে প্রয়োজনীয় হতে হবে না, আর যা প্রয়োজনীয় তা সুন্দর হতে পারে না। আমি দেখাতে চাই যে, যা প্রয়োজনীয় তাও সুন্দর হতে পারে।

সৌন্দর্য ও প্রয়োজনের মধ্যে সম্পর্কটা কি এ নিয়ে রূপতাত্ত্বিকদের মধ্যে বহুকাল মত-বিরোধ চলে আসছে। কিন্তু কোন মীমাংসায়ই এ পর্যন্ত তাঁরা পৌঁছান নি। প্রয়োজনের স্পর্শ লাগলেই সৌন্দর্য তার জাত খোয়াবে এ মত যাঁরা পোষণ করেন, মহাত্মাজী যে রূপতত্ত্বে সে দলভুক্ত নন উপরের উদ্ধৃতি থেকেই তা বোঝা যাবে। প্রসঙ্গত এখানে একটা কথা বলা যেতে পারে। সে কথাটা এই যে, যারা শুধু প্রয়োজনাতীতের মধ্যেই সৌন্দর্যের সন্ধান পান, তাঁদের দৃষ্টি যে অপর দলের চেয়ে অপরিসর, তা বললে বোধ হয় অবিচার করা হবে না। কারণ দ্বিতীয় দলের রূপতাত্ত্বিক যাঁরা, তাঁরা প্রয়োজনীয়তার মধ্যেও যেমন সুন্দরকে দেখেন, প্রয়োজনাতীতের মধ্যেও তেমনি সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হন না। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যাঁরা পালং শাকের সবুজ শোভায় সৌন্দর্যের সন্ধান পান, ফুলের সৌন্দর্য উপভোগে তাদের কোন বাধা

হয় না। কিন্তু প্রথম দল ফুলের সৌন্দর্য উপলব্ধিতে যতই মুখর হন না কেন, পালং ক্ষেতের হরিৎ শোভাকে সুন্দর বলে মেনে নিতে মতবাদের খাতিরেও অন্তত একটা কুণ্ঠা বোধ করেন। প্রয়োজন ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে মনীষী এমার্সন যা বলেছেন, প্রাসঙ্গিক বলেই তা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন—

"Beauty must come back to the useful arts, and the distinction between the fine and the useful arts be forgotten. If history were truly told, if life were nobly spent, it would be no longer easy or possible to distinguish the one from the other. In nature, all is useful, all is beautiful. It is therefore beautiful, because it is alive, moving, reproductive, it is therefore useful, because it is symmetrical and fair."

অর্থাৎ প্রয়োজনীয় শিল্পের মধ্যেও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে হবে এবং চারুশিল্প ও কারুশিল্পের পার্থক্য ভুলে যেতে হবে। ইতিহাসকে যদি সত্যভাবে বিবৃত করা হয়, জীবন যদি মহৎভাবে যাপিত হয়, তা হলে ওর একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করা আর সহজ বা সম্ভব হবে না। প্রকৃতিতে সবই প্রয়োজনীয়, অথচ সবই সুন্দর। সে জীবন্ত, চলন্ত ও সৃষ্টিশীল বলেই সুন্দর আর সুসমঞ্জস ও মনোরম বলেই প্রয়োজনীয়।

শিল্পকলা সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত আলোচনা করতে গিয়ে মোটামুটি দুটি কথা বলতে চেয়েছি। তার প্রথমটি হ'ল এই যে, জীবনকে যিনি সদাজাগ্রত সাধনার দ্বারা পরিপূর্ণ বিকাশের পথে যত বেশীদূর এগিয়ে দিয়েছেন, যিনি তাকে পরিপূর্ণতার যত কাছাকাছি নিয়ে গেছেন, তিনি তত বড় শিল্পী। একথাটি যে ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের গোড়ার কথা বৈদিক ঋষি, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর উক্তি উদ্ধৃত করে তা দেখাতে চেষ্টা করেছি। শিল্পতত্ত্বে ভারতীয় চিন্তাধারার একটা ঐতিহ্যগত যোগসূত্রের ইঙ্গিতও এতে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত যে কত দৃঢ় ও সুস্পষ্ট, তা দেখাবার জন্য তাঁর লেখা থেকে এখানেও একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেনঃ—

"As I am nearing the end of my earthly life I can say that purity of life is the highest and truest art. The art of producing good music from a cultivated voice can be achieved by many, but art of producing that music from the harmony of a pure life is achieved very rarely."

অর্থাৎ 'আমি পার্থিব জীবনের সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি বলেই বলতে পারি যে, জীবনের শুচিতাই হ'ল মহত্তম ও সত্যতম শিল্প। স্বরানুশীলনের ফলে অনেকেই ভাল সঙ্গীতকলা সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু শুচি-শুভ্র জীবনের সুসমতার ফলে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, তা কদাচিৎ কারো আয়ত্ত হয়।'

দ্বিতীয়ত আমরা দেখেছি যে, গান্ধীজীর সৌন্দর্যবোধ প্রয়োজন আর প্রয়োজনাতীতের গণ্ডি দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজনীয়ের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যও যেমন তাঁর সমুদার দৃষ্টির সম্মুখে স্ফুরিত হয়, শিল্পতাত্ত্বিকরা যাকে 'শিল্প' সংজ্ঞা দিয়ে বলতে চান প্রয়োজনাতীত তারও মধ্যে প্রয়োজনের সত্তাটি তাঁর সন্ধানী চোখে তেমনই ধরা পড়ে। কিন্তু কেবল প্রয়োজন-প্রয়োজনাতীতের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেই ত আর শিল্পতত্ত্বের সব কথা বলা হয় না। আরও অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে জেগে ওঠে, অনেক সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারে। প্রথমেই যে কথাটা মনে জাগে তা হ'ল এই যে, প্রয়োজনীয় ও তথাকথিত প্রয়োজনাতীত উভয়ই গান্ধীজীর মতে শিল্প বলে পরিগণিত হতে কোন বাধা নেই বটে, কিন্তু শিল্প বলতে বস্তুত তিনি কি বোঝেন বা বোঝাতে চান তা ঐ কথাতে মোটেই স্পষ্ট হয় না। কাজেই গান্ধীজীর মতে শিল্প কি, সে কথাটা বোঝবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

গান্ধীজীর মতে শিল্প যা, তা সত্যকে প্রকাশ করবে, করবে আত্মার বিকাশে সহায়তা। সেই শিল্পের যিনি স্রষ্টা তিনিই হলেন প্রকৃত শিল্পী।

"Jesus, to my mind, was a supreme artist because he saw and expressed truth."

আমার মতে যীশু একজন পরম শিল্পী, কারণ তিনি সত্যের দেখা পেয়েছিলেন এবং সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন—একথা তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন। জিজ্ঞাসু গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু এমনও তো দেখা গেছে, জীবন যাদের সংযত ও সুন্দর নয় তাঁরাও অপূর্ব সৌন্দর্যের, অনুপম শিল্পের সৃষ্টি করেছেন।

এর উত্তরে গান্ধীজী যা বলেছিলেন, তাতে যে শুধু তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও শিল্পরুচিরই পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, মনোবিজ্ঞানের একটা বড় তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর সচেতনতার প্রমাণ আমরা পাই। সে তত্ত্বটি হ'ল দ্বৈত ব্যক্তিত্ব বা ইংরেজিতে যাকে বলে dual personality। একই মানুষের মধ্যে যে পাশাপাশি দেবত্ব ও দানবত্ব, শিল্পী আর অশিল্পী, সাধু ও অসাধু একই সঙ্গে বর্তমান থাকতে পারে, মনোবিদেরা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে তা' প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা সেই সত্যেরই পরিচয় পাই। কাজেই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির জবাবে গান্ধীজী সেই সত্যটিকেই জিজ্ঞাসুর কাছে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেনঃ—

"That only means that truth and untruth often co-exist, good and evil are often found together. In an artist also not seldom the right perception of things and the wrong co-exist. Truly beautiful creations come when right perception is at work. If these moments are rare in life they are also rare in Art."

অর্থাৎ "তাতে শুধু এই বোঝা যায় যে, সত্য ও অসত্য অনেক সময় এক সঙ্গেই থাকে; ভাল এবং মন্দকে প্রায়ই পাশাপাশিই থাকতে দেখা যায়। শিল্পীর মধ্যেও বস্তুর সত্যানুভূতি ও অসত্যানুভূতি অনেক সময়ই পাশাপাশি থাকে। যখন সত্যানুভূতি সক্রিয় হয়, তখনই সত্যিকার রূপসৃষ্টি সম্ভব হয়। এরূপ মুহূর্ত জীবনেও যেমন শিল্পেও তেমনি দুর্লভ।"

রবীন্দ্রনাথও একস্থানে তাঁর কাব্যময় ভাষায় এই কথাই বলেছেনঃ—

"কলাবান্ গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী, সেখানে তাঁহারা তপস্বী; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না; সেখানে চিত্তের সাধনা ও সংযম আছেই। অল্প লোকই এমন পুরাপুরি বলিষ্ঠ যে, তাঁহাদের ধর্মবোধকে ষোলো আনা কাজে লাগাইতে পারেন। কিছু না কিছু ভ্রষ্টতা আসিয়া পড়ে। কারণ, আমরা সকলে হীনতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। চরমে আসিয়া দাঁড়াই নাই। কিন্তু জীবনে আমরা যে কোনো স্থায়ী বড়ো জিনিস গড়িয়া তুলি, তাহা আমাদের অন্তরের ধর্ম-বুদ্ধির সহায়েই ঘটে, ভ্রষ্টতার সাহায্যে নহে। গুণী ব্যক্তিরাও যেখানে তাঁহাদের কলা রচনা স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের চরিত্রই দেখাইয়াছেন; যেখানে তাঁহাদের জীবনকে নষ্ট করিয়াছেন, সেখানে চরিত্রের অভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সেখানে, তাঁহাদের মনের ভিতরে ধর্মের যে একটি সুন্দর আদর্শ আছে, রিপুর টানে তাহার বিরুদ্ধে গিয়া পীড়িত হইয়াছেন। গড়িয়া তুলিতে সংযম দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম। ধারণা করিতে সংযম চাই, আর মিথ্যা বুঝিতেই অসংযম।"

যেমন শিল্পী সম্বন্ধে তেমনি শিল্প সম্বন্ধেও গান্ধীজীর বিচারের মানদণ্ড হল সত্য। যাতে মানুষকে সত্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে না, মানুষকে যা পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে দেয় না, তাকে 'শিল্প' সংজ্ঞা দিতে তিনি স্বভাবতই কুণ্ঠিত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

"These productions of man's Art have their value only so far as they help the soul onwards towards self-realisation.

অর্থাৎ 'মানুষের শিল্পসৃষ্টির ততটুকুই সার্থকতা আছে যতটুকু আত্মোপলব্ধির দিকে তা অগ্রসর করে দেয়।' একটা কথা এখানে বোঝা আবশ্যক যে, গান্ধীজী আত্মোপলব্ধি বা সত্যোপলব্ধি বলতে বস্তুতঃ একই জিনিস বোঝাতে চেয়েছেন।

তারপর গান্ধীজী আরও অগ্রসর হয়ে গেছেন। সত্যিকার যা' শিল্প তাতে মানুষকে তার আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করবে বটে, কিন্তু সেরূপ শিল্প সৃষ্টি কি যে কেউ করতে পারে?

গান্ধীজী বলেছেন, না। যাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সত্যের মধ্যে রূপ ফুটে ওঠে, সত্যকেই যিনি সৌন্দর্য বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন ঐরূপ মহৎ শিল্পের সৃষ্টি সেইরূপ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

Whenever men begin to see beauty in truth, then true Art will arise.

অর্থাৎ 'তখনই সত্যকার শিল্পের সৃষ্টি হবে, যখন মানুষ (শিল্পী) সত্যের মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান পাবে।' কারণ সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের পৃথক অস্তিত্বকেই গান্ধীজী স্বীকার করেন না।

(There is then, as I have said, no Beauty apart from Truth.)

সত্য ও সৌন্দর্যের এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের কথা প্রতীচ্যের কয়েকজন মনীষীও এমনই জোরের সঙ্গে বহু স্থানে বলেছেন। আমরা তার মধ্যে একজনের লেখা থেকে সামান্য দু-একটা অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও শিল্প-সমালোচক মনস্বী রাস্কিন বলেছেনঃ—

But I say that the art is greatest which conveys to the mind of the spectator, by any means whatsoever, the greatest number of the greatest idea; and I call an idea great in proportion as it is received by a higher faculty of the mind, and as it more fully occupies, and in occupying, exercises and exalts the faculty by which it is received.

If this then be the definition of great art, that of a great artist naturally fellows. He is the greatest artist who has embodied, in the sum of his works, the greatest number of the greatest ideas.

অর্থাৎ যে শিল্প দর্শকের মনে যে কোন উপায়েই হউক না, সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মহৎভাব সঞ্চারিত করতে পারে, আমি সেই শিল্পকেই শ্রেষ্ঠ শিল্প বলি। চিত্তের উন্নত বৃত্তির কাছে যে পরিমাণে সেই ভাব গ্রহণীয় হয় এবং সেই বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে যে ভাব তাকে ক্রিয়াশীল ও উন্নীত করে, মহৎ ভাব বলতে আমি সেই ভাবই বুঝি।

এই যদি শ্রেষ্ঠ শিল্পের সংজ্ঞা হয়, তাহলে এর থেকেই বুঝা যাবে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সংজ্ঞা কি হবে। যে শিল্পী তার দৃষ্টিতে সব চেয়ে বেশি মহৎ ভাবের সন্নিবেশ করতে পেরেছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

মিঃ রাস্কিন অন্যত্র বলেছেনঃ—

"The next characteristic of great art is that it includes the largest possible quantity of truth in the most perfect possible harmony.'

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সত্য অত্যন্ত সুসমঞ্জসভাবে তার অন্তর্নিহিত হয়ে থাকে।

ঋষিপ্রতিম টলস্টয়, মনীষী এমার্সন এবং প্রতীচ্যের আরও অনেক শিল্পরসজ্ঞ মনীষীর লেখা থেকে অনুরূপ উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধে অতিবিস্তৃতির আশঙ্কায় আমরা সেগুলোর উল্লেখ এখানে আর করলাম না।

শিল্প সম্বন্ধে গান্ধীজীর আর একটা দাবী এই যে, সত্যকার যে শিল্প তার আবেদন হবে সর্বজনীন। যে শিল্পের আবেদন পৃথিবীতে কেবল কয়েকজন মানুষের মনেই সাড়া জাগায়, কোটি কোটি মানুষের চিত্ত যার কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে, তা থেকে কোনই প্রেরণা পায় না, যার রহস্যালোকের চাবি কাঠিটি কয়েকজন বিশেষ মানুষের কেবল অধিকারে, অগণিত রসপিপাসু মনের আকূতি যার রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করতে পারে না, না পায় তাতে প্রবেশের অধিকার, সে আর্ট গান্ধীজীর মতে ব্যর্থ—তাঁকে মহৎ শিল্প নামে অভিহিত করতেও গান্ধীজী কুণ্ঠিত। যেমন ধর্মজগতে তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রেও গান্ধীজী সে দেবতার পায়ে মাথা নোয়াতে নারাজ, যার কাছে কোটি কোটি মানুষ অচ্ছুত বলে পায় না প্রবেশের অধিকার। দিলীপকুমারের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে গান্ধীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথাই বলেছেনঃ—

"......আমি তাহাকে মহৎ শিল্প বলি না যার কদর শুধুই বিশেষজ্ঞদের কাছে—অর্থাৎ টেক্‌নিকের অন্ধি সন্ধি না জানলে যার কোনো মাথা মুণ্ডুই পাওয়া যায় না। আমি মনে করি যে মহৎ শিল্পের আবেদন ঠিক প্রকৃতির সৌন্দর্যের মতই বিশ্বজনীন। চুলচেরা বিচার নিয়ে মাথা ঘামানোর নামই যে শিল্পবোধ এ আমি ভাবতেই পারি না। খাঁটি রসবোধের সঙ্গে সমজদারিয়ানা ও তানটানের চেকনাইয়ের কোন সম্বন্ধই নেই। তার বেশ হবে সরল—তার প্রকাশ হবে সহজ—ঐ যে বললাম ঠিক প্রকৃতির প্রাঞ্জল ভাষার মতন।" (তীর্থংকর, ৬৮ পৃঃ) অন্যত্রও তিনি এই ধরণের অভিমত অনেক স্থানে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

"I want art and literature that can speak to the millions.

যে শিল্প ও সাহিত্য কোটি কোটি মানুষের বোধগম্য সেইরূপ শিল্প ও সাহিত্যই আমি চাই।"

"Here too, just as elsewhere, I must think in term of millions.

যেমন অন্যত্র তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রেও আমি জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিচার করবো।" আর এক স্থানে তিনি বলেছেন—

"I love music and all other arts, but I do not attach such value to them as is generally done. I cannot for example recognise the value of those activities which require technical knowledge for their understanding.

আমি সংগীত ও অন্যান্য শিল্প ভালবাসি, কিন্তু সাধারণতঃ এর উপর যে মূল্য আরোপ করা হয় তা আমি করি না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যে 'সমস্ত শিল্পকার্য বুঝতে হলে টেকনিকের জ্ঞান অপরিহার্য তার মূল্য আমি উপলব্ধি করতে পারি না।"

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনীষী কাউণ্ট লিও টলস্টয়ের 'What is art?' বইখানার নাম অনেকেরই জানা। মনস্বী লেখক এই গ্রন্থে যে নিষ্ঠা, যে দরদ এবং যেরূপ তদ্‌গত হয়ে শিল্পতত্ত্বের আলোচনা করেছেন তার তুলনা দুর্লভ। আমরা শিল্পী ও শিল্প-রসিক সকলকেই বইখানা পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। শিল্পের ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে টলস্টয় যে স্বপ্ন দেখেছেন, গান্ধীজীর পূর্বোক্ত মত-বাদের সঙ্গে তার আশ্চর্য সঙ্গতি রয়েছে। তিনি বলেছেনঃ—

Artistic activity will then be accessible to all men. It will become accessible to the whole people because (in the first place) in the art of the future not only will that complex technique which deforms the productions of the art of today, and requires so great an effort and expenditure of time, not be demanded but on the contrary the demand will be for clearness, simplicity, and brevity—conditions brought about not by mechanical methods but through the education of taste.

অর্থাৎ শিল্পকার্য তখন সকল মানুষেরই অধিগম্য হবে। আজিকার শিল্পদৃষ্টি টেক-নিকের যে মারপ্যাচে বিকৃত হয়, তাতে যে বিফল প্রয়াস ও সময়ব্যয়ের প্রয়োজন হয় ভবিষ্যৎ কালের শিল্পে তা থাকবে না বলেই তা সর্বজনের অধিগম্য হবে। ভবিষ্যতের শিল্প হবে স্পষ্ট, সরল ও সংহত। শিল্পে এ অবস্থা আনতে কোন যন্ত্রবদ্ধ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে না, রুচিশিক্ষার ভিতর দিয়েই শিল্পে এ (স্পষ্ট ও সংহত সরলতা) আনা যাবে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, গান্ধীজী শিল্প সম্বন্ধে যা বলেছেন তা' হল তাঁর মতে শিল্পের আদর্শ। যে শিল্পী এই আদর্শের যত কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুতে পারবেন, তাঁর শিল্প সাধনা হবে সেই পরিমাণে সার্থক, শিল্পী হিসাবে তাঁর স্থান কোথায় তার বিচারও সেই নিরিখেই করা হবে। তবে শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্পীকে কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে গান্ধীজীর পূর্বোদ্ধৃত উক্তি-গুলো থেকে তার যেমন ইঙ্গিত পাওয়া যাবে তেমনি পাওয়া যাবে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি থেকে। আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশে কেন সব দেশেই এমন শিল্পীর অভাব নেই যাঁরা আঙ্গিকের কারিকুরির উপরই শিল্পের সার্থকতা নির্ভর করে বলে মনে করেন এবং তার উৎকর্ষ সাধনেই সময় ও চিন্তা ব্যয় করেন। এই আঙ্গিকপ্রাণ শিল্পবাদের প্রতিবাদ-স্বরূপই যেন গান্ধীজী বলেছেন—

"True art takes note not merely of form but also of what lies behind. There is an art that kills and an art that gives life. True art must be evidence of happiness contentment and purity of its authors."

অর্থাৎ "প্রকৃত যে শিল্প তা শুধু বাহ্য আকার সম্বন্ধেই অবহিত নয়, আকারের অন্তরালে যা আছে সে সম্বন্ধেও সচেতন। শিল্প যেমন জীবনপ্রদ হতে পারে তেমনি এমন শিল্পও আছে যা জীবনধ্বংসী। সত্যকার যে শিল্প তা' শিল্পীর আনন্দ, তৃপ্তি ও পবিত্রতার পরিচয় দেবে।"

শিল্পকে গান্ধীজী কি দৃষ্টিতে দেখেন তার মোটামুটি আলোচনা করেছি। এই আলোচনা প্রসঙ্গে দেশী ও বিদেশী অনেক মনীষীর উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়েছে। গান্ধীজীর শিল্প-দর্শন যে খাপছাড়া উদ্ভট কিছু নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও শিল্পস্রষ্টাদের অনেকেই যে অনুরূপভাবে ভাবিত এই দেখাবার জন্যই উদ্ধৃতিগুলো দেওয়া হয়েছে। মানব-প্রেমিক গান্ধীজী সব কিছুকেই মানুষের কল্যাণের দিক থেকে বিচার করেছেন। যাতে মানুষের কল্যাণ করে না, মানুষের জীবনকে করে না মহত্তর, সুন্দরতর ও পবিত্রতর গান্ধীজীর কাছে সেরূপ কোন কিছুরই বড় একটা আবেদন নেই। মানুষকে যাঁরা ভালবাসেন, মানুষের জীবনকে —সমাজকে যাঁরা শান্তির নিলয়ে পরিণত করতে চান, সুস্থতর সুন্দরতর করে গড়ে তুলতে চান, তাঁদের শিল্পরুচিতেও এই বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে হবে। বিভিন্ন দেশের মানবপ্রেমিক মনীষীদের চিন্তাধারার অনুসরণ করলেও আমরা এই সত্যেরই সন্ধান পাই। মানুষের জীবন ও সমাজকে যদি শোভন ও সুন্দর করে তুলতে হয়, সত্যকার শিল্পরুচিকে সৌন্দর্য-বোধকে কতিপয় মানুষের বিলাসকলার অন্তর্ভুক্ত করে না রেখে তাকে মানুষ মাত্রেরই জীবনগত করে ফেলতে হবে। তা হলে এই রুচিবোধ—এই সৌন্দর্যশ্রীতেই মানুষকে হীনতা ও জীবনের কদর্যতা থেকে রক্ষা করবে, মানুষের জীবন মধুময় হয়ে উঠবে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'The National Value of Art' পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা বলেছেন। আমরা নিম্নে তা উদ্ধৃত করে দিলামঃ—

"Art galleries can not be brought into every home, but, if all the appointments of our life and furnitures of our homes are things of taste and beauty, it is inevitable that the habits, thought and feelings of the people should be raised, ennobled, harmonised, made more sweet and dignified."

অর্থাৎ "আর্ট গ্যালারি প্রতি গৃহে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ ও গৃহের প্রতিটি আসবাব যদি রুচিসম্মত ও সুন্দর হয় তা'হলে মানুষের আচার, চিন্তা ও মনোবৃত্তি যে উন্নততর, মহত্তর, সামঞ্জস্যপূর্ণ, মাধুর্যমণ্ডিত ও মহিমান্বিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

অবশেষে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে এ প্রবন্ধের উপসংহার করবো। গান্ধীজী বহুবার বহুস্থলে বলেছেন যে, তারায় ভরা নীল আকাশ, প্রকৃতির অফুরন্ত শোভাসম্পদই তার সৌন্দর্যস্পৃহা তৃপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। তবু মহৎ শিল্প মহাত্মাজীর মনে যে কিরূপ সুগভীর আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়, একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই তা বোঝা যাবে। ভ্যাটিকানের সিস্টাইন ভজনালয়ে (Chapel) যীশুখৃষ্টের মূর্তি দেখে মহাত্মাজী কিরূপ বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ভাবের আবেগে তাঁর হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তাঁর নিজের ভাষায়ই তা আমরা এখানে পরিবেশন করছি। তিনি বলেছেনঃ—

"I saw a figure of Christ there. It was wonderful. I could not tear myself away. The tears sprang to my eyes as I gazed."

অর্থাৎ সেখানে আমি খৃষ্টের একটি মূর্তি দেখি। মূর্তিটি অপূর্ব। আমি সেখান থেকে চলে আসতে পারছিলাম না। আমি যখন তাকিয়েছিলাম আমার চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

সাধারণ লৌকিক অর্থে আমরা যাকে শিল্পী বলি মহাত্মাজী যে তা নন, তা' আমরা পূর্বেই বলেছি। তিনি কবি নন, কিন্তু সত্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ তাঁর মনের ভাব তাঁর লেখায় আপনা-আপনি কাব্যময় হয়ে ফুটে উঠেছে। 'The Cow is a poem of pity'র মত ছত্র শুধু পৃথিবীর মহত্তম কবিদের হাত দিয়ে বেরুনোই সম্ভব। ভজন গানের মাধুর্য তাঁর সমগ্র সত্তাকে পরিপ্লুত করে দিত। তিনি বলেছেনঃ—

'Music means rhythm. Its effect is electrical. It immediately soothes.'

'সঙ্গীত অর্থ ছন্দ ও শৃঙ্খলা। সঙ্গীত বিদ্যুতের মত দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্তি এনে দেয়।' সত্যের অকৃত্রিম সাধক বলেই তিনি সত্যকার সৌন্দর্যেরও পূজারী। তাই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেনঃ—

'Truth and beauty I crave for, live for, and would die for.

অর্থাৎ আমি সত্য ও সৌন্দর্য-পিপাসু, তাঁর জন্যই আমার জীবন এবং জীবন দানও আমি তার জন্য করবো।' বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র সত্তাই শিল্পময়, সহজ সরল সৌন্দর্যময় বলে তাঁর প্রতি বাক্য, কার্য ও আচরণই শিল্পের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠতো। তাই ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলেছেনঃ—

He becomes lyrical when he describes the 'music of the spinning wheel,' the oldest music in India, which delighted Kabir the poet-weaver. অর্থাৎ যখন ভারতের প্রাচীনতম সঙ্গীত, যে সঙ্গীতে কবি-তন্তুবায় কবির মুগ্ধ হতেন, সেই চরকার সঙ্গীতের কথা তিনি যখন বর্ণনা করতেন তখন তাঁর ভাষা কাব্যময় হয়ে উঠতো।'

'সংগঠন' হইতে উদ্ধৃত

স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বি এ পাঠ ও বিবাহ

জানকীনাথ কটকেই র‍্যাভেন্‌স কলেজেই বি এ পাঠ আরম্ভ করেন এবং এফ এ পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ায় অন্তত প্রথম দিকটা পাঠের কোন অসুবিধা হয় নাই। তিনি প্রধানতঃ কটকেই থাকেন, মাঝে মাঝে কোদালিয়ায় আসিয়া বাস করেন। তখনকার দিনে কটক হইতে যাতায়াত খুব সহজ ছিল না। একবার দেশে আসিয়া শুনিলেন তাঁহার বিবাহের কথাবার্তা হইতেছে। তখন বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর; দুঃখের সংসার, উপজীবিকার পথ অনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না। কিন্তু সেদিনে অভিভাবক যাহা স্থির করিয়া দিতেন, তাহার উপর পাত্র পাত্রীর কোনও কথাই চলিত না। জানকীনাথ এই সংবাদে বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন; কিন্তু যেখানে অভিভাবকরা কথা বলিতেছেন, তখন আপনার মতামত প্রকাশ করা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই।

একদিন সত্য সত্যই পাত্রীপক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাত্রীর পিতামহ কাশীনাথ দত্ত মহাশয়; সঙ্গে বিশ্বস্ত পুরাতন পরিচারক গোপাল। পাত্র তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর (থার্ড ইয়ার ক্লাশ) ছাত্র মাত্র। কাশীনাথ আসিয়া বেকন (Lard Bacon)-এর উপর প্রবন্ধ লিখিতে দিলেন। জানকীনাথ খানিকটা সময় চাহিলেন, কিন্তু কাশীনাথ পরের ট্রেণে কলিকাতা ফিরিতে চান। তখনকার দিনে সন্ধ্যায় ফিরিবার মাত্র একখানি ট্রেণ ছিল। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া শেষ করিতে হইল। কাশীনাথ পণ্ডিত লোক; বিশেষত ইংরাজি সাহিত্য পাঠে তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্তি ছিল। তিনি জানকীনাথের প্রবন্ধ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। এত অল্প সময়ে বেকন সম্বন্ধে এরূপ প্রবন্ধ লেখা যে সম্ভব তাহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই।

তিনি পথে গোপালের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এ সকল বিষয় বাড়ির লোকের সহিত আলোচনা যাহাই হউক গোপালের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হওয়া চাই। সে যুগে বিশ্বস্ত পরিচারক পরিবারের অঙ্গীভূত একজন বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সংসারের বহু অতি প্রয়োজনীয় এবং গোপনীয় সংবাদ কর্তারা আপনাদের বৃদ্ধ পরিচারকদের নিকট বিশ্বাস করিয়া জানাইতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিশ্বাসের কোন অপপ্রয়োগ হইত না।

স্টেশনের পথে কাশীনাথ পাত্র সম্বন্ধে গোপালের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। বলা বাহুল্য, জানকীনাথের দারিদ্র্য, সাংসারিক অবস্থা প্রভৃতি আলোচনা করিয়া যে মত স্বতঃই মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, বিশেষত হাটখোলার দত্ত পরিবারের এবং জার্ডিন স্কিনার কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী কাশীনাথ; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণের প্রথমা কন্যা আদরের প্রভাবতীর বিবাহের পাত্র যে জানকীনাথ হইতে পারে না, এই মতই গোপাল ব্যক্ত করিল। কাশীনাথ ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রবন্ধের বিশেষত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া জানকীনাথের হৃদয়গ্রাহী ব্যবহার, কথা বলার ভঙ্গী এবং জীবনের ঘটনার সহিত নিজেকে মিলাইয়া চলিবার রীতি প্রভৃতি কতগুলি বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই যুবক শীঘ্রই তাহার অবস্থা ফিরাইয়া অভাবের হাত হইতে মুক্ত হইবে এবং সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে। কাশীনাথ বাড়িতে ফিরিয়া সকল কথা বলিলেন। দেখা গেল, গোপালের মতের সমর্থনকারী লোকই বেশী। সমাজিক ক্রিয়াকর্ম ভাগ্যে তখন ভোটে পরিচালিত হইত না, তাহাতেই গৃহকর্তা কাশীনাথ ভোটে হারিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও একপ্রকার জোর করিয়াই সেই বিবাহ দিলেন।

প্রভাবতী

প্রভাবতী কাশীনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রথম পুত্র গঙ্গানারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যা। প্রভাবতীর পূর্বে দুই ভ্রাতা সুরেন্দ্র ও যতীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রভাবতী ১২৭৫ সালের ১৩ই ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯) ভূমিষ্ঠ হন। তাহার পর আর সাত ভাই ও পাঁচ ভগ্নী জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা মিলিয়া প্রভাবতী সমেত গঙ্গানারায়ণের পঞ্চদশ সন্তান। বিবাহের তারিখ লগ্ন স্থির হইয়া গেল এবং এক কাশীনাথের বিশ্বাসের উপর ১৮৮০ সালের ৮ই ডিসেম্বর (২৪শে অগ্রহায়ণ ১২৮৭) শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ধনীঘরের কন্যা প্রভাবতী বালিকা বধূরূপে কোদালিয়ার জানকীনাথের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশীনাথের দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে পরে আর কাহারও সন্দেহ করিবার যে কিছুই ছিল না, তাহা ভবিষ্যৎ অতি পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য দান করিয়াছে। প্রভাবতীর ব্যবহার সকলকে মোহিত করিয়াছিল। বাক্যে আচরণে প্রভাবতীর নিকট এমন ব্যবহার কেহ পান নাই, যাহাতে দরিদ্রঘরে কেহ মনে কখনও ব্যথা পাইয়া থাকেন।

কর্মক্ষেত্রের সূচনা

জানকীনাথ বিবাহের পর র‍্যাভেন্‌স কলেজ হইতে ১৮৮২ সালে বি-এ পাশ করেন। কৃষ্ণবিহারী সেন জানকীনাথের পঠদ্দশায় এ্যালবার্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি এই সময় এ্যালবার্ট কলেজের রেক্টর (Rector) হইয়া কলেজ পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানকীনাথকে ন্যায় (Logic)-এর অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত বৃন্দাবন বসু মহাশয় জয়নগর মিত্রবাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন। সেই সূত্রে জানকীনাথের সেখানে যাতায়াত ছিল এবং বসু পরিবারের দুঃসময়ে মিত্রবাবুদের সহৃদয়তা ও সাহায্যের কথা তাঁহার স্মরণ ছিল। জয়নগর ইনস্টিটিউশন তখন একজন উপযুক্ত প্রধান শিক্ষকের অভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। তাঁহার নিকট এই কার্যের ভার লইবার জন্য অনুরোধ আসিল। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে জয়নগর ইনস্টিটিউশনে প্রধান শিক্ষক (১৮৮৩—৮৪) হইয়া যান। তখনই তাঁহার মনের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি মূল গ্রহণ করিয়াছে। হাইকোর্টের বিচারে দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ডের আদেশ শুনিয়া তিনি স্কুলের প্রথম তিন শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট গিয়া মামলার মর্ম বুঝাইয়া দেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর এক একটা ছাত্রের হাতে কালো ফিতা পরাইয়া দিবার পর স্কুল সে-দিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেন। সে-যুগে ইহা অত্যন্ত সাহসের পরিচয়। তাহার পর স্কুল কর্তৃপক্ষের সহিত যে তাঁহাকে ইহা লইয়া বোঝাপড়া করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

আইন ব্যবসায়ের সূত্রপাত

তিনি শিক্ষকতা করিবার কালে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন হইতে ১৮৮৪ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কতদূর ঝোঁক ছিল তাহা বলা যায় না; তবে অবস্থা-পরম্পরা তাঁহাকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার নিকট তৎকালীন যাঁহারা আদর্শ পুরুষ অর্থাৎ দ্বারকানাথ, উমেশচন্দ্র, শিবনাথ, কৃষ্ণবিহারী, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই শিক্ষকতা করিয়া জীবিকার্জন করিতেছেন; সুতরাং তিনিও প্রথম সুযোগে শিক্ষক হইয়া উপার্জ্জন আরম্ভ করেন।

এই সময় প্রভাবতীর সহিত বিবাহ এবং সেই সূত্রে প্রভাবতীর পিতৃগৃহের প্রভাব কতক পরিমাণে তাঁহার ব্যবহারজীব জীবনের জন্য দায়ী। প্রভাবতীর পিতার তৃতীয়া ভগ্নীর স্বামী কটকের প্রথিতযশা উকীল (রায় বাহাদুর) হরিবল্লভ বসু। তিনি আপন ব্যবসায়ে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিবেক ও বিচার প্রয়োগ করিয়া ওকালতি করার ফলে তাঁহার কাজ যেমন প্রচুর ছিল, তেমনই মক্কেলের সম্পূর্ণ কাজ না করিয়া পয়সা লওয়া বিষবৎ ছিল। তিনি একজন উপযুক্ত সহকারীর অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিলেন। জানকীনাথকে পাইলে তাঁহার মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন এই হইল তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। সৌম্যদর্শন, প্রিয়ভাষী, ক্লান্তিহীন, কঠোর পরিশ্রমী, সত্যানুরাগী এবং পাঠোৎসাহী বলিয়া জানকীনাথ তখন আত্মীয়, বন্ধু ও ছাত্রমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। সেই যশোবার্তা হরিবল্লভের নিকট পৌঁছিলে তিনি জানকীনাথ ও প্রভাবতীকে কটকে লইয়া যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিলেন।

সন্তান লাভ

জানকীনাথ আইন অধ্যয়নকালে প্রথম সন্তান কন্যা প্রমীলাবালাকে লাভ করেন। প্রমীলা ১৮৮৪ সালের ৩১শে মে তারিখে বরাহনগরে মাতামহ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীনাথ হাটখোলা পরিবার হইতে পৃথক হইয়া আসেন এবং বরাহনগরে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করেন। গঙ্গানারায়ণের সকল সন্তানই বরাহনগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রভাবতীর দ্বিতীয় সন্তান সরলাবালাও বরাহনগরে ১৮৮৫ সালের ১ই আগস্ট তারিখে ভূমিষ্ঠ হন।

জানকীনাথ ১৮৮৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী কটকে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি অচিরকালের মধ্যে হরিবল্লভের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং অপুত্রক হরিবল্লভ জানকীনাথকে পুত্রাধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কটকের বাগান বাড়ির সম্মুখে স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু ও তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ। বালক সুভাষচন্দ্র সর্বদক্ষিণে দণ্ডায়মান

জানকীনাথের নিকট কটক নূতন নয়। তিনি এফ্‌-এ ও বি-এ পরীক্ষা কটক হইতে পাশ করিয়াছেন। তিনি উড়িষ্যার ভাষার সহিত কতক পরিচিত এবং উড়িষ্যাবাসীর আচার ব্যবহার, রীতিনীতি—সকলই আন্তরিকতার সহিত বিচার করিতে পারিয়াছিলেন। মক্কেলের প্রতি সহানুভূতি, অক্লান্ত শ্রম, অধ্যবসায় এবং ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সহৃদয় ব্যবহার ব্যবহারজীব সমাজে অনতিকাল মধ্যেই জানকীনাথের স্থান নির্দেশ করিয়া দিল।

হরিবল্লভ নিজস্ব বলিয়া আর কিছুই রাখিলেন না। জানকীনাথ ও প্রভাবতী এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ তাঁহার নিজ সন্তানসন্ততির স্থান গ্রহণ করিলেন। জানকীনাথ যখন প্রচুর উপার্জন করেন, তখনও হরিবল্লভের আশ্রয় পরিত্যাগ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। হরিবল্লভের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া স্থানান্তরে যাওয়া সকলেরই নিকট কষ্ট কল্পনা হইয়া উঠিল। হরিবল্লভের গৃহে জানকীনাথের প্রথম পুত্র সতীশচন্দ্র ১৮৮৭ সালের ২রা নভেম্বর, দ্বিতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র ১৮৮৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর এবং তৃতীয় পুত্র সুরেশচন্দ্র ১৮৯১ সালের ১১ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে উড়িয়া বাজারে তাঁহার আবাসগৃহ নির্মিত হইয়া গিয়াছিল। পাঁচটি সন্তান লইয়া জানকীনাথ হরিবল্লভের বাড়ী হইতে নিজ ভবনে গমন করেন।

জানকীনাথ যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেন তাহার তুলনা ছিল না। তাহার একটা প্রধান কারণ যে, তিনি সর্বভাবে আপনাকে উড়িষ্যাবাসীর আপনার জন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যেমন মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিভেদ-জ্ঞান ছিল না, তেমনি প্রাদেশিকতার কোনও লক্ষণই তাঁহার মধ্যে স্থান পায় নাই। তখন হইতে তাঁহার উদার হৃদয় দরিদ্রের, দুঃখীর সমবেদনায় ব্যথিত হৃদয়ের পরিচয় লোকসমক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তাঁহার আবাসে নানাপ্রকার লোকের সমাগম হইত। ব্যবসায়ের যশঃ দূরদূরান্তে ছড়াইয়া পড়িলে, ধনী দরিদ্র নানা মক্কেল আসিয়া উপস্থিত হইতেন; কেহ কেহ বা তাঁহার বাড়িতে থাকিতে বাধ্য হইতেন। নিকট আত্মীয়, বন্ধু প্রভৃতিতে সর্বদাই তাঁহার আবাস পরিপূর্ণ। তাঁহার সদালাপের শক্তির জন্য বহু লোক পরিচয়ের জন্য লালায়িত হইতেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে, সংসারে, বন্ধুবান্ধবের আগমনে তাঁহাকে ক্রমেই প্রায় সকল সময়ই ব্যস্ত থাকিতে হইত। অর্থী প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিত না; দর্শনাকাঙ্খী যাঁহারা, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি সকল কথা নিজে শুনিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন।

সংসার বৃদ্ধি

নানাভাবের লোক সমাগমে বাড়ি মুখর; এই সময় জানকীনাথের অপরাপর সন্তানও জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৮৯২ সালের ২৫শে জুন চতুর্থ পুত্র সুধীর চন্দ্র, ১৮৯৪ সালের ১২ই জানুয়ারী সুনীলচন্দ্র, ১৮৯৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী তৃতীয়া কন্যা তরুবালা, ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী (১১ মাঘ ১৩০৩) বিশ্ববিশ্রুত নেতাজী সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্রের জন্ম সময়ের একটা আভাস দিতে জানকীনাথ চেষ্টা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অনেকগুলি সন্তানের পিতা বলিয়া জানকীনাথের হস্তলিখিত খাতায় অপর কাহারও জন্ম সময় উল্লেখ নাই। এই খাতাখানি তাঁহার অপর কোনও ডায়েরী হইতে সংগ্রহ করিয়া আন্দাজ ১৯৩০ সালে লেখা। সুতরাং সুভাষচন্দ্র তখন ভারতের অবিসম্বাদী নেতা বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া জানকীনাথ লিখিয়াছেন—

"23rd January 1897, a few minutes after 12 a.m., between 12 and 1 p.m."

তাহার পর ১৮৯৮ সালের ৩রা অক্টোবর চতুর্থা কন্যা মলিনাবালা, ১৯০০ সালে ৬ই আগষ্ট পঞ্চমা কন্যা প্রতিভাবালা জন্মগ্রহণ করেন।

১৯০১ সালে জানকীনাথ কটক মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সেই সময় এমন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান খুব কমই ছিল, যাহার সহিত জানকীনাথের সংস্রব ছিল না অথবা তাহা জানকীনাথের সাহায্য পুষ্ট ছিল না।

ইহার পর তাহার আরও তিনটি সন্তান, কন্যা কনকবালা ১৯০২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, সপ্তম পুত্র শৈলেশচন্দ্র ১৯০৪ সালের ১৩ই মার্চ এবং অষ্টম পুত্র ও শেষ সন্তান সন্তোষচন্দ্র ১৯০৫ সালের ২৫শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠা

তাঁহার কর্মকুশলতার খ্যাতি কটক শহরের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র উড়িষ্যায় পরিব্যাপ্ত হইল এবং তিনি ব্যবহারজীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিলেন। ১৯০৫ সালে তাঁহাকে সরকারী উকিল (Government Pleader and Public Prosecutor) নিযুক্ত করা হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে তাঁহার সমান অধিকার ছিল। ক্রমে উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত করদরাজ্যগুলির তিনি মনোনীত উকিল হইয়া উঠিলেন। ভূমি সংক্রান্ত আইনে তিনি অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করেন এবং বিহার উড়িষ্যা আইন পরিষদে তাঁহার সুচিন্তিত পরামর্শ লাভের জন্য ১৯১২ সালে তাঁহাকে সভ্য মনোনয়ন করিয়া প্রেরণ করা হয় এবং সেই বৎসরই তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবন

জানকীনাথ ধন ও জনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সরকারী কর্মচারী, দেশীয় রাজন্যবর্গ অথবা তাঁহাদের কর্মচারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পোষ্য ও প্রার্থী, বন্ধু ও আত্মীয় প্রভৃতি লইয়া জানকীনাথ এক বিরাট গোষ্ঠীর কেন্দ্রস্থলে নিজেকে স্থাপন করিলেন। কিন্তু কোনও দিকে তাঁহার মনোযোগের শৈথিল্য ছিল না। কর্মক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে তিনি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা, সামাজিকতা রক্ষা অথবা তাঁহার পল্লীর দীন দরিদ্র হইতে দুর্গা পূজার ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকিতেন।

সকল কার্যে তিনি যোগ্য সহধর্মিণী লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মত ভাগ্যবান খুব কমই দৃষ্ট হয়। বহু সন্তানের জননী হইয়াও প্রভাবতীর স্বাস্থ্য অটুট ছিল; জানকীনাথকে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইত না। তাহা ছাড়া বিরাট সংসার, চতুর্দশ সন্তান, দুই তিনটি শ্যালক, ভাগিনেয়, কর্মচারী, বাড়ির পরিচারক পরিচারিকা, মালী, কোচম্যান, সহিস, অতিথি, আত্মীয়, স্বগ্রামবাসী প্রভৃতি মিলিয়া প্রতিদিন তাঁহাকে বহু লোকের অন্ন সংস্থান করিতে হইত। অর্থ স্বচ্ছলতার সংসারে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা এবং ব্যয় নির্বাহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু এতগুলি লোকের তদ্বির তদারক আদর-আপ্যায়ন করা কত বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা অনুমান করিয়া লইতে কষ্ট হয় না। এ সকল ব্যাপারে জানকীনাথের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি ছিল, যাহাতে কেহ কোনওরূপে মনে ব্যথা না পায়। সংসারের সমস্ত ভার প্রভাবতীর উপর, কিন্তু যেখানে অনবধানতা, অপরিচয় অথবা অন্য কোনও কারণে যত্নের ত্রুটি হইতে পারে, সেখানে জানকীনাথ অতি সজাগ। গ্রামের দরিদ্র আত্মীয় বা পরিচিত কটকে বা পুরীতে গেলে সাধারণতঃ তাঁহার আবাসে স্থান লাভ করিতেন। এ সকলের যথার্থ মর্যাদা পাচক অথবা বাড়ির লোকে পাছে রাখিতে না পারে, সেই জন্য ব্যবস্থা ছিল, তাঁহার নিজের ভোজনকালে ইঁহাদের স্থান তাঁহার পাশেই নির্দিষ্ট হইত। যদিই বা কোনওরূপে উপেক্ষার সম্ভাবনা থাকে, তাঁহার সম্মুখে তাহা কখনই সম্ভব নয়, ইহা তিনি জানিতেন।

ভোজনকাল অতিক্রম হইলে বা অসময়ে লোক আসিয়া পড়িলে তাঁহার নিয়ম ছিল, বাহিরে বসাইয়া আলাপ করিবার সময় বলিতেন যে, "আজ শরীরটা ভাল নাই, হয়ত আজ কিছু খাইব না" এবং বাটীর মধ্যে পূর্ব হইতেই সেই সংবাদ পাঠাইয়া দিতেন, যাহাতে সহজেই লোকে বুঝিতে পারে যে, "কর্তা" একজনের ভোজ্য আজ উদ্বৃত্ত করিতে চান। তাঁহার মত ছিল, তিনি যখন বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সর্বপ্রকারে পালনের জন্য দায়ী, তখন তাঁহার নিকট লোক আসাতে যেন কাহারও সেদিন অনাহার অর্থাৎ দৈনিন্দন পথ্যের অভাব না ঘটে। যদি বুঝিতেন বাড়ির লোকের অনেকেরই খাইতে বাকী আছে, তাহা হইলে তিনি মত "পরিবর্তন" করিয়া এক সঙ্গে আহারে বসিতেন।

তাঁহার এই ব্যবহারের জন্য বাড়ির লোকজন তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না এবং এক একজন বাড়ির পরিবারভুক্ত হইয়া জীবনাতিপাত করিয়াছে। তখন বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে বালকবালিকাদের যে অন্তরের যোগ জন্মিয়া যাইত তাহাতে সেই সকল পালিত পুত্র কন্যাদের মায়ায় এক পরিবার ছাড়িয়া অন্য পরিবারে লোকজন যাইতে সম্মত হইত না। জানকীনাথের পরিবারে পরিচারিকা সারদা আজ বহু লোকের নিকট পরিচিত। সুভাষের "ধাই মা" সারদা আজীবন জানকীনাথের পরিবারে বাস করিয়া গিয়াছে। লোকজনকে কটু কথা বলা জানকীনাথের স্বভাব বিরুদ্ধ। তাঁহার শাসন ছিল মধুর; অত্যন্ত বিরক্ত হইলে, যে কাজের ভার যাহার উপর ছিল, তাহাকে বলিতেন যে তাহাকে আর সে কাজ করিতে হইবে না, ইচ্ছা হয় বিনা পরিশ্রমে সে বেতন লইতে পারে। এইরূপ শাসনই লোকজনের নিকট অত্যন্ত গুরু বলিয়া মনে হইত।

বহু পরিবার তাঁহাকে পালন ও শাসন করিতে হইয়াছে, কিন্তু এখানেও তাঁহার স্বভাবের বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি সদাই কর্মব্যস্ত, স্বল্পভাষী এবং উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ক্রোধ, বিরক্তি বা স্নেহ প্রকাশে অনভ্যস্ত। আদর করিয়া কাঁধে তুলিয়া বেড়াইয়া স্নেহ প্রকাশ তাঁহার ছিল না, "রাশভারী" বলিয়া বালক-বালিকারা গিয়া তাঁহার নিকট আদরের উপদ্রব করিতে সাহস করিত না, কিন্তু নিকটে পাইলে, পথে পড়িলে বা সময়মত কাছে ডাকিয়া যে স্নেহস্পর্শ দান করিতেন অথবা মধুর আলাপ করিতেন, তাহার ভিতরেই তাঁহার শিক্ষা ছিল, প্রয়োজন মত শাসনও ছিল। তাঁহার শাসনের এমনই গুণ ছিল যে, বালক বালিকা পোষ্যদিগের মধ্যে কেহ উচ্ছৃঙ্খল হয় নাই, কাহারও জন্য কখনও কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় নাই।

সন্তানদের মধ্যে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কাজ করা রীতি বা অভ্যাস ছিল না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও

চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের কাজ করিবার স্বাধীনতা ছিল। এমন ক্ষেত্রে যেখানে তাঁহার অমত থাকিতে পারে, অথচ পুত্রেরা সেরূপ কাজ করিয়াছে, তিনি তাঁহার নিজের বিচার ও সংস্কারমত সদুপদেশ দিতেন। কেহ তাহা সত্ত্বেও বিপরীত আচরণ করিলে তিনি তাহা পুনর্বিচার করিয়া দেখিতেন এবং সেই কাজের মধ্যে কোনও নীচতা খলতা বা মনুষ্যত্বের হানিকর কোনও অংশ নাই জানিলে তিনি তাঁহাদের পক্ষে মত দিতেন।

এ সম্পর্কে অনেক বিষয়ের অবতারণা করা যাইতে পারে। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে সুভাষ সংসারে প্রথম "বিদ্রোহ" ঘোষণা করিল, অর্থাৎ তাহার ভ্রাতারা বা মাতুলরা যাহা করিতেন না, সে তাহাই আরম্ভ করিল। জানকীনাথের গোচরীভূত হইলে তিনি সুভাষকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহাতে কি অসুবিধা হইতে পারে। সুভাষ তাহা কতক শুনিল, কতক উপেক্ষা করিল। কিন্তু জানকীনাথ যখন দেখিলেন সভাষ নিজেকে গড়িয়া তুলিবার জন্য সমাজের কল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে চায়, তিনি তাহাতে আর আপত্তি করেন নাই।

সুভাষ যেভাবে পালিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে অতি বাল্যকালে যোগ শিক্ষার জন্য যে ক্লেশ করিতে হয়, তাহা জানকীনাথ জানিয়াছিলেন। দারুণ শীতে সুভাষ অনাবৃত দেহে ছাদের উপর ভগবচ্চিন্তায় বিভোর, দারুণ রৌদ্রে কাঠজুড়ির বালির উপর নগ্ন পদে সুভাষ এপার ওপার করিয়া বেড়াইয়াছে, জানকীনাথের তাহা কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহার জন্য সুভাষকে তিরস্কার করিলেন না, কারণ সুভাষ পরীক্ষা করিতে চায় যখন অভাবগ্রস্ত লোক বস্ত্রাভাবে বা অন্নকষ্টহেতু শীতে অনাবৃত দেহে থাকে বা বোঝা মাথায় করিয়া কাটজুড়ির বালি রৌদ্রে পার হয়, তখন সুভাষ কেন তাহা পারিবে না। তাহা ছাড়া তখন তাহার ধারণা, কৃচ্ছ্রসাধন ব্যতিরেকে ধর্মানুমোদিত জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। যখন সুভাষ মাতাপিতার মত না লইয়া কলেরা রোগীর সেবার জন্য কটক হইতে বহুদূরে গিয়া কয়েকদিন কাটাইয়া আসিল, তখন তিনি তাহাকে যে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহাই প্রকারান্তরে তাহার উৎসাহের কারণ হইল।

আরও কিছুদিন পরের কথা,—১৯১৪ সাল। সুভাষ খাঁটি সাধু ও গুরুর সন্ধানে নানাস্থান ঘুরিয়া ছয় মাস বাদে বাড়ি ফিরিল। পিতার সহিত সাক্ষাতে ধর্মের নানা মত ও কর্মের পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তাঁহার আপত্তি, সুভাষ একখানি পত্র দিয়া কেন জানায় নাই। সুভাষ এ বিষয়ে তাহার মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছে ঃ

"Next timeএ চলিয়া গেলে বাবা বোধ হয় আর ফিরাইবার চেষ্টা ও সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন। মা বলেন, 'আবার ও যদি যায়, আমি আর থাকিব না।' তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়া বোধ হয়। বাবাকে দেখিলাম খুব reasonable."

এই নিয়ম জানকীনাথ জীবনে বরাবর পালন করিয়াছেন। যখন সুভাষ সিভিল সার্ভিস পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প তাঁহাকে জানাইল, তিনি প্রথমে তাহাকে ঐ কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। সুভাষের দৃঢ়তার বিষয় অবগত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে জানাইলেন, যখন সে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে চায়, ভগবানের আশীর্বাদ তাহার শিরে বর্ষিত হউক। সুভাষ উত্তরে লিখিয়াছিল, পিতৃগর্বে সে চিরদিনই গর্বিত, কিন্তু যেমন করিয়া সেই গর্ব সেদিন সে অনুভব করিতেছে, কখনও এই অনুভূতি তাহার পূর্বে হয় নাই।

১৯৩০ সালে যখন শরৎচন্দ্র আইন ব্যবসায় স্থগিত রাখিবার সঙ্কল্প জানকীনাথকে জানাইলেন, তখন জানকীনাথ কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, সুভাষের জন্য বহু ব্যয়, জানকীনাথের মাসিক দানের পরিমাণ অপরিমিত, দুর্গাপূজা, সামাজিক ক্রিয়া প্রভৃতির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার অধিকাংশই শরৎচন্দ্রের উপার্জন হইতে মিটাইতে হইত। জানকীনাথ জানাইলেন, ঐ সময় শরৎচন্দ্রের উপার্জন বন্ধ হইলে সংসারে দারুণ কষ্ট হইবে, কিন্তু যখন দেশের কাজ, তখন তিনি ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি দান করিতেছেন, কারণ ব্যক্তি অপেক্ষা দেশ বড় এবং সবার উপর শ্রীভগবান বড়। তিনি সকল সুখ দুঃখের মালিক অতএব তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া তিনি শরৎচন্দ্রকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন।

সারদা
(ইঁনিই সুভাষচন্দ্রকে লালনপালন করেন)

জানকীনাথের চরিত্রের আসল কথাটি সুভাষ লিখিয়াছে। তিনি খুব "reasonable" অর্থাৎ যুক্তি মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত। নিজের মত বড় করিতে গিয়া তিনি সংসারে অহেতুক অশান্তি সৃষ্টি করেন নাই, যাঁহারা সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করিতে চান, তাঁহাদের প্রতিবন্ধক হইয়া কি সংসার, কি সমাজ, কি রাষ্ট্র চক্রের গতি ব্যাহত করিবার কারণ স্বরূপ হন নাই।

সন্তানদিগের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য অধিক মাত্রায় দায়ী মাতা প্রভাবতী। তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া সংসারের মধ্যে অন্যায় কাজ করা সম্ভব ছিল না। ছেলেদের শিক্ষার সমস্ত ভার তিনি নিজ হাতে লইয়াছিলেন। কতদিন ছেলেমেয়ে মিশনারী সাহেব মেমদিগের স্কুলে পড়িবে, কতদিন সেখান হইতে র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে যাইবে ইহা স্থির করা তাঁহার কাজ। তাহাদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিতেন প্রভাবতী। প্রকৃতপক্ষে জানকীনাথ অর্থ উপার্জন করিলেও সংসার প্রতিপালন সম্বন্ধে বহু সুবিধা পাইয়াছেন। এ সকল বিষয়ে প্রভাবতীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা সংসারের রীতি ছিল।

দরিদ্রের প্রতি প্রেম

যতই দিন যায়, জানকীনাথের দেবচরিত্র সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমেই যেন দরিদ্রের প্রতি সমবেদনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবের কাজে লিপ্ত থাকিয়া কি করিয়া তিনি তাঁহার দরিদ্র পোষ্য, আত্মীয় অনাত্মীয়, সকলের সংবাদ রাখিতেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। দরিদ্র ছাত্রদিগের শিক্ষার ভার পূর্ণ বা আংশিকভাবে বহন করা হয়ত সহজ কথা, মাসিক সাহায্য যে সকল দরিদ্র পরিবার পায়, তাহাও পাঠাইয়া দেওয়া হয়ত তত কষ্টকর নয়, কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের মধ্যে যে আবার সুখ দুঃখের খেলা আছে, তাহার অংশ গ্রহণ করা, অন্তরে অনুভব করা হয়ত তত সহজ নয়। কিন্তু তাহাই ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। যাহারা তাঁহার সাহায্য সূত্রে পরিচিত তাহারা কেহ পত্রাদি লিখিয়া অথবা সাক্ষাতে দুঃখ জানাইলে, তাহা দূর করিবার ব্যবস্থা ত হইতই, উপরন্তু যাহারা দুঃখের সংবাদ প্রথম জানাইল, তাহাদের জন্য যতক্ষণ না কোনও সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার শান্তি নাই।

একটি যুবক একদিন আসিয়া বলিল যে, মিঃ হেফকীর (A. G. Heefkee) নিকট একটি চাকুরী খালি আছে, জানকীনাথ সাহায্য করিলে সে উহা পাইতে পারে। হেফকী ইউরোপীয়ান প্রোটেস্ট্যাণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন এবং কিছুদিন জানকীনাথের পুত্রদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এই সময় উড়িষ্যার করদরাজ্য এলাকার (ট্রিবিউটারী মহল) বিদ্যালয় সকলের (Inspector) পরিদর্শক হিসাবে কাজ করিতেছিলেন।

যুবকটির পরিচয় যাহা পাইলেন, তাহাতে অপর কেহ হইলে মিষ্টবাক্যে যুবকটিকে বিদায় দিতেন, জানকীনাথও অবশ্য তাহাই করিলেন, তিনি বিষয়টি ভাবিয়া যাহা হয় স্থির করিবেন বলিলেন। তাঁহার পদমর্যাদায় হেফকী সাহেবের নিকট কোনও অনুরোধ করিতে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যুবকটির দুঃখের কথা শুনিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছেন। হেফকী সাহেব তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিলে কি হইবে তিনি ভাবিলেন না। পরদিন সকাল বেলা হেফকী সাহেবের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত। হেফকী দূর হইতে জানকীনাথকে দেখিয়া সসব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, তাঁহার আবাসে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে এভাবে সম্মানিত করিবার কারণ কি? ('To what do I qwe the honour of this visit, from you, Janaki Babu.') জানকীনাথ সমস্ত কথা বলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হইয়া গেল। যথাকালে যুবকটি তাহার প্রার্থিত পদ পাইল।

দান অনেকে করেন, কিন্তু দুঃখীর আনন্দে দরদ দিয়া আনন্দবোধ করার শক্তি কতজনের আছে তাহা জানি না। একদিন পথে এক ভিখারিণী জিজ্ঞাসা করিল যে সে তাহার পুত্রের বিবাহ দিয়াছে, জানকীনাথ পুত্রবধূ দর্শন করিতে

যাইবেন কি না। ভিখারিণীর সহিত তাঁহার গ্রহীতা ও দাতার সম্পর্ক। এত দুঃসাহস যে উড়িষ্যার মহামাননীয় রাজা মহারাজ জমিদারদিগের সম্মানার্হ ব্যক্তিকে তাহার কুটীরে আহ্বান করে। কিন্তু দরিদ্রের মর্যাদাকে সম্মান দেওয়াও জানকী-নাথের চরিত্রের মহত্ত্ব। ভিখারিণীর সাহস ছিল, বিশ্বাস ছিল তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইবে না। জানকীনাথ নিজ আচরণ দ্বারা এ সাহস দান করিয়াছিলেন। জানকীনাথ সেদিন ব্যস্ত ছিলেন, পরদিন ভিখারিণীর কুটীরে গিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। অর্থ দিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিলেন এবং সেখানে চৌকীতে বসিয়া ভিখারিণীর সংসারের অন্তরঙ্গ হইয়া আলাপ করিলেন। এ দরদ ক্বচিৎ দেখা যায়; ভিখারিণীর অনুরোধ ধৃষ্টতা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করাই কর্মব্যস্ত ধনীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভিখারিণী জানিত যে সে যাহা চায় বাঞ্ছাকল্পতরু তাহা দানে অসম্মত হইতে পারেন না।

আত্মীয়ের কথা বাদ দিয়া পরিচিত বন্ধুদের মধ্যেও কেহ গত হইলে, জানকীনাথের কাজ সেই সকল পরিবারের শোকে উপস্থিত থাকিয়া সান্ত্বনা দেওয়া এবং পরে নাবালক পুত্র কন্যাদের ভরণ-পোষণের দিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখা। এই সকল পরিবারে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার কোনও অসুবিধা না হয়, সেই কাজই তাঁহার প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। আজ যাহারা পরনির্ভর, বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা শীঘ্র উপার্জনক্ষম হইলে সেই সংসারে দুঃখ মিটিবে, ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা। দরিদ্র এবং প্রকাশ্য ভিক্ষার্থী যাচ্ঞা করিয়া কখনও ব্যর্থমনোরথ হয় নাই। সময় সময় তিনি যে ভার গ্রহণ করিতেন তাহা তাঁহার কায়িক শক্তি ও আর্থিক সংগতি অতিক্রম করিয়া যাইত। উড়িষ্যায় প্রায়ই অন্নাভাব ঘটিত এবং মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষকল্প অবস্থাও উপস্থিত হইত। এই সকল সময়ে জানকীনাথের বাড়ির দ্বার অবারিত, পাকশালার কাজে বিরাম নাই। কেহ যেন অনাহারে না থাকে, যখন তাঁহার ও পরিবারের সকলের নির্বিঘ্নে দুবেলা ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন যাহারা তাঁহার বাড়ির নিকট আসিতে পারে এবং অন্ন চায় তাহারা যেন অনাহারে না থাকে ইহাই ছিল তাঁহার নির্দেশ।

তেজস্বিতা

বহিরাকৃতি বা সদানন্দময় ব্যবহার কিন্তু অসাধারণ তেজ আবৃত করিয়া রাখিয়া দিত। যেখানে আত্মমর্যাদার সামান্য হানি হইবারও সম্ভাবনা থাকিত, সেখানে বজ্রাদপি কঠোর; অন্যায় অপমানের সহিত আপোষ তাঁহার দ্বারা কখনও সম্ভব ছিল না। আত্মসম্মান বিষয়ে তাঁহার মত অপরাপর অনেকের অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম অনেক উন্নত ছিল এ বিষয়ে অপরে যখন বিশেষ দোষের কিছু লক্ষ্য করিতেন না, তিনি তাহার মধ্যেও আপনার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিবাদের কারণ পাইতেন। ১৯১৭ সালে কটকের ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আসিলেন ভার্নেড সাহেব (A. H (?) Vornede)। তাঁহার খেয়াল হইল সরকারী উকিল তাঁহার তাঁবেদার এবং তাঁহার হুকুম মানিয়া চলিবেন। জানকীনাথের তেজস্বিতা সম্বন্ধে তিনি কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি দমিবার পাত্র নহেন, জানকীনাথের উপর আদেশ দিলেন কটক (Head Quarter) পরিত্যাগ করিতে হইলে তিনি যেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানাইয়া যান। এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের মতামতের কোনও প্রশ্নই ছিল না, পত্রে সেরূপ কোনও ইঙ্গিতও ছিল না। জানকীনাথ ইহাতে সম্মত হইলেন না। কার্যকারণ উপলক্ষে কটকে থাকা প্রয়োজন কি না, তিনি সরকারী উকিল, সে বিষয়ের বিচার তাঁহার নিজের কাছে; ম্যাজিস্ট্রেটের মতামত তাঁহার বিচার্য বিষয় নহে। তিনি এই ব্যাপার লইয়া পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলেন; তাঁহার সরকারী সম্বন্ধ ছিন্ন হইল।

তাঁহার জীবনে এরূপ ঘটনা বিরল নহে, কিন্তু সাধারণভাবে তিনি ঘোরতর অন্যায় না হইলে কাহারও মতের প্রতিবাদ করিয়া গোলযোগ করিতেন না অথবা তাঁহার কার্যের নীতি সম্পর্কে কাহারও সহিত আলোচনা করিয়া প্রচার করিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীরামকৃষ্ণের কতিপয় ত্যাগী ও গৃহী ভক্ত

শ্রীআশুতোষ মিত্র

শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে যিনিই আসিয়া তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি গৃহী হউন বা ত্যাগী হউন, শ্রীঠাকুরের শক্তির বিকাশ তাঁহার ভিতর হইয়াছে—ইহা আমরা দেখিতে পাই। তবে সকল ভক্তের ভিতর সমভাবে হয় নাই—আধারভেদে কোন-না-কোন দিক দিয়া সে শক্তি বিকশিত, আর সেই বিকাশটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা আমাদের সংকীর্ণ বিদ্যাবুদ্ধিতে ঐ শক্তির বিকাশ যে যে দিক দিয়া পাত্রবিশেষে বর্তমান প্রবন্ধের উপাদানস্বরূপ মহান্ চরিত্র-গুলিতে প্রস্ফুটিত দেখিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই এযাবৎ অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং ভবিষ্যতে সেইরূপে যত্নবান্ হইব।

কিশোরীমোহন রায় বনহুগলী নিবাসী। কলিকাতায় সরকারী দপ্তরে চাকুরী করিতেন এবং সে ব্যপদেশে নিত্য আলমবাজার হইতে নৌকাযোগে যাতায়াত করিতেন। ক্ষীণ শরীর হইলেও অফিসে কামাই তাঁহার খুব কম হইত এবং প্রতি ছুটিতে মঠে আসিতেন, আর মঠেই ছুটীর দিনগুলি যাপন করিতেন। আমরা তাঁহাকে বহুবার দেখিয়াছি এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগও পাইয়াছি। আবার এই সুযোগ লাভ দুই-এক বৎসর স্থায়ী হয় নাই—ত্রয়োদশ বৎসরে উহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। অতএব এই দীর্ঘকাল তাঁহাকে যেভাবে দেখিয়াছি এবং দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহারই সহায়ে তাঁহার পূর্ব চরিত্র অঙ্কন করিতে সাহসী হইয়াছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, কিশোরীমোহনকে স্নানান্তে একবার ঠাকুরঘরে গিয়া প্রণাম করা ব্যতীত কখনও পূজা পাঠ ধ্যান ধারণা করিতে দেখি নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, তাঁহাতে কখনও ক্রোধের সঞ্চার বা তাঁহার সেই সদা-হাস্যাননটি গাম্ভীর্যে আবৃত দেখিতে পাই নাই। সদাই হাস্যমুখ—বড়-ছোট জ্ঞান নাই, সকলের সঙ্গে সমভাবে মেলামেশা তাঁহার যেন প্রকৃতিগত ভাব ছিল। এই অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক ভাব দৃষ্টে আমরা যুগপৎ আশ্চর্যান্বিত ও মুগ্ধ হই।

ক্রমে দিন যাইতে থাকে, আর তাঁহাতে ঐ একই ভাবের তারতম্য না দেখিয়া তাঁহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হই এবং নিজ মনে ভাবিতে থাকি—একটা রিপু জয় করিতে মনুষ্যের কতটা সাধনার আবশ্যক হয়, কিন্তু তাঁহার বিনা সাধনায় ক্রোধহীন অবস্থা লাভ হইয়াছে—ইহার কারণ কি? ঐ প্রকার ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ঐখানেই তাঁহাতে শ্রীঠাকুরের শক্তির বিকাশ হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, কিশোরীমোহনের শরীর শীর্ণ ছিল। অধিকন্তু তাঁহার দাড়ি ছিল এবং মঠে অধিকাংশ সময়ে একখানি লুঙ্গী পরিধান করিতেন। এজন্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণ হইলেও মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইত, আর তিনি পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদিগের কথা অনুকরণ করিতেও পারদর্শী ছিলেন। এই সব কারণে তাঁহার ত্যাগী গুরু-ভ্রাতারা তাঁহাকে 'আব্দুল' নামে অভিহিত করিতেন। আমরা এতদূর দেখিয়াছি যে, মঠে আগন্তুক আসিয়া তাঁহাকে মুসলমান ভ্রমে তাঁহার হাতে চা-পান করিতে ইতস্তত করিতেছেন।

কিশোরীমোহন সদাই কর্মশীল, উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। ঐ ক্ষীণ শরীরে তিনি নৌকা-চালকের কার্য অতি দক্ষতার সহিত করিতে পারিতেন। তাঁহার সহিত একই নৌকায় যাতায়াত করিবার ভাগ্য আমাদের কয়েকবার হইয়াছে। এখানে একবারের বিবরণ দিতেছি—বড়বাজারের ঘাট হইতে তাঁহার সহিত মঠে পান্সী নৌকায় আসিতেছি। পান্সীর মাঝি বংশপরম্পরায় মাঝিগিরি করিতেছে। বৈশাখ মাস—কালবৈশাখী। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। বড়বাজার হইতে পাড়ি মারিয়া যখন নৌকা ঘুসুড়ীর টাঁকের নিকট আসিয়াছে, তখন অকস্মাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়

ওঠে। কিশোরীমোহন উল্লসিত হইয়া মাঝির নিকট উপস্থিত হন। পান্সী-ভর্ত্তা আরোহী—সকলেই তাঁহাকে চিনেন, এমন কি, মাঝিও চিনে। দেখিতে দেখিতে ঝড় প্রবল বেগ ধারণ করে, আর গঙ্গার তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া দাঁড়িগুলিকে স্নান করাইয়া দিতে থাকে। নৌকা চালান কঠিন হইয়া উঠে। কিশোরী-মোহন মালকোছা মারিয়া হাসিতে হাসিতে মাঝিকে নৌকার ভিতর হইতে জল নিষ্কান্ত করিতে বলিয়া তাহার হস্ত হইতে হালটি লইয়া ঝিঁক মারিতে মারিতে গাইতে থাকেন—"ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠিছে, করতিছে সোঁ সোঁ সোঁ" ইত্যাদি আর মাঝে মাঝে দাঁড়ি-দিগের দাঁড়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দের তালে তালে 'ইয়া মেরে ভাইয়ো, ইয়া মেরে ভাইয়ো' বাক্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। নৌকাখানি সুদক্ষ কর্ণধারের হাতে আসিয়া কখন তরঙ্গের শীর্ষস্থানে চড়িয়া আর কখন-বা দুইটি তরঙ্গের মাঝখানে ঝপাস শব্দে পড়িয়া ক্ষিপ্রবেগে চলিতে থাকে এবং অনতিবিলম্বে মঠের ঘাটে আসিয়া পেঁছে। এই কার্যে কিশোরীমোহনের দুইটা বিষয় লক্ষ্য করি—একটি তাঁহার ঐ ক্ষীণ শরীরে কার্যকালে অত শক্তি দেখা দেয়; অপরটি অত পরিশ্রমেও তাঁহার সেই সদা-হাস্যমুখের তিলমাত্র পরিবর্তন না হওয়া।

কিশোরীমোহন হাস্যরসের নানা প্রকারের অবতারণা করিতে পারিতেন, আর সেগুলি বড়ই উপভোগ্য হইত। সেগুলি বলিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। আর সবগুলি এতকাল পরে আমাদের মনেও নাই। তাই এখানে দুই-তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

একদিন মঠে শ্রীঠাকুরের বিশেষ ভোগ হইয়াছে। ভক্তেরা প্রসাদ পাইতেছেন। দধি পরিবেশন হইতেছে। অকস্মাৎ পরিবেশককে সম্বোধন করিয়া কিশোরীমোহন গাহিলেন—

"দে দই, দে দই পাতে,
ওরে বেটা হাঁড়ি হাতে।
ওরা কি তোর বাপ-খুড়ো,
তাই ঢেলে দিলি ওদের পাতে?
আমি কি তোর কেউ নই যে,
চলে গেলি খালি হাতে?

ইত্যাদি। তাঁহার গাহিবার ঢঙ দেখিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

অপরটি শনিবার। মঠে কলাইয়ের ডাল হইয়াছে। খাইতে খাইতে বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) বলিয়া উঠিলেন—"আব্—দুল! —কলাইয়ের ডাল।" অমনি কিশোরী-মোহন আসনোপরি উপবিষ্ট অবস্থাতেই দক্ষিণ হস্তে পাত্রস্থিত কলাইয়ের ডাল দেখাইতে দেখাইতে গাহিতে লাগিলেন—

"যত রকম ডাল আছে এ সংসারে,
কলাইয়ের কাছে সব শালা হারে।
আমরি, কি মজা আহারে,
যেন টিকি ধরে জুতো মারে॥
খেসারী, মুশুরী, মুগ, অড়র, ছোলা।
গরীবের পক্ষে আখাম্বা আছোলা।
ঘী মশলা না দিলে গলায় যায় না গেলা,
পাতলা হ'লে খায় না নরে॥
অনাহূত অতিথি জামাই কুটুম্ব এলে,
গরম গরম ফেন ঢেলে দিলে ডেলে,
যোগে-যাগে দীনের দিন যায় চলে
ভ্রূক্ষেপে সম্ভ্রমে চলে।
দিশী জাফ্রন হলুদ যাকে বলে,
জলে গুলে তার একবিন্দু দিলে,
আদা লঙ্কা হিঙ্গে রিফাইন হলে,
সে সৌরভে কে রবে ঘরে॥
বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, বীরভূমের
যত লোক,
কলাই-মন্ত্রে তারা বলের উপাসক।
কোনকালে তারা ভোগে নাক রোগ,
সদা থাকে সুস্থ শরীরে॥
শীলে বেটে যদি গড়ে বড়াবড়ি,
কালিয়ে কাবাব যায় গড়াগড়ি।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বাসব, স্বর্গপুর ছাড়ি,
হাঁড়ি হাতে করে দাঁড়ান দুয়ারে॥
তাতে যদি হয় টকের মাছের যোগ,
ভরণী নক্ষত্রে পায় মুলোযোগ।
পেটে যেন ঢোকে ভস্মকীট রোগ,
সে রোগ কেউ কি সারতে পারে॥
খাসীর খাসা মাসে অনাটন হলে,
অনায়াসে মাসকলাই গোঁজা চলে।
ভুঁড়ি-মোটা বাবু করে তুলে ফেলে,
মহাবায়ু পিত্ত পলায় দূরে॥
এমনধারা ডালে যে দোষারোপ করে।
কবি বলে তারে পাঠাই দ্বীপান্তরে॥
মাংসতুল্য গুণ মাসকলাই ধরে।
শিব লিখেছেন তন্ত্রসারে॥"

এমন একটা দক্ষতার পরিচয় দিয়া কিশোরীমোহন হাবভাব সহকারে গানখানি গাহিলেন যে, আমাদের হাত থালায় রহিয়া গেল—কাহারও মুখে উঠিল না; সকলেই অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এমনই সদানন্দময় পুরুষ ছিলেন তিনি!

শারদীয়া পূজার সময় তাঁহার মুখে পূর্ব-বঙ্গীয় ঢঙে "কি ঠাওর দেহলাম চাচা" ইত্যাদি গানখানি এত মধুর লাগিত যে, শ্রোতা মাত্রকেই মুগ্ধ হইতে হইত।

তাঁহার বিষয় কিছু কিছু 'শ্রীমা' পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সেজন্য সেগুলির পুনরুল্লেখ এখানে করা হইল না।

চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কিশোরীমোহন এক বৎসর 'উদ্বোধন' পত্রের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সহিত নিজ কার্য সম্পন্ন করেন। সে সময় পত্রখানি পাক্ষিক ছিল। সেটা পত্রের নবম বৎসর।

বেলঘরের তারক

পূর্বেই স্বামী শিবানন্দ চরিত্র (২নং চরিত্র) বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে যে, তিনি ব্যতীত অপর এক 'তারক' শ্রীঠাকুরের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি 'বেলঘরের তারক' বা 'ছোট তারক' বা 'তারক বসু' নামে ভক্তগণের মধ্যে পরিচিত। এক্ষণে সেই 'বেলঘরের তারক বা তারক বসুর' বিষয় যাহা জানি, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

বেলঘরের তারক যে বেলঘরিয়া নিবাসী, ইহা তাঁহার নামের পার্থক্য হেতুই বুঝা যায়। তিনি গৃহস্থ ছিলেন এবং কালে-ভদ্রে মঠে আসিতেন। সেই সূত্রেই তাঁহাকে দর্শন করিবার বা তাঁহার সহিত অল্পবিস্তর মিশিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। তাঁহাকে শ্রীঠাকুরের বিষয় কিছু বলিতে বড় একটা শুনি নাই। বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে তিনি মাত্র সেই সাধারণ কথাগুলি বলিতেন, যাহা সকলেই পুস্তকাদিতে পড়িয়াছে। নিজের বিষয় ধরাছোঁয়া দিতেন না। ফলত আমা-দিগকে তাঁহার নিকট হইতে কোন নূতন আলোক পাইবার আশা একপ্রকার ত্যাগ করিতে হয়। অগত্যা আমাদিগকে একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। ঐ উপায়ে তাঁহার মনোবৃত্তির কতকটা বুঝিতে পারিব ভাবিয়াই একদিন তাঁহাকে নিভৃতে পাইয়া তাঁহার শ্রীমুখে গান শুনিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করি। তিনি আমাদের প্রার্থনা এড়াইতে না পারিয়া গাহেন। গানগুলি আমাদের মনে আছে—পাঠক-পাঠিকার জন্য এখানে দিতেছি—

কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে!
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব
ত্যজি চতুর্বিংশ-তত্ত্ব,
সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব
দেখি আপনে আপনে॥
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে
পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে
কুণ্ডলিনী জাগরণে॥
শীতল হইবে প্রাণ
অপানে পাইবে প্রাণ
সমান উদান ব্যান
ঐক্য হবে সংযমনে॥
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ
ভূত পঞ্চময় তঞ্চ,
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ
বঞ্চনা করি কেমনে॥
করি শিবা শিবযোগ
বিনাশিবে ভবরোগ,
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ
ক্ষরিত সুধার সনে॥

মূলাধারে বরাসনে
ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে
মিলাইবে সমীরণে॥
কহে শ্রীনন্দকুমার
ক্ষমা দে হরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার
শিব-শক্তি মায়াধনে॥

তাঁহার গলা সাধারণ হইলেও গানখানি ভাব সংযুক্ত থাকায় আমাদের ভাল লাগিল। আমরা আর একখানি গাহিতে অনুরোধ করায় তিনি আমাদের অনুরোধ রাখিয়া গাহিলেন—

জাগ কুল-কুণ্ডলিনী।
প্রসুপ্ত ভূজগ-কায়া আধার পদ্মবাসিনী॥
গচ্ছ সুষুম্না পথ,
স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুরে অনাহত,
বিশুদ্ধাজ্ঞা সঞ্চারিণী॥
ত্রিকোণে জলে কৃশানু,
তাপিত হইল তনু,
মূলাধার ত্যজ শিবে,
স্বয়ম্ভূ-শিব-বেষ্টিনী॥
শিরস্থ সহস্র দলে,
পরম শিবেতে মিলে
ক্রীড়া কর কুতূহলে
সচ্চিদানন্দদায়িনী॥
দ্বিজ রামধন মাগে,
যোগাসনেতে যোগে,
পরম শিবের সহিত
তোমায় হেরি তারিণী॥

যেমন বক্তৃতায় বক্তার মনোভাব প্রকাশ পায়, তেমনি এক্ষেত্রে গানে গায়কের মনোভাব প্রকাশিত হইল—আমরা বুঝিলাম, তারকবাবু যোগপথের পথিক। কেবল তাহাই নহে, তিনি সাধনমার্গের চরম সীমায় পৌঁছিতে উৎসুক।

মহেন্দ্র কবিরাজ

মহেন্দ্র কবিরাজ সিঁথি নিবাসী। শ্রীঠাকুরের নিকট প্রায়ই আসিতেন শুনিয়াছি। পরে আমাদের সময়ে সুবিধা পাইলেই মঠে আসিতেন। এজন্য তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার আমাদের সুযোগ হইয়াছে। তিনি বড়ই অমায়িক ছিলেন। সকলের সহিত মিশিতে ভালবাসিতেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে শ্রীঠাকুরের বিষয় কিছু না কিছু শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইতাম, আর তিনি আমাদিগকে কখনও বঞ্চিত করিতেন না।

তিনি বলিতেন—জানি না কি সুকৃতিবলে তাঁর (শ্রীঠাকুরের) কাছে এসেছিলেম; নইলে আমরা কি মানুষ ছিলেম? তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন, অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু, তাই তাঁর কৃপায় আমরা তাঁর কাছে যাতায়াত করতে পেরেছি, তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনতে পেয়েছি, অমৃতের আস্বাদ পেয়েছি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে তাঁহার ভিতর কি একটা ভাব আসিত, আর তিনি গাহিতেন—

যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আদিনাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব বল, এস হে মম হৃদয়ে॥
হৃদয় কুটীর দ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে?

গাহিতে গাহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে অশ্রু বহির্গত হইতে থাকিত, আর তিনি মৌনভাবে থাকিয়া যাইতেন।

আবার কখন-বা বলিতেন—কই? কতকাল হয়ে গেল, তিনি ছেড়ে গেছেন! কই? দেখা দেন, কই? —ইত্যাদি বলিতে বলিতে নিজ মনে গাহিতেন—

হরি, তোমা বিনে কেমনে এ-ভবে জীবন ধরি,
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরী॥
যখন তোমারে পাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয়-তাপ সব পাশরি॥

শুনিতে শুনিতে আমরা বিহ্বল হইয়া যাইতাম, আর অবাক্ হইয়া ভাবিতাম—সংসারে আবদ্ধ জীবের ভিতর ঐ তীব্র ব্যাকুলতা দিয়া শ্রীঠাকুর কি খেলাই না খেলিতেছেন! ধন্য তিনি, আর ধন্য তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরা। এ-লীলা তাঁহাতেই সম্ভবে!

সুরেশচন্দ্র দত্ত

সুরেশচন্দ্র মঠে বড় একটা আসিতেন না। আমাদের সুদীর্ঘ অবস্থিতিকালের মধ্যে মাত্র দুই-তিনবার তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং তাহাও মঠের উৎসব সময়ে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে। শুনিয়াছি, তিনি কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে বিশেষ করিয়া যাইতেন। তিনি শ্রীঠাকুরের আদর্শ গৃহী ভক্ত নাগ মহাশয়ের (দুর্গাচরণ নাগ) পরম সুহৃদ ছিলেন—ইহা শুনিয়া থাকিলেও এবং দুই-একখানি গ্রন্থে পড়িয়া থাকিলেও আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমরা নাগ মহাশয়ের কুমারটুলিস্থ কর্মক্ষেত্রে, শ্রীমার বাটীতে এবং মঠে কখনও উভয়ের একত্র সমাবেশ দেখি নাই—যতবার নাগ মহাশয়কে দর্শন করিয়াছি, ততবারই তাঁহাকে একাকী পাইয়াছি, সুরেশচন্দ্রকে তাঁহার সঙ্গে একবারও পাই নাই। এই সব কারণে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ আমাদের কখনও হয় নাই, আর সেই হেতু তাঁহার বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

সুরেশচন্দ্র শ্রীঠাকুরের জীবনী এবং উক্তি-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, আর ইহাই নাকি ঐ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ।

নবগোপাল ঘোষ

নবগোপাল ঘোষকে দর্শন করিবার বহু পূর্বেই তাঁহার বিষয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে এবং শ্রীঠাকুরের জীবনীগুলিতে পড়ি। তাঁহার প্রথম দর্শন পাই—বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাটীতে যখন মঠ ছিল, সেইখানে। তদবধি তাঁহার দর্শন আমাদের ভাগ্যে বহুবার হইয়াছে; তাঁহার বাটীতেও কয়েকবার গিয়াছি।

নবগোপাল হাওড়া রামকৃষ্ণপুর নিবাসী। যতটা স্মরণ হয়, কলিকাতায় জর্জ হেণ্ডারসন নামক সওদাগরী অফিসে কর্ম করিতেন, আর নিত্য রামকৃষ্ণপুর হইতে অফিসে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার গৃহে গেলে আগন্তুকমাত্রেরই মনে হইত, যেন তিনি একটি প্রকৃত ভক্ত পরিবার মধ্যে আসিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী আদর্শস্বরূপা সহধর্মিণী ছিলেন। সন্তান-সন্ততিগণ সকলেই শ্রীঠাকুরের ভক্ত। একটি পুত্র ত অবিবাহিত অবস্থায়ই মঠভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বাটীতে নিত্য শ্রীঠাকুরের পূজা হইয়া থাকিত এবং সদাই যেন একটা লক্ষ্মীশ্রী সর্বত্র বিরাজ করিত।

কেবল ইহাই নহে। নবগোপাল নিজ বাটীতে প্রতি বৎসর শ্রীঠাকুরের একটি উৎসবের আয়োজন করিতেন, যাহাতে মঠের সাধু ভক্তেরা এবং অন্যান্য গৃহী ভক্তেরা নিমন্ত্রিত হইয়া একত্র সমবেত হইতেন, ঐ অনুষ্ঠানে ভজন-কীর্তনাদি হইত এবং সকলে একত্রে প্রসাদ পাইতেন। ঐ উৎসবে এক বৎসর আমরা মাধাইরূপী কালিপদ ঘোষ এবং জগাই-রূপী মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে দেখিয়াছি —ইহা ইতিপূর্বে কালিপদ ঘোষ আখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

নবগোপালের আঁখিদ্বয় সদাই ভক্তি-অশ্রুতে ডগমগ করিতে থাকিত। তাঁহার ভিতরে এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে, তাহার প্রভাবে তাঁহাকে পথে-ঘাটে দেখিতে পাইলেই ছেলের দল ঘিরিয়া ফেলিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' শব্দে নৃত্য করিত। তিনি তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিতে থাকিতেন, তাহারা নিজ দল বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিত এবং তাঁহাকে একেবারে বেষ্টন করিয়া থাকিত, যতক্ষণ না তিনি তাহাদের নৃত্যে যোগদান করেন। তাঁহার গণ্ডযুগল প্লাবিত হইত, আর অবশেষে 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' রবে নাচিতে থাকিতেন। এই প্রকারে তিনি বালক-গণের নিকট রেহাই পাইতেন।

নবগোপালের মুখে সদাই 'জয় রামকৃষ্ণ' রব শুনিতে পাওয়া যাইত। অফিসের সহ-কর্মীদিগের দ্বারাও ঐ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

ভাই ভূপতি

ভূপতিকে মঠের বড় ও ছোট সকলেই 'ভাই ভূপতি' নামে ডাকিতেন। আমরাও সেই নামে তাঁহাকে এখানে অভিহিত করিলাম। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী ভিন্ন ধর্মাবলম্বিনী হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া

গিয়াছিলেন। অতএব সংসারে তাঁহার মাতা ব্যতীত অপর কেহ ছিলেন না। তিনি বিদ্বান্ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার, মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর সে বিকার তাঁহাকে বিপথে না লইয়া গিয়া সুপথেই লইয়া গিয়াছিল। তিনি সংসারের কিছুই দেখিতেন না, কোন প্রকার উপার্জনও করিতেন না, এমন কি, তাঁহার আহারের কোন নির্দিষ্ট সময় বা খাদ্যদ্রব্যবিশেষের উপর কোন ঝোঁকও ছিল না। মাতা দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়া, খাইতে দিতেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কাল কাটাইতেন। দিবসে বাটীতে আসিবার বা থাকিবার কোন নির্ধারিত সময় তাঁহার ছিল না, তবে রাত্রি-যাপন বাটীতেই করিতেন।

ভাই ভূপতিকে দিবসের অধিকাংশ সময়ে হেদুয়ার ধারে ফুটপাথের উপর যজ্ঞোপবীতটি ধরিয়া জপ করিতে করিতে হন হন করিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। তখন তাঁহাকে ঐভাবে দেখিয়া পথিকেরা, বিশেষত স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা দূর হইতে সাবধান হইয়া যাইতেন এবং পাগল কামড়াইয়া বা গায়ে থুতু দিতে পারে ভাবিয়া অপর ফুটপাত ধরিয়া যাতায়াত করিতে থাকিতেন। পাগল কিন্তু সদা নিরুপদ্রবী এবং নিজ মনে জপ করিতে করিতে দ্রুত পাদচারণ করিতেন। বার মাসই তাঁহাকে ঐ প্রকারে দেখা যাইত। বর্ষাকালে অল্পস্বল্প বৃষ্টিতে তিনি কাতর হইতেন না—বেশি বৃষ্টি আসিলে হয় কোন বাটীর গাড়ি-বারান্ডার তলে অথবা রাস্তার কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতেন বটে, কিন্তু নিজ জপ সমভাবেই চলিত। শীতকালে কোচার খুঁটটি গায়ে দিতেন অথবা মাতা প্রাতঃকালে বাটী হইতে বাহির হইবার সময় একখানি র‍্যাপার গায়ে দিয়া দিলে সেইখানি সমভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিত।

ভাই ভূপতি অর্থের বশীভূত ছিলেন না; বস্তুতঃ সঞ্চয় যে কি বস্তু তাহা তিনি জানিতেন না। যাঁহারা তাঁহাকে চিনেন, তাঁহাদের কেহ মঠে আসিবার সময় নৌকাভাড়া দিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলে তিনি আসিতেন এবং ফিরিবার সময় ঐরূপ কাহারও না কাহারও সঙ্গে যাইতেন। মঠে আসিয়াও ঐ প্রকার জপ করিতেন? কখন শ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে জপ করিতেন, একদিন ঐপ্রকার জপ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ হইতে অস্পষ্ট স্বরে কোন মন্ত্র নির্গত হইতেছে দেখিতে পাইয়া তাঁহার অলক্ষে পিছনে দাঁড়াইয়া আমরা কান পাতিয়া শুনিয়াছি। সে সময়ে তিনি ওঁ রামকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করিতেছিলেন।

ভাই ভূপতিকে ধরিয়া বসিলে তিনি গাহিতেন, তবে মাত্র একখানি গান; তাহাও আবার সম্পূর্ণ না গাহিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিয়া জপে মনোনিবেশ করিতেন—গান আমাদের ধরাইয়া দিতে হইত, তবে শেষ করিতেন। তিনি গায়ক ছিলেন না, গানখানির ভাব আমাদের ভাল লাগিত তাই তাঁহাকে দিয়া গাওয়াইতাম। গানখানি এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

হরি কাণ্ডারী যেমন, আর কি তেমন
আছে নে[...]
পার করেন দীনজনে, অধমতারণ চরণ দিয়ে[...]
তরণীর এমনি গুণ, তার নাইক হাল,
নাইক গু[...]
চলে সে আপনি তরী, অধমতারণ চরণ পেয়ে[...]

বক্সা ক্যাম্প • অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়; ১৯৩০ সালের আয়ু কাজেই একদিন ফুরাইয়া গেল, ১৯৩১ সাল আসরে আসিয়া দেখা দিল। প্রথমেই মনে বাঙালদের ভাষায় 'কামড়' মারিল যে, না জানি এ-ভাবে জেলে কত সালকেই পুরানো বলিয়া বিদায় দিয়া নূতন সালকে অভ্যর্থনা করিতে হয়। মনকে অবশ্য প্রবোধ দিলাম যে, মুক্তির দিন একটা বছর আগাইয়া রাখা গেল। মুক্তির দিন যত দূরেই রহুক, একটা বছর পার করিয়া একটা বছর তার নিকটবর্তী হইয়াছি, ইহাকে হাতের পাঁচ বলিয়া মনে করিবার অধিকার আমাদের নিশ্চয় ছিল। এই সান্ত্বনা লইয়াই ১৯৩১ সালকে 'আস্তে আজ্ঞা হোক্' বলিয়া আমরা সম্ভাষণ জানাইলাম।

মাস কতক পরে বাঙলা নূতন সাল ১৩৩৮ দেখা দিল। নূতন বছর আমার জন্য একটি উপঢৌকন আনিয়াছিল। এই সালটি আমার জীবনে স্মরণীয় বৎসর, এই বৎসরে আমার জীবনে একটি পরমপ্রাপ্তি ঘটে। জেলখানাতে পরমপ্রাপ্তি? কেন, তাহাতে বাধা আছে কিছু? 'পরমপ্রাপ্তি' যেথান হইতে প্রেরিত হয়, সেখানকার দানের স্বভাব সম্বন্ধেই তো প্রবাদ প্রচলিত, "যো দেতা হ্যায় ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা হ্যায়।" এতই পারে, আর জেলখানাতে দিতে পারিবে না, এ কি একটা কথা হইল!

একটু বিনয় প্রকাশ করিতে হইল। ব্যাকরণের 'উত্তমপুরুষ' কথাটা আপনাদের মনে আছে আশা করি। সেখানকার ভূমিকা ও কৈফিয়তটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইতে আজ্ঞা হয়। কারণ, উত্তমপুরুষের মানে আমার নিজের কথা কিছু এবার আসিয়া পড়িবে। নিজের কথা বলিয়াই যে তাহাদের আগমনে আপত্তি করিব, আমার ব্যবহারে এমন পক্ষপাতিত্ব আপনারা আশা করিবেন না।

২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্ণ হইবে। সমগ্র জাতি এই উপলক্ষে তাঁহার জন্মজয়ন্তী উৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছে। বিরাট ব্যাপার ও বিরাট উৎসব, তাই অনুষ্ঠানের তারিখটি জয়ন্তী উৎসবের কর্তৃপক্ষ পিছাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা ঠিক করিলাম যে, ২৫শে তারিখেই আমরা কবিগুরুর জয়ন্তী উৎসব পালন করিব।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশের লোকের ও স্বদেশীদের কি মনোভাব, তাহা আপনারা নিশ্চয় জানেন। এখনও যদি না জানিয়া থাকেন, তবে আর খামোকা চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট নাই বা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনা লিখিতেছি না। কবিগুরু সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণাটা এই সুযোগে এখানে পেশ করিয়া রাখিতে চাই। আশা করি, আমার মতামত একান্ত আমারই বলিয়া গ্রহণ করিবেন, কলহের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবেন না।

পড়াশুনা আমার খুব বেশী, এমন অহংকার আমি করি না। আপনাদের আশীর্বাদে যতটুকু বিদ্যাচর্চার দুর্ভোগ আমার হইয়াছে, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই আমার প্রথম অভিমতটি ব্যক্ত করিতেছি। ব্যাসদেবের পর ভারতবর্ষে এত বড় সাহিত্যিক প্রতিভা আর আসেন নাই, কবিগুরু সম্বন্ধে ইহাই আমার ধারণা। যুক্তি দিয়া এ-ধারণা পরিবর্তন আপনারা করিতে পারিবেন না। আমি যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছি, তাহার আর রদবদলের অবকাশ নাই।

আমার দ্বিতীয় ধারণা, বর্তমান যুগে উপনিষদের এত বড় ভাষ্যকার আর কেহ আসেন নাই। বর্তমান ভারতবর্ষে উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার বলিয়াই কবিগুরুকে আমি মনে করি।

আমার তৃতীয় ধারণাটি একটু বিশেষ। প্রথম দুইটি ধারণা লইয়া আলোচনার অবকাশ হয়তো আছে এবং ইচ্ছা হইলে আলোচনা করাও চলে। কিন্তু তৃতীয় ধারণাটি সম্বন্ধে সে-সুযোগ নাই। ধারণাটি ব্যক্ত করিলেই আমার উক্তির অর্থটুকু পরিষ্কার হইবে। আমি মনে করি, রবীন্দ্রনাথ সমাধিবান পুরুষ। ঋষির সমাধিই আমি বুঝাইতেছি, যে-সমাধিতে ঋষি ও ব্রহ্মজ্ঞ পদবীতে সাধকগণ উপনীত হইয়া থাকেন। জানি, প্রশ্ন করিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছেন যে, কেমন করিয়া জানিলাম, ইহার প্রমাণ কি? ক্ষমা করিবেন, যতটুকু বলিয়াছি, তার অধিক কিছু আমার আর এ-বিষয়ে বক্তব্য নাই। আমি মনে করি, শুধু তাহাই নহে, আমি জানি, রবীন্দ্রনাথ সমাধিবান পুরুষ। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলিতেন, ইহা রীতিরক্ষা নহে, ইহা সত্য সম্ভাষণ। এই সত্য অজানা থাকিলে গান্ধীজীকে আর ভারতবর্ষের 'মহাত্মা' হওয়া চলিত না। ভারতবর্ষের মহাত্মা যাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রকৃতই গুরুস্থানীয় ছিলেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আয়োজন চলিতে লাগিল। এই উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থা ও আয়োজনের মূলে ছিলেন ভূপেনবাবু (রক্ষিত)। ভবেশবাবু (নন্দী) তখন ছিলেন আমাদের সাহিত্যসভা ও লাইব্রেরীর সেক্রেটারী। তাঁহাকে লইয়া আমার যতদূর মনে পড়ে অনিলবাবুও (রায়) সঙ্গে ছিলেন, ভূপেনবাবু তিন নম্বর ব্যারাকের বারান্দায় আমার কম্বলের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইহাই ছিল আমার অধ্যয়নগৃহ।

ভূপেনবাবু বলিলেন, সকলের ইচ্ছা যে, অভিনন্দনপত্রটি আমি রচনা করি। প্রস্তাব শুনিয়াই মন লোভী হইয়া উঠিল। বিপ্লবী-বন্দীদের পক্ষ হইতে কবিগুরুকে অভিনন্দন জানাইবার অধিকার, এই সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করিবার মত নির্লোভ আমি ছিলাম না। 'আচ্ছা' বলিয়া আমি সম্মত হইলাম। আমার জীবনে ইহাকে ভাগ্যের শ্রেষ্ঠতম একটি দান বলিয়াই আমি মনে করি। মুখে বলিলাম না, কিন্তু মনে মনে বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।

ভারতীয় রীতিতে মণ্ডটি সুসজ্জিত হইল। মঞ্চের সম্মুখে দুই ধারে কদলীবৃক্ষ ও আলপনা-দেওয়া মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল। সম্মুখের দিকে এক সারি প্রদীপমালা। প্রথমে ঐক্যতান, তৎপরে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া মঞ্চোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির পাদমূলে স্থাপিত হয়। সর্বশেষে 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' সংগীতে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। পরে কবি-গুরুর 'বিসর্জন' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকের পৌরোহিত্য করেন বন্ধুবর ভূপেন রক্ষিত।

সুধীরবাবু (বসু) ছিলেন শিক্ষিত আর্টিস্ট। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র একটি চিত্র অংকিত করিয়া নীচে অভিনন্দনটি চীনা কালিতে লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। একটি বাঁশের নলের আধারে 'অভিনন্দনপত্রটি' রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরিত হয়।

রবীন্দ্র জয়ন্তী কমিটির পক্ষ হইতে অমল হোম মহাশয় এক পত্রে জানান যে, অভিনন্দনটি কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি প্রত্যুত্তরে একটি 'প্রত্যভিনন্দন' কবিতা লিখিয়াছেন। কবির স্বহস্তে লিখিত "প্রত্যভিনন্দনটি" অভিনন্দন রচয়িতাকেই যেন দেওয়া হয়, ইহাই কবির ইচ্ছা। দুর্ভাগ্যবশতঃ কবির স্বহস্তের সেই 'প্রত্যভিনন্দন'-পত্রটি গোয়েন্দা বিভাগের ত্রুটিতে বক্‌সা ক্যাম্পে না আসিয়া বহরমপুরে বন্দিশিবিরে প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় জনৈক বন্দী তাহা আত্মসাৎ করেন বলিয়া আমি পরে খবর পাই। আমাকে না জানিয়াও আমাকে দিবার জন্য কবির বিশেষ ইচ্ছা জানাইয়া যাহা প্রেরিত হইয়াছিল, দৈবের খেয়ালে তাহা ভুল গন্তব্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে। আমার জীবনে এত বড় ক্ষতি খুব কমই হইয়াছে।

আমাদের অভিনন্দনপত্রটির প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—

"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চরণকমলে—
ওগো কবি,
তোমায় আমরা করিগো নমস্কার।
সুদূর অতীতের যে-পুণ্য প্রভাতক্ষণে তোমার আবির্ভাব, আজ বাঙলার সীমান্তে নির্বাসনে বসিয়া আমরা বন্দিদল তোমার সেই

জন্মক্ষণটিকে বন্দনা করি। আর স্মরণ করি বিরাট মহাকালকে, যিনি সেই ক্ষণটির দ্বারপথ উন্মুক্ত করিয়া এই দেশের মাটির পানে তোমাকে অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়াছেন।

যেদিন জ্যোতির্ময় আলোক-দেবতা তমসা-তীরে প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিলেন, আলোক-বহ্নির আত্মপ্রকাশই তো সেদিনকার একমাত্র সত্য নয়। সেই একের প্রকাশে সুপ্তির অন্ধকার তটে তটে বিচিত্র বহুও যে আপনাকে জানিয়া জানাইয়া উঠিয়াছে! হে মর্তের রবি, তোমার আকাশ-বিহারী বন্ধুর সঙ্গে তোমার যে পরম সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তুমি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছ, তাই তো বিস্মৃতির অখ্যাত প্রদেশে আমাদের মাঝে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হে ঐশ্বর্যবান; তোমার মাঝে জাতি আপন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়াছে।

হে ধ্যানী, তোমার চোখে জাতি মহান বিশ্ব-মানবের স্বপ্ন দেখিয়াছে।

হে সাধক, তোমার হাতে জাতি আপনার সাধনার ধন গ্রহণ করিয়াছে।

তাই কি তুমি প্রত্যেকের পরমাত্মীয় ?

হে ঋষি, তোমার জন্মক্ষণে এই বাঙলায় জনমগেহে সমগ্র জাতির জন্ম-জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। অজাত আমরা সেদিন অজানা নীহারিকাপুঞ্জের মাঝে না জানিয়াও শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। আজ জাগ্রত জীবনের যাত্রাপথে দাঁড়াইয়া হে অগ্রজ, তার ঋণ শোধ করি। আমরা না আসিতে তুমি আমাদের জীবনের জয়গান গাঁথিয়াছ। আমরা সে-দান প্রণামের বিনিময়ে আজ অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি।

তোমার জন্মক্ষণটি পিছনের অতীতে হয়তো হারাইয়া গিয়াছে,—কিন্তু আজিকার এই স্মরণ দিনে আমাদের কণ্ঠের জয়ধ্বনি সম্মুখের অগণিত মুহূর্তশ্রেণীতে প্রতি-ধ্বনিত হইয়া অনন্তের শেষ সীমান্ত-পারে গিয়া পৌঁছুক।

হে কবিগুরু, "তোমায় আমরা করি গো নমস্কার।' অবরুদ্ধের অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি গুণমুগ্ধ সমবেত রাজবন্দী"

বক্সা বন্দিশিবির,
২৫শে বৈশাখ,
১৩৩৮

আমাদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কবিগুরু পাঠাইলেন "প্রত্যভিনন্দন।" ঋষি কবির প্রত্যভিনন্দন, আমরা স্বভাবতঃই একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। অভিনন্দনের উত্তর হয়তো একটা তিনি দিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া বিনিময়ে তিনিও আমাদের জন্য অভিনন্দন পাঠাইবেন, ইহা বস্তুতঃই আমরা আশা করি নাই। বুঝিলাম, বাঙলার বিপ্লবী-দের প্রণাম বাঙলার কবিকে সত্যই বিচলিত করিয়াছে, কাজেই এই অগ্নি-প্রণামের প্রত্যুত্তরে ঋষির অভিনন্দন উৎসারিত হইয়াছে বিপ্লবীদের জন্য নয়, বিপ্লব-শক্তির জন্য।

কবিগুরু প্রত্যুত্তরে জানাইলেন—

"প্রত্যভিনন্দন
(বক্সা দুর্গে রাজবন্দীদের প্রতি)

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন॥

মৃত্তিকার ভিত্তিভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুথ শক্তি বলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত নরের রাজধানী॥

'অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা শুনালো বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দার্জিলিং"

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮।

কবিগুরুর এই প্রত্যভিনন্দন যত সাময়িক কালের জন্যই হউক, বন্দিদের একটু বিশেষ-ভাবে আত্মসচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, এইটুকু আমার মনে আছে। আমার নিজের কথা পূর্বেই একটু ব্যক্ত হইয়াছে। আমার লেখা কবিগুরুকে স্পর্শ করিয়াছে, ইহাতে সেদিন আমার দৃঢ় ধারণা হইল যে, আমি লিখিতে পারি এবং চেষ্টা করিলে সাহিত্যিক বলিয়াও হয়তো একদিন পরিচিত হইতে পারি। অর্থাৎ, এই ঘটনা—যাহা ঘটে তাহাই ঘটনা নহে, যাহাতে চরিত্রের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়, আমি তাহাকেই ঘটনা আখ্যা দিয়া থাকি,—আমাকে আমার সম্বন্ধে বেশ খানিকটা সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। যে-মনোভাব আমার সেদিন আমি দেখিয়াছিলাম, তাহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে আত্ম-আদর।

বয়স বাড়িয়াছে, রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছে, হয়তো মাথাও কিছু ঠাণ্ডা হইয়াছে, তাই আজ আর আত্ম-আদর বা আত্ম-অনাদর কোন ভাবই মনে আসে না। যেটা আসে, তাহা একটি প্রশ্ন অথবা প্রত্যাশা।

'প্রত্যভিনন্দন'-এর শেষ কথাটিতে কবি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়?" উত্তরে আজ আর বলিতে পারি না 'আমি বা আমরা।' অপরের কথা জানি না, কিন্তু নিজের কথা যতটুকু জানি, তাহাতে বলিতে পারি যে, বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের পরিচয় অন্ততঃ আমি দিতে পারি নাই। আমার মুক্ত পরিচয় আমার কাছে এখনও অনুদ্ঘাটিত রহিয়াছে, বাহিরের শৃঙ্খলচ্ছন্দে তাহার পরিচয় দেওয়ার কথা তো উঠেই না।

কিন্তু কবি এমন কথা কেন লিখিলেন? 'অমৃতের পুত্র মোরা,' এ কথা তো আমরা জানি না, বিশ্বময় জানানো তো অনেক পরের কথা। কেন কবি আমাদের সম্বন্ধে লিখিলেন 'আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।' অথচ শুনিতে পাই, 'ঋষির নয়ন 'মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না কহে।' প্রত্যভিনন্দনে আমাদের সম্বন্ধে ঋষিকবির এই উক্তি কি প্রকৃতই সত্য—ইহাই আমার প্রশ্ন।

ইহাকে প্রশ্ন না বলিয়া প্রত্যাশাও বলা চলে। ঋষিকবি আমাদের নিকট কি প্রত্যাশা করেন, তাহাই প্রশ্নের আকারে ঐভাবে প্রত্যভিনন্দনে জানাইয়া গিয়াছেন, এই অর্থেই আজ আমার মন ঋষির 'অভিনন্দন' গ্রহণ করিয়াছে এবং আমার ধারণা, ইহাই প্রত্যভিনন্দনের প্রকৃত অর্থ।

ঋষির প্রত্যাশা যদি আমাদের একজনের জীবনেও পূর্ণ হইত, তবে দেশের ভাগ্য আমরা ফিরাইয়া দিতে পারিতাম। যে-শক্তিতে গান্ধীজী ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করিয়া গিয়াছেন, তখন বাঙলার বিপ্লবীরা তাহার চেয়েও প্রবলতর ভাবে দেশ ও জাতিকে আন্দোলিত ও মন্থিত করিতে পারিত। সে-মন্থনে অমৃত যদি নাই বা উঠিত, অন্ততঃ বাঙলা-বিভাগের গরল উঠিত না, কিংবা সাম্প্রদায়িকতার বিষও সে-মন্থনে সঞ্জাত হইত না। বাঙলার বিপ্লবীদের কোন নেতা বা কর্মীর জীবনেই ঋষিকবির এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নাই, কেহই নিজ জীবনে ঋষির জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই।

আজ নিজের নিভৃত মনের গহনে তাকাইয়া দেখিতে পাই যে, বাঙলার বিপ্লবের অসমাপ্ত যজ্ঞশালা পরিত্যক্ত পড়িয়া আছে, কিন্তু ভস্ম-মাঝে এখনও অগ্নি অবসান হয় নাই। মহা-ঋত্বিক ও মহাতাপসের অপেক্ষায় এক কণা অগ্নি এখনও অপলক তাকাইয়া আছে।

সত্য কথাই বলিব, লিখিতে গিয়া নিজের বক্ষের পঞ্জরের অভ্যন্তরে ভীত কম্পন বোধ করিতেছি। ঋষির প্রত্যাশা পূর্ণ করিব, সত্যই কি এমন সৌভাগ্য ও অধিকার আমার আছে? তবে বৃথা কেন বুকের এই ব্যথা ও এই কম্পন? ঋষিকবি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়? আমি আজ আমার মনের চরম বেদনায় কাতর আহ্বান না জানাইয়া পারিতেছি না—হে বন্ধু, তোমরা কেহ তোমাদের জীবনে ঋষির এই প্রশ্নের উত্তর দেও। এ-প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত যে আমার মুক্তি নাই। আমি আজও সেই বন্দী। (ক্রমশঃ)

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

পায়ের শব্দ পেয়ে অরবিন্দ চোখ ফেরালে। একটু হাসলেও যেন। বাণী হাসি দিয়ে সংশয় ঢাকতে পারলে না—অরবিন্দর হাসিটা আগের মত নয়, যেন কেমন অসহায়, হাতে হাতে ধরা পড়ে লোকে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ঠিক ঐ রকম হাসে না কি ? যা হয় হোক এবার !

অরবিন্দর ধরণধারণ আজ বাণীর মোটেই ভাল লাগছে না। ঘুরতে ফিরতে কেন যে লোকটাকে আজ এত অসহ্য লাগছে বুঝতে পারছে না। আবার লোকটা চোখের ওপর না থাকলেও বোধ হয় ভাল লাগবে না। অসহ্য রাগটা কেন ? অরবিন্দ তাকে চোরের মত ভালবেসেছে বলে, না, তাদের ভালবাসাটা জানাজানি হ'য়ে গেছে বলে ? না, তার মত অরবিন্দ কি ভাবছে না ভাবছে জানতে পারছে না বলে ? মনে হ'চ্ছে অরবিন্দ সমস্ত দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে- তাই কি এত রাগ ? এখন যদি দাদার কাছে অরবিন্দ তাদের ভালবাসা-বাসি নিয়ে দুটো কড়া কথা শোনে বেশ কিছু অপমানিত হয়, তা হ'লে বাণী যেন খুব খুশী হ'বে—দাদার সংগে সেও যোগ দেবে, না তার বলতে একটুও আটকাবে না এ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না—অরবিন্দকে সে আদৌ ভালবাসে না।

কিন্তু সে ভালবাসে না বললেই কি সব মিটে যাবে ? তার আগে অরবিন্দ যদি বলে বসে ঃ কি বলচেন, আমি ও'কে ভালবাসতে যাব কেন, ক্ষেপেচেন ! তখন ? সেও না বললে, অরবিন্দকে তো কটু বলা যাবে না বরং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ওর সুবিধেই হ'বে। না, এত সহজে সে অরবিন্দকে ছাড়বে না—যত লজ্জাই করুক তার, সে বলবে অরবিন্দ তাকে ভালবাসে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একশ'বার, হাজার বার লক্ষবার। কিন্তু প্রতিপক্ষের অস্বীকারে তার ভালবাসা প্রমাণ হ'বে কি করে ? প্রমাণ কিছু আছে কি বাণীর ? যা দেখে নিরপেক্ষ লোকে ভালমন্দ সিদ্ধান্ত করবে। তাইতো প্রমাণ একটা থাকা চাই ! কি প্রমাণ আছে অন্তত বোঝাবার মত। অস্বীকার করে বরং অরবিন্দই তাকে অপমান করবে ? তা কিছুতেই সে হ'তে দেবে না। কই দাদার সামনে অস্বীকার করুক দিকি একবার—সে আগাগোড়া সমস্তই বলে দেবে। এমন প্রমাণ উপস্থিত করবে যে সব থ' হ'য়ে যাবে—অরবিন্দর মুখের মত জবাব হ'বে। বললেই হ'লো আর কি, কই আমি তো ও ব্যাপারের কিছু জানি না।

এত রাগেও প্রথম চুম্বন শিহরণ যেন আবার নতুন করে বাণী অনুভব করতে পারে—ওষ্ঠাধরে অঙ্কিত চকিত লাজরক্ত যেন জ্বল জ্বল করে ওঠে। বাণী তাড়াতাড়ি ঠোঁট দুটো চেপে দাঁড়িয়ে থাকে। অরবিন্দর কিন্তু এখনো কড়িকাঠ গোণা শেষ হয় না, হাতবাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিয়ে সমর ডাকলে, আয় বস।

অরবিন্দর কড়িকাঠ গোণা শেষ হ'লো, সহাস্যে চাটা নিয়ে বললে, আবার চা ? এই নিয়ে চারবার হ'লো।

বাণী উত্তর দিলে না। সমর বললে, আর একবার হতে আপত্তি কেন—নিন্, নিন্। বাণীর দিকে ফিরে বললে, শুধু চা নিয়ে এলি, খাবার টাবার কিছু আনলি না ?

অরবিন্দ বললে, না, না থাক্। আবার হাঙ্গামা মিছিমিছি—

বাণী উঠে পড়লো, ইচ্ছে হ'লো বলে, হোক হাঙ্গামা তবু তাকে খেতেই হবে। উনি বললেই অমনি খাবার আসবে না! শেষটা এমনভাবে ঘর ছেড়ে গেল যেন, শুধু চা গিলে অরবিন্দ এখনি পালিয়ে যাবার মতলব করছে। অরবিন্দকে কিছুতেই আজ না খাইয়ে ও ছাড়বে না। এখনি খাবার নিয়ে আসবে কেমন না-খেয়ে থাকুক দিকি! তাকে যদি হাঙ্গামা পোয়াতে হয় তো তার কি? মিছিমিছি মানে কি? লৌকিকতা করবার আর জায়গা পেলেন না? কেন ও'র ইচ্ছে মত! অন্যদিন দিব্যি রাক্ষসের মত না বলতেই খেয়েচেন—আজ হ'লো কি ?

স্খলিতপদে বাণীর ঘর ছেড়ে যাওয়ায় সমরও অবাক হয়—বাণীর ত্বরিৎপদে ক্রোধ প্রকাশ পায়। হঠাৎ বাণী এত বেজার কেন? অরবিন্দ কি ভেবে নিজের মনে হাসে। বাণীর আজ হ'লো কি ?

আলাপ আর তেমন জমে না। অরবিন্দ যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে এটা-ওটা প্রশ্ন করে, সমর ভাসা ভাসা উত্তর দেয়। যুদ্ধে যাওয়ার বাহাদুরীটা যুদ্ধের কলা-কৌশল ব্যাখ্যানে আর প্রকাশ পেতে চায় না, কেমন সংকোচ বোধ করে সমর এখন। যতই মুখে এরা আগ্রহ দেখাক, যুদ্ধ এবং যোদ্ধা কাউকেই এরা সম্মানের চোখে দেখে না, প্রবীরেরই তো বন্ধু! সমরের নিশ্চিত ধারণা হয়।

অরবিন্দ জিগ্যেস করেঃ আচ্ছা Frontএ তো ছিলেন, যুদ্ধ ক'রতে গেলে কোন জিনিসের দরকার ?

হঠাৎ প্রশ্নটা বড় ঠকান মনে হয়। কি উত্তর দেবে সমর ভেবে পায় না—বলে, সব জিনিসেরই দরকার।

অরবিন্দ হেসে বলে, কোন্‌টা না হ'লে যুদ্ধ একেবারেই চলে না ?

মনে মনে সমর বিরক্ত হয়। জিগ্যেস করবার আর কিছু পেলেন না—যত সব ফাজলামি—ওপর-চালাকি পাকামি! ন্যাকামি হচ্ছে? অরবিন্দ সম্বন্ধে এতক্ষণের সব ধারণা যেন উল্টে যায়। হাম-বড়া ছেলে যত সব! সমর বেশ উষ্মার সুরে বলে, কোনটা আবার, আপনি জানেন না—সাহস!

শুধু সাহসে Total win হয়? আর কিছুর দরকার হয় না—জেদ? অরবিন্দ সমরের মুখের ওপর চেয়ে থাকে। সমর থতমত খেয়ে যায় যেন।

অরবিন্দ বলে, সাহসটাই যদি সব কিছু হ'তো তাহ'লে যুদ্ধাবস্থা বেশীদিন থাকতো না—আর যে কারণে মানুষ মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সে কারণ কি যুদ্ধের কারণ? সাহস মানে কি to shoot and kill, to bomb and destroy, to be able to march under orders? আমার তো মনে হয় এ সব যুদ্ধে সাহসের কোন নাম গন্ধ নেই। একটা অদমিত উন্মত্ত ব্যক্তিগত জেদই এখন দেশে দেশে যুদ্ধ বাধায়—মুষ্টিমেয় কতকগুলো লোকের খেয়াল ছাড়া ও আর কিছু নয়। যুদ্ধের পূর্বে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যতই বলা হোক না কেন, যুদ্ধ না ঘটাবার পক্ষে অবস্থা সৃষ্টির পথ ভাল করে' অনুসন্ধান করা হয় না। আন্তরিক কোন চেষ্টাই হয় না। সাহস কার—যারা রাইফেল বোমা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করে তাদের না, যারা পেছন থেকে কেবল হুমকি ছাড়ে? অর্থ-বিনিময়ে স্বজাতি হননের যে ইচ্ছে তাকে আপনি সাহস বলবেন? অরবিন্দর কথায় একটা মাতব্বরির গন্ধ পায় সমর। মনে মনে বড় চটে ওঠে—এদের মতলবটা কি, পাকেপ্রকারে তাকে এত কথা শোনাচ্ছে! সে তো জানতে চায়নি যুদ্ধটা কি, কেন, এদের এত মাথাব্যথা কেন তবে? সমর নিজেকে অপমানিত বোধ করে—না, না, কোন তর্ক সে এদের সংগে করতে চায় না, নিজের কোন ব্যক্তিত্বও প্রচার করতে চায় না। হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত করবার ইচ্ছে হয় সমরের, এমন শিক্ষা দেবে যে, আর কখনো পাকামি করতে আসবে না এরা উপ-যাচক হ'য়ে।

সমর বলে বসেঃ ঘরে বসে ল্যাজ নাড়াটা তাহলে সাহসের পরিচয় কি বলেন? যারা কখনো সাহস দেখাবার জন্যে নড়ে বসে না তারাই সাহস নিয়ে গবেষণা করে। কিন্তু সাহসটা তো শুধু কথার নয়, কাজের! আপনি আমাকে চড় মারলে সঙ্গে সঙ্গে সেই চড় ফিরিয়ে দিলে কি বলবেন? Courage hates argument!

এতটা হবে অরবিন্দ ভাবতে পারেনি। তাছাড়া রাগ করবার মত কি সে বলেচে। একটু যেন মনে মনে লজ্জিত হ'য়ে পড়ে। ভাবে হয়তো এ প্রসঙ্গ তোলা তার উচিত হয়নি। পরক্ষণেই আবার মনে হয়, এখন চুপ করে যাওয়া মানে হার স্বীকার করা—তর্ক যখন তুলেছে তখন ভাল করেই মীমাংসা হোক, করলেনই বা উনি রাগ! হেসে জবাব দেয়, ল্যাজ নাড়াটা যেমন সাহসের নয় তেমনি আগ বাড়িয়ে ল্যাজ কেটে আসাটাও সাহসের নয়। সাহস যেমন তর্ক করে না, তেমনি আবার ডিকটেশন মানে না—ফরমাস করে' নিশ্চয়ই সাহস আনা যায় না। চড়ের বদলে চড় মারতে পারলেই কি সাহস দেখান হয়?

সমর যেন রেগে জবাব দেয়ঃ হ্যাঁ, হয়। আপনার ও 'বাঁকিস' ব্যাখ্যা রেখে দিন!

অরবিন্দ হেসে বলে, আপনি যখন রাগ করচেন তখন না হয় রেখে দিলুম, কিন্তু যাই বলেন, আধুনিক যুদ্ধে সাহসের কোন বালাই নেই!

সমর চুপ করে' থাকে। আর তর্ক বৃথা—ইঙ্গিতটা যে তাদের লক্ষ্য করে বুঝতে পারে। মিলিটারীরা সাহসের 'সিমবল' নয়, বিভীষিকার প্রেত। মানুষের কুটিল ক্রুর চক্রান্তের জৌলুষ রূপ হ'চ্ছে ঐ মিলিটারীর সাজপোষাক! এ যেন সুদৃশ্য খাপে বিষ মাখান জড় ছুরি! জমকাল সামরিক সাজপোষাক পরে যতটা হোমরা চোমরা মনে হয় তা কি মিথ্যে? সমর কি অস্বীকার করতে পারে—মিলিটারী পোষাক এবং ব্যাজ পরে নিজেকে তার খুব Distinguished মনে হয়। কেন? পোষাকের জন্যে, না পদের জন্যে, না কাজের জন্যে? সাধারণ লোক কি তাদের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে না? কেন?

সমর বলে, সাহসের বালাই না থাক, তর্কেরও কোন অবকাশ নেই। আপনাদের যা খুশী বলতে পারেন। I do not defend war but I do not deny it in the manner you people do. You cannot do without war.

অরবিন্দ আবার তর্ক তোলেঃ কেন যাবে না—তা হ'লে সভ্য বলে' গর্ব করে' লাভ কি? যুদ্ধ ছাড়া যদি বাঁচা না যায় তা হ'লে বেঁচে লাভ কি? বাঁচবার পক্ষে ওটা কি অনিবার্য?

সমর উত্তর দেয়ঃ তর্ক ক'রলে কি হবে, যুদ্ধের 'রেফারেন্স'ই তার প্রমাণ—বাঁচতে গেলে যুদ্ধ করতেই হ'বে, আর বেঁচে থেকে যুদ্ধ করতেই হয়। It's fact! সাহস থাক আর নাই থাক।

অরবিন্দ বলেঃ যুদ্ধটাকে অত আমল না দিলে, যুদ্ধাবস্থার 'ইমপরট্যান্স' পূর্বাহ্নে স্বীকার না করলে বোধ হয় যুদ্ধ ছাড়া বাঁচা এবং বাঁচান যায়।

সমর হাসে। ছেলেমানুষী চিন্তা ছাড়া কি! এদের ওপর রাগ করে মিথ্যে মিথ্যে মাথা গরম করা। সাহসের ওরা কি ধার ধারে, কি বুঝবে।

অরবিন্দ বলে, 'হিউম্যান এ্যাফেয়ার্স'-এ হিউম্যানই গেছে তাই যুদ্ধ না হলে আজ চলে না—তাছাড়া ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞাটা বড় ব্যক্তিগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাই যুদ্ধকে ঘৃণা এবং গর্হিত বলবার মত সার্বজনীন নৈতিক-বোধও জগতের সব মানুষের নেই। যত খণ্ড ক্ষুদ্র বৃহৎ যুদ্ধ হোক্ না কেন, প্রত্যেক প্রতি-পক্ষের সমর্থক এবং সহায়ক আছে, কাজে কাজেই যুদ্ধকে ঠেকান যায় না, সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। ভেবে দেখবেন মিলিটারী বাজেটে প্রতি বছর যে পয়সা খরচ হয় তাতে করে' স্বর্গরাজ্য তৈরী করা যায়।

সমর বলে, তা বলে 'হিউম্যান নেচার' তো আর উল্টে দেওয়া যায় না।

অরবিন্দ বললে, বোধ হয় সম্ভব, চেষ্টা তো কেউ কোনদিন করে' দেখেনি।

সমর হাসে। একেবারে ছেলেমানুষী চিন্তা; হিউম্যান নেচার বদলাবে! শুধু ছেলে-মানুষীই নয়, অলীক অবাস্তব চিন্তা!

অরবিন্দ আবার বললে, ওটা তো আপনার ধারণা—'হিউম্যান নেচারের' শেষ কথা কি জানা গেছে?

তর্ক করার প্রবৃত্তি সমরের অনেক আগেই চলে গেছে—কি হ'বে তর্ক করে? যেহেতু সে যুদ্ধে গিয়েছিল সেই হেতু এখন এরা অনেক কথাই বলবে, অনেক নাক উল্টোবে, অনেক উপদেশ দেবে। নিজেদের কথার সারবত্তা বোঝাতে পুঁথিগত অনেক বিদ্যাই আওড়াবে। কিন্তু হাজার লক্ষ কোটি পুঁথিতে কি যুদ্ধ ঠেকাতে পেরেচে, না, পারবে কোনদিন? হঠাৎ এটম বোমার কথাটা মনে পড়ে যায়—বুকের ভেতরটা কেমন করে' ওঠে; একি উল্লাস না আতঙ্ক সমর ঠিক ধরতে পারে না। চোখের ওপর একটা জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গ যেন ঝলসায়। মুহূর্তের জন্যে এই ঘরবাড়ী, গৃহপরিবেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব কিছুর চেতনা লোপ পায়—কিছু নেই, কেউ নেই, অনুভূতির পারে এ এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি! পর মুহূর্তে আবার পূর্বাপরের জ্ঞান ফিরে আসেঃ যুদ্ধ-ফেরৎ ক্যাপ্টেন সমর দত্ত, বকুলবাগান রোডের অধিবাসী! ভেবে আশ্চর্য লাগে, হঠাৎ এরকমটা হ'লো কেন! সামনাসামনি যুদ্ধে প্রচণ্ডতায় তো কোনদিন এমন হতচেতন আসেনি, বরং তখন প্রতি মুহূর্তে ঘরের কথ নিজের কথা, সবার কথা খুঁটিয়ে মনে পড়তো মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও মৃত্যুর কথা ভাবা যে না—সকলে মরলেও সে মরবে না, মৃত্যুর বারত বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে শুধু বেঁচে থাকবে

সমর চুপ ক'রে অরবিন্দর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দৃষ্টিটা কেমন শূন্যে মনে হয় অরবিন্দ একটু অবাক হ'য়ে যায়। সে বরাব লক্ষ্য করছে কথার মাঝখানে সমর কেমন অন্য মনস্ক হ'য়ে পড়ছে। এখন ব্যাপারটা যে বেশী করে' চোখে পড়ল। কেন? উনি কি তা হ'লে এ বিষয়ে কোন কথা পছন্দ করেন না অরবিন্দ তর্ক করার জন্যে মনে মনে বিরক্ত হ'য়েছেন? অরবিন্দ অবশ্য ওর সম্বন্ধে এতক্ষণ ধারণা ভালই করেছে—মিলিটারীদে যতটা অহঙ্কারী উদ্ধত এবং নির্বোধ ভাবতে ইনি তা নন। অরবিন্দ ভাবতে পারে না এতক্ষণের আলাপে বাণীর দাদার কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে। এতক্ষণ তর্ক যাই হোক অন্তত বাণীর দাদার সম্বন্ধে তার কো বিপরীত ধারণা হয়নি। তার সম্বন্ধে বাণী দাদা কি ধারণা করলেন? নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ধারণা করে নিয়েছেন। সমরের চুপ করে থাকায় অরবিন্দ মনে মনে লজ্জিত হ'য়ে পড়ে।

নিজের কানে বেখাপ্পা শোনালে জিগ্যেস করেঃ রাগ করলেন না কি?

সমর চমকে উঠে বলে, না, না, রাগ কেন কথাটা ভেবে দেখবার সত্যি!

কণ্ঠস্বরে ঠিক মনের অনুমোদন প্রকা পায় না। অরবিন্দের মনে হয় সমর কথা কথা একটা বললে।—কথা বাড়াবার ইচ্ছে নে বলেই এড়িয়ে যেতে চাইচে। কি ভেবে দেখ দরকার? Human Nature সম্বন্ধে সত্যি কি ও'র ভাববার দরকার হয়েছে?

খানিকক্ষণ দুজনে চুপ করে' বসে থাকে অসহ্য রকমে অস্বস্তিটা বাড়তে থাকে দুজনেই যেন দুজনের কাছে লজ্জিত হ' থাকে—হৃদ্যতার যে ইচ্ছে প্রথমে দুজ অপরিচিত ব্যক্তিকে টেনে আলাপ জমিয়েছিল-এখন যেন সে ইচ্ছেটা ততো নয়, এ বিপরীত বিমুখতায় দুজনকেই স্তব্ধ করে দিয়েছে। সোজা সুতোয় গেরো পড়া মত।

এক সময় অরবিন্দ উঠে পড়ে। হঠাৎ উ পড়াটা অসৌজন্য মনে হ'লেও চুপ করে ব থেকে, ছেঁড়া চুলে গেরো দেওয়ার বিড়ম্ব থেকে তো রেহাই পাওয়া যাবে। এর মধ্যে বাণী আর ঘরে আসেনি, সে থাকলে না হ পুনঃ আলাপের চেষ্টা করে' দেখা যেত আজকাল বাণী অনেক হুঁসিয়ার হ'য়ে গে পূর্বের মত সদাচঞ্চল ভাব আর প্রকাশ ক

না—কখন তখন ঘরে ঢুকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। খুঁজে দেখবে না কি বাণী এখন কোথায় আছে? না, থাক এখন আর এ বাড়ীতে খোঁজাখুঁজি চলবে না, অরবিন্দর কেমন ধারণা হয়। বাণী বোধ হয় তার দাদার ভয়ে জড়সড় হ'য়ে আছে।

তবু কিছুক্ষণ অরবিন্দ বাইরের ঘরে একলা-একলা চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকে, সে বেরিয়ে গেলে দরজাটা তো খোলা থাকবে, আজ একথা কি এবাড়ীর কারো খেয়াল হয়নি এখনো। একি প্রতীক্ষা না নেহাৎ-ই প্রয়োজন বোধে অপেক্ষা করা? বাণীর আজ হ'লো কি? এত ভুল হ'চ্ছে কেন? আগাগোড়া ব্যাপারটা অরবিন্দের একটা অশুভ ইঙ্গিতের মত মনে হ'চ্ছে—নিশ্চয়ই তার অবর্তমানে বাণীকে নিয়ে এমন কিছু হ'য়ে গেছে যার ফলে পূর্বের মত বাণীকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাণী হারায়নি, বাণীকে হারিয়ে ফেলেছে সে।

একলা একলা অপেক্ষা করার অধীরতা ক্রমশঃ নিরাশার বেদনায় পর্যবসিত হয়। হয়তো আর অপেক্ষা করার দরকার হ'বে না কোনদিন।

সবে দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামতে যাবে ঘরের মধ্যে চেয়ার নাড়া শব্দ হ'লো। অরবিন্দ পিছন ফিরে দাঁড়াল। বাণী এসে ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়েছে। চোখে কান্না নেই কিন্তু কিসের যেন অসহায় আকুলতা আছে। অজস্র সহস্র বক্তব্য যেন না বলা বেদনায় মুখের ওপর নীল হয়ে আছে।

অরবিন্দ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাণীর হাত ধরে। কি হয়েছে, জিগ্যেস করবার আগেই বাণী অরবিন্দের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেলে।

এই মাত্র কথা প্রসঙ্গে অরবিন্দ যে কথা তুলে গেল তা যেন ইচ্ছে করে ঠেলে দেওয়া যায় না। মুখে সমর যাই বলুক না কেন, মনে খটকা লাগাবার মত একলা ঘরে অরবিন্দর কথাগুলো খোঁচাতে থাকেঃ যাই বলুন, যুদ্ধের সঙ্গে সাহসের কোন সম্পর্ক নেই—যারা সত্যিকারের সাহসের পরিচয় দেয়, তারা কোনদিন যুদ্ধ করবার ইচ্ছে নিয়ে যুদ্ধ করে না।

সমর ভেবে অবাক হয়, শেষের কথাটুকু এখন আপনা থেকে অরবিন্দর কথার ব্যাখ্যা হিসেবে তার মনে উদয় হচ্ছে। তা হলে অরবিন্দর কথায় সত্য আছে—যুদ্ধের সঙ্গে সাহসের কোন সম্পর্ক নেই? দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বৃত্তি? একই লোকের পক্ষে একই সময়ে ঐ দুই বিপরীত বৃত্তির অনুভূতি কি খুব সম্ভব? সাহসটা যদি ব্যক্তিগত হয়, যুদ্ধটা সমষ্টির—বহু সাহসের প্রকাশে যুদ্ধের সৃষ্টি! কিন্তু সাহসের বিরুদ্ধে সাহস যদি না দাঁড়ায়? অরবিন্দ তো সেই ব্যাখ্যাই করতে চাইলে এতক্ষণ—সাহস কোনদিন মারমুখো হবে না, বরং শান্ত সুবোধ একটা বৃত্তির মত থাকবে! কি করে তা সম্ভব?

মানুষের স্বভাবের শেষ কথা যেন ওরা জেনে বসে আছে! তখন মুখোমুখি সমর প্রতিবাদ করেছিল—অসম্ভব বলে অরবিন্দর কথা মানতে চায়নি। এখন যেন মনে হচ্ছে অরবিন্দর কথাটা মানলেও মানা যায়। যে সাহস যুক্তি মানে না সে ঠিক সাহসের পর্যায়ে পড়ে না, বোধ হয় গোয়ার্তুমি বলে তাকে। আর যুদ্ধ মানে গোয়ার্তুমির সংঘর্ষ।

আশ্চর্য, এসব কথা সমর এখন ভাবছে কেন নিজেই বুঝতে পারে না। যুদ্ধ করতে গেলে সাহসের দরকার আছে কিনা জেনে এখন আর তার লাভ কি? তারা সাহসের পরিচয় দিয়ে এসেছে কি কতকগুলো জেদী লোকের খেয়ালের খেলনা হয়ে ফিরে এসেছে তার কৈফিয়ৎ অরবিন্দ প্রবীরের মত ছেলেদের দিয়ে লাভ কি—আর দেবেই বা কেন? যুদ্ধে যাওয়া সাহসের কি না, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের বোঝাবার জন্যে সমরের এত মাথা ব্যথা কেন? নিজেকে সাহসী ভাবার পক্ষে আজ হঠাৎ এ সংশয়ই বা জাগে কেন? ব্যক্তিগত যে কারণেই সে যুদ্ধে যাক্ যুদ্ধে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে? প্রবীর অরবিন্দ অস্বীকার করলেই এমনি সেটা মেনে নিতে হবে? কেন? নিজের কাজের নিন্দা প্রশংসার জন্যে সমর কি ওদের মুখ চেয়ে বসে আছে? এমন কি মাতব্বর ওরা? তবুও দেশের পাঁচজন হিসেবে ওদেরই সমরের মনে পড়ে। যে সাহসিকতার পরিচয় নিয়ে দেশে ফিরে গর্ব করবার এবং বাহবা পাবার ইচ্ছে ছিল, ঘরে-বাইরে তার তো কোন সমাদরই হলো না। কুলী-কেরাণীর মত কারো মনে কোন ঈর্ষা বা শ্রদ্ধা জাগাতে পারলে না। কাঁধে ব্যাজ এ'টে বুশ্ সার্ট ট্রাউজার্স পরে যতই তারা ঘোরাঘুরি করুক না কেন!

বড় নিরর্থক মনে হয় সমরের নিজেকে। যেন বড় বেগার খেটে দেশে ফিরে এসেছে—বড় ধরা পড়ে গেছে সবার কাছে। কোন কিছুর দোহাই দিয়ে আর নিজের যুদ্ধে যাওয়াটাকে সমর্থন করতে পারবে না। এই ক'দিন ধরে পরিবর্তনের একটা ধারণা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—কিন্তু কি সে পরিবর্তন, কোথায় সে পরিবর্তন সমর সঠিক ধারণা করতে পারে না। কখনো মনে হয় পরিবর্তনটা সামাজিক, কখনও বা ব্যবহারিক আবার এখন নিঃসংশয়ে মনে হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ রাজনীতিক। বাগ-বেণীবাবুরা সে পরিবর্তনের যে ইঙ্গিতই করুক, অরবিন্দ বাণী প্রবীর এরা আবার ভিন্ন পথের সন্ধান দেয়। গত ছ'বছরে দেশ অনেক বদলে গেছে—তার ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ এ। পূর্বের সে মানুষ আর নেই, সে দেশ . আর নেই—অনেক নীচতা সংকীর্ণতার মধ্যেও অনেক মহত্ত্বের সন্ধান চেষ্টা করলে যেন পাওয়া যাবে। দুঃখ করবার কারণ থাকলেও আশা ছাড়বার কারণ নেই। এই প্রবীর, এই অরবিন্দ এরা তো আর বৃথা নয়!

কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে তার কোন যোগ থাকবে না? ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের জাবর কেটে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে? হেরে যাওয়ার, ছোট হওয়ার প্রশ্নটা এখন বড় বেশী মনে হয়। এদের সকলের কাছে সে হেরে গেছে এদের সকলেই তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। বৃথাই সে যুদ্ধে যাওয়ার গর্ব নিয়ে বুকে-পিঠে ব্যাজ এ'টে নিজেকে দ্রষ্টব্য করতে চেষ্টা করছে—কে পোছে তাকে—Who Cares?

হঠাৎ চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলতে মাথাটা কেমন ঘুরে যায়—মুহূর্তে সব কিছু লোপ পায়. অনুভূতির তীব্রতায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যেন পাক খায়—ঝড়ের নাড়ায় মাঝ দরিয়ায় তরী কাৎ হয়ে পড়ার মত। কে জানে, এ পরিবর্তন ভাল না মন্দ? তার জীবনে এ পরিবর্তনের অদৃশ্য ছোঁয়ায় তার পরিকল্পিত সুখের অন্তরায় হয়েছে কি না?

স্পর্শ-কাতর মনটা সহসা বড় কঠিন হয়ে ওঠে—সমস্ত কিছু অস্বীকার করার হঠকারিতায় মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়। সে যদি এ সব কিছুই না স্বীকার করে? করবে না কোন কিছুই স্বীকার, মানবে না কোন পরাভব —দুর্বল মানসিকতাকে আমল দেবে না। যদি একান্ত বর্তমানকে মানিয়ে নিতে না পারে, অতীতের সঙ্গে তাহলে আবার নতুন করে আরম্ভ করবে—তা বলে ভেবে আক্ষেপ করবার জন্যে সে দেশে ফিরে আসেনি। ছুটি ভোগ করতে সে দেশে এসেছে আবার ছুটি ফুরলে চলে যাবে, তার অত ভেবে লাভ কি? প্রবীর যা খুশি তাই করুক, অরবিন্দ যা খুশি তার সম্বন্ধে ভাবুক—বাণীকে নজরবন্দী রেখে কাকে সে ঠেকিয়ে রাখবে।

(ক্রমশঃ)

গীতার শিক্ষা ও সাধনা

গীতা জয়ন্তীর উপসংহারে কিছু বলতে অনুরোধ এসেছে। কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না। প্রথমত যাঁরা এই অনুষ্ঠানের চার দিনব্যাপী আয়োজন করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গীতার কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। এমন দিনে যাঁরা গীতার ধ্বনি আমাদের কানের কাছে এনে ধরেছেন, তাঁরা সত্যই আমাদের নমস্য। সে ধ্বনি কতখানি আমাদের কানে বাজবে, সে বাণী কতখানি আমরা বুঝব, এ বিচার করবো না; কারণ তার যেটুকু শুনবো, যেটুকু বুঝবো তাতেই আমাদের কাজ হবে। গীতা প্রজ্ঞানময়ী, সকলের বোঝবার মতই তা সোজা, আর সকলে যাতে তাজ্ঞা হতে পারে, তেমন করেই তা সাজানো রয়েছে। গীতা সবাকার উপদেষ্টা। একদিক থেকে বিচার করলে কেহই তা বুঝেন না, অন্য দিক থেকে বিচারে সকলেই বোঝেন। মধুর রসের এই হলো ধর্ম। একেবারে বুঝে শেষ করে ফেললে আর তার মাধুর্য থাকলো কি? গোপন কিছু না থাকলে, রহস্য যদি কিছু না থাকে, সবই যদি প্রকাশ্য হয়, তবে সে জিনিস মধুর হতে পারে না। এই দিক থেকে গীতা ষোল আনা কেউই বুঝে উঠতে পারেন না। এর যত ভাষ্য, যত টীকা হয়েছে, জগতের অন্য কোন শাস্ত্রের বোধ হয়, তা হয়নি, তবু গীতার রহস্য সমানই রয়ে গেছে এবং অনন্তকাল ধরেই মানুষের কাছে গীতা জিজ্ঞাস্য থাকবে। প্রজ্ঞানময়ী ধ্বনি এবং বাণীর এই হচ্ছে বিশিষ্টতা। এইদিক হতে গীতা পণ্ডিতদের কাছেও দুরধিগম্য। আবার অন্য দিক থেকে এ শাস্ত্র সকলের পক্ষেই সুগম। যিনি মনের যে স্তরে আছেন সেই স্তরেই গীতার বাণী চিত্তকে দৃপ্ত করে তুলতে পারে। মানুষের মনের মাপ বুঝে ভাব বিস্তার ক'রে গীতা জীবনে পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ অধ্যায়নী এই জননীর কাছে কেহই নিরাশ হয় না। মায়ের স্তন্য ধারায় সবাই তুষ্ট এবং পুষ্ট হয়। গীতার নামটা শুনতে চাইলেও লাভ আছে।

বলতে পারেন, ধর্ম আমরা চাই না, পরকাল আমরা জানি না। আমরা গীতা দিয়ে কি করবো? বলা বাহুল্য ধর্ম এই কথাটি শুনলেই আজকাল অনেকে বিরক্তি বোধ করেন। যাঁরা ধর্মের কথা বলেন, তাঁদের এরা করুণার পাত্র এবং নির্বোধ মনে করেন। ওদের অনেকের বাচনিক বিনয়ের ভঙ্গীতে সে ভাবটা চাপা থাকে মাত্র। পরকাল না মানাই এদের মতে বিদ্যাবত্তার লক্ষণ। পরকাল আছে কি না আছে, সে খোঁজে দরকার নেই, যে ক'টা দিন বেঁচে থাকা যায়, তার বিচারই এঁরা বড় বলে বোঝেন, এই কথা বলেন। এঁদের কাছে যুক্তি, বিচার এগুলিই নাকি বড়। ধর্ম সে অযৌক্তিক, পরকাল মানাটাও অযৌক্তিক এবং অনর্থক। এঁদের মতে ঐহিক প্রয়োজনের সংস্থানের মধ্যে সব যুক্তি রয়েছে। এঁদের কথায় আপত্তি করতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, ধর্ম না মানলেও নীতি মানার প্রয়োজন আছে। গীতার শিক্ষা এই নীতির শিক্ষা, অর্থাৎ কিভাবে জীবনকে চালালে *এর ষোল আনা রস আমরা উপভোগ করতে পারবো,* গীতা আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে। গীতার শিক্ষায় জীবনের আর্ট অধিগত হওয়া যায়। পরকাল না মানায় আপত্তি কিছুই নাই। কিন্তু শুধু কথার জোরে পরকালকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জীবনের ক্ষয় সম্বন্ধে যদি চেতনা রয়, যদি ভয় থাকে তবে পরকালও যাচ্ছে না। পরে কি হবে এ চিন্তা থাকছেই। যদি জীবনকে আমাদের পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, এর সব দৈন্যের উপরে উঠে যেতে পারি, যেখানে আলোর রাজ্য সেখানে, তবেই পরকাল না মানার বড়াই সার্থক হতে পারে। গীতার শিক্ষা জীবনকে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। পরকালের তোয়াক্কা না রাখবারই সে শিক্ষা। স্বর্গ সুখের জন্য গীতার প্রয়োজন নাই। গীতা স্বর্গ সুখকে নিন্দাই করেছে। সর্বাবস্থায় জীবনের সংগতি, স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবার জন্যই গীতার শিক্ষার প্রয়োজন। বর্তমানে ঐহিক সুখভোগের একটা ঝোঁক সর্বত্র দুর্নিবার হয়ে উঠেছে, কিন্তু এতে শান্তি আমাদের কিছু মিলছে কি? না শান্তি এতে আমাদের মিলছে না। মিলতে পারেও না; আমাদের জীবনের মৌলিক নীতির সঙ্গে এ গতির সংগতি নেই। ঐহিক ভোগকে একান্ত করে দেখবার এ দৃষ্টিতে আমাদের শিক্ষা সার্থক হতে পারছে না। বাস্তবিক পক্ষে জীবনকে স্বচ্ছন্দ করবার বিদ্যা থেকে আমরা বঞ্চিত থাকছি। অর্থ-সাম্য ঘটাতে গিয়ে আমরা জীবনের ব্যর্থতাই পুঞ্জীভূত করে তুলছি," শ্রেণী বৈষম্য বিলোপ করতে গিয়ে দুরন্ত বিদ্বেষে শ্রেণী বৈষম্যের পীড়ন এবং বিভীষিকাকে একান্ত করে তুলছি। প্রকৃতপক্ষে সেবা এবং ত্যাগের পথেই যে জীবনের সার্থকতা লাভ হতে পারে, আমরা সমগ্র অন্তর দিয়ে এ সত্যটিকে বরণ করে নিতে পারছি না। কাব্যের বিচারে ধন-সাম্য বলছি, কিন্তু প্রেম আমাদের অধিগম্য হচ্ছে না। ফল হচ্ছে এই যে, বিদ্বেষের পথে বিদ্বেষই পুষ্ট হয়ে উঠছে, অন্ধকারের পর অন্ধকারই জমছে, পথের খোঁজ মিলছে না। বিজ্ঞানের দানে দুঃখের বানেই আমরা বেশী করে ডুবে পড়ছি। আমাদের সুখ একটুও বাড়ছে না। গীতা এখানে আলোক দেখিয়েছে। গীতার শিক্ষা সেবা এবং ত্যাগের অনবদ্য মাধুরী-স্পর্শে আমাদের জীবনকে শতদলের মত ফুটিয়ে তুলেছে। এ মানব-সংস্কৃতি গূঢ় তাৎপর্য ও গীতার সাহায্যে সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মনকে উদার করে। পরকে আপন করে, অভাবের মধ্যে ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করবার শক্তি এবং সমর্থ্য চিত্তে সঞ্চার করাই শিক্ষার সার কথা। জীবনের সামঞ্জস্য এবং সংগতি সাধনের জন্যই বিদ্যার প্রয়োজন, হাহাকার বাড়াবার জন্য নয়। এই বিদ্যাই গীতায় বিতরণ করা হয়েছে। বস্তুত আমরা শিক্ষিত হয়েও প্রকৃত শিক্ষার প্রভাব জীবনে অনেকেই লাভ করতে পারি না। স্বার্থ সংকীর্ণতাকে কেন্দ্র করে বাইরের কতকগুলো উপচার সংগ্রহ ক আর তারই আড়ম্বর, এতে শিক্ষার উদ্দেশ্য প হয় কি? পক্ষান্তরে পশুত্বের গ্লানি, দুর্বল ভয় ও বিদ্বেষ এগুলোই জীবনে একান্ত হ দাঁড়ায়। ত্যাগের প্রাচুর্য এবং নির্মল জীবে মাধুর্য বিষয় চিন্তার এই গ্লানির তাপে শুকি যায়। জীবন তিক্ত এবং নীরস হয়ে দাঁড়া সে অবস্থায় আমাদের মুখে কষ্টস হাসিতে অন্তরের আড়ষ্টতা কাটতে পারে ন আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনকে এমনই একা আড়ষ্টের ভাব অভিভূত করে ফেলছে। ধনী হও দোষের কিছু নয়, একথা শুনছি। কিন্তু শুনে অন্তর দিয়ে মানতে পারছি না। যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক পোকামাকড়ের মত মরছে, সে দেশে ধন হওয়া, অর্থাৎ ধনের অধিকারে ভারী হওয়া নিশ্চয়ই দোষের। কিন্তু বললেই মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, কিংবা অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয়ের পথও নিরোধ হয় না। মানুষের পক্ষে এভাবে ধনী হওয়া যে বিড়ম্বনা এবং বঞ্চনা, এতে মানুষের অধিকারের দিক থেকেও গ্লানি বা হানি রয়েছে, নিজের হিসাবের খাতাতে যে লোকসান ঘটছে, এ সত্য যে পর্যন্ত আমরা মনে মুখে এক করে না বুঝবো ততদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজ-জীবনের দৈন্য কোনক্রমেই দূর হবে না। গীতা জলের মত পরিষ্কার করে এইটি বুঝিয়ে দিয়েছে। সেবা এবং ত্যাগ যার জীবনে নাই, গীতার দেবতা তেমন ধনীকে চোর বলে অভিহিত করেছেন। ভাগবত বলেছেন, যেটুকু নিজের একান্ত প্রয়োজন ধনের সেইটুকুতেই তোমার অধিকার। তার বেশী যে ভোগ করবে সে দণ্ডনীয় অপরাধী। এসব নীতিকথায় আমাদের অন্তরাত্মা সত্যই কি সাড়া দেয়? যদি না দেয়, তবে আমরা মানুষ হতে পারব না। শুধু তাই নয়, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বজায় রাখাও আমাদের পক্ষে দুষ্কর হবে। সুতরাং ধর্মের জন্য গীতার প্রয়োজন না থাকলেও আমরা যাতে মানুষ হতে পারি, পশুত্বের ক্লেদ গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের মৌলিক আনন্দ ও সৌন্দর্য যাতে আমরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হই, এজন্যও গীতার শিক্ষার প্রয়োজন আছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যই আজ গীতার আদর্শ অবলম্বনীয় হয়ে উঠেছে।

প্রকৃত পক্ষে গীতা ধর্মকে বাস্তব জীবন হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখে নাই। ভারতের শিক্ষাই তা নয়। গীতা অর্থ অর্জন করতে না বলেছে তা নয়, তবে অর্থের দ্বারাই যে অর্থ সিদ্ধি ঘটে না, সেবার পথেই অর্থ সার্থকতা দিতে পারে, এ শিক্ষা গীতা দিয়েছে এবং বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এতে অপরের উপকার যত হোক না হোক, তোমার নিজের যে উপকার হবে তা সুনিশ্চয়। সেবার এই ব্যবসায়ে টাকা খাটালে লোকসান কোন দিক থেকে যে হওয়ার উপায় নেই, গীতা তা স্পষ্ট ক'রে বোলেছে। শুধু তাই নয়, গীতা এ কথাও বলেছে যে, বাইরের পরিমাণ বা উপচারের উপর জীবনের পূর্ণ রস-সম্ভোগের এই অধিকার নির্ভর করে না, সেবা এবং ত্যাগে তোমার একান্ততার উপরই তা নির্ভর করে। অর্থাৎ ধনী দশ টাকা সেবার্থে ব্যয় করে যে আনন্দ পেতে পারেন, তুমি দুই পয়সা ব্যয় করেও তা পেতে পার। ব্রাহ্মণ বিদ্যা দান করে যে আনন্দ লাভ করতে পারেন, একজন অন্ত্যজ সমাজের সেবাতেই তাই পেতে পারে। আনন্দের অনুপাত রয়েছে সেবার ভিতর দিয়ে আত্মীয়তা উপলব্ধির উপর, স্বার্থ-

বোধকে ছেড়ে যিনি যতটা উঠতে পারবেন তার উপর। প্রকৃতপক্ষে বাইরের বিচারে কর্মের সত্যকার নিরিখ হয় না। পক্ষান্তরে সেবার আত্যন্তিকতার পথেই কর্ম-সাধনা জ্ঞানময় প্রকাশে মনকে পূর্ণ মহিমায় দৃপ্ত করে তোলে। আনাড়ির মত কর্ম না করে, কর্মের এই কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারলেই ভেদ-বিদ্বেষের দৃষ্টি এবং অজ্ঞানতা কেটে যেতে পারে। সমাজ এবং রাষ্ট্র জীবনের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তির এই হোল সত্যকার পথ। এই পথেই অসূয়া বুদ্ধি দূর হয়। পদ, মান ও প্রতিষ্ঠার জন্য ক্যাংলামীর নিবৃত্তি ঘটে। গীতার শিক্ষায় জীবন যদি আমাদের অনুশীলিত না হয়, তবে দেশ সেবার জন্য যত উপদেশ কোনটি সত্যকার কাজে আসবে না। দেশসেবার নামে পদ মানের ঘাঁটি নিজেরা আগলে থেকে আমরা অপরের দিকে তাকিয়ে ছোট কাজের মাহাত্ম্য প্রচারেই তৃপ্ত থাকবো। এ মিথ্যাচার আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনকে অভিভূত করবেই। ধর্ম না মানা সত্ত্বেও আমরা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে রেহাই পাবো না। গীতা রাষ্ট্র ও সমাজের অভ্যুন্নতির এ নীতি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেছে।

শুধু তাই নয়, গীতা মানুষের জীবনকে পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত করার পথ দেখিয়েছে; এমন বিজ্ঞানের নির্দেশ দিয়েছে যা জানলে আমরা অপরাজেয় হতে পারি, বাইরের কোন আঘাতই আমাদের অবসন্ন করতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান এখনও এ পথে পা দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে গীতা এই সত্য উন্মুক্ত করেছে যে, আমাদের একান্ত আশ্রয় ভিতরে রয়েছে, সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, ভাগাভাগির প্রশ্ন নেই এবং অবস্থারও বিপর্যয় নেই। সকল মানুষের জন্য অক্ষয়, অব্যয় সে অমৃতের ভাণ্ডার খোলা আছে। আমরা এই অনপেক্ষ অবস্থা লাভ করে মানব জীবনের মহত্ত্বকে সকলেই উপলব্ধি করতে সমর্থ। মানুষ যে অত বড় হ'তে পারে, মানব জীবনের সম্ভাব্যতা কত বিরাট এবং বিশাল গীতা তা ঘোষণা করেছে। মানুষের সম্বন্ধে এত বড় কথা জগতের অন্য দেশে বা কোন জাতিই শুনতে পায় নি। এত বুক ভরা আশা আর কোন দেশের কোন শাস্ত্রই মানুষের মনে জাগাতে পারে নি। মানুষকে আমরা কত বড় ক'রে দেখতে পারি, তার অনুপাতেই আমাদের ভিতর মনুষ্যত্বের বিকাশ নির্ভর করছে। আমরা কতখানি মানুষ হ'য়েছি, সংস্কৃতিবান্ হ'য়েছি, এই অনুভূতিকে তারই নিক্তি বলা যেতে পারে। বিশাল বিশ্ব-বিপর্যয়ের আবর্তময় অন্ধ পরিপ্রেক্ষায় গীতার আলোকে মানুষ নিজের মর্যাদা ঠিক ক'রে পেয়েছে। প্রকৃতির সব সংহারিণী শক্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে সে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ধর্মকে যারা অবাস্তব বলতে চান, অরোক্ষ বলতে চান তাঁদের বলি, গীতা তাঁরা ধর্ম বলতে যা বোঝেন, তার কথা বলে নি। একান্ত বাস্তব বস্তুই গীতাতে মিলে এবং সংশয়ের প্রশ্ন সেখানে আদৌ নেই। গীতার আদর্শের সঙ্গে মানুষের জীবনের নিত্য সম্পর্ক এবং সত্য সম্পর্ক রয়েছে।

মানুষের জীবনকে জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, তাকে সমন্বিত ক'রে তোলাই গীতার উদ্দেশ্য। গীতা জগৎকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেয় নি। পক্ষান্তরে গীতা এমন একটি সত্যের নির্দেশ করেছে যা ধরতে পারলে, বুঝতে পারলে, পরিবর্তনশীল এই জগতেই মানুষের মনের একান্ত অভীপ্সার সঙ্গে যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিরোধ বলে প্রতীত হয় এবং অনর্থকর বলে মনে হয়, সেই নশ্বরতার মধ্যেই মানুষ, আপনার অকৃতময় সনাতন সত্তায় অপরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। গীতা মানুষকে এমন বিদ্যা শিখিয়েছে, যা একটু আয়ত্ত করতে পারলে জগতের পরিবর্তন-পদ্ধতির মূলে এমন একটা নীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যা মেনে চললে এ পরিবর্তনশীলতা মানুষের পক্ষে আর ক্ষতির বিষয় থাকে না বরং রসোপচিতিরই কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে গীতার শিক্ষা নৈতিমূলক নয়, স্বীকৃতিমূলক। একটু বিচার করলেই বোঝা যাবে বিকারকে আমরা সব অন্তর দিয়ে স্বীকার ক'রে নিতে পারিনে। হাতের কাছে পাই, তাই বিকারকে নিয়েই আমাদের নাড়াচাড়া, কিন্তু প্রাণের গভীর স্তরে একান্ত সার্থকতায় সেগুলো সাড়া দেয় না। চিন্ময় সত্তাতেই আমাদের মন যুক্ত হয়, সঙ্গত হয়। চিন্ময় সত্য বলতে জটিল দার্শনিকতার অবতারণা না ক'রে শুধু এইটুকুই এখানে বলতে চাই যে, সে সত্তার সঙ্গে আমাদের আত্মসম্পর্ক সহজ এবং স্বাভাবিক রয়েছে, বিচারের দ্বারা আমি সে সম্বন্ধকে অন্য রকম করতে পারিনে, আমার মন-বুদ্ধির সঙ্গে তা এমন জড়ানো মিশানো যে, ফাঁক করবার উপায় নেই। গীতা বিশ্বে সৃষ্টির এই বিকারের কারবারের মধ্যে চিদৈশ্বর্যপূর্ণ আমাদের একান্ত অন্তর দেবতারই সন্ধান দিয়েছে এবং তাঁর পরিপূর্ণ সত্তার সঙ্গতিতে সব বিকারের মধ্যে রসোপলব্ধির সন্ধান গীতা ফুটিয়ে তুলেছে। গীতার শিক্ষার প্রভাবে এইভাবে বস্তু বিচারের ক্ষুদ্রত্বের পরিমিতি হ'তে মন মুক্ত হয়; অজ্ঞানতা কেটে যায়। আমাদের নিঃস্বতা দূর হয় এবং সত্ত্ব সর্বত্র উদার স্বাচ্ছন্দ্যে ও অসংমূঢ় আত্মতার নৈতিক প্রাচুর্যে পরিস্ফূর্ত হয়ে পড়ে। এমন বিদ্যাপরায়ণা জননীর বন্দনা, এমন জ্ঞানগুরুর অর্চনা না করলে আমরা মানুষই হ'তে পারবো না। ধর্ম যদি কুসংস্কার হয়, তবে গীতার ধর্ম না মানাকে বলবো আরও কুসংস্কার এবং বর্বরতা। অশ্রদ্ধা, ঔদ্ধত্য এবং স্বেচ্ছাচার আজকাল সংস্কার এবং প্রগতির ভোল ধ'রে চলছে। বলা বাহুল্য, এগুলো আমাদের সর্বনাশের পথেই নিয়ে যায়।

অন্য দিকে কথায় কথায় আমরা যারা ধর্মের দোহাই দেই, তাদেরও বোঝা উচিত যে, ধর্মজীবন হাওয়াই বাজী নয়। কতগুলো আচার অনুষ্ঠানের হাওয়াইয়ের জোরেই আমরা পুণ্যের জীবনের জ্যোৎস্নার রাজ্যে পৌঁছতে পারবো না। প্রকৃত ধর্ম জীবনের সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের সম্বন্ধ রয়েছে। নিরুদ্দিষ্ট পথে ধর্মের সাধনা চলে না জীবনকে বাস্তব রসে পুষ্ট করে তুলতে পারলে তবে সে পথ স্পষ্ট হ'য়ে উঠে। নারদ ঋষি এক জায়গায় বলেছেন, শালের কোঁড় যেমন জোরে মাটি ভেদ ক'রে ফুঁড়ে উঠে, তেমনই ধর্ম জীবনও বাস্তব জীবনে প্রেমের প্রগাঢ় সংবেদনে সব দৈন্য দুর্বলতাকে অতিক্রম করে ঊর্ধে উত্থিত হয়। অন্য কথায় প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্যে যদি ভালবাসা বা প্রেমের সাড়া আমাদের জীবনে এবং আচরণে আমরা না পাই, তবে ধর্মের নামে স্বর্গের দিকে চেয়ে মন্ত্র পড়ার কোন মূল্যই নেই। এ জগতে কিছু নেই, পরের জগতে গিয়ে আমরা শান্তি সুখ ভোগ করবো, ধর্মের নামে যাঁরা এমন ধারণায় চলেন, তাঁদের বিড়ম্বনাই সার হবে। গীতাকে মানতে গেলে অন্ততঃ এই কথাই বলতে হয়। গীতা মানুষকে যে ধর্মের নির্দেশ দিয়েছে, সে ধর্মের আশ্রয় সর্বত্র সব অবস্থাতেই সমান। সে আশ্রয় আগেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকবে, প্রকৃত পক্ষে সে পরম সত্যের আশ্রয় পেলে পূর্বাপরের সব হিসাব থেকে যুক্ত হয়ে আমরা প্রাণবান হ'য়ে উঠতে পারি। হলেও হতে পারে, গীতা সত্য সম্বন্ধে কোন ক্ষেত্রেই এ সন্দেহ রাখে নি। গীতার ধর্ম প্রত্যক্ষতায় পরম বলে প্রবল এবং উজ্জ্বল। এই ঔজ্জ্বল্য তার আছে ব'লেই সে বৈকল্যকে দূর করতে সমর্থ। গীতার ধর্ম এজন্য বুকে জোর দিতে পারে, হৃদয়কে জাগাতে পারে এবং হৃদয় বত্তাই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। হৃদয়ের বল যার নেই, জীবনকে সে সত্য ক'রে কিছুতেই পেতে পারে না, সত্য ক'রে পাওয়া তো দূরের কথা। আমাদের জীবনকে ধারণ করে, তাকে নিত্য প্রতিষ্ঠা দেয়, এই জন্যেই তো ধর্মকে আমরা ধর্ম বলি। জীবনের ভাণ্ডার যদি এখানে শূন্যই থাকলো, তার পরিপূর্ণ লাবণ্যই না দেখলাম, তবে ভবিষ্যতের বরাতে ধর্মের ধোঁকায় বোকা বুঝই মানতে যাবো কেন? বস্তুতঃ এদেশের সাধকেরা ধর্ম বলতে জীবনের সঙ্গে ধরা ছোঁয়া মিলছে না, শুধু ফাঁকার উপর ধারণা নিয়ে চলতে হচ্ছে এমন কোন বস্তু বোঝেন নি। পক্ষান্তরে তাঁরা এমন কথাই বলেছেন যে, যদি সব সময় অনিশ্চিতের আশঙ্কাতেই উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়, পদে পদে মরণের ভয়ই আমাদের অভিভূত করে রাখে, তবে আমাদের ধর্ম সাধনার সব শ্রম নিরর্থক হচ্ছে বুঝতে হবে। অথচ ধর্ম বলতে আমরা যে পথে চলছি তাতে অনেকেই বাস্তব জীবনে প্রাণের সে বল পাই না। জীবনের দৈন্য সবই রয়েছে, অথচ ফাঁকা কথার শূন্যের উপর আমাদের আস্ফালনের অন্ত নেই। পরকালের বড়াই আমরা করি, কিন্তু ইহকালে জীবনে হিংসা, দ্বেষ, —যত রকমের দুর্বলতা সবগুলিই আমাদের থেকে যাচ্ছে। মন আমাদের একটুও বড় হয় না। স্বার্থ-হানির শঙ্কামাত্রে চোখে আমরা অন্ধকার দেখি। গীতার ধর্ম এমন ধর্ম নয়। সে কৌশল একবার আয়ত্ত করতে পারলে মন এমনতর দুর্বল হয় না। বাস্তব জীবনে স্থায়ী সঙ্গতি পেয়ে মানুষ তার পরিপূর্ণতা আস্বাদন করে। বস্তুতঃ ধর্মের নামে অনেক গ্লানি সমাজে দেখা দিয়েছে। ধর্মের স্বরূপ যদি আমরা জানতে চিনতে এবং সত্যই ধর্মের পথে চলতে আমরা চাই, তবে গীতারই শরণ নিতে হবে। ধর্ম একদিন বিশাল অশ্বত্থ দ্রুমের মত ছায়া বিস্তার করে আমাদের সমাজ-জীবনকে স্নিগ্ধ রেখেছিল। সে আশ্রয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা আমরা কেটে এসেছি। জগতের অনেক বড় বড় জাতি ধ্বংস হ'য়ে গেছে। প্রাচীন মিশর গেছে, গ্রীস গেছে, বেবিলন গেছে। কিন্তু আমরা এই ধর্মের আশ্রয়েই বেঁচে ছিলাম। এর মধ্যে বাস্তব কিছু ছিল না, আমাদের ধর্ম আগাগোড়া অবৈজ্ঞানিক, একথা বললে চলবে কেন? কিন্তু আশঙ্কার কারণ ঘটেছে। ধর্মের সে আশ্রয় আমরা হারিয়েছি। ব্যক্তি জীবনের একান্ত নিঃস্বতা আমাদের মনকে আড়ষ্ট করে ফেলছে এবং ধর্মের নামে কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক অন্ধ আচার ও অনুষ্ঠানের পাকচক্রের ভিতর পড়ে আমরা প্রাণের জোর পাচ্ছি না। আমাদের জীবনের হিসাবে শুধু মিথ্যাচারই সার হ'য়ে উঠেছে। সত্য দাঁড়াচ্ছে স্বার্থ, সুখ লালসার জন্য ঘৃণ্য প্রবঞ্চনায়। এ পথ আমাদের ছাড়তে হবে এবং জীবনে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গীতার সেবা এবং প্রেমের আদর্শে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনকে সংহত ও সঞ্জীবিত করতে হবে। আমার মতে গীতার নির্দেশই ধর্ম—বিশ্বমানবের এ ধর্ম সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত এবং যুগোপযোগী এ ধর্ম। গীতা পুরাণো হবার নয়। পুরামাত্রায় প্রগতিবাদী আধুনিক মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তুলবার, স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলবার আর্ট

আছে এই গীতায়। এতে জাতির বিচার নেই, সম্প্রদায়ের বিচার, দেশ, কাল এবং পাত্রের বৈষম্য-বোধের কোন বিড়ম্বনা নেই। অস্বীকার করা চলে না যে, মানুষ এখনও পশুত্বের মধ্যেই অনেকখানি রয়েছে। এ সত্য তো নানাদিক থেকে দিন দিনই উন্মুক্ত হচ্ছে। মহা যুদ্ধের ন্যায় বড় একটা আঘাতের পরও মানুষের জ্ঞান কিছু বেড়েছে কি? তেমন কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, বরং হিংস্রতাই ব্যক্ত হচ্ছে। শান্তির বাণী মুখে যাঁরা আবৃত্তি করছেন, রাক্ষসী বৃত্তি ষোল আনাই তাদের মনে সজাগ রয়েছে। নৈতিক উন্নতি তো কোন দিক থেকে ঘটেই নি। পক্ষান্তরে বিশ্বজীবনে রাষ্ট্র জীবনে এবং ব্যক্তি জীবনে দুর্নীতিই দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থার বড়াই করাতে সার্থকতা কিছুই নাই। বাইরের উপচার আর ঐশ্বর্য যতই বাড়ুক ও ঐশ্বর্য রাক্ষসেরই ঐশ্বর্য। এতে সৌন্দর্য নেই, শালীনতা নেই, এর বিভীষিকায় পৃথিবী কেঁপে উঠছে। এর প্রতি অঙ্গের ভঙ্গীতে কুৎসিত কদর্যতা ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের চিন্তা গতি, মনের গতি যদি না ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তবে শুধু আন্তর্জাতিক বিধি বিধানে কিংবা স্বদেশ প্রেমের আন্তরিকতাহীন অভিসন্ধি-পূর্ণ চাতুরীতে এ সঙ্কট অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। এ তো সোজা কথা। গীতার আদর্শের পরম বলই বাস্তব জীবনে প্রাণের সংগতি দিয়ে মানুষের মনের গতি ঘোরাতে পারে। ফাঁকা কথায় মন মানবে না বুঝবে না, কিন্তু গীতার কথার সঙ্গে দেখা মাথা রয়েছে। গীতার রাজ্যে অন্ধকার নেই, সংশয় নেই। ধার্মিক হওয়া আমাদের দরকার না হ'তে পারে, আধ্যাত্মিক জীবন বলতে অবাস্তব একটা ধাঁধার মধ্যে আমরা পড়তে পারি, কিন্তু গীতায় এ সব সমস্যা নেই। আমরা যা দেখছি, জানছি, চিনছি আমাদের সেই বাস্তব প্রতিবেশের মধ্যেই গীতা আমাদের জীবনের সামঞ্জস্য সাধন করেছে। এ বিদ্যা জানলে স্বর্গ লাভ আমাদের হোক না হোক, আমরা ভদ্রলোক হ'তে পারব, মানুষ হতে পারব এবং শান্তি ও প্রীতির একটা পরিবেশের মধ্যে আমাদের প্রাণের প্রাচুর্য আমরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হব।

দীর্ঘ পরাধীনতার পর ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে। ভারতের এ স্বাধীনতা হঠাৎ আসে নি। এর মূলে প্রাণের মহিমা অনেক কাজ করেছে। পরিমাণ তার কাগজের পাতায় ধরা না পড়তে পারে; কিন্তু সে সাধনার তীব্রতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। গীতার সেবা এবং ত্যাগের আদর্শেই ভারতের পরাধীনতার বন্ধন কেটেছে। যজ্ঞ করতে হয়েছে, এই জন্য বলি দিতে হয়েছে অনেকের প্রাণ। ইংরেজ দয়া করে আমাদের দেশ ছেড়ে যায় নি। আমি তো বলবো গীতার নিষ্কাম সাধনা-প্রণোদিত মানব-সেবার বেদনা এদেশের স্বাধীনতা এনেছে। পরিমাণ আমাদের বিচারের ওজনে তেমন বড় ঠেকছে না এ কথা বুঝি; কিন্তু এ ধর্মের স্বল্প ও মহাভয় থেকে উদ্ধার করে। এ জ্ঞানের আগুন একবার জ্বললে তার এক স্ফুলিঙ্গই যুগ-যুগান্তের আবর্জনাকে দগ্ধ করে ফেলে। আর পরিমাণেই বা কম বলব কি করে? তখন তপস্যা তো কম হয় নাই। গান্ধীজীর জীবন-দানে গীতার মহান আদর্শই তো দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। গীতার আদর্শের উপরই আমাদের সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করে তুলতে হ'বে। যদি এই দিক থেকে আমরা বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারি, তবে জগতে কোন শক্তিই আমাদের আঘাত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে ভারতের সংস্কৃতির উদার আদর্শ মানুষের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবে, বিশ্ব জগৎ পারস্পরিক বিদ্বেষের পশুত্ব থেকে মুক্ত হ'বে, প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করবে। বিশ্ব মানব-সেবার এই পরম ব্রতে আজ স্বাধীন ভারতের আহ্বান এসেছে। সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি— প্রচুর প্রাণ থলে এই ধর্ম সংগ্রামে আমাদিগকে এগিয়ে যেতে হবে। গীতার অভীঃ মন্ত্র আমাদের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করুক। *

*হাওড়া বৈষ্ণব সম্মিলনীতে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিপি।

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

কিন্তু প্রায় এক বছরের ভিতর আর ইসাবেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, সেই সময় আমি অবশ্য সোফী সম্বন্ধে এমন কথা বলতে পারতাম যা তাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলত, তবে এমনই তখনকার পরিস্থিতি যে, আমার সে ইচ্ছা ছিল না। প্রায় ক্রীস্‌মাস পর্যন্ত আমি লন্ডনে ছিলাম, তারপর বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে প্যারীতে আর না নেমে সোজা রিভিয়েরায় গিয়ে উঠলাম। একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম তাই পরের কয়েক মাস বহির্জগৎ থেকে অবসর নিয়েছিলাম। এলিয়টের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতাম। নিশ্চিতভাবে ওর শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তা সত্ত্বেও যেভাবে সে তার সামাজিক জীবন যাপন করত তাতে আমি বেদনানুভব করতাম। আমি এলিয়েটের আমন্ত্রণে তার নিত্যনূতন পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য ত্রিশ মাইল দৌড়ে যেতাম না বলে সে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল। ঘরে কাজ নিয়ে বসে থাকাটাই আমার পক্ষে অহমিকা।

এলিয়ট বলেছিল, "ভায়া হে, এখন হ'ল চমৎকার সীজন, এমন সময় বাড়িতে বন্ধ থেকে নিজেকে বাইরের সব কিছু থেকে বঞ্চিত রাখাটা মহাপাপ। সম্পূর্ণভাবে ফ্যাসনবহির্ভূত রিভেয়ারার এই প্রান্তে যে তুমি কেন পড়ে আছ তা একশ বছর বাঁচলেও আমি বুঝতে পারব না।"

বেচারা এলিয়ট! বোকারাম যে অতদিন বাঁচবে না তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। জুন মাসের ভিতর আমার উপন্যাসের মোটামুটি খসড়া রচনা শেষ হ'ল, ভাবলাম এবার বিশ্রাম নেওয়া যায়, তাই ব্যাগটা বোঝাই করে যে নৌকাটায় আমরা গ্রীষ্মে বে দ্য ফজেসে স্নান করতে যেতাম—সেইটিতে উঠে মার্সাই উপকূলে পাড়ি দিলাম। সামান্য বাতাস ছিল সেই কারণে মোটর ব্যবহার করতে হ'ল। ক্যালের হারবারে একটি রাত কাটানো গেল, আর এক রাত কাটল সেন্ট ম্যাক্সিমে, তৃতীয় রাত্রি কাটল সানারিতে। অতঃপর আমরা তুলোঁ গেলাম। এই বন্দরটির ওপর আমার বরাবরই একটা আকর্ষণ ছিল। ফরাসী নৌ-বাহিনীর জাহাজগুলি একটা রোমাঞ্চকর আবহাওয়া সৃষ্টি করে—আর কোন-দিনই আমি এই শহরের প্রাচীন পথগুলিতে বেড়াতে ক্লান্তি বোধ করতাম না। জাহাজঘাটায় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারতাম, দেখতাম নাবিকরা যুগলে বা তাদের প্রণয়িনীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর বে-সামরিক ব্যক্তিবৃন্দ এমন ভঙ্গীতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় যে, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ উপভোগ করা ছাড়া যেন পৃথিবীতে তাদের আর কোনো কাজ নেই। এইসব জাহাজ ও ফেরী নৌকা এবং যে কল-কোলাহল মুখরিত জনতা এই বিরাট হারবারে চলাচল করে তাদের জন্য—তুলোঁ এমন একটি অঞ্চল যেখানে বিরাট পৃথিবী এক-কেন্দ্রাভিসারী হয়েছে। সমুদ্র ও আকাশের আলোর ঔজ্জ্বল্যে ঈষৎ ঝলসিত চোখে যখন কাফেতে এসে বসা যায় তখন কল্পনাবগাহী মন যেন পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তে চলে যায়। যেন প্রশান্ত সাগরের নারিকেলশ্রেণী বেষ্টিত প্রবালোপকূলে বড় নৌকো ভেড়ানো হয়েছে। রেঙ্গুনের জাহাজঘাটার জেটিতে নেমে রিকসা চড়া হচ্ছে, জাহাজের ওপরতলা থেকে যেন পোর্ট অব প্রিন্সে কোলাহলময় নিগ্রোদের দেখা যাচ্ছে।

সকালে একটু বেলায় আবার নৌকায় উঠে আমরা অপরাহ্নের মাঝামাঝি তীরে এসে পৌঁছলাম, তারপর জাহাজঘাট অতিক্রম করে এসে বিপণি শ্রেণী, যেসব লোকজন চলাফেরা করছে বা যারা কাফের চাতালে বসে আছে তাদের দেখতে লাগলাম। সহসা সোফীকে দেখলাম, ঠিক সে সময়েই সেও আমাকে দেখতে পেল—হেসে সোফী বলে উঠলঃ হ্যালো। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে তার সঙ্গে করমর্দন করলাম। একটি ছোট টেবিলে ও একাই বসেছিল—সামনে একটি শূন্য গ্লাস বসানো।

সে বললঃ "বসুন—একপাত্র টেনে যান।"

আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম—"তুমিই বরং আমার সঙ্গে একপাত্র টানো।"

সোফীর গায়ে ফরাসী নাবিকের সবুজ ও সাদা ডোরাকাটা একটি জারসী, পরনে একটা উজ্জ্বল লাল পায়জামা আর পায়ে একটি স্যানডাল, তার ভিতর থেকে পায়ের আঙুলের রঞ্জিত নখ দেখা যাচ্ছে, ওর মাথায় টুপী নেই, আর ছোট করে ছাঁটা ও কোঁকড়ানো চুল এতই ফিকে সোনালী রঙের যে দেখলে প্রায় রূপালি বলে মনে হয়। রু দ্য লাপ্পে যখন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখনকার মতই ও জবর রকম প্রসাধন করে আছে। টেবিলের ওপর রক্ষিত পাত্রাবলী দেখে অনুমান করলাম ইতিমধ্যেই ওর দু-এক পাত্র টানা শেষ হয়েছে, তবে তখনও মাতাল হয়নি। আমাকে দেখে ও অসন্তুষ্ট হয়েছে মনে হল না।

সে বললঃ "প্যারীর সবায়ের খবর কি?"

"বোধ হয় সবাই ভালো আছে, রিজে সেই দিন লাঞ্চ খাওয়ার পর ওদের কারো সঙ্গে তার আমার দেখা হয়নি।

নাক দিয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে সে হাসতে লাগল;

"আমি শেষ পর্যন্ত আর লারীকে বিয়ে করলাম না।"

"জানি, কিন্তু কেন?"

"আমি আর শেষটায় ঐ যীশুখৃষ্টের মেরী ম্যাগডালেন হয়ে উঠতে পারলাম না—না মশাই ও আমার সইল না।"

"শেষ মুহূর্তে কেন তোমার এই মতি-পরিবর্তন ঘটল?"

আমার দিকে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ও তাকালো। হেলান ঘাড়ের তেমনই উদ্ধত ভঙ্গী, ক্ষীণ বক্ষ ও শীর্ণতার জন্য এবং এই বেশে তাকে দুরন্ত বালকের মত দেখাচ্ছে; কিন্তু একথা স্বীকার্য যে শেষবার যখন দেখেছিলাম তখন এই লাল পোষাকের চেয়ে ওকে অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। মুখ ও ঘাড় বেশ রৌদ্রদগ্ধ মনে হচ্ছে, তবে গাত্রবর্ণের বাদামী রঙের জন্য গালের রুজ ও ভ্রূর কৃষ্ণত্ব মনোরম ঠেকছে তার প্রতিক্রিয়া অশ্লীল দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য আকর্ষণহীন নয়।

সে বললঃ "আপনি আমার কাছে সব শুনতে চান?"

আমি ঘাড় নাড়লাম। ওয়েটার আমার অর্ডার মাফিক বীয়র আর ওর জন্য ব্রান্ডি ও সেলটজার (সোডা জাতীয় পানীয়) নিয়ে এল। সদ্য নিঃশেষিত সিগারেট থেকে আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সোফী বলেঃ তিন মাস এক বিন্দু মদ স্পর্শ করিনি, ধূমপান করিনি। আমার মুখে ক্ষীণ বিস্ময়ের রেখা লক্ষ্য করে সে হেসে বলল, আমি সিগারেটের কথা বলছি না, আফিম,—ভারি বিশ্রী লাগছিল—জানেন যখন একা থাকতাম তখন চীৎকার করে ঘর ফাটিয়ে দিতাম, বলতাম—'এ আমার সহ্য হয় না, এ আমি পারব না।' কিন্তু লারি যখন কাছে থাকত তখন এত খারাপ লাগত না,

যখন ও থাকত না তখন নরক যন্ত্রণা ভোগ করতাম।"

যখন আফিমের কথা তুলচ। তখন আমি ওকে আরও তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করলাম, ওর চোখের তারা দেখে বুঝলাম এখনও ও আফিম সেবন করছে। ওর চোখ দুইটি আশ্চর্যরকম সবুজ হয়ে উঠেছে।

"ইসাবেল আমাকে বিবাহের পোষাক দিচ্ছিল, সেটার এখন কি হল কে জানে? মৃদু-রক্তিম তার বর্ণ। আমরা স্থির করেছিলাম আমি ওকে নিয়ে একত্রে 'মলিনোয়' যাব—ইসাবেল সম্বন্ধে এটুকু বলব যে পোষাকআসাক সম্বন্ধে ও যা জানে না তা জানার মতই নয়। আমি যখন ওদের বাসায় পোঁছলাম তখন ইসাবেলের সেই লোকটি বলল—জোনকে নিয়ে ইসাবেল ডেনটিস্টের কাছে গেছে, বলে গেছে শীঘ্রই ফিরবে। আমি বসবার ঘরে গেলাম। কফির জিনিসপত্র তখনো টেবিলে সাজানো, আমি লোকটিকে এক কাপ পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। শুধু এই কফিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, লোকটি কফি নিয়ে আসছি বলে খালি কাপ ও পট নিয়ে চলে গেল, ট্রেতে একটি বোতল ছিল সেটি রেখে গেল। আমি জিনিসটা দেখলাম, আপনারা সবাই রিজেতে সেই যে পোলিস বস্তুটি নিয়ে আলোচনা করে-ছিলেন, এটি সেই দ্রব্য।"

"জুব্রভকা। হ্যাঁ মনে আছে বটে এলিয়ট ইসাবেলকে বলেছিল কিছু পাঠিয়ে দেবে।"

"আপনারা সবাই ত ওর সুগন্ধ সম্পর্কে পঞ্চ-মুখ হয়ে উঠেছিলেন, আমারও কৌতূহল হল—আমি ছিপিটি খুলে গন্ধ শুঁকলাম। আপনারা ঠিকই বলেছিলেন—ভারী চমৎকার সুগন্ধ। আমি একটি সিগারেট ধরালাম, আর কয়েক মিনিটের ভিতরেই লোকটি কফি নিয়ে এসে হাজির। কফিটাও চমৎকার। ফ্রেঞ্চ কফি সম্পর্কে লোকে অনেক কথা বলে, বলতে পারে, আমার কিন্তু আমেরিকান কফিই ভালো লাগে। শুধু ওই জিনিসটাই আমি এখানে পাই না। কিন্তু ইসাবেলের কফিটাও খারাপ নয়, আমার বড় খারাপ লাগছিল, এক কাপ খাওয়ার পর আমারও শরীরটা অনেক ভালো বোধ হল। টেবিলের ওপর রাখা বোতলটি দেখতে লাগলাম, সে এক ভয়ংকর প্রলোভন। কিন্তু আমি মনকে বল্লাম, "মরুকগে, আমি ওসব কথা ভাবব না—আর একটি সিগারেট ধরালাম। ভেবেছিলাম ইসাবেল এখনই এসে পড়বে—কিন্তু ও এলো না, আমি ভারী নার্ভাস হয়ে পড়লাম, অপেক্ষা করতে আমার ভারী বিশ্রী লাগছিল, ঘরটিতে পড়ার মতও কিছু ছিল না। আমি ঘরে ঘরে ছবিগুলি দেখতে লাগলাম—কিন্তু সেই হতভাগা বোতলটা আমার বারবার নজরে পড়তে লাগল। তারপর ভাবলাম এক গ্লাস ঢেলে শুধু দেখাই যাক। এমন চমৎকার রঙ।

"ক্ষীণ সবুজ রঙ।"*

"ঠিক বলেছেন। ভারী মজার, রঙটি গন্ধের মতই মনোরম। শাদা গোলাপের বুকে যেমন সবুজ দেখা যায়, এ তেমনই সবুজ। আমাকে দেখতে হ'ল ওর স্বাদটাও ওই রকম কিনা। ভাবলাম শুধু একটু স্বাদ পরখ করে দেখলে আমার আর এমন কি ক্ষতি হবে। আমি শুধু এক চুমুক খাবো মনে করেছিলাম, এই সময়ে একটা শব্দ শোনা গেল, মনে হ'ল বোধ হয় ইসাবেল ফিরে এসেছে, ওর কাছে ধরা পড়ার বাসনা আমার ছিল না, তাই পুরো গ্লাসটাই পান করে ফেললাম। —শেষ পর্যন্ত কিন্তু আওয়াজটা ইসাবেলেরই নয়, এতে কিন্তু আমার শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল, অনেকদিন মনের আমার এমন অবস্থা হয়নি। আমি যেন আবার সজীব হয়ে উঠলাম, ইসাবেল যদি তখনই ফিরে আসত তাহ'লে হয়ত এখন আমি লারির সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করতাম। অবস্থাটা কি রকম যে দাঁড়াত কে জানে?"

"আর সে তাহ'লে এলই না?"

"না, এলোনা, আমি ত' রাগে অন্ধ হয়ে উঠলাম, ও মনে কি ভাবে, কি হয়ে উঠেছে সে, যে আমাকে এইভাবে অপেক্ষায় বসিয়ে রেখেছে? তারপর দেখলাম লিকিয়োর গ্লাস (সুরাপাত্র) আবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে—হয়ত অন্যমনস্কভাবে আমিই ঢেলে নিয়েছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি নিজেই যে ঢেলেছি তা জানতে পারিনি, সেটাকে আবার বোতলে ঢেলে ফেলাটা বোকামি তাই আমিই খেয়ে নিলাম। একথা অস্বীকার করা চলে না, জিনিসটি অতি সুস্বাদু, আমি যেন অন্য স্ত্রীলোক; আমার হাসতে ইচ্ছা হ'ল, তিন মাসের ভিতর এমন মেজাজ আর আমার হয়নি। আপনার মনে আছে ওই বুড়ো বিট্‌লেটা বলছিল যে পোল্যাণ্ডে সবাই গ্লাস ভর্তি জুব্রভকা পান করে অথচ তাদের মাথার চুলটিও নড়ে না? আমার মনে হয় যে কোনো পোলিশ বাচ্চার মত আমিও সমান তালে খেয়ে যেতে পারি, সুতরাং আমি আমার কফি-পাত্রটির তলানিটুকু আগুন রাখার জায়গায় ফেলে দিয়ে কাপটি ছাপিয়ে জুব্রভকা ঢেলে দিলাম। মাতৃদুগ্ধ না —আমার ইয়ে—তারপর যে কি হল আমি জানি না, বোতলে যে আর কিছু অবশিষ্ট রইল তা মনে হল না। তারপর ভাবলাম ইসাবেল ফিরে আসার পূর্বেই আমার বেরিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। ও আমাকে আর একটু হলেই ধরে ফেলত, আমি সামনের দরজা দিয়ে বেরোতেই জোনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ির পাশে সরে গেলাম—ওরা নির্বিঘ্নে বাসায় ঢুকে পড়ল, তারপরই আমি বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। আমি ড্রাইভারকে ঝড়ের মত উড়ে যেতে বললাম, সে যখন জানতে চাইল, কোথায় যেতে হবে, আমি তার মুখের ওপর হেসে ফেটে পড়লাম। আমার তখন লাখ টাকার মত অবস্থা।"

যদিও জানতাম ও যায়নি, তবু প্রশ্ন করলাম—"তুমি কি বাসায় ফিরে গেলে?"

"আপনি কি আমাকে নির্বোধ মনে করেন? জানতাম লারী আমাকে খুঁজতে আসবে, যেসব জায়গায় আমার যাতায়াত ছিল তার কোনটিতে যেতে সাহস হল না, তাই 'হাকিমে' গেলাম, জানতাম লারী আমাকে সেখানে কখনও খুঁজে পাবে না। তা ছাড়া আমার আফিম পান করার বাসনা হয়েছিল।"

"হাকিম আবার কি?"

"হাকিম—হাকিম একজন আলজীরিয়ান, আর পয়সা দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে হাকিম যে কোনো সময়েই আফিম জোগাড় করে দিতে পারে। সে আমার বন্ধুসদৃশ। আর যা চাওয়া যাবে সে সবই দিতে পারে, ছোট ছেলে, যুবা, নারী, এমন কি কাফ্রী পর্যন্ত। সর্বদাই ওর হাতে পাঁচ ছ'জন আলজীরিয়ান মজুত থাকত। আমি সেখানে তিনদিন কাটালাম। ঐ ক'দিনে কতগুলি পুরুষের যে সংসর্গে এলাম তা বলতে পারি না।" সোফী হেসে উঠল, তাদের বিভিন্ন রকমের আকৃতি, গড়ন আর রঙ। যে ক'দিন নষ্ট হয়েছিল তা এক রকম ভালোই পুষিয়ে নিলাম। কিন্তু জানেন, আমার ভয় ছিল। প্যারীতে আমার নিরাপদ মনে হচ্ছিল না—ভয় ছিল লারী আমাকে খুঁজে পেতে পারে, তা ছাড়া হাতে বেশী অর্থও ছিল না। জানেন, ঐসব হতভাগাদের সঙ্গে সংসর্গ করতে আবার টাকা দিতে হয়। সুতরাং বেরিয়ে পড়লাম, আমি বাসায় ফিরে গিয়ে দরোয়ানকে একশ' ফ্রাঁ দিয়ে বললাম—যদি কেউ আসে তাকে যেন বলে আমি চলে গেছি। আমি আমার জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে সেই রাত্রেই তুলোঁর আসার ট্রেন ধরলাম। ওখানে না পোঁছানো পর্যন্ত আমার নিজেকে নিরাপদ মনে হচ্ছিল না।"

"আর সেই থেকেই কি তুমি এখানে আছো নাকি?"

"হ্যাঁ, আমি এখানেই থাকব,—যত আফিম চান পাবেন, নাবিকেরা সব পূব দেশ থেকে নিয়ে আসে, আর জিনিসটাও ভালো,—প্যারীতে যা পাওয়া যায় তা নয়, আমি হোটেলে একটা ঘর পেয়ে গেলাম। 'কমার্স এ লা মারিন' জানেন ত? রাতে ওখানে গেলে মনে হয়—বারান্দাগুলো গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে।" লুব্ধের মত বিশ্রী ভাবে সোফী আঘ্রাণ নিয়ে বলে, "মিষ্টি ও তীব্র গন্ধ। বোঝা যাবে ঘরে সবাই নেশা করছে, একটা চমৎকার ঘরোয়া ভাব মনে জাগে—আর যার সঙ্গে আপনি আসুন না কেন, তাতে ওরা কিছু মনে করে না। সকাল পাঁচটায় দরজায় ঘা দিয়ে নাবিকদের জাহাজে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, সুতরাং সে বিষয়েও

চিন্তার কিছু নেই।” তারপর একটুও না থেমে সোফী বলল, “জাহাজঘাটার ধারেই বই-এর দোকানে আপনার একখানা বই দেখলাম; আপনার সংগে দেখা হবে জানলে একখানা কিনে এনে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিতাম।”

বই-এর দোকানের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় জানলায় লক্ষ্য করছিলাম আমার একটি নভেলের সদ্য প্রকাশিত অনুবাদ আর সব বই-এর সংগে সাজানো রয়েছে।

আমি বললাম, “আমার ত মনে হয় না তোমার খুব ভালো লাগবে।”

“কেন লাগবে না জানি না, আমি পড়তে পারি জানেন?”

“আর তুমি লিখতেও পারো তা জানি।”

সে আমার দিকে তাকিয়েই হাসতে শুরু করল। বলল:

“হ্যাঁ, যখন শিশু ছিলাম তখন কবিতা লিখেছি, মনে হয় অতি অদ্ভুত হত, কিন্তু আমি তখন ভাবতাম চমৎকার হয়েছে। আপনাকে বোধ হয় লারী বলেছে।” এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সোফী বলে: “যাই হোক, জীবনটা নরক, তবে যদি তা থেকে কিছু আনন্দ আহরণ করতে হয়, তাহলে সেটুকু না গ্রহণ করাটাই নির্বোধের কাজ।” উদ্ধত ভঙ্গীতে মাথাটি হেলিয়ে সোফী বলে ওঠে “কিন্তু আমি যদি কিনি আপনি তাতে কিছু লিখে দেবেন?

“আমি কাল চলে যাচ্ছি, তুমি যদি সত্যি চাও, আমি এক কপি এনে তোমার হোটেলে রেখে যাব।”

“সেই ভালো হবে।”

“সেই সময়েই জাহাজঘাটায় একটা নৌ-বাহিনীর লঞ্চ এল। একদল নাবিক তার ভিতর থেকে নেমে পড়ল—সোফী এক দৃষ্টিতে তাদের দেখে নিল।

তারপর কার দিকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, “ঐ আমার বন্ধু! আপনি ওকে একপাত্র খাইয়ে চলে যাবেন, লোকটি কর্সিকান, আর ভীষণ ঈর্ষাকাতর।”

একজন তরুণ আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমাকে দেখে একটু ইতস্ততঃ করল, কিন্তু সোফীর ইঙ্গিতে আমাদের টেবলের ধারে এল। লম্বা, পরিষ্কার ভাবে কামানো সুন্দর চেহারা। চমৎকার কালো চোখ, খগনাসা, আর মাথায় দাঁড়কাকের মত কালো চুল তরঙ্গায়িত। তাকে কুড়ি বছরের বেশী মনে হয় না। সোফী আমাকে তার বাল্য-কালের মার্কিনী বন্ধু বলে পরিচয় দিল।

সে আমাকে বলল, “মূক বিল সুন্দর।”

“তুমি একটু কড়া ধাতের লোক পছন্দ কর, না?”

“যত কড়া ততই ভালো।”

“একদিন দেখবে তোমার গলাটা কাটা গেছে।”

সে হেসে বলে “আশ্চর্য হবো না, এই খারাপ অবস্থার হাত থেকে ভালো ভাবেই নিষ্কৃতি পাব।”

নাবিকটা তীক্ষ্ম গলায় বললী “ফরাসীতেই কথা বলা উচিত, কেমন নয়?”

সোফী তার দিকে হেসে তাকাল, সে হাসিতে বিদ্রূপ মেশানো ছিল। সে অতি দ্রুত ফরাসী চলতি ভাষায় কথা বলতে পারত, তাতে কিঞ্চিৎ মার্কিনী টান থাকত,—এর দরুণ সোফীর মুখনিসৃত অশ্লীল চলতি ভাষায় একটা রসিকতার সুর থাকত, সেই কারণে না হেসে পারা যেত না।

সে বলল “আমি ওকে বলছিলাম তুমি সুদর্শন ও সুশ্রী—কিন্তু তোমার শালীনতা বজায় রাখার জন্য ইংরাজীতে বলছিলাম।” তারপর, আমাকে উদ্দেশ করে সোফী বলল “তা ছাড়া ও শক্তিমান, ওর পেশীগুলি বক্সারের মত দৃঢ়। অনুভব করে দেখুন।”

নাবিকের মুখের গাম্ভীর্য এই চাটু-কারিতার ফলে কেটে গেল, সে খুশীর হাসি হেসে তার হাত বাড়িয়ে বাইসেপ দেখাতে লাগল।

বলল “টিপে দেখুন, দেখুন ভালো করে।”

আমি তাই করে উপযুক্ত প্রশংসা বাক্য প্রকাশ করলাম। কয়েক মিনিট আলাপ করা গেল। তারপর মদের দাম দিয়ে উঠে পড়লাম। বললাম:

“আমাকে এখন যেতে হবে।”

“আপনাকে দেখে ভালোই হল, বই-এর কথা কিন্তু ভুলবেন না।”

“না, ভুলবো না।”

আমি ওদের উভয়ের করমর্দন করে চলে এলাম। পথে আমি একটা বই-এর দোকানে দাঁড়ালাম—একখানি নভেল কিনে নিয়ে সোফীর নাম ও আমার নাম লিখলাম। তারপর, সহসা মনে এল বলে এবং আর কিছু মনে এল না বলেও, সকল কাব্যসংগ্রহে প্রাপ্তব্য রনসার্ডের সেই সুন্দর ছোট্ট কবিতার প্রথম লাইনটি বইটিতে লিখে দিলাম, প্রিয়তমে আমাকে দেখতে দাও...

Mignonne, allous Voir Si la rose.

বইখানি হোটেলে রেখে দিলাম। জাহাজ-ঘাটার ওপর হোটেল, আমি সেখানে অনেকবার ছিলাম। কারণ এখানে রাতে ছুটি পাওয়া নাবিকদের যখন ভোর বেলা তূর্য ধ্বনিতে আহ্বান করে তখন ঘুম ভেঙে যায়, কুয়াশার ভিতর দিয়ে হারবারের স্থির জলের ওপর যখন সূর্যোদয় হয়, তখন জাহাজগুলির ওপর একটা মনোরম মাধুর্য বিস্তার করে। পরদিন আমরা কাসিসের দিকে রওনা হলাম, ওখানে যেতে কিছু মদ কিনে নিয়ে তারপর মার্সাই গিয়ে নৌকাটির জন্য অর্ডার দেওয়া একটা নূতন পাল নিয়ে আসতে হবে।

এক সপ্তাহ পরে বাড়ি ফিরলাম।

(ক্রমশঃ)

ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কলিকাতায় আসিয়া বিদেশ হইতে নীত বুদ্ধশিষ্যদ্বয়ের অস্থি সংরক্ষণ জন্য মহাবোধি সোসাইটিকে দিয়াছেন ও গান্ধী-ঘাটের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি জাতির সম্ভ্রমের জন্য জাঁকজমকের পক্ষপাতী; উভয় ব্যাপারই সেইজন্য জাঁকজমক সহকারে সম্পন্ন হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধের শিষ্যদ্বয়ের অস্থিগ্রহণোৎসব যে কালোপযোগী হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। একদিন বৌদ্ধমত হিন্দুমতের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহার পরে শংকরাচার্য সে মতের বিরোধিতা করিয়া এদেশে আবার হিন্দু মত প্রতিষ্ঠিত করেন—বৌদ্ধ মত তাহার জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া বিদেশে তাহার পুণ্য প্রভাব রক্ষা করিতেছিল। আজ যখন ভারতরাষ্ট্রে রাজোচিত সম্মানে বুদ্ধশিষ্যদ্বয়ের অস্থি নীত হইয়াছে, তখন যাঁহারা সে উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু ব্রাহ্মণ। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ—পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু উহা পোত হইতে আনিয়াছিলেন—পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তা ডক্টর চক্রবর্তী সঙ্গে গঙ্গোদক লইয়া আসেন। তাহার পরে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উহা মহাবোধি সোসাইটির পক্ষের বাঙালী ব্রাহ্মণ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অর্পণ করেন। ইহা হিন্দু মতের উদারতার ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রের উপযোগী কাজই হইয়াছে।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যখন কংগ্রেসের সভাপতিকেও নূতন রাষ্ট্রে দুর্নীতির ব্যাপ্তিহেতু দুঃখপ্রকাশ করিতে দেখা যাইতেছে, তখন রাষ্ট্রের পরিচালকগণ বুদ্ধদেবের ত্যাগের কথা স্মরণ ও কীর্তন করিয়াছেন। গান্ধীজীর ত্যাগের প্রশংসা কীর্তিত হয় বটে, কিন্তু আদর্শ অনুসৃত হইতেছে বলিয়া মনে করা যায় না। আমরা আশা করি, বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতরাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত করিতে সাহায্য করিবে। তাহা হইলেই এই উৎসব সার্থক হইবে।

বারাকপুরে গান্ধীজীর স্মারকস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। স্মরণীয়দিগের স্মৃতিরক্ষার বিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়। কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণ প্রসঙ্গে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন সে সকলের আলোচনা করিয়া স্মৃতিসৌধ নির্মাণই প্রকৃষ্ট উপায়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারাকপুরে এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন। এখন এই স্তম্ভ ও তাহাতে রক্ষিত দ্রব্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কলিকাতায় আসিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন—যদিও তিনি কয়মাস পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন, তথাপি কলিকাতার ও পশ্চিমবঙ্গের কথা অনেক সময় তিনি মনে করিয়াছেন। কারণ—কলিকাতা ভারতরাষ্ট্রের সর্ব প্রধান নগর এবং তাহাই থাকিবে আর পশ্চিমবঙ্গ আজ সীমান্ত প্রদেশ সুতরাং তাহাকে তাহার অবস্থানের উপযুক্ত হইতে হইবে। ভারতরাষ্ট্রের এই সীমান্ত প্রদেশের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে তিনি কেবল বলিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের সমস্যা। পণ্ডিত জওহরলাল পূর্ববঙ্গ হইতে আগন্তুকদিগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলেনঃ—

"সৌভাগ্যের বিষয় গত এক বা দুই মাসে অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। এই বাস্তুত্যাগ সমস্যা একাধিক কারণে উদ্ভূত।"

এই উন্নতি সম্বন্ধে যে মতভেদের অবকাশ নাই, তাহা বলা যায় না। যেদিন কলিকাতায় তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন, সেইদিনই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে'র ঢাকা কার্যালয় হইতে সংবাদ আসিয়াছে, নানাস্থান হইতে হিন্দুদিগের জমি বলপূর্বক মুসলমান কর্তৃক অধিকারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জের উপকণ্ঠে বন্দর নামক স্থানে একটি পুরাতন মন্দির আছে। উহা সরকার কর্তৃক "সংরক্ষিত" বলিয়া অভিহিত। ঐ মন্দিরের নিকটে প্রায় ২ শত বিঘা জমি হিন্দুরা স্মরণাতীত কাল হইতে অধিকার করিয়া তাহাতে গৃহ, দোকান-ঘর প্রভৃতিও নির্মাণ করিয়াছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই জমি লইয়া যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে আদালত রায় দিয়াছিলেন, উহাতে হিন্দুদিগের কায়েমী অধিকারস্বত্ব আছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে কিন্তু মুসলমানরা ঐ জমি অধিকার করিয়া হিন্দুদিগকে বেদখল করিবার চেষ্টা করে। হিন্দুরা নারায়ণগঞ্জে মহকুমা কর্মচারীর নিকট আবেদন করিয়া কোন ফল পান নাই। শেষে তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন আদালতে অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে থানার দারোগার উপর তদন্তের ভার পড়ে। দীর্ঘকাল দারোগা কোন রিপোর্ট না দেওয়ায় হিন্দুরা পুনরায় আবেদন করেন এবং বিষয়টি তদন্তের ভার নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির মুসলমান ভাইস-চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে মুসলমানরা বলপূর্বক হিন্দুদিগের জমি অধিকার করে এবং একটি বিস্কুটের কারখানা লুঠ করে। হিন্দুদিগের অভিযোগে মহকুমা হাকিম যে নির্দেশ দেন মুসলমানরা অনায়াসে তাহা অমান্য করিতেছে। হিন্দুরা প্রতিকার পাইতেছেন না।

পশ্চিমবঙ্গে চাষের ও বাসের জমি চাষবাসের অনুপযোগী করিবার একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। গঙ্গার জলে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ পলি বাহিত হয়। সে সকল অতি সহজে ইষ্টক নির্মাণের জন্য উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পূর্বে গঙ্গার পশ্চিমকূলে কোতরং প্রভৃতি স্থানে গঙ্গার কূলে সঞ্চিত পলি ইষ্টক নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইত। তাহাতে তিন দিকে লাভ হইত—

(১) পলি নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া নদীর খাত ভরাট করিত না;

(২) ইষ্টক নির্মাণের জন্য চাষের ও বাসের জমির অপব্যয় হইত না;

(৩) নৌকায় ইষ্টক চালান দেওয়ায় বহনের ব্যয় কমিত।

ইটালীতে কৃষকগণ বর্ষার পরে ছোট ছোট খাল কাটিয়া নদীর পলি বাহক জলধারা ক্ষেত্রে লয়—পলি সাররূপে ব্যবহৃত হয়। যদি কলিকাতা হইতে কিছুদূর পর্যন্ত গঙ্গার কূলে জমিতে গর্ত খনন করিয়া বর্ষার সময় নদীর জল সঞ্চয় করা হয়, তবে অল্পদিনের মধ্যেই সেই সকল গর্ত পলিতে ভরাট হয় ও পলি ইষ্টক নিমাণের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন—"আদি গঙ্গা" প্রভৃতি যে সকল হাজামজা নদীর খাত খনন করিবার পরিকল্পনা আছে, সেই সকলের তীরস্থ জমি যদি ইষ্টক প্রস্তুত করিবার কার্যে ব্যবহৃত হয়, তবে পরে খননের কাজে সাহায্য হয়। কিন্তু তাহা হইতেছে না। কলিকাতা হইতে নির্দিষ্ট দূরবর্তী স্থানে আর ইটখোলা করিতে দেওয়া হইবে না, এইরূপ নির্দেশ কয় বৎসর পূর্বে দান করা হইয়াছিল। কিন্তু এখনও সে নির্দেশ অবাধে অবজ্ঞাত হইতেছে। ফলে কলিকাতার উপকণ্ঠে চাষের জমির পরিমাণ কমিতেছে—কলিকাতায় শাকসব্জীর মূল্যবৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

এই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন, গ্রামের বা ক্ষেত্রের মধ্যে ইটখোলা হইলে গাছের অনিষ্ট হয়। তাহা কোনরূপে বাঞ্ছনীয় নহে।

গত বৎসরে কৃষিকার্যের, মৎস্যের চাষের ও পানীয় জলের জন্য কতকগুলি পুষ্করিণী সমগ্র প্রদেশে সংস্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা জানিতে লোকের

ঔৎসুক্য সঙ্গত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বে-সামরিক সরবরাহ সচিব বলিয়াছেন—শ্রমিকের অভাবে বরাদ্দ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার এই উক্তি যদি সত্য হয়, তবে কি মনে করা যায় না—উপযুক্ত আহার্যের অভাবে লোকের শ্রমসাধ্য কাজ করিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে? নহিলে—এই বেকার সমস্যার সময়েও শ্রমিকের অভাব হয় কেন? অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, কৃষি বিভাগ বা সেচ বিভাগ ঐ উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে বলিতে পারেন।

বিহার সরকারের বাঙালী বিদ্বেষ বিহারে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। পরলোকগত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত—পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত—'মুক্তি' পত্রে লিখিত হইয়াছে—

"মানভূম জিলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুদিন হইতেই বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে। অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত মানভূম জিলার জনসাধারণ অপেক্ষা করিতেছিল এই আশায় যে, স্বাধীন দেশের কর্ণধারগণ এ বিষয়ে একটা সুব্যবস্থা করিবেন। পণ্ডিতদের স্কুল করা, ছেলেদের স্কুলে পড়া একটা দুর্ঘট, অপমানজনক ও নিতান্ত গ্লানির ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। একটা স্বাধীন দেশে এ অবস্থার কল্পনা করা যায় না যে, জনসাধারণ নিশ্চিন্ত মনে তাহাদের শিশুসন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না, শিক্ষকগণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছাত্রদের শিক্ষাদান করিতে পারিবেন না।........সম্প্রতি ইহা চরমে উঠিয়াছে, পুরুলিয়া জিলা স্কুলের ব্যাপার লইয়া।"

এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৬ শত হইবে। ইহাদিগের শতকরা ৭৫ জন বঙ্গভাষাভাষী; অর্থাৎ বাঙলা তাহাদিগের মাতৃভাষা। স্কুলের চতুর্থ হইতে একাদশ পর্যন্ত ৮টি শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম প্রাথমিক এবং ষষ্ঠ হইতে একাদশ মাধ্যমিক শ্রেণী। প্রত্যেক শ্রেণীতেই ২টি সেক্‌শন—বাঙলা ও হিন্দী। বাঙলা সেক্‌শন বঙ্গভাষাভাষীদিগের ও হিন্দী হিন্দী-ভাষাভাষীদিগের জন্য। বাঙলা সেক্‌শনগুলিতে ছাত্র অধিক—এমন কি হিন্দী সেক্‌শনগুলিতে ছাত্রের অভাব ঘটে। সহসা নির্দেশ আসিয়াছে, সরকারী স্কুলে বাঙলা সেক্‌শন থাকিবে না; ছাত্রের মাতৃভাষা সাহিত্য হিসাবে গৃহীত হইবে এবং তাহাতে ইতিহাস, ভুগোল, অঙ্ক প্রভৃতি হিন্দীকে বাহন করিয়া শিখিতে হইবে। বর্তমান ইংরেজী বৎসর হইতে এই নির্দেশ পালিত হইতেছে।

সকলেই জানেন, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন কংগ্রেসের সভাপতি তখন তিনি হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনকে বিহারে অধিক উৎসাহ সহকারে হিন্দী চালিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—তাহা হইলেই বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল হিন্দীভাষাভাষী হইবে। বিহার সরকার কিছুদিন হইতেই বিহারে বাঙালীদিগকে অপমানকর অবস্থায় স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের সুস্পষ্ট প্রতি-শ্রুতি—ক্ষমতা পাইয়া এখন—পদদলিত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধানুভব করেন না।

ছাত্রের মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাকে শিক্ষা-দান করা হইবে, কংগ্রেসের এই নীতিও বিহারে প্রহসনে পরিণত হইল। আবেদন নিবেদনের দ্বারা এই অবস্থার যে প্রতীকার হইবে, এমন মনে করা যায় না। সুতরাং বাঙালীকে ইহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। বিহার সরকার যদি বিহারে হিন্দী ব্যতীত অন্য কোন ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেন, তবে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিলে তাহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে? আর এক কথা—বাঙলাও যখন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে থাকিতে পারে; এদেশে যখন বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের—"জুনিয়র" ও "সিনিয়ার" পরীক্ষা গৃহীত হইতে পারে, তখন পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে কি কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইতে পারে না। বিহার সরকার যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অগ্রাহ্য করেন, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অগ্রাহ্য করিতে পারেন। অতি অল্পদিন হইল, পূর্ব পাঞ্জাবের (অর্থাৎ হিন্দুস্থান পাঞ্জাবের) হাইকোর্টের জন্য বাঙালী জজ—কলিকাতা হইতে লইয়া যাইতে হইয়াছে। শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ এই সর্তে সে পদ গ্রহণ করিয়াছেন যে, সে পদ গ্রহণ তাঁহার পক্ষে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারকের ও ফেডারেল কোর্টের জজের পদ প্রাপ্তির অন্তরায় হইবে না। সরকারী চাকরীই শিক্ষালাভের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কাজেই টাটানগরে, পুরুলিয়ায়, ধানবাদে—যদি বাঙলার বাহনে শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে সকল স্কুল হইতে ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারে, তাহা হইলে আর বিহারবাসী বাঙালীদিগের পুত্রকন্যা-দিগকে বাধ্য হইয়া হিন্দীতে শিক্ষালাভ করিতে হয় না। একথা যখন অবশ্য স্বীকার্য যে, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভই বাঞ্ছনীয়, তখন বিহারে বা উড়িষ্যায় সরকার যদি বাঙালীদিগকে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগে বঞ্চিত করেন, তবে বাঙালীদিগকে সেই সকল স্থানে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাহা সংশ্লিষ্ট করা ব্যতীত উপায় কি?

কলিকাতা কর্পোরেশন আগামী বর্ষের মার্চ মাস পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসনশীল থাকিবে না—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়াদিগের দ্বারা পরিচালিত হইবে। ইহার আবর্জনা দূর করিতে নাকি আরও বর্ষাধিককাল প্রয়োজন। কলিকাতা কর্পোরেশনের পুঞ্জীভূত আবর্জনা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। বর্তমান প্রধান সচিব দীর্ঘকাল কর্পোরেশনে ছিলেন—তিনি একবার মেয়রও হইয়াছিলেন। তিনি তখন যে সংশোধন সম্ভব করিতে পারেন নাই, এখন তাহাই সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। চেষ্টা সফল হউক। কিন্তু যে কয়মাস কর্পোরেশন সরকারের অধীনে পরিচালিত হইতেছে, সে কয় মাসে কি কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে?

বুলগেরিয়ার বামন-শিল্পী

বুলগেরিয়ার চিত্রশিল্পীদের মধ্যে আধুনিক শিল্পকলায় যিনি সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পী তাঁর নাম জর্জ প্যাভ্‌লভ। ফরাসীয় ভাবছায়া (Impressionist) পদ্ধতিতে তিনি ছবি আঁকেন। কিন্তু আসলে একটি বামন—মাত্র

বুলগেরিয়ার লম্বা মন্ত্রী আর বামন শিল্পী!

তিন ফুট লম্বা। সম্প্রতি বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী জর্জ দিমিত্রভ শিল্পী প্যাভ্‌লভের স্টুডিও দেখতে গিয়ে অবাক হয়েছেন—কারণ বামন হয়েও প্যাভ্‌লভ্‌ অদ্ভুত সব ছবি এ'কেছেন।

অবিচ্ছিন্ন দাম্পত্য জীবন!

সম্প্রতি এক খবরে জানা গেছে ইংলণ্ডের ব্রাট্‌লবী অঞ্চলের লিঙ্কনশায়ার গ্রামের এক বৃদ্ধ দম্পতীর অদ্ভুতভাবে মৃত্যু ঘটেছে। বৃদ্ধ চার্লস সাইমনের বয়স হয়েছিল ছিয়াশী বছর, এবং তাঁর স্ত্রী হ্যারিয়েট সাইমনের বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। পঁয়ষট্টি বছর আগে এ'দের দুজনের বিয়ে হয়। আর আগে এ'রা দুজনেই ছোটবেলা থেকে প্রতিবেশীরূপে বড় হয়েছিলেন, খেলা করেছিলেন, এবং বিবাহিত জীবনের এই পঁয়ষট্টিটি বছর তাঁরা কখনও কেউ কাউকে ছেড়ে থাকেন নি। কিন্তু সম্প্রতি মিস্টার ও মিসেস সাইমন খুব অথর্ব ও অসুস্থ হয়ে পড়ায়, এবং তাঁদের দেখাশোনা করবার লোক না থাকায়, তাঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার জন্য সরকার থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে মিসেস সাইমনকে গেনস্‌বরোর এক সরকারী মহিলা আশ্রয়ভবনে নিয়ে যান এবং বৃদ্ধ সাইমনকে ২০ মাইল দূরে ঐ রকম একটি পুরুষদের আশ্রয়ভবনে নিয়ে রাখেন। তাঁদের

কিন্তু এই ছাড়াছাড়ির মাত্র দু' সপ্তাহ পরেই—একই দিনে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার আড়াআড়িতে এই বৃদ্ধ দম্পতি মারা গেছেন। এ খবরে তাঁর প্রতিবেশীরা সবাই অত্যন্ত মুষড়ে পড়েন, ঐ গ্রামের একজন বলেন—যে যখনই ও'দের দুজনকে সরকার থেকে এভাবে আলাদা আলাদা রাখার ব্যবস্থা করেন তখনই আমরা ভেবেছিলাম—এমন কিছু অঘটন ঘটবে।" যাই হোক্‌ শেষ পর্যন্ত এই দম্পতীর মৃতদেহ দুটি এনে—তাঁদের গ্রামেই একই যায়গায় কবর দেওয়া হয়েছে। সত্যিই একেই বলা যায় "অবিচ্ছিন্ন দাম্পত্য জীবন।" আধুনিককালের দম্পতীরা এ'দের সুখের জীবনটা কল্পনার চোখে ভেবে দেখবেন কি?

পুলিশের নামে উল্টো নালিশ!

সম্প্রতি আমেরিকায়—ইলিনয়েসের স্টার্লিং অঞ্চলের আলবার্ট ডি মার্টিন নামে এক ভদ্রলোককে মাতাল অবস্থায় গাড়ী চালানো ও গাড়ীতে ধাক্কা লাগানোর অপরাধে দুজন পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কোর্টে এই মামলার বিচার হওয়ার পরেই ঐ ভদ্রলোক ঐ দুজন পুলিশ প্রহরীর নামে দশ হাজার ডলারের খেসারৎ দাবী করে—এই অজুহাতে এক নালিশ ঠুকে দিয়েছেন যে, ঐ পুলিশ দুজন আর পাঁচ মিনিট আগে তাকে মাতাল অবস্থায় গাড়ী চালানোর জন্য গ্রেপ্তার করলে হয়তো কখনই তার গাড়ী এভাবে ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যেত না, অতএব এই যে নিগ্রহ ও অপমান—এর জন্য দায়ী ঐ পুলিশ দুজনই এবং তারা এর জন্য দশ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।"

ডাকযোগে জীবজন্তু পাঠানো!

ডাক মারফৎ চিঠি-পত্তর, বই, প্যাকেট, পার্শ্বেল এই সবই পাঠানো যায়, এই কথাই জানি আমরা—এই দেশে। কিন্তু আমেরিকাবাসী ডাকযোগে কি কি পাঠাতে পারেন, তা সম্প্রতি জানা গেছে—ব্রুকলিনের পোস্ট-মাস্টার এডোয়ার্ড জে কুইগ্‌লির বিজ্ঞপ্তিটি থেকে। বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে জানা গেছে যে, সেখানে ডাকযোগে কুকুর, বেড়াল, সাপ, বাঁদর, খরগোস ইত্যাদি পাঠানো সব সময়ে সম্ভব নাও হতে পারে। তবে ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষ ডাকযোগে পাঠাবার জন্য গ্রহণ করবেন—কুমীরের বাচ্ছা (কুড়ি ইঞ্চি লম্বা পর্যন্ত), মৌমাছি, কচ্ছপ, ব্যাঙ, শিংওলা কোলাব্যাঙ এবং কতকগুলি বিশেষ জাতের পোকামাকড় (যদি তারা উপযুক্তভাবে শেওলা বা ঘাসপাতা দিয়ে মোড়া থাকে)—এমন না হ'লে ডাক-বিভাগের নামডাক বাড়বে কি করে! —ভবঘুরে

মানুষ ও মানসিক শক্তি

ডক্টর অভীশ্বর সেন এম এসসি; পি এইচ ডি

অতীতে বহু জীবজন্তুকে পৃথিবীতে একদিন দেখা গিয়াছিল, তাহাদের অনেকে আজ নাই। জীবিত বা মৃত, পৃথিবীর অসংখ্য জীবনের মধ্যে কেবলমাত্র মানুষের ভিতরই মানসিক শক্তির পরিচয় পাই। ইহা সত্যই অদ্ভুত। কোন প্রাণী হইতে একটি প্রস্তরখণ্ডকে চতুষ্কোন করিয়া কাটিবার, বা দশ পর্যন্ত গণনা করিবার বা কোন সংখ্যার অর্থ বুঝিবার প্রমাণ পাইতে গিয়া পর্যবেক্ষক মানুষকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে।

সৃষ্টির বিশৃংখলতার মধ্যে বহু জীবজন্তুর কথা আমরা জানি, যাহারা বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে। বোলতা মাটির ভিতর গর্ত খনন করে, কোন পতঙ্গ ধরিয়া তাহার মধ্যে তাহাকে রাখিয়া দেয়। পতঙ্গ শরীরের এমন স্থানে সে দংশন করে, যে সে একেবারে মরিয়া যায় না, কেবলমাত্র ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। তাহা যেন সুরক্ষিত মাংসখণ্ড। বোলতা ঠিক ঐ স্থানেই তাহার অণ্ড প্রসব করে। তাহারা হয়ত জানে না, ডিম হইতে শিশু বোলতারা বাহির হইয়া, খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইবে না—কীট পতঙ্গ শীকার না করিয়াও তাহারা অর্ধমৃত পতঙ্গটির অংশ খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। জীবন্ত ও জাগ্রত অবস্থায়, পতঙ্গ শিশু বোলতাদের নিশ্চয় মারিয়া ফেলিত। বোলতাদের এই কাজ নিয়মিত; প্রতিবার ঠিক একই সময়ে একই কাজ তাহারা করিয়া যায়। তাহা না হইলে পৃথিবীতে কোন বোলতা থাকিত না। কেন তাহারা এই কার্যের পুনরাবৃত্তি বার বার নীরবে করিয়া যায়, এ রহস্যে বিজ্ঞান কোন উত্তর দিতে পারে না। অথচ প্রতিবার আকস্মিক ঘটনায় এই সকল কার্য ঘটে, তাহাও মনে করা যায় না। বোলতা মাটির ভিতরকার গর্তটি, মাটি দিয়া ঢাকিয়া আনন্দে চলিয়া যায়, শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সে কিংবা তাহার পূর্বতন বোলতারা কেন এরূপ করিতেছে, কোন ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন সে অনুভব করে না। শিশু বোলতারা কখন অণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসে, তাহাদের পরিণতি কি হয়, তাহাও সে কোনদিন জানিতে চেষ্টা করে না। এমন কি সে জানে না যে সে তাহার বংশকে বাঁচাইয়া রাখিবার জনাই বাঁচিয়াছে এবং তাহার জনাই তাহাকে এই সকল কার্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে।

কেমন করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় মৌমাছি ও পিপীলিকা তাহা জানে। তাহাদের নিজ নিজ দলের মধ্যে অদ্ভুত শাসন শৃংখলাও আছে। তাহাদের মধ্যে সৈনিক, কর্মী, অলস পুরুষ ও দাসও আছে। বহুকাল পূর্বে বাল্টিক উপসাগরের উপকূলে অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যের কোন দ্বীপের গভীর অরণ্যে কাষ্ঠখণ্ডে বন্দী পিপীলিকা ও আজিকার পিপীলিকায় কোন পার্থক্য নাই। প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত সুপরিচিত হইবার পর, পিপীলিকাদের ক্রম বিবর্তন বোধহয় নিরস্ত হইয়াছিল। পিপীলিকার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক কি কোন বৃহত্তর লক্ষ্যের জন্য তৈরী হয় নাই!' সামাজিক জীব হিসাবে, পিপীলিকা নিশ্চয় প্রচুর শিক্ষালাভ করিয়াছে। তাহারা এই সুন্দর সামাজিক শিক্ষালাভ করিয়াছে "সকলের চেয়ে বেশী লোকের জন্য সকলের চেয়ে বেশী ভাল" অদ্ভুতভাবে। তাহাদের কার্যের তুলনা করিতে গেলে মানুষকে আসিয়া যাইতে হয়, গত শতাব্দীর ইস্ট ইণ্ডিজ-এর লোকদের অদ্ভুত আত্মত্যাগে।

কোন কোন জাতির পিপীলিকার মধ্যে কর্মী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ বীজ সংগ্রহ করে, শীতের সময় অন্য পিপীলিকাদের খাদ্যের সংস্থান করিবার জন্য। পিপীলিকাদের এই বীজ চূর্ণ করিবার বিশেষ গৃহ আছে, সেখানে উপনিবেশের খাদ্য সঞ্চয় করিবার জন্য যে সকল পিপীলিকা থাকে, তাহাদের চোয়ালের সঙ্গে কেবল ভীষণ দর্শন করাতের তুলনা করা চলে। তাহাদের কার্য শুধু বীজ চূর্ণ করা। যখন শীতকাল আসে, এবং সকল বীজই চূর্ণ হইয়া যায়, "সকলকার চেয়ে বেশী লোকদের সকলকার চেয়ে বেশী ভাল"র জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করার প্রয়োজন আসিয়া পড়ে, তখন এই শস্য চূর্ণকারী পিপীলিকা কর্মীদল সৈনিক পিপীলিকাদের হস্তে নীরবে জীবন বিসর্জন দেয়। ভবিষ্যৎ পিপীলিকা বংশধরদের মধ্যে শস্যচূর্ণকারিদের কখনও অভাব ঘটে না। হয়ত শস্যচূর্ণকারীর দল, মৃত্যুর সময়, নিজেদের এই বলিয়া প্রবোধ দেয় যে, তাহারা তাহাদের কার্যের উপযুক্ত পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হয় নাই কারণ বীজ চূর্ণ করিবার সময়, খাদ্যের আস্বাদ, তাহারাই প্রথমে গ্রহণ করিয়াছে।

কোন কোন পিপীলিকা, তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতই হউক, বা বিবেচনা-শক্তির ফলেই হউক, ছাতা জন্মাইয়া ছাতার উদ্যান তৈরী করে খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য। তাহারা লোমপরিপূর্ণ শিশু কীট ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ধরিয়াও পালন করে। মানুষের পক্ষে গৃহপালিত পশুদের মত এই কীটপতঙ্গ বন্দী হইয়া পিপীলিকাদেরই কার্য করে। পিপীলিকারা তাহাদের গৃহপালিতদের গাত্র নিঃসৃত একপ্রকার রস মধুর ন্যায় ব্যবহার করে। তাহারা শত্রু পিপীলিকাদের বন্দী করিয়া রাখে। তাহাদের মধ্যে দাসপ্রথারও প্রচলন আছে। কোন কোন পিপীলিকাজাতি, তাহাদের গৃহ নির্মাণ করিবার সময়, ঠিক গর্তের প্রয়োজনমত বৃক্ষপত্র কাটিয়া ফেলে, কর্মী পিপীলিকারা এই পত্রগুলি নিজেদের শরীর দিয়া ধরিয়া রাখে। পত্রগুলির প্রান্তে প্রান্তে শিশু পিপীলিকা সূত্রের মত কোন কিছু দিয়া বিভিন্ন পত্রগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করে। শিশু পিপীলিকার জন্য হয়ত কোন কীটকোষ প্রস্তুত হয় না, কিন্তু তাহারা সাধারণের মঙ্গলের জন্য, নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে।

কেমন করিয়া পিপীলিকাদেহের অনু-পরমাণু এই সকল জটিল কার্য প্রণালীর পরিচালনা করে—কোথাও না কোথাও বুদ্ধিবৃত্তি আছে।

কেবলমাত্র মানব মস্তিষ্কেরই এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে, সে বিবেচনা শক্তি লাভ করিয়াছে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ঠিক বাঁশীর এক-একটি সুরের ন্যায় সুন্দর কিন্তু সংক্ষিপ্ত—মানবের মস্তিষ্ক সকল সুরের আকর। মানুষ এই বিভিন্ন সুরগুলিকে নানাভাবে একত্র করিয়া এরূপে চিন্তাধারার সৃষ্টি করে যে সত্যই তাহা আশ্চর্য। মানুষের সৃষ্টি হইবার আগে, আদিম জগতের প্রস্তররাশি হইতে এমন কোন প্রাণীর জন্ম হয় নাই, যাহার মস্তিষ্ক মানব মস্তিষ্কের ন্যায় এত পরিবর্তনশীল। সেইজন্যই মানুষ আজ আশা করে, যে সে একদিন সৃষ্টির সকল রহস্য জানিবার শক্তি লাভ করিবে, সে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পদে স্থাপিত হইবে। তাহার শক্তিতে সে হইবে অতুলনীয়, সৌভাগ্যে সে হইবে অমর।

রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার প্রতিবিধান অনুসারে জীবজন্তুর উদ্ভব, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া কেবলমাত্র সম্ভব—ইহার অধিক অগ্রসর হইতে সে অসমর্থ। পক্ষীর পুচ্ছের সৌন্দর্যকে যৌন আকর্ষণের উপায় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। যদিও সুন্দরী নারীর প্রয়োজন আছে—একটি নির্জীব সুন্দর চিত্র মানুষের অস্তিত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজন নয়। অণুপরমাণু প্রস্তর ও জলের মিলন ঘটিতে পারে, জীবন্ত হইলে তাহাদের মনুষ্যে পরিণত

হওয়া সম্ভব, কিন্তু ইহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া কি আরও অগ্রসর হইতে পারে? তাহাদের মধ্য হইতে কি একজন সংগীতজ্ঞের সৃষ্টি হইতে পারে, যাহার কাগজের উপর বিভিন্ন সুর লিপিবদ্ধ করিবার, বীণার মত কোন সংগীত যন্ত্রে বাতাসে তরঙ্গ তুলিবার এবং শ্রোতাদের চিত্ত বিনোদন করিবার ক্ষমতা আছে? তাহারা কি তাহাদের সুর, সেলুলয়েড পত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে, অথবা বেতার যন্ত্রে ইথার তরঙ্গ তুলিয়া তাহাদের গান পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিতে পারে? এই ইথরের কথা অণু-পরমাণুরা কিছুই জানে না, কেবলমাত্র জানে, তাহারা ইহার মধ্যে আছে অথবা ইথর দিয়া তাহারা তৈরী।

যে কোন প্রাণী তাহাদের ব্যক্তিগত চেষ্টাকে সংঘবদ্ধ করে; তাহারা একসংগে শীকার করে, খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, বহুপ্রকারে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র চেষ্টাকে বৃহত্তর করিয়া তুলে। কিন্তু ইহার বেশী তাহারা অগ্রসর হইতে পারে না।

মানুষ কিন্তু ব্যক্তিগত চেষ্টাকে বৃদ্ধি করিয়া পিরামিড, তাজমহল ও স্তুপ নির্মাণ করিয়াছে; একই সময়ে সে যন্ত্রবিজ্ঞানে নানা কৌশল, কপিকল চক্র ও অগ্নির ব্যবহার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে। ভারবাহী জন্তুদের সে গৃহে পালিত করিয়াছে, বহু শ্রমসাধ্য কার্য অনায়াসে সম্পন্ন করিবার জন্য সে চক্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে সে তাহার চরণদ্বয় ও পৃষ্ঠদেশ শক্ত করিয়া আনিয়াছে। পতনশীল জলের শক্তিকে সে আয়ত্তে আনিয়াছে, বাষ্প, বায়ু ও বিদ্যুতের শক্তিকে সে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। শক্তিক্ষয়ী কার্যগুলি মস্তিষ্কের সাহায্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছে। সে একস্থান হইতে আর একস্থানে মৃগ হইতেও দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতেছে—তাহার রথের সহিত পক্ষসংযুক্ত করিয়া পক্ষীর চেয়েও দ্রুত-গতিতে আকাশে উড়িতেছে। পদার্থের কোন আকস্মিক সংগঠনে এই সকল বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ সম্ভব হয় নাই।

সৌন্দর্য সকল প্রকৃতিতেই আবদ্ধ। মেঘ, ইন্দ্রধনু, নীল আকাশ, তারকার আনন্দ, উদীয়-মান চন্দ্রসূর্য, শান্ত দ্বিপ্রহরের অপরূপ আলস্য ইহাদের সৌন্দর্য মানবমনে কত উৎসাহই না আনিয়া দেয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে, সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জন্তু ও ক্ষুদ্র শৈবাল-পুষ্প অপরূপ সৌন্দর্য রেখায় বিভূষিত। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থদের স্ফটিকের গঠন-মূলক রেখাগুলি, তুষারকণা হইতে সূর্যকিরণ ধৌত ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু এত সুন্দর যে নিপুণ চিত্রকরহ কেবল ইহাদের অনুকরণ করিতে বা তুলনামূলক গঠন করিতে পারিবে। একটি সবল সুস্থ উদ্ভিদের প্রত্যেকটি পত্র সম্পূর্ণভাবে গঠিত এবং তাহাদের গঠনপ্রণালী নির্দিষ্ট কৌশলে সম্পন্ন হইয়াছে। পুষ্প তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সুপরিচিত এবং সুসংবদ্ধ। তাহাদের গঠন প্রণালীর নমুনা অতি সুন্দর, প্রতি পুষ্পের বর্ণও চারিদিকের অবস্থার সহিত সুসামঞ্জস্যে সংগৃহীত; তাহাদের বিভিন্নতা কদাচিৎ লক্ষিত হয়।

একটি সবল ক্ষুদ্র জীব সৌন্দর্যের আকর। তাহার স্বাভাবিক গতি স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর। স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে, আপনার রক্ষণাবেক্ষণের আবেষ্টনীর মধ্যে জীবকে এত সুন্দর দেখায়, যে মনে হয় তাহাদের একএকজন সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিকাশ। সবুজ উপত্যকা, শান্ত গৈরিক নদীবক্ষ, বক্র তরুশ্রেণী, দিগন্তবিস্তৃত পুষ্পিত শস্যক্ষেত্র, আকাশচুম্বী পর্বতশিখর ও তুষারাবৃত শৈলবক্ষ—মানবমনে আবেগের সৃষ্টি করে। মরুভূমির মধ্যে রুক্ষ বালু শৈলেরও একটি বিশেষ সৌন্দর্য আছে। সমুদ্র তরঙ্গের গরিমাময় উচ্ছ্বাস, উপকূলে উপকূলে এই তরঙ্গের ভগ্নমান সৌন্দর্য—সমুদ্রতীরেই হউক কি সমুদ্রবক্ষেই হউক, যাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদের মনকে আলোড়িত করে। ইতস্তত সঞ্চরণশীল মৎস্যশ্রেণীর স্বচ্ছন্দ গতি, তরঙ্গের নীচে সমুদ্রের জলরাশির নীচে, সামুদ্রিক শৈবালের নিপুণ সমাবেশ, মানুষের মনে একটি সুরময় উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে এবং কত প্রশ্নই না মনের মধ্যে জাগরিত করে। অবিকৃত প্রকৃতি মানুষের মনে যে আবেগ আনে, তাহাতে আমাদের মনে, কোন অজ্ঞাত চিরসৌন্দর্যময় প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা আনে—যাহার ছায়া পৃথিবীর প্রস্তর-বক্ষকে ছাইয়া তাহাকে অপরূপ সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়াছে। সে সৌন্দর্যের পরিমাণ শুধু মানুষেই করিতে পারে। সৌন্দর্য মানুষকে বিধাতার দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়।

উদ্দেশ্যের সহিত বিষয় নিবিড়ভাবে বিজড়িত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত অণুপরমাণু লইয়া আমাদের জীবনের যে সম্পর্ক, তাহারও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। প্রতি বিষয়ের সহিত যদি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নির্দেশ করা যায়, আর যদি বিশ্বাস করা যায়, মানুষ এই উদ্দেশ্যের একটু বিশেষ বিকাশ, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক মতবাদে, মানুষের শরীর ও মস্তিষ্ক যে পার্থিব—তাহাতে সন্দেহ নাই। অণু-পরমাণুর দল জীবজন্তুর দেহে যে অদ্ভুত কার্য করে, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল, যদি বুদ্ধি তাহাকে উদ্দেশ্যমূলক কোন কার্যে নিয়োগ না করে। এই নির্দেশমূলক বুদ্ধির কোন পরিচয় বিজ্ঞান আজও দিতে পারে না অথচ তাহাকে পার্থিব বলিয়া প্রকাশ করিবারও শক্তি তাহার নাই।

ইহা কি একটি প্রহেলিকা মাত্র?

সাহিত্য-সংবাদ

বেহালা যুব-সম্প্রদায় পরিচালিত

দশম বার্ষিক সত্যেন্দ্র স্মৃতি রচনা প্রতিযোগি

১৩৫৫

বিষয়ঃ—

১। কলেজ ছাত্রীদের জন্য—"রান্নাঘর"।
২। কলেজ ছাত্রদের জন্য—"বিজ্ঞানের গতি
৩। স্কুল ছাত্রীদের জন্য—"পুতুল খেল
৪। স্কুল ছাত্রদের জন্য—
"অতীত ও বর্তমা

নিয়মাবলীঃ—

প্রতিটি রচনা পাঁচ পৃষ্ঠার (ফুলস্কে মধ্যে বাঙলা ভাষায় লিখে ২৭শে মাঘ, ' (ইং ৯-২-৪৯) বা তৎপূর্বে নিম্ন ঠিকা পাঠাতে হবে। কৃতী লেখক-লেখিকাদের এক করে রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হ প্রবেশ মূল্য লাগবে না।

শ্রীবিমলচন্দ্র বাগ, সম্পাদক, সাহিত্য বিভ যুব-সম্প্রদায়, বেহালা, দক্ষিণ কলিকাতা।

কলিকাতার সাম্প্রতিক গোলমালে যেসব ট্রাম পোড়ানো হইয়াছে, শুনিলাম তার জন্য ছাত্ররা দায়ী নয়। খুড়ো বলিলেন—"আমরা আগেই আঁচ করেছিলাম একাজ শিক্ষার্থীর হতে পারে না, বেশ পাস-করা—পাকা ঝানু ছাড়া ট্রাম পোড়ানো বিদ্যে জাহির সহজ নয়।"

* * * * *

God has given us all in India a chance"—বলিয়াছেন রাষ্ট্রপাল রাজাজী। "লাটের গদি আর ট্রামের গদি দুই-ই যাহদের কাছে অলভ্য, তারা রাজাজীর মত ভগবানের নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করবেন না"—ট্রামের হাতলটায় ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে মন্তব্য করিলেন আমাদের প্রাচীনতম সহযাত্রী বিশু খুড়ো।

* * * * *

মন্ত্রিত্ব গঠনের পর হইতেই কংগ্রেস মহলের একতা ও সংগতি ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। খুড়ো বলিলেন—"খুবই স্বাভাবিক, কেননা, কেউ বলছেন পার্বতী-সুত লম্বোদর, আর কেউ বলছেন পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর"!

* * * * *

পৃথিবীর খাদ্যনীতির ডাইরেক্টার-জেনারেল মিঃ ডড্ জানাইয়াছেন—"It will depend on this year's harvest whether people will eat or die"—মরিলেও আমরা এই সান্ত্বনা নিয়া মরিব যে, এত বড় একটা আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা বাঁচিয়া থাকিতেই জানিয়া যাইবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে।

* * * * *

পূর্ব-পাকিস্তানের উজীর জনাব নুরুল আমিন বলিয়াছেন—"সাধারণ লোকের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল"—তাহলেও অসাধারণ লোকদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই এখন মাতামাতি চলছে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

পূর্ব-পাকিস্তানের অন্য এক সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে নাকি বেশ দুর্নীতি

পরিলক্ষিত হইতেছে। —"হিন্দুস্থানও Parity বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন"—মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

* * * * *

Grim future of Indian Cotton—একটি সংবাদ। সিডনী কটনের ভবিষ্যতের কথা এখনও জানা যায় নাই। তবে আশা করি, Mercy Misson-এর প্রয়োজন তার ফুরাইয়া গিয়াছে।

* * * * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, অতি শীঘ্রই নাকি মুদ্রায় আর রাজার মাথা থাকিবে না। —আমাদের মাথা ব্যথা লাঘব হইবার কারণ অবশ্য তাতে কিছুই নাই।

* * * * *

এক সভায় চিয়াং কাইশেকের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়া সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—"What he said could not be heard" খুড়ো বলিলেন—"এদ্দিন সাহায্যের জন্য চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা বসে গেছে কিনা তাই"!

* * * * *

"ইমারৎ যদি হয় গড়িবারে ভিৎ তার তুমি ভাই"—একটি কবিতার লাইন। —"ইট-সুরকীর যা অবস্থা, তাতে এই ব্যবস্থাই প্রশস্ত"—বলা বাহুল্য, এই মন্তব্যও আমাদের অ-কবি খুড়োর।

* * * * *

Continued inactivity in share market—একটি সংবাদ। ব্ল্যাক-মার্কেটে অবশ্যি কর্মতৎপরতার অভাব নেই—বলিলেন ট্রামের জনৈক সহযাত্রী।

* * * * *

সহযোগী স্টেটসম্যান সম্প্রতি Smoking fashion-র কয়েকটি ফটো ছাপিয়েছেন। "কিন্তু তাতে ট্রামে-বাসে Smoke করার fashionটি বাদ পড়ায় অংগহানি হলো নাকি" —বলেন খুড়ো, সেই খুড়ো অথচ হাতে তার সেই পুরোনো বিড়িটি আর নেই।

* * * * *

স্ত্রী রাঁধতে ক্লান্তি পেত"—একটি বিজ্ঞাপন। —"তবু ভালো, অনেক স্ত্রী যে মোটে রাঁধেনই না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * * *

ডারবানের গোলমাল প্রসংগে সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন—Indians have not fully digested the great words

of Mahatma Gandhi—"কিন্তু মারটা তারা বেশ ভালোভাবেই হজম করেছে বলে মনে হয়"—বলে শ্যামলাল।

পরিবর্তনের মুখে চীন

চীনের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট একটা পরিবর্তন হতে চলেছে। এ-পরিবর্তন বৈপ্লবিক ধরণের হলেও এর আসল স্বরূপ কি হবে, তা ঠিক করে বলা শক্ত। চীন সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত সুন্ ইয়াৎ সেনের পুত্র ডাঃ সুন্ ফোর প্রধান মন্ত্রিত্বে নবগঠিত চীন মন্ত্রিসভা গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে যুধ্যমান উভয় পক্ষের প্রতি অবিলম্বে বিনাসর্তে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশের সংগে সংগে উভয় পক্ষকে শান্তি আলোচনার জন্যে নিজ নিজ প্রতিনিধিমণ্ডলী নিয়োগের অনুরোধও জানানো হয়েছে। এই নির্দেশ ও অনুরোধ কম্যুনিস্ট দল ও কুওমিণ্টাং গভর্নমেণ্ট—উভয়ের প্রতি করা হলেও কার্যত এর অর্থ হল মার্শাল চিয়াং কাইশেকের কুওমিণ্টাং গভর্নমেণ্টের অবসান। যুদ্ধবিরতির নামে একে আমরা একতরফা আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কিছু বলে অভিহিত করতে পারি না। যখন এই যুদ্ধবিরতির আবেদন জানানো হয়েছে, তখন কম্যুনিস্ট সর্বাধিনায়ক মাও সে তুংয়ের বিজয়ী বাহিনী চীনের বহু উল্লেখযোগ্য জনপদ ও নগর দখল করে রাজধানী নানকিংয়ের পনের মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। এ অবস্থায় এ আবেদনের কি অর্থ হতে পারে? বহুদিন থেকেই চীনে শান্তি স্থাপনের নানাবিধ জল্পনাকল্পনা চলছিল। মার্শাল চিয়াংয়ের গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে সরকারী ও বে-সরকারী সূত্রে শান্তি স্থাপনের একাধিক প্রয়াস আমরা ব্যর্থ হতে দেখেছি। সুরক্ষিত সরকারী ঘাঁটি মুকদেনের পতনের পরে মার্শাল চিয়াংয়ের কুওমিণ্টাং বাহিনীর মনোবল এমনভাবে ভেঙে পড়েছে যে, গত দুই মাসকালের মধ্যে তারা কোন একটি কম্যুনিস্টবিরোধী সংগ্রামেও বিজয়ী হতে পারেনি। কম্যুনিস্ট বাহিনীর অগ্রাভিযানে সামান্য মাত্র বাধা দেওয়াও সম্ভব হয়নি এ-বাহিনীর পক্ষে। তবু চিয়াং কাইশেক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিমজ্জমান ব্যক্তির মত তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরে বাঁচার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর মুখ রক্ষার পথ ছিল দুটি—হয় অধিকতর মার্কিন সামরিক ও আর্থিক সাহায্য লাভ করে কম্যুনিস্ট-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া—নয়তো কোন তৃতীয় শক্তির মধ্যস্থতায় কম্যুনিস্টদের সংগে একটা শান্তি স্থাপনের আপোষ-রফা করা। সমর ক্ষেত্রে কম্যুনিস্টদের এ্ঁটে উঠতে না পেরে গত দুই মাসকাল তিনি এই দুই পথে আত্মরক্ষার আপ্রাণ প্রয়াস করেছিলেন। চীনের সুদীর্ঘ ২২ বৎসরব্যাপী গৃহযুদ্ধ আজ এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এর একটা হেস্তনেস্ত না হয়েই পারে না।

অধিকতর মার্কিন সামরিক ও আর্থিক সাহায্য লাভের আশায় মাদাম চিয়াং কাইশেক স্বয়ং আমেরিকায় গেছেন এবং এখনও তিনি সেখানেই আছেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। ইতিপূর্বেও মাদাম চিয়াং কাইশেকের আমেরিকা-ভ্রমণ আমরা দেখেছি। তিনি আমেরিকায় গেলে তাঁকে নিয়ে একটা বিরাট হৈচৈর সৃষ্টি হত। স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট থেকে শুরু করে সাধারণ মার্কিন রাজ-কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতেন। আর এবার? এবার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সংগে দেখা করতে তাঁকে সাতবার নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছে। তাছাড়া মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর থেকে তাঁকে প্রায় স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, চীনকে সাহায্য করার জন্যে পূর্বে পরিকল্পনা অনুসারে যে অর্থ নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, তার এক-চুল এদিক-ওদিক তাঁরা করবেন না। বিপদের দিনে এরূপ প্রত্যুত্তরের জন্যে চিয়াং গভর্নমেণ্টের পূর্বে থেকেই প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে এতকাল তাঁকে অর্থ জুগিয়ে এসেছে, তা চীনকে সাহায্যের জন্যে নয়, নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে। চীনের গৃহ-যুদ্ধ স্পষ্টত চিয়াং কাইশেকের প্রতিকূলে গেছে বলে আমেরিকাও আজ আর অধিকতর অর্থসাহায্য করতে রাজি নয়। তার একমাত্র কারণ, আমেরিকা বুঝতে পেরেছে যে, চিয়াং কাইশেকের দ্বারা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই সে আজ সুযোগ বুঝে হাত গুটিয়ে বসেছে। চীনের ভাগ্যে কি ঘটল না ঘটল—ব্যবসায়ীসুলভ মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তা দেখার অবকাশ নেই। এ প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় চীনের রাষ্ট্রনায়কগণ দ্বিতীয় প্রয়াসও করেছিলেন, অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় কম্যুনিস্টদের সংগে একটা আপোষ-রফার চেষ্টা করেছিলেন। চীনের জাতীয় জীবনে এমন সময় একাধিকবার এসেছে, যখন কম্যুনিস্টদের সংগে কুওমিণ্টাং গভর্নমেণ্টের আপোষ-রফার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিজয়ের উল্লাস ও মার্কিন সাহায্যের জোরে সে সময় আপোষের ব্যাপারে চিয়াং কাইশেক গা করেন নি। আজ ভাগ্যের চাকা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে—বিজয়ী আজ মাও সে তুং। পরাজয়ের মুখে বিজয়ীর সংগে আপোষ প্রয়াস করতে গেলে সর্ত ভাল না পাবারই সম্ভাবনা। তাই কুওমিণ্টাংয়ের পক্ষ থেকে তৃতীয় কোন শক্তির মধ্যস্থতা পাবার চেষ্টা চলেছিল। এই উদ্দেশ্যে চিয়াং গভর্নমেণ্ট ফ্রান্স, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার স্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই বৃহৎ চতুঃশক্তির কেউ মধ্যস্থতা করতে রাজি হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত কুওমিণ্টাং গভর্নমেণ্টকে প্রায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে।

চীনের প্রেসিডেণ্ট মার্শাল চিয়াং কাইশেক তাঁর জন্ম-শহর ফেংসুয়াতে যাবার জন্যে রাজধানী নানকিং ত্যাগ করেছেন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা যে, এ হল তাঁর ক্ষমতা ত্যাগ ও চীন পরিত্যাগের পূর্বাভাস। নববর্ষের বাণীতে চিয়াং কাইশেক বলেছিলেন যে, কম্যুনিস্টরা শান্তি স্থাপনের জন্যে আগ্রহান্বিত হলে তিনি পদত্যাগ করতে রাজি আছেন। সেই পদত্যাগই তাঁকে শেষ পর্যন্ত করতে হল। তাঁর পরিবর্তে প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন চীনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও কুওমিনটাঙ পার্টির উদারনৈতিক সদস্য লি সুং-জেন্। ইতিপূর্বে চীনের কম্যুনিস্ট বেতারে কম্যুনিস্ট দলপতি মাও সে-তুং শান্তির যে ৮-দফা সর্ত প্রচার করেছেন সে সর্ত বিজয়ীসুলভ মনোভাবের দ্বারা রচিত এবং সেই সর্ত পুরোপুরি গ্রহণ করা হলে তা হবে কুওমিনটাঙ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল। এই ৮-দফা সর্ত

নিম্নোক্তরূপঃ (১) যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি, (২) ভুয়া শাসনতন্ত্রের অবসান, (৩) কুওমিনটাঙ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন আইন প্রতিষ্ঠানগুলির অবসান, (৪) গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সব প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন, (৫) আমলাতান্ত্রিক মূলধনের বাজেয়াপ্তি, (৬) কৃষি সংস্কার, (৭) বিশ্বাসঘাতকতামূলক সকল চুক্তির অবসান ও (৮) কুওমিনটাঙ গবর্ণমেণ্টের হাত থেকে শাসন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে পরামর্শদাতা আইন পরিষদের বৈঠক আহ্বান। চীনের সর্বশেষ সংবাদে দেখা যায় যে, যুদ্ধ বিরতির আহ্বান সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট বাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ হয় নি এবং তারা ইতিমধ্যে পিপিং শহর দখল করেছে। আরও দেখা যায় যে, ২২শে জানুয়ারী তারিখের ঘোষণায় নতুন প্রেসিডেণ্ট লি সুং-জেন্ ঘোষণা করেছেন যে চীনা কম্যুনিস্ট দলের প্রদত্ত সর্তের ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা করতে কুওমিনটাঙ প্রস্তুত। এই ঘোষণার পরে শান্তি আলোচনায় সম্মত হতে যেমন কম্যুনিস্টদের বাধবে না, তেমনি এই ধরণের সর্তে শান্তি আলোচনার অর্থই হল কুওমিনটাঙের ২২ বৎসরব্যাপী শাসনের অবসান।

চীনে আজ যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া শুধু এই সুপ্রাচীন দেশটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—এর প্রতিক্রিয়া হবে সমগ্র এশিয়া ও সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতির উপর। চীনে আজ যা ঘটতে চলেছে তার আংশিক দায়িত্ব যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এড়াতে পারে না, তেমনি চিয়াং কাইশেকও এড়াতে পারেন না। পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সাহায্যের জোর যদি না থাকত, তবে দীর্ঘ ২২ বৎসরকাল চীনের জাতীয় জীবনে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলত কিনা সন্দেহ। বহু পূর্বেই চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের একটা সম্মানজনক আপোষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি যথেষ্ট পরিমাণে চীনকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য করত, তাহলেও চীনের আজ এ পরিণতি ঘটত না। অপর পক্ষে এ দুর্ঘটনার জন্যে চিয়াং কাইশেক দায়ী এই জন্যে যে, তিনি একটি সুমহান্ রাজনৈতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়েও গণ-জীবনের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ বজায় রেখে চলতে পারেন নি। চীন সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সুন ইয়াৎ সেনের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন তিনি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি চীনের জাতীয় জীবনে সুন ইয়াৎ সেন প্রচারিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শবাদকে আদৌ রূপ দিতে চেষ্টা করেন নি। ফলে দুঃখ-দুর্দশাপীড়িত চীনের জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন তাঁর গভর্নমেণ্টের ভাগ্যে জোটেনি বললেই চলে। কার্যত তাঁকে আমরা দেখেছি যে, তিনি সামরিক একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করেই চীনকে নিজের অধিকারে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘুষ, দুর্নীতি ও গণতন্ত্রবিরোধিতার যেসব অভিযোগ আমরা পূর্বাপর শুনে এসেছি, সেগুলিকে আমরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না। সুন ইয়াৎ সেন প্রচারিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শচ্যুত হয়ে চিয়াং গভর্নমেণ্ট যদি গণ-জীবনের স্পর্শবিরহিত না হয়ে উঠতেন, তবে কম্যুনিস্টদের পক্ষে এতটা গণ-সমর্থন লাভ কোনক্রমেই সম্ভব হত না এবং চিয়াং কাইশেককেও চীনের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে এমন অগৌরবের মধ্যে বিদায় নিতে হত না। মহাচীনের রাজনৈতিক জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন হতে চলেছে, আজও তার রূপ স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করার উপায় নেই। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

ভিয়েৎনাম

আজ ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের বর্বর আক্রমণ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ইন্দোনেশিয়াকে অবলম্বন করে নয়াদিল্লীতে পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে একটি এশিয়া সম্মেলনও হয়ে গেল। এই সম্মেলনের কাছে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ-প্রপীড়িত ভিয়েৎনামের তরফ থেকেও একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া প্রসঙ্গে স্বতঃই আমাদের ভিয়েৎনামের কথা মনে পড়ে। ভিয়েৎনামের সমস্যা ইন্দোনেশিয়ার সমপর্যায়ভুক্ত হলেও রাজনৈতিক কারণে এ সমস্যাটি আশানুরূপ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পায়নি। এর একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, ডাঃ হো-চি-মিনের ভিয়েৎনাম রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে যে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, সে হল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র নয় —বরং সেই ফ্রান্স বিশ্বের বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্যতম বলে প্রকীর্তিত। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ায় হল্যাণ্ডের কার্যক্রমের নিন্দা করা কিংবা তার সাম্রাজ্যবাদী দুষ্প্রয়াসে বাধা দেওয়া যতটা সহজ—ভিয়েৎনামের ব্যাপারে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেরূপ করা সহজ নয়। মালয়ে বৃটিশরা যা করছে, সেটাও ভিয়েৎনাম বা ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় বিশেষ প্রশংসনীয় নয়। তবু বৃটিশদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অতটা আলোড়ন জাগে নি কেন? এর কারণ বোঝা অত্যন্ত সহজ। পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের অধীনে প্রাচ্যে সামরিক ঘাঁটি থাকা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আঁকড়ে রয়েছে ভিয়েৎনাম এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবে রয়েছে মালয়। আর এ দুটি দেশকে তাঁবে রাখার জন্যে উভয় ক্ষেত্রেই দেখানো হচ্ছে লাল জুজুর ভয়। এই লাল জুজুর ভয় যে বহুলাংশে কল্পিত, সে কথা না বললেও চলে।

সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশলে ফ্রান্স হল্যাণ্ডের চেয়ে বেশি দক্ষ বলে সে ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে কোন সর্বাত্মক অভিযান চালিয়ে বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্রে সমালোচনার ঝড় ওঠারও সুযোগ দেয়নি। ভিয়েৎনামকে তাঁবে রাখার জন্যে সে আশ্রয় নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ভেদ-পন্থার। ভিয়েৎনাম রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে জেনারেল জুয়ানের প্রধান মন্ত্রিত্বে সামরিক একটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট গঠন এই কূটকৌশলেরই অন্তর্গত। তথাকথিত ফরাসী ইউনিয়নের অধীনে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দানের লোভ দেখিয়েই এই গভর্নমেণ্ট গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশল এইখানেই নিরস্ত হয়নি। তারা চেষ্টা করছে আন্নামের ভূতপূর্ব সম্রাট বাও দাইকে এই সাময়িক গভর্নমেণ্টের অধিনায়ক পদে বসাতে। যুদ্ধশেষে ভিয়েৎনাম রিপাব্লিকের অনুকূলে সম্রাট পদ ত্যাগ করে বাও দাই একদা ভিয়েৎনামবাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। বর্তমানে বাও দাইয়ের সঙ্গে ফরাসী গভর্নমেণ্টের সেই আলোচনাই চলছে। কর্মপন্থা ভিন্ন হলেও ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোনেশিয়ায় যা করতে চাইছে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরাও ভিয়েৎনামে তাই করতে চাইছে। কূটনৈতিক কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভিয়েৎনাম নিয়ে ততটা আলোড়ন না হলেও নৈতিক দিক থেকে ভারতের উচিত, ভিয়েৎনামকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা।

২৩-১-৪৯

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(প্রথম সংখ্যা হইতে ত্রয়োদশ সংখ্যা পর্যন্ত)

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ২৩শে মাঘ, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 5th February, 1949. [১৪শ সংখ্যা

বাণী বন্দনা

যাহা সত্য তাহাই সুন্দর এবং তাহাই শিব বা কল্যাণপ্রদ। সৌন্দর্যানুভূতির এই বলেই মানুষের সমগ্র সভ্যতা এবং সংস্কৃতি নবসৃষ্টির পথে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ভারতের সাধকগণ সৃষ্টির মূলে এক শুদ্ধ নির্মল আনন্দময় সত্তার সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই জ্ঞানদায়িনী জননীস্বরূপে বন্দনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, কর্মের উপরই ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং আনন্দময়ী সেই দেবীর বন্দনার ছন্দে কর্মকে লীলায়িত করিয়া লইতে পারিলে কর্মের আয়াসগত গ্লানি হইতে মানুষ মুক্ত হইতে পারে, কর্মে তখন আর ক্লেশ থাকে না। কর্ম তখন মানুষের পক্ষে আর বন্ধনের কারণ হয় না। পক্ষান্তরে কর্মের পথে ধর্মজীবনের প্রাণের ছন্দই অনাবিদ্ধভাবে অন্তরে বিলসিত হইয়া উঠে। যিনি আমাদের মনের মূলে স্মিত ঈক্ষণের স্পর্শ দানে কর্মকে এই ভাবে ধর্মে এবং ধর্মকে লীলার রাজ্যে যিনি উন্নীত করেন তিনিই বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী। তিনি বীণাধারিণী। তাঁহার বীণার ঝঙ্কারে বিশ্বময় প্রাণের ধারা সঞ্চারিত হয়। রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠে। শীতের জাড্য কাটিয়া গিয়া বসন্তের বাতাস ছুটে, ফুল ফোটে, সাহিত্য-সঙ্গীত ও বিবিধ শিল্পকলায় মানব-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয় এবং সমাজ-জীবনের প্রতিষ্ঠা ঘটে। দেবী বীণাপাণি এই দিক হইতে মানব-সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আদি জননী। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই দেবীর অত্যুজ্জ্বল মাধুরী উপলব্ধি করিয়া কি রূপ! কি রূপ! বলিয়া চারিদিকে চক্ষু বিস্তার করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি হন চতুর্মুখ। বেদমন্ত্রে এই দেবীর মহিমাই বহুধা এবং বিবিধ ছন্দে পৃথকভাবে কীর্তিত হইয়াছে। এদেশের সাধকরা বলিয়াছেন, এই মায়ের মাধুর্য একান্তভাবে উপলব্ধি করাতেই জীবনের সার্থকতা। যজ্ঞের পথেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। মনস্বিগণ এই মায়ের উদ্দেশ্যে সর্বস্ব যজ্ঞে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যজ্ঞ-সিদ্ধ সুষ্ঠু এবং সংযত জীবনেই শ্বেত শতদল-বাসিনী জননীর অপরিম্লান প্রসাদ ফুটিয়া উঠে। আমাদের বাণী-বন্দনা এই দিক হইতে সার্থকতা লাভ করুক। আমাদের সব কর্ম যজ্ঞে পরিণত হোক্ এবং আনন্দময়ী জননীর প্রত্যক্ষানুভূতি আমাদের চিত্তে যজ্ঞের প্রবৃত্তিকে পরিস্ফুর্ত করিয়া তুলুক।

কর্তব্যের আহ্বান

গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিবসে জাতি নূতন কর্তব্য সাধনে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। আমরা সর্বোদয় দিবসে ভগবানকে সাক্ষী করিয়া এই শপথ গ্রহণ করিয়াছি যে,—'স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি; কিন্তু আমাদের নবলব্ধ এই স্বাধীনতাকে সর্বাংশে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে এতৎসম্পর্কিত দায়িত্ব আমাদিগকে বহন করিতে হইবে এবং কর্তব্য পালন করিতে হইবে। আমাদের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জন-সেবার সুযোগ পাওয়া এবং তৎসম্পর্কিত দায়িত্ব বহন ও কর্তব্য পালনের ভার গ্রহণ করা জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয়। যাঁহারা এই দায়িত্ব বহন এবং কর্তব্য পালনের কথা বিস্মৃত হইবে, পদ ও ক্ষমতার প্রত্যাশায় ছুটাছুটি করিবে, তাহারা দেশের অনিষ্টই সাধন করিবে।' বলা বাহুল্য, এই পবিত্র প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তদুপযোগী নৈতিক মর্যাদাবোধ আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; পক্ষান্তরে সংকীর্ণ স্বার্থ-গত দৈন্য এবং দুর্বলতা আমাদের সমাজ জীবনকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, জাতির যাঁহারা সেবক এবং কর্মী তাঁহাদের মধ্যেও এই ঘৃণ্য দৈন্য ও দুর্বলতা প্রসারলাভ করিয়াছে। বিগত জয়পুর কংগ্রেসে এ সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। নেতারা জাতির দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণও করিতেছেন। কিন্তু নৈতিক চেতনা কিছুতেই উপযুক্তভাবে বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। দুর্নীতি মিথ্যাচারের চোরা পথে প্রশ্রয় দিন দিনই পাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে নৈতিক এই দুর্বলতা এবং চরিত্র বলের এই অভাবই আমাদের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ইহা সুস্পষ্ট যে, যদি আমরা এই সংকট কাটাইয়া উঠিতে না পারি, তবে আমাদের স্বাধীনতা স্বপ্ন বিলীন হইয়া যাইবে এবং উদ্দাম অনাচার আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। পরিস্থিতি বাস্তবিকই সংকটজনক। আমাদের আশে পাশে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে সমাজ-বিধ্বংসী উচ্ছৃঙ্খলতার উৎকট আবর্ত উঠিয়াছে। চীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়ার আকাশ রাষ্ট্রবিপ্লবের ধূম্র-ধূলিতে আচ্ছন্ন। এ বিপদ আমাদের উপরও আপতিত হইতে পারে। সময় থাকিতে যদি আমরা সতর্ক না হই, তবে সে আশংকা সম্পূর্ণই রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের স্বাধীনতা যদি রক্ষা করিতে হয়, এবং সর্বধ্বংসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের আতঙ্ক হইতে দেশকে যদি বাঁচাইতে হয় অধিকন্তু নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বা মানুষ হিসাবে নিজেদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ইচ্ছা সত্যই যদি আমাদের থাকে, তবে ক্ষুদ্র স্বার্থের সব গণ্ডী কাটাইয়া আমাদিগকে বাহির হইতে হইবে। শুধু উপদেশে নয়, ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনের সর্বত্র, প্রত্যেকটি কাজের ভিতর আমাদের চরিত্র শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের পর জগতের সর্বত্র একটা নৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, মহা-

যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া অনেকটা ইহার মূলে আছে, এ কথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু অবস্থাকে স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়, অবস্থার প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করাতেই মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্যা মানুষের সামনেই আসে এবং মানুষই সেগুলির সমাধানও করিয়া থাকে। জগতের সব জাতিই এইভাবে বড় হইয়াছে। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া যদি আমরা নিজের নিজের স্বার্থের বেসাতি খুলিয়া বসি, তবে সে মিথ্যাচারের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করিতেই হইবে এবং স্বয়ং ভগবান আসিয়াও তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। দুর্বল যে, কেহই তাহার রক্ষক নাই এবং উদার স্বার্থের অনুভূতিই শক্তির প্রকৃত ভিত্তি। সে অনুভূতি যাহাদের নাই, তাহারা পশু। পশু কখনই স্বাধীনতার মর্যাদা উপভোগ করিতে পারে না। এ সত্যটি আজ আমাদের ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। জনসাধারণকে এ সম্বন্ধে সচেতন করিবার প্রয়োজন বিশেষ-ভাবেই আছে, আমরা এ কথা স্বীকার করি; *কিন্তু আমাদের মনে হয়, যাঁহারা শাসননীতির পথে জনসেবার সাক্ষাৎ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী। রাষ্ট্রনীতিতে প্রকৃত ত্যাগ এবং সেবার* মাহাত্ম্যকে *পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া তাঁহারা* সমাজ-জীবনের এই নৈতিক অধোগতির পথ রুদ্ধ করিতে পারেন। ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্য-পরায়ণতাকে প্রদীপ্ত করিয়া তাঁহারাই জনমনের অবসাদ এবং অসহায়ত্বকে দূর করিয়া চরিত্র-বলকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে সমর্থ। বস্তুত দুর্নীতি বা অনাচার সমষ্টি-মনে কখনই একান্ত নয়, সাময়িকভাবে মানুষের মনে এ সম্বন্ধে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে মাত্র। জনগণের হিতকর্তা হিসাবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নিজেদের ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের দ্বারা এবং সশ্রদ্ধ সেবার পথে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত সমষ্টি মনে মনুষ্যত্বের সত্য এবং সনাতন মর্যাদা সহজেই জাগাইতে পারেন। সুতরাং যাঁহারা জাতির সেবক ও কর্মী এবং সেই হিসাবে নেতৃত্বের মর্যাদা পাইয়াছেন, রাষ্ট্র-নীতিকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আজ যাঁহাদের উপর বর্তাইয়াছে, পথ তাঁহাদিগকেই দেখাইতে হইবে। শুধু কথায় নহে, কাজের দ্বারা সমষ্টি চেতনাকে তাহাদের জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চরিত্রশক্তিসম্পন্ন কর্মীরাই জাতির শক্তি এবং তাঁহাদের সাধনার বলকে ভিত্তি করিয়াই জাতি গড়িয়া উঠে। পদ, মান এবং প্রতিষ্ঠার মোহ হইতে মুক্ত শুদ্ধ সেবার অনাবিল সন্তুষ্টিতে অধিষ্ঠিত কর্মীদের উপরই জাতির ভবিষ্যৎ একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে।

লোকসেবার মর্যাদা

লোকসেবার ক্ষেত্রে সততার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আদর্শে ইংরেজ মর্যাদা জাগ্রত। ইংরেজের অনেক দোষ থাকিলেও তাহার এই যে একটি মহৎ গুণ ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজ জাতি স্বার্থের জন্য অনেক দেশ লুণ্ঠন করিয়াছে, অনেক জাতিকে শোষণ করিয়াছে; সব সত্য; কিন্তু শাসনক্ষেত্রে উচ্চাধিকারে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সামান্য নৈতিক বিচ্যুতিকেও তাহারা ক্ষমা করে নাই। লিন্‌স্কি ট্রাইব্যুনালের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত ইহার অন্যতম প্রমাণ। ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যতম সদস্য মিঃ বেলচার এবং অপর কয়েকজন পার্লামেণ্টের সদস্য ও শাসন-বিভাগের কর্মচারীর নামে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ব্যাপারটি ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রধান মন্ত্রী এটলী তাঁহার অন্যতম সহকর্মীর আচরণকে আড়াল করিয়া ইজ্জত বজায় রাখিতে যান নাই। তিনি তৎপরতার সঙ্গে এই সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত করেন। ট্রাইব্যুনালের তদন্ত অনুসারে ইঁহারা কেহ কেহ অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। তদন্তে প্রমাণ হইয়াছে যে, ব্যবসায়ীদিগকে অন্যায় *সুবিধা দিবার জন্য উঁহারা কেহ কেহ অর্থ, কেহ বা কয়েক বোতল মদ, সোনার সিগারেটের কেস্‌, পোষাক-পরিচ্ছদ* বা অন্য দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীদের সম্পর্কে আনীত এই অভি-যোগের সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে আলোচনা হইবে। আলোচনার ফল কি হইবে এখনই বলা যায় না; তবে একথা সত্য যে, লোকশাসনের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও যে মন্ত্রী সততার মর্যাদা কিঞ্চিৎমাত্রও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, ইংলণ্ডের লোক-সমাজে তাঁহার আর মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না। টাকার জোরে তিনি সেখানে পুনরায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইবেন না। একটা স্বাধীন জাতি যে সকল কারণ-পরম্পরায় বড় ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, লোক-শাসনের ক্ষেত্রে সততার প্রতি তাহার নিষ্ঠা তাহার অন্যতম গুণ। মহাত্মাজী এই আদর্শকে এদেশের সমাজ এবং রাষ্ট্রজীবনে জাগ্রত করিতে সর্বদা তৎপর ছিলেন। তাঁহার স্বজনগণের এবং তাঁহার অনুগামী কংগ্রেসকর্মী ও নেতৃবর্গের আচরণ সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন থাকিতেন। মিথ্যাকে ঢাকিয়া রাখিয়া প্রকৃত ব্যাধিকে প্রশ্রয় দেওয়াতে যে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের অকল্যাণই সাধিত হয় এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। লোকশাসনের ক্ষেত্রে সততার প্রতি সজাগ দৃষ্টি ব্রিটিশের সাংস্কৃতিক অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার গণতান্ত্রিকতাকে এই সংস্কৃতি সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তিতে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। রাষ্ট্র পরিচালনা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যেখানে কর্তব্যপরায় দুর্নীতি হইতে মুক্ত এবং পক্ষপাতহী সেখানে সমাজজীবনে তাঁহাদের আদর্শ প্রভা বিস্তার করে, ইহা স্বাভাবিক। শাসকদের এ আচরণ দেখিয়া শুধু জনগণই যে আস্থাশী হইয়া উঠে, এমন নয়, ইহাতে সমাজ-জীবনে সকল দিকে উদার এবং উন্নত চরিত্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অর্থ বা পদমানের গুরুত্ব চরিত্রবলের কাছে তুচ্ছ হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত মনুষ্যত্ব পদ ও মানের প্রভাব এবং অর্থে বলে ক্রয় করা যায় না, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ মানুষকে প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। রাষ্ট্র এবং সমাজ সংস্কৃতির এই আদর্শ যতটা দৃঢ়, সে রাষ্ট্র এবং সমাজ ততটা উন্নত লোকসেবার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার দিকে নবীন ভারতের দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তোল বর্তমানে সর্বপ্রধান প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে দেশের দুর্দশা লইয়া যাহারা পাপ-ব্যবস করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিংবা তৎপ্রতীকারে শিথিলতা প্রদর্শন করে, কোন সভ্য সমাজে মানুষের মর্যাদা লাভ করিবার অধিকার তাহাদে নাই। লোক সমাজের ঘৃণিত জীবনে বিড়ম্বনা ভোগই তাহাদের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত।

স্বদেশপ্রেমের মর্যাদা ও মূল্য

পাকিস্থান রাষ্ট্রে সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপন একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলা চলে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা বীরের ব্রত গ্রহণ করেন এবং সেই ব্রত প্রতিপালনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বেলায় পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রাণধর্মের সংকো অথবা স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তির অভাব আগা-গোড়াই পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃত-পক্ষে কিছুদিন আগেও উৎকট সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ আবেগে সুভাষ-চন্দ্রের প্রতিকৃতি অপসারিত করিবার মত ব্যাপারও সেখানে ঘটিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের আদর্শের প্রতি পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তরুণদের শ্রদ্ধা আমাদের মনে আশা জাগাইয়াছে। এই শ্রদ্ধা যদি প্রগাঢ়তা লাভ করে, তবে সুখের বিষয়ই বলিতে হইবে কারণ, মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার দৈন্য কাটাইয়া সেখানে স্বদেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদাবুদ্ধি প্রসার লাভ করিতেছে আমরা ইহাই বুঝিব। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্র-দায়িকতা এবং স্বদেশপ্রেম এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী বস্তু। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সম প্রচেষ্টার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাই একমাত্র প্রেরণা লাভ করে, স্বদেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদাবুদ্ধির মনুষ্যত্বের দীপ্তি অর্থা বিদেশী বিজেতার বিরুদ্ধে শৌর্যময় সংগ্রাম

সঙ্কল্প তাহাতে ছিল না; শুধু ছিল সংস্কৃতি-বিরোধী নিতান্ত সঙ্গীন একটা সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা। সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া মেজর-জেনারেল শা নওয়াজ দিল্লীতে একথাটা তুলিয়াছিলেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন; পাকিস্থানের আদর্শ কোন দিনই মানিতে পারি নাই, দুই-জাতি তত্ত্ব কোন দিনই স্বীকার করিয়া লই নাই। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে আমার জন্মভূমি রাওয়ালপিণ্ডি বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। মেজর শা নওয়াজের এই উক্তির মধ্যে পক্ষপাতিত্ব আছে, এমন মনে করা ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশপ্রেম এবং মানবতার উদার মর্যাদাবুদ্ধিতে তিনি এ বেদনা অনুভব করিয়াছেন। স্বদেশপ্রেম যেখানে একান্ত এবং বলিষ্ঠ সেখানে হিন্দু এবং মুসলমানের ভেদ বিচার টিকে না। মনুষ্যত্বের প্রতি মর্যাদাবুদ্ধিও এই ভেদ-সম্পর্কিত অধিকার-বৈষম্য স্বীকার করিয়া লইতে স্বভাবতই বিমুখ হয়। এসত্য অস্বীকার করা চলে না যে, গান্ধীজীর ন্যায় মহামানবের আদর্শ পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নাই, জওহরলালের ন্যায় নেতার উদার মানব-সংস্কৃতির শক্তি ও পাকিস্থানের রাষ্ট্র-সাধনা প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। সুভাষচন্দ্রের প্রাণময় জীবনের পবিত্র এবং পাপনাশী পাবক স্পর্শ হইতেও পাকিস্থানের রাষ্ট্রসাধনা বঞ্চিত ছিল। কিন্তু মহৎ আদর্শ ব্যক্তি বা সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নহে, বিশেষতঃ পাকিস্থান ভারতের পর নয়। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছেন, পাকিস্থানের স্বাধীনতার মূলেও তাঁহাদের অবদানই মুখ্য-ভাবে রহিয়াছে। ইহাতে অত্যুক্তি কিছুই নাই, অসত্যও কিছু নাই। ইংরেজ ভারত ছাড়িতে বাধ্য না হইলে পাকিস্থান আসিত কি? সুতরাং ইংরেজকে যাহারা ভারত ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইতে পাকিস্থানের বাধা কোথায় বরং স্বাধীনতার উদার পরিপ্রেক্ষায় তাহাই স্বাভাবিক। এই আদর্শ সে যদি এখনও গ্রহণ করিতে পারে, এবং তাহাতে তাহার উন্নতিই ঘটিবে। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশপ্রেম মানুষের ধর্ম, বীরের ধর্ম; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা অনুদার অন্ধতা এবং নৈতিক দুর্বলতা অসংস্কৃত মনোবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্তর্নিহিত বলিষ্ঠ প্রাণবত্তাকে পাকিস্থান যদি আন্তরিক-তার সঙ্গে স্বীকার করিয়া লয়, তবে প্রগতি-শীল রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভের পথ তাহার পক্ষে উন্মুক্ত হইবে। পরন্তু সাম্প্রদায়িকতা এবং দুই জাতিতত্ত্বের কূট ও কৃত্রিম নীতি পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রে সর্বজনীন মর্যাদাকে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করিবার আদর্শ গ্রহণ করিলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে এবং তাহাতে উভয়েরই মঙ্গল। বস্তুতঃ মানব-সংস্কৃতির পথ ছাড়িয়া কোন রাষ্ট্রকেই শুধু সাম্প্রদায়িক জিগীরের জোরে ঠেলিয়া তোলা যায় না। সেক্ষেত্রে আপনার দুর্বলতাতেই তাহা এলাইয়া পড়ে, পাকিস্থান রাষ্ট্রের নিয়ামকগণ এ সত্য এখনও উপলব্ধি করুন।

আশ্বাস ও তাহার অন্তরায়

পাকিস্থানের প্রচার ও পুনর্বসতি সচিব খাজা সাহাবুদ্দিন সম্প্রতি ঢাকাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে যদি কোন ভীতি থাকে, তাঁহারা যেন তাহা দূর করিয়া স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাস করেন। খাজা সাহা-বুদ্দিনের এই উক্তির আন্তরিকতা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, ভীতির কারণ যদি থাকে, তবে ভীতি দূর করা যায় না এবং রাষ্ট্রে স্বাধীন নাগরিকের অধিকার উপভোগের সুবিধা যদি না থাকে, তবে স্বাধীন নাগরিকের ন্যায় জীবন যাপনের অবস্থা মনে মানিয়া লওয়া আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। দুর্বল মনের অবস্থাতেই এমন আত্মপ্রবঞ্চনা সম্ভব। পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্র-দায়ের মনে সত্যই যদি ভীতির ভাব থাকে, তবে তাহার কারণও আছে বুঝিতে হইবে, সেখানকার হিন্দুরা যদি স্বাধীন নাগরিক জীবনে উদ্বুদ্ধ না হইয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে, পূর্ববঙ্গের প্রতিবেশে এ সম্পর্কে অন্তরায় অবশ্য রহিয়াছে। কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের দুই একজন বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি একটা বদ্ধ সংস্কার লইয়া দীর্ঘদিন চলিতে পারে; কিন্তু বিশেষ অবস্থার চাপে না পড়িলে সমাজের একটা বড় অংশের যুগযুগান্তরের সংস্কৃতিবোধ বিপর্যস্ত হয় না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে ভীতির কারণ এবং স্বাধীন নাগরিকের সত্যকার মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের অন্তরায়, এই দুইটি দূর করিবার দায়িত্ব বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের গভর্নমেণ্ট এবং তথাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর রহিয়াছে। এই দায়িত্বটুকু প্রতিপালিত হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মন হইতে ভয় দূর হইতে বেশী সময় লাগিবে না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজ শিক্ষা, দীক্ষা এবং সংস্কৃতি—সকল দিক হইতেই উন্নত। ইহাদের প্রতিভা এবং শক্তিকে যদি তথাকার গভর্নমেণ্ট পূর্ণভাবে রাষ্ট্র এবং সমাজের সংগঠনে নিয়োগ করিতে সক্ষম হন, তবে পূর্ববঙ্গ অল্প দিনের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ প্রদেশ স্বরূপে পরিণত হইবে। এই কাজটি সম্পন্ন করিতে হইলে ইসলাম রাষ্ট্র গঠনের প্রগতিবিরোধী, অবাস্তব এবং উদ্ভট কল্পনা হইতে পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনকে সর্বপ্রথমে মুক্ত করাই আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ধর্মের মানব-সংস্কৃতিমূলক সার্বজনীন মৌলিক আদর্শই রাষ্ট্রের শাসন-নীতিতে গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু ধর্ম বিশেষের আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া আধুনিক জগতে কোন রাষ্ট্রই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে না।

লোক সংগ্রহের শক্তি

গান্ধীজীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি ছিল, কিসের বলে তিনি জনগণের মনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৩০শে জানুয়ারী সংখ্যার হরিজন পত্রে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, বিভিন্ন লোক তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন কার্য-কলাপের দিক হইতে তাঁহার উপর মহত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু একটিমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ কাজের বিচারে এইরূপ মহামানবের মহত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। মহাত্মাজীকে তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষার সারমর্ম একটি পাঠ্য পুস্তকের আকারে সুসম্বদ্ধভাবে লিখিয়া দিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাতে তাঁহার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে গান্ধীজীর এমন অসামর্থ্যের কারণ সাধকের গূঢ় অন্তর-সাধনার অন্যতম রহস্য। প্রকৃতপক্ষে অহঙ্কারের উপর ভিত্তি করিয়া অখণ্ড সত্যের একান্ত উপলব্ধিকে অভিব্যক্ত করা যায় না। কর্ম-সাধনার পথে সত্যের প্রত্যক্ষ সংবেদন-সম্পর্কে তাহা স্বতঃই উৎসারিত হইয়া থাকে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, তাঁহার জীবনই তাঁহার বাণী, এইদিক হইতে তাঁহার এই বচনের সার্থকতা রহিয়াছে। মহাত্মাজী জগতের নরনারীর মধ্যেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং ইহাদের সেবার ভিতর দিয়াই তাঁহার অন্তর মহিমা উচ্ছ্বসিত হইত। সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে তাঁহার পুণ্য প্রভাব বিস্তৃত হইত। গান্ধী-জীবন হইতে জনগণের প্রতি এই শ্রদ্ধার নীতিটি আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে আগে জনচিত্তের স্বাভাবিক সংবৃত্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়া দরকার, নহিলে শ্রদ্ধা-বুদ্ধির কোন মূল্য থাকে না। মহাত্মাজীর জীবন-সাধনায় জনগণের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধাবুদ্ধি বলিষ্ঠ ছিল। আমরা যদি সেই শ্রদ্ধাকে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারি তবে জনগণের চিত্তের উপরও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইবে। ভগবান সকলের অন্তরেই আছেন; শ্রদ্ধার স্পর্শে নরনারায়ণ সাড়া দিবেন। রাষ্ট্র-নৈতিক সাফল্য লোক-সংগ্রহের এই উদার এবং অনহঙ্কৃত কর্মসাধনার উপরই নির্ভর করে।

শিল্পীঃ কৃপাল সিং

শিল্পীঃ পূর্ণেন্দু পাল

স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু

শ্রী কালীচরণ ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]
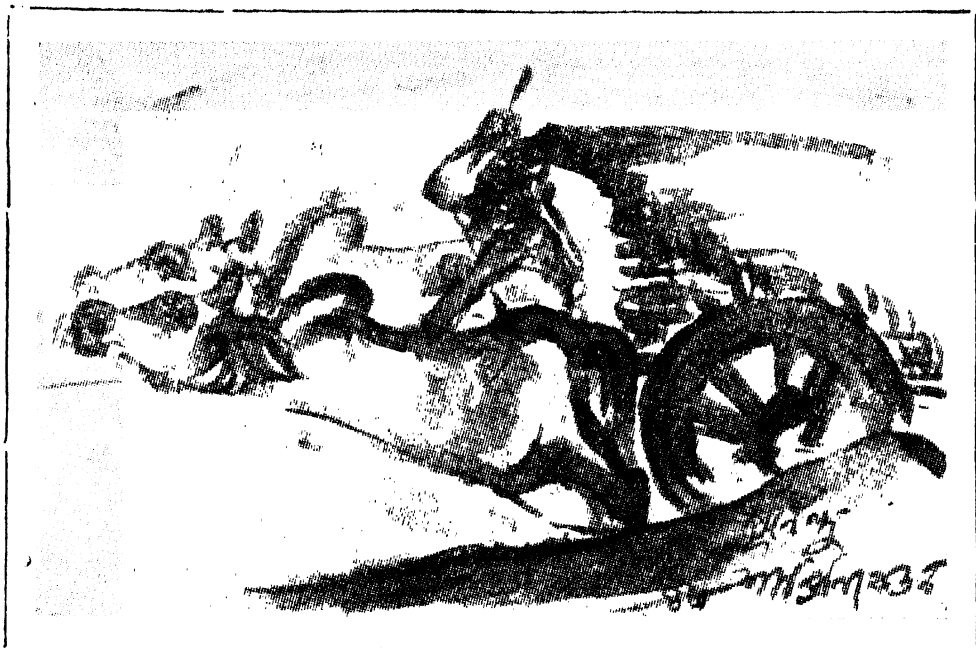
গ্রামের সহিত সম্পর্ক

জানকীনাথের কোন গুণের কথা প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। একাধারে তিনি এত গুণ ধারণ করিতেন, যাহার একটি থাকিলে লোকে যশস্বী অথবা গুণবান বলিয়া পরিচয়লাভ করিতে পারেন।

তাঁহার শৈশব কৈশোরের লীলাক্ষেত্র জন্মভূমি গ্রামের কথা কখনও ভুলেন নাই। সাধারণতঃ লোক ধনী হইলে সমাজে প্রতিষ্ঠা হইলে স্বগ্রাম, গ্রামবাসী এমন কি নিকট আত্মীয়কে আর স্বীকার করিতে চান না। এ সম্বন্ধে বহু ঘটনার আলোচনা হইয়া থাকে; অতিরিক্ত ক্ষেত্রে দরিদ্র পিতাকে বন্ধু মহলে বাটীর পরিচারক বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পরিহাস প্রচলিত আছে। সুখের বিষয় নিজ গ্রামকে স্বীকার করিবার সাহস আজকাল দেখা যায়, কিন্তু অন্য যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা গেল, তাহার সম্বন্ধে কতক উন্নতি হইলেও সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। এই প্রবৃত্তি হয়ত মানুষের স্বভাবের মধ্যে নিহিত আছে, তাহা না হইলে ইহা লঘু বা গুরুরূপে এত ব্যাপকভাবে সর্বত্র দেখা যাইত না। সেই হিসাবে মনে হয় যিনি সারাজীবন দরিদ্র গ্রাম ও গ্রামবাসী সম্বন্ধে একই মমতা ও শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি মানুষ হিসাবে অপরাপর হইতে কত মহৎ। গ্রামের যিনিই কুটির বা পুরীর বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছেন, তিনিই জানেন, তাঁহার নিকট তাঁহার সেই সমৃদ্ধি ও সম্মানের মধ্যে কোনরূপ সংকোচ ও দ্বিধা ভোগ করিতে হয় নাই। যাঁহাদের আত্মসম্মানের "বাতিক" আছে, তাঁহারা সাধারণতঃ ধনী আত্মীয় বন্ধুর বাড়ী গিয়া বাস করিতে চান না। সাধারণতঃ এই সকল স্থলে যে ব্যবহার পাওয়া যায় তাহাই সকলকে নিরুৎসাহ করে। কিন্তু জানকীনাথের আবাসে গিয়া বাস করিবার কোনও কারণ উপস্থিত হইলে মনে আনন্দের উদ্রেক হইত। তাঁহার নিকট গিয়া বাস এবং তাঁহার সঙ্গ লাভ করিবার জন্য মন উন্মুখ হইয়া উঠিত।

ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে তিনি গ্রামের লোকের সহিত যে অমায়িক ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহা যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, সত্যই তাঁহারা ভাগ্যবান। প্রতি পূজা এবং কলিকাতায় থাকিলে গ্রামের প্রতি আনন্দ উৎসবে তিনি স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হইতেন। পুরাতন কোনও বন্ধু বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পীড়া অথবা মৃত্যুর সংবাদ পাইলেও তাঁহাকে কোদালিয়াতে ছুটিয়া যাইতে হইত। পূজার সময় প্রতি বৎসরই নিজের যাওয়া চাই, সঙ্গে পত্নী প্রভাবতী এবং পুত্রদের মধ্যে যে কয়জনকে নিকটে অর্থাৎ কলিকাতায় পাওয়া যায়, সকলকে লইয়া পূজার কয়দিন কোদালিয়ায় থাকিতেন অথবা কলিকাতা হইতে যাতায়াত করিতেন। সমস্ত গ্রামে সাড়া পড়িয়া যাইত। যাঁহাদের সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল, তাঁহাদের ত কথাই নাই, যাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় নাই তাঁহারাও যেন দেবদর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইত।

এক স্থানে বসিয়া সর্ববয়সের সর্ব অবস্থার সহিত আলাপ করিতেন। অধিকাংশই গ্রামের সুখ-দুঃখের কথা, অতীত দিনের কথা, গ্রামের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের ব্যবস্থার কথা। প্রতি পরিবারের সংবাদ লওয়া তাঁর রীতি, প্রত্যেকের নাম ধরিয়া কে কি করে, কেমনভাবে তাহাদের দিন চলিতেছে, এই সকল জিজ্ঞাসা করা তাঁহার কাজ। যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ, সামাজিক মর্যাদায় শ্রেয়ঃ তাঁহাদের বাড়ী গিয়া তিনি স্বয়ং দেখা করিয়া আসিতেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা কেহ আগ্রহবশতঃ নিজে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে মৃদু ভর্ৎসনা করিতেন। তাঁহার কর্তব্য হিসাবে যখন তিনি তাঁহাদের বাড়ী যাওয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তখন আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার প্রৌঢ় বয়সেও গ্রামের যাঁহারা তাঁহার প্রণম্য ছিলেন, তিনি জাতিনির্বিশেষে সকলের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেন। অহংকার, জাত্যাভিমান, পদমর্যাদা তাঁহাকে এইভাবে পূজনীয় ব্যক্তিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত করে নাই।

গ্রামের সমস্ত সৎকার্যে তাঁহার দান ছিল; সত্য কথা বলিতে কি সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানত তাঁহার দানেই সঞ্জীবিত ছিল। পথ নির্মাণ, পুষ্করিণী, গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, বারোয়ারী পূজা, দরিদ্র ভাণ্ডার, লাইব্রেরী পাঠশালা ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে বিলি ব্যবস্থা, সবারই মূলে জানকীনাথ। লাইব্রেরীর পাকা ইমারত তাঁহারই দানে নির্মিত। শেষ পর্যন্ত গ্রামের "কামিনী ঔষধালয়" নামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইলে জানকীনাথ মধ্যম পুত্র শরৎচন্দ্রের উপর সেই ভার ন্যস্ত করেন। বলা বাহুল্য, পিতৃভক্ত সন্তান, দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির নামে কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া ঔষধালয় স্থাপিত করিয়া দেন।

লাইব্রেরীর নামকরণ লইয়া জানকীনাথের আর এক মধুর ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান লাইব্রেরী গৃহ নির্মিত হইবার পূর্বে এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় যে লাইব্রেরী ছিল, তাহার নাম "বীণাপাণি লাইব্রেরী"। তাহার পর জানকীনাথের বদান্যতায় গৃহ নির্মিত হইলে পুস্তকাদি উহাতে স্থানান্তর করা হয়। তখন যাঁহারা জানকীনাথের নিকট গিয়া লাইব্রেরী গৃহ নির্মাণের কথা বলিয়াছিলেন তাঁহারা, তাঁহাদের নিজেদেরও মনে হইয়াছিল, গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে উহা জানকীনাথের পিতৃদেবের নামানুসারে "হরনাথ লাইব্রেরী" নামকরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ লইবেন। জানকীনাথকে বলিতে তিনি ইহাতে তাঁহার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মত যখন একটি পুরাতন লাইব্রেরী আছে এবং সেই নামেই চলিয়া আসিতেছে, তখন আর নূতন নামের প্রয়োজন নাই। কিন্তু "বীণাপাণি" কোনও লোকের নাম নয় এবং যিনি দান করিতেছেন, গ্রামবাসী তাঁহার পিতার নাম স্মরণ করিয়া হরনাথ লাইব্রেরী নামকরণ যখন করিতে চান, তখন জানকীনাথের কোনও আপত্তি করা উচিৎ নহে। তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ নম্রতাবশতঃ ইহাতে সম্মত হইলেন।

সেইভাবে প্রস্তরফলক লিখিত হইবার প্রস্তাব হইলে, প্রস্তরে লিখিত ভাষা প্রভৃতির আলোচনা সম্পর্কে লাইব্রেরী কমিটির সভা আহূত হইল। তখন দেখা গেল কয়েকজন নূতন নামে আপত্তি জানাইলেন। লাইব্রেরী গৃহনির্মাণকালে যখন পল্লীতে এই নাম পরিবর্তনের আলোচনা হইয়াছে, তখন এ আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। তাঁহারা "বীণাপাণি" নাম রাখিবার জন্য ভীষণ জেদ ধরিলেন অথচ দাতার পিতার নামের সহিত সংযুক্ত হইবে বলিয়া জানকীনাথকে পুনঃপুনঃ বলিয়া আসা হইতেছে। যে মীমাংসা হইল, তাহা যেমন হাস্যোদ্দীপক তেমনই কৃতজ্ঞতালেশহীন। নাম স্থির হইল "হরনাথ - বীণাপাণি লাইব্রেরী"। জানকীনাথ শুনিয়া একটু মৃদু হাস্য করিলেন এবং বলিলেন যে, গ্রামে রমানাথ সরস্বতী (তাঁহার মসনী পুত্র) বলিলে লোক কাহার কথা হইতেছে বুঝিতে পারে। কিন্তু হরনাথ বীণাপাণি বলিলে একটী অদ্ভুত নাম সৃষ্টি হইবে যাহার কোনও অর্থ হয় না। তাহা অপেক্ষা কেবল বীণাপাণি নাম থাকিয়া যাক। কিন্তু যাঁহারা ভিত পত্তনের পূর্ব হইতেই পুত্রের কল্যাণে যাঁহার নাম গ্রামের স্মরণীয় লোকদের পর্যায়ে স্থান দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিলেন যে, কালক্রমে লোকে হরনাথ লাইব্রেরী বলিবে হরনাথের সহিত বীণাপাণির যোগ এই উদ্ভট কল্পনা ধীরে ধীরে লোপ পাইবে। যখন ইহাই স্থির হইল, জানকীনাথকে সকল ঘটনা বলিলে তিনি গ্রামবাসীর কৃতজ্ঞতার কি বিচার করিলেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন না, কেবল বলিলেন যে, যখন তুচ্ছনাম লইয়া লাইব্রেরীর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তখন যাহাতে এক সঙ্গে কাজ করিবার সুযোগ হয়, সেইরূপই করা যুক্তিযুক্ত। তিনি একবারও উল্লেখ করেন নাই যে হরনাথের নাম না থাকিলে তিনি ঐ গৃহে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হইতে দিবেন না। এ সদাশয়তা কতজনের আছে তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

গ্রামের দরিদ্র ভাণ্ডারকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি মাসিক যে টাকা বৎসরের পর বৎসর দান করিয়াছেন, তাহা দান পরায়ণ কোটীপতির পক্ষেই সম্ভব; তাঁহার মত মধ্যবিত্ত অবস্থার বহু সন্তানের পিতা, বহু লোকের পালকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি ধনে যত বড় ছিলেন, মনে তাহা অপেক্ষা শতগুণে সমৃদ্ধ ছিলেন। ইহারই প্রেরণায় তিনি সাধ্যাতিরিক্ত দান করিয়া গিয়াছেন। যখন কৃতী পুত্রেরা পিতাকে উপার্জনের ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য জেদ করিলেন, তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন সত্য, কিন্তু সমস্ত মাসে কিছু কাজ করিতেন, যাহার আয়ে তাঁহার মাসিক দানের ব্যয় সংকুলান হইয়া যাইত। তাঁহার ধারণা দানের অর্থ নিজ কায়িক উপার্জন হইতে সংগ্রহ করিতে হয়; অপরের, পুত্র হইলেও উপার্জন এই কার্যে ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহার পুত্রেরা বিশেষত মধ্যম পুত্র যখন ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত দানের ক্ষেত্র আপনার উপার্জনে ভার লইলেন তিনি ধীরে ধীরে আপনাকে তথা হইতে অপসারণ করিয়া লইতে লাগিলেন।

তাঁহার দানের রীতি সাধারণ হইতে কিছু ভিন্ন ছিল। তাঁহার পরিবারের অনেকেই তাহা টের পাইতেন না, অনেক সময় দান গ্রহীতা বুঝিতে পারিতেন না নিয়মিত সাহায্যের মূল উৎস কোথায়। যে সকল ছাত্রা নিয়মিত মাসিক সাহায্য পাইত তিনি তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন দিন এবং দিনের মধ্যে বিভিন্ন সময় নির্ধারিত করিয়া দিতেন।

তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, যে সাহায্য পায় তাহার দান গ্রহণ অপরে জানিলে সে লজ্জায় পড়ে। কত ছাত্র এক কালে সাহায্য পাইত, তাহা, কাহারও জানা ছিল না।

তাঁহার কথা ছিল, যাহারা প্রকাশ্য ভিক্ষা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা দরিদ্র ভদ্র পরিবার যাহারা নিজেদের অভাবের কথা কাহাকেও মুখ ফুটিয়া জানাইতে পারে না, তাহাদের দুর্দশা অনেক বেশী। সেইজন্য গ্রামে দানের ব্যাপারে তাঁহার নির্দেশ ছিল, যে যদি কোনও পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু বা উপার্জনক্ষমতা হীন হইয়া পড়ে এবং সংসারে অপর আয় না থাকে, তাহা হইলে জানকীনাথের চরস্বরূপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অভাবের পরিমাণ জানিতে হইবে এবং অসহায় পরিবার সাহায্যের আবেদন জানাইবার পূর্বে দান পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

দান এমনভাবে করার নির্দেশ ছিল, যাহাতে গ্রহীতা যেন দাতার নাম জানিতে না পারেন; জিজ্ঞাসা করিলে দরিদ্র ভাণ্ডারের নাম করিবার আদেশ ছিল। তিনি বলিতেন, যাহারা দাতার নাম প্রকাশ না করিয়া সাহায্য পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে, সেইই প্রকৃত কর্মী।

পূজার পূর্বে তিনি বহু নূতন কাপড় পৌঁছাইয়া দিতেন, যাহাতে অভাবগ্রস্থ লোকও ইচ্ছা করিলে পূজার সময় নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে পারে। কোনও কোনও পরিবারের সমস্ত বর্ষের বস্ত্র তিনি যোগাইতেন। পূজার সময় তিনি নিজে কতগুলি কাপড় সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহার ধারণা যাঁহারা পল্লীর কর্মীদের নিকট নিজের অভাবের কথা জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে, তাঁহার নিকট তাঁহারা অকপটে তাঁহাদের বেদনা নিবেদন করিবেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া যে পুত্র নিকটে উপবিষ্ট থাকিতেন, তাঁহার হাত দিয়া কাপড় কখনও কখনও অর্থ দান করাইতেন। লোকের দুঃখ কষ্ট শুনিবার কি অপরিসীম ধৈর্য তাঁহার ছিল তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন।

দরিদ্রের যে মর্যাদাজ্ঞান আছে এবং পূর্ব অবস্থা স্বচ্ছল থাকিলে অভাবের অবস্থায় যে তাহা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে ইহা তিনি যেমন বুঝিতেন অপরে তাহা বুঝিতেন না; এমন কি তাঁহার পরিবারের মধ্যেও ঠিক এই সমবেদনা অনুভূতি আছে কি না তাহা বলা যায় না। তাঁহার সামাজিক ক্রিয়াকর্ম গ্রামে গিয়া করিতে পারিলে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। সতীশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র উভয়ের বিবাহ একই সঙ্গে দিয়া তিনি গ্রামে গিয়া পাকস্পর্শ বা "বৌ-ভাত" ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কলিকাতায় ক্রিয়াকর্মে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে পত্র বা নিকট আত্মীয় কাহাকেও পাঠাইয়া দিয়া নিমন্ত্রণ করা তাঁহার রীতি ছিল। সাধারণত তাঁহার বাড়ীর কাজে বহু লোক নিমন্ত্রিত হইতেন এবং তাহার অধিকাংশই সমৃদ্ধ পরিবারের লোক হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি একথা স্মরণ করিতেন, তাঁহার অপরাপর নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার দরিদ্র গ্রামবাসীরা অস্বস্তি বোধ করিবে। ইহার প্রতি বিধানের জন্য সকলকে যতদূর সম্ভব নিজে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেন, কিন্তু গ্রামের লোকদের জন্য তিনি নিজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া রাখিতেন। এ কার্যের ভার তিনি কাহারও উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। সর্বদাই তাঁহার চিন্তা থাকিত, কেহ যদি যথাযোগ্য, অর্থাৎ তাহার গ্রামের লোকদের যে সম্মান প্রাপ্য, তাহা দিতে কৃপণতা করে। কলিকাতায় এলগিন রোডের বাড়ীর নিমন্ত্রণ পাইলে সকলকে হাজির হইতেই হইবে। ইহা প্রাণের টান। তিনি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, প্রত্যেকের বাড়ীর সংবাদ; আবার কেহ না আসিলে, সেইখানেই অপরের নিকট না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, আবার অনুপস্থিত ব্যক্তির সহিত ভবিষ্যতে সাক্ষাৎ মাত্রেই অনুপস্থিত হওয়ার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। প্রাণ ঢালিয়া এত অন্তরঙ্গতা দেখা যায় না।

পূজার সময় তাঁহার বাড়ীতে অষ্টমী বা নবমী তিথিতে মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা আছে। প্রায় প্রতি বৎসরই মধ্যাহ্ন গড়াইয়া যাইত, বিকাল বেলা "পাতা পড়িত"। জানকীনাথ নিজে উপস্থিত, এই বিলম্বে তিনি অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করিতেন। কিন্তু এই আয়োজনের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদুনাথের উপর। যদুনাথ এ বিষয়ে বিশেষ অনবহিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নিকট অনুরোধ করিয়া অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই; তাঁহার নিজের স্বভাব এত নম্র যে জ্যেষ্ঠের প্রাণে ব্যথা দিয়া তিনি এই ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই।

আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বিলম্ব আছে জানিয়াও মধ্যাহ্নের পূর্বেই আসিতেন; তাঁহাদের পরিতৃপ্তির অন্য ব্যবস্থা ছিল। জানকীনাথ স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া অথবা সামান্য ফল ও মিষ্ট আহার করিয়া এই সকল ব্রাহ্মণদিগের সহিত বসিয়া আলাপ করিতেন। তাঁহার ভাষায়, কথা বলার ভঙ্গীতে, প্রতি আচরণে এমন মোহিনী শক্তি ছিল, যাহাতে লোক ক্ষুধা ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহা শুনিতেন। মাঝে মাঝে বাড়ীর মধ্যে তাগিদ পাঠাইতেন; কিন্তু তিনি জানিতেন "বড় দাদার" ইহাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। অত্যন্ত অশোভন অবস্থার মধ্যে তাঁহার কথাবার্তা, আদর আপ্যায়ন একটি শান্তি স্বর্গীয় ভাব সৃষ্টি করিত।

তাঁহার সামাজিকতা সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যায়, মনে হয়, ততই অমৃতের উদ্ধার হইবে বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। কাহাকেও সম্মান দান করিবার সময়ও তিনি এমন কথাবার্তা বলিতেন যেন সেই কাজ সম্পাদিত হইলে তিনি কৃতকৃতার্থ হন।

কলিকাতার বাড়ীতে (বর্তমানে নেতাজী ভবন) গ্রাম হইতে দুপুরের পূর্বে কেহ আসিলে বা গ্রামের প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য আসিতে বলিলে, সঙ্গে সঙ্গে আহারের জন্য অনুরোধ করিতেন। এখানে "বড় লোকের" বাড়ী বলিয়া না খাইবার চেষ্টা সফল হইত না। সঙ্গে বসিয়া গল্প করিবেন, আহারের আসন একই স্থানে পাতা হইবে, একই সঙ্গে আহারাদি হইবে। যদি কেহ এড়াইবার জন্য বা সত্যই অন্য কোনও স্থানে কার্য ব্যপদেশে যাইবার কথা বলিতেন, তিনি আহারের সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার অনুরোধ করিতেন। আগন্তুক বাটীর বাহির হইয়া যাইবার সময় সদর দরজা পর্যন্ত সঙ্গে আসিতেন, স্নেহের পাত্র হইলে তাহার কাঁধে একখানি হাত রাখিয়া চলিতেন, দরজার নিকট বিদায় দিবার সময় বলিয়া দিতেন, ফিরিতে যেন অন্যথা না হয়, তিনি নিজে তাহার আসিবার অপেক্ষায় না খাইয়া বসিয়া থাকিবেন। এমন মনের শক্তিসম্পন্ন বা "বড় লোকের" প্রতি বিদ্বেষসম্পন্ন বা আশঙ্কান্বিত ব্যক্তি দেখি নাই, যিনি এই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন।

ইহা ছিল তাঁহার আপ্যায়নের নিয়ম। অনেক স্থানে সাধারণভাবে কেবল বেলায় আসার জন্য খাইবার অনুরোধ হইয়া থাকে, কিন্তু এ আন্তরিকতা অন্যত্র। ইহার অজ্ঞাতে অত্য ক্রুর স্বভাবও বশীভূত হইতে বাধ্য। প্রেম দিয়া বশীভূত করা তাঁহার স্বভাবসি ভগবদ্দত্ত শক্তি, আবার প্রেম দিয়া শিক্ষাদান তাঁহ এক বিশেষ গুণ ছিল। গ্রামের ফেলারাম (কল্পিত নাম) কিশোর অবস্থা হইতে তিনি পুত্রে ন্যায় স্নেহদান করিয়া আসিয়াছেন। ফেলারাম যুব হইলে তিনি তাহাকে সেই স্নেহ হইতে বঞ্চিত করে নাই; উপরন্তু তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে শেষ পর্যন্ত এমন হইয়াছিল যে, তিনি বলিতে যে, ফেলারামকে তিনি শরৎ সুভাষ হইতে ভি বলিয়া কখনও মনে করেন না। সেই সমাদর দি পাড়ার ছেলেকে আত্মীয় হইতে আপনার করি চিরকাল বাঁধিয়া রাখা কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভ হইয়াছিল।

ফেলারাম এক সময় (১৯৩০) কলিকাত দক্ষিণ অঞ্চলে এক বাসায় থাকাকালীন সেখা হইতে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর শুভবিবাহের আয়োজ করা হয়। সামাজিক নিয়মে জানকীনাথের বাড়ীতে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসা হয় এবং সেই সময় জানকীনাথ কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকায় জ্যে পুত্র সতীশচন্দ্রের নামে নিমন্ত্রণ পত্র রাখিয়া আ হয়। সতীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র আসিবে ইহা একরূপ সুনিশ্চিত। পাত্রীর বাড়ীর আয়োজ চলিতেছে আর ফেলারাম ও তাহার অগ্রজরা বাসা সম্মুখে একটু খোলা জায়গায় বসিয়া আছে বেলা ৪টার সময় বাসার সামনে মোটর আসিয় থামাতে সকলেই একটু বিস্মিত হইল। কারণ এ সময়ে মোটরে কাহারও আসার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। ফেলারাম ও ভ্রাতারা নির্বাক বিস্ময়ে দেখিল স্বয়ং জানকীনাথ কপট গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয় মোটর হইতে অবতরণ করিয়া উঠানের দিকে আসিতেছেন। সকলে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদ ধূলি গ্রহণ করাতে তিনি দুই বাহু বিস্তার করিয় সকলকে বক্ষে ধারণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন যে, তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন নাই। কারণ তাঁহার তো নিমন্ত্রণ হয় নাই নিমন্ত্রণ হইয়াছে সতীশের। সুতরাং সতীশের ও তাহার বয়োকনিষ্ঠদের নিমন্ত্রণে আসা সম্ভব করা হইয়াছে। তিনি ফেলারামকে অনেক দিন দেখেন নাই; সেই দিনই কটক হইতে ফিরিয়াছেন এবং ফেলারাম ও তাহার ভ্রাতাদের ও তাহাদের সকলের সন্তানসন্ততি জামাতা কুটুম্বদের মঙ্গল সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। ফেলারাম প্রভৃতি বলিল যে, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার যোগ্যতা তাহার বা তাহার দাদাদের নাই। তাহাদের পিতা ঠাকুর জীবিত থাকিলে তবে জানকীনাথের মতন লোককে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করা সম্ভব।

জানকীনাথ হাসিয়া বলিলেন যে, চালাক ছেলেরা এইভাবে নিজেদের দোষ ঢাকিতে চায়, তাহা কখনই সম্ভব নয়। তিনি যখন জীবিত, পত্রে তাঁহার নাম লেখা থাকিবে, তিনি কলিকাতায় থাকুন বা নাই-ই থাকুন। তিনি যখন সতীশ শরৎ সকলের পিতা, সামাজিক কাজে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাঁহার নামে পত্র থাকিলে সেই পত্রের বলে ছেলেরা আসিতে পারিবে। বিশেষতঃ ফেলারামের বাড়ী না আসিলে চলিতেই পারে না। ফেলারাম ও ভ্রাতারা কৃতজ্ঞতায় বিমূঢ় হইয়া রহিল; চক্ষে জলধারা নামিল।

জানকীনাথ বলিলেন, তিনি কটক হইতে সকালে আসিয়া বিকালে নীচে নামিয়া সতীশচন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করিলে খামের উপর লাল অক্ষরে "শুভ-বিবাহ" দেখিয়া খামখানি লইয়া পত্র পড়িলেন। তাহাতে ফেলারামের এক অগ্রজের নাম ও ফেলারামের ঠিকানা পাইয়া বুঝিলেন, বোকা ছেলেদের শিক্ষা দিবার খুব সুযোগ হইয়াছে। তাহাতে তিনি গাড়ী লইয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

বিকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া কত আলাপ করিলেন। আয়োজন সামান্য, কিন্তু গ্রামের বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত পুরুষ প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন। জানকীনাথকে দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দ ধরে না; জানকীনাথও তাঁহাদের এক একজনকে ধরিয়া কুশলাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি গ্রামের লোকেদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশায় রবাহূত হইয়া সেখানে আসিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। হাসির রোল উঠে, আর ফেলারাম ও ভ্রাতারা অত্যন্ত গৌরব বোধ করিলেও নিজেদের ভুলে মনে মনে অনুতাপ বোধ করিতে লাগিল।

সকল দিক বিচার করিলে বলিতে হয়, এই অবস্থায় আসা এবং সকলকে লইয়া চার ঘণ্টাকাল আলাপ পরিচয় জমাইয়া বরবধূকে আশীর্বাদ করিয়া প্রত্যাবর্তন করা এক জানকীনাথ ব্যতিরেকে কাহারও দ্বারা সম্ভব ছিল না।

ভগবানে বিশ্বাস

যাঁহারা জানকীনাথকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার হৃদয় ভগবৎ প্রেমে ভরপুর হইয়া আছে। তাঁহার কোনও কথায়, কোনও কাজে অহমিকা ছিল না। তাঁহার আবাস, তাঁহার ক্রিয়া-কর্ম কখনই তিনি নিজের নামে করিতেন না। "তোমাদের পূজো", "তোমাদের কাজ" প্রভৃতি বলিয়া নিজেকে মুক্ত রাখিতেন। সুভাষ যখন সিভিল সার্ভিস পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করে, তখন জানকীনাথ কটকে। গ্রামের একটি যুবক সেই সময় কটকে বেড়াইতে গিয়াছিল; সুভাষচন্দ্রের সহিত ইহার পরিচয় ছিল; তাহাকে সংবাদটা দিবার কালে বলিলেন, "তোমাদের সুভাষ চাকরি ছাড়িতেছে।" তাঁহার সমস্ত জীবনই পরার্থে নিয়োগ করিয়াছেন; সমস্ত কাজই যেন তিনি পরের প্রতিনিধি হইয়া সুসম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার নিজের বলিতে যৎসামান্য প্রয়োজন। ধনের অধিকারী হইয়াও তাঁহার কালাপাড় ধুতি ও হাত-বন্ধ সাদা টুইল সার্ট এবং প্রয়োজন হইলে একটা এণ্ডি কোট—ইহাই তাঁহার পোষাকের সর্বস্ব।

বাড়ীতে বিগ্রহ, পুরীর বাড়ী "জগন্নাথ ধাম" দেশে দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি পূজা। চাল-চলন সাধারণ সম্ভ্রান্ত ঘরে যাহা হয়, তাহা অপেক্ষা একটুও বেশী নয়। জীবনে তিনি গীতার উপদেশ পালন করিয়া গিয়াছেন। ধর্মের উপদেশ দিয়া যাঁহারা তাঁহাকে শিষ্য বা ভক্ত পর্যায়ভুক্ত করিতে তৎপর, তাঁহারা বুঝেন নাই, জানকীনাথের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি কোন্ স্তরে বর্তমান। তিনি শাক্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সে দিনে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বংশে এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যাইত না। বৈষ্ণববংশে মৎস্য মাংসাদি আহার করিতে দেখা যায়; সেইভাবে কোনও শাক্ত হয়ত নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী। বৈষ্ণবে দুর্গা প্রণাম, প্রতিমাদি দর্শন অঞ্জলি প্রদান করিতে এবং শাক্তে হরিনাম করিতে বা মালসাভোগ গ্রহণে আপত্তি সকল তিরোহিত হইয়াছিল। তাঁহার কুলগুরুবংশ শক্তিমন্ত্র দান করেন বা করিতেন এবং তাঁহারা মাহিনগরের অধিবাসী। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, জানকীনাথ কৈশোরেই তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবের মধ্যে পড়েন এবং ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেনের ছাত্র ও পরে এ্যালবার্ট কলেজে সহকর্মী হিসাবে এবং ক্রমশঃ স্বয়ং ব্রহ্মানন্দের বক্তৃতাদির প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ব্রহ্মানন্দের ছবি তাঁহার বসিবার ঘর অলংকৃত করিয়া থাকিত।

কিন্তু তাই বলিয়া তিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মতে বিশ্বাসী ছিলেন না তাহা নহে। তিনি যে মতের মধ্যেই পড়িয়া থাকুন, মানুষ যে সর্বধর্ম মত একই হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মতবাদ অপেক্ষা অনেক বড় তাহা তিনি সর্বদাই স্মরণে রাখিতেন এবং নিজ জীবনে তাহা পালন করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পরে তাঁহাকে আবার পাবনার সংসঙ্গী দল আশ্রমে লইয়া যান এবং পরে জানকীনাথ যে তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা প্রচার করিয়াছেন। জানকীনাথের কাছে এ বিচার অতি তুচ্ছ। তিনি পূজার সময় বাড়ী গিয়া প্রাঙ্গনের একধারে নিজে জুতা খুলিয়া ফেলিতেন; তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা যাইতেন, তাঁহারা তাঁহার কার্যের অনুকরণ করিত। প্রতিমার সম্মুখে আভূমি প্রমাণ প্রণাম সারিয়া তিনি যোড়করে নিমীলিত নেত্রে বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন; অনেক সময় তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িত।" তাঁহার অন্তরঙ্গ যাঁহারা তাঁহারা জানিতেন তিনি দুঃখতাপহারিণী জগন্মাতার কাছে পল্লীর সর্বরকম মঙ্গল কামনা করিতেছেন; জগতের শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করিতেছেন, জন্মগ্রহণ করিয়া যে ভার স্কন্ধে লইয়াছেন সেই ভার বহিবার শক্তি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বর্তমান থাকে। আরতির সময় সমস্তক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আলো ও ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে মাতৃমূর্তি মুখে কত ভাব প্রকাশ করে, তাহা তন্ময় হইয়া লক্ষ্য করিতেন। প্রতিমা ও আরতি দর্শনে সুভাষ সঙ্গে থাকিলে সর্বরকমে সে পিতার অনুকরণ করিত, এমনও হইয়াছে উঠানে সকলেই প্রণামান্তর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু সুভাষের প্রণাম তখনও শেষ হয় নাই। পিতাপুত্রে যোড়করে মুদ্রিতনেত্রে যখন প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সে যে কি দৃশ্য তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন সার্থক হইয়া গিয়াছে।

পূজা প্রভৃতি তাঁহার বহিরাবরণ মাত্র; অন্তর তাঁহার জগতের সেবায় বহুরূপে মানবের সম্মুখে যে দেবতা বিরাজ করিতেছে, তাঁহার পূজা, তাঁহার সেবা তিনি আমরণ করিয়াছেন। তিনি জীবে প্রেম করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিয়াছেন। শাক্ত, ব্রাহ্ম, সৎসঙ্গ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মত ও পথ তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার বস্তু হইতে পারে, কিন্তু নিত্য মুক্ত পুরুষ তাঁহার নিকট ইহারা সহায়ক বটে, কিন্তু শেষ গতি নয়।

নিঃশত্রু পুরুষ

আদর্শ পুরুষের জীবন যাপন করিয়া তিনি নিজেকে যে অবস্থায় উন্নীত করিয়াছিলেন, তাহা অভূতপূর্ব। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, মিথ্যা লোভ প্রভৃতি দোষ নিজ চেষ্টায় বশীভূত করা সম্ভব; কিন্তু জগতে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জনসাধারণের কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া নিঃশত্রু থাকা সম্ভব নহে। জানকীনাথের প্রকাশ্য শত্রু থাকা সম্ভব নহে, কারণ বৈরীর মন জয় করিবার প্রথা তাঁহার অভিনব। কটকে যখন তিনি ব্যবহারজীবী সমাজে দীপ্তসূর্য, তখন তাঁহার প্রতি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবীণতর লোকের মধ্যে স্বাভাবিক ধর্মে দুই একজন ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই সহৃদয় ব্যবহারে তাঁহাদের মন জয় করিতেন; তাহাতেও না হইলে বিরোধের পরিবর্তে যথাসাধ্য উপকার করিয়া চলিতেন। একজন প্রতিষ্ঠাবান এবং প্রবীণ উকিল জানকীনাথের উপর অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। তিনি কেঁওঝর নৃপতির নিকট হইতে ষাট হাজার টাকা কর্জস্বরূপ গ্রহণ করেন। পরে রাজা গদিচ্যুত হইলে গভর্নমেণ্ট একজন ইংরাজকে কমিশনার নির্বাচন করেন। ঘটনাচক্রে এই ইংরাজটি জানকীনাথের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

ভার লইয়াই নূতন কর্মকর্তা দেখিলেন, হিসাবে পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের নামে ষাট হাজার টাকা ঋণস্বরূপ খরচ লেখা আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই টাকা অনতিবিলম্বে তহবিলে জমা দিবার জন্য জোর তাগিদ দিয়া পত্র দিলেন। ভদ্রলোকটি প্রমাদ গণিলেন। মামলা, মোকদ্দমা এমনকি লোক জানাজানি হইলেও তাঁহার সম্মানের যথেষ্ট হানি হইবে। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার কল্পিত শত্রু জানকীনাথের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ইংরাজ বন্ধু কমিশনারকে বলিয়া অন্তত ছয় মাস সময় দিবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিলেন। জানকীনাথ তাঁহার "বন্ধুর" নিকট যে ব্যবহার পাইতেন, তাহাতে এ বিষয়ে উপেক্ষা করিলে কোনও দোষ হইত না। কিন্তু তাঁহার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, অথচ অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা, তাহাই সংসাধিত হইল। জানকীনাথ গিয়া কমিশনার সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাহেব সেই সময় দিলেন এবং অনুরোধের অর্থ যে কি কথার ভাবে তাহাও বুঝাইয়া দিলেন, যে জানকীনাথ এই টাকার জন্য প্রকারান্তরে দায়ী হইয়া পড়িতেছেন। জানকীনাথ যে এই অনুরোধের অর্থ নিজে বুঝিতেন না তাহা নহে, তিনি তৎসত্ত্বেও তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে লোক তাঁহার জন্য এই বিপদ বরণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ছয় মাস গেল, টাকার পরিবর্তে আরও তিন মাস টাকা দেওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার অনুরোধ আসিল। আশ্চর্যের বিষয় আবার তিন মাস সময় পাওয়া গেল এবং ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করা হইল। তাহার পর অপর পক্ষ হইতে যে ব্যবহার পাওয়া গেল, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল যে, জানকীনাথের হিসাব ভুল হয় নাই; তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শত্রুর হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

তাঁহার মত সর্বগুণান্বিত ব্যক্তির সম্মুখে নিন্দা করিতে অনেকের কুণ্ঠা থাকিতে পারে, কিন্তু এমন মানুষ কেহ কি জন্মিয়াছে যাহার অসাক্ষাতে কেহ কখনও নিন্দা বিদ্রূপ করে নাই। জানকীনাথ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁহার শত্রু ছিল না, অসাক্ষাতেও তাঁহার কার্যের বিরূপ সমালোচনা করিবার লোক দেখিতে পাওয়া যাইত না। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার দেশবরেণ্য পুত্রদিগের কেহ কেহ বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠিয়াছেন, শত্রুতা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে কটূক্তি করিতেও পশ্চাদপদ হন নাই, কিন্তু তাঁহারাও জানকীনাথের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে অতি শ্রদ্ধা সহকারে সেই নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই নিঃশত্রু থাকিয়া বা থাকিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

নিষ্কাম পুরুষ জানকীনাথ যথাকালে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে
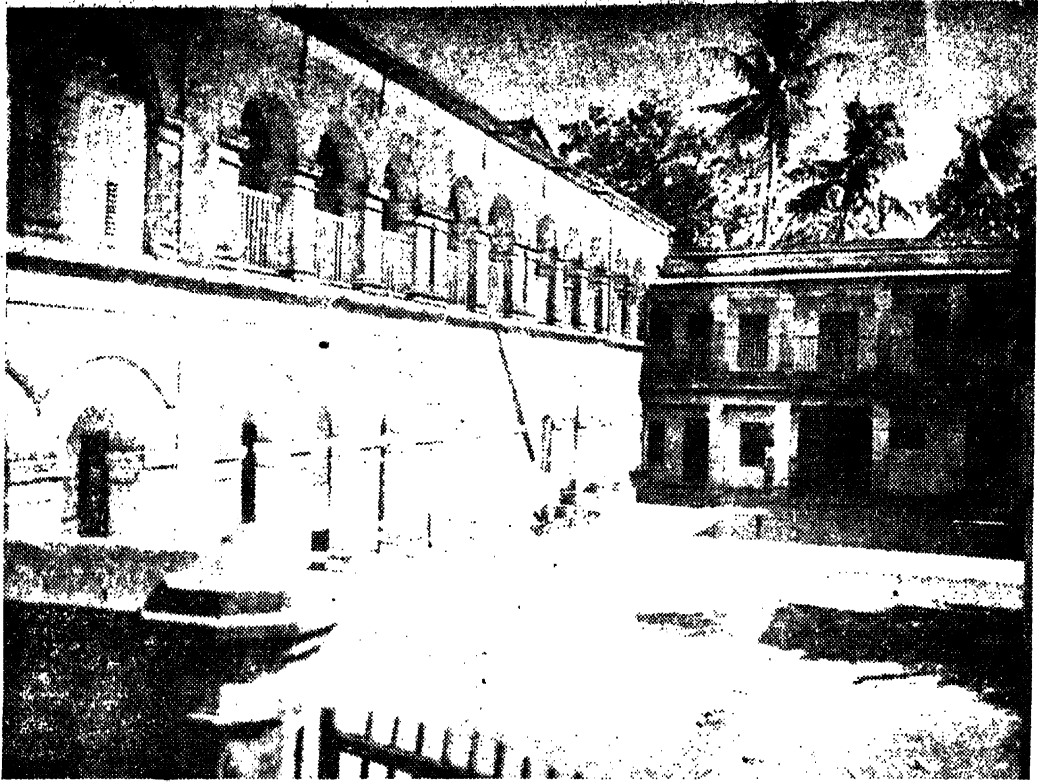
স্বগীয় জানকীনাথ বসুর কটকস্থ বাসভবন—তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এই ভবনটি দান করিয়াছেন।

উড়িষ্যাবাসী বিশেষত উড়িষ্যার করদ রাজণ্যবর্গের মধ্যে দু তিনজন তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোনও কাজ করিতে সাহস করিতেন না। তাহাতেই মাঝে মাঝে তাঁহাকে কটকে বা পুরীতে যাইতে হইত। ক্রমশ তাহাও ত্যাগ করিলেন। দীর্ঘজীবনের যে অসুবিধা তাহা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়া পুত্র, একাধিক কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র প্রভৃতি বিয়োগের ব্যথা সহ্য করিতে হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের গৌরব বৃদ্ধির সহিত বারে বারে কারাবরণ করিতে হইয়াছে। ইহাতে তিনি যে পুত্রগৌরব অনুভব করিতেন, তাহা সুভাষচন্দ্রের প্রথম কারাবাসের আদেশ শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে তিনি সুভাষকে লইয়া গৌরব অনুভব করেন। কিন্তু সুভাষ জেলে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, বারে বারে তাহার জীবন বিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে কালযাপন করিতে হইয়াছে। তাঁহার জীবিত কালেই শরৎচন্দ্রকে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে; সুভাষচন্দ্রও তখন অবরুদ্ধ। এ সকল ক্লেশ তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু কেহ তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখেন নাই। স্মিতহাস্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই; হাস্যরসের অবতারণা হইলে তিনি তাহার অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। গাম্ভীর্যের সহিত এ বিষয়ে তিনি এক মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তাঁহার মনে শক্তি অটুট ছিল। ১৯৩০ সালে তিনি গভর্নমেণ্টের অত্যাচারের প্রতিবাদে "রায় বাহাদুর" উপাধি পরিত্যাগ করেন। এ উপাধি দিয়া জানকীনাথের কোনও পরিচয় হয় নাই, তিনি ইহা ব্যবহার করিয়া নিজেকে সম্মানিত মনে করেন নাই। সরকারী মহলে কাগজপত্রে রায় বাহাদুর খেতাব লিখিত বা মুদ্রিত হইত, কিন্তু তাহা ছাড়া ইহার অবস্থিতি কাহারও স্মরণে থাকিত না। তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" করিয়া গভর্নমেণ্ট রায় বাহাদুর খেতাবের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাঁহার কোনও মর্যাদা বৃদ্ধি হয় নাই। বাস্তবিকই তিনি অন্তরের বিভূতিতে সমৃদ্ধ, যাঁহার সমস্ত কর্ম ও কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই সকল উপাধির কোনও অর্থই ছিল না।

জীবনের শেষদিকে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না, সুতরাং তিনি কলিকাতার বাহিরে বেশী যাইতেন না। সেখানে বসিয়াও গ্রামের পূজা ও দরিদ্র পোষ্যদিগের সমস্ত সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লইয়া আনন্দ লাভ করিতেন। ১৯৩৪ সালের শেষদিকে দেহ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল এবং তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। সুভাষ তখনও নির্বাসন দণ্ড ভোগ করিতেছে। তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া একবার শেষ দেখা করাইবার চেষ্টা হইল, কিন্তু সম্ভব হইল না। সুভাষ যেদিন আসিয়া পৌঁছিল, তৎপূর্বদিন (ডিসেম্বর ৩রা) মহামানব ইহজগতের লীলা শেষ করিয়া সাধনোচিতধামে চলিয়া গিয়াছেন।

জানকীনাথের তিরোধানের পর একটি কথা বারে বারে স্মরণ হয়। বাস্তবিকই এই শ্রেণীর লোক জগতের অলঙ্কারস্বরূপ এবং ইঁহাদের স্থান আর পূর্ণ হইতেছে না। জগতে বহু মহৎ কাজ করিয়াও তিনি "অজ্ঞাতবাস" করিয়া গিয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে যতটুকু পরিচয় নিতান্ত প্রয়োজন, তাহার অধিক পরিচয় তিনি কখনও দেন নাই। যে সকল মহাপুরুষ মানবের সেবাকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সমসাময়িক জগতে জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষের দুঃখমোচনকে জীবন ব্রত হিসাবে পালন করিয়াছেন, যাঁহারা নিরক্ষরকে শিক্ষাদান, পাপাচারীর মধ্যে ধর্মভাব সৃষ্টি, মানুষকে ধর্মে, কর্মে, জীবনের নানাক্ষেত্রে উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে লইয়া গিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন, যাঁহারা যশঃ, ধন, মানের লোভে কর্তব্য বিচ্যুত হন নাই, যাঁহারা বাক্যে মনে চরিত্রে সংযমকে প্রধান স্থান দিয়াছেন, সত্যে যাঁহাদের অকুণ্ঠ নিষ্ঠা, ত্যাগ যাঁহাদের মজ্জাগত এইরূপ লোক ক্রমশই লোপ পাইতেছে। জানকীনাথের গ্রাম সমষ্টির কথা ভাবিয়া সেই কথা মনে পড়ে দ্বারকানাথ, উমেশচন্দ্র, শিবনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ প্রভৃতি লোকের আবির্ভাব কি আবার সম্ভব হইবে? যাঁহারা একাধারে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া লোকোত্তর চরিত্রের প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই নত হইয়া আসে; তাঁহাদের গ্রামবাসী, দেশবাসী তাঁহাদের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য যাঁহাদের ছিল তাঁহারা সত্যসত্যই ভাগ্যবান।

সমাপ্ত

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনেকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে সমর জানালার বাইরে চেয়ে ছিল। অনেক বাড়ির আলসে আর পাঁচিলে বাঁশের ডগায় বাঁধা তারে চোখ দুটো ঘুরে-ফিরে নিবন্ধ হবার চেষ্টা করছিল। শূন্য দৃষ্টিপথে অনেক দূর পর্যন্ত কোলকাতার ঊর্ধ্বগামী বোবা কাঠিন্য উদ্যত হয়ে আছে গোরস্থানের শেওলা-ধরা স্মৃতি-ফলকের মত।

অলকাদের বাড়ির ছাদটা দেখা যাচ্ছে—জানলার বাইরে দু'পা অগ্রসর হলেই যেন ওখানে সোজা পৌঁছনো যাবে। নীচে নেমে পথ দিয়ে হেঁটে গেলে কিন্তু ও বাড়িটা গুলিয়ে যাবে। কিছুতেই চেনা যাবে না এই সেই। শূন্যে প্রতিভাত বাড়ির রূপটা এখন কি স্পষ্ট, কত নিকটে!

ছাদের ওপর একটা নারী মূর্তিও যেন অনেকক্ষণ ধরে নড়াচড়া করে। সমর রুদ্ধশ্বাসে নিরীক্ষণ করে। তবে কি অলকারা এখনো ঐ বাড়িতেই আছে? ছাদের ওপর কাপড় তুলতে এসেছে? বেশ বুঝতে পারে সমর—নারী মূর্তিটা চঞ্চল পদে ছাদের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে—বারে বারে নুয়ে নুয়ে কাঁধের ওপর হাতের ওপর কি সব জড় করে রাখছে! দূর নয়, তবু অনেক দূরে মূর্তিটা ছায়ার মত মনে হয়। কাছে মনে হলেও চোখের ওপর সঞ্চরমান মূর্তিটি এখনো দুর্নিরীক্ষ অস্পষ্ট! চোখকে বিস্ফারিত করে। হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহকে বিমুগ্ধ চোখের কোণে এনে প্রতিফলিত করলেও কি ও মূর্তিটাকে চেনা যাবে না? স্পষ্ট দেখতে না পেলেও সমর বুঝতে পারে ছাদের ওপর নারী মূর্তিটি যেন এক সময় স্থির হয়ে তার জানলার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে—চোখের একাগ্রতায় জানালার মানুষটিকে চেনবার চেষ্টা করছে নিস্পন্দ হয়ে।

কতক্ষণ এ রকম ভাবে কাটতো বলা যায় না। নীচ থেকে ডাক আসতে সম্বিৎ ফিরে আসে। তাই তো এ কি চোখের ভুল না, মনের মোহাচ্ছন্ন রূপ—নতুন করে জীবন আরম্ভ করার এই কি সূচনা? এত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ মন তার? ছি, এ কি দুর্বলতা!

অলকার মনেরও তো ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটতে পারে? দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে দেশবাসীর মানসিক পরিবর্তনও সংঘটিত হয়—সে ভালই হোক আর মন্দই হোক, পশ্চাদগামীই হোক বা অগ্রগামীই হোক। অলকা এখন যে পথ বেছে নিয়েছে তাতে স্বাচ্ছন্দ্য আছে, দুঃখভোগের পথ সে বর্জন করেছে। সমরের অবর্তমানে যদি সে দুঃখই ভোগ না করলো তা হলে ভালবাসল কি করে? সমরকে মনে রাখবার মত কোন হৃদয়বৃত্তি আছে তার? স্বাচ্ছন্দ্যের পথে ভালবাসার আসা-যাওয়া নেই—অলকার পরিবর্তনে অলকা নিজেকে আড়াল করেছে, ভুলে গেছে পূর্বাপর। সমরের লজ্জা পাবার মত সে পরিবর্তন। তবু বারে বারে দুঃখ পেতে এ লজ্জার কাহিনীই মনে পড়ে কেন? এখন আর কিছু কি ভাবা যায় না?

হঠাৎ শূন্য ঘরে সমর মনে মনে চীৎকার করে ওঠেঃ না, না, আমি ভুলে যাব—ভুলে যাব!

নীচে চৌধুরীর 'মেসেঞ্জার' অপেক্ষা করছিল। জরুরী তলব করেছে মেজর সাহেব। খামটা খোলবার আগে চকিতে সমরের কেন যে মনে হয়—চিঠিটা চৌধুরী না দিয়ে তার বোন রেবা দেয় না? হাতটা সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে ওঠে থর থর করে, এ কি আশ্চর্য অদ্ভুত ভাবনা। সমর কি পাগল হয়ে গেল? রেবা তাকে চিঠি দিতে যাবে কেন? কতটুকু বা পরিচয় হয়েছে তার সঙ্গে? সেদিনের বিদায় সম্ভাষণের স্নিগ্ধ আলাপটুকু মনে কোন রেখাপাত করেছে না কি? বড় সুন্দরী চৌধুরীর বোনকে সেদিন মনে হয়েছিল সমরের। পুনর্বার আসতে বলায় রেবার চিবুকের রেখায় যেন টোল পড়েছিল—গেটের পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করায় কোন ইঙ্গিত ছিল না তো? কি যে আবোল-তাবোল ভাবনা, কোন মানে হয় এখন?

খামটা ছিঁড়ে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। চৌধুরীর বোনই চিঠি লিখেছে—গোটা গোটা বাংলা অক্ষরের কয়েকটা আঁচড়, নিখুঁত সুন্দরঃ আজকের সন্ধ্যে বেলায় আমাদের এখানে সামান্য কিছু জলযোগের আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা এলে আমরা সকলে খুব খুশি হব। নমস্কার জানবেন। ইতি—

চিঠিটা পড়ে আর তত উত্তেজনা থাকে না। খামের ওপর সমরের নাম লেখা না থাকলে যে-কোন লোককে এ চিঠি পৌঁছে দেওয়া যেত। চৌধুরীর বোন আজ সকালে এমন চিঠি অনেক গুলো লিখেছে বোধ হয়—বিশেষ কারো জন্যে কলম নিয়ে মনকে অন্তর্মুখী করতে আজ সকালের চিন্তাকে শাসন করেনি সে। কথা কওয়ার মত অক্ষরগুলো তো কই চিঠির কাগজে জ্যান্ত হয়ে ওঠেনি? মৃদু আলাপের মত চিঠির ভাষা গুঞ্জন করেনি?

পত্রবাহক সমরের মুখের ওপর ঠায় চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বোধ হয় কোন উত্তরের প্রতীক্ষা করে। সমরের খেয়াল হয়—লোকটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে। জিগ্যেস করে, আউর কুছ্?

পত্রবাহক বলে,. আব্ তো যায়? কুচ পাত্তা মিলে গা?

চিঠিটা ছেঁড়া খামে ভরতে ভরতে সমর বলে. না, তোম্ যাও।

আর্দালী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সমরের যেন খেয়াল হয়, বড়লোক বাড়ির পার্টির নিমন্ত্রণে উত্তর দেওয়ার দরকার হয়। R. S. V. P কথাটার মানে কি?

দূর-রূ সে চৌধুরীর বোনকে ভালবাসতে যাবে কেন? চৌধুরীর বোনের কাছ থেকে, এসব কি সে প্রত্যাশা করছে? আজ সকলকে ওরা যেমন নিমন্ত্রণ করছে, তাকেও তেমন নিমন্ত্রণ করেছে এতে আর বিশেষভাবে চিন্তার কি কারণ ঘটেছে?

চৌধুরীর বোন সুন্দর হলেই বা কি, কুৎসিত হলেই বা কি—সমরের কি আসে যায়!

সমর মনে মনে হাসে—কি অদ্ভুত চিন্তা-শীলতা মনের।

যতটা আনন্দ পাবার আশা নিয়ে সমর চৌধুরী বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসে, ততটা আনন্দ পায় না। পাঁচজনের মাঝখানে পড়ে কেমন যেন অস্বস্তি হতে থাকে। খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব, গান-বাজনা, সঙ্গ-সুখ কিছুতে আর মন ভরতে চায় না। এমন অন্য-মনস্ক সমর যেন ইতিপূর্বে আর কোনদিন হয়নি। পাঁচজন নারী-পুরুষের সমাহার ইতি-পূর্বে এত নিরর্থক এবং অসারও মনে হয়নি। চৌধুরীরা আজকে সন্ধ্যায় শুধু শুধু কতক-গুলো অর্থ এবং সময়ের অপব্যয় করছে। পাঁচজনে মিলে একসঙ্গে খেলে চৌধুরীদের কি এমন পাঁচটা হাত বেরুবে? পার্টিটা কি কারণে এখনো জিগ্যেস করা হয়নি।

অথচ কেন যে এই বিস্বাদ সমর ঠিক ধরতে পারে না। যতদূর মনে হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ভালই হয়েছে। উদ্যোক্তাদের আলাপ-আপ্যায়নও বেশ সৌহার্দ্য এবং সৌজন্যপূর্ণ। ভিড়টাও এমন বেশী কিছু নয় যে, পারস্পরিক আলাপ পরিচয়ের পক্ষে দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনে এবং ইতিপূর্বে এই বাড়িতেই চৌধুরীর বৈঠকখানায় বারকয়েক দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে—সঙ্কোচ বা জড়তার কোন কারণ নেই। এর চেয়ে আর বেশী কি সমর আশা করে বসে আছে?

চৌধুরী বাড়ির সান্ধ্য ভোজনটা এতই ঘরোয়া যে দৃষ্টি এড়িয়ে থাকবার উপায় নেই—একটা ঘরের মধ্যে সকলে মুখোমুখি সামনা-সামনি বসেছে, আশ-পাশ এবং মাথার ওপর অনেকগুলো আলোর বিচ্ছুরণে ঘরটা থমথম্ করছে। আলোয় আলোয় আলোর ছায়ায় ঘরের মেঝে দেওয়ালের গায়ে অশরীরী সত্তা ঠিকরে পড়ছে—কিছুতে ঘর ছেড়ে যেন বেরিয়ে যেতে পারছে না।

ওরই মধ্যে এক কোণে চেয়ারে সমর চুপ করে বসে আছে। মনটা এখন ঘরেও নেই, বাইরেও নেই—অদ্ভুত এক রকমে নিষ্ক্রিয়। চোখের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে সিলিং পর্যন্ত উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে—আবর্তটা আলোর তলায় অল্পক্ষণ স্থায়ী, অবিরাম। মানুষের গায়ের গন্ধ নেশার গন্ধে হারিয়ে গেছে। সমরের নজরে পড়ে, ঘরের দেওয়াল আলমারীগুলোর ডালায় ক্রুশ করে কাগজের পট্টীমারা—কাটা মাথায় প্ল্যাস্টার করার মত। স্বচ্ছ কাঁচের ওপর এ আবার কি ফ্যাশান? হঠাৎ কারণটা মনে পড়ে না। সাদা কাগজের টুকরোগুলো লালচে হয়ে কাঁচের ওপর কামড়ে আছে, কাঁচের স্বচ্ছতা অনুপ্রবিষ্ট নিশ্চিহ্ন। সমর এমনিই কাঁচের ওপর এতটুকু দাগ সহ্য করতে পারে না, চোখের ওপর কাঁচের গায়ে কলঙ্করেখা দেখলে মেজাজটা কেমন খিচড়ে যায়—বিশ্রী লাগে! ইচ্ছে করছে এখনি জল-নেকড়া নিয়ে কাঁচের ডালাগুলো পরিষ্কার করতে বসে। কি বীভৎস নোংরা ঐ দাগগুলো! চৌধুরীরা এত সৌখীন এটা আর চোখে পড়ল না! কাঁচের ওপর কাগজের পট্টী এঁটে কি বাহার খুলেছে? সমরের যেন খেয়াল হয়, কাঁচের ওপর ঐ ভাবে প্ল্যাসটারিং করার বিশেষ অর্থ আছে—এর আগে আরো দু-এক জায়গায় যেন এ রকম দেখেছে। কিন্তু কি সেটা? নিজের মনে সমর হেসে ফেলে, এটা মনে করতে তার এত দেরী হচ্ছিল—আশ্চর্য! বোমা পড়লে কাঁচ ওড়ে তাই এই শৃংখল ব্যবস্থা। কিন্তু বোমার ঘায়ে আস্ত বাড়িটাই যদি উড়ে যায় তখন? কত অকিঞ্চিৎ-কর না এই 'প্রিভেণ্টিভ মেজার!' মনকে আঁখি-ঠেরা!

সমর চোখ ফিরিয়ে নেয়। বেশ গল্প-গুজবে সব জমে উঠেছে। রেবা ঘুরে ঘুরে এক একবার সকলের চেয়ারের হাতলে বসছে, উতলা শাড়ির মত দোল খেয়ে খেয়ে দাঁড়ে বসা। আজকের সাজ-পোষাকটাও ওর খুব জমকালো—চটুলতায় রেবা আজ একেবারে অনন্যরূপ। রেবার ঘসা-মাজা মুখ, রুক্ষ চুল, স্বল্পাচ্ছাদিত পীনোন্নত বক্ষঃস্থল সৌন্দর্যের কৃত্রিমতাকেও মনোহারিণী করে তুলেছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই রেবার এই সপ্রতিভ কাছে আসা আসিটা উপস্থিত সকলের ভলই লাগছে। নারী-রূপের সম্মুখ পশ্চাদ্দেশ যে সমান দর্শনীয় তা এখন রেবাকে দেখলেই বোঝা যাবে—কটি-নিতম্ব দেশে নিভাঁজ শাড়ীর বেড়াটা অভিজ্ঞ শিল্পীর তুলির টানের মত। হাল্কা গেরোয় গ্রীবার ওপর অলকদামের শাসনও বড় সুসংযত বিন্যস্ত। ওঠা-বসায় অনেক চোখে অনেক রঙ ধরাবার মত। ঘরে আরও দু'চারজন মহিলা আছেন, কিন্তু রেবাকে ডিঙিয়ে তাঁদের দর্শনীয়তা সবার কাছে সমান ভাবে পেঁছচ্ছে না।

আজকেও সবাই uniform পরে এসেছে। নিজ নিজ 'র‍্যাংক ভিউ' করাবার জন্যে হাতে-পিঠে বুকে ব্যাজ আঁটা আছে। অত্যধিক পরিমাণে 'স্মার্ট' হবার জন্যে সবার মধ্যে একটা ছটফটানি অনুভব করা যায়। রাহাকে আজ সকলের চেয়ে বেশী 'গে' মনে হয়। রায়-চৌধুরী, দে, ভড়, ভৌমিক আজ খুবই সপ্রতিভ এ্যালার্ট! সিগারেটের ধোঁয়ায়, বক্তব্যের স্বকীয়তায় হাস্যলাস্যের সুউচ্চ গুঞ্জনে কিছু একটা বলতে পারার ব্যগ্রতায় ঘরটা সহসা যেন সজীব হয়ে উঠেছে। মেজর চৌধুরী সাহেব আজ যেন ইচ্ছে করে সকলকে সুযোগ দিয়েছে কপচাবার।

লেত্তিমারা লাট্টুর পাক ফুরিয়ে যাওয়ার মত রেবা এসে সমরের চেয়ারের কাছে দাঁড়াল—খসে-পড়া আঁচলটা কুড়িয়ে নিয়ে বুকের অনাচ্ছাদিত অংশটার ওপর চাপা দিলে। সমরের মাথাটা হঠাৎ কেমন ঝিমঝিম করে ওঠে—এতক্ষণ নজরেই পড়েনি রেবার গায়ে কোন জামাই নেই। পায়ে মোজা গলানর মত কটিদেশ থেকে সূক্ষ্ম কি যেন একটা আচ্ছাদনি বুক পর্যন্ত উঠে এসেছে—কাঁধপিঠ সম্পূর্ণ নগ্ন। গাত্রাবরণের স্থিতিস্থাপকতায় স্তনদ্বয়ের ভার উপলব্ধি করা যায়। আশ্চর্য সুদৃঢ় সুসংবদ্ধ রেবার দেহলতা। খানিকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সমর। এখন যেন বুঝতে পারে সেদিন রেবা রাহাকে 'We had enough fun' বলে কি বোঝাতে চেয়েছিল। আজকের এটা fun নয় তো?

রেবা আর চেয়ারের হাতলে বসে না। পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করে, আপনার বোনকে কই আনলেন না তো? আমরা কিন্তু খুব আশা করেছিলুম।

কণ্ঠস্বরে আত্মীয়তা বোধ করা যায়। সমর কেমন অপ্রস্তুত বোধ করে। বাণীটাকে আনলেই হতো! সমর চুপ করে থাকে। হাতের সিগারেটটা আধ-খাওয়া অবস্থাতে এ্যাসট্রেতে জেঁকে ধরে। চৌধুরীর বোনের কাছ থেকে সমর এতক্ষণ এই ধরণের আত্মীয়তা আশা করছিল কিনা কে জানে।

রেবা জিগ্যেস করে, আপনার বোনের কথা দাদার কাছে শুনেচি। দাদা খুব প্রশংসা করছিল সেদিন।

সমর কৌতুক করে ওঠেঃ তাহলে তো তার আজ নিশ্চয়ই আসা উচিত ছিল—কি বলেন? সমর হেসে ওঠে। রেবাও হাসে। না হাসলে বোধ হয় চলতো, তাই উভয়ের কেউ আর কথা কয় না। দাঁড়িয়ে থেকে ইতস্তত করে রেবা সরে যায়। সমর উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকে।

রেবা যতক্ষণ কাছে দাঁড়িয়েছিল, ততক্ষণ সমর অস্বস্তিতে ঢিলে মেরে গিয়েছিল—কেমন একটা মানসিক জড়তা এসেছিল। ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, পছন্দ-অপছন্দ কিছুই যেন বোধ করতে পারছিল না, চোখের উপর দম-আটকানো একটা সুন্দরের সংজ্ঞা ঝুলছিল কেবল। রেবা সরে যেতে হাঁফ ফেলে সমর স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। সংগে সংগে মনটা বড় শূন্য আর স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। হঠাৎ ছিদ্রান্বেষীর মত মনে হয়। ছি, ছি, একি—এত বাড়াবাড়ি! চৌধুরীর বোন কি ওর চেয়ে ভাল করে সাজতে পারতো না আজ? অমন সৌন্দর্যকে অত কুৎসিত করে প্রকট করার মানে কি? যে কোন সুস্থ লোককে রেবা লজ্জা দিচ্ছে, নিজের লজ্জাটা এতগুলো নগ্ন চোখে বিস্ময়ে ফুটে উঠেছে। ওকি বুঝতে পারছে না?

সমরের একবার ইচ্ছে হয়, উঠে গিয়ে রেবাকে বলে, আজ তোমাকে মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না কিন্তু। হয়তো চৌধুরীর বোন ক্ষুণ্ন হবে—হোক, তবু মুখের ওপর তাদের কেউ ও-কথাটা বলতে পারলে যেন ওর ভাল হতো। চৌধুরীর কি কোন খেয়াল নেই বোনের শালীনতা সম্বন্ধে? প্রশংসার বদলে রেবার আজ তিরস্কার পাওয়াই উচিত। ......কে জানে হঠাৎ রেবা সম্বন্ধে সমরের এ চিন্তাশীলতা জাগছে কেন? যেরকম করে খুশি ও সাজুক, তার মাথা ঘামাবার কি আছে? শুধু শুধু মাথা ঘামায় কেন? চৌধুরীর বোনের কি আসে-যাবে—সমর দত্তর চোখে তার সাজ-পোষাক যদি না ভাল লাগে? সত্যিই কোন মানে হয় না। কেন সে আজ অকারণে চৌধুরীর বোনের সম্বন্ধে উৎসুক হচ্ছে? Meaning-less Silly—

রাহা বার বার আসন ছেড়ে উঠে রেবার কাছে গিয়ে বলছে, Excuse me Miss Chowdhury—

অবশ্য রক্ষা এই, যা বলছে, তা কেউ-ই বড় একটা শুনতে পাচ্ছে না। তাছাড়া রাহার বক্তব্য যে কি, তাও বোধ হয় সবসময় মিস চৌধুরীই বুঝতে পারছে না—কখন সরল হাস্যে, কখন ভ্রূভংগে, কখনো বা অস্পষ্ট উচ্চারণে রাহাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। ঘরের কেউ কেউ বোধ হয় লক্ষ্য করছে, কেউ কেউ বোধ হয় লক্ষ্য করেও লক্ষ্য করছে না, আজকের fun বোধ হয় এইটাই।

সমরের সময় সময় ইচ্ছে হয়, রাহার টাই-শুদ্ধ জামার গলা ধরে এনে বসিয়ে দেয়। গালে চড় মেরে ধমক দেয়, কি হ্যাংলামি হচ্ছে! দুজনেই বেহায়া। উচ্ছন্নে যাক!

ওদিকে চৌধুরী সাহেব [illegible] ফৌজের নৈতিক অস্তিত্বের কথা আলোচনা আরম্ভ করেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ যত বড় কাজই করুক, তাদের 'Very Existence' সামরিক বিধি-ব্যবস্থাসম্মত কিনা দেখতে হবে A band of rebels.

চৌধুরী বলছে : ওদের নিয়ে এত হৈ-চৈ করার কোন মানে হয়?

Are they source of any Inspiration? Jai Hind!—Azad Hind! meaningless—our Govt. very lenient at now-a-days. Childish!

ভড় বললে, আগে বন্দে মাতরম্ বলতে দিতো না, এখন রাস্তা-ঘাটে শোন জয় হিন্দ! কান ঝালাপালা! ব্যান করে দেওয়া উচিত। War cry!

চৌধুরী ওয়াকিবহালের মত বলে, I understood it will be soon banned. British Govt. will not brook. They are no fools—

সমর এদেরই মত আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকলাপে বিশেষ ঈর্ষান্বিত—আজাদ হিন্দের বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে সাধারণ লোকের মত উৎফুল্ল বা মুগ্ধ নয়, বরং সন্দিগ্ধ। তবুও বলে, Public opinion will carry this through. Govt এখন কিছু বলবে না মনে হয়।

চৌধুরী বলে, What? You don't know Captain—you will see. Delhi Chalo চলবে না।

সমর চুপ করে কি যেন ভাবে। দেশের লোক দিল্লী গেলেই বা কি আর না গেলেই বা কি—তার ভাবনাটা নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সেটা যে যুদ্ধাবস্থার মতই অনিশ্চিত, মনে মনে সে বেশ বুঝতে পেরেছে। কি হবে তর্ক করে, এ-তর্কে যোগ দিয়ে? কোন মীমাংসা হবে কি? 'আজাদ হিন্দের' উচ্ছ্বাস দাবিয়ে রাখতে পারবে কি? হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলনের কথা মনে পড়ে যায়—সেদিন পুলিশ-মিলিটারীর তাণ্ডব চোখের ওপর ভেসে ওঠে—রোজ স্কুল বন্ধ, কলেজ বন্ধ, হরতাল! কি উত্তেজনাপূর্ণ সেদিনগুলো! সমর জেলে যায়নি, পিকেটিং করেনি, তবু স্কুলের বই বগলদাবায় চেপে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে মনে প্রার্থনা করেছিল, এ-দিনের যেন শেষ না হয়—একদিন, দুদিন, তিনদিন, অনেকদিন চলুক এ। ক্ষতি কি!

মনটা খারাপ হয়ে যায়। কি কারণে সমর বুঝতে পারে না। আই এন এ নিয়ে লোকের মাতামাতিতে তার কিছু যায়-আসে না। শেষ পর্যন্ত ঐ অসহযোগের মত। অত বড় আগস্ট বিপ্লব, তাই বলে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, এ আর ক'দিন?—শ্লোগানে বিপ্লব আসবে? ভড়ের মত তার দুর্ভাবনা নেই। কিন্তু চৌধুরীর মতও আবার নিশ্চিন্ত হতে পারে না। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে এর উদ্দীপনা বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নিশ্চয় এদের দাবিয়ে দেবে।

বাইরে রাস্তা দিয়ে কে যেন 'কদম কদম বড়ায়ে যা, খুশিকে গীত গায়ে যা' গাইতে গাইতে ছুটে যাচ্ছে। একক কণ্ঠস্বরে, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের নীরব পাড়াটা হঠাৎ চমকে উঠলো। ঘরের ভিতর সকলে হঠাৎ মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে চুপ করে গেল। বিস্ময়ে না, বিরক্তিতে, না আর কিছুতে এরকমটা হলো বোঝা গেল না।

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠে চৌধুরী সাহেব বললে, ধোপার ছেলে!

Someday he would make a good singer.

সকলে হে-হে, হো-হো, হা-হা, খে-খে, খিক্-খিক্ করে হেসে উঠলো। সমর কেমন অন্যমনস্ক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। চৌধুরীর বোন এর মধ্যে কখন ঘর ছেড়ে চলে গেল? না, রাহা ওঠেনি—ধোপার ছেলের রসিকতায় ফ্যাচ ফ্যাচ করে সে-ও এখনো হাসছে।

খাওয়া-দাওয়া চুকে যেতে সমর উঠবে উঠবে করছে, দু-একজন উঠেও গেছে। চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে যাবে কিনা সমর ইতস্তত করছে—অনেকক্ষণ বাড়ির ভিতর গেছে এখনো বেরুচ্ছে না। অদূরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রেবা অনেককে সহাস্য বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে। ঠিক এই সময় উঠে ওর চোখের ওপর দিয়ে চলে যেতে সমরের কেমন সংকোচ বোধ হচ্ছে—এভাবে চোখে পড়াটা শ্লাঘায় কোথায় যেন বাধবে। অথচ কেন যে মনের এই ভাব বোঝাও যায় না। সমর নিশ্চেষ্ট হয়ে কোচের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়—সব মিটে যাক, তারপর এক ফাঁকে রাস্তায় নেমে পড়লে হবে।

আশ্চর্য মনের ভাবগতিক, দেহের নিশ্চেষ্টতা সত্ত্বেও সমরের চোখ দুটো থেকে থেকে দরজার কাছ পর্যন্ত ছুটে যায়। দরজার সামনেটা আলো-আঁধারে আবছা—অনেক ছায়ার ভিড়ে মাঝে মাঝে আলো কাঁপছে, রেবার দেহলতা রেখায়িত হয়ে উঠছে। অনেকটা আচ্ছন্নের মত দেশে ফেরবার পথে ট্রেনের কামরার অসমসাহসিকা সহযাত্রিণী সেই তরুণীটির মুখাবয়বের স্মৃতি মনে পড়ে। আশ্চর্য অম্লান সে স্মৃতি। সমর অবাক হয়ে যায়। জীবনের পাওনায় মাত্র একটা রাত্রি আর একটি প্রভাতের চাক্ষুষ পরিচয় এত গভীর হয় কেন? অলকার পরিচয় তাহলে কি, সমর ভুলে গেছে—তাই স্মৃতিপটে এদের আসা-যাওয়া?

ঘরের ভিতর আর কেউ নেই, সমর একা—আলোগুলো ঠায় জ্বলছে। দরজার সামনে ছায়া-ছবি অন্তর্হিত, সউচ্চ, সলজ্জ-সহাস্য আলাপ আর শোনা যাচ্ছে না। উঠে যাবার এই যেন প্রশস্ত সময়। সমর উঠে পড়ে গুটি গুটি একটু আগে কলগুঞ্জনটা কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে—কেউ না থাকায় নিজের কথাটাও যেন টের পাওয়া যায় না আর। সমরের পায়ের গতি সহসা ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনের লনে পড়তে রেবার সঙ্গে দেখা হলো। রেবা অতিথিদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল। হঠাৎ সমর বড় চমকে ওঠে। রেবা সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে জিগ্যেস করেঃ একি, একলা একলা যাচ্ছেন যে বড়!

রেবার কথা সমর ঠিক বুঝতে পারে না। সঙ্গে আবার তার ছিল কে? সমর বলে, মানে? একলা যাব না তো সঙ্গে যাবে কে? আমার সঙ্গে তো কেউ আসেনি।

রেবা হাসেঃ ও, না, তাই বলছিলুম। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।

না, থাক, আমি একলাই যেতে পারবো—আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। সমর পাশ কাটায়।

সমরের কথায় রেবা যেন একটু বিরূপতার আঁচ পায়। ভদ্রলোক বড় অসামাজিক—সমরের ব্যবহারটা কোন্ পর্যায়ে পড়ে? রেবা ক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ির ভিতর চলে যায়।

> Between the Gate
> And the House;
> Between the Street
> And the Destination,
> The distance is great.
> I'u accompany thee?

এগিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে বাড়িটার দিকে সমর একবার কি ভেবে তাকায়ঃ ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে—দোতলা বাড়ির তলায় ঘাসের লন, ফুলের কেয়ারী ঘুমন্ত শিশুর পরিত্যক্তা খেলনার মত অনাদৃত। শিশু যদি জানতো, তার খেলনার মূল্য কত, তাহলে হয়তো কখনো ঘুমোত না। এমনি সমরের মনে আসেঃ

আপনি-আপনি আশ্চর্য কবিতা এল, মনে মনে হেসে সমর অন্যমনস্কভাবে লোহার গেট ঠেলে বাইরে পা দিতে পিছন থেকে চৌধুরীর আর্দালী ডাকলে, সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

হঠাৎ সমর থতমত খেয়ে যায়। চৌধুরী আবার ডাকে কেন? কি এমন জরুরী যে, আজ না বললে হতো না? আর্দালী ভুল করেনি তো? গেটটা বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে সমর জিগ্যেস করলে, আমাকে?

আর্দালী হেসে বললে, দত্ত সাহেব তো আপনি আছেন?

চৌধুরী বললে, I am sorry—তোমাকে এতক্ষণ জিগ্যের করা হয়নি, কাল চ্যারিটি শো'তে আসছো তো?

সমর অবাক হয়ে চৌধুরীর মুখের দিকে চায়। জিগ্যের করে কি চ্যারিটি? কোথায়?

চৌধুরীও বিস্মিত হয়ঃ সেকি তুমি কিছু জান না? Your sister has organised one.

আমার বোন? কই, শুনিনি তো। কিসের জন্যে? কিছু না বুঝে সমর বোকার মত চেয়ে থাকে।

In aid of a Destitude Home. I understand your younger brother is its Founder Secretary.

আশ্চর্য তুমি জান না? অবিশ্বাসীর মত চৌধুরী বলে।

না-জানায় সমরের ক্ষোভই হয় বেশি। এ-ব্যাপারে প্রবীর-বাণী তাকে বাদ দিল কেন? তার দ্বারা কিছু হবে না ভেবেই কি তাকে কিছু বলেনি, না তাকে অপমান করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছে? সাহায্যের জন্যে তার বন্ধুদের কাছে ছুটে আসতে পারলে আর তাকে জানাতে পারলে না? এতদূর স্পর্ধা হয়েছে বাণীর? চৌধুরী তাড়িয়ে দিলে না কেন? রাগটা যেন চৌধুরীর ওপরই বেশি হয়।

চৌধুরী জিগ্যেস করলে, কি আসচো তো? তাহলে একসঙ্গে স্টার্ট করা যাবে।

সমর হ্যাঁ-না করে। চৌধুরীর কানে যায় কি না বোঝা যায় না। বলে, তোমার বোন যা করছে—

Really a great humanitarian work. She must be encouraged. It speaks of great heart!

সমর জিগ্যেস করে, আপনারা কে কে যাবেন?

চৌধুরী খুব উৎসাহ সহকারে জবাব দেয়ঃ কেন, সবাই। ভড়, ভৌমিক, রাহা, দে Everyone of us. চল না একসঙ্গে যাওয়া যাবে। শুনলুম, এর মধ্যে একজন নামকরা এ্যাকট্রেস্‌ও আছেন—কি যেন নাম, দাঁড়াও তোমাকে 'প্যাম্ফলেট'টা দেখাচ্ছি।

চৌধুরী উঠে চারিদিক হাতড়ে দেখলে। কাগজটা উপস্থিত কোথাও খুঁজে পেলে না। ফিরে এসে বললে, যাকগে, তুমি দেখে নিও। তাহলে ready থেকো!

সমরের কিছু যেন মাথায় ঢোকে না। এত বড় একটা ব্যাপার তাকে বাদ দিয়ে তারই নাকের ওপর হচ্ছে কি করে? এত সতর্কতাতেও বাণী নিজের ইচ্ছেমত কাজ করে বেড়াচ্ছে? এতদূর বেড়েছে মেয়েটা!

সমর জিগ্যেস করে কত টাকার টিকেট বিক্রী করেছে আপনার কাছে?

চৌধুরী বলে, That's nothing for so great a work! শ' আড়াই টাকার টিকেট বিক্রী করে দিয়েছি আমরা। রেবাই সব করেছে। কেন?

উদ্‌ভ্রান্তের মত সমর বলে, আমি দুঃখিত মেজর চৌধুরী—ক্ষমা চাইছি।

ছুটে ঘর থেকে সমর বেরিয়ে যায়। পিছন থেকে চৌধুরী হাঁকেঃ আরে শোন, শোন—কিসের ক্ষমা? Strange!

সমর দৃকপাত না করে সোজা বাইরের রাস্তায় এসে পড়ে। নিজের ওপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ শক্তি যেন হারিয়ে ফেলে। কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তার বিকারে মনটা এমনই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, এ-ব্যাপারে তাকে অপমানের জন্যেই পরিকল্পিত একটা যোগসাজস ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারে না। এ প্রবীরের কাজ—এ বাণীর কাজ। এত বড় অপমান সমরের জীবনে যেন আর কোনদিন হয়নি। সে দেখে নেবে—কিছুতে সহ্য করবে না। টিকেট কেনবার আগে চৌধুরীর তাকে জানান উচিত ছিল—বাণী তার বোন, সুতরাং এব্যাপারের দায়িত্ব সম্বন্ধে সমরেরই ভাবনার কারণ আছে। বাণী গেল, আর অমনি কচি ছেলের মত তুমি আড়াই শ' টাকার টিকেট কিনে ফেললে? একবারও ভাবলে না, একটু জিজ্ঞাসা-পড়া করলে না? কেন? শুধু বাণী নিজে গিয়েছিল বলে? চৌধুরীর দুর্বলতাটা ধরতে পেরেও দুঃখের মধ্যেও সমর কিছুটা যেন খুশি হয়। কাজের জন্যে যত না হোক, বাণীর জন্যেই চৌধুরী অত টাকার টিকেট কিনেছে। ডেস্টিটিউট হোমের জন্যে ও'র তো ভারি মাথাব্যথা।

আসতে আসতে চিন্তার উগ্রতা কমে আসে। রাগটা পড়ে না, কিন্তু রাগ না করার পক্ষে অনেক যুক্তি যেন এখন দেখা যায়। বাণী তাকে না জানিয়ে টিকেট বিক্রী করে যেন ভালই করেছে—জানলে সে নিশ্চয়ই বারণ করতো, তাছাড়া টিকেট বিক্রী করার কথা জানাবার সময় তো চলে যায়নি? আরো বাণী হয়তো ভেবেছে, দাদা এসব ভালোবাসে না—দাদাকে কিছু না বলাই ভাল। সত্যিই কি সমর এসব ভালবাসে না? চৌধুরী ভালবাসতে পারে, প্রশংসা করতে পারে, আর সে ভালবাসতে পারে না? বাণী কই তার কাছে একবার এসে দেখলে? দোষটা বাণীর চেয়ে প্রবীরেরই বেশি। নিজেরা পারে না, বোনকে পাঠিয়েছে ভিক্ষে করতে! তা-ও সমরেরই বন্ধুদের কাছে। মুরোদ ত কত! এতেই দেশোদ্ধার করবে। বলে নিজে খেতে পায় না, আবার অপরকে খাওয়াবে। যত সব ছেলেমানুষী ব্যাপার। একসময় নিজেকে এদের চেয়ে সমরের অনেক বুঝদার মাতব্বর মনে হয়। এদের ওপর এখন রাগ করাটা এদের প্রশ্রয় দেওয়া, এদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া। যা খুশি পারে ওরা করুক গে, সে কিছু দেখবে না, শুনবে না।

কিন্তু আজ চৌধুরী কি ভাবলে? —ভাই-বোনের সঙ্গে যে তার বনে না, এটা কি বুঝতে পেরেছে? চৌধুরীর সামনে সব কিছু জানার ভাণ করা তার উচিত ছিল। বোকার মত কিছু জানি না বলা তার যোগ্য হয়নি। ঘরে যাই হোক, বাইরে প্রকাশ করা কোনমতে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। না, তার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পাচ্ছে। আত্মধিক্কারের কেমন একটা প্রবণতা সমরের আসে।

তবুও, এর পর সাবধান হতে হবে। যতদিন আছে বোনকে কড়া নজরে রাখবে সে। এই সব দলে মিশে কোনদিন কিছু একটা কীর্তি না করে বসে। বেকার ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে যেভাবে মেলামেশা করছে। সেদিন অরবিন্দকে হাতের কাছে পেয়ে কিছু না বলে ছেড়ে দেওয়া তার ঠিক হয়নি। যে কোন ছুতোয় ছোকরাকে অপমান করা তার উচিত ছিল। ঘরে-বসা মাতব্বর কথার সম্রাট সব। যুদ্ধটা কিছু নয়, চাকরিটা কিছু নয়—ও'দের বক্তৃতাটাই সব। অকর্মাদের বচন আছেই। কি করে ছোকড়া? মজুর-কৃষক ক্ষেপিয়ে বেড়ায়? রাজনীতিতে পেট ভরবে? না, বাণীকে আর মেলামেশা করতে দেবে না—আজই বাবা-মার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা পরামর্শ করবে। ওর ইচ্ছেমত নাকি? হঠাৎ চৌধুরীর সঙ্গে বাণীর বিয়ের সম্বন্ধ করার কথা মনে আসে। বাণীকে বিপদ থেকে ফেরাবার এই যেন প্রকৃষ্ট উপায়। সমরের নিশ্চিত ধারণা হয়, চৌধুরী রাজী হবার জন্যেই তৈরি হয়ে বসে আছে। বাণী রাজী হবে না? কিন্তু চৌধুরী শেষ পর্যন্ত—

চৌধুরীর কাছে বোনের জন্যে এই খানিকটা আগে ক্ষমা চাওয়াটা কেমন ছেলেমানুষী মনে হয়। সত্যিই তো এতে ক্ষমা চাইবার কি আছে? নিজেকে সমর যেন বড় হাস্যাস্পদ করে ফেলেছে—সব কিছু না জেনে, না বুঝে, চিন্তা না করে এতটা উতলা হওয়া তার উচিত হয়নি। যুদ্ধে গিয়ে এত নিয়মকানুনের মধ্যে থেকেও মনটাকে শাসনে আনতে পারেনি। চুলোয় যাক এ-মাথা-ব্যথা। চৌধুরীর পয়সা আছে টিকেট কিনেছে, তার কি বলবার আছে। কার কি?

কিন্তু এসব ব্যাপারে আবার একট্রেস কেন? চৌধুরীর লোভ তাহলে কার ওপর? বাণী না, এই অজ্ঞাতশীলা এ্যাকট্রেস? কে এই এ্যাকট্রেস?

(ক্রমশঃ)

বক্সা ক্যাম্প • অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

গ্রীষ্মকাল আসিল। আপনাদের একটু কষ্ট করিয়া আর একবার খেলার মাঠে যাইতে হইবে। আমাদের হকি খেলা দেখিয়াছেন, এবার ফুটবলের পালা। ভাবিতেছেন, হকি খেলা হইতেই আমাদের ফুটবল খেলাটাও অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন? বৃথা চেষ্টা করিবেন না।

শুনুন তবে, সিপাহীরা পর্যন্ত স্বীকার পাইল যে, ফুটবল খেলা না দেখিলে বাবুদের সঠিক পরিচয় জানা বাকী থাকিয়া যাইত। উঃ, কি প্রচণ্ড খেলা। ফুটবলে লাথি মারিতে গিয়া বাবুরা পাথর কিক্ করেন, কেষ্টবাবু ও অনুকূলবাবু এজন্য সামান্য মুখ-বিকৃতি পর্যন্ত করেন না। সিপাহীদের মহলে ধন্য-ধন্য পড়িয়া গেল। সাধে কি আর সাহেবেরা বাবুদের এত ভয় করেন।

লীগের খেলা মারাত্মক অবস্থায় আসিয়াছে। পাঁচ নম্বর ও তিন নম্বর ব্যারাক পয়েন্টে ভীষণভাবে কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে—যেন দুইটি রেসের ঘোড়া পাশাপাশি ছুটিয়াছে, ঘাড় লম্বা করিয়া একে অপরকে হার মানাইবার শেষ চেষ্টা করিতেছে, এমনই সঙ্গীন ও রোমাঞ্চকর 'পরিস্থিতি' সেটা। উত্তেজনার আর অবধি নাই।

আমরা তিন নম্বর ব্যারাক টীম গঠন লইয়া সমস্যায় পড়িলাম। আমাদের তিন নম্বর ব্যারাকের গোলরক্ষক ছিলেন ক্ষিতিশবাবু (ব্যানার্জি)। একটু বর্ণনার আবশ্যক বোধ করিতেছি।

ক্ষিতীশদা বয়স্ক ব্যক্তি, আর একটু ঠেলা দিলেই চল্লিশে পৌঁছিয়া যাইবেন। দৈর্ঘ্যে একটু কম, এই কমতিটুকু তিনি প্রস্থে প্রয়োজনেরও অধিক পোষাইয়া লইয়াছেন। ভুঁড়িটি দর্শনীয়, কিন্তু স্পর্শ করিলে টের পাওয়া যাইত যে, তাহা লোহার মত নিরেট। দেয়ালে বল লাগিলে যেমন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, আমাদের গোলরক্ষকের ভুঁড়ির দেয়ালে ধাক্কা খাইয়া তীব্র সটের বলকেও 'মাগো' ডাক ছাড়িয়া তেমনি তীব্রবেগে পিছু হটিয়া আসিতে হইয়াছে। ক্ষিতীশদার ভুঁড়ি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে নিম্নোক্তরূপ প্রশ্নোত্তর প্রচলিত ছিলঃ—

"কে যায়?"

"ভুঁড়ি যায়।"

"কার ভুঁড়ি?"

"ক্ষিতীশবাবুর।"

"তিনি কোথায়?"

"পিছনে আসিতেছেন।"

চেহারার বর্ণনায় প্রত্যাবর্তন করা যাইতেছে। আমাদের এমন গোলরক্ষকের মুখে মানে নাকের নীচে একজোড়া গোঁফ, মুখের ডাহিনে বামে বাহু বিস্তার করিয়া মুখমণ্ডলকে আগুলিয়া আছে—যেন আগন্তুক মাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তুম কোন্ হ্যায় রে।" গোঁফজোড়া ক্ষিতীশদার গর্বের বস্তু ছিল। হাত দুইটি ছোট একজোড়া মুগুরের মত ঘাড় হইতে বিলম্বিত হইয়া আছে। ভীম কর্তৃক ময়দামর্দিত কীচকের খানিকটা আভাস যেন আনয়ন করে বলিয়া মনে হয়। ক্ষিতীশদা ভুঁড়িপেট লইয়া বরাবর আমাদের গোলরক্ষকের কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি অজাতশত্রু ছিলেন না; অনেকে তাঁহার পিছনে ফেউ লাগিলেন, বিশেষ করিয়া সন্তোষদা (দত্ত)।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে তিন নম্বর ব্যারাকের বারান্দায় পাশা বসিত, একদিকে থাকিতেন প্রতুলবাবু (গাঙ্গুলী) ও সন্তোষদা, অপরপক্ষে থাকিতেন ক্ষিতীশবাবু ও ভূপতিদা (মজুমদার)। তখন অহি-নকুল সম্পর্কে নিত্য-সম্পৃক্ত সন্তোষদা ও ক্ষিতীশদার যে বাক্‌যুদ্ধ চলিত, তাহাতে উপর-নীচ সকল ব্যারাকের বহু দর্শককে আকর্ষণ করিয়া আনিত। অর্থাৎ বিনা পয়সায় এমন দৃশ্য দেখিবার জন্য আমরা ছোটখাটো একটা ভিড় জমাইয়া খেলার আসরটিকে চক্রাকারে বেষ্টনপূর্বক অবস্থান করিতাম।

বাক্‌যুদ্ধ অনেক সময় বাহু-যুদ্ধে গিয়া গড়াইত। এ-পাশ হইতে ক্ষিতীশদা তাঁর মোটা-সোটা খাটো হাতে উদ্বাহু হইয়া আক্রমণোদ্যত হইতেন, পাশার ছকের ও-পাশ হইতে সন্তোষদা তাঁর সবল দীর্ঘ হাত বাড়াইয়া তাহা ঠেকাইতেন। অনেক সময় মনে হইত, সন্তোষদা দুই হাতে এক ক্রুদ্ধ সিংহের থাবা কোনমতে মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া "ত্রাহি ত্রাহি" জপ করিতেছেন। আমরা দর্শকগণ সন্তোষদার এই বিপদে কিছুমাত্র সহানুভূতি বা মমতা না দেখাইয়া উল্লাসে হৈ-হৈ করিয়া উঠিতাম। ভূপতিদা মন্তব্য করিতেন, "গজ-কচ্ছপের লড়াই।" শুনিয়া আমরা হাস্য করিতাম এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, গজ-কচ্ছপও হাসিতে যোগ দিয়া আমাদের হাস্য ও আনন্দ দুই-ই বৃদ্ধি করিত।

সেদিন বাক্‌যুদ্ধ গজ-কচ্ছপের বাহুযুদ্ধে আসিয়া গিয়াছে। হাড়ের পাশা দুই হাতের পাতায় ঘর্ষণপূর্বক মড়মড় শব্দ তুলিয়া প্রতুলবাবু যুদ্ধবিরতির অপেক্ষা করিতেছিলেন।

পাশার দান দিবার আগে প্রতুলবাবু শান্তভাবে হাসিকে অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন, "এ তোমার বড় অন্যায়, সন্তোষ। গোল ঠেকাতে পারেননি বলে যে পাশা খেলতে পারবেন না, এ তোমার কোন কাজের কথা নয়।"

সন্তোষদা উত্তর দিলেন, "আপনি জানেন না প্রতুলদা, এ একটি জিনিয়স, সব খেলাতেই সমান পারঙ্গম, সব্যসাচী বল্লেই চলে।"

প্রতুলবাবু এবার হাসিকে মুক্ত করিতে কোন বাধা বোধ করিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষিতীশবাবু কি বলেন?"

ক্ষিতীশবাবু জবাব দিলেন, "এ'রা সব মুখেন মারিতং জগৎ। দেখলাম না তো আজ পর্যন্ত মাঠে নামতে একদিন।" আমরা উপস্থিত দর্শকবৃন্দ এ-অভিযোগ সমর্থন করিলাম।

সন্তোষবাবু হাসিয়া জবাব দিলেন, "আমি তো আর লজ্জার মাথা খাইনি, নইলে আর একজনের মত নেমে পড়তুম বৈকি।"

'আর একজন' যিনি লজ্জার মস্তক ভক্ষণ করিয়া বসিয়াছেন, তিনি মুখভঙ্গী সহযোগে পুরানো রসিকতাটিরই আবৃত্তি করিলেন, "মুখ না থাকলে এদ্দিন শেয়ালে টেনে নিত।"

ভূপতিদা শুধু প্রশ্ন করিলেন, "কার?" অর্থাৎ কার মুখ না থাকিলে, বক্তার না সন্তোষ দত্তের, এই সমস্যায় তিনি পড়িয়াছেন।

ক্ষিতীশদা মেজাজ রক্ষা করিলেন না, স্বপক্ষের ভূপতিদাকে পর্যন্ত বিপক্ষে ঠেলিয়া দিয়া ব্যাপক আক্রমণ চালাইলেন, "আপনাদের সকলেরই। সবাই সমান বচনবাগীশ।"

প্রতুলবাবু মোক্ষম সময়ে একটি সংবাদ ছাড়িলেন, "সন্তোষ, রবিবাবুও (সেন) নাকি গোলে খেলতে পারেন। কিন্তু বছর কুড়ির মধ্যে মাঠে নেমেছেন বলে তো মনে হয় না?"

সন্তোষদা সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "আমাদের গোলকিপারের মত খেলতে কুড়ি বছর কি বলছেন, জীবনেও মাঠে নামবার দরকার হয় না। কিন্তু রবিবাবু খেলবেন কি করে?"

প্রতুলবাবু বুঝিতে পারিলেন না, আমরাও না, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সন্তোষ দত্ত উত্তর দিলেন, "বুঝছেন না, তাহলে যে মণ্ডপ কাৎ হয়ে পড়বে। আত্ম-, সম্মানে আঘাত লাগবে যে। আমাদের চ্যাম্পিয়ন কি রাজী হবেন গোল ছাড়তে?" বলিয়া তেরছ-নয়নে চ্যাম্পিয়নের দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

"আমাদের চ্যাম্পিয়ন' কিন্তু রাজী হইয়া গেলেন, বলিলেন, "তবে তো বেঁচে যাই, একটা খেলার মত খেলাও দেখতে পারি। শুধু গোলে

কেন, ব্যাকেও তো গোষ্ঠ দত্ত নিজে নামতে পারেন।"

বলিয়াই তিনি দৃষ্টিটাকে উপস্থিত সকলের উপর বুলাইয়া নিলেন। তাঁহার মুখের ভাবখানা এই যে, সন্তোষ দত্তকে গোষ্ঠ দত্ত নাম দিয়া তিনি যেন বাক্‌যুদ্ধে সকলকেই 'নক-আউট' করিয়া ফেলিয়াছেন। উপস্থিত সকলেও ক্ষিতীশদার বক্তব্যে ও মুখের বিজয়ী ভঙ্গিমায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সন্তোষ দত্ত উত্তর দিলেন, "গোল খালি রেখেও নামতে রাজী আছি কিন্তু বিভীষণকে গোলে রেখে—" কথাটা আর শেষ করিতে পারিলেন না। সকলের সমবেত হাসির মধ্যে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। চ্যাম্পিয়ন হইতে একেবারে বিভীষণে নামাইয়া আনা, সন্তোষবাবু যেন ক্ষিতীশদাকে একটি প্যাঁচে ডিগবাজী খাওয়াইয়া দিলেন।

অবশেষে ঠিক হইল, আগামীকল্য ভোরেই একটা 'প্র্যাকটিস ম্যাচ' হইবে, তিন নম্বরের পক্ষে রবিবাবু গোলে, আর সন্তোষদা ব্যাকে খেলিবেন। রবিবাবুকে রাজী করাইবার কথা উঠিলে সন্তোষদাই বলিলেন, "সে ভার আমার, ওটা আমার উপর ছেড়ে দিন।"

রাত্রিটা কোনমতে ধৈর্য ধরিয়া আমরা পার করিয়া দিলাম। ভোর হইতেই সারা ক্যাম্পে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। সারারাত্র থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টি গিয়াছে, ভোরেও আকাশের সারা মুখ মেঘে আচ্ছন্ন। টিপ-টিপ বৃষ্টিও হইতেছিল, কিন্তু এই সামান্য বৃষ্টি বক্সা পাহাড়ে বৃষ্টি বলিয়া ধর্তব্যই নহে। খেলাটা বন্ধ হইল না।

রবিবাবু হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া গোলে গিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে মনে হইল যে, কেহ যেন তাঁহার ত্রিসীমার মধ্যে না আসে, অন্তত যার প্রাণের মায়া আছে, সে যেন না আসে, এমনই 'এস্পার কি ওস্পার'-মার্কা বিজ্ঞাপন রবিবাবুর চোখে-মুখে লটকানো হইয়াছে। আজ রবিবাবুরই শেষ দিন, নয় বলেরই শেষ দিন, কিংবা কোন হতভাগ্য খেলোয়াড়েরই শেষ দিন। ভয়ানক ও রোমাঞ্চকর নাটকের পর্দা উত্তোলনের অপেক্ষায় সকলে কুম্ভক মারিয়া রহিলেন।

রবিবাবুর পুরোভাগে ব্যাকে স্থান লইলেন সন্তোষদা ওরফে ক্ষিতীশদার গোষ্ঠ দত্ত। তাঁহারও ভাবখানা কহতব্য নহে। রবিবাবু ও সন্তোষ দত্ত যেন দুই দৈত্য তিন নম্বর টীমের ব্যূহদ্বার অগলাইয়া আছেন।

আর ঠিক তাঁহাদের পশ্চাতে গোলপোস্টের পিছনে স্থান গ্রহণ করিলেন আমাদের চ্যাম্পিয়ন ওরফে সন্তোষ দত্তের বিভীষণ ক্ষিতীশদা। তাঁহার ভুঁড়িপেট ও "তুম কৌন হ্যায়রে"-মার্কা গোঁফজোড়া অবশ্য সঙ্গেই ছিল, তাঁহার ভাবখানাও কহতব্য নহে, যেন মহাবীর ভীমসেন বালখিল্যদের ক্রীড়া দেখিতে উপস্থিত হইয়াছেন, এমনই একটি কৌতুক ও তাচ্ছিল্যের মাংসপিণ্ডের ন্যায় তিনি দণ্ডায়মান রহিলেন।

খেলা আরম্ভ হইল। এদিকে ব্যূহরক্ষাকারী দুই দৈত্য ও ভুঁড়িপেট চ্যাম্পিয়নের মধ্যেও লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল। মাঠে ও মাঠের বাহিরে দুইটি লড়াই যুগপৎ চলিতে লাগিল। সন্তোষ দত্ত বল কিক্ করিতে গিয়া স্বপক্ষের খেলোয়াড়ের নিতম্বে লাথি মারিয়া তাহাকে ভূমিশায়ী করিলেন, গোলের পিছনে দাঁড়াইয়া ক্ষিতীশদা অঙ্গভঙ্গীতে তাহার অনবদ্য অনুবাদ করিয়া দেখাইলেন। রবিবাবু একবার ডাহিনে, একবার বামে হেলিতেছেন, বলের সঙ্গে যেন অদৃশ্যসূত্রে তিনি নাসিকা-বদ্ধ—তাহারও নিখুঁত নকল ক্ষিতীশবাবু স্বীয় দেহে দেখাইয়া চলিলেন। এই অপূর্ব দেহভঙ্গী দর্শকদের 'মাগো, আর হাসিতে পারি না' স্বীকারোক্তি নির্গত করিয়া ছাড়িল।

এতো গেল নাট্যের নীরব দিক। ক্ষিতীশদা এই সঙ্গে গোলরক্ষক ও ব্যাকের সহিত সমান বাক্‌যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, যেন কর্ণের রথের শল্য-সারথি সমালোচনা করিয়াই বীরদ্বয়কে অর্ধেক ঘায়েল করিয়া আনিবেন। বাকীটা অর্থাৎ মড়ার উপর খাড়ার ঘা দিবার ভারটুকু মাত্র তিনি মাঠের খেলোয়াড়দের উপর দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। খেলাটা বিশেষভাবে এইখানেই এবং মাঠেও মারাত্মকভাবে জমিয়া উঠিয়াছিল।

যোগেশ চক্রবর্তী বল লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, ব্যাকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িল বলিয়া। রবিবাবু খাঁচার বাঘের মত গোলের দুই পোস্টের মধ্যে বলের গতি অনুযায়ী একবার ডাহিনে, আবার বাঁয়ে হেলিতেছেন, চেঁচাইয়া বলিলেন, "সন্তোষ, অপোজ হিম, চার্জ কর।"

পিছন হইতে ক্ষিতীশদা রবিবাবুকে পরামর্শ দিলেন, "দুর্গা দুর্গা বলে বুক চেপে ধরুন, চোখ বন্ধ করুন, ফাঁড়া কেটে যাবে।"

রবিবাবুর এই দিকে কান দিবার মত অবস্থা ছিল না। তিনি সত্যসত্যই 'সিরিয়স' হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবার ধমক দিয়া উঠিলেন, "অপোজ হিম।"

হুকুম পাইবার পূর্বেই সন্তোষ দত্ত 'অপোজ' করিতে কুইকমার্চে ছুটিয়াছিলেন, ব্যাকের একটা দায়িত্ব আছে তো। কিন্তু যোগেশ চক্রবর্তী মানুষ মোটেই সুবিধার নয়, সন্তোষদার সম্মুখ দিয়াই বল লইয়া পাশ কাটাইয়া বাহির হইল। কাপুরুষ, ভয়ে পাশ কাটাইয়া পলায়ন করিল এবং গোল লক্ষ্য করিয়া ধাঁ করিয়া কিক্ করিয়া বসিল—বল গোলের অভিমুখে উঁচু হইয়া ছুটিয়া আসিল।

রবিবাবু পুরোভাগে ব্যাক সন্তোষ দত্তের অক্ষমতায় ও পশ্চাৎভাগে মাঠের বাহিরে ক্ষিতীশদার মর্মভেদী খোঁচায় অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সমালোচনায় যৎপরোনাস্তি চটিয়া রহিয়াছিলেন। বলটা তাঁর নাকের বরাবর হাত দুই দূরে থাকিতেই, রাগিয়া এমন ঘুঁষি মারিলেন, যেন এত দিনে ভগবান দয়া করিয়া বৃটিশ জাতিটারই মুখটি বলাকারে তাঁহার থাবার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন—'মারি কি বাঁচি' করিয়া তিনি ঘুঁষি ছাড়িলেন।

একে তো রবিবাবু শক্তিমান পুরুষ, তদুপরি বেশ একটু তপ্ত হইয়াই ছিলেন, ঘুঁষির জোরটা কাজেই মোক্ষমই হইয়াছিল। বলটা মাঝ মাঠ পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। রবিবাবু সটান ক্ষিতীশদার অভিমুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন মুখের ভাবখানা এই—বলি ব্যাপারটা দেখিয়াছেন, কি মনে হয়? আর ক্ষিতীশদার মুখের ভাবও দেখিবার মত হইল, ঘুঁষিটা যেন বলের বদলে তাঁরই মুখে লাগিয়াছে।

রবিবাবু খেলা শেষ হইবার অপেক্ষায় ছিলেন। গোলপোস্টের পিছনে দাঁড়াইয়া ক্ষিতীশবাবু এতক্ষন যেসব মর্মভেদী বাক্যবাণ অঙ্গভঙ্গী সহযোগে একতরফা নিক্ষেপ করিয়াছেন, খেলাতে আবদ্ধ থাকায় এতক্ষণ তার কোন প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবার অবসর মিলিয়াছে।

রবিবাবু ডাকিয়া কহিলেন, "সন্তোষ, ধর তো।" বলিয়া চোখের ইঙ্গিতে শিকার দেখাইয়া দিলেন।

মোটা শরীর ও ভুঁড়িপেট লইয়া শিকার তখনও গোলপোস্টের পিছনেই ছিলেন। সন্তোষবাবুকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ক্ষিতীশবাবু খেঁকাইয়া উঠিলেন, "আসুক না দেখি।" বলিয়া কিন্তু এক-পা দু-পা করিয়া পিছনে হটিতে লাগিলেন। সারা গায়ে ও কাপড়ে কাদা লইয়া সন্তোষ দত্ত ক্ষিতীশবাবুকে গিয়া জাপটাইয়া ধরিলেন।

উপরে পাহাড়ের গ্যালারীতে ও নীচে মাঠে যত দর্শক ছিলেন, পরম উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। চীৎকার শুনিয়া সিপাহীরা পর্যন্ত ফিরিয়া আসিল, খেলা শেষে তাহারা ব্যারাকের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

উঃ, কী আলিঙ্গন। যেন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে বাহুবেষ্টনে পাইয়াছেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই বীর জাপটাজাপটি করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন এবং ভীমরুলের কামড়-খাওয়া জীবের মত গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

রবিবাবু তফাতে দাঁড়াইয়া দেখিবার মত লোক ছিলেন না। আগাইয়া গিয়া ক্ষিতীশবাবুকে ধরিয়া এ-পাশ ও-পাশ করাইতে লাগিলেন—যেন অতিকায় একটি মৎস্যকে ভাজিবার পূর্বে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া মশল্লা মাখাইয়া লইতেছেন।

ক্ষিতীশবাবু যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন দেখা গেল যে, জলে-কাদায় তিনি এক কিম্ভূত-কিমাকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। মোটা গোঁফজোড়ায় কাদা লেপটাইয়া বাওয়ায় বীর-

ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া তাহার অবমাননায় হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। —সিপাহীরা পর্যন্ত খুশি হইয়া গেল।

লড়াই সংক্রামিত হইয়া গিয়াছিল। খেলোয়াড় ও অ-খেলোয়াড় সব জোড়ে জোড়ে জাপটাজাপটি চলিয়াছিল। পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া যাঁহারা নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া খেলা দেখিতেছিলেন, মাঠ হইতে কর্দমাক্ত শত্রু তাঁদের পিছনে তাড়া করিল। ব্যারাকের ভিতরেও গিয়া আক্রমণকারিগণ লড়াই শুরু করিয়া দিল। রোগী ও নিতান্ত বৃদ্ধ যাঁরা, তাঁরাই কেবল রেহাই পাইলেন। মেয়েরা থাকিলে তাঁরাও অবশ্য রেহাই পাইতেন, কারণ রণশাস্ত্রে অস্পৃশ্যদের তালিকায় রুগ্ন ও বৃদ্ধের সঙ্গে ইঁহাদেরও উল্লেখ আছে।

মাঠ হইতে একটা সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি ক্রমে ব্যারাকের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। এক সময়ে দেখা গেল, ভুঁড়িপেট ও মোটা শরীর ক্ষিতীশদা জন-চার-পাঁচেকের কাঁধে চড়িয়া চীৎ হইয়া ব্যারাকে প্রবেশ করিতেছেন। জল মাটিতে নামাইয়া রাখিতেই ওস্তাদ অমর চ্যাটার্জি সিগন্যাল দিল—"জয় বাবা ঘটোৎকচের জয়।"

সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বাহক দল ও অন্যান্য সকলে হুঙ্কার ছাড়িল, "জয়—"

ভূপতিদা বলিলেন, "কচ্ছপ তো দেখছি, গজটি কোথায়?"

ভীড়ের মধ্য হইতে সন্তোষ দত্ত উত্তর দিলেন—"হাম ইধরে হ্যায়।"

(ক্রমশ)

ভবিষ্যতের খাদ্য

অমরেন্দ্রকুমার সেন

আজ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই খাদ্যাভাব চলছে। মাত্র কয়েকটি দেশ ছাড়া কোন দেশের লোকই পেট ভরে খেতে পায় না। কি করে এই খাদ্যাভাব কাটিয়ে ওঠা যায়, সেজন্য সকলেই চিন্তা করছেন। কিন্তু সমস্যার শেষ এখানেই নয়, আরও বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সমগ্র পৃথিবীকে, যদি না ইতিমধ্যেই তার কোন সমাধান হয়। পরমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা অপেক্ষা অধিকতর খাদ্য উৎপন্নের গবেষণা আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে হবে।

আমাদের দেশে পতিত জমি উদ্ধার, সার প্রয়োগ, সেচকার্যের আধুনিক ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি, উৎকৃষ্ট বীজ বপন ইত্যাদির দ্বারা ফসল বাড়াবার খুবই চেষ্টা চলছে এবং এইরূপ ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য দেশও অবলম্বন করছেন। এর দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে, খাদ্যাভাবও অনেকটা মিটবে, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই উন্নতি হবে সাময়িক মাত্র। বেশী দিন নয় মাত্র পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীতে খাদ্যের এমন ঘাটতি পড়বে যে সে ঘাটতি পৃথিবী কাটিয়ে উঠতে পারবে কি না সন্দেহ। তাঁদের মতে পৃথিবীতে দৈনিক পঞ্চাশ হাজার করে' লোক বাড়ছে এবং যদি এই হারেই জনসংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে ২০০০ হাজার খৃষ্টাব্দে যে জনসংখ্যা হ'বে তাদের সকলকে পেট ভরে' খেতে দেবার মতো খাদ্য পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করা কঠিন হ'বে।

বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করলেও নিরাশ হননি। তাঁরা খাদ্যের নতুন উৎস সন্ধান করতে সুরু করে দিয়েছেন। যে খাদ্য মানুষ খেতে অভ্যস্ত নয় অথবা যেখান থেকে আহার্য কিছু পাওয়া যায় না বলে আমাদের ধারণা, সেই সব পদার্থ থেকে কি করে' খাদ্য পাওয়া যেতে পারে তার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ খুবই চেষ্টা করছেন। গাছ কি পদ্ধতিতে বাতাস ও জলকে নিজের পুষ্টির জন্য খাদ্যে রূপান্তরিত করে, সেই রহস্যকে উদ্ঘাটিত করবার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেছেন। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক এজন্য পরমাণবিক শক্তিরও সাহায্য গ্রহণ করছেন।

গাছ মাটি থেকে খাদ্যের যে সব উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলি হ'ল নাইট্রোজেন,
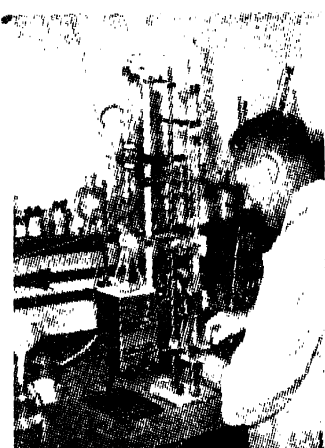
ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষারত ডক্টর স্পোহর

ফস্‌ফরস্ ও পটাশিয়াম আর কিছু কিছু ধাতব পদার্থ যথা লোহা, ম্যাগনিসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও গন্ধক। শিকড় দিয়ে এইগুলি উঠে গুঁড়ি ও ডাল বেয়ে একেবারে সেই পাতায় উঠে যায়। পাতা যেন গাছের রন্ধন-শালা। কিন্তু এই সব মাল মশলা রান্না করতে হ'লে চাই অঙ্গার। গাছ এই অঙ্গার সংগ্রহ করে হাওয়া থেকে।

হাওয়ায় অঙ্গার আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আকারে। গাছের পাতা এই কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেয়। গাছের পাতায় ক্লোরোফিল নামে একপ্রকার রসায়ন আছে যার জন্য গাছের পাতা সবুজ। এই ক্লোরোফিল সূর্যরশ্মির উপস্থিতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ভেঙে ফেলে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের অক্সিজেন গ্যাসরূপে হাওয়ায় উড়ে যায় আর কার্বন চিনি ও স্টার্চে রূপান্তরিত হয়। সূর্যরশ্মির সাহায্যে কার্বনের এই চরম পরিণতিকে বলা হয় "ফোটোসিন্থেসিস"। এই ফোটোসিন্থেসিস পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, গাছের পাতার ভেতর কি যে ঘটে তা আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। গাছের এই পদ্ধতি যদি মানুষ নকল করতে পারে, তাহলে খাদ্যসমস্যার চিরতরে মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু তা কি হবে!

যাই হোক আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ছাড়বার পাত্র নন। খাদ্যসমস্যার সমাধান করবার জন্য তাঁরা উঠেপড়ে লেগে গেছেন। তাঁরা এই গাছকে নিয়েই পড়েছেন। গাছই আমাদের খাদ্যের মূল উৎস, অতএব সেই গাছকে বাদ দিলে কি চলে?

গাছ থেকে স্নেহ(ফ্যাট)জাতীয়, আটা-ময়দা (কার্বোহাইড্রেট) এবং আমিষ (প্রোটিন) জাতীয় খাদ্য পাওয়া যায়। ডক্টর এইচ এ স্পোহর নামে জনৈক বৈজ্ঞানিক এমন এক পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে গাছের স্নেহজাতীয় উপাদান প্রস্তুত করবার যন্ত্র বন্ধ করে আমিষ জাতীয় উপাদান বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করতে পারেন অথবা অপর কোন একটির উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে আর একটির উৎপাদন বাড়াতে পারেন। ডক্টর স্পোহর একপ্রকার শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি ইচ্ছানুরূপ গাছের খাদ্যের একটি না একটি উপাদানের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে লাগলেন।

অবশ্য তাঁর এই পরীক্ষার ফল এমনই হয়ে ওঠেনি যে, কয়েক সের এই শ্যাওলা থেকে এক কৌটো মাখন পাওয়া যাবে, সে রকম অবস্থা কখনও হবে কিনা বলা যায় না। তবে এই পরীক্ষা আরও ব্যাপকভাবে সফল হলে গাছ পালার পুষ্টি বাড়বে এবং সেই সকল গাছপালা অথবা ফলমূল আরও কম পরিমাণে আমাদের খেলেও চলবে অথচ শরীরের পুষ্টি হবে বেশী। যে জমিতে সার অথবা ধাতব পদার্থ কম থাকে, সে জমিতে উৎপন্ন শস্য খেলে শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টি হয় না, কিন্তু জমি ভাল হলে তাতে সারবস্তু ও খনিজ পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে থাকলে এবং সেই জমিতে উৎপন্ন শস্য খাদ্য-রূপে গ্রহণ করলে শরীরের সম্যক পুষ্টি সাধিত হয়। মনে করুন আমরা ভালো জমিতে উৎপন্ন এক পোয়া পালং শাক অথবা দুটো বিলাতি বেগুন খেলে যে পুষ্টি হবে, ডক্টর স্পোহর অবলম্বিত উপায়ে যদি ঐ পালং শাক অথবা বিলাতি বেগুনের খাদ্যের উপাদান বাড়ানো যায়, তবে তা ঐ পরিমাণে খেলে শরীরের পুষ্টি বেশী হবে।

ডক্টর স্পোহর যে জলজ শ্যাওলা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, তার নাম ক্লোরেলা। তাঁর মতে ক্লোরেলা থেকে এক পাউন্ড স্নেহজাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করতে হলে ত্রিশ গ্যালন জলে প্রায় এক পাউন্ড ওজনের কয়েকটি লবণজাতীয় রসায়ন মেশাতে হবে এবং তাইতে ত্রিশ দিন ধরে ক্লোরেলার চাষ করতে হবে। শুধু তাই নয়, বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে, তার চেয়েও বেশী পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বিশিষ্ট বাতাস সেই জলে প্রবেশ করাতে হবে এবং জলের উত্তাপ যাতে ৭০ ডিগ্রি থেকে ৭৫ ডিগ্রি ফার্নাহিটের মধ্যে থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার ফোটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়া ঠিকভাবে চালাবার জন্য সূর্যকিরণকেও অবহেলা করলে চলবে না। লম্বা কাচের আধারে অথবা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পাত্রে এই পরীক্ষা করা যেতে পারে। অনেক জায়গায় সমুদ্রের জল আবদ্ধ হয়ে যায় ও সেখানে নানা জলজ উদ্ভিদ জন্মায়; এগুলির ওপরও পরীক্ষা চালিয়ে সফলকাম হতে পারা যায়। তবে ডক্টর স্পোহর এখনও পর্যন্ত তাঁর পরীক্ষার খুঁটিনাটি প্রকাশ করেন নি। এইটুকু বলা যায় যে, মূল খাদ্যের উৎস থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে পুষ্টি আদায় করে নেবার চেষ্টা শুরু হয়েছে। বস্তুত ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে জলজ উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করবার জন্য একটি বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হয়েছে।

দুজন বৈজ্ঞানিক, ডক্টর মেলভিন ক্যালভিন ও ডক্টর অ্যান্ড্রু এ বেনসন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোটোসিন্থেসিসের রহস্য ভেদ করবার চেষ্টায় কিছুদিন থেকে গবেষণায় লিপ্ত আছেন। এই দুজন বৈজ্ঞানিকও ক্লোরেলা নামক জলজ উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করছেন। তাঁদের পরীক্ষার বিশেষত্ব হচ্ছে যে, তাঁরা ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত কৃত্রিম স্বতঃদীপ্ত (রেডিও-অ্যাক্টিভ) কার্বন গ্যাসের সাহায্য নিচ্ছেন। তাঁরা এই কার্বন ক্লোরেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। এই স্বতঃদীপ্ত কার্বনের সুবিধা এই যে, সে ক্লোরেলার মধ্য দিয়ে কোথায় কোথায় যায়, তা গাইগার কাউন্টার নামক যন্ত্র দ্বারা ধরা যায়। ইউরেনিয়াম অথবা রেডিয়াম হ'ল আসল স্বতঃদীপ্ত ধাতু। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ কোন ধাতু অথবা মৌলিক পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে স্বতঃদীপ্ত করছেন, সেগুলি ঔষধরূপে এবং গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে "রেডিওস্টোপ"। এই রেডিও-স্টোপ জীবদেহে অথবা উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে তাদের গতিপথ গাইগার কাউন্টার নামক যন্ত্রে ধরা যায়। ডক্টর ক্যালভিন ও বেনসন ক্লোরেলার মধ্যে ঐ কার্বন রেডিওস্টোপ প্রবেশ করিয়ে গাইগার কাউন্টার দ্বারা তার গতিপথ নিখুঁতভাবে ধরবার চেষ্টা করছেন। এখনও তাঁরা ফোটোসিন্থেসিসের রহস্য ভেদ করতে পারেন নি, তবে আশা করছেন এক বৎসরের মধ্যেই পারবেন।

ডক্টর ক্যালভিন ও বেনসন এইটুকু জানতে পেরেছেন যে, সূর্যকিরণ শক্তিরূপে পাতায় প্রবেশ করলেই পাতা ধাতব পদার্থের সাহায্যে তাকে দিয়ে তিন প্রকার কাজ করিয়ে নেয়। প্রথম কাজ হ'ল স্টার্চ ও চিনি প্রস্তুত, দ্বিতীয় উদ্ভিজ্জ তেল প্রস্তুত আর তৃতীয় হ'ল প্রোটিন প্রস্তুত। ডক্টর স্পোহরের মতো তাঁরাও বলেন যে, উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ রসায়ন প্রবেশ করিয়ে তাদের মধ্যে ইচ্ছানুরূপ চর্বি, তেল অথবা প্রোটিন প্রস্তুত করা যাবে।

সমুদ্রের মধ্যে জলজ উদ্ভিদের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। এইগুলির ঠিকভাবে চাষ করতে পারলে অথবা তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ রসায়ন প্রয়োগে তাদের খাদ্যযোগ্য করতে পারলে মানুষের খাদ্যাভাব দূর হবে। সমুদ্রের জলজ উদ্ভিদ হয়ত আমাদের খেতে হবে, এ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। বেশীদিন নয়, ত্রিশ বৎসর আগে কে স্বপ্নে ভেবেছিল যে, টোম্যাটো আমাদের একদা প্রয়োজনীয় খাদ্য-রূপে পরিগণিত হবে? আলু সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। একদা আমরা আলুকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম, আজ আলু ছাড়া আমাদের চলে না। সেইরকম সামুদ্রিক উদ্ভিদ ব্যতীত আমাদের চলবে না, এমন দিন হয়ত আসবে। একদল বৈজ্ঞানিক আমাদের এখন থেকেই সামুদ্রিক উদ্ভিদ খেতে বলছেন, কারণ সামুদ্রিক উদ্ভিদ নানাপ্রকার খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ, যা আমাদের খাওয়া প্রয়োজন।
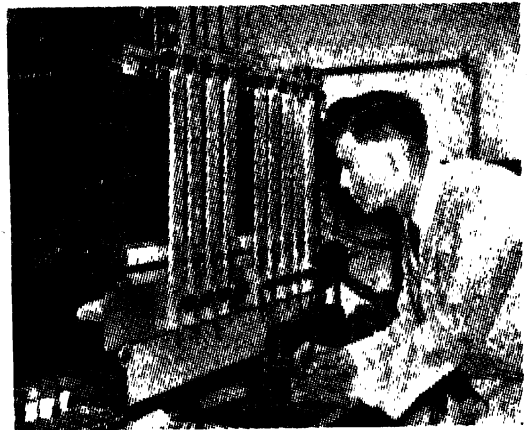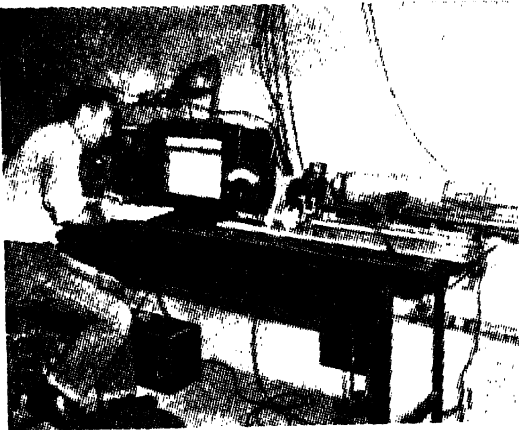
পরমাণবিকশক্তি সাহায্যে পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ স্থির করা হচ্ছে

ক্লোরেলা নামক শ্যাওলা নিয়ে পরীক্ষা চলছে
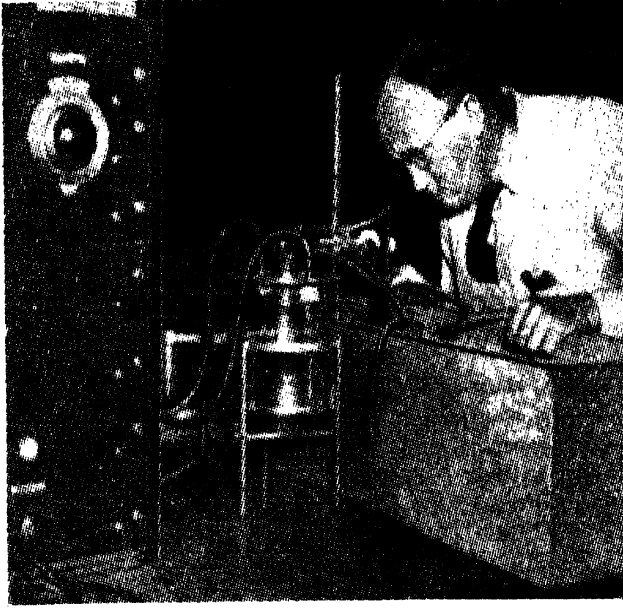
সামুদ্রিক উদ্ভিদ নিয়ে জনৈক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন

একজন বৈজ্ঞানিক প্রায় আড়াই হাজার সামুদ্রিক উদ্ভিদের এক তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তার মধ্যে প্রায় চারশ" প্রকার উদ্ভিদ মানুষের খাদ্যযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ক্যাপ্টেন জন ক্রেগ হলিউডের একজন বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার, তিনি সমুদ্রের ভেতর ছবি তুলে বিখ্যাত হয়েছেন। একবার তিনি ভারী ডুবুরীর পোষাক প'রে যন্ত্রপাতি নিয়ে সমুদ্রের তলায় ছবি তুলতে নেমে জলজ উদ্ভিদে আটকে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোথা থেকে এক জাপানী ডুবুরি এসে তাঁকে উদ্ধার করে। ব্যাপারটা পরে জানা গিয়েছিল। জাপানীরা সেইখানে মারাসগাসো নামে জলজ উদ্ভিদের চাষ করে এবং সেই জলজ উদ্ভিদ দেশে চালান দেয়। জাপানীরা ঐ জলজ উদ্ভিদ খেতে ভালবাসে। ঐ ডুবুরীটি তখন 'ফসল' সংগ্রহ করতে গিয়েছিল।

প্রোটিন, মানুষের খাদ্যের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রোটিন খাদ্য বিনা মানুষের বাঁচা মুশকিল। ডক্টর উডওয়ার্ড, যিনি কিছুকাল পূর্বে কৃত্রিম কুইনাইন প্রস্তুত করেছিলেন, তিনি কৃত্রিম প্রোটিন প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন, তবে তা খেতে মোটেই সুস্বাদু নয়। হয়ত এই কৃত্রিম প্রোটিন অপর কোন খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। কিন্তু একদল বৈজ্ঞানিক বলছেন যে, যে সমস্ত উপকরণ থেকে কৃত্রিম প্রোটিন প্রস্তুত করা হচ্ছে, সেইগুলিই ত' খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়, অতএব এই খাদ্যবস্তুকে নষ্ট করে কৃত্রিম প্রোটিন প্রস্তুত করবার প্রয়োজন কি? বরঞ্চ সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে কৃত্রিম প্রোটিন প্রস্তুত করা ভাল, কারণ সামুদ্রিক উদ্ভিদের ভাণ্ডার অফুরন্ত। সুখের বিষয় যে, বর্তমানে সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে।

আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে করাতের গুঁড়ো এবং কাঠের ছিলে লক্ষ লক্ষ টন নষ্ট হয়। অথচ এই কাঠের গুঁড়ো থেকে চিনি, ইথাইল এ্যালকোহল এবং ইস্ট অথবা 'বি' ভিটামিন প্রস্তুত করা যায়। গত যুদ্ধের সময় জার্মানরা করাতের গুঁড়ো থেকে উৎকৃষ্ট পশু-খাদ্য প্রস্তুত করেছিল। কাঠে সেলুলোজ নামে যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে, তাতে অ্যাসিড প্রয়োগ করে চিনি প্রস্তুত করা যায়। এক টন কাঠের গুঁড়ো থেকে ৫০০ পাউণ্ড ইস্ট প্রস্তুত করা যায়, যা থেকে আবার 'বি' ভিটামিন তৈরি করা শক্ত নয়। উৎকৃষ্ট হুইস্কি প্রস্তুত করতে যে প্রকার অ্যালকোহল ব্যবহার করতে হয়, সেই প্রকার উৎকৃষ্ট অ্যালকোহলও কাঠের গুঁড়ো থেকে প্রস্তুত করা যায়। এই অ্যালকোহলের নাম ইথাইল অ্যালকোহল!

আজকাল ইউরোপের কয়েকটি দেশে মাল্টি-পার্পাস-ভিটামিন ফুড অথবা সংক্ষেপে এম-পি-ভি নামে এক প্রকার খাদ্যের সারাংশ পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাংস, ডিম, দুধ এবং সব্জী থেকে এই খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এই খাদ্য গুঁড়ো আকারে পাওয়া যায়, এতে জল মিশিয়ে ঝোলের মতো করে অথবা অন্য কোনো খাদ্যে মিশিয়ে খাওয়া যায়।

ডিমের খোলা আমরা ফেলে দিয়ে থাকি অখাদ্য বলে; কিন্তু আজকালকার খাদ্যবিদ্‌গণ ডিমের খোলা খেতে বলেছেন, কারণ ডিমের খোলায় আছে প্রচুর ক্যালসিয়াম, যা আমাদের হাড় মজবুত করতে প্রয়োজন। অবশ্য দুধ খেলে ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য অনেক খাদ্যের প্রয়োজন মেটে, কিন্তু দুধ কোথায়? পৃথিবীতে যত দুধ উৎপন্ন হয়, গরু অথবা মহিষের, তা প্রত্যেক লোকের কুলোয় না। স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে এখন থেকে অনেক খাদ্য খাওয়া অভ্যাস করতে হবে, যা আমরা অখাদ্য বলে থাকি। এইরূপ একটি খাদ্য হল হাড়। হাড় আমরা একটু-আধটু খাই নরম তরুণাস্থি পেলে, আর খাই টেংরি অনেকক্ষণ জলে সিদ্ধ করে। তবে টেংরিটা খাই না, খাই ঝোলটা এবং টেংরির মধ্যে যে মজ্জা থাকে। মজ্জা রক্ত পরিবর্ধক এবং কোন কোন ধাতব পদার্থ এতে থাকে। কিন্তু হাড়কে অনেকক্ষণ আবদ্ধ পাত্রে ফুটিয়ে নরম করে ও তারপরে গুঁড়িয়ে খেলে সেই সঙ্গে শুধুই ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস খাওয়া হবে না, কিছু ফ্লোরিন খাওয়া হবে, যা দাঁত রক্ষা করতে প্রয়োজনীয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না এবং জমির উৎপাদনেরও একটা সীমা আছে। খাদ্যরূপে ব্যবহারের জন্য পশুপক্ষীর সংখ্যাও বাড়ানোর ব্যবস্থাও খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তাদের থাকতে ও খেতে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেইজন্য মানুষ আজ অন্য উপায়ে তার ভবিষ্যতের খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়েছে।

চৌকিদার

সুশীল রায়

গ্রাম্য পথ। চৌকিদার চলেছে। গ্রামের পথে পথে পদধ্বনি তুলে চৌকিদার গ্রাম পরিক্রমা ক'রে চলেছে। একা একা রাত্রির অন্ধকার কেটে কেটে সে প্রহরা দিয়ে বেড়াচ্ছে। হাতের জ্বলন্ত আলোটিই তার একমাত্র সঙ্গী। শ্মশানের পাশ দিয়ে, কবরখানার গা ঘেঁষে প্রত্যহ সে এমনি চলে। রাতের গাঢ় অন্ধকার তার হাতের আলোর ইসারায় পথ থেকে যেন স'রে দাঁড়ায়। চৌকিদার চলে।

ঘুমন্ত গৃহস্থদের সচকিত ক'রে হেঁটে চলে চৌকিদার—রাতের প্রহরী। কখনো কোনো শিশুর অবাধ্য কান্না, কখনো দূর থেকে শৃগালের ডাক শুনে সে বুঝতে পারে, পৃথিবীর প্রাণ আছে। এ ছাড়া নীরব নির্জীব চারিধার। শুধু মাঝে মাঝে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে বেজে ওঠে—

চৌকিদার। খবরদার! খবরদার......কে জাগে কে জাগে!

সিরাজ। (চাপা গলায়) ওই, ওই শোন। সাড়া দাও। জবাব দাও—জেগে আছ কিনা। ও-ভাবে চুপ ক'রে থেকো না, রাবেয়া। বলো, কিছু একটা বলো। জেগে আছ, কি, জেগে নেই। —কথা বলতে ভুলে গেছ বুঝি?

চৌকিদার। হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার।

সিরাজ। সাবধান, সাবধান, রাবেয়া। কথা ব'লো না। সাড়া দিয়ো না। চুপ, চুপ। একটুও যেন শব্দ হয় না। রাতের প্রহরী হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওই শোন—

চৌকিদার—(বহুদূরে) হুঁশিয়ার।

চৌকিদার হানা দিয়ে বেড়ায়। হাতের লণ্ঠন ঘুরিয়ে সে দেখে, যতদূর দৃষ্টিকে সে প্রসারিত করতে পারে। পথে পথে সে ঘুরে বেড়ায় রাতের পর রাত। অন্ধকারের আনাচ-কানাচ হয়ত খোঁজে, হয়ত খোঁজে না। নেহাৎ মুখস্ত করা হাঁক হেঁকে ঘুরে বেড়ায় চৌকিদার।

চৌকিদার। (পদশব্দ এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে) খবরদার, খবরদার। হুঁশিয়ার।

সিরাজ। জানতে পারেনি, রাবেয়া। বেঁচে গেছি এ-যাত্রা। জেগে আছ কিনা, কিছু ব'লো না। আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, ভুলেও তার জবাব দিয়ো না। শুধু কানে-কানে একবার এই সুযোগে ব'লে নাও—জেগে আছ কিনা। বলো, হ্যাঁ আছি।—কই, বলছো না তো। নিস্তেজ হ'য়ে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কী দেখছো? বলবে না? ঠাণ্ডা তোমার হাত। সত্যি তুমি ম'রে গেছ কিনা বলো তো। অসম্ভব, হ'তে পারে না। বিশ্বাস করতে পারিনে। মিথ্যা, মিথ্যা ও কথা।

[গাছের পাতায় বাতাসের দীর্ঘনিশ্বাস বাজে।]

ও কিসের শব্দ? কার দীর্ঘনিশ্বাস? অমন ক'রে নিঃশ্বাস ফেললে কেন? বলো, কী হ'য়েছে তোমার। বলো, খুলে বলো, রাবেয়া।

চৌকিদারের কণ্ঠস্বর দূরে মিলিয়ে গেছে। নিশীথ রাত্রে বাতাসও যেন রুদ্ধ নিশ্বাসে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছে রাতের ভাষা। রাত্রি কথা কয়। রাত্রি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে। কে কে জেগে আছে এই ঘোর নিশীথে, কে তার হিসেব রাখে। চৌকিদার শুধু চৌকি দিয়ে বেড়ায়। জাগ্রত রাখতে চেষ্টা করে গৃহস্থদের। কিন্তু তার সেই সন্ধানী দৃষ্টির অগোচরে কী ঘ'টে যায়, তা নিশ্চয় সে জানে না। শ্মশানের পাশ দিয়ে, কবরখানার গা ঘেঁষে আবার সে ফিরে আসে।

চৌকিদার। কে জাগে?—হুঁশিয়ার।—

সিরাজ। (অস্ফুষ্ট শব্দে) চিনতে পারছো না আমাকে? আমি সিরাজ। (হাসি) রাবেয়া চিনেও চিনেনা আমাকে। এতদিনের পরিচয় আজ ধুলোয় ধূসরিত হ'য়ে গেলো। এই মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে সেই আত্মীয়তা। কত প্রতিশ্রুতি, কত কল্পনা, কত চাটুকথা, কত স্তুতিবাদ সব মুছে গেলো নিমিষে। আজ তৃতীয় রাত্রি। চৌকিদারের তীক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে আজ আবার তোমায় দেখতে এসেছি। তুমি বদলে গেছ, রাবেয়া। অনেক অন্যরকম হ'য়ে গেছ তুমি। দিন দিন তুমি বদলাচ্ছ। মানুষ এমনি বদ্‌লে যায় বুঝি? এমনি ভুলে যায় হয়ত। এতদিন একথা বুঝতে দাওনি কেন? কেন বলোনি, নিমেষে তুমি বদলে যেতে পারো। তোমার চোখ ঘোলাটে হ'য়ে এসেছে। মুখে সে পালিশ আর নেই। আমি রোজ আসব, রোজ দেখব—কতটা তুমি বদলাতে পার। কতদিনে তুমি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে পারো। তোমার শ্রী, তোমার সৌন্দর্য—এই তার দাম? এত সহজে, এত অল্প সময়ে এমন শ্রীহীন তুমি হ'ত পারলে?

চৌকিদার। কৌন হ্যায়! কে কথা বলে?

সিরাজ। কথা? কই, কথা তো কেউ বলেনি। আমি তো একমনে ব'সে ব'সে ভাবছি। আমার ভাবনা বুঝি শব্দ ক'রে উঠেছে! রাবেয়া, বোরখা দিয়ে ঢাকো নিজেকে। ইজ্জৎ বাঁচাও। এই নাও মাটি, এই নাও কাদা।

চৌকিদার। (রূঢ় গলায়) কে তুমি? কে এখানে?—চোর, চোর......

সিরাজ। চোর নই। মিথ্যে কথা বলছো, চৌকিদার। আমি চোর নই।

চৌকিদার। এখানে কি করছো তবে? এই রাতে, এই কবরখানায়?

সিরাজ। চুরি করিনি ভাই। দেখছিলাম।

চৌকিদার। চলো আমার সঙ্গে।

সিরাজ। হাত ছাড়ো। বলো, কোথায় যেতে হবে। আমি নিশ্চয় যাব।

চৌকিদার। কোথায় যেতে হবে জানো না? কি করছিলে এখানে?...একি, কবর খুঁড়ে ফেলেছ। মড়া চুরি করতে এসেছিলে? সব মাটি খুঁড়ে তুলেছ? তুমি কি মানুষ। তুমি জানোয়ার একটা।

সিরাজ। তুমি মালিক। তা ব'লে তা-ই কি সত্যি? আমি জানোয়ার নই। আমি মানুষ, তোমারি মত মানুষ।

চৌকিদার। কি করছিলে এখানে?

সিরাজ। রাবেয়াকে দেখতে এসেছিলাম। ও নাকি ম'রে গেছে পরশুদিন হঠাৎ নাকি ম'রে গেছে। তোমার বিশ্বাস হয়, চৌকিদার? তিন দিন আগে তোমার সঙ্গে যে হেসে কথা বললো, সে যাবে ম'রে? সে ম'রে যেতে পারে?

চৌকিদার। খুব হ'য়েছে। কিছুই যেন জানো না। মানুষ ম'রে যাওয়াটা খুব যেন আশ্চর্য।

সিরাজ। আশ্চর্য নয়? তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছে? সে কি, বিশ্বাস হ'চ্ছে তোমার? কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করতে কিছুতেই পারছিনে। আমাকে বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারো, চৌকিদার?

চৌকিদার। উহুঁ। তিনে-দুয়ে কত হয়?

সিরাজ। কেন। পাঁচ।

চৌকিদার। বুঝলাম। জ্ঞান তোমার আছে। পাগল তুমি নও। তাহ'লে আর কিছু বুঝিয়ে দেবার আমার নেই। বিশ্বাস তোমার করতেই হবে।

সিরাজ। একী জুলুম! করতেই হবে বিশ্বাস?

চৌকিদার। নিশ্চয়। যাক, বাজে সময় নষ্ট করিয়ো না। চলো আমার সঙ্গে। তুমি চোর তুমি ডাকাত। মড়া মানুষকে খুঁচিয়ে যে জাগাতে চায়, জ্যান্ত মানুষ জবাই করার চেয়েও তার—

সিরাজ। ছিছি। তুমি বলছো কি আলোটা নিয়ে একবার এসো এদিকে মাটির আবরণ তুলে তোমাকে দেখাচ্ছি সোনার মূর্তি দেখাব তোমাকে, চৌকিদার সে সোনা এখন সোনা নেই—পেতলের মত কুৎসিত হ'য়ে গেছে। রং চ'টে গেছে তার।

চৌকিদার। কিসের কথা বলছো?

সিরাজ। মেহেরবাণী ক'রে একটু এসো আমার সঙ্গে।—এই দ্যাখো মুখ, এই দ্যাখো চোখ। আলোটা আর একটু এদিকে আনো। চমকিও না, চৌকিদার। ভয় পেয়োনা, চৌকিদার। এই আমার রাবেয়া। পরশুদিন একে মাটি-চাপা দেওয়া হ'য়েছে। তাকিয়ে দেখ ভাল ক'রে। বিশ্বাস করতে পারছো, ও ম'রে গেছে!

চৌকিদার। (অট্টহাসি) পাগলের মত অত বকছো কেন? বিশ্বাস মানে? তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

সিরাজ। বোঝা শক্তই বটে। তুমি যদি চৌকিদার না হ'য়ে—

চৌকিদার। থাক ও-কথা। চলো আমার সঙ্গে। বাজে ব'কে অনেক সময় নষ্ট হ'য়েছে। এসো, এসো আমার সঙ্গে

সিরাজ। যেতে হবে? আমায় এখান থেকে যেতে ব'লো না, চৌকিদার। আমায় থাকতে দাও, আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে চাই।

চৌকিদার। দেখাব এখন। তোমার পাপের সাজা আছে। ইস্, যে ম'রে গেছে, যাকে কবর দেওয়া হ'য়েছে তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকতে না দিয়ে তার ওপর এই অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছ। তুমি বে-আইনী কাজ ক'রেছ! চলো চলে এসো।

সিরাজ। অমন নিষ্ঠুর হ'য়ো না। অমন ক'রে টেনো না আমাকে। শোনো আমার কথা। চৌকিদার, তুমি মানুষ। তুমি নিষ্ঠুর হবে? আমায় দেবে না দেখতে?

চৌকিদার। কী আর দেখবে? দেখার আর আছে কি? কখন ও খতম হ'য়ে গেছে।

সিরাজ। মানুষ ম'রে গেলে দেখতে পায় না কেন, বলতে পারো? আমি তা-ই খুঁজে বেড়াচ্ছি। চোখ দুটো টেনে টেনে আমি দেখেছি, ওর চোখের তারা দুটো তেমনি কালো, তেমনি চেয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু আমায় দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে নিশ্চয় একবার আমার সঙ্গে কথা বলতো।

চৌকিদার। তা বলতো বটে। দেখতে যদি পেতো, কথা তাহ'লে বলতোই। এতক্ষণে তুমি সহজ মানুষের মত কথা বলেছ বটে।

সিরাজ। আরও কি জানো, চৌকিদার। ও ভুলে গেছে সব কথা। এমন ভুলো মন ওর আগে ছিল না। সব কথা ও মনে রাখতে পারতো। ছোট্ট একটা কথা বলছি, শোনো চৌকিদার। অহল্যাবাঈ রোড। সিঁথির সিঁদুরের মত টুকটুকে লাল একটা সুরকির সড়ক। বহুদিন আগের কথা। আমরা তখন বালক-বালিকা। সেই লাল অহল্যাবাঈ রোডে এক্কায় চেপে আমরা একদিন বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ধবধবে শাদা টাট্টু ঘোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো একাটা। হঠাৎ কাৎ হ'য়ে প'ড়ে গেলো ঘোড়া, গড়িয়ে গেলো গাড়ি। ওর কিছু হ'লোনা। আমার কপালটা কাটলো। কপালের রক্ত আর অহল্যাবাঈ-এর ধুলো মিলেমিশে এক হ'য়ে গেলো। দুই-ই যে লাল।

চৌকিদার। এ-ও একটা গল্প নাকি?

সিরাজ। গল্প কেন, সত্যি ঘটনা। মাত্র কিছুদিন আগে সে কি বললো জানো? বললো, সেই ধুলোয় আর সেই রক্তে যেমন অদ্ভুত মিল সেই বাল্যের দুর্ঘটনায় ঘটেছিলো, যৌবনের বেদনাকে আমরা তেমনি রঙ্গীন মিলে বাঁধবো। শিশু-স্বপ্নকে যৌবনের দুঃস্বপ্নের সঙ্গে এক সূত্রে সে কী ভাবে বেঁধেছিলো বলো তো! এত যার স্মৃতিশক্তি, সে আজ দু'দিন আগের প্রতিজ্ঞা পালন করতেই ভুলে গেলো! সব ভুলে গেছে ও। কিছুই আর ওর মনে নেই। এমন কেন হয়, বলতে পারো?

চৌকিদার। পারিনে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কিনা, বলো।

সিরাজ। জোর করছিনে। যাব না বলছিনে। তুমিও জোর ক'রো না, ভাই। তুমিও আমায় যেতে ব'লো না। আমি দেখবো, ধীরে ধীরে জল যেমন ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে যায়, মানুষও তেমনি ধীরে ধীরে উড়ে যায় কিনা। এই কবরের কাছ থেকে আমি নড়বো না। আমি একদৃষ্টে চেয়ে থাকবো ওই মৃতদেহের দিকে। যদি যায়, যাক্। আমার চোখের সামনে থেকে নিজেকে যদি ও সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, বাধা দেব না আমি। আমি শুধু ব'সে ব'সে দেখবো তার অন্তর্ধান।

চৌকিদার। (হাস্য) পাগলই বলতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা, দেখ ব'সে ব'সে। চৌকি দিয়ে ব'সে থাকো। দেখো, ধরতে পার কিনা।

সিরাজ। ধরতে চাইনে। যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, তাকে ধরতে তো চাইনি। যে ব'লেছিলো, কখনো চোখের আড়াল হ'তে সে পারবে না, কখনো মনের অগোচরে যেতে সে পারবে না, তার কী ক'রে মতের বদল হ'লো—এইটে শুধু দেখতে চাই। কত কথা সে ব'লেছিলো, সব বাজছে কানের মধ্যে, ঝঙ্কার দিয়ে বেড়াচ্ছে আমার শরীরের রক্তে রক্তে। শুনবে চৌকিদার, শুনবে তার কথা? কান পাতো আমার বুকের ওপর, শুনতে পাচ্ছ তার কণ্ঠস্বর।

[রাবেয়ার কণ্ঠস্বর বাজতে লাগলো]

রাবেয়া। সিরাজ, সিরাজ, সিরাজ। সমুদ্র দেখেছ সিরাজ? তীর থেকে সমুদ্রকে টেনে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ঈশ্বরের কত ষড়যন্ত্র। কত আকর্ষণ, কত প্রলোভন, কত উৎপীড়ন। সমুদ্রকে যতই টেনে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সমুদ্র ততই সব বাধা-নিষেধের জাঙ্গাল ভেঙে ঢেউ-এ ঢেউ-এ বাহু বাড়িয়ে হাহাকার করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বালুর বেলায়। তীরকে তরঙ্গ কি কখনো ছাড়তে পারে? পারে না। কখনই পারে না। আমি তরঙ্গ, তুমি তীর। যুগ-যুগান্তর ধ'রে বাহিরবিশ্বে প্রবল আলিঙ্গনের মালা-পরানো চ'লেছে, সেই মালার একটি লহর আমাদের অন্তরের মাঝখানে এসে জড়িয়ে গেছে। এ-কথা বিশ্বাস করো, সিরাজ?

সিরাজ। সমুদ্র দেখেছি। তুমি কি পাহাড় দেখেছ, রাবেয়া?

রাবেয়া। দেখেছি। কেন সিরাজ?

সিরাজ। ঝরণা দেখেছ? এঁকে-বেঁকে ঝিরঝির ক'রে ঝরণা কেমন নেমে আসে, দেখেছ?

রাবেয়া। দেখেছি। পাহাড়ের গলায় মালা হ'য়ে পাক খেয়ে খেয়ে নেমে আসে ঝরণা। নুড়ির বাজনা বাজাতে বাজাতে গান গায় ঝরণা। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি সেই গান। কিন্তু কেন?

সিরাজ। না, এমনি। তুমি তবে জানো। আমাকে তুমি পাথর ভেবো না, আমি পর্বত। তোমাকে চঞ্চল চটুল আমি ভাবব না। তুমি ঝরণা।

রাবেয়া। ঠিক। তুমি স্থির, তুমি অটল। কিন্তু সিরাজ, পাথরও যদি তুমি হও, তবু তুমি সার্থক। পাথরেরও প্রাণ আছে। পাহাড় বাড়ে, পাহাড় ধীরে ধীরে বড় হয়—এটা কি তার প্রাণের লক্ষণ নয়? আমি ভালোবাসি অটল প্রাণ।

সিরাজ। আমি ভালবাসি গতি—বেগের আবেগ। ধীরে ধীরে বড় হয় ঝরণা। পাহাড় কেটে কেটে নিজের চলার পথ নিজের শক্তিতে সে বড় করে। সে চায় বড় হ'তে, আরও বড়, আরও অনেক বড়। নদী দেখেছ?

রাবেয়া। (হাসি) কি বলছো তুমি? সম্মুখে ওটা কি? কিসের দোলায় দোল খাচ্ছি আমরা?

সিরাজ। তাও তো বটে। এ নৌকোকে এখন নৌকো বলতে ইচ্ছে করছে না। এ এখন তরণী। নদীটাও নদী নয়। এখন এ তটিনী।

রাবেয়া। জীবনকে কাব্য দিয়ে বেঁধো না, সিরাজ। তার পরিণাম বড় কষ্টকর। বড় দুঃখ পাবে তা হ'লে।

সিরাজ। কিসের কষ্ট? কিসের দুঃখ?

রাবেয়া। কিছু না। সমুদ্রের গর্জন আর পাহাড়ের গর্জন, দুই-ই বড় মারাত্মক। সমুদ্রের গর্জনে পৃথিবী কেঁপে ওঠে, পাহাড়ের গর্জনে পৃথিবী নির্বাক হ'য়ে যায়। একদিন যদি আসে সেই গর্জনের ডাক। একদিন যদি আসে সেই ভয়ের সংকেত। ভয় পেয়ো না, সিরাজ। সমুদ্রের গর্জনের মধ্যেই তরঙ্গের আবির্ভাব, পর্বতের গর্জনের নীচেই ঝরণার অস্পষ্ট কলকাকলী। একথা মনে রেখো। জীবনে যদি কখনো দুঃখ আসে, সেই দুঃখের গোপনে

লুকিয়ে এসে আমি দুঃখমোচনের ডাক দেব। কিছু ভেবো না, সিরাজ। পথে যদি বাধা আসে, একবার নাম ধ'রে আমায় ডেকো।

সিরাজ। রাবেয়া।

রাবেয়া। বলো।

সিরাজ। তোমার এত কথার মানে?

রাবেয়া। মানে আবার কি? মানে ঐ মেঘ। হ'তেও পারে, ঐ মেঘই দুর্যোগের ইঙ্গিত। পশ্চিমে চেয়ে দেখো। নদীর ওপারের ওই ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর ডিঙিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে কালো মেঘ।

সিরাজ। কী যে বলো। কী হ'য়েছে তোমার আজ? এতটুকু মেঘের ছায়া দেখেই তুমি দুর্যোগ আঁচ করতে ব'সেছ!

রাবেয়া। ওখানেই তো আমাদের ভুল। ক্ষুদ্রকে আমরা বড়ই তুচ্ছ ক'রে দেখি। ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহতের বীজ যে থাকে, এটা আমরা মানতে চাইনে।

সিরাজ। মানি। কেন মানবো না।

রাবেয়া। মানোই যদি, তবে অমন উপেক্ষা ক'রোনা ওই দেখ, কথায় কথায় মেঘ কতটা বড় হ'য়ে উঠেছে।

সিরাজ। একটি মুহূর্তে মোর, সে-যে চিরকাল। আমাদের এই পরম মুহূর্তটি তুমি মেঘের কাহিনী ব'লেই নষ্ট করতে চাও বুঝি?

রাবেয়া। এক টুকরো একটা মুহূর্তকে চিরকালের মর্যাদা দিতে চাও, আর এত বড় একটা মেঘ কয়েকটা কথার গৌরব কেন পাবে না? গরম বাতাস লাগছে না গায়ে?

সিরাজ। লাগছে। জলের মধ্যে ব'সে বাতাসটা বড় মিষ্টি ঠেকছে।

রাবেয়া। মেঘ কিন্তু আরও বড় হ'য়ে উঠলো। এবার নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চলো। একেবারে মাঝগাঙে এসে প'ড়েছ। কিনারে চলো শীগ্‌গির।

সিরাজ। তুমি বড় ভীতু, রাবেয়া।

রাবেয়া। ভয় নয়, ভাবনা। যদি ঝড় ওঠে, শুধু এই ভাবনা এ ছাড়া আর কিছু নয়।

সিরাজ। এ-ভাবনা বুঝি মিছে নয়, রাবেয়া। ঝড়ই বুঝি ওঠে। পালে এসে ঘা দিলো দমকা বাতাস। সাঁতার জানো?

রাবেয়া। আমার জন্যে ভাবনা নেই, তুমি জানো কি না, বলো।

[সামান্য ঝড়ের শব্দ]

ঐ উঠেছে ঝড়। ধীরে ধীরে আকাশ ঢেকে এলো মেঘে। চারদিক অন্ধকার হ'য়ে আসছে, সিরাজ। ক'সে দাঁড় টানো, এই আমি বসলাম হালে। জীবনের অগ্নিপরীক্ষা এসে গেলো বুঝি। ওকি, তুমি নির্বাক হ'য়ে গেলে কেন? কথা বলো—

সিরাজ। শুধু নির্বাক নই, আমি নির্বোধ হ'য়ে গেছি। কি করতে হবে বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে।

রাবেয়া। এই তো সুবর্ণসুযোগ। অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে, এসো, দু'জন দু'জনকে পরখ করে নিই। শপথ করি এসো, চরম দুঃখেও আমরা তফাৎ হবো না। আসুক ঝড়, আসুক প্লাবন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। তুমিও প্রতিশ্রুতি দাও। বলো, কখনো আমায় ছেড়ে যাবে না।

[ঝড়ের শব্দ]

এসেছে। এসেছে। অনেক প্রতীক্ষার পর এসেছে প্রলয়। ভয় পাইনি, ভাবনা হচ্ছিল। যদি ঝড়ের ঝাপটায় আমার কাছ থেকে দূরে স'রে যাও—শুধু এই ভাবনা। কিন্তু না, কিছুতে না। কখনো না। এ হ'তে পারে না, এ হ'তে দেব না। তীর আর কত দূর, সিরাজ।

সিরাজ। এই তো আমি। তুমি উতলা হ'য়ো না। নদীর তরঙ্গ তুমি নও। তুমি সাগরের ঢেউ। নদী উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে।

রাবেয়া। না, না—তুমি না। তীর— নদীর কিনার।

সিরাজ। সে এখন অনেক দূরে। তীরের মায়ায় বেঁধো না নিজেকে। এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর, রাবেয়া।

অনেক জল উঠে পড়লো নৌকোয়। নৌকো ডুবলে উপায় কি হবে?

রাবেয়া। হাত চেপে ধরো আমার। দাঁড় টেনে কোনো ফল নেই। পাল ফেঁসে গেছে। ঝড়ের ধাক্কায় আমরা নিরুদ্দেশের দিকে চ'লেছি

সিরাজ। বুঝতে পারছি। তবু চেষ্টা করা চাই। হাল ছেড়ে দিয়ে বসোনা, তুমি। বিপদে হাল ছাড়তে নেই, রাবেয়া।

রাবেয়া। কিসের বিপদ। প্রেম আমাদের রক্ষাকবচ, মৃত্যু মোদের নাই।

[ঝড়ের শব্দ অব্যাহত]

সিরাজ। মিথ্যে কথা।

রাবেয়া। মিথ্যে নয়। কেউ রুখতে পারবে না। কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এই নামলো বৃষ্টি। বর্ষণ শুরু হ'লো। দুর্যোগের আবির্ভাব ঘ'টেছে এবার। আসুক দুঃখ, আসুক কষ্ট। সিরাজ, ভয় পেয়ো না; ভাবনা ক'রোনা। আমি আছি তোমার পাশে। এই তো আমি। ভালো ক'রে চেয়ে দেখ, এই যে আমি। বৃষ্টি চোখে বিঁধছে বুঝি? তাকাতে পারছ না ভাল ক'রে?

সিরাজ। চারদিক অন্ধকার। আলো— আলো। দিক ভুল হ'য়ে যাচ্ছে আমার।

রাবেয়া। এই যে আমি। এদিকে চাও। অধীর হ'য়ো না। কিসের ভয়, কিসের ভাবনা। সব তুচ্ছ ক'রে নতুন কিনারে গিয়ে পৌঁছতে আমাদের হবেই। বিপদকে সাক্ষী রেখে শপথ করছি, শুনতে পাচ্ছ তো? এই বিপদকে সাক্ষী রেখে বলছি—অতলে যদি তলিয়ে যাই, তবু তোমার সঙ্গী থাকবো। স্রোতের মুখে যদি দিক ভুল ক'রে ফেলো, তবুও সঙ্গী থাকবো আমি।

সিরাজ। দিক ভুল ক'রেছি, রাবেয়া। আর বাঁচবার উপায় নেই।

রাবেয়া। বলো কি, বাঁচতে আমাদের হবেই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে—

সিরাজ। মৃত্যুর মুখে আর নেই, মৃত্যুর গহ্বরে যেতে আরম্ভ ক'রেছি এবার। ডুবে যাচ্ছে নৌকো। উঠে আসছে ঢেউ। আমার হাত ধরো, রাবেয়া।

রাবেয়া। আমি আছি। ভয় নেই। একা তোমাকে ফেলে কোথায় আমি যাব? সিরাজ, সিরাজ! আমাকে সঙ্গে টেনে নাও, আমাকে ছেড়ে দিয়ো না।

[ঝড়ের শব্দ বন্ধ]

সিরাজ। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠস্বর চাপা প'ড়ে যেতে লাগলো। সেই অঝোর বর্ষণের মাঝ থেকে, সেই ফেনিল জল-কল্লোলের ভেতর থেকে তাকে—

[চৌকিদার ও সিরাজ]

চৌকিদার। উদ্ধার করতে পারলে না?

সিরাজ। পেরেছিলাম। অনেক কষ্টে তাকে উদ্ধার ক'রে কিনারে পৌঁছেছিলাম, চৌকিদার।

চৌকিদার। তা হ'লে—

সিরাজ। তাহ'লে কি, তা কি তুমি বুঝলে না? সেই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝখান থেকে তাকে টেনে আনলাম। কিন্তু সে সহ্য করতে পারেনি সেই প্লাবন। দু'দিন সে পড়ে রইলো অসুস্থ হ'য়ে, তিন দিনের দিন—

চৌকিদার। বুঝলাম। সব প্রতিজ্ঞা ভেঙে সে পালিয়ে গেলো?

সিরাজ। পালিয়েই বুঝি যেতো। কিন্তু পালাতে দিইনি তাকে। তা'কে আমি ধরে রেখেছি। দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে দিইনি। আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া কি কথার কথা। এই কবরখানায় আমি তা'কে আগলে বসে আছি। আমি দেখতে চাই, কত নিষ্ঠুর সে হ'তে পারে, কত ভঙ্গুর হতে পারে তার ভালবাসা।

চৌকিদার। তুমি প্রহরী হ'য়ে ব'সে থাকবে এই কবরখানায়? তা'তে কি আর ফিরে পাবে?

সিরাজ। ফিরে পাবার আশায় ব'সে নেই। জীবন এত তাড়াতাড়ি এমন মিথ্যে হয় কি ক'রে তাই জানতে চাই। সোনার শরীর কাদা হ'য়ে যায় কি ক'রে নিজের চোখে তা-ই দেখতে চাই। মানুষ ম'রে গেলে দেখতে পায় না কেন, মরে গেলে মানুষ এমন নিষ্ঠুর হয় কেন—এই জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি এখানে

ব'সে থাকবো। চোখের পাতা টেনে টেনে দেখলাম, চোখ আছে। কিন্তু সে-চোখে দৃষ্টি নেই কেন?

চৌকিদার। অন্ধকারের মধ্যে কী তুমি দেখতে পাচ্ছ? দেখতে কষ্ট হ'চ্ছে না?

সিরাজ। কিছু না। আজ তিন রাত আমি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এখানে এসে আমার জিজ্ঞাসার আলো জেব্লে ব'সে আছি। বলো, এর উত্তর পাবো না একটা?

চৌকিদার। কি জানি! দ্যাখো চেষ্টা ক'রে। এই আলোটা নাও ভাই। এই আলোটা ওর মুখে ফেলে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকো। তোমার প্রশ্নের উত্তর পেতেও পারো। ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে গলে গলে মাটিতে মিশে একাকার হোক্, ব'সে ব'সে দ্যাখো তুমি। আমি যাই।

সিরাজ। কোথায় চললে?

চৌকিদার। কাজে। তুমি এখানে এই আলো জেব্লে চৌকি দাও। আমি চললেম আমার কাজে। তুমি জাগো। জেগে ব'সে থাকো চৌকি দিয়ে।

সিরাজ। আবার এসো। কাল রাতে এসো কিন্তু ফিরে। আমাকে এখানেই পাবে। মানুষ ম'রে গেলে সব ভুলে যাবে, এ-ও কি একটা কথা। মানুষ ম'রে গেলে কিছুই দেখতে পাবে না। এ-ও কি সম্ভব?

চৌকিদার। কে জাগে, কে জাগে, কে জাগে। [প্রস্থান]

গান্ধীজীর দিল্লী ডায়েরী—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক—হরিজন প্রকাশন, হরিজন পত্রিকা কার্যালয়, ২৭-৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

'গান্ধীজীর দিল্লী ডায়েরী' গান্ধী-সাহিত্যের স্মরণীয় গ্রন্থ, কারণ এই গ্রন্থে তাঁহার শেষ বাণী সমূহ সংকলিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী পর্যন্ত গান্ধীজীর দিল্লীতে অবস্থানের দিনলিপি তথা তাঁহার এই সময়কার প্রার্থনান্তিক ভাষণ-সমূহ এই গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইতিহাসে এই সময়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ—চতুর্দিকে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার জ্বলন্ত পাবক এই সময়ে পূর্ণ রূপ পাইয়াছিল এবং গান্ধীজী কলিকাতায় গিয়া ও বিহার পরিক্রমা শেষ করিয়া দিল্লীতে অবস্থান ও পাঞ্জাব পরিক্রমার সংকল্প করিতেছিলেন। আলোচ্য পুস্তকে তাঁহার ভাষণগুলিতে দেখা যাইবে, দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য দূর করিতে না পারিলে তিনি আর বাঁচিতে চান না, এমনই একটা বেদনাময় সুর ধ্বনিত হইতেছে। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে আততায়ীর হস্তে গান্ধীজী যে আত্মদান করেন, তাহাতে তাঁহারই লীলাবসানের ইচ্ছা রূপ পাইয়াছে। পাঠক বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গ্রন্থের পাতাগুলি পড়িতে পড়িতে বেদনার সঙ্গে এই তত্ত্বটিই অনুভব করিতে পারিবেন। তাঁহার এই শেষ বাণীগুলিতে ত্যাগ ও অহিংসার এবং মানবীয় মৈত্রীর চরম রূপ প্রকটিত হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের জন্য গান্ধীজীর চরম প্রচেষ্টা এই ভাষণগুলির মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে।

গান্ধীজীর দিল্লী ডায়েরী প্রথমে ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থ তাহারই বঙ্গানুবাদ। এই মধুর ও প্রাণস্পর্শী বঙ্গানুবাদের সাহায্যে পাঠকগণ গান্ধীজীর বাণীসমূহের অখণ্ড রূপেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গ্রন্থখানা ঠিক বাণী-গ্রন্থ নহে, কারণ ইহাতে গান্ধীজীর বাণী-সমূহ সরাসরিভাবে প্রদত্ত হয় নাই, কতকটা দিনলিপির আকারে এবং সম্পাদিতরূপে গ্রন্থখানা সংকলিত। এই জন্যই ইহার নাম 'দিল্লী ডায়েরী' রাখা হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাঁহার অমৃতময় ভাষণসমূহ ছাড়াও তাঁহার দিল্লী অবস্থানের মোটামুটি সব রকম ঘটনাবলীই পাওয়া যাইবে। এই স্মরণীয় গ্রন্থখানার বঙ্গানুবাদ বাহির করিয়া উদ্যোক্তাগণ বাঙালী পাঠকগণের পরম কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন। ২৫৮।৪৮

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প—প্রকাশক, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।
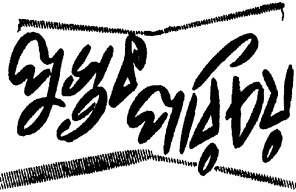
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বহু গল্পের মধ্য হইতে বাছা বাছা পনেরোটি গল্প চয়ন করিয়া এই 'সংগ্রহ-গ্রন্থ'খানা সাজানো হইয়াছে। বিভূতি বাবুর যত গল্প আমরা এ পর্যন্ত পাঠ করিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার শ্রেষ্ঠ গল্প চয়ন করা সহজসাধ্য নহে, কেননা, রসের বিচারে তাঁহার কোন্ গল্পকে শ্রেষ্ঠ নয় বলা যাইতে পারে তাহা নির্ধারণ করা কঠিন।

বাঙলাদেশে যে অতি অল্প কয়েকজন কথা-শিল্পী সর্বাঙ্গসুন্দর ছোট গল্প লিখিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের হাত হইতে কখনও রস-অনুত্তীর্ণ একটি রচনাও বাহির হয় নাই বলিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন, বিভূতিভূষণের স্থান তাঁহাদেরই মধ্যে। তাঁহার গল্পগুলি বহু পঠিত; কাজেই নূতন করিয়া ইহাদের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার যে-সকল গল্প পাঠকগণ ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রে কিংবা গল্প-পুস্তকে বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছেন এবং নানাদিক দিয়া যে-সকল গল্পকে পাঠকগণ বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বপূর্ণ মনে করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশ গল্পই এই সংগ্রহে পাওয়া যাইবে। যেমন, প্রবাসীর পুরস্কারপ্রাপ্ত রাণুর প্রথম ভাগ, বিখ্যাত হাসির গল্প বরযাত্রী প্রভৃতি। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, উহাকে গল্প-সংগ্রহখানার কুঞ্জিকা হিসাবে পাঠকগণ ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাতে অল্পের মধ্যে গল্পগুলির পরিচয় ও ধারাবাহিকতা দেখান হইয়াছে।

গল্পরসিক পাঠকগণের নিকট এই 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থখানা যে বিশেষ লোভনীয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকাশক ছাপা, কাগজ ও বাঁধানোতে বিভূতিবাবুর গল্পের শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। ২২০।৪৮

ওঅর এ্যাণ্ড পীস্—টলস্টয় প্রণীত। অনুবাদক—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। মিত্র ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

ঋষি টলস্টয়ের 'ওঅর এ্যাণ্ড পীস্' বিশ্ব-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পের বই। ইহার আয়তন যেমন বিরাট, তেমনি ইহার মধ্যে ঘটনাবলীও অফুরন্ত এবং ইহার চরিত্রাবলীও প্রায় অগণন। বহু বিষয়ের সমাবেশ এই গ্রন্থ মধ্যে ঘটিয়াছে। একাধারে যুদ্ধবিগ্রহ এবং মানবতাবোধ জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। কোনো কোনো সমালোচক বিষয় ও বস্তুর, ঘটনা ও চরিত্রের ঘাত ও প্রতিঘাতের এত প্রাচুর্য দেখিয়াই বোধ হয় এই গ্রন্থকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

সম্রাট নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানজনিত যুদ্ধকে পটভূমি করিয়া এই বিরাট গ্রন্থ রচিত। এই দুরন্ত রণোন্মত্ততার হুবহু চিত্র আঁকিতে আঁকিতে ঋষি ও দ্রষ্টা টলস্টয় যে মহৎ শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাতে বিশ্ব-সাহিত্য মানবতা-বোধের অবদানে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

টলস্টয় রুশ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির দিনে তথাকার এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানবতার দুঃখবেদনায় সর্বদা তাঁহার হৃদয় ভরপুর থাকিত, এইজন্য সুখ ও ঐশ্বর্যের জীবন তাঁহার মনে অনুরাগ জাগাইতে পারে নাই। দুঃখদগ্ধ গণমানবের জীবন তাঁহার ধ্যান ও দৃষ্টির বস্তু হইয়াছিল। পৃথিবীর মানবপ্রেমিক ব্যক্তিদের তিনি অন্যতম। তাঁহার এই বিরাট গ্রন্থখানা বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া অনুবাদক বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিলেন।

নতুন ঠিকানা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দি ফিনিক্স্ প্রেস লিমিটেড, ৫৬, বেণ্টিংক স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

'নতুন ঠিকানা' নূতন ধরণের একখানি উপন্যাস। একটি সম্পূর্ণ মৌলিক, নূতন এবং বেগবান কাহিনী লেখক জোরালো ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, সে কাহিনী গল্পের নায়ক প্রশান্তর জীবনের। তার জীবনের বাইশটি বৎসর ধীর গতি নদীর মত কাটিবার পর সহসা তাহাতে ঝঞ্ঝা ও সংক্ষোভ দেখা দিল। সে তার মামা যুক্তপ্রদেশের এক অধ্যাপক দেবেশ মজুমদারের নিকট থাকিত; পিতার স্মৃতি তাহার নিকট অস্পষ্ট ছিল; একদিন টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে আসিয়া দেখে তার পিতা মৃত্যুশয্যায়। তাহার পিতা একজন বিধবা মহিলা ও তাহার কন্যা মণিমালার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; প্রশান্তর নিকট অপরিচিত সেই দুইজনকেও সে পিতার শয্যাপার্শ্বে দেখিতে পাইল। যাহোক, পিতার মৃত্যুর প্রাক্কালে আদেশ করিয়া গেলেন, 'মণিমালাকে তুমি বিয়ে কোরো'।

ইহাই হইল গল্পের আদি পর্ব। ইহাকে পটভূমিকা করিয়া অতঃপর প্রশান্তর জীবন নানা বিচিত্রগতিতে যে প্রকৃতই 'নতুন ঠিকানা'র দিকে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার কাহিনী পাঠককে মুগ্ধ করিবে। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। গল্পের চরিত্রগুলিকে সুস্পষ্ট করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। বিশেষত কাহিনীর পূর্বাপর

সামঞ্জস্য রক্ষার এবং চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। ২৬২।৪৮

গদর বিপ্লব—শ্রীসুধীরকুমার সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থ কুটীর, ২৮জি, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য একটাকা চারি আনা।

এই পুস্তকে গদর বিপ্লবের আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বিপ্লবের প্রধান হোতা ছিলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ, শচীন সান্যাল, বাবা গুরুদিৎ সিং প্রভৃতি বহু বীরবৃন্দ। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতে দমননীতির প্রকোপ বৃদ্ধি এবং নানা কারণে জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস প্রভৃতির দরুণ চরমপন্থী মুক্তিকামীরা গুপ্ত আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯১২ হইতে ১৯১৭ সাল এই ছয় বৎসরকাল ভারতে বিপ্লবাত্মক সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়ে। বস্তুতঃপক্ষে ঐ সময়ে সমগ্র দেশ এক আগ্নেয়গিরির মতই বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। বৃটিশের শত্রু জার্মানীর সহযোগিতায় অস্ত্রাদি আমদানী করিয়া প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য এক অসমসাহসিকতার পথে এই সকল বীর পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই বিপ্লব প্রচেষ্টাই গদর বিপ্লব নামে পরিচিত। ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য যতগুলি প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই গদর বিপ্লবই সর্বাধিক ব্যাপক আন্দোলন। এই প্রচেষ্টা যদিও সকল হয় নাই, তবু শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামপ্রচেষ্টায় যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন বা নির্বাসন বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ত্যাগ ও বীরত্ব ভাবী বংশধরের প্রেরণার উৎস-স্থল, ইহাতে সন্দেহ নাই। বাঙলা তথা ভারতে বোমার যুগের ইতিহাস লইয়া অনেক গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে; সে-সব গ্রন্থে বিপ্লবের এই ব্যাপক প্রচেষ্টার সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। শ্রীসুধীরকুমার সেন এই পুস্তকে গদর বিপ্লবের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়া বাঙলার তরুণদের উপকার করিলেন। তরুণ সমাজকে প্রায়ই রহস্য-সংক্রান্ত সিরিজের উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত আজগুবি বইপত্র লইয়া মাতিয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহাদের নিকট এই সকল অসমসাহসিক বিপ্লবের সত্য কাহিনী অবিশ্বাস্য মনগড়া কাহিনী অপেক্ষা অধিকতর লোভনীয় বোধ হইবে। ২৯২।৪৮

মহামানবের জীবনকথা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—দি সিটি বুক কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

গান্ধীজীর জীবনী। গ্রন্থখানা বড় আকারের ৭৩ পৃষ্ঠায় পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত, ডেমি বাঁধাই এবং মলাটের উপর রঙীন ছবিযুক্ত। গ্রন্থের পরিচ্ছেদসমূহের পুরোভাগ গান্ধীজীবনঘটিত রেখাচিত্রে শোভিত। এ সকল ছাড়া ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গী সব দিক দিয়াই গ্রন্থটি কিশোর কিশোরীদের উপযোগী হইয়াছে। গান্ধীজীর জীবনচরিত বিষয়ক অনেক বইপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এখানাও তন্মধ্যে একটি। কিন্তু তবু ইহার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়িবে। যেমন গ্রন্থকার কেবল গান্ধীজীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া যান নাই, ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া প্রায় সর্বত্রই মহামানবের আদর্শগুলি সুস্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাতে বালকবালিকাদের মনে গান্ধীজীর মহৎ ভাব ও আদর্শগুলি অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। আমরা বইখানার [illegible]

জাতীয় ভাষা বর্ণবোধ—প্রথম ভাগ (অসংযুক্ত বর্ণ) শ্রীরেণুকা দেবী ও শ্রীগণেশপ্রসাদ দ্বিবেদী প্রণীত। প্রকাশক—দেবব্রত কলাকুঞ্জ—প্রয়াগ; ৯৫, সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ। মূল্য আট আনা।

সচিত্র হিন্দি বর্ণ-পরিচয়ের বই। অ আ এবং ক খ আদি বর্ণমালাসমূহে আদ্যক্ষরের সঙ্গে মিল রাখিয়া নেতৃবৃন্দের ছবি সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং অন্যান্য পাঠগুলিও রেখাচিত্রের দ্বারা মনোজ্ঞ করা হইয়াছে। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দী বর্ণমালা শিক্ষার প্রথম ভাগ হিসাবে এই বইটি শিক্ষার্থীদের উপযোগী হইয়াছে। পাঠগুলি বেশ মোলায়েম ভাষায় রচিত। মধ্যে মধ্যে মনোজ্ঞ ছড়া এবং তৎসহ ছবিগুলি শিশুদের চিত্তাকর্ষণ করিবে। ৯৭৩।৪৮

প্রাচীন প্রাচী—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—পূর্বাশা লিমিটেড, পি ১৩, গণেশ-চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

'প্রাচীন প্রাচী'র কবিতাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত—এশিয়া, ভারতবর্ষ, বাঙলা। মাত্র ৩২ পৃষ্ঠার কবিতার মধ্যে লেখক প্রাচীন প্রাচীকে রূপময় করিয়া তুলিয়াছেন। বইটির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। ২৮১।৪৮

১। **ছাড়পত্র**, ২। **ঘুম নেই**—সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রণীত। মূল্য যথাক্রমে দেড় টাকা ও দুই টাকা।

সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রকৃত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। তরুণ বয়সেই তাঁহার মধ্যে সেই শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। ছাত্রজীবনেই তাঁহার জীবনদীপ নিবিয়া না গেলে তিনি যে বিখ্যাত কবি হইতে পারিতেন, এই দুইখানি কবিতা পুস্তকেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উভয় গ্রন্থই তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। প্রথম ছাড়পত্র প্রকাশিত হইয়া পাঠক মহলে সমাদৃত হয়; সম্প্রতি উহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ঘুম নেই তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ। উভয় গ্রন্থেরই সম্পাদনা ও ভূমিকা রচনা করিয়াছেন শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। ২৭৫।৪৮

বিপ্লবের বিয়ে—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দি বুক সিণ্ডিকেট, ১০, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য—দুই টাকা।

মোট তেরোটি গল্পের সমষ্টি। শেষ গল্পের নাম অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। লেখক ভূমিকায় জানাইয়াছেন, বইখানির অধিকাংশ গল্পই তাঁহার ষোল থেকে বাইশ বৎসর বয়সের ভিতরের রচনা। তদনুপাতে গল্পগুলি যে অধিকতর পরিপক্কতার ছাপ বহন করিতেছে, তাহা বইটির যে-কোন একটি গল্প পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিশেষতঃ সবগুলি গল্পই ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়া পাঠকদের নিকট ইহাদের মূল্য যাচাই হইয়া গিয়াছে। আশা করি গল্পরসিক পাঠকগণের দৃষ্টি এই গল্পবইটির প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

মন্দার পর্বত—ডাঃ মতিলাল দাশ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

ডাঃ মতিলাল দাসের লেখা এই উপন্যাসখানা শচিশুভ্র প্রেম, ত্যাগ ও তপের মাহাত্ম্যে দীপ্তি-মান। সুরেশ সস্ত্রীক মন্দার পর্বতে বেড়াইতে যায়; সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা শশিপদবাবুর সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। শশিপদবাবু ও জ্যোৎস্না পরস্পর নিষ্কলুষ নিষ্কাম প্রেমে আবদ্ধ। কিন্তু ক্ষণিকের রূপমোহে মোহগ্রস্ত সুরেশ জ্যোৎস্নার প্রতি দৌর্বল্য প্রকাশ করে; পরে সোনার কাঠির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হয়, তেমনি জ্যোৎস্নার পবিত্রতার স্পর্শে সুরেশ অন্তরে বাহিরে শুচি হইয়া তপোব্রত গ্রহণ করে। ইহারাই গল্পের প্রধান চরিত্র। লেখক ইহাদিগকে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত করিয়াছেন। তবে উপন্যাসটির প্রকৃত নায়ক-নায়িকা হইতেছে শশিপদবাবুর কন্যা শান্তা এবং সুরেশের বন্ধু অপূর্ব। পার্শ্বচরিত্ররূপে মধ্যপথে আগাইয়া আসিয়া ইহারা কাহিনীর মধ্যে নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছে এবং শেষে পরিণয়ে কাহিনীকে মধুরেণ সমাপন করিয়াছে। লেখকের ভাষা জোরালো। চরিত্রগুলি সুস্পষ্ট। আখ্যান-ভাগ নূতন এবং বিশেষ করিয়া উত্তম আদর্শ ও উৎকৃষ্ট রুচির পরিপোষক। ২৭৮।৪৮

ম্যানিয়া—শ্রীকুমারেশ ঘোষ প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান—রীডার্স কর্ণার; ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা।

'ম্যানিয়া' স্ত্রী ভূমিকা ও দৃশ্যপট বর্জিত, ছেলেমেয়েদের উপযোগী একখানি নাটিকা। সংলাপ বেশ রসমধুর। তদুপরি স্ত্রী ভূমিকা ও দৃশ্য-পটাদির হ্যাঙ্গাম না থাকায় বালকদের অভিনয়ের সুবিধা হইবে। ২০৩।৪৮

রক্তদ্বীপ—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান—সাহিত্য মন্দির, ৫৪।৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এখানাও ছেলেদের অভিনয়োপযোগী স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটিকা। ছেলেমেয়েদের আমোদের সঙ্গে উচ্চ আদর্শ পরিবেশনের চেষ্টাও ইহাতে করা হইয়াছে। ২১২।৪৮

শেষের গান—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কবিতাগুলি রসধর্মে উচ্ছল। কবির দৃষ্টি বাহ্যবিচারের বিড়ম্বনাকে অতিক্রম করিয়া প্রাণের মূঢ়-মাধুরীর চাতুরী-সংস্পর্শে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মালিন্যের ঊর্ধ্বে রূপ ও রসরাজ্যে অরূপণ বদানালীলার লাবণ্য উপলব্ধির সংবেদন তাঁহার ভাষাকে স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল করিয়াছে। 'শেষের গান' নামক কবিতাটি প্রতিবেশ সৃষ্টির সম্ভূতির দিক হইতে তেমন দানা বাঁধিয়া না উঠিলেও মনের উপর একটা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যায়।

আমাদের নেতাজী—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী; ২০৪ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চৌদ্দ আনা।

গ্রন্থখানা প্রধানতঃ বালক-বালিকাদের জন্য রচিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাল্য তথা ছাত্র জীবনের এবং নেতৃ ও যোদ্ধৃ জীবনের সকল কাহিনীই সংক্ষেপে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ছেলেরা গ্রন্থখানা আনন্দের সহিত পাঠ করিবে এবং স্বল্প পরিসরের মধ্যে এই বিরাট জীবনের হুবহু প্রতিফলনই দেখিতে পাইবে। ছেলেদের জীবন ও চরিত্র গঠনে এই শ্রেণীর গ্রন্থ অপরিহার্য। ২৯৬/৪৮

আগমনী—ঈদ ও বিজয়া সংখ্যা। শ্রীসুজিত কুমার নাগ সম্পাদিত। কার্যালয়—৪২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই আনা।

"আগমনী" মাসিক পত্র। উহা কেবলমাত্র বালক-বালিকাদের লেখা লইয়া বাহির হয়। উহা ঈদ ও বিজয়া যুগ্ম সংখ্যাখানা পড়িয়া সুখী হইয়াছি। উহাকে হিন্দু-মুসলমান বালক বালিকারা মিলিতভাবে রচনা দ্বারা রূপায়িত করিয়াছে। ২৯৮/৪
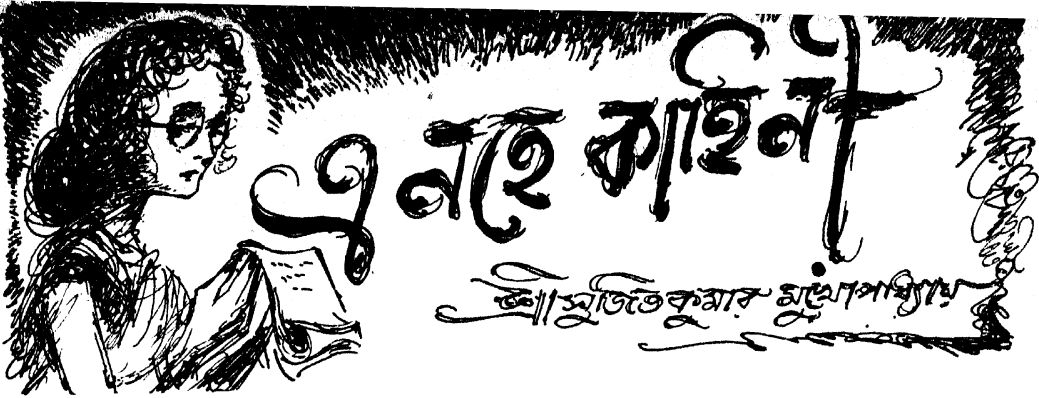
যৌবনে মানুষের মন সাধারণত একটা উচ্চ আদর্শের দিকে ধাবিত হয়। আমার মনও একটা মহৎ আদর্শে আসক্ত হইয়াছিল। নানাদিক হইতে আমি উৎসাহও পাইয়াছিলাম। বড় কাজ করিবার প্রধান বাধা আমাদের নিজেদের স্বার্থহানি। কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশত উহাতে আমার স্বার্থহানি না হইয়া স্বার্থসিদ্ধি হইত। কেননা, উহার জন্য আমি বেতন পাইতাম। এইরূপ মণি (আদর্শ) —কাঞ্চন (অর্থ) যোগ সহজে ঘটে না। সুতরাং পরম উৎসাহে আমি পরার্থসিদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করি।

আমার কর্মক্ষেত্র ছিল আসামের এক শহরে। সেখানে আড্ডা গাড়িবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই একদল আদর্শ-পাগল যুবক আমার কার্যে যোগ দিল। আমাদের সকলেরই তখন একমাত্র চিন্তা—কিভাবে কাহার সাহায্য করা যায়। পরকে সাহায্য করিবার আমাদের সেই অধীর আগ্রহ, অনেককেই রীতিমত বিব্রত করিয়া তুলিল।

এইরূপ যখন আমাদের মনের অবস্থা, তখন একদিন এক গণ্যমান্য বৃদ্ধ আমাদের ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ বাপু, তোমরা আপাতত এই কাজটা কর দেখি। জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতার কড়াকড়ির জন্য আমাদের হিন্দুদের শবদাহ করিবার লোক পাওয়া যায় না। ফলে অনেক সময় রাস্তায় ঘাটে মৃতদেহ পড়িয়া থাকিয়া পচিতে থাকে। শহরে তবু উহা মেথরে টানিয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাহাও তো ভাল নহে। উহা দাহ করিয়া ফেলাই ভাল। তেমারা যুবক, জাতভেদ আশা করি মান না—অন্তত শবের জাতভেদ মান না। তোমাদের কাছে এটা আশা করিতে পারি কি?"

এতদিনে একটা কাজের মত কাজ পাইয়া আমরা যেন একেবারে কৃতার্থ হইয়া গেলাম। পরম ভক্তিভরে বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া আমরা বলিলাম—"যে-আজ্ঞে! আপনি যত পারেন শব সংগ্রহ করিয়া দিবেন। আমরা সব শব দাহ করিব।"

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তোমরাই চতুর্দিকে খোঁজ করিলে যথেষ্ট শব সংগ্রহ করিতে পারিবে। তবে দেখ বাপু, তোমাদের যেরূপ উৎসাহ, জ্যান্ত লোককে যেন আবার চিতায় তুলিও না।

"আজ্ঞে, না, না। সেকি কথা।" বলিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

জ্যান্ত লোককে যেন আবার চিতায় তুলিও না

ইহার পর প্রবল উৎসাহে আমরা কাজে নামিলাম। প্রথম দুই চারিদিন কোন শব মিলিল না। তাহাতে আমাদের মধ্যে অনেকেই কিছুটা দমিয়া গেল। একজন অতি-উৎসাহী তরুণ প্রস্তাব করিল—"প্রত্যেককে এক-একটা পাড়া ভাগ করিয়া দেওয়া হউক। যে-পাড়া যাহার ভাগে পড়িবে, সে প্রতিদিন সকালে-বিকালে সেই পাড়ার প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—কেহ মরিয়াছে কিনা। তাহা হইলে প্রায় প্রতিদিনই একটা-না-একটা শব পাওয়া যাইবে এবং একটা শবও আমাদের হাতছাড়া হইবে না।"

সৌভাগ্যবশত তাহার ঐ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে বাতিল হইয়া যায়। নতুবা আমাদের মার খাইতে হইত।

যাহা হউক, সত্বর আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। একদিন একজন লোক খবর দিল—শহরের এক প্রান্তে, নদীর ধারে, একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে। শুনিবামাত্র আমরা সকলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে ছুটিলাম। সত্যই এক ব্যক্তি মরিয়া পড়িয়া আছে। মানুষের মৃতদেহ দেখিয়া যে এত আনন্দ হয়, তাহা কি কখনো কল্পনা করিয়াছিলাম।

লোকটি এ শহরের নয়। গ্রাম হইতে শহরে আসিয়াছিল। অনেকেই তাহাকে চিনিল। কেননা—একদিক হইতে সে বিখ্যাত ছিল। তাঁহার একটি পা ছিল না। মোটর চাপা পড়ায় উহা কাটিয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে সে কিছু টাকা খেসারৎ পায় এবং এইরূপেই সে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।

লোকটি জাতিতে ব্রাহ্মণ। আমাদের অবশ্য যে-কোন জাতির শব বহন করিতে কোন আপত্তি ছিল না। তথাপি ব্রাহ্মণের শব পাওয়ায় সকলেই যেন অতি উৎফুল্ল হইল। আমরা শব তুলিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু এক প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন—"থাম বাপু, অতো সোজা নয়। মৃতদেহ অমনি তুলিলেই হইল? শেষে নিজেরা মরিবে কি?"

আমরা তো অবাক্। এ বলে কি। আমাদের মধ্যে একজন চুপি চুপি বলিল—"আমি বুঝিয়াছি। এই মৃতদেহের প্রতি আমাদের অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়া ভয় দেখাইয়া ইহার জন্য আমাদের কাছে কিছু আদায় করিতে চায়।"

আসলে কিন্তু তাহা নহে। পরে সব পরিষ্কার হইল। পুলিশে খবর দেওয়া প্রয়োজন। পুলিশের অনুমতি হইলে তবে শব জ্বালাইতে পারা যাইবে।

পুলিশের অনুমতি পাওয়া আমাদের পক্ষে তেমন কঠিন হইল না। কেননা, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুলিশের মধ্যেও দুই-একজন আমাদের চাঁদা দিতেন। তথাপি অনুমতি মিলিতে সময় লাগিল। মৃতদেহ শ্মশানে পৌঁছাইতে রীতিমত রাত্রি হইয়া গেল।

কিন্তু সেখানে গিয়া আর এক ফ্যাসাদ বাধিল। দাহের সরঞ্জাম কাষ্ঠাদি ও শব লইয়

যাইলেই যে শবদাহ করা যায় না, কার্যকালে ইহা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিলাম। আমরা সকলেই আনাড়ি। শবদাহ করা দূরে থাক, অনেকে ইতিপূর্বে শবই দেখে নাই। আর আমাদের মধ্যে এমন লোকও একজন ছিল না—যে শ্মশানে উপস্থিত থাকিয়া শবদাহ করিতে দেখিয়াছে।

আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন এক অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি। তিনি অগ্রসর হইয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। রীতিমত করিৎকর্মা লোক। দেখিয়াই বুঝিলাম, শবদাহে ইঁহার হাত পাকিয়াছে। পরে পরিচয় পাইলাম, গত বিশ বছর যাবৎ তিনি এই কাজ করিতেছেন। কেহ মরিয়াছে—একবার খবর পাইলেই হয়। নিতান্ত শয্যাগত না হইলে নিশ্চয়ই শ্মশানে উপস্থিত হইবেন। ইহা তাঁহার এক নেশার মত। এমন একজন লোক পাইয়া আমরা যে কী খুশি হইলাম, তাহা বলিবার নয়। সেই শ্মশানেই অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া আমরা তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলাম এবং তাঁহাকে আমাদের শবদাহ পার্টির 'অনারারী মেম্বর' করিয়া লইলাম।

প্রায় শেষ রাত্রে আমাদের শ্মশানকৃত্য সমাপন হইল। ভোরের দিকে স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

এইভাবে এই শবদাহের দ্বারাই আমাদের পরার্থপরতার 'হাতে-খড়ি' হইল। ধীরে ধীরে আরো অনেক কাজে আমরা আত্মনিয়োগ করিলাম। অস্পৃশ্যতা নিবারণ, নমঃশূদ্রাদি জাতির ক্ষৌরকার্যে নাপিত নিয়োগ—তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, বিধবা-বিবাহ, অপহৃতা নারীর উদ্ধার—এই সমস্তই আমাদের কর্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

একবার এক অপহৃতা নারী উদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের তরুণ মনে যে আঘাত লাগে—তাহা ভুলিবার নয়। ঐ এক আঘাতেই আমাদের অনেকের কাজের উৎসাহ চলিয়া যায়।

আমরা খবর পাইলাম—চা-বাগান অঞ্চলে এক জমিদার একটি বালিকাকে অপহরণ করিয়া নিজের গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। জমিদার প্রবল পরাক্রান্ত। পুলিশের সাহায্যে অথবা জবরদস্তি করিয়া তাঁহার কাছ হইতে ঐ বালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব নহে। সুতরাং ঠিক করিলাম—আমরাও ঐ বালিকাকে ঐ জমিদারের গৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিব।

আমাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পার্শ্ববর্তী চা-বাগানের মালিক। গভীর রাত্রে তাঁহার মোটর লইয়া আমরা কয়েকজন রওনা হইয়া গেলাম। নিকটবর্তী একস্থানে মোটরখানা লুকাইয়া রাখিয়া আমরা ঐ জমিদারের বাড়ির আনাচে কানাচে লুকাইয়া রহিলাম। উদ্দেশ্য মেয়েটি রাত্রে শৌচাদির জন্য বাহির হইলে তাহাকে ধরিয়া মোটরে তুলিয়া রওনা হইব।

পরম ধৈর্যের সহিত মশক-দংশন সহ্য করিতে করিতে আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এক ঘণ্টা এক যুগের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। কিন্তু রাত্রি আমাদের বৃথা গেল। শুধু এক রাত্রি নয়—তিন রাত্রি আমাদের এইভাবে কাটিল। চতুর্থ রাত্রিতে আমাদের তপস্যার ফল ফলিল। বালিকা বাহির হইল। তাহার এক নিকট আত্মীয় আমাদের সঙ্গে ছিল। সে উহাকে চিনিল। তৎক্ষণাৎ পিছন হইতে গামছা দিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিলাম এবং তিন-চারজনে চ্যাংদোলা করিয়া মোটরে তুলিলাম। তাহার পর মিনিট পনরের মধ্যে দশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের বন্ধুর চা-বাগানে উপস্থিত হইলাম।

বালিকা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে অভয় দিয়া সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। সে আনন্দে অভিভূত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পরদিন তাহার পিতা আসিল।

মোটরে তুলিলাম

পিতাপুত্রীর সে মিলন দৃশ্য অতীব করুণ। আমরাও অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই।

অনুসন্ধানে জানিলাম—বালিকার স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিবে না। আমরা তাহার পুনর্বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। বালিকা বা তাহার পিতার তাহাতে আপত্তি নাই। তাহাদের সমাজে ইহার চল আছে। চা-বাগানে অবিবাহিত কুলির অভাব নাই। তাহাদের অনেকেরই অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। বালিকাকে বলিলাম যে, উহাদের যাহাকে খুশি সে পতিত্বে বরণ করিতে পারে। অতি আগ্রহের সহিত সে আমাদের এই স্বয়ংবর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

চা-বাগানের মালিক। সেকালেও তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত। অতি গোপনে এবং অতি সুরক্ষিত অবস্থায় বালিকাকে তাঁহার বাংলোয় রাখা হইল। একমাত্র তাহার পিতা ভিন্ন বাহিরের কোনো লোককে তাহার নিকট যাইতে দেওয়া হইত না। তথাপি একদিন সে অপহৃত হইল! আমাদের নিকট ইহা অতীব রহস্যময় মনে হইল। কিন্তু এই রহস্য যেদিন উদ্ঘাটিত হইল আমাদের সেদিনের মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। বালিকার পিতাই কিনা উৎকোচ লইয়া নিজের কন্যাকে সেই নারী-নির্যাতনকারী জমিদারের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়াছে!

যাক্! আমাদের বিচিত্র কর্মতালিকার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া আপনাদের আর ধৈর্যচ্যুত করিতে চাই না! শবদাহ দিয়া আমাদের কীর্তিকাহিনী শুরু করিয়াছি—এখন শবদাহ দিয়াই শেষ করি।

শহরের মধ্যস্থলে, বড় রাস্তার ধারে, এক বৃদ্ধ বাস করিতেন। সব সময় তাঁহার বাড়ীর পাশ দিয়াই আমাদের যাতায়াত করিতে হইত! দেখিতাম গৌরবর্ণ, শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশ, দীর্ঘশ্মশ্রু, সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ তাঁহার হেলান চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মনে কেমন একটা সম্ভ্রমের ভাব আসিত! বৃদ্ধের বয়স বোধ হয় আশির কম হইবে না। শুনিলাম তিনি আদর্শনিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ পুরুষ। সেকালের ব্রাহ্ম। তাঁহার পুত্র নাই। একমাত্র কন্যা, স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। স্ত্রী পঙ্গু! আজ বার বছর যাবৎ চলৎশক্তি-হীন শয্যাগত অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই রোগক্লিষ্টা জীবন্মৃতা জননীর জন্যই কন্যা বিবাহ করেন নাই! একযুগ ধরিয়া অক্লান্তভাবে হাসিমুখে এই রুগ্না জননীর সেবা করিয়া চলিয়াছেন। অর্থোপার্জন করিতেছেন তিনি। পাকাদি সাংসারিক যাবতীয় কার্যও করিতেছেন তিনি। উপরন্তু এই রোগিণীর সেবা ও ঐ শিশুসম বৃদ্ধের তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহার। শহরশুদ্ধ সকলের মুখে তাঁহার প্রশংসা। গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা পর্যন্ত বলেন—"এমন কন্যা আমাদের সমাজে নাই।"

হঠাৎ একদিন এই বাড়ী হইতেই আমাদের ডাক আসিল। ঐ জীবন্মৃতা বৃদ্ধার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু না মুক্তি? কিন্তু দেখিয়া অবাক হইলাম—কন্যা পাগলিনীর ন্যায় মাতৃ-

বক্ষে লুটাইয়া কাঁদিতেছেন। বৃদ্ধের অবস্থা যেন আরও শোচনীয়। প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া যাহার সহিত সুখেদুঃখে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন—সে আজ এই জীবন সায়াহ্নে তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল—একি কম মর্মব্যথা! আমাদের তরুণদের নিকট ইহা ধারণারও অতীত! তথাপি আমরাও বিচলিত হইলাম।

সেদিন আবার দারুণ বর্ষা! সকাল হইতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ঐ বৃষ্টির মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। মৃত্যু ঘটিয়াছে অপরাহ্নে। মৃতদেহ তুলিতে সন্ধ্যা হইল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই শ্মশানে পৌঁছিলাম।

সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম—শ্মশান জলে ডুবিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দ্বীপের ন্যায় এক আধ অংশ তখনও জলের উপর জাগিয়া আছে। নৌকায় করিয়া ঐরূপ এক দ্বীপে গিয়া দাহের আয়োজন করিলাম। বৃষ্টির বেগ বাড়িলে দাহকার্য শেষ হইবার পূর্বেই দ্বীপ ডুবিয়া যাইবে। তখন শব সমেত দাহকারী-দেরও সলিল-সমাধি নিশ্চিত। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশত বৃষ্টির বেগ যেন কমিয়া আসিতেছিল। চিতা সাজাইয়া শব যখন তাহার উপর তুলিলাম, তখন বর্ষণ প্রায় ক্ষান্ত হইয়াছে। অতি কষ্টে ভিজা কাঠের চিতা জ্বালাইলাম। কেবলই ভয়, আবার এখনি মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া চিতা নিভাইয়া দিবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শবদাহ শেষ হওয়া পর্যন্ত আর বৃষ্টি হইল না!

দাহকার্য শেষ হইতে সকাল হইয়া গেল। আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। পূর্বদিক অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইতেছে। নদীতে স্নান সারিয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ফিরিলাম।

শ্রাদ্ধের দিন নিমন্ত্রিত হইয়া বৃদ্ধের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বসিয়া ছিলেন। আমাদের দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলেন! নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি নহে। দুই একটি ব্রাহ্ম পরিবার ও আমরা শ্মশানযাত্রীর দল।

গোটা দুই ব্রহ্ম সংগীত ও কয়েকটি মন্ত্রপাঠের পর, কন্যা ব্রাহ্ম সমাজের রীতি-অনুযায়ী—জননীর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী পাঠ করিলেনঃ—

"যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার এক গ্রামে আমাদের বাড়ী ছিল। আমার মায়ের বয়স যখন নয়, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। বাবার বয়স তখন পনের। বাবা আমার কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। আমাদের গ্রামে যখন এই সংবাদ পৌঁছায়, তখন সেখানে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। দেশের বাড়ীতে তখন মা ও ঠাকুমা এই দুইজন স্ত্রীলোক মাত্র থাকিতেন। তাঁহাদের সেখানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে আবার হঠাৎ আমার ঠাকুমার মৃত্যু হইল। বাবা তখন ছাত্র। তাঁহার উপার্জন নাই। তথাপি বাধ্য হইয়া মাকে তাঁহার কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইল!

"সেখানে গিয়া কি কষ্টে যে তাঁহাদের দিন কাটিয়াছে—তাহা বলিবার নয়। সকাল সন্ধ্যা ছেলে পড়াইয়া বাবা যাহা পাইতেন, তাহাতে কলেজের বেতন ও বাড়ীভাড়া দিয়া অতিকষ্টে প্রায় অর্ধাশনে তাঁহাদের দিন কাটিত। উপযুক্ত আচ্ছাদন বস্ত্রের অভাবে মা আমার বাসার বাহির হইতে পারিতেন না। ভোর হইতে রাত দশটা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও রাত্রি জাগিয়া, বাবা পরম উৎসাহের সহিত মাকে পড়াইতেন। মা আমার বুদ্ধিমতী ছিলেন। অসীম আগ্রহে, প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া তিনি নিজেকে শিক্ষিতা করিয়া তোলেন। এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনের বলও তাঁহার যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। তিনি বলেন—"আমি দেশে ফিরিয়া যাইব। লোকের ভয়ে নিজের বাসভূমি নিজের ঘর-সংসার ছাড়িয়া দিব—এ কখনই হইতে পারে না।" বাবা তাঁহার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত খুশি হন।

মায়ের আমার তখন একটিমাত্র পুত্র সন্তান বছর দুই হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুসন্তানকে কোলে লইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন, একজন অসহায় স্ত্রীলোকের পক্ষে 'একঘরে' হইয়া পল্লীগ্রামে বাস করা যে কি কঠিন তাহা জানিয়া শুনিয়া মা আমার গ্রামে ফেরেন। কিন্তু না ফিরিলেই বোধ হয় ভাল ছিল!

জ্ঞাতিরা সুযোগ বুঝিয়া মিথ্যা মামলার দ্বারা ইতিপূর্বে তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি দখল করিয়া বসিয়াছিল। তিনি ফিরিয়া আসায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বোধ হয় চক্ষু-লজ্জাবশতই মাত্র ভিটেবাড়ীটি তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু জমি-জায়গা কিছুই তিনি পাইলেন না। বাবা তখন একটি চাকরী পাইয়াছিলেন। তিনি টাকা পাঠাইতেন। তাহাতেই সংসার চলিত।

নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন

অতিকষ্টে নিদারুণ কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়াই মায়ের আমার সেই পল্লীগ্রামে দিন কাটিতেছিল। তিনি হাসিমুখে সমস্তই সহ্য করিতেন। অবশেষে একদিন তাঁহার শিশু-পুত্রটির কঠিন পীড়া হইল। গ্রামে ডাক্তার নাই। শহরে আছে। কিন্তু ডাক্তার ডাকিবে কে? পীড়িত শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া মা আমার দ্বারে দ্বারে ফিরিলেন—কেহই তাঁহার কথা শুনিল না। তিনদিন বিকারের ঘোরে শিশু পড়িয়া রহিল। চিকিৎসা হইল না—উপযুক্ত পথ্যও মিলিল না। চতুর্থ দিন ভোরের দিকে তাহার মৃত্যু হইল। মৃতপুত্রকে বুকে লইয়া মা আমার মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সারাদিন সেই শিশুর শব কোলে লইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন, কেহ আসিল না।

কেহ খোঁজও করিল না। অবশেষে সন্ধ্যার সময় তিনি নিজেই সেই মৃত শিশুদেহ তুলিয়া লইয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন..................!"

আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্বাক নিস্পন্দ-ভাবে এই অপূর্ব কাহিনী শ্রবণ করিলাম। এই চিরদুঃখিনী মহীয়সী নারীর শ্রাদ্ধবাসরে একান্ত আগ্রহে গভীর নিষ্ঠার সহিত, আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি... মনে হইল ইঁহার পবিত্র দেহ বহন ক... সুযোগ লাভ করিয়া আমরা ধন্য হই... আমাদের 'সৎকার সমিতি' সার্থক হইয়াছে

সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন যেভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লক্ষ লক্ষ লোক শোভাযাত্রা করিয়া গড়ের মাঠে সমবেত হইয়া সভাপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পালের আন্তরিকতাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল—সুভাষচন্দ্রের জয়গানে গগন-পবন মুখরিত হইয়াছিল। তাঁহার কীর্তি-কৌমুদী দেশের লোকের চিত্ত কিরূপ আলোকিত করিয়া আছে—তাহাই সেদিনের উৎসবে দেখা গিয়াছে। আজ শত্রু ও মিত্র সকলেরই মুখে সুভাষচন্দ্রের জয়গান। যাঁহারা পূর্বে তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন আপনাদিগের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিশ্চয়ই লজ্জানুভব করিতেছেন।

ভারত-রাষ্ট্রে জমিদারী ও শিল্প জাতীয়-করণ সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলা হইয়াছে। শিল্পের ব্যাপারে পর্বত মূষিক প্রসব করিয়াছে—ভারত সরকারের শিল্প-সচিব শিল্পপতিদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, দশ বৎসরের মধ্যে শিল্প জাতীয়করণ হইবে না। ইহার ফলে এদেশের ইংরেজ শিল্পপতিদিগেরও সুবিধা হইবে—বহু অর্থ লাভ হিসাবে—বিদেশে যাইবে। আর সরকার লাভের সীমাও নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন না। জমিদারী সম্বন্ধে কি হইবে?

যে স্থানে খাদ্যের সমস্যার সমাধান হইতেছে না, পরন্তু 'নিয়ন্ত্রণ'-ব্যবস্থায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় বা অপব্যয় হইতেছে, সে স্থানে যদি বস্ত্রের 'নিয়ন্ত্রণ' লইয়া স্বব্যবস্থিতচিত্তের খেলা হয়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ক্ষমতা লাভের পূর্বে বলিয়াছিলেন—ক্ষমতা পাইলে তিনি চোরাবাজারের ব্যবসায়ীদিগকে ল্যাম্প পোস্টে ফাঁসি দিবেন—তিনি ক্ষমতা লাভের পরেও বলিয়াছেন—কাপড়ের কল-ওয়ালারা অবাধে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে। অ... এ-মুনাফা দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়াই হইয়াছে। কিন্তু তিনি কি সেই মুনাফা তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করিবার উপায় করিয়াছেন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয় মাস পূর্ববঙ্গ হইতে আগত পণ্ডিতদিগকে সংস্কৃত কলেজে পুঁথি নকল—কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি ও পাঠোদ্ধার প্রভৃতি কাজ দিয়া পারিশ্রমিক প্রদান করিতেছিলেন। বর্তমানে সে ব্যবস্থা বন্ধ হইল। পূর্ববঙ্গে যাঁহারা টোল রাখিয়াছেন, অথবা এখনও পূর্ব-পাকিস্থানের শিক্ষায়তনে চাকরী করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য চাহিয়াছেন বা পাইয়াছেন। ইহা কি সত্য? পশ্চিমবঙ্গ সরকার পণ্ডিতদিগের তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। আমরা অভিযোগ পাইতেছি, কোন কোন মৃত ব্যক্তির নাম যেমন ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে যাঁহাদিগের চতুষ্পাঠী পশ্চিমবঙ্গে নাই, এমন লোকের নামও হয়ত ভ্রমবশতঃ ঐ তালিকাভুক্ত হইতেছে। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গে এবার বাজেটে কতকগুলি নূতন কর ধার্য করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ অবিভক্ত বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যয় সংকোচের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করেন নাই। তাহা না করিয়া যদি তাঁহারা লোককে নূতন কর দিতে বাধ্য করিয়া ব্যয় নির্বাহ ক... তবে তাহা কি সঙ্গত হইবে? এ বিষয়ে ... ভেদের যথেষ্ট কারণ আছে।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী স... (বঙ্গভাষা বিভাগ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা... পক্ষ হইতে সাধারণ সম্পাদক সর্বসাধা... নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ভিত্তি করিয়া একটি মৌলিক প্রবন্ধ (কোন ক্ষেত্রেই ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক... করিয়া লেখা বার পৃষ্ঠার অধিক নহে) অ... ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে আহ্বান করিতে... এ প্রবন্ধে বিচারক থাকিবেন ডাঃ শ্রী... বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ রায়, শ্রীপবিত্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়। সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকারীকে সমিতির পক্ষ হইতে "শান্তি লাহিড়ী রৌপ্যপদক" (পঁচিশ টাকার... প্রদত্ত হইবে। বিচারকদের সিদ্ধান্তই চ... বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। এই প্রবন্ধের লেখকের কোন দাবী থাকিবে না। কোন প্র... মূল্য নাই। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীক্ষীরোদ রায়
৩৫।১৩, পদ্মপুকুর
কলিকাতা-

বিজ্ঞমুখের কথা
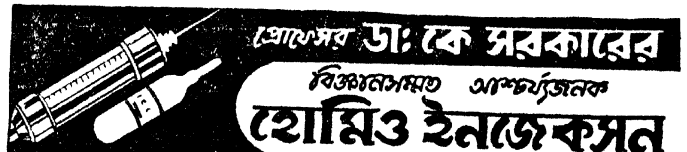
কোনও একটা জিনিসকে আঁকড়ে থাকার স্পৃহা মানুষের মজ্জাগত। বহু দিনের বিশ্বাস, সংস্কার টপ করে ছেড়ে দেওয়া বা কাটিয়ে ওঠা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুধু তাই নয়, একটা আন্তরিক মমতার আকর্ষণ মনের ভেতর থেকে কাজ করে। যার ইংরেজি নাম হল 'লয়্যালটিস্'।

পারিবারিক অথবা সাংসারিক বন্ধনের মোহ হল এমনি একটা লয়্যালটি। গৃহকে কেন্দ্র করে মানুষ বেঁচে আছে বহুদিন, আদিম মানুষ যখন প্রথম বাসা বেঁধেছে—তখন থেকে। তাই সেই গৃহের অর্থাৎ যৌথ-পরিবারের অশরীরী আকর্ষণ কাটানো সত্যই দুরূহ। আমরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত লোক মুখে বলি—আর পারি না! এত বড় সংসারের দায়িত্ব একার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে আর সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে—এ কেমন কথা? কিন্তু মুখে যতই নালিশ করি, হুমকি দেখাই, কাজের বেলায় এড়িয়ে যেতে পারি না। তার কারণ—কিছুটা চক্ষুলজ্জা, কিছুটা সমাজের অনুশাসন। কে কি ভাববে, এই ভেবেই আমরা অনেক সময় পিছিয়ে থাকি, জড়িয়ে থাকি। এটা দোষের কথা নয়, অথবা সাহসের অভাব বলছি না। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, সংসারের চাপ যেখানে অত্যাচারের সামিল, সামাজিক অনুশাসন যেখানে অন্যায় বলে বুঝতে পারছি অথচ আমরা নিরুপায় হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকি, বৃহৎ পরিবারের স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্রতা যখন অনায়াসে দায়িত্ব অর্পণ করে আপনি জগন্নাথ সেজে বসে থাকে, স্নেহান্ধ সংসার যখন পিছু টানে, আত্মোন্নতির সাহায্য না করে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তখন ঝেড়ে ফেলার সাহস না থাকলে তাকে বোধ হয় কাপুরুষতা বলা চলে। যারা লয়্যালটির গিল্টি পালিশ দেওয়া যূথ-বন্ধনের আদিম মনোভাবকে নিরুদ্যম ভীরুতা বলে চিনে ফেলেছে, তারা ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। মুক্ত আকাশের নীচে নিরুপদ্রব, অকারণ কলরববর্জিত পৃথক একটি নীড় রচনায় প্রয়াসী হয়।

* * * *

পুরুষের হাতে অর্থ, হাতে ক্ষমতা। তাই ঝাঁপ দেবার ভরসা সে রাখে, অথবা রাখতে পারে। কিন্তু নারীর পক্ষে যৌথ-পরিবারের মারাত্মক গণ্ডি কাটানো কঠিন। হয়তো তার সে ইচ্ছা আছে, ক্ষমতাও আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে পয়সারও হয়তো অভাব নেই। তবু সংসার ত্যাগ করে নিজের স্বামী-পুত্রকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র ঘর পাতবার উদ্যম তার বড় একটা থাকে না। তার প্রধান কারণ, আমাদের সমাজ। পুরুষ দুঃসাহসী, উচ্ছৃঙ্খল হলে বড় জোর সংসারের প্রশান্ত সমুদ্রে একটা চঞ্চলতা জাগে। নারী স্বাতন্ত্র্যাভিলাষিণী হলে ওঠে ঝড়-তুফান। উপরন্তু দুর্নাম, গঞ্জনা, অপবাদের আশঙ্কা আছে। যদি কোনও মহিলা সংসারের নীচতায়, কুটিল স্বার্থপরতায় বিব্রত, উৎপীড়িত বোধ করেন, তাঁকে চুপ করে থাকতে হবে। বোবার শত্রু নেই। নীরব দর্শক আর শ্রোতা সেজে, কৃত্রিম শিষ্টতার মুখোশ পরে যদি কাউকে না চটিয়ে সকলকে তুষ্ট করার চেষ্টায় তিনি নিজেকে নিরুদ্ধ রাখতে পারেন, তাহলে সংসার তাঁর স্তুতিবাদ করবে। গম্ভীর হলে দুষ্ট আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত তাঁকে খাতির করবে, সমীহ করে চলবে। কিন্তু এক হিসেবে তাঁর মনের ওপর যতখানি চাপ পড়ে, তার দাম কে দেয়? স্বামী তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখেও বুঝতে পারেন না, তাঁর সহিষ্ণুতার মাত্রা কতখানি। মনের চাপ ক্রমশ দেহকেও পীড়িত করে, স্নায়ু-গুলোকে টান করে রাখে। কিন্তু গোপনে কিভাবে তাঁর আত্মিক অধঃপতন হচ্ছে, সে খবর কে রাখে?

অনুকূল পরিবেশে এমন কোন মহিলার স্বাভাবিক বিনয়-সৌজন্য, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও সংযম তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও কতখানি সাহায্য করতে পারত। কিন্তু তাঁর সমস্ত শক্তি সর্বক্ষণ নিয়োজিত হচ্ছে হতশ্রী সংসারের শ্লেষ-কলহ-নীচতার সঙ্গে শান্ত সংগ্রাম চালিয়ে। পাছে কোনও অশান্তির সৃষ্টি হয়, কিংবা একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে যায়—এই ভয়েই তিনি অধিকাংশ সময় আড়ষ্ট থাকেন। সংসারের ছায়া-নাট্যের 'ক্রনিক' উত্তেজনায় তিনি এতটা উচাটন থাকেন, অন্যমনস্ক নিষ্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে পড়েন যে, সংসারই তখন তাঁকে দোষ দেয়—হয় তিনি অতিরিক্ত চাপা এবং দাম্ভিক, নয়তো তিনি বেচারী নির্বোধ। কিন্তু যে সংসারের ভারসাম্য খুঁজতেই তাঁর জীবনের সমস্ত সরসতা নষ্ট হল, স্বাভাবিক স্ফূর্তি এবং প্রাণের বিকাশ সেখানে খুঁজতে গিয়ে যদি না মেলে, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সংসারে আন্তরিক বিতৃষ্ণা এসে গেলেও কিন্তু এঁরা সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন না, কেননা, সংসার এঁদের রেহাই দেয় না। সবাই জানে এবং বুঝে ফেলে—যদিও স্বীকার করতে কেউ চায় না যে, আসলে এই মানুষটার ওপরই নির্ভাবনায় দায়িত্ব ফেলে দেওয়া চলে। সামঞ্জস্য আর শ্লীলতা-জ্ঞানে এই মানুষটা কদর্যতার ঊর্ধ্বে। এর দ্বারা আর কিছু না হোক অনিষ্ট হবে না। কর্তব্যবোধে আর ভদ্রতা শিক্ষায় আপনার স্বার্থকে বড় করে দেখবে না, আর বিপদে এই লোকটাই নীরবে এগিয়ে আসবে। অন্য মহিলারা যখন সামান্য একটু কাজ করেই বিজ্ঞাপনের ডামাডোল বাজাতে শুরু করেন, অযাচিতভাবে স্বামী-গৌরব, পুত্র-গৌরব, আর কিছু না থাকলে বাল্যকালের পিতৃগৃহের কল্পিত মাহাত্ম্য কীর্তন করতে শুরু করেন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের কথা সাতকাহন করেন, তখন এই মানুষটা কিছুই করে না। চুপ করে শোনে, দেখে—বড়-জোর একটু হাসে। মনে মনে একটা সন্দেহ আর অস্বস্তি হয় বৈকি! কিন্তু এই মানুষটাকে মুখ ফুটে কিছু বলা যায় না। আঁচলে আঁচল লাগিয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে কলহ-মনান্তর প্রকাশ্যে বাধানো অসম্ভব। তাই সংসার এই ধরণের মহিলাদের রেহাই দেয় না। আবার অমন ধরণের পুরুষদেরও রেহাই দেয় না। মাঝখান থেকে এদের দিয়ে আপনার সুবিধাটুকু বাগিয়ে নেয়......

এই হল আমাদের পুরুষালি সমাজ; এই হল আমাদের মেয়েলি সংসার। ইতরবিশেষ আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই 'এক্সপ্লয়েট' করবার প্রবৃত্তিটা উদগ্র হয়ে আছে। এই সমাজই নাকি আমাদের ধর্ম। অর্থাৎ আমাদের ধারণ করে আছে। বলা যেতে পারে—ধারণ করে ছিল একদিন, যখন গোষ্ঠী-সমাজের বাইরে পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত না। এখন আর ধারণ করে নেই, জড়িয়ে আছে। অনেকটা নাগপাশের মতন। এই সমাজ ও সংসার যতদিন পারবে, আমাদের শোষণ করবে। অনিশ্চিতের ভয়, ভবিষ্যতের ভয় আর অভ্যাসের মৌতাত মিলে আমাদের মনের চারিদিকে এমন একটা জটিল ও কঠিন জাল বুনে রেখেছে যে, সেই জাল সহসা কেটে বেরিয়ে আসা শক্ত। তবে দুনিয়াটাও শক্তের ভক্ত। যে সমাজে ব্যক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠা আছে, যে সংসারে মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় ন্যায়ত এবং আইনত—যেমন য়ুরোপ—সেখানে সাবালকত্ব অর্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথক গার্হস্থ্যের সূচনা হয়। জন্মগত মমত্ব-বন্ধন তাতে নষ্ট হয় না। অথচ তাকে ঘাড়ে চেপে বসার সুযোগও দেওয়া হয় না। মাঝখান থেকে ভদ্রতা, উদারতা, শ্লীলতা এবং সামাজিক সম-বেদনা পুষ্টিলাভ করবার সুবিধা পায়।
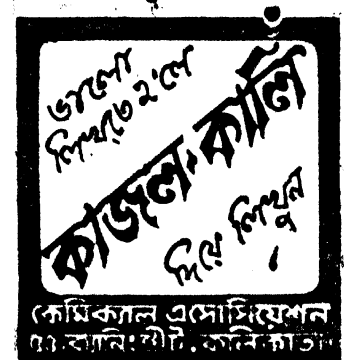
একেই বলে অধ্যবসায়!

সম্প্রতি জানা গেছে যে, আমেরিকার টাম্পা নিবাসী মিস্টার ও মিসেস মেলভিন জোন্স নামে এক অন্ধ দম্পতি নিজেরাই হাতে করে তাঁদের দোতলা বাড়ীটি তৈরীর কাজ শেষ করেছেন। ৯ বছর আগে তাঁরা দৃঢ়সংকল্প নিয়ে এই কাজে দুজনে হাত দিয়েছিলেন। ন'টি বছরের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও চেষ্টায় এতদিনে তাঁরা তাদের নতুন বাড়ীটি তৈরীর কাজ শেষ করেছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে তাঁরা বাড়ীটি তৈরী করেছেন তা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছে। অবাক হওয়ার কথাই তো!

মানুষের তৈরী তুষার বৃষ্টি!

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন প্রদেশের পোর্টল্যাণ্ড অঞ্চলে কর্নেল ই এস এলিসন নামে এক আবহাওয়া বিশারদ বৈমানিক কিভাবে মানুষ নকল তুষারবৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারে তা দেখিয়েছেন। তিনি রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরী ড্রাই আইস বা শুকনো বরফের গুঁড়ো বিমানে বোঝাই করে নিয়ে শূন্যপথে খুব উঁচুতে ওঠেন তারপর সেগুলি সেখান থেকে ছড়াতে থাকেন। তার ফলে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মনে হলো পাঁচ দশ মাইল জায়গা জুড়ে তুষারপাত হচ্ছে। এই ব্যাপারটির ছবিও তোলেন আর এক বৈমানিক ফটোগ্রাফার অন্য একটি বিমান থেকে। সেই ছবিটি ছাপা হলো। দেখলেই বুঝবেন যে মানুষও নকল তুষার তৈরী করে খোদার ওপর কতখানি খোদকারী করতে পারেন।

গরীব হলেও মহান দাতা!

বিগত বড়দিনের রাত্রে ম্যানহাটানের এক কারখানার শ্রমিক ৭৩ বছরের বুড়ো জেমস স্মিথ ছেঁড়া জুতো পায়ে তালি লাগানো পোষাকে কাঁপতে কাঁপতে এসে ঢুকলো এক সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানে। সেখানে সেদিন সবাই আসছে কিছু না কিছু দান দিয়ে যেতে। ঐ লোকটিকে ঢুকতে দেখে সবাই একটু অবাক হলো। ভেতরে ঢুকে সে তার ছেঁড়া জামার ভেতর থেকে বার করলে একটা কাগজের ঠোঙা। সেটা সে উপুড় করে দিলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের টেবিলে— দেখা গেল তা থেকে বেরিয়ে এল আমেরিকার ছোট বড় নানা দামের খুচরো মুদ্রা। গুণে দেখা গেল মোট রয়েছে ৩০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় নশো টাকা। খুব বিনয়সহকারে বুড়ো জেমস সম্পাদককে বললেন "নিউইয়র্কের শিশু হা পাতালের বাচ্চা রোগীদের সেবায় আমার এ যৎসামান্য দানটুকু কাজে লাগালে কৃতা হবো।"

এরপর সবাই তাঁকে বললে আপনারই ে নিজের চিকিৎসা ও পোষাকের দরকার—কিভা আপনি দান করতে ভরসা পাচ্ছেন। কেউ বে প্রশ্ন করলে—সব জিনিসেরই যখন এত দ বেড়েছে তখন কিভাবে এই পয়সাটা বাঁচালেন বুড়ো হেসে জবাব দিলে—"ওসব কথা আলা আমি তো নিজে অবিবাহিত—পরিবার বলে কিছু নেই, কাজেই কষ্ট করে নিজে থে গরীবদের যতটা সাধ্য সাহায্য করাই তো আমা উচিত। ঐ পয়সাটা কি করে জমিয়ে জানেন। রোজ বাড়ী ফিরে পকেটে যা খুচরে পয়সা থাকে তাই ফেলেছি ঐ ঠোঙাতে। এ ভাবে সারা বছরে যা জমে তা আমি কোন-না কোন গরীব-সেবার কাজে লাগিয়ে অফুরন্ত আনন্দ পাই এই ভেবে যে আমি আমার সাধ্যমত যতটুকু পেরেছি করেছি।"

ভাবুন তো এমন দাতা যে দেশে আছে সে দেশের গরীবদের দুঃখ লাঘব করতে বড় লোকদের ভিক্ষার দান দরকার হয় কি?

জেটচালিত প্রথম মোটর গাড়ী!

সুইজারল্যাণ্ডের অস্টাড্ শহরের হান্স বার্জার জেট-চালিত ছোট্ট একটি মোটর গাড়ী তৈরী করেছেন। এটি লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ'ফুট, চওড়া সওয়া তিন ফুট, গাড়ীটির ইঞ্জিনটির ওজন মাত্র সাড়ে ছ'সের এবং এটি বসানো হয়েছে গাড়ীটির পিছনে। এই গাড়ীটির নাম দেওয়া হয়েছে—"ইয়ং সুইজারল্যাণ্ড"। গাড়ীটি এখনও পর্যন্ত ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে দৌড়ুতে সমর্থ হয়েছে —তবে এটির গতি প্রায় ঘণ্টায় ৩০০ মাইল পর্যন্ত করা চলবে। এখানে গাড়িটির ছবি দেওয়া হচ্ছে; গাড়ীটিতে বসে আছে মি বার্জারের দু'বছরের মেয়েটি।
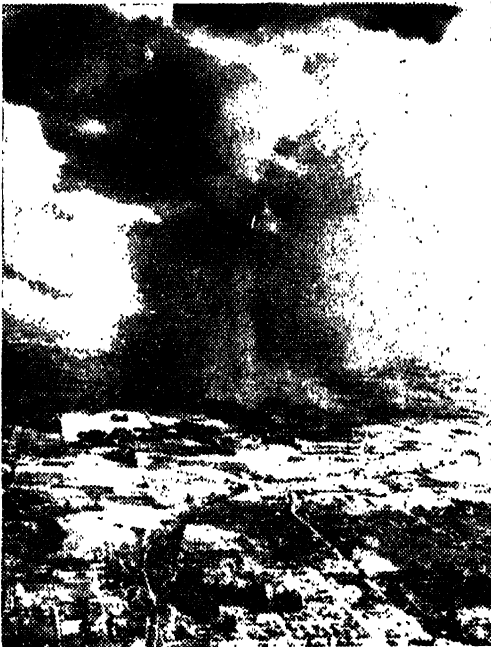
মানুষের তৈরী তুষার পড়ছে

জেট চালিত প্রথম মোটর গাড়ী

"ক্ষুরস্য ধারা"—
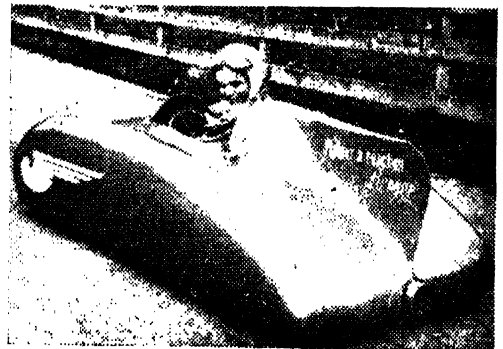
সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

(সাত)

এলিয়টের চাকর জোসেফের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানলাম যে এলিয়ট অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে, ও আমাকে দেখলে খুশি হবে, সুতরাং পরদিন এনটিবে যাত্রা করলাম। জোসেফ আমাকে তার মনিবের কাছে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে জানালো যে, এলিয়ট ইউরিমিয়া রোগে আক্রান্ত, ডাক্তাররা তার অবস্থায় শঙ্কিত। সে এখন একটু সামলে উঠেছে, ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছে কিন্তু ওর কিডনী দোষগ্রস্ত আর কোনো দিন যে সেগুলি আবার সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে উঠবে সে আশা নেই। জোসেফ চল্লিশ বৎসর এলিয়টের সেবা করছে, আর তারপ্রতি অনুরক্ত, ওর ভঙ্গী যদিচ শোকাকুল তবু আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সন্তোষের ভঙ্গী দেখা গেল, ওদের শ্রেণীর অনেকেরই চরিত্রে এ ভঙ্গী দেখা যায়।

"Ce pauvre monsieur"—(আহা বেচারা!) জোসেফ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। "ও'র অবশ্য অনেক রকম বাতিক ছিল বটে, তবে অন্তরটা ভালোই ছিল। তবে সকল মানুষকেই ত' একদিন মরতে হবে। দুদিন আগে আর পরে।"

এমনভাবে কথাগুলি সে উচ্চারিত করল যেন এলিয়ট শেষ নিশ্বাস ফেলেছে। আমি গম্ভীরভাবে বললাম : "তোমার একটা ব্যবস্থাও করেছে নিশ্চয়, কেমন জোসেফ?" সে শোকাকুল ভঙ্গীতে বললে "সেইরকম আশাইত' করা যায়।"

আমাকে যখন সে ঘরে নিয়ে গেল তখন এলিয়টের উৎফুল্ল চপলতা দেখে আমি বিস্মিত হলাম। তাকে মলিন এবং বয়স্ক দেখাচ্ছে বটে কিন্ত মন বেশ হাল্কা। ওর দাড়ি কামান, চুলগুলি পরিচ্ছন্ন ভাবে ব্রাস করা, পরণে একটি ফিকে নীল রঙের পাজামা, তার পকেটে সেই কাউণ্টের মুকুটের ভিতর ওর নামের আদ্যাক্ষর অঙ্কিত রয়েছে। এর চেয়ে আরো বড় অক্ষরে মুকুটের ভিতর এইভাবেই নামাঙ্কিত রয়েছে ওর বিছানার চাদরে।

সে এখন কেমন বোধ করছে জানতে চাইলাম।

এলিয়ট সানন্দে জানালো, "চমৎকার আছি, এ একটা সাময়িক অসুস্থতা, আবার দু চারদিনের ভিতরই চাঙ্গা হয়ে উঠবো। গ্রাণ্ড ডিউক ডিমিট্রির সঙ্গে শনিবার লাঞ্চ খাব, আমার ডাক্তারকে বলেছি যে কোনো মতে তার ভিতর আমাকে খাড়া করে দিতেই হবে।"

আমি ওর সঙ্গে আধঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম, তারপর চলে আসার সময় জোসেফকে বললাম যদি আবার অসুখ বাড়ে তাহলে আমাকে একটা খবর দিও। এক সপ্তাহ পরে আমার এক প্রতিবেশীর বাড়িতে লাঞ্চ-এ গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা হতে আমি অবাক হয়ে গেলাম,—পার্টির জন্য সজ্জিত এলিয়টকে যেন মূর্তিমান মৃত্যুর মতো দেখাচ্ছে।

আমি তাকে বললাম : "তোমার এভাবে বেরোনো উচিত হয়নি এলিয়ট।"

"কি যে বাজে বকো ভায়া, ফ্রীডার ওখানে রাজকুমারী মারকলদার আসার কথা রয়েছে, এই ইতালীয় রাজপরিবারকে আমি দীর্ঘদিন ধরে জানি, সেই লুইসা বেচারীরা যখন রোমে ছিল, তখন থেকে জানাশোনা। ফ্রীডা বেচারাকে ত' বিপদে ফেলতে পারি না।"

ওর অদম্য উৎসাহের প্রশংসা করব, না এই মারাত্মক ব্যাধিজর্জরিত শরীর নিয়ে, এই বয়সেও সামাজিকতার এই উৎকট বিলাস সম্পর্কে অনুশোচনা করব তা বুঝলাম না। দেখে মনেই হবে না যে অসুস্থ মানুষ। মরণোন্মুখ অভিনেতা যেমন আসন্ন মৃত্যুর ব্যথা ও বেদনা ভুলে রঙমাখা মুখে ষ্টেজের ওপর এগিয়ে আসে, এলিয়টও সেই ভঙ্গীতেই মার্জিত সভাসদের ভূমিকায় তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে অভিনয় করে গেল। ওর অপরিসীম অমায়িকতা যথাযোগ্য অভ্যাগতদের প্রতি যথারীতি চাটুকারিতাপূর্ণ আগ্রহ ও স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষ-বাক্যে সবাইকে আমোদে রেখেছিল। ওর সামাজিকতার এই ধরণের পরিচয় আর কখনো বোধকরি আমি দেখিনি। যখন রয়েল হাইনেস চলে গেলেন (আর যে ভঙ্গীতে এলিয়ট অভিবাদন জানালো, তার ভিতর উচ্চপদের উপযুক্ত সম্ভ্রম ও তারুণ্যের প্রতি বৃদ্ধের স্বভাবোচিত সপ্রশংস ভঙ্গী ফুটে উঠল) তখন গৃহকর্ত্রী বল্লেন যে পার্টিটা শুধু এলিয়টের জন্যই জমলো, এলিয়টই এই পার্টির প্রাণস্বরূপ।

কয়েকদিন পরেই এলিয়ট আবার অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, ডাক্তাররা তাকে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে নিষেধ করলেন। এলিয়ট ত' রাগে জ্বলে উঠল :

"ঠিক এই সময়েই এমনটা ঘটল, এ অতি বিশ্রী অবস্থা। এখন বিশেষ করে চমৎকার সীজন।"

রিভেয়ারায় কোন্ কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রীষ্ম যাপন করতে এসেছেন এলিয়ট তার দীর্ঘ তালিকা আউড়ে গেল

আমি তাকে প্রতি তিন চার দিন অন্তর দেখতে যেতাম। কখনো কখনো সে বিছানায় শুয়ে থাকত, কখনো বা খোলা কেদারায় ঝকমকে ড্রেসিং গাউন পরে পড়ে থাকত, ও জিনিসটির ওর বোধকরি অফুরন্ত সঞ্চয় ছিল, কেন না একটি ড্রেসিং গাউন ওকে দ্বিতীয়বার পরতে দেখেছি বলে স্মরণ হয় না। এই রকম একদিনে, ততদিনে আগষ্ট মাস পড়ে গেছে, আমি এলিয়টকে অস্বাভাবিক রকমের শান্ত দেখলাম। বাড়িতে ঢোকার সময় জোসেফ আমাকে বলেছিল এলিয়ট এখন অপেক্ষাকৃত ভালো আছে মনে হয়; ওকে এখন শান্ত দেখে তাই আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার সংগৃহীত উপকূলস্থ গুজবাদি বলে ওকে আমোদিত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও একেবারে আগ্রহহীন হয়ে রইল। ওর চোখের কোণে ক্ষীণ ভ্রুকুটি লক্ষ্য করলাম, আর ওর ভঙ্গিমায় এমন একটা বিষণ্ণ ভাব দেখা গেল যা তার পক্ষে অস্বাভাবিক।

সহসা সে আমাকে প্রশ্ন করলে : "তুমি এড্না নভেমালির পার্টিতে যাচ্ছ নাকি?"

"না, কিছুতেই নয়।"

"ও তোমাকে বলেছে?"

"রিভেয়ারার সবাইকেই ও বলেছে।"

প্রিন্সেস্ নভেমালি অসীম বিত্তশালিনী মার্কিন মহিলা, একজন রোমান প্রিন্সকে বিবাহ করেছেন। ইতালিতে দু চার পয়সার যে সব প্রিন্স ছড়াছড়ি যায় এ সেই জাতীয় প্রিন্স নয়। এক বিরাট পরিবারের ইনি প্রধান, আর ষোড়শ শতাব্দীর একজন করিৎকর্মা Condottiere-এর (লুণ্ঠনকারী) এঁরা বংশধর। স্ত্রীলোকটির বয়স ষাট, বিধবা, আর ফ্যাসিস্ত সরকার তাঁর মার্কিনী আয়ের ওপর একটা মোটা অংশ দাবী করায়, তিনি ইতালি ছেড়ে নিজের জন্য ক্যানের ধারে একটি চমৎকার 'ফ্লোরেনটাইন ভিলা' বানিয়েছেন। ইতালিয়ান মার্বেল দিয়ে তিনি বাড়িটার দেয়াল গেঁথে তুলেছেন, বিদেশ থেকে শিল্পী আমদানি করে ছাদ চিত্রিত করেছেন। তাঁর চিত্রাবলী, ব্রোঞ্জের মূর্তি প্রভৃতি অসাধারণ সৌন্দর্যের সামগ্রী, এমন কি এলিয়ট নিজে ইতালীয়

আসবাব পছন্দ না করলেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে তাঁর সংগ্রহ অপূর্ব। বাগান অতি মনোরম আর স্নানাশয় নির্মাণে একটা ঐশ্বর্য ব্যয়িত হয়েছে। তিনি নিমন্ত্রণাদির বিশেষ আয়োজন করতেন আর বিশজনের নীচে কখনো নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হ'ত না। শ্রাবণ-পূর্ণিমা উপলক্ষে তিনি একটি ফ্যান্সি ড্রেস পার্টির আয়োজন করেছেন, আর যদিও সেই দিনটির এখনও তিন সপ্তাহ বাকী, তবু রিভেয়ারায় সকলের মুখে ঐ ছাড়া আর কোনো আলোচনা নেই। আতসবাজি পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, আর প্যারী থেকে যন্ত্রসংগীতের একটা দল আনা হবে, নির্বাসিত রাজন্যবর্গ পরস্পর ঈর্ষাকাতর ভংগীতে বলাবলি করছেন যে, এর দরুণ প্রিন্সেস যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবেন তা ওঁদের সারা বছরের জীবনযাত্রার খরচ।

তাঁরা বলছেন "এ একেবারে নবাবী।"

তাঁরা বলছেন "এসব নিছক পাগলামী।"

তাঁরা বলছেন "এসব বিকৃত রুচির পরিচায়ক।"

এলিয়ট আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "তুমি কি পরে যাবে?"

"আমিত' তোমাকে বললাম এলিয়ট, আমি যাবো না। এই বয়সে আর কি আমি ফ্যান্সি ড্রেসে সাজতে যাব মনে কর।"

সে ভাংগা গলায় বলে "আমাকে কিন্তু নিমন্ত্রণ করেনি।"

আমার মুখের পানে শীর্ণদৃষ্টিতে তাকালো এলিয়ট। আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম ঃ "বলবে বৈকি, সব নিমন্ত্রণপত্র এখনও হয়ত ছাড়া হয়নি।"

"না আমাকে বলবে না।" ওর গলার স্বর ভেংগে পড়ল। "এ হ'ল ইচ্ছাকৃত অপমান।"

" না না এলিয়ট, তা বিশ্বাসের বাইরে, নিশ্চয়ই হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে।"

"সহজে লোকের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মত লোক আমি নই।"

"যাই হোক, যাওয়ার মত ত' তোমার শারীরিক অবস্থা হ'ত না।"

"নিশ্চয়ই আমি যেতাম, এই সীজনের এই হোল সর্বশ্রেষ্ঠ পার্টি! আমি যদি মৃত্যু-শয্যায় পড়ে থাকতাম তাহলেও উঠে যেতাম। আমার পূর্বপুরুষ কাউণ্ট দ্য লরিয়ার পোষাক পরে আমি যেতাম।"

কি যে বলব বুঝতে না পেরে আমি নীরব রইলাম।

এলিয়ট সহসা বলে উঠল "তুমি আসার কিছু আগে পল বারটন আমাকে দেখতে এসেছিল।"

এই ব্যক্তিটি যে কে আমার পাঠকদের পক্ষে তা স্মরণ রাখা সম্ভব বলে মনে করি না, কারণ আমাকেই দেখতে হ'ল, কি নাম তার দিয়েছি। যে তরুণ মার্কিনকে এলিয়ট সমাজে পরিচিত করে দিয়েছিল এবং যে তাকে পরে প্রয়োজনান্তে ত্যাগ করছিল তারই নাম পল বারটন। সম্প্রতি সাধারণের চোখে তার খ্যাতি বেড়েছে, কারণ সে ব্রিটিশ জাতীয়ত্ব গ্রহণ করেছে এবং সংবাদপত্রের একজন মালিকের মেয়েকে বিবাহ করেছে, সংবাদপত্র মালিকটি পীয়রত্ব লাভ করেছেন। এই প্রভাবের পট-ভূমিকায় ও স্বীয় তৎপরতায় স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে যে সে অনেক দূর যাবে। এলিয়ট তাই অতি তিক্ত হয়ে আছে—

"রাতে যখনই আমার ঘুম ভেঙে যায়, আর শুনি ইঁদুরে আমার ওয়েস্ট কোটটা আঁচড়াচ্ছে, তখনই বলি "ওই পল বারটন নামছে। 'দেখো ভায়া ও শেষ পর্যন্ত হাউস অব লর্ডসে গিয়ে বসবে। ভগবানের দয়ায় তখন অবশ্য সেসব দেখার জন্য আমি আর বেঁচে থাকব না।"

এলিয়টের মত আমিও জানতাম এই ছোকরাটি বিনা স্বার্থে কোনো কিছু করার লোক নয়, তাই বললাম ঃ ও কি চায়?"

এলিয়ট খেঁকিয়ে বলে উঠল ঃ "কি চায় বলছি, আমার ঐ কাউণ্ট দ্য লরিয়ার পোষাকটা ধার চায়।"

"সাহস ত' খুব!"

বুঝতে পারছ না এর মানেটা কি? এর মানে ও জানে এড্না আমাকে বলেনি ও বলবে না- সেই ওকে পাঠিয়েছে, বুড়ো ডাইনী, আমি না থাকলে আজ ও থাকত কোথায়! আমি ওর জন্য কত পার্টি দিয়েছি, যাদের সবাইকে ও চেনে তাদের সংগে আমিই ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, জানো ও রাতে ওর সোফারের সংগে শোয়: তুমি নিশ্চয়ই তা জানো, কি কেলেংকারি! বারটন এখানে বসে আমাকে বলে গেল এড্না সারা বাগান আলো দিয়ে সাজাবে, আতস-বাজি ছোঁড়া হবে ইত্যাদি। আমি আতস-বাজি ভালোবাসি। তারপর বল্ল এড্নাকে কতলোক নিমন্ত্রণের জন্য পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু এড্না সে সব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে, পার্টিটাকে ও সত্যই জমকালো করতে চায়। এমনভাবে কথা বলল যেন আমাকে নিমন্ত্রণের কোনো কথাই ওঠেনা।"

"তুমি কি পোষাকটা ধার দিচ্ছ নাকি?"

"তার আগে আমি ওর মৃত্যু ও নরকবাস দেখব। আমি ওর পরে কবরস্থ হব।" উঠে বসে এলিয়ট বিকৃতমস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের ন্যায় নড়তে লাগল, সে বলল, "ওঃ কি অকরুণ! আমি ওদের ঘৃণা করি, ওদের সবাইকেই ঘৃণা করি। যখন আমি ওদের আপ্যায়ন করেছি, ততদিন ওরা খুশি ছিল, এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি, রুগ্ন হয়েছি, এখন আর ওদের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হওয়ার পর দশজনও আমার খোঁজ নিতে আসেনি। আর এই সারা সপ্তাহে মাত্র একটি অতি সাধারণ ফুলের তোড়া পাওয়া গেছে। আমি ওদের জন্য অনেক কিছু করেছি। ওরা আমার খাদ্য ও মদ্যের সদ্ব্যবহার করেছে, আমি ওদেরই জন্য ওদের সংবাদ বহন করে বেড়িয়েছি, আমি ওদের জন্য পার্টির আয়োজন করে দিয়েছি, ওদের জন্য আমার ভিতরকে বাহির করে, উজাড় করে দিয়েছি, আর তার বিনিময়ে কি পেলাম? একেবারে কিছু নয়—কিছুই নয়। আমি মরি কি বাঁচি, তাতে ওদের মধ্যে একজনেরও কিছু আসে যায় না, ও কি নিষ্ঠুর।"

এলিয়ট কাঁদতে লাগল, ওর চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটা গাল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল —বলল ঃ "এখন ভাবি ভগবান, আমেরিকা ছেড়ে না আসাই আমার ভালো ছিল।"

এই বৃদ্ধ—কবরের গহ্বর যার জন্য হাঁ করে রয়েছে, পার্টিতে ডাকা হয়নি বলে এই-ভাবে শিশুর মত কাঁদছে, এ বড় বেদনাকর দৃশ্য, এ অতি অদ্ভুত, অসহনীয়ভাবে করুণ অবস্থা।

আমি বললাম, "কিছু ভেবো না এলিয়ট, পার্টির দিন রাত্রে হয়ত বৃষ্টি হবে, তাহলেই জব্দ হবে।"

আমার কথাগুলি ও নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণ ধারণের ভংগীতে গ্রহণ করে চোখের জলের ভিতরই হেসে উঠল।

"আমি ওকথা ভাবিনি। আমি ভগবানের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করব, এমন প্রার্থনা আর কখনো করিনি, তাহলেই সব মাটি হবে।"

ওর বিক্ষিপ্ত মনটিকে অন্য খাতে চালিত করে দিলাম এবং তাকে উৎফুল্ল না হলেও অন্তত আত্মস্থ করে চলে এলাম। কিন্তু ব্যাপারটি এইখানেই নিষ্পত্তি করতে দিলাম না, সুতরাং বাড়ি ফিরেই এড্না নভেমালিকে টেলিফোনে ডেকে বললাম যে, পরদিন আমি ক্যানেতে যাচ্ছি ওর সংগে লাঞ্চ খাওয়া যেতে পারে কিনা, জিজ্ঞাসা করলাম। নভেমালি জানাল, আমাকে সে সানন্দে আপ্যায়িত করবে, তবে কোন পার্টি হবে না। যাই হোক, আমি কিন্তু পৌঁছে দেখি, শ্রীমতী নভেমালি ছাড়া তার দশজন উপস্থিত রয়েছে। নভেমালি খারাপ ধরণের স্ত্রীলোক নন, মহানুভবতা ও আতিথেয়তা আছে, তার একমাত্র দোষ—ধারালো জিভ। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব সম্পর্কেও পৈশাচিক উক্তি করতে তার বাধতো না, কিন্তু এ কার্য সে করতো শুধু নির্বোধ স্ত্রীলোক বলেই আর নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অপর কোন প্রকার অভিব্যক্তি তার জানা ছিল না বলেই।

এড্নার মুখনিঃসৃত কুৎসাবলীর প্রায়ই পুনরাবৃত্তি হত বলে তার বিষোদ্গারের পাত্রাবলীর সংগে তার অনেক ক্ষেত্রে বাক্যালাপ বন্ধ থাকত। তবে সে ভালো ভালো পার্টি দিত

বলেই তারা ওকে ক্ষমা করত- ওর এই বিরাট ব্যবস্থায় এলিয়টকে নিমন্ত্রণ করতে অনুরোধ করে তাকে অপমানিত করবার বাসনা আমার ছিল না, তাই ব্যাপারটা কি, তাই জানার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। এ বিষয়ে এড্না উত্তেজিত হয়েই ছিল—লাঞ্চের সময় এ ছাড়া আর কথাই ছিল না।

আমি যথাসম্ভব আকস্মিকভাবে উল্লেখ করলাম—"এলিয়ট ওর ফিলিপ দি সেকেণ্ড পোষাক পরতে পেলে খুশি হবে।"

সে বলল: "আমি ত' ওকে বলিনি।"

আমি বিস্ময়ের ভান করে বললামঃ "কেন?"

"কেন বলব? ওর আর এখন কোন সামাজিক মূল্য নেই। ও একটি বিরক্তিকর ও কুৎসা প্রচারক প্রাণী।"

এই সব অভিযোগ সত্যের খাতিরে সমান-ভাবে ওর প্রতিও প্রযোজ্য—তবু কথাগুলি আমার কাছে একটু স্থূল ঠেকল। স্ত্রীলোকটি নির্বোধ!

সে আবার বললঃ "তাছাড়া আমি চাই পল এলিয়টের পোষাক পরুক, ঐ বেশে ওকে চমৎকার মানাবে।"

আমি আর কিছু বললাম না, কিন্তু যে কোন উপায়ে বেচারা এলিয়টের জন্য একখানা নিমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহের জন্য বদ্ধপরিকর হলাম। লাঞ্চের পর এড্না তার বন্ধুদের বাগানে নিয়ে গেল আমিও বাঞ্ছিত সুযোগ পেয়ে গেলাম—একবার আমি এই বাড়িতে দু-চারদিন ছিলাম, তাই এর বন্দোবস্ত আমার জানা ছিল। অনুমান করলাম, সেক্রেটারীর কাছে এখনও অনেক নিমন্ত্রণ পত্র নিশ্চয়ই পড়ে আছে, তার ঘরেই সেগুলি আছে। আমি সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম, একখানি পকেটে ফেলার মতলব, তার ওপর এলিয়টের নামটি লিখে ডাকে ছেড়ে দেব। জানতাম, ও এতই অসুস্থ যে, আসতে পারবে না। কিন্তু এই নিমন্ত্রণলিপি পাওয়ার অর্থ ওর কাছে অনেকখানি। কিন্তু দরজা খুলে ঘরে ঢুকে এড্নার সেক্রেটারীকে ডেস্কে বসে থাকতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম—তখনও লাঞ্চের টেবিলেই সে বসে থাকবে আশা করেছিলাম। মিস কিথ্ মধ্যবয়সী স্কচ রমণী, ধূসর চুল, মুখে দাগ, চোখে পাঁশ-নে—আর মুখে কৌমার্যের দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছাপ। আমি আত্মস্থ হয়ে নিলাম।

"প্রিন্সেস ত অতিথিদের নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছেন; তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে এখানে একটু ধূমপান করে যাই।"

"আসুন, স্বাগত।"

মিস কিথ্ স্কচ ভঙ্গীতে কথা বলেন, আর যখন কাষ্ঠ রসিকতা করেন, তখন তা এমনই বিস্তৃত করে তোলেন যে, শ্রোতার কাছে তা অতীব আমোদদায়ক হয়ে ওঠে। দু-চারজন প্রীতিভাজনের জন্যই মিস কিথের এই রসিকতা সংরক্ষিত। কিন্তু যখন আপনি হেসে গড়িয়ে পড়বেন, তখন সে এমনই বিস্ময়াহত ভঙ্গী করে থাকবে যে, দেখে মনে হবে, যেন তার সব কথাতেই রস অনুভব করে আপনি এমনি হেসে থাকেন।

আমি বললামঃ "মনে হয়, এই পার্টির ব্যাপারে তোমার ভীষণ খাটুনি পড়েছে মিস কিথ্।"

"মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছি না পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, জানি না।"

ওকে বিশ্বাস করা চলতে পারে জেনে আমি খোলাখুলি কথাটি পাড়লামঃ "বুড়ো খুকি এলিয়টকে বলেনি কেন?"

মিস কিথের গম্ভীর আকৃতিতে একটা হাসির রেখা তরঙ্গায়িত হল।

"উনি যে কি, তা ত জানেন। ওর ওপর ইনি চটেছেন। তালিকা থেকে ওর নাম উনি স্বহস্তে বাদ দিয়েছেন।"

"জানো ত টেম্পলটন মৃত্যুমুখে, আর বিছানা ছেড়ে উঠবে না কোনদিন, এভাবে আমন্ত্রিত না হয়ে ও বড় ব্যথা পেয়েছে।"

"প্রিন্সেসের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে হলে উনি যে সোফারের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকেন, এ-কথাটা চারিদিকে না রটিয়ে বেড়ালেই পারতেন। আর সেই সোফারের আবার স্ত্রী ও তিনটি সন্তান আছে।"

"সত্যি! —এড্না শোয় নাকি?"

মিস কিথ্ তার পাঁশ-নের ফাঁকে আমাকে বেশ করে দেখে নিয়ে বললঃ "আমি একুশ বছর সেক্রেটারীর কাজ করছি, এই নীতি মেনে নিয়েছি যে, আমার মনিব মাত্রেই তুষারের মত অকলঙ্ক ও পবিত্র। স্বীকার করি, আমার এক মনিব-গিন্নী যখন তিন মাস অন্তঃস্বত্ত্বা, তখন তাঁর স্বামী আফ্রিকায় ছ মাস ধরে সিংহ শিকার করে বেড়াচ্ছেন, তখন আমার এই নীতি প্রায় ছিন্নভিন্ন হওয়ার উপক্রম- যাই হোক, শেষে প্যারীতে আসা হোল। সে যাত্রাটি অবশ্য বারবহুল হল, তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। হার লেডিসিপ্ আর আমি দুজনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।"

"মিস কিথ্ আমি এখানে তোমার সঙ্গে ধূমপানের খাতিরে আসিনি, এলিয়ট বেচারার জন্য একখানা নিমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই স্বয়ং এসেছিলাম।"

"অতি অবিবেচকের কাজ হত তাহলে।"

"দিয়ে দাও। মিস কিথ্, লক্ষ্মী মেয়ে, একখানি কার্ড দাও। সে আসবে না অথচ বেচারা বৃদ্ধ শান্তি পাবে। তোমার ত তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আছে নাকি?"

"না, উনি চিরদিনই আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছেন। উনি পাকা ভদ্রলোক। ওঁর সম্বন্ধে এটুকু বলব, এখানে প্রিন্সেসের কাছে এসে যারা তাদের ভুঁড়ো পেট ভরিয়ে যায়, তাদের অনেকের সম্পর্কেই একথা বলা খাটে না।"

সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিম্নপদস্থ দু-একজন কর্মচারী থাকেন, যাঁদের কথা তাঁরা শুনে থাকেন। এই সব অপোগণ্ডরা ব্যঙ্গ, বক্রোক্তি বা তাচ্ছিল্য-সম্পর্কে অতি সচেতন—যদি তারা বোঝে যে, যথোচিত সম্মান পাওয়া গেল না, তাহলে তারা তাদের মুরুব্বিদের কান ভারি করে দেয়, বিরূপ ব্যক্তিদের প্রতি মনিবের বিরোধ বাড়িয়ে তোলে। তাদের সঙ্গে খাতির বজায় রাখা ভালো। এলিয়ট এ ব্যাপারটা ভালোই জানত, তাই দরিদ্র আত্মীয় বা প্রাচীন দাসী-চাকরানী বা সেক্রেটারীর প্রতি বন্ধুতার সুরে সদয় ভঙ্গীতে দু-একটা কথা বলতোই বা মৃদু হাসত। আমি নিশ্চিত জানতাম, মিস কিথ্কে সে মাঝে মাঝে জিনিষ-পত্র উপহার দিয়েছে—ক্রীসমাসে এক বাক্স চকোলেট দিয়েছে বা একটা ভ্যানিটি কেস কিম্বা হ্যাণ্ডব্যাগ উপহার দিয়েছে।

বললাম, "নাও মিস কিথ্, হৃদয়ের পরিচয় দাও।"

প্রশস্ত নাকের ওপর মিস কিথ্ তার পাঁশ-নেটি ভালো করে আঁটলো, তারপর বললঃ

"আপনি নিশ্চয়ই আমার মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলেন না মিঃ মম। তাছাড়া ওই বুড়ো গাই যদি জানতে পারে, তাহলে সোজা আমাকে বরখাস্ত করবে। কার্ড-গুলি টেবিলে পড়ে আছে—খামের ভিতর ঢাকা। আমি জানালার ধারে গিয়ে অংশত বাহ্য-সৌন্দর্য দেখব, আর দীর্ঘক্ষণ একভাবে কাজ করে পা টেনে ধরেছে ছাড়িয়ে নেব। পিছনে ফিরলে যদি কিছু ঘটে, স্বয়ং বিধাতা বা মানুষ কেউই আমাকে তার জন্য দায়ী করতে পারবে না।"

মিস কিথ্ যখন তার চেয়ারে ফিরে বসল, তখন নিমন্ত্রণ পত্র আমার পকেটে।"

আমি হাত প্রসারিত করে বললাম, "তোমাকে দেখে ভারি আনন্দ হল মিস কিথ্। ফ্যান্সি-ড্রেস পার্টিতে তুমি কি পরবে?"

সে বললঃ মশাই আমি পাদ্রির মেয়ে, এই সব নির্বুদ্ধিতা বড়লোকের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। "হেরাল্ড আর মেইল" পত্রিকার প্রতিনিধিদের যখন সাপার খাওয়া ও আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর স্যাম্পেন শেষ হয়েছে দেখব, তখনই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে—তখন আমার শোবার ঘরের নিভৃতে একখানি ডিটেকটিভ কাহিনী নিয়ে বিশ্রাম করতে যাবো।

(ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক* সমস্যা

মঞ্জুভূষণ দত্ত

নয়া-বাঙলার আয়তন যে পরিমাণে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে, সমস্যা সেই অনুপাতে সহজ হয় নাই অর্থাৎ কাঁকুড় দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তের হাত বীচিটা অক্ষতই রহিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ তুলিবার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রেই যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনো তাহার টাল সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

আলোচনা শুরু করিবার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে একবার চোখ বুলাইয়া লইলে ভালো হয়। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন অবিভক্ত বঙ্গের প্রায় ৩৬% এবং জনসংখ্যা ৩৫% (১৯৪১-এর সেন্সাস অনুসারে)। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা এই কয় বৎসরে আরও অনেকটা বাড়িয়াছে, তবে নূতন সেন্সাসের পূর্বে এই সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা সম্ভবপর নহে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবী লোকের সংখ্যা ৫০%-এর অধিক নয়, অবশিষ্ট জনসমষ্টির ১৬% শিল্প সংক্রান্ত কার্যে জীবিকা নির্বাহ করে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিসম্পদ সামান্যই, প্রধান শস্যগুলির উৎপাদন প্রয়োজনানুরূপ নহে। পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমি অনুপাতে বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলসেচনের সুব্যবস্থা নাই, নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গের প্রভেদ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপর দিকে পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসম্পদ অনেক বেশি; অবিভক্ত বাঙলার কল-কারখানা এবং খনিজ সম্পদ প্রায় সবই পশ্চিমবঙ্গের অংশে পড়িয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গকে প্রধানত শিল্পের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে, তবে কৃষি-উন্নয়নও আবশ্যক। পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করা। মাথাপিছু আয় বাড়াইতে হইলে শুধু মাত্র ন্যায়সঙ্গত ধন-বণ্টনেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না, উৎপাদনও বাড়াইতে হইবে। ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই জনবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন, সুতরাং আয়তন অনুপাতে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অধিকতর।

পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে গেলে অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী। গঠনমূলক বলিয়া এই ব্যয়কে 'টাকা খাটান' বলাই বোধ হয় সমীচীন। ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটকে ভিত্তি করিয়া গঠনমূলক কার্যের একটা তালিকা করা যাইতে পারে; (১) শিক্ষা, (২) জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, (৩) গৃহনির্মাণ, (৪) কৃষিকার্য ও জলসেচ, (৫) সমবায়, (৬) শিল্প, (৭) আইন ও শৃঙ্খলা, (৮) জল সরবরাহ।

উপরিউক্ত উন্নয়ন-পরিকল্পনায় কোন বিভাগকেই অবহেলা করা যায় না এবং প্রতি বিভাগেই বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। গত বৎসরের বাজেটে জমার তহবিলে ৩১ কোটি টাকা (তন্মধ্যে সাড়ে ছয় কোটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছিলেন) এবং খরচ বাবদ ৩২ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। এই ৩২ কোটি টাকার মধ্যে সাড়ে ছয় কোটি টাকা গঠনমূলক কার্যে ব্যয়িত হইবার কথা ছিল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব আয় ২৪½ কোটি টাকার অধিক নয়, এবং অন্যান্য দুই কোটি লোকের জন্য গঠনমূলক কাজে যে ৬½ কোটি টাকা ‡ বরাদ্দ হইয়াছিল তাহাও ভিক্ষালব্ধ।

পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্টের আর্থিক দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দুইটি বিষয় সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সকল প্রদেশেরই আর্থিক অভিযোগ রহিয়াছে। সকলেরই বক্তব্য একঃ কেন্দ্রীয় সাহায্য ভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির পরস্পরের মধ্যে রাজস্ববণ্টনে যে অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত দুইটি পরীক্ষা করা যাক।

নিম্নের অংকগুলি (Eastern Economist, Annual Number, 1948.) হইতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের আয় ব্যয়ের (১৯৩৯-৪৮) পরিমাণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিবে।

উল্লিখিত হিসাবে দেখা যায় ১৯৩৯-৪০ হইতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয় উভয়ই ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে প্রতি বৎসরই কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় আয় অপেক্ষা বেশী কিন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলির মোট ব্যয় সকল বৎসর মোট আয় অপেক্ষা অধিক নয়। এই হিসাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক অবস্থা দেওয়া নাই, কিন্তু তাহাদের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নিদর্শন আছে; কোন কোন বৎসর সামান্য উদ্বৃত্ত থাকিলেও মোট প্রয়োজনের পক্ষে এই উদ্বৃত্ত অর্থ যথেষ্ট নয়। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে যদিও দেশের শাসকবর্গ কোন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নকার্যে হাত দেন নাই, তবুও যুদ্ধের কল্যাণে ব্যয়ের অংকগুলি অনাবশ্যকভাবে স্ফীত হইয়াছিল। বর্তমানে যুদ্ধের ব্যয় না থাকিলেও দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে গেলে শিক্ষা, সমষ্টিগত বাসা, যানবাহন, স্বাস্থ্য, দেশরক্ষা প্রভৃতি বিভাগে বিপুলতর ব্যয়ের প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার উভয়েরই যখন ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তখন বিশেষ করিয়া প্রদেশগুলির কাঁদুনী গাহিবার কি কারণ থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত প্রদেশগুলির আর্থিক সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। বর্তমানে কেন্দ্রের সহিত প্রদেশের এবং প্রদেশগুলির পরস্পরের মধ্যে যে আর্থিক সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা ১৯৩৬ সালে স্যার অটো নিমেয়ারের নেতৃত্বে গঠিত এক কমিশন দ্বারা নিরূপিত হয়। এই কমিশন যে বিধান দেন তাহা "নিমেয়ার সিদ্ধান্ত" নামে পরিচিত। বিভিন্ন কর, শুল্ক ইত্যাদি কোনটি প্রদেশের অংশে পড়িবে এবং কোনটির আয় কেন্দ্রীয় তহবিলে যাইবে; কোন্ কোন্ করের আয় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বণ্টিত হইবে এবং এই বণ্টন কি হিসাবে হইবে, তাহা নিমেয়ার সিদ্ধান্তে স্থির হয়।

প্রদেশগুলির অভিযোগ এই যে, রাজস্ব

(সংখ্যাগুলি দশ লক্ষের)

সরকারী আয়	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮
কেন্দ্রীয়	১২৫৮	১৪৫১	১৭৩৭	২৩৫৪	৩০২৯	৩৯৯৪	৪০৮২	৩৯৭১	১৯৮৫
প্রাদেশিক	৯০৮	৯৭৫	১০৭৪	১২৪৩	১৬০৩	২০৮২	২২৯৩	২৪৩৬	২৬০০
সরকারী ব্যয়									
কেন্দ্রীয়	১২২৬	১৫৮৬	১৮৭৪	৪২৫৭	৫৫৭৫	৬৪১৭	৫৮২১	৫০৭৮	২৬১৭
প্রাদেশিক	৮৯২	৯৫২	১০৩৪	১১৮২	১৫৩৮	২০৪২	২১৮১	২৫৪৬	২৬৭১

* "আর্থিক" কথাটি এখানে "financial" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

‡ এই ৬½ কোটি টাকা শেষ পর্যন্ত ২½ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

বণ্টন বিষয়ে নিমেয়ার সিম্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অসংগত পক্ষপাতিত্ব দেখান হইয়াছে অর্থাৎ যে সকল কর অথবা শুল্ক হইতে প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশী এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সংগে সংগে যে সকল কর অথবা শুল্কের আয় বৃদ্ধি পাইবে সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। অপর পক্ষে নিমেয়ার সাহেব প্রাদেশিক সরকারের ব্যয় সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অথবা প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেন নাই। অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নহে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বের প্রধান প্রধান সূত্রগুলি বিবেচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান উপায়গুলির মধ্যে আয়কর, মুনাফা কর, ডাক ও তার, কর্পোরেশন ট্যাক্স, আমদানী ও রপ্তানি শুল্ক, কেন্দ্রীয় আবগারী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। প্রাদেশিক রাজস্বের উপায়গুলির মধ্যে ভূমি-রাজস্ব, কৃষি আয়কর, বন, প্রাদেশিক আবগারি বিক্রয় কর, টিকেট (মোকদ্দমা সংক্রান্ত), রেজেস্ট্রি, আমোদপ্রমোদ, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন কেন্দ্রীয় রাজস্বের কোন কোন অংশ (যথা, আয়কর) কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, বর্তমান ব্যবস্থানুসারে প্রাদেশিক রাজস্ব উল্লেখযোগ্য-ভাবে বাড়াইবার কোন পথ নাই। আয়করের যে অংশ প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হয়, বর্তমানে তাহার পরিমাণ মোট আয়করের অর্ধেকের কম। দুঃস্থ প্রাদেশিক সরকারের নিকট কিন্তু এই উচ্ছিষ্টটুকুর মূল্যও কম নয়। ভূমিরাজস্ব প্রাদেশিক আয়ের একটা মোটা অংশ কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের পূর্বে এই দিক হইতে আর অধিক কিছু আশা করিবার নাই। যুদ্ধের বাজারে বন ও আবগারি হইতে মোটা টাকা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই অঙ্কও সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। সুরাপান নিষিদ্ধ হইবার সংগে সংগে আবগারি বিভাগের আয় আরও কমিবে, বলাই বাহুল্য। বিক্রয়-কর সকল প্রদেশেই রহিয়াছে, কিন্তু এই করের হার আরও বাড়াইলে* তাহাতে অসন্তোষ বাড়িবার সম্ভাবনা। মোকদ্দমার টিকেট হইতে আয় বাড়িলে তাহাও দেশের পক্ষে নিশ্চয়ই কল্যাণ-কর নয়। ঘোড়দৌড় হইতে প্রতি বৎসর যে টাকা সরকারী তহবিলে আসে, কংগ্রেসী আমলে তাহার সম্বন্ধেও বেশী দিন ভবিষ্যদ্বাণী করা চলিবে না। কৃষি আয়-কর সম্বন্ধেও ঐ কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক সরকারের উপরে যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, তাহা পালন করিবার আর্থিক সংগতি তাহাদের নাই। ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের ন্যায় বাধ্য হইয়াই তাহাদের বাগাড়ম্বরে অথবা কাতর বিলাপে শক্তির অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইতেছে।

এবার পশ্চিমবংগের অবস্থা বিচার করিয়া দেখা যাক। মোটামুটিভাবে নিমেয়ার সিম্ধান্তে অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বাঙলার প্রতি বিশেষ করিয়া অবিচার করা হইয়াছিল বলিলে ভুল হইবে; তবে অপেক্ষাকৃত 'দরিদ্র' প্রদেশগুলির উপর স্যার অটো কিঞ্চিৎ কৃপাবর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই আদায়ীকৃত আয়কর অথবা জনসংখ্যার ভিত্তিকে উপেক্ষা করিয়া বাঙলাকে আয়করের বণ্টনীয় অংশের (divisible pool) মাত্র ২০% দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালে বোম্বাই প্রদেশে আদায়ীকৃত আয়করের পরিমাণ বাঙলা দেশের সমান হওয়ায় বোম্বাই সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে এই হিসাব অনুসারে বোম্বাই ও বাঙলার তহবিলে আয়কর বাবদ আনুমানিক ১২ কোটি (৬ কোটি+৬ কোটি) টাকা জমা হইত। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বাঙলায় আয়কর বাবদ যে টাকা আদায় হইত, তাহার প্রায় সবটুকুই বর্তমান পশ্চিমবংগের দান। পূর্ববংগ হইতে বাৎসরিক ৮০/৮৫ লক্ষ টাকার অধিক আয়কর পাওয়া যায় নাই।

দেশ বিভাগের ফলে নিমেয়ার সিম্ধান্তের যেটুকু পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহাতে সম্ভবতঃ পশ্চিমবংগেরই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। নূতন সিম্ধান্ত অনুসারে আয়করের বণ্টনীয় অংশের মাত্র ১২% পশ্চিম-বংগের প্রাপ্য। অর্থাৎ আয়করের আদায় ৮০ লক্ষ টাকা কমিবার অপরাধে পশ্চিম-বংগের ২½ কোটি টাকা জরিমানা হইল এবং এই টাকা ভাগ হইল অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে। ১৯৩৬ সালে আর্থিক স্বচ্ছলতার অজুহাতে বাঙলা দেশের প্রাপ্য কাটিয়া 'দরিদ্র' প্রদেশগুলির উদরপূর্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু দেশ বিভাগের পর এই অপূর্ব ন্যায়দণ্ড এবার দরিদ্র পশ্চিমবংগকে আঘাত করিয়াছে। ইহাকে "বস্ত্রহরণ" বলিব, না "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা" বলিব?

এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। নিমেয়ার সিম্ধান্ত অনুসারে পাট রপ্তানি শুল্কের ৬২½% পাট উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির প্রাপ্য। এই টাকাটা উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বণ্টিত হইয়া আসিয়াছে। দেশ বিভাগের পূর্বে এই ব্যবস্থায় ৬২½%এর প্রায় সবটুকুই বাঙলার তহবিলে আসিত; কারণ কাঁচাপাটের প্রায় ৮৫% এবং পাটজাত দ্রব্যের প্রায় ১০০% বাঙলা দেশে উৎপন্ন হইত। দেশ বিভাগের পর এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবিভক্ত ভারতের কাঁচাপাট অধিকাংশ পূর্ববংগে উৎপন্ন

* পশ্চিমবংগ সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য নিত্য ব্যবহার্য কয়েকটি দ্রব্য বিক্রয় করের অন্তর্ভুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়; এই পরিবর্তনের ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সংসার প্রতিপালন আরও কঠিন হইবে। একটি সর্বজনগ্রাহ্য করনীতিকে উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নাই।

হইত; সুতরাং পূর্ববৎ উৎপন্ন কাঁচাপাটের পরিমাণ হিসাব করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পাট রপ্তানি শুল্ক বণ্টন করিলে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষ হইতে কাঁচাপাটের রপ্তানি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে; অতএব বলিতে গেলে বর্তমানে রপ্তানি শুল্ক পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি হইতেই আসিতেছে। পাট রপ্তানি শুল্ক বণ্টন করিতে হইলে কাঁচাপাটের উৎপাদন হিসাব না করিয়া পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বিবেচনা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। পূর্ববঙ্গে পাটকল নাই। পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন পূর্বের ন্যায় এখনো প্রায় সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ। মজার ব্যাপার এই যে, যুক্তিবিরোধী বলিয়া ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ সনাতন ব্যবস্থা বহাল রাখেন নাই, তৎপরিবর্তে পাট রপ্তানি শুল্কের ২০% পশ্চিমবঙ্গের ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট ৮০% কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা করিয়াছেন। আর্যবিধান গলাধঃকরণ করিতে পাছে কষ্ট হয়, সেই ভয়ে শাস্ত্রকারগণ পশ্চিমবঙ্গের সাহায্যকল্পে আরও ৫০ লক্ষ টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

উল্লিখিত বিষয় হইতে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুর্গতির কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। লীগ শাসকবর্গের যথেচ্ছাচারিতার পরও পশ্চিমবঙ্গের মধুভাণ্ডে যেটুকু তলানি পড়িয়াছিল, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে দেনা মিটাইতে তাহাও উবিয়া গিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঞ্চিত অর্থ কিছুই নাই। কেন্দ্রীয় সাহায্যের ভরসায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে উন্নয়ন পরিকল্পনায় হাত দিয়াছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কাটছাঁটের ফলে তাহাও পঞ্চভূতে বিলীন হইলে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিবে না।

সমস্যা থাকিলেই সমাধানের কথা ভাবিতে হয়, কিন্তু নয়া বাঙলার আর্থিক দুর্গতি স্বেচ্ছাকৃত নয়, তাই বর্তমান ব্যবস্থা বহাল রাখিয়া স্থায়ী প্রতিকারের চেষ্টা করিলে তাহাতে সুফল ফলিবার আশা বেশী নাই।

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক সম্বন্ধ পুনর্বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। ফেডারাল শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিবার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী; কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের সম-উন্নয়নও কম প্রয়োজনীয় নয়। এদিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে রাজস্বের সূত্রগুলি বণ্টন (division of sources) না করিয়া রাজস্ব বণ্টন (division of resources) করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। রাজস্ব আদায় ও বণ্টন উভয় কার্যই যত কেন্দ্রীকৃত হয়, ততই মঙ্গল। সহজ ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারকে কর্তৃত্বের সহিত দায়িত্বও লইতে হইবে। জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, যানবাহন, সমষ্টিগত বীমা, দেশরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা (Central Planning) অত্যাবশ্যক। বিশেষ বিশেষ বিভাগে দেশের সকল অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন অংশের জন্য অর্থব্যয় করিলে কলহের কারণ থাকিবে না। বৈদেশিক ফেডারাল রাষ্ট্রগুলির অভিজ্ঞতা হইতেও একই শিক্ষা পাওয়া যায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল প্রভৃতি ফেডারেল রাষ্ট্রগুলিও ক্রমে কেন্দ্রীকরণের (centralisation of finances) উপযোগিতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে।

অবশ্য আর্থিক ব্যবস্থার স্কন্ধে সকল দায় চাপাইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে চলিবে না! পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব দায়িত্বও রহিয়াছে : (১) ব্যয় সংকোচ, (২) আয় বৃদ্ধি।

ব্যয়সংকোচ সম্বন্ধে দুইটি প্রস্তাব করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও সুরাপান নিবারণ (Prohibition), আপাততঃ স্থগিত রাখিতে হইবে। এই দুইটি কার্য কালক্রমে যতই কল্যাণপ্রসূ হউক, পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন অথবা আয় সংকোচের সম্ভাবনা তাহাতে বর্তমান আর্থিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের সেই সামর্থ্যের একান্ত অভাব। স্মরণ রাখিতে হইবে, পশ্চিমবঙ্গের আয়তন অবিভক্ত বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়াইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট বাৎসরিক ব্যয় অবিভক্ত বঙ্গের মোট ব্যয়ের ৫০%এরও অধিক। দ্বিতীয়তঃ অনাবশ্যক ব্যয় বন্ধ করিতে হইবে। কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর বেতন ও ভাতা বাবদ কিছু কিছু অনাবশ্যক ব্যয় হইতেছে সত্য, কিন্তু ইহাদের বেতন হ্রাস করিলেও সমস্যার সমাধান হইবে না। সমগ্রভাবে প্রাদেশিক বাজেটে কয়েক সহস্র টাকার মূল্য খুব বেশী নয়। ব্যয় সংকোচ অন্য উপায়ে করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কেন্দ্রীয় ক্রয়ের (Central Purchasing) উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগে নানা অফিসে নানা জিনিস কিনিতে হয়। এই ক্রয়ের ভার বিভিন্ন অফিসের উপর না ছাড়িয়া দিয়া সকল বিভাগের সকল অফিসেরই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একত্রে কিনিলে শুধু যে অর্থের সাশ্রয় হইবে তাহা নহে, ক্রীত দ্রব্যও সমশ্রেণীর হইবে।

কেন্দ্রীয় ক্রয়ের কিছু কিছু ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে। স্টেশনারী জিনিসপত্র কিনিবার ভার সাধারণতঃ স্থানীয় অফিসের উপর দেওয়া হয় না। তবে সকল ক্ষেত্রে এরূপ সুব্যবস্থা নাই।

ব্যয়সংকোচের প্রধান দায়িত্ব কিন্তু জনসাধারণের। করদাতৃগণ দলবদ্ধ হইয়া দেশের প্রভূত উপকার করিতে পারেন। আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রে করদাতৃগণের বিভিন্ন স্থায়ী সমিতি (Taxpayers' Association) আছে। এই সকল সমিতির কাজ সরকারি আয়ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা। গভর্নমেণ্ট যে টাকা ব্যয় করেন তাহা জনসাধারণের নিকট হইতেই পাওয়া। কাজেই প্রদত্ত করের সদ্ব্যয় হইল কি অপব্যয় হইল তাহাও করদাতাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে উল্লিখিত সমিতিগুলি উপযুক্ত বেতনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া থাকেন। এই বিশেষজ্ঞেরা সমিতির পক্ষ হইতে পরিষদে উপস্থিত থাকিয়া অর্থসচিবের বক্তৃতা শুনেন এবং গভর্নমেণ্টপ্রদত্ত বাজেটে ছিদ্রান্বেষণ করেন। এই ব্যবস্থার সুফল সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

আয়বৃদ্ধির প্রধান উপায় প্রাপ্য ট্যাক্স কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়া লওয়া। কার্যতঃ বিষয়টা খুব সহজ নহে। ধূর্ত করদাতৃগণ নানা অসদুপায়ে দেয় কর ফাঁকি দিয়া থাকে। এইভাবে গভর্নমেণ্টের যে টাকা নষ্ট হয় তাহার অঙ্ক নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। এই সমস্যা সকল দেশেই অল্পবিস্তর বিদ্যমান। আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রে ধূর্ত করদাতাদের জালে ফেলিবার জন্য গভর্নমেণ্ট এক শ্রেণীর গোয়েন্দা (tax ferrets) নিযুক্ত করেন। ইহারা নানা কৌশলে অসাধু করদাতাদের জালিয়াতি আবিষ্কার করিয়া গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য টাকা উদ্ধার করিয়া থাকে। ইহাদের চেষ্টার ফলে যে টাকাটা সরকারি তহবিলে জমা হয়, পুরস্কার স্বরূপ তাহার এক নির্ধারিত অংশ ইহারা পাইয়া থাকে। আমাদের দেশে এরূপ কোন ব্যবস্থা আছে কি না জানি না।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত উপায়গুলি ভিন্ন ব্যয়সংকোচ ও আয় বৃদ্ধির আরও পথ আছে, তবে সকল উপায় এখন বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মোট কথা, পশ্চিমবঙ্গকে স্বাবলম্বী হইতে হইলে সকল উপায়ই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

মাথাধরা রোগ নয় রোগের বিপদ সঙ্কেত

শ্রীবিজয় চক্রবর্তী

মাথাধরায় কাবু হয় না এমন লোক কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু জীবনে মাথাধরা কি তা জানতে হয়নি এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

মাথাধরার কারণ বহুবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তির কষ্টসাধ্য ব্যবহারের ফলে যে মাথাব্যথা হয় তাকে বলে প্রতিফলিত শিরঃপীড়া। কারণ এ ক্ষেত্রে সর্বদা চোখেতেই বেদনা অনুভূত হয় না।

প্রতিফলিত শিরঃপীড়ার অন্যান্য কারণ ঃ নাকের নালিতে উপদ্রব, মস্তিষ্কস্থিত শূন্যগর্ভগুলিতে রোগ সংক্রমণ, কর্ণপীড়া, চোয়াল ও ঘন সন্নিবদ্ধ দাঁতের রোগ। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার, নাক মুখ ও কানের রোগ, খুলির ভিতরকার শূন্য স্থানে স্ফীতি এগুলোই পৌনঃপুনিক শিরঃপীড়া ঘটিয়ে থাকে। বিশেষ করে শিরঃপীড়া প্রথম দিকে কেবল মাত্র মাথার এক দিকেই আক্রমণ করে।

চোখের জন্যই যখন মাথা ধরে তখন প্রধানতঃ একটি চোখেই বেদনা বোধ হয় বা কানের দুপাশেও ছড়িয়ে পড়ে। তবে কখনও কখনও মাথার মধ্যেখানটাও টন্ টন্ করে। দূরে দৃষ্টি চালনার ফলে মাথা ধরলে তা সাধারণতঃ মাথার পিছন দিকেই আক্রমণ করে। বিশেষ করে এ রকম মাথাধরা নিয়েই যখন রোগীর ঘুম ভাঙে।

অন্ত্রের গোলযোগই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের মাথা ধরার কারণ। কারণ এ অবস্থায় মগজের নীচে অবস্থিত শৈষ্মিক গ্রন্থির স্ফীতি ঘটে থাকে। আর এই গ্রন্থির সংগে পেটের কার্যকলাপের বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। এ ধরণের মাথাধরার আক্রমণও সাধারণতঃ মাথার মধ্যিখানেই হয়ে থাকে। তবে নাকের পিছনে বা কপালের মাঝখানেও এর আক্রমণ হতে পারে। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই এ রকম মাথাধরা মাথার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মাসিক ঋতুকাল এবং রজোজীবনের অবসানের পূর্বেও মেয়েদের ঘন ঘন মাথা ধরে থাকে। মগজ বা তার আধারের রক্তবাহী নাড়ীতে যদি কোন কারণে শোণিত সঞ্চয় ঘটে তা হলেও মাথা ধরে। এর থেকেই মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রদাহ বা মেনিনজাইটিস হতে পারে।

সুরাসার বা কুইনাইন জাতীয় ওষুধও অনেক সময় মাথাধরার কারণ হয়।

মস্তিষ্কস্থিত শূন্যগর্ভগুলিতে রোগ সংক্রামিত হলে বিশেষ প্রকার তীব্র বেদনা সৃষ্টি করে। তবে পথ পরিষ্কার করে নিয়ে রক্ত চলাচলের পথ সুগম করে দিলেই রোগের উপশম হয়। ভোরের দিকেই এ রকম মাথাধরার আক্রমণ হয়ে থাকে।

রক্ত চলাচলের বিঘ্ন ঘটায় যে মাথাব্যথা হয় তার বেদনা কদাচিৎ তীব্র হয়। তবে মাথায় রক্ত চলাচল সামান্যমাত্র ব্যাহত হলেই মাথা ধরবে। মস্তিষ্কে রক্তস্বল্পতা ঘটলেও মাথা ধরে এবং কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেই তা সেরে যায়।

উচ্চ রক্তচাপ ও ধমনীর অস্বাচ্ছন্দ্যের দরুণ মাথার পিছনেই বেদনা বোধ করা স্বাভাবিক। সকালের দিকেই রোগীকে অনুযোগ করতে দেখা যায়। তবে কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর আরাম বোধ হয়।

যকৃতের গণ্ডগোল, পাণ্ডু ও মূত্রগ্রন্থির পীড়ায় বিবমিষা-জনিত শিরঃপীড়ার আক্রমণ হয়। সমস্ত মাথায়ই বেদনা অনুভূত হয়। তবে মাথাধরার কারণগুলো দূর করা মাত্রই মাথাধরা ছেড়ে যায়।

মাথার খুলির সংগে যুক্ত পেশীগুলোর প্রসারণের ফলেও এক প্রকার মারাত্মক মাথাব্যথা হয়। এর বেদনা অসহনীয়। মাথার এক দিকে বা উভয় দিকেই অথবা একই সংগে পশ্চাতেও এর আক্রমণ চলতে পারে। চুল আঁচড়াবার সময় বা মাথা ধোয়ার সময় কখনও মাথার কোন একটি জায়গা নরম বলে মনে হয়। এ হতেই বুঝতে হবে যে উক্ত লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই শ্রমের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

আমেরিকার কোলয়ডাল (পদার্থকে একটি বিশেষ অবস্থায় কেলয়েড বলে) পরীক্ষাগারগুলিতে মাথাধরার একটি চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। পর্দায় এরূপ যাদুকরী চিত্র খুব কমই প্রদর্শিত হয়েছে। আমাদের মাথায় যে সমস্ত স্নায়ু রয়েছে তারাই এই চিত্রের অভিনেতা। তবে তাদের বহুগুণে বড় করে দেখান হয়েছে। এই চিত্রে আপনি মাথাধরা কি তাই দেখতে পাবেন। স্নায়ুপ্রান্তগুলো কি করে জড়িয়ে যাচ্ছে, পাক খাচ্ছে এবং ব্যথায় কুঁকড়ে আসছে তাই আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এর পর দেখবেন রক্ত কণিকার চেয়েও ক্ষুদ্র কোলয়েডদের মুক্তি ফৌজ কি করে অকুস্থলের প্রতি অভিযান করেছে। এবং অচিরেই তারা সেখানে এসে পৌঁছুবে যেখানে মস্তিষ্কের সজীব পদার্থগুলোর মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটেছে। ছবিতে দেখান হয়েছে যে কি করে পরীক্ষাগারে প্রস্তুত কোলয়েডগুলো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনছে। কি করে স্নায়ুগুলোর মোচড়ান থেমে যাচ্ছে। শান্ত হয়ে তারা যথাস্থানে ফিরে আসছে।

আপনার যদি মাথা ধরে থাকে তাহলে উষ্ণ পাদস্নান গ্রহণ করুন। অর্থাৎ একটি গরম জলের পাত্রে পা ডুবিয়ে বসে থাকুন। তবে মাথাটি একটি ভিজে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। যতখানি সহ্য করতে পারবেন তত গরম জলই ব্যবহার করবেন এবং তাপ বের হতে না দেওয়ার জন্য হাঁটু পর্যন্ত কাপড় বা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসবেন। মাথায় যে ভিজে তোয়ালেটি ব্যবহার করবেন তা মাঝে মাঝেই ঠান্ডা জলে নিংড়ে নিতে হবে। গরম জল বা লেবুর রস গরম করে খেলেও মাথায় রক্তের চাপ হ্রাস পায়। রোগী আরাম বোধ করে।

চিকিৎসকের নিকট অধিকাংশ রোগীই মাথাধরাকে তাদের রোগের অন্যতম লক্ষণ বলে বর্ণনা করেন। তা সে রোগ যাই হক না কেন। অবশ্য মাথাধরারও প্রকারভেদ রয়েছে যথেষ্ট। তাদের উৎপত্তির কারণও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাই চিকিৎসকের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মাথাধরার কারণ নির্ণয় করা। কারণ গলদ কোথায় জানতে পারা গেলে আরোগ্যের বিলম্ব হয় না।

শুনতে খারাপ হলেও এটা সত্যি যে প্রায় ত্রিশ রকমের সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের মাথাব্যথায় আমরা ভুগে থাকি। কিন্তু তা হলেও মাথাধরা রোগ নয়। এ হচ্ছে তাপমান যন্ত্রে পারদের মত। তাপমান যন্ত্রটিই আবহাওয়ার বৈচিত্র্য আনে না। সে শুধু তাপের পরিমাপ নির্দেশ করে।

যাই হোক মাথাধরায় কারো মৃত্যু হয় না।

মাথাধরা ত্রিশ রকমের হলেও প্রায় দু'শ কারণে মাথা ধরতে পারে। একটু বিশদভাবে বলতে গেলে—আঁট জুতো, ভুল চশমা, রাত্রিতে শশা খাওয়া, বিকল মূত্রগ্রন্থি, অতিরিক্ত চর্বি খাওয়া, অসুস্থ যকৃত ও হজমকারী যন্ত্র, স্ফীত মাড়ি, কোষ্ঠ কাঠিন্য, মস্তকের শূন্য স্থানে রোগ সংক্রমণ, উচ্চ রক্ত-চাপ, উত্তেজনা, অবসাদ, কোমরে কষে কাপড় পড়া, কম আলোতে পড়া, বদ্ধ ঘরে পরিশ্রম করা, রাত জাগা এবং এরকম আরও অনেকের মধ্যে যে কোন একটিই আপনার মাথাধরার কারণ হতে পারে।

তবে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে মূলতঃ এই কয়েক প্রকার মাথাধরার কথাই বলতে হয়।

তীব্র বেদনাদায়ক শিরঃপীড়া-রোগ—সবচেয়ে মারাত্মক। সাধারণত এক চোখে, বিশেষ

করে ডান চোখে তীব্র বেদনার সৃষ্টি করে। চোখে অসম্ভব কটকটানি হয়। রোগী বমি করতে পারে অথবা গা-বমি বোধ করে। এক কথায় সমুদ্র-পীড়ার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় রোগীর দেহে।

অবশ্য এ ধরণের মাথাধরা রোগ আক্রমণের পূর্বে তলব দিয়ে আসে।......নানারকম চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সামনে পিছনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি খেলে যাচ্ছে। বহুপ্রকার রেখাংকিত মূর্তি দুলছে চোখের সামনে। ব্যস্, ব্যথায় আপনার মাথা ছিঁড়ে পড়তে চাইবে।

এ রোগের আক্রমণ দীর্ঘ বা স্বল্পস্থায়ী হতে পারে। অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন ভোগাতে পারে। আবার যখন তখন যে কোন সময়ও এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। বা বহুদিনের জন্যও চুপ করে থাকতে পারে। প্রত্যহ একবার বা দু তিন মাস বাদে একবার—এর আক্রমণের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

এ ধরণের মাথাধরা-রোগ পুরুষানুক্রমে চলতে পারে। সংক্রামী বীজ বর্তমান থাকায় এর আক্রমণের সাথে চুলকানি, সর্দিগর্মি, চর্ম-রোগ, ফোঁড়া, পাঁচড়াও দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা হচ্ছে উদ্ধত বীজাণুদের খুঁজে বের করা, তাদের উচ্ছেদ করা এবং সংখ্যায় কমিয়ে আনা।

রাইগাছের শ্যাওলা থেকে তৈরী আর্গট হচ্ছে এর প্রধান ওষুধ। এর এক প্রকারের উৎপাদন আর্গটামাইন টার্টারেট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ দেয়। সব চাইতে ভাল ফল পেতে হলে মাংসপেশীতে ইনজেকসন নেওয়াই ভাল। তবে গোড়ার দিকে ওষুধ খেয়েও আরাম হয়।

এ জাতীয় ওষুধ অবশ্য শিরাগুলোকে সংকুচিত করে। ফলে রক্ত-চাপ বেড়ে যায়। এবং সেজন্য রক্ত-চাপ যাদের বেশী তারা কোন অবস্থায়ই কখনও আর্গট ব্যবহার করবে না।

তীব্র যন্ত্রণাদায়ক এ ধরণের মাথাধরা-রোগীদের চিকিৎসা করতে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অতিরিক্ত সচেতন, স্নায়ু-দুর্বল, অত্যন্ত মেজাজী লোকেরাই সাধারণত এ রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। আর একভাবে বলতে গেলে এ রোগকে এক ধরণের স্নায়ু-রোগও বলা যেতে পারে। সুতরাং কাজে ঢিল দেওয়া, বিশ্রাম নেওয়া, কিছুদিনের জন্য কার্যধারার পরিবর্তন করা, খাওয়া অদল বদল করা এবং ঘুমের সময় বাড়ানও এদের চিকিৎসার অন্যতম অংগ হতে হবে।

ভিটামিন বি-আই, থাইরয়েড, ইনসুলিন ও কোকেন-ইনজেকসনও এ ক্ষেত্রে বিশেষ কাজ দিয়ে থাকে। রোগী যখন কিছুতেই সুস্থ হতে পারছেন না তখন চিকিৎসকের বিশেষ তত্ত্বাবধানে এগুলোও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

উপরোক্ত এই মাথাধরা-রোগ ঘড়ির কাঁটা দেখে আসতে পারে। অর্থাৎ নিয়মিতভাবে দিন বা রাত্রির একটি বিশেষ মুহূর্তে মাথা ধরতে পারে। এবং এ অবস্থায় এস্পিরিন প্রভৃতি স্যালিসাইলিক এসিডের কোন উৎপাদনই কোন ফল দেয় না। তবে তিন সপ্তাহকাল যাবৎ বিষক্রিয়া প্রযুক্ত ইনজেকসন দ্বারা রোগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া যায় মাত্র।

বিষক্রিয়া-জনিত মাথাধরাকে আমরা আলোচ্য রোগের পর্যায়ে দ্বিতীয় প্রধান স্থান দিতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের শরীরেই বিষ রয়েছে। কিন্তু তাদের মাত্রাধিক্য ঘটলেই মস্তিষ্কের ধমনীগুলো প্রসারিত হয়ে পড়ে। মাথার কোন একটি ধারে অমনি হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে। এ অবস্থায় অনেক সময় চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখা যায়। নাকে বন্ধভাব থাকে।

কানের দুপাশে তীব্র বেদনাদায়ক এক প্রকার মাথাধরা যখন তখন অর্থাৎ কোন পরোয়ানা না দিয়েই আক্রমণ করে। প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়ও এর আক্রমণ হতে পারে। কিছুক্ষণ পায়চারী করলে গলদেশে অবস্থিত ক্যারাটিড ধমনীতে চাপ দিলে বা আর্ডেনালিন ব্যবহারে স্বস্তি পাওয়া যায়। ক্রমশ মাত্রা বাড়িয়ে বিষক্রিয়া প্রযুক্ত ইনজেকসন দ্বারা অনেক সময় স্থায়ী আরোগ্য লাভ করা যায়।

চোখে মাথাধরা—এর উৎপত্তির কারণ খুবেই সহজবোধ্য। চোখের অতিরিক্ত শ্রম, কম আলোতে পড়া, ছোট অক্ষরে ছাপা বই পাঠ করা, প্রয়োজন অথচ চশমা ব্যবহার না করা, কম লেন্সের চশমা ব্যবহার করা এবং এই ধরণের আরও অনেক কারণ থেকেই এর সৃষ্টি। তবে এ ধরণের মাথাধরার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন নয়। খানিকটা বিশ্রাম, উষ্ণ-স্নান, সকাল সকাল ঘুমানো, পেটের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা সাধারণ ক্ষেত্রে এ কয়টি বিষয়ই আরোগ্য লাভের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। আর তা না হলে আপনার চোখের ডাক্তার ত রয়েছেন। তবে চোখ রগড়ে আপনি একটু ব্যায়াম করতে পারেন। কেবল একই দিকে তাকিয়ে থাকবেন কেন। চারদিকেই দৃষ্টিপাত করুন। মাঝে মাঝে কড়িকাঠও গুণে নিতে পারেন খানিকক্ষণ।

মানসিক মাথাব্যথা। দুঃখকষ্ট, মানসিক স্থৈর্য নাশ, উত্তেজনা, ক্লান্তি, নিশ্চিত দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচা, ঘাবড়ে যাওয়া, অতিরিক্ত শ্রম এর থেকেই মানসিক মাথাধরা রোগ হয়ে থাকে। শরীরে নয় স্নায়ুমণ্ডলেই এর উৎপত্তি। এবং মনে রাখতে হবে যে, ডাক্তার নয়, একমাত্র রোগীই এ ধরণের মাথা-ধরার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন।

এ ছাড়াও আর এক ধরণের মাথাধরা রয়েছে। আমাদের মাথার ভিতরে শারীরিক প্রয়োজনেই যে সমস্ত শূন্য স্থান রয়েছে কোন কারণে তা দূষিত, স্ফীত বা আবদ্ধ হয়ে পড়লেই মাথা ধরে। এক্ষেত্রে বার্বিটল বা এফিড্রাইন ব্যবহারে সাময়িক আরাম পাওয়া যায়। তবে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা নিয়ে বেরোলেই যেমন বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয় না, গা বাঁচিয়ে চলতে পারেন মাত্র এও তেমনি।

হজম-জনিত মাথাধরা। হামেশাই দেখা যায়। গুরুতর নয় কিন্তু ঘন ঘন আক্রমণ হয়ে থাকে। তবে এ হওয়াও যেমনি সহজ যাওয়াও তেমনি কঠিন নয়। এ ক্ষেত্রে ঘাড়ে বেদনাবোধ করা স্বাভাবিক। তা ছাড়া সমস্ত কপাল জুড়ে ভিতর থেকে কেউ যেন কিছু চেপে ধরেছে বলে মনে হয়।

এ রোগের কারণ অনুমান করা খুব শক্ত নয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত যদি বাইরে কাটান, মাত্রার অধিক মদ্যপান করেন তাহলেই এর কবলিত হতে হবে। তা ছাড়া যদি অসময়ে অতিরিক্ত খান, এক বেলা খাওয়া না জোটে বা কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে থাকে তাহলেও দুর্ভোগ ভুগতে হতে পারে।

তবে ও ধরণের মাথাধরা সারান খুবেই সহজ। খাওয়া সম্পর্কে একটু মনোযোগী হলেই হল। আপনি যদি এ ধরণের মাথা-ধরায় আক্রান্ত হন তাহলে বুঝতে হবে যে, পরিপাক-যন্ত্রের প্রতি আপনার ব্যবহার আরও সংযত ও দরদপূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

যাই হোক, চাটনি যেমন মুখরোচক হলেও খাদ্য নয়, এই প্রস্তাবগুলোও তেমনি রোগের চিকিৎসা নয় চিকিৎসার পক্ষে সহায়ক মাত্র। রোগমুক্তি না পেলেও খানিকটা আরাম পেতে পারবেন আপনি এর দ্বারা।

শরীরটাকে শিথিল করে যদি বিশ্রাম নেন তাহলেই মাথাব্যথাটা খানিকটা কম বলে বোধ হয়। এই মাথাব্যথাটাকেই আমরা মাথাধরা বলে থাকি, কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মাথায়ই বেদনা বোধ হয়। কিন্তু মাথায় বেদনা বোধ হলেও এর উৎপত্তি-গত কারণ মাথায় নয়। যেমন বিজলী বাতিকে দপ্ দপ্ করতে দেখলে বুঝতে হয় যে, বালবটাই যে খারাপ তা নয়, তারের কোন অংশে গোলমাল রয়েছে।

শরীরটাকে শিথিল করবার জন্য তাপ ব্যবহার করা খুবেই ফলপ্রদ। ইনফ্রা রেড-রেঞ্জ্ অর্থাৎ ২৫০ ওয়াটের একটি বাতির তাপ যদি সর্বাংগে লাগান, বিশেষ করে পায়েতে, তাহলে নিশ্চয়ই বেদনার জোর কমে আসবে।

যে কোন ধরণের মাথাধরারই উষ্ণ-স্নান সব চাইতে আরামদায়ক। সহ্য করতে পারবেন এ রকম গরম জলে বেশ কিছুক্ষণ উষ্ণ-স্নান গ্রহণ করুন।—একটি টবে বসুন। ঝরণা-স্নানের কলটা ছেড়ে দেবেন না যেন কোন কারণেই। শরীরটা বেশ ছড়িয়ে দিন। শুধু নাকটি ভাসিয়ে বসে থাকুন গরম জলের টবটিতে মিনিট

পনের। এর পর উঠে শরীরটাকে বেশ ক'রে মুছে নিন। খুব রগড়াবেন না যেন। তারপর খানিকক্ষণের জন্য শুয়ে বিশ্রাম করুন।

এক বেলার খাওয়া বাদ দিন। নানাপ্রকার মাথাধরা স্নায়ুরোগ ও অন্যান্য ছোটখাটো রোগে এটি একটি ভাল ব্যবস্থা। চর্বি কম খাবেন। আপনার পেটের কোন ক্ষতি করবে না এমন সব খাদ্যই বেছে খাবেন। এর সুফল অনেক। রাত্রিতে বেশ খানিকটা হাঁটবেন। যখন নিতান্তই হাঁফ ধরে যাবে তখনই শুতে যাবেন।

শরীরটাকে খুব শিথিল করে শোবেন। পারেন তো চিৎ হয়েই ঘুমোবেন। এমন তাজ্জব ব্যাপারও দেখা যায় যে, আলো জ্বালিয়ে শুলে অনেকে খুব আরাম বোধ করেন। ঘুমোবার সময় আপনার গায়ের কাপড় যত হাল্কা হয় ততই ভাল।

কোন কোন মাথাধরায়, বিশেষ করে পরিপাক-যন্ত্রের স্নায়ুঘটিত মাথাধরায়, শরীরটাকে যতদূর সম্ভব আলগা করে মিনিট কুড়ি বিশ্রাম নিলেই আরাম পাওয়া যায়। অতি ব্যস্ততায় মারাত্মক ভীড়ে পরিপাক-যন্ত্রের রস নিস্কাসন কার্য কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়। আপনার স্নায়ুমণ্ডল যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, যখন খুব দ্রুতবেগে কাজ করে যেতে হচ্ছে আপনাকে তখন নিশ্চয়ই খুব অল্প আহার করবেন।

আবার কখন কখনও যে-সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা আপনি উপকার পেয়ে থাকেন তার বিপরীত আচরণের দ্বারা আপনি ফল পাবেন। হাঁটু গেড়ে বসে আনত হয়ে কপাল দিয়ে মাটি ছুঁতে চেষ্টা করুন। এ অবস্থায় মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করুন। উচ্চ রক্ত-চাপ ও হৃদরোগীদের পক্ষে এটি বিশেষ কার্যকরী হবে।

ধীর ও গভীর শ্বাস প্রশ্বাসও খানিকটা আরাম দেয়। সমস্ত নাক জুড়েই নিশ্বাস নেবেন। নিশ্বাস প্রশ্বাসে খুব বেশী সময় নেবেন না। গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, চোখে মুখে রক্ত ওঠা পর্যন্ত দম নিতে থাকবেন বা দম ছাড়তে থাকবেন।

যদি আপনার কখনও চোখেতে 'শিরঃপীড়া' হয় তাহলে খুব করে চোখ ঘষবেন না যেন। চোখের ব্যায়াম অবশ্যই করবেন। চারদিকে, ওপরে, নীচে, দুপাশে, ধারে সংযতভাবে আংগুলের ডগা দিয়ে চোখটাকে রগড়ে দিন। এতে বেশ ফল পাওয়া যায়।

শরীর 'ম্যাসেজ' করলেও বেশ উপকার পাওয়া যায় মাথাধরায়। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালিত হয়। শরীরে উষ্ণ জল শুষে নিয়ে যে উপকার পাওয়া যায় এরও ফল তাই। যদি মনে করেন যে, হাত পা টিপে দিলে বা আংগুলে ফুটিয়ে দিলে আপনার স্নায়ু সতেজ হবে তাহলে তাও পরীক্ষা করতে পারেন।

মোট কথা, মাথাব্যথার জন্য মাথা ঘামানো কোন কাজের কথা নয়। মাথাধরায় কেউ মারা যায় না। অন্তত হঠাৎ মৃত্যু ঘটাতে পারে না এ।

বেশ করে আপনার উপসর্গগুলো বিশ্লেষণ করুন। মাথাধরার মূল কারণটি জানতে চেষ্টা করুন। কারণগুলো যাচাই করে দেখুন এবং নিজে লক্ষ্য রাখুন মাথাধরা বিপজ্জনক রোগ নয়। রোগের বিপদ সংকেত মাত্র। উত্তম চালক মাত্রেই এই বিপদ সংকেতে সাবধান হন। মনোযোগ দিয়ে এর খুঁটিনাটি যেন লক্ষ্য করেন এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম বেছে নেন।

সিনেমা ব্যবসার অবস্থা

ব্যবসা হিসেবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অবস্থা স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে উত্তরোত্তর খারাপের দিকেই যাচ্ছে, আবহাওয়া দেখে সেরকমই মনে হয়। কিন্তু এমনি মজার ব্যাপার যে, এ নিয়ে হিসেব করতে বসলে যে অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় তা ঠিক এর উল্টো। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আগের চেয়ে ছবি তৈরীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভই ক'রছে। আগের চেয়ে ছবি মুক্তিলাভও ক'রছে অনেক বেশী সংখ্যায়। এবং লোকেও যে ছবি আগের চেয়ে বেশী দেখছে তারও একটা প্রমাণ হ'লো আগের চেয়ে প্রমোদ-কর বাবদ সরকারী আয় বৃদ্ধির হার। প্রমোদ-করের সর্বভারতীয় হিসেব হ'চ্ছেঃ

প্রদেশ	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮
বম্বে	৭৮,০০,০০০্	৯৩,৬৫,০০০্
মাদ্রাজ	৫৪,২৪,০০০্	৭৪,১৯,০০০্
পশ্চিম বাঙলা	* ৪৬,৯৯,০০০্	৩৫,৪৪,০০০্
যুক্তপ্রদেশ	৩১,৬২,০০০্	৩৬,২৯,০০০্
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১২,৭৮,০০০্	২২,৬১,০০০্
পূর্ব পাঞ্জাব	* ৬,৫১,০০০্	৪,০৯,০০০্
বিহার	৭,৫০,০০০্	১২,০৩,০০০্
দিল্লী	——	৭,৯৩,০০০্
আসাম	২,৫৪,০০০্	২,৯৩,০০০্
উড়িষ্যা	——	১,২৪,০০০্
আজমীর	৪৮,০০০্	৪৬,০০০্
মোট	২,৪০,৬৬,০০০্	২,৯০,৮৬,০০০্

* দেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে।

ওপরের হিসেব স্পষ্টই ব'লে দিচ্ছে যে, ১৯৪৬-৪৭ সালের চেয়ে দেশ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতবর্ষে ছবির পৃষ্ঠপোষক বেশী, যেহেতু প্রমোদ-কর বেশী উঠেছে ৫০,২০,০০০্ টাকা। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হ'চ্ছে যে, যে দু সনের হিসেব দেওয়া হ'লো সেই চব্বিশ মাসের বেশী সময়টাকেই পার হ'তে হ'য়েছে দেশের রাজনীতিক ও অন্যান্য বহুবিধ দুর্যোগময় অবস্থার মধ্যে দিয়ে। ১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৮ সালের গোড়া পর্যন্ত দেশে অশান্তির অবধি ছিলো না। বিশেষ ক'রে বাঙলা ও পাঞ্জাবে ব্যবসা তো প্রায় অচল হবার জোগাড় হ'য়েছিলো। ছবির প্রদর্শন অত্যন্ত ব্যাহত হয়। কিন্তু প্রমোদ-করের হিসেবে দেখা যায় দুটি প্রদেশেই ঐ সময়েও চলচ্চিত্র-ব্যবসা কি এমন আর হ্রাস পেয়েছে! অবিভক্ত বাঙলায় যতো চিত্রগৃহ ছিলো, ভাগ হবার পর পশ্চিম বাঙলা পেয়েছে তার প্রায় ⅔ অংশ—প্রমোদ-করের হিসেবে আয় কিন্তু ঠিক ঐ অনুপাতে কম হ'য়ে যায়নি। বরং ওপরের হিসেব থেকে আয় বেশী হওয়ারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ব পাঞ্জাবের ব্যাপারও ঐরকমই দেখা যাচ্ছে। আরও একটা কথা—

সর্বভারতীয় হিসেবে পাওয়া যায় যে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালের গোড়ার ছ' মাস ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসার সুসময় গিয়েছে। তার মধ্যে '৪৫-'৪৬ সনটাই হ'চ্ছে চূড়ান্ত সুবৎসর। এই বারো মাসে প্রমোদ-কর খাতে ভারতের সরকারী তহবিলে জমা পড়েছে ২,৭২,৫৮,০০০্ টাকা—মনে রাখতে হবে যে, ভারত তখন অবিভক্ত ছিলো। কিন্তু ব্যাপার এমনি বিচিত্র যে, ঐ চরম সুসময়ের আয়ও এখন যাকে দুর্বৎসর বলে ধরা হ'চ্ছে সেই '৪৭-৪৮ সালের প্রমোদ-করের চেয়েও ১৮,২৮,০০০্ কম—দেশ ভাগাভাগির ফলে ভারতের আওতা থেকে মোট চিত্রগৃহের প্রায় ১৫ অংশ পাকিস্থান কবলিত ক'রে নেওয়া সত্ত্বেও। সুতরাং সমগ্রভাবে ধ'রলে লোকে যে আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ছবি দেখছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু এইটেই হ'চ্ছে রহস্য। সমগ্রভাবে ছবির ব্যবসায় বেশী টাকা ওঠা সত্ত্বেও বাজার নীচের দিকে যায় কি ক'রে? ছবির সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ ক'রেছে ব'লে স্বতন্ত্রভাবে প্রতি ছবি পিছু আয় কম হ'চ্ছে, এ যুক্তিটা এখনও গ্রাহ্য করার অবস্থায় পৌঁছয়নি। কারণ ছবি বেশী যে পরিমাণে হ'য়েছে তার চেয়ে চিত্রগৃহের সংখ্যা বেড়েছে অনুপাতে বেশী ছাড়া কম নয়। আর দুটো দিক আছে যা অবস্থা খারাপের সম্ভাব্য কারণ ব'লে ধরা যায়। এক—আয় যা

বৃদ্ধিলাভ ক'রছে সেটা হ'চ্ছে শুধু বিদেশী ছবির ক্ষেত্রেই যার অংশলাভে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প বঞ্চিত। আর, দ্বিতীয়—ভারতীয় ছবির প্রদর্শকরাই ছবির আয়ের এত বেশী অংশ খেয়ে যাচ্ছেন যে, সব দিয়ে থুয়ে ছবির মালিক-দের ভাগ্যে আর কিছু জুটতে পারছে না। এর মধ্যে যেটাই কারণ হোক তা সমাধান করা শক্ত ব্যাপার নয় মোটেই। এবং দুরবস্থার প্রতিকার করার উপায় ব্যবসায়ীদের হাতের মধ্যেই আছে। ওদিকে বৃটেনে প্রমোদ-কর একেবারে তুলে দেবার জন্যে একটা আন্দোলন আরম্ভ হ'য়েছে। ছবি দেখিয়ে বছরে গড়পড়তা ওঠে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড। এর মধ্যে থেকে প্রমোদ-কর চলে যায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড। থাকী ৭ কোটি পাউন্ডের সামান্য অংশ ছবির মালিকের হাতে যায়। ওরা তাই বলছে যে, টিকেট বিক্রী হ'লেই টাকা ভাগ হ'য়ে যাওয়ার প্রথা রদ না ক'রলে প্রযোজক বাঁচতে পারছে না।

বিহারে প্রমোদ-কর বৃদ্ধি

চলচ্চিত্র আমাদের দেশের বর্ধিষ্ণু শিল্প-গুলির অন্যতম। বহু কোটি টাকা এই শিল্পটির পিছনে নিয়োজিত রয়েছে। সাম্প্রতিক হিসেবেই প্রায় তিন কোটি টাকা এক প্রমোদ-কর বাবদই সরকারী তহবিলে বছরে জমা হ'চ্ছে। এর বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে দেশের বহু সহস্র লোক অন্নের সংস্থান ক'রছে এবং একে কেন্দ্র ক'রে ছোটখাটো অজস্র শিল্প অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু শিল্পটির এমনি দুর্ভাগ্য যে, চিরকালই সে কোনরকম সরকারী সহায়তা-লাভে বঞ্চিত হ'য়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, যখনি শিল্পটির উন্নতি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে অমনিই সরকারী তরফ থেকে একটা বাধার সৃষ্টি ক'রে উন্নতিকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সমগ্র ইতিহাসে বার বার এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তিই দেখতে পাওয়া যায়।

একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হ'চ্ছে বিহারের প্রমোদ-কর বৃদ্ধি। একে তো বিহারের মাত্র শতখানেক চিত্রগৃহ ওখানকার মোট জনসংখ্যার অনুপাতে নিতান্তই নগণ্য। তার ওপর ঐ ক'টি চিত্রগৃহ থেকেই বিহার সরকার যতটা পারা যায় প্রমোদ-কর আদায় ক'রে নিচ্ছেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে যা আদায় হ'য়েছে তার পরের বারো মাসে তা বৃদ্ধিলাভ ক'রেছে শতকরা প্রায় ষাট ভাগ। এখন প্রমোদ-কর ডবল ক'রে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'য়েছে। তার মানে বিহারে চিত্রগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো তাকে খর্ব ক'রে দেওয়া হ'লো। করের বোঝাটা বইতে হয় সাধারণ পৃষ্ঠপোষকদের এবং করবৃদ্ধি মানে তাদেরই খরচ বৃদ্ধি। তাদের পৃষ্ঠপোষণ ক্ষমতা অসীম নয়। ছবি দেখা বেশী খরচ সাপেক্ষ হ'য়ে দাঁড়ালে ছবির প্রতি লোকের উৎসাহ কমতে বাধ্য হবে যা শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রশিল্পের প্রসারের পথে প্রাচীর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

চলচ্চিত্রশিল্পটিকে দেশের সরকার কামধেনু মনে ক'রে নিয়েছেন। প্রমোদ-কর তো আছেই তা ছাড়া আরও বহুরকমের কর এই শিল্পটি থেকে গ্রহণ করা হয়। যা যোগ ক'রলে দেখা যাবে যে, এই শিল্পটির মোট যা আয় তার হয়তো অর্ধেকই নিয়ে যাচ্ছে দেশের সরকার। এক পয়সাও না খাটিয়ে তো বটেই, এমন কি শিল্পটির কোন দিকের কোন সুরাহার ব্যবস্থা না ক'রে দিয়েও। যে শিল্পের অর্ধেক আয়টাই একেবারে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তার অবস্থা ভাববার কথা। চলচ্চিত্রশিল্পকে অন্যদিকের সরকারী ঘাট্‌তি পূরণের ভাণ্ডার ধ'রে রাখার নীতি আজ বদল করা দরকার হ'য়েছে কারণ, চলচ্চিত্রশিল্পই আজ ঘাট্‌তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় নাট্য পরিষদ

ডাঃ কালিদাস নাগের নেতৃত্বে ভারতীয় নাট্য পরিষদ গঠিত হ'য়েছে নাটকীয় ধারার মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে। জনসাধারণকে আনন্দ দান ও তাদের শিক্ষার জন্যে উনেস্কো জাতীয় নাট্য আন্দোলনের প্রবর্তন করার জন্য যে আবেদন প্রচার ক'রেছে এই পরিষদ সেই অনুপ্রেরণায় প্রসূত হ'য়েছে। পরিষদের কর্মধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে ডাঃ নাগ গত ২২শে জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। ডাঃ নাগ জানান যে, জাতীয় নাট্য আন্দোলনকে মূর্ত করার জন্যে, এবং নাটককে প্রগতিমূলক চিন্তা-ধারায় পুষ্ট ক'রে তোলার জন্যেই এই পরিষদের প্রবর্তন এবং এদের প্রধান লক্ষ্য থাকবে দেশের শিল্প প্রতিভাকে সম্মিলিত করা; অজ্ঞাত ও অনাদৃত নাট্য প্রতিভাকে যোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত করা, চলতি মঞ্চের ধারায় পরিবর্তন আনা; মুক্তস্থানে সর্বসাধারণের সুবিধাজনক ব্যবস্থার মধ্যে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা; এবং পরিষদকে নাট্য প্রচারে ব্রতী সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কেন্দ্র ক'রে তোলা। যে কোন ব্যক্তির লেখা নাটক সত্যিই প্রতিভার পরিচয় দিলে তারা সাদরে গ্রহণ করবেন এবং ভ্রাম্যমাণ দল সৃষ্টি ক'রে দেশের সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে নাট্যরস বিতরণে উদ্যোগী হবেন।

গত ১৪ই জানুয়ারী কলকাতায় পণ্ডিত নেহরুর অবস্থানকালে পরিষদ 'দি লাইট দ্যাট শোন্ ইন ডার্কনেস্' নামক একটি নৃত্যনাট্যের আয়োজন করেন। সমাগত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ প্রতিনিধিবৃন্দ ও ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। এই উপলক্ষ্যে পরিষদ পণ্ডিত নেহরুর কাছে তাদের উদ্দেশ্য জানিয়ে এবং সরকারী সহযোগিতা কামনা ক'রে একটি স্মারক প্রদান করেছে।

সেদিনের আলোচনায় জানা গেলো যে, আগামী ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে পরিষদ তাদের প্রথম উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ অনুষ্ঠানটি কোন ময়দানে উত্থাপন করার আয়োজন ক'রছেন। এর পর ডাঃ নাগ স্বরচিত মহাত্মা গান্ধীর শৈশবকাল থেকে আফ্রিকায় অবস্থানকালীন জীবন অবলম্বনে একটি নাটক পরবর্তী গান্ধী-জন্মদিবসে প্রয়োগ ক'রবেন ব'লে জানিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনচিত্র

মহাত্মাজী জীবিত থাকতেই ১৯৩৭ সালে খবর পাওয়া গিয়েছিলো যে, মাদ্রাজের ডকুমেণ্টারী ফিল্মস্ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে জনৈক এ কে চেট্টিয়ার গান্ধীজীর জীবনী অবলম্বনে সংবাদ-চিত্র সংকলন ক'রে একটি জীবনী-চিত্র প্রস্তুতে ব্রতী হ'য়েছেন। তারপর এ বিষয়ে আর বিশেষ কোন খবরই পাওয়া যায়নি। তার কারণ শ্রীচেট্টিয়ার এই কাজের জন্যে ভারতের বাইরেতেই বেশি সময় অতিবাহিত করেন। দশ বছর ধ'রে তিনি চারটি মহাদেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ ক'রে গান্ধীজী সম্পর্কিত মূল সংবাদচিত্রগুলি আহরণে ব্যস্ত থাকেন। এবং ১৯২২ সাল থেকে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে গান্ধীজী সম্পর্কিত প্রায় যাবতীয় তথ্যচিত্র সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন দেশের শত শত ক্যামেরাম্যানের তোলা গান্ধীজীর ৩৭ বছরের ঘটনাবহুল জীবন তথা ভারতের জাতীয় ইতিহাস নিয়েই 'মহাত্মা গান্ধী' নামক তথ্যচিত্রটি নির্মিত হ'য়েছে। ছবিখানি গত সপ্তাহে স্থানীয় টাইগার সিনেমাতে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

এই এগারো-রীল ছবিখানিতে আছেঃ মহাত্মার সঙ্গে গোখলে, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, আরউইন, চার্লি চ্যাপলিন, রোমাঁ রোঁলা, লিনলিথগো, নেতাজী ও অন্যান্য বহু নেতা; দশটি বিভিন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মার যোগদান, আশ্রমে গান্ধীজী, আন্দোলনের নেতৃত্বে গান্ধীজী, ইত্যাদি বহু তথ্যমূলক চিত্র।
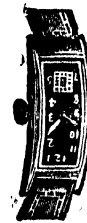
নূতন ছবির পরিচয়

মন্ত্রমুগ্ধ (নিউ থিয়েটার্স)—কাহিনী, সংলাপ ও গানঃ বনফুল; চিত্রনাট্যঃ বিমল রায় ও সুধীশ ঘটক; পরিচালনাঃ বিমল রায়; আলোকচিত্রঃ কমল বসু; শব্দঃ লোকেন বসু; সুরযোজনাঃ রাইচাঁদ বড়াল; শিল্পনির্দেশঃ সুধেন্দু রায়; ভূমিকায়ঃ সুনীল দাশগুপ্ত, জীবেন বসু, শক্তি ভাদুড়ী, কালীপদ সরকার তুলসী চক্রবর্তী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, মীরা সরকার, রেবা দেবী, মনোরমা (বড়), মনোরমা (ছোট), ছবি রায় প্রভৃতি।

অরোরা ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিখানি ১৪ই জানুয়ারী চিত্রা-প্রাচী-রূপালীতে মুক্তিলাভ করেছে।

প্রতিভারও মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে এবং তার ছুটির দরকার হয়। সে ছুটি মানে হচ্ছে চলিতধারার মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ভিন্নতর পরিবেশে বিকাশ লাভ করার একটা চেষ্টা। মন্ত্রমুগ্ধকে প্রতিভার সেই অবসরযাপন কালেরই একটি বিকাশ বলে ধরা যায়।

বনফুলের এই রসরচনাটি চিত্রে রূপান্তরিত হবে যখন শুনি তখন আমরা হেসেছি; তারপর ছবিখানি দেখতে দেখতে হেসেছি প্রচুর। এই দুই হাসির মধ্যে তফাৎ আছে। প্রথমে আমরা হেসেছিলাম এই ভেবে যে, 'মন্ত্রমুগ্ধ' গল্প নিয়ে ছবি করতে যাওয়াটা হাস্যকর প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়াবে, কাহিনীটাই ছিলো এমনিভাবের লেখা। কিন্তু দ্বিতীয়বার হেসেছি প্রাণ খুলেই, ছবিখানি সত্যিই হাসির খোরাক যোগাতে পেরেছে বলে। বস্তুত ছবিখানিকে বাঙলা চলচ্চিত্রের নিছক হাস্যরসপূর্ণ শ্রেষ্ঠ অবদান বলে আখ্যাত করা যায়। ইতিপূর্বে পরিচালক বড়ুয়ার কাছ থেকে তার এই রকম একটি অবকাশ-বিকাশ পেয়েছিলাম 'রজত জয়ন্তী'র মধ্যে, তারপর এইখানিই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ লঘুরস চিত্র।

কাহিনীটির মধ্যে প্রথমেই মন আকৃষ্ট হয় এর ঘটনা ও চরিত্রাবলীর সঙ্গে দৈনন্দিন বাস্তবের সম্পর্ক দেখে ও অনুভব করে। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিবেশে মনস্তত্ত্বের যে বিচিত্র লীলা দেখা যায় কাহিনীটিতে তারই কতকের সমাবেশ হয়েছে। তাই কাহিনীটিকে আমাদেরই সমাজ জীবনের একাংশ বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা জাগে না। চরিত্রগুলিকে কৃত্রিম মনে হয় না, মনে হয় ওরা আমাদেরই আশপাশেরই কেউ।

ধরতে গেলে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জুড়ীকে কেন্দ্র করেই গল্পের উপাদান তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। এক হলো মোহনলাল আর চুমকী—কলেজের পড়ুয়া প্রেমপ্রলাপ সর্বস্ব ছেলেমেয়ে; লেকে বসে প্রেম করে; প্রেমের জন্য নির্বুদ্ধিতার চরম পরিচয় দেয়, লোকহাসাবার খোরাক জোগায়। দ্বিতীয় হলো শুভংকরী আর হারাধন—অতি সন্দিগ্ধা শুভংকরী, স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে নিজ আয়ত্তে রাখে বলে কুকুর করে রেখে দিতে চায়। তৃতীয়, নয়নতারা আর ভৈরব—সহৃদয়া ও সামাজিক কর্তব্যপরায়ণা এবং নির্লিপ্ত ও ঘরকুনো একটি জুড়ী। এ ছাড়া আর আছে, পাড়ার আড্ডাবাজ দাদা ঝানু মল্লিক; মানুষ-পুলিশ, গুণ্ডা, ডাক্তার প্রভৃতি।

গল্পের আরম্ভ লেকে মোহনলাল ও চুমকীর অভিসার থেকে। হঠাৎ ওদের মাঝে এক গুণ্ডা আবির্ভূত হয়ে চুমকীর কানের দুল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মোহনলাল প্রতিজ্ঞা করলে যে সে গুণ্ডাটাকে ধরবেই। মোহনলালের বাড়ীওয়ালা হলো ঝানু মল্লিক, বনেদী কলকাতার হৃতাবশেষ। ঝানু মল্লিকের আড্ডা আছে, ড্রামাটিক ক্লাব আছে যার স্টার-অভিনেতা হলো হারাধন। কিন্তু হারাধনের বেগড়া তার স্ত্রী শুভংকরী; তার দেরী করে বাড়ী ফেরার উপায় নেই—তাহলেই নানারকম সন্দেহ করবে, জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। হারাধন প্রতিকারের উপায় খুঁজতে লাগলো, মল্লিকের সঙ্গে পরামর্শ হলো। পরদিন ঝানু মল্লিক সাধু সেজে হাজির হলো শুভংকরীর কাছে, শুভংকরী স্বামীকে বশ করে একেবারে কুকুর বানিয়ে ফেলার মন্তরটা সাধুর কাছে থেকে শিখে নিলে। সেই রাত্রেই হারাধন এলো জামাতে মদ মেখে মাতাল সেজে আর শুভংকরী বাধালো তুমুল কাণ্ড। হারাধন বিছানায় শুতেই শুভংকরী দরজা বন্ধ করে মন্তর পড়ে দেওয়ার আয়োজন করলে। এদিকে হারাধন সে সুযোগে জানলা দিয়ে সরে পড়লো আর বিছানায় রেখে গেলে একটা কুকুর, যা সে বাড়ীতে আসবার আগে জানলার নীচে লুকিয়ে রেখে এসেছিলো। শুভংকরী দরজা খুলে কুকুর দেখেই উল্লসিত হলো, সে ভাবলো যে এটা তার মন্তরেরই ফল; কুকুরকে সে স্বামীর আদরে পালন করতে লাগলো। হারাধন বাড়ী ছাড়া হবার পর ঝানু মল্লিক তাকে দাড়ীগোঁফ পরিয়ে তার এক পুরনো বাড়ির ওপরতলায় রাখলে। হারাধন বাইরে বের হয় না, ঝানুই তাকে খাবার এনে দেয়। সেই বাড়িটির সামনে চুমকীদের হস্টেল। সামনের পোড়ো বাড়ীটায় যমদূতের মত লোকটা হস্টেলের মেয়েদের আতঙ্কের সৃষ্টি করলে। চুমকীর কাছ থেকে সে খবর পেলে মোহনলাল। মোহনলাল সাব্যস্ত করলে যে এই ব্যক্তিই হচ্ছে লেকের সেই গুণ্ডা। ইতিমধ্যে পাড়ার ছেলের পাল্লায় পড়ে ঝানু মল্লিককে বাইরে খেলতে যেতে হলো, সে-কদিন হারাধন দুপুরে এক সময় লুকিয়ে বাইরে থেকে খেয়ে আসবে ব্যবস্থা হলো। খবরাখবর নিয়ে মোহনলাল গুণ্ডা ধরবার সংকল্প করে একদিন দুপুরে গিয়ে হারাধনের গুপ্ত আড্ডায় হানা দিলে। হারাধন তখন বাইরে। ওদিকে হস্টেলের থেকে খবর পেয়ে পুলিশও সেখানে হাজির, তারা মোহনলালকে ধরে থানায় নিয়ে গেলো। থানার অফিসার জানতে পারলে যে মোহনলাল নির্দোষ, শুধু তাই নয়, তার শ্যালিকা চুমকীর সে পাণিপ্রার্থী। সুতরাং চুমকী ও মোহনলালের মিলন ঘটলো। ওদিকে মন্তরের দশ দিন অতিক্রান্ত হলো। শুভংকরী, কুকুরকে আবার মানুষ করার জন্যে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। মোহনলাল নির্দোষ দেখে আসল দোষীকে ধরবার জন্যে পুলিশ ওদিকে আবার হারাধনের আড্ডায় হানা দিলে। হারাধন পালিয়ে একেবারে বাড়িতে এসে হাজির।

কাহিনীটি হাল্কারসের মধ্যে দিয়েও কয়েকটা দিকে চোখ খুলে দেওয়ার কাজে লাগবে। শুভংকরীর মতো স্ত্রীরা তাদের সঠিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবে। মোহনলালের মতো ছেলেরা সমাজের চোখে যে কি বস্তু তা তারা জানবে। লোকে পুলিশকেও মানুষ বলে গণ্য করতে শিখবে; লোকে বুঝবে যে তারা সমাজেরই অঙ্গ, আর পাঁচ জনের মতই তাদের জীবনযাত্রা। ভৈরবের মতো অসামাজিক লোকও পর্দার আয়নায় তাদের প্রতিমূর্তি দেখে লজ্জিত হবে। চিত্র কাহিনী হিসেবে 'মন্ত্রমুগ্ধ' বাস্তবানুগ দৃষ্টিকোণ সামনে তুলে দিতে পেরেছে।

পরিচালনা ও বিন্যাসকে কিন্তু ঠিক এতখানি তারিফ করা গেলো না। অল্পের মধ্যেই সেরে দেওয়ার একটা তাড়াহুড়ো ভাব সর্বত্র পরিস্ফুট দেখা যায়। দৃশ্য সংযোজনায় এমন কোন গোলমাল পাওয়া যায় না যাতে কোথাও খটকা লাগতে পারে এবং একথাও সত্যি যে, গল্পের গতিও হয়েছে খুবই তরতরে। কিন্তু এর মধ্যে অভাব হচ্ছে সাবলীলতার। পর্দার চেয়ে দৃশ্য উপস্থাপন কৌশল যেন মঞ্চের ধারাকেই বেশী অনুসরণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাবিত ঘটনার বেইগুলোকে জোর করে স্পষ্ট করার পরিচয় পাওয়া যায়—জানলা দিয়ে হারাধনকে পালাতে হবে বলে এক জায়গার জানলায় শিক না থাকার কথাটাকে হঠাৎ স্পষ্ট করে দেওয়া, জামায় মদ ঢেলে মাতলামী করার ইঙ্গিত দিতে হারাধনকে দিয়ে মদের বোতল খোলানো, একটার বদলে দুটো দাড়ীর কথা জোর করে সন্নিবিষ্ট করা ইত্যাদির জন্যে সাসপেন্স নষ্ট হওয়ায় যত না ক্ষতি হোক তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা নষ্ট হওয়ায়। চিত্রের রূপান্তরও হয়েছে এতটা হালকা ওজনের যে, নিউ থিয়েটার্সের বৈশিষ্ট্য কোথাও কোনদিকে পাওয়া গেল না।

চরিত্রগুলি বাস্তবানুগ হওয়ার অভিনয়-শিল্পীরাও অভিনয়ের আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতাকে কাটিয়ে চরিত্রগুলিকে সত্যিকারের প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। প্রশংসা অনেকেরই প্রাপ্য, তবে সবচেয়ে বেশী হারাধনের ভূমিকায় জীবেন বসু। নিঃসন্দেহে এটি তার শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্ব—আগাগোড়া ছবি-

খানিকে তিনি প্রায় একাই মাৎ করে রেখেছেন। তার সংগে অবশ্য সমানতালে সহযোগিতা করে গিয়েছেন শুভংকরীর ভূমিকায় শ্রীমতী রেবা। মোহনলালের ভূমিকায় সুনীল দাশগুপ্ত এর পরই প্রশংসনীয়; নির্বীর্য মজনুটাইপটা তিনি বাস্তব করে তুলতে পেরেছেন। আর এক নবাগত ঝানু মল্লিকের ভূমিকায় শক্তি ভাদুড়ীর অভিনয়ও স্বাভাবিক হয়েছে। ভৈরব ও ডাক্তারের দুটো ছোট ভূমিকায় যথাক্রমে তুলসী চক্রবর্তী ও ইন্দু মুখোপাধ্যায় তাদের স্বাভাবিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চুনকীর ভূমিকায় মীরা সরকার মানিয়ে নিয়ে গেছেন, তেমন কোন আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেননি।

মোট চারখানি গান আছে; দুখানি রবীন্দ্রনাথের আর দুখানি বনফুলের নিজের লেখা। গাওয়া ভালই হয়েছে, বিশেষ করে 'পথ ভোলা পথিক'-এর চিত্ররূপটি মনোজ্ঞ লাগে। 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যাভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত একক নাচটি ও অংশটিকে দুর্বল করেছে। রাইচাঁদের সংগীত পরিচালনা তাঁর সুনাম অনুযায়ীই হয়েছে।

আলোকচিত্র বিমল রায় বা নিউ থিয়েটার্সের ছবির উপযুক্ত পর্যায়ের নয়। আশ্চর্য কিন্তু যে, তিনি 'অঞ্জনগড়' তুলে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শব্দ গ্রহণেতেও একটা অস্বাভাবিক উগ্র কাংস্যরেশ সবায়ের স্বরেতে এমনি কৃত্রিমতা সৃষ্টি করেছে যা কানে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। দৃশ্যসজ্জাদি কাহিনীকে অনুসরন করেই গিয়েছে।

টুকরো খবর

এ সপ্তাহে দুটি দুঃসংবাদ পাওয়া গিয়েছে। প্রথম হলো বাঙলার প্রথিতযশা শব্দযন্ত্রী শ্রীজগদীশ (মহারাজ) বসুর আকস্মিক মৃত্যু এবং দ্বিতীয় হচ্ছে বম্বের জনপ্রিয় হাস্যাভিনেতা ভি এচ দেশাইয়ের পরলোকগমন।

শ্রীজগদীশ বসু পরিচিত ছিলেন মহারাজা নামে। সবাকযুগের প্রবর্তন থেকেই তিনি চিত্রজগতের সংগে সংশিলষ্ট ছিলেন এবং স্বনামধন্য শব্দযন্ত্রী শ্রীমধু শীলের কাছে ছবির শব্দগ্রহণ পদ্ধতি শিক্ষালাভ করে কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে দীর্ঘকাল শব্দযন্ত্রীরূপে যুক্ত থাকেন। একজন অতি কৃতী শব্দযন্ত্রী বলে তাঁর সুনামও ছিলো যথেষ্টই। কয়েক বৎসর ইতস্ততঃ কাজ করার পর সম্প্রতি তিনি ইন্দ্রলোক স্টুডিওতে যোগদান করেছিলেন।

ভি এচ দেশাই বম্বে টকীজের ছবির মধ্যে দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনয়-শিল্পীদের অন্যতম ছিলেন। প্রথম জীবন আরম্ভ করেন উকীল হিসেবে; তারপর ১৯৩৭ সালে তিনি বম্বে টকীজে যোগদান করেন এবং কয়েকখানি মাত্র চিত্রে অবতরণ করেই একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যাভিনেতা রূপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

এই দুই পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

* * * * *

শান্তারামের বাঙলা ছবি করার আর একটু বিস্তারিত খবর হচ্ছে যে, বর্তমানে 'শিব-শক্তি' নামক রাজকমলে যে হিন্দী পৌরাণিক ছবিখানি হচ্ছে তারই বাঙলা হবে, নতুন করে তুলে নয়—'ডাবিং' করে; ডাবিংয়ে মারাত্মক অসুবিধে কোথাও হলে সেই অংশটুকুই নতুন করে গৃহীত হতে পারে। বাঙলা সংলাপ রচনা করবেন নিতাই ভট্টাচার্য এবং শান্তারামের সহযোগিতা করবেন 'জজ সাহেবের নাতনী' 'তকরার' প্রভৃতি ছবির তত্ত্বাবধায়ক সুখেন্দু ঘোষ। এরা দুজনে আগামী ১২ই বম্বে যাত্রা করবেন।

* * * * *

স্থানীয় ইংরেজী চিত্রগৃহ 'সোসাইটি'তে মার্চ মাস থেকে নিয়মিতভাবে হিন্দী ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথম ছবি হচ্ছে 'ঘর কী ইজ্জৎ'।

* * * * *

চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের সংঘ বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েসনকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা সফল হয়েছে এবং আগামী মাসের মধ্যেই নতুন কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়ে নবোৎসাহে সংঘটিকে চালাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

* * * * *

রসিকতা কিনা জানি না, শুনা গেল, পরিচালক অমর মল্লিক 'বিবেকানন্দ' তোলা শেষ হলে বিলেতে যাবেন ও'রই একটা ইংরেজী সংস্করণ তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে।

* * * * *

সে দিনে অভিনয় শিল্পীর জন্যে সংবাদপত্রের একটা বিজ্ঞাপন থেকে জানা গেল যে, উক্ত ছবিখানি কলকাতায় তুলবে হলিউডের (!) কোন প্রযোজক। ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝা গেলো না

* * * * *

আমেরিকা ও বিলেতে চিত্রগ্রহণের সময় প্রায় সব স্টুডিওতেই সিনেমা-ক্যামেরার পাশে একটি করে টেলিভিসন ক্যামেরা চালু রাখার রেওয়াজ উঠেছে। এতে ফল এই হয় যে, সিনেমা ক্যামেরাতে ফিল্মের ও পট দৃশ্যটি ঠিক যা রূপে নেবে টেলিভিসন পর্দায় তোলার সংগে সংগে তার অবিকল ছাপ দেখতে পাওয়া যাবে। এই ব্যবস্থায় ভুলচুলের জন্যে ছবির পুনর্গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি কমিয়ে দিতে পেরেছে।

কলিকাতায় বুন্দি কলাম্ চিত্রাবলীর প্রদর্শনী

রাজপুতনার বুন্দি স্টেটের 'কলাম্ চিত্রাবলী'র এক অপূর্ব প্রদর্শনী তথাকার 'জাতীয় সম্পদ রক্ষা' সমিতির উদ্যোগে ও বুন্দি রাজ্যের মিউজিয়ামের কিউরেটার শ্রীযুক্ত সুধাংশু রায়ের চেষ্টায় ১১১নং রসা রোডে (কালীঘাট) রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্কৃতি ভবনে গত ২৮শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাঙলার বিশিষ্ট কলাতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুত অর্ধেন্দু গাঙ্গুলী মহাশয়। তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় রাজপুতনার বিস্মৃতপ্রায় কলাশিল্পের পটভূমিকার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

সংগৃহীত চিত্রাবলীর সাহায্যে রাজপুত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও তাহার বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙলার অন্যতম কলাকুশলী ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বুন্দির মহারাজা বাহাদুর সংগৃহীত চিত্রাবলীর কলাশিল্পীর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রদর্শনীর সাহায্যে বিস্মৃতপ্রায় রাজপুত কলাশিল্পীর সহিত পূর্ব ভারতের পরিচয় স্থাপিত হইবে। চিত্রামোদী মাত্রেরই এই প্রদর্শনীর সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। প্রদর্শনীটি আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্যন্ত বেলা ১২টা হইতে ৭টা পর্যন্ত প্রতিদিন খোলা থাকিবে।
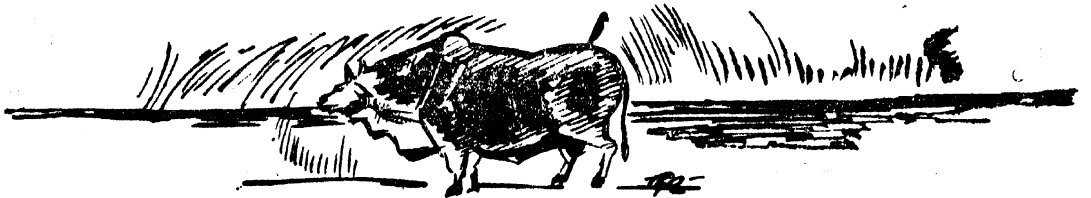
সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ৩০শে মাঘ, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 12th February, 1949. [১৫শ সংখ্যা

পূর্ববঙ্গের অবস্থা

পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্থানের তরুণদিগকে উচ্চশিক্ষার আদর্শের কথা শুনাইয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর উপাধিতে সম্মানিত করেন। অভিনন্দনের উত্তরে খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন, পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ তরুণদের উপরই নির্ভর করিতেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোচনা প্রসঙ্গে খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহবাদ সর্বস্ব। এই সভ্যতার মধ্যেই ইহার ধ্বংসের বীজ নিহিত রহিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমাদের জীবনের গতিকে প্রাচ্য সভ্যতার আধ্যাত্মিকতার পথে ফিরাইয়া লইতে হইবে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যের ঐহিক ভোগ সুখমূলক সভ্যতার ফলেই জগতের সর্বত্র নানারূপ বর্বর উপদ্রব অনুষ্ঠিত হইতেছে। খাজা নাজিমুদ্দীনের এই উক্তির যাথার্থ আমরাও স্বীকার করি। প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্যের আগুণ পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা জগতে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। মানুষকে পীড়ন, নির্যাতন এবং শোষণ ও লুণ্ঠনকে কার্যতঃ ইহারা নীতিস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই নীতির বর্বরতার বীভৎসরূপ আমরা সেদিন দেখিয়াছি। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডকে শ্বেতভূমিস্বরূপে শুদ্ধ রাখিবার বাতিকে সেই বর্বরতারই পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ধ্বজাধারীরাই আজ খৃষ্টীয় আদর্শ রক্ষার নাম লইয়া ইন্দোনেশিয়ায় পশুবল প্রয়োগ করিতেছে। প্যালেস্টাইনে ভেদ-বৈষম্য ইহারাই জাগাইয়াছে। সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা ভারতবর্ষে জাগাইয়া ইহারাই দীর্ঘদিন ভারতবর্ষকে শোষণ ও লুণ্ঠন করিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, সেই সাম্প্রদায়িক সেই ভেদ-বৈষম্যের বিষ বপন করিয়া গিয়া এ দেশের ভবিষ্যৎ তাহারা বিপন্ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, এ দেশের রাষ্ট্রনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ইহাদের দ্বারাই পুষ্ট হইয়াছে এবং যত রকম অনর্থের কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মূলে বৈষম্যমূলক যে নীতি কাজ করিয়াছে, পাশ্চাত্য রাজনীতিকেরাই তাহার মন্ত্রদাতা এবং গুরু। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই সাম্প্রদায়িকতার এই বিষ এ দেশে ছড়ায়। ইহার মারাত্মক ফলের সম্বন্ধে আমরা যদি এখনও সচেতন হই, তবেই মঙ্গল। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনিষ্টকর প্রভাব বর্জনের জন্য খাজা নাজিমুদ্দীনের উপদেশ পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তরুণদিগের মনকে সাম্প্রদায়িকতার বিষের প্রভাব হইতে যদি মুক্ত করিতে পারে, তবে আমরা সবচেয়ে অধিক সুখী হইব। কিন্তু তৎপূর্বে পাকিস্থান রাষ্ট্রের নিয়ামকদের মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। শুধু উপদেশে নয়, কাজে প্রাচ্য সংস্কৃতির মূলীভূত উদার দৃষ্টি তাহাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। মানুষে মানুষে ভেদ এবং বৈষম্যের দৃষ্টিতে কোন রাষ্ট্রের উন্নতি ঘটে না। সে পথ সভ্যতার পথ নয়, বর্বরতারই পথ, এই সত্য মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্রের নিয়ামকগণ যদি তাহাদের রাষ্ট্রে সার্বজনীন অধিকার স্বীকার করিয়া লন, তবে ভেদ-বৈষম্যের যে বিষ সভ্যতার শত্রুরা এ দেশে ছড়াইয়া গিয়াছে, তাহার অনিষ্টকারিতা হইতে আমরা এখনও রক্ষা পাইতে পারি।

জাতি কোন্ দিকে

ভারত সাম্প্রদায়িকতার নীতি সর্বতোভাবেই বর্জন করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাকিস্থানের নিয়ানকগণ মুখে উদারতার বড় বড় কথা বলিলেও তাঁহাদের কাজে অনেক ক্ষেত্রেই তেমন উক্তির যাথার্থ রক্ষিত হইতেছে না। হায়দরাবাদের ব্যাপারে পাকিস্থানবাদী রাজনীতিকদের এই কূট খেলার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ভারত বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বন করাতে সে সঙ্কট এখন কাটিয়া গিয়াছে। এখন শুনিতেছি কাশ্মীরের গণভোটের ব্যাপারেও পাকিস্থানী রাজনীতিকেরা মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতার আগুন লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছে। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী সম্প্রতি কাশ্মীরের মীরপুর অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। মাঘের শেষে মোল্লা-মৌলবীদের খিদমদগারীতে রাওলপিণ্ডি শহর ইতিমধ্যেই গরম হইয়া পড়িয়াছে এবং ঐ সব ধর্মপ্রাণ পুরুষের শাস্ত্র ব্যাখ্যার চোটে কাশ্মীর সীমান্তের আকাশে গুমোট পাকিয়া উঠিতেছে। পাকিস্থানী নেতা ও বক্তারা পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও স্পষ্ট ভাষায় কাশ্মীরে গিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, আগামী গণভোটে কাশ্মীরের মুসলমানদের "কোরাণ অথবা কাফের" এই দুইয়ের একক়ে বাছিয়া লইতে হইবে। প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার উদার আদর্শ এ সব নিশ্চয়ই নয়। নিরক্ষর জনসাধারণের মন যদি এই হীন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষে একবার দূষিত করিয়া তোলে, তবে পরবর্তী কোন উপদেশই সহজে কাজে আসে না। বলা বাহুল্য, পূর্ব পাকিস্থানের পরিস্থিতি এখনও এই ব্যাধি হইতে

নটীর পূজা

শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বসু

[শ্রীসুখময় মিত্রের সৌজন্যে]

ঋষি সাধকের বসন্ত-উৎসব

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বসন্ত পূর্ণিমা প্রেমের ও আনন্দের উৎসব তিথি। এই দিনে আনন্দের ও প্রেমের দোলা অন্তরে লাগে, হৃদয়ে জাগে। উভয় পক্ষ সমান না হইলে তো প্রেম হয় না। একজন যদি উচ্চ, আর একজন যদি তুচ্ছ হয়, তবে তাহাতে জুলুম হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রেমের কোন সম্ভাবনা নাই। তাই বিশ্বভুবনের অধিপতি যখন মানুষের কাছে প্রেম চাহিতে আসিলেন, তখন তিনি তাঁহার চরাচরব্যাপী ঐশ্বর্যকে ফেলিয়া দিয়া মানুষের সমান হইয়া, কাতর হইয়া মানবীয় প্রেম ভিক্ষা করিলেন। ইহাই বসন্ত উৎসবের মূল।

এই প্রেমের উৎসবে মানুষই বরং গৌরবের অধিকারী। রাজা হইয়া এই প্রেমের উৎসবে মানুষই ভগবানকে সগৌরবে কিছু দান করিতে প্রবৃত্ত হইল। দীনভাবে যেন অকিঞ্চন সংকুচিত ভগবান বামন হইয়া মানবীয় প্রেমের সেই ভিক্ষা হাত পাতিয়া লইতে আসিলেন। দান করিতে গিয়া দাতা প্রেমিক মানুষ উপলব্ধি করিল যে দানকে সে সামান্য মনে করিয়াছিল, তাহা সামান্য দান নহে। ভিক্ষাপ্রার্থী সেই বামনই ক্রমে চরাচরব্যাপী বিরাট রূপে দেখা দিলেন। প্রেমের সামান্য একটু দান-উৎসবই চরাচরব্যাপী হইয়া দাঁড়াইল। প্রেমে যে-মানুষ একটুখানি আপনাকে উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে ক্রমেই এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল যে, ঐটুকু দেওয়ার মধ্যে সে আপনাকে নিঃশেষে সম্পূর্ণ দান করিয়া ফেলিয়াছে। প্রেমের একটুখানি দেওয়া অর্থও সর্বস্ব দিয়া একেবারে রিক্ত হওয়া। ভারতের সাধকেরা চিরদিন ভগবানের বামন-ভিক্ষা লীলার মধ্যে প্রেমের এই রহস্যই উপলব্ধি করিয়াছেন।

ভক্ত কবীর বলিয়াছেন, 'আমার দুয়ারে আজ আমার প্রিয়তম আসিয়াছেন ভিখারীর রূপে। আজ আমি কি আমাকে নিঃশেষে তাঁহার কাছে উৎসর্গ না করিয়া পারি? আমি এখনও তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই, শুধু তাঁহার কাতর বেদনা-ভরা প্রার্থনাবাণী শুনিয়াছি। তাহাতেই আমি আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না।'

মেরে ফকীরবা মাংগি জায়
মৈঁ তো দেখহুঁ ন পৌল্যোঁ॥

কবীর তখন কাতরে নিবেদন করিতেছেন, 'প্রভু, তোমার একি খেলা। আমি দীন ভিখারী আমার কাছে তোমায় আবার কিসের ভিক্ষা চাওয়া! হে প্রেমময়, না চাহিতেই তো আমি তোমাকে সর্বস্ব দিয়া বসিয়াছি, তবু যখন তুমি আমার কাছে আসিয়া ভিখারীর মত আজ হাত পাতিয়াছ, তখন আমি আর কিছুই বাকি রাখিব না। নিঃশেষে আজ আপনাকে তোমার কাছে বিলাইয়া দিব। ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক।'

মংগন সে ক্যা মাংগিয়ে
বিন মাংগে জো দেয়
কহৈ' কবীর হম বাহীকো
হোলী হোয় সো হোয়॥

আমাদের কবিগুরুও এই লীলার গানই গাহিলেন,

সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল
নিশি ভোরে যোগী ভিখারী।
কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার
চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব
তাই ভাবি লো॥

তবে যখন লোক-লোকান্তরের অধিপতি হইয়াও আমার দুয়ারে তুমি যোগী ভিখারী হইয়া আসিয়াছ, তখন আজ নিশ্চয়ই আমি আমার সর্বস্ব তোমার চরণে ঢালিয়া দিব।

এবার উজাড় করে লও হে আমার
যা কিছু সম্বল।

এখন আমার বলিয়া কিছুই আর ধরিয়া রাখা চলিবে না। এখন হইতে আমার সর্বস্বই তাঁর চরণতলে।

বাকি আমি রাখব না, রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে
ছেয়ে দেব ছেয়ে দেব ভুঁই।

* * *

আমার কুলায় ভরা রয়েছে গান
সব তোমারে করেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায়
চরণ যখন ছুঁই॥

এই বসন্ত উৎসবে তাই সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিবার তাগিদ ও ডাক আসিয়া উপস্থিত হয়।

সব দিবি কে, সব দিবি পায়,
আয় আয় আয়।
ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়
আয় আয় আয়॥

প্রেমানন্দের এই দেওয়া-নেওয়ার অজস্রতার দোলায় লীলাতেই তো বসন্ত উৎসব।

প্রেমের উদার অজস্রতায় ভগবান আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বচরাচরে, তাইতো মানুষ সাধক তীর্থযাত্রী হইয়া তাঁহাকে দিগ্‌বিদিকে খুঁজিয়া বেড়ায় তীর্থে তীর্থে। আর তিনিও প্রেমের ব্যাকুলতায় তাঁহার প্রেমের ধন মানুষকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান কালের উৎসব-প্রদক্ষিণ-লীলায়।' তীর্থে তীর্থে আমরা তাঁকে খুঁজি। ঋতুর উৎসবে উৎসবে তিনি আমাদের খোঁজেন ও চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করেন প্রেম-পরিক্রমা। উৎসবের পর উৎসবে তিনি আমার হৃদয়-ভিক্ষার লীলায় ঘুরিয়া ফেরেন। তাইতো বসন্তের দোল উৎসবে ভক্তের দল আপনাদের নিঃশেষে উৎসর্গ করার জন্য ব্যাকুল।

এই প্রেমের উৎসবে সর্বস্ব দেওয়ার কথা বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। হাজার হাজার বৎসর আগে ঋষি কবি গাহিলেন— ভগবান আপনাকেই যে নিঃশেষে দিয়াছেন বলিয়া তাঁর সৃষ্টিতে আমাদের সব শক্তির উৎস।

য আত্মদা বলদা।

ঋষিরা দেখিলেন, প্রেমের এই দেওয়া-নেওয়াতেই বিশ্বের প্রাণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত নিরন্তর চলিয়াছে।

প্রাণঃ প্রাণং দদাতি
প্রাণায় দদাতি॥

প্রাণই পারে প্রাণকে দিতে। প্রাণের জন্যই এই প্রাণ দেওয়া। এই দেওয়া-নেওয়া বন্ধ হইলেই স্বার্থপর সংকীর্ণ মৃত্যু।

শ্রুতি বলিলেন, "সর্বস্ব দিতে হইবে। কিছু বাকি রাখিলে চলিবে না।"

সর্বস্বং দদ্যাৎ।

যে এমন করিয়া সর্বস্ব দিতে পারিল— সেই তো কল্যাণকে পূর্ণ করিল। নিঃস্বার্থ, সর্বরিক্ত সেই কল্যাণই নিত্যকালের কল্যাণ।

য সর্বৈশ্বর্যং দদাতি।
সর্বদা ভদ্রং দদাতি॥

সর্বস্ব যে জন বসন্ত উৎসবের প্রেমলীলায় দিতে পারিল, সে জনই চরিতার্থ।

সর্বম্ এনম্ সমাদায়।

সেই জনই ধন্য হইল। সেই জনই কৃতকৃত্য হইল।

স বৈ কৃতকৃত্যো ভবতি।

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এই দেওয়া-নেওয়ার লীলার অপরূপ আনন্দই এই বসন্ত উৎসবের মধ্যে। তাই বৈদিক ঋষিরা গাহিলেন, "দিক্ সকলের মধ্যে যেমন পূর্ব দিক শ্রেষ্ঠ, তেমনি ঋতুগণের শ্রেষ্ঠ এই বসন্ত। আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়া সে সব কিছু প্রকাশিত করে।

প্রাচী দিশাম্।
বসন্ত ঋতুনাম্॥

তাই ঋষিরা বলিলেন, "জয় জয় হউক এই বসন্তের।" সর্বস্ব নিঃশেষে দান করাতেই এই বসন্ত ধন্য।

বসন্তায় স্বাহা॥

তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন, "নব আনন্দে ও নব চেতনায়, বসন্ত আমাদের আজ জীবন্ত করুক, সচেতন করুক।"

চেতসা বৈ প্রাণেন;
অবতু নো বসন্ত ঋতুঃ॥

আজ পৃথিবীর অন্তর হইতে একটি অনন্ত দল কমলের মত বসন্তটি যে উঠিয়াছে ফুটিয়া—সেই বসন্তই সবাকার প্রাণস্বরূপ।

অয়ং পুরোভুবস্তস্য প্রাণো
ভৌবায়নো বসন্তঃ॥

সর্বস্ব উৎসর্গ-করা এই বসন্তই আমাদের গায়ত্রী মন্ত্র হউক, ইহাই আমাদের মধ্যে নব প্রাণ, নব জীবন জাগাইয়া তুলুক।

প্রাণায় নো বাসন্তী গায়ত্রী

আজ বসন্ত উৎসবের ষোলো কলায় পূর্ণ চন্দ্রমাকে কি যথার্থভাবে আমরা দেখিতে পারিয়াছি? আজ এই চন্দ্রমা হইতে শুধু আলোক নহে, আজ এই চন্দ্রমা হইতে আনন্দ-ময় প্রাণের অমৃতপ্লাবন সর্বচরাচরে ঝরিয়া পড়িতেছে। শুধু চক্ষু দিয়া এই লীলা দেখা যায় না, মন দিয়া, হৃদয় দিয়া সেই অপূর্ব রহস্য উপলব্ধি করিতে হইবে। সবাই তো দেখেন চক্ষে, মন দিয়া দেখেন কয়জন?

পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা
ন সর্বে মনসা বিদুঃ॥

বসন্তোৎসবের চন্দ্রের এই রহস্য-লীলা আজ যদি দেখা গেল, তবেই আজ ব্রহ্মকে আমাদের জীবনে দীপ্যমান করা গেল। আর যদি তাহা না দেখা গেল, তবেই আমার জীবনে ব্রহ্ম গেলেন মরিয়া।

এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে
যচ্চন্দ্রমা দৃশ্যতে
অথ এতন্ম্রিয়তে
যন্ন দৃশ্যতে॥

তাই আজ বসন্তের চন্দ্রকে হৃদয় মন প্রাণ দিয়া বার বার প্রণাম করি—

নমশ্চন্দ্রমসে নমঃ।
জয় জয় হউক এই চন্দ্রমার—
স্বাহা চন্দ্রমসে স্বাহা॥

বসন্তোৎসবের যে চন্দ্র আজ দেখিতে চাই, সে চন্দ্র তো বাহিরের ভৌতিক চন্দ্র নহে। সেই চন্দ্র আমাদের মন হইতে নিত্য নব রূপে জায়মান। এই তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের গানে শুনিয়াছিলাম—

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে।

আজ দেখিতে চাই সেই চন্দ্রমাকে, যাহা আমাদের মন হইতে বিকসিত।

চন্দ্রমা মনসো জাতঃ।

সেই চন্দ্রমার কোথাও জীর্ণতা নাই। তাহা নিত্যই নব নব রূপে জায়মান।

চন্দ্রমাশ্চ পুনর্নবঃ।

আমাদের অন্তরে ও বসন্ত চন্দ্রমার মধ্যে আজ যেন কোনো ভেদ-প্রভেদ না থাকে। আজ আমাদের মন ও চন্দ্রমা উভয়ে যোগযুক্ত হইয়া এক হইয়া যাউক।

যদিদং মনঃ সোদসৌ চন্দ্রঃ।

আমাদের হৃদয় হইতেই মন এবং মন হইতেই এই চন্দ্রমার উদয়।

হৃদয়ান্মনো মনসশ্চ চন্দ্রমাঃ।

এই চন্দ্রে এবং আমাদের প্রাণে প্রেমের অপূর্ব মাখামাখি—

চন্দ্রঃ প্রাণেন সংহিতঃ।

সেই চন্দ্রে শুধু আলোকই পাই না, পাই চৈতন্যকে ও পাই প্রেমের অমৃতকে।

তত্র যৎ প্রকাশতে চৈতন্যম্॥

এই ঋষি বাক্যকে পূর্ণ করিবার জন্যই কি ৪৬৩ বৎসর পূর্বে এমন দিনে আমাদেরই দেশে প্রেমময় মহাপ্রভু চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই দিনেই কি দুঃখতাপক্লিষ্ট জগতে আবার প্রেমের নূতন আনন্দবাজার বসিল? সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া সর্বরিক্ত ভিখারী প্রেমের শাশ্বত হাট বসাইয়া গেলেন।

আজ বসন্ত পূর্ণিমায় চৈতন্য চন্দ্র হইতে যে আমাদের প্লাবন নামিতেছে, তাহা চিন্ময় দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে। বৈদিক ঋষিদের ভাষাতেই বলি—

ঊর্ধ্বং ভরন্ত মুদকং কুম্ভে নেবোদ
হার্যম্॥

আজ আকাশ হইতে অমৃতের পাত্র উপুড় করিয়া প্রাণধারা অজস্র ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। শুধু চক্ষু দিয়া দেখিলে দেখিবে কি? মন দিয়া কি সকলে দেখিতে পারো না?

পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ॥

আজ বসন্ত উৎসবে পরম দেবতার প্রেম-লীলা প্রত্যক্ষ করুন। সেই প্রেমোৎসবের নাই মৃত্যু, নাই জীর্ণতা।

দেবস্য পশ্য কাব্যং
ন মমার ন জীর্যতি॥

এই লীলাই বিশ্বের চিরন্তন লীলা। এই প্রেমলীলাই প্রতি বসন্ত উৎসবে নব নব রূপে আসিয়া দেখা দেয়। আজও সেই প্রেমলীলা আমাদের কাছে নব রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

সনাতন মেন মাহু রুতাদ্য স্যাৎ পুনর্নবঃ।

আজ যদি এই প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ না দেখিলাম, তবে আমাদের জীবনই বৃথা। তাই আজ সর্বস্ব দক্ষিণা দিয়া এই লীলা প্রত্যক্ষ করা চাই।

আজ প্রিয়তমের চরণে সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া জীবনের উপলব্ধি দিয়া এই বসন্তকে পরিপূর্ণ করিয়া দিব। বসন্তও যেন আজ তাহার আনন্দামৃতে আমাদের পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। আজ যেন উপলব্ধির সকল বাধা দূর হইয়া যায়।

বসন্তম্ ঋতুনাম্ প্রীণামি
স মা প্রীতঃ প্রীণাতু॥

এইভাবে যদি আপনাকে আজ উৎসর্গ করিতে পারি, তবেই আমাদের এই দেওয়া হইবে এক অপরূপ যজ্ঞ। এই যজ্ঞই তো আসল "দেব-যজ্ঞ"। এই দেব-যজ্ঞ যদি যথার্থ-ভাবে সম্পন্ন করিতে পারি, তবে বিশ্বের সকল তেজে, সকল আনন্দ-রসে উঠিব ভরপুর হইয়া। সকল দ্বেষ-বিদ্বেষ, স্বার্থ-নীচতা, অকল্যাণ হইবে বিদূরিত।

বসন্তস্যাহং দেবযজ্যয়া
তেজস্বান্ পয়স্বান্ ভূয়াসম্॥

বসন্তোৎসবের পুণ্য দিনে আজ তাঁহার প্রেমলীলা সকলের প্রত্যক্ষ হউক, আজ সর্বত্র চিন্ময় নব চৈতন্যের অভ্যুদয় হউক, আজ সর্বত্র প্রেমের আনন্দের উৎসব ভরিয়া উঠুক। সব হিংসা দূর হউক, সব নীচতা দূর হউক, সব পাপ দূর হউক। যাহা কিছু ঘোর, যাহা কিছু ক্রূর, যাহা কিছু পাপ, সবই আজ কল্যাণে ও মঙ্গলে পরিণত হউক।

যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপম্
তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব নমস্তু নঃ।

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

শেষ পর্যন্ত অপমানবোধটা একটা কৌতূহল বৃত্তিতে পরিণত হয়। দেখাই যাক না ওরা কি করছে—উৎসাহ না দিলেও উঁকি মেরে দেখতে দোষ কি! এটা ঠিক, তার কাছে সমর্থন পাবে না বলেই তাকে বলেনি। চৌধুরীর টাকা বেশী হয়েছে তাই খরচ করেছে, অন্য কারণও হয়তো আছে—যা খুশী ওরা করুক তার কি। ওদের সংগে গিয়ে না হয় একটা মজা দেখেই এল! কিন্তু চৌধুরীর বোন যাচ্ছে কেন? তারই বা এত আগ্রহ কেন এ সব ব্যাপারে? নিশ্চয়ই প্রবীরবাবু গিয়ে লেকচার মেরে এসেছেন? বক্তৃতায় ভোলবার মেয়েই বটে! স্নব্! গোপনে গোপনে কোথায় কিছু একটা যেন হয়েছে, এখনো হচ্ছে বোধ হয় সমরের ধারণা হয়। চৌধুরী পরিবারের এত আগ্রহ কেন? অনাথ আশ্রমের জন্যে হঠাৎ ওদের এত মাথাব্যথা? একটা বিলাসিতা ছাড়া আর কি! প্রবীর এদের স্বারস্থ হয়ে যেন নিজেকে বড় ছোট করে ফেলেছে—যেখানে এতটুকু আন্তরিকতা নেই, সেখানে বড় অন্তরংগ হবার দীনতা প্রকাশ করেছে। প্রবীরের ভুলে সমর যেন খুশীই হয়—যাই করুক, যত বড় বড় কথাই বলুক, শেষ পর্যন্ত ঐ! আর এই করে দেশের কাজ করবে! তা হলেই হয়েছে! একটা যেন পরাজয়ের দুর্ভাবনা থেকে সমর রেহাই পায়।

বাণীকে অনেকবার জিগ্যেস করবে করবে করেও সমর কিছুতে কোন কথা জিগ্যেস করতে পারলে না। সংকোচটা কিসের জন্যে—অপমান ভয়ের না, আত্মাভিমান বোধের? একটা কাল্পনিক মর্যাদাহানির প্রশ্ন থেকেই যায়। ভাই-বোনের কাছে তার আর আশা করবার কিছু নেই, অধিকারও নেই। তার ইচ্ছে মত হুকুম মত এ সংসার আর নিয়ন্ত্রিতও হবে না। তার রোজগারের জন্যে কেউ আর তাকে সমীহ করবে না—যদি একান্নবর্তী হয়ে থাকতে যায় তা হলে এখন তাকেই খোসামোদ করে চলতে হবে। বাণীই যেন এই প্রথম তার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করলে। ভেবে দেখলে, এ সবের কিছুই দরকার ছিল না। সমস্ত সংসারটাই যে একটা স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে চলছে, এখানে কোন কিছুই যে এমনি পাওয়া যাবে না এত-দিনে অনুভূতির তিক্ত অভিজ্ঞতায় সমর নিঃসংশয়ে বুঝেছে। প্রত্যাশা কথাটা এখানে কত বড় না কাঙালপনা! বাবা-মাকে পর্যন্ত বোঝা যায় না—তাঁদের স্নেহ-ভালবাসারও আর তেমন স্বাদ নেই। যেন কেবলমাত্র একটা অলিখিত কর্তব্যের খাতিরে এই সংসারে বাপ-মা ভাই-বোন একত্রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, বর্ণহীন, স্বাদহীন, দুশ্ছেদ্য একটা সম্বন্ধবোধ। নাই বা রইল এই বাধ্যবাধকতা—কি এসে যাবে, কার কি ক্ষতি হবে?......তবু নিজের অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা সমরের একেবারে ঘোচে না। যত মনে হয় সে হেরে গেছে, তাকে সকলে উপেক্ষা করছে ততই মনে মনে কঠিন হয়ে বলছে, কেন হারবো? উপেক্ষা করবার স্পর্ধাকে দেখে নেব! কিছুতে ছাড়বো না। অদ্ভুত হার-জিত খেলা আরম্ভ হয় মনে। এখনি যেন সে টিট করে দিতে পারে সংসারের সকলকে—ঐ বাণী, ঐ প্রবীর, কতক্ষণ নিজেদের স্ব স্ব মত অভিরুচি নিয়ে থাকবে, সে যদি এখন পৃথক হয়ে যাবার সংকল্প প্রকাশ করে? স্বচ্ছন্দে ডান হাতটা ওঠায় না, অত লম্বা লম্বা বুলি বেরোয়! ইচ্ছে করলে এখনি নিজের অধিকারটা সে সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছের জড়তায় কোন সংকল্প আপাততঃ প্রকাশ পায় না—যা হয় হচ্ছে হোক, সে আর কদিন এখানে আছে! মিছিমিছি একটা মান-অভিমানের পালা করে আর লাভ কি?

হয়ত সমর বোঝে না, নিজের অভিমানটা কত প্রগাঢ়, কত গভীর, না পাওয়ার আক্ষেপটা মনকে কতখানি সংবেদনশীল করে দিয়েছে। তাই আজ যা কিছু দেখছে সবই যেন বিসদৃশ লাগছে—একমাত্র নিজের মনটাকে ছাড়া আর কিছু যেন সে দেখতে পাচ্ছে না। ছ'বছর অ-দেখা এই গৃহপরিবেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাউকে বোঝা যায় না, পূর্বের সে সম্বন্ধ আর স্থাপন করা যায় না। নিজেকে যতটা আত্মকেন্দ্রিক করেছে আশ-পাশের সবাই যেন ততদূরে সরে গেছে। এক একবার মনটা যেন সহজ হয়ে ওঠে—এই পরিবর্তনের যেন মানে বোঝা যায়। ক্ষুব্ধ মনটা জড়তা ঠেলে ফেলে খুশী হবার চেষ্টা করে। দুঃখ করবার কিছু নেই—অপমানিত হবারও কারণ নেই। এখন ইচ্ছে করলে, অলকাকে আবার ফিরে পাওয়া যায়। ভেবে দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যিই কি অলকা উপেক্ষা করে সরে গেছে! নিজে থেকে একবার দেখতে দোষ কি? অদ্ভুত কাল্পনিকতায় মনটা মাঝে মাঝে লঘু হয়ে ওঠেঃ সে যেন যোদ্ধা অসংখ্য যুদ্ধজয়ের মধ্যে তার লেডি-লাভকে উদ্ধার করছে। অপহৃতা অলকা তারই আশাপথ চেয়ে এখনো প্রাণবায়ু নিঃশেষ করেনি। যে জন্যেই সে সৈনিক হোক এটাও যেন একটা বড় কারণ—অলকাকে ফিরে পাওয়ায় তার সৈনিক হওয়ার স্বার্থকতা।

...আজ ওদের ছেলেমানষী দেখতে যাবার কৌতূহল যেমন হয়, তেমনি অলকার সংগে একটা মুখোমুখি বোঝাপড়া করে আসবার ইচ্ছেও মনের সংগোপনে কোথায় যেন ক্রিয়া করে। আর চলেই যখন যাবে, তখন না হয় একবার জেনেই যাবে অলকার মনোভাবটা কি। মনে মনে যা ধারণা করেছে তার চেয়ে বেশী কিছু তো আর হবার ভয় করে না সমর। না হয় সে অকপট অনুরাগ প্রকাশ পাবে না—তাতে কি? তবু দেখে যাবে মানুষ কত বদলাতে পারে—ভালবাসার ক্ষেত্রে চোখের আড়াল মনের আড়াল করে কি না? আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে খ্যাতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে কুসুমাস্তীর্ণ জীবন-পথে প্রেমাস্পদের রদবদল হওয়া কতদূর সম্ভব? ফিরে যাবার আগে অন্ততঃ সে জেনে যাবে—সে অলকাকে ভাল-বেসেছিল, না অলকা তাকে ভালবেসেছিল, না তাদের ভালবাসাটা মনের একটা ব্যাধি? আচ্ছা, এই কদিনের মধ্যে সে এতবার অলকার কথা ভাবতে পারলে, কিন্তু একবারও স্বশরীরে তার কাছে উপস্থিত হলো না কেন? অলকার সিনেমা করাটাই কি তার এ বিমুখতার একমাত্র কারণ? না, অন্য কোন কারণ আছে? ভদ্রভাবে রোজগার করাটা যদি মেয়েদের পক্ষে দোষের না হয়, তা হলে অলকা যেপথ বেছে নিয়েছে সেটা দোষের এবং ঘৃণার হবে কেন? চাকরী করতে যে মেয়ে পারে সে মেয়ে সিনেমা করলে এত আপত্তি হয় কেন? অলকাকে তা হলে কি সমর বিশ্বাস করে না—তার বিমুখতার কারণ কি তা হলে অলকার নৈতিক চরিত্র? বেশ তো সেটা যাচাই করে নিলেই তো পারতো—অলকা অলকা আছে না অন্য কিছু হয়ে গেছে! কি? যাচাই করবার দরকার নেই, ও জানা কথা? তা হলে তো অলকার দিক থেকে বলবার অনেক কিছুই রয়ে গেল—সেটা অন্তত শোনা উচিত। ও-ও নয়? তা হলে এ মনোবেদনার কারণ কি? মিছিমিছি কষ্ট পাওয়া নয় কি? অলকার রোজগারের পথটাকে যদি তোমার সন্দেহ না হয়ে থাকে তা'হলে প্রকৃত সন্দেহ তোমার কাকে?—অলকার মানসিক পরিবর্তন এখনো তো জানা যায়নি! উত্তর যেন একটা খুঁজলে এমনি পাওয়া যাবে—কিন্তু সেটা কি ঠিক ব্যক্ত হতে পারছে না। অলকাকে সে ঘৃণা করে না, তার সিনেমা করাটাও অপছন্দ করে না; তবে—

সিনেমা করে অলকার যদি খ্যাতি না হতো তা'হলে কি দেশে ফিরে সমর আজকের মত

বিরূপ থাকতে পারতো? তার অভিমানের সমস্ত কারণ অলকার প্রবঞ্চনা বলে মনে করতো? অলকার খ্যাতিই তা'হলে এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক? কেন? যে নারীর খ্যাতি আছে তাকে কি একান্তভাবে নিজের ভাবা কোন পুরুষের পক্ষে সম্ভব না? সে নারী যদি ভালবাসে, সে-ভালবাসায় সাড়া দেওয়া কি কোন পুরুষের পক্ষে অমর্যাদার? কিন্তু খ্যাতিমানদেরই ভালবেসে মেয়েরা ধন্য হয়েছে। হঠাৎ নিজের খ্যাতির কথা সমরের মনে হয়—অলকাকে ধরে রাখবার পক্ষে তার কি কোন খ্যাতি নেই? অলকা কি এখন তার খ্যাতিরই মূল্য দেবে শুধু? ক্যাপ্টেন সমর দত্তের কোন খ্যাতি নেই? অলকার তুলনায় তার খ্যাতির দৌড়ই বা কতদূর? অভিনেত্রী অলকা আর যোদ্ধা সমর, কে বেশী পরিচিত? অনেক দূরে নাগালের বাইরে চলে গেছে অলকা—স্বাবলম্বী স্বাধিকার প্রমত্তা! প্রেম মরেনি কিন্তু সংকোচ বোধ হয় কাটেনি এই কারণে—অলকার এখন অনেক কাজ, পরিবারের গণ্ডী তার এখন বহু বিস্তৃত, বহু অভাজন অকিঞ্চনের মুখে ফেরে ওর নাম। অলকার এই খ্যাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যদি যেত কোনদিন! এর মধ্যে নিজে থেকে কোনদিন অলকা যদি ছুটে আসে, তা'হলে—

...চৌধুরী একাই সমরের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সমর আসতে বললে, you are too late! বাঁ হাতের কব্জিটা ঘুরিয়ে সমরের মুখের উপর তুলে ধরলে।

সমর জিগ্যেস করলে, এরা সব কোথায়? আসেনি এখনো?

আসেনি মানে? They are gone long before. আর কতক্ষণ বসে থাকবে? চৌধুরী সমরের দেরীতে আসার কৈফিয়ৎ চায় যেন।

এরি মধ্যে এদের এত তাড়া কেন সমর বুঝতে পারে না। সামান্য একটা 'চ্যারেটীর' ব্যাপারে এদের এতো আগ্রহাতিশয্যই বা কেন? শুধু দান করে' খুশী নয়, দানের উসুলটাও দেখতে চায়? যে রকম মনে হয় তাতে প্রবীর এদের সবাইকে যেন একরকম বশ করে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে—সমরকে ডিঙিয়ে এতগুলো লোকের সমর্থন আদায় করে নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছে। প্রবীর যা করছে তা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান নয়। সমরের ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এরাও শেষ পর্যন্ত ভুলে গেল—একবার ভেবে দেখলে না চ্যারেটীটা কেন, কি উদ্দেশ্যে? বড় বাড়াবাড়ি!—'চ্যারিটেবল' হওয়াটা আজ এদের ফ্যাশন, না, আন্তরিকতা?

কৈফিয়তের সুরে সমর বললে, excuse me, আমি মনে করেছিলুম, সেই সন্ধ্যে নাগাদ 'ফাংকসন' আরম্ভ হবে—এখন তো সবে পাঁচটা!

চৌধুরী চুপ করে রইল, যেন সমরের কথা কানেই ঢোকেনি। বার কয়েক কেবল কব্জি উল্টে ঘড়িটা দেখে নিলে। আর গিয়ে কোন লাভ নেই এমনভাবে বসে সিগারেট টানতে লাগল। সমর সামনাসামনি বসে' দৃষ্টিটা কখনো সিলিং-এ, কখনো মেঝেয়, কখনো বা দেওয়ালের কোন একটা ছবির ওপর নিবদ্ধ করতে চাইলে। আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক—কি কুক্ষণেই যে সঙ্গে যাবার জন্যে রাজী হ'য়েছিল! এখন ফিরে যেতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

ভিতরে ভিতরে অনেক ঢোঁক গিলে সমর বললে, মেজর চৌধুরী আমার তো কোন কার্ড নেওয়া হয়নি—আমি না হয় নাই গেলুম।

চৌধুরীর যেন এতক্ষণে খেয়াল হ'লো, বললে, Needn't worry, সে হবে 'খন Let us start then.

চৌধুরীর আর তর সয় না। লাফিয়ে উঠে পড়ল। পিছনে পিছনে আসতে সমরের যেন এই প্রথম নজরে পড়লো, চৌধুরীর দেহে আজ ইউনিফরম নেই। লোকটাকে কেমন নেড়া-নেড়া দেখাচ্ছে। চৌধুরী কি নিজেকে আজ ভুলে গেল—এত বড় একটা ব্যতিক্রমে খেয়াল নেই? For a soldier dress is the first consideration, সবার চেয়ে চৌধুরীই তো সেটা মানতো! এ ভুল না, স্বেচ্ছাকৃত? ধুতিচাদরে কি অদ্ভুত মানিয়েছে চৌধুরীকে সমর বলবে নাকি! মনে মনে সমর কাকে বাহবা দেবে, বাণীকে, না প্রবীরকে, না অজ্ঞাত-কুলশীলা এ্যাকট্রেশকে? সব যেন কেমন ওলোটপালট মনে হ'চ্ছে সমরের—কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না আজকে এদের ব্যবহারের। সবাই মিলে একটা যেন মজা পেয়েছে!

ট্যাক্সিতে উঠে চৌধুরী বললে, I wholeheartedly support your sister's cause—I mean your brother's.

সমরের কিছুই এসে যায় না। ট্যাক্সির মধ্যে আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইল।

রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড়ে ট্যাক্সিটা পথে বার দুই থেমে গেল। সমর লক্ষ্য ক'রলে, গাড়ির মধ্যে চৌধুরী সাহেব বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে' ফেলেছে—ড্রাইভার মানুষ না হ'য়ে যদি গাধাঘোড়া হ'তো তা হ'লে এতক্ষণে চৌধুরী কি করে বসতো বলা যায় না। Flogging a dead horse! সামনে পুলিশের হাতটা অনেকক্ষণ পরে কাঠের পুতুলের মত নেমে যেতে গাড়িটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠলো। চৌধুরী বললে, It matters little if you take a Taxi or a Rickshaw—Not worth paying now-a-days.

চৌধুরীর মনে ট্রেন ফেল হবার তাড়া। গাড়িটা আর এক জায়গায় থামতে চৌধুরী একেবারে ক্ষেপে গেলঃ Don't stop go on! যুদ্ধক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র চালনার হুকুমের মত—fire! তবু গাড়ি নড়ে না, 'ট্রাফিক রুল' মেনে কাঁপতে থাকে। চৌধুরী ফুৎকার দিলে, worthless!

সমরের বড় কৌতুক বোধ হচ্ছিল। চৌধুরী একেবারে ছেলেমানুষ হ'য়ে গেছে। বাণী-প্রবীর অনুষ্ঠিত 'চ্যারিটী শো'তে উপস্থিত না হ'লে যেন জীবনটা ওর ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। আশ্চর্য, কোথায় যে মানুষের দুর্বলতা কিছুই বোঝবার উপায় নেই!

গাড়ির বাইরে সমর চেয়ে দেখলে, আশপাশ গাড়িঘোড়ায় গিস্ গিস্ করছে—সামনে পুলিশের হাতখানা যেন হঠাৎ সব চালকের চোখ চাপা দিয়েছে, কানামাছি খেলার মত। গাড়ি কাঁপছে, ঘোড়া কাঁপছে, মানুষ কাঁপছে, পড়ন্ত রোদ কাঁপছে। কাঁকর বিছানো পথে নতুন জুতো পরে' হেঁটে যাওয়ার মত অনুভূতি —একটা অদৃশ্য গণ্ডীর ভিতর অনেকগুলো ঊর্ধ্বশ্বাস হাঁপিয়ে উঠছে।

সমরের চোখটা আটকে যায়—রাস্তার ধারে কংক্রিট করা এ-আর-পি শেল্টার সুড়ঙ্গের গায়ে বিজ্ঞাপন আঁটাঃ Invest in kindness, জুড়নো রক্তের রঙ-এ আঁকা দুটো ক্রশ চিহ্ন। শেল্টারটার গায়ে আলকাতরায় লেখা—বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থান (A. R. P. Shelter)। হঠাৎ বড় মনে লাগে, দুটো লেখাই—অদ্ভুত যোগাযোগ আছে যেন। নিষ্ঠুর বোমার ভয়ে কাৎ হবার পর দয়ার দানের দরকার হ'বে? হৃদয়ের সব বৃত্তিগুলোকে দরকার মত খাটিয়ে নিতে হ'বে! কিন্তু দয়ার মূলধনে সংসার চলবে কি?

Invest in kindness! কথাটা বেশ মাথা খাটিয়ে বার করেছে। ওটা পড়ে কেউ কোনদিন লাভের কথা ভাবেনি তো? অসম্ভব কি! আজ তারা যে জন্যে যাচ্ছে সে কি ঐ রকম একটা বড় কথায় বলা যায় না? সমরের মনে হয়, চৌধুরী দেখেনি তো বিজ্ঞাপনটা! আর দেখলেও আজকের আগ্রহের কারণ কি ওর ঐ?

মঞ্চ থেকে চাপা আলোর বিচ্ছুরণে হলের ভিতরের অন্ধকার দর্শকদের মুখে-মাথায় ওঠা-নামা করছে—আলো-আঁধারের ছোপ লেগেছে। চুপি চুপি কানে-কানে কথা কওয়ার মত ঘরময় অন্ধকার সঞ্চারিত। মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ পরিবেশটা বড় ভাল লাগে সমরের। মঞ্চের আলোটা মূক স্তব্ধতায় প্রদীপ্ত; একটা সম্ভাবনায় সমুন্নত।

আসনে বসে' আশপাশের লোকজনদের সমর ভাল করে' দেখতে পাচ্ছে না—আবছা মুখাবয়বের ছায়া সব। মঞ্চের ওপর শুধু শুধু আলো জ্বালিয়ে রেখে কি হচ্ছে—কিছু একটা হ'লেই তো হয়। সমর বুঝতে পারে পাশে চৌধুরী খুব আগ্রহ সহকারে সামনে নাক

বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অন্ধকারেই সমর চোখ দুটোকে আশেপাশে ঘুরিয়ে নেয়—মন্দ লোক হয়নি, হলটা ভর্তি! মেয়ের আমদানীই বেশী! প্রবীররা মন্দ ব্যাপার করেনি। হঠাৎ সমরের মনে হয়, আজ এই মুহূর্তে যারা এখানে উপস্থিত আছে, তারা প্রবীরের 'ডেস্টিট্যুট হোমের' দুরবস্থার কথা স্মরণ করছে? দয়ায় অর্থ খাটালে কি তার প্রাপ্তি এইভাবে হয়? চ্যারীটীর আবার শো কেন? প্রবীররা আজ যে টাকা পাবে তা চ্যারিটি কি করে? দয়ার বিনিময় চলে নাকি? কোন মানে হয় না আজ এই অনুষ্ঠানের—চৌধুরীর আগ্রহের আর কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। যত সব ছেলে-মানুষী, সস্তা উচ্ছ্বাস!

চৌধুরীর বোনকে মাঝে মাঝে খুব ব্যস্ত হ'য়ে এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা করতে দেখা গেল। আজকের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ওর-ও ভাবনার অন্ত নেই যেন। একেই স্মার্ট তার ওপর আবার খুব স্মার্ট হ'য়েছে, পিঠে বেণী দুলিয়ে, সাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে—আলো আঁধার চমকে চমকে ছোটাছুটি ক'রছে। কিন্তু ওর এত উৎসাহ কেন? প্রবীর কি ওর পূর্ব পরিচিত? রহস্যের মত মনে হয়। মনে একটা সন্দেহ থেকেই যায়।

একটা ছোট বই অভিনয় আরম্ভ হ'লো। বাণী একাই একশ। বোনের জন্যে সমর মনে মনে গর্ব অনুভব করে। না, গুণ আছে মেয়েটার, চমৎকার অভিনয় ক'রছে! এর মধ্যে ওকে এসব কে শেখালে? প্রবীর না, অরবিন্দ? অরবিন্দবাবুর নিশ্চয়ই কোন পার্ট আছে! অরবিন্দর কথা মনে হ'তে বোনের অভিনয়টা আর তত প্রশংসনীয় মনে হয় না। সখের অভিনয়ও মেয়েদের করা উচিত নয়—এ ব্যাপারে ও কার মত নিয়েছে? বাবা-মা জানেন? বেহায়াপনা যত সব! প্রবীর কি ওর গর্জেন নাকি?

চোখ ফেরাতে পাশে চৌধুরীর মুখের ওপর নজর পড়ল। হঠাৎ ওর চোখ দুটো বড় জ্বলছে মনে হ'লো—অন্ধকারে শ্বাপদরা এই রকম চোখ মেলে রাখে বোধ হয়।

বাণীর অভিনয় ভদ্রলোকের এতই ভাল লাগছে? চৌধুরী ক্রমশ দুর্জ্ঞেয় হ'য়ে উঠছে। ইতিমধ্যে রেবাকে আরো বার দুই দেখা গেল—আলো জ্বলতে সমরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'লো। ঘাড়টা ঈষৎ দুলিয়ে হাসলেঃ আপনি এসেছেন বলে খুশী হ'য়েছি।

রেবার অত ঘোরাঘুরি করে' কাজ কি?—পাশে এসে বসুক না কেন! সেদিন বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করে' যত কাছে সরে আসতে চেয়েছিল আজ পরিচয়ের স্মিতহাস্যে যেন অনেক দূরে সরে যেতে চাইছে—এখন চেষ্টা করলেও আর ওকে কাছে আনা যাবে না। রেবার এই দূরত্বটা মনে একটা ঈর্ষার ভাব এনে দেয়—কিন্তু ঈর্ষাটা কার ওপর?

চৌধুরী একেবারে তন্ময় হ'য়ে আছে। সহজে উঠবে বলে' আশা করা যায় না। মাঝে মাঝে পটক্ষেপে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া মানুষ-গুলোকে আবার খুঁজে পাওয়া যায়, আলোকিত রঙ্গালয়টা আবার অনেক চেনা পরিচয়ের আলাপে হাত-পা নাড়ায়, পা ঘষায় মুখর হ'য়ে ওঠে। পরিচিত যারা আগে পরে এসেছে তাদের মধ্যে বেশ একটা খোঁজাখুঁজি পড়ে যায়ঃ আরে, তারপর, কি মনে করে, অনেক দিন পর, ইস্, সত্যি নাকি, কি আশ্চর্য, ভাগ্যি এসেছিলুম ইত্যাদি বিস্ময়াবিষ্টতা। উপস্থিত রঙ্গালয়টা যেন দেখাশোনা করবার ক্ষেত্র! সমর নিজের আসনে বসে' ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে—একটু আগের স্তব্ধ ঘরটা কি পরিমাণ মুখর। তার চেনা পরিচিতের মধ্যে একমাত্র রাহাকেই দেখা যাচ্ছে—বেশ 'লাইভলি' হ'য়ে মঞ্চের দিকে ফিরে আছে। সমর সামনে পিছনে অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটোকে ঘুরিয়ে আনেঃ আর কোন চেনা লোকের হঠাৎ দেখা পাবার ইচ্ছে কিনা কে জানে! প্রতিবারই পটক্ষেপে সমর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে। অকারণে খুঁজে দেখার নেশা পেয়ে বসে—মাঝে মাঝে সমরের মনে হয়, এই রঙ্গালয়ের সকলকেই সে চেনে, সকলের সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে—ইচ্ছে করলেই যেন আলাপ পরিচয় জমে উঠবে। এই সুন্দরের সমাহারে প্রতিটি মানুষ কি সুন্দর, কত যেন সহজ কত আপনার! পাশের লোকটার চেয়ে পিছনের লোকটার সঙ্গে যেন পরিচয় ইচ্ছে করলেই গাঢ় হ'য়ে উঠবে। এত সুস্থ অবস্থায় যেন মানুষকে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এখন রেবা যদি কাছে আসে আলাপ পরিচয়ের এতটুকু দ্বিধা, আড়ষ্টতা থাকবে না—যদি অপেক্ষা করতে বলে অপেক্ষা ক'রবে, যদি সঙ্গে যাবার আব্দার করে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাবে। শুধু রেবা নয়, যে কেউ, অন্য কেউ, আরো কেউ। আশ্চর্য মনের ভাবনা! চৌধুরীর বোনের কথা এত করে' মনে আসছে কেন,—একি দুর্বলতা?

অভিনয়ের বিষয়টি বড় হৃদয়স্পর্শীঃ—একটি ছেলে একটি মেয়ে সমাজ-সেবার সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়ে—দুজনের মধ্যে সমাজ-সেবার পথ নির্বাচন নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়, নিজেদের সামর্থ্যের কথা, শক্তির কথা, আর পাঁচজনের সহযোগিতার কথা এসে পড়ে—সবই অমীমাংসিত থেকে যায়—নিজেদের দুর্বার ইচ্ছেটা অনেক সময় আশাভঙ্গে নিরুৎসাহে বোঝার মত, মনে হয়—ছেলেটি মেয়েটি কেমন মুষড়ে পড়ে চুপ করে ভাবে। মেয়েটি বলে, চল ফিরে যাই। ছেলেটি বলে, ফিরে যাবে কোথায়? কে আছে আমাদের? আমাদের আমরা ছাড়া এখন যখন আর কেউ নেই, তখন কিসের টানে ফেরবার কথা ভাব বুঝতে পারি না? ফেরবার জন্যে কি এ পথে পা দিয়েছি? মেয়েটি চুপ করে যায়। ছেলেটির কথা ভাববার কিনা ভাবতে থাকে। কি কাজ করবে তারা? হঠাৎ সমাজ-সেবার সংজ্ঞা যেন গুলিয়ে যায়—কি ক'রলে সমাজ-সেবা হবে? গ্রাম ছেড়ে অনেক দূর তারা চলে আসে—এখন কোন মুখে ফিরে যাবে? ছেলেটা আবার বলে, আমাদের আমরা ছাড়া যেমন কেউ নেই, আবার যাদের কথা আমাদের মনে আছে আমরা ছাড়া তাদের কেউ নেই। কিন্তু কারা তারা?...নেপথ্যে বোমা কামানের গর্জন শোনা যায়—আরো একটা শব্দ ওঠেঃ দূরাগত উর্মিমুখরতা, পঙ্গপালের আগমন বার্তা। ওরা যেখানে অপেক্ষা করে দেখতে দেখতে ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকারে ভরে ওঠে—বহু শত সহস্র মানুষের ক্রমবর্ধমান মিছিলে জায়গাটা ভরে যায়—ক্রুদ্ধতায় নয়, কেবল সমবেত করুণা ভিক্ষায়—রঙ্গমঞ্চ উদ্বেল হয়। এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, দর্শকরা ঠিক বুঝতে পারে না, তারা দুঃখিত না বেদনার্ত। কেবল একটা ঊর্ধ্বশ্বাস উত্তেজনা বোধ করতে পারে। এই মানুষ, এত মানুষ হাত বাড়িয়ে মানুষের কাছে কি চাইছে, অভি-শাপ না অনুগ্রহ? ছেলেটি মেয়েটি বিচলিত হয়ে পড়ে—কর্তব্যের সন্ধান হয়তো মেলে কিন্তু এখন উপায়? ছেলেটি বুভুক্ষিত নরনারীর মিছিল নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়, মেয়েটি কয়েকটি মৃতপ্রায় কিশোর-কিশোরী শিশুপুত্র নিয়ে বসে থাকে—ছেলেটির ফিরে আসার অপেক্ষা করে। মাঝে মাঝে দূরে কামানের গর্জনে দিগন্ত কেঁপে ওঠে, মৃতপ্রায় ছেলেমেয়ে গুলো হঠাৎ বড় থমকে ওঠে, ঝিমুনী ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়, ভয়-বিহ্বল চোখে কিছুক্ষণের জন্যে চায়। আরো দূরে অগ্রগামী অকিঞ্চনের গোঙানী ওঠে। কতদিন যে মেয়েটি অপেক্ষা করে। —শেষে একদিন খাদ্যের সন্ধানে ছেলেটি যে পথে গিয়েছিল, সেই পথে উন্মত্তের মত ছুটে যায়। মেয়েটি কি পাগল হ'য়ে গেল? উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রাচীন কোন বনস্পতির পাদ-দেশে অনেক শিশু নরকঙ্কাল জড় করা, আশ-পাশে মাটীতে গাছের ডালে শকুনি গৃধিনী অপেক্ষা করে আছে। পোড়া মাটীর মত নিদাঘ দগ্ধ এই প্রান্তর। আক্ষেপের মত মাঝে মাঝে হিস্ হিস্ শব্দ ওঠে একটা। (ক্রমশঃ)

এলিয়্যাটের কাব্যালোক

দিনেশ দাশ

বার্ধক্যে নিতান্ত পঙ্গু হয়ে না পড়লে নোবেল-পুরস্কার অর্জনের যোগ্যতা ক্বচিত কয়েকজনের ভাগ্যে জোটে। গঙ্গাযাত্রী জিদ্ এই পুরস্কার পেয়েছিলেন গত বৎসর। গল্স্ওয়ার্দিকে দেওয়া হয়েছিল কবরে যাবার কিছুদিন আগে। যা হ'ক ষাট বছর বয়সে এলিয়্যাট এবার সাহিত্যে নোবেল-লরিএট হলেন। Waste Land-এর কবিকে এই পুরস্কার পাবার জন্যে কেন যে এতদিন অপেক্ষা করতে হ'ল তা ভাবতে অবাক লাগে। তবু এ কথা অকুণ্ঠভাবেই বলব যে এলিয়্যাটের সাহিত্য প্রতিভার এই দরকারী স্বীকৃতিতে আধুনিক বস্তুবাদী কাব্য সাহিত্যেরই বিজয় ঘোষণা করে। আজ স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনে প্রশ্ন জাগবে যে টেনিসন, সুইনবার্ন, ইএট্সের ভেতর দিয়ে যে রোমান্টিসিসম্ এতদিন চ'লে এসেছে তা টিকবে না বস্তুবাদী এলিয়্যাটের এই আধুনিক কাব্যরীতিই ভবিষ্যতের কবিদের রচনাশৈলী হয়ে দাঁড়াবে!

জাহ্নবী যেমন ক'রে মহাদেবের জটায় আটক ছিল ঠিক তেমনিভাবেই আধুনিক জীবনের ভাবপ্রবাহ পারিপার্শ্বিক জটিলতার মধ্যে বহুদিন ধরে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল—তাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করলেন আধুনিক কবিগুরু টি এস এলিয়্যাট। এদিকে তীক্ষ্ন ও সূক্ষ্ম সমালোচনার আকারে সহায়তা করল তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষা। বস্তুতঃ তাঁর কাব্য ও সমালোচনা পরস্পর টানা-পোড়েনের মত গ্রথিত হ'য়ে তাঁর কাব্যের বনিয়াদকে পাকা করেছে।

এলিয়্যাটের প্রথম কাব্যগ্রন্থ Poems 1909-1925 প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল উনিশ শতকীয় রোমান্টিসিসমের এবার যবনিকা পড়ল। এই গ্রন্থের প্রথম কাব্য-স্তবকে Prufrock (১৯১৭)-এর প্রথম ক'টি লাইনেই ইঙ্গিত দেয় যে ইংরিজী কাব্য দিক্ পরিবর্তন করছেঃ

> Let us go then, you and I,
> When the evening is spread out against the sky,
> Like a patient etherised upon a table;

সন্ধ্যার এই নতুন রূপের সঙ্গেই তার কিছু পরেই যখন পড়িঃ

> I grow old....I grow old....
> I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

রূঢ় সত্যের বাস্তব রূপ কবির অভিনব রচনারীতিতে ধরা পড়েছে তবু বার্ধক্যের দীর্ঘশ্বাসটুকুরও যেন ছোঁয়া লাগে। কাব্যের প্রচলিত কাঠামোতে বাঁধা না গেলেও কবির নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-বেদ সম্পর্কে আর কোনো সংশয় থাকে না। আর এটুকু বুঝতেও অসুবিধে হয় না যে, কবির সংকল্প থাকলে তিনি যে কোনো বস্তুকে ও শব্দকে কল্পনাময় ক'রে কবিতায় রূপান্তরিত করতে পারেন। আলোচ্য কবিতা The Love Song of J. Alfred Prufrock পড়লেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কবি শুধু তাঁর যুগ সম্পর্কে সজাগ নন যুগের জটিল সংবেদনশীল জীবনকে তিনি পরিপূর্ণ উপলব্ধি করেছেন। উপলব্ধিই

টি এস এলিয়্যাট

হ'ল কাব্যের প্রাণ—যুক্তি সেখানে গৌণ। এই উপলব্ধি লাভ করার জন্যে কবিকে কোনোদিন পণ্ডিতদের কাছে ধর্ণা দিতে হয় না তাঁর জন্মগত অধিকারবলেই তিনি তা লাভ করেন। যে জটিল জীবন-দর্শনের কাঁটা তার ঠেলে বড় বড় রাজনৈতিক ও দার্শনিক ঢুকতে পারেন না। কিন্তু কবি তার আশ্চর্য ক্ষমতায় অভিমন্যুর মত ব্যূহ ভেদ ক'রে সটান মূল তথ্যে গিয়ে পেঁাছোন। অনেক সময় দেখা যায় রাজনৈতিক-দের কূট ধূমাবর্তে দেশের সহজ সত্য হারিয়ে গেছে সেখানে কবি তার স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে বিশুদ্ধ আলোকসম্পাত করেছেন। কিন্তু অবাক হবার বিষয় হ'ল কাব্যিক অভিজ্ঞতা থেকে এলিয়্যাটের কবিতার জন্ম হলেও তা যুক্তির সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। এখানে জাগতিক খুঁটিনাটির উপর তার পর্যবেক্ষণী সূক্ষ্মদৃষ্টি অনেকটা ঔপন্যাসিকের সমগোত্রীয়। সংলাপের ছন্দের সঙ্গে তাঁর কাব্যের ছন্দও একতানে চলে এর সার্থক উদাহরণঃ

> And would it have been worth it, after all,
> After the cups, the marmalade, the tea,
> Among the porcelain, among some talk of you and me
> Would it have been worth while
> To have bitten off the matter with a smile,
> To have squeezed the universe into a bale,
> To roll it toward some overwhelming question,
> To say: 'I am Lazarus, come from the dead,
> Come back to tell you all, I shall tell you all'—
> If one, settling a pillow by her head,
> Should say: 'That is not what I meant at all,
> That is not it, at all.'

আত্মবিদ্রূপ ও আত্মপ্রতারণার এই মনোভাব এলিয়্যাট পেয়েছিলেন ফরাসী কবি Jules Laforgue থেকে। তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে ব'লেছেন,

> "The form in which I began to write, in 1908 or 1909 was directly drawn from the study of Laforgue together with the later Elizabethan drama !"

এলিয়্যাটের কাব্যে অনুভূতি ও বুদ্ধির যথার্থ সঙ্গম হ'য়েছেঃ—অনুভূতি শব্দে রূপান্তিরিত হয়েছে এবং শব্দ অনুভূতিতে। এর মনোহর উদাহরণ Gerontion স্তবকে অনেক পাওয়া যায়। এই কবিতাটি মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা ও ভাবময় কল্পনার বৈচিত্র্য ও কাব্যিক অনুভূতির মিলনস্থল। তা ছাড়া, ইংরিজী ভাষায় প্রায় সমস্ত শব্দ দিয়ে তাঁর কাব্যদেহের গঠন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এলিয়্যাটের পূর্ববর্তী কেউ-ই ইংরিজী কাব্যে এত শব্দের প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় না। একথা উড়িয়ে দেওয়া চলে না যে, মানুষের কথ্যভাষাতেই তার মনের আবেগ যথাযথ প্রতিফলিত হয়। তাই কথ্য-ভাষা ও কথ্যভাষার ছন্দেই তিনি তাঁর কাব্যকে গঠিত করেছেন। আধুনিক ইংরেজ ও বাঙালী কবিরা উনিশ শতকীয় কাব্যিক শব্দ পরিহার ক'রে কথ্যভাষা ও ছন্দে কবিতা রচনা করার প্রেরণা পেয়েছেন কতকটা এলিয়্যাটের কাছ থেকে। আধুনিক সংলাপের বিন্যাসের সঙ্গে

হুবহু মিল রেখে ছন্দ-সংগতির আশ্চর্য মিলন দেখি Protrait of a Ladyতে :

> Well! and what if she should die some afternoon,
> Afternoon grey and smoky, evening yellow and rose;
> Should die and leave me sitting pen in hand
> With the smoke coming down above the housetops;
> Doubtful, for a while
> Not knowing what to feel or if understand
> Or whether wise or foolish, tardy or too soon....
> Would she not have the advantage, after all?

একজন আধুনিক যুবকের ব্যক্তিগত নৈরাশ্য ও বেদনার পটভূমিকায় The Love Song of J. Alfred Prufrock ও Portrait of a Lady কবিতা দুটি রচিত। কিন্তু Gerontion-এ কবির সান্নিধ্য হ'তে ব্যবধান রচনা ক'রে এক বৃদ্ধের জবানবন্দীতে কবিতাটি পরিকল্পিত হ'য়েছে। নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিজের ব্যক্তিগত সত্তাকে তফাতে রেখে তিনি মানব-চৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন—কোথায় এর পরম লক্ষ্য। Gerontion-এ কবির ব্যক্তিত্ব সমাহিত হওয়াতে কবিতাটি দেশ-কালের ঊর্ধ্বে স্থাপিত হ'য়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। কবিতাটিতে বর্ণনা নেই, নেই ধারাবাহিকতা, আছে কেবলমাত্র একটি বৃদ্ধের চেতনা-প্রবাহ যেখানে বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রগুলি এসে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়াচ্ছে :

> My house is a decayed house,
> And the jew squats on the window sill, the owner,
> Spawned in some estaminet of Antwerp,
> Blistered in Brussels, patched and peeled in London,
> The goat coughs at night in the field overhead;
> Rocks, moss, stonecrop, iron, merds.
> The woman keeps the kitchen, makes tea,
> Sneezes at evening, poking the peevish gutter. I an old man,
> A dull head among windy spaces.

বৃদ্ধের বাড়িটি জীর্ণ। যে-ইহুদিটি বাড়ির জানলার বাজুতে উবু হ'য়ে ব'সে আছে তিনি তার কথা ভাবছেন। কিন্তু মনে হয় চিন্তা তো দূরের কথা জোরে হাঁক দিলেও তাঁর কথা ইহুদিটির কানে পৌঁছোবে না। তারপর সন্নিহিত যে-মাঠে রাত্রে ছাগল কাশে সেই মাঠ ও তার বাড়ির সীমানা কোথায় নির্দেশ করা কঠিন। যে-জীবনের সীমান্তে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন সেই জীবনের ওপর দিয়েই তাঁর স্মৃতি পিছু হাঁটছে—তাঁর চিন্তার প্রতিফলন হ'ল ঘটনা, দৃশ্য ও ব্যক্তিসমূহে। তাঁর প্রশ্ন হ'ল, এই যে জীবন এর পরিণতি অর্থ ও অবশিষ্ট কি?

কবিতাটি আধুনিক বন্ধ্যা পৃথিবীর পটভূমিকায় স্মৃতি ও সংকল্পের মিশ্রণে রচিত। বৃদ্ধটি 'শুকনো মাসে' বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করছেন যে-বৃষ্টি জীবন দেয়। কিন্তু এও তাঁর জানা যে, নতুন বৃষ্টি আর নামবে না। তাঁর মনে যেন কোথাও ঈর্ষা জাগছে। তিনি ভাবছেন, পুরোনো দিনের কথা—পুরোনো দিনের যৌবন ও বীর্যের কথা—তাঁর রূঢ় পারিপার্শ্বিককে তিনি অবজ্ঞা করতে চান। অথচ যৌবনের স্বপ্নের সঙ্গে এবং প্রধান জীবনের উচ্চতম পরম আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলিত হ'য়েছে। পরের ছত্রেই তিনি বলছেন :

> Signs are taken for wonders. 'We would see a Sign!'
> The word within a word, unable to speak a word,
> Swadidled with darkness. In the juvescesce of the year,
> Came Christ the tiger.

Gerontion-এ এলিয়াট বিরোধী অনুভূতির টানা-পোড়েনে কবিতাটি গেঁথেছেন—কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল কোনো উপমার আশ্রয় না নিয়ে তিনি কতকগুলি নাম বা কতকগুলি ঘটনা সাজিয়ে কাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। অবিশ্যি কোনো কোনো স্থানে আবহাওয়া জটিল ও দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু মুশকিল হ'ল, এলিয়াট-কাব্যের মেরুদণ্ড হ'ল এই জটিলতার ওপর, যেমন,

> What will the Spider do,
> Suspend its operations will the weevil
> Delay? De Bailhache, Fresca, Mrs. Cammel, whirled
> Beyond the circuit of the shuddering Bear
> In fractured atoms. Gull against the wind, in the windy straits,
> Of Belle isle, or running on the Horn,
> White feathers in the snow, the Gulf claim
> And an old man driven by the Frades
> To a sleepy corner.

এই বিচিত্র নামগুলির ওপর সিন্ধু-সারসের গতি যতই উদ্দাম হ'ক না কেন তার অনিবার্য পরিণতি হ'ল "চূর্ণিত অণু-পরমাণুতে"। ঝড়ের মুখে এক গোছা পালক ঝ'রে প'ড়ে মানব-জীবনের অসহায়তার কথা প্রকাশ করছে। সেই সঙ্গে এও জানাচ্ছে যে, মানুষের পাপ, ব্যর্থতা সত্ত্বেও জীবনের গতি কী প্রচণ্ড, কী উদ্দাম। এলিয়াটের আধুনিক রীতিতে মাঝে মাঝে গীতিকবিতার মত সুর পাওয়া যায়—সে সুর নিছক ইংরিজী গীতিকাব্যের সুর। এই 'দুঃখবাদী রোমাণ্টিসিসমের ইঙ্গিত আমরা Prufrock স্তবকের Preludes ও Rhapsody on a Windy Night কবিতা দুটিতে পেয়েছি ; এর ধরণ বোদলেয়ারের মত হ'লেও 'রোমান্তিক যুগ'কে মনে করিয়ে দেয় :

> I am moved by fancies that are curled
> Around these images, and cling!
> The notion of some infinitely gentle
> Infinitely suffering thing.
> Wipe your hand across your mouth and laugh
> The Worlds revolve like ancient Women
> Gathering fuel in vacant lots.
> (Preludes)

এই গীতিকবিতাধর্মী মনের চরম পরিণতি দেখি The Waste Land-এ। সেখানে এও দেখি প্রতিভার আগুনে অ-কাব্যময় বস্তুরও উচ্চতম কাব্যে পরিণতি। Waste Land-এ ইংরিজী কবিতা নতুন খাদে প্রবাহিত হ'ল কিন্তু আশ্চর্য লাগে যে, কাব্যিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রইল—এইজন্য Waste Land ইংরিজী কবিতার ইতিহাসে যুগান্তকারী অধ্যায় হ'য়ে থাকবে। এই মহৎ কবিতাটি ১৯২২ সালে The Criterion পত্রিকার প্রথম দু'সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। বিংশ শতকের জটিল জীবনের মধ্যে কাব্যের সঙ্কটকে The Criterion পত্রিকা সমাধান করল—বিংশ শতাব্দীর কাব্যের মুক্তি হ'ল। এর প্রভাব শুধু ইংরিজী কাব্যে সীমাবদ্ধ রইল না, পৃথিবীর কাব্যেও Waste Land-এর দান অসামান্য।

এই কাব্যের মুক্তি শুধু বিষয়বস্তু থেকে নয়—আঙ্গিক থেকেও। কাব্যে আঙ্গিক বা আধার খুব বড় কথা। এই আধারের গুণেই একজন কবির সঙ্গে অন্য কবির বা ভিন্ন যুগের কবির কাব্যের তারতম্য ঘটে। কারণ আজ পর্যন্ত কাব্যের বিষয়বস্তুর খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি। যে অনুভূতির উপর কাব্য গ'ড়ে ওঠে সেই মূল অনুভূতিগুলির প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে বিশেষ তারতম্য ঘটে নি। বদল হয়েছে শুধু বহিরাবরণের। একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের পুত্র বিয়োগ ঘটলে সে চুল ছিঁড়ে, বুক চাপড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানিয়ে চীৎকার করে তার বেদনা জানায়, কিন্তু একজন আধুনিক মহিলার মধ্যে এর একটিও অভিব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে এ মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তার শোকের পরিমাণ অল্প। সে হয়তো দু-একটি সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিতে জানায়। এই যে অভিব্যক্তি বা আঙ্গিকের কথা বলছি এটাই হ'ল কাব্যের বড় কথা—কারণ আজ পর্যন্ত সাহিত্যে মূল অনুভূতির পার্থক্য ঘটেছে সামান্য তবু একযুগের কাব্যের সঙ্গে অন্য যুগের সাহিত্যের পর্বতপ্রমাণ পার্থক্য নির্ভর করে শুধু আঙ্গিকের ওপর। সাহিত্যে এই আঙ্গিকের বা আধারের তারতম্যে প্রভেদ গ'ড়ে ওঠে। এই আঙ্গিক যখন যুগের দাবীতে কবির কাব্যে রূপ নেয় তখনই মহৎ কাব্যের সৃষ্টি হয়।

এলিয়টের কাব্যে বিরোধ ও, আপাত-বিশৃংখলতায় অনেকেই রুষ্ট। কিন্তু এই বিশৃংখলতা আমাদের উপস্থিত সভ্যতার প্রতিবিম্ব মাত্র। আমাদের ঐতিহ্যের সংগে সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। ঐতিহাসিক কল্পনা আমাদের অতীতকে বর্তমানে টেনে এনেছে। কিন্তু কোনো যুগের পক্ষে এত বড় ঐতিহ্যকে পরিপাক করা সহজ নয়। ফলে, পুরোনো আঙ্গিক—পুরাতন রচনাশৈলী ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে। এ ছাড়া যন্ত্রযুগের প্রকর্ষতার সংগে সংগে মানবের জীবনপ্রবাহ ব্যাহত হয়েছে। মাটির সহজ জীবন যেন উপড়ে এনে সহুরে যন্ত্রের সংগে জুড়তে দেওয়া হয়েছে। ক্ষেত-খামার মাটি ফসলের সংগে স্মরণাতীত-কালের জীবন-যাত্রা থেকে আজ আমরা নির্বাসিত। প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত মানব সংস্কৃতি একতারে বাঁধা ছিল। এই ঐক্য থেকে আজকের সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই আজ আধুনিক পৃথিবীতে

> April is the Cruellest month, breeding
> Liliacs out of the dead land, mixing
> Memory and desire, stirring
> Dull roots with spring rain.
> (Waste Land)

এই পোড়ো জমিতে ফুল ফুটলে কী হবে—এই মরামাটিতে জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটলে কী হবে, এর সংগে মনবাত্মার কোনো যোগ নেই। জীবন এখানে প্রাণ সঞ্চারিত করে না, জীবন এখানে পরিপূর্ণতা দেয় না, জীবন শুধু এখানে এক যান্ত্রিক পুনরাবর্তন মাত্র। জীবনের এই পৌনঃপুনিকতাই তো মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। তাই তিনি অন্যত্র আরও কঠোরভবে ব'লেছেন

> Nothing at all but three things....
> Birth, Copulation and death.
> That'all, that's all, that's all.
> Birth, Copulation and death.

এই কি মানব-জীবনের পরম পরিণতি—ইহাই কবির চরম প্রশ্ন।

এলিয়াট 'ওয়েস্টল্যান্ডে' সমগ্র মানব-চৈতন্যের ওপর আলোকসম্পাত করার চেষ্টা করেছেন। অবিশ্যি যে পন্থা তিনি অবলম্বন করেছেন সেটি দুর্বোধ্য এলিয়টী পন্থা। আজকের আমাদের এই জটিল জীবনের পক্ষে এ ছাড়া আর কী উপায় ছিল তা বলা অত্যন্ত কঠিন। নির্বিকার মনোবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে জীবনকে দেখার জন্যে কবি টিরেসিয়াস নামে একজন ব্যক্তির কল্পনা করেছেন। টিরেসিয়াস ওয়েস্টল্যান্ডের কোনো চরিত্র নয়, সে নিছক দর্শক মাত্র—তবু সেই এই কাব্যগ্রন্থের যথা-সর্বস্ব। কারণ সেই সমস্ত চরিত্রকে মিলিত করছে—সেইজন্য সমস্ত স্ত্রীলোকই একটি স্ত্রীলোক এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই টিরেসিয়াসের মধ্যে লীন হচ্ছে। আসলে টিরেসিয়াস যা দেখছে তার সারবস্তুটিই হ'ল ওয়েস্টল্যান্ড কাব্য।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি যে এই কাব্যগ্রন্থের নাম তিনি নিয়েছেন কুমারী জে এল ওয়েস্টনের মানবতত্ব গ্রন্থ 'Ritual to Romance' থেকে। এই গ্রন্থের পটভূমিকার ওয়েস্টল্যান্ড কাব্যের ঐক্যরূপ বোঝা সহজ হয়ে উঠবে। প্রথমে Tarot pack নিয়েই শুরু করা যাক্।

> Madame Sosostris, famous
> clairroyante,
> Had a bad cold, neverthless
> Is known to be the wisest
> woman in Europe,
> With a wicked pack of
> Cards.

তাসের পরিচয় দিয়ে এলিয়াট মানুষের জীবন অদৃষ্ট নামে এক প্রচন্ড বহির্শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। এই তাসের প্যাকেটের অবতারণা করে এলিয়াট বলতে চেয়েছেন যে মানব-জীবন অদৃষ্ট, ভাগ্য ও অনন্ত কুহেলিকার মিশ্রণে সৃষ্টি, এ ছাড়া তথাকথিত সভ্য জীব Madam Sosostrisএর ওপর কটাক্ষও কম করা হয়নি। পরের কবিতা Fire Sermon-এ এলিয়াট শুধু একটি কথায় বিংশ শতাব্দীর সুভ্যতাকে অসার বলে প্রতিপন্ন করেছেন—বলেছেন Unreal। এই যে তার বাহ্যিক মেকী সৌন্দর্য তার মধ্যে সারবস্তু ব'লে কিছু নেই—ফাঁপা, মরীচিকা মাত্র। অথচ সত্যের পিছনে কবি ছুটেছেন

> To Carthage then I came
> Burning, burning, burning, burning
> O Lord Thou pluckest me out
> O Lord Thou pluckest burning.

এখানে কবি সেন্ট্ অগাস্টাইন ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কামনা করেছেন।

এর পর ওয়েস্টল্যান্ডের শেষ ও শ্রেষ্ঠ কবিতা What The Thunder Said। প্রথম কবিতায় আমরা দেখেছি যে এই 'পোড়োজমিতে' ফুল ফোটে না—যেটুকু ফোটে তা শুধু নিষ্ঠুর জৈব ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে। এখানে জীবনে স্বাদ নেই পূর্ণতা নেই—এই জমি শুধু পাথরে তৈরী। এখানে জল নেই—শুধু the dry stone no-sound of water—কিন্তু শেষ কবিতায় এই তৃষ্ণা আধ্যাত্মিকতা তৃষ্ণায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এখানে বজ্র নিষ্ঠুর কঠিন যাতে বৃষ্টির কণাটুকু নেই। কবিতাটি শুরু হবার পর থেকেই অবসাদ যেন ছত্রে ছত্রে ঘনীভূত হয়েছে—নৈরাশ্য ও ব্যর্থতায় কবিতাটি যেন অতি কষ্টে এগিয়ে চলেছে—ক্লান্তি এত বেশী যেন দীর্ঘনিশ্বাস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে—

> Here is no water but only rock
> Rock and no water......

যদি এতটুকু পানীয় থাকতো! কবি কল্পনায় জলের শব্দ শুনছেন

> Drip drop drip drop drop drop drop
> But there is no water

এই কাল্পনিক জলের শব্দে কবির সঙ্গে যেন আমাদের তৃষ্ণা আরও প্রখর হয়ে ওঠে। এই বেদনা তো শুধু কবির নয় এতো সারা ওয়েস্টল্যান্ডের বেদনা, কিন্তু সত্যি কি এ মরুভূমিতে এক ফোটা জল নেই? কিন্তু পরের ছত্রেই দেখি—

> Who is the third who walks
> always beside you?
> When I count, there are only you
> and I together
> But when I look ahead up the
> white road
> There is always another one
> walking beside you
> Gliding wrapt in a brown mantle,
> hooded
> I do not know whether a man
> or a woman
> —But who is that on the other
> side of you?

এই তৃতীয় মূর্তিটি যে যীশুখৃষ্টের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—অথচ আত্মার পানীয়ের সন্ধানে কবি ছুটেছেন। এর পরেই দেখি কবি অন্যত্র মনোনিবেশ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপ ও রাশিয়ার দিকে কবির দৃষ্টি নিবন্ধ। কিন্তু সেখানে শুধু মানুষের কান্না আর তথাকথিত সভ্যতার গম্বুজ গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে ভেঙে পড়ছে—এবং এর ভিত্তির নীচেও কোনো সার বস্তু নেই;

> What is that sound high in the air
> Murmur of maternal lamentation...
> Falling towers
> Jerusalim Athens Alexendria
> Vienna London
> Unreal.

তবে কোথায় সত্য মিলবে? আত্মার পানীয় কোথায় পাওয়া যাবে—এইভাবে পৃথিবী পরিক্রমা করে তিনি অবশেষে এলেন যেখানে

> Ganga was sunken, and the limp leaves
> Waited for rain, while the black clouds
> Gathered far distant over Himavant.

শেষে 'হিমাবন্তে'র প্রাচীন ঋষিভূমিতে তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন। সেখানে বজ্র নির্ঘোষে বৃহদারণ্যকের শাশ্বত বাণীই ধ্বনিত হ'ল—Datta, Dayadhvam, Damyata—দাও, দয়া কর, দমন কর—নিজের জীবনকে উৎসর্গ করাই প্রকৃত সুখ, নিজেকে সংযত করাই প্রকৃত শান্তি। মনীষী সোপেনহাওআর যেমন পৃথিবীর দর্শন মন্থন ক'রে শেষ পর্যন্ত উপনিষদেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে গেলেন—বলে গেলেন,

> It (Upanisad) has been the consolation of my life and it will be the consolation of my death.

মনীষী কবি এলিয়াটও প্রাচীন অর্বাচীন সমস্ত সভ্যতার ভান্ডার হাতড়ে শেষে

উপনিষদেই আশ্রয় নিলেন এবং উপনিষদের ধরণে শান্তি, শান্তি, শান্তি ব'লে ওয়েস্টল্যান্ড শেষ করলেন। তিনি এই ইঙ্গিত দিলেন যে পৃথিবীর 'পতিত জমি' উপনিষদের এই তিনটি মন্ত্রেই আবার আবাদী ভূমিতে পরিণত হ'তে পারে। তবে তাঁর ওয়েস্টল্যান্ডে বৃষ্টি নামল না,—পতিত জমি অনাবাদী হয়েই রইল এবং ওয়েস্টল্যান্ড যেখানে শুরু হয়েছিল, শেষও সেখানেই হ'ল। ওয়েস্টল্যান্ড পর্যন্ত আলোচনার সঙ্গে এলিয়টের কাব্য প্রতিভার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হ'ল। পরবর্তী গ্রন্থসমূহ The Hollow Men, Ash Wednesday প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে এলিয়ট-প্রতিভা আবার নতুন বাঁক নিয়েছে।

এ কথা যথার্থ যে টীকা, টিপ্পনি ও উদ্ধৃতির অর্থ সম্পূর্ণ বোঝা না যাওয়াতে ওয়েস্টল্যান্ডের রস সম্পূর্ণ আস্বাদন করা যায় না, কিন্তু মহৎ কবিতার লক্ষণ হল বুদ্ধির সিংহতোরণে প্রবেশ করার আগে সে মনের দরজায় কড়া নাড়ে। এলিয়টের কবিতার অর্থ পুরোপুরি বোঝা না গেলেও তার অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে পৌঁছোয়। এই-খানেই এই কাব্যের সার্থকতা। তাই ওয়েস্ট-ল্যান্ড শুধু ইংরিজী কাব্যকে নতুন খাতে প্রবাহিত করেনি, পৃথিবীর আধুনিক কাব্য-প্রবাহের সীমানা নির্দেশ করছে।

সোয়ালো

এ ডি সিলভা

অনন্ত নীল আকাশে ডানা মেলে অলস-ভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে সোয়ালো পাখী, মিষ্টি সুরে গান করছে তার সঙ্গিনীর প্রেমের কাহিনী।

বাতাসে একটা ঠাণ্ডার আমেজ। উড়তে উড়তে শিরশির করে উঠলো ডানা দুটো—সোয়ালোটা বুঝতে পারলো আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে, শীত এসে গেল বলে।

ঝাঁকের পর ঝাঁক পাখীর দল এরি মধ্যে এসে জুটছে। মাঠের ধারে কারখানার আঙিনায় এদের মেলা বসে, আজকাল প্রতি-দিনই তার সংখ্যা বাড়ছে—সকলেরই হাবে ভাবে উৎকণ্ঠার ছাপ। শীত এসে পড়েছে। সোয়ালো কিন্তু তাদের দলে ভিড়লো না! আজ বার দিন হলো সঙ্গিনী তার নীড় ছেড়ে বেরোয়নি। ছোট্ট নরম তুলতুলে শরীরটা দিয়ে সে চারটি ডিমের ওপর একভাবে চেপে বসে আছে—মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখছে নীলাভ আকাশের দিকে, আর শুনছে তার আনন্দোজ্জ্বল সঙ্গীদের কলকাকলী।

দিনের বেলা সোয়ালো তার সঙ্গিনীকে খাওয়ায়। আকাশে আলোর রেখা ফুটতেই বতাসে সে তার ডানা মেলে দেয়, সঙ্গিনীর খাবার খুঁজতে। সাঁ সাঁ ক'রে নেমে যায় অনেক নীচে—বাতাস সেখানে শিশিরকণায় ভারী। পোকামাকড়ের সেটা রাজত্ব। ঝোপে ঝাড়ে, বাগানের আনাচে কানাচে শীকার করে বেড়ায় সোয়ালো। সঙ্গিনীকে সে উপহার এনে দেয় মশা, মাছি, গুবরে পোকা আর মাকড়সার ঠাং নানা রংয়ের কারুকার্য করা প্রজাপতি আর মৌমাছির ডানা। জলও নিয়ে আসে ঘাসের মাথায় চিক্‌চিক্ করা শিশির কণা থেকে।

কিন্তু আজ আর সে নীচে নামেনি সঙ্গিনীর খাবার খুঁজতে—সোজা উড়ে চলে এসেছে উঁচুতে, আরও উঁচুতে, ভোরের কুয়াশা ভেদ করে। বাচ্চাটা ডিম ফুটে বেরিয়েছে কাল—চারটে ডিম থেকে একটা বাচ্চা। ভোরের আলোয় চোখ মেলে প্রথমেই তার চোখে পড়েছে বাচ্চাটা। ধূসর রংয়ের পালকহীন নরম তুল-তুলে ছোট্ট একটা দেহ—ঠিক যেন একটা বাদুড়ের ডানা, পাখীর বাচ্চা নয়।

জেগে উঠে দেখে তার সঙ্গিনী বাসার একেবারে ধারে বসে আছে চুপটি করে তার দিকে তাকিয়ে। সঙ্গীকে তাকাতে দেখে সে ঘাড়টা একপাশে কাত করে গলায় একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করল। এ শব্দের অর্থ পাখী জানে। এ শব্দ ভালবাসার কিন্তু এতে আছে বিষাদের সুরও। প্রকৃতির আসন্ন মৃত্যুর আভাস অনুভব করেছে সেও।

মেয়ে পাখীটা টুকটুক করে বাসায় লাফিয়ে বেড়াতে লাগল, ডানা ঝাড়তে ঝাড়তে আর কিচ্ কিচ্ শব্দ করতে করতে। ঘুরতে ঘুরতে একবার তার সঙ্গীর খুব কাছে এসে মুখ তুলে তাকাল—দৃষ্টিতে তার মেয়েলি ভয়ের একটা অস্পষ্ট আভাস। সোয়ালো সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাতে লাগল আস্তে আস্তে। মেয়েটা তার দিকে গলাটা অল্প একটু বাড়িয়ে দিয়ে গভীর একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বার করতে লাগল। ডানা দুটোকে ঝেড়ে টুকটুক ক'রে সে বারকয়েক ঘুরপাক খেলে—তারপর এক জায়গায় স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে আড়চোখে কেবলি তাকাতে লাগল একবার সঙ্গীর দিকে আরেকবার সদ্য ফুটন্ত ছানাটার দিকে। এবার সে যখন সঙ্গীর দিকে ফিরে ফিরে তাকায় তখন তার চোখে যেন একটা লজ্জার আভাস। একটু পরে সে চট্ করে এগিয়ে বাচ্চাটাকে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে এগিয়ে এল। সঙ্গীকে সে উপহার দিচ্ছে—প্রেমের উপহার।

সোয়ালো তাকিয়ে রইল তার সঙ্গিনীর দিকে। কি সুন্দর গোল ছোট্ট গলা—ঠিক যেন একটা মুক্তোর দানা। নরম তুলতুলে বুক, তার ওপর সুন্দর চকচকে পালক। বুক দিয়ে চেপে ধরা ডিমটা যে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, তার দাগটুকুও স্পষ্ট। ছোট্ট পাখীটা কত ক্ষীণ দুর্বল হয়ে গেছে। মমতায় ভরে উঠল সঙ্গীর বুক।

* * * *

অসীম নীলিমায় ভাসতে ভাসতে সোয়ালোর মনে পড়ে গেল তার ছোট্ট নীড় আর সঙ্গিনীর কথা। ডানা গুটিয়ে নিয়ে সাঁ সাঁ করে সে নেমে পড়ল মাটিতে। বাসায় বসে বসে সোয়ালোর সঙ্গিনীর চোখে পড়ল নীচে সবুজের মেলায় তার সঙ্গীর ডানার কাল ছায়া। অমনি দুলে উঠল তার বুক—সঙ্গীকে বাসায় ফিরতে দেখলে প্রতিবারই এমনি হয়।........ একবার, দুবার তিনবার মাথার ওপর পাক খেয়ে গেল পাখীটা—নীচের জমিতেও তিনবার ভেসে গেল তার ছায়াটা। ঘাড় কাত করে মেয়ে পাখীটা লক্ষ্য করছে ছায়াটার ঘোরাঘুরি। ছোট্ট বাসাটার একপাশে সরে গেল সে, ছানাটাকে টেনে নিল বুকের নরম তুলতুলে পালকের মধ্যে—জায়গা করে দিল তার সঙ্গীকে বাসায় নামতে। এক ঝলক সূর্যের আলো এসে পড়ল বাসাটায় আর তার মৃত চারটি ডিমের ওপর। পর মুহূর্তের সূর্যের আলো ঢেকে গেল, শোনা গেল ডানার ঝাপটানো—সোয়ালো এসে নামল ঠিক তার সঙ্গিনীর পাশে।

পাখীটা তার প্রিয়ার জন্য নিয়ে এসেছে একটা মস্ত নীল প্রজাপতি। বাসায় বসে অল্প

অল্প হাঁপাতে লাগল সে, তাকিয়ে রইল সঙ্গিনীর দিকে, কিন্তু মুখ থেকে প্রজাপতিটা না নামিয়ে। সঙ্গিনী আনন্দে ঘড়ঘড় করতে করতে আধবোজা চোখে তাকিয়ে রইল সঙ্গীর পানে।

*   *   *   *

সোয়ালোটা লাফাতে লাফাতে চলে গেল, বাসার কিনারায়—মরা ডিমকটার ওপর টুক্ করে নামিয়ে রাখল ছোট্ট প্রজাপতিটা। তার সঙ্গিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে শীকারটা ঘাড় কাত করে। একটু পরে এগিয়ে এসে ঠোঁট দিয়ে বিঁধিয়ে তুলে নিল সে পোকাটা। সদ্য ফোটা বাচ্চাটা হাঁ করল বড় করে। চোখ-দুটো ওর বন্ধ একটা পাতলা চামড়ার পর্দায়। মুখে ঝুলন্ত পোকাটা দোলাতে লাগলে মা —টুপ করে খসে পড়ল পোকাটা ডিমগুলোর ওপর, আট্‌কে রইল শুধু একটুকরো ডানা। বাচ্চাটার খোলা মুখে টুক করে ছেড়ে দিলে মা সেই ডানাভাঙ্গা টুকরোটা।

নীড়ের প্রান্তে পাশাপাশি বসে সোয়ালো আর তার সঙ্গিনী তাকিয়ে রয়েছে আকাশের পানে। নির্মেঘ আকাশ; তারি পটভূমিকায় চমৎকার দেখাচ্ছে নীচে লাল বেরী গাছগুলো। সোয়ালোটা নীড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আকাশের কোলে; দূরে আকাশের গায়ে কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে নীচে নেমে এসে বসল বেরী গাছের শাখায়—নেচে নেচে ঝেড়ে ফেলে দিল রাতের জমান শিশিরকণাগুলো। ছোট্ট শাখাটায় দোল খেতে খেতে ডাক দিল তার সঙ্গিনীকে। মিষ্টি সুরে সাড়া দিল তার সঙ্গিনী কিন্তু উড়ে গেল না বাসা ছেড়ে। সোয়ালো তখন একলাফে উঠে গেল আকাশের অনেক উঁচুতে শাখার আশ্রয় ছেড়ে। দূরে আকাশের নীল গায়ে গোল হয়ে বারকয়েক ঘুরপাক খেয়ে সাঁ করে নেমে এল,—এসে বসল একেবারে তার বাসার কিনারায়। সঙ্গিনীর পানে চেয়ে ডেকে উঠল সে—সে সুরে আছে মাদকতা, সে সুরে আছে উত্তেজনা। আবার সে ডানা মেলল, উড়তে উড়তে চলে গেল দূরে। কখনো কাত হয়ে ভাসতে লাগল বাতাসের গায়ে, কখনো নীলাভ মেঘের স্তর ভেদ ক'রে সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে, কখনো বা ডানা মুড়ে তীরগতিতে নেমে এল নীচে সবুজের গায়ে—ঠিক যেন এক টুক্‌রো পাথর, অদৃশ্য হাতে কে ছুঁড়ে দিল অলক্ষ্য থেকে।

পালা করে তারা খাওয়াতে লাগল বাচ্চাটাকে। একজন থাকে বাসায়—অপরজনের থাকে তখন শিকারের পালা। সোয়ালো যখন শিকার ধরে ফেরে, তার গতিতে থাকে গর্বের ভাব, মিষ্টি প্রেমের সুরে গান গেয়ে সে চক্রাকারে উড়তে থাকে নীড়ের চারিদিকে। কিন্তু তার সঙ্গিনী যখন ফেরে—ক্লান্তিতে তার ডানা মুড়ে আসে, নিঃশব্দে এসে সে আশ্রয় নেয় নীড়ের অন্তরে। বাতাসে ভাসতে ভাসতে তার মনে হয়, শরীরটা তার প্রাণহীন। ডানা দুটো ভারী। বহু শিকার তাকে এড়িয়ে পালিয়ে যায়। গ্রীষ্মে বেলা শেষের নরম আলোয় দিগন্ত যখন ছেয়ে যেত, সঙ্গীর পাশে পাশে হাল্কা ডানায় উড়ে বেড়ান ছিল তার চরম আনন্দ। কিন্তু আজ আর সে আনন্দ উপভোগে তার মমতা নেই। সঙ্গী তার যতই প্রাণমাতানো সুরে ডাকুক, তার চোখের সামনে ডানা ভাসিয়ে যতই কলাকৌশল দেখাক—তার প্রিয়াকে আজ আর সে লক্ষ্য করতে পারবে না তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়তে।
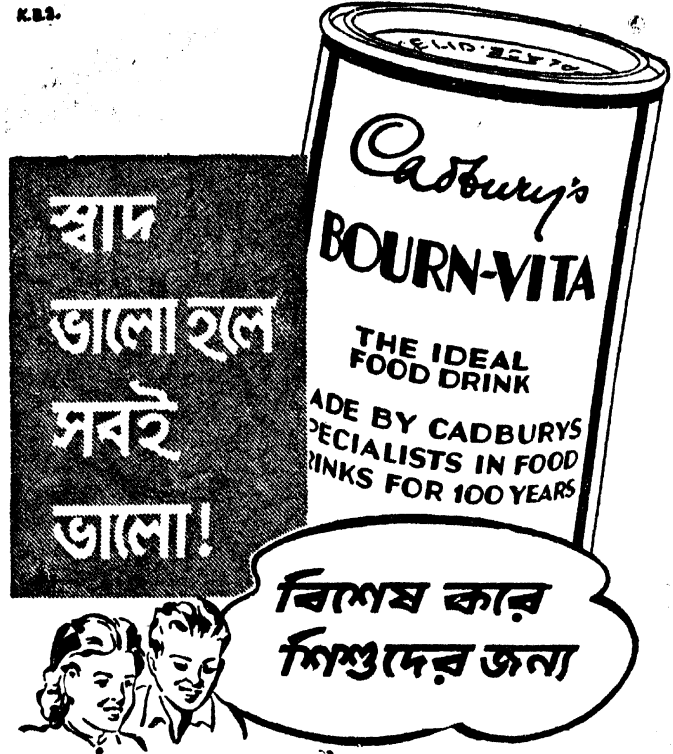
বাচ্চাটা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে; গোল একটা ব্যাঙের ছানারমত ছিল শরীরটা—দেখতে দেখতে সে হয়ে উঠল নরম পালকে ভরা ছোট্ট একটা ফুলের মত। টুকটুকে লাল গোল মুখটি, ক্ষণে ক্ষণে অল্প একটু হাঁ করছে ভেতর থেকে একটু গোলাপী আভা ফুটে বেরুচ্ছে। পাতলা পর্দার আড়াল থেকে চোখ-দুটি বেরিয়েছে।

প্রথম যখন তার চোখ ফুটল—চোখ মেলে তাকাতেই প্রথমে নজর পড়ল তার পাশে তিনটি ডিম। তার পর দেখল তার মাকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। কালো বড় বড় স্নেহস্করা দুটি চোখ—বুকের নরম পালকের ওপর পড়েছে প্রভাত সূর্যের সোনালী আলো। তার পেছনেই রয়েছে অসীম আকাশের অনন্ত হাতছানি। সেই মুহূর্তেই জেগে উঠল বাচ্চাটার মনে নীড় ছাড়বার বাসনা।

* * * *

এমনি এক দিনে সোয়ালো পাখীটার নজরে পড়ল—সে প্রান্তরে তারা একা। শীতার্ত সঙ্গীসাথীরা সব চলে গিয়েছে দেশ ছেড়ে। বাসার কিনারায় বসে নিঃশব্দে তারা তাকিয়ে রইল পরস্পরের পানে। শীতের জড়তা ছেয়ে আসছে চারিদিকে। কিন্তু তারা দেশ ছাড়বে কি করে—তাদের বাচ্চাটা এখনও উড়তে শেখেনি যে! বাসার মাথায় বসে পুরুষ পাখীটা মুখ হাঁ করে চোখ মিটমিট করে ডাকতে লাগল বাচ্চাটাকে। মা কতদিন সামনের গোলাপ-ঝাড়ে উড়ে গিয়ে চেষ্টা করেছে বাচ্চাটাকে বার করতে; মিষ্টি সুরে গান করেছে গোলাপের ডালে নেচে নেচে—যদি বাচ্চাটা মুগ্ধ হয়ে উড়ে চলে আসে। বার বার ডেকেছে কত আদরের সুরে! বাচ্চাটার চোখের সামনে বাতাসের সঙ্গে ভেসে ভেসে, ঘুরপাক খেয়ে কতরকমেরই না কৌশল দেখিয়েছে। ক্ষীণ, দুর্বল দেহ নিয়ে পাগলের মত অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে চলেছে মা—বাচ্চাকে যে উড়তে শেখাতে হবেই। শীত এসে গেছে!

ভীতচকিত দৃষ্টিতে তারা পরস্পরের পানে তাকাল। ভয় এবং হতাশায় সোয়ালো তীক্ষ্ন সুরে ডেকে উঠল। অধীরভাবে বাসার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল—রাগে তার গলার ভিতর থেকে একটা একটানা আওয়াজ বার হতে লাগল, ঘড়ঘড়, ঘড়ঘড়। ভাঙ্গা, মোটা সুরে বাচ্চাটাকে সে ডাকতে লাগল বার বার—তীক্ষ্ন চঞ্চু দিয়ে মাথায় আঘাত করতে লাগল অবিশ্রাম। সারা শরীর ব'য়ে ভয়ের ঠাণ্ডা একটা শিরশিরানি নেমে এল সোয়ালো পাখীটার—যেন বরফ জলের ধারা। সঙ্গীরা সব তাদের ছেড়ে গেছে কবে। তারা একা, একেবারে একা। শীতের ধূসর আকাশের মত ভয়াবহ নির্জনতা! বিষম রাগে সে বাচ্চাটাকে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে পাগলের মত ঝাঁকানি দিতে লাগল। মা পাখীটা কাতরভাবে ডেকে উঠল। বাচ্চাটাকে সোয়ালো আরেকবার নাড়া দিল প্রচণ্ডভাবে। হঠাৎ তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তার সঙ্গিনীর ওপর। তার নিশ্চুপ ভাব, অসীম ধৈর্য, অনমনীয় মনের জোরের প্রতি একটা প্রচণ্ড ঘৃণায় সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল সোয়ালোর। লাফিয়ে পড়ল সে সঙ্গিনীর দেহের ওপর; তীক্ষ্ন নখ দিয়ে আঘাত করতে লাগল তাকে পাগলের মত। ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতে করতে ফেলে দিল মাটিতে—ক্ষীণ দুর্বল দেহটিকে দু পায়ে মাড়াতে লাগল অবিরাম। আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিঝুম মেরে পড়ে রইল মেয়ে পাখীটা তার সঙ্গীর পায়ের কাছে।

সোয়ালো যখন বাসা ছেড়ে চলে গেল, আস্তে আস্তে মাথা তুলল তার সঙ্গিনী,—বাচ্চাটা পাশেই দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে মায়ের পানে। বহুক্ষণ ধরে অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মা সন্তানের দিকে—তারপর যখন সে মুখ খুলল, তার গলা দিয়ে বার হ'ল কোমল মিষ্টি একটা সুর: ক্ষমা, ভালবাসা আর স্নেহে সে সুর ভরপুর—এর চেয়ে মিঠে সুর বাচ্চাটা এর আগে আর কখনো শোনেনি। আস্তে আস্তে উঠে চলে এল মা একেবারে বাসার কিনারায়, তারপর তেমনি মিষ্টি সুরে ডাকতে ডাকতে নীড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাতাসে, ধীরে উড়ে এসে বসল নীচে গোলাপ ঝাড়ের শাখায়। বাচ্চাটা মাকে লক্ষ্য করতে লাগল, আর তার বুকে কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। অপরূপ সেই সুরের মাধুরীতে দেহ যেন তার কানায় কানায় ভরে উঠল। দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে সে চলে এল বাসার একেবারে কিনারায়—ডানা দুটোকে মেলে ধরে ইতস্তত করতে লাগল। শিরায় শিরায় একটা আগুনের রেখা খেলা করে বেড়াচ্ছে তার। কানে বাজছে তার মায়ের গানের সুর, আর চোখে পড়ল সামনে অসীম অনন্ত নীলাকাশ। পায়ে পায়ে সে উঠে দাঁড়াল—ছড়িয়ে দিল ছোট্ট ডানা দুটো। পর মুহূর্তে ভেসে পড়ল সে বাতাসের সাথে!

* * * *

গভীর আঁধার; ছোট্ট দলটি উড়ে চলেছে দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে। কত ঘণ্টা হয়ে গেছে, তারা উড়েই চলেছে। ছোট্ট বাচ্চাটা সকলের সামনে—একটু পেছনে এক পাশে মা, আরেক পাশে বাবা। তাদের উড়ন্ত ডানার নীচে সাগরের ঢেউ। শক্ত আঘাতে বাতাসকে খান্ খান্ করে স্থিরভাবে উড়ে চলেছে বাচ্চা সোয়ালো পাখীটা। আবহাওয়া শান্ত, বাতাসের ঝাপটা নেই।

নিঃশব্দে তারা উড়ে চলেছে। মা পাখীটা তার বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে একটানা ডানা ঝাপটানো। নিকষ কালো আঁধার; চোখে দেখা যায় না কিছুই। ধীর গতিতে মা এগিয়ে চলল দুই চোখ বন্ধ করে—লক্ষ্য তার সামনের দুটি ডানার অশ্রান্ত আওয়াজ। আকুল হৃদয়ে কান পেতে শুনছে সে—ছোট্ট দুটি ডানা বাতাস কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে একভাবে। মা এখন বুঝতে পেরেছে, দক্ষিণ দেশে সে আর পৌঁছুতে পারবে না! তবু যখন সামনের আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল—পাগলের মত সে শেষবার চেষ্টা করল ক্লান্ত ডানা দুটিকে টেনে কোন মতে এগিয়ে যেতে। কিন্তু ক্ষীণ, দুর্বল দেহ,—প্রতি মুহূর্তে শরীর অবশ হ'য়ে আসছে, মৃত্যু ঘনিয়ে এল বুঝি! বাচ্চাটাকে যদি একবার দেখতে পেত!

পাতলা মেঘের পর্দার আড়ালে, পূব আকাশে লাল আভা ফুটছে—সূর্যের প্রথম আলোর রেশ! বাতাস অল্প অল্প গরম হয়ে উঠল। সোয়ালোর সঙ্গিনী স্বপ্ন দেখছে বসন্ত ঘুরে এসেছে! আকাশে, বাতাসে, গাছের মাথায়, তার ছোট্ট নীড়টিতে ঝলমল করছে বসন্তের আলো! বাতাসে বৃষ্টির ঝমঝম্ গান। আকাশ থেকে ধীরে ধীরে খসে পড়তে লাগল তার অবশ দেহ।

সাগরের তীরে উড়ে গিয়ে পড়ল ছোট্ট একটি দেহ। চারি ধারে মেঘ গলে গলে পড়ছে। সমুদ্রের বুক থেকে লাফিয়ে উঠল টকটকে লাল গোল সূর্য......ঘন কালো আঁধার। অসীম আকাশ। ছোট্ট দুটি উড়ন্ত ডানা।......

সূর্যালোকিত ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠল নরম এক গুচ্ছ পালক!

সোয়ালো আর তার বাচ্চা স্থিরগতিতে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে!

অনুবাদ—শ্রীসাবিত্রী ঘোষাল

নিধিরামের প্রত্যাবর্তন

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কেনারাম মুখোপাধ্যায় (সাকিম-নারীট, জেলা—হাওড়া) মৃত্যুকালে বিষয়-সম্পত্তি কিছু কম রাখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁহার একমাত্র পুত্র নিধিরামের অদৃষ্টে বিধাতা পৈতৃক সম্পত্তি ভোগের সুখ অথবা নৈশ্চিন্ত্য না লিখিয়া থাকিলে তিনি কি করিবেন? পিতা বর্তমানে নিধিরাম মোট তিনবার গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। একবার সতেরো দিন এবং আর একবার তিনমাস পরে তাঁহাকে ফিরিয়া পাওয়া যায়; কিন্তু তৃতীয়বার অর্থাৎ মাতার মৃত্যুর পর তিনি যখন শ্মশান হইতে নিরুদ্দেশ হইলেন তাহার পর পরবর্তী চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে তাঁহার আর কোনো সন্ধান মিলিল না। কেনারাম জীবনে কখনও ভালো করিয়া পেটে খান নাই, প্রাণ ধরিয়া কোনো সৌখীন বা মূল্যবান জিনিস কিনিয়া ব্যবহার করেন নাই, দানধ্যানতীর্থ-ধর্মের কোনো বালাই কেনোদিন তাঁহার ছিল না। আজীবনের সমস্ত সঞ্চয়—খত, তমসুক, হ্যাণ্ডনোট, কোম্পানীর কাগজ, বন্ধকী গহনা এবং নগদ টাকা একটা লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া তিনি যখন দেহত্যাগ করিলেন তখন নাকি তাঁহাকে পোড়াইবার লোকের অভাব ঘটিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত গ্রামের সমাজপতি হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজে কাঁধ দেওয়ায় কেনারামের গ্রাম সম্পর্কে আত্মীয় এবং জ্ঞাতি-ভ্রাতা রাধানাথ বংশানুক্রমিক শত্রুতা বন্ধ রাখিয়া তাঁহার মুখাগ্নির কাজটা কোনোরূপে সারিয়া দেন। সকলে আশা করিয়াছিল শ্রাদ্ধটা ঘটা করিয়াই হইবে, কিন্তু কেনারামের লোহার সিন্দুকের চাবি যখন কোথাও পাওয়া গেল না এবং উহা ভাঙিবার জন্য বা নূতন চাবি তৈয়ারি করাইবার জন্য কামার ডাকিতেও যখন হরিহর প্রমুখ গ্রামের মাতব্বরেরা বাধা দিলেন তখন রাধানাথ বাঁকিয়া বসিলেন, তিনি এক পয়সাও খরচ করিতে রাজি হইলেন না। হরিহরই শেষ পর্যন্ত দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচ দিয়া নমো নমো করিয়া কেনারামের কাজ সারিলেন অর্থাৎ অনুপস্থিত নিধিরামকে পিতৃদায় হইতে উদ্ধার করিলেন। রাধানাথকে শান্ত করিবার জন্য আপাতত কেনারামের বাড়ি এবং জমিজমা ভোগদখলের অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইল, সুতরাং নগদ টাকা না পাইলেও তাঁহার আয় সহসা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। ফলে তাঁহার মেজাজ ও উদরের পরিধি যে পরিমাণে বাড়িল মনের উদারতা সে পরিমাণে বাড়িল না। প্রজারা এক সময়ে কেনারামের মৃত্যু কামনা করিত, এখন রাধানাথের অত্যাচারে অস্থির হইয়া তাহারা তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল। বাগ্‌দীদের 'হারানে'কে রাধানাথ যেদিন বাকি খাজনার জন্য নিজহস্তে নির্মমভাবে প্রহার করিলেন, সেদিন হারানের মা ঠাকরুণ-তলায় মাথা কুটিয়া প্রার্থনা জানাইল, "মা, এর বিচের তুমি করো। আমাদের নিধিদাদাকে তুমি ফিরিয়ে আনো, পোড়ার মুখোকে তিনি জুতো মেরে গাঁছাড়া করুক, আমাদের হাড় জুড়োক।" সেদিন দরিদ্রের সেই আকুল-মিনতি নিশ্চয়ই স্বর্গে নারীটের জাগ্রত দেবী মা-মঙ্গলচণ্ডীর দরবারে পৌঁছিয়া তাঁহার সিংহাসন টলাইয়াছিল। দেবী সচকিতা হইয়া অনুচরী পদ্মার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "পদ্মা, আসন কেন টলে?"

ব্যাপরটা অবিকল ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল কিনা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনুরূপ ফল ফলিয়াছিল। সেইদিন বিকালের দিকে মানভূম জেলার গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের একটি ছোটো স্টেশনের নিকটবর্তী বাজার হইতে জুতা কিনিতে আসিয়া পাঁচ মাইল দূরবর্তী টৌপাটাঁড় কয়লাখনির ওভারসিয়ার নিধিরাম সহসা তাঁহার পূর্বজীবন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন। দোকানদার জুতাজোড়াটি যত্ন করিয়া একটা খবরের কাগজে মুড়িয়া দিয়াছিল, নিধিরাম সেটিকে সেই অবস্থাতেই পাঁউরুটি প্রভৃতি অন্যান্য সওদার জিনিসের সঙ্গে হাতে করিয়া লইয়া আসিতে-ছিলেন। পথিমধ্যে একটা সমৃদ্ধ গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া মনে হইল এক কাপ চা খাইলে মন্দ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হইল নূতন জুতা হাতে থাকার চেয়ে পায়ে থাকাই সম্মানজনক এবং ভদ্রোচিত; বিশেষত গন্তব্যস্থল যখন অদূরে তখন নূতন জুতায় ফোস্কা পড়িবার ভয়ও বিশেষ নাই। নিধিরাম পুরাতন ছেঁড়া জুতাজোড়াকে প্রথমত পথেই বিসর্জন দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, পরে ভাবিলেন, "থাক। খনির মধ্যে কাজ দেবে।" নূতন জুতা পায়ে দিয়া তাহারই আচ্ছাদনের কাগজ দিয়া তিনি পুরাতন জুতা দুইটিকে মুড়িতে যাইতে-ছিলেন, সহসা তাহার এক জায়গায় একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়িলঃ 'বাবা নিধি, ফিরে এস। আমি মৃত্যুশয্যায়। আমার বহুকষ্টের সঞ্চয়, অন্যে ভোগ ক'রলে আমি মরেও শান্তি পাব না। শ্রী কেনারাম মুখোপাধ্যায়। সাং নারীট, জেঃ হাওড়া।' নিধিরাম ধীরে ধীরে পথের ধারে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া লইয়া কাগজের তারিখ দেখিলেন। সাতমাস পূর্বের বিজ্ঞাপন! নিধিরামের মাথাটা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। বিভূপদর চায়ের দোকানে ঢুকিয়া পর পর তিন কাপ চা খাইলেন, তাহার পর অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় ধীর মন্থর গমনে নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে কর্মস্থলে ফিরিলেন।

২

টৌপাটাঁড় কুলিধাওড়ার একপ্রান্তে একটি নির্জন ক্ষুদ্র কক্ষে একখানা দড়ির খাটিয়ায় শুইয়া নিধিরাম চিন্তা করিতেছিলেন। আকাশ-পাতাল চিন্তা, সে চিন্তার মাথামুণ্ড নাই। সুদীর্ঘ ছত্রিশ বৎসরের কত সুখদুঃখের কাহিনী ক্ষণকালের জন্য মূর্তি ধরিয়া বিস্মৃতির অতল গহ্বর হইতে সহসা উঠিয়া আসিতেছিল, নিধিরাম কখনও ভয়ে, কখনও বিস্ময়ে, কখনও বা আনন্দে নিজেই আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেছিলেন। তটস্থ দর্শকের দৃষ্টিতে ছায়া-ছবির মতো নিজের অতীত কীর্তিগুলি কল্পনা নেত্রে দেখিতে মন্দ লাগিতেছিল না।

নিধিরাম শৈশব হইতেই একটু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ এবং দুরন্তপ্রকৃতির ছিলেন। তাঁহার চিররুগ্না নিষ্ঠাবতী ধর্মপ্রাণা মাতা এবং প্রবল প্রতাপ ঝানু বৈষয়িক পিতার মধ্যে কেহই তাঁহাকে স্বমতে দীক্ষিত করিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর বয়সে পূজার সময় একজোড়া জুতা কিনিয়া দিয়া পিতা বলিলেন "জুতো পরে ছুটবি না, রাস্তার ধারে ধারে ঘাসের ওপর দিয়ে চলবি, কাঁকরের ওপর হাঁটবি না। খবদার, তিন বছরের মধ্যে জুতো ছিঁড়লে তোমার পিঠের চামড়া ছিঁড়বে, মনে থাকে যেন।" দরিদ্র প্রতিবেশীর ছেলে অবিনাশের জুতা হয় নাই বলিয়া সে কাঁদিতেছিল, মা তাহাকে তাঁহার জুতা দান করিয়া 'কে দিয়াছে' বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, মাতার ধর্মরক্ষার জন্য নিধিরামকে সে যাত্রা অধর্ম করিতে অর্থাৎ পিতার কাছে জুতা চুরি গিয়াছে বলিয়া মার খাইতে হইয়াছিল। আর একদিনের কথা মনে পড়ে; চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে প্রশস্ত উঠানে সমবয়সী ছেলের দল জুটাইয়া নিধিরাম 'চু কিৎ কিৎ' খেলিতেছেন। প্রতিপক্ষের সবচেয়ে ওস্তাদ খেলোয়াড় গয়লাদের খেঁদু, "চু যাব, চরণে যাব, পাতি লেবুর মাতি খাব" বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়াছে, নিধিরামরাও তাহাকে সদলে জাপটাইয়া ধরিবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময়ে দোতলার জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া তাঁহার মাতা সহসা ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা নিধি, ওসব মিছে ছেলেখেলা ক'রে কি হ'বে বাবা? তার চেয়ে সুস্থির হ'য়ে ব'সে দু'দণ্ড ভগবানের নাম কর, পরকালে কাজ দেবে।" বলা বাহুল্য খেঁদু, অক্ষতদেহে ফিরিয়া গেল, সেদিন খেলা আর জমিল না।

হাতে-খড়ির দিন নিধিরাম 'ক' লিখিতে গিয়া কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হন নাই, সেই দুঃখে মা তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইলেন না। বাবার ও বিষয়ে বৃথা চিন্তা করিবার সময় ছিল না, তিনি তখন একটা মামলা লইয়া ব্যস্ত। নিধিরাম মাঠে-ঘাটে খেলিয়া বেড়াইত এবং সন্ধ্যাবেলা অ্যামেচার যাত্রাপার্টির কয়েকটি সখী-সাজায় অভ্যস্ত ছেলের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিতে শিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় একদিনের কথা। শাপুইদের পুকুরঘাটে চাঁদের আলোয় শানবাঁধানো চাতালে বসিয়া পাড়ার ছেলেছোকরারা গান ধরিয়াছে "রাধা-শ্যাম একাসনে সেজেছে ভালো। রাই আমাদের হেমবরণী, শ্যাম চিকন কালো।" হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া শিশু নিধিরাম সেদিন তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে-ছেন, এমন সময় তাঁহাদের সমবেত কণ্ঠস্বরকে ছাড়াইয়া পিতার কণ্ঠস্বর কানে আসিল, "নিধে। সটকে মুখস্থ হয়েছে?" গান থামিয়া গেল, চাঁদ মেঘে ঢাকিয়া গেল। কেনারাম হাঁক দিলেন, "গলা টিপলে দুধ বেরোয়, এর মধ্যে যে লায়েক হ'য়ে গেছ দেখছি? আবার 'শ্যাম চিকন কালো!' শ্যাম পণ্ডিতের চিকন বেত এখনো খাওনি, না? রোসো, কালই তোমায় পাঠশালে ভর্তি করছি। বাড়ি চল, হতভাগা! ফের যদি এখানে দেখি" তাঁহার কথার শেষাংশ অনুচ্চারিত রহিয়া যাওয়ায় অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটিল না। নিধিরাম নতমস্তকে গম্ভীর মুখে পিতার অনুগমন করিলেন।

কেনারামের যে কথা সেই কাজ। পরদিন বিধিমতো সিধাসমেত মাটির দোয়াত, খাঁকের কলম

ও এক বোঝা তালপাতা শুধু নিধিরামকে নিজেই তিনি পাঠশালায় হাজির করিলেন। শ্যাম পণ্ডিত কেনারামের কাছে কিছু প্রাপ্তির আশা কোনোদিন করেন নাই, সুতরাং আশাতীত সাফল্যে খুশি হইয়া বলিলেন "কত গাধা পিটিয়ে মানুষ করলুম মুখুজ্যে মশাই, এতো আপনার সোনার চাঁদ! আপনি কিছু ভাববেন না, একে আমি দু'দিনে সায়েস্তা করে দে'ব। তবে কথা রইল, চামড়া আমার, হাড় আপনার। ছেলের হাড় ভাঙবার আগে আপনি কিন্তু কিছু বলতে পারবেন না।" কেনারাম সম্মতি দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় সংগে সংগে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "আমি কিন্তু বেত ছেড়ে দিয়েছি।" কেনারাম অবাক হইয়া বলিলেন "বলেন কি? তাহ'লে এসব অপোগণ্ডগুলিকে সামলাবেন কি করে? হঠাৎ এরকম মতিগতি হ'ল কেন আপনার" শ্যাম পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন "আর বলেন কেন? ক'দিন আগে নোতুন ডেপুটি ইনিস্পেক্টরবাবু এসেছিলেন। দয়ার শরীর। এসেই বললেন 'শুনেছি, আপনি ছেলেদের বড় মারেন, ওটা ঠিক নয়।' প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, ছেলেদের গায়ে হাত তুলব না, বা, বেত মারব না। কি করি? ওপরওলা! কথা দিতে হ'ল। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে গিন্নির কাছ থেকে হাতাখানা চেয়ে নিয়ে এসেছি। হাতও নয়, বেতও নয়।"

কেনারাম হাসিয়া বলিলেন, "হঠাৎ এ অস্ত্রটির কথা মাথায় এল কি ক'রে?"

শ্যাম পণ্ডিত বলিলেন, "বিপদে পড়ে মধুসূদনের নাম করতেই তাঁর মধুকৈটভ বধের কথাটা মনে পড়ে গেল; জলও নয়, স্থলও নয়।"

কেনারাম চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই নিধিরামের কয়েকটি বন্ধু জুটিয়া গেল। নিজের পাড়ার ছেলেরা তিন চারজন ছিল, তাহা ছাড়া গয়লা পাড়া এবং পাশের গ্রামের ছেলেও অনেকগুলি ছিল তাহারা সকলেই তাহার চেয়ে বয়সে বড়ো। নিধিরামকে প্রথমভাগের পুরাতন পড়া দেখিয়া রাখিতে বলিয়া শ্যাম পণ্ডিত ঘণ্টাখানেকের জন্য অন্য ছেলেদের লইয়া পড়িলেন। কেহ পড়া বলিতে না পারায় একপায়ে দাঁড়াইল, কেহ ইঁট হাতে লইয়া নাড়ুগোপাল হইল, কেহ বা হাতার বাড়ি খাইল। তাহার পর হঠাৎ পণ্ডিত মহাশয়ের ঘন ঘন হাই উঠিতে আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেদের সকলকে লাইন করিয়া দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "আমি একটু আসছি। তোমরা স্থির হ'য়ে যে যার পড়া দেখবে কেউ মুখ খুলবে না।" তারপর বিশেষ করিয়া নিধিরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বলো, মুখে চাবি কথা কইব না।" ছাত্রেরা সকলে নিজ নিজ দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ওঁঠাধারে চাপিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল "মু-খে চা-বি ক-থা কইবনা।" শ্যাম পণ্ডিত নিধিরামের দিকে চাহিয়া বলিলেন যতক্ষণ না আমি এসে বলব 'মুখ খোলো' ততক্ষণ কেউ আর মুখ খুলতে পারবে না। মুখ খুললেই মুখে ঘা হয়ে যাবে, সে আর জন্মে সারবে না।"

নিধিরাম ভয়ে ভয়ে ঠোঁট টিপিয়া প্রাণপণে আঙুলে চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় ঘরের বাহির হইবামাত্র চারিদিকে ছেলেরা মৃদুস্বরে আলাপ আরম্ভ করিল। "এই ফোকরে তোর মারবেলটা দেতো" "হ্যারে হাঁদা, তুই নাকি আমাকে পটলার কাছে মিথ্যেবাদী বলেছিস্," "আঃ কি করিস, খবরদার আমার বইয়ে হাত দিবি না।" "ডানদিকে গুটে নামতা মুখস্ত আরম্ভ করিল, 'কুড়িকে কুড়ি, কুড়ি দু'গুণে বুড়ি, তিন কুড়িং কড়াইভাজা চার কুড়িং খেতে মজা"; বাঁদিকে হোঁদলা তাহার সুরে সুর মিলাইয়া আরম্ভ করিল, "একের পিঠে দুই, বিছনা পেতে শুই।" সহসা সকলের দৃষ্টি নিধিরামের দিকে পড়িল। "দ্যাখ্ দ্যাখ্, ঐ নোতুন ছেলেটা কি রকম ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে আছে!" গুটে বলিল, "নিধি, সবাই হাসছে যে, কথা বলনা?" নিধিরাম শংকিতভাবে বলিল, "মুখে ঘা হবে না?" চতুর্দিকে হাসির রোল উঠিল। "তুইও যেমন পাগল, আমরা তো রোজ কথা বলি, কার মুখে ঘা হয়েছে দ্যাখ তো।" একসংগে দশ বারোটি বালক হাঁ করিয়া নিধিরামের দিকে আগাইয়া আসিল, গুটে বলিল "পণ্ডিতের ওসব মিথ্যে কথা শুনিস কেন? আফিং খেয়ে এখন ঝিমুচ্ছে। চ' এইবেলা একটু ডাংগুলি খেলিগে।" নিধিরাম রাজি না হওয়ায় তাহারা কয়েকজন বাহিরে চলিয়া গেল। হঠাৎ তাহার কানে গেল শ্রীপদ আর নিমাইয়ে তর্ক বাধিয়াছে। নিমাইএর বক্তব্য, গণেশের পায়ের জুতো চুরি করার জনাই মা দুর্গা চোরাকে খোঁচাইয়া মারিতেছেন, তাহার প্রমাণ গণেশের পায়ে জুতো নাই। মা দুর্গা যখন কার্তিককে জুতো কিনিয়া দিয়াছিলেন তখন গণেশকে বাদ দিয়াছিলেন—ইহা হইতেই পারে না। শ্রীপদ বলে, গণেশের কলা-বৌয়ের সহিত বিবাহ হইতেছে, তিনি তাই বাহিরে জুতো খুলিয়া আসরে আসিয়াছেন। আর চোরাকে মা-দুর্গা যে মারিতেছেন তাহার কারণ সে সরস্বতীর সোনার গহনা চুরি করিয়াছে। মা-দুর্গা এক মেয়েকে সোনার গহনা এবং অন্য মেয়েকে রুপার গহনা দিবেন এমন একচোখো তিনি নিশ্চয়ই নন। চুরির পর দ্বিতীয়বার পয়সার অভাবে সরস্বতীকে রুপার গহনা গড়াইয়া দিয়াই মা-দুর্গা চোরাকে ধরিয়াছেন। নিধিরাম মায়ের কাছে নিয়মিত পুরাণকথা শোনেন, তিনি উভয়ের কথাই খণ্ডন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুজনেই ভুল বলছ। ও চোরা নয়", অসলে ওর নাম মহিষাসুর। ও স্বর্গ থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। দেবতাদের রক্ষা করবার জন্য মা-দুর্গা তাই নিজে এসেছেন ওকে মারতে।" "হ্যাঁ তোকে বলেছে। যত আজগুবি কথা।" নিধিরাম বলিলেন "বলছি আমি মা-দুর্গা"—

সহসা শ্যাম পণ্ডিতের কর্কশ কণ্ঠস্বর কানে আসিল, "এই মা-দুর্গা, দাঁড়া বেঞ্চির ওপর। কান ধর্। হতভাগা ছেলেদের বলে গেলুম একটু চুপ ক'রতে তা' না! চেঁচিয়ে কানের পোকা বার করে দিলে! হরে, আমার হাতাটা বার করতো। "প্রিয় সর্দার-পড়ুয়া হরিচরণকে সেদিন হেলেবো পাঁচটা কদমা ঘুষ দিয়াছিল, সে অম্লানবদনে বলিল হাতাতো নেই।" শ্যাম পণ্ডিত গর্জন করিয়া উঠিলেন "কি হ'ল হাতা? সরিয়েছে হতভাগারা? যা, বাঁশের কঞ্চি কেটে আন্, আজ সবকটার রক্ত দেখে ছাড়ব।" হরিচরণ কুণ্ঠিতভাবে বলিল "আজ্ঞে, আজ গুরুমা পাঁচ রকম রাঁধছেন কিনা, তাই একটু আগে নিতাই এসে হাতা চেয়ে নিয়ে গেল।" শ্যাম পণ্ডিত একটু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "নিধের বাড়ীর সিধে পেয়েছে, আজ আর রক্ষে আছে? তা' আমাকে বলে নিয়ে গেলেই পারত। আচ্ছা আজকের মতো তোমাদের মাপ করলুম। নিধিরাম, তোমাকে যেন আর কোনোদিন বলতে না হয়। এবার ধরলে হাড় এক জায়গায় মাংস এক জায়গায় ক'রে ছাড়ব। তারপর কণ্ঠস্বর আরও একটু মোলায়েম করিয়া বলিলেন, "এদিকে এসো তো দেখি, হাত পাতো।" পাশ হইতে কে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল হাতনি মারবে।" "নিধিরাম গুরুবাক্য অমান্য করিতে সাহস করিল না, আগাইয়া গিয়া হাত পাতিল। শ্যাম পণ্ডিত তাহার আঙুলে দেখিলেন, হাতের চেটো ঘষিলেন এবং শুঁকিলেন; যখন স্থির বিশ্বাস হইল নিধিরাম তামাক খায় না তখন তাহাকে চার পয়সার তামাক আনিতে দিলেন ক্লাসশুদ্ধ সকলেই গোহার এই আকস্মিক সৌভাগ্যোদয় দর্শনে অবাক হইয়া গেল, হরিচরণের একটু ঈর্ষাও যে না হইল তাহা বলা যায় না। কিন্তু যাঁহার ভাগ্যে এই অযাচিত সৌভাগ্যের উদয় হইল, তিনি মোটেই খুশি হইতে পারিলেন না। কেনারাম বিষণ্নবদনে মুদির দোকানে গিয়া বলিলেন "চার পয়সার তামাক দাও তো।" "মুদি বলিল" এই বয়সে তামাক ধরেছ? তা বেশ, বাপ পানটি না খেয়ে পয়সা জমাচ্ছে, এত পয়সা ভোগ করবে কে? তা, কোন্ তামাক দোবো নিধুবাবু বড়ো না ছোট? নিধিরাম তখন কথাটার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ইহার পর পাঠশালা হইতে আমতার স্কুল, শ্যাম পণ্ডিতের 'হাতা' হইতে রাম মাষ্টারের "রুলের" রাজ্যে পদোন্নতি। কিসব দিনই গিয়াছে।

কত কথাই মনে পড়ে। ম্যাট্রিক ফেল করিয়া 'নিমাই সন্ন্যাস' অভিনয় দেখিয়া নিধিরাম প্রথমবার একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেন। পরিচিত গ্রামগুলি ছাড়াইয়া আমতায় আসিতেই ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হইল। আমতার বাজারে গোটা চারেক বড়ো পান্তুয়া খাইলেন, হাত খালি হ'য়ে গেল। পরদিন দামোদরের ধারে নির্জন স্থানে এক গাছতলায় নিধিরাম আশ্রম খুলিলেন। কাহারও নজরে পড়িল না, সারাদিন অনাহারে কাটিল। উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা না হইলে নয়। তার পরদিন সন্ধ্যায় ষ্টেশন হইতে একজনের একটা আধমণি মাল বহিয়া এক ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া তিন আনা উপার্জন হইল। কোনোরূপে অনশন হইতে রক্ষা পাইলেও সর্বাংগে এমন ব্যথা হইল যে আর হাত পা নড়ে না। সেই অবস্থায় নিধিরাম মনকে বুঝাইলেন জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি বলিয়া বসিয়া থাকিলেই হয় না, বুদ্ধিও খাটাইতে হয়। নিধিরাম সারাদিন বাজারের কাছাকাছি একটা গাছের তলায় চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়িতে লাগিলেন, "হর হর বোম বোম।" দুই চারিজন ভক্তিমান পুরুষ এবং ভক্তিমতী নারীর ভক্তি হইল গোটা আষ্টেক পয়সা এবং কিছু চাল সংগ্রহ হইল। কিন্তু আমতা স্কুলের এক সহপাঠী শাসাইয়া গেল, সাদা জামা পরিয়া ভিক্ষা করিলে পুলিসে ধরিবে। চার পয়সার গেরি মাটি কিনিয়া নিধিরাম কাপড় জামা রঙ করিলেন এবং মেলাই-চণ্ডীতলায় গিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিলেন। ঠাকুরের প্রসাদে এবং ভক্তদের দয়ায় আহার একরূপ চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু রাত্রে মশার কামড়ে ঘুম হয় না। গৃহত্যাগের সতেরো দিন পরে সেবার পল্টু, গোদা, ভ্যাবলা প্রভৃতি তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে আমতার মেলাইচণ্ডীতলার মেলা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। প্রকৃত পক্ষে তিনি উদ্ধৃত হইবার জনাই সেদিন সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং এমন নিপুণতার সহিত আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া বড়ী আসিয়াছিলেন যে, তিন মাসের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে একটি কথা বলিতে সাহস করেন নাই। সেদিনটা এখনও যেন চোখের উপর ভাসিতেছে! পল্টুর পিসিমা একপাল গ্রামের ছেলেমেয়ে সংগে লইয়া মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, বালক সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র তিনি চিনিতে পারেন। সন্ন্যাসী ছাই মাখিয়া গেরুয়া কাপড় পরিয়া সম্মুখে গৈরিক

বর্ণে রঞ্জিত একটি জামা বিছাইয়া চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিয়াছিলেন কেবল মাঝে মাঝে মিট মিট করিয়া চাহিয়া দেখিয়া লইতেছিলেন, কে কি দিয়া গেল। অনেকেই এক মুঠা করিয়া চাল দিয়া যাইতেছিল, সন্ন্যাসীর সম্মুখে চাউলের স্তূপ জমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। কুলটি, কলাটি, আখের টুকরাটি পড়িলে তিনি সযত্নে সেগুলি সরাইয়া রাখিতেছিলেন। পল্টুর পিসিমা চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন "এ ছোঁড়া কেনা মুখুজ্যের ব্যাটা না হয়েই যায়না।" সেই মুখ সেই চোখ।"

গোদার দিদি সঙ্গে ছিলেন, বলিলেন, "হ্যাঁরে নিধে, আমাদের চিনতে পারচিস নে?" সন্ন্যাসী মিট মিট করিয়া চাহিয়া চোখ বুজিলেন। কোনো সাড়াশব্দ না পাইয়া পল্টুর পিসি বলিলেন, "বাবা নিধি, তুমি কি সত্যিই আমাদের চিনতে পারছ না?" এইবার সন্ন্যাসী কথা কহিলেন। বলিলেন, "ভিক্ষাং দেহি।"

পল্টুর পিসি বলিলেন, "ভিক্ষে দেব বইকি বাবা, আগে আমার কথার উত্তর দাও। সত্যিই আমাকে তুমি চেনো না?"

"হ্যাঁ বাবা হুংকারানন্দ, তোমার বাড়ি নারীটে না?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, আমি নিজেই নিজেকে আজ পর্যন্ত চিনতে পারলুম না, আপনাকে কি করে চিনব?"

পিসিমা এই আধ্যাত্মিক জবাব পাইয়া ভড়কাইয়া গেলেন। একটু থামিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বাবা তোমার নাম?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "শ্রীমৎস্বামী হুংকারানন্দ সরস্বতী।"

পল্টুর পিসিমা এইবার তাঁহার সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া জেরা আরম্ভ করিলেন, "হ্যাঁ বাবা হুংকারানন্দ, তোমার বাড়ি নারীটে না? পল্টু তোমার প্রাণের বন্ধু, তাকেও চিনতে পারছ না?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ, স্বদেশোভুবনত্রয়ম্। আমার আবার দেশ, আমার আবার বন্ধু!"

এইবার পল্টু আগাইয়া আসিয়া বলিল, "ঠাকুর, পাঁঠার ঘুগ্‌নি খাবে? তোফা বানিয়েছে।"

সন্ন্যাসী নিস্পৃহভাবে বলিলেন, "ভক্তের ভক্তির দান, যা পাই, তাই খাই। সন্ন্যাসীর কিছুতেই বাধা নেই।"

পল্টু শালপাতার ঠোঙায় করিয়া দুই আনার পাঁঠার ঘুগ্‌নি আনিল। সন্ন্যাসী পরম তৃপ্তি-সহকারে নিমেষ মধ্যে সেটুকু শেষ করিলেন। পল্টু আবার আনিল, আবার মিনিট খানেকের মধ্যে তাহা নিঃশেষিত হইল। এইবার ভ্যাবলা বলিল, "নিধিদা, তুমি যে সেই হনুমানের বাচ্ছাটাকে হলুদ মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলে, তাকে কেউ দলে নেয়নি। আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তাড়িয়ে দিয়েছে বেচারাকে। সে আজ পাঁচ দিন হ'ল তোমাদের তেঁতুল গাছে এসে বসে আছে। বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচবে না। খায়না দায়না, হুপহাপ করে না, মাঝে মাঝে কেবল কিচমিচ করে কাঁদে।"

সন্ন্যাসীর মুখ অনুতাপে ম্লান হইয়া গেল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "তোমরা সোডা সাবান দিয়ে সেটার গায়ের রং তুলে দিতে পারো না?"

গোদার বুদ্ধিটা একটু মোটা, কথাগুলিও কাঠখোট্টা গোছের। সে বলিল, "তবে রে নিধে! ভালোয় ভালোয় যাবি, না পুলিস ডাকব? জানিস, তোর বাবা তোর নামে থানায় ডাইরি করে রেখেছে। সোজা কথায় না গেলে এখুনি পুলিসে খবর দেব, হাতে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে।"

পল্টু বলিল, "নিধিদা, খাওয়া দাওয়ার তেমন জুৎ হচ্ছেনা বোধ হয়, না? শরীরটা ক'দিনে শুকিয়ে গেছে। চলো, আমাদের সঙ্গে বাড়ি চলো। নোতুন পুকুরটায় এবার যা মাছ হয়েছে, বাড়িশুদ্ধ দুবেলা খেলেও ফুরোতে পারবে না। আর বামুন দিদির রান্না, বুঝেছ নিধিদা, সে আর তোমায় কি বলব? যত বুড়ো হচ্ছে, তত হাত খুলছে।"

অগত্যা সেবার নিধিরামকে বাড়ি ফিরিতেই হইল। পর বৎসর তিনি সসম্মানে তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় কলেজে পড়িতে গেলেন এবং অনতিবিলম্বেই অতি আধুনিক কবিরূপে বন্ধুমহলে খ্যাতিলাভ করিলেন। পরিবর্তনটা এতই দ্রুত ঘটিল যে, তিনি নিজেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। দুষ্টলোকে বলে তাঁহাদের প্রতিবেশী কুলদাচরণ চক্রবর্তীর ভাইঝি ট্যামটেমির প্রেমে পড়িয়াই নিধিরাম প্রথমবার ম্যাট্রিক ফেল করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার ভাষা ছিল অত্যন্ত সেকেলে, কবিতা ছিল 'নয়নজলে গেঁথেছি মালা, পরাব গলে' অনুকরণে রচিত ন্যাকামিপূর্ণঃ যথা, "আমারে তুমি বলিয়াছিলে করিবে বিয়ে, দুলিয়াছিলে এক দোলাতে পাশে বসিয়ে। সহসা শুনি ধনীতনয়ে বিবাহ করি ছাড়িয়া যাবে সেবকে তব হে সুন্দরী! তুমি তো সুখী হইবে সখি করি বিবাহ, আমার বলো মিটিবে কিসে প্রাণের দাহ।"

ইহার দুই বৎসর পরে সেই নিধিরামের লেখা 'ক্রন্দসী অটবী বক্ষে ধ্যানস্তব্ধ হিপোপোটেমাস, নাগোধনাকারে নাচে মল্লিম্লুচ পাংশু প্রহেলিকা' পড়িয়া কলেজের প্রফেসররাও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার "খদ্যোৎ বিদ্যুৎ গর্ভে নাচে, তারি সাথে অন্ধকারে নাচে মোর রিরংসার মাতরিশ্বাদ্যুতি" অথবা 'বিদেশী আকাশে মরা ইঁদুরের চাষ, নীল ঘাসে ভাসে প্রোটোপ্লাজমের গন্ধ' অথবা 'হৃদয়ের দাঁত দিয়ে আজি আসিয়াছি, প্রিয়ে, চেকনাই তনুটি এ চিবিয়ে খেতে' তৎকালীন অতি আধুনিক সাময়িক পত্রিকায় পড়িয়া তাঁহার সতীর্থেরাই কেবল ধন্য ধন্য করিল না, তিনি নিজেও বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন। সেই সময়ে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে তাঁহার একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল; নামটা এতদিন পরেও বেশ মনে আছে,—তৃষ্ণা। কিছুদিনের জন্য নিধিরাম স্বর্গমর্তের মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থায় ছিলেন। লেক, ডায়মণ্ড-হারবার, বোটানিক্যাল গার্ডেন, টেনিস পার্টি, পিকনিক! তিনখানা খাতা কবিতায় ভরিয়া উঠিল, তাহার পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে 'ধূসর হাহাকার' এবং 'পুনর্ণবা বেপথু'। সহসা একদিন সহপাঠিনীর নিজ হস্তে লেখা তাঁহার শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া নিধিরামের কলিকাতার এবং অতি আধুনিক সভ্যতার উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল, তিনি পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্বে পরীক্ষা না দিয়াই গ্রামে ফিরিলেন। পিতার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আমি গ্রামেই থাকব, পড়াশোনা আমার দ্বারা হবে না।" কেনারাম ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিলেন, "এই সংকল্পটা বছর দুই আগে স্থির হলে আমার প্রায় দেড় হাজার টাকা বাঁচত। তোমার মতো একটি অকালকুষ্মাণ্ডকে না পুষে ঐ টাকায় আমি ত্রিশটা ভাগলপুরী গরু পুষলে মাসে কমপক্ষে পাঁচ মণ দুধ হ'ত, সেটা ভেবে দেখেছ?" নিধিরাম স্বীকার করিলেন, তিনি অতদূর চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। কেনারাম বলিলেন, "বেশ, কাল থেকে আদায়-তসিলের কাজটা বনমালীর কাছে শিখবে, আর কোন মাঠে কত জমি আছে, প্রজাদের কার কত খাজনা, ভাগ চাষীদের কার কাছে কত পাওনা সব বুঝে নেবে। বনমালী বুড়ো হয়েছে, ওকে আসছে মাস থেকে ছেড়ে দেব, ওকে দিয়ে আর কাজ চলছেনা।" নিধিরাম কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "দেখুন, আপাতত কিছুদিন আমাকে একটু সময় দিন। ও কাজে আমার মন সায় দিচ্ছে না।" কেনারাম অবাক হইয়া বলিলেন, "সায় দিচ্ছে না? বলো কি? তোমার মতো জোয়ান ছেলেকে বসিয়ে খাওয়ানোতেও তো আমার মন সায় দিচ্ছে না। তাছাড়া আমার সে রকম অবস্থা নয়, তাও তুমি জানো। তা হ'লে এখন কি করবে স্থির করছ?" নিধিরাম বলিলেন, "আপাতত কিছু টাকা ধার পেলে একটা নাট্যমন্দির করতুম আমাদের।" কেনারাম বলিলেন, "গতিরাম মুখুজ্যে ছিলেন দিগ্‌গজ পণ্ডিত, এ তল্লাটে শ্রাদ্ধের সভায় কেউ তাঁর কাছে মুখ খুলতে সাহস করত না। তাঁর নাতি হ'য়ে তুই যাত্রার দল খুলবি, আর আমি জোগাব তার টাকা? লক্ষ্মীছাড়া, কুলাঙ্গার! একথা বলতে তোর মুখে বাধল না? আমি হরেনের কাছে শুনেছিলুম বটে, তুমি কলকাতায় কুসঙ্গে মিশে 'কাব' হয়েছ, তবে তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে তা তখন বুঝতে পারিনি। তারপর সেদিন নিরাপদর কাছে 'কালিঝুলি' কাগজে তোমার কবিতা পড়লুম। শূর্পনখার কাটা নাক নাকি পঞ্চবটী বনে মাটিতে পড়ে কাঁদছে। যেমন ভাব, তেমনি ভাষা! কি যেন, খ্যাঁচ্ খচাং।"

স্বরচিত কবিতাটিকে অপমৃত্যু হইতে বাঁচাইবার আগ্রহে স্থানকাল ভুলিয়া নিধিরাম ভাবগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "স্বপ্নে দেখি সে খাঁড়া চকচকে ধারালো! রাজার দুলালে পেয়ে স্বামীহারা বুনো মেয়ে প্রেমে মজে আপনাকে হায়াল। আমারে ও আপনারে হারাল। ঘ্যাঁচ্ ঘচাং, ঘ্যাঁচ্ ঘচাং, ঘ্যাঁচ্ ঘচাং! ওঃ! অ্যাঃ! উঃ! আমার এ দশা হবে কাল ভেবেছিল কে? প্রেমময়ী রাক্ষসী আমারে সাজাত বসি নিতি নব চন্দনতিলকে, কালাগুরু গোরোচনাতিলকে! ঘ্যাঁচ্ ঘচাং, ঘ্যাঁচ্ ঘচাং, ঘ্যাঁচ্ ঘচাং! ওঃ! অ্যাঃ! উঃ!"

কেনারাম হুংকার ছাড়িলেন, "চুপ কর বে-আদব! বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়।"

সুতরাং নিধিরাম দ্বিতীয়বার একবস্ত্রে গৃহ-ত্যাগ করিলেন। দামোদরের ধারে বাড়ির চাকর মতি বাগদী হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া তাঁহার হাতে ছোটো একটা পুঁটুলি দিল। নিধিরাম পুঁটুলি খুলিয়া দেখিলেন একটা ধুতি, একটা কাগজের মোড়কে কোনো দেবতার প্রসাদী শুষ্ক ফুলবিল্বপত্র আর একটি দশ টাকার নোট। মা লেখাপড়া জানিতেন না, তাহার হাতে বেশি টাকাও কোনোদিন থাকিত না। নিধিরামের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। একবার ভাবিলেন ফিরিয়া যাইবেন, অন্ততঃপক্ষে মাকে একবার একটা প্রণাম করিয়া আসিবেন, শেষে ভাবিলেন মতির হাতে মাকে একটা চিঠি দিবেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুই হইয়া উঠিল না, নৌকা পরপারে পৌঁছিল।

আমতা স্টেশনের কাছে সন্ন্যাস জীবনের একটি ভক্তের সঙ্গে দেখা। সে কিছুতেই ছাড়িল না, গৃহস্থ মূর্তি দেখিয়াও তাহার ভক্তি কমিল না। গোয়ালা বাড়ীতে মধুসংক্রান্তির ব্রত উদ্‌যাপন, পুরোহিত আসে নাই, নিধিরামকে অগত্যা মানরক্ষা করিতে হইল। তিনি 'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ হইতে আরম্ভ করিয়া 'তথা মে মাধবীদেবী বিবরম্ দাতুমর্হতি' পর্যন্ত মধুর সঙ্গে সম্পর্কিত যে কটা সংস্কৃত কথা মনে আসিল বলিয়া পূজা শেষ করিলেন। যজমান ব্রাহ্মণের মুখে সংস্কৃত শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজে কিছু মন্ত্র বলিবার তাঁহার বড়ো ইচ্ছা। বলিলেন "আমাকে কিছু বলাবে নে বাবা?" নিধিরাম বলিলেন, আমি সব বলে দিয়েছি তোমার হয়ে, তুমি শুধু দশবার জপ কর "ওঁ মধু, ওঁ মধু।" এমন সময় গোয়ালা-পাড়ার মাতব্বর কেশব ঘোষ উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "ও কি ঠাকুর মশাই, বামুনের ঘরে পৈতে হবার আগে ওকথা কেউ বলতে পারে না, গয়লার মেয়েকে তুমি নরকে ডোবাবে নাকি?" তাও তো বটে! নিধিরাম বলিলেন, "আমি বলেছি বলেই ও-বলতে যাবে কেন? ও 'নমো' বলে বলবে।" অগত্যা গোপগৃহিণী একগলা ঘোমটা টানিয়া বলিলেন, "নমো বধু, নমো বধু।" নিধিরাম বলিলেন, "উঁহু হচ্ছে না, মধু বলতে হবে।" গোপগৃহিণী বলিলেন, "নমো পিস্‌শাউড়ি, নমো পিস্‌শাউড়ি।" নিধিরাম বলিলেন, "ও কি বল?" বাড়ির কর্তা বৃন্দিশ্বর ঘোষ সসংকোচে বুঝাইয়া দিলেন, "আমার পিসির নাম মধুমালা ছিলেন কিনা, ও নামতো ও ধরতে পারবেনে। তা আর কিছু বললে হয়নে?" ভালো বিপদ! নিধিরাম বলিলেন, "শাস্ত্রে আছে 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ,' তা মধুর অভাবে 'গুড়' বললেও ক্ষতি নেই।" তাহার পরদিনই দক্ষিণার টাকাটি খরচ করিয়া নিধিরাম কলিকাতায় পৌঁছিলেন।

কবিতার খাতা খান পাঁচ-ছয় সঙ্গে ছিল আর ছিল তাঁহার 'শূর্পনখা' নাটকখানি। পুরাতন মেসে একটি বন্ধুর অতিথিরূপে উঠিয়া নিধিরাম প্রথমেই এক দিস্তা কাগজ কিনিলেন এবং বাছিয়া বাছিয়া গুটি-কতক কবিতা 'কপি' করিলেন। পরিচিত অতি আধুনিক পত্রিকার মালিকেরা টাকা দেন না, অগত্যা প্রাচীনপন্থী মাসিকপত্র সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইল। শেষে দেখিলেন, ছাপানো যদিই বা সম্ভব হয়,—টাকা দিয়া অতি-আধুনিক কবিতা কিনিবার মতো বেকুব কলিকাতায় পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এই বিংশ শতাব্দীতে অতি-আধুনিক কবিতার অর্থ বুঝিতে চায় এরূপ বেরসিকও দুর্লভ নয়। একজন সম্পাদক তো স্পষ্টই বলিলেন, "কাগজের দাম বেড়েছে, ছাপানোর খরচ তিন গুণ হয়েছে, এখন ওসব অর্থহীন প্রলাপ ছাপবার মতো অবস্থা আমাদের নয়। বাপের টাকা থাকে তো নিজে খরচ করে ছাপান, না থাকে তো উনুন ধরান।"

কয়দিন মেসে থাকিতে পাঁচ টাকা খরচ হইয়া গেল, অগত্যা নিধিরাম পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে থাকার কিছু সুবিধা হয় কিনা দেখিতে বাহির হইলেন। চা'টা, পরোটাটা এক আধ বেলা জুটিলেও রাত্রে থাকিবার স্থান এবং অর্থ সাহায্যের সম্ভাবনা বড়ো দেখা গেল না। বিডন স্ট্রীটে পুরন্দরী ধর্মশালায় তিন দিন কাটাইয়া নিধিরাম নাট্যশালা-গুলিতে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। তাঁহার অতি আধুনিক 'শূর্পনখা'র নাম শুনিয়াই কেহ কেহ

বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছিলেন

মুখ বাঁকাইলেন, একজন পরিচালক দয়া করিয়া বলিলেন, "শেষ অঙ্কটা একটু পড়ুন তো।"

নিধিরাম পড়িলেনঃ "রাবণ—সীতা, সীতা, আমি এসেছি।

সীতা—কে আপনি, কাকে চান? রামলক্ষ্মণ তো বাড়ি নেই, তাঁরা যে সোনার হরিণ ধরতে গেছে।

রাবণ—আমি তোমার ক্রীতদাস লংকেশ্বর রাবণ। সোনার হরিণ আমিই পাঠিয়েছিলেম সীতা, সে তো ধরা যায় না। আমার কাছে ধরা দাও তো আমিই তোমার সোনার হরিণ হব সীতা। আমার স্বর্ণপুরী তোমার হবে, আমি দশ মাথার উপর তোমায় মুকুট করে রাখব—পাকা সোনা দিয়ে মুড়ে।"

পরিচালক বলিলেন, "থাক, আর পড়তে হবে না।" নিধিরাম করুণভাবে বলিলেন, আর একটু শুনুন, "তোমার প্রেম তো চিরজীবী নয় লংকেশ্বর। আমি তো প্রস্তুত কিন্তু" পরিচালক বাধা দিয়া বলিলেন, "ব্যস্ হয়েছে। দেখুন আপনাদের এখনও মায় খাবার মতো তাগদ আছে শরীরে; আমাদের বুড়ো হাড়, ভাঙলে আর জুড়বে না। আমাদের নিয়ে আর কেন টানাটানি করেন।" আর এক জায়গায় এক ভদ্রলোক বলিলেন, "খাতা রেখে যান, সাত দিন পরে আসবেন।" নিধিরাম খাতা রাখিয়া বলিলেন, "দশটা টাকা যদি আগাম দিতেন।" ভদ্রলোক বলিলেন, "হাঁড়ি চড়িয়ে বেরিয়েছেন বুঝি? তবে অন্য জায়গায় দেখুন। নোতুন অথর, টাকা দিয়ে বই নিতে হলে আপনার বই নেব কেন? অনেক খরচ করতে হয়—একখানা বইয়ের পেছনে। দান খয়রাত করবার—"

দুই টাকা হাতে থাকিতে নিধিরাম আবার হাওড়া স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন্ ট্রেনে যাইবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই ঠিক ছিল না। একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন তিনি রাণীগঞ্জে যাইবেন। নিধিরামও রাণীগঞ্জের টিকিট কাটিলেন। পথে অচিন্তিতপূর্ব উপায়ে এক বন্ধু লাভ হইল। গাড়িতে ভিড় ছিল না, নিধিরাম যেদিকে বসিয়াছিলেন তাহার অপর দিকে বাঙ্কের উপর এক ভদ্রলোক বসিয়া বসিয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার নাক অথবা মুখ কোনখান দিয়া 'ঘড়ৎ, ঘড়ৎ' করিয়া একটা শব্দ বাহির হইতেছিল। সহসা ভদ্রলোক আঁ-আঁ করিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া উঠিলেন। অনেকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, দুইজন উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি হল মশাই, কিছু কামড়াল নাকি?" একজন নিশ্চিন্তভাবে পাখা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আরে তোমরাও যেমন। দুঃস্বপন দেখে আঁৎকে উঠেছেন।" ভদ্রলোক কিন্তু উত্তরও দিলেন না, তাঁহার হাঁও বন্ধ করিলেন না, মুখের মধ্যে একটা আঙুল দিয়া কি দেখাইতে লাগিলেন। নিধিরাম ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন, দ্রুতপদে গিয়া মাঝের বেঞ্চের পিঠ রাখিবার জায়গাটার উপর দাঁড়াইয়া এক লাফে বাঙ্কে উঠিলেন এবং ভদ্রলোকের মুখের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়া একটা গুবরে পোকা টানিয়া বাহির করিলেন। পোকাটা ভদ্রলোকের শ্বাসনালীর কাছে পৌঁছিয়া চিন্তা করিতেছিল অজানা অন্ধকারে গর্তের ভিতরে প্রবেশ করা উচিত হইবে কিনা! ভদ্রলোকের চীৎকারে বোধ হয় আর অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিল না, অথচ ফিরিবারও পথ পাইতে-ছিল না। নিধিরাম যখন তাহাকে বাহির করিয়া আনিলেন তখন সে কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতভাবে চুপ করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর একটু আলো পাইতেই 'বোঁও-ও' করিয়া উড়িয়া গেল। ঘরশুদ্ধ লোক হাসিতেছিল; কিন্তু ভদ্র-লোক হাসিলেন না। তিনি নামিয়া আসিয়া নীচের বেঞ্চে নিধিরামের পাশে বসিলেন। বলিলেন, "আপনি আজ আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আপনার নামটি জানতে পারি?" নিধিরাম কুণ্ঠিত-ভাবে বলিলেন, "আপনি অকারণ আমাকে বাড়াচ্ছেন, সামান্য একটা পোকা বার করে"—ভদ্রলোক বলিলেন, "ঐ পোকাটা আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিত। সবাই মজা দেখছিল, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়—"

ভদ্রলোকের নাম কৈবল্য ঘোষ, এল এম এস ডাক্তার। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাড়িতে গিয়ে তিন মাস কাটিয়াছিল মন্দ নয়। সকাল বিকাল একটু ছেলে পড়ানো, কখনো বা ভাদুর গান, কখনো বা সাঁওতালী গান শোনা, কখনো বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কয়লা খনি অঞ্চলের পাহাড়ে জঙ্গলে ভ্রমণ। বাড়ির জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করিত, নিধিরাম সেদিন স্টেশনে গিয়া যাত্রীদের ওঠানামা দেখিতেন। ডাউন ট্রেনগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হইত এই

গাড়িই কিছুক্ষণ পরে হাওড়া পৌঁছিবে।. সেখান হইতে তেলকলঘাট, আমতা, নারীট—মা!—মা বোধ হয় এখন তাহাদের চিলের ছাদে বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতে করিতে তাহারই কথা ভাবিতেছেন।

সেদিন ডাউন ট্রেনটা চলিয়া গেল, অল্প কিছুক্ষণ পরেই একটা আপ ট্রেন আসিয়া স্টেশনে দাঁড়াইল। একখানা ইণ্টার ক্লাশ কামরার জানলার মধ্য দিয়া মুখ বাড়াইয়া কে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"কে, নিধিদা না?" ট্রেন থামিতেই পল্টু নামিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। বলিল, "যাক, বেঁচে আছ তাহলে? সান্ন্যাসী তো হওনি দেখছি! কি করছ তাহলে?" দুই মিনিট ট্রেন থামিল, তাহার মধ্যে পল্টু নিধিরামের মোটামুটি সংবাদ লইল এবং নিজের খবরটাও দিল। রেলের চাকরী পাইয়াছে। 'পাস' পাইয়া পিসিমাকে ও স্ত্রীকে কাশী দেখাইতে চলিয়াছে। পল্টুর পিসি গাড়ির ভিতর হইতেই চোখ মুছিয়া বলিলেন, "বাড়ি ফিরে যা বাবা। তোর মা আর বেশী দিন বাঁচবে না। কেঁদে কেঁদে শয্যে নিয়েছে। দেখা না হলে পরে আফসোস থাকবে বলে দিচ্ছি।" অভিমান বিসর্জন দিয়া নিধিরাম কৈবল্যবাবুর কাছে বিদায় লইয়া সেই রাত্রে ট্রেনেই বাড়ি রওনা হইয়াছিলেন। মার শেষ দিন কয়টা শান্তিতে কাটিয়াছিল, প্রায় দুই মাস ছেলের হাতের সেবা পাইয়া এবং তাহার মুখে 'হরিনাম' শুনিতে শুনিতে তিনি যখন শেষ বিদায় লইলেন সেদিন নিধিরাম শ্মশান হইতে আর বাড়ী ফিরেন নাই। সে আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসরের কথা।

ইতিমধ্যে অনেক ঝড়ঝাপ্টা মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। নিধিরাম কবির দলে গান লিখিয়াছেন, যাত্রার দলে ভর্তি হইয়া অভিনয় করিয়াছেন, কয়লার খনিতে সম্প্রতি মালকাটা এবং বোঝাড়িদের চরাইয়া দিন কাটাইতেছেন। অল্প বেতন, প্রচুর পরিশ্রম, শিক্ষিত লোকের সঙ্গের অভাব, সবই এখন গা-সহা হইয়া গিয়াছে। ম্যানেজারবাবু স্নেহের চক্ষে দেখেন; তিনি দিন কতক কলেজে পড়িয়াছেন এবং এককালে কবিতা লিখিতেন এ সংবাদ খাজাঞ্চিবাবুর মারফত শুনিয়া অবধি তাঁহার কাজের চাপ কমিয়াছে এবং নিমন্ত্রণের বহর বাড়িয়াছে। কাছাকাছি কোন গ্রামে বা কয়লার খনিতে সখের অভিনয় হইলে তাঁহার ডাক পড়ে। তবু মন ভরে না, কিন্তু দিন অন্তর এক একবার মনে হয় বাড়ি ফিরিয়া যাই। কিসের জন্য এই দুর্ভোগ? বকুন, মারুন, নিজের বাবা তো? তিনিও তো দুঃখ কম পান নাই? একবার শেষ দেখা কি হইবে না? সব থাকিতে কেন এমনভাবে অনাথের মতো বিদেশে পড়িয়া থাকা? মনে পড়িল ছয় বৎসরের মধ্যে একটা কবিতা লেখা হয় নাই। কাজ, কাজ। আজ খবরের কাগজটা পড়িয়া নিধিরাম মনস্থির করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; ফিরিবেন কি ফিরিবেন না। বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা অল্প, তবু দেখা প্রয়োজন। জীবনে অর্থের প্রয়োজন আছে, অন্সরের প্রয়োজন আছে। এই কুলি কামীনদের সরল জীবন গল্পের উপকরণ যোগাইবার পক্ষে চমৎকার, কিন্তু শিক্ষিত মানুষের জীবনে ইহার বাহিরের আবহাওয়ার, সংসারের বিচিত্র জটিল সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশেরও প্রয়োজন আছে।

রাত্রি গভীর। একদল বোঝাড়ি ও মালকাটা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে, "চিংড়ি মাছে বড়া ঝিঙায় নিশিল না! দিদিগো, রাগ কোরো না আর এমন করিব না।"

নাঃ, সত্যই মিশিল না। কলেজে পড়া নিধিরাম আজ আর অতি আধুনিক নহেন, তবু তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে সংস্কৃতির যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অদৃশ্য প্রাচীর রচনা করিয়াছে তাহার মধ্যে ছিদ্র রচনা করিয়া আলাপ আলোচনা চলে, কবুলা করা চলে, এক হইয়া যাওয়া চলে না। সেই হলুদ-মাখা হনুমানটার কথা মনে পড়িল। উচ্চ শিক্ষার কয়েক কোটা হলুদে তাঁহাকে তাঁহার দেশের শতকরা নব্বইজনের কাছে চিরদিনের মত পর করিয়া দিয়াছে। নিধিরাম পরদিন সকালেই বাড়ি ফিরিবেন স্থির করিলেন।

* * * *

সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলের মধ্য দিয়া ট্রেন ছুটিয়াছে। পৌষ মাসের সন্ধ্যায় সেদিন সহসা বনকীর্ণ পাহাড়ের মাথায় অকাল বর্ষার ঘননীল মেঘ ঘোরঘটা করিয়া আসিতেছে; বৃষ্টি নামিল বলিয়া। একটা থার্ড ক্লাশ গাড়ির এক প্রান্তে জানালার ধারে ঝুঁকিয়া বসিয়া নিধিরাম তন্ময় হইয়া বহিঃপ্রকৃতির দিকে চাহিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার মনের কপাট খুলিয়া গেল, কয়লাখনির ওভারসিয়ার নিধিরাম নিমেষ মধ্যে পনেরো বৎসর পূর্বের কলেজ জীবনের একটা বিশেষ দিনে ফিরিয়া গেলেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনে গঙ্গার ধারে তাঁহার পাশে বসিয়া একজন সেদিন এমনি

"গরুকা স্থান তো গগনমেই হ্যায়"

বর্ষার ঘনায়মান মেঘের দিকে চাহিয়া একটা গান গাহিয়াছিল। নিধিরামের অন্তরের উদ্বেলিত আনন্দ আর ধৈর্য মানিল না, তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন।

"বাদল মেঘে মাদল বাজে,—বা—জে,
গুরু গুরু গুরু গুরু গগন মাঝে।"

পার্শ্বোপবিষ্ট পশ্চিমা যাত্রীটি এতক্ষণ নীরবে গঞ্জিকা-সেবন করিতেছিলেন, তাঁহার মুখনিঃসৃত ধূম হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই নিধিরামকে প্রথমটা জানালার বাহিরে মাথা বাড়াইতে হইয়াছিল। সহসা তিনি উৎসাহিত হইয়া মাথা নাড়িয়া নিধিরামকে তারস্বরে সমর্থন করিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আপনি ঠিক বোলিয়েসেন বাবুজী, গুরুকা স্থান তো গগনমেই হ্যায়। জো গুরু ওয়হি ভগবান। ইসিলিয়ে তো হামাদের শাস্ত্রে বোলেসে মৎগুরু শ্রীজগৎগুরু।" আপনি ভক্তিমান আদেন, গুরুকৃপা লাভ হোইয়েসে। আপনার মঙ্গল হোবে। সঙ্গে সঙ্গে জলদ মন্দ্রে "জয় গুরু শ্রীগুরু" বলিয়া একটি হুঙ্কার ছাড়িয়া তিনি সসম্ভ্রমে গাঁজার কলিকাটি আগাইয়া দিলেন।

গুরুভক্তির জন্য এত অযাচিত প্রশংসা এবং গাঁজার কলিকা দ্বারা অভ্যর্থিত হইবার এইরূপ অপূর্ব সম্মান লাভ করিয়াও নিধিরাম বিশেষ খুশী হইতে পারিলেন না। সঙ্গী ভদ্রলোকটির বহু উপরোধেও তিনি আর 'গুরু ভজন' করিতে স্বীকৃত হইলেন না। 'ঝরিয়ামে বিউকা ভাও', 'মিট্টিকা তেল' লইয়া কিরূপ জুয়াচুরি চলিতেছে, কয়লা কেন দুষ্প্রাপ্য হইল এই সব গুরুতর আলোচনায় বাকী পথটা কাটিয়া গেল। ভদ্রতার খাতিরে জানা না জানার মধ্যে পার্থক্য না রাখিয়া নিধিরাম সকল কথারই উত্তর দিলেন। ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছিতে নিধিরাম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

সঙ্গে কেবল একটি কাপড়ের পুঁটুলি আর একটি জীর্ণ সুটকেশ। স্টেশনে নামিয়া নিধিরাম অবাক হইয়া গেলেন। লোকের ভিড় চতুর্গুণ, কুলিদের দক্ষিণা চতুর্গুণ, মানুষের হৈ হল্লার সঙ্গে লাউড স্পীকারের চীৎকার, কোন্ ট্রেন কোন্ প্ল্যাটফর্ম হইতে কখন ছাড়িবে তাহার মুহুর্মুহু ঘোষণা সব মিলিয়া তাঁহাকে হকচাইয়া দিল। পুঁটুলিটি বাঁ কাঁধে তুলিয়া এবং সুটকেসটি ডান হাতে ঝুলাইয়া নিধিরাম ভিড় ঠেলিয়া মন্থর গমনে অগ্রসর হইলেন। প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিয়া স্টেশনের প্রকাণ্ড পাকা চত্বরটি পার হইতেছেন এমন সময় একটা প্রমত্ত কণ্ঠের তীব্র তীক্ষ্ণস্বর সহসা তাঁহার কানে আসিল। একটি সুন্দরী সুসজ্জিতা মধ্য বয়সী ধনী বধূ বোধ হয় ট্রেন ধরিবার উদ্দেশ্যে মাথায় আধ ঘোমটা দিয়া দ্রুতপদে সাত নম্বর প্লাটফর্মের দিকে চলিয়াছিলেন সঙ্গে কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক ও বিছানা আর ছাতি বগলে পাকা-গোঁফ ম্লান বেশ শীর্ণদেহ এক বৃদ্ধ,—বোধ হয় বাড়ির সরকার হইবেন। ওদিকের বইয়ের স্টলের দিক হইতে কয়েকজন গোরা সৈনিক রসালাপ করিতে করিতে আসিতেছিল; তাহাদের মধ্যে একজনের বোধ হয় অতিরিক্ত রসাধিক্য হইয়াছিল; মদের ঝোঁকে টলিতে টলিতে সে সঙ্গীদের ছাড়াইয়া অগ্রসর হইল এবং বধূটির কয়েক হাত দূরে দাঁড়াইয়া হাঁক দিল, "এইই, ইডার আও।" ধনীবধূ এবং তাঁহার সরকার থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, গোরা আবার হাঁকিল, "ইউ ব্লাডি, কুইক্, কুইক্, টোনারা বিবি কা জলদি লাও।" বধূ প্রস্তর প্রতিমার মতো নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, সরকার সভয়ে বলিলেন, "ও বৌমা, ডাকছে যে গো, যাওনা?" বধূ অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে তাকাইয়া হন হন করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। স্খলিত চরণে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে করিতে সাহেব হুঙ্কার ছাড়িল, "এই টোম যাটা কাঁহা বাট শুনটা নেহি। সরকার ভীতভাবে বলিতে বলিতে চলিলেন, "ও বৌমা, বলি সায়েব রাগ করচে যে গো একবার গেলে হোতুনি?" অন্য গোরাগুলো দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল, চতুর্দিকে কম করিয়া পঞ্চাশজন বাঙালী সন্তান দাঁড়াইয়া এই দৃশ্যটি উপভোগ করিতেছিলেন। নিধিরাম দ্রুতপদে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "আর এক পা এগোলেই মারব ঘুষি।" সাহেব অবাক হইয়া বলিল, "ঘুষি কিস্‌কো বোলটা?" নিধিরাম সুটকেস পুঁটুলি মাটিতে ফেলিয়া বলিলেন, "নাকমে পড়নেসে মালুম হোগা। আর যদি এক পা এগোয়গা সায়েব, তো বাবার নাম ভুলিয়ে দেগা।" বলিয়া আস্তিন গুটাইলেন। সাহেব অধিকতর

বক্সা ক্যাম্প • অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

নদী যখন পর্বতগুহা ছাড়িয়া বাহির হয়, তখন হাতে কোন ম্যাপ লইয়া বাহির হয় না। ডাহিনে বামে তটের ধাক্কায় তার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলে এবং এইভাবেই একদা সমুদ্র-মোহানায় এ-যাত্রা সমাপ্ত হয়। নদীর সঙ্গে মানুষের এই বিষয়ে হুবহু মিল রহিয়াছে। মানুষের মধ্যেও এমনি একটি প্রাণ-প্রবাহ বর্তমান, সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহারও জীবন-পথ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

নদীর জীবন-যাত্রা সমুদ্রে শেষ হয়, মানুষের যাত্রা কোন্ সমুদ্রে শেষ হয়? উত্তম প্রশ্ন। নদী তো পর্বত গুহা হইতে নির্গত হয়, মানুষের আদি উৎস-গুহাটি কি? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারিলে, মানুষের যাত্রা কোন্ সমুদ্রে শেষ হয়, আপনাদের এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে আমিও প্রস্তুত আছি, তার পূর্বে নহে। অর্থাৎ, আপনার আদি আগে আপনি আবিষ্কার করুন, আপনার অবসানও তখন আপনি জানিতে পারিবেন।

পৃথিবীতে ঠ্যাঁটা মানুষের অভাব নাই, কেহ কোন কিছু বলিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে, খুঁত ধরিতে তারা যেন এক পায়ে খাড়া হইয়াই থাকে। তাহারা বলিবে যে, নদীর সঙ্গে মানুষের মিলটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, নদীর হাতে ম্যাপ নাই সত্য, কিন্তু মানুষের কপালে দুই দুটা চক্ষু আছে। অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধি আছে, তার আলোতেই সে জীবনের পথ দেখিয়া লইতে ও চলিতে পারে।

কথাটা শুনিতে নিশ্চয় বুদ্ধিমানের মত, কিন্তু ইহাকেই বলা হয় পল্লবগ্রাহী বুদ্ধি। বুদ্ধির আলোতে পথ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, কথাটা মানিয়া লইয়া একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। মোটরেরও তো সামনে আলো থাকে, সে-আলোতে পথ দেখে কে? নিশ্চয় মোটর গাড়িটা নয়। এই আলোতে পথ দেখে গাড়ির চালক। মানুষের চালক কে? যাক্, নদীর ক্ষেত্রে যার নাম দেওয়া হইয়াছে গতি, মানুষের বেলা তার নামই প্রাণ-প্রবাহ বা স্ব-ভাব। এই স্ব-ভাবটিই বহির্জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে বিশেষ অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত হইয়া চলে।

এত কূটকচালে আমাদের আবশ্যক নাই। কোন কিছুকেই আকার দিতে হইলে হাতুড়ীর আঘাত দিতে হয়, নইলে তাহা অর্থহীন একটা বস্তুপিণ্ড থাকিয়া যায় মাত্র। মানুষের স্বভাবটিকেও বিশেষ মূর্তিতে বা ব্যক্তিত্বে রূপ দিতে তেমনি আঘাত আবশ্যক, সংসারে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতই সেই হাতুড়ীর আঘাত। এই রকম একটি আঘাতেই বক্সাক্যাম্পে আমার স্বভাবের একটা দিক সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। ব্যাপারটা এই—

তখন আমি পাঁচ নম্বর ব্যারাকের বাসিন্দা, পরে তিন নম্বরে উঠিয়া আসিয়াছিলাম, আমার পাশের সীটে আছেন শরৎবাবু, যিনি সিউড়ী হইতে এতাবৎ জোঁকের মত আমার সঙ্গে লাগিয়াই ছিলেন। বিকালের দিকে বিছানায় চীৎ হইয়া একটা বিদেশী উপন্যাস পাঠ করিতেছিলাম, বেশ জমিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু রসভঙ্গ-দূতের অভাব কোনকালে কোথাও হয় না, এ-ক্ষেত্রেও হইল না।

শরৎবাবুর সীটে বসিয়া ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা শরৎবাবুকে 'কম্যুনিজম্' বুঝাইতেছিলেন। থাকিয়া থাকিয়া কানে আসিতেছিল, 'ক্লাশলেস্ সোসাইটি।' মন বিগড়াইয়া গেল। রস-ভোগে বা সম্ভোগে যারা বাধা দেয়, তাদের সম্বন্ধেই তো আদি-কবির শাশ্বত অভিশাপ, 'মা নিষাদ—।' আমিও অভিশাপ প্রদান করিলাম।

আধুনিককালের ভাষায় চিরকালের অভি-শাপকে তর্জমা করিয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা মানে রূপ দিলাম—"Your classless Society is an Utopia."

অর্থাৎ, শ্রেণীহীন সমাজ শুধু আকাশ-কুসুমই নহে, সেই খ-পুষ্পেরই স্বপ্ন তাহা।

ব্যস্, শুরু হইয়া গেল, যাকে বলে তর্ক-যুদ্ধ। যুদ্ধের দর্শকসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইল এবং যুযুধান ব্যক্তিরাও দুইভাগ হইয়া দুইপক্ষে যোগ দিলেন। লড়াইটা প্রথম দিনে শেষ হইল না; পরদিন আবার বিকালে টিফিন-শেষে এইখানেই তর্কসভা বসিবে, সাব্যস্ত হইল। পর পর চারদিন এই তর্কসভার অধিবেশন হয়, পরে ইহা পরিত্যক্ত হয়।

ডাঃ শর্মার পক্ষে যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন 'কালীমোহন সেন, করাচীর বুখারী, মণি সিং, রেজাক সাহেব; ইঁহারা সকলেই কমরেড। আমার পক্ষে যোগ দিলেন সন্তোষ গাঙ্গুলী ও সুরপতি চক্রবর্তী। নেতারাও আসিয়া আসরে আসন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু যুদ্ধে যোগ দিতেন না।

ইহার পরেই ক্যাম্পে কম্যুনিস্ট সাহিত্য চর্চার ধুম পড়িয়া যায়। নিত্য মোটা মোটা ইংরেজী বই ক্যাম্পে আসিতে লাগিল। এবার-কার বন্দীশালাতেই বাঙলার রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে কম্যুনিজম প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ লাভ করে এবং সমর্থক সংগ্রহ করে। আন্দামানেও ঠিক এই একই ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়াছিল, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিপ্লবী বন্দীরাও অবশেষে কম্যুনিস্ট দলে নাম লিখাইয়াছিলেন। বাঙলায় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রকৃত শক্তি জেলেই সংগৃহীত হইয়াছিল।

শ্রেণীহীন সমাজকে তো স্বপ্ন বলিয়া মন্তব্য করিয়া বসিলাম, কিন্তু কোথাকার জল কোথায় গিয়া গড়াইল, তাহাই ভাবি। উক্ত স্বপ্ন আজও স্বপ্নই আছে এবং স্বপ্নই থাকিবে, কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টিটা কিছু আর স্বপ্ন নয়, তাই কমরেডের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, ইহারা আগে কম্যুনিস্ট হয়, পরে কম্যুনিজম গ্রহণ করে। জেলখানাতে যতটুকু দেখিয়াছি, তাহা হইতেই এই ধারণা আমার হইয়াছে। পিতা হিন্দু হইলে যেমন সন্তানসন্ততিরা হিন্দু হয়, কোন দল বা উপদলের নেতা কম্যুনিস্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুবর্তিগণেরও ধর্মান্তর ঘটিয়া থাকে। আমার বিস্ময়ই বোধ হইত যে, ইহা কী চরিত্র? আগে কম্যুনিস্ট হওয়া পরে কম্যুনিজম গ্রহণ! এ যেন আগে মুসলমান হইয়া পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ।

সেদিন আমি তর্কযুদ্ধে কি বক্তব্য ও মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তাহা আজ আর স্মরণ নাই। শুধু এইটুকু বিশেষভাবে স্মরণ আছে যে, আমার সমগ্র অস্তিত্ব কম্যুনিস্ট মত-বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ আমার স্বভাবের উপর এই ঘটনা হাতুড়ী-আঘাতের কাজ দিল, দেখিলাম স্বভাবটি আমার বিশেষ মূর্তি পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে। আমি কম্যুনিজমের শুধু প্রতিবাদী নহি, ঘোর বিদ্বেষীই হইয়া উঠিলাম।

কোন মতবাদের প্রতি বিদ্বেষ দ্বারা চরিত্রের নেতিবাচক দিকটাই শুধু ব্যক্ত হয়, চরিত্রের নিজস্ব স্বরূপটি তাহাতে ব্যক্ত হয় না।

আমার স্বভাবের নেতিবাচক দিকটাও এক-দিন এইভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই সাহিত্যসভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করিবার ভার আমার উপর পড়ে। প্রবন্ধটির আরম্ভ ও উপসংহার দুইই আমার আজও স্মরণে আছে।

একেবারে সংস্কৃতের ভোঃ ভোঃ বা শৃণ্বন্তু স্টাইলে সে প্রবন্ধ আরম্ভ করিলাম—"আমি আছি, ইহা প্রমাণের অপেক্ষা করে না, আমি স্বয়ংসিদ্ধ।"

তারপর এই 'স্বয়ংসিদ্ধকে' তাড়া করিয়া যে শেষে বা পরিণতিতে গিয়া খতম করিলাম, তাহার নাম 'সচ্চিদানন্দ।' লিখিলাম, "আমি

আছি, তাই আমার এক পরিচয় 'সৎ'; আমি জানি, তাই আমি 'চিৎ' এবং ইহাই আমার আনন্দ।" এই তিনটিকে 'আমি' নামক স্বয়ংসিদ্ধ-পাত্রে ঠাসিয়া মিশ্রিত করিয়া অংকশাস্ত্রের যোগফলে যাহা পাওয়া গেল, তাহাই সচ্চিদানন্দ।

লিখিবার আগে সত্যই আমি জানিতাম না কি লিখিব। লিখিয়া তবে জানিতে পারিলাম কি আমার প্রকৃত বক্তব্য। অর্থাৎ আমার স্বভাবটি আমার কাছে এই ঘটনায় ঈষৎ বিদ্যুৎ-চমকে ক্ষণিকের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম প্রকাশেই আমি আমার স্বভাবের সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ সেদিন করিতে সমর্থ হইলাম।

যেন যুদ্ধে জয় করিয়াছি, এমনই মুখ-চোখের ভাব লইয়া সাহিত্য-সভা হইতে নির্গত হইলাম। প্রবন্ধটিতে ক্যাম্পের চিন্তাশীল মহলে নাকি একটু আন্দোলনও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু আমার বন্ধুরাই আমাকে পথে বসাইয়া দিল। ইহা না হইলে বন্ধু!

ফণী (মজুমদার) জিজ্ঞাসা করিল, "যা লিখিস, তা তুই বুঝিস?"

শোন কথা! আমার কথার অর্থ নাকি আমি জানি না। আমি কি ব্যাসদেবের স্টেনোগ্রাফার সেই গণেশ কেরানী যে, শুনিয়া তবে লিখিতে হইবে? অর্থাৎ, ফণীর কথার সোজা মানে এই যে, আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা গিলিত-চর্বণ মাত্র। ইহা যদি গিলিতচর্বণ হইয়া থাকে, তবে গলাধঃকরণ ব্যাপারটি নিশ্চয় আমি জন্ম-জন্মান্তরে সারিয়া রাখিয়াছি, এই জীবনে তাই শুধু চর্বণের অধিক পরিশ্রম আমার অদৃষ্টে লেখা হয় নাই। যত যুক্তিই দেই না কেন, মনে মনে কিন্তু দমিয়া গেলাম।

মোক্ষম ঘাই মারিল কালীপদ (গুহরায়)। সাহিত্য সভা হইতে ব্যারাকে ফিরিয়া আসিতেই সে ডাক দিয়া বসিল, "এই অনুলোম-বিলোম।"

অমলেন্দু নামটা যে কারণে অনুলোম-বিলোমে রূপান্তরিত হইল, তাহাতেই আমাকে একেবারে ফাটা ফানুস বানাইয়া ছাড়িল, আমি একেবারে চুপসাইয়া গেলাম।

পরে কিন্তু দেখিতে পাইলাম যে, অঙ্গারকে জলে শত ধুইয়াও তার কালো রং ছাড়ানো চলে না, আমার স্বভাবের ঐ রংটিও তেমনি আমাকে পরিত্যাগ করিল না। "আগুন দিলে কালো অঙ্গারও অবশ্য অগ্নিবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু মানুষের স্বভাবে আগুন লাগিতে পারে, সে আগুন কোথায়?

দুর্গে পড়া-শুনার ধুম লাগিয়া গিয়াছিল, সকল পার্টিতেই ঘরে ঘরে ক্লাস বসিত। আলাপ আলোচনা, পড়াশুনা, বাদ-প্রতিবাদ ইত্যাদিতে বক্সা ক্যাম্পের চিন্তাজগতে ঝড় লাগিল। আমিও আমার কম্বল-ঘেরা বারান্দায় ঘরে অধ্যয়নে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আমার পাঠ্য দেশী-বিদেশী গল্প-উপন্যাস সাহিত্যের চৌহদ্দীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। সকলে যখন বুদ্ধি ও চিন্তার খোরাক সংগ্রহে ব্যস্ত, আমি তখন রস-সম্ভোগে মগ্ন।

সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি হইতে আমি আমাকে নিরাপদ দূরত্বে সরাইয়া রাখিলাম, কারণ চাণক্য বলিয়া দিয়াছেন, 'শতহস্তেন—'। 'ইজম'কে আমি সেই "শত-হস্তেন"-এর তালিকায় ফেলিয়া দূরেই রহিলাম বটে, কিন্তু তাহারা দূরে রহিল না, আগাইয়া আসিয়া আক্রমণ করিল।

বক্সা ক্যাম্পে তিন নম্বর চৌকায় যাহারা নাম লিখাইয়াছিল, তাহাদের প্রধান দলটির নাম ছিল "রিভোল্ট পার্টি"। যুগান্তর ও অনুশীলন হইতে ইহারা সরিয়া আসিয়াছিল। বক্সা-ক্যাম্পের চিন্তারাজ্যে যে আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, এই দলের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহাকে বিশেষ একটি বাস্তব মূর্তি দিবার জন্য ব্যস্ত ও কর্মতৎপর হইলেন।

একদিন আমার ডাক পড়িল। কম্বলের ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া বিজুর (চ্যাটার্জি) কক্ষে প্রবেশ করিলাম। গিয়া দেখি প্রতুলবাবু (ভট্টাচার্য), বিনয়বাবু (রায়), খাঁ সাহেব, পঞ্চাননবাবু, বোধহয় যতীনদাও (ভট্টাচার্য) উপস্থিত রহিয়াছেন।

আসন গ্রহণ করিয়া স্বভাবসুলভ চাপল্যে দাঁত বাহির করিয়া বলিলাম, "বাবা, এ যে দেখছি হাইকম্যান্ড মিটিং! আমাকে তলব কেন?"

কেনটা বুঝাইবার ভার প্রতুলবাবু গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার বক্তব্য যতই পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, আমার দুই ভুরু ততই কুঞ্চিত হইয়া আসিতে লাগিল। অর্থাৎ, আমিও চিন্তাশীল বা চিন্তিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। টের পাইলাম, আমার স্বভাবের গাত্র হইতে চাপল্য বহির্বাসের ন্যায় পরিত্যক্ত হইল, আমার সত্তার সমস্ত শক্তি লইয়া আমি গম্ভীর হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রতুলবাবুর মোট বক্তব্য এই যে, নিজেদের মধ্যে দীর্ঘদিন আলাপ-আলোচনার পর তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, অন্ততঃ সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটি পার্টি গঠন বক্সা-ক্যাম্পেই করিয়া লওয়া উচিত। সকলেই সম্মত হইয়াছেন। অবশেষে মাস্টার মশায়ের (অধ্যাপক যতীশ ঘোষ) নিকট যাওয়া হয়। তিনি সমস্ত শুনিয়া শেষে নাকি মন্তব্য করিয়াছেন, "অমলেন্দুকে জিজ্ঞেস কর গিয়ে।" অর্থাৎ, আমার মতামত না-জানা পর্যন্ত, তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করিবেন না, কিংবা আমি যদি এই পার্টিগঠনে সম্মত হই, তবে তাঁহার দিক দিয়াও কোন আপত্তি থাকিবে না।

প্রতুলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি কি বলেন?"

আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "Misuse of energy, শক্তির অপচয়।"

যেন বোমা মারিয়া বসিয়াছি, এমনই মুখের ভাব উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের দেখিতে পাইলাম। দেশের স্বাধীনতার দেখা নাই,' অথচ মতবাদের মোহে বা লড়াইতে ইঁহারা আকৃষ্ট হইয়াছেন, এই মনোভাবটিই উক্ত ইংরেজী শব্দ কয়টিতে ব্যক্ত হইল। ইহাকে ভর্ৎসনাও বলা চলে।

বেশী বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়া সংক্ষেপে বলিলাম, "না, এখন পার্টি গঠন হতে পারে না, অন্তত জেলে তো নয়ই। এ পণ্ডশ্রম করবেন না।" বলিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

কম্বলের ঘরে আসিয়া ডেক চেয়ারে কাৎ হইলাম। প্রথমেই মনে হইল, কোথাকার জল কোথায় গড়াইয়া চলিয়াছে!

দ্বিতীয় যে-কথাটি মনে জাগিল, আমার জীবনেরই তাহা মারাত্মক প্রশ্ন। এই প্রশ্নটিই ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের প্রধান ও একমাত্র প্রশ্ন হইয়া দেখা দিয়াছিল বছর তিনেক পরে, তখন আমরা রাজপুতানার মরুভূমিতে দেউলী ক্যাম্পে। এই প্রশ্নটির ধাক্কায় আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। স্বীকার করিতে দোষ নাই যে, এই প্রশ্নের যে-পরিণতি আমার জীবনে দেখা গেল, তাহাতে আমার জীবনের ভারকেন্দ্রই উৎপাটিত হইয়া স্থানান্তরিত হইল। এতদিনের আমিটা অকস্মাৎ তাহার আজন্ম নিবাসটি ত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে ঘর বাঁধিল। প্রশ্নটির ইহাই হইল পরিণাম, তাই ইহাকে আমি মারাত্মক প্রশ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

ডেক চেয়ারে কাৎ হইয়া আছি, মুখে সিগারেট, চোখ বুজিয়া টানিয়া যাইতেছিলাম। কোথাকার জল কোথায় গড়াইয়া চলিয়াছে, আমার বন্ধুদের রাজনৈতিক জীবন-ক্ষেত্র সম্বন্ধেই এই মনোভাব আমার টের পাইলাম। তারপর দেখি যে, আমার ব্যক্তিগত জীবনক্ষেত্রেও এই জল গড়াইবার সূত্রপাত শুরু হইয়াছে।

মনের গভীর হইতে প্রশ্ন বাহির হইয়া আসিল, 'কে তুমি? কতটুকু তুমি জান শুনি যে, এতগুলি লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মত প্রকাশ কর? কতটুকু তুমি দেখিয়াছ যে, পথ দেখাইতে যাও? সামান্য ছোট্ট একখানা হাত-চাপা দিলে যার দৃষ্টি অন্ধ হয়, পরের মুহূর্তে কি ঘটিবে যে জানে না, সে কোন্ জোরে ও কোন্ বুদ্ধিতে এমনভাবে 'হাঁ' বা 'না' নির্দেশ দেয় শুনি? নিজের জীবনের পথেই যে নিজে অন্ধের মত পা দিয়া পথ পরীক্ষা করিয়া চলে, সে কেন এবং কেমনে পথ দেখায় বলিতে পার?

সত্তার গভীরে কোথায় আমার যেন ফাটল ধরিয়াছে, তাই এই অপরিচিত অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন

বাহির হইয়া আসিল। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি? কস্ত্বং?"

ইহাকেই বলে কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হওয়া। আমার জীবনে অভিশাপ ছিল, তাই সাপ বাহির হইয়া আসিল।

গভীর রাত্রে পঞ্চাননবাবু আমার কম্বলের ঘরে ঢুকিলেন। পঞ্চাননবাবু আমার আবাল্য-সুহৃদ। স্কুলে নীচের ক্লাশে থাকিতেই আমরা কয়েক বন্ধু এই বিপ্লবের যাত্রাপথে বাহির হইয়াছিলাম, সে ১৯১৪।১৫ সালের কথা। তারপর দীর্ঘদিন একত্র চলিয়া আসিয়াছি। আমাদের জীবন যেদিন শেষ হইবে, সেদিনও একই পরিণামে আমরা একত্র অবসান লাভ করিব, বিধাতার এই নির্দেশ আমরা যেন না শুনিয়াও শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমরা জানিতাম যে, আমাদের জীবনের আরম্ভ একত্র, যাত্রাও একত্র এবং অবসানও এক সঙ্গে।

পঞ্চাননবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এত চটে গেলি কেন?"

বন্ধুর প্রশ্নে ভিতরে ঝড় জাগিল, সংযম হারাইয়া ফেলিলাম।

বলিলাম, "তুমি জান না পঞ্চাদা, আমার সমগ্র অস্তিত্ব বিদ্রোহী হয়ে উঠে। রাশিয়াতে বিপ্লব করেছে, গভর্নমেণ্ট হস্তগত করেছে, বেশ বুঝি আমি। বিপ্লবের শিক্ষা তাদের কাছে নিতে আমি প্রস্তুত আছি, কেমন করে দল গঠন করতে হয়, বিপ্লব প্রচার করতে হয়, সবই আমি তাদের কাছে শুনতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু, একটা রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করেছে বলেই যে, সেই জোরে জীবন সম্বন্ধে, জীবনের অর্থ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার অধিকার তার জন্মেছে, এ আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। হাতে গভর্নমেণ্ট পেলেই যে মানুষকে তার জীবনের অর্থ সম্বন্ধে পথ নির্দেশের অধিকারও তার হবে, একে আমি বেআদপী মনে করি। জীবনের অর্থ যদি বুঝতে চাই, তার জন্য মরে গেলেও আমি মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিনদের কাছে যেতে রাজী নয়। জান, চোখ বুজলে আমি কি দেখি? দেখি কম করেও তিন হাজার বৎসর এই দেশের বোধিবৃক্ষতলে, গুহায় গহ্বরে, পর্বতে প্রান্তরে সাধকশ্রেণী ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। তিন হাজার বৎসর, ধারাবাহিক এই ধ্যানের সত্যানুসন্ধান। আমি যাব জীবনের অর্থ জানতে এই ক্ষণিকের বুদ্বুদ মার্কস ও লেনিনের কাছে? তুমি জান না, আমার সমস্ত অস্তিত্বে কী জ্বালা ধরে এই অর্বাচীনদের আস্পর্ধায়, অনধিকার চর্চায়। আমি ঋষির দেশের মানুষ, আমি বুদ্ধ-শংকর-চৈতন্যের সাধনার উত্তরাধিকারক্ষেত্রের অধিবাসী, আমি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মানসভূমির বাসিন্দা। সমস্ত পৃথিবীও যদি তোমার কম্যুনিস্ট হয়, তবু আমি বলব যে, গোল্লায় যাও, আমাকে বিরক্ত করো না।"

ইহাই ছিল আমার মনোভাব। হিমালয়ের ক্রোড়ে বসিয়া গভীর নিশীথ রাত্রে সেদিন আমার সত্তার সমস্ত আবেগ আমি বন্ধুর নিকট অবারিত করিয়া দিয়াছিলাম। এই আত্ম-মোক্ষণে মনটা শান্ত হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি বল?"

পঞ্চাননবাবু ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "যাহা সত্য, তাহা আমার একান্ত আপন ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে আমি মাথাব্যথা করি না, বাদপ্রতিবাদও করি না। দেশের স্বাধীনতা চাই, তা যেভাবে যে-পথেই আসুক, তাতেই আমি প্রস্তুত। আমার নিজের কথা এর মধ্যে কিছু নাই। কম্যুনিস্ট হলেই যদি স্বাধীনতা আসে, আমি তাতেও প্রস্তুত। এই আমার সোজা হিসাব। আমার সত্য-মিথ্যার হিসাব আমি এর সঙ্গে জড়াইনে।"

গভীর রাত্রে উভয়ের নিকট উভয়ের হৃদয়ের দ্বার কৈশোর দিনের মতই আর একবার আমরা উদ্ঘাটিত করিয়াছিলাম। হিমালয় এই হৃদয়োদ্ঘাটনের মৌন সাক্ষী রহিল।

(ক্রমশ)

গত ৩১শে জানুয়ারী দিল্লীতে কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের পরিচালক-মণ্ডলীতে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম বলিয়াছেন,—ভারত-রাষ্ট্রের খাদ্য সমস্যার সমাধান করিবার জন্য প্রদেশসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে এক পঞ্চবার্ষিকী খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল। ঐ পরিকল্পনায় ৫ বৎসরে ভারত-রাষ্ট্রের খাদ্যোপকরণ ৩০ লক্ষ টন বর্ধিত করা স্থির হয়। ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দের উৎপাদন অপেক্ষা পর বৎসর ৯ লক্ষ টন অধিক উৎপাদিত হইবার কথা—

মাদ্রাজ	৫,২৯,০০০ টন
বোম্বাই	৫৭,০০০ "
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৬৩,০০০ "
যুক্তপ্রদেশ	২,১৬,০০০ "
বিহার	১৮,০০০ "
উড়িষ্যা	১২,০০০ "
আসাম	৯,০০০ "

পাঞ্জাব ও বাঙলা বিভক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব অর্থাৎ ঐ প্রদেশদ্বয়ের ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অংশদ্বয় উৎপাদন বৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট কথা বলিতে পারেন নাই—কারণ ঐ প্রদেশদ্বয়ে অবস্থা অস্বাভাবিক ছিল। খৈল, রাসায়নিক সার, 'কম্পস্ট', সবুজ সার, হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া এবং পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতির দ্বারা সেচের ব্যবস্থা করিয়া এই উৎপাদন বৃদ্ধি হইবার কথা। উৎকৃষ্ট বীজ দেওয়াও উপায়ের মধ্যে ছিল। এই জন্য কেন্দ্রী সরকারকে মাত্র এক কোটি টাকা দান বা ঋণ হিসাবে দিতে হইয়াছিল।

মধ্যপ্রদেশে ফল নির্ধারণোপযোগী হইয়াছে—আসামের ও উড়িষ্যার ফলও উল্লেখযোগ্য। বীজ, অপচয় প্রভৃতি বাবদে উৎপন্ন শস্যের শতকরা সাড়ে ১২ ভাগ বাদ দিলে দেখা যায়, মধ্যপ্রদেশে যে স্থানে লোকপ্রতি উৎপাদন ১৮ আউন্সের এবং আসামে ১৫ আউন্সের অধিক হইয়াছে, সে স্থানে পশ্চিমবঙ্গে ১৪ আউন্সের সামান্য অধিক হইয়াছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন যত অধিক তত আর কোথাও নহে। হরিণঘাটায় ক্ষেত্র রচনা করা হইয়াছে, তাহাতে ব্যয়িত প্রায় এক কোটি টাকায় লোকের কোন উপকার হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডক্টর শিক্কার কার্যের আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। তিনি যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা-ব্যবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে পারেন নাই, তাহা কি সরকার অস্বীকার করিতে পারিবেন?

আচার্য কৃপালনী যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিবেচ্য। গত ৩০শে জানুয়ারী তিনি কলিকাতায় এক সভায় বলেন,—রাজনীতিকরা যদি কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তবে অনেক দুঃখের অবসান হয়—

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ আমরা আবশ্যক দ্রব্যের অভাব অপেক্ষা দ্রব্য বণ্টনে সাধুতার অভাবে অধিক কষ্ট পাইতেছি। ......যিনি ক্ষমতা পরিচালন করেন, তিনি যদি মন্দিরে বা উপাসনা গৃহে না যাইয়া আপনার কার্যালয়কে মন্দির বলিয়া মনে করেন এবং সামাজিক জীবনে ও রাজনীতিক কার্যে ধর্মাচরণ করেন, তবে ভারতবর্ষে দুর্নীতি আর থাকিবে না।"

বাংলায়—বিভাগের পূর্বে দুর্নীতি কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে ও শাসন বিষয়ক রিপোর্টে দেখা গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি কথা

বলিব। শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় সরকারী চাকরীতে নানা উচ্চপদ অধিকার করিয়া বাংলা সরকারের দুনীতিদমন কার্যের ভার লইয়া অবৈতনিক ভাবে সে বিষয়ে আবশ্যক অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট রচনা করেন। তাঁহার রিপোর্ট ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সরকারের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন কাজই হয় নাই। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "The red-tape proved, as always, a steriliser". রিপোর্টখানি সরকারের দপ্তরে কীটদষ্ট হইতে থাকে, তাহা প্রকাশ করা তো পরের কথা, বিবেচিতও হয় নাই। শেষে বিজয়বাবু কোন প্রকাশককে উহা প্রকাশের অনুমতি দেন। আমরা বিজয়বাবুর রিপোর্ট পাঠ করিয়াছি এবং আমরা মনে করি, এই রিপোর্টের আলোকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থা-ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া লোকমত গঠন জন্য সমিতি গঠন করিলে ভাল হয়। ইংরেজের আমলে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এইরূপ কাজ করিতেন। এখন তাঁহারা "শিশু-রাষ্ট্রের" অনিষ্টাশঙ্কায় রাষ্ট্র-চালকমাত্রেরই কাজের সমালোচনায় বিরত।

যে সময় পাকিস্তানের বড়লাট খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকায় আসিয়া হিন্দুদিগকেও পাকিস্তান রাষ্ট্র দৃঢ় করিতে বলিয়াছেন, সেই সময় ঢাকা হইতে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর বাড়ী বলপূর্বক অধিকারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা শহরে ৪৮নং মালাকরতলার শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দাসের বিধবা শ্রীমতী যামিনী-সুন্দরী দাসী জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদনে জানাইয়াছেন, তাঁহার গৃহটি দ্বিতল। তিনি পুত্রকন্যাদিসহ দ্বিতলে থাকেন—নিম্ন-তলে কয়জন হিন্দু ভাড়াটিয়া থাকেন—সেণ্ট গ্রেগরী স্কুলের শিক্ষক শ্রীমদনমোহন গঙ্গো-পাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম। মদনমোহনবাবু নিম্নতলস্থ মন্দিরের গোপাল বিগ্রহের পূজাও করেন। ঐ বিগ্রহ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। কিছুদিন পূর্বে তিনি সমগ্র গৃহ মদনমোহনবাবুর হেপাজতে রাখিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। গত ১৭ই জানুয়ারী তারিখে মদনমোহনবাবু যখন বিদ্যালয়ে ছিলেন, সেই সময় জালাল হোসেন চৌধুরী নামক এক মুসলমান গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বিতলে কয়টি ঘর অধিকার করে। মদনমোহনবাবু পরদিন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিলে তিনি আদেশ দেন—"অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং অভিযোগ সত্য হইলে বে-আইনী ভাবে প্রবেশকারী জালাল হোসেনকে বাহির করিয়া দিতে হইবে।" কিন্তু পুলিশ কিছুই করে নাই। পুলিশ-কনস্টেবল শ্রীমনোরঞ্জন দাসও নিম্নতলে একজন ভাড়াটিয়া। গত ২৬শে জানুয়ারী মনোরঞ্জন যখন রাত্রিতে কাজে বাহিরে ছিল, তখন জালাল হোসেন তাহার ঘরের দ্বার ভাঙিয়া তাহাতে প্রবেশ করে—ভাড়াটিয়াদিগকে গালি দেয়—মনোরঞ্জনের স্ত্রীকে ঠেলিয়া দেয় ইত্যাদি এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বাড়ীতে বিষ্ঠা ছড়ায় ও মন্দিরদ্বার ভাঙিয়া স্বর্ণালঙ্কারসহ গোপাল বিগ্রহ চুরি করে। অভিযোগকারিণী গত ২৮শে জানুয়ারী ঢাকায় ফিরিয়া সকল বিষয় অবগত হন। তাঁহার পুত্র মৃত্যুপণ করিয়া প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে ইসলাম রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর অবস্থা কিরূপ তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ভারত সরকারের ২ জন বাঙালী মন্ত্রী আছেন—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী। শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার তাঁহাদিগকে জানান, পাকিস্তানে বস্ত্র প্রেরণ করিতে না পারায় মাদ্রাজে তন্তুবায়-গণ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে—তাহাদিগের অনেক কাপড় জমিয়াছে। তাঁহার কথায় উক্ত মন্ত্রিদ্বয় ৩ মাসের জন্য পাকিস্তানে হাতের তাঁতের কাপড় রপ্তানি করিবার অনুমতি দিতে সম্মত হইয়াছেন। সেই সংবাদে সাহস পাইয়া অধ্যাপক রঙ্গ বলিয়াছেন—

(১) ভারত সরকার বিনাশুল্কে লুঙ্গী রপ্তানির অনুমতি প্রদান করুন;

(২) ভারত-রাষ্ট্রে তন্তুবায়গণ যে বস্ত্র বয়ন করিবেন, তাহার অর্ধেক যেন লুঙ্গী হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লোক বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছে। পাকিস্তানে তাঁতের কাপড় রপ্তানি করিতে সম্মতি দিবার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে সেই কাপড় মাদ্রাজ হইতে অবাধে রপ্তানি করিবার ব্যবস্থা করিবেন কি?

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সার প্রয়োজন, তাহা যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনই দুর্মূল্য হইতেছে কেন? একথা কি সত্য যে সালফেট অব এমোনিয়ার মূল্য গত ১০ মাসে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে?

(১) গত মার্চ মাস পর্যন্ত কেবল বিদেশী মাল পাওয়া যাইত, তখন দর প্রতি টন ২ শত ৯৫ টাকা ছিল;

(২) গত ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত ভারতীয় মালও আমদানী হয়; তখন স্বদেশী ও বিদেশী উভয়বিধ মালের দর প্রতি টন ৩ শত ৬ টাকা ছিল;

(৩) গত জুলাই হইতে নবেম্বর পর্যন্ত কেবল ভারতীয় মাল পাওয়া গিয়াছে; তখন দাম প্রতি টন ৩ শত ৪১ টাকা হয়;

(৪) গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় মালের দাম, প্রতি টন ৩ শত ৪৫ টাকা হইয়া জানুয়ারী মাসে ৩ শত ৭৮ টাকা টন হয়। এই সময় কানাডা হইতেও মাল আমদানী হয়।

অল্প দিন হইতে যে মহীশূরী মাল আসিতেছে, তাহাতে আশানুরূপ ফল ফলিতেছে না, এমন অভিযোগও আমরা পাইতেছি। এ বিষয়ে পরীক্ষা প্রয়োজন। যদি জ্বালানীর জন্য কয়লা ও কাঠ পাওয়া যায়, তাহা হইলে গোবর সাররূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে: তাহার সহিত ক্ষেতের আবর্জনা মিশিলে উৎকৃষ্ট সারের কাজ হয়। এই আবর্জনার উপকারিতা সম্বন্ধে একটি প্রচলিত "বচন" আছে—

"বাড়ীর বুড়ো ক্ষেতের হুড়ো"—অর্থাৎ বাড়ীর বৃদ্ধ ও ক্ষেত্রের আবর্জনা বিশেষ উপকারী।

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ব্যবসায়ী "পণ্ডিত-দিগের" টোলের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। সে কথার উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছিলাম। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ২ শত ৬৯ জনকে কলিকাতা হইতে তালিকাভুক্ত করিবার জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পরিদর্শকগণ—অনুসন্ধানে মাত্র একশত ৫০ জনকে পাইয়া-ছেন। আমরা আশা করি, কেবল কলিকাতায় নহে—মফঃস্বলেও এ বিষয়ে আবশ্যক অনু-সন্ধান করা হইবে। কবিরাজ বা ডাক্তার বা চাকরীয়াবা যেন চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত বলিয়া তালিকাভুক্ত হইতে না পারেন।

বিপ্রমুখের কথা
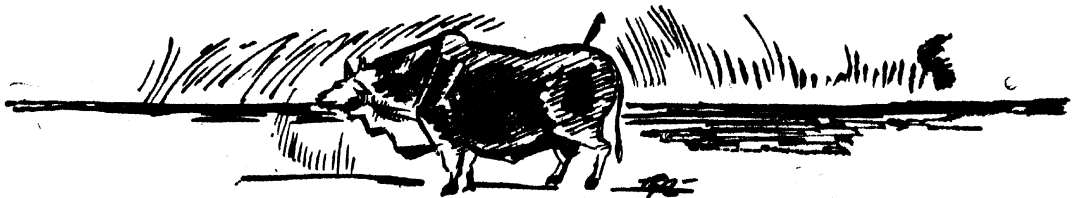
যৌথ সংসারে মহিলাদের স্থান-প্রসঙ্গে বলেছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা সংসারে দাসত্ব করেন,—অনেকটা দায়ে পড়ে। এর জবাবে কেউ-কেউ বলতে পারেন, তাঁরা দাসত্ব করেন কেন? অর্থনৈতিক কারণটাই প্রধান নয়। যাঁদের মনের জোর আছে, অধিকার আছে অর্থাৎ নিজস্ব কর্তৃপক্ষের অসম্মতি নেই, অযথা হস্তক্ষেপও নেই, তাঁরা বৃহৎ পরিবারের লৌহ-শৃঙ্খলে নিজেদের বেঁধে রাখেন কেন? আসলে তাঁরা পর-গাছা। একটা কিছু জড়িয়ে থাকাই তাঁদের সার্থকতা। সকলের সংসারে যখন থাকেন, তখনও তাঁদের মুখভার। আবার নিজের সংসার যখন করেন, তখনও তাঁদের মনভার। অসন্তোষটা হল মনের অতি-প্রয়োজনীয় পোষাক। তবু ছাড়তে তাঁরা পারেন না এবং জানেন না। সংসার ছাড়লে তাঁরা প্রেমেন মিত্রের 'অনাবশ্যক' গৃহিণী। কাজেই ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্, তাঁরা সংসারকে আঁকড়ে থাকেন। একান্নবর্তী সংসারের ঝামেলা নিয়ে পুরুষকে তার নিজের অদৃষ্টকে গঞ্জনা দেন। আবার পৃথক সংসার হলে হাঁপিয়ে ওঠেন। কথা বলতে না পেরে এবং কাউকে কিছু শোনাতে না পেরে আকণ্ঠ ফুলে ওঠেন। অতএব দেখা যাচ্ছে—নারী হলেন 'কনজারভেটিভ্' সংরক্ষণশীল।

* * * *

নারীর রক্ষণশীলতা অবশ্য সত্য কথা। কিন্তু পুরুষ প্রগতি বেশি পছন্দ করে, না কি নারী—এ বিতর্ক বহু পুরাতন।

সভ্যতার প্রথম ও মধ্য যুগে এই তর্কের তেমন প্রয়োজন ঘটেনি, অবকাশও ছিল না। কিন্তু যবে থেকে সংসারের ও সমাজের অর্থ বিস্তৃত হয়েছে, নারীর সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তবে থেকে পুরুষের ও নারীর নিজস্ব মনন এবং স্বাতন্ত্র্যকে মেনে নেওয়া হয়েছে। এখন সেই মন ও স্বাতন্ত্র্য কোন্ ক্ষেত্রে বাধা মানে না, এগিয়ে যেতে চায় —অর্থাৎ প্রগতিকামী, আর কোন্ ক্ষেত্রেই বা বেশী দূরে এগুতে ভরসা পায় না, পুরানো জীবন-আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকে,—অর্থাৎ সংরক্ষণশীল, সেটা বিবেচনার বিষয়।

হাবে-ভাবে, আচরণে, চিন্তা-ধারায় এবং মত প্রকাশে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য আছেই এবং থাকতে হবে, জীবতত্ত্বের অমোঘ নিয়ম-নির্দেশে। কারণ প্রকৃতি উভয়পক্ষকে একই ছাঁচে ঢালাই করে নি। কিন্তু একথাও ঠিক্ যে কয়েকটি স্বভাব আর গঠন-গত বৈষম্যের ওপর একটা সাধারণ প্রস্তাব খাড়া করা শক্ত এবং সমীচীনও নয়। তবে নারীর যে সামাজিক ও পারিবারিক রূপের পরিচয় আমরা নিত্য পেয়ে থাকি, তাঁদের মনের ও আচরণের যে ক্রিয়া ও সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াগুলি প্রায়ই লক্ষ্য করবার সুযোগ পাই, তাই থেকে মোটামুটি বলা চলে যে অনেক স্থলেই তাঁরা সংরক্ষণশীল—একটা আকস্মিক অথবা বড় রকমের পরিবর্তনের পক্ষপাতী তাঁরা নন। বিধাতার সৃষ্টির গড়নে তফাৎ থাকলেও, আজ-কাল অবশ্য অনেক মহিলাই শিক্ষায় দীক্ষায়, আচরণে ও মতবাদে, স্বাধীন চিন্তায় এবং অন্তঃশক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশে আধুনিক বিদগ্ধ পুরুষের সমকক্ষ,—কোনও কোনও জায়গায় তাঁরা আরও অগ্রসর হয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কর্মক্ষেত্রে, রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে নারী শুধু পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার ক্ষমতাই অর্জন করেন নি, অনেক সময়ে পুরুষের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

কিন্তু আমি বলছি সাধারণ সংসার ও মধ্যবিত্ত সমাজের নারীর কথা। শতকরা আশি পঁচাশি জন মহিলা সমাজের যে গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন, যে মানসিক স্তরে তাঁদের চিন্তা-শক্তি ও বুদ্ধি-বিচারের ব্যবহারিক প্রয়োগ সীমাবদ্ধ আছে,—তারই কথা। দেখা যায়—সেখানে নারীমনের স্বাভাবিক ঝোঁকটা প্রগতি বা বিপ্লবপন্থী নয়। দু চার-জন থাকতে পারেন—যাঁদের সাহস আছে, নতুন জীবন-ধারা কিংবা একটা পরিবর্তন বা আন্দোলনকে যাঁরা পুরুষের চেয়ে সহজে বরণ করে নিতে পারেন অথবা বেশি উন্মাদনা নিয়ে চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতন মনের জোর দেখাতে পারেন। কিন্তু গড়-পড়তা হিসেবে বোধ হয় এ কথা বলা চলে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক মেলা-মেশায় মেয়েরা মজ্জাগত সংস্কারকে উড়িয়ে দিতে চান না—কারণ উড়িয়ে দিলে চলে না। তাঁদের স্কন্ধে যে রক্ষণ-দায়িত্ব সমাজ চাপিয়ে দিয়েছে, সেটা না মেনে উপায় নেই। তাই আবহমান কালের ঐতিহ্য আর সামাজিক তথা পারি-বারিক আদর্শে পুষ্ট নারীর মন স্থিতিশীল বিচার-বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখে এবং নির্ভর করে বেশি মাত্রায়। সমাজ-সংসারের ভিত্তিকে টলিয়ে দিয়ে যদি আসে কোনও পুরানো প্রথা বা আচার-অনুষ্ঠানের আকস্মিক বিপর্যয়, তাহলে নারীর মন তাকে তেমন আন্তরিক প্রসাদে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

নারী-চরিত্রের এই বিমুখতা কিন্তু মনো-বিকারের চিহ্ন নয়, মানসিক সংকীর্ণতার পরিচয়ও নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফেরে, সমাজ-ব্যবস্থার কল্যাণে এই মনোভাবটাই যে ন্যায্য ও নিতান্ত স্বাভাবিক ফল,—সেই কথাটা আবার জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। সভ্যতার আদিম যুগ থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত নারীর ধারিণী শক্তির ওপর অনেকখানি গুরুভার চাপানো হয়েছে এবং সেই শক্তির জোরেই আজও ভারতীয় সমাজ ও সংসার-ধর্ম অনেকটা দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। এতে ভালো হয়েছে অথবা মন্দ হয়েছে, এটা এখন আমাদের বিচার্য্য বস্তু নয়। তবে নারীর স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা যে সমাজ-নীতি আর রাষ্ট্র-নীতি-ব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, সেটা অবিসংবাদিত সত্য। বহু দিন ধরে বিশেষ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে এবং আবেষ্টনীতে বাস করে তাঁরা 'কনডিশ্যানড্' অথবা দেশ-কাল-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

নারী-মনের স্বাভাবিক উদারতা পুরুষের চেয়ে কিছু কম নয়। তবে যেসব স্থলে, যে বিশেষ পরিবেশে নারীমনের সহজাত সংকোচ এবং প্রতিক্রিয়া, সেগুলি লক্ষ্য না করলে এই আলোচনা অর্থহীন হয়। তাই মেয়েদের ধারণায়, মতামতে ও সামাজিক ব্যবহারে যে প্রগতির অভাব বা পরিবর্তনের বিরোধিতাটুকু নজরে পড়ে, তার উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রথমে সংসার-পরিচালনার কথাই ধরা যাক্। পুরুষ বাইরে যতই প্রভাব আর প্রতিপত্তিশালী হোন্ না কেন, গৃহধর্মে এবং সংসারের নিত্য কর্মে নারীর মত ও ব্যবস্থাকে তিনি কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কারণ এস্থলে দ্বৈতবাদ চলে না। শৃঙ্খলার খাতিরে বোধ হয় চলাও উচিত নয়........

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

প্র.না.বি.....

হীরা

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের বহু শাখা এবং বহু ফল। উপন্যাসখানির প্রধান নায়ক-নায়িকা সকলেরই ভাগ্যে বিষফলের ভাগ পড়িয়াছে। নগেন্দ্র দত্ত, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, দেবেন্দ্রনাথ ও হীরা কেহই বিষফলে বঞ্চিত হয় নাই। হীরা অপর চারজনের মতো মূলতঃ প্রধান চরিত্র নয়—কিন্তু বিষফলের প্রতিক্রিয়ায়, ঘটনাবর্তে পড়িয়া এই সামান্যা নারী অসামান্যা হইয়া উঠিয়াছে। হীরা দত্ত বাড়ীর দাসী—কিন্তু বিষের এমনি প্রভাব যে, গ্রন্থের উপসংহারে বেদনার মহিমায় সে দত্ত গৃহিণীর চেয়েও উজ্জ্বলতর মূর্তি ধরিয়াছে। বাস্তবিক একমাত্র হীরার ভাগ্যেই বিষফল অমিশ্র ক্রিয়া করিয়াছে—কোন দিক হইতে একবিন্দু সান্ত্বনার অমৃত তাহার ভাগ্যে জোটে নাই।

সূর্য্যমুখী পুনরায় নগেন্দ্রের প্রণয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর প্রণয় ও বিশ্বাস কখনো হারায় নাই, কুন্দনন্দিনী সার্থকতার শিখরে উঠিয়া মৃত্যুর আনন্দের দিগন্তরে চলিয়া পড়িয়াছে, এমন কি নিষ্ঠুর দেবেন্দ্রনাথের প্রতিও লেখক অকরুণ নন—মৃত্যুর তিরস্করণী তাহার সমস্ত প্রদাহ ও ব্যর্থতা ঢাকিয়া দিয়াছে—কিন্তু হীরার ভাগ্যে কি হইল? দেবেন্দ্রের মৃত্যু শয্যায়, গ্রন্থের শেষতম অধ্যায়ে তাহাকে দেখিতে পাই—"তাহার বসন অতি মলিন, শতধা ছিন্ন, শত গ্রন্থি-বিশিষ্ট এবং এত অল্পায়ত যে, তাহা জানুর নীচে পড়ে নাই এবং তদ্দ্বারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই। তাহার কেশ রুক্ষ্ম, অবেণী-বন্ধ, ধূলিধূসরিত—কদাচিৎ বা জটাযুক্ত। তাহার তৈলবিহীন অঙ্গে খড়ি উঠিতেছিল এবং কাদা পড়িয়াছিল।" তাহাকে দেখিয়া মুমূর্ষু দেবেন্দ্র ভাবিল এ কোন্ উন্মাদিনী। "উন্মাদিনী অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল—আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি হীরা।" দেবেন্দ্র শুধাইল—"তোমার এ দশা কে করিল?"

"হীরা রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশিত করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। পরে স্থির হইয়া কহিল—তুমি আবার জিজ্ঞাসা করো—আমার এমন দশা কে করিল? আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ। এখন চিনিতেছ না—কিন্তু একদিন আমায় খোশামোদ করিয়াছিলে। এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু একদিন এই ঘরে বসিয়া আমার এই পা ধরিয়া গাহিয়াছিলে—

স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লবমুদারং।"

দেবেন্দ্র মরিল, শান্তি পাইল। কিন্তু হতভাগিনী হীরার ভাগ্যে শান্তি মিলিল না।" দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর, কতদিন তাহার উদ্যান মধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে, স্ত্রীলোক গাহিতেছে—

স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লবমুদারং।"

সংসার বিষ-বৃক্ষের বিচিত্র নিয়ম। কে বীজ বপন করে, কে অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্য করে, কে বিষফল চয়ন করে—আর বিষফল কাহার ভাগ্যে নিদারুণ নিয়তির অমোঘ শর-সন্ধান করিয়া বসে! এমন যে সতত প্রত্যক্ষ মৃত্যু, সে-ও তাহার কাছে ঘেঁষে না! হীরার ভাগ্যে নির্মম অদৃষ্ট বেদনার পাত্র উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে! শিল্পীরা এমন নির্মম কেন? নির্মমতা যে সৃষ্টির ভূমিকা! বাটালির আঘাত নহিলে কি পাষাণে মূর্তি ফোটে?

অনেক সমালোচক রোহিণীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সমবেদনার অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন! কিন্তু হীরার অবস্থার তুলনায় রোহিণীকে সৌভাগ্যবতী বলিতে হইবে।

হীরার অনুরূপ আরও দুটি নারী চরিত্র বাঙলা সাহিত্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাটের রুক্মিণী এবং শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের কিরণময়ী। ইহাদের দুজনেরই প্রেমের শরসন্ধান ব্যর্থ হইয়াছে—সেই ব্যর্থ শর ঘুরিয়া আসিয়া তাহাদের চিত্ত ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে—তখন তাহাদের শুভাশুভ জ্ঞান পর্যন্ত লুপ্ত। তাহাদের ব্যর্থ প্রেম ভগ্নস্তম্ভ অট্টালিকার মতো প্রণয়ীর মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—অবশেষে তাহারা হীরার মতোই উন্মাদ হইয়া গিয়াছে।

যশোরের যুবরাজ উদয়াদিত্য বিবাহের পূর্বে রুক্মিণীর প্রেমে ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ হইয়াছিল। বিবাহের পরে সে মোহ তার সম্পূর্ণ দূরে হইয়া গিয়াছিল। রুক্মিণী কিন্তু উদয়াদিত্যের আশা ছাড়ে নাই। সে ভাবিয়াছিল উদয়াদিত্যকে হাত করিয়া তাহার হৃদয় এবং যশোরের সিংহাসনের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিবে। কিন্তু সে দেখিল সে আশা সহজে সফল হইবার নয়—অন্ততঃ যুবরাজ পত্নী সুরমা জীবিত থাকিতে নয়। সুরমা বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল—সে বিষ রুক্মিণী প্রদত্ত। এখানে হীরা কর্তৃক কুন্দকে বিষদানের কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। সুরমার মৃত্যুর পর সে ভাবিয়াছিল তাহার পথ সুগম হইবে। কিন্তু উদয়াদিত্য তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তখন রুক্মিণীর ব্যর্থ প্রেম নিদারুণ মূর্তি ধরিল। তারপর যখন প্রতাপাদিত্যের ক্রোধে উদয়াদিত্যের বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিল—তখন এই হতভাগিনী নারী প্রতাপাদিত্যের প্রতিহিংসার যন্ত্র হইয়া উঠিল। সে নৈরাশ্যে জলে ঝাঁপ দিয়া মরিতে গিয়াছিল, কিন্তু ভাবিল মরিলেই কি শান্তি পাইবে? সে বুঝিল উদয়াদিত্যের সর্বনাশ ব্যতীত তাহার হৃদয় শান্ত হইবে না। উদয়াদিত্য যশোর পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলে তবে তাহার ক্রোধ পড়িল। ক্রোধ পড়িল—কিন্তু সে আর শান্তি পাইল না। সে উন্মাদিনী হইয়া গেল।

রুক্মিণী চরিত্র দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় তাহাকে চিত্রিত করিবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হীরার চরিত্রটি ছিল। অবশ্য রুক্মিণী চরিত্র হীরার ন্যায় প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত নয়। কিন্তু সে যে হীরার ছায়া তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। সে ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট আবার ছায়ার মতোই সত্য।

চরিত্রহীন উপন্যাসে কিরণময়ী চরিত্র-অঙ্কনের সময়ে শরৎচন্দ্রের মনে হীরার ছবি উপস্থিত ছিল কি না নিশ্চয় বলিতে পারি না, তবে এ দুটি চরিত্রের ছকে সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। কিরণময়ী বিধবা হইবার পরে উপেন্দ্রকে দেখিল। উপেন্দ্রকে ভালবাসিল। উপেন্দ্র পত্নীগত প্রাণ, কিরণময়ী বুঝিল উপেন্দ্রকে পাইবার আশা নাই। তাহার ব্যর্থ প্রেম ক্রোধে পরিণত হইল। সে উপেন্দ্রকে আঘাত করিবে। কিন্তু তাহার উপায় কি? তখন সে উপেন্দ্রের প্রিয় পাত্র দিবাকরকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাহাকে লইয়া ব্রহ্মদেশে পালাইয়া গেল। বেচারা দিবাকরের ধারণা হইয়াছিল কিরণময়ী তাহাকে ভালবাসে। সে কখনো কিরণময়ীর ভালবাসা পায় নাই—ভালবাসার ভানমাত্র পাইয়াছিল। এদিকে কিরণময়ীর মন শূন্যতার ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল—এবং অবশেষে এই নিদারুণ শূন্যতায় তাহার বুদ্ধির ভারসাম্য বিচলিত হইল। দেশে ফিরিবার পরে সে পাগল হইয়া গেল—পাগল হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখানেও দেখি হীরার চরিত্রের ছাঁচ। প্রেম-ব্যর্থতা, ক্রোধ এবং অবশেষে উন্মাদ অবস্থা।

চরিত্র তিনটির মধ্যে হীরার ন্যায় হতভাগিনী কেহ নয়। হীরা এক নৃশংস পাষণ্ডের হাতে পড়িয়াছিল। দেবেন্দ্র জানিয়া শুনিয়া বেশ সুস্থ মেজাজে হিসাব করিয়া হীরার সর্বনাশ করিয়াছিল—সর্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যেই করিয়াছিল। উদয়াদিত্য বা উপেন্দ্র সম্বন্ধে ইহা আদৌ প্রযোজ্য নহে।

মানুষের বংশলতিকার মতো কাল্পনিক নরনারীরও বংশলতিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে হীরা, রুক্মিণী ও কিরণময়ীকে একই ভাবগোষ্ঠীর মেয়ে বলা যাইতে পারে। আবার ভাঁড়ু দত্ত ও হীরা মালিনী একই বংশের লোক, আবার যেমন দেবযানী ও বাঁশরী সরকার দেহান্তরে সমান রক্তধারা বহন করিতেছে। নৃতাত্ত্বিক যেখানে বাস্তব রক্তধারায় ঐক্য সন্ধান করে, সাহিত্য সমালোচককে সেখানে কাল্পনিক রক্তধারার ঐক্য সন্ধান করিতে হয়। আর একবার রক্তের ঐক্য খুঁজিয়া পাইলে জাতিগত চরিত্রের রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে।*

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

পল্লী শিক্ষা সমস্যা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

শিক্ষা সমস্যার সমাধান প্রত্যেক জাতির প্রাথমিক কর্তব্য। ইহা ভিন্ন কোন জাতির মেরুদণ্ড সমুন্নত হইতে পারে না—স্বাধীন জাতির তো নহেই। রুশ, তুর্কী, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন জাতিসমূহ শিক্ষা সমস্যার মোটামুটি সমাধান করিয়াছে। ঐসব দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা অভূতপূর্বরূপে হ্রাস পাইয়াছে। বৃত্তিশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার সমস্যাও তাহারা মিটাইয়া দেশবাসীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও দেশের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা চালু করিয়াছে। কিন্তু ভারতের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। এতদিন ভারত পরাধীন ছিল। বিদেশী শাসক আপনার প্রয়োজনে শিক্ষা-নীতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। যতটুকু দরকার এবং যতজনকে দরকার ঠিক ততটুকু ও ততজনকেই তাহারা শিক্ষিত করিয়াছে। ফলে একদিকে আমাদের ছাত্র সমাজ যেমন লাভ করিয়াছে কেরানীগিরির শিক্ষা, তেমনি অপর দিকে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে অচিন্তনীয়রূপে। ভারতের নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৯৩ জন। ইহা একাধারে যেমন অভাবনীয় তেমনি দুঃসহ। এই দুঃসহ অবস্থার শীঘ্র পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ স্বাধীন ভারতের সত্যিকারের রূপ বিকশিত হইতে পারে না।

অবিভক্ত ভারতে গ্রামের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ আর তাহার শতকরা ৭৫ জন গ্রামের অধিবাসী। বিভক্ত ভারতের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই বাস করে গ্রামে। সুতরাং শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই আসে পল্লীবাসীর শিক্ষার কথা। অন্যথায় শহরের মুষ্টিমেয়কে শিক্ষিত করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। শিক্ষা ব্যবস্থা লইয়া যাঁহারা মাথা ঘামান এই সহজ কথাটা তাঁহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে এবং সেইভাবে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে ও সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পল্লী শিক্ষা সহজ সমস্যা নহে। অনেক সমস্যার চেয়ে ইহা জটিল ও গুরুতর। কারণ, ভারতের পল্লীসমূহ বিক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত অনগ্রসর। পল্লীবাসীর মনও ভয়ানক সংস্কারবিরোধী ও রক্ষণশীল। 'লেখাপড়া করলে সন্তানসন্ততি লাঙল ধরবে না', এই মনোভাব তাহাদিগকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা কিছুতেই ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাইতে চাহে না। কেহ যদি নিকটবর্তী পাঠশালায় ছেলেদের ভর্তি করাইয়াও দেয় তাহাও খুব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। পাঠশালায় যাওয়ার চেয়ে গরু চরানো তাহারা লাভজনক ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। এই মনোভাব পরিবর্তনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচার ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন পল্লীতে শিক্ষা বিস্তারের পথে আরও বহু বাধা রহিয়াছে।

গ্রাম বলিতে আমরা কি বুঝি। রাজস্ব বিভাগ গ্রাম বা পল্লী বলিতে যে স্থান বা ভূমি হইতে রাজস্ব আদায় হয় তাহাই বুঝায়। সে ভূমিতে লোক থাকিতে পারে আবার নাও থাকিতে পারে। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের দিক হইতে বিবেচনা করিলে গ্রামের ঐ সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে চলিবে না। শিক্ষা বিভাগকে প্রত্যেকটি পল্লীগ্রাম নূতন করিয়া জরিপ করাইতে হইবে এবং নির্দিষ্ট জনসংখ্যাপূর্ণ স্থান লইয়া নূতন করিয়া ইউনিট গঠন করিতে হইবে। তাঁহাদের ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐ সব নূতন ইউনিটে কয়টি স্কুল প্রয়োজন এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

এই ইউনিট গঠনের পথে কিছু অসুবিধা আছে। কারণ ইউনিট গঠন করিতে গিয়া দেখা যাইবে যে কোন কোন ইউনিট এত ছোট হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাতে এক শিক্ষক পরিচালিত একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় চলিতে পারে। কিন্তু ইহাদেরও উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সুতরাং কি নীতি গ্রহণ করা দরকার তাহা শিক্ষা বিভাগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

যে সব স্থানে সপ্তাহান্তে হাট বা বাজার বসে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পল্লী জনকেন্দ্রকে নূতন ভাবে গঠিত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে সব স্থানে সাপ্তাহিক হাট বা বাজার বসে সেটাকে কেন্দ্রস্থল ধরিয়া তাহার পাঁচ হইতে ৭ মাইল পরিধির মধ্যে যতগুলি গ্রাম বা বাসস্থল আছে তাহাকে এক ইউনিট ধরা যাইতে পারে। ঐ হাটের স্থানই হইবে শিক্ষা কেন্দ্র। এইভাবে শিক্ষাকেন্দ্র নির্বাচিত হইলে গ্রামিক-গণের মধ্যে ভাব বিনিময়, সংবাদাদি আদান-প্রদান ও অন্যান্য অনেক সুবিধা হইবে। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন তাহারা হাট উপলক্ষে নিজেদের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবেন। তাহাতে শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হইবে। বাঙলা দেশে চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসাইবার পেছনেও এই যুক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। তবে ভারতের সকল স্থানেই যে এই ভাবের হাট বা বাজার বসে তাহা নহে। কিন্তু ঐসব স্থানেও কেন্দ্রীয় স্থান নির্বাচিত করা অসুবিধাজনক নহে। শিক্ষা বিভাগকে এইভাবে নূতন পল্লী জনকেন্দ্র গঠন করার ব্যাপারে তৎপর হইতে হইবে। নূতন পল্লী গঠিত করিয়া প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করিয়া আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। আমরা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা বলি, কিন্তু আমাদের ঐসব আলোচনা অনেকক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কানেই পৌঁছায় না। তার ফলে সত্যিকারের কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। তাই প্রয়োজন হইতেছে বিভিন্ন পল্লীকেন্দ্রে যুগোপযোগী নূতন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। যাহাতে গড়ে সমস্ত শিক্ষক ও গ্রামবাসীই উহাদের কাজকর্ম লক্ষ্য করিতে পারে। তাহাতে নূতন ধারা শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন শিক্ষকরা তেমনি গ্রামবাসীও উৎসাহ অনুভব করিবে। ইহাতে শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হইবে।

পল্লী বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন ব্যবস্থাও একটা সমস্যা বিশেষ। পূর্বে বিভিন্ন স্থানে স্কুলের সংখ্যা কম ছিল তাই ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশনাল অফিসার ও তাঁহার অধস্তন নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিদর্শকের পক্ষে কাজ চালান সুবিধার ছিল, কিন্তু আজ স্কুলের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং ঐ মুষ্টিমেয় পরিদর্শকের পক্ষে আর কাজ চালান সম্ভবপর নয়। অর্থাভাবে গভর্নমেণ্টও অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিতেছেন না। যে সংখ্যা আছে তাহা দিয়াই কাজ চালাইয়া যাইতে চাহিতেছেন ফলে কোন কোন পরিদর্শকের বৎসরে দুই শতাধিক স্কুল পরিদর্শন কার্য সমাপ্ত করিতে হইতেছে। তাঁহাকে দিনে দুই তিনটি স্কুলও পরিদর্শন করিতে হয়। এই পরিদর্শন কার্যও তেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কারণ, যে অল্প সময় পরিদর্শক স্কুলে থাকেন তাহার মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিতে ও সই করিতেই সময় কাটিয়া যায়। একবার করিয়া স্কুল ঘরগুলি দেখিয়া নিয়াই তিনি তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করেন। ইহাতে বিদ্যালয়ের সত্যি-কারের অসুবিধা ও শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি কিছুই সুপারিশ

করিতে পারেন না। ইহার ফলে পল্লী বিদ্যালয়সমূহই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শহরে তবু নানা অবস্থায় শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা ও ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তাহার কোন সুবিধা নাই। এই অবস্থা দূরে করিবার জন্য কতকগুলি পল্লী শিক্ষাকেন্দ্র একত্র করিয়া তাহাদের কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষককে স্থানীয় পরিদর্শক নির্বাচিত করা যাইতে পারে। তিনি স্কুল ইন্সপেক্টরের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে কোন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে না কিন্তু একটা নূতন ও কার্যকরী পদ্ধতি চালু হইবে।

পল্লী শিক্ষার আর একটি সমস্যা হইতেছে স্থানীয় অবস্থাভেদে বিদ্যালয়ের পড়ার সময় ও ছুটির ব্যবস্থা করা। কারণ, শহরের বিদ্যালয়গুলির মত ঐসব স্থানেও যদি বিদ্যালয় বসিবার সময় ও ছুটির সময় নির্দিষ্ট করা হয় তবে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বর্ষার সময়, ধান কাটা বা বীজ বপন করার সময় অনেক কৃষক-সন্তানের পক্ষে স্কুলে যোগদান সম্ভবপর নহে। চাষী-পিতা ছেলেকে এই দিনগুলিতে স্কুলে পাঠাইবার চেয়ে মাঠের কাজে নিযুক্ত রাখিতেই ভালবাসেন। সুতরাং সেই অনুসারে ব্যবস্থা না করিলে ছাত্রসংখ্যা স্বভাবতঃই হ্রাস পাইবে। এই সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদি ঠিকভাবে ব্যবস্থা করা যায়, তবে তথাকথিত চাষাভূষার ছেলেমেয়েদের পক্ষে তিন ঘণ্টা ক্লাশ করা সম্ভবপর। সুতরাং ছুটির দিন ও ক্লাশ করার সময় সুনির্দিষ্ট করার উপরও পল্লীশিক্ষা বিস্তার অনেকখানি নির্ভর করে।

পরবর্তী সমস্যা হিসাবে আমরা ক্যারিকুলামের (carriculum) কথা বলিতে পারি। এই ক্যারিকুলাম কি হইবে? পল্লী ও শহরের পাঠ্য বিষয় কি একই হইবে না পৃথক্ হইবে? গ্রামের ও শহরের ছেলেমেয়েদের যদিও একই শিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন তবু পাঠ্য বিষয় পৃথক্ থাকা দরকার। কারণ, পল্লীর পরিবেশ শহরের পরিবেশ হইতে এতই পৃথক্ যে, পল্লীর বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা শহরের স্কুল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ সহজ সত্যটা অনেকের নজরেই এতদিন পড়ে নাই, ফলে পল্লীর আবহাওয়া ও পরিবেশের সহিত সংযোগ না থাকায় উহা পড়ুয়াদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভবপর হইলে তাহার মারফৎ গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য যেমন নূতন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা সম্ভবপর হইবে তেমনি তাহাদের পরিবেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার প্রতি তাহাদের আরও অনুরাগী করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে।

পল্লী শিক্ষার পথে আর একটি সমস্যা দেখা যায় সে হইতেছে এক-শিক্ষক পরিচালিত বিদ্যালয়। যেমন আমাদের গ্রাম্য পাঠশালাগুলি। পাঠশালার গুরুমহাশয় যেমন কোন ছাত্রের অ আ ক খ পাঠ গ্রহণ করিতেছেন আবার তেমনি অন্য ছাত্রের পড়া গ্রহণ করিতেছেন। অর্থাৎ, গুরুমহাশয় একই সময়ে একই কক্ষে বসিয়া বিভিন্ন মেধার ছাত্রের পাঠ গ্রহণ করিতেছেন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা আলোচনা হইয়াছে। পক্ষে বিপক্ষে নানা কথা হইয়াছে। ইহার দোষগুণ অনেকই আছে। অনেকে ইহা বন্ধ করিয়া দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। এক শিক্ষক পরিচালিত পাঠগৃহ অবৈজ্ঞানিক নহে। পাঠাভ্যাসের একটা স্তর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী। ছাত্রগণ শিক্ষকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারায় এবং তাঁহার নিকট হইতে স্নেহদরদ পাওয়ায় সহজে পাঠ গ্রহণ করিতে পারে। তা ছাড়া, প্রৌঢ় শিক্ষকের অভিজ্ঞতাও শিক্ষাদানের পক্ষে কম নহে। ইহা এইসব গুরুমহাশয়দের নিকটই পাওয়া যাইতে পারে অন্যত্র নহে। তাই আমাদের মনে হয়, আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পাশে এ ধরণের পাঠশালা থাকা উচিত। আমেরিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায় এই ধরণের এক শিক্ষক পরিচালিত স্কুল বহু রহিয়াছে। সুতরাং ঐগুলি সুপরিচালনা ও সুগঠনের জন্য শিক্ষা বিভাগের তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

পল্লীশিক্ষার প্রধানতম সমস্যা হইতেছে শিক্ষক সমস্যা। বৃত্তি হিসাবে শিক্ষককে সমস্ত আধুনিক অবস্থা যেমন মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের কাহিনী, সমাজের নয়া উন্নতি, আধুনিক সমস্যা, নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইবে। এই সব বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা শহুরে শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে, পল্লীর শিক্ষকের পক্ষে ত নহে-ই। জগত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরতম পল্লীগ্রামে একটা অবশ পরিবেশের মধ্যে যে শিক্ষক দিন কাটান তিনি সহজেই চলতি যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। তিনি কোন সংবাদপত্র পান না, কদাচিৎ কোন শিক্ষিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন; পড়ার মত বই পান না এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথও তাহার কাছে রুদ্ধ। তাই তাঁহার শিক্ষা পদ্ধতি যে অল্পদিনেই সময় অনুপযোগী হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ইহার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। গ্রামের হতভাগ্য শিক্ষকবৃন্দ যাহাতে সময়ের তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারেন, সাম্প্রতিক অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে পারেন সেজন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। এই সমস্যা মীমাংসার ভার গভর্নমেন্ট ও শিক্ষা বিভাগকে সমানভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, উহা হইতেছে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পল্লীর অধিবাসীর মধ্যে সম্পর্ক। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বিদ্যালয় ও অধিবাসীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইহার কারণ হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমোন্নতির ধারা। ইংলণ্ডে জনসাধারণই সর্বপ্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। নিজেদের স্থাপিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাহারা অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিল। ১৮৭০ খৃঃ সর্বপ্রথম যে স্কুলবোর্ড গঠিত হয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল ঐ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য করা। এই সব বোর্ডে বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে গ্রহণ করা হয় এবং স্কুলসমূহ পরিচালনা ব্যাপারে তাহাদের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে স্থানীয় জনসমাজ ঐ সব বোর্ডকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে। ১৯০২ ও ১৯৪৪ সালে বোর্ডের পরিচালনা ব্যাপারে অনেক সংশোধন করা হইলেও ঐ একাত্মবোধ বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই। অন্যদিকে মার্কিন মুল্লুকেও এই ব্যবস্থাই বর্তমান। স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ ও অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। কারণ তাহারা উহা নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে কিন্তু ভারতে এই একাত্মবোধের একান্ত অভাব। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ যে নিজেদেরই প্রতিষ্ঠান সাধারণ গ্রামবাসী তাহা ত অনুভব করেই না বরঞ্চ বৈরী বা বিরোধী প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভিত্তিতে এই মনোভাবের কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। গ্রাম্য পাঠশালা বা টোলের উপর গ্রামবাসীদের টান বেশী, কারণ, পাঠশালা বসে তাহাদেরই চণ্ডীমণ্ডপে, গুরুমহাশয় তাহাদেরই নিজস্ব লোক। সুতরাং পাঠশালার প্রশস্ত অঙ্গনে বসিয়া দুই দণ্ড আলাপ করিবার সুবিধা তাহাদের হয়। তাই তাহারা পাঠশালাকে এত আপনার মনে করে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এই পাঠশালার সংখ্যা ছিল বহু—কিন্তু সরকারী নীতি পরিচালকবৃন্দ এই সব পাঠশালাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত না মিশাইয়া দিয়া উহাদের বিলুপ্তির পথ প্রশস্ত করায় গ্রামবাসীদের বিরক্তি ও অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রামে প্রায় চাপাইয়া দিয়াছেন তাই পল্লীবাসী উহাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া ভাবিতে পারিতেছে না। পরবর্তীকালে নানা আইন করিয়া এই সম্পর্ককে তিক্ততর করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রামবাসীরা যাহাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে নিজেদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান মনে করিতে পারে তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, অন্যথায় শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হইবে না কোনদিন। শিক্ষা বিভাগকে এ বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে।

"ক্ষুরস্য ধারা"—
সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়
(পূর্বানুবৃত্তি)

দু-চারদিন পরে যখন এলিয়টের সংগে দেখা করতে গেলাম দেখি সে আনন্দবিহ্বল। সে বল্‌লে : "দেখ, নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছি, আজ সকালে এল।"

বালিশের তলা থেকে কার্ডখানি বার করে আমাকে দেখাল।

আমি বল্‌লাম : দেখ, আমি ঠিকই বলেছিলাম তোমাকে, তোমার নামের আদ্যক্ষর T দেখা যাচ্ছে সেক্রেটারি এতদিনে তোমার নামে পেঁৗছেছে।"

"এখনও জবাব দিই-নি কাল দেব।"

একথায় আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। বল্লাম :

"আমি কি তোমার হয়ে জবাব দিয়ে দেব? তোমার এখান থেকে বেরিয়ে পোস্ট কারে দেব।"

"না না তুমি কেন দেবে ? আমি নিজেই নিজের চিঠির জবাব দিতে পারব।"

ভাবলাম সৌভাগ্যক্রমে মিসেস কিয়াই চিঠিটা খুলবেন এবং চেপে দেওয়ার বুদ্ধি হবে। এলিয়ট ঘণ্টা বাজাল।

"তোমাকে আমার পোযাকটা দেখাব।"

"তুমি যাবে মনে করছ নাকি এলিয়ট ?"

"নিশ্চয়ই আমি যাব, আমি বোম'র বলের পর আর এটি পরিনি।"

ঘণ্টার আওয়াজে জোসেফ এল, এলিয়টতাকে পোষাকটা আন্‌তে বল্‌ল, লম্বা চৌকস বাক্সের ভিতর রাখা, পাতলা কাগজে মোড়া। শাদা সিল্কের লম্বা মোজা। শাদা সাটিনে সোনালি কাজ করা পাৎলুন, একটা ক্লোক, গলায় জড়িয়ে পরবার একটা স্কার্ফ, একটা ভেলভেটের টুপী, তাতে একটি সোনালি চেন ঝুলছে। গোল্ডেন ফ্লিসের চিহ্নটা তাতেই ঝোলান থাকে। দেখ্‌লাম প্রাদোতে রক্ষিত টিসিয়ানের আঁকা ফিলিপ দি সেকেণ্ডের ছবির জমকালো পোষাকের এটি একটি অনুকৃতি। আর যখন এলিয়ট বল্‌ল, কাউণ্ট দ্য লরিয়া ইংলণ্ডের রাণীর সঙ্গে স্পেনের রাজার বিয়ের দিন এই পোষাকটিই পরেছিলেন তখন না ভেবে পারলাম না যে কথাটি তার নিছক কল্পনা বিলাস।

পরদিন প্রাতে ব্রেকফার্স্ট খাওয়ার সময় টেলিফোনে ডাক পড়্‌ল,—জোসেফ জানালো রাত্রে এলিয়টের অসুখ বেড়ে ওঠে, তখনই ডাক্তারকে ডাকা হয়, তিনি বলেন, যে দিনটা কাটে কিনা সন্দেহ। আমি গাড়ি ডেকে এলটিবের পানে ছুটলাম। গিয়ে দেখি এলিয়ট অচৈতন্য হয়ে আছে, বরাবর দৃঢ়ভাবে নার্স ডাকার বিরোধিতা করেছে এলিয়ট। কিন্তু গিয়ে দেখি গীস ও বেসলোর মাঝামাঝি অবস্থিত এক ইংরাজী হাসপাতাল থেকে ডাক্তার নার্স ডেকে এনেছেন, দেখে খুসী হলাম। বেরিয়ে গিয়ে ইসাবেলকে একটা তার করে দিলাম। গ্রে আর ইসাবেল লা বাউলের সমুদ্রতীরে মেয়েদের নিয়ে গ্রীষ্ম যাপন করছিল—অনেক দূরের পাড়ি, তাই আমার ভয় হল ওরা হয়ত যথাসময়ে এলটিবেতে এসে পেঁৗছতে পারবে না। ইসাবেলের দুটি ভাই ছাড়া (তাদেরও সে দীর্ঘকাল দেখেনি), ইসাবেলই এলিয়টের একমাত্র নিকট আত্মীয়া।

কিন্তু হয় এলিয়টের মনে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, নয় ওষুধপত্র বেশ কার্যকরী, কেননা সেদিনের ভিতর সে আবার একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল। বিধ্বস্ত হলেও বাইরে বেশ সাহসিকভঙ্গী দেখাল, নার্সকে তার যৌন-জীবন সংক্রান্ত অশ্লীল প্রশ্ন করে আপনাকে আমোদিত রাখল। আমি প্রতিদিন অপরাহ্নে তার সংগেই থাকতাম, পরদিন পুনরায় ওকে দেখতে গিয়ে লক্ষ্য কর্‌লাম দুর্বল হলেও সে বেশ উৎফুল্ল। নার্স আমাকে অতি অল্পকালের জন্যই থাক্‌তে দিল। আমার প্রেরিত তারের কোনো জবাব না পেয়ে আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত ছিলাম। ইসাবেলের লা-বাউলের ঠিকানা জানা না থাকাতে প্যারীর ঠিকানায় তার পাঠিয়েছিলাম, তাই ভয় ছিল হয়ত বা দারোয়ান সেটি যথাযথ ঠিকানায় পাঠাতে দেরী করেছে। দু-দিন পরে ওদের জবাবে জানলাম যে তারা তখনই যাত্রা করছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রে আর ইসাবেল মোটরযোগে ব্রীটানি গিয়েছিল। আমার তার তারা সবেমাত্র পেয়েছে, ট্রেনের সময় দেখে বুঝলাম ছত্রিশ ঘণ্টার আগে ওরা পেঁৗছতে পারবে না।

পরিদন ভোরের দিকে জোসেফ পুনরায় আমাকে ডেকে জানালো গতরাত্রে এলিয়টের অতি খারাপ অবস্থা গেছে এবং সে আমাকে খুঁজছে। আমি তাড়াতাড়ি গেলাম। পেঁৗছতেই জোসেফ আমাকে বারন্দার একপাশে ডেকে নিয়ে বল্‌ল :

"একটা যদি কথা বলি ম'সিয়ে আমাকে মাফ করবেন, আমি নিজে অবশ্য স্বাধীন চিন্তাশীল প্রাণী, জানি সব ধর্মই জনগণের উপর একটা প্রভুত্ব চালাবার জন্য পুরোহিতদের ষড়যন্ত্রের ফল, কিন্তু ম'সিয়ে জানেন ত' স্ত্রী চরিত্র কি জিনিস। আমার স্ত্রী আর চেম্বারমেড জেদ ধরেছেন যে বেচারার শেষ স্বস্তিবাণী শোনা উচিত, এবং সময়ও এদিকে অতি অল্প" ও আমার দিকে নির্লজ্জের ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল—"আর একথা ত' সত্যি কে না জানে, মরতেই যদি হয় মানুষের উচিত চার্চের সঙ্গে বোঝাপড়া করা।"

আমি ওকে পরিস্কার বুঝে নিলাম—যতই স্পষ্টাস্পষ্টি ওরা ব্যঙ্গ করুক অধিকাংশ ফরাসী মৃত্যুকালে যে ধর্ম-বিশ্বাস তাদের অস্থি মজ্জায় জড়িত তার সংগে মৈত্রী স্থাপন করে।

"তুমি কি চাও আমি ওর কাছে এই প্রস্তাব করি।"

"ম'সিয়ে যদি অনুগ্রহ করেন।"

এ কাজটা অবশ্য আমার তেমন মনঃপূত নয়, —কিন্তু যাই হোক এলিয়ট অনেক দিন ধরেই নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক সুতরাং তার ধর্মমতের রীতি পালন করাটাই তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। এলিয়ট চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, কৃশ ও ম্লান, কিন্তু সে সম্পূর্ণ সচেতন। আমি নার্সকে চলে যেতে বল্লাম।

আমি বল্লাম। "এলিয়ট তোমার অসুখ বড় বেড়েছে,—ভাবছিলাম, ভাবছিলাম যে পুরোহিতের সংগে দেখা করলে হয় না ?"

ও বিনা উত্তরে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

"তোমার কি মনে হয় আমি মরতে বসেছি ?"

"তা অবশ্য মনে হয় না, তবে কি জানো সাবধানের মার নেই—"

"বুঝেছি।"

এলিয়ট নিরুত্তর। আমি তার পানে তাকাতে পারলাম না। আমি দাঁত চেপে রইলাম, শঙ্কা হোল হয়ত কেঁদে ফেলব। আমি তার মুখের পানে তাকিয়ে বিছানার প্রান্তে বসে রইলাম।

এলিয়ট আমার হাতে চাপড় মারল—

বল্ল: "মুষড়ে পোড়ো না ভাই, Noblesse oblige, সম্ভ্রান্তদের দায়িত্ব আছে। জানো ত!"

আমি অট্টহাস্য কর্‌লাম।

বল্লাম : "তুমি এক বিতিকিচ্ছি প্রাণী এলিয়ট।"

"বেশ ভালো, এখন বিশপকে ডেকে বলো আমি স্বীকারোক্তি করতে চাই, আর অন্তিমক্ষণ পেতে চাই, যদি এ্যাবে চার্লসকে পাঠাতে পারেন ত ভালো হয়। তিনি আমার বন্ধু।"

এ্যাবে চার্লস হলেন বিশপের ভিকার জেনারেল, এ'র কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমি নীচে গিয়ে টেলিফোন করলাম। বিশপের সঙ্গেই কথা বললাম।

তিনি জানতে চাইলেন—"খুব জরুরী নাকি ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি এখনই যাচ্ছি।"

ডাক্তার এলেন, তাঁকে জানালাম কি ব্যবস্থা করেছি, তিনি নার্সকে সঙ্গে নিয়ে এলিয়টকে দেখতে গেলেন, আর আমি নীচের তলায় খাবার ঘরে বসে রইলাম। নীস থেকে এলটিবে মোটরে বিশ মিনিটের রাস্তা—আধ ঘণ্টার ভিতরই একটি বিরাট কালো রঙের সেডান গাড়ি দোরে এসে দাঁড়াল,—জোসেফ আমার কাছে এল।

সে উৎসাহিত ভঙ্গীতে বল্লে : c'est Monseigneur en personee, Monsieur—
বিশপ নিজেই এসেছেন।

আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিতে এগিয়ে এলাম। যথারীতি ভিকর জেনারেলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসেন নি, তবে কেন জানি না একজন তরুণ পাদ্রীকে নিয়ে এসেছেন। তার হাতে একটি পাত্র রয়েছে তাতে সম্ভবতঃ পবিত্র জল সিঞ্চন করার পাত্রাদি ও জল আছে। সোফার একটি অপরিচ্ছন্ন কালো বালিস নিয়ে পিছনে এল। বিশপ আমার সঙ্গে করমর্দন করে তার সহচরটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বল্লেন :

"আমাদের বন্ধু বেচারী কেমন আছে?"

জোসেফ বল্ল : "তিনি বড়ই পীড়িত হয়ে পড়েছেন মঁসিয়ে।"

"একটা ঘর দেখিয়ে দিতে পার—যেখানে আমরা পোষাক পরে নিতে পারি!"

"এইটা ডাইনিং রুম—ওপর তলায় ড্রয়িং রুম।"

"ডাইনিং রুমই ভালো হবে।"

আমি ও'কে ভিতরে নিয়ে গেলাম, জোসেফ ও আমি হলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল—বিশপ বেরিয়ে এলেন,—পিছনে এ্যাবে দু হাতে ধরে ছোট পাত্রে পূত বারি নিয়ে চল্লেন। কেমব্রিকের গামছায় পাত্রটি আবরিত, কাপড়টি এতই সূক্ষ্ম যে সব জিনিস স্বচ্ছ দেখায়। আমি বিশপকে ডিনার বা লাঞ্চ পার্টি ভিন্ন দেখিনি, তিনি বেশ ভোজন-বিলাসী, উত্তম আহার বা সুরা তিনি উপভোগ করতেন, মজাদার গল্প চটক লাগিয়ে বলতে পারতেন। তখন তাকে বেশ শক্ত সামর্থ্য সাধারণ খাড়ায়ের মানুষ বলে মনে হ'ত। কিন্তু এখন পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে তাঁকে শুধু লম্বা চওড়া বলে মনে হল না, বেশ রাজসিক চেহারা মনে হল। তাঁর লাল মুখে শ্লেষভরা অথচ প্রসন্ন হাসি লেগেই থাকত,—এখন সে মুখ গাম্ভীর্যে ভরা। একদিন যে তিনি—সওয়ার সৈনিকদের অফিসার ছিলেন—মুখে তার এতটুকু ছাপ নেই, তাঁকে গির্জার একজন অতি উচ্চপদস্থ যাজক বলে মনে হ'ল। জোসেফ নিজের গায়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে দেখে আমি এতটুকু বিস্মিত হলাম না। বিশপ তাঁর মাথাটি মৃদু নমস্কারে নত করলেন।

তিনি বল্লেন "আমাকে রোগীর কাছে নিয়ে চলুন।"

আমি পথ ছেড়ে দিয়ে আমার আগেই তাঁর উপরে সিঁড়িতে ওঠার ব্যবস্থা করে দিলাম, কিন্তু উনি আমাকেই প্রথমে উঠতে নির্দেশ দিলেন। আমরা অতি গম্ভীর নিস্তব্ধতায় উপরে উঠতে লাগলাম। এলিয়টের ঘরে প্রবেশ করে বল্লাম :

"এলিয়ট, বিশপ নিজেই এসেছেন।"

বসার ভঙ্গীতে ওঠার জন্য এলিয়ট আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল—বল্লে :

"মঁসিনর—এ সম্মান আমি সাহস করে কোনদিন প্রত্যাশা করিনি।"

"নড়বেন না বন্ধু!" এই বলে বিশপ আমাকে ও নার্সকে বল্লেন : "আপনারা যান।" তারপর এ্যাবেকে বল্লেন "আমি প্রস্তুত হ'লেই তোমাকে ডাকব।"

এ্যাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন—অনুমান করলাম চ্যালিসটা রাখার জায়গা খুঁজছেন। আমি ড্রেসিং টেবলে রক্ষিত কূর্মপৃষ্ঠ শোভিত ব্রাস সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে দিলাম,—নার্স নীচে নেমে গেল, আমি এ্যাবেকে নিয়ে যে ঘরটায় এলিয়ট পড়াশোনা করত সেইখানে গেলাম। জানলার বাইরে উন্মুক্ত নীলাকাশ, তিনি এগিয়ে গিয়ে একটি জানলা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বসে পড়লাম।

আকাশে অগণন তারকার যেন দৌড় চলেছে, ঘন নীলের ওপর দ্যুতিময় প্রকাশ। একটি বড় দ্বিমাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজ লাল পাল তুলে হারবারের দিকে চলেছে, বুঝলাম এগুলি চিংড়ি মাছের নৌকা, সার্ডিনিয়া থেকে ক্যাসিনোর ভূরিভোজের আসরের খাদ্য বয়ে নিয়ে আসছে। বন্ধদ্বারের ভিতর থেকেও আমি কণ্ঠস্বরের ফিস্‌ফিসানি শুনতে পাচ্ছিলাম। এলিয়ট তার স্বীকারোক্তি করছে। আমার সিগারেট খাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আশংকা ছিল এ্যাবে হয়ত আহত হবেন। তিনি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিলেন, তরঙ্গায়িত ঘন কালো চুল, সুন্দর কালো চোখ, জলপাই রঙের গাত্র চর্মে তার ইতালীয় উৎপত্তি পরিস্ফুট। তার ভঙ্গিমায় দক্ষিণী বহ্নি পরিস্ফুট, তাই মনে মনে প্রশ্ন জাগল কোন্ ধর্ম বিশ্বাসের তাড়না, কি জলন্ত বাসনায় এই তরুণ তার স্বভাবোচিত জীবনোপভোগের কামনা বিসর্জন দিয়ে ভগবানের সেবায় আত্ম-নিবেদন করে দিয়েছে।

সহসা পাশের ঘরের কণ্ঠস্বর থেমে গেল। আমি দরজার পানে তাকালাম। দরজা খুলে গেল বিশপ এলেন।

এ্যাবেকে তিনি বল্লেন : 'venez'—এদিকে এস।

আমি একাই রইলাম। আমি পুনরায় বিশপের কণ্ঠস্বর শুনলাম, জানতাম উনি সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছেন—অন্তিমকালের জন্য চার্চ যে প্রার্থনা নির্দেশ দিয়েছে। পুনরায় স্তব্ধতা—বুঝলাম এলিয়ট খৃষ্টের দেহ ও রক্তের অংশ গ্রহণ করছে। কেন জানিনা, হয়ত পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই স্বভাব পেয়েছি, ক্যাথলিক না হলেও আমি কখনও ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে 'মাস' প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে পারি না—ঘণ্টার আওয়াজে আমার হৃৎকম্প হয়। এখনও আমার শরীরে সেই রকম কাঁপন ধরল—একটা শীতল বাতাস অঙ্গ বেয়ে প্রবাহিত হল। ভয় ও বিস্ময়ের কম্পন। দরজা পুনরায় খুলে গেল।

বিশপ বল্লেন : 'আপনি এবার আসতে পারেন।"

আমি ঘরে গেলাম, এ্যাবে কাপ ও ছোট্ট গিল্টের প্লেটটি কেম্ব্রিকের কাপড় দিয়ে ঢাকছেন। তার ভিতর খৃষ্টের অন্তিমভোজের স্মারক রুটি রয়েছে।

এলিয়টের চোখ জ্বলছে।

সে বলল : 'মঁসিনরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এস।"

আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম, জোসেফ ও দাসীবৃন্দ হলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, দাসীরা কাঁদছে, তিনজন দাসী, তারা একে একে এসে বিশপের কাছে হাঁটুমুড়ে বসে তাঁর আংটি চুম্বন করল। বিশপ দুটি আঙুল তুলে তাদের আশীর্বাদ জানালেন। জোসেফের স্ত্রী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে বিশপের দিকে ঠেলে দিল সে তখন হাঁটুমুড়ে বসে আংটি চুম্বন করল। বিশপ ম্লান হাসলেন, বল্লেন তুমি বুঝি 'ফ্রী থিংকার'?

দেখলাম জোসেফ কথা বলার চেষ্টা করছে।

বল্লে : "হ্যাঁ মঁসিনর।

"তার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়োনা, তুমি তোমার প্রভুর বিশ্বাসী কর্মচারী ছিলে—বিধাতা তোমার বিশ্বাসের ত্রুটি উপেক্ষা করবেন।"

আমি ও'র সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত গেলাম—তার গাড়ির দরজা খুলে দিলাম। তিনি আমার দিকে মাথা নামিয়ে নতি জানালেন—তারপর ভিতরে যেতে যেতে বল্লেন :

"আমাদের বন্ধুটির অতি খারাপ অবস্থা—তার যা কিছু ত্রুটি সবই বাহ্যিক, অন্তরে ওর মহানুভবতা ছিল—সহচরদের প্রতি করুণা ছিল।" (ক্রমশঃ)

সোভিয়েট কূটকৌশল না শান্তি কামনা?

গত সপ্তাহের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী জেনারেলিসিমো স্ট্যালিনের বিবৃতি দান। তাঁর বিবৃতির মধ্যে বেশ খানিকটা ভাসা ভাসা অস্পষ্ট ভাব ও 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের কূটনীতি থাকলেও এ বিবৃতি বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা চাঞ্চল্যের সূত্রপাত করেছিল। করারই কথা। কারণ, জেনারেলিসিমো স্ট্যালিন অত্যন্ত সংযত-বাক্ ও স্বল্পভাষী। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র-নায়কের মত তিনি প্রতিনিয়ত বক্তৃতা বা বিবৃতি দেন না। ফলে মাঝে মাঝে অকস্মাৎ তিনি যে কথা বলেন সে কথা যতই সাধারণ হোক, তাই সমস্ত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রথম শ্রেণীর সংবাদের মর্যাদা পায়। এক্ষেত্রেও অনেকটা তাই হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্স্ট গ্রুপের আন্তর্জাতিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মিঃ কিংসবারি স্মিথের কয়েকটি প্রশ্নের যে উত্তর স্ট্যালিন দিয়েছেন তাই মস্কো বেতার থেকে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে কিছুটা আন্তর্জাতিক চমকের সৃষ্টি হয়েছে। স্ট্যালিনের মূল বক্তব্য হল তিনটি—তিনি শান্তি আলোচনার জন্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত, প্রয়োজন হলে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিতভাবে বিশ্বযুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করে চুক্তি স্বাক্ষর করতে তিনি রাজী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেন যদি পশ্চিম জার্মানীতে স্বতন্ত্র গভর্নমেন্ট স্থাপনের কল্পনা ত্যাগ করে ও ত্রিশক্তি কর্তৃক আরোপিত ব্যবসায় বাণিজ্য ও যোগাযোগ ঘটিত বাধা-নিষেধ তুলে নেয় তবে তিনি বার্লিন অবরোধের ঘোষণা করতেও প্রস্তুত। এ কথা কয়টি খুব নতুন মনে হলেও কার্যত নতুন নয়। এই ধরণের কথাবার্তা আমরা ইতিপূর্বে বহু সোভিয়েট নেতার মুখ থেকে শুনেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও চোখের উপর দেখছি বার্লিন সম্বন্ধে মস্কো আলোচনার ব্যর্থতা। তবু বর্তমানে পৃথিবী দুটি সুস্পষ্ট পরস্পরবিরোধী ব্লকে পরিণত হওয়ায় শান্তির সম্ভাবনা যেরূপ দ্রুত তিরোহিত হয়ে চলেছে তার পটভূমিকায় স্ট্যালিনের কথা কয়টি বেশ গুরুত্ব নিয়েই দেখা দিয়েছিল এবং যুদ্ধের আশঙ্কায় পীড়িত বিশ্বজনমতের একাংশকে প্রভাবান্বিত করতেও হয়তো পেরেছিল।

বিশ্বজনমতের উপর স্ট্যালিনের এ বিবৃতি যে প্রভাবই বিস্তার করে থাকুক না কেন—যাঁদের উদ্দেশ্যে এ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁরা কিন্তু এর দ্বারা বিভ্রান্ত হন নি। বলা বাহুল্য,

আমরা মার্কিন নেতৃবৃন্দের কথাই বলছি। তাঁরা এই নতুন সোভিয়েট প্রস্তাবের পিছনে যে কূটনীতি আছে তা ধরে ফেলেছেন এবং ফলে ৩০শে জানুয়ারী তাঁর শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করে স্ট্যালিন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে-ছিলেন, ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডীন্ অ্যাকেসন্ তার উপর যবনিকা টেনে দিয়েছেন। এই প্রস্তাব নাকচ করে দেবার সমর্থনে মিঃ অ্যাকেসন্ যে কয়টি যুক্তি দেখিয়েছেন তা উপেক্ষা করা চলে না। তিনি বলেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন একতরফা শান্তি আলোচনা করতে রাজী নয়। আলোচনা যদি করতেই হয় তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ইউরোপীয় সহযোগী ফ্রান্স ও বৃটেনকে সঙ্গে নিয়েই আলোচনা করবে। দ্বিতীয়ত বিনা সর্তে বার্লিনের বুক থেকে সোভিয়েট অবরোধের অবসান ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত কোন আলাপ-আলোচনার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তৃতীয়ত মিঃ অ্যাকেসন্ মনে করেন যে, সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সনদ অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন করে যুদ্ধবিরোধী কর্মনীতি ঘোষণা করার কোন অর্থ হয় না। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবের এই উক্তিগুলিকে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। তা ছাড়া শান্তি প্রস্তাব সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সন্দেহের চোখে দেখার আর একটি কারণও আছে। স্ট্যালিন বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে এতটা আগ্রহান্বিতই যদি হন, তবে তিনি একটি বে-সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নের উত্তরে এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করলেন কেন? এমন নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার কূট-নৈতিক সম্পর্ক নেই। তিনি মস্কোস্থিত মার্কিন দূতাবাস বা ওয়াশিংটনস্থিত সোভিয়েট দূতাবাসের মাধ্যমে অতি সহজে সরাসরি এ প্রস্তাব করতে পারতেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে। কিন্তু তা তিনি করেন নি। তাই মার্কিন রাজনৈতিক মহল স্ট্যালিনের এ প্রস্তাবে আদৌ উৎসাহ দেখান নি। তাঁরা এ শান্তি আলোচনার প্রয়াসের পিছনে সোভিয়েট কূট-নৈতিক চালকেই বড় করে দেখতে পেয়েছেন।

ইউরোপীয় রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়কত্বে সোভিয়েটবিরোধী পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন সমাপ্তপ্রায়। আর কিছুদিনের মধ্যে অতলান্তিক চুক্তিও সম্পন্ন হয়ে যাবে। পূর্ব ইউরোপ থেকে পশ্চিম ইউরোপে কম্যুনিজমের প্রসার বন্ধ হয়ে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। বার্লিনে অবরোধ সৃষ্টি করে সোভিয়েট রাশিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে যতটা বিপদে ফেলতে পারবে ভেবেছিল—ততটা বিপদে তারা পড়ে নি। তাই আজ সোভিয়েট রাশিয়া তার কূটনীতি পালটাতে চায়। সে আজ শান্তি স্থাপনের আগ্রহ দেখিয়ে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের সোভিয়েটবিরোধী রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রয়াস শিথিল করে দিতে চায়—ফাটল ধরাতে চায় তার ঐক্যবদ্ধ সংহতিতে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ফাঁদে পা দিতে রাজী হয় নি। অতএব শান্তি আলোচনার সম্ভাবনার উপর এইখানেই যবনিকা পড়ল।

শান্তির জন্যে সোভিয়েট প্রস্তাব ও মার্কিন পক্ষের জবাব—এ দুটোর মধ্যেই অনেক কিছু অকথিত রয়ে গেছে বলে আমরা মনে করি। তা নইলে যে প্রস্তাব মূলেই গ্রহণযোগ্য নয়, সে সম্বন্ধে আলোচনার স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে ট্রুম্যান-স্ট্যালিন ভাসুর-ভাদ্রবৌ-এর রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন কেন? বার্লিন সমস্যা নিয়ে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচার-পতি মিঃ ভিন্‌সিন্‌কে নিজের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে মস্কো পাঠানোর প্রস্তাব তুলতেও ট্রুম্যানকে আমরা দেখেছিলাম। সেই ট্রুম্যান আজ ধুয়ো তুলেছেন যে, স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর কোন অসম্মতি নেই—তবে সে সাক্ষাৎকার মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটনে হওয়া চাই। তিনি ওয়াশিংটনের বাইরে এক পা-ও যেতে রাজী নন। অপরপক্ষে স্ট্যালিন অবশ্য মস্কোর চারদিকে তাঁর সীমারেখা টেনে দেন নি—তবে তিনি স্বাস্থ্যহানির অজুহাত তুলে বলেছেন যে, রাশিয়া—বড় জোর পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়ায় তিনি ট্রুম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত। সুতরাং এ দুটি সমান্তরাল রেখা কখনও একত্রিত হবার সামান্য সম্ভাবনা মাত্র নেই। তাই যদি হবে, তবে অহেতুক স্থান নির্ণয় নিয়ে এতটা ঘটা কেন?

এসব দেখে শুনে স্পষ্ট মনে হয় যে, এসব হল নিতান্তই বাহ্যিক ব্যাপার—আসলে বিরোধ রয়ে গেছে অন্যত্র। সে বিরোধের কথা স্ট্যালিন কিংবা ট্রুম্যান কেউ স্পষ্ট করে বলতে রাজী নন। এ বিরোধের মূলগত কারণ হল পরস্পর-বিরোধী আদর্শঘটিত—আসলে সেখানে আপোষরফার কোন অবকাশ নেই। কম্যুনিস্ট সোভিয়েট রাশিয়া ও ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিভূ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকের পৃথিবীতে

দুটি স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ ও রাষ্ট্রাদর্শের ধারক। এ দুটি পরস্পরবিরোধী। সোভিয়েট রাশিয়া শান্তি চায় আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি চায় না—এরূপ কোন কথা নেই। শান্তি চায় উভয়েই—তবে সে শান্তি প্রত্যেকেই চায় নিজের নিজের মতানুযায়ী। এরূপ একটি পরিস্থিতি থাকলে যে বিরোধও থাকবে—এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? এই মূল কারণ দূর না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হবার আশা দুরাশা মাত্র।

স্বস্তি পরিষদের নতুন প্রস্তাব

ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্যে বিশ্বশান্তি পরিষদ নতুন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে তাঁদের পক্ষে উপায় ছিল না। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারটি নিয়ে বিশ্ববাসীদের কাছে চরম লজ্জায় পড়ে গেছেন তাঁরা। ইন্দোনেশিয়া রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ডাচরা যখন আকস্মিক অভিযান করেছিল, তখন স্বস্তি পরিষদ একত্রিত হয়ে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেন এবং সেই সঙ্গে ধৃত রিপাব্লিকান নেতৃবৃন্দের মুক্তিরও সুপারিশ করেন। কিন্তু কাকস্য বেদনা। ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী হল্যাণ্ড নির্বিঘ্নে স্বস্তি পরিষদের নির্দেশ উপেক্ষা করে চলেছিল। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতাদের ডাচরা ধরে রেখেছে সুমাত্রার অদূরে বাঁকা দ্বীপে। সেখানে তাঁদের অসুবিধার অন্ত নেই। ইন্দোনেশিয়ার সংগ্রামরত জাতীয়তাবাদী কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর ডাচদের নির্মম নির্যাতনের যে সব কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে সে সব পড়লে ঘৃণায় শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। স্বস্তি পরিষদ ডাচদের এই বর্বর অনাচারের বিরুদ্ধে সামান্যমাত্র প্রতিবাদ না জানিয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তাকেও তারা মেনে নিতে সম্মত হয় নি। ইত্যবসরে ডাচদের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে এশিয়ার জনমত দানা বেঁধে উঠেছে এবং তার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি নয়াদিল্লীর এশিয়া সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে। ডাচ-ইন্দোনেশীয় বিরোধ মীমাংসার জন্যে স্বস্তি পরিষদের উপর চাপ দেওয়া এবং এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের ইতিকর্তব্য নির্দেশ করাই ছিল এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এশিয়ার ১৯টি দেশের সম্মিলিত এই ৮ দফা দাবীকে স্বস্তি পরিষদ যে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি তার প্রমাণ আমরা পেলাম স্বস্তি পরিষদের নতুন প্রস্তাব থেকে।

এই নতুন প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ ৪টি দেশ। এই গৃহীত প্রস্তাবটির মধ্যে আমরা জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশিয়ার দাবীর আংশিক পরিপূরণ মাত্র দেখতে পেলাম। এশিয়া সম্মেলনের তরফ থেকে যে সর্বনিম্ন দাবী করা হয়েছিল তাও পরিপূরণ করা হয় নি। তবু স্বস্তি পরিষদের প্রথম প্রস্তাবের তুলনায় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অনেকগুণে ভাল হয়েছে—একথাটা অনস্বীকার্য। এ প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারা উপধারাকে কিভাবে কার্যকরী করা হয় না হয় তার উপরেই এ প্রস্তাবের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করবে। পরস্পর বিবদমান দুটি পক্ষকে একই যোগে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হলে আপোষ প্রস্তাব যেরূপ দুর্বল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক—এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক অভিযান চালিয়ে ডাচরা যে ফল পেতে চেয়েছিল তা তারা পেয়েছে। তারা চেয়েছিল সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে রিপাব্লিকের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে। তা তারা করেছে এবং রিপাব্লিক নেতৃবৃন্দকে তারা জানিয়ে দিয়েছে যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে রিপাব্লিককে তারা আর স্বীকার করে না। স্বস্তি পরিষদ এই নতুন প্রস্তাবে ডাচদের এই অন্যায় দাবীকে বহুলাংশে মেনে নিয়েছেন। ডাচদের অন্যায় সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবে একটি কথাও নেই। কিংবা রিপাব্লিককে তার পূর্বাবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সম্বন্ধেও একটি কথা নেই। শুধু বলা হয়েছে যে, রিপাব্লিকের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে যোগজাকার্তা অঞ্চলে তাঁদের কার্য পরিচালনার স্বাধীনতা দিতে হবে। পুরনো রিপাব্লিকের অস্তিত্ব পুনঃস্থাপিত হবে কি না এর থেকে সে কথা বোঝা যায় না। ১৯৪৯ সালের ১৫ই মার্চের মধ্যে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় অন্তর্বর্তী ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এশিয়া সম্মেলনের প্রস্তাবানুসারে এই ফেডারেল গভর্নমেণ্টের পরিপূর্ণ আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা, বৈদেশিক স্বাধীনতা ও সেনাবাহিনীর উপর পরিপূর্ণ অধিকার থাকবে কি না—সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় নি। ইন্দোনেশিয়ার ভাবী রাষ্ট্ররূপ নির্ধারণের জন্যে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু তার আগে ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচ সৈন্য অপসারিত করা হবে কি না সে সম্বন্ধে স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব নীরব। ১৯৫০ সালের ১লা জুলাইএর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌম স্বাধীনতা অর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য প্রস্তাবে। এশিয়া সম্মেলনের প্রস্তাবে ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে এই সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরের সুপারিশ করা হয়েছিল। মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে অবশ্য বিশেষ কিছু যায় আসে না। মূলগত বিরোধ থেকে গেছে ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচ সৈন্যের অপসারণ প্রসঙ্গে। ডাচরা এখন বিজয়ী এবং সৈন্যশক্তি আছে তাদের দখলে। এ অবস্থায় কোন সুস্থ আপোষ-আলোচনা সম্ভব নয় কিংবা পক্ষপাতহীন কোন স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানও সম্ভব নয়। সুতরাং এই প্রশ্নটি অমীমাংসিত থাকলে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক সমস্যারও সমাধান হবে না। উভয়পক্ষের মধ্যে মীমাংসা বিধানের জন্যে স্বস্তি পরিষদের পক্ষ থেকে একটি নতুন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান সদিচ্ছা কমিটির তুলনায় এই কমিশনের হাতে অধিকতর ক্ষমতাও অর্পণ করা হয়েছে। এই কমিশনের উপর কর্তৃত্ব থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এই কমিশন আপোষ-মীমাংসার ব্যাপারে কোন পথ নেন তারই উপর স্বস্তি পরিষদের সমগ্র ইন্দোনেশিয়া পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভরশীল। ডাচরা এখনও সরকারীভাবে স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব মেনে নেয় নি কিংবা রিপাব্লিকের নেতৃবৃন্দকে মুক্তিও দেয় নি। রিপাব্লিক বহির্ভূত অন্যান্য ফেডারেশনপন্থী রাষ্ট্রের নায়করা সম্প্রতি একত্রিত হয়ে ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গঠন সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং সম্মিলিত ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গঠনের ব্যাপারে রিপাব্লিকের বন্দী নেতৃবৃন্দকে রিপাব্লিক গভর্নমেণ্ট বলে স্বীকার করে নিতে সম্মত হয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করেছেন। এই প্রস্তাব বন্দী রিপাব্লিক নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করাও হয়েছে। এই প্রস্তাবে তাঁদের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায় নি। মোট কথা, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় জীবনে আর এক দফা আপোষ আলোচনার সূত্রপাত হল বলে আমরা মনে করি। এর পরিণতি কি হয় তাই জানার জন্যে আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

৬-২-৪৯

দেশের স্বার্থকে সমস্ত কিছুর উর্ধে স্থান দিতে হইবে"—বলিয়াছেন আচার্য কৃপালনী। বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন —"অনেকে তাকে উর্ধে স্থানই দিয়েছেন,—একবারে শিকেয় তুলে!"

* * *

মৌলানা আজাদ ভারতের যাদুঘরের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, তাঁর উপর কথা বলা আমাদের সাজে না, তবু সবিনয়ে বলিব, সত্যিকারের প্রশংসাটা প্রাপ্য কিন্তু ভারতের চিড়িয়াখানার।

* * * *

পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন,—

"Official Delhi is not an ideal place for an individual to choose to live in".—"তবু To let বিজ্ঞাপন দেখার জন্যে নতুন ভাড়াটেদের উৎসাহের অন্ত নেই"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * * * *

CULTURAL contacts should have no frontier and admit of no obstacles—বলিয়াছেন খাজা নাজিমুদ্দীন। "কিন্তু culture-এর চাইতে agricultureটা যাদের বেশী আসে তারা কিন্তু ভাবেন অন্য রকম"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

পূর্ব-পাকিস্তানের এক সংবাদে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জে নাকি প্রায় পাঁচশত মাঝি

ধর্মঘট করিয়াছে। নৌকা বানচালের সংবাদ অবশ্য এখনও পাওয়া যায় নাই।

* * * *

শুনিলাম হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের মধ্যে উন্মাদ বিনিময়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা ব্যবস্থাটির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। বরং হিন্দুস্থানী উন্মাদ পাকিস্থানে এবং পাকিস্থানী উন্মাদ হিন্দুস্থানে থাকিলেই অচিরে তাদের সুস্থ হইয়া উঠার সম্ভাবনা ছিল।

* * * *

বাঙলা সরকার কলিকাতাতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, সাধারণের পক্ষ হইতে "৪৯ ধারা" প্রবর্তনের চেষ্টা করা হইবে না।

* * * *

প্রসংগত সর্দার প্যাটেলের মন্তব্য মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছেন—
Incidents in Calcutta are not the way of Swaraj but of China.—

—খুড়ো এই মন্তব্যে যোগ দিয়া বলিলেন, —Way of জাহান্নম।

* * * *

গভর্নমেণ্টের নিকট জনসাধারণের সর্বপ্রকার দাবীর কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন,—"It is not a ma-Bap Government."—"তাতে অবশ্যি আমাদের বিশেষ আপত্তির কারণ নেই, শুধু অনুরোধ গভর্নমেণ্ট যেন সব সময় আমাদের সংগে বেয়াইর পরিহাস না করেন"—মন্তব্য বলা বাহুল্য খুড়োর।

* * * *

শ্যামলাল এই প্রসংগটার জের টানিয়া বলিল, "ভরসা বিশেষ নেই খুড়ো, সেদিন শ্রীমতী সরোজিনী খোলসা বলে দিয়েছেন—Governors of India today are only jokers,—তাদের joker হলেও না হয় সান্ত্বনা ছিল!"

শ্রীযুক্ত শান্তনম্ বলিয়াছেন,—
If the people were willing to bear additional burden, the Government would gladly meet railwaymen's demand—
খুড়ো বলিলেন,—"চাপালেই হয়, বোঝার ওপর শাকের আঁটি বৈ তো নয়!"

* * * *

রাজাজী বলিয়াছেন,—"Let us remember that there is God in every living thing"—"তা মনে রাখা ভালো, তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে শিব যেমন আছেন, তেম্নি ঘেঁটু ওলাইচণ্ডীও আছেন"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * * *

রাজাজী আরও বলিয়াছেন,—"Our people are the atta and the Government loaf" "কিন্তু তেঁতুল বীচি কা'রা সে কথা কিন্তু রাজাজী বলেননি"—বলা বাহুল্য এ মন্তব্য খুড়োর।

* * * * *

আমাদের সৈন্যাধিপতি শ্রীযুত কারিয়াপ্পা বলিয়াছেন,—"We are servants of people." আমাদের রাষ্ট্রপতিও বলিয়া-

ছিলেন যে, তিনি একজন humble servant মাত্র, উড়িষ্যার প্রদেশপাল জনাব আসফ আলিও নিজেকে servant বলিয়াই জাহির করিয়াছিলেন।

"চাকরের সংখ্যা এই হারে বাড়তে থাকলে মনিব খুঁজে পাওয়া দায় হবে"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

মহাত্মাজীর নির্দিষ্ট পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতে পারিব সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে।"—বলিয়াছেন বাঙলার প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু। "সন্দেহ আমাদেরও

দুটি স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ ও রাষ্ট্রাদর্শের ধারক। এ দুটি পরস্পরবিরোধী। সোভিয়েট রাশিয়া শান্তি চায় আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি চায় না—এরূপ কোন কথা নেই। শান্তি চায় উভয়েই—তবে সে শান্তি প্রত্যেকেই চায় নিজের নিজের মতানুযায়ী। এরূপ একটি পরিস্থিতি থাকলে যে বিরোধও থাকবে—এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? এই মূল কারণ দূর না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হবার আশা দুরাশা মাত্র।

স্বস্তি পরিষদের নতুন প্রস্তাব

ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্যে বিশ্বশান্তি পরিষদ নতুন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে তাঁদের পক্ষে উপায় ছিল না। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারটি নিয়ে বিশ্ববাসীদের কাছে চরম লজ্জায় পড়ে গেছেন তাঁরা। ইন্দোনেশিয়া রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ডাচরা যখন আকস্মিক অভিযান করেছিল, তখন স্বস্তি পরিষদ একত্রিত হয়ে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেন এবং সেই সঙ্গে ধৃত রিপাব্লিকান নেতৃবৃন্দের মুক্তিরও সুপারিশ করেন। কিন্তু কাকস্য বেদনা। ক্ষুদ্রে সাম্রাজ্যবাদী হল্যান্ড নির্বিঘ্নে স্বস্তি পরিষদের নির্দেশ উপেক্ষা করে চলেছিল। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতাদের ডাচরা ধরে রেখেছে সুমাত্রার অদূরে বাঁকা দ্বীপে। সেখানে তাঁদের অসুবিধার অন্ত নেই। ইন্দোনেশিয়ার সংগ্রামরত জাতীয়তাবাদী কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর ডাচদের নির্মম নির্যাতনের যে সব কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে সে সব পড়লে ঘৃণায় শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। স্বস্তি পরিষদ ডাচদের এই বর্বর অনাচারের বিরুদ্ধে সামান্যমাত্র প্রতিবাদ না জানিয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তাকেও তারা মেনে নিতে সম্মত হয় নি। ইত্যবসরে ডাচদের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে এশিয়ার জনমত দানা বেঁধে উঠেছে এবং তার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি নয়াদিল্লীর এশিয়া সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে। ডাচ-ইন্দোনেশীয় বিরোধ মীমাংসার জন্যে স্বস্তি পরিষদের উপর চাপ দেওয়া এবং এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের ইতিকর্তব্য নির্দেশ করাই ছিল এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এশিয়ার ১৯টি দেশের সম্মিলিত এই ৮ দফা দাবীকে স্বস্তি পরিষদ যে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি তার প্রমাণ আমরা পেলাম স্বস্তি পরিষদের নতুন প্রস্তাব থেকে।

এই নতুন প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ ৪টি দেশ। এই গৃহীত প্রস্তাবটির মধ্যে আমরা জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশিয়ার দাবীর আংশিক পরিপূরণ মাত্র দেখতে পেলাম। এশিয়া সম্মেলনের তরফ থেকে যে সর্বনিম্ন দাবী করা হয়েছিল তাও পরিপূরণ করা হয় নি। তবু স্বস্তি পরিষদের প্রথম প্রস্তাবের তুলনায় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অনেকগুণে ভাল হয়েছে—একথাটা অনস্বীকার্য। এ প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারা উপধারাকে কিভাবে কার্যকরী করা হয় না হয় তার উপরেই এ প্রস্তাবের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করবে। পরস্পর বিবদমান দুটি পক্ষকে একই যোগে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হলে আপোষ প্রস্তাব যেরূপ দুর্বল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক—এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক অভিযান চালিয়ে ডাচরা যে ফল পেতে চেয়েছিল তা তারা পেয়েছে। তারা চেয়েছিল সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে রিপাব্লিকের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে। তা তারা করেছে এবং রিপাব্লিক নেতৃবৃন্দকে তারা জানিয়ে দিয়েছে যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে রিপাব্লিককে তারা আর স্বীকার করে না। স্বস্তি পরিষদ এই নতুন প্রস্তাবে ডাচদের এই অন্যায় দাবীকে বহুলাংশে মেনে নিয়েছেন। ডাচদের অন্যায় সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবে একটি কথাও নেই। কিংবা রিপাব্লিককে তার পূর্বাবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সম্বন্ধেও একটি কথা নেই। শুধু বলা হয়েছে যে, রিপাব্লিকের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে যোগজাকার্তা অঞ্চলে তাঁদের কার্য পরিচালনার স্বাধীনতা দিতে হবে। পুরনো রিপাব্লিকের অস্তিত্ব পুনঃস্থাপিত হবে কি না এর থেকে সে কথা বোঝা যায় না। ১৯৪৯ সালের ১৫ই মার্চের মধ্যে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় অন্তবর্তী ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এশিয়া সম্মেলনের প্রস্তাবানুসারে এই ফেডারেল গভর্নমেণ্টের পরিপূর্ণ আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা, বৈদেশিক স্বাধীনতা ও সেনাবাহিনীর উপর পরিপূর্ণ অধিকার থাকবে কি না—সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় নি। ইন্দোনেশিয়ার ভাবী রাষ্ট্ররূপ নির্ধারণের জন্যে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু তার আগে ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচ সৈন্য অপসারিত করা হবে কি না সে সম্বন্ধে স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব নীরব। ১৯৫০ সালের ১লা জুলাইএর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌম স্বাধীনতা অর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য প্রস্তাবে। এশিয়া সম্মেলনের প্রস্তাবে ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে এই সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরের সুপারিশ করা হয়েছিল। মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে অবশ্য বিশেষ কিছু যায় আসে না। মূলগত বিরোধ থেকে গেছে ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচ সৈন্যের অপসারণ প্রসঙ্গে। ডাচরা এখন বিজয়ী এবং সৈন্যশক্তি আছে তাদের দখলে। এ অবস্থায় কোন সুস্থ আপোষ-আলোচনা সম্ভব নয় কিংবা পক্ষপাতহীন কোন স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানও সম্ভব নয়। সুতরাং এই প্রশ্নটি অমীমাংসিত থাকলে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক সমস্যারও সমাধান হবে না। উভয়পক্ষের মধ্যে মীমাংসা বিধানের জন্যে স্বস্তি পরিষদের পক্ষ থেকে একটি নতুন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান সদিচ্ছা কমিটির তুলনায় এই কমিশনের হাতে অধিকতর ক্ষমতাও অর্পণ করা হয়েছে। এই কমিশনের উপর কর্তৃত্ব থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এই কমিশন আপোষ-মীমাংসার ব্যাপারে কোন পথ নেন তারই উপর স্বস্তি পরিষদের সমগ্র ইন্দোনেশিয়া পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভরশীল। ডাচরা এখনও সরকারীভাবে স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব মেনে নেয় নি কিংবা রিপাব্লিকের নেতৃবৃন্দকে মুক্তিও দেয় নি। রিপাব্লিক বহির্ভূত অন্যান্য ফেডারেশনপন্থী রাষ্ট্রের নায়করা সম্প্রতি একত্রিত হয়ে ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গঠন সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং সম্মিলিত ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গঠনের ব্যাপারে রিপাব্লিকের বন্দী নেতৃবৃন্দকে রিপাব্লিক গভর্নমেণ্ট বলে স্বীকার করে নিতে সম্মত হয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করেছেন। এই প্রস্তাব বন্দী রিপাব্লিক নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করাও হয়েছে। এই প্রস্তাবে তাঁদের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায় নি। মোট কথা, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় জীবনে আর এক দফা আপোষ আলোচনার সূত্রপাত হল বলে আমরা মনে করি। এর পরিণতি কি হয় তাই জানার জনে আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

৬-২-৪৯

দেশের স্বার্থকে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে”—বলিয়াছেন আচার্য কৃপালনী। বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন —“অনেকে তাকে ঊর্ধ্বে স্থানই দিয়েছেন,—একবারে শিকেয় তুলে!”

* * *

মৌলানা আজাদ ভারতের যাদুঘরের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, তাঁর উপর কথা বলা আমাদের সাজে না, তবু সবিনয়ে বলিব, সত্যিকারের প্রশংসাটা প্রাপ্য কিন্তু ভারতের চিড়িয়াখানার।

* * * *

পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন,—

“Official Delhi is not an ideal place for an individual to choose to live in”.—“তবু To let বিজ্ঞাপন দেখার জন্যে নতুন ভাড়াটেদের উৎসাহের অন্ত নেই”—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * * * *

CULTURAL contacts should have no frontier and admit of no obstacles—বলিয়াছেন খাজা নাজিমুদ্দীন। “কিন্তু culture-এর চাইতে agricultureটা যাদের বেশী আসে তারা কিন্তু ভাবেন অন্য রকম”—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

পূর্ব-পাকিস্তানের এক সংবাদে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জে নাকি প্রায় পাঁচশত মাঝি

ধর্মঘট করিয়াছে। নৌকা বানচালের সংবাদ অবশ্য এখনও পাওয়া যায় নাই।

* * * *

শুনিলাম হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের মধ্যে উন্মাদ বিনিময়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা ব্যবস্থাটির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। বরং হিন্দুস্থানী উন্মাদ পাকিস্থানে এবং পাকিস্থানী উন্মাদ হিন্দুস্থানে থাকিলেই অচিরে তাদের সুস্থ হইয়া উঠার সম্ভাবনা ছিল।

* * * *

বাঙলা সরকার কলিকাতাতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, সাধারণের পক্ষ হইতে “৪৯ ধারা” প্রবর্তনের চেষ্টা করা হইবে না।

* * * *

প্রসংগত সর্দার প্যাটেলের মন্তব্য মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছেন—
Incidents in Calcutta are not the way of Swaraj but of China.—

—খুড়ো এই মন্তব্যে যোগ দিয়া বলিলেন, —Way of জাহান্নম।

* * * *

গভর্নমেন্টের নিকট জনসাধারণের সর্বপ্রকার দাবীর কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন,—“It is not a ma-Bap Government.”—“তাতে অবশ্যি আমাদের বিশেষ আপত্তির কারণ নেই, শুধু অনুরোধ গভর্নমেন্ট যেন সব সময় আমাদের সংগে বেয়াইর পরিহাস না করেন”—মন্তব্য বলা বাহুল্য খুড়োর।

* * * *

শ্যামলাল এই প্রসংগটার জের টানিয়া বলিল, “ভরসা বিশেষ নেই খুড়ো, সেদিন শ্রীমতী সরোজিনী খোলসা বলে দিয়েছেন—Governors of India today are only jokers,—তাসের joker হলেও না হয় সান্ত্বনা ছিল।”

শ্রীযুক্ত শান্তনম্ বলিয়াছেন,—
If the people were willing to bear additional burden, the Government would gladly meet railwaymen's demand—
খুড়ো বলিলেন,—“চাপালেই হয়, বোঝার ওপর শাকের আঁটি বৈ তো নয়।”

* * * *

রাজাজী বলিয়াছেন,—“Let us remember that there is God in every living thing”—“তা মনে রাখা ভালো, তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে শিব যেমন আছেন, তেমনি ঘেঁটু ওলাইচণ্ডীও আছেন”—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * * *

রাজাজী আরও বলিয়াছেন,—“Our people are the atta and the Government loaf” “কিন্তু তেঁতুল বীচি কা'রা সে কথা কিন্তু রাজাজী বলেননি”—বলা বাহুল্য এ মন্তব্য খুড়োর।

* * * * *

আমাদের সৈন্যাধিপতি শ্রীযুত কারিয়াপ্পা বলিয়াছেন,—“We are servants of people.” আমাদের রাষ্ট্রপতিও বলিয়া-

ছিলেন যে, তিনি একজন humble servant মাত্র, উড়িষ্যার প্রদেশপাল জনাব আসফ আলিও নিজকে servant বলিয়াই জাহির করিয়াছিলেন।

“চাকরের সংখ্যা এই হারে বাড়তে থাকলে মনিব খুঁজে পাওয়া দায় হবে”—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

মহাত্মাজীর নির্দিষ্ট পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতে পারিব সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে।”—বলিয়াছেন বাঙলার প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু। “সন্দেহ আমাদেরও

আছে, কেননা এ পথ প্রায় ট্রাম-বাসের পথেরই সামিল"—বলিলেন ট্রামে-বাসের জনৈক সহ-যাত্রী।

* * * *

গান্ধীজীর বিশাল হৃদয়-সমুদ্রে সহস্র সহস্র নদনদী আসিয়া মিলিত হইয়াছিল"—বলিয়াছেন সর্দার প্যাটেল। "সমুদ্র আজ নেই, তাই দেখছি—অনেক নদীই আজ শুধু—'আপন বেগে পাগলপারা'—" বলিলেন খুড়ো।

* * * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার "মহাজাতি সদনটি" নির্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। মহাজাতি নির্মাণের ভার অবশ্য জনসাধারণের, আশা করি, তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

* * * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি বিপুল ঘাটতির সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রমাণ হইয়া গেল, এ-সরকার জনগণেরই সরকার। টাকাকড়ির দিকটায় জনগণের সঙ্গে এ'দের আশ্চর্য মিল!

* * * *

গৌহাটিতে একদল মেয়ে একটি পুলিশ বাহিনীকে নাকি ঝাঁটা নিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। ঝাঁটাটা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের পর্যায়ে না পড়িলেও অচিরেই ঝাঁটার উপর লাইসেন্স প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

* * * * *

শুনিলাম, বর্তমান মাস হইতে গবর্ণমেণ্ট নাকি একশত উনসত্তরখানি বাস বন্ধ করিয়া দিবেন। "অতঃপর যাত্রীদের জন্য পুষ্পরথের ব্যবস্থা করবে থেকে হবে সে সংবাদ অবশ্যি এখনো জানা যায়নি"—বলিতে বলিতে বিশুখুড়ো বাস্ হইতে নামিয়া গেলেন।

এক সংবাদে প্রকাশ, হায়দরাবাদে একটি Man-eaterকে ধরিয়া দেওয়ার জন্য নাকি পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। "মেজর জেনারেল চৌধুরী নিশ্চয়ই এ-সংবাদ পাঠ করেছেন"—বলিল আমাদের শ্যামলাল।

* * * *
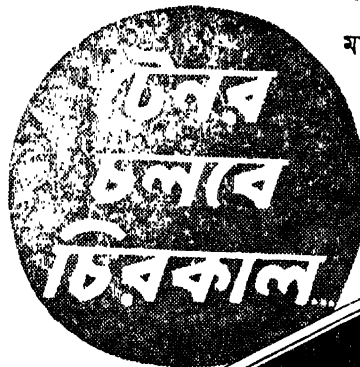
ব্যাধির পরাজয়

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির জয়

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে, শিশুর হাতও পুড়বে, বৃদ্ধের হাতও পুড়বে। পর্বতের কিনারায় পৌঁছে এগিয়ে পা বাড়ালে পড়তে হবে, পাপীকেও পড়তে হবে পুণ্যাত্মাকেও পড়তে হবে, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার দন্ড পেতেই হবে। মানুষের তৈরি নিয়ম উপেক্ষা করে কখন-সখন পার পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতি একজন কঠোর বিচারক, সে কাউকে ছেড়ে কথা কয় না, কাউকে রেহাই দেয় না। মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম সব জানতে থাকল, বিপদ থেকে সাবধান হয়ে চলল, আগুনে হাত দিল না, পর্বতের কিনারায় এসে আর এগিয়ে চলল না।

সুস্থ থাকতে হলে, নিরাময় থাকতে হলে মানুষকে কতকগুলি নিয়ম পালন করে চলতে হবে, অবহেলা করলে তার দাম দিতে হবে। নিয়ম জানিনে বললে চলবে না। মানুষের তৈরি আইন সম্বন্ধে যদিও সেই কথা আছে, তবু না জেনে অপরাধ করে ফেলেছে জানলে হাকিম একটু দয়াপরবশ হন। কিন্তু স্বাস্থ্যের নিয়ম ভাঙলে কোন ক্ষমা নেই। শুধু কি তাই, অনেক ব্যাপারে দু-তিন পুরুষ অবধি শাস্তি চলতে থাকে। এখানে আর এক বিপদ এই, স্বাস্থ্যপালনের নিয়ম সব কি কি, কোন্ ত্রুটিতে কি শাস্তি পেতে হবে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা বহুদিন মানুষ জানল না, শাস্তি পেল, কিন্তু কোন্ অপরাধের জন্য তা বুঝল না, সাবধান হতে পারল না। রোগ যখন এল, নিঃসহায় হয়ে ভুগতে থাকল মনে করল এ দেবতার ক্রোধ, দেবতাকে খুশি করবার উপায় ঠাওরাতে থাকল। আন্দাজে অনেক মুষ্টিযোগ, টোট্কা ব্যবহার করল, রোগ কখন সারল, কখন সারল না। রোগের ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে সময় সময় হয়ত ঠিক ওষুধটি পাওয়া গেল, কিন্তু রোগের উৎপত্তির কারণ জানা হল না। চিকিৎসক রুগীর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে একটা প্রেসক্রিপসন লিখে চলে গেলেন, কিন্তু সে রোগ একজন থেকে আর একজনে কি করে ছড়ায় সে সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছু জানেন না, সুতরাং কোন কথা জানিয়ে যেতে পারলেন না। শেষ অবধি ব্যাধিই জয়ী রইল। আর জয়ী বলে জয়ী! ইতিহাস থেকে দু'চারটে ঘটনা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

খৃষ্টপূর্ব ৮৮ সালে অক্টেভিয়সের সৈন্যদলের মধ্যে সতের হাজার লোক কোন এক সংক্রামক ব্যাধিতে মারা যায়। এক সময় অ্যাবসিনিয়া সৈন্যের ষাট হাজার লোক যে সংক্রামক রোগে মারা যায় বিজ্ঞানী এখন সেটাকে বসন্ত বলে মনে করে।

১৬৩২ সালে একা টাইফস দুদিকের দুই সৈন্যদলকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে, নিজেদের মধ্যে তাদের যুদ্ধ করতে হয়নি। ইউরোপে নেপোলিয়নের ক্ষমতা খর্ব করে যুদ্ধরত মানবশত্রু বা টাইফস প্রভৃতি ব্যাধি, তা জোর করে বলা চলে না, আর—সেদিনের কথা। ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইংলণ্ডের দেড় লক্ষ লোক প্রাণ দিল, একা লণ্ডন শহরের হিসেব হল ষাট হাজার।

কিন্তু বিজ্ঞান এগিয়ে এল, রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা আরম্ভ করল।

এডওয়ার্ড জেনার

আগের চিকিৎসকেরা রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে চলেছিলেন, এখনকার পদ্ধতি হল অন্য রকমের। কি কারণে একটা রোগ হয়, কিভাবে সেই রোগ ছড়িয়ে পড়ে, আর সেই রোগ একেবারে যাতে না আসে তার জন্য কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান অনুসন্ধান আরম্ভ করল।

জেনার ও বসন্তের টিকা

আগে বসন্ত রোগটা আকছার লোকের মধ্যে দেখা দিত। কেউ বাঁচত, অনেকে মরত। হওয়া না হওয়াটা মনে করত বিধির বিধান, হল তো হল, না হল তো না হল।

১৬৯৪ সালে ইংলণ্ডের রাণী মেরি এই রোগে মারা যান। এ সম্বন্ধে মেকলে তাঁর ইংলণ্ডের ইতিহাস পুস্তকে লিখলেন—

আজ বিজ্ঞান ওই রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছে। কিন্তু তখন সে অবস্থা ছিল না। প্লেগ অনেক লোককে নাশ করে চলে গেল বটে, কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায় প্লেগ মাত্র একবার দুবার এসেছে। বসন্ত যে বারোমেসে ব্যাপার ছিল। কবরস্থানে মড়ার পর মড়া আসছে। প্রত্যেক লোক ভয়ে অস্থির কাকে কখন ওই রোগে ধরে। রোগের আক্রমণ থেকে যারা বেঁচে উঠল তাদের দেহ কি ভয়ংকর হল। মা তার কোলের শিশুর দিকে চেয়ে আতঙ্কিত হল, যুবক তার বাগ্দত্তার দিকে আর তাকাতে পারে না।

বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়ের ইতিহাসটা হল এই রকম।—

জেনার তখন চিকিৎসা বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। ছাত্রাবস্থায়ও তিনি ভাবছেন কি করে বসন্তরোগের আক্রমণ থেকে মানুষকে বাঁচান যায়। একদিন এক গয়লানী কথায় কথায় বলল, —আমার আর বসন্ত হবার ভয় নেই, একবার হয়ে গিয়েছে। আশেপাশে গয়লাদের মধ্যে তখন এই কথা চালিত ছিল যে, একবার বসন্ত হলে আর দ্বিতীয়বার হয় না। কেন হয় না সে তারা জানে না, হয় না এই দেখে এসেছে। গয়লানীর এই কথায় জেনার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটি আলোর রেখা দেখতে পেলেন।

জেনার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন, আর শেষ অবধি একটি গ্রাম্য প্রবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন। ষোল বছর ধরে নানা রকম পরীক্ষা করে শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, গো-বসন্তের টিকা নিলে আর বসন্ত হবে না। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার পর ১৭৮৮ সালে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। প্রথম প্রথম সাধারণ লোক জেনারকে নিয়ে বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল। ব্যঙ্গ চিত্র বের হ'ল, গো-বসন্তের টিকা দেওয়ার ফলে মানুষের মাথা গরুর মাথা হয়ে গিয়েছে, মাথায় শিং গজিয়েছে। এ তো হল সাধারণ লোকের কথা। জেনার তাঁর পরীক্ষার বিবরণী রয়াল সোসাইটিতে পাঠালেন, রয়াল সোসাইটি থেকে তা ফেরত এল।

১৭৯৬ সালে ১৪ মে জেনার সব প্রথম একটি আট বছরের ছেলেকে গোরুর টিকা দিলেন। চারদিকে তখন বসন্ত হচ্ছে, কিন্তু দেখা গেল সেই ছেলেটির বসন্ত হল না। জেনারের এখন আর কোন সন্দেহ রইল না যে, তিনি মানব জাতিকে এক ভয়াবহ ব্যাধি থেকে মুক্ত করবার উপায় বের করতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর উপর বিদ্রূপ চলতেই থাকল। জেনার, একটুও দমলেন না। তিনি তাঁর ছেলেকে ছিল তিনবার টিকা দিলেন। নিকটে একটা সময় অনেক গরীব লোক বাস করত, জেনার বিস্কার

রক্ষকার
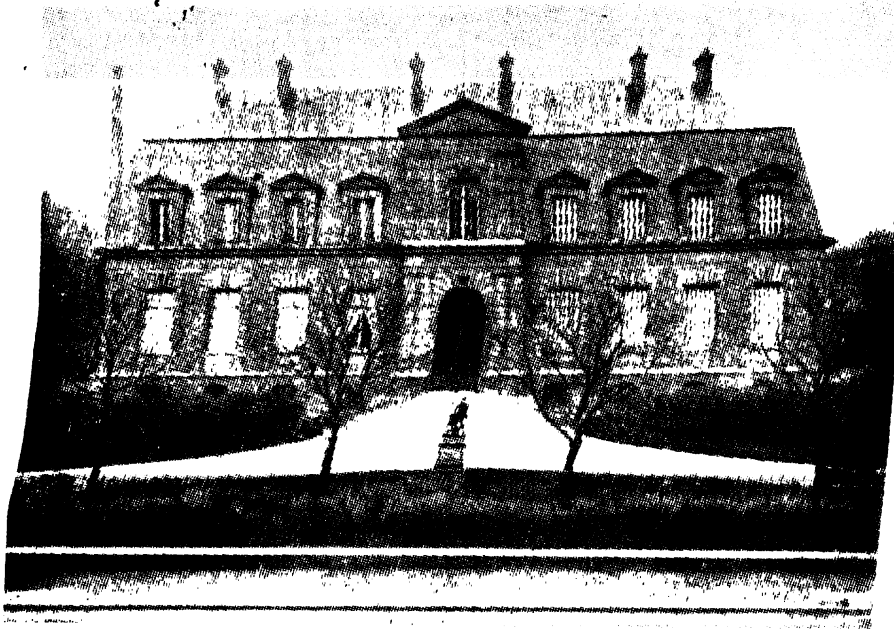
পাস্তুর ইনস্টিটিউট—প্যারিস

দেওয়া হয়। তিনি সমস্ত টাকাটা পাস্তুর ইনস্টিটিউটকে দিয়ে দিলেন। আসিরিস এই পুরস্কারটা দেন, তিনি রাউক্সকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এরকম করার কারণ কি? রাউকস উত্তর দিলেন আমার যা কিছু পরীক্ষা এই ইনস্টিটিউটেই করেছি, আর ইনস্টিটিউটের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। আসিরিস তখন চুপ করে রইলেন. কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর সম্পত্তির অনেকটা অংশ তিনি পাস্তুর ইনস্টিটিউটকে দান করে গিয়েছেন।

১৮৯৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর পাস্তুরের মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধি ক্ষেত্রের জন্য এই গবেষণাগারই ঠিক করা হল।

গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ দিয়ে অতি বৃহৎএর পরিচয় দিয়ে অমর হয়েছেন। পাস্তুর অণুবীক্ষণ দিয়ে অতিক্ষুদ্রের পরিচয়ে দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

(ক্রমশঃ)

শতাব্দীর কথা (মাসিক পত্র)—সম্পাদক শ্রীভবেশ ভট্টাচার্য। কার্যালয় ৪১নং বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সাড়ে তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা।

'শতাব্দীর কথা' মাসিক পত্রের প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইয়া প্রীত হইলাম। পত্রখানার পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও উৎকৃষ্ট রচনাবলী সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। আমরা পত্রখানার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ৯।৪৯

মোপাসাঁর গল্প—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীসলীল সেনগুপ্ত সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—নন্দা পাবলিশিং হাউস, ৫এ, বেলতলা রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য দুই টাকা বার আনা।

মোপাসাঁর গল্পের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছি। প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই দ্বিতীয় খণ্ডেও মোপাসাঁর বাছা বাছা গল্প অনুবাদিত হইয়াছে। এই খণ্ডে মোপাসাঁর 'শিল্পীর প্রেম," "পোহাইল রাত্রি," প্রভৃতি মোট পনেরটি গল্প পাঁচজন অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড যাঁহাদের আনন্দ দিয়াছে, তাঁহারা এই দ্বিতীয় খণ্ডও অবশ্যই পাঠ করিবেন। ২৩৬।৪৮

শিকারের কথা—শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

"শিকারের কথা"র লেখক নিজে শিকারী; তাঁহার শিকারের অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাগুলিকে তিনি যে নিজের স্মৃতির প্রকোষ্ঠে অর্গলবদ্ধ না রাখিয়া বালক বালিকাদের পাঠের জন্য গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। লেখকের বর্ণনা সুন্দর। স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা তাঁহার "শিকারের কথা"কে অধিকতর লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কাহিনীগুলি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি বন্য জগতের এক বিচিত্র রূপ এইগুলির মধ্যে ধরা দিয়াছে। সে জগতের যাহারা বাসিন্দা, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা পরিচয় লাভ করিতে পারিবে। বইখানার রচনা যেমন সুন্দর, তদনুপাতে বহিরবয়বে সৌন্দর্যের অভাব লক্ষিত হইল। পরবর্তী সংস্করণে বইখানাকে আরও সুষ্ঠু রূপে দেখিলে সুখী হইব। ১৭৬।৪৮

ইণ্ডিয়া না হিন্দ?—ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, হিন্দুস্থান সাহিত্য সঙ্ঘ, ৪নং সুবলচন্দ্র লেন, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

এই ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানা আগাগোড়া কাজের কথায় পূর্ণ। আমরা হিন্দু শব্দকে জাতি অর্থে ব্যবহার না করিয়া ধর্ম হিসাবে ব্যবহার করাতেই অভ্যস্ত, ফলে আমাদের সংহতি ব্যাহত হইয়াছে। ইংরেজের দেওয়া অসার ইণ্ডিয়া শব্দ পরিহার করিয়া হিন্দুস্থানের জাতি আমরা, 'হিন্দুস্থানী' জাতিরূপে আমাদের পরিচয় দেওয়া উচিত; লেখক নানা যুক্তির সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লেখকের এই কামনা সফল হইতেই চলিয়াছে। ১৮৬।৪৮

সুভাষবাদ—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার প্রণীত। গ্রন্থলেখা, ৮৯ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীবাদল গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন সম্বন্ধে অনেক বই-ই বাহির হইয়াছে। সেগুলি প্রধানতঃ বিবরণমূলক। কিন্তু

সুভাষচন্দ্রের কর্মপ্রচেষ্টাকে বিশ্লেষণ করিয়া বোধ হয় অধিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই। সেই হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থ নূতনত্বের দাবী করিতে পারে। রাজনীতিক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের অবদানকে লেখক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বইটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও মৌলিক চিন্তায় পূর্ণ; সুভাষচন্দ্রকে বুঝিবার পথে বইটি পাঠক-দিগকে নূতন আলোক দান করিবে। ১৯৬।৪৮

গান্ধীপন্থায় গ্রাম গঠন—শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—আই এ পি কোং লিমিটেড, ৮।স, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

লেখক গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ও গ্রাম উদ্যোগ প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কাজেই তিনি গান্ধীজীর পন্থায় গ্রাম গঠনের বিষয়ে পরামর্শ দিবার যোগ্য ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বইয়ের প্রত্যেকটি বিষয়ই তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে তিনি বিবৃত করিয়াছেন। গ্রাম গঠনের সমস্যা ও সমাধানের নানা ইঙ্গিত যেমন এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে, তেমনি গ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগকে নিবিড় করার একটা প্রেরণাও এই গ্রন্থপাঠে অধিগম্য হইবে। গ্রাম-উদ্যোগী কর্মীমাত্রেরই এবং পল্লীহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই ধরণের গ্রন্থাদি পাঠ করা উচিত। ২৭৭।৪৮

জ্ঞানের আলো—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্ত্র-ভাবে মুদ্রিত। প্রণেতা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মজুমদার এম-এ, বি-টি। প্রাপ্তিস্থান—(১) নারায়ণ লাইব্রেরী, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা; (২) শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য প্রথম ভাগ, আর্ট পেপারে ছাপা—এক টাকা চার আনা। দ্বিতীয় ভাগ—এক টাকা আট আনা।

"জ্ঞানের আলো" সাধারণ জ্ঞানের বই। ভারত ও পাকিস্থানের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শাসন সম্পর্কিত অনেক বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিখ্যাত ব্যক্তি-বর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের তথ্য, দেশ বিদেশের সাহিত্য, জ্যোতিষ ও পদার্থ বিদ্যার তথ্যাদি প্রভৃতি জানিবার ও মনে রাখিবার মত বহু বিষয় বইখানাতে পাওয়া যাইবে। বইখানা শিক্ষার্থীদের বিশেষ কাজে আসিবে। ২৭৩।৪৮

SMALL INDUSTRIES: Their Place in Post-War Industrialization. By D. N. Ghose M.A. General Printers and Publisher Ltd. 119 Dharamtala Street, Calcutta. Price Rs. 3|-

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বাঙলা সরকারের শিল্প (বিবর্ধন) বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর। দেশের শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার ধ্যানধারণা নিয়োগ করিয়া এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানা লিখিত হইয়াছে। দেশের ছোটখাট শিল্পগুলি কিভাবে পরিচালিত হইতে পারে; উহাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা কি কি, বিশেষত যুদ্ধোত্তর ভারতে ইহাদের অপরিহার্যতা লেখক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন। শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি বইটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ২০০।৪৮

ইশারা—শ্রীমৃণালকান্তি দাশ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীদেবেন্দ্র শ্যাম; মডার্ন বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য বইটি রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক আইভ্যান টুর্গেনিভের কয়েকটি কথিকার অনুবাদ। মৃণালকান্তি দাশ নিজে কবি; টুর্গেনিভের রচনা-গুলিও নামান্তরে গদ্যাকারের কবিতা। এই যোগাযোগের ফলে ইশারা'র রচনাগুলি ভাষায় ও ভাবসম্বেগে কবিতার মতই মনোরম হইয়া উঠিয়াছে; রচনাগুলি স্বচ্ছ, সাবলীল এবং কাব্যময়; অনুবাদ বলিয়া মনেই হয় না। বইটি আকারে ক্ষুদ্র। মূল্য আরও কমও হইতে পারিত। ২১৮/৪৮

কালাবদর (গল্প গ্রন্থ)—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক: দি গ্লোব লাইব্রেরী। ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। মূল্য—আড়াই টাকা।

অধুনাতন কালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ই বোধ-হয় একমাত্র উল্লেখযোগ্য গল্পকার যিনি অকুণ্ঠভাবে বাঙালী পাঠকের স্বীকৃতি-সমর্থ। তুলনামূলক বিচারে বিতর্কের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও, এ কথা আমি শ্যাক অনস্বীকার্য—পরিমিত সংযমবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতায়, আঙ্গিক ও ভাষাবিন্যাসের আশ্চর্য কলাকৌশলে, নিত্যনূতন বিষয়বস্তু ও দৃশ্য-দৃশ্যান্তরের আবিষ্কারসুলভ স্বকীয়তায়, বহুব্যাপী কল্পনাপ্রসারে এবং সব হইতে যাহা বড় কথা, বুদ্ধিদীপ্ত অথচ স্বাভাবিক সুস্থতায়, যেটি এ যুগে মহার্ঘতারই নামান্তর—তিনি অজাতশত্রু না হইলেও নিশ্চয়ই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। "কালাবদর" লেখকের সর্বাধুনিক গল্প-সংকলন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা, কম-বেশী নানা শ্রেণীর চিত্র-চরিত্রে মুখর—"টোপ, শৈব্যা, শিল্পী ও কালাবদর" ইত্যাদি মোট ন'টি গল্পে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের রূপায়ণ। উল্লিখিত প্রতিটি গল্পই, মাত্র কিছুদিন পূর্বেই, সুধীজন ও পাঠক সাধারণের নিকট আত্যন্তিক সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং প্রতিটিই আপন আপন পরিবেশে ও বৃন্তে সূর্যালোকিত একেকটি টলটলে শিশিরবিন্দুর মতই সমুজ্জ্বল—ছোটো-গল্পের যাহা পূর্ণ প্রাণধর্ম। অন্তঃসারশূন্য ধন-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপর শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুতীব্র কশাঘাত ও নদীপ্রান্তরের বেনামী ভুখা-মানুষের প্রতি নিগূঢ় মমত্ববোধে, বিদ্যুৎবহ্নি ও অশ্রুশ্রাবণের সমন্বয়িত যাদুরচনায় লেখকের যে অসাধারণ আত্মস্বাতন্ত্র্য—আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিটি রচনাতেও তাহার প্রাঞ্জল স্বাক্ষর সমভাবেই উৎকীর্ণ। শক্তিমান শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত "মেঘনানদীর মাঝি"র বলিষ্ঠ প্রচ্ছদপটটি, শুধু-মাত্র শোভাবর্ধনে নয়, গ্রন্থের মর্যাদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে। এইরূপ একটি সার্থক গল্পগ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশককেও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কৈফিয়ৎ

হরপ্রসাদ মিত্র

রোদে পিঠ দিয়ে
পায়রার মতো
ভেসে বেড়াবার ইচ্ছে নয়,
কাছে থাকবার,
কথা বলবার যন্ত্রণায়
মাঝে মাঝে মন
দূরে পাড়ি দেয়
ভবঘুরেদের মন্ত্রণায়।

ভিড়ে হাঁটবার,
শুধু খাটবার,
নানা ধাক্কার সমতলে—

ধুলো সুরকির
বনে ঘাসফুল উদ্ধত
তাই বুঝি রোদ উদ্যত ?

ফেরারীর দায়ে
সেও সাজা পায়,
আছে খরশান কাস্তে ?

তাহলে এবার
চুপি চুপি বলো
কাকে হবে ভালোবাসতে।

স্বপ্ন সত্তা

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

বিরাট আকাশে এক সমুদ্র দেখেছি—
যেন কত বিচিত্রতাময় :
শুভ্র মেঘে তুষারের আস্বাদ পেয়েছি,
সূর্যে দেখি শ্বেতাশ্বের গতির বলয়।

অপরূপ আলোর বিস্ময়
কাঁচা-সোনা রঙের প্লাবনে—
দীপ্ত করে আমার হৃদয়
আলো-ঝরা জ্যোতির শ্রাবণে।

মেদুর হৃদয় কত হল স্বপ্নময়,
শ্যামল তৃণের রঙে দেখেছি—
আসন বিছানো শত মায়াময়
গভীর আভাস তারি পেয়েছি।

নতুন তারায় আমি স্বপনে,
আকাশে প্রদীপ হয়ে জ্বলেছি—
চেতনা-মধুর মৃদু-পবনে,
ভাবনা-গগনে দ্রুত চলেছি।

ভাবনা-নির্ঝর নিত্যকালে
পাষাণে সুগোপন, আজো রয়—
স্বপন-বিজড়িত মোহজালে
ঘুমিয়ে জ্যোতির বিস্ময়।

এখনো তাই ক্ষীণ কারাগারে
বাধার আবরণ শুধু নামে।
অকূল ছবির পারাবারে
অবাধ স্রোত তাই যেন থামে।

জ্যোতির জোয়ারে তবু যাই
অযুত ছবির উপকূলে—
দূরের দেশ আজো খুঁজি তাই,
রয়েছে আপন প্রাণমূলে।

শ্রেষ্ঠ ছবির বিচার

আমাদের দেশে বছরকার শ্রেষ্ঠ ছবি নির্ণয় করার কোন সুসংগত ব্যবস্থা একরকম নেই বললেই চলে। বছর আষ্টেক আগে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন সাংবাদিকদের বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান প্রয়োগের ব্যবস্থা চালু করেছিলো এবং সে-বিচার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছিলো। কিন্তু দেশের রাজনীতিক অবস্থার জন্যে গত কবছর সাংবাদিকদের ঐ বিচার স্থগিত থাকায় লোককে ভাঁওতা দেবার জন্যে একধরণের বিচারের উদ্ভব হয়েছে। কোন কিছু ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগা এক কথা, আর তাকে দেশের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে জাহির করা আর এক কথা। জনকতক লোককে একজোট করিয়ে একটা কিছুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়ে নেওয়া শক্ত কথা নয় কিন্তু সে নির্ধারণ গ্রাহ্য হওয়া নির্ভর করছে বিচারকদের যোগ্যতার ওপরে। যার তার মত নেওয়া যেতে পারে কিন্তু যেহেতু বহু যে-সে লোক এক বিষয়ে একমত সুতরাং সেই মতই ধর্তব্য সেটা নিতান্তই ছেলেমানুষী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি ছবির ব্যাপারে এইরকম সব ছেলেমানুষীকে একদল চিত্রব্যবসায়ী প্রশ্রয় দিয়ে ব্যাপক করে তুলেছেন, যার ফলে সত্যিকারের গুণসম্পন্ন কীর্তি ও গুণী যাচ্ছে অবলুপ্তির মাঝে চাপা পড়ে আর সে জায়গায় নীরস জিনিস ও নীরেট লোককে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানের জন্যে ঢাক পিটিয়ে সামনে দাঁড় করানো হচ্ছে।

কিছুকাল আগে 'স্বয়ংসিদ্ধাকে' বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে লোককে ভাঁওতা দেওয়া হয়। কোন এক সংঘের সভ্যরা নাকি ঐ নির্ধারণে পৌছয় এবং চিত্রনির্মাতারা সেই নিয়েই হৈচৈ আরম্ভ করে দেন। সে সঙ্ঘ কিসের, তার সভ্যদের ছবির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের যোগ্যতা কি, বা বিচারে কোন পদ্ধতি অনুসরণ হয়েছে তা প্রকট করার দরকার কেউ দেখলে না। তারপর সেই নির্ধারণকেই ঢাক পিটিয়ে এমনি করা হলো যে, বহুলোকের ধারণাই হয়ে গেলো যে সত্যিই 'স্বয়ংসিদ্ধা' সে-বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি—অথচ বিশেষজ্ঞরা সেকথা ভাবতে শিউরে উঠবেন।

তেমনি এবার 'কালোছায়া'কে বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে ওর প্রযোজকরা ঘোষণা করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রেও কোন একটা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংঘ ছবিখানিকে শ্রেষ্ঠ বলে নির্ণয় করেছে আর প্রযোজকরা তাই লোকের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়ার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। প্রযোজকরা শুধু ঐ নির্ধারণেই ক্ষান্ত হননি, তারা 'গ্যালপ পোল'-এর(!) সাহায্যে ছবিখানির মধ্যে আরও অনেকদিকের শ্রেষ্ঠত্বের যে নির্ধারণে পৌছেচেন তাও জাহির করে বেড়াচ্ছেন। লোককে বিভ্রান্ত করার কত উপায়েরই না আশ্রয় নেওয়া হয়! নিজের ছবিকে কেউ শ্রেষ্ঠ বললে তাতে আপত্তি

না উঠতে পারে এবং নিজের ঘোষণাকে জোর দেবার জন্যে দু'একটা সংঘকে নাচিয়েও দেওয়া যায়। কিন্তু তাই ব'লে সেইটেই সমগ্র দেশের বিচার বলে ঘোষণা করার অধিকার বা আসে কোত্থেকে আর তার যুক্তিই বা কি?

বিলেত ও আমেরিকায় ছবির বিচারের অনেকগুলি ব্যবস্থা আছে। নামকরা পত্র-পত্রিকা মারফৎ নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় এবং নির্বাচিত ছবিখানিকে, 'অমুক পত্রিকার পাঠকদের মতে সবচেয়ে জনপ্রিয়' বা 'অমুক পত্রিকার পুরস্কার-প্রাপ্ত' ছবি বলে প্রচার করা হয়। আর শ্রেষ্ঠত্বের বিচার ওরা ছেড়ে দেয় 'একাডেমী অফ্ মোসন পিকচার্স আর্ট এণ্ড সায়েন্স' বা অনুরূপ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর। তা না হলে আলোক-চিত্র কি শব্দযোজনা কি অন্যান্য কলাকৌশলের উৎকর্ষ বিচার করার ক্ষমতা সাধারণ লোকের কি করে থাকতে পারে? আমাদের দেশে অবিশেষজ্ঞ জনসাধারণের ওপরে সে বিচারও ফেলে দেওয়া হয়। এতে ভালোর চেয়ে মন্দই বেশী হয় যেহেতু মাপকাঠির বিচারের চেয়ে লোকের ব্যক্তিগত ধারণাটাই প্রশ্রয় পেয়ে যায়, যুক্তি ও জ্ঞানের কোন মূল্যই থাকে না সে ক্ষেত্রে। তাতে প্রকৃত গুণীরও চাপা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই থেকে যায়।

পাকিস্থানে ভারতীয় পতাকা

একটা আন্তর্জাতিক নিয়ম আছে যে, যে কোন রাষ্ট্রে আর এক রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সংগীতের অবমাননা হতে পারবে না। কিন্তু পাকিস্থানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। ওখানে কোন ছবিতে ভারতীয় পতাকা, ভারতীয় জাতীয় সংগীত অথবা ভারতীয় নেতাদের ছবি থাকলে সে অংশ কেটে বাদ না দেওয়া পর্যন্ত সে-ছবি দেখাবার ছাড়পত্র পায় না। কোথাও বন্দে মাতরম বা জয় হিন্দ বা কোন জাতীয় ধ্বনি থাকবারও উপায় নেই। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এ নিষেধ কেবল মাত্র ভারতীয় ছবির ওপরই প্রয়োগ করা হচ্ছে। ব্রিটিশ কি আমেরিকান ছবিতে ওদের যার যার জাতীয় পতাকা, কি ধ্বনি, কি গান কিংবা নেতাদের ছবির জন্য কোনরকম বাধা-নিষেধ নেই। ভারতীয় ছবিতে এমন কি রামধুন পর্যন্তও বরদাস্ত করা হয় না। অথচ ভারতের কোথাও ওরকমের কোন বাধা নেই। এখানে 'বার্থ অব পাকিস্থান'ও দেখানো হয়। ছবিতে পাকিস্থানের পতাকার জন্যে কিম্বা পাকিস্থানের নেতাদের প্রতিকৃতির জন্যে কোথাও আজও আপত্তি উঠেছে বলেও জানা যায়নি। অথচ পাকিস্থানে ভারতীয় ছবির ঐরকম সব অংশের ওপর আপত্তি কি জন্যে হ'তে পারে বুঝে ওঠা ভার।

নূতন ছবির পরিচয়

কবি (চিত্রমায়া—রাধা ফিল্মস্)—কাহিনী, সংলাপ, গীত রচনা : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রযোজনা, চিত্রনাট্য, পরিচালনা : দেবকীকুমার বসু, আলোকচিত্র : ধীরেন দে, শব্দযোজনা : নৃপেন্দ্র পাল, সুরযোজনা : অনিল বাগচী, শিল্প নির্দেশ : শম্ভো মুখোপাধ্যায়; ভূমিকায় : রবীন মজুমদার, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী, আশু, নৃপতি, কুমার, গোকুল, হরিধন, কালি বন্দ্যো, অনুভা, নীলিমা, নিভাননী, রেবা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। ছবিখানি ডি-লুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় ২১শে জানুয়ারী উত্তরায় মুক্তি পেয়েছে।

কবি বা কবিয়াল সম্প্রদায় বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতির যেমন একটি বিশিষ্ট সম্পদ, তেমনি তাদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে তারাশংকরের উপন্যাস 'কবি'ও বাঙলার কথাসাহিত্যের একটি অনবদ্য অবদান বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রণয়-গাঁথা হিসেবে 'কবি'র স্থান ক্লাসিকের পর্যায়ে। 'কবি'র মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে বাঙলার পল্লীর খাঁটি পরিবেশে বাঙলার পল্লী-জীবনের ও পল্লী-চরিত্রের সাংস্কৃতিক উন্মেষের দিকটা। কবি সম্প্রদায় ছাড়াও বাঙলার আর একটি মৌলিক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি 'ঝুমুর' দলকেও আমরা খানিকক্ষণের জন্যে কাহিনীতে পাই। সর্বসমন্বয়ে কাহিনী হিসেবে 'কবি' চিত্রমাধ্যমে অভিনব উপাদান, যার মধ্যে বাঙলার সংস্কৃতির একটা ধারাকে মূর্ত করে তোলার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় কথা-সাহিত্য ভাণ্ডারে এ ধরণের কাহিনী বড় একটা পাওয়া যায় না, আর ছবিতেও এরকম কিছু আগে কখনও চিত্রিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

'কবি'র নায়ক হচ্ছে নিতাই। ডোমের ঘরে জন্ম, ছেলেবেলা থেকেই স্বভাব-কবি। তার কাব্য প্রেরণার উৎস হলো পাশের গাঁয়ের ঠাকুরঝি—বন্ধু রাজনের বিবাহিতা শ্যালিকা। রাজন স্টেশনের পয়েণ্টস্‌ম্যান—নিতাইয়ের প্রতিভাকে সে শ্রদ্ধা করে, বন্ধু বলে গর্ব অনুভব করে। নিতাই জীবিকা অর্জন করতো স্টেশনে কুলীর কাজ করে। সেবার চণ্ডীতলার মেলায় কবি-গানের আসর বসেছে, কিন্তু এক-পক্ষের দেখা নেই। কর্তৃপক্ষ আসর ভেঙে যাওয়ার লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্যে ঘোষণা করলে যে, যে ব্যক্তি মহাদেব কবিয়ালের সংগে পাল্লা দিতে পারবে সে রূপোর মেডেল পাবে। ঠাকুরঝির আগ্রহাতিশয্যে এবং রাজনের জিদে

নিতাই এসে আসরে দাঁড়ালো। আসরে স্বজাতের অপমান হওয়ায় ডোমেরা নিতাইকে গাইতে নিষেধ করলে। নিতাই তা অগ্রাহ্য করে গাইলে, মহাদেবের সঙ্গে পাল্লা দিলে। ফলে নিতাইকে ঘর ছেড়ে আসতে হলো। রাজন তাকে তার আঙনে ঠাঁই করে দিলে। ঠাকুরঝি সেখানে রোজ আসে, নিতাইকে দুধ খাইয়ে যায়। আসরে গাইবার পর নিতায়ের মর্যাদাবোধ জাগলো, তাই কুলির কাজ সে ছেড়ে দিলে। অনটনের মধ্যে ঠাকুরঝির সান্ত্বনা আর রাজনের উৎসাহে নিতাইয়ের দিন কাটছে এমন সময় তার ডাক এলো রসিক সমাজের কাছ থেকে। গেয়ে যখন ফিরে এলো তখন গলায় তার নতুন চাদর, পায়ে নতুন জুতো আর ঠাকুরঝির গলায় পরিয়ে দিলে একছড়া হার। এরপর আরম্ভ হলো নিতাইয়ের জীবনে দ্বিতীয় অধ্যায়। গ্রামেতে ঝুমুরের দলের সঙ্গে এলো বসন, দলের সেরা মেয়ে। বিরোধের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের সৃষ্টি হলো। বসন রুগ্নদেহে আশ্রয় নিলে নিতাইয়ের ঘরে, নিতাই তার পরিচর্যা করলে। ঠাকুরঝি এদের অলক্ষ্যে তা দেখলে আর অভিমানে নিতাইয়ের দেওয়া হার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গোলো। ঝুমুরের দল চলে গেল তারপর দিন। ঠাকুরঝি এদিকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কেঁদে গান গেয়ে মাথা খুঁড়ে অস্থির হলো সে। নিতাইয়ের দণ্ডে ওর প্রেমের কথা জানাজানি হলো। রাজন নিতাইকে বললে ঠাকুরঝিকে বিয়ে করার জন্যে। ঠাকুরঝির তখন উন্মাদ অবস্থা, রোজা লাগিয়ে ভূত নামানো হচ্ছে ওর ঘাড় থেকে। এমন সময় ডাক এলো নিতাইয়ের, সেই ঝুমুরের দলের কাছ থেকে। ঠাকুরঝিকে গঞ্জনা ও স্বজনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে নিতাই চলে গেলো সেই ডাকে। মেলায় এবারে বসন তাকে সত্যিই আকর্ষণ করলে। বসনের দুঃখময় জীবনের প্রতি নিতাইয়ের মমতা জাগলো; নিতাই বসনকে ভালবাসলে। বসনদের দলের সঙ্গে নিতাই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ালে। শেষে এক জায়গায় থেমে পড়তে হলো। বসনের যক্ষ্মা প্রবল হয়ে উঠেছে। দলের সকলে ওদের ছেড়ে চলে যেতে চাইলে। নিতাইয়ের কাছে এলো একটা আসরে গাইবার জন্যে ডাক বিজয়ীকে তারা সোনার মেডেল দেবে। বসনকে ফেলে নিতাই যেতে চাইলে না; কিন্তু নিতাইকে যাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে বসনই চিরতরে পৃথিবী ছেড়ে গেলো। নিতাই আসরে গাইলে এবং মেডেলও পেলে। নিতাইয়ের মনে পড়লো ঠাকুরঝির কথা—মেডেল পেলে তাকে সে দেবে। নিতাই তাই শেষবারের জন্যে গ্রামে গেলো। দেখলে, তার আর ঠাকুরঝির অভিসারমঞ্চ কৃষ্ণচূড়ার তলায় চিতা জ্বলছে। রাজনের কাছে শুনলে যে বিরহের যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে ঠাকুরঝি মৃত্যু বরণ করে নিয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে তারাশঙ্করের এই রচনাটি বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ। কিন্তু বই এক জিনিস, তার ছবি আর এক। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এই লিরিক জাতীয় কাহিনীর চিত্রায়ণে দেবকী বসুর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি ভারতীয় চিত্রজগতে নেই। কিন্তু সম্ভবত, "চন্দ্রশেখর"-এর কাহিনী পরিবর্তনের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করে এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যটি এমনিভাবে তিনি রচনা করেছেন যাতে বইয়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থেকেছে বটে, কিন্তু ছবির বৈশিষ্ট্য মূর্ত হওয়া যথেষ্ট ভাবে ব্যাহত হয়েছে। বিন্যাসে দেবকীবাবু তাঁর বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস ছাপকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি, যার ফলে কবিয়াল নিতাই তার মৌলিকত্ব হারাতে বাধ্য হয়েছে। নিতাই, রাজন, ঠাকুরঝি, বসন প্রত্যেকটি চরিত্রই অভিনব সৃষ্টি। এদের মধ্যে যে যে পরিবেশের মানুষ তার পশ্চাদপটে সে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এদের সুখদুঃখ, প্রেম-পরিণয়, আসক্তি ও আবেগ সবই পাওয়া যায়, কিন্তু ওদের জীবনের যে সমস্ত বৈচিত্র্য কাহিনীতে ওদের বিশেষ ঠাঁই এনে দিয়েছে তা যেন তেমন স্পষ্ট হতে পারেনি—ওদের প্রাণশক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণ কোথাও যেন বাধা পেয়ে গিয়েছে। 'তাছাড়া,—কবিয়াল সম্প্রদায় পল্লীজীবনের কী সম্পদ ছিলো সেইটে মূর্ত থাকবে, না কবি নিতাই হবে মূর্ত অথবা ঝুমুর দলটা স্পষ্ট হবে, না দলের সেরা বসন হবে স্পষ্ট—এ রকম একটা দোমনার ভাব বিন্যাসে পাওয়া যায়। যে জন্যে না কবিয়াল সম্প্রদায় আর না নিতাই, না ঝুমুরের দল আর না বসন, কেউই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু পরস্পরের চলার গতিতে বাধা এনে দিয়েছে, কোথাও বা একঘেয়েমী এনে দিয়েছে, আবার কোথাও মাত্রাকে অগ্রাহ্য করে যেতে বাধ্য করেছে।

অভিনবত্বের দিক থেকে ছবিখানি প্রশংসনীয় অবদান সন্দেহ নাই। কিন্তু অনবদ্য বলতে দ্বিধার কারণ যথেষ্ট আছে। প্রথমেই কানে লাগে ভাষার উচ্চারণ। পরিবেশের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে যাবার জন্যে গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তার উচ্চারণে সাবলীলতার বদলে কষ্টায়িত প্রচেষ্টার কৃত্রিমতাটা ফুটে উঠে সংলাপের মাধুর্য তো নষ্ট করেছেই এমনকি স্থানে স্থানে বিরক্তি উৎপাদনও করেছে।

দৃশ্যগুলিকে মঞ্চের মতো গণ্ডীবাঁধা জায়গায় আবদ্ধ করে রেখে ছবির ব্যাপকতায় হানি ঘটানো হয়েছে। অনেক দৃশ্য, বিশেষ করে কবি গান ও ঝুমুর নাচের দৃশ্যগুলিতে শট্‌-বৈচিত্র্যের অভাব দৃশ্যগুলিকেও অসাড় করে দিয়েছে। আসরের দৃশ্যগুলি play-back-এর বদলে সরাসরিভাবে গ্রহণ করার জন্যেই নাকি অমন বৈচিত্র্যহীন হয়েছে ক্যামেরার দিক থেকে। আর তাই বোধহয় শব্দের দিক থেকেও গানগুলি জবরজঙ্গ চীৎকারে পরিণত হয়েছে। একটা হেঁচকাটানে প্রত্যেকবার দৃশ্য পরিবর্তন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্রী ঝাঁকুনীর সৃষ্টি করেছে।

নিতাইকে একজন অতি প্রতিভাবান কবিয়াল বলে ধরা হয়েছে, কিন্তু তার কাব্য-কৃতিত্বের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া গেলোনা যার জন্যে আসরের বা গ্রামের লোক তো দূরের কথা রাজন বা ঠাকুরঝির কাছেও সে কোন শ্রদ্ধা পেতে পারে। তেমনি ঝুমুরের দলেও সেরা মেয়ে হবার মতো বসনের কৃতিত্ব অস্পষ্ট। কবি গান বা ঝুমুর যে সত্যিই দেশের একটা সাংস্কৃতিক সম্পদ এদের দেখলে তা মনে করা যায় না।

আমাদের আশা ছিলো যে দেবকীবাবু তারই উপযুক্ত এই কাহিনীটির মাধ্যমে তার প্রতিভার নতুনতর বিকাশ দেখাতে পারবেন—গত কয়েক বছর যার অভাব তার মধ্যে দেখা গিয়েছে। কিন্তু দেখা গেলো যে তিনি ঠিক আগের মতই আছেন, সময়ের সঙ্গে তাল ফেলে এগিয়ে আসতে পারেননি। সেই চণ্ডীদাসী প্রভাব; এমন কি সেই মেয়েদের সাজঘরে উঁকি মারার প্রবৃত্তি পর্যন্ত—যেমনি ছিলো "সোনার সংসারে" আজুরীর বেলায়, ঠিক তেমনি দেখা গেলো এখানেও বসনের সাজঘরে।

অভিনয়ে ঠাকুরঝির ভূমিকায় অনুভা দর্শক হৃদয় জয়ে সফল হতে পারতেন যদি না তার উচ্চারণের কৃত্রিমতা বাধা না হয়ে উঠতো। তাকে মানিয়েছে মন্দ নয়, অভিব্যক্তিও খারাপ হয়নি, কিন্তু ঐ এক দোষে চরিত্রই গিয়েছে নষ্ট হয়ে। বসনের ভূমিকায় নিলীমা অপ্রশংসনীয় নয়, কিন্তু বড্ড বেশি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করেছেন যেনো। নাম ভূমিকায় রবীন মজুমদার ছাপ দেবার চেষ্টা করেছেন। সায়গলি ঢঙ এমনকি স্বরটা পর্যন্ত নকল করে তার গান কখানি শুনতে ভালোই লাগে এবং গায়ক হিসেবে তার সুনামও হয়তো বাড়িয়ে দেবে, কিন্তু নিতাই কবিকে তা সার্থক করে তুলতে পারলো না। পয়েন্টসম্যান রাজনের ভূমিকায় নীতিশ মুখোপাধ্যায় একটি দরদী মানুষের চরিত্র ভালই ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবির অনেকখানি অংশই বহির্দৃশ্যে তোলা। কয়েকটি জায়গা ছাড়া ক্যামেরার কাজ মনে রাখার মতো কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে। বহু স্থানে সংলাপের জড়তা ও অস্পষ্টতা শব্দ গ্রহণের কৃতিত্ব ম্লান করেছে। কয়েকখানি গান ছাড়া সঙ্গীতাংশে প্রশংসা করার কিছু নেই।

বৈচিত্র্য হিসেবে "কবি" সমাদর পাবার মতো ছবি। ছবিখানির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আর গুণের দিক হচ্ছে সর্বদিকেরই অকৃত্রিমতা—পরিবেশ, চরিত্র বা ঘটনা সর্বদিকেই। উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত শহুরে কৃত্রিম জীবনকে কেন্দ্র করে তোলা ছবির চেয়ে প্রাকৃতিক শোভার মাঝে পল্লী-সংস্কৃতির একটি উৎসের ছাপ লাগানো জীবনের প্রতিচ্ছবি অনেক বেশি তৃপ্তিদায়কই হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বা অসাধুতা বৃদ্ধির পক্ষে তাহা সংগত কারণ হইতে পারে না। সরকারী নীতির প্রতিকারের বিধি-সম্মত পথ রহিয়াছে। সে যাহা হোক, বর্তমান বাজেটে ব্যবসায়ী মহলের অভিযোগের কোন সংগত কারণই আর নাই। ভারত গভর্নমেণ্ট দেশের শিল্প-উৎসাহিত করিবার জন্য যথেষ্ট আন্তরিকতার সংগেই অগ্রসর হইয়াছেন। ব্যবসায়ী সমাজ ইহার পরও দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকে সুসংস্থিত করিবার উদ্দেশ্যে যদি যথেষ্ট আন্তরিকতার সংগে অগ্রসর না হন এবং জনসমাজের স্বার্থের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি সমধিক জাগ্রত না হয়, তবে তাঁহাদের বিপদের দিনই ঘনাইয়া আসিবে এবং সে বিপদ তাঁহারা নিজেরাই ডাকিয়া আনিবেন। গভর্নমেণ্টও সে সংকটে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

পাকিস্থানের রাষ্ট্রানুশাসন

জনাব লিয়াকৎ আলী খান পাকিস্থানের রাষ্ট্রানুশাসনের একটি মুসাবিদা পাকিস্থানের গণ-পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে উদার শাসনতান্ত্রিক নীতির বড় বড় কথা প্রায় কিছুই বাদ যায় নাই; কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কার্যত সব নীতিরই গতিপথ একটি সর্তের দ্বারা মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। ভগবানের নামে শপথ করিয়া প্রস্তাবের সূচনা করা হইয়াছে। পাকিস্থান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়; সুতরাং এক্ষেত্রে সেখানে সংজ্ঞানির্দেশ লইয়া কোন সমস্যা দেখা দেয় নাই। কিন্তু ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। পাকিস্থান গণ-তন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, পরমতসহিষ্ণুতা এবং ন্যায়ের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, খুবই ভাল কথা, আশ্বাসেরও বিষয়; কিন্তু [illegible] বাস্তবতা লাভ করিবে 'ইসলামের নির্দেশানুযায়ী' এই সর্ত জুড়িয়া দেওয়াতেই যত সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে শংকার ভাব বাড়িবে এবং শাসন-নীতির উদারতার সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিগুলি সুস্পষ্টভাবে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে পারিবে না। কারণ সেসব নীতিই পরিচালিত হইবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী। অথচ ইসলামের বিধান সম্পর্কে যাহারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী, তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেও মতের ঐক্য নাই। বিভিন্ন আচার্য ইসলামের শ্রুতি কোরান এবং স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষ্য করিয়াছেন। এই সব ব্যাখ্যা-ভাষার যাথার্থ্য লইয়া অতীতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। গোড়ার দল কালের গতির সংগে খাপ খাওয়াই নীতিকে প্রয়োগ করিতে দেয় নাই। সেক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ ক্ষুন্ন হইল বলিয়া আর্তনাদ তুলিয়াছে এবং মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা বহাল রাখিতে চাহিয়াছে। স্বার্থগত সাম্প্রদায়িকতা শাসন-নীতির মূলে জড়াইয়া থাকিলে এমন অনর্থের সৃষ্টি হইবে, ইহা স্বাভাবিক। বস্তুতঃ পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিকেরা নিজেদের আপাতঃ-স্বার্থের জন্য সাম্প্রদায়িকতার সংগে রাষ্ট্রনীতিকে জড়িত করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রের সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির পথেই অন্তরায় সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইসলাম ধর্মের ব্যবহারিক দিকটাকে ভিত্তি করিয়া ইহাদের অনেকে হয়ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট পাকাইয়া ধর্মপ্রভাবিত রাষ্ট্র-নীতিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন, কিন্তু মধ্য প্রাচীতে 'ইসরাইল' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এবং আরব রাজ্যসমূহ সে রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইবার পর প্যান-ইসলামের সে ভিত্তি সমূলে ভাঙ্গিয়া পড়িতে বসিয়াছে। ধর্মগত সংস্কৃতির বালির বাঁধ দিয়া রোধ করিবার উপায় নাই। বলা বাহুল্য, এই পথে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, ক্রমে তাহা বাড়িতেই থাকিবে। ফলত বিশ্বমানবের সর্বজনীন অধিকার স্বীকৃতি ব্যতীত এখন কোন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। পাকিস্থানের নিয়ামকগণ সোজাসুজি এ সত্যকে স্বীকার করিয়া লইতে সাহসী হইতেছেন না। ফলে তাঁহারা নিজেদের রাষ্ট্রে নানা রকম সংকট জমাইয়া তুলিতেছেন, ইহা দুঃখের বিষয়।

দেবী সরোজিনী

দেবী সরোজিনী

গত ১৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেত্রী মনস্বিনী সরোজিনী দেবী অকস্মাৎ হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। সরোজিনী দেবীর পরলোকগমনে ভারতবর্ষের জীবনক্ষেত্র হইতে একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্ব লোপ পাইল। কবি, বাগ্মী, দেশপ্রেমিক, প্রতিভাময়ী একসঙ্গে তিরোহিত হইলেন। তাঁহার জীবন-সাধনায় ভারতের রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনে মাতৃত্বের যে মধুর আপ্যায়ন অপরিম্লান ঔদার্য বিস্তার করিয়াছিল, আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম। সরোজিনী দেবীর মনস্বিতা, তাঁহার কবিত্ব এবং বাগ্মিতা, তাঁহার রাজনীতিক জীবনে তাঁহার অকুতোভয়, তেজস্বিতার কাহিনী ভারতের কিম্বদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। অর্ধশতাব্দীকাল তাঁহার চরিত্রের দীপ্তিচ্ছটা ভারতের আঁধার আলো করিয়া রাখিয়াছিল, ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে আশা অস্তমিত হইল। মহাত্মা বাপুজীর তিরোধানের ১৪ মাস পরে তাঁহার প্রিয় শিষ্যা দিব্যধামে তাঁহার সঙ্গে গিয়া মিলিত হইলেন। বাণীর বিদুষী দুহিতা মৈত্রেয়ীর ন্যায় সাধন-মহিমায় স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদানকারী সন্তানগণের অধ্যুষিত জ্যোতিষ্কলোকে অধিরূঢ় হইলেন। ভারতের কবিকুঞ্জে পাপিয়ার কণ্ঠ নীরব হইল। গত বৎসর যুক্তপ্রদেশের প্রদেশপাল পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর তিনি নিজেকে পিঞ্জরাবদ্ধ বন-বিহগীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ সে বন-বিহগী আজ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া উন্মুক্ত আকাশে অনন্তের অভিযাত্রী হইলেন।

বাণী-বন্দনায় যাঁহার প্রতিভার বিকাশ, রুদ্রাণীর পূজায় যাঁহার প্রতিভার পরিস্ফূর্তি, ইহা কিছু বিস্ময়কর নয়। তাঁহার ভাষা ইংরেজি হইলেও ভাবের সম্পদে সেগুলি ভারতীয় রসতত্ত্বের ব্যঞ্জনাতেই পূর্ণাভিব্যক্তি লাভ করে। তাঁহার উদার চিত্তের সংবেদনশীলতা স্বদেশের সমাজ এবং রাষ্ট্র-জীবনের গ্লানিকে দগ্ধ করিবার জন্য আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠে। কবি সরোজিনী বাণী-সাধনার নূতন পথ অবলম্বন করেন। তাঁহার সমগ্র জীবনে অগ্নি-বীণা বাজিয়া উঠিতে থাকে। কবিকুঞ্জের বিলাসের আসন ছাড়িয়া তিনি দুর্দৈবের বিলাস-ব্যসনই বরণ করিয়া লন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে যে বীর্যময় আন্দোলন আরম্ভ হয়, দেবী সরোজিনী তাহার দুঃখকষ্টের বোঝা ষোল আনাই বহন করেন। পুনঃ পুনঃ কারাবরণে তাঁহার স্বাস্থ্য একান্ত-ভাবে ভগ্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজনীতিক সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া কাজ করিয়াছেন। ফলত সরোজিনীর কবিচিত্তে যে মধুর ভাবধারা উৎসারিত হয়, রাজনীতিতে তাহারই ভৈরব-মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হইয়াছে। কবিত্ব-রস তাঁহার প্রাণরসকে উদ্বেলিত করিয়া দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে রুদ্র ছন্দে নির্ঝরিনীর প্লাবনের সৃষ্টি করে। মৃদুগামিনী গিরি-কুলু কুলু ধ্বনি উদ্দাম নৃত্যছন্দে প্রাণধারার প্রাচুর্য বিস্তারে এদেশের জনমণ্ডলীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে মাতাইয়া তুলিয়াছে। বাঙলার মনস্বিতায় ভাবরসের এমন বৈচিত্র্য বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হইবে। এখানে সাহিত্য-সাধনা এবং কাব্য-প্রতিভা বৈপ্লবিক প্রেরণার পথে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। বাঙলার কবি এবং সাধকের মনোবীণায় শান্ত, শিব, যিনি রুদ্র-মধুরে জাগিয়াছেন। অতিসৌম্যের অনুভূতি, অতি-রৌদ্রের স্তুতি-গীতিতে এখানে জীবনকে ত্যাগের মহিমায় সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। সরোজিনী-জীবনে বাঙলার এই বিশিষ্ট কাব্যরসই রুদ্র-মধুরে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাঙলার জ্ঞান ধ্যানে গরীয়ান হইয়াছে এবং দানে মহীয়ান হইয়াছে। সরোজিনী দেবীতে বঙ্গভারতীর সেই বিচিত্র বিভূতিরই প্রাণপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। এ বিভূতির বিস্তারভঙ্গী বলিষ্ঠ এবং বেগবান। বাধা ইহা মানিতে চায় না এবং কিছুতে ইহা ক্ষীয়মাণ হইবার নয়। সরোজিনী দেবীর জীবনে প্রাণময় যে কাব্যছন্দ জাগিয়াছিল বয়োধর্মে কিংবা শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তাহা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সর্বত্র স্বচ্ছ-লাবণ্যের মহিমা বিস্তার করিয়াছে।

আপন কীর্তির বলে সরোজিনী দেবী নিজেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নাগরিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়া তিনি রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন। স্বাধীন ভারতের তিনি প্রদেশপালস্বরূপে সকলের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। রাজনীতির গতি স্বভাবতঃই দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের পথেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দেবী সরোজিনী সাক্ষাৎ-সম্পর্কে রাজ-নীতির ভিতর থাকিয়াও দ্বন্দ্বমোহের ঊর্ধ্বে ছিলেন। কোনরূপ উপদলীয় বা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁহারা একান্ত তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে সম্মান শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিতে বাধ্য হইতেন। মানবতার সমুন্নত মহিমা সরোজিনী দেবীর রাজনীতিতে সব সময় উজ্জ্বল থাকিত, আর থাকিত মাতৃসুলভ সহিষ্ণুতা এবং উদারতা। বাঙালীর কন্যা সরোজিনী বাঙলা দেশকে কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। ১৯২৬ সালে পাবনায় এক শ্রেণীর মুসলমান গুণ্ডার ব্যাপক অত্যাচার এবং উপদ্রব ঘটে। নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সরোজিনী সে সময় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি সুদূর হায়দরাবাদ হইতে সে দুর্দিনে বাঙলায় ছুটিয়া আসেন এবং তথাকার আর্ত সেবাব্রতী কর্মীদের পাশে আসিয়া দাঁড়ান। তিনি পদব্রজে পাবনার উপদ্রুত গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। কর্দমাক্ত মাঠে আলি পথ ধরিয়া চলিয়া আর্ত ও পীড়িতদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং অত্যাচার ও উপদ্রবের প্রতিবিধানে তৎপর হন। এই কাজে তিনি যে অপরিসীম কষ্টসহিষ্ণুতা এবং প্রগাঢ় হৃদয়বত্তার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রে মহনীয়তা পরিস্ফুট হইয়াছে। সেবাব্রতী কর্মিগণ এই তেজস্বিনী নারীর আদর্শে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং উপদ্রবকারীরা স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পূর্ব-আফ্রিকার নিগৃহীত প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য সরোজিনী দেবীর সাধনা সামান্য নয়, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু বাঙলার নারীর সম্মান বিপন্ন হইলে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেবী সরোজিনীর এই যে সাধনা, এ স্মৃতি চিরদিন জাগরূক থাকিবে। বস্তুত দেবী সরোজিনী ভারতের নারীর মর্যাদা জগৎ-সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হইয়া তিনি কমলা-বক্তৃতা প্রদান করেন। সে বক্তৃতাকে ভারত নারীর মর্যাদার মধুছন্দ বলা যাইতে পারে।

ভারতের দুর্দিনের অবসান ঘটে নাই। এদেশের বৈদেশিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মোহ ভারতে ইহার মধ্যেই নূতন আতঙ্ক জমাইয়া তুলিয়াছে। এদেশের সনাতন শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে উপহসিত করিবার দুর্বুদ্ধি সমাজের এক স্তরে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে; অশ্রদ্ধা, অসংযম এবং নীতিহীনতার গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইতেছে না। আজিকার এই দুর্দিনে সরোজিনীর মত প্রতিভাশালিনী সর্বজনশ্রদ্ধেয়া নেত্রীর প্রয়োজন কত অধিক, বলা অনাবশ্যক। কিন্তু সেজন্য আমরা বিলাপ করিব না। দেবী সরোজিনীর জীবন-বীণায় যে ঝঙ্কার বাজিয়াছে, তাহা ভারতের আকাশ-বাতাসে মিশিয়া থাকিবে। তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যদি আমরা তাহার অনুসরণ করিতে পারি, তবেই আমরা মানুষ হইতে পারিব। দেবী সরোজিনীর নিত্য-জীবনের দিব্যশক্তি মৃত্যুর পরপার হইতে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক, কোটি কোটি ভারতবাসীর সঙ্গে গিয়া আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমাদেরও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

শিল্পীঃ শ্রীনন্দলাল বসু

পুরনারী
[শ্রীসুখময় মিত্রের সৌজন্যে]

ফিরিওয়ালা
[বাণী মুখার্জির সৌজন্যে]

পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার মহাশয় আমোদকর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। আমাদের আমুদে বিশু-খুড়ো ট্রামে-বাসের যাত্রীদের বাদুড়নৃত্য, স্বর্গের সিঁড়ি ও দুধের পুকুর প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার amusing ভাষণগুলি আমোদকরের আওতায় পড়ে কিনা তা সরকার বাহাদুরকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিলেন।

* * * *

কর্পোরেশনের শিশু প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত এস এন রায় সন্দেশ রসগোল্লা বন্ধ করিয়া শিশুদের জন্য দুগ্ধের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। অবশ্য যতদিন তা না হয়—ততদিন শিশুদের বেড়াইবার পার্কগুলিতে দুগ্ধের অনুকল্প আলুকাবলী, ফুলুরি বেগনীগুলি অবাধেই চলিতে থাকিবে।

* * *

শুনিলাম কলিকাতাতে নাকি প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ লোকের জলের কোন ব্যবস্থা নাই। অত্যধিক দুগ্ধের ব্যবস্থা করিতে গিয়া জলের অপ্রাচুর্য হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে কোন কর্পোরেশনী বিজ্ঞপ্তি আমরা এখনও পাঠ করি নাই।

* * *

রাস্তায় "কে বা কাহারা" একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন—"চীনের পথই পথ!" বিশু-

খুড়ো বলিলেন—"আহা, শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।"

* * * *

উৎসব অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপালের পোষাকটি কি ধরণের হওয়া উচিত শ্রীযুক্ত রাজাজী নাকি সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন।—"পোষাকের পরামর্শ অবশ্যি আমরা দিতে পারি কিন্তু রাজাজী তা সংগ্রহ করতে পারবেন কি?"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ পূর্ব পাকিস্থান সরকার নাকি ইট তৈরীর ব্যবসা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।—"খুবই

ভালো কথা, তবে ইটগুলো ঢিল ছোঁড়ার কাজে খরচ না হলেই হয়"—মন্তব্য খুড়োর।

* * * *

কেন্দ্রীয় পরিষদে হিন্দু কোড বিল সম্বন্ধে বিশুখুড়োর মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"ট্রামে-বাসের সীট ছাড়া আর সবকিছুতে মেয়েদের পূর্ণ অধিকার দিতে আমরা প্রস্তুত!"

* * * *

এই প্রসঙ্গেই জনৈক বিরুদ্ধদলের প্রতিনিধি বলিয়াছেন—আইন-সচিব মহাশয়ের মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি কি করিয়া এমন একটি আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিলেন ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। ট্রামে-বাসের যাত্রীদের একজন বলিলেন—"এ কথার জবাব প্রতিনিধির প্রশ্নেই আছে,—আইন-সচিব বিচক্ষণ বলেই পেরেছেন।"

* * * *

একটি খবরে বলা হইয়াছে—বাঙলার প্রদেশপাল সম্প্রতি চিড়িয়াখানা প্রদর্শন করিতে নাকি আলীপুর গিয়াছিলেন। শ্যামলাল বলিল—"আমাদের ধারণা ছিল আলীপুরের বাইরের চিড়িয়াখানা দেখার পর তাঁর আর আলীপুরে যাবার দরকার হবে না।"

* * *

বানাটিকিটে যারা ট্রেন ভ্রমণ করেন—তাদের নিকট হইতে নাকি ই আই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ একলক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশ' এগার টাকা দু' আনা আদায় করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষের—"Travel as you please" বিজ্ঞাপন এতদিনে কার্যকরী হইল!

* * * *

বিলাতের এক চিড়িয়াখানায় একশত পঁচিশ বৎসর বয়সের একটি টিয়াপাখী নাকি একটি ডিম পাড়িয়াছে। সংবাদদাতা বলিতেছেন,—The news made headlines in London. "তা তো হবেই, প্রায় দু'শ' বছরের যে হাঁসটি নিত্যি সোনার ডিম পাড়তো তাকে হ্যাংলামো করে কেটে ফেললে পরে টিয়ের ডিম নিয়ে ধেই নৃত্য করা ছাড়া গতি থাকে না, তবু ভালো এখনো ঘোড়ার ডিম নিয়ে নাচতে হচ্ছে না"—বলা বাহুল্য, টিপ্পনী বিশুখুড়োর।

* * * *

আমরা এখনো পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করি নাই বলিয়া দেশনায়কদের অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁদের ধারণা যে কত ভুল, তাঁদের দুঃখ যে কত অলীক তা

হোলির দিনে রাস্তায় পচা ডিম আর টমাটোর যদৃচ্ছা ব্যবহার দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। অগণ্য নরনারী Hooligan হ্যায় বলিয়া গলা ফাটাইতেছেন—আমরা প্রাচীনপন্থীরা এখনো অবশ্য হোলি হ্যায়-ই বলিতেছি, কিন্তু আমাদের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যে নয়!!

চিঠিপত্র

প্রমথ চৌধুরী

[শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়কে লিখিত—শ্রীযুক্ত সুমনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে মুদ্রিত]

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ
২৩।৯।১৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমার অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়ে অতিশয় সুখী হয়েছি। তুমি যে অহর্নিশি টলটলায়মান পদার্থের উপর দাঁড়িয়েও মাথা ঠিক রেখেছ, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তোমার চিঠি। তোমার চিঠি স্ফূর্তিতে টগবগ করছে। সেদিন সবুজ-সভায় ঐ চিঠিখানি পড়া হল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করলেন ও চিঠির ভিতর অসাধারণ ফূর্তি আছে। অতুলবাবু বললেন যে, সুনীতির ভিতর যে স্বাভাবিক buoyancy আছে ভারতবর্ষের মাটির সংস্পর্শ ত্যাগ করা মাত্র তা ফুটে উঠেছে। তোমার চিঠি আমি অনেককে পড়ে শুনিয়েছি—সকলেই এ বিষয়ে অতুলবাবুর সংগে একমত। এখন আমার মত শুনবে? এই লেখার ভিতর তোমার একটা নতুন হাত দেখতে পেয়েছি। তোমার হাতে অতি সহজে বর্ণনা আসে। আর চলতি বাঙলার জোর ও 'যুত' যে কত বেশি তার প্রমাণ তোমার চিঠির প্রতি ছত্রে পাওয়া যায়। বাঙলা লেখবার হাত তোমার জাহাজে চড়েই খুলে গিয়েছে, তাই আশা করছি তোমার কাছ থেকে ঘন ঘন ঐ ভাষাতেই এমনি জলজ্যান্ত চিঠি পাব। আমরা বলতুম যে "সুনীতির কানে ধরা পড়ে না, এমন কিছু নেই—" এখন দেখছি তোমার চোখে ধরা পড়ে না এমন জিনিসও কম আছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক চোখ বুজে দেশ ভ্রমণ করে। তারি জন্য শত শত লোক ইউরোপ ঘুরে এল, অথচ তাদের হাত থেকে সে দেশের একটা ছবিও বেরুলো না। রবিবাবু ও বিবেকানন্দ স্বামীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তোমার চোখে কানে এবং মনে যা ধরা পড়ে, তুমি অমনি খুঁটিয়ে আমাকে লিখো, সেই চিঠি শুনেই সবুজ দল চোখে বায়স্কোপ দেখতে পাবে। আমাদের জাত—Concrete-এর জ্ঞান হারিয়ে বসে আছে—আমি চাই সে জ্ঞানকে তোমরা আবার উদ্ধার করো। পৃথিবীতে Concreteএর চাইতে কি আর কিছু বেশি interesting জিনিস আছে?

আজকে আমি চিঠি লেখবার মেজাজে নেই—তাই তোমার জবাব দু-পাতাতেই সারছি। আপিস ইস্কুলের ছুটি হয়েছে—দুচারদিনের মধ্যেই রাঁচি যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে নিরুপদ্রব অবসরের ভিতর বসে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে বড় বড় চিঠি লিখব।

বিলেত থেকে মণ্টুর এক লম্বা চিঠি পেয়েছি। সে বহু কষ্টেই কেম্ব্রিজে একটা non-collegiate কলেজে ঢুকেছে, কিন্তু থাকবার কোনও স্থান পায় নি। আশা করি তোমাকে এ বিপদে পড়তে হবে না, তোমার পিছনে India Officeএর জোর আছে। মণ্টুর কথামত, আমি Anderson সাহেবকে আমার গল্প ও কবিতার বইগুলো পাঠিয়ে দিলুম। পড়ে ভদ্রলোকের কি রকম লাগবে জানি নে। "ফরমায়েসি গল্পের" মত লেখায় কি তিনি দন্তস্ফুট করতে পারবেন? "উজ্জ্বল নীলমণি" যে "অলঙ্কার" হলেও বাঙালী বৈষ্ণবদের একখানি sacred book-এ জ্ঞান সঞ্চয় করবার সুযোগ আমার বিশ্বাস তাঁর কখনও হয় নি। সে যাই হোক, আমার ঐ লেখাগুলোর ভিতর থেকে তোমরা তাঁকে তরিয়ে দিয়ো। আমার গল্প যদি তাঁর পছন্দ হয় তাহলে Timesএ নিশ্চয়ই তার সুখ্যাতি বেরুবে, আমি অমনি বাঙলাদেশের একজন বড় লেখক হয়ে উঠব। সম্ভবত সেই সংগে বই ছাপাবার টাকাটাও উঠে আসবে। আজ এইখানেই শেষ করি। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
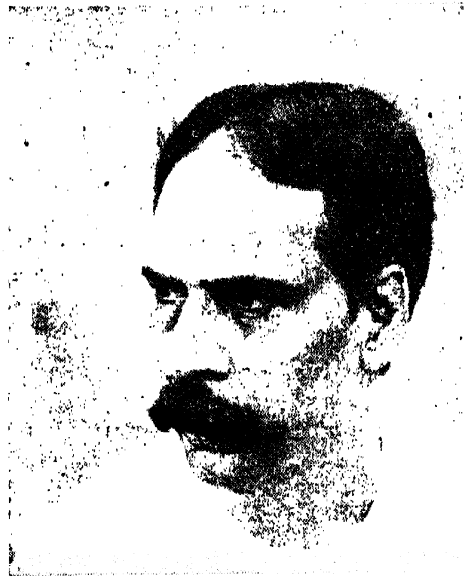
রাঁচি
৫ই অক্টোবর ১৯১৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ২ নম্বর চিঠি কলকাতা ঘুরে কাল এখানে এসে পৌঁচেছে। প্রথম চিঠির উত্তরে আমি আগেই লিখেছি যে তোমার চিঠি পড়ে সুখ আছে। তুমি চোখ-কান খোলা রেখে বিলেত চলেছ—তাই তোমার চিঠি পড়ে তোমাদের জাহাজি-জীবনের ছবিটা আমাদের চোখের সুমুখেও ফুটে উঠছে। চিঠিগুলো আমার যে একটু বিশেষ করে ভাল লাগছে, তার বিশেষ কারণ ঐ চিঠি পড়ার সংগে সংগে আমার মনে বিলেতযাত্রার পূর্ব-স্মৃতি সব জেগে উঠছে।

আমার মনে আছে, এডেন বেজায় গরম। আমরা যখন শহর দেখতে ডাঙ্গায় নামি, তখন আকাশে আগুন জ্বলছে,—বোধহয়

ওখানে বৃষ্টির মধ্যে হয় শুধু অগ্নিবৃষ্টি। পৃথিবীর ও-অঞ্চল হচ্ছে সত্যি সত্যি একটা পোড়া দেশ। মুসলমান ধর্মের ভিতর যে অতটা তেজ আছে, তার নিশ্চিত কারণ ও-ধর্মের ঐ জন্ম-মরুভূমি। সে যাই হোক—সোমানিদের চেহারা আজও আমার মনে আছে। শুধু কাপড়ে তারা classic নয়—চেহারাতেও—কেউ কেউ কষ্টিপাথরের "আপোলো"। তবে কালো-পাথরের কোনও Venus দেখেছি বলে ত মনে হয় না।

এদেশে অবশ্য আমি Venusএর সাক্ষাৎ পেয়েছি—কিন্তু সে পথরের নয় bronzeএর। এই সূত্রে আমার মনে পড়ে গেল যে, রঙ সম্বন্ধে আমরা bronze-ageয়ে পেশছেছি—ইউরোপীয়েরা আর কাফ্রীরা আজও stone-ageয়ে রয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, পাথর কালো হলেও পাথর, শাদা হলেও পাথর। Ethnology সম্বন্ধে আমার এই অপূর্ব আবিষ্কারটি দেখো যেন বিলেতে প্রকাশ করে ফেলো না।

তারপর Suezএর একটি ছবি আমার চোখের সুমুখে আজও ভাসছে। নীল-সমুদ্রের উপর সাদা-পাল-তোলা ছোট ছোট আরবি নৌকাগুলো ঠিক রাজহাঁসের মত চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে কোন কোনটি যখন তীরবেগে ছুটে জাহাজের কাছ ঘেঁষে এসে পড়ে তখন দেখা যায়—আগাগোড়া শুভ্রবসনে মণ্ডিত একএকটি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ একহাতে হাল আর এক হাতে পাল ধরে তামার দেবমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেবমূর্তি শুনে চমকে ওঠো না। আরবরা ও Moorsরা চেহারায় সত্য সত্যই superman—অবশ্য আমাদের তুলনায়। যদি Gibraltar হয়ে যাও তা হলে অসংখ্য Moorএর দর্শন লাভ করবে। রঙ যে আকারের উপর টেক্কা দেয় তার প্রমাণ এশিয়া ও আফ্রিকার উপর ইউরোপের আধিপত্য। কলিযুগের দোষই এই যে সে-যুগ classic নয় romantic. বিলেতে গিয়ে এর বিশেষ পরিচয় নিজেই পাবে, অতএব আমার পক্ষে তার পূর্বাভাষ দেওয়াটা নিষ্প্রয়োজন।

Port Said পেরুলেই বুঝতে পারবে যে একটা নতুন পৃথিবীতে গিয়ে পড়েছ—যে পৃথিবীতে আকাশে আলো কম ও বাতাসে শীত বেশি। অন্ততঃ Mediterraneanএ ঢুকেই আমার ত তাই মনে হয়েছিল।

তোমাকে বড় চিঠি লিখব বলে গত পত্রে ভরসা দিয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি কথাটা রাখা মুস্কিল। চিঠির কাগজের অষ্টপৃষ্ঠা পোরাই কি দিয়ে তাই নিয়ে পড়েছি মুস্কিলে। তুমি ত নিত্য নূতন দেশ নতুন লোক দেখতে দেখতে চলেছ—সুতরাং লেখবার অনেক মাল তোমার হাতে আপনা হতেই এসে জুটছে। কিন্তু আমাদের জীবন প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটার মত একই চালে একই চক্রে ভ্রমণ করছে—তার আর কোনও বদল নেই—যদি কোন দিন ঈষৎ fast কিম্বা slow চলে তা হলেই আমরা বলি জীবনের কলটা বিগড়ে গেল। সত্য কথা বলতে গেলে এদেশে জীবনের ক্রমে slow হবার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে—ক্রমান্বয়ে দম দিয়ে তাকে ঠিক রাখতে হয়, আর তুমি যেদেশে চলেছ সে দেশে উত্তরোত্তর fast হওয়াটাই জীবনের ধর্ম। এই থেকে আমার মনে হয় যে, ইউরোপ ও এসিয়া যদি মিলেমিশে এক হয়ে যায় তা হলে জীবনীশক্তির এমন একটা গতি পাওয়া যাবে যা মানুষে সামলে উঠতে পারবে। ইউ-রোপের এঞ্জিনের পিছনে এসিয়ার ব্রেক না জুড়ে দিতে পারলে মানব সভ্যতা তেড়ে গিয়ে খদে পড়বে—ইতিমধ্যে পথিমধ্যে কত যে "কলিসান" হবে তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। দেখতে পাচ্ছ—ফাঁক পেয়েই বক্তৃতা সুরু করে দিচ্ছি। এর কারণ চারপাশে এমন কিছু ঘটছে না যার খবর তোমাকে দিতে পারি।

তবে আজ কদিন হল আমার জীবনে একটা নতুন ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। ঘটনাটি কি জানো? পুজোর ছুটিতে কলকাতা ছেড়ে রাঁচি আসা। এ ঘটনা অবশ্য প্রতি বৎসর নিয়মিত ঘটে—তবে প্রতি বৎসরই সেটি হয় একটি নতুন ঘটনা।

প্রথমত পুজো যতো কাছিয়ে আসে সবুজসভা তত হালকা হতে আরম্ভ করে। এ বৎসর শেষ পর্যন্ত দেখা পেয়েছি, কিরণ হারীত সুবোধ প্রবোধ সুধীন্দ্র ও অমিয় চক্রবর্তীর। ধূর্জটী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্রয়াগধামে প্রস্থান করেছে—শ্বশুরালয়ে।—দেখো প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলোকে তোমরা কজনে মিলে যে শ্বশুর মন্দির করে তুলছ এটা কিন্তু ঠিক "হিন্দোচিত" ব্যবহার নয়। শ্রাদ্ধ ও বিবাহ এক সংস্কার নয়—আর যেখানে মানুষে মাথা মোড়াতে যায় সেখানে কারও মাথা ঘোরাতে যাওয়া উচিত নয়। সত্যেন্দ্র বেচারা উল্টেপাল্টে জ্বরে পড়ছে। আজ মাসখানেক তার সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। হারীতের মুখে শুনলাম তুমি সত্যেন্দ্রকে একখানি ফুর্তিওয়ালা চিঠি লিখেছ—কলকাতায় ফিরে সেখানি দেখতে পাব আশা করছি। অতুলবাবু স্ত্রীপুত্র নিয়ে "সোনের-উপর-ডিহিরি"তে গিয়েছেন। তার খবর সেই অবধি পাই নি, যদিচ নিত্য তার চিঠির পথ চেয়ে আছি। তিনি Empedoclesএর বিষয় একটি প্রবন্ধ লিখছেন "সবুজ পত্রে"র জন্য। সে প্রবন্ধ যে ভাল হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই;—কেননা, এর মধ্যে তিনি গ্রীক দর্শনের ইতিহাস পড়ে সারা করেছেন। সুরেশানন্দ মাণিকগঞ্জের ভাষায় একটি গল্প লিখেছে। এ মাসের কাগজে সেটি বেরিয়েছে পড়ে দেখো, তোমার philologistএর প্রাণ তাতে খুসি হবে। ভাল কথা "সবুজ পত্র" পাও ত? অর্থাৎ বিলেতে পাবে ত? আশা করি পবিত্র তোমাদের কাগজ পাঠাতে ভোলে নি। আসবার আগে রবিবাবুর সঙ্গে দুদিন দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় তিনি দুটি চমৎকার pun করেছিলেন। একটি হচ্ছে এই যে—ভারতবর্ষ মারা গেল একদিকে "বুরোক্রাসি" আর একদিকে 'বুড়োকাসির' চাপে। দ্বিতীয়টি এই—"এদেশে Cornwallis Street আছে, কিন্তু চক্ষু-ওয়ালিস ষ্ট্রীট নেই"। punটা অবশ্য তোমার কান এড়িয়ে যাবে না, কেননা "কর্ণ" বলে একটা অঙ্গ তোমার মস্তকে আছে। তার উপর তোমার এই সব চিঠিই প্রমাণ যে, তোমার permanent ঠিকানা হচ্ছে ১নং চক্ষু-ওয়ালী ষ্ট্রীট। এদেশে অধি-কাংশ লোকের শরীরে চক্ষুকর্ণের যে কোনও বিবাদ নেই তার প্রমাণ আমাদের কাছে "দর্শন" ও "শ্রুতি" হয়ে উঠেছে। চোখ বুঁজে শোনা-কথা মেনে যাওয়াটাই হচ্ছে এদেশে বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

তুমি শুনে খুসি হবে যে বাঙলার সাহিত্যরাজ্যে হঠাৎ আমার কপাল ফিরেছে। কিছুদিন থেকে দৈনিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে আমার লেখার একটু আধটু প্রশংসা বেরুচ্ছিল। তারপর সেদিন দেখি "প্রবাসী"তে "বীরবলে"র উপর পঞ্চপৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তার প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত চলেছে শুধু আমার সুখ্যাতি। এই গুণগানের মধ্যে একটি কথাও বেসুরো নেই। তা ছাড়া এ সমালোচনাটি খুব ফুর্তি করে লেখা—একেবারে লড়াক্কে আর্টিকেল। প্রবন্ধ লেখক বিপক্ষ দলকে "যুদ্ধং দেহি" বলে লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা এই যে, তাঁর মতের যে প্রতিবাদ করবে তিনি যে একেবারে মূর্খ ও নির্বোধ এ সত্য তিনি হাতে কলমে প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছেন। এই প্রবন্ধ পড়ে আমার মনে হচ্ছে যে বাঙলা দেশে যদি কেউ লেখক থাকে ত "সোহহং"। এ প্রবন্ধ যে লেখা হয়েছে, তাতে আমি আশ্চর্য হচ্ছিনে, কেননা, লেখক হচ্ছেন—সুরেশ চক্রবর্তী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রবাসীতে ওটি বেরিয়েছে। এ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে ও দল থেকে কেউ কোন উচ্চবাচ্য করবে না—কেননা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ওটির উপর hall-mark স্বহস্তে ছেপে দিয়েছেন।

ভাবগতিকে যেরকম বুঝছি আমার "পদচারণ"কেও লোকে বোধহয় একচোট বাহবা দেবে। লোকমুখে ও চিঠিপত্রে ওর অনেক রকম তারিফ শুনেছি—এমন কি রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকেও ও-কবিতার

উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে। Monsieur Jurrdain যে গদ্য বলতে পারেন, এ জ্ঞান তাঁর ছিল না, যতদিন না তাঁর মাস্টার মহাশয় সে বিষয়ে তাঁকে সচেতন করেন—এখন দেখছি আমিও তেমনি ইতিপূর্বে জানতুম না যে আমি পদ্য লিখতে পারি, পাঠকদের কৃপায় এই জ্ঞান লাভ হল যে আমার হাতেও ভাষা ছন্দোবন্ধ হয়। এখন পাঁচজনে মিলে আমাকে সাহিত্য-রাজ্যের একজন কেষ্টবিষ্টু না করে তুললেই বাঁচি।

সে যাই হোক, আমাদের সবুজ দল দেখছি ক্রমে পাতলা হয়ে আসছে। তোমরা ত বিলেত গিয়ে পৌঁচেছ—আর এখনও যানে-ওয়ালা রয়েছেন কিরণ—পাকা আর সুধীন্দ্র—কাঁচা।

আর একটি খবর দেই। আমাদের সবুজ দলের আস্তানা অন্তত কিছু দিনের জন্য ভাঙ্গবে। আমার বাড়ী আমি বেচে ফেলেছি। বাড়িটের যখন দুনো দাম পাওয়া গেল, তখন আর বিক্রী করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। যত শীগ্গির পারি একটি নতুন বাসা বাঁধব—তবে খুব সম্ভবত কিছুদিন আমাকে nomadic জীবনযাপন করতে হবে।

আমি আজকাল Italian নিয়ে পড়েছি। তুমি যদি Italian সাহিত্যের ক্যাটালগ জোগাড় করে আমাকে পাঠিয়ে দেও ত বড় ভাল হয়। Exchange যদি এখনকার মত পড়ন্ত অবস্থায় থাকে তা হলে সামনের বছর কিছু Italian বই আনাবার ইচ্ছে আছে। সস্তা বই আমার এখন আর চলে না, কেননা, ছোট অক্ষর পড়বার মত চোখের শক্তি এখন আর নেই। আমার বিশ্বাস David Nuttএর দোকানে তুমি ক্যাটালগ সংগ্রহ করতে পারবে।

তোমার চিঠিগুলো আমি সব গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি—ইচ্ছে আছে একটু আধটু বাদসাদ দিয়ে সেগুলো পরে ছাপানো যাবে।

আজ এইখানেই শেষ করি, এমনিই চিঠি বেজায় লম্বা হয়ে গিয়েছে—তার উপর বেলাও বাড়ছে। তোমাকে বিজয়ার আশীর্বাদ দিয়ে, আজ তবে বিদায় হই। শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২২।১।২০

কল্যাণীয়েষু,

এতদিন তোমার কাছ থেকে চিঠি পাই নি এবং তোমাকেও লিখি নি যে, তোমার কাছে চিঠি আমার পাওনা কিম্বা দেনা আছে—মনে পড়ছে না।

লোকমুখে শুনছি যে তুমি লন্ডন ইউনিভারসিটিতে D. Litt. পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাচ্ছ না। এও ত বড় জ্বালা। তবে India Office যখন তোমার সহায় তখন সে অনুমতি কাল হোক্ পরশু হোক্ পেয়েই যাবে।

তুমি পবিত্রকে যে চিঠি লিখেছ তাতে দেখলুম যে তুমি আপাতত Greco-Roman আর্টের চর্চা করছ। একথা শুনে বিশেষ খুশি হলুম। আমিও এদানিক Renaissance আর্টের চর্চা করছি অর্থাৎ বই পড়ে আর engraving দেখে এ বিষয়ে যতটা জ্ঞান সঞ্চয় করা সম্ভব ততটা করবার চেষ্টায় আছি। ঠেকছে এক জায়গায়। এই কলকাতা শহরে ইটালিয়ান বইয়ের একান্ত অভাব। হাতের গোড়ায় যে কখানি আছে, সেই কখানি নিয়েই নাড়াচাড়া করছি। তুমি যত শীগ্গির সম্ভব আমাকে একখানি ইটালিয়ন বইয়ের ক্যাটালগ পাঠিয়ে দিয়ো—তদ্দৃষ্টে আমি ফেরৎ ডাকে তোমাকে আমার জন্য খানকতক বই কিনে পাঠাবার টাকা পাঠিয়ে দেব।

সে ত পরের কথা। তুমি পত্র-পাঠ Greco-Roman আর্ট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ সবুজপত্রের সম্পাদকের বরাবর পাঠিয়ে দিয়ো। বেশী দেরী করো না, কেননা বছর প্রায় কাবার হয়ে এলো।

আমাদের সবুজপত্র দলের খবর হচ্ছে তার দল ক্রমে কমে আসছে। কিরণশঙ্করও বিলেত চলে গেছেন, শুনছি হারীতও দুদিন পরে সমুদ্রযাত্রা করছেন। প্রবোধ পোস্ট-আপিসে চাকরি নিয়েছে, সুবোধ গিয়েছে ব্রহ্মদেশে। সত্যেন্দ্র এখন জ্বরের অধিকারে। ধূর্জটী বিবাহ করে এখন গৃহস্থ না হোক সাংসারিক হয়েছে—সে করছে ঘিয়ের ব্যবসা। বাকী আছেন এক অতুলবাবু—তাঁর সাক্ষাৎ প্রতি শনিবারেই পাই, উপরন্তু দু'একজনেরও সাক্ষাৎ পাই। ওই সবুজ দলের ভাঙ্গা ঘর আবার গড়ে তুলতে হবে; কেননা বাংলার অবস্থা যে রকম হয়ে আসছে তাতে এ দলের বিশেষ দরকার আছে। প্রথমত Reformএর দৌলতে দেশসুদ্ধ লোক পলিটিক্যাল হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত industrial হয়ে ওঠবার চেষ্টায় আছে। বৈশ্যবুদ্ধি দেশের লোকের এমন বেড়ে যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণধর্মের রক্ষার জন্যে আমাদের কোমর বাঁধতে হবে, নচেৎ আসন্ন ডিমোক্রাটিক যুগ যে কি পর্যন্ত ইতর হয়ে পড়বে, সে কথা ভাবতে গেলেও ভয় হয়। যে রকম লোকের ভাবসাব দেখতে পাচ্ছি তাতে করে আশঙ্কা হয় যে বাঙালী শেষটা মারোয়াড়ী হয়ে না ওঠে—তা না হোক, কলকাতা শহরটা যে আগাগোড়া বড়বাজার হয়ে উঠবে সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। তুমি যখন ফিরবে তখন দেখতে পাবে যে মা-গঙ্গা হয়ে উঠেছেন Clyde—বিদেশের যত Capital এদেশে এসে জুটেছে—স্বদেশের labour-এর হুড়োয়। "মায়াময়মিদং অখিলং"—এ বুলি অবশ্য আমরা আজও ছাড়ি নি, কিন্তু বর্তমানে এ-মায়ার অর্থ হচ্ছে রজত-মায়া এবং সে মায়ায় আমরা সবাই মুগ্ধ।

এই ত গেল দেশের কথা। আমি নিজে একরকম ভালই আছি, অর্থাৎ বরাবর যেমন থাকি তেমনই আছি। — এই ঘোর ওলট-পালটের দিনে Static সভ্যতার মাহাত্ম্য হঠাৎ আমার চোখে পড়েছে। যদি দেখ যে সবুজপত্র aristocratic সভ্যতার গুণ গাচ্ছে তাহলে আশ্চর্য হয়ে [illegible] অত্যাচারে democracyটা অসহ্য [illegible] ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

১০।৬।২০

কল্যাণীয়েষু
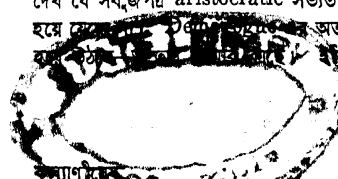
[illegible] তোমার কাছ থেকে আর একখানি চিঠি পেয়েছি। আজ "মেল-ডে"—তাই চটপট দু-ছত্র লিখে দিচ্ছি। উপরের ঠিকানা থেকেই বুঝতে পারছ যে আমি এখন আর আমার পুরোনো বাড়ীতে নেই।.........এখন কোনও কুটুম্বের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছি। ইতিমধ্যে একটি নতুন বাড়ী তৈরি করবার ইচ্ছে আছে এবং আপাতত তারই যোগাড়যন্ত্র করতে সকাল-বিকেল কেটে যাচ্ছে। আজকাল কলকাতা শহরে স্থাবর সম্পত্তিকে অস্থাবরে পরিণত করা যেমন সহজ—অস্থাবরকে স্থাবরে পরিণত করা দেখতে পাচ্ছি তেমনি কঠিন।

মরুক-গে জমিজমার কথা। এখন বইয়ের কথা কওয়া যাক্। Vasari আমি মূল ইতালীয় ভাষাতেই চাই। J. A. Symonds-এর Renaissance বহুকাল আগে আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি। আশা করি বইগুলোর ভাল edition পাওয়া যাবে। Classics দেখতে সুন্দর না হলে অচল হয়, কেননা ও জাতের বই লোকে ঘরে রাখে—প্রধানত ঘর সাজাবার জন্য। আমি অবশ্য ওসব বইয়ের পাতা কাটব—তবে পাতা কেটে যদি দেখি যে তার ছাপা ভাল তা হলেই খুসি হব আর তার উপর তার ভিতর যদি ছবি থাকে ত সোভানাল্লা।

আজকাল Machiavelli পড়ছি, Prince নয় Discorsi—চমৎকার লাগছে। ও ভদ্রলোকের বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায় না—সে বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি কঠিন। এ যুগে মানুষে মনোরাজ্যে তলওয়ার ধরতে জানে না—Renaissance-এর ইতালিতে

তারা জানত। আর Machiavelli ছিলেন সে দলের ভিতর সব চাইতে বড় ওস্তাদ। এ'র সংগে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে। দেখি কতদূর কি হয়।

"রায়তের কথা"র প্রতিবাদ কেউ করছে না। পলিটিসিয়ানদের দল এখন কথাটা চাপা দেবার চেষ্টায় আছে। কেননা, মডারেট একস্ট্রিমিস্ট দু'দলই জমিদারদের লেজ ধরে election বৈতরণী পার হবার উদ্যোগ করছেন। এই সব দেখে-শুনে দেশ ছেড়ে বিলেতে গিয়ে বাস করতে ইচ্ছে যায়। এখন হাতে এতটা টাকা হয়েছে যে আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে ইউরোপে বাস করতে পারি। শুধু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের টানে আমাদের এখানে আটকে রেখেছে। "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে" এ গানটা এখন আর মনে মনে গাই নে। দেখতে পাচ্ছ দেশের উপর আমার মন চটে গেছে—সুতরাং ও বিষয়ে আর বেশি কিছু বলা উচিত নয়, কেননা তাহলে আমার কলমের মুখ থেকে হয়ত অনেক মেজাজি কথা বেরিয়ে পড়বে। এখানে আজকাল বেজায় গরম,—থার্মমিটার ১১০ পর্যন্ত ঠেলে উঠছে। এ অবস্থায় মাথা ঠান্ডা রাখা অসম্ভব। বৃষ্টি পড়লে সরস চিঠি লিখব, এখনকার মত এই শুকনো ঝনো লেখাতেই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

পুঃ—Dent-এর Dante আমার হস্তগত হয়েছে।

20 Mayfair Baligunj Calcutta 12-7-22

কল্যাণীয়েষু,

গ্রীসের একটি গণ্ডগ্রাম থেকে লেখা তোমার দীর্ঘ পত্র পেয়ে যে কতদূর খুসি হয়েছি তা বলতে পারি নে। এত দূরদেশে থেকেও আমাকে মনে করে ও-চিঠিখানি লিখেছ, এতে আমি বাস্তবিকই মহা-আনন্দিত হয়েছি। পত্র পাঠ সেখানিকে যন্ত্রস্থ করেছি, তার পর তার প্রুফ বাড়ীর সকলকে ও রবিবাবুকে পড়ে শুনিয়েছি......। সকলেই বলছেন চিঠিখানি চমৎকার হয়েছে।......

বুঝতে পারছ প্রায় দু'বছর আমি কি ঝঞ্চাটে ছিলুম। লেখাপড়া একরকম বন্ধই ছিল। তবে একটা নতুন বিদ্যে শিখেছি—মিস্ত্রির কাজ। এখন আমি কত ইঁটে এক শ ফুট গাঁথনি হয়—কত চৌড়া ঘরে কি মাপের লোহার কড়ি লাগে, কোপলা কাকে বলে,—পোল খিলেন কোথায় চলে—ভাঙ্গা খিলেন কোথায় দিতে হয়—আর Jack-arch-এরই বা গুণাগুণ কি, এসব বিষয়ে অনেকটা ওয়াকিবহাল হয়েছি। ভবিষ্যতে আমার লেখায় এ বিদ্যের পরিচয় দেব।

এ-অবস্থায় 'সবুজপত্র' যে শুকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তার পর 'নন-কো' আন্দোলনে, লোকের মতামত, কথাবার্তা সব উল্টোপাল্টা হয়ে গিয়েছিল, ও ব্যাপারের মধ্যে সাহিত্য-আলোচনা একেবারে অচল হয়ে পড়েছিল। গত ১২ ফেব্রুয়ারী বার্দোলিতে কংগ্রেস যে সঙ্কল্প করেন তার পর দেশ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। শুধু 'চরকা আর খদ্দর' নিয়ে বাঙলা থাকতে পারে না। এই অবসরে আমি আবার লিখতে আরম্ভ করেছি। তিনখানি নতুন সাপ্তাহিক পত্রে—শঙ্খ, বিজলী ও আত্মশক্তিতে নিয়মিত লিখছি। এটা একটা নতুন খবর কি না? সব লেখাই অবশ্য স্বনামে লিখি। প্রমথ চৌধুরী ও বীরবল, দুজনেই—হপ্তায় তিনদিন—সংবাদপত্রের স্তম্ভে আবির্ভূত হন। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে দুজন আমার পথ ধরেছেন। অতুল বাবুর লেখা 'বিজলী'তে আগে বেরিয়েছে, ধূর্জটির লেখা কাল বেরবে। এ কথা শুনে তুমি অবশ্য একটু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ। এই নতুন কাগজগুলো একটু নতুন ধরণের। এদের প্রায় সব প্রবন্ধই স্বাক্ষরিত। সম্পাদকীয় 'আমরা'র চল বাঙলা-কাগজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার পর এ-সব কাগজে, আর্ট সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান সকল বিষয়েই প্রবন্ধ বার হয়। এদের নিজের কোনও ব্যক্ত মত নেই অর্থাৎ যার যা মত, তিনি এসব কাগজে অবাধে প্রকাশ করতে পারেন। আর একটি কথা। এরা সব 'বীরবলী' ভাষা অঙ্গীকার করেছে এবং সেই সংগে বীরবলী ঢঙও। সুতরাং এরা সব ফুর্তি করে লেখে। এই ত হয়েছে আমার নতুন কাজ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আজ ক'দিন হল হঠাৎ মারা গেছেন। আজকে তাঁর একটি শোকসভায় আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করছি। এই নিয়ে আজ একটু ব্যস্ত আছি—তাই তোমাকে আজ আর দস্তুরমত চিঠি লেখা হবে না। আমাদের পাঁচজনের খবর জানিয়েই ও পত্র শেষ করব।

সত্যেন ঢাকা ইউনিভারসিটিতে চলে গিয়েছে।—ধূর্জটি আজও বেকার বসে আছে। অতুলবাবু ওকালতি করছেন। কিরণশঙ্কর 'নন-কো'র দৌলতে মাস তিনেক জেলে কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছে। এখন সে 'বিদ্যাপীঠে' মগ্ন আছে। 'হারীত' অশোকের কাল নির্ণয় করছে। শিশির ভাদুড়ি মদন-থিয়েটারের ম্যানেজার হয়েছে, লোকে বলে হাজার টাকা মাস মাইনেও পায়। তোমার বন্ধু পান্নালালও থিয়েটারগুলো দখল করে নিচ্ছে।—এ ছাড়া বাদবাকী সকলে ভেস্তে গেছে। সুবোধ চলে গেছে রেঙ্গুনে—প্রবোধ কিছু করছে না। বরদা গুপ্ত একদম ডুব মেরেছে। অমিয় চক্রবর্তী বোলপুরে জার্মান ও ফরাসী শিখছে। এই সব কারণে আমাদের সবুজ সভা এখন দু'জনের সভা হয়েছে—এর দুটি মেম্বর হচ্ছে আমি আর অতুলবাবু।

'সবুজ পত্র' আজও চালাচ্ছি—তবে আর চালাব কি না—তা আজও ঠিক করতে পারিনি।—এর পরের চিঠিতে সে কথা তোমাকে জানাব। আজ এইখানেই বিদেয় হই। বেলা একটা বাজে, এখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

[অতুলবাবু—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
মণ্টু—শ্রীদিলীপকুমার রায়
Anderson সাহেব=কেম্ব্রিজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক জে ডি অ্যান্ডার্সন
কিরণ=কিরণশংকর রায়
পবিত্র=শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
হারীত=শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব
ধূর্জটি—শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়]

ভিনসেণ্ট ভ্যান গোঘ

জীবন তাকে অভিভূত করেছিল। চার পাশে চোখ মেললে দেখতে পেতো লক্ষ লক্ষ জীবনের হাতছানি; চোখ বুজে নিজের অন্তরে দৃষ্টি সমাহিত করে দেখতে পেতো অগুন্তি জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই জীবনের জন্য একটা শাশ্বত পিপাসা তার চিত্তে একটা অনির্বাণ জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। সেই জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে সে খাঁটি সোনা হয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে শিল্পসৃষ্টির যে প্রতিভা প্রচ্ছন্ন ছিল তাকে অবলম্বন করে তার পরম সেই জীবন-তৃষা প্রচণ্ড আবেগে চোখ মেলেছিল।

তার নাম ভিনসেণ্ট ভ্যান গোঘ্। (Vincent Van Gogh) হল্যান্ডের গ্রুট-জুনডার্ট পল্লীতে ১৮৫৩ সালে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন সেখানকার পল্লী-গীর্জার ধর্ম-যাজক। পিতার ছয়টি সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। সেখানে দুঃসহ-দারিদ্র্য ও সুকঠোর আদর্শবাদিতার মধ্যে তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। কৈশোরে লণ্ডন শহরে ছবি বিক্রির দোকানে কাজ করতেন। সেখানে নানা ধরণের মানুষের সঙ্গে মিশে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা যেমন সঞ্চয় করেন, তেমনি লোকের শিল্পের ভালোমন্দ বুঝবার অক্ষমতা এবং সত্যিকার শিল্পসম্পন্ন জীবনময় চিত্রের প্রতি অনাদর ও নিষ্প্রাণ রঙ-সুর্বস্ব চিত্রের প্রতি লোকের স্বাভাবিক প্রবণতা তার মনে বিরক্তি ধরিয়ে দেয়। তার উপর , ব্যর্থ প্রেম, বঞ্চনা, প্রত্যাখ্যান সব মিলে তাকে বেদনায় জর্জরিত করতে থাকে।

সেই সীমাহীন বেদনার গুরুভার বুকে নিয়েও তিনি চারপাশের জীবনের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে চললেন।

সে-জীবন আরাম-আয়াস বিলাস-ব্যসনের জীবন নয়। মানুষের দুঃখ, দৈন্য, বেদনা ও বিষাদভরা সে জীবন। শহর-প্রান্তের বস্তির সেই কদর্যময়, অস্বাস্থ্যকর জীবন তাকে এতই বিচলিত করেছিল যে, তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য, তাদের দুঃখ-দৈন্যের জ্বালা ভোলাবার জন্য এই নিরতিশয় জঘন্য, নরককুণ্ড সদৃশ আবহাওয়া থেকে তাদের টেনে তুলবার জন্য তিনি অধীর হয়ে পড়তেন। যারা অট্টালিকায় বাস করে, প্রচুর আহার্যপানীয়ে দেহ পুষ্ট করে, ধর্মকে, ভগবানকে তাদের চাই না। এসব দিয়ে তারা কি করবে? কিন্তু যারা বস্তিতে থাকে, খেতে পায় না, কদর্যতার পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে, ধর্মের বাণী, ভগবানের বাণী শুনিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে, জীবনের প্রতি তাদের পরিচ্ছন্ন মমত্ববোধ জাগাতে হবে। এই সব নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা তাকে অহর্নিশ পীড়িত করত, যার ফলে তাকে ধর্মোপদেষ্টা হয়ে বস্তি-জীবনের মধ্যে কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ করেছিল।

ভ্যান গোঘের জীবনের মধ্যে ব্যর্থতার এক মর্মবিদারক মূর্ত আসন গেড়ে বসেছিল। তিনি যাতেই হাত দিতেন জীবন পণ করেও সফল হতে চাইতেন, কিন্তু তাঁর সকল কঠোর শ্রম ও চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতো। এই ব্যর্থতার জ্বালাকে নিজের মধ্যে লালন করে তিনি ক্ষতবিক্ষত হতে থাকতেন, কিন্তু কারো প্রতি কোনো অভিযোগ রাখতেন না। কিন্তু জীবনের প্রতি এক সীমাহীন লালসা তাঁর মধ্যে জ্বলজ্বল করত। সে লালসা তাঁকে এক অপার্থিব, অননুভূত ভাবোদ্বেগে অধীর করে রাখত। কামে, প্রেমে, জ্বালায়, ব্যর্থতায়, বঞ্চনায় ও অধীরতায় আচ্ছন্ন নিজের জীবনকে তিনি আঘাতের পর আঘাতে জাগিয়ে রাখতেন; সংঘাতের পর

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ভিনসেণ্ট ভ্যান গোঘের জীবনী অবলম্বনে লেখা Irving Stone-এর বিখ্যাত উপন্যাস Lust for Life-এর অনুবাদ "জীবন-তৃষা" আগামী সপ্তাহ হইতে "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে। উপন্যাসটি অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীঅদ্বৈত মল্লবর্মণ।

শিল্পীর নিজ প্রতিকৃতি

স্কুলের ছেলে

সংঘাত খেয়ে তাঁর সে-জীবন মানুষের জীবন-বিকাশের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। তাঁকে খাঁটি মানুষের শিল্পী করে তুলেছিল।

আর্টের ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাকালে, রেমব্রাণ্ট, রুবেনস্ প্রভৃতি মানবপ্রেমী শিল্পীর সৃষ্টি তাঁকে মুগ্ধ করত। তাঁরা রেখায় রেখায় মানবের দুঃখদৈন্যময় আসল রূপ ফুটিয়ে গিয়েছেন। সে সব চিত্রে তাঁর মনের অনুকূল সাড়া পেতেন তিনি। তাঁদের গুরু বলে মেনে নিয়ে নিঃশব্দে তাঁদের পায়ে শ্রদ্ধার অঞ্জলি ঢেলে দিতেন। কিন্তু তখনো তিনি নিজে ছবি আঁকবার কথা ভাবতেন না। রেনাঁর 'জেসাস্ ক্রাইস্ট' গ্রন্থে এই কটি লাইন তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল; লাইনগুলি পাঠ করে প্রায়ই তিনি অশ্রুপ্লুত হতেন ঃ "মানুষ কেবল সুখী হবার জন্য সংসারে আসেনি; কেবল সৎ হয়ে চলাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। মানবতার জন্য তাকে অনেক বড়োবড়ো জিনিস বুঝতে হবে, তাকে মহত্ত্ব অর্জন করতে হবে, যে অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির মধ্যে প্রায় প্রতিটি মানবাত্মা নিজের অস্তিত্ব টেনে টেনে চলেছে, তাঁকে তার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।" তেইশ বৎসর বয়সে লণ্ডনের ছবির দোকানে যখন কাজ করতেন, তখন সেখান থেকে সহোদর থিয়োকে লিখিত একখানি পত্রে এই লাইন কয়টি তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন।

ভ্যান গোঘ মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। জীবনের মাত্র দশটি বৎসর বাকি থাকতে তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন। এই দশটি বৎসরই তাঁর শিল্পী-জীবনের আরম্ভ ও শেষ। এই অত্যল্প জীবনের মধ্যেই তিনি দুই হাজার পেণ্টিং ও ড্রইং করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল জীবনের শেষ চারি বৎসরের মধ্যে।

আজ তাঁর ছবিগুলি পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। তাঁর ছবিতে বিশ্বমানবের দুঃখ-বেদনা রূপ পেয়েছে বলে, তার মধ্যে সার্বজনীন মানবাত্মা বিকশিত হয়ে উঠেছে বলে সর্বদেশের শিল্পরসিকদের কাছে সে-সব ছবি অকুণ্ঠ বন্দনা লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর এই আন্তর্জাতিক খ্যাতির কণামাত্রও তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তিনি নিজের নিভৃত লোকের উচ্ছলিত আনন্দে মশগুল হয়েই ছবির পর ছবি এঁকে যেতেন। জীবনের যে অনন্ত নগ্ন-মূর্তি তার অন্তরের তটে আজীবন ঢেউয়ের মতো মাথা কুটে মরছে, প্রচণ্ড আবেগে সেগুলি তার তুলিচালনার মধ্যে বেরিয়ে আসতে লাগল। তাই খ্যাতির প্রতি, নামের প্রতি, অর্থের প্রতি উদাসীন থেকে তিনি অধীর আনন্দে আচড়ে আচড়ে জীবন সৃষ্টি করে চলতেন। সে সব কারো ভালো লাগল কিনা সেদিকে ফিরেও তাকাতেন না। আর সত্যি সত্যি, তখন সে-সব ছবি কারো ভালো লাগে নি। কারণ এর ভিতর-কার নবজীবনের সূচনা তখন তারা আভাসেও বুঝতে পারেনি। তাঁর দুই হাজার ছবির মধ্যে জীবদ্দশায় মাত্র একখানা ছবি বিক্রি হয়েছিল। তাও, তাঁর এক বন্ধু নিতান্ত কৌতূহলের বশে সেখানাকে পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন। সাফল্য এসেছিল তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। আজ তাঁর বড়োবড়ো ক্যানভাসগুলোর এক একটির দাম আমাদের দেশের মুদ্রায় পৌণে দুই লক্ষ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা! সর্বসাকুল্যে তাঁর ছবিগলির

পিয়ানো বাজনায়

আনুমানিক মূল্য হবে ভারতীয় মুদ্রার সতেরো কোটি থেকে পঁচিশ কোটি টাকার মধ্যে।

সারাজীবন তিনি দারিদ্র্যে কষ্ট পেয়েছেন। চারপাশের দীনদুঃখীদের জীবন, তাদের অশ্রু-বেদনা দুঃখযন্ত্রণা, নিজের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে লালন করেছেন . এবং এই দ্বিগুণিত বেদনার নিত্যদংশনে চিত্তের অভ্যন্তরে বিক্ষত হয়েছেন। জীবদ্দশায় এই সাফল্য এলে তিনি যে কি করতেন সে সম্বন্ধে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন সাহিত্যিক আর্ভিঙ্ স্টোন ভ্যান গোঘের জীবনী অবলম্বনে একখানা উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি বিস্তর অনুসন্ধানের পর যে তিনি এই জগৎপ্রসিদ্ধ শিল্পী জীবনকে উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন একথা বলা বাহুল্য। তিনি বলেছেন ঃ আজ তাঁর ছবির মূল্যের অঙ্ক দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু সে অঙ্ক যত বড়ই হোক, বেঁচে থাকতে এ অঙ্ক দেখতে পেলে তিনি যে খুব উল্লসিত হয়ে উঠতেন তাও মনে হয় না। কেননা, অর্থের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। তাঁর একমাত্র আসক্তি ছিল জীবনকে বুঝবার প্রতি, তাঁর একমাত্র অনুরাগ ছিল জীবনকে শিল্পে রূপদানের প্রতি।

শিল্পীদের মন স্বভাবতঃই স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। ভিনসেণ্ট ভ্যান গোঘ ছিলেন সেই স্পর্শকাতরতার চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি। অতি অদ্ভুত ও বিচিত্র তাঁর জীবন। প্রণয়াদি সর্ব-বিষয়ে বঞ্চনালাভের এক অত্যদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় তাঁর চিত্তে বিক্ষোভ জেগেছিল এবং সেটা অপ্রকাশ্য থেকে থেকে তাঁর প্রকৃতিকে অস্বাভাবিক করে তুলেছিল। শৈশবে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ পেলে তাঁর মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। বারো বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতার পল্লীভবনের চার-পাশের বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি জাত-শিল্পী ছিলেন বলেই প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি প্রাণরসের উচ্ছ্বাস দেখতে পেতেন। এই প্রকৃতিপ্রেমই পরবর্তী সময়ে মানবপ্রেমে রূপায়িত হয়ে তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে জীবনরসে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল। তা ছাড়া ছবির দোকানে কাজ করার দরুণ বড়োবড়ো শিল্পীদের সৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সর্বক্ষণ কাটাবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবচরিত্র লক্ষ্য করে আত্মীয়েরা তাঁকে ধর্মোপদেষ্টার শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমস্টারডামে পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন। সেখানে পিতৃব্যভবনে থেকে ভাষাতত্ত্ব বীজগণিত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি শিক্ষার জন্য তিনি রোজ দিনেরাতে আঠারো-কুড়ি ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করতেন। কিন্তু মানব-দুঃখের এক বিশ্বতশ্চক্ষু অগ্নিগর্ভরূপ তাঁকে সারাক্ষণ চঞ্চল করে রাখত বলে, তাঁর ত্রুটিহীন যত্নের মধ্যেও ব্যর্থতা দেখা দিয়েছিল। আমি কি, কোন্ কাজে আমি সংসারে এসেছি, এই মানবসমাজে আমার জীবনের কি প্রয়োজন? এতসব বড়োবড়ো বই মুখস্ত করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? এসকল চিন্তার আগুনে তাঁকে নিয়ত দগ্ধাতে থাকলে, একদিন সহসা পড়াশুনা ছেড়ে দিলেন। তারপর এক ধর্ম-প্রচারক দলের মারফতে কয়লাখনির মজুরদের মধ্যে কাজ করার সুযোগ জুটে যায়। কিন্তু সেখানে মজুরদের দুঃখ-দারিদ্র্যের অংশ গ্রহণার্থে ভগ্নকুটীরে অবস্থান, স্বল্পাহার গ্রহণ এবং সর্বসমক্ষে নিজের পাপ ও ত্রুটিবিচ্যুতির স্বীকৃতি এসব কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে সকলের বিদ্রূপমাত্র তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল, আর কিছু নয়। তারপর সেখান থেকে তিনি পদচ্যুত হন।

তাঁর শিল্প-চর্চার শুরু এর পর থেকেই। তাও নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে অতি অদ্ভুত পথে বিবর্তিত হয়ে চলেছিল। তাঁর

ডাকপিওন রুলিন

গৃহ কাজ

সতত-অস্থির জীবনে যে স্থৈর্য আনবার জন্য আত্মীয়দের চিন্তা ও উদ্বেগের অন্ত ছিল না, শিল্প-চর্চা শুরু করার পর সে স্থৈর্য আপনা থেকে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার অধৈর্য, চিত্রশিক্ষকের সঙ্গে ঝগড়া, এসবের দরুণ তাঁর মন তিক্ত থাকত। প্রেমবঞ্চিত যুবক এই সময়ে পথিপার্শ্ব থেকে একটি স্ত্রীলোককে ধরে এনে তাকে নিয়ে ঘর-সংসার পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর দুঃখযন্ত্রণা বাড়ল বই কমল না। আত্মীয়-স্বজন তাঁর উপর একান্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কেবল তাঁর চার বৎসরের কনিষ্ঠ সহোদর থিয়োর মমতা কখনো তাঁর উপর থেকে অন্তর্হিত হয় নি। থিয়ো সর্বদাই তাঁর সুখ-দুঃখের সমভাগী ছিলেন।

অস্থির প্রকৃতির জন্য ভিনসেণ্ট কারো সঙ্গেই মানিয়ে চলতে পারতেন না। প্যারিসে শিল্পচর্চার সময় তাঁর মত অদ্ভূত আর এক শিল্পী পল গগাঁর সঙ্গে তাঁর সাংঘাতিক এক ঝগড়া হয়েছিল এবং তার ফলও খুব মারাত্মক হয়ে ছিল।

প্যারিসে তাঁর কোনো শিল্পী বা শিল্প-শিক্ষকের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ার দরুণ তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে চলে আসেন। সেখানে আর্লস-এর সূর্যকরোজ্জ্বল পল্লীসৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করল। সেখানে ক্রাউ-এর রৌদ্রোদ্ভাসিত মাঠ, ময়দান ও তৃণভূমির ছবি আঁকতে আঁকতে তাঁর দিন কেটে যেত। মানুষের ছবিও আঁকতে থাকেন। কিন্তু সে ছবি "সিটার" সামনে রেখে আঁকলেও তাতে নিজেকেই তিনি উজাড় করে দিতেন। কখনো ডাকহরকরা, কখনো কৃষক, কখনো কোনো বন্ধুকে তিনি তুলির রেখায় রূপ দিতেন। তাতে তাঁর আজন্মলালিত মানবতার রূপই রেখায় রেখায় বিকশিত হয়ে উঠত।

সেখানে তাঁর শিল্পপ্রেরণা নূতন নূতন খাতে প্রবাহিত হত। যা কখনও আঁকা যায় না, এমন জিনিসও তিনি আঁকবার চেষ্টা করতেন। তমোময়ী রাত্রি, তারকাচ্ছন্ন আকাশ, হলদে ও নীল রঙের ঘূর্ণি—এসব দুঃসাহসিক শিল্পচেষ্টা তাঁর তুলিকা সম্পাতে প্রকাশ হোত।

তারপর থেকে তাঁর মানসিক অস্থিরতা ও অস্বাভাবিকতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাঁকে উন্মাদশালায় নিয়ে রাখতে হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তাঁর শিল্পচর্চার বিরাম ছিল না। অতঃপর প্রকৃতিস্থ বলে সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি পাগলা-গারদ থেকে ছাড়া পান। এই সময়ে প্যারিসের কাছে "অভারসুর-অয়েস্" নামক স্থানে অবস্থানকালে শিল্পরসিক ডাঃ গাচেট-এর পোর্ট্রেট এঁকে তাঁকে মুগ্ধ করেন এবং ডাঃ গাচেটও তাঁকে এনগ্রেভিংএর ধরণধারণ শিক্ষা দিতে থাকেন।

এর কিছুদিন পরেই তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়ে একখানি উচ্চাঙ্গের শিল্প-সাময়িকী পত্রে এক প্রবন্ধ বের হয়। জনসমাজে এই তাঁর প্রতিভার সর্বপ্রথম স্বীকৃতি। কিন্তু তখন আর তাঁর এসব দেখবার মতো অবস্থা ছিল না। হতাশা বিষাদ ও মানসিক বৈকল্যে তাঁর স্বাস্থ্য তখন একেবারেই ভেঙে পড়েছে। তিনি আজীবন আর্তদের, অশান্তদের সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজেকে অপরে কেউ সান্ত্বনা দিতে চান নি। জগতের কারো কাছে সান্ত্বনা না পেয়েই বোধ হয় সে ভার তিনি নিজ [illegible] গ্রহণ করলেন। ১৮৯০ সনের [illegible]শে জুলাই তিনি নিজ দেহে গুলী করলেন। এর দুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভ্রাতার আত্মহত্যার শোকে থিয়োর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে তিনি এক বৎসর পরেই ভ্রাতার অনুগমন করেন।

এখানে ভিনসেণ্ট ভ্যান গোঘের অঙ্কন সম্বন্ধে দু'এক কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করব।

কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনে তাঁর ছাবর এক প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে সহস্র সহস্র শিল্প-রসিক উপস্থিত হয়ে এসব ছবি দেখেছে ও প্রশংসা করেছে। পাশ্চাত্যের নানা দেশের শিল্পপ্রেমিকদের মধ্যে তাঁর ছবি ছড়িয়ে

রয়েছে। তা ছাড়া, নানা চিত্রশালাতে এসব ছবি সযত্নে রক্ষিত আছে। মোটের উপর তাঁর ছবি আজ সর্বত্র সমাদৃত। শিল্পীর নিজের অদ্ভুত চরিত্র এবং তাঁর জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, শিল্পে রূপায়িত হয়েছে বলেই ছবিগুলি হয়েছে বাস্তব ও জীবন্ত। সম্ভবত এই জন্যেই এগুলি আজ সর্বদেশের শিল্পরসিকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাচ্ছে। তাঁর তুলিকা-সম্পাতে অসাধারণ শক্তি, মানসিক অস্থিরতার দরুণ অভূতপূর্ব আবেগ এবং প্রাণের সহনাতীত চাঞ্চল্য সব কিছুর সমন্বয়ে তাঁর শিল্পে জীবন-নৃত্যের একটি অখণ্ড ছন্দ কল্লোলিত হয়েছে। রঙের ঘনত্ব ও তুলির চাঞ্চল্য তাঁর ছবিতে শ্রাবণের বর্ষণের মতো রেখার বৃষ্টিপাত করে চলেছে। ফরাসী আভাসবাদী (Impressionist) শিল্পীদের মতো বৈজ্ঞানিক বর্ণ-সামঞ্জস্য তিনি ছবিতে রক্ষা করেন নি। তাঁর ছন্দময় বর্ণ-চাতুর্য বরং নিজের মানসিক অবস্থারই ব্যঞ্জনা। হলদে রঙকে আলো ও জীবনের প্রতীক মনে করে তিনি চিত্রে প্রধানত এই রঙই ব্যহার করতেন বেশি।

তাঁর শিল্প-সাধনার জীবনকে সময়ের দিক থেকে মোটামুটি তিন ভাগে দেখানো যায়।

হল্যান্ডে কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার সময়ে, ব্রাবান্টের তৃণভূমি অঞ্চলে হেগ্ শহরে বাসকালে তাঁর যে কয় বৎসর কেটেছে, সেটা তার শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্যায়। তখন তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল গভীর ধর্মভাব ও মানবতার প্রতি মমত্ব বোধ থেকে উৎসারিত। দিনমজুর, খনিমজুর, ভিখারী, চাষা—এদের অযত্নের জীবন, পর্যুদস্ত জীবন প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের জীবনের সামিল; তিনি এদেরই জীবন পর্যবেক্ষণ করে চিত্রিত করেছিলেন তাঁর এই সময়ের শিল্পসাধনা। তাঁর অমর চিত্র দি পোট্যাটো ইটার্স—এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের ক্ষীণ প্রদীপালোকে আহার্য গ্রহণের এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য—এই সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ফিরে এলে তাঁর শিল্পজীবনের মোড় ঘুরে গিয়ে দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়। এই সময়ে তাঁর প্রতিভা আশ্চর্য রকমে বিকাশলাভ করে। তিনি বড়ো বড়ো আভাসবাদী শিল্পী ও তাঁদের অনুগামীদের পর্যালোচনা করে তাঁদের 'থিওরি' ও 'প্র্যাকটিস' বিশেষভাবে অনুধাবন করেন; কিন্তু সব কিছুতে নিজের ব্যক্তিত্ব ও সত্তার ছাপ দিতে ভোলেন নি। তাঁর হল্যান্ডীয় যুগের চিত্রে রামধনুর বর্ণ-চমক বেশি প্রকাশ পেত। তাঁর প্যারিসযুগে সেটা বিবর্তিত হয়; এই সময়ে পুষ্প সুষমা, স্টিল-লাইফ প্রভৃতির অনেক আশ্চর্যজনক চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল।

কিন্তু শহরের কোলাহলে রুদ্ধপ্রাণ হয়ে তিনি দুবৎসর পরেই প্যারিস ত্যাগ করে দক্ষিণ ফ্রান্সে চলে যান। সেখানে প্রভেন্সের আর্লস নামক স্থানে অবস্থিতিকালে পুনরায় তাঁর সাধনার গতি পরিবর্তিত হয়। এখানকার রৌদ্রোজ্জ্বল প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি অশ্বগতিতে তুলি চালনা করে চিত্রের পর চিত্র সৃষ্টি করতে থাকেন। এটাই তাঁর শিল্পজীবনের শেষ পর্যায়। সেখানে তিনি দিন-রাত ছবি আঁকতেন। চোখের সামনে যা দেখতেন, তাকেই তিনি শিল্পরসে রসিয়ে ক্যানভাসের গায়ে রূপায়িত করতেন। তাঁর চিত্রে তখন নূতন গভীরতা ও ঐশ্বর্য, আশ্চর্য উৎকর্ষ এবং বর্ণ-প্রলেপের এক বৈপ্লব চমৎকারিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ তাঁর শিল্পসাধনার স্বর্ণযুগ। ঐ বৎসরে এক এপ্রিল মাসেই তিনি 'ফুটন্ত ফুলময় বাগিচায় (Orchard in blossoms) শীর্ষক' চিত্রপুঞ্জের পনেরো পর্যায় ছবি এঁকেছিলেন। বিখ্যাত 'সূর্যমুখী' চিত্রের চারি পর্যায় চিত্রিত করেছিলেন। এ ছাড়াও অনেক বিখ্যাত ছবি তাঁর এই সময়ের অঙ্কন। কিন্তু ঐ সময়ে চিত্রে অত্যুৎকর্ষের অস্বাভাবিক বেগ দিতে গিয়েই সম্ভবত তাঁর জীবনীশক্তি ক্ষয় পেতে থাকে। তিনি দেহে মনে কাবু হয়ে পড়েন। দেহ ও মনের ওপর এইরূপ অস্বাভাবিক অত্যাচারের দরুণ তাঁকে শাসন করে, এমন কেউ ছিল না বলেই তিনি জীবনের সন্ধানে বল্গাহারা বেগে ছুটে চলেছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে ক্ষমা করে নি।

বসন্ত-বাহার

ত্রিপুরা চক্রবর্তী।

কে এই ত্রিপুরা, কি তার পেশা, কিছুই জানি না।

খামের ওপর পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বড়বাবু ঠিকানা লিখে দিলেন।

ঠিকানাটারই দরকার বেশি, ঠিকানাটাই বড় কথা। আমার সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক কি।

খামের মুখ জুড়ে দিতে দিতে বড়বাবু বললেন, "অক্রূর দত্ত লেন থেকে খুব বেশি ঘুরে হবে না। একটু এগিয়ে বাঁদিকে গলি দেখতে পাবে। গলির মুখে দু-তিনটা বড় বাড়ি। তারপর একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ। নিম কি অশথ হবে, বেদীর মত বাঁধান নিচেটা; হ্যাঁ, ওখানটায়। দেখবে জায়গাটা বেশ একটু ফাঁকামতন।'

বললাম, 'পারব স্যার। ঠিকানা বার করতে কষ্ট হবে না।'

বড়বাবু আমার হাতে চিঠি দিলেন।

'জরুরী চিঠি। বেয়ারা ফেয়ারা নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে।' হাত-ঘড়ির ওপর চোখ রেখে বড়বাবু হাই তুললেন। 'সোওয়া ছ'টা। হ্যাঁ সাতটার আগেই তুমি পেঁৗছে যাবে।'

'তা পারব, স্যার।'

'ভাল কথা। ট্রামের পয়সা নিয়ে যাও।'

মনিব্যাগ খুলে করকরে একটা আধুলি বড়বাবু আমার হাতে গুঁজে দিলেন।

একে বড়বাবু, তার ওপর তাঁর ব্যক্তিগত কাজ, এবং সেটাও বেশ জরুরী। খুব কৃতার্থ-বোধ করলাম।

বড়বাবুর কাজ করার সুযোগ পেয়েছে এবং নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে নি পৃথিবীতে এমন কেরানী কজন আছে আমার জানা নেই।

তার ওপর এই আধুলি।

অক্রূর দত্ত লেন অবধি ট্রামে ক'রে যাওয়া ও সেখান থেকে বাড়ি ফেরা (ফার্স্ট ক্লাসে চেপেও) তিন আনা দশ পয়সার বেশি নয় হিসাব আছে।

অফিস থেকে বেরিয়েই ঝুপ করে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ি। একটা ডিম-সিদ্ধ, টোস্ট ও চা খেয়ে ভারি পরিতৃপ্তবোধ করলাম।

ভাগ্যিস বেয়ারা পিয়ন চলে যাওয়ার পরও একটা টাইপের কাজে আটকা পড়েছিলাম। তার পুরস্কার।

মনে মনে বড়বাবুর দীর্ঘজীবন কামনা করে গালে পান গুঁজে সিগারেট ধরিয়ে বৌবাজারগামী ট্রামে চাপি।

কতক্ষণ আর। অক্রূর দত্ত লেন থেকে বেরিয়ে যাওয়া গলিও চট্ করে পেয়ে গেলাম। জাঁদরেল বাড়িও চোখে পড়ল দু'চারখানা।। তারপরই বাড়িগুলো থেমে গেছে। হ্যাঁ, নিম-গাছ। বাঁধানো বেদী। দেখলাম টিউবওয়েল, গ্যাসের আলো, কাঁচা নর্দমা। ধোঁয়া ও মোষ-ছাগলের গন্ধের সঙ্গে আর একটা গন্ধ নাকে লাগল।

বলতে কি, গন্ধটা ভাল লাগল।

পৌষের সন্ধ্যায় গরম ফুলুরী-বেগুনীর গন্ধ কার না ভাল লাগে। দু-চার পয়সার কিনে খাওয়ার লোভ হ'ল।

খদ্দেরের ভিড় দেখে আর অগ্রসর হই নি।

বরং যারা তেলেভাজা শেষ করে বেদীর ওপর পা ঝুলিয়ে বসে মাটির ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছে, বিড়ি টানছে গালগল্প করছে, তাদের দিকেই অগ্রসর হলাম।

জিজ্ঞেস করতে একজন আঙুল দিয়ে বংগালীবাবুর ঘর দেখিয়ে দিল।

খোলার ঘরের তিরাশী নম্বরের কামরা।

অর্থাৎ আরও আশীটা দরজা অতিক্রম করার জন্যে আমি ফের রাস্তায় নামলাম।

তেলেভাজার দোকানের শেষে সাবান ও সোডা-লিমনেডের বোতল সাজানো পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে পানের দোকান চোখে পড়ল। লম্বা হিন্দুস্থানী মেয়ে টাকা ফেলে দিয়ে বাঙলা পানের খিলি ও ক্যাপস্টানএর প্যাকেট কিনছে।

এক জয়গায় দেখলাম অনেকগুলো রিক্সা, পা নামানো, পিঠ গুটোনো, ভাঙা কি চালু ঝাপ্‌সো আলোয় ভাল মালুম হ'ল না।

ছাগলের ডেরা, মোষের আস্তানা পার হয়ে গেলাম।

একবারে শেষের দিকের ঘর চক্রবর্তীর।

এই প্রথম একটি ঘরের সামনে দড়ির ওপর একটা ভিজা শায়া ঝুলতে দেখলাম। কাঁচা নর্দমা, তেলেভাজা ও ধোঁয়ার গন্ধের পর এই প্রথম নাকে লাগল মিষ্টি সাবানের গন্ধ, যেন ভিজে শায়া থেকে উঠে আসছিল।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলাম।

পুরুষ বেরোলো না, এল স্ত্রীলোক। একটি মেয়ে। অল্প বয়স। হাতে হারিকেন। এই অঞ্চলে ইলেকট্রিক নেই আগের ঘরগুলো দেখেই বুঝেছিলাম।

'কাকে খুঁজছেন, আপনি?' হাতের লণ্ঠন মাটিতে রেখে মেয়েটি বলল, "নাম?"

আমার নাম আর কি করে বলি, বলে লাভই বা কি। বললাম, 'ম্যাকফার্সন কোম্পানী থেকে এসেছি, বড়বাবু চিঠি দিয়েছেন।'

'কই, দিন।' মেয়েটি হাত বাড়াতে খামটা আমি ওর হাতে ছেড়ে দিলাম।

ইংরেজি লেখা। উচ্চারণ করে মেয়ে ত্রিপুরা চক্রবর্তীর নাম পড়ল। বুঝলাম ইংরেজি জানা মেয়ে।

'দাঁড়ান, বাবাকে দিয়ে আসি।' ও ঘরে ঢুকল চিঠি নিয়ে।

একটু পর বেরিয়ে এল ত্রিপুরা চক্রবর্তী। দু'দিকের গাল গর্তে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তা তো না, চোখে পড়ল ধনেশপাখির নাকের মত উঁচু নাক, আর তার চেয়েও বেশি উঁচু চক্রবর্তীর দাঁত।

এই রোগা শরীরে এতবড় দাঁত কেমন অদ্ভুত লাগল। বেমানান। নাকের কাছে হারিকেন ও খাম তুলে নিজের নাম পড়া শেষ করে চক্রবর্তী আমার দিকে তাকাল।

'আপনি নিয়ে এসেছেন চিঠি?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ম্যাকফার্সনে চাকরি করেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কেরানী?'

মাথা নাড়লাম।

'বি গ্রেড না সি গ্রেড? কদ্দিন ঢুকেছেন? প্রভিডেন্ড ফন্ড হয়েছে? ডেস্পাচে এখন আছে কে? ছারপোকা ভর্তি বেতের চেয়ারগুলো সরিয়েছে এখন? হাজিরা-খাতা এখন সাড়ে নটায় সরিয়ে নেয় না নটায়?'

এতগুলি প্রশ্নের কোনটার উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে আমি চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকালাম।

'নতুন ঢুকেছেন?' চক্রবর্তী ফের প্রশ্ন করল।

সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে দেখে খুশি হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তা তো চেহারা দেখেই ধরেছি।' একটু কেসে চক্রবর্তী আলোটা মাটিতে রাখল।

বললাম, 'আমাকে কি অপেক্ষা করতে হবে?'

'অপেক্ষা? কেন? ফক্ করে একদলা কফ আমার মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে চক্রবর্তী হাসল, হাসল কি কাসল, লম্বা দাঁতের জন্যে তা বোঝা গেল না। 'চিঠির জবাব? সে হবে'খন।'

'আমি তা হলে—'

'আরে দাঁড়ান না মশাই, এত তাড়া কেন, কোথায় থাকেন আপনি?'

'শ্যামবাজার।'

'হরি হরি।' হাসি কি কাশির ধমকে সুপারী গাছের মত লম্বা শুকনো শরীর কেঁপে উঠল। 'ভাবলাম আরো বেণ্ডেল থেকে এসে বুঝি আপিস করেন, ট্রেন ধরার তাড়া।'

চুপ করে রইলাম।

বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল চক্রবর্তী। আমার চোখের ওপর চোখ নামিয়ে বলল, কেমন ঠাণ্ডা পড়েছে বোঝেন। কই, দিন না চার-ছ-আনার পয়সা, গরম তেলেভাজা খেয়ে শরীরটা একটু মুড়মুড়ে করে তুলি?'

একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।

'ইস, কি যে রুচি তোমার বাবা, ছোটলোকের এই খাবারগুলো কেন তুমি—'

ত্রিপুরা পিছনের দিকে ঘাড় ফেরাল, আমিও চোখ ফেরালাম।

চক্রবর্তীর সেই মেয়ে। পিছনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ খেয়াল করি নি।

'দেখলেন, শুনলেন মেয়ের কথা? চক্রবর্তী আমার দিকে মুখ ফেরাল, 'তুই নয় আই-এ পাশ করেছিস, বাপের চেয়ে পণ্ডিত বেশি, টনটনে হাইজিন জ্ঞান হয়েছে, তাই বলে,—তাই বলে—' চক্রবর্তীর হাসি এবার পরিষ্কার ধরা পড়ল। উঁচু দাঁতের দেয়াল থেকে নিচের ঠোঁটটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। 'ম্যাকফার্সন কোম্পানীর একজন কেরানী তো আপনি, এককালে আমিও যে ওখানে ছিলাম, কাশির জন্যে—যাক্ সেসব কথা, ঠাণ্ডার সময় গরম এক ঠোঙা তেলেভাজা পেলে কেরানীরা কেমন খুশি হয়, আপনিই বলুন না মশাই।' এর পর, বুঝলাম, একটু বিরক্ত হয়ে মেয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকল। আর এল না।

চক্রবর্তী ঠিক হাত বাড়িয়ে আছে।

বড়বাবুর দেওয়া আধুলীর অর্ধেকটা ওর হাতে দিয়ে আমি রাস্তায় নামলাম।

শহরের মাঝখানে এমন চমৎকার ফাঁকা জায়গা আছে আর সেখানে আমাদের প্রাক্তন সহকর্মী এক ত্রিপুরা চক্রবর্তী লুকিয়ে আছে ভাবতেই পারি নি।

পরদিন অফিসে, কি যেন মনে পড়তে হঠাৎ অরুণকে বললাম বড়বাবুর সেই চিঠির কথা, সেই ছাগলের আস্তানা, খোলার ঘর, ম্যাকফার্সন কোম্পানীর ত্রিপুরা চক্রবর্তী, তার দাঁত নাক সুপারি গাছের মত শুকনো লম্বা শরীর, আই-এ পাশ মেয়ে সব, আর সবচেয়ে মজার, তেলেভাজা কাহিনী—।

কাজের চাপে অন্যমনস্ক ছিল অরুণ। বলল, 'হয়ত ছিল এখানে এক ত্রিপুরা, নব্বই বছর কোম্পানী চালানি ব্যবসা করছে কয়লাঘাটা স্ট্রীটে, কতজন এল, কত আদমী চালান গেল এই অফিসের দৌলতে, তার ঠিক ঠিকানা আছে কি?'

অরুণের কথা অনুমোদন করলাম।

কেননা, কতজন দেখছি, রোজ বড়বাবুর দরজায় ঢু মারছে। আসছে যাচ্ছে।' চাকরি প্রার্থী থেকে শুরু করে দশটা চাকরি দিতে পারে এমন লোকের-ই বা অভাব কি বড়বাবুর দরজায়। দশটা ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় বলেই তো তিনি বড়বাবু।

ভুলে গেছলাম, ভুলতে বসেছিলাম ত্রিপুরাকে।

একদিন শীত কমে গিয়ে একটু একটু গরম হাওয়া দিতে শুরু করেছে সবে, হঠাৎ চোখে পড়ল সেই দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি। লিফট থেকে বেরিয়ে আসছে।

টিফিন সেরে আমি নিজের কামরায় ঢুকব, পিছন থেকে ডাকল, 'অ মশাই, শুনুন।'

ত্রিপুরা চক্রবর্তী।

যেন আমায় চিনতে পারল না। কেননা হাসি কি কাশি, দাঁতের ওপারে কোন শব্দই শুনলাম না, আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো সত্ত্বেও।

'ঘণ্টা পড়বার আগেই যে গরুর মত ছুটছেন, বলি আমরাও তো কাজ করেছি এককালে।' পকেট থেকে হলদে শাদাটে একটা খাম চক্রবর্তী আমার হাতে গুঁজে দিল। 'পি কে ভিতরে আছে?'

পি কে বড়বাবুর সংক্ষিপ্ত ইংরেজি নাম।

বললাম, 'আছে, যান, দেখা হবে।'

'যান টান নয়, দয়া করে চিঠিখানা এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন, নিজে গিয়েই দিয়ে আসুন না।' বলতে বলতে চক্রবর্তী লিফটের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'আমি যাই না ওর কামরায়, আমি যাব না।'

যেন রাগ, যেন অভিমান বড়বাবুর ওপর। চাকরি না পেলে কি চাকরি থেকে বরখাস্ত হলে বড়বাবু সম্পর্কে মানুষের মনের এই অবস্থা হয়! চক্রবর্তীর ঠিক কোনটা আমি ভেবে শেষ করবার আগেই ও লিফটে বেয়ে সরাৎ করে নিচে নেমে গেল।

কি ভেবে পরে বেয়ারার হাতে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম বড়বাবুর ঘরে।

আশ্চর্য, ঠিক সেদিনই, বিকেলে, আবার আমার ডাক পড়ল। না, ছুটির পরে নয়, ছুটি হবার আগে। ঘড়ির কাঁটা তখন মোটে চারটে চল্লিশে।

'তুমি এখনি চলে যাও, মিহির।' নাম ঠিকানা লেখা শেষ করে খামের মুখ জুড়ে বড়বাবু চিঠিটা আমার হাতে তুলে দিলেন। 'বেয়ারা পিয়নকে দিয়ে বিশ্বাস নেই, ওরা খামোকাও রাস্তায় দেরী করে।'

দেখলাম, টেবিলের একপাশে বড়বাবুর টিফিন—মানে পেঁপের স্তূপ, সিঙ্গারার ঠোঙা, দুধের ভাণ্ড তখন পর্যন্ত অস্পৃষ্ট অভুক্ত।

যেন ঘেমেটেমে এই মাত্র তিনি চিঠি লিখে শেষ করেছেন।

'ঠিকানা খুঁজে পেতে সেদিন কষ্ট হয় নি তো?'

'না স্যার।' কৃতার্থের হাসি হাসলাম।

'সোজা রাস্তা, কষ্ট হবার কথা নয়।' মনিব্যাগ খুলে বড়বাবু একটা আধুলি বার করলেন। 'তোমার ট্রামের পয়সা।'

চিঠি ও পয়সা পকেটে ফেলে বেরিয়ে আসব। বললেন, 'শোন।'

ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে সেই ঢিলের দিকে তাকিয়ে থাকার মতন বড়বাবু আমার পকেটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। খামটা উঁকি দিচ্ছিল।

'আর কিছু বলতে হবে স্যার?' আস্তে জিজ্ঞেস করলাম।

'না আর বলাবলি কি? বড়বাবু আমার চোখে চোখ রাখলেন। 'যদি উত্তর লিখে দেয় নিয়ে এসো। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি এখানে থাকব।'

ঘাড় নেড়ে পুস্-ডোর ঠেলে বেরিয়ে এলাম।

পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে আমি তিরাশী নম্বর ঘরের দরজায় পৌঁছে যাই।

হাঁক দিতে মেয়ে নয়, চক্রবর্তী নিজে বেরিয়ে এল।

লম্বা খামটা আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিতে নিতে বলল, 'একটু আগে এলে হ'ত কি।'

বস্তুত আমি কে ও কি, সেদিকে তাকাবার ফুরসৎ ছিল না ত্রিপুরার। আদ্যোপান্ত চিঠিটা পড়ল। এপিঠ ওপিঠ দুবার। তারপর ফালি ফালি করে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে কাগজটা সামনের নর্দমায় ফেলে দিল।

দাঁতের ওপারে কাশির শব্দ শোনা গেল। পরে বুঝলাম ওটা হাসি। নিচের ঠোঁটটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে।

বললাম, 'উত্তর চেয়েছেন বড়বাবু।'

'ওই মুখেই বলে দেবেন ওকে। এর আবার উত্তর কি।' চক্রবর্তীর লম্বা শরীর আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। 'বুঝেছেন মশাই, অত লেখালেখির পর ঠিক হ'ল কিনা মেয়েকে চাকরি দেওয়া হবে ম্যাকফার্সন কোম্পানীতে, হুঁ কয়লাঘাটা স্ট্রীট। জিজ্ঞেস করি, বড়বাবু কি আমায় তেলেভাজার লোভ দেখাচ্ছে? না বাজারে রাজভোগ রসগোল্লার অভাব আছে কিছু? আপনিই বলুন না মশাই।'

দরজা নড়ে উঠল খটখটিয়ে। বেরিয়ে এল মেয়ে।

'আমি তখনই তোমায় বলছিলাম, বাবা। যেমন তোমার অফিস তেমনি তোমার বড়বাবু। ও আর কত বড় হবে। যাক, এ নিয়ে আর তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আমার ব্যাপার আমি দেখব।' ব'লে আমার ও চক্রবর্তীর সামনে দিয়ে ও রাস্তায় নেমে গেল।

পড়ন্ত মাঘের ঝিকিমিকি বেলা, দেখলাম; সেদিন জুতো ব্যাগ শাড়ি ব্লাউজ দিব্যি মাজাঘসা মেয়ে চক্রবর্তীর।

ধুলো ধোঁয়া ও নর্দমার গন্ধ কতক্ষণের জন্যে চাপা পড়ে রইল মিষ্টি সাবানের গন্ধে।

'অ মশাই, চুপ করে আছেন কি।' মেয়ে চোখের আড়াল হতে ত্রিপুরা আমার হাতে অল্প ধাক্কা দিল। 'ছাড়ুন না চার ছ'আনার পয়সা। এমন ফুরফুরে বিকেলে মুড়মুড়ে ফুলুরি চায়ের সঙ্গে জমবে ভাল।'

আরও একদিন

দেবদাস পাঠক

প্রাচীরের বেড়া ডিঙিয়ে এখানে তবু দেখি রোদ আসে,
নোনা-ধরা ভিজে দেয়ালের গায়ে অচেনা সবুজ পাতা
কি যে আশ্বাসে মাথা নেড়ে নেড়ে সূর্যের দিকে চায়;
দুডানায় ভিজে রোদ মেখে নিয়ে কাকলিমুখর ভোরে
জানালার পরে উড়ে এসে বসে একটি চড়ুই পাখি;
এখানে ওখানে টুকরো কথায় আর একটি দিন সুরু।

যাবে কেটে যাবে আশা নিরাশায় ব্যথা আর বেদনায়
আরও একদিন দৈনন্দিন জীবনের জমা থেকে।
বিকেলের ছায়া গাঢ় হবে জলে—জানালায় ম্লান আলো
কাঁপবে; ঘরের দেয়ালে ফেলবে আঁকাবাঁকা ভীরু ছায়া:
ভোরের চড়ুই মেলবে না ডানা; গালিচায় পুরু ধুলো।
আবার রাত্রি এলো; এলোমেলো ভাবনারা দিশেহারা।

বিপ্রমুখের কথা

বংশ-গৌরব আর ভূয়ো মর্যাদার মতন আরো কয়েকটি ধারণা এবং লোকাচারের বশবর্তী হয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। এগুলো হল ঘুণ-ধরা বাঁশ—যার সাহায্যে মধ্যবিত্ত জীবনের নড়বড়ে কাঠামোটাকে প্রাণপণে খাড়া রাখবার চেষ্টায় আমাদের অর্ধেকের ওপর সময় ও শক্তির অপচয় হয়ে থাকে। মাঝারি গৃহস্থ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিশাপ হল এই লৌকিকতার দাসত্ব।

যে সময়ে লৌকিকতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থাটা অন্য রকমের ছিল নিশ্চয়ই। শায়েস্তা খাঁর আমলে যেটা বাজার দর ছিল, সেটা এখনকার তুলনায় সত্যযুগের স্মৃতি। তবু এমন একদিন গেছে যখন এক-শোটাকায় শতাধিক অতিথিকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা যেত। সংসার ও সমাজের অর্থ-নৈতিক বন্ধন সে যুগে এতটা কঠিন নাগপাশের মতন কণ্ঠনালীর ওপর চেপে বসে নি। সেটা এমন বেশি দিনের কথা নয়। আজ থেকে বারো-চৌদ্দ বছর আগেও এটা সম্ভব হত। শুধু খাদ্যবস্তু নয়। সোনা-রুপোর দরও এমন চড়া ছিল না। পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে গিনি সোনার ভরি ছিল, একথা ভেবে প্রৌঢ়া গৃহিনীরা আক্ষেপ করেন। কি বোকামিটাই তাঁরা করে-ছিলেন আরও কিছু স্বর্ণ সঞ্চয় না করে। আধুনিকারা ভাবেন, আরও কিছুদিন আগে জন্ম নিলে মন্দ হত না। অন্ততঃ বাপের-বাড়ী থেকে পঞ্চাশ ভরির বদলে পনেরো ভরি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী আসতে হত না। কিন্তু সে কথা থাক্‌ অকারণে লোভ বৃদ্ধি করতে চাই না। আমার বক্তব্য হচ্ছে লৌকিকতার অত্যাচার। যে সময়ে ব্রাহ্মণভোজনের পর দক্ষিণাস্বরূপ একটি ছোট্ট রুপোর সিকিতে ব্রাহ্মণ গদগদ হতেন, উপনয়নে নবীন ব্রহ্মচারীর ভিক্ষার ঝুলিতে দুটি রৌপ্যমুদ্রা পড়লে সে সন্ধ্যা-আহ্নিকের কথা ভুলে যেত, নববধূর মুখদেখানি দশটি টাকা দিলে ধন্য ধন্য রব পড়ে যেত, অথবা কোনো মেয়েকে পাঁচ টাকায় একখানা উৎকৃষ্ট বেলেডাঙ্গা শাড়ী দিলে সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেখানি পোষাকী কাপড় হিসেবে ব্যবহার করত, সে সময়ে লৌকিকতার অত্যাচার অতটা গায়ে লাগত না। অবশ্য এ কথা ঠিক, সস্তা গণ্ডার দিনে মানুষের রোজগারও ছিল কম। তবু দরিদ্র মধ্যবিত্তও ওরি মধ্যে মানিয়ে এবং বাঁচিয়ে সংসার করতেন এবং কালে-ভদ্রে লৌকিকতা করতেন। কিন্তু আজকাল এই মুদ্রাস্ফীতির দিনে, মানুষের অর্থাগম সেই অনুপাতে ঠিক বাড়েনি। অন্ততঃ যতটা বাড়লে ভদ্রতা-রক্ষা হয়। শিক্ষকের বেতন, ডাক্তারের দর্শনী উকিলের ফি মোটামুটি একই রকম আছে। তাই সাধারণ গৃহস্থ জীবনে এই লৌকিকতার দাবী ভয়াবহ অত্যাচারে দাঁড়িয়াছে।

লৌকিকতার উদ্ভব হয়েছিল ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে। তার অর্থও ছিল নিরীহ। অকারণ অর্থব্যয়ে এবং প্রায় বাধ্যতাসূচক লেন-দেনে সেটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেনি এবং সামাজিক মর্যাদার অঙ্কুশ বিশেষ হয়ে ওঠে নি। তত্ত্ব নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল প্রবাসিনী কন্যার খোঁজ নেওয়া। জামাতা বাবাজীর ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশে ভেট পাঠানো নয়। সন্দেশের অর্থ ছিল নিতান্তই আক্ষরিক, সংবাদ আদান-প্রদান। এবং সেই সূত্রে শুধু হাতে যাওয়ার প্রথাটা উঠে গিয়ে মিষ্ট উপমাটি তিক্ত দায়িত্বে পরিণত হল। এইভাবেই নিরীহ আচার অনুষ্ঠানগুলো অবশ্য কর্তব্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন লৌকিকতার প্রচ্ছন্ন মাধ্যর্যটুকু লুপ্ত হয়ে যায়। এক পক্ষ থেকে জন্মায় প্রত্যাশা, যেটা নিরঙ্কুশ দাবীর সামিল। অপরপক্ষে জন্মায় অসামর্থ এবং অক্ষমতার মিনতি অথবা প্রতি-বাদ। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেখানে দুর্বল, সেখানে সামাজিকতার অনুশাসন প্রবল। তাই ধার করে তত্ত্ব করতে হয় নব-বিবাহিতা কন্যার শ্বশুর-বাড়ীতে। এবং কম-সে-কম তিন-চারটি তত্ত্ব প্রথম দু-এক বছরের মধ্যে না পাঠালে কন্যাকেই সুনিপুণ শ্লেষ-গঞ্জনায় উৎপীড়িত হতে হয়।

মধ্যবিত্ত জীবনে এই লৌকিকতা রক্ষা যে কত বড় বালাই, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। মাসের শেষ দিকে যদি নিমন্ত্রণ এসে পড়ে, তাহলে শূন্য তহবিলের দিকে তাকিয়ে শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাসই পড়ে। শুভ-কর্মের মরসুম এক এক সময়ে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দেখা দেয়, অর্থাৎ দু-এক মাসের মধ্যেই তিন-চারটি জায়গা থেকে আহ্বান আসে। যদি একান্নবর্তী পরিবার অথবা বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকেন, তাহলে তো কথাই নেই। দায়িত্ব এবং দেনার ঠেলা সামলাতেই পুরো একটা বছর কেটে যায়। আপনার নিজের সংসার হয়তো খুবই ছোট এবং চাহিদাও খাটো। কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে একত্র বাস করার এবং সমাজে অতি সাধারণ প্রতিষ্ঠা-টুকু রক্ষা করার অতিরিক্ত শুল্ক আপনাকে দিতেই হবে। দাদার সম্বন্ধী আপনার একমাত্র পুত্রের উপনয়নে যখন আংটি দিয়েছিলেন তাঁর কালোবাজারী আয়ের একটা নগণ্য নমুনা দেখিয়ে, তখন তাঁর পাঁচটি দুহিতার বিবাহ, আশীর্বাদ অথবা জন্মতিথি উপলক্ষে আপনার সামান্য আয় থেকেই তার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে হবে। তার-পর আপনার নিজের আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব বান্ধব আছেন যাঁরা শুধু মিষ্টান্নে অথবা মিষ্ট কথায় তৃপ্ত না হতে পারেন। হয়তো আছে শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে কুটুম্বিতার নানা শাখা-প্রশাখা। শুনেছি শ্যালিকা নাকি রস-মাধুরী, দাম্পত্য জীবনের টনিক-বিশেষ। কিন্তু টনিকের সিরাপ ও মাদক উত্তেজনা অচিরেই লুপ্ত হয় যদি শ্যালিকার সংখ্যা হয় একাধিক। আপনার গৃহিণী হয়তো দুটি সন্তানদানেই ক্লান্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যদি হন সুখ-প্রসবিনী?

আপনার যখন পড়তি বয়স, ঘাটতি দেনা এবং বাড়তি সংসার, তখন লৌকিকতা কি বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায় না? যখন দেখি সকালে কোথাও শানাই বাজছে তখন আমার মন খারাপ হয়। শানাইয়ের করুণ সুরে দুহিতার আসন্ন বিয়োগব্যথাই শুধু মূর্ত হয় না। হয় অন্য কিছু। প্রথমে মনে হয়, কন্যার পিতা আগামী এক বছরে তত্ত্বের খরচ হিসাব করে রেখেছেন তো, না কি কন্যাকে সমর্পণ করার সময়ে ভাব-প্রবণ হয়ে বেহিসাবী খরচ করছেন? দ্বিতীয় কথা হল—এই দুর্দিনে যেচে কেউ বিয়ে করে? একা নিজের কাছা সামলানোই দায়। তার ওপর গাঁট-ছড়া! তৃতীয় কথা হল—নিমন্ত্রিত অভ্যা-গত, আত্মীয়-কুটুম্বের দল। কেউ বা হয়তো বিবাহ-প্রাঙ্গণে উপহারের মোড়কটি চাদরের আড়ালে রেখে শেষ ট্রামের সময় উত্তীর্ণ হবার উদ্বেগে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। কোনও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মীয় হয়তো মাস-কাবারী সংসার জ্বালায় জর্জর হয়ে অবশেষে মরিয়া হয়ে ধার করেছেন। কারুর বা মুখ হয়তো গম্ভীর ও বেজার। লৌকিকতার চাপ, উপহারের নমুনায় গৃহিণীর উত্তাপ ইত্যাদি নানা আভ্যন্তরিক কারণে হয়তো মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন।

তখন মনে হয়—এ বিড়ম্বনা আর কত-দিন? র‍্যাশনিং-এর কড়া নিয়মে দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর পালা তো চুকেই এসেছে। নিমন্ত্রণ পত্রের শেষে মাত্র জলযোগের উল্লেখও থাকে। এটা যখন ছাঁটাই করে কমিয়ে আনা হয়েছে, তখন লৌকিকতার অত্যাচারটুকু উঠিয়ে দিলেই হয়! আপনারা হয়তো বলবেন, কেন—'লৌকি-কতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়'—কোনও কোনও চিঠিতে লেখা থাকে তো আজকাল। নিশ্চয়ই। সেটা আমরাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মনের কোণে লেখা আছে—'যদি আসো, ভালো প্রেজেন্টটাই এনো।' বিবাহ-সভায় যদি কোনো কবি অথবা লেখক বন্ধু কিছু ফুল অথবা স্ব-রচিত দু-একখানা বই নিয়ে যান, তা নিয়ে সমাদরের অভিনয় চলে। পাঁচজনের কাছে বলা যায়, অমুক লেখক এসেছিলেন। কিন্তু উপহারের টেবিলে সে বই আর ফুল সরিয়ে অন্যান্য মূল্যবান এবং দীপ্তিময় উপহারের মোড়ক খুলে রাখা হয়, সেটাও তো নজরে পড়ে। তাই মনে হয়, সবাই যদি উদ্যোগী হয়ে খাদ্যবস্তু নিয়ন্ত্রণ-নীতির অনুসরণে উপহার নিয়ন্ত্রণ-সূচক আইন পাশ করাতে পারেন, তবেই এই আচার-সর্বস্ব দেশে গৃহস্থের ক্ষীণ প্রাণ আরও কিছুদিন বাঁচে।

পৃথিবী

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

লজ্জার সবুজ রঙ প্রাগৈতিহাসিক কোন দিনে
নেহাৎ-বয়স-কম নর্তকী কন্যার মনে মনে
প্রথম আকীর্ণ।
কৈশোর উত্তীর্ণ হতে লজ্জার সবুজ আস্তরণ
জড়াল প্রবালবর্ণ কলিটির গন্ধময় কোষ,
জড়াল কুমারী প্রাণে লজ্জা আর প্রেমের সন্তোষ।
আশ্চর্য শরম,
পীতবর্ণে দেখি তাই কামনার আসক্তি চরম।
রক্তবর্ণ প্রেম আর সবুজ লজ্জায়
নারীর মজ্জায় পীত রঙ।

পৃথিবী নর্তকীকন্যা, পীত রঙ রসায়ন তার,
কুমারী মেয়ের স্বপ্নে তাই দেখি পীতের বাহার,
প্রথম অঙ্কুর-শিশু মাটিতে বা মানুষের ঘরে
সেই রসায়নে রঙ ধরে।
লজ্জার সবুজ রঙ দিনে দিনে ফের ফুটে উঠে
তারপর নাভিনালে প্রেমের প্রবাল পদ্ম ফুটে;
আরবার পীতের প্রকাশ।

শোন শোন, কাল রাত্রে আমার প্রিয়ার ছিল সাধ,
আমাকে বাজাবে বলে আমি হই কোলের বেহালা।
কাল নয় বেয়নেট, কাল আমি ছিলাম সুরেলা,
একটি রাত্রির জন্যে সে করেছে ফুলের আবাদ।
ছায়াময় জলের মতন
দুরন্ত যুবতী প্রিয়া ছলো ছলো গভীর গহন।

আজ এই ভোরবেলা আমার প্রিয়ার মনে সাধ,
(চন্দ্র অস্ত গেল বলে বিশ্রী লাগে বেহালার সাজ।)
কবরী বিমুক্ত করে সর্ববিধ অলঙ্কার ছেড়ে
এই ভোরে একাকিনী ধেনো মাঠে শিশিরের কাছে,
চুপচাপ সর্ব অঙ্গে, কোষে কোষে চেতনার আলো,
ভোরের আলোয় আজ জাতকের কামনায় সুখ
সেই সুখ চায় প্রিয়া—প্রিয়া বুঝি মাতৃস্নেহে মূক।

তারপর রৌদ্রের ভেতর
ক্রমে খর রৌদ্রে দেখি চোখ তার হয়েছে প্রখর।
গতির ঘর্ঘরে দেখি প্রিয়া কাঁপে থরো থরো করে,
ঘর্মাক্ত মুঠিতে দেখি গতির রথের রজ্জু ধরে।
লজ্জা নেই, প্রেম নেই, দেখি তারে সক্রোধে কঠিন,
ধূলি-ধূসরিত চুল মধ্যাহ্নের বাতাসে উড্ডীন।
প্রিয়া চায় আহুতি আমার
জনতার গতিতে দুর্বার।

পৃথিবী

শ্রীবিমল মিত্র

পেরিয়ে অনেক রাত্রি,
অনেক রাত্রির সমুদ্র,
এখানে এলাম
এই স্বপ্নের পাহাড়ে।

আশা ছিল
ধোঁয়া আর ধুলো লাগবে না গায়ে।
আমি লিখবো মহাকাব্যঃ
মানুষের পরম জিজ্ঞাসা,
আর বিধাতার চরম উত্তর।

কিন্তু কে জানতো বলো
এটা একটা অগ্নিগিরি;
এখানেও হবে অগ্নুদগার!
শুনেছি নাকি এটা পাহাড় নয়
কয়লার স্তূপ!
এর ভেতরে খালি জমাট কয়লা!
এখানে বসবে কল
বসবে রেল-লাইন
বসবে বয়লার, ডায়নামো,
বাজবে ভোঁ নাকি!

তবে তাই হোক্
হে পৃথিবী
হে আধুনিক পৃথিবী!
আমাকে মৃত্যুঞ্জয় কোর না,
আমাকে অমর কোর না,
শুধু দিও
হাত তিনেক জমিঃ
কারণ
তোমার পাশেই আমি শোব!

সুবোধ ঘোষ

তাঁর নাম ভগবান আদিত্য, লোকে তাঁকে বলে লোকপ্রদীপ। সমাজকল্যাণই তাঁর জীবনের ব্রত।

সমাজকল্যাণ কোন নতুন কথা নয়, নতুন আদর্শ নয়। বহু আদর্শবাদী আছেন যাঁরা সমাজের কল্যাণ সাধনার কাজকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন।

এর জন্যে নয়, ভগবান আদিত্য সমাজ-কল্যাণের এমন একটি নীতি প্রচার করেন, যা তাঁর আগে কেউ করেনি। সমদর্শিতার নীতি। পাত্র ও অপাত্র বিচার নেই, সকলের প্রতি তাঁর সমান মমতা, সমান সম্মান। নিতান্ত পাপাচারীর প্রতি তাঁর যে আচরণ, সদাচারীর প্রতিও তাই।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই আদর্শে ভুল আছে।—আপনি যে আলোক দিয়ে নিশান্তের অন্ধকার দূর করে তৃষ্ণার্ত হরিণ-শিশুকে নির্ঝরের সন্ধান দেন, সেই আলোকেই আবার ক্ষুধার্ত সিংহ হরিণশিশুকে দেখতে পায়। যে আলোক দিয়ে হরিণশিশুকে পথ দেখালেন, সেই আলোক দিয়ে হরিণশিশুর মৃত্যুকেও পথ দেখালেন—এ আপনার কেমন সমদর্শিতা?

আদিত্য বলেন,—আবার সেই আলোকেই সন্ধানী ব্যাধ সিংহকে দেখতে পায়।

পণ্ডিতেরা তবু তর্ক করেন—কিন্তু এ সমদর্শিতায় কার কি লাভ হলো? হরিণ-শিশুর প্রাণ গেল সিংহের কাছে, সিংহের প্রাণ গেল ব্যাধের কাছে। আবার ব্যাধের প্রাণ হয়তো......।

আদিত্য—হ্যাঁ, সেই আলোকে ব্যাধের শত্রুও ব্যাধকে দেখতে পেয়ে হয়তো সংহার করবে। এই তো সংসারের একদিকের রূপ, এক পরম সমদর্শীর নীতি সকল জীবের পরিণাম শাসন করে চলেছে। আমি সেই পরম নীতিকেই সাহায্য করি।

পণ্ডিতেরা আদিত্যের এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হন না। তর্কের ক্ষণিক বিরামের মধ্যে হঠাৎ উপস্থিত হয় তপতী, ভগবান আদিত্যের কন্যা।

তপতী বলে—যে আলোকে নিশান্তের অন্ধকার দূর হয়, সেই আলোকেই মুদ্রিত কমলকলিকা স্ফুটিত হয়, সেই আলোকেই সন্ধান পেয়ে অলিদল কমলের মধু আহরণ ক'রে নিয়ে যায়, সেই মধুই ওষধিরূপে জীবনকে পুষ্টি দান করে। শুধু সংহার কেন, এই সৃষ্টির লীলাও যে এক পরম সমদর্শীর সমান করুণার আলোকে চলছে।

পণ্ডিতেরা অপ্রস্তুত হন। আদিত্য সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে তপতীর দিকে তাকান। শুধু আদিত্যের স্নেহে নয়, আদিত্যের শিক্ষায় লালিত হয়ে তপতীও আজ সিদ্ধসাধিকার মত তার অন্তরে এক উপলব্ধির সন্ধান পেয়েছে। বহু অধ্যয়নেও পণ্ডিতেরা যে সহজ সত্যের রূপটুকু ধরতে পারেন না, পিতা আদিত্যের প্রেরণায় শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে সে সত্যের রূপ উপলব্ধি করেছে তপতী। ঐ জ্যোতিরাধার সূর্য, ঊর্ধ্বলোক থেকে মর্ত্যের সর্ব সৃষ্টির ওপর আলোকের করুণা বর্ষণ করছেন, সকলের প্রতি সমভাব, যেন এক বিরাট কল্যাণের যজ্ঞ। কারও প্রতি বিশেষ কৃপণতা নেই, কারও প্রতি বিশেষ উদারতা নেই। সমভাবে বিতরিত এই কল্যাণই নিখিলের আনন্দ রূপে ফুটে উঠছে।

কল্যাণী হও! এ ছাড়া তপতীকে আর কোন আশীর্বাদ করেন না আদিত্য। রূপ, যৌবন, অনুরাগ, বিবাহ, পাতিব্রত্য ও মাতৃত্ব—সবই সমাজকল্যাণের জন্য, আত্মসুখের জন্য নয়। এই নিখিলরাজিত কল্যাণধর্মের সঙ্গে ছন্দ রেখে যে জীবন চলে, তারই জীবনে আনন্দ থাকে। যে চলে না, তার আনন্দ নেই।

পিতা আদিত্যের এই শিক্ষা ও আশীর্বাদ কতখানি সার্থক হয়েছে, কুমারী তপতী মুখের দিকে তাকালেও তার পরিচয় পাওয় যায়। মন্ত্রবারিসিক্ত পুষ্পস্তবকের মত স্নিগ্ সৌন্দর্যে রচিত একখানি মুখ। এ রূপে প্রভ আছে, জ্বালা নেই। এ দেহ হতে বিচ্ছুরি হয় লাবণ্য, প্রগল্ভতা নয়। এ চোখের দৃষ্ নক্ষত্রের মত করুণ মধুর, খর বিদ্যুতের ম নয়। সত্যিই এক কুমারিকা কল্যাণী যে অন্তরের শুচিতা দিয়ে তার যৌবনের অঙ্গ-শোভা ছন্দে বাঁধা কবিতার মত সংযত কর রেখেছে।

পণ্ডিতেরা যাই বলুন, আর যত বিরোধিতা করুন, আদিত্যের প্রচারিত সমাজ কল্যাণ ও সমদর্শিতার নীতিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে আর একজন—রাজা সম্বরণ সম্বরণের সেবিত প্রজাসাধারণ এমন এক সুখ ও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হয়েছে য পূর্বে কখনো হয়নি।

রাজ্য, বিত্ত, রূপ ও যৌবনের অধিকার হয়েও রাজা সম্বরণ এখনও অবিবাহিত আত্মসুখের সকল বিষয় কঠোরভাবে বর্জ করেছে সম্বরণ। সম্বরণ বিশ্বাস কর কল্যাণব্রতীর ধর্ম হলো ঐ জ্যোতিরাধার সূর্যে মত, যার পুণ্যরশ্মি ভূলোকের সর্ব প্রাণীক সমান পরিমাণ আলোক দান করে। উচ্চনী ভেদ নেই, পাত্রবিশেষ তারতম্য নেই। সম চরাচর যেন এই সূর্যের সমান স্নেহে লালি কল্যাণের রাজ্য। যখন অদৃশ্য হন, তখন সর্বজীবকে সমভাবেই অন্ধকারে রাখেন। এ সমদর্শিতার নীতি নিয়েই সম্বরণ তার রাজ্যে কল্যাণ সৃষ্টি করেন।

সম্বরণ বিবাহ করেনি, বিবাহে কোন ঈপ্স নেই। সম্বরণের ধারণা, বিবাহিত হলে তা সমদর্শিতার নীতি ক্ষুণ্ণ হবে, লোকহিতের ব্র

। পাবে। ভয় হয়, সংসারের সকলের মধ্যে
ছ বেছে বিশেষভাবে একটি নারীকে দয়িতা-
প আপন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সকলকে
মনে করতে হবে।

সদিন ছিল সম্বরণের জন্মতিথি। যে মহাপ্রাণ
ক্ষকের কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শের
গ্রহণ করেছে, তাঁরই কাছে শ্রদ্ধা জানাবার
এল সম্বরণ। অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ ও দীপের
হার নিয়ে সম্বরণ আদিত্যের কুটীরে
স্থিত হলো। উপবাসে শুদ্ধদেহ, স্নান-
শ্ধ, সুকঠোরব্রত তরুণ সম্বরণের মুখের
র নবোদিত সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল।
দিত্য মুগ্ধভাবে ও সস্নেহে দেখছিলেন
রণকে। তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি আশীর্বাদের
বেগে স্নিগ্ধ হয়ে উঠছিল।

তবু আজ আদিত্যের মনে যেন একটা
ন্নতার ছোঁয়া লেগেছিল। মনে হয়, সম্বরণ
কোথায় একটা ভুল ক'রে চলেছে। এই
স, এই তারুণ্যলালিত জীবনকে এত
াচারে ক্লিষ্ট ক'রে রাখার কোন প্রয়োজন
না। সমদর্শিতার জন্য, সমাজকল্যাণের
, এই কৃচ্ছ্রতার কোন প্রয়োজন নেই। এসব
বাসী যোগীর পক্ষেই শোভা পায়, প্রজাহিত-
রাজকুমারের পক্ষে শোভা পায় না।

আশীর্বাদের পর আদিত্য বলেন—একটা
রোধ ছিল সম্বরণ।

—বলুন।

—তোমার সমদর্শিতায় প্রজার জীবন
াণে ভরে উঠেছে। কিন্তু তুমি বিবাহিত
এই সাধনায় বাধা আসবে, এমন সন্দেহের
অর্থ নেই।

—অর্থ আছে ভগবান আদিত্য।

সম্বরণের কথায় একটু চমকে ওঠেন
দত্য। সম্বরণ এই প্রথম আদিত্যের
দেশের ভুল ধরলো।

সম্বরণ বলে—আত্মসুখের যে কোন বিষয়
নে প্রশ্রয় দিলে স্বার্থবোধ বড় হ'য়ে উঠবে।

আদিত্য বলেন—আত্মসুখের জন্য নয়
রণ, সমাজের মঙ্গলের জন্যই বিবাহ।
াগ্য তোমার ব্রত নয়। সমাজে থেকে
জের সকল হিতের সাধক তুমি। যাঁরা
র্শবান, তাঁরা সমাজকল্যাণের জন্যই বিবাহ
ন। একটি পুরুষ ও একটি নারীর মিলিত
বন সমাজকল্যাণের একটি প্রতিজ্ঞা মাত্র।
ছাড়া বিবাহের আর কোন তাৎপর্য নেই।
ার দিকে দেখ, আমি সমদর্শী, কিন্তু আমিও
াহিত। আমিও পুত্রকন্যা নিয়ে সংসার-
ন যাপন করি। এমন কি, কুমারী কন্যার
াহের কথা নিয়ে দুশ্চিন্তাও করি।

সম্বরণ কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে—
নার কুমারী কন্যা?

আদিত্য—হ্যাঁ, তপতী। তাকে উপযুক্ত
সম্প্রদান করতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত
।

সম্বরণ আরও কৌতূহলী হয়—আপনি কি
বলতে চান ভগবান আদিত্য?

আদিত্য—তুমি বিবাহিত হও।

সম্বরণ—কাকে বিবাহ করবো?

আদিত্য সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেন
না। সম্বরণের প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে
পড়েন।

সম্বরণ বলে—আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি
ভগবান আদিত্য। আপনার কাছ থেকেই আমি
সমদর্শিতার জ্ঞান লাভ করেছি। আপনি
আমার শিক্ষাগুরু। তাই অনুরোধ করি, এমন
কিছু বলবেন না, যার ফলে আপনার প্রতি
আমার বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়।

আদিত্য জিজ্ঞাসুভাবে তাকান—আমার প্রতি
তোমার শ্রদ্ধা ক্ষুণ্ণ হবে, এমন কথার আভাস
কি তুমি পেয়েছ?

সম্বরণ—হ্যাঁ, মনে হয়, আপনার কুমারী
কন্যার বিবাহের জন্য আপনার যে দুশ্চিন্তা,
ও আমাকে বিবাহিত হওয়ার জন্য যে অনুরোধ,
এ দু'য়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে।

ভগবান আদিত্য নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।
মিথ্যা বলেনি সম্বরণ। কন্যা তপতীর জন্য
যোগ্য পাত্র খুঁজছেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছে,
কুমার নৃপতি সম্বরণই তপতীর মত মেয়ের
স্বামী হওয়ার যোগ্য। অন্যভাবেও তিনি
ভেবেছেন, তাঁর পুত্রবৎ এই তরুণ সম্বরণ, তাঁরই
শিক্ষা ও দীক্ষায় সমদর্শী আদর্শে ব্রতী এই
সম্বরণের জীবনে তপতীর মত মেয়েই
সহধর্মিণী হওয়ার যোগ্য। আদিত্য তাঁর
অন্তর অন্বেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করেন,
সত্যিই কি তিনি শুধু তাঁর আত্মজা তপতীর
সৌভাগ্যের জন্যই সম্বরণকে পাত্ররূপে পেতে
প্রলুব্ধ হয়েছেন? নিজের মনকে প্রশ্ন করে
কোথাও সে রকম কোন স্বার্থতন্ত্রের কলুষ
আবিষ্কার করতে পারেন না ভগবান আদিত্য।
কিন্তু কি ভয়ংকর অভিযোগ করেছে সম্বরণ।

আদিত্য শান্তভাবে বলেন—যদি এ দুয়ের
মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে, তাতে অন্যায় কিছু
হয়েছে কি সম্বরণ?

সম্বরণ—যদি সে রকম কোন ইচ্ছা আপনার
থাকে, তবে আপনাকে সমদর্শী বলতে আমার
দ্বিধা হবে ভগবান আদিত্য। আপনার কন্যাকে
পাত্রস্থ করার জন্যই আপনার আগ্রহ, সমদর্শিতা
ও সমাজকল্যাণের আদর্শের জন্য নয়।

আদিত্য শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলেন—ভুল
করছো সম্বরণ। আমি সমদর্শী। তপতী
আমার কন্যা হয়েও যতটা আপন, তুমি আমার
পুত্র না হয়েও পুত্রের মতই ততটা আপন।
শুধু তপতীকে পাত্রস্থ করার জন্যই আমার
দুশ্চিন্তা নয়, সম্বরণের জন্যও যোগ্য পাত্রী
পাওয়ার সমস্যাও আমার দুশ্চিন্তা। একটি
কুমার ও একটি কুমারীর জীবন দাম্পত্য লাভ
ক'রে সমাজের কল্যাণে নূতন মন্ত্ররূপে, সংকল্প-
রূপে, ব্রতরূপে ও যজ্ঞরূপে সার্থক হয়ে উঠবে,

এই আমার আশা। এর মধ্যে স্বার্থ নেই,
অসমদর্শিতাও ছিল না সম্বরণ।

আদিত্য নীরব হন। কিন্তু সম্বরণের
আত্মত্যাগের গর্ব যেন আর একটু মুখর
হয়ে ওঠে।—ক্ষমা করবেন, আপনার সমদর্শিতার
এই ব্যাখ্যা আমি গ্রহণ করতে পারছি না।
আপনি ভুল করছেন ভগবান আদিত্য। আমি
শুদ্ধাচারী, সংযতেন্দ্রিয়, আমি আত্মবর্জিত
সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ করেছি। পত্নী গ্রহণ
করলে, আমার জীবন স্বার্থের বন্ধনে জড়িয়ে
পড়বে। একটি নারীর প্রতি প্রেমের পরীক্ষা
দিতে গিয়ে আমার জীবনে মানবসেবা,
সর্বকল্যাণ ও সমদর্শনের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়ে
যাবে।

আদিত্য আর কোন কথা বললেন না।
সম্বরণ ফিরে এল, শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে
নূতন শিক্ষা নিয়ে নয়, শিক্ষার আতিশয্যে
শিক্ষাগুরুকে হারিয়ে দিয়ে।

* * * * *

বন অঞ্চলে একাকী ভ্রমণে বের হয়েছিল
সম্বরণ। কোথায় কোন্ বনবাসী যোগী একান্তে
দিনযাপন করছেন, কোন্ নিষাদ ও কিরাতের
কুটীরে দুঃখ আছে, সবই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ
করবে সম্বরণ ও দুঃখ দূর করবে। সমদর্শী
সম্বরণের অনুগ্রহ কারও জন্য কম বা বেশী
করে রাখা নেই। যেমন রাজধানীর প্রজা,
তেমনি বনবাসী প্রজা, সর্ব প্রজার সুখ ও
শুভের প্রতি সে নিজের চক্ষে সর্বদা
লক্ষ্য রাখে, দূতবার্তার ওপর নির্ভর করে
থাকে না।

ভ্রমণ শেষ ক'রে বনপ্রান্তে এসে একবার
দাঁড়ালো সম্বরণ। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে,
কী সুন্দর ও শোভাময় হয়ে রয়েছে পৃথিবী।
মাথার ওপরে নীলিমার শান্ত সমুদ্রের মত
আকাশে হীরকপ্রভ সূর্যের গায়ে অপরাহ্ণের
রক্তিমা লেগেছে, নীচে বিস্তীর্ণ অটবীসংকুল
অরণ্যানীর নিবিড় শ্যামলতা। নিকটে
অল্পোচ্চ মেঘবর্ণ শৈলগিরি, পদপ্রান্তে
পুষ্পময় বনলতার কুঞ্জ। একটি দীর্ঘায়ত
পথরেখা বনের বুক ভেদ করে এসে, শৈল-
গিরির কোলে উঠে, তার পর মাঠের ওপর
নেমে গেছে। কিঞ্চিৎ দূরে এক জনপদের
কুটীরপংক্তি দেখা যায়।

চলে যাচ্ছিল সম্বরণ, কিন্তু যেতে
পারলো না। গিরি-পথ ধরে কেউ একজন
আসছে। যোগী নয়, নিষাদ নয়, কিরাত নয়,
কোন দস্যুর মূর্তিও নয়। ধীরে ধীরে এগিয়ে
আসছে, তার দেহের ভঙ্গী ও পদক্ষেপে
অদ্ভুত এক ছন্দ যেন লেগে আছে, মঞ্জীর নেই
তাই তার মধুর ধ্বনি শোনা যায় না।

সে মূর্তি কিছুদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ
থেমে গেল। সম্বরণ এতক্ষণে বুঝতে পারে,
এক তরুণী নারীর মূর্তি।

পথের ওপর সম্বরণ দাঁড়িয়ে থাকে, তরুণী মূর্তি আর অগ্রসর হয় না। সম্বরণ কি ভেবে তার দিকে এগিয়ে গেল এবং বিস্মিত হলো। এই শোভাময় পৃথিবীর রূপে কোথায় যেন একটু অভাব ছিল, এই বিচিত্র নিসর্গ চিত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা বর্ণচ্ছটার অভাব ছিল, এই তরুণী পৃথিবীর সেই অসমাপ্ত শোভাকে পূর্ণ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পর মুহূর্তে মনে হয়, ঠিক তা নয়। এই নিভৃতচারিণী রূপমতী যেন ধরণীর সকল রূপের সত্তা। পুষ্পে সুরভি দিয়ে, লতিকায় দোলা দিয়ে, কিসলয়ে কোমলতা দিয়ে, পল্লবে শ্যামলতা দিয়ে, স্রোতের জলে কলনাদ জাগিয়ে, এই রূপের সত্তা অলক্ষ্যে ভূলোকের সকল সৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ায়। সম্বরণের সৌভাগ্য, আজ তার চোখের সম্মুখে পথ ভুলে সে দেখা দিয়ে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ দেখা হয়ে গেল। এতক্ষণে পথ ছেড়ে পাশে সরে যাবার কথা, কিন্তু সম্বরণ এই সাধারণ শিষ্টতার কর্তব্যটুকুও যেন এই মুহূর্তে বিস্মৃত হয়েছে।

সম্বরণের এই বিস্ময়নিবিড় অপলক দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তরুণীর মূর্তি ধীরে ধীরে ব্রীড়ানত হয়ে আসে। এই অক্লান্ত পল্লব মর্মর, চঞ্চল সমীরের অশান্ত আবেগ, অবারিত মিলন ও আকাঙ্ক্ষার জগৎ এই বনময় নিভৃতে তরুণীর এই ব্রীড়ানত দৃষ্টির সংযম কেমন অবান্তর ও বিসদৃশ মনে হয়।

সম্বরণ বলে—শোভান্বিতা, তোমার পরিচয় জানি না, কিন্তু মনে হয় তোমার পরিচয় নেই।

তরুণীর কৃষ্ণ মদিরতায় প্রলিপ্ত আয়ত নয়নের দৃষ্টি যেন ক্ষণিকের মত বিহ্বল হয়ে ওঠে। এই সুন্দর পুরুষের মূর্তি যেন সব অন্বেষণের শেষে তারই জীবনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পল্লবের সঙ্গীত, বনানীর শিহরণ, এই গিরিক্রোড়ের নিভৃত, এই লগ্ন, সবই যেন এই দুই জীবনের মুখোমুখি দেখাটুকু সফল করার জন্য যুগের প্রথম মহূর্তে তৈরী হয়েছিল। মনে হয়, এই মর্ত্যভূমির সঙ্গে, এই বর্তমানের সঙ্গে, এই বরতনু পুরুষের কোন সম্পর্ক নেই। দেশ-কালের পরিচয়হারা এক চিরন্তন দয়িত, যার বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্য নিখিল নারীর প্রথমজা বেদনা যৌবনের স্বপ্ন রচনা করে। এই গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিতে আপনা থেকেই হাত উঠে আসে।

মাত্র ক্ষণিকের বিহ্বলতা, পরমুহূর্তেই তরুণীর মূর্তি যেন সতর্ক হয়ে ওঠে।

তরুণী প্রশ্ন করে—আপনার পরিচয়?

—আমি দেশপ্রধান সম্বরণ।

আকস্মিক ও রূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে তরুণী চমকে পিছনে সরে যায়। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দূরান্তের দিগ্বলয়ের দিকে নিষ্কম্প দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিলোল স্বর্ণাঞ্চল দুহাতে টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে ধরে, যেন এক অপমানের স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইছে অনাঘ্নী এই সুতনুকা নারী।

সম্বরণ বিচলিত হয়ে ওঠে—মনে হয়, তুমি যেন এক কল্পলোকের কামনা।

—না রাজা সম্বরণ, আমি এই ধূলি-মলিন মর্ত্যলোকেরই সেবা।

—তুমি মূর্তিমতী প্রভা, তোমার পরিচয় তুমিই।

—না, দিবাকর তার পরিচয়।

—তুমি স্ফুটকুসুমের মত সুরুচি।

—পুষ্পদ্রুম তার পরিচয়।

—তুমি তরঙ্গের মত ছন্দোময়।

—সমুদ্র তার পরিচয়।

—তুমি......।

আমার পরিচয় আছে রাজা সম্বরণ, আমি সাধারণী, সংসারের নারী, কুমারী।

—তুমি যে আমারই......।

তরুণীর অধরে মৃদু হাসি রেখায়িত হয়ে ওঠে।—আমি মানুষের ঘরের মেয়ে, পিতৃস্নেহে লালিতা। আমি সমাজে বাস করি রাজা সম্বরণ। স্বেচ্ছায় পুরুষ বরণ করতে পারি না, পারি সমাজের ইচ্ছায়।

—তার অর্থ?

—স্বামীরূপে ছাড়া সমাজকুমারী কোন পুরুষকে আহ্বান করতে পারে না।

সম্বরণের সকল আকুলতায় যেন হঠাৎ একটা বাস্তবের আঘাত লাগে। তৃষ্ণাতুরের মুখের কাছ থেকে যেন পানপাত্র দূরে সরে যাচ্ছে। সম্বরণ বলে—মনোলোভা,, স্বামী-রূপেই গ্রহণ কর আমাকে।

—আমি নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করতে পারি না রাজা সম্বরণ। আপনি আমার পিতার অনুমতি গ্রহণ করুন।

—কেন?

—আমি সমাজের মেয়ে। পিতা আমার অভিভাবক।

—কোথায় তোমার সমাজ?

—ঐ যে কুটীর পংক্তি দেখা যায়।

—এখানে এসেছ কেন?

—এসেছি, সকল কল্যাণের আধার সমদর্শী সূর্যকে দিনান্তের প্রণাম জানাতে, এ আমার প্রতিদিনের ব্রত।

সম্বরণ দুঃসহ বিস্ময়ে যেন চীৎকার করে ওঠে—কে তুমি?

তরুণী বলে—কল্পনা নই, কামনা নই, তপস্যা নই। আমি লোকপ্রদীপ আদিত্যের মেয়ে, তপতী।

চোখে যেন এক মুঠো তপ্ত বালুকার ঝাপ্‌টা লেগেছে, সম্বরণ চকিতে মাথা হেঁট করে। যখন মুখ তোলে, তখন সম্মুখে আর কেউ নেই।

সূর্য অস্তাচলে অদৃশ্য, বনের বুকে অন্ধকার, তপতী নেই, শুধু একা দাঁড়িয়ে থাকে সম্বরণ। সারা জগতের সত্যমিথ্যা রূপে যেন এক বিপর্যয় ঘটে গেছে। তা[র] আদর্শের অহঙ্কার, তার কৃচ্ছ্রতার দর্প কে[ন] এক মায়াবীর বিদ্রূপে ধুলো হয়ে গেছে।

কিন্তু সব স্বীকার করে নিয়েও, এ[ই] মুহূর্তে মর্মে মর্মে অনুভব করে সম্ব[রণ] আজিকার স্বপ্নেদেখা ছবিকে ভুলে যাবা[র] শক্তিও তার নেই। কোথায় তার সমদর্শি[তা] আর কৃচ্ছ্র কৌমার্যের সঙ্কল্প? কোথাও নেই। তপতী ছাড়া এ বিশ্বে আর কোন সত্য আ[ছে] বলে মনে হয় না।

সম্বরণের সত্তা যেন এই অন্ধকারে তা[র] সকল মিথ্যা গর্বের মূঢ়তা ও চক্ষুলজ্জা থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। কোথাও চলে যাবার অথবা ফিরে যাবার সাধ্য নেই। সংসারের ঘটনার কাছে আজ হাতে হা[তে] সে ধরা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু যে স্বপ্নকে কাছে পাওয়ার জন্য তার প্রতিটি নিঃশ্বা[স] আজ কামনাময় হয়ে উঠেছে, সেই স্বপ্নকে বহুদিন আগে নিজেই অপ্রাপ্য করে রে[খে] দিয়েছে নিজের অহঙ্কারে। আজ তাকে ফি[রে] চাইবার আর অধিকার কই?

সম্বরণ আর নিজ ভবনে ফিরলো না।

* * * * *

সম্বরণের এই আত্মনির্বাসনে সারা দে[শে] ও সমাজে বিস্ময়ের সীমা রইল না। কেন[,] কোন্ দুঃখে, কিসের শোকে সম্বরণ তার এ[ত] প্রিয় সেবার রাজ্য ও কল্যাণের সমাজ ছে[ড়ে] দিল? এ কি বৈরাগ্যের প্রেরণা?

সকলেই তাই মনে করেন। ভগবা[ন] আদিত্যও তাই মনে করেন। শুধু একমা[ত্র] যে এই ঘটনার সকল রহস্য জানে, সেই চু[প] ক'রে রইল।

চুপ ক'রেই থাক্‌তে হবে তপতীকে। বনপ্রান্তের অপরাহ্ন বেলার আলোকে যা[র] মুখের দিকে তাকিয়ে তপতী তার অন্তরে[র] নিভৃতে প্রথম প্রীতমের পদধ্বনি শুনে[ছে] পেয়েছে, তাকে ভুলতে পারা যাবে না, কি[ন্তু] সেকথা এ জীবনের ইহকালের কানে কা[নে] কখনো বলাও যাবে না। নিজ চোখে দে[খা] ও নিজ কানে শোনা সেই সুতরুণ কুমারে[র] অভ্যর্থনাকে চিরকাল প্রহেলিকার আহ্বা[ন] বলেই মনে করতে হবে। তপতী জা[নে] সম্বরণ তার হতদর্প জীবনের মুখঢাকা লজ্জা অতিক্রম করে আর সমাজে আস্‌বে না[।] কেউ জান্‌বে না, বনপ্রান্তের এক অপরা[হ্ন] বেলায় একটি পুরুষ ও নারীর সম্ম[ুখ] সাক্ষাৎ শুধু চির বিরহের বেদনা সৃষ্টি ক[রে] দিল।

শুধু চুপ করে থাকতে পারলেন [না] সম্বরণের কুলগুরু ও রাজপুরোহিত বশি[ষ্ঠ]। রাজাহীন রাজ্যে অশাসন দুঃখ অশান্তি উপদ্রব আরম্ভ হয়ে গেছে। চারদিকে অবহে[লা]

ও বিশৃঙ্খলা। বশিষ্ঠ একদিন সম্বরণের কাছে উপস্থিত হলেন।

আরও কঠোর কৃচ্ছ্রাচারে শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল সম্বরণ। বশিষ্ঠ বেদনার্ত ভাবে বলেন—হঠাৎ এ কি কাণ্ড করলে সম্বরণ?

—হঠাৎ ভুল ভেঙে গেল গুরু।

—কিসের ভুল?

বশিষ্ঠের প্রশ্নে সম্বরণ উত্তর দেয় না। বশিষ্ঠ আবার প্রশ্ন করেন—জানি না, কোন্ ভুলের কথা তুমি বলছো। কিন্তু ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হবে কেন?

—হ্যাঁ, এখানেই। এই বনপ্রান্তের গিরি-শিখর আমার মন্দির। কল্যাণাধার সূর্যের উদয়াস্তের পথের দিকে তাকিয়ে এইখানেই আমাকে জীবনের শান্তি ফিরে পেতে হবে।

বশিষ্ঠ হেসে ফেলেন—ভুল করো না সম্বরণ। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি, তোমার এ তপস্যা বোধ হয় অভিমানের তপস্যা। পূজারীর আনন্দ তোমার মনে নেই। তুমি এক দুঃখকে ঢাকবার জন্যে মিথ্যা বৈরাগ্য ও নিষ্ঠাহীন পূজার চেষ্টা করছো।

সম্বরণ চুপ করে থাকে, আত্মদীনতায় কুণ্ঠিত অপরাধীর নীরবতার মত। কিন্তু বশিষ্ঠ কঠিন প্রশ্নের মূর্তির মতই সম্বরণের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে থাকেন। সম্বরণ বলে—ভগবান আদিত্যকে আমি মিথ্যা গর্বের ভুলে অশ্রদ্ধা করেছি, এ প্রায়শ্চিত্ত তারই জন্য গুরু।

কৌতূহলী বশিষ্ঠের চোখের দৃষ্টি তেমনি শাণিত প্রশ্নের মত উদ্যত হয়েই থাকে, যেন আরও কিছু তাঁর জানবার আছে।

সম্বরণ বলে—ভগবান আদিত্যের কন্যা তপতীকে......।

বশিষ্ঠ সস্নেহে বলেন—বুঝেছি। একবার ভুল করেছিলে, তার জন্য আর একবার ভুল করো না সম্বরণ। তুমি সমদর্শী সমাজসেবক। সমাজহীন নিভৃত তোমার যোগ্য স্থান নয়। আমি এখন চলি, তোমাকেও পরে যেতে হবে, আমিই এসে নিয়ে যাব।

বশিষ্ঠ চলে গেলেন বনপ্রান্ত ছেড়ে আদিত্যের ভবনে। সকল প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়ে গেছেন। ঘটনার রহস্য এতদিনে জানতে পেরে আদিত্যও বিস্মিত হলেন। এবং তপতী এসে বশিষ্ঠ ও আদিত্যকে প্রণাম করতেই দুজনেই তপতীর সুস্মিত অথচ লজ্জানম্র মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হলেন। আশীর্বাদ করেন—শুচিমতী, তোমার অনুরাগ সার্থক হউক, তোমার জীবনে সূর্যারতির পুণ্য সফল হউক্।

* * * *

তপতী পতিগৃহে চলে গেছে। কল্যাণাধার সূর্যের পূজারী সম্বরণ ও পূজারিণী তপতীর মিলিত জীবন সংসারে নতুন কল্যাণের আলোক হয়ে উঠবে, এই আশায় প্রসন্ন হয়েছিলেন আদিত্য। কিন্তু দেখা দিল মেঘ। আবার আদিত্য বিষণ্ণ হলেন। বেদনাহত চিত্তে তিনি নির্মম সংবাদ শুনলেন, সম্বরণ প্রজা-সেবার সকল ভার অমাত্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে তপতীকে নিয়ে দূরে উপবন ভবনে চলে গেছে।

এমন বেদনা জীবনে পাননি আদিত্য। তাঁর আদর্শ যাদের জীবনে সব চেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে তিনি আশা করে-ছিলেন, তারাই দু'জন যেন সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সমাজের জন্য নয়, সংসারের জন্য নয়, যেন বিবাহের জন্যই এ বিবাহ হয়েছে। কোথা থেকে এই বন্য রীতির অভিশাপ দু'টি জীবনের সৌন্দর্য্য ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। গুরু বশিষ্ঠ এসে আদিত্যের সম্মুখে যেন অনুতপ্ত হয়ে বিষণ্ণ মুখে বসে থাকেন।

উপবন ভবনের নিভৃতে জগৎছাড়া এক স্বপ্নের নীড় রচনা করতে চায় সম্বরণ। এখানে তপতী ছাড়া আর কিছু সত্য নয়। এই যৌবনধন্যা রূপাধিকা নারীর কুন্তল-সুরভির চেয়ে বেশী সৌরভ যেন পৃথিবীর কোন পুষ্পকুঞ্জে নেই। এই আঁখি কনীনিকার কাছে আকাশের সব তারা নিষ্প্রভ। এই চুম্বনে যেন ঊষা জাগে, আলিঙ্গনে নিশা নামে। বরাঙ্গিনী তপতীর দেহ যেন এক অন্তহীন কামনার উপবন, যার অঙ্গরাগ পরিমলরেণু প্রতি মুহূর্তে লুণ্ঠন ক'রে জীবন তৃপ্ত করতে চায় সম্বরণ।

হাঁপিয়ে ওঠে তপতী। উপবনের মৃদুল বাতাসও জ্বালাময় মনে হয়। কোথায় রইল সমাজ আর সমাজের কল্যাণ? কোথায় সূর্যারতির পুণ্য? কোথায় আদিত্যের সমদর্শিতার দীক্ষা? পতি-পত্নীর জীবন নয়, শুধু এক নর ও এক নারীর কামনাকুল মিলন।

সংবাদ আসে—আদিত্য বিষণ্ণ হয়ে আছেন, বশিষ্ঠ দুঃখিত হয়ে আছেন, রাজভবনে নিরানন্দ, প্রজাসমাজে বিদ্রোহ, অশান্তি ও অনাচার। শত্রু ইন্দ্র সুযোগ বুঝে রাজ্যের শস্য ধ্বংস করেছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতের আর্তরবে দেশের প্রাণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সম্বরণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। ওসব যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর দুঃখের ঝড়, এই উপবন ভবনের নিভৃত ও সুখপ্রমত্ত জীবনে তার কোন স্পর্শ লাগে না। সম্বরণের দিকে তাকিয়ে তপতীর দৃষ্টি ব্যথিত হয়ে ওঠে। সমদর্শী প্রজাসেবক সম্বরণের এমন পতিত পরিণাম সে কল্পনা করতে পারেনি।

তপতীর দুঃখ চরম হয়ে উঠলো সেদিন, গুরু বশিষ্ঠ যেদিন আবার উপবন ভবনের দ্বারে উপস্থিত হলেন, সম্বরণের সাক্ষাৎপ্রার্থীরূপে। গুরু বশিষ্ঠ এসেছেন, এ সংবাদ শুনেও সম্বরণ গুরুদর্শনের জন্য উৎসাহিত হলো না, বশিষ্ঠ উপবন-ভবনের বাহির দ্বারেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্বরণের মূঢ়তার রূপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে তপতী। নিজেকেও নিতান্ত অপরাধিনী বলে মনে হয়। সব ভেবে নিয়ে, নিজেকে আজ চরমের জন্য প্রস্তুত করে নিল তপতী।

উপরে মধ্যাহ্ন সূর্য, গুরু বাইরে দাঁড়িয়ে, আর উপবন ভবনের অভ্যন্তরে লতাবিতানে আচ্ছন্ন এক আলোকভীরু ছায়াকুঞ্জে গন্ধতৈলের প্রদীপ জ্বলে। তারই মধ্যে সাধের স্বপ্ন নিয়ে লীলাবিভোর সম্বরণ, তার দুই বাহু তপতীর গলা সর্পিল বন্ধনের মত জড়িয়ে ধরে রেখেছে। আসবলুব্ধ ভৃঙ্গের মত ব্যগ্রতা নিয়ে সম্বরণের মুখ তপতীর মুখের দিকে এগিয়ে আসতেই তপতী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দু' হাত দিয়ে একটু রূঢ়ভাবেই সম্বরণের সর্পিল আলিঙ্গনের বন্ধন ছিন্ন ক'রে সরে দাঁড়ায়।

সম্বরণ বিস্মিত হয়—এ কি তপতী?

—আমি তপতী নই।

—এর অর্থ?

—এর অর্থ, তপতী কোন পুরুষের উপবনের প্রমোদসঙ্গিনী হতে পারে না।

বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সম্বরণ, তপতীর কথাগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সত্যিই মনে হয়, তপতীর ছদ্মরূপে আর যেন কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে। দুই চোখে মূর্খের বিস্ময় নিয়ে সম্বরণ প্রশ্ন করে—তুমি কে?

—আমি একটা নারীর দেহ।

শঙ্কিতের মত চমকে ওঠে সম্বরণ। তপতীর কথাগুলি যেন শাণিত ছুরিকার মতই নির্মম, নিজেরই মায়াময় রূপের নির্মোক মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছে, ভিতরে তপতী নামে কোন সত্তা নেই। সম্বরণ অসহায়ের মত প্রশ্ন করে—তপতী কে?

—তপতী এই মন, যে মন পিতা আদিত্যের কাছে দীক্ষালাভ করেছে, কল্যাণাধার সূর্যের আরতি ক'রে জীবনের একমাত্র পুণ্য লাভ করেছে। যে মন সংসারের মধ্যে প্রিয়তমরূপে এক স্বামীর মন খুঁজছে। যে মন স্বামীর মনের সাথে মিলিত হয়ে সমাজ-সংসারে সবাকার প্রিয় হয়ে উঠতে চাইছে। সেই শিক্ষিতা সুরুচি কল্যাণী ও প্রিয়া তপতীর মন তুমি কোনদিন চাওনি, পাওনি।

—তবে এতদিন......।

—এতদিন যা পেয়েছ তার মধ্যে তপতীর এতটুকু আগ্রহ ছিল না।

—এতদিন তোমার কোন আনন্দ......।

—এতটুকুও না।

উপবন ভবনের স্বপ্ন যেন চূর্ণ হয়ে যায়। সম্বরণের মনে হয়, ধূলিময় এক জনহীন মরুস্থলীতে সে একা দাঁড়িয়ে আছে। তপতী এত নিকটে দাঁড়িয়ে, কিন্তু সুদূরের মরীচিকা বলেই মনে হয়। রূপ নয়, রূপের শব নিয়ে এতদিন শুধু বিলাস করেছে সম্বরণ।

—এ শাস্তি তুমি আমায় কেন দিলে তপতী? তুমি যে একান্ত আমারই, আমারই সাথে বিবাহিতা ও পরিণীতা তুমি।

—সত্য, কিন্তু শুধু বিবাহের জন্যই তোমার সংগে আমার বিবাহ হয়নি সম্বরণ।

—তবে কিসের জন্য?

—জগতের জন্য।

জগতের জন্য? তপতীর উত্তর যেন মন্ত্রধ্বনির মত উপবন ভবনের বাতাস স্পন্দিত করে।

জগতের জন্য? গন্ধতৈলের প্রদীপ নিভে যায়। উপবনের তরুবীথিকার শীর্ষ চুম্বন ক'রে, ঘনবল্লরীবিতানের বাধা ভেদ করে ছায়াকুঞ্জের অভ্যন্তরে সূর্যনিঃসৃত রশ্মিধারা এসে ছড়িয়ে পড়ে। এক অভিশপ্ত বিস্মৃতির দীর্ঘ অবরোধ ভেদ করে বহু দিন আগে শোনা এই ধ্বনি যেন নূতন করে শুনতে পায় সম্বরণ—জগতের জন্য। একটি কুমার ও একটি কুমারীর জীবন মিলিত হয় সমাজকল্যাণের নূতন মন্ত্ররূপে, সংকল্পরূপে, ব্রতরূপে, যজ্ঞরূপে! তারই নাম বিবাহ। নিজের জন্য নয়, নিভৃতের জন্য নয়, জগতের জন্য।

দুই চোখ জলে ভরে উঠেছিল সম্বরণের। অবহেলিত রাজ্য সমাজ ও সংসারের দুঃখ যেন ঐ সূর্যরশ্মির সংগে এসে তাকে স্পর্শ করেছে। এ দৃশ্য দেখতে করুণ হলেও তপতী যেন পাষাণী মূর্তির মত অবিচলভাবে দেখতে থাকে।

সম্বরণ শান্তভাবে বলে—বার বার তিনবার আমার ভুল হয়েছে তপতী, কিন্তু তুমিই চরম শাস্তি দিয়ে শেষ ভুল ভেঙে দিলে।

তপতী উত্তর দেয় না। চরম সমাধানের জন্য সেও আজ প্রস্তুত হয়েছে। সম্বরণ ধীর স্বরে বলে—তোমায় আমি পাইনি তপতী, কিন্তু পেতে হবে।

তপতী সচকিতভাবে তাকায়। সম্বরণের কথার কোন অর্থ বুঝতে পারে না। তপতীর হাত ধরার জন্য এক হাত এগিয়ে দিয়ে সম্বরণ বলে—চল।

তপতী—কোথায়?

সম্বরণ—ঘরে, সমাজে, জগতে।

তপতী বিস্মিত হয়। সম্বরণ যেন সে বিস্ময় চরমভাবেই চমকে দেবার জন্য বলে—চল, গুরু বশিষ্ঠ আমাদের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

তপতী দু'হাতে সম্বরণের গলা জড়িয়ে ধরে বুকের ওপর মাথা রাখে।

সারা জীবনের তৃষ্ণা যেন এতদিনে সত্যিই তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছে। সম্বরণের মুখে তারই সুস্মিত আভাস ফুটে ওঠে। সম্বরণ বলে—তুমি বড় শাস্তি দিয়ে ভালবাস তপতী।

তপতী সংগে সংগে উত্তর দেয়—তুমি যে ভালবেসে শাস্তি দাও।

বক্সা ক্যাম্প

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমাদের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আপনারা নিশ্চয় করিয়া লইয়াছেন। আমাদের সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কি ধারণা, দুইটি মন্তব্য হইতে বাকীটুকু অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

বছরে একবার করিয়া আমাদের আই-বি ইণ্টারভিউ হইত। আমাদের চরিত্রের কতটা উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে, এই ইণ্টারভিউ হইতেই তার বাৎসরিক রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হইত।

এই রকম এক ইণ্টারভিউ সারিয়া জনৈক ডেটিনিউ ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলেন। দশজনে তাঁকে ঘিরিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি বারতা রে দূত!"

দূত বার্তা পেশ করিলেন, "জিগ্যেস করলে কেমন আছেন?"

"আপনি কি বললেন?"

"বললাম, কেমন আছি খবরটা জানবার জন্য এত খরচ ও এত কষ্ট করে এখানে আসবার কোন দরকার ছিল না, মেডিক্যাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেই হোত।"

শ্রোতাদের একজন বলিলেন, "ভালো বলেছেন, দশের মধ্যে আপনাকে দশ দিলাম। তারপর?"

দূত বলিলেন, "তারপর জিগ্যেস করলে, অনুতাপ হয়েছে কিনা, বলুন? হয়ে থাকলে খালাসের চেষ্টা দেখতে পারি।"

শুনিয়া এক শ্রোতা বলিয়া উঠিলেন, "অনুতাপ! ব্যাটা বলে কি।"

রোগা, ফর্সা, কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগী জনৈক ডেটিনিউ একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি যে মন্তব্য করিলেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেই চমকিত, বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। মন্তব্যটি ডেটিনিউদের সম্বন্ধেই, তবে একটু অশ্লীল। পদি পিসীকে যে পদ্ধতিতে পদ্মিনী করা হয়, মন্তব্যটিকেও সেই পদ্ধতিতে যথাসাধ্য মার্জিত করিয়া লইতেছি।

একপাশ হইতে বেশ একটু স্পষ্ট গলাতেই উক্ত ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "অনুতাপ? ডেটিনিউ কি চীজ ব্যাটারা এখনো বোঝে নাই দেখছি। মাথায় কল্কি চাপিয়ে ড্যাস্ দিয়ে ধোঁয়া বের করলে তবে বুঝবে।" —এখানে ড্যাস মানে দেহের নবদ্বারের সর্বনিম্ন দ্বারটি।

মানুষের শরীরটাকে হুকা বানাইয়া তামাকু সেবন করিবার মত প্রতিভা যাঁহাদের থাকে, তাঁহারাই ডেটিনিউ, ইহাই হইল আমাদের আত্মপরিচয়।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি যাঁহার, তিনি আপনাদের পরিচিত, আমাদের অশ্বিনীদা (গাংগুলী)। তখন তিনি প্রেসিডেন্সী জেলে বড়হাজতে ছিলেন এবং আরও অনেকেই ছিলেন।

সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, আটটাও প্রায় বাজে, অথচ ভোরের টিফিনের টিনের প্রকাণ্ড ট্রে বা হাফ্-বাক্স মাথায় লইয়া তখনও কয়েদীরা আসিতেছে না। বাবুরা অস্থির হইয়া উঠিলেন। আটটা বাজিয়া গেল, তবু বড়হাজতের গেটে বাঞ্ছিত কড়া নাড়ার শব্দ শ্রুত হইল না। নয়টাও বাজিয়া শেষে দশটার কোঠায় ঘড়ির কাঁটা পেশছিয়া গেল, টিফিনের দেখা নাই। বাবুরা রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অশ্বিনীদা তাঁহার খাটিয়াতে বসিয়া পত্রিকা পড়িতেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "টিফিন আসে নি বুঝি?"

একটি ছেলে বিরসবদনে উত্তর দিল, "না।"

অশ্বিনীদা সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, "ভেবেছে, জব্দ করবে। আরে ব্যাটারা, আমরা যে কি চীজ, এখনও বুঝলিনে? উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে পরে মুষ্টিভিক্ষার চাল যোগাড়ে বার হই, আমরা সেই চীজ। আমাদের জব্দ করবি?"

দুইটি মন্তব্যে আমাদের যে আত্মপরিচয় স্বমুখে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা এক কথায় এই যে, আমরা অদ্ভুত। অদ্ভুতের অদৃষ্টে অদ্ভুতই আসিয়া জোটে। শাস্ত্রেই আছে, যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে, আমাদের মত গ্রাম্য লোকের ভাষায়—যেমন দেবা, তেমন দেবী।

বরাত জোরে আমাদেরই যোগ্য দুই ডাক্তার জুটিয়াছিল। বরাতের জোর আরও একটু বেশি ছিল বলিয়া দিন সাতেকের বেশি

আমাদের খবরদারী করিবার সুযোগ তাঁহারা পান নাই, স্বস্থানে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হিজলী ক্যাম্পে গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে আমরা যখন অনশন আরম্ভ করি, তখন ক্যাম্পের বড় ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন না, বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতা গিয়াছিলেন। এদিকেও বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল, শ' দুয়েক বন্দী অনশন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জলপাইগুড়িতে কমান্ডান্টের জরুরী তার গেল, প্রত্যুত্তরে দুইজন সাব-এসিস্ট্যান্ট সার্জন সশরীরে ক্যাম্পে আবির্ভূত হইলেন।

একজনের নাম হর্ষ, অপরের নাম হেরম্ব, আমরা বলিতাম হিড়িম্বা ডাক্তার। হর্ষের দেহের দৈর্ঘ্য নাই, প্রায় সবটুকুই প্রস্থ। একটা গোলাকার মাংসপিণ্ডের, অভাবে বস্তুর, নিম্নে দুইটা ঠ্যাং ও ঊর্ধ্বে দুইটা হাত ঝুলাইয়া দিলেই হর্ষের মূর্তি প্রায় পনর-আনা পাওয়া যায়। এর পর যদি উপরের দিকে ছোট্ট গোলাকার একটি মুণ্ড বসাইয়া দেন, তবে তো হর্ষের প্রতিমূর্তি পূর্ণাঙ্গই পাইয়া গেলেন। হর্ষ ডাক্তার চলেন আস্তে, বলেনও আস্তে, প্রায় মৌনীবাবা। অনেকের ধারণা যে, ভয়েই হর্ষ ডাক্তারের বাক্‌সংযম দেখা দিয়াছিল।

হিড়িম্বা ডাক্তার সব দিক দিয়া হর্ষের বিপরীত। তাঁহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই-ই ছিল। আকৃতিতেই শুধু নহে, প্রকৃতিতেও তিনি হিড়িম্বা ছিলেন। তিনি আসিবার আগে তাঁহার জুতার বিরাট আওয়াজ জানান দেয় যে, তিনি আসিতেছেন। চলেন যেমন, বলেনও তেমনি। হিড়িম্বা ডাক্তার ব্যারাকের এ-কোণায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিলে, ও-কোণায় তার ঢেউ লাগে; গলার তারটি জন্মাবধিই এমনি মোটা সুরে বাঁধা।

প্রথম দিনেই হিড়িম্বার ডাক্তারী বিদ্যার পরিচয় পাওয়া গেল। অশ্বিনী মাস্টার বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, একবার এদিকে আসবেন।"

"আসছি।"

উত্তরটা এমন সুরে প্রদত্ত হইল যে, শাসানী মনে হইতে পারিত। যেন, 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি' ভাবটি ঐ সংক্ষিপ্ত 'আসছি'- শব্দটির মধ্যে তিনি ভরিয়া দিলেন।

হিড়িম্বা ডাক্তার অশ্বিনী মাস্টারের খাটের পাশে চেয়ারটা টানিয়া লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে?"

"পেটে ভয়ানক ব্যথা।"

"ব্যথা? ব্যথা হল কেন?"

রোগী উত্তর দিলেন, "তা আমি কি করে বলব। আমি তো ডাক্তার নই।"

ডাক্তার উত্তর দিলেন, "আপনার পেটে ব্যথা, আর আপনি বলতে পারেন না কেন ব্যথা হল?"

অশ্বিনীবাবু এবার ভালো করিয়া হিড়িম্বা ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। পরে বলিলেন, "বাজে কথা রাখুন, যদি ওষুধ কিছু দিতে পারেন দিন, নইলে উঠুন।"

হিড়িম্বা ডাক্তার সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমি কি ওষুধ দেব। আপনি যদি কোন ওষুধ সাজেস্ট করতে পারেন, বলুন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"আপনি যান, আমার কোন ওষুধের দরকার নাই।"

এবার হিড়িম্বা ডাক্তার বুদ্ধিমানের মত উত্তর দিলেন, "না খেয়ে আছেন, তাই পেটে ব্যথা হয়েছে। খাওয়া আরম্ভ করলেই সেরে যাবে।"

হিড়িম্বা যে অদ্ভুত, এটুকু এই প্রথম পরিচয়েই জানা গেল, কিন্তু তাঁহার আসল প্রকৃতিটি যে কি, জানিবার জন্য আরও একটু অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

পরদিন উপেন দাস হর্ষকে ডাকিলেন, "শুনুন তো।"

শুনিবার জন্য হর্ষ ডাক্তার নিঃশব্দে আগাইয়া আসিলেন।

উপেনবাবু বলিলেন, "বসুন।"

হর্ষ ডাক্তার নীরবে নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন এবং বসিয়া চুপ করিয়াই রহিলেন।

উপেন দাস কহিলেন, "হেরম্ববাবুকে আপনি কদ্দিন চেনেন?"

এবার হর্ষ মুখ খুলিলেন, "অনেক দিন, চোদ্দ-পনর বছর।" কিন্তু কেন এই প্রশ্ন, সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই প্রকাশ করিলেন না।

উপেনবাবু ঘনিষ্ঠ সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, হেরম্ববাবুকে রোগের কথা বললে তা তিনি এড়িয়ে যান কেন?"

হর্ষ ডাক্তার যেন আদালতে শপথ গ্রহণ করিয়া সাক্ষ্যদান করিতেছেন, সেইভাবে জবাব দিলেন, "কি করবে। ডাক্তারী যে কিছুই জানে না।"

"তবে চাকুরী করছে কেমন করে?"

"ছাড়িয়ে দেয় না বলেই করতে পারছে।"

উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, লোকে উপরে রিপোর্ট করে না?"

হর্ষ উত্তর দিলেন, "লোকের সঙ্গে খুব খাতির করতে পারে।"

উপেনবাবুর যেটুকু জানিবার জানিয়া লইলেন। পরের দিন হিড়িম্বা ঘরে ঢুকিতেই উপেনবাবু আমন্ত্রণ জানাইলেন, "ডাক্তারবাবু আগে এদিকে আসুন।"

"একটা মানুষ আমি কত দিক সামলাই" বলিতে বলিতে হিড়িম্বা ডাক্তার উপেনবাবুর সীটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আরও কয়েকজন ডেটিনিউ উপস্থিত ছিলেন।

হিড়িম্বা উপবিষ্ট হইলেই উপেনবাবু বলিলেন, "বুকে, পিঠে, পেটে, সারা শরীরে বড্ড ব্যথা, কি করি বলুন তো?"

হিড়িম্বা অসন্তুষ্ট সুরে জবাব দিলেন, "আচ্ছা, আমাকে দেখলেই কি আপনাদের অসুখের কথা মনে পড়ে?"

"আপনি ডাক্তার, আপনাকে দেখলে রোগের কথা মনে পড়বে না তবে কিসের কথা মনে পড়বে?"

হিড়িম্বা প্রশ্নের উত্তরের ধার দিয়াও গেলেন না, প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "ডাক্তারেরা রোগ সারাতে পারে, আপনাদের ধারণা?"

সৌরভ ঘোষ জবাব দিলেন, "আমাদের তো তাই ধারণা।"

হিড়িম্বা প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, "এ আপনাদের মস্ত ভুল ধারণা। রোগ সারতে হলে আপনিই সারে, কোন ডাক্তারের সাধ্য নেই যে রোগ সারায়, আমার কাছে শুনে রাখুন।"

উপেনবাবু বলিলেন, "ওসব কথা থাক। আমাকে একটা ওষুধ দিন। অসহ্য ব্যথা।"

হিড়িম্বা বলিলেন, "আর একটু সহ্য করুন, বিকেলে আপনাদের ডাক্তার ফিরবেন। আমাকে আর ভোগাবেন না।"

সৌরভবাবু বলিলেন, "ডাক্তার আসবেন কিনা, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর এদিকে সহ্য করতে গিয়ে লোকটা মারা যাক, কি বলেন?"

হিড়িম্বা কাচুমাচু হইয়া কহিল, "আমাকে দেখলেই আপনাদের রোগ চাড়া দিয়ে উঠে। কেন আর আমাকে ভোগান। জানেনই তো ওষুধে কিছু হয় না। দয়া করে বিকেল পর্যন্ত সহ্য করুন।"

সৌরভ ঘোষ বলিলেন, "আপনি কি গরু ডাক্তার?"

হিড়িম্বা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইলেন, "তা বলতে পারেন।" কথাটা যেন দুধারী তলোয়ার, শ্রোতাদের এমনই সন্দেহ হইল।

হিড়িম্বা উপেন দাসকে বলিলেন, "খুব যদি ব্যথা হয়ে থাকে, তবে আমি হর্ষবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাঁর ধারণা, তিনি ডাক্তারীটা জানেন, অন্যেরাও তাই মনে করে। পাঠিয়ে দিচ্ছি, একটা ওষুধ চেয়ে নিন।"

উপেন দাস কহিলেন, "সত্যই আপনি মনে করেন, সারবার হলে রোগ আপনিই সারে, ডাক্তারে কিছু করতে পারে না?"

"সত্যি তাই মনে করি। এইভাবেই তো এতটা বছর চিকিৎসা করে এসেছি, আপনাদের কাছে মিথ্যে বলে কি লাভ হবে?"

উপেনবাবু কহিলেন, "বেশ, আপনার উপদেশই শিরোধার্য, সারতে হলে আপনিই সারবে। জীবনে আর ডাক্তার ডাকে কোন শালায়। নিন, সিগারেট খান।"

ইহার পর হিড়িম্বা ঘরে ঢুকিলেই প্রত্যেক সীট হইতে আহ্বান আসিত, 'ডাক্তারবাবু, এদিকে আসুন, এদিকে' এবং হিড়িম্বাও উত্তর দিতেন—"আমি একটা মানুষ, কতদিক সামলাই।" কথাটা ঠিক, সকলেই চাহিত হিড়িম্বাকে লইয়া আড্ডা জমায়, তাঁর এমনই চাহিদা হইয়াছিল। কেহই তাঁহাকে রোগের বা

ঔষধের কথা বলিত না। সাতদিন "থাকিয়া হিড়িম্বা ও হর্ষ বিদায় নিলেন।

যাইবার সময় হিড়িম্বা বলিয়া ফেলিলেন, "বাঁচলাম, কি বিপদেই পড়েছিলাম। অবশ্য আপনারাও আমাকে বুঝে নিয়েছিলেন। মনে রাখবেন।"

তাঁহার শেষ অনুরোধটা রক্ষা করিয়াছি, তাঁহাকে আমরা মনে রাখিয়াছি।

এই সুযোগে আমাদের খড় ডাক্তারের কথা একটু বলা উচিত বোধ হইতেছে।

মৈমনসিংহের সতীশবাবু হন্তদন্ত হইয়া একদিন আমাদের ব্যারাকে ঢুকিলেন, কহিলেন, "ডাক্তারবাবু গেলেন কোথায়?"

ট্যানাবাবু জবাব দিলেন, "পাঁচ নম্বর ব্যারাকের দিকে গেছেন দেখলাম। কেন, ব্যাপার কি?"

তিনি উত্তর দিলেন, "ব্যাপার সীরিয়াস। পরে বলব।" বলিয়া হন্তদন্ত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সতীশবাবুর পরিচয় দরকার। ক্যাম্পে তিনি সতীশ-ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। বেঁটে-খাটো চটপটে মানুষটি। কোন অবস্থাতেই অপ্রতিভ হন না, যেন জাপানী পুতুল, কাৎ করিয়া দিলেও উঠিয়া বসেন। সতীশঠাকুর নিরলস ব্যক্তি, একটা কিছু লইয়া সর্বদাই ব্যস্ত, চুপ করিয়া থাকিলেও মাথার ভিতর প্ল্যানের প্যাঁচ কষেন। ক্যাম্পের সর্বত্রই তিনি আছেন এবং হৈ হৈ লইয়াই আছেন। একটু নমুনা দিতেছি, চাখিয়া দেখিবার জন্য।

ব্যারাকের সম্মুখ দিয়া সতীশঠাকুরকে যাইতে দেখিয়া বিজয় দত্ত আহ্বান করিল, "আসুন, এক বাজী দাবা হোক।"

মল্লের আহ্বানে মল্লোচিত সাড়া সতীশ-ঠাকুর দিলেন, বলিলেন—"আসুন, আপনার সঙ্গে দাবা খেলব বাঁ হাত দিয়েই," বলিয়াই বসিয়া গেলেন।

জনৈক বয়স্ক ডেটিনিউকে সতীশঠাকুর ডাকিতেন খুড়োমশায়। খুড়োমশায়ের শীত-কালে বিশেষ একটা অভ্যাস ছিল। পাহাড়ের শীতে রাত্রে উঠিয়া প্রস্রাব করা কষ্টকর বোধ হওয়ায় খুড়োমশায় বিছানায় থাকিয়াই বৃহৎ একটি বোতলে উক্ত কার্য সম্পাদন করিতেন, পরে বোতলটা ছিপি আঁটিয়া হাত বাড়াইয়া খাটের নীচে রাখিয়া দিতেন, ভোরে জমাদার আসিয়া তাহা সরাইয়া নিত এবং বোতলটি ধৌত করিয়া পুনরায় স্থানমত রাখিয়া যাইত।

একদিন ভোরেই সতীশঠাকুর আমাদের ব্যারাকে আসিয়া দেখা দিলেন। সৌরভবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত ভোরে যে! ব্যাপার কি?"

সতীশঠাকুর উত্তর দিলেন, "গুরুতর ব্যাপার, খুড়োমশায়ের 'শিলপ অব টং।'"

'শিলপ অব টং' বুঝিতে না পারিয়া আমরা চাহিয়া রহিলাম। অর্থটা ব্যাখ্যা করিতেই সাঁটে সাঁটে হাসি ফাটিয়া পড়িল।

খুড়োমশায় গতরাত্রে মূত্রবেগে উঠিয়া বসেন, হাত বাড়াইয়া খাটের তলা হইতে বোতলটা তুলিয়া লন। কিন্তু ঘুমের চোখে বোতলের মুখটা ঠিক ঠাহর করিতে পারেন নাই, ফলে এক পশলা মূত্র শয্যাতেই পতিত হয়। ইহাই সতীশঠাকুরের ভাষায় খুড়োমশায়ের 'শিলপ অব টং।' (ক্রমশ)
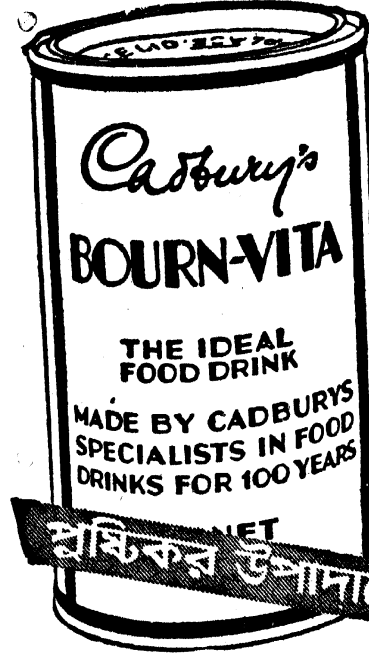
নরবলি

অমরেন্দ্র কুমার সেন

মানুষের প্রধানতম শত্রু কে? এই প্রশ্ন উঠলে সকলে নিশ্চয় একমত হয়ে জবাব দেবেন, মানুষের প্রধানতম শত্রু মানুষ স্বয়ং— বাঘ, ভাল্লুক অথবা সাপ নয়। মানুষ যে সব মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে তা বনের হিংস্র জন্তু ধ্বংস করবার জন্য নয়, মানুষকে ধ্বংস করবার জন্যই। রাইফেলের ভেতর থেকে যে বুলেট বেরিয়ে এসে এক নিমেষে মানুষের মৃত্যু ঘটায়, তাও নাকি যথেষ্ট নয়। মানুষে এমন এক বুলেট আবিষ্কার করল যা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে না। তার দেহের মধ্যে বোমার মতো ফেটে যাবে এবং তার পোষাকে আগুন ধরে যাবে, মৃত্যুটা যেন যতদূর সম্ভব যন্ত্রণা-দায়ক হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই প্রকার বুলেট ইংরেজরা ব্যবহার করেছিল। ইংরেজরা করাতের মতো দাঁতওয়ালা বেয়নেট ব্যবহার করেছিল বলেও শোনা যায়। গত মহাযুদ্ধে অজস্র বিমান থেকে অজস্র বোমা বর্ষণ এবং অ্যাটম বোমার ব্যবহার যে নিষ্ঠুরতার চরমতম নিদর্শন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি!

এখন সাধারণতঃ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়ার রীতি প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। কেউ কাউকে খুন করলে তার শাস্তি সাধারণতঃ মৃত্যুদণ্ড। এই মৃত্যুদণ্ড আবার নানাভাবে প্রয়োগ করা হয়। কোনো দেশে তা হয় গুলি করে, কোনো দেশে গলায় ফাঁস দিয়ে আবার কোনো দেশে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ অথবা বৈদ্যুতিক চেয়ার ব্যবহার করে।

মৃত্যুদণ্ড বহুদিন থেকেই চলে আসছে, কিন্তু এই মৃত্যুর যন্ত্রণা যতদূর সম্ভব কম সহ্য করতে হয় তার চেষ্টাও চলে আসছে বহুদিন থেকেই। বাস্তবিক মাটিতে কোমর পর্যন্ত পুঁতে দিয়ে তারপর ক্ষুধার্ত কুকুর দিয়ে দংশন করিয়ে অথবা শূলে চড়িয়ে মৃত্যু ঘটানো যে কি পরিমাণে নৃশংস ছিল তা ভাবতেও যেন শরীর শিহরিত হয়। আবার এই প্রথা নাকি আমাদের দেশেই প্রচলিত ছিল। না জানি প্রাচীন রোমে ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে আসামীকে নিক্ষেপ করা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই ছিল।

আজকাল নাকি মৃত্যুদণ্ডটা এমন দ্রুত যান্ত্রিক প্রথায় ঘটানো হয় যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যন্ত্রণা অনুভব করবার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে। এই রকম ব্যবস্থা যে আগে প্রচলিত ছিল না তা আগেই বলেছি। প্রাচীন রোমে আরও একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত নর অথবা নারীকে সামান্য একটি বস্ত্রখণ্ড পরিয়ে তাকে একটি বড় থলের মধ্যে ভরে দেওয়া হ'ত। সেই থলের মধ্যে থাকত একটি কুকুর, একটি লড়ায়ে মোরগ এবং একটি বিষধর সাপ।

স্পেনে মৃত্যুদণ্ড

তারপর থলের মুখ বন্ধ করে কোনো একটি জলা জায়গায় ফেলে দেওয়া হ'ত।

মধ্যযুগে ইংলণ্ডে আসামীকে তার কারা-কক্ষের মেঝেয় গাঁথা শৃঙ্খলের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হ'ত, তারপর তাকে উবুড় করে শুতে বাধ্য করা হ'ত এবং তার পিঠের ওপর এমন ভাবে একটি ভারী ওজন চাপিয়ে দেওয়া হত যা সে নামিয়ে দিতে পারত না। জেল-খানার লোকেরা তাকে খেতে দিত এক চাকা ছাতাপড়া পাউরুটি, খানিকটা ঘোলা জল আর যাবার সময় আর একটা ওজন। খাবারের এই পরিমাণ আবার দৈনিক কমত, কিন্তু পিঠের ওপর একটি করে ওজন বাড়ত। এই রকম করেই হতভাগ্যের একদিন মৃত্যু ঘটত। একেই বলে "দগ্ধে' দগ্ধে মারা।" এসব ছাড়া উত্তপ্ত সাঁড়াশী দিয়ে চোখ ও গায়ের মাংস তুলে নিয়ে; একে একে হাত, পা ও অবশেষে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গলা কেটে; জীবন্ত দগ্ধ করে, উঁচু পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে অথবা ফুটন্ত পাঁচে ফেলে দিয়েও মানুষকে মারা হ'ত। সে যুগে ক্রুশে বিদ্ধ করে যীশুখৃষ্টের হত্যা নিষ্ঠুরতার অন্যতম নিদর্শন।

আজকাল ফাঁসি কার্যটা নিখুঁত ভাবে সমাধা করবার জন্য কতই না মাথা ঘামানো হচ্ছে! সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিসটি হ'ল ফাঁসির দড়ি। সুনির্বাচিত শন থেকে এই দড়ি প্রস্তুত করা হয়। এইজন্য সাধারণতঃ ইটালিতে উৎপন্ন শন ব্যবহার করা হয়। মসৃণতার জন্য শনের দড়িতে ফাঁস দ্রুত ও ভাল ভাবে লেগে যায়। প্রতিবারে অবশ্য নতুন দড়ি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আসামীর গলার পরিধি, ওজন ও দৈর্ঘ্য, ফাঁস থেকে নীচের গর্তের দূরত্ব ইত্যাদির হিসাব নেওয়া হয়, যাতে ভাল করে ফাঁস লাগানো যায়, মৃত্যু হতে দেরী না হয়। ফাঁস ভাল করে না লাগলে মৃত্যু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফাঁসি দেওয়া ব্যাপারটা নাকি অত্যন্ত অমার্জিত ছিল। ফাঁসি মঞ্চের ওপরে যে ফাঁসিকাষ্ঠ থাকে তার ওপর দিয়ে যে কোনো একটা দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত, তারপর দড়ির এক প্রান্তে একটা যেমন তেমন ফাঁস প্রস্তুত করে আসামীর গলায় পরিয়ে দেওয়া

গিলোটিন

হ'ত। যে দিকে আসামী থাকত তার বিপরীত দিক থেকে একজন বলশালী ব্যক্তি ফাঁসির দড়ির অপর প্রান্ত ধরে জোরে এক হ্যাঁচকা টান মারত। আসামী হঠাৎ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বিলম্বিত থাকত, তারপর কোন এক সময়ে হতভাগ্যের প্রাণবায়ু বহির্গত হ'ত।

এই ব্যবস্থা নাকি পূর্বে প্রচলিত ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেকটা মার্জিত। তখন নাকি আসামীর গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়ে দড়ির অপর প্রান্ত একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'ত। তারপর কোনো এক সময়ে ঘোড়াটিকে হঠাৎ জোরে চাবুক মারা হ'ত। ঘোড়া মার খেয়ে চকিতে বেগে দৌড়তে আরম্ভ করত এবং লোকটির গলায় ফাঁস ত জোরে আটকে যেতই উপরন্তু তাকে মাটিতে খানিকটা টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত। ফাঁসি আটকে মৃত্যু না হলেও এইতেই মৃত্যু ঘটত।

স্পেন দেশে আজও একপ্রকার পদ্ধতি চলিত আছে যাকে বর্বর যুগীয় প্রথা বলা যেতে পারে। আসামীকে একটি চেয়ারে বসানো হয়, তারপর পশ্চাৎদিকে অবস্থিত একটি দন্ডে সাঁড়াশির মতো একটি যন্ত্রে তার গলাটি আটকে দেওয়া হয়। সেই সাঁড়াশিতে আবার একটি প্যাঁচ আছে, সেই প্যাঁচটি ঘোরাতে থাকলে গলায় সাঁড়াশি শক্ত হয়ে বসতে থাকে ও অবশেষে চোরের শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়। একেই বলে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মারা। কোনো কোনো সাঁড়াশির সঙ্গে ধারালো ছুরি থাকে যার জন্য ঘাড়টি আগেই কেটে যায়। এতে মৃত্যুযন্ত্রণা কিছু কম ভোগ করতে হয়।

প্রচলিত ধারণা এই যে গিলোটিন ফরাসী বিদ্রোহের সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে: কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। ফরাসী বিদ্রোহের প্রায় দুশো বৎসর আগে অনুরূপ একটি যন্ত্রের প্রচলন ছিল যার নাম ছিল "মেডেন।" তবে গিলোটিন নামক যন্ত্রটি যেটি ডক্টর জে, আই, গিলোটিনের নামানুসারে চলে আসছে, মানুষের মুন্ডচ্ছেদ করবার পক্ষে সেটি অত্যুৎকৃষ্ট। এত দ্রুত ও এত সহজে আর কোনো যন্ত্রে মানুষের মাথা কাটা যায় না। আগে জল্লাদরা তলোয়ার অথবা খাঁড়া কোপ মেরে মানুষের মাথা কাটত, অনেক সময়ে এক কোপে কার্য সমাধা হতো না। এর চেয়ে নৃশংস ব্যাপার আর কি হতে পারে? জাপানীরা আজও পর্যন্ত তলোয়ার দ্বারা দোষীর মুন্ডচ্ছেদ করে। আগে ইংলন্ডে খাঁড়া অথবা কুঠার ব্যবহৃত হত। কোনো সময়ে আসামীর মুন্ড কোনো একটি কাঠের ওপর রাখা হত আবার কোনো সময়ে হাড়কাঠের মত যন্ত্রে আটকে দেওয়া হ'ত। তবে প্রায়ই তাদের হাত পা বেঁধে নতজানু করে বসিয়ে, ঘাড় মাটির সঙ্গে নীচু করে দেওয়া হ'ত। তবে এত সহজে সকলে কি আর রাজি হ'ত? তখ আসামীদের ওপর বল প্রয়োগ করা হত।

গিলোটিন অনেকটা সরু গোলপোস্টের মতো একটা কাঠের ফ্রেম। যে দুটি দন্ড সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের ভেতরের দিকে খাঁজ কাটা থাকে। ওপরের কাঠে গিলোটিনের মাথা কাটবার আসল অস্ত্রটি আটকানো থাকে। এটি খুব ধারালো, এবং ওপরের দিকে ভারী ওজন লাগানো থাকে। ছেড়ে দিলেই খাঁজ দিয়ে অস্ত্রটি চকিতে নেমে আসে এবং অতি সহজেই মুন্ডটি দেহচ্যুত করে। অবশ্য ইতিমধ্যে কাঠের সেই ফ্রেমের নীচে শিকারকে উপুড় করে প্রস্তুত রাখা হয়।

বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুগ আরম্ভ হ'ল। তাই এই যুগে মৃত্যুদণ্ডটাও বৈজ্ঞানিক প্রথায় যাতে কম যন্ত্রণা-দায়ক হয়, সেই চেষ্টা হ'ল। চেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত হ'ল ইলেকট্রিক চেয়ার। আসামীকে
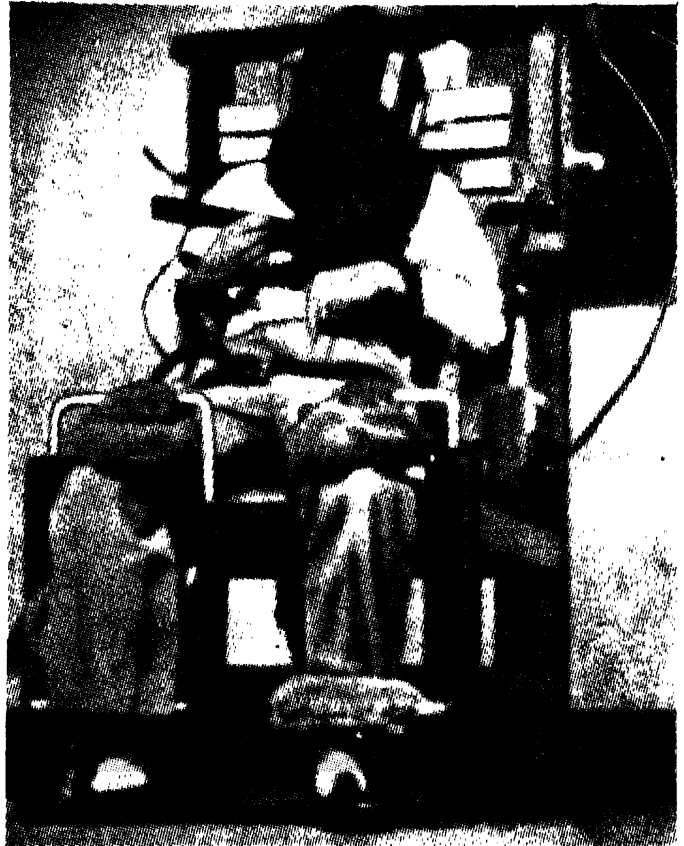
ইলেকট্রিক চেয়ার

জাপানে নরবলি

ইলেকট্রিক চেয়ারে এনে বসিয়ে দিয়ে আর সুইচ টিপে দিলেই হল না, যে সুইচ টিপবে, তাকে ভাল ইলেকট্রিক মিস্ত্রী হওয়া চাই। দণ্ডিত ব্যক্তিকে আগে থাকতে ভাল করে দেখে চেয়ারের যন্ত্রপাতি ঠিক করে বসাতে হয়, নইলে ইলেকট্রিক চেয়ার হয়ত নিখুঁতভাবে কাজ করবে না। চেয়ারটি মজবুত ওক কাঠের দ্বারা তৈরী করা হয়। দণ্ডিত ব্যক্তিকে বাঁধবার জন্য আটটি শক্ত বেষ্টনী থাকে, যা দিয়ে কোমর, বুক, দুই বাহু ও গোড়ালি বেশ শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সুইচ টিপে একেবারে দু' হাজার ভোল্ট বৈদ্যুতিক শক্তি চালিয়ে দেওয়া হয়, তারপর তা কমিয়ে হাজার ভোল্টে আনা হয়। হাজার ভোল্ট শক্তি প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড রাখা হয়, তারপর তা আবার বাড়িয়ে দু' হাজার ভোল্ট করা হয়। এই রকম কমানো বাড়ানো প্রায় চার পাঁচবার করে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেন, অবশ্য প্রথা অনুযায়ী, কারণ এরপর কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। বৈদ্যুতিক তরঙ্গটা চালানো হয় প্রধানত মাথা আর ডান পা দিয়ে। এজন্য মাথার চুল আর পা কামিয়ে দেওয়া হয়, আর যাতে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ভালভাবে যেতে পারে, সেজন্য এই দুই স্থানে লবণ জলে স্পঞ্জ ভিজিয়ে রাখা হয়।

ইলেকট্রিক চেয়ার কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রদেশে ব্যবহৃত হয়, আর কোথাও এটি এখনও সমাদৃত হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই কয়েকটি প্রদেশে আবার গ্যাস-চেম্বার ব্যবহৃত হয়। গ্যাস চেম্বারটি হল একটি ছোট কুঠুরি যার চারিদিক বেশ শক্ত করে বন্ধ করা থাকে। আসামীকে একটি চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে বসিয়ে দেওয়া হয়। চেয়ারের পাশে একটি জল-মিশ্রিত সালফিউরিক অ্যাসিডের পাত্র থাকে। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ঘরের বাইরে থেকে একটি দড়ি কেটে দিলেই প্রায় দশটি এক আউন্স ওজনের পটাসিয়াম সায়ানাইড গ্যাসের 'ডিম' অ্যাসিড পাত্রে পড়ে ও
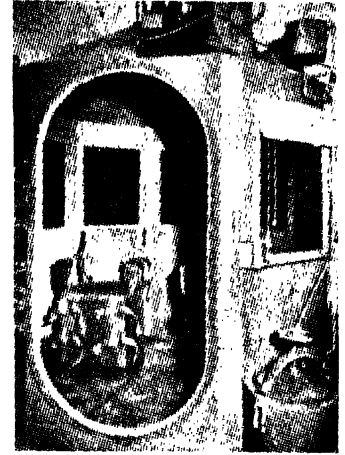
গ্যাস চেম্বার

সেই সঙ্গে তীব্র বিষাক্ত গ্যাসের কুণ্ডলী উঠতে থাকে এবং আসামীর নাকের মধ্যে প্রবেশ করলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে।

সভ্যজগতে মৃত্যুদণ্ড ঘটাবার এই কয়টি পদ্ধতি জানা আছে, এর পর আবার কি আবিষ্কৃত হয় কে জানে। তবে ইংলণ্ডে ফাঁসির ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। সত্যই ত "চক্ষুর" পরিবর্তে চক্ষু নিলে শত্রুকে জয় করা যায় না। মানুষকে সংশোধিত করতে হলে চাই অন্যপ্রকার-শাস্তির ব্যবস্থা, যা হবে সত্যই প্রেমমূলক।

বিশ্রাম ও আরোগ্য

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(১)

পরিশ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর পরিশ্রম, এই নীতির উপরই আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত শ্রমের সহিত বিশ্রামের স্থান বিনিময় করিয়া লইয়াই আমরা বাঁচিয়া থাকি।

পরিশ্রমের শেষে দেহ ভাঙিয়া আসে। প্রকৃতি তখন আপনি বিশ্রাম চায়। তখন পরিমিত বিশ্রামে দেহ ও মনের ক্ষমতা ফিরিয়া আসে। পরিশ্রমে দেহের ভাণ্ডার হইতে যে-শক্তির অপচয় হয়, বিশ্রাম সেই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দেয়। এই জন্যই পরিমিত বিশ্রামের শেষে দেহ তাহার কর্মক্ষমতা ফিরিয়া পায়।

পরিশ্রম একশ্রেণীর ধ্বংস-কার্য। প্রত্যেকটি পরিশ্রমের কার্যেই দেহ কতকটা ক্ষয় পাইয়া থাকে। পরিমিত বিশ্রাম দ্বারা সেই ক্ষয় পূরণ করা আবশ্যক। অন্যথা দেহের ক্ষয় হয়। এই জন্য একবার শ্রান্ত হইবার পর, বিশ্রাম না করিয়া যখন পুনরায় শ্রমে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন দেহের যে-ক্ষয় হয়, তাহা সহজে পূরণ হয় না।

শ্রান্ত হইবার পর যেমন বিশ্রাম করা কর্তব্য, তেমনি কয়েকদিন শ্রম করিবার পরেও একদিন বিশ্রাম করা আবশ্যক। এইজন্য ছয়দিন কাজ করিবার পর, একদিন বিশ্রাম নিবার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত আছে। সম্ভব হইলে, কিছু দীর্ঘদিন কাজ করিবার পরেও এইভাবে কিছু দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত।

বিশ্রামের এই সময়টা কখনও নষ্ট হয় না। যে-সময়টা বিশ্রামের জন্য দেওয়া হয়, ভবিষ্যতের জন্য শক্তির ভাণ্ডারে তাহা গচ্ছিত থাকে। এইজন্য যাহারা মস্তিষ্কের কাজ করে তাহারা কায়িক পরিশ্রমশীল লোকদের অপেক্ষা গড়ে চৌদ্দ হইতে বিশ বৎসর বেশী বাঁচিয়া থাকে।

(২)

কিন্তু জীবনে বিশ্রামের সুযোগ লাভ করা সহজ কথা নয়। এই পৃথিবীতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তবে ক্ষুধার অন্ন অর্জন করিতে হয়। কর্মময় জীবনে বিশ্রাম লাভ করাই একটা প্রধান সমস্যা। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কর্মব্যস্ততার ভিতরেও যে অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্রাম লাভ না করা যায় এমন নয়।

আমরা পরিশ্রমকে হয়ত এড়াইতে পারি না। কিন্তু চেষ্টা করিলে শ্রমকে লঘু করিয়া লইতে পারি এবং এমন ব্যবস্থা করিতে পারি

যাহাতে স্বল্প বিশ্রামেই দীর্ঘ বিশ্রামের ফল লাভ করা যাইতে পারে।

একজন লোক বলিয়াছেন, কাজে মানুষ মরে না, মরে উদ্বেগে। ব্যস্ততা ও উদ্বেগই কাজের পরিশ্রমকে বাড়াইয়া তোলে। পরিশ্রমে দেহের যতটা ক্ষয় না হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষয় হয় ব্যস্ততা ও উত্তেজনায়। এই জন্য কাজের ভিতর হইতে উত্তেজনাকে যদি বাদ দিয়া দেওয়া যায়, তবে শ্রমটা যেন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়। শ্রমকে লঘু করিয়া লইবার ইহাই কৌশল।

এইভাবে অভ্যাস করিলে স্বল্প বিশ্রামকেও গভীর করা যাইতে পারে। আমরা যখন বিশ্রাম করি তখন দেহ বিশ্রামরত থাকিলেও মন নিষ্ক্রীয় থাকে না। হয়ত গভীর বিদ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা ও অদম্য কর্মপিপাসা মনকে আলোড়িত করিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-স্রোতও ধমনীর ভিতর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলে। এইরূপ অবস্থায় দেহ আর কেমন করিয়া বিশ্রাম পায়?

একটি নিদ্রিত শিশুর দিকে তাকাইলেই আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের বিশ্রামের ত্রুটি কোথায়। শিশুটি নিশ্চিন্তমনে গা এলাইয়া দিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকে। আমরা ঐরূপ পড়িয়া থাকিতে পারি না কেন? যদি ঐভাবে বিছানার সঙ্গে নিজকে মিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে পড়িয়া থাকা যায়, তবেই দেহ সত্যকার বিশ্রাম লাভ করে।

কিছুদিন চেষ্টা করিলে সত্য সত্যই শিশুদের মত সমস্ত দেহ শিথিল করিয়া বিশ্রাম লাভ করা যায়। এইরূপ বিশ্রাম লাভের জন্য দেহকে শিথিল করাই সর্বপ্রধান কথা। কয়েকদিন অভ্যাস করিলেই সর্বদেহে এই শিথিলতা আনয়ন করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকেই আরোগ্যমূলক শিথিলতা (Durable relaxation) বলা হইয়া থাকে। এই অভ্যাস এক শ্রেণীর সাধনা। ইহাকে বিশ্রামের সাধনা বলা যাইতে পারে। দেহকে এইভাবে শিথিল করিয়া বিশ্রাম করিলে স্বল্প বিশ্রামেই দীর্ঘ বিশ্রামের ফল লাভ করা যায়।

এইরূপ বিশ্রাম করিবার বিশেষ একটি পদ্ধতি আছে। ইহা গ্রহণ করিবার পূর্বে ইহার জন্য দেহ ও মনকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। প্রথমেই মনটিকে চিন্তাশূন্য করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহার পর বিছানার উপর পিঠ রাখিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করিয়া বিড়ালে যেভাবে আলস্য ভাঙ্গে, হাত-পাগুলিকে সেইভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত করা হইয়া থাকে। প্রথম একখানা হাত আস্তে আস্তে যত-দূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া পুনরায় গুটাইয়া আনা হয়। তাহার পর হাতখানাকে শয্যার উপর এ-ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যেন উহা আপনি পড়িয়া যায়। পড়িয়া গেলে, যেখানে পড়িয়া থাকে সেই খানেই, অবশ অঙ্গের মত হাত-খানাকে রাখিয়া দিতে হয়। তাহার পর একে একে অপর হাত এবং পা দুইটিকেও ঐরূপ সংকুচিত ও প্রসারিত করিয়া এবং পরে বিছানার উপর ছাড়িয়া দিয়া দেহকে সম্পূর্ণ-রূপে শিথিল করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার পর চক্ষু দুইটি বুজিয়া শয্যার উপর শবের মত পড়িয়া থাকিতে হয়। এইজন্য ভারতীয় যোগশাস্ত্রে এই আরোগ্যমূলক বিশ্রামকে "শবাসন" বলিয়া থাকে। যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন, শয্যার উপর দেহকে শিথিল করিয়া দিয়া এবং চক্ষু দুইটি বুজিয়া "শবাসন" গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহার পর প্রত্যেকটি অঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয় যে ঐ অঙ্গটি শিথিল হইয়া গিয়াছে। এইভাবে হাত, পা, মেরুদণ্ড প্রভৃতি দেহের সকল অঙ্গ সম্পর্কে চিন্তা করা হইয়া থাকে।

কোন অঙ্গের উপর মন স্থির করিলেই দেখা যাইবে যে ভিতরে ভিতরে যেন একটা উত্তেজনা স্রোত বহিয়া যাইতেছে। তখনই ঠিক ঠিক ধরা পড়ে যে, বিশ্রাম গ্রহণ করিলেও দেহটি ঠিক ঠিক বিশ্রাম পায় না। কিন্তু এই-ভাবে শিথিলতা অভ্যাস করিতে করিতে ধীরে ধীরে সমস্ত উত্তেজনা নষ্ট হয়।

এইভাবে কিছুদিন অভ্যাস করিলে কয়েক-দিনের মধ্যেই সমস্ত দেহময় আশ্চর্য একটা শান্তি নামিয়া আসে। এইভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করিলে, সাধারণ বিশ্রাম অপেক্ষা বিশ্রাম অনেক গভীর হয়।

এই অবস্থাটাকে আয়ত্তের ভিতর আনিতে সাধারণতঃ এক হইতে দুই সপ্তাহ সময়ের অবাশ্যক হয়। কিন্তু একবার অভ্যাস হইয়া গেলে শয্যায় শয়ন করিয়া ইচ্ছা করা মাত্র সমস্ত দেহ শিথিল ও ঢিলা হইয়া যায়।

দেহ এইভাবে শিথিল হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে যদি শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম গ্রহণ করা যায় তবে অত্যন্ত উপকার হয়। প্রকৃত পক্ষে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম আরোগ্যমূলক শিথিল-তার একটা অপরিহার্য অংশ। দেহ শিথিল হইয়া যাইবার পর তিন চার বার পর্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ইহা খুব ঘন ঘন নিবার প্রয়োজন হয় না। বেশ বিশ্রাম নিয়া কিছু পর পর একবার করিয়া নিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই সময় দেহের শিথিলতা যাহাতে ভঙ্গ না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এইজন্য শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়ামগুলি খুব ধীরে ধীরে গ্রহণ করা কর্তব্য। তথাপি শিথিলতা অভ্যাস হইয়া গেলে, দেহ যত শিথিল হয়, শ্বাস প্রশ্বাস তত গভীর হইয়া উঠে। তখন দেহ ইচ্ছা করিয়া যতবার এই ব্যায়াম নেয়, তত বারই নেওয়া যাইতে পারে।

এই পদ্ধতি অনুযায়ী অর্ধ ঘণ্টার জন্য দেহকে শিথিল করিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিদিন ইহা গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয় না। সাধারণ অবস্থায় সপ্তাহে দুইদিন গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ তরুণ রোগে প্রতিদিন ইহা গ্রহণ করা যায়। তাহার পর রোগ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে বেশী দিন অন্তর অন্তর গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

শ্রান্ত বা দেহ-মনের উত্তেজিত অবস্থায় ইহা যে-কোন সময় গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় খালি পেটে বা আহারের পূর্বে গ্রহণ করিলেই সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার হইয়া থাকে।

(৩)

শ্রান্তদেহে সজীবতা ফিরাইয়া আনিতে দেহকে এইভাবে শিথিল করার মত আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। দেহের শ্রান্ত অবস্থায় মাত্র দশ মিনিটের জন্য ইহা গ্রহণ করিলে সমস্ত শ্রমের অপনোদন হয় এবং ক্লান্তির ভাব কাটিয়া যায়।

দেহ ও মনের উত্তেজিত অবস্থায়ও ইহা যে কোন সময় গ্রহণ করিয়া আশ্চর্য উপকার লাভ করা যায়। মন হঠাৎ ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, শয্যার উপর পড়িয়া দেহকে শিথিল করা মাত্র মন শান্ত হইয়া যায়। মনের যে চঞ্চল ও উত্তেজিত অবস্থা তাহাও বহু ক্ষেত্রে দেহের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উত্তেজনা হইতেই উৎপন্ন হয়। এই জন্য কিছু দিন দেহের শিথিলতা অভ্যাস করিলে মাংসপেশী ও স্নায়ুর উত্তেজনা যখন কমিয়া যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উত্তেজনাও বিনষ্ট হয়।

প্রকৃতপক্ষে কিছুদিনের জন্য দেহের শিথিলতা অভ্যাস করিলে মনের দিক দিয়া আশ্চর্য পরিবর্তন হয়। ইহা গ্রহণের ফলে কোপন স্বভাব শান্ত হয়, কলহস্পৃহা কাটিয়া যায়, বিনা উত্তেজনায় যুক্তি দিয়া কথা বলিবার ক্ষমতা আসে এবং মানুষ সহজে ঘাবড়ায় না বা কাজের কথা ভুলিয়া যায় না। মনটি যখন এইভাবে শান্ত হইয়া আসে তখন দৈহিক স্বাস্থ্যও উন্নতি লাভ করে। এই জন্য পরিপূর্ণ বিশ্রামই ওজন লাভের একটি প্রধান উপায়।

কিছুদিন দেহের শিথিলতা অভ্যাস করিলে উহা এরূপ আয়ত্তে আসে যে, কাহারও সহিত দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে বা পথ চলিতে চলিতে ইচ্ছা মাত্র দেহকে শিথিল করিয়া দেহ ও মনকে শান্ত করিয়া লওয়া যায়।

শিথিলতা অভ্যাসের দ্বারা স্নায়ুগুলি স্নিগ্ধ হয় বলিয়া বিভিন্ন স্নায়বিক রোগে ইহার দ্বারা আশ্চর্য উপকার হইয়া থাকে। অনিদ্রা রোগ দূর করিবার ইহা একটি প্রধান উপায়। যদি সুনিদ্রা লাভ না হয়, তবে সকল বিশ্রামই মিথ্যা হইয়া থাকে। সত্যকার যে স্বাভাবিক বিশ্রাম তাহাও কেবল নিদ্রার সময়ই লাভ হয়। এই সময় সকল উত্তেজনার অবসান

হইয়া থাকে এবং দেহ তাহার শ্রান্ত তন্তুগুলিকে মরামত করিবার অবসর পায়। যদি প্রতিদিন যথাসময়ে নিদ্রা না আসে, নিদ্রা অগভীর হয় অথবা অল্প সময় পরেই ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে কিছুকাল পর্যন্ত প্রতি রাত্রেই শয়নের পূর্বে দেহকে শিথিল করিয়া লওয়া উচিত। কয়েকদিন এইরূপ করার পর দেহকে শিথিল করা মাত্র আপনি নিদ্রা আসে এবং কখন যে আসে তাহা বোঝাই যায় না।

তোতলামিকে বর্তমানে আর বাক্যযন্ত্রের রোগ বলিয়া গণ্য করা হয় না, ইহা নিঃশেষে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা একটি স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা ঘটিত রোগ। প্রতিদিন বা একদিন অন্তর একদিন নিয়মিতভাবে দেহকে শিথিল করিলে ক্রমশঃই তোতলামির ভাব কাটিয়া যায় এবং অবশেষে রোগী স্বরযন্ত্রের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে

অন্যান্য সাধারণ রোগে দেহকে শিথিল করিবার তেমন প্রয়োজন না থাকিলেও এমন কোন রোগ নাই, যাহাতে বিশ্রামের প্রয়োজন না আছে। অতিরিক্ত শ্রমের পর দেহ যেমন বিশ্রাম চায়, তেমনি রোগের সময়ও দেহ কাজ করিতে অস্বীকার করে। কারণ দেহ যখন বিশ্রামরত থাকে, তখনই কেবল প্রকৃতি দেহকে মেরামত করিয়া লইবার অবসর পায়। এইজন্য সমস্ত রোগে বিশ্রামই একটা চিকিৎসা।

প্রায় সমস্ত রকম বেদনায় সামান্য নড়াচড়াতেই কষ্ট বোধ হয়। তখন কেবল বিশ্রাম দিলেই অনেক সময় বেদনা পড়িয়া যায়। এইজন্য একটা হাত বা পা যদি ভাঙিয়া বা মচকিয়া যায়, তবে প্রথমেই এমন ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে হাত, পা নড়িতে না পারে। আঘাত-প্রাপ্ত অঙ্গটিকে এইরূপ বিশ্রাম দিবার ব্যবস্থা করিলে প্রকৃতি ঐ অঙ্গটিকে আপনিই সংস্কার করিয়া লয়। ঠিক এইজন্যই পেট বেদনা হইলেও আমরা না খাইয়া পেটকে বিশ্রাম দেই।

এইভাবে মস্তিষ্কের অসুখে মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়া হইয়া থাকে। চক্ষুরোগ বা অন্য কোন যন্ত্রের রোগেও ঐ সকল যন্ত্রকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। অনেক সময় দেহটিকে বিশ্রাম দিলেই দেহের বিভিন্ন যন্ত্র বিশ্রাম পাইয়া থাকে। এই জন্য পাকস্থলীর ক্ষত প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়।

সর্বপ্রকার জ্বররোগেই বিশ্রাম একান্ত অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে। জ্বরের সময় কেবল বিশ্রামেই বহু অবস্থায় জ্বর আপনি আরোগ্য লাভ করে। এমন কি যক্ষ্মারোগীকেও কেবলমাত্র বিশ্রাম দিলে তাহার জ্বর ও অধিকাংশ উপসর্গ আপনা হইতেই কমিয়া আসে। যদি যক্ষ্মা রোগীকে প্রয়োজনানুসারে কয়েকদিন হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্রাম দেওয়া যায়, তবে অনেক সময় কেবল তাহা দ্বারাই রোগীর দুর্বলতা মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, দ্রুত হৃৎকম্পন, জ্বর, কাশি ও শ্লেষ্মা কমিয়া আসে এবং কোন কোন অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়।

এই সকল কারণে সকল রোগেই বিশ্রামে উপকার হয়। কঠিন কঠিন রোগে কেবল বিশ্রাম নেওয়াই যথেষ্ট হয় না। ঐ সকল অবস্থায় সর্বদার জন্য শয্যায় থাকিয়া পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের (rest in bed) আবশ্যক হইয়া থাকে। যখন রোগী শয্যা হইতে কিছুতেই নামে না এবং অপর কেহ তাহার জন্য সব কিছু করিয়া দেয়, তখনই কেবল তাহার পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

কিন্তু রোগ ও স্বাস্থ্যে বিশ্রামের যথেষ্ট উপকারিতা থাকিলেও ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, বিশ্রাম ও আলস্য এক কথা নয়। রোগ ব্যতীত বিশ্রামের অর্থই শ্রমের পর বিশ্রাম। যে বিশ্রাম শ্রমের অনুগমন করে না, দেহ ও মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থাকেই দীর্ঘ করিয়া লয়, তাহা বিশ্রাম নয়, তাহা আলস্য। অতিরিক্ত শ্রমে যেমন দেহের ক্ষয় হয়, আলস্যেও তেমনি মনের ভিতর মরিচা ধরিয়া যায়। আলস্য ও শ্রান্তির ভিতর যদি একটা বাছিয়া লইতে হয়, তবে শ্রান্তিকেই বাছিয়া লওয়া উচিত। খাটিয়া খাটিয়া বরং মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি মরিচা ধরিয়া মরা ভাল নয়।

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

(সাত)
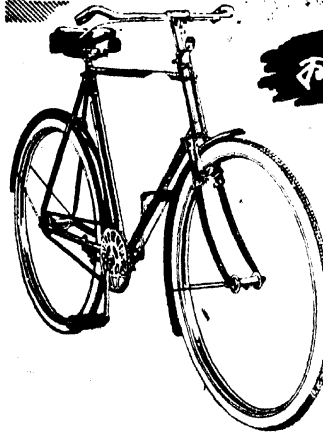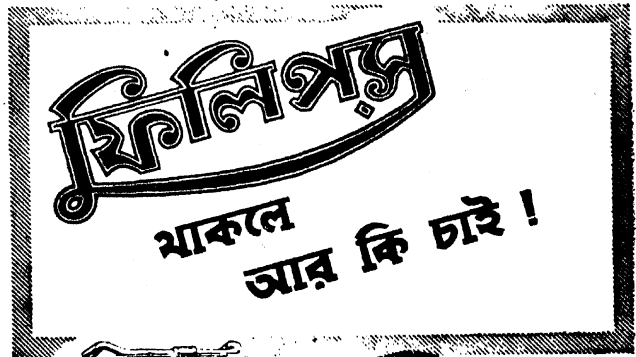
এইখানে পরিষ্কারভাবে বলে রাখছি যে, বেদান্ত দর্শনের একটা বিবরণ দেওয়ার আমি চেষ্টা করছি না। সে কার্য করার মত উপযুক্ত জ্ঞান আমার নেই, যদি থাকত তাহ'লেও সে কাজ করার যোগ্য স্থান এই নয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসাবে যেটুকু গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী কথা লারী আমাকে বিস্তারিতভাবে বলেছিল,—লারীকেই আমার প্রয়োজন। লারীর এই অভিজ্ঞতা ও তার ফলে পরবর্তীকালে তার জীবন কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল সেই বিবরণ আমি এইবার পাঠকদের কাছে পেশ করব। আর সেই কারণটুকু না থাকলে এই রকম জটিল বিষয় হয়ত আমি আদৌ স্পর্শ করতাম না। তার কন্ঠস্বরের মনোহারিত্বের এতটুকু পরিচয় আমি ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারব না, তার জন্য আমি অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করছি। অতি সামান্যতম কথার ভিতরও মাধুর্য ভরা থাকত। যদিচ ও গুরুতর এবং জটিল বিষয়ে আলোচনা করত, সেগুলি অতি স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্ত করত। কথা বলার ভঙ্গীতে বলত, হয়ত তার ভিতর কিছু লজ্জা থাকত,—অথচ এমনভাবে বলত যেন আবহাওয়া বা শস্য সম্পর্কে আলোচনা করছে। আমার লেখা পড়ে যদি মনে হয় যে তার ভঙ্গী নীতি-গর্ভ তাহলে সে ত্রুটী আমার রচনার। আন্তরিকতার মতই তার নম্রতাও চোখে পড়ত।

কাফেতে সামান্য দু চারজন লোক ছিল। যারা হৈ চৈ করে বেড়ায় তারা সব অনেক আগেই পালিয়েছে। যারা প্রেম নিয়ে ব্যবসা করে সে বেচারীরা তাদের আস্তানায় ফিরে গেছে। মাঝে মাঝে ক্লান্তদর্শন কেউ কেউ এসে বীয়র ও স্যান্ডউইচ্ চাইছে—বা অর্ধ জাগরিত কেউ এসে কফি চাইচে। শাদা-কলার পরা শ্রমিকরা আসে। একজন রাতের ডিউটি শেষ করে বাড়িতে ঘুমাতে যাচ্ছে। অপরজন এলার্ম ক্লকের তাগিদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠে কাজে চলেছে। লারী কিন্তু স্থান ও কাল সম্পর্কে অচেতন। আমার জীবনে বহু বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি,—একাধিক বার মৃত্যুর মুখোমুখি এসে বেঁচেছি। একাধিকবার রোমান্সের সংস্পর্শে এসেছি, আর তা জানতামও। মার্কোপোলো যে পথ বেয়ে ক্যাথে নগরীতে গিয়েছিলেন মধ্য এশেয়ার সেই অঞ্চলটি টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে পার হয়েছি। পেট্রোগ্রাদের এক আড্ডায় রুশীয় চা পান করার সময় আমার সামনের চেয়ারে বসে কালো কোট ও ডোরাকাটা পাজামা পরা এক ভদ্রলোক কিভাবে তিনি একজন গ্রাণ্ড ডিউককে হত্যা করেছিলেন তার বিবরণ বেশ মোলায়েম কণ্ঠে ব্যক্ত করে গেলেন। ওয়েস্ট মিনিস্টারের এক ড্রয়িং রুমে বসে হেদনের পিয়ানোর স্বর্গীয় সুরধারা শুনেছি ওদিকে বাইরে বোমা পড়ছে, এমনও ঘটেছে। কিন্তু জমকালো রেস্তোরাঁর মূল্যবান আসনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লারীর মুখে ঈশ্বর পরম পুরুষ ও অনন্ত এবং শেষ হীন জীবনধারা সম্বন্ধে কথা শুনেছি এ অবস্থা আমার জীবনে আর ঘটেনি।

(আট)

লারী কয়েক মিনিট চুপ করে রইল, তাকে তাড়া দেওয়ার বাসনা না থাকায় আমিও চুপ করে রইলাম। কিছু পরে আমার দিকে তাকিয়ে বন্ধুতার ভঙ্গীতে মৃদু হাসল, যেন সহসা আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে।

"ত্রিবাঙ্কুরে পেঁছে দেখলাম শ্রীগণেশের সংবাদ নেওয়ার তেমন প্রয়োজন ছিল না, সবাই তাঁকে জানে। দীর্ঘকাল তিনি পর্বত কন্দরে গুহাবাস করেছেন, অবশেষে কয়েকজন দানশীল ব্যক্তির অনুরোধে সমতলে নেমে এসেছেন, সেখানে তাঁরা তাকে এক খণ্ড জমি দিয়ে আশ্রম বানিয়ে দিয়েছেন। রাজধানী ত্রিভান্দ্রম থেকে জায়গাটি অনেক দূর, প্রথমটা ট্রেন ও পরে গো-যানে সেই আশ্রমে পেঁছিতে আমার প্রায় সারা দিন লেগে গেল। আশ্রম প্রাঙ্গণে এক তরুণকে জিজ্ঞাসা করলাম যোগীর সঙ্গে দেখা করা যায় কিনা। রীতি অনুসারে আমি উপহার হিসাবে এক ঝুড়ি ফল নিয়ে এসে ছিলাম। কয়েক মিনিটের ভিতরই যুবকটি আমাকে একটি লম্বা হল ঘরে নিয়ে এলেন, ঘরটির চারি পাশে জানলা। এক পাশে শ্রীগণেশ ব্যাঘ্রচর্মাবৃত উচ্চাসনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। তিনি বল্লেনঃ "আপনার আসার আশায় ছিলাম।" আমি নিশ্চিন্ত হলাম, ভাবলাম হয়ত আমার সেই মাদ্রাজের বন্ধুটি আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। কিন্তু তাঁর নাম বলতে তিনি ঘাড় নাড়লেন। আমি ফলগুলি তাঁর সামনে ধরলাম, তিনি সেই যুবকটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বল্লেন। আমরা একাকী নীরবে বসে রইলাম। কতক্ষণ যে এই নীরবতা রইল বলতে পারি না, আধ ঘণ্টাও হতে পারে। তাঁকে কি রকম দেখতে পূর্বে বলেছি। শুধু বলিনি, কি স্বর্গীয় প্রভা, তাঁর মুখে স্বার্থহীনতা, সততা ও শান্তির জ্যোতি প্রতিভাত। ভ্রমণের ফলে আমি ক্লান্ত ও উত্তপ্ত ছিলাম, কিন্তু ক্রমেই আমি বেশ স্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। তিনি আর একটি কথা বলার পূর্বেই আমি বুঝলাম যে, এই লোকটিরই আমি সন্ধান করছিলাম।"

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—"তিনি কি ইংরাজী বলতে পারেন?"

"না, কিন্তু জানেন; আমি তাড়াতাড়ি ভাষা শিখে নিতে পারি। দক্ষিণ দেশে বোঝবার ও বোঝনার মত যথেষ্ট তামিল আমি শিখে ফেলেছিলাম, অবশেষে তিনি কথা বল্লেনঃ

বল্লেন, "কি কারণে এখানে এসেছ?"

"কিভাবে ভারতবর্ষে এলাম, তিন বছর কিভাবে এখানে জীবন কাটিয়েছি, কিভাবে সাধুদের কথা শুনে, তাঁদের জ্ঞান ও পবিত্রতার সুযশ পেয়ে একটির পর আরেকটি সাধুর কাছে ঘুরেছি ও অবশেষে দেখেছি যার সন্ধানে ফিরছি তা পাই না—এই সব কথা বলতে শুরু করেছি সবে উনি বাধা দিয়ে বল্লেনঃ

"ও সব আমি জানি, আমাকে বলার প্রয়োজন নেই, এখানে কেন এসেছ?"

আমি বল্লাম, "আপনাকে গুরুত্বে বরণ করব বলে!"

তিনি বল্লেন, "শুধু ব্রাহ্মণই গুরু।"

"তিনি আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তারপর সহসা ও'র দেহ ঋজু হয়ে উঠল, তাঁর চোখ যেন কোটরে ঢুকে গেল, তারপর দেখলাম ভারতীয়রা যাকে সমাধি বলে তিনি সেই সমাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য ঘটে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ জ্ঞান থাকলে সবিকল্প এবং জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদজ্ঞান না থাকলে নির্বিকল্প সমাধি ঘটে। আমি হাটু মুড়ে ও'র সামনে

...টিতে বসে আছি, আর আমার হৃদ্‌যন্ত্র অতি ... চলতে লাগল। কতক্ষণ পরে বলতে ...রি না, উনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তখন ...ঝলাম, ও'র স্বাভাবিক সচেতনতা ফিরে আসছে ...নি আমার পানে প্রেম-করুণা বিজড়িত ...টিতে তাকালেন।

তিনি বল্লেনঃ বেশ থাক, ওরা তোমার ...বার জায়গা দেখিয়ে দেবে।

"যে জায়গাটিতে পাহাড় থেকে ...মে শ্রীগণেশ প্রথমটা ছিলেন, আমার ...ন্য সেই জায়গাটি নির্দিষ্ট হল। যে ...টিতে এখন দিনরাত্রি থাকেন সেটি ও'র ...তিবৃদ্ধির পর যখন শিষ্যরা চারদিক থেকে এসে সমবেত হ'তে লাগল তখনই তৈরী ...য়েছিল। চিহ্নিত হওয়ার বাসনা না থাকায় ...মি ভারতীয় পোষাক গ্রহণ করলাম, আর রৌদ্রতপ্ত হওয়ার ফলে গায়ের চামড়ার রঙ এমন ...য়েছিল যে, না বলে দিলে বোঝার উপায় ছিল ... যে আমি দেশীয় লোক নই। আমি প্রচুর ...ড়েছিলাম, ধ্যান করতাম, শ্রীগণেশ যখন কথা ...ইতেন তখন তাঁর কথা শুনতাম, তিনি বেশী ...থা বলতেন না। কিন্তু সর্বদাই প্রশ্নের ...বাব দিতে তিনি খুসী হ'তেন, আর যারা ...নতেন তাঁরাও আনন্দ পেতেন। কানে যেন ...গীত সুধা বর্ষিত হত। তাঁর যৌবনে যদিও ...নি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন কিন্তু নিজের ...ষ্যদের প্রতি সে রকম কঠোরতা ছিল না। ...ত্মপরবশতার আসক্তি থেকে তাদের মুক্তি ...ওয়ার তিনি চেষ্টা করতেন কামনার তাড়না ...থেকে মুক্তি, আর তাদের বলতেন যে, স্থৈর্য, ...ংযম, ত্যাগ, অনাশক্তি, মনের দৃঢ়তা ... মোক্ষলাভের প্রবল বাসনা প্রভৃতির ...যোগেই মোক্ষলাভ সম্ভব। নিকটস্থ শহর-...লি থেকে এমন কি তিন চার মাইল দূরে ...থেকেও একটি প্রসিদ্ধ মন্দিরের বাৎসরিক মেলা ...পলক্ষ্যে প্রচুর লোকজন আসতঃ তারা ...ভান্দ্রম বা আরো দূরবর্তী অঞ্চল থেকে এসে ...দের দুঃখের কথা বলত, তার উপদেশ প্রার্থনা ...রত, আর সকলেই আত্মিক দৃঢ়তা ও মানসিক ...ন্তি নিয়ে ফিরত। তিনি যা শেখাতেন তা ...তি সহজ এবং সরল। তিনি বলতেন, ...মরা সকলে যা জানি তার চাইতে তা বড়। ...বং জ্ঞানই মোক্ষের পথ। তিনি বলতেন ...ধনার জন্য সংসার ত্যাগ করাটা প্রধান ব্যাপার ..., তবে অহংকে ত্যাগ করতে হবে। তিনি ...লতেন স্বার্থশূন্য হয়ে কাজ করলে মন পবিত্র হয়। তিনি বলতেন, কর্তব্যের দ্বারাই মানুষকে কর্তব্য কর্ম করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তার ফলে সে তার অহং ভুলে সর্বজীবে লীন হ'তে পারে। কিন্তু শুধু তাঁর উপদেশই যে অপূর্ব তা নয়, লোকটি স্বয়ং, তাঁর আত্মিক মহত্ত্ব, সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি, আর সাধুতা অনন্যসাধারণ। তাঁর উপস্থিতিই যেন আশীর্বাদ। আমি তাঁর কাছে অতি সুখে ছিলাম। বুঝলাম, অবশেষে যা খুঁজছিলাম তা পেলাম—সপ্তাহ, মাস অচিন্তনীয় দ্রুত গতিতে কেটে গেল, ভারী সুখে ছিলাম। আমি প্রস্তাব করলাম, যতদিন না তাঁর তিরোভাব ঘটে ততদিন থেকে যাবো (নশ্বর দেহ ত্যাগ করার নাম তিরোধান) কিংবা যতদিন না ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করি এবং নিশ্চিন্তভাবে বুঝতে পারি আমি আর পরমাত্মা এক হয়ে গেছি ততদিন থাকব।"

"অতঃপর?"

"তারপর,—ও'রা যা বলেন, তা যদি সত্য হয়, তাহ'লে এর পর আর কিছু নেই, আত্মার পার্থিব জীবনধারার অবসান ঘটবে, আর তাকে ফিরে আসতে হবে না।"

আমি প্রশ্ন করলাম—"শ্রীগণেশ কি এখন মৃত?"

"যতদূর জানি এখনও আছেন।"

এই কথা বলার সময় আমার প্রশ্নের অর্থটা উপলব্ধি করে লারী আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুখ টিপে হাসল। তারপর এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আবার বলতে শুরু করল, কিন্তু এমন ভংগীতে বলতে লাগল যে, প্রথমটা আমার মনে হ'ল, আমার জিভের গোড়ায় যে দ্বিতীয় প্রশ্ন জেগে আছে সেটির জবাব সে এড়িয়ে যেতে চাইছে। প্রশ্নটা এই যে, তার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল কিনা।

"আমি একাদিক্রমে যে আশ্রমে ছিলাম তা নয়, বনবিভাগের একজন অফিসারের পাহাড়ের নীচেই স্থায়ী বাসা ছিল, তাঁর সংগে সৌভাগ্য-ক্রমে পরিচয় হয়েছিল। তিনি শ্রীগণেশের একজন ভক্ত শিষ্য, একটু কাজের ফাঁক পেলেই তিনি দু চারদিনের জন্য একবার আশ্রমে আসতেন। তিনি চমৎকার লোক, আমরা সবাই তাঁর সংগে খুব গল্প করতাম। তিনি তাঁর ইংরাজী আমার ওপর পরীক্ষা করতেন। তাঁর সংগে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি আমাকে বল্লেন—বনবিভাগের দরুণ পাহাড়ের ওপরেই একটা বাংলো আছে, আমি যদি একা সেখানে যেতে চাই, তাহলে তিনি আমাকে তার চাবী দিতে পারেন। আমি মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম। দুদিনের পথ, প্রথমে সেই বন-বিভাগের গ্রামটিতে বাসে করে যেতে হয়, তারপর পায়ে হে'টে যেতে হয়, সেখানে পৌছালে পর কিন্তু মন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও নির্জনতায় ভরে ওঠে। আমি কাঁধের ঝোলায় যা পারলাম নিয়ে নিলাম। আর খাদ্যদ্রব্যাদি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা লোক ঠিক করে নিয়েছিলাম। যতদিন না ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ততদিন আমি সেখানে ছিলাম। কাঠের বাড়ি, পিছনে ছোট্ট একটু রান্নাঘর আছে, আর আসবাবপত্র তেমন কিছুই নেই, একটা খাটিয়া মাত্র, তার ওপরই শয্যা বিছাতে হবে, আর একটি টেবল ও দুটি চেয়ার। জায়গাটি বেশ ঠাণ্ডা এবং মাঝে মাঝে রাতে আগুন জ্বালতে হ'ত—আমার কাছাকাছি কুড়ি মাইলের ভিতর জন-প্রাণী নেই জেনে আমার মনে এক অপূর্ব শিহরণ জাগল। রাতে মাঝে মাঝে ব্যাঘ্রগর্জন বা হস্তীযূথের জঙ্গল ভাঙ্গার আওয়াজ পেতাম—আমি জঙ্গলের ভিতর দীর্ঘপথ হে'টে বেড়াতাম। একটি জায়গায় আমি বসতে ভালবাসতাম—সেখান থেকে আমার সমুখের ও নীচের পাহাড় দেখা যেত। আর একটি হ্রদ দেখা যেত, সন্ধ্যায় সেখানে হরিণ, শূকর, বাইসন, হাতী, চিতাবাঘ প্রভৃতি জল খেতে আসত।

"আশ্রমে দু-বছর কাটাবার পর আমি অরণ্য-আবাসে যে কারণে গেলাম, তা শুনে আপনি হাসবেন। সেখানে জন্মদিবস কাটাবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। পূর্বদিনে সেখানে পৌছলাম। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠে যে জায়গাটির কথা ইতিমধ্যে বলেছি, সেইখানে সূর্যোদয় দেখতে গেলাম। পথটি চোখ-বুজেও আমি যেতে পারতাম। আমি একটি গাছের তলায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখনও রাত আছে, আকাশে তারারা ম্লান হয়ে এসেছে, দিন আসন্ন, আমার মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। এমনই অবস্থা যে, অন্ধকারের ভিতর আলো কখন ফুটেছে তা বুঝি নি। গাছের আড়ালে যেন এক রহস্যময় মূর্তি প্রকাশ হচ্ছে—আমার মন আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে উঠল।

সূর্য উদিত হলেন।

—ক্রমশ

গত সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিদিগের পুনর্বসতির ব্যবস্থার জন্য কলিকাতায় এক পরামর্শ-সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ভারত সরকারের সাহায্যদান ও পুনর্বসতি সচিবের পরামর্শদাতা খান্না মহাশয় ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন। ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কিরূপে কার্যে পরিণত করা হইবে, তাহা জানিবার জন্য বাঙালী মাত্রেরই ঔৎসুক্য অবশ্যম্ভাবী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট পেশ হইয়াছে। ইহাতে বৈশিষ্ট্য বা নূতনত্ব নাই। কেবল, ইহা দরিদ্রের বাজেট নহে। নূতন কর স্থাপিত করিয়া ঘাটতি পূরণ—অনেক ক্ষেত্রে "খানা কাটিয়া খানা ভরাট করা" হয়। বিশেষ ভারত সরকারের বাজেটের প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গের উপর কিরূপ হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বাজেট রচনা করা হইয়াছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটের বিস্তৃত আলোচনা আমরা করিব না। কিন্তু আমরা আজ বাজেটের বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য ২টি দফার উল্লেখ প্রথমে করিব—(১) "অডিট, বাজেট, ট্যাক্সেশান ও এক্সাইস"—এই বিভাগে ৩টি নূতন পদ সৃষ্ট হইয়াছে—

অতিরিক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী—১
সহকারী সেক্রেটারী—২

বিভক্ত বাঙলায় এই সকল অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির কারণ কি? যদি এই নূতন পদে বাহির হইতে লোক গৃহীত হয়, তবে যে নিম্নতরস্থ যোগ্য কর্মচারীদিগের মধ্যে অসন্তোষের উদ্ভব অনিবার্য হইবে, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব। একেই ভাতা সম্বন্ধে চেম্বারের নির্ধারণানুযায়ী কাজ না হওয়ায় কর্মচারীদিগের মধ্যে অসন্তোষের উদ্ভব যে হয় নাই, তাহা নহে; তাহার পরে যোগ্যতার পুরস্কারে পদোন্নতির স্থানে যদি নূতন লোক নিয়োগ হয়, তবে যে সেই অসন্তোষ বর্ধিত হইবে, তাহা মনে করা কখনই অসঙ্গত নহে।

(২) কলিকাতার উপকণ্ঠে যান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন জন্য বাজেটে ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে মন্তব্য আছে—

জনসাধারণের সুবিধার জন্য যানে যাত্রীর ভীড় কমাইতে কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে ৪ শত বাস সরকার চালাইবেন স্থির করিয়াছেন। এ পর্যন্ত ৭০ খানি বাস সহরের ৩টি প্রধান পথে চলাচল করিতেছে। এই কার্যে বহু বাস্তুহারাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব—

টিকিট বিক্রয় প্রভৃতি (?) হইতে

প্রাপ্ত	৮৭,৫০,০০০ টাকা
বাস চালনার ব্যয়	৭৯,০০,০০০ টাকা
সুতরাং মোট লাভ	৮,৫০,০০০ টাকা

কথায় বলে "হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না।" কিন্তু ৭৬ লক্ষ টাকা প্রযুক্ত করিয়া যদি সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা লাভ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য—

(ক) সরকারের বাসে কি সংস্কার—এমন কি রং করাও প্রয়োজন হয় না?

(খ) সরকারী সম্পত্তিতে কি ডিপ্রিসিয়েশন হিসাব ধরা নিষিদ্ধ হইয়াছে?

এই বিভাগের জন্য যাঁহাকে কয় বৎসরের সর্তে প্রধান কর্মচারী করিয়া আনা হইয়াছে, তাঁহার মাসিক বেতন কত এবং তাঁহার দপ্তর-খানার মাসিক ব্যয় কত? ইহার মধ্যেই কি ট্রাম কোম্পানী হইতে দ্বিগুণ বেতনে কোন সহকারী আমদানী করা হইয়াছে? যে সকল লোক বাসের ব্যবসা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লাভ করেন। যদি আমাদিগের এই অনুমান সত্য হয়, তবে বাস-ব্যবসা সরকারের একচেটিয়া করিবার পূর্বে দ্বৈত ব্যবস্থা না করিয়া লোককে আরও বাস চালাইবার অধিকার দিলে কি ক্ষতি হইত?

কেন্দ্রী সরকারের ব্যবস্থায় পেট্রলের মূল্য বৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাস পরিচালন ব্যয় কি বাড়িয়া যাইবে না?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে দরিদ্রদিগের কোন অসুবিধা দূর হইবে না—মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ ত পরের কথা।

আবার ভারত সরকারের বাজেটে কাগজের ও পেন্সিল প্রভৃতির উপর আমদানী শুল্কের জন্য শিক্ষার্থীদিগের যে অসুবিধা ঘটিবে, তাহা অন্যদিকে দূর করিবার কোন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে নাই।

কলিকাতার উপকণ্ঠে ও বসিরহাটে যে হাঙ্গামা ঘটিয়াছে, তাহা যে অত্যন্ত ভয়াবহ, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু আমরা আর একটি ব্যাপার আরও ভয়াবহ বলিয়া মনে করি। সে দিকে আবশ্যক দৃষ্টি না দিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঈশপের উপকথার একচক্ষু হরিণের মত কাজ করিবেন। আমরা ২৪ পরগণার পরে হুগলী জিলায় গ্রামে গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনী-দিগের সহিত পুলিশের সংঘর্ষের কথা বলিতেছি। এই সকল সংঘর্ষে গ্রামের স্ত্রীলোক-দিগের যোগদানে মনে হয়, যে ভাব এই সকল সংঘর্ষে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা আমা-দিগের পরিবারের কেন্দ্র পর্যন্ত ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে। হুগলী জিলার সংঘর্ষে আহত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সেদিন হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হইয়াছে। কেন এমন হইতেছে। আমরা বলিয়াছি, সন্ত্রাসবাদ একবার আবির্ভূত হইলে, তাহা সহজে দূর করা যায় না। কিন্তু যে সন্ত্রাসবাদ বিদেশীর শাসনকালে উদ্ভূত হইয়াছিল, স্বায়ত্তশাসনে তাহার অবসান হইবে, এমন আশা অনেকে করিয়াছিলেন। সরকারের বিশ্বাস, এই সকল ঘটনার মূলে কম্যুনিস্টরা রহিয়াছে। এই মত কতদূর নির্ভরযোগ্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, চীনে কম্যুনিস্ট প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে এবং ব্রহ্মে কারেনরা কম্যুনিস্টদিগের সহিত যোগ দিয়াছে। এই অবস্থায় এদেশের সরকারের বিশেষ সতর্কতাবলম্বন প্রয়োজন। ব্যবস্থায় ও ব্যবহারে দেশের লোককে বুঝিতে দেওয়া কর্তব্য—বিদেশীর স্বৈরশাসনের অবসান হইয়াছে এবং ভারত-রাষ্ট্রে স্বদেশী সরকার গণতন্ত্রানুমোদিত পথ গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেছেন। সেজন্য যে সকল পদ্ধতির ও ব্যবহারের পরিবর্তন করা অনিবার্য সে সকলের বর্জনে ও পরিবর্তনে আর কালবিলম্ব না করাই সঙ্গত।

দেখা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সকল কম্যুনিস্টদিগের কাজ বলিলেও লোক মনে করিতেছে, জনগণের অসন্তোষ বৃদ্ধির নানা কারণ রহিয়াছে। প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্য—অন্নবস্ত্রের সমস্যার জটিলতা দূর করিতে সরকারের অক্ষমতা। তাহার পরে দেখা যাইতেছে, এবার সরকার যে বাজেট রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অযথা অনেক কর ধার্য করা হইয়াছে। সরকার ব্যয় সঙ্কোচের সামান্য চেষ্টা করিলেই যে সেগুলি হইতে জনসাধারণকে অনায়াসে অব্যাহতি দিতে পারিতেন তাহা আমরা অবশ্যই বলিব।
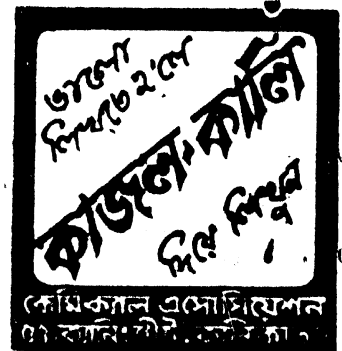
এই প্রসঙ্গে আমরা সর্বাগ্রে কৃষির উপর করের উল্লেখ করিব। বীজের উপর ও গাছের উপর যে বিক্রয়-কর স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে যাহাকে "নার্সারি" ব্যবসা বলে, তাহা নষ্ট হইবে। আর তাহার অনিবার্য ফল এই হইতেছে যে, খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির পথই রুদ্ধ হইতেছে।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বহু লোক চেষ্টা করিয়াও গৃহনির্মাণের অনিবার্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। প্রথম—ইষ্টক। ইষ্টক আজ যে মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, তাহা অসঙ্গত অধিক। ইষ্টক ব্যবসায়ীদিগের একটি সমিতি বা সঙ্ঘ আছে, তাহার প্রচারপটুতা প্রশংসনীয়। সেই সমিতি বা সঙ্ঘ ইষ্টকের মূল্য হ্রাস না করিবার কারণ হিসাবে মধ্যে মধ্যে বিবৃতি প্রচার করেন; তখন বলা হয়, ইট পুড়াইবার জন্য কয়লা পাওয়া যায় না; কখন বলা হয়, অকাল বর্ষণে অনেক ইট নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কখন বলা হয়, শ্রমিকের অভাব—ইত্যাদি। আমাদিগের একান্ত অনুরোধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়া দেখুন—বর্তমানে ইষ্টকের মূল্য কিরূপ হওয়া সঙ্গত। তাহার পরে সিমেণ্ট। এই সিমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু নিয়ন্ত্রণে দেখা যায়, যদিও নিয়ম করা হইয়াছে—লোকে সাধারণত এদেশে প্রস্তুত সিমেণ্ট পাইবে না—তাহাদিগকে অধিক মূল্যে বিদেশী আমদানী সিমেণ্ট লইতে হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যদিও বলিয়াছিলেন, ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহকে নির্দেশ দিয়াছেন, অত্যাবশ্যক নির্মাণকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন সিনেমা গৃহ বা বিরাট গৃহ নির্মাণের জন্য সিমেণ্ট প্রভৃতি দেওয়া হইবে না, তথাপি গত বার মাসে কলিকাতায় কতগুলি নূতন সিনেমা গৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং নগর বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী বিরাট গৃহও কিভাবে মাথা তুলিতেছে, তাহা কি ভারত সরকার লক্ষ্য করেন নাই? এই সকল গৃহের জন্য আবশ্যক উপকরণ—বিশেষ লৌহ ও সিমেণ্ট কি সবই চোরাবাজার হইতে আসিতেছে?

মাত্র কয়দিনের ব্যবধানে দুইজন প্রসিদ্ধ বাঙালীর মৃত্যু হইয়াছে। মিশরে ভারত সরকারের রাষ্ট্রদূত ডক্টর সৈয়দ হোসেন কায়রোয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইঁহার পিতা বাঙলার অধিবাসী ও বাঙলা সরকারে চাকরিয়া ছিলেন; ইঁহার মাতা বাঙলার কন্যা। ইনি মিস্টার ফজলুল হকের শ্যালক ছিলেন। ডক্টর সৈয়দ হোসেন ইংরেজিতে সুপণ্ডিত ও সাংবাদিক ছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যখন বিপিনচন্দ্র পালকে সম্পাদক করিয়া এলাহাবাদ হইতে ইংরেজি দৈনিক 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' প্রচার করেন, তখন সৈয়দ হোসেন বিপিনবাবুর সহকারী ছিলেন। সেই সময় নেহরু পরিবারের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সৈয়দ হোসেন দীর্ঘকাল বিদেশে ছিলেন। ভারতবর্ষ বিভক্ত ও স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইলে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর দ্বারা তিনি বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারত-রাষ্ট্রে প্রথম মহিলা প্রদেশপাল সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুতে একজন বিখ্যাত কবি, বাগ্মী ও রাজনীতিক কর্মী—ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বহু ত্যাগস্বীকারকারী মহিলার তিরোধান হইয়াছে। মৃত্যুর কয়দিন পূর্ব হইতে তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না; কিন্তু তিনি যে সেই অসুস্থতায় অতর্কিতভাবে লোকান্তরিত হইবেন, তাহা মনে করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। যদিও ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার কাজের মধ্যে তাঁহার কর্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে, তবুও তাঁহার মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর। তাঁহার সম্বন্ধে কেবল বলা যায়ঃ—

"Life's work welldone,
Life's laurel well won,
Life's race well run
New cometh rest."

সরোজিনী নাইডু—পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। অঘোরবাবু বৃটেনে শিক্ষালাভান্তে হায়দরাবাদের তৎকালীন নিজামের আমন্ত্রণে তথায় শিক্ষা-বিভাগের পুনর্গঠন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় শিক্ষক ও পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। বহু বাঙালী হায়দরাবাদে যাইয়া চট্টোপাধ্যায় দম্পতির অতিথি সৎকারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই পরিবারের জ্ঞান পরিবেষ্টনে সরোজিনীর জন্ম হয়। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহাকে বিজ্ঞান শিক্ষাদান পিতার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু কন্যার স্বাভাবিক কবি-প্রতিভাই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহাকে শিক্ষা শেষ করিবার জন্য য়ুরোপে প্রেরণ করা হয়। তথায় তাঁহার কবিতা অনেক সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে সমালোচক এডমণ্ড গস বহুদিন পূর্বে বাঙালী কবি তরু দত্তের কবিতার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তিনি সরোজিনীকে পরামর্শ দেন—তিনি যেন বিদেশী ভাব বর্জন করিয়া প্রকৃত ভারতীয় ভাবের বিকাশ তাঁহার কবিতায় করেন। স্বদেশে প্রত্যাবৃত হইয়া সরোজিনী ডক্টর নাইডুকে বিবাহ করেন। বিলাত যাত্রার পূর্বেই তাঁহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু পিতামাতার অসম্মতি হেতু তখন বিবাহ হয় নাই। পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলের প্রভাবে সরোজিনী নাইডু রাজনীতিক অন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তি সহজেই তাঁহাকে রাজনীতিক দলে সমাদৃত করে। তিনি কেবল দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যই ত্যাগ-স্বীকার করেন নাই; পরন্তু দেশের সামাজিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধনেও বিশেষ অবহিত ছিলেন। কংগ্রেসে তিনি কিরূপ আদর লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সভানেত্রী নির্বাচনেই বুঝিতে পারা যায়।

তিনি ইংরেজিতে যেমন উর্দুতেও তেমনই অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারত-রাষ্ট্র শোকাচ্ছন্ন। নব ভারতের স্মরণীয় ও বরণীয় মহিলাদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)
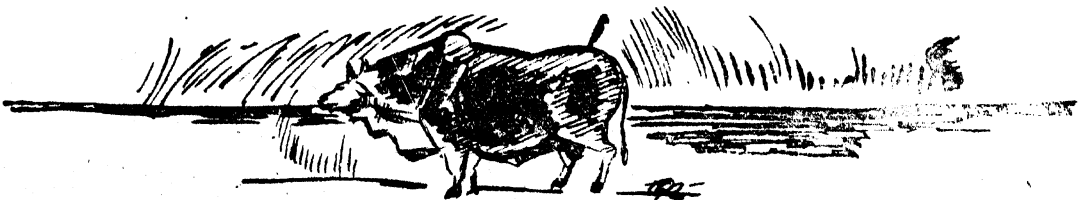
সমরের একবার মনে হয় নিঃশব্দে পিছন ফিরে যে-পথে এসেছে সেই পথে ফিরে যায়। কেন সে এলো? সে না এলেই বা কার কি বয়ে যেত! কিন্তু অগ্রগামী অলকার আকর্ষণটা যেন চুম্বকের মত—কিছুতেই আর দ্বিধায় সংশয়ে মন স্থির হয় না, ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

অলকা মোটা হয়েছে, অলকা ঘর সাজিয়েছে, অলকা সুখেস্বচ্ছন্দে দিন যাপন করছে। আর কি দেখতে চায় সমর? অলকা কারো মুখাপেক্ষায় বসে নেই—কারো পথ চেয়ে এখনো আছে কি না তারও বা নিশ্চয়তা কি? এখন অলকাকে দেখতে ভাল লাগলেও না দেখলেই যেন ভাল ছিল। আকর্ষণের মধ্যে এত জ্বালা ইতিপূর্বে সমর আর কোনদিন অনুভব করেনি। এই দেখার এই ভাবার তুলনা নেই। গত বছর অদর্শনে যে অনুরাগ তিলে তিলে রসঘন হ'য়ে উঠেছিল, দেশের মাটিতে পা দিয়ে চিত্তের বিক্ষিপ্ততায়ও সব উত্তাপ মুহূর্তের জন্যে সমর ভুলতে পারেনি, তা যেন এখনই বড় তরল আর উত্তাপহীন মনে হ'চ্ছে—এত কাছাকাছি, এত পাশাপাশি, তবু কতদূর! অলকা অনেক দূরে ঘরের কোথায় যেন সরে দাঁড়িয়েছে—হাত বাড়ালে এখন সমর কোন স্পর্শ পাবে না। ছায়াছবিকে স্পর্শ করলে রক্তমাংসের স্বাদ পাওয়া যায় কি?

অলকাকে দেখতে ভাল হ'য়েছে, স্বাস্থ্য ফিরেছে—এলো চুলে পিঠটা ছেয়ে আছে নগ্ন ডান হাতটা নিটোল শাঁকের পিঠের মত মসৃণ। নতুন করে' প্রেমে পড়ার মত আজকের অলকার রূপ সমরের চোখের ওপর প্রতিভাত। হঠাৎ সমর বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। বিরাগে কি অনুরাগ দেখা দেয়?

সমর নিজেকে বোঝায় এ তোমার নয়—অলকার এ রূপ, এ স্বাস্থ্য তোমাকে দেবার জন্য নয়। মিথ্যে মুগ্ধ হচ্ছো তুমি! বোঝা-পড়া করতে এসে একি দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে? ছি! সঙ্গে সঙ্গে মনটা বড় কঠিন হ'য়ে ওঠে—না, না, না। অলকার স্বাস্থ্যটাই এখন যেন বড় চোখে লাগে সমরের।

বসবার ঘরে আসবাবপত্রের ভিড়ে গৃহকর্ত্রীর খাওয়া বসা শোয়ার স্বাচ্ছন্দ্য বোঝা যায়। বেশ সুখে আর আরামে আছে অলকা। এখন কি দিয়ে কথা আরম্ভ করবে সমর—কেমন আছ? উত্তরে অলকা ভাল বললে সেটা কেমন শোনাবে? নিজেকে সমরের বোকার মত মনে হ'বে নাকি! ওর চেয়ে কিছু জিগ্যেস না করে বসে থাকাই উচিত? সমর উৎসুক চোখে ঘরটা খুঁটিয়ে দেখে। নিজেকে অন্যমনস্ক করতে চায় সে।

পাশে বসে অলকা জিগ্যেস করে, কই তুমি তো কিছু বলচো না?

সমরের যেন খেয়াল হয়—বলে, অ্যাঁ, কি বলবো? ঘরটা বেশ সাজিয়েচো? সব আপ-টু-ডেট ফার্নিচার দেখচি।

এ ধরণের কথায় অলকা খুসী হয় কি না বোঝা যায় না। বলে, বাড়িটা বড় হ'লে আরো ভাল হত। পা নড়াবার জায়গা নেই এতে!

এরপর কি বলবে সমর ভেবে পায় না, অলকা এখন একজন হ'য়ে উঠেছে—আরো হয়তো অনেক কথা বলবে নিজের সামর্থ্য জাহির ক'রতে। লোকে থাকবার জায়গা পায় না, ও'র এত বড় বাড়িতে কুলোয় না! না, এসব থাক, শুনে কাজ নেই।—ওর বাড়বাড়ন্ত হ'লে তার কি আসে যায়, কি ক্ষতিবৃদ্ধি তার? সমর চুপ করে থাকে।

অলকা বলে, ঘরের অভাবে অনেক জিনিস তো এমনি পড়ে আছে। রাখবারই জায়গা নেই।

সমর কেমন নির্লিপ্তের মত বলে, তাই নাকি! ঘর না থাকলে ওসব জিনিসের কোন দাম নেই, আবার ওসব জিনিস না হ'লে ঘরেরও কোন দাম নেই।

একটু যেন দার্শনিকতা প্রকাশ পেয়েছে নিজের কথায়, সমর হাসবে কিনা ভাবে।

অলকা হাতের কাছে টিপয়ের ঘেরাটোপটা ঠিক করতে করতে বলে, সত্যি! কেনবার সময় কি আগ্রহটাই না ছিল।

সমর হঠাৎ জিগ্যেস করে, তোমার মা, মানে মাসীমা কোথায়? তাঁকে তো দেখচি না!

নশুর সঙ্গে ছোট মাসীর বাড়ি গেছেন। আজ আসবার কথা আছে। অলকা হয়তো বুঝতে চেষ্টা করে, এতক্ষণ পরে সমর তার মার খোঁজ নিচ্ছে কেন।

সমর বলে, ও। মাসীমা বোধ হয় আমাকে ভুলে গেছেন? নশু কি খুব বড় হ'য়েছে?

অলকা হেসে বলে, হ্যাঁ খুব বড়! তু... যাওয়ার পর থেকে মা একদিনও তোমা... করেননি—বলতেন, তুমিই নাকি তাঁকে ভু... গেছ!

এটা অভিযোগ কিনা সমর বুঝতে পা... না। আর ভেবে দেখলেও কথাটা ঠিক, একজ... ছাড়া প্রবাসে বড় একটা কারো কথা মনে পড়... না। এখন অলকার কথায় মনে হ'চ্ছে, তখ... সেই একজন ছাড়া আর সকলের কথা ম... পড়লে যেন ভাল হ'তো। আজকের মান... বেদনাটা এত করে' মনে হতো না, তা হ'লে।

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সমর বলে... কেন প্রত্যেক চিঠিতে আমি তো মাসীমার কথ... লিখতুম, তুমি জানাওনি?

অলকা যেন আর একটু সরে কাছ ঘেঁ... আসে। স্পর্শ না পেলেও স্পর্শানুভবতো... সমর একটু যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে। অলক... কপট কোপে বলে, বারে, তা বলে আমার চিঠি... মাকে দেখাব নাকি? আলাদা করে লেখনি... কেন?

কৈফিয়ৎ দেবার আর কিছু থাকে না হয়তো। সমর বলে, মায়ের হ'য়ে তুমি ঝগড়া... করবে নাকি?

অলকা হেসে ওঠে। সমরও হাসে, কিন্তু সে-হাসিটা বড় ম্লান। পালিশ-করা ফার্নিচারে হাসির হিল্লোল ওঠে, পালিশ-করা মুখগুলো আত্মম্ভরিতায় কেমন যেন থক্ থক্ করছে।

কিছুতে সমর সহজ হ'তে পারে না। এই হাসি, এই প্রশ্ন, এই কাছে-বসা কিছুই তাকে পুরনো সুরে বাজাতে পারে না। কেন এমন হ'লো? ছ বচ্ছরটা কি অনেক দীর্ঘ না, এই ছ বচ্ছরে অলকার আর্থিক এবং শারীরিক পরিবর্তনটা তার অনভিপ্রেত? দুঃখের মাঝে অলকাকে ফিরে পাওয়া, গ্রহণ-করা যত সহজ হ'তো, আজ তার সুখের মধ্যে পূর্ব সম্বন্ধে হাত বাড়ান তত সহজ নয় বোধ হয়—কেমন কাঙাল-পনা। অলকা দেবার জন্যে বসে থাকলেও সমর নিতে কুণ্ঠা বোধ করে, না না, সে-আর হয় না! বিশ্বাসভঙ্গের বিরূপতা সঙ্গোপনে কোথায় যেন থেকে যায়। কিন্তু কেন বিশ্বাসভঙ্গ, কিসের বিশ্বাসভঙ্গ সমর ঠিক বুঝতে পারে না। সন্দেহ কাকে? অলকাকে না অলকার এই হঠাৎ ঐশ্বর্যকে? কিসে বাজছে? প্রবাসবাসে গত ছ বচ্ছরের চেতনাটা সমরের যত না দীর্ঘ মনে হ'য়েছিল আজ স্বদেশে প্রেমাস্পদের নিকটবর্তী হ'য়ে তার চেয়ে অধিকতর দীর্ঘ মনে হ'চ্ছে। এই মিলন কি মিলন, না বিচ্ছেদের আর এক নাম? এত বোঝা-পড়া করবার ছিল, কিন্তু কিছুই তো জিগ্যেস করা হ'লো না। অলকার বর্তমান

...দুর পরিচয়টাই যথেষ্ট। আর কিছু ...বার দরকার হয় না সমরের।

অলকাও সমরকে বুঝতে পারে না। ...টা এত গম্ভীর কেন? এই কি সে আশা ... আছে? হঠাৎ অলকার মনে হয়, আর ...জনের মত সমরও তাকে সন্দেহ করে, তাই ...র মত উচ্ছ্বসিত হ'তে পারছে না। বিরহ ...লন কি এত নিস্তব্ধ নির্লিপ্ত এবং নিষ্ক্রিয় ... কখনো? সমর কি ভাবছে এত? একটু যেন অভিমান হয় অলকার এই না-বোঝার ...কুলতায়। এক একবার ইচ্ছে করে লোকটার ...পর হুড়মুড় করে' পড়ে যায়—কাছ ঘেঁষে ...কটাকে চেপে ধরে শোফার কোণে। সমরের ... বন্ধ হ'য়ে যদি যায় তো যাক, বলুক সে কি ...দেহ করে, কেন সন্দেহ করে। আজকের ...ম্ভীর্যে তার এতদিনের প্রতীক্ষাকে সমর উপেক্ষা ক'রবে? কেন, কেন? জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করেঃ তুমি কি ভেবেচো, কি ...নেচো—কেন অমন মুখ গোমড়া ...রে' আছ? ...স করে' আচমকা যদি সমরের গালে চড় ...রতে পারে তা হ'লে যেন অলকার রাগ যায়।

সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার নরমও হয়। ...টা নিজের ভেবে নিয়ে অলকার সমরের ...ন ভিজাতে ইচ্ছা করেঃ কেন তুমি অমন করে' ...ছ, লক্ষ্মীটি বল না? আমার দোষ হ'য়েচে —রাগ করো না। এখন তুমি আমাকে নিয়ে ... খুশী করো, যা শাস্তি দিতে চাও দিও। আমাকে নাও, এই ঘরবাড়ি জিনিসপত্র গয়না-গাঁটী সব!

মুখে অলকা জিগ্যেস করেঃ আর তোমাকে নিশ্চয়ই যেতে হবে না, যুদ্ধ তো শেষ হ'য়ে গেচে।

সমর এমনি জবাব দেয়, এখনো আমরা ...ড়া পাইনি—পরশুদিন ফিরতে হ'বে।

পরশু? এর মধ্যে কেন? অলকা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সমরের মুখের দিকে চায়।

সমর নির্লিপ্তের মত বলে, ছুটীর মেয়াদ ফুরিয়েচে। এসেচি তো অনেকদিন।

কি ভেবে অলকা আর কিছু জিগ্যেস করে না। সমর বলে, ভেবেছিলুম যাবার আগে তোমার সঙ্গে বোধ হয় দেখা হ'বে না, যাক্ দেখা হ'য়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

অলকা হঠাৎ বলে বসে, দেখা না হ'লে কি ...ব এসে-যেত?

নিজের বিদ্রূপটা শ্লেষটা নিজের গায়েই বেঁধে—ব্যথা না পেয়ে অলকা যে এমনি জবাব দেবে সমর ভাবতে পারেনি। সমর আমতা আমতা করে, না, তা নয়, তা নয়, তবে—

অলকার কি হয় বোঝা যায় না। হঠাৎ অলকার কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকেঃ তবে কি? ... এলেই পারতে।

সমর বড় অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে। কথাটা এতটা অপ্রিয় এবং শ্রুতিকটু হ'বে সে ভাবেনি। তাড়াতাড়ি বলে, এতে রাগের কি আছে, রাগ করচো কেন?

ম্লান হেসে অলকা বলে, না, রাগ করবো কেন। সত্যিই তো।

দুজনেই চুপ করে' বসে থাকে কিছুক্ষণ। সহজ সরল আলাপের সুযোগ যেন হারিয়ে গেছে। দুজনেই ইচ্ছে করে' সে সুযোগ গ্রহণ করছে না। বৃথা মুহূর্ত বয়ে যাওয়ার মত এই মিলনদর্শন নিশ্চেষ্টতায় কেটে যায়।

এক সময় অলকা বলে, তুমি বস, আমি আসচি, দেখি ওদিকে চায়ের কি হ'লো।

সমর বাধা দেয় না। পিছন থেকে অলকা না-উঠে-যাবার অনুরোধ আশা করেছিল কিনা বোঝা যায় না। তবে তার উঠে যাওয়াটার মধ্যে কোন আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ পেল না।

অলকা উঠে গেলে সমর একলা ঘরে চুপ করে বসে' চোখ দুটোকে উপর নীচে আশে-পাশে এদিক ওদিক ব্যস্তভাবে ঘুরিয়ে ফেরে। যতবার মনে হয়, এই ঘরের সব কিছু অলকার স্বোপার্জিত ততবার মনটা বড় বিরূপ হয়। তার পৌরুষের কোথায় যেন লাগে। তুলনায় নিজের সামর্থ্যটা তুচ্ছ মনে হয়। ভালবাসা পৌরুষের অপমান সহ্য করে না—অলকা এখন আর তার প্রেমিকা নয়, অলকা স্বাধিকার প্রমত্তা-প্রতিদ্বন্দ্বী। ভালবেসে আর অলকাকে ফিরে পাওয়া যাবে না। সে বিদেশে গিয়ে যুদ্ধ করে' আর কি করলো? অলকা তাকে অনেক দূরে ফেলে রেখে গেচে। এই বাড়িঘর সাজানয় অলকা নিজেকে প্রচার করেছে, একান্তভাবে আর সমরের কাছে গোপন থাকেনি। প্রথম প্রেমের সে-লাজুকতা ঐশ্বর্যের কাছে বিক্রী করেছে। অলকা আর সে অলকা নেই।

সমর চোখ তুলে দেখলে, দোরগোড়ায় একটি লোক ঘরে ঢোকবার জন্যে ইতস্তত করছে। ভিতরে সমরকে দেখেই যেন তার সঙ্কোচ। সমর চোখ নামিয়ে নিলে, ভদ্রলোক ঘরের ভিতরে এসে সমরের সামনে সোফায় বসলেন। কিছুক্ষণ দুজনের নিস্তব্ধতায় একটা নিঃশব্দ জিজ্ঞাসা ঘরময় ছোটাছুটি করলে। অপরিচয়ের গাম্ভীর্যটা বড় অস্বস্তিকর। সমর মনে মনে প্রশ্ন করলে, এ আবার কে? অলকার সঙ্গে তার মতই কি পরিচয়?

আগন্তুকের ভাবনার কোন সঠিক সংজ্ঞা নেই—তবে লোকটি কে, মিলিটারী পোষাকে—জানতে পারলে ভাল হ'তো। হঠাৎ অলকার ঘরে মিলিটারী কেন? এ'দের সম্বন্ধে তো অলকার শ্রদ্ধার অন্ত নেই!

সমর না চেয়েই বুঝতে পারে, লোকটি তাকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করছে—অলকার সঙ্গে তার প্রয়োজনের বিষয়টি জানবার জন্যে বিশেষ আগ্রহান্বিত।

একটি 'নারীকে উপলক্ষ্য করে' দুটি অপরিচিত পুরুষের পাশাপাশি অপেক্ষা করা যে কি তা যারা কোনদিন অপেক্ষা করেছেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন। দুজনকে দুজনে না বোঝায় অকারণে একটা অস্থির সন্দিগ্ধচিত্ততা উভয়ের মধ্যেই গড়ে ওঠে—এখন শুধু সন্দেহ করাটাই যেন কাজ। অথচ কেন, দুজনের কেউ হয়তো স্পষ্ট করে' বলতে পারবে না। অলকার বর্তমান সামাজিক অবস্থায় এমন অনেক অপরিচিতের কাজে অকাজে আসা-যাওয়াটা কি অসম্ভব, অভাবনীয়? তবে কেন?

ইতিমধ্যে অলকা এসে ঘরে ঢোকে। হিরণকে লক্ষ্য করে বলে, কখন এলেন?

হিরণ স্মিতহাস্যে বলে, এই আসচি!

অলকা সমরের পাশেই বসে। হিরণবাবুর হাসিটা হঠাৎ যেন মিলিয়ে যায়। তিনি বড় কাজের লোক হ'য়ে ওঠেনঃ এসেছিলুম পালধি কোম্পানীর সেই বইটার সম্বন্ধে কথা বলতে। অনেক পয়সা ওরা খরচ করবে—হিউজ ব্যাপার। যদি রাজী থাকেন—

অলকার হঠাৎ কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়—বলে, আমি ভেবে দেখবো।

প্রসঙ্গটা চাপা পড়লেই সে যেন বেঁচে যায়। হিরণ বলে, আচ্ছা তাই হ'বে—তাড়াতাড়ি নেই। আমি উঠি।

অলকা বলে, এর মধ্যে উঠবেন—বসুন না! ওদের তাড়া না থাকলেও আপনার তাড়া আছে খুব দেখচি।

হিরণ আশ্বস্ত হ'য়ে নিঃশব্দে হাসে। পুনরায় আসন গ্রহণ করে মিলিটারীর পরিচয় মনে মনে আন্দাজ করতে চেষ্টা করে।

নীরব শ্রোতা দর্শকের মত সমর এদের আলাপ শোনে, দেখে। অলকা আজ অন্ততঃ তার কথা ভেবে ভদ্রলোককে বিদায় দিতে পারতো। একলা তার সঙ্গ-সুখ হয়তো অলকার ভাল লাগে না, তাই ভদ্রলোককে বসিয়ে রাখতে চাইলে। অলকার মনোগত ইচ্ছেটা কি?

সমরের কথা যেন অলকার হঠাৎ খেয়াল হয়—হিরণকে দেখিয়ে বলে ওঠেঃ আপনাদের বুঝি আলাপ হয়নি? ইনি একজন ফিল্ম ডিরেক্টর শ্রীহিরণ সান্যাল, আমাকে ইনিই প্রথম সিনেমা করতে উৎসাহ দেন।

পরিচয়ের সুরে একটু যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সমরের কানে লাগে।

সমরকে দেখিয়ে বলে, ইনি, মানে—যুদ্ধে গিয়েছিলেন, আমার খুব—

কথাটা অলকা সম্পূর্ণ করতে পারে না। আমার কি? বলুক স্পষ্ট করে, দোষ কি—লজ্জা কেন? অলকা কি বলে না-বলে শোনবার জন্যে সমরের আগ্রহটা যেন দম আটকে যায়। যুদ্ধে যাওয়ার পরিচয়ে সে আর গর্ব অনুভব করে না।

অলকা পরিচয় শেষ করেঃ ছেলেবেলা থেকে এ'দের সঙ্গে আমাদের খুব মেলামেশা—এ'র বাবা আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন।

এত কথা বলবার হয়তো দরকার ছিল না। কে জানে অলকা এত কথা বললে কেন—সহজ করে সমরের পরিচয় দিলে না কেন? সমরকে সে ভালবাসে এ কথা পরিচয়সূত্রে জানান যায় নাকি? সমরের ইচ্ছে করে প্রতিবাদ করে—নিজেই নিজের পরিচয় দেয়। 'আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন' কথাটায় খুব খোঁচা নেই কি?

হিরণ শুনে হেসে মাথা নেড়ে পরিচয়ের প্রীতি জানায়। জিগ্যেস করে, আপনি কর্তাদন যুদ্ধে ছিলেন?

অনিচ্ছে সত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে সমর বলে, ছ বছর।

হিরণ বলে, তার মানে সুরু থেকে?

হ্যাঁ, সমরের গলার স্বরটা বড় মৃদু আর বিকৃত হ'য়ে বেরোয়।

হিরণের ঔৎসুক্য যেন বাড়েঃ মানে, বরাবর ফ্রণ্টেই ছিলেন?

এবার সমর জোরেই উত্তর দেয়ঃ হাঁ—অপারেশন থিয়েটারেই ছিলুম।

হিরণ চুপ করে' যায়—মনে মনে সমরের সাহসের তারিফ করচে কি না কে জানে। কিম্বা যুদ্ধ-প্রত্যাগত কোন দেশী সৈনিকই আর তত বিস্ময় বা শ্রদ্ধার বস্তু নয়। কেবল অলকার পরিচিত বলেই যেটুকু কৌতূহল। সমরেরও ও প্রসঙ্গ আর ভাল লাগে না।

মাঝখান থেকে অলকা বলে' বসে, তুমি কিন্তু আর যেতে পাবে না!

কথার সুরে সমর যেন একটু বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। অলকা কি সত্যি বলচে? তখনকার অভিমান করার সঙ্গে এখনকার কথার সুরের যেন মিল আছে। ইচ্ছে করলে কি এখন ফিরে পাওয়া যাবে? কিন্তু ভদ্রলোকের কাছে তার পরিচয়টা অমন করে' দিলে কেন—বলতে পারতো না সহজ কথাটা সহজ করে? কিসের বাধা। সমর অহেতুক সন্দেহ করে অলকা তাকে গোপন করছে—ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার কোন সম্বন্ধ আছে। এ কেবল অলকার ছলনা।

'কেন?' জিগ্যেস ক'রতে গিয়ে সমর দ্বিধায় চুপ করে থাকে। মেয়েদের কণ্ঠস্বরে ভোলা কোন কাজের কথা নয়। হিরণ জিগ্যেস করেঃ আবার আপনাকে যেতে হবে বুঝি?

প্রশ্নটা বোকার মত। সমর জবাব দেয়ঃ হ্যাঁ যদ্দিন না ছাড়া পাই তদ্দিন এখানে ওখানে করতে হ'বে। আচ্ছা, ধরুন আর্মিতে আপনি রয়ে গেলেন, তখনো থাকবেন। জেরা করার মত হিরণের কথা শোনায়।

সমরের পৌরুষে যেন লাগে। বলে, কেন থাকবো না? রাখলে তো!

সমর অলকার মুখের দিকে চেয়ে দেখে—হয়তো শুনতে যায় অলকা এখন কি বলে। কিন্তু এ বিষয়ে অলকার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করে না সে।

হিরণ বলে, রাখবে না কেন, আজকাল আর্মি তো ইণ্ডিয়ানিজেশন্ হচ্ছে। যুদ্ধে কত লোক নিলে—বড় পোস্ট ইণ্ডিয়ানকেই দিলে।

তার চাকরি থাকা না থাকা নিয়ে ভদ্রলোকের আগ্রহই যেন বেশী। সমরের ইচ্ছে করে এক ধমক দিয়ে ভদ্রলোককে চুপ করিয়ে দেয়। নির্বোধের মত জবাব দেয়ঃ দেখা যাক, কি হয়।

অলকা তেমনি চুপ করে আছে। কে জানে, এ ভদ্রলোক আরো কতক্ষণ বসবে। হঠাৎ যেন সমরের খেয়াল হয় এমনিভাবে লাফিয়ে উঠে বলে, আমি এখন উঠি। বেলা হ'য়েছে!

অলকা চোখ তুলে বলে, পরশুই তা হ'লে যাবে?

সমর পিছন ফিরে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, দেখি।

এগিয়ে দিতে অলকা নীচ পর্যন্ত আসে। সমরের যে কি হয় বোঝা যায় না—একবারও পিছন ফিরে তাকায় না।......

রাস্তায় নেমে সমর মন ঠিক করে ফেলে, না আর কোন দুর্বলতা নয়। অলকা যা ছিল সে পরিচয়ে আর কোন প্রয়োজন নেই। অলকার বর্তমান জীবনে তার কোন স্থান থাকলেও সেটা খুব শ্রদ্ধার নয়। অলকার জীবনের গণ্ডি এখন অনেক বিস্তৃত! কিন্তু সমর কিছুতেই ঠিক করতে পারে না, সত্যিকারের বিরূপ সে এখন কার ওপর, অলকার ঐশ্বর্য না, হিরণের অস্তিত্ব? এখন এভাবে সরে আসাটা কাপুরুষতা নয় কি? তবে কি করতে সে এসেছিল?—অলকার মধ্যে কি এমন পরিবর্তন সে লক্ষ্য করলে? একদিন যাকে একান্ত নিজের করে' পেয়েছিল আজ কোন কিছু দাবী না করেই তাকে ছেড়ে দিচ্ছে কি বলে? আজ কি প্রমাণ হ'লো—অলকা তাকে চায় না, তাকে ভালবাসে না? কি বুঝলো সে? অলকার বর্তমান স্বাচ্ছল্যে তার কি কোন লোভ নেই? নারীদেহ অধিকার করার কোন পৌরুষ? পৌরুষ কথাটার যথার্থ অর্থ যেন সমর বুঝতে পারে না,—কি মানে কথাটার? যাকগে, না হয় সে কাপুরুষই—তাতে আর হ'য়েছে কি!

তবু মনস্থির করতে সারা দুপুর সমর পাগলের মত শহর পরিক্রমণ করে বেড়ায়। বাড়ি ফেরবার কথা ভুলে যায়। ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই জড়দেহটাকে বিচলিত করে না। নেশাখোরের মত নিজের আবোল-তাবোল চিন্তায় বিভোর হ'য়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় সমর ঘোরে। হিসেব মিলবার কথা নয়, হিসেব গণ্ডগোলের কথাটাই কেবল মনে হায় হায় করে ওঠে। এ যেন চোখ কান বুজে শুধু শুধু আক্ষেপ করা। বার বার সমরের মন বলে, খবরদার, যুক্তি তুমি ধারে কাছে এস না! হিসেব তুমি মিলো না। যা ভাবছি আমাকে ভাবতে দাও—কষ্ট যদি পাই, কষ্টই পেতে দাও। অলকা আমার নয়। অলকা আমাকে চাইলেও আমি অলকার হব না। অলকার এখন সেদিন নেই—তার স্বাস্থ্য ফিরেছে, ঐশ্বর্য হ'য়েছে—তাকে দেখবার এখন অনেক লোক আছে। ভালবেসে ধন্য হবার ছেলেমানষী করবার সময় নেই অলকার। তাছাড়া—

আচ্ছা, অলকা তার মত করে' আর কাউকে ভালবাসতে পেরেছে কি? তার ঐ যৌবন আর কেউ ভোগ করেছে কি? এতো নির্বোধের মত চিন্তা—অলকা তার কথা ভেবে ছ বছর নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ হ'য়ে আছে, তার জন্যে নিজেকে অপরূপ করে তুলেছে। তার ভোগের জন্যেই ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে। না, না সত্যি নির্বোধই সে! তাকে আবার অলকা কোনদিন ভালবাসত? ভুল তার বোঝার ভুল। অলকা এখন যাকে খুশি যখন খুশি ভালবেসে দেহ দান করতে পারে। মিথ্যে সে আক্ষেপ করছে, ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাস্তায় এক সময় সমর অলকাকে লেখা-চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললে, ও চিঠির আর কি দরকার? তার হৃদয়াবেগের কোন প্রমাণ না থাকাই ভাল, চিঠি পেলে অলকার যে কি হ'বে সে তো দেখে এল। এর পর চিঠিটা হাতে করে' ঐ হিরণবাবুর সামনেই হাসাহাসি করবে। ছি। চিঠির টুকরোগুলো বাতাসে উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো—সমর উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়ে রইলঃ দু'এক টুকরো এখনো বাতাসে উড়ছে, ছোট ছোট বলাকার মত।

সামনে একটা ট্রাম ধরে উঠে পড়ে সমরের একবার মনে হয়—এই পাগলের মত রুক্ষ বেশে অলকার কাছে উপস্থিত হ'লে কেমন হয়। জামায় টকসানি গন্ধ বেরিয়েছে, গায়ের ঘামে ভেতরের গেঞ্জীটাও ভিজে গেছে, হাত মুখ চটচট করছে। এই-ই সময়। সোজা গিয়ে অলকাকে সে যদি এখন ভীম আলিঙ্গনে আকর্ষণ করে, অলকার মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে তার গায়ের গন্ধ পাওয়ায় তা হ'লে—। পুরুষ সে, তার পৌরুষে অলকার ব্যক্তিসত্তা নিশ্চয়ই লোপ পাবে। সারাদিনের ক্ষুৎপিপাসা অনায়াসেই শান্ত হ'বে। অলকা কেমন করে সরে যায় সে দেখে নেবে। এরি নাম কি পৌরুষ? একটা লেলিহান কামনা যেন মনের মধ্যে আবার লক্ লক করে' ওঠে। ভোঁতা মিয়োন মনটা যেন আবার সজীব হ'য়ে ওঠে। অলকাকে ভালবাসি না তবু তাকে চাই—টেনে ছিঁড়ে কেড়ে নে

তাকে। বিচার করে নয়, অভিমানে নয়, পশুশক্তিতে অলকাকে নিজের করতে হবে। বয়ে গেল অলকা কি ভাবে না ভাবে, ভেবে। বাসনার উদগ্রতায় সমরের মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। এতক্ষণ অলকার সংগে যে ব্যবহার করে এল তার জন্যে সমর নিজেকে ধিক্কার দিলে। কি নির্বোধ সে। প্রথম প্রেমের জোয়ারে প্রথম যেদিন অলকাকে জোর করে' বুকে টেনে নিয়েছিল সেদিনের কথা সমরের মনে পড়ে—কত সহজে সেদিন অলকাকে অধিকার করা গিয়েছিল! সেদিন আর আজ, অনেকদিন। ইতিমধ্যে অনেক অধিকার গড়ে উঠেছে, অনেক অধিকার ছিন্ন হ'য়েছে। ছ'বছরে অলকা অনেক বদলে গেছে। সেও কি বদলিয়েছে? কিন্তু কিসের পরিবর্তন? হৃদয়াবেগের না মনের? মনটাকে নিয়েই যেন যত সংশয়। নিজেকে মনে ধরাবার দ্বিধায় শেষ পর্যন্ত সমর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে চলন্ত ট্রামের বাইরে মুখ বাড়িয়ে থাকে—গাড়ির ভিতর অপরিচিত অসংখ্য লোকের চাউনিতে কেমন অস্বস্তি লাগে। এত ভিড়ে মানুষ বাস করতে পারে? কোলকাতাটা এই ক'বছরে যেন নরক হয়ে উঠেছে?......

অনেক রাত করে সমর বাড়ি ফিরলে। রাত সে করেনি, এমনিই কখন রাত হ'য়ে গেছে তার খেয়াল হয়নি। কি করবে ইচ্ছে করে তো সে আর রাত করেনি?

বাইরের ঘরে যোগানন্দবাবু অপেক্ষা করছিলেন। ঘরে ঢুকে সমরের মনে হ'লো, বাবা তার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। ছি ছি, বুড়ো মানুষটাকে মিছি মিছি কষ্ট দিলে। এত রাত পর্যন্ত ফেরেনি বলে হয়তো অপেক্ষা করছেন।

দরজা খুলে দিয়ে যোগানন্দবাবু নিঃশব্দে আবার চেয়ারে এসে বসলেন, সমর ভিতরের দালানের দিকে পা বাড়াতে বললেন, আজ ওদিকে খুব গোলমাল হ'য়েছে বুঝি—গাড়ি ঘোড়া বন্ধ?

সমর দাঁড়িয়ে যায়। হঠাৎ যোগানন্দবাবুর কথা বুঝতে পারে না। জিগ্যেস করে, কোনদিকে?

যোগানন্দবাবু একবার উঠে শব্দ করে' চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে বলেন, কেন, তুমি শোননি—ধর্মতলায়?

সমর ফিরে এসে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বলে, কেন কি হ'য়েছে? আমি তো শুনিনি কিছু?

যোগানন্দবাবু উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বলেন, ধর্মতলায় গুলি চালিয়েছে যে—সন্ধ্যের আগে। সমস্ত ট্রাফিক বন্ধ লোকে আসতে পারচে না, হেঁটে ফিরচে। তুমি শোনোনি? এলে কিসে? সমর বিস্মিতকণ্ঠে বলে, কেন?—কই না তো! কি আশ্চর্য!

গম্ভীর গলায় যোগানন্দবাবু বলেন, কেন আবার? ছাত্ররা আই-এন-এ ডে করছিল তাই—ওদের শোভাযাত্রা ডালহৌসি স্কোয়ারে এগুতে দেয়নি!

নিজের মনে সমর যেন লজ্জা পায় সংবাদটা এতক্ষণ না রাখায়। বলে, এর জন্যে গুলি চললো?

আবার কি! দিন দিন অরাজক হ'য়ে উঠছে! বেটারা আবার যুদ্ধে জিতেছে—এবার ধরে ধরে মাথা কাটবে, বিদ্রূপের মত যোগানন্দবাবুর কথা শোনায়।

সমরের মনে হয় বাবা তাকে শোনাবার জন্যেই কথাগুলো বলছেন। বাণীর মুখে শোনা প্রবীরের কথাগুলো মনে পড়েঃ "দাদা কার জন্যে যুদ্ধে গিয়েছিল? ব্রিটিশ সিংহকে আরো শক্তিশালী করতেই মাইনে খেয়ে বেইমানী করে' এসেছে!" কিন্তু বাবাও কি প্রবীরের দলে শেষ পর্যন্ত। সংবাদটার আকস্মিকতায় সমর যেন কেমন থ হ'য়ে যায় বন্ধ ঘরের মধ্যে বিচলিত বাপের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সমর যেন টের পায় আশেপাশে সমস্ত বাড়ির অভিভাবকরাই আজ এমনি করে' অপেক্ষা করছে, সব গৃহের নিদ্রা টুটে গেছে, উদ্বেগে—আশঙ্কায় আর আক্রোশে! কিন্তু হঠাৎ একি! এত ব্যাপার, আর সে সারাদিন কিছুই টের পেল না, সে কি এদেশের কেউ নয়?—এক প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে সমর যেন বোবা হ'য়ে যায়—জড়পিণ্ডের মত দাঁড়িয়ে থাকে। সারাদিন কি করলো সে?

মা টলতে টলতে ঘরে ঢোকেন, যোগানন্দবাবুকে লক্ষ্য করে বলেন, একবার খোঁজ নিলে না—মেয়েটা এখনো ফিরলো না কেন?

যোগানন্দবাবু উত্তর দেবার আগেই সমর বললে, কে খুকী? সে এখনো ফেরেনি। যোগানন্দবাবু যেন বিরক্ত হ'লেন, ফিরবে কি করে সেও শুনলুম শোভাযাত্রায় ছিল, গুলি যখন চলেছে তখন সে আর বাদ গেছে—ব্যস্ত হ'য়োনা, ধৈর্য ধর, কাল সব খবরই পাবে। রাতটা প্রভাত হোক!

সমর বলে, তাকে যেতে দিলে কেন?

যোগানন্দবাবু যেন হাসলেন, আটকাবে কি করে? চারুবাবু বিরুবাবু বিশুবাবু মায় ঐ বেণীবাবুর মেয়েটা পর্যন্ত গেছে! আজাদ হিন্দের নামে তো সবাই মেতেছে—ক'জনকে তুমি আটকাবে?

সমর অবাক হ'য়ে বাবার কথা শোনে—হঠাৎ তার বাবা যেন বড় সংযমী আর আত্মপ্রত্যয়ী হ'য়ে উঠেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মান রক্ষায় নিজের প্রিয়জনদের বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র বিচলিত নন। সেই বাবাকে চেনাই যায় না। মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণায় কি মানুষ মহৎ হ'য়ে ওঠে? আজাদ হিন্দ ফৌজের সাময়িক উদ্দীপনা এমনি করে' দেশের সব লোককে বদলে দিয়েছে?

দেশে ফিরে 'আজাদ হিন্দের' সম্বন্ধে আলোচনাটা যত ছেলেখেলা, হুজুক ভেবেছিল ব্যাপারটা তা নয়—এ নিয়ে নিজের একদা লঘুচিত্ততার জন্যে সমর যেন মনে মনে লজ্জা পায়। 'ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সহ্য করবে না' আলোচনা প্রসংগে একদিন একথা বলায় মনের দীনতাটা সমর এখন বুঝতে পারে। ছি ছি কি নীচতার পরিচয় তারা না দিয়েছে! 'আজকে ছাত্ররা গুলী তুচ্ছ করে বললে, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বিচার করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। চৌধুরীর সংগে বাণীর সেদিনের তেজোদৃপ্ত তর্কবিতর্কের কথা মনে পড়ে—সেদিন বিরক্তি প্রকাশ করে সমর যেন ভাল করেনি।

মুহূর্তের জন্যে সমর কি ভেবে নেয়। ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। পিছন থেকে কাত্যায়নী দেবী বলেন, সারাদিন নাসনি-খাসনি এখন আবার কোথায় বেরুচ্ছিস? রাস্তায় গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছে আবার—ওরে শোন!

গলির মোড় থেকে সমরের গলা শোনা যায়ঃ আসচি।

কিন্তু এত রাত্রে সমর কোথায় চললো? তাকেও কি আজকের উন্মাদনা, মদমত্ততা পেয়ে বসল? বাণীর সংবাদ এনে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন পিতামাতাকে শান্ত করতে চায়?

রাস্তায় বেরিয়ে সমর ঠিক করতে পারে না, কিভাবে অকুস্থলে পৌঁছবে। থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে, হেঁটে যাবে না, গাড়ীঘোড়ার জন্যে অপেক্ষা করবে? আশ্চর্য, এমন পরিচিত রাস্তাগুলো কেমন অচেনা মনে হচ্ছে—এ যেন কোথায় অন্য কোনখানে এসে পড়েছে সে! কয়েক ঘণ্টা আগে যে রাস্তাকে নেহাৎ-ই নির্জীব নিঃসাড় এবং বিরক্তিকর রকমে কুৎসিৎ মনে হয়েছিল, এখন তারা যেন কঠিন এক সম্ভাবনার গাম্ভীর্যে থম থম করছে—রাস্তা বোধ হয় কথা কইবার জন্যে ভেতরে ভেতরে আকুলি-বিকুলি করছে? আর সে ঝিম-মারা নিরানন্দভাব নেই। রাস্তায় এখন কিসের মাদকতা। সমর পা চালিয়ে সামনে এগিয়ে চলে। নেশাখোরের মত পায়ের গতি শ্লথ এবং বিক্ষিপ্ত। আশেপাশে সামনে কোন পথচারী নেই, তবু যেন সমরের মনে হয়, অনেকেই রাস্তার এখানে ওখানে ভিড় করে' দাঁড়িয়ে আছে—ব্যগ্রভাবে সামনে যেয়ে জানতে চাইছে, কি হলো মশাই?—হঠাৎ গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ হয়ে গেল যে বড়? আঁ কি হাঙ্গাম হলো? গুলী চলছে? কেন? কাকে গুলী করছে? বলুন না মশায় কি হলো ওদিকে? নিঃশব্দ জিজ্ঞাসাবাদে সমর থমকে থমকে দাঁড়ায়—পাশ

থেকে ও কারা কথা কইছে? কি জানতে চাইছে?

ঝোঁকের ঘোরটা কেটে গেল—সমর চোখ রগড়ে একবার সামনে চায়।

ধর্মতলাগামী বড় রাস্তাটা বড় খাঁ খাঁ করছে, হঠাৎ ভয়-পাওয়ার মত নির্জন। একি, সমর ভুল শোনেনি তো? কোথায় গণ্ডগোল? ভুতাবিষ্টের মত আলোছায়ায় আশপাশের বাড়িগুলো কেবল দাঁড়িয়ে আছে। না না, ও কিছু না, মনের ভুল। সমর ভাবে হয়তো আরো একটু এগিয়ে গেলে কোনো গাড়ি মিলবে। রাত এখন কটা? অন্ধকারে ঘড়িটা দেখা যায় না। কেবলি মনে হয়, ভুল শোনেনি তো—নিশি পাওয়ার মত এ কোথায় কার খোঁজে চলেছে সে? কেন যাচ্ছে? শাসনকর্তার মারণ অস্ত্রে আজ যদি কেউ মরে থাকে, তার কি আসে যায়! হাত দিয়ে গুলী ঠেকাবে সে? ভাবনা কি তার কেবল বাণীর জন্যেই। বাণী মাততে গেল কেন? যেমন নিজের ইচ্ছেয় গেছে, যাক তার কি?

কিছুদূরে এসে সমরের যেন মনে হয়, ডাইনে একটা গলির মুখে কয়েকটা ছায়া মূর্তি তাকে দেখে সরে গেল। সমর দাঁড়িয়ে গেল: ও কারা?, এত রাত্তিরে কি করছে ওখানে? আবার চলতে আরম্ভ করলে ছায়ামূর্তিগুলো আবার যেন স্বস্থানে ফিরে আসে। কয়েকবার সমর সামনে এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে। শেষে মূর্তিগুলো আর সরলো না—যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কাছে এসে সমর খপ করে একজনের হাত ধরে ফেললে, এই ছোকরা এখানে কি করছো? ওসব কি!

সবিস্ময়ে সমর দেখলে, পায়ের তলায় অনেক আধলা ইঁট আর পাথরের টুকরো জড় করা আছে। সমর জিগ্যেস করলে, এই এসব কি হবে?

আশ্চর্য সমরকে দেখে ছায়ামূর্তিগুলো ভয় পেল না—সমরের প্রশ্নে খানিকক্ষণ কেবল বিহ্বলের মত চেয়ে রইল তার পর এক সঙ্গে হেসে উঠলো। সমর এবার ধমক মেরে জিগ্যেস করলে, এই হাসচিস কেন? এই, এই—এই!

হিহি, খিল-খিল হাসি ছাড়া সমর আর কোন উত্তর পেলে না। মূর্তিগুলোকে সমর যেন চিনলে, মানুষীর গর্ভজাত পথকুক্কুর এরা—অভিভাবকহীন অনাদৃত মানব শিশুরা। কিন্তু এত রাত্রে এরা এখানে কি করছে? ইঁট পাথর জড় করে কিসের অপেক্ষা করছে? প্রবীরের ডেস্টিটুট হোমের কথা মনে পড়ে যায়—প্রবীর বেন বলেছিল, এই রকম ঝড়ে পড়া ছেলেমেয়ে ভবিষ্যতে মানুষ করে তোলবার ভার নিয়েছে তারা। মানুষের শ্রদ্ধার ভালবাসার সম্পর্কটা শুরুতেই এমন অনাদরের, অবজ্ঞার আর অবহেলার হবে কেন? এখন যেন সমরের ধক করে মনে হয়, প্রবীরদের কাজটা প্রকৃতই মহৎ। প্রবীর যা করছে, তার তুলনা হয় না। যুদ্ধে গিয়ে সে এমন হাতি-ঘোড়া কিছুই করেনি। কেন তাকে লোকে বাহবা দেবে, কেনই-বা তার জন্যে মনে মনে সম্ভ্রম পুষে রাখবে? তার যুদ্ধে যাওয়াটা দেশের কোনই কাজে আসেনি। তুলনায় নিজেকে এত ছোট মনে হতে থাকে সমরের। কিন্তু অবাক কাণ্ড, নিজেকে ছোট মনে হওয়ায় আর পূর্বের সে জ্বালা নেই। সে ছোট-ই!

হঠাৎ অদূরে একটা ট্রাক আসার শব্দ হয়—হোঁ-ও, হোঁ-য়-ৎ, হোঁ-ও-ও! শব্দ পেয়ে ছেলেগুলো যে দৌড়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ে, সমর বৃথাই সামনে চেয়ে কিনারা করবার চেষ্টা করে। পায়ের কাছে সংগ্রহ করা ইঁট-পাথর ছাড়া তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার এখন কোন চিহ্নই নেই। যেন ভোজবাজির মত ওরা মিলিয়ে গেল!

গাড়ী থেকে একজন পুলিশ অফিসার নেমে সমরের কাছে এগিয়ে এল। সমরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললে, Excuse me, এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন না আমাদের গাড়ীতে, কোথায় পৌঁছে দিতে হবে?

এত খাতির কেন সমর বুঝতে পারে না। অথচ এই একটু আগে এদের গাড়ীর শব্দ পেয়ে ছেলেগুলো কোথায় লুকিয়ে পড়েছে। তারা ভয় পেয়েছে ভয়ের গন্ধে। সমর কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। চুপ করে থাকে।

পুলিশ অফিসারটি বলে, বুঝেচি, ঐ বস্তির ছেলেগুলো আটকেছিল তো? আসুন আসুন পৌঁছে দিচ্ছি আপনাকে।
We have orders to shot to kill these street dogs. They are very dangerous elements! Pest of the society!

সমর এগোয় না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, পুলিশ অফিসারটি ফিরে যেতে যেতে বলে, সামনে যাবার চেষ্টা করবেন না—আনরুলী স্টুডেণ্টস্ যত সব—কেবল হুজুক, পড়া নেই, শোনা নেই রাতদিন হৈ-হৈ রৈ-রৈ করছে। সাবধানে এগোবেন, আড়াল থেকে ইঁট ঝাড়লেই হলো। ওদের বিশ্বাস নেই। ট্রাবল এহেড্!

অফিসারটি চলে যেতে সমরের যেন খেয়াল হয় তার ইউনিফরম দেখে পুলিশ অফিসারটি সমীহ করে গেল। ইউনিফরম-এর এত গুণ? ছেলেগুলো কিন্তু কানাকড়ি মূল্য দেয়নি তার পোষাকের? পথকুক্কুরগুলোই বোধ হয় তার যথার্থ মর্ম বোঝে। তাকে ঠিকই চিনেছিল। সমর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে। এই নিস্তব্ধ, শঙ্কিত রাত্রে স্তিমিত পথচাওয়া আলোর উদ্বেগে আর উত্তেজনায় সমর নিজেকে নতুন করে উপলব্ধি করে—গত ছ'বছরের ধ্যান-ধারণা সব এই একটি রাত্রের ঘটনাবহুলতার সংঘাতে বদলে যায়: দেশে ফিরে দেশকে যা মনে হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তা নয়; দেশের সম্বন্ধে নীচতা জড়তার অপবাদ আর দেওয়া যায় না। আশ্চর্য পরিবর্তন, অভাবিত সংঘটন! —এখন সমরই যেন অনেক পিছনে পড়ে আছে! সহসা সমরের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—টহলদারী পুলিশের গাড়ী থেকে আগ্নেয় অস্ত্রের ফুৎকার মাঝে মাঝে নৈশ আকাশ চমকে দেয়, মিলিটারী পোষাকের সম্মানটা সমরের আর ভাল লাগে না। এত রাত্রে রাস্তায় রাস্তায় গলির মোড়ে কারা জেগে আছে? ওরা কুকুর না, মানুষ? ওরা মুমূর্ষু, না জীবিত উদ্দাম? প্রবীরের কথা সমরের মনে পড়ে যায়; মোষ বলবো কাকে? একদিন এই মোষেরাই জনপদে ছুটে আসবে, দয়ার জন্যে নয়, নিজের অধিকার বুঝে নিতে।

ছোটভায়ের আদর্শবাদের স্বপ্নমায়ায় সমর সেদিন হেসেছিল। এখন সেই হাসিটা লজ্জার মত মনে খা খা করে। একটা আদর্শকে লক্ষ্য করে এতদিনের প্রতিবাদ বাঁধ ভেঙেছে—পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তনের উপলব্ধিতে সমর কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এ কি চেতনা? অকুস্থানে পৌঁছার জন্যে সমর বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ে—ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে যায়। হঠাৎ চৌধুরীর কথা মনে পড়ে: British Government will not break! কত অলীক আশা চৌধুরীর!

সামনে কোন রাস্তায় 'জয় হিন্দের' আওয়াজ উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের শব্দ হলো। সমর ছুটতে লাগল। খানিকটা এসে আর যেন ছুটতে পারে না, পা দুটো মাটি থেকে কিছুতে ওঠে না—গা হাত পা টনটন করে। রাস্তার ধারে একটা শিরীষ গাছের গুঁড়িতে ভর দিয়ে সমর দাঁড়িয়ে থাকে: মনে হয় এ রাত্রির আর শেষ হবে না, এই জয়ধ্বনি আর রাইফেলের গর্জন চলবে সারারাত! এ কি বিপ্লব? বাণীকে কি করে সে ফিরিয়ে আনবে—তা হ'লে নিজেকেও তো ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়। কিন্তু বাণীর যদি কোন সাক্ষাৎ না মেলে—যদি সে তার সঙ্গে পিছু হটতে রাজী না হয়? না না, কেন সে বাণীকে ফেরাবে—এখন বাণীর জন্যে তো তার গর্ব অনুভব করা উচিত। তার ছোট বোন যা করছে, এদিনের স্মরণাতীতকালেও তার উল্লেখ থাকবে। চৌধুরী বলেছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের সরকার ফাঁসি দেবে, বাণী বলেছিল, দেশের লোক তা সহ্য করবে না। বাণীর কথাটা আজ সত্যি! চৌধুরীর 'লাভিং এ্যাণ্ড হ্যাঙগিং' কথাটা বিদ্রূপ নয়, মস্ত বড় প্রশংসা স্তুতি!

আর এগিয়ে গিয়ে সমর কি করবে? সমরের ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজকের সকালের সারাদিনের ভাবনার সঙ্গে এখনকার

ভাবনার কোন মিল নেই। হঠাৎ তার মানসলোকে পরিবর্তন সম্ভব হলো কি করে? ব্যক্তিগত চিন্তার ঊর্ধ্বে এ সামাজিক বোধ এল কি করে? দেশে ফিরে ছুটি ভোগ করতে করতে—কই সমর তো একদিনও একথা ভাবেনি—বরং দেশের রাজনীতিক রূপটাকে অবহেলাই করে এসেছে, তুচ্ছ ভেবেছে! একি অদ্ভুত, একি আশ্চর্য, একি অভাবনীয়? যদি বিপ্লব বাধে সমর কোন পক্ষে অস্ত্র ধরবে? না, যুদ্ধ করে কোন কিছুরই মীমাংসা এখনো হয়নি। যুদ্ধে গিয়ে কেবল অপমান কুড়িয়েছে, নিজেকে এদের কাছ থেকে পর করে দিয়েছে। কেন যুদ্ধে গিয়েছিল সমর এখন যেন স্পষ্ট করে বলতে পারে না—বলতে লজ্জা পায়। দেশাত্মবোধ ছাড়া কোন সৈনিকের জীবনই গৌরবের নয়। সে-বোধ কি ছিল তার কোনদিন? এখনো কি আছে? দিনের হিসেবটা গুলিয়ে যায়—কতদিন সে দেশে ছিল না? কতদিন সে দেশে ফিরেছে?, আগের দিনগুলো যেন হঠাৎ উল্লম্ফনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে!

Between the Past
And the Present

Towards the Future....
From the Past
To the Present
There's a Future
Out of the Present
Cometh the....
Oh, Memory!

কিছুই মনে করতে পারে না সমর। কতদিন আর সে দেশে ফিরেছে? এই তো সেদিন—স্মৃতির ভার আর তত বোধ হয় না। একি পরিবর্তন, একি উপলব্ধি!

সমরের মনে হলো গাছের তলাটা যেন অন্ধকার হয়ে এল। আবছা আঁধারটা—হঠাৎ আলোর জোর কমিয়ে দেওয়ার মত। সমর চোখ তুলে দেখলে, মাথার ওপর শিরীষ গাছের ডালের ফাঁকে আধখানা চাঁদের পাণ্ডুর মুখটা একটুকরো উড়ো মেঘে ঢাকা পড়েছে—মেঘের আড়াল ডিঙিয়ে চাঁদটা ভেসে ওঠবার জন্যে ছট-ফট্ করছে। মেঘাবরণে নেই কোন ক্ষমা। হঠাৎ চন্দ্রমা কথাটা এমনি মনে আসে সমরের। মনে করতে পারে না, কতকাল চাঁদের মুখ দেখেনি। হ্যাঁ, তা অনেকদিন হবে। এই উৎকণ্ঠিত রাত্রে চন্দ্রালোকিত কোলকাতা শহরটাকে কেমন দেখাবে? বোধ হয় মানাবে না। চাঁদের মুখ থেকে মেঘাবরণ না সরাই এখন ভাল। কি চাঁদের আলো এই দুর্যোগময়ী রাতে? চাঁদ তুমি অস্ত যাও—মাটিতে আজ মৃত্যুর আহ্বান।

আশ্চর্য এখন অলকার মুখটাও মনে পড়ে। সকাল বেলায় দেখা মুখ নয়—অনেকদিন আগের একটা ভীরু লাজুক মুখ। কি ভেবে সমর মনে মনে হেসে ফেলে।

আজকের রাত শেষ হয়ে কালকের দিনরাত পেরিয়ে তবে পরশু। থাক্ না অনেক দেরী, তার জন্যে এখন থেকে ভাববার কি দরকার? পরশু তো আসুক তখন ভাবা যাবে অতঃপর কর্তব্য কি। এই তো সেদিন সে দেশে ফিরেছে, এর মধ্যে এত তাড়া কেন? ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার প্রয়োজন তো তার ফুরিয়েছে।

আজকের রাতের কথা অলকা কি কিছু ভাবছে? বোধহয় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে এখন। কে জানে কি ভেবে সমর এবার শব্দ করে হাসলে। সকালের ঘটনা কি অলকার এখন মনে আছে?

সমাপ্ত।

The Doctrine of Passive Resistance:— By Sri Aurobindo. Arya Publishing House, 63, College Street, Calcutta. Price Re. 1-8.

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল হইতে ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্ববিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেইগুলি একত্র করিয়া এই সুদৃশ্য ও সুচিন্তিত পুস্তকখানা প্রকাশ করা হইয়াছে। সে সময়ের রাজনীতির গগনে আলোক প্রদর্শনের ন্যায়ই ভারতের লক্ষ্যপথের রূপময় সত্তা এই সকল প্রবন্ধে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে লক্ষ্যস্থল লব্ধ হইয়াছে, প্রবন্ধান্তর্গত ভাবধারা তাহাতে প্রভূত সহায়ক হইয়াছিল—একথা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১৮৮।৪৮

নব-সন্ন্যাস—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য প্রথম খণ্ড পাঁচ টাকা ও দ্বিতীয় খণ্ড তিন টাকা।

'নব-সন্ন্যাস' একখানি সুবৃহৎ রাজনৈতিক উপন্যাস। উহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডের পটভূমি ঝরিয়া-বরাকরের কয়লাখনি অঞ্চল, এবং দ্বিতীয় খণ্ডের গল্পাংশের ভিত্তি মেদিনীপুর জেলা। ঊনিশ শ বিয়াল্লিশ সালে ভারতব্যাপী বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। নব-সন্ন্যাসের দুইটি খণ্ডের মধ্যে এই বিপ্লবই হইতেছে সীমারেখা। অর্থাৎ পূর্বখণ্ডে প্রস্তুতিকার্য এবং পরবর্তী খণ্ডে উহার পরিণতির রূপ চিত্রিত হইয়াছে। ভারতের একটি বিশেষ সময়ের পূর্ব-পর ভাবধারাকে উপন্যাসে রূপ দিবার লেখকের এই প্রচেষ্টাকে সাহিত্যে নবোদ্যম বলা যাইতে পারে।

রাণীগঞ্জ-বরাকরের এলাকায় রহস্যময় এক নূতন মাস্টারমশায়ের সঙ্গে টুলু নামক ধর্ম ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তরুণের সাক্ষাৎ হইতে কাহিনীর শুরু। টুলু শেষে শ্রমিকদের ভালোমন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলে এবং অক্লান্তভাবে শ্রমিককল্যাণ কার্যে আত্মনিয়োগ করে। সেই উপন্যাসের নায়ক। নায়িকা বলিতে পারি সাঁওতালী কামিন-মেয়ে চম্পাকে। তবে প্রথম খণ্ডে সে প্রচ্ছন্ন নায়িকা। অপর এক কুলি-মেয়ের সন্তান প্রসবের পর মৃত্যু হয়। সেই পরিত্যক্ত সন্তানটিকে লালন করার ব্যাপারে টুলু ও চম্পার মধ্যে অনুরাগ ও বিরাগ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ঘটিতে থাকে। অতঃপর মাস্টারমহাশয়ের আদর্শে অগ্নিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া টুলু অত্যাচারীদের শাস্তিদানের সঙ্কল্প গ্রহণ করে, গ্রেপ্তার হয় এবং কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়।

দীর্ঘকাল কারাভোগের পর দ্বিতীয় খণ্ডে টুলু তাহাদের সেই লালনকরা ছেলের মাধ্যমে চম্পার সঙ্গে মিলিত হয়। চম্পা তখন আর কামিন-মেয়ে নয়; সে এখন পুরাপুরি সংগঠন-কর্মী।

বিভূতিবাবুর এই উপন্যাসখানা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। মিঠেকড়া নানা রসের গল্প লিখিয়া তিনি হাত পাকাইয়াছেন। তাঁহার হাতে রাজনৈতিক উপন্যাসও সার্থক হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থে নানা ঘটনা ও বিবিধ চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়াছে। লেখক মাস্টার মশাই, টুলু প্রভৃতি আদর্শস্থানীয় পরিচিত বিপ্লবী যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি অজ্ঞাত ধরণের নানা চরিত্রও তাঁহার লেখনী-চালনাগুণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য বইটি পাঠকদিগকে বিচিত্র আনন্দ দান করিবে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।

২২১।২২২।৪৮

নিবেদন—শ্রীমতী ঊষারাণী দেবী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসতীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৫৬নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কবিতার বই। গ্রন্থের মোট ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রায় একশটি কবিতা ও গান দেওয়া হইয়াছে। রচনাগুলি সবই আধ্যাত্মিক ভাবের। ভগবৎ সমীপে আত্মনিবেদনের মূল সুরটিই নানারূপে বিভিন্ন ছন্দ ও ভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবিতাগুলি লেখিকার ভক্তিময় হৃদয়ের সহজ ও অনাড়ম্বর প্রকাশ।

৭।৪৯

বৈদিক সিদ্ধান্ত—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

"বৈদিক সিদ্ধান্ত" গ্রন্থে বেদসম্মত পন্থায় জীবন-চর্যার খুঁটিনাটি লেখক মন্ত্রাদি সহযোগে বিবৃত করিয়াছেন। প্রসঙ্গত সৃষ্টিতত্ত্ব, যজ্ঞ উপাসনা, শুদ্ধিতত্ত্বাদি বর্ণনা করা হইয়াছে। অল্পের মধ্যে বেদবিধি আচারের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ই লেখক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৮।৪৯

বিচিত্র কথা (প্রথম খণ্ড) শ্রীঅমৃত শর্মা প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

শ্রীঅমৃত শর্মা রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বিচিত্র কথা লিখিয়া

আসিতেছেন। এই বিভাগে তিনি নানা জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা, বিজ্ঞান জগতের আধুনিকতম সংবাদাদি এবং দেশ বিদেশের কৌতূহলোদ্দীপক খবরাখবর প্রাঞ্জলভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহারই মধ্য হইতে চয়ন করিয়া আলোচ্য পুস্তকখানা প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বইখানা ছেলেমেয়েদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া উচিত। ২৮৯।৪৮

বিপ্লবের সন্তরথী—শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—জয়ন্তী লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, সূর্য সেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই সাতজন বিপ্লবীর কাহিনী সংক্ষেপে এই পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে। বইটি বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী। বিপ্লবীদের ছবি এবং রঙীন মলাট দেওয়া হইয়াছে। ১৬।৪৯

CIX 1
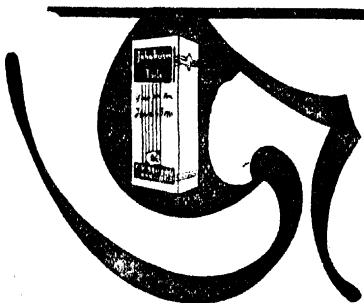
পৃথিবীর বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্প্রতি 'ওয়ার্ল্ড' নামক আন্তর্জাতিক পত্রিকাতে পৃথিবীর বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

রাসেল বলেন—সভ্যতার প্রারম্ভে যখন থেকে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ব্যাপকভাবে সমাজ গঠন করতে সবে শিখেছে তখন থেকেই নিজেদের সমাজ বা দেশকে বাঁচান ও প্রতিবেশীদের অধিনত বা ধ্বংস করার চেষ্টা অনবরত করে এসেছে। প্রত্যেক যুদ্ধের সময় পরস্পরের মধ্যে কোনো আদর্শ সংঘর্ষের কথা জোর করে টেনে আনা হয়েছে এবং কোন আদর্শটি সত্য তা প্রমাণিত হয়েছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হারজিতের দ্বারা।

ভগবানের চিন্তা করা হবে শনিবারে না রবিবারে, শূকরের মাংস অখাদ্য না গোমাংস, সূর্যের উপাসনা করা হবে না খৃষ্টীয় ঈশ্বরকে মানা হবে এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করেছে টিটাস-এর সৈন্যদল বা মোগল বীরেরা অথবা স্পেনীয় খৃষ্টান আক্রমণকারীরা। এখন বাকি আছে নির্ধারিত হতে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ধনতন্ত্রবাদ ভাল না সাম্যবাদ। এই প্রশ্নের মীমাংসা অর্থনীতিজ্ঞরা করবেন না, মীমাংসা হবে যুদ্ধ করে। মানুষের মনের ধারা, তার মধ্যে ভোগলালসা বা নিষ্ঠুরতা বা অন্যান্য দৌর্বল্য প্রাক ইতিহাসের যুগেও যা ছিল এখনো তাই আছে, কেবল তফাৎ হয়েছে এই দিক থেকে যে তার চিরন্তন নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে সাহায্য করার জন্য এখন বিজ্ঞান অভিনব অস্ত্র জোগাচ্ছে।

যুদ্ধের সময় বিজ্ঞান কেবল যে ধ্বংসোপকরণ জোগায় তা অবশ্য নয়, রক্ষণের উপায় সম্বন্ধেও সাহায্য করে। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়েছে কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ধ্বংসের দিকেই বেশী ঝুঁকেছে। সেই সব যুগেই মানুষ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছে যখন রক্ষণের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। আণবিক বোমা বা জীবাণুঘটিত অস্ত্র প্রয়োগের বিরুদ্ধে মানুষকে ভবিষ্যতে রক্ষা করতে পারে এমন কোনো ব্যবস্থার সম্ভাবনা এখনো দেখি না।

আগেকার দিনে বিজ্ঞানীরা স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। নিউটন, ক্যাভেনডিস্, ফ্যারাডে, ডারউইন প্রভৃতি মনীষীরা যে বিষয়েতে তাঁদের অভিরুচি নির্বিচারে তারই চর্চা করেছেন, তাঁদের স্বাধীন চিন্তা বা কর্মে কেউ বাধা দেয়নি। বিজ্ঞানের সাহায্য বিনা এখনকার দিনে যুদ্ধ চালান যায় না রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা বেশ বুঝেছেন। বিজ্ঞানীদের কাজেই পূর্বেকার মত স্বাধীনতা আর নেই। কোনো কোনো দেশে তাদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণই লোপ পেয়েছে, অন্যান্য দেশে লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আজকাল অত্যন্ত মূল্যবান যন্ত্রাদি লাগে, বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞান চর্চার জন্য। আমেরিকার মত ক্রোরপতিদের গভর্নমেণ্টের পক্ষেই বিজ্ঞানীদের উপযোগী সাজসরঞ্জাম জোগান সম্ভব। বিজ্ঞান চর্চার উপর রাজসরকারের নজর পড়েছে। বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের যুগে বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রাধিপতিদের দাসত্ব স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।

বিজ্ঞানীদের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত হলেও বিজ্ঞানই যথার্থ এই অবস্থার জন্য দায়ী। রাজসরকারের অধীনস্থ হওয়াতে বিজ্ঞানীরা প্রকৃত বিজ্ঞানের সেবা না করে সরকারের সেবা করতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্রতন্ত্র মানুষের কোনো উপকারই করে না তা নয়। কিন্তু প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রনীতিই হচ্ছে নিজেদের (এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিত্র দেশীয়দের) সমৃদ্ধ ও বলশালী করে তোলা আর অন্য সকলকে দরিদ্র ও দুর্বল করে রাখা। সেইজন্য যে বিজ্ঞানী নিজের দেশের লোকের কোনো উন্নতির পথ বলে দিতে পারেন তাঁর যত খ্যাতি যে বিজ্ঞানী অন্য মানুষদের মারবার কলকব্জা আবিষ্কার করতে পারেন তাঁরও ততোধিক খ্যাতি। এক সময়ে বিজ্ঞানীদের আদর্শ ছিল নির্লিপ্তভাবে জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানোপার্জন করা। এখন তা আর নেই। বরং পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে বলতে আরম্ভ করেছেন ঐ আদর্শের কোনো মূল্যই নেই। কোনো বিজ্ঞানী আজকের দিনে যদি ইউরেনিয়াম ধাতু সম্বন্ধে কোনো গবেষণা করতে ইচ্ছা করেন তবে তার জন্য যত টাকাই লাগুক না কেন রাজকোষ থেকে অনায়াসে তিনি তা পাবেন। কিন্তু কেও যদি বলেন কার্বন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন তবে টাকা পাবার আগে প্রমাণ দিতে হবে যুদ্ধের কাজে তাঁর এই গবেষণা কোনো সাহায্য করবে কি না।

বিজ্ঞানীদের পক্ষে এই অবস্থা অত্যন্ত অতৃপ্তিকর। কিন্তু এর প্রতিবিধান তাঁদের ক্ষমতার বাইরে। রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করলেই যে সব সময়ে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তা নয়। কিন্তু যতদিন আন্তর্জাতিক বিরোধ আছে—যুদ্ধের সম্ভাবনা যাবে না এবং জাতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র বিশ্বমানবের সমভাবে উন্নতির চেষ্টা কখনই করবে না। কাজেই রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলে বিজ্ঞানীদের সমাজের অহিতকারী না হয়ে উপায় নেই।

মানব সমাজের যে সঙ্কট বর্তমানে উপস্থিত হয়েছে দুই উপায়ে তার নিষ্পত্তি হতে পারে। এক উপায় হচ্ছে বিজ্ঞান এতদিন আমাদের যা কিছু শিখিয়েছে সব ভুলে গিয়ে সভ্যতার একেবারে আদিম অবস্থায় ফিরে যাওয়া। কিন্তু সে অবস্থায় পৌঁছবার পূর্বে মানুষকে অশেষ দুঃখকষ্ট মহামারী ও দুর্ভিক্ষ ভোগ করতে হবে। অন্য উপায় হচ্ছে পৃথিবীর সমুদয় দেশকে একটি মাত্র মহৎ রাষ্ট্রতন্ত্রের শাসনে আনা। এই একমাত্র উপায় আছে যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘুচিয়ে দেবার। যুদ্ধ বন্ধ হলে বিজ্ঞানীরা মানুষ মারবার অস্ত্র আবিষ্কার করার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায়। তারা তখন তাদের সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি সমাজের হিতকর কাজে লাগাতে পারবে। বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত মানুষের যতটুকু শ্রম লাঘব করতে পেরেছে তাতে সাধারণের কতটা উপকার হয়েছে বলতে পারি না, তবে লোকবল বাড়িয়ে যুদ্ধের আয়োজনের প্রচুর সুবিধা করে দিয়েছে সে বিষয় সন্দেহ নেই। যদি যুদ্ধের ভয় একেবারে না থাকে তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কম পরিশ্রমে অনেক বেশী কাজ করতে পারবে, প্রচুর খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসপত্র প্রস্তুত করার অবসর পাবে। তাহলে পৃথিবীর কোথাও তখন দারিদ্র্য থাকবে না।

বিজ্ঞান এরই মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নতি করে ও রোগের প্রকোপ কমিয়ে মানুষের জীবনকাল যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ বন্ধ হলে বিজ্ঞান এদিকে আরো মনোযোগ দিতে পারবে। তবে এই সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে মৃত্যুর হার কমে গেলে পৃথিবীতে জনবাহুল্যের ভয় আছে। তখন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কেবল নয় সর্বত্রই সন্তান জন্মের হারও সেই সঙ্গে কমাতে হবে। যুদ্ধের প্রয়োজনের কথা ভেবে এবং সংকীর্ণ জাতীয়তার প্রভাবে রাষ্ট্রতন্ত্র জন্মহার কমাতে এখন ইচ্ছা করে না। রাষ্ট্রতন্ত্রের এই পাগলামি যখন ঘুচে যাবে তখন বিজ্ঞান মৃত্যুহার নিশ্চয়ই আরো কমিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে জন্মহার যদি না কমাতে পারা যায় তবে পৃথিবীতে খাদ্যের

অভাব ঘটবেই ও বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ থেকে কেউ নিষ্কৃতি পাবে না। কৃষির উন্নতির দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েক বছর হয়ত দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু সন্তান জন্ম নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ মানব সমাজ স্থায়ীভাবে কখনো গঠিত হবে না।

বারুদের আবিষ্কার থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মাত্রই রাষ্ট্রীয় শক্তিকে উত্তরোত্তর বলীয়ান করেছে। পূর্বে রাজসরকার অন্যায় বা অত্যাচার করলে প্রজাবিপ্লবের দ্বারা তার প্রতিকার সম্ভব ছিল। বিজ্ঞান এখন রাজশক্তিকে এতই প্রতাপান্বিত করেছে যে, সাধারণের পক্ষে কোনোরকম বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব নয়। পুলিশ ও সৈনিকের সাহায্যে এখনকার যে কোনো গভর্নমেণ্টের পক্ষে অথবা যে কোনো সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলের পক্ষে বিরুদ্ধচারিদের দমন এমন কি নিশ্চিহ্ন করা অতি সহজ। ইস্কুল, কলেজ ও সংবাদপত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে সরকার খুব সহজেই দেশের লোকদের বুঝিয়ে দিতে পারে যে, সরকার যা কিছু করে দেশের হিতের জন্যই। সরকার অন্যায় করছে এ কথা বলবার কোনো উপায় নেই বা কারো সাহস নেই। আমি বাড়াবাড়ি করে এ কথা বলছি না, বর্তমান রাশিয়াতে এই অবস্থাই দাঁড়িয়েছে। অথচ যখন বলশেভিক বিপ্লব ঘটে তখন বলশেভিকদের সংখ্যা রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা একের বেশী ছিল না।

রাষ্ট্রীয় শক্তি যেখানে অতিরিক্ত প্রবল হয়ে ওঠে দেশের সাধারণকে অজ্ঞ করে রাখার চেষ্টা করে অথবা তাদের এমন বিকৃতভাবের শিক্ষা দেয় যাতে তারা বুঝতে না পারে তাদের উপর কোনো অবিচার হচ্ছে বা তাদের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের দুর্বল করে রাখা হচ্ছে। শিক্ষার ব্যবস্থা খুব ভালই হয়, কিন্তু ইস্কুল-কলেজে যে সব বই পড়ান হয় তা সরকারের অনুমোদিত হওয়া চাই, সাধারণের খোরাক হিসাবে সরকার যা উপযোগী মনে করে বই-গুলিতে তাই থাকে, সত্যের সংগে তার কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাবান রাখার জন্য সাধারণকে কেবল যে বিকৃতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তা নয়, বাইরে থেকে কোনো বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য খবর পাবার সব পথ বন্ধ রাখা হয়। এই অবস্থায় কিছুদিন পরে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি লোপ পায়, চিন্তার ধারা ক্রমশ একঘেঁয়ে গোঁড়ামিতে পরিণত হয়। তখন তারা বই পড়া বুলি কেবল আওড়াতে থাকে, মৌলিক উদ্ভাবনাশক্তি হারিয়ে ফেলে।

যখন একটি স্বল্পসংখ্যক রাজনৈতিকদল সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠে তখন অধীনস্থ লোকদের প্রতি কঠোর এমন কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা বেলজিয়ামের ভূতপূর্ব রাজা লিওপোল্ডকে কংগোর আফ্রিকানদের উপর নিষ্ঠুরতার জন্য নিন্দা করে থাকি, কিন্তু ভুলে যাই আমেরিকায় আজকের দিনেও নিগ্রোরা কী নৃশংস ব্যবহার পায় সাদা চামড়া আমেরিকানদের কাছে। ইংলণ্ডে শ্রমিকরা এতদিন পরে অনেকটা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের উন্নতি করতে পেরেছে, কিন্তু তার আগে তাদের কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। রাশিয়াতে শ্রমিকদের ক্যাম্প-গারদ (Forced Labour Camps) সোভিয়েট সরকারের একটি অত্যাবশ্যকীয় স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব ক্যাম্পে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয় তা কংগোর অত্যাচারের তুল্যই। আসল কথা হচ্ছে মানুষকে দায়িত্বহীন ক্ষমতা দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না, ক্ষমতা পেলেই সে নির্মমভাবে তা প্রয়োগ করবে।

আমরা এখন ভবিষ্যতের যে বৈজ্ঞানিক যুগের কথা কল্পনা করে থাকি, সে যুগে গণতন্ত্র যাতে সজাগ থাকে মানুষকে সতর্ক হতে হবে এবং দেখতে হবে মানুষ যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে। মানুষ যেমন সমাজ গড়তে চায়, সমাজ-বন্ধন ভেঙে দেবার প্রবৃত্তিও তার যথেষ্ট আছে। সমাজ যতই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ওঠে ভাঙার ইচ্ছা ততই সংহত হয়ে আসে। এই ভাঙনের প্রবৃত্তিই কিন্তু রসসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপাদান। একঘেয়ে সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায় রসসৃষ্টির অবকাশ নেই।

এই একটি মহাসমস্যা। স্বেচ্ছাচারিতা থেকে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। স্বেচ্ছাচারিতাকে দমন করে রাখলে সমাজের যেমন অনেক দিকে উপকার ও উন্নতি হতে পারে তেমনি ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে। নিরাপত্তার খাতিরে সমগ্র সমাজ হয়ত একঘেয়ে নিরানন্দে মজ্জিত হয়ে পড়বে। আশা করা যাক আমার এই কাল্পনিক ধারণা ভবিষ্যতে ভুল বলেই প্রমাণিত হবে।

বিজ্ঞান মানুষের মস্ত সহায় হবে যদি যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হয় এবং সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রকৃত বিকাশের কোনো বাধা না থাকে ও সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক অভিব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে মানুষ প্রস্তুত থাকুক মহাবিনষ্টির জন্য।

চীনে শান্তির সম্ভাবনা

চীনের জাতীয় জীবনে শান্তির সম্ভাবনা আবার প্রবলতর হয়ে উঠেছে। বিজয়ী কম্যুনিস্ট পক্ষ প্রদত্ত শান্তির সর্তাবলী যখন প্রেসিডেণ্ট লী সুং জেনের নেতৃত্বে জাতীয় গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করেছিলেন তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, চীনে মারাত্মক গৃহযুদ্ধের অবসান হতে চলেছে। কিন্তু কম্যুনিস্টদের নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের দাবী মেনে নিলে সমগ্র চীন চলে যাবে কম্যুনিস্টদের অধিকারে। তা হলে জাতীয় গভর্নমেণ্টের অস্তিত্ব বলে আর কিছুই থাকবে না। এই নিয়ে চীনের জাতীয় গভর্নমেণ্টের মধ্যেই তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মাঝখানে চীনের জাতীয় গভর্নমেণ্ট সুস্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে শান্তি আলোচনা ব্যাহত হয়েছিল। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুন ফোর নেতৃত্বে গভর্নমেণ্টের একাংশ রাজধানী নানকিং ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টনে। গভর্নমেণ্টের অপরাংশ প্রেসিডেণ্ট লী সুং জেনের নেতৃত্বে ছিলেন নানকিং-এ। আরও শোনা গিয়েছিল যে, কম্যুনিস্টদের অসংগত দাবীর ফলে ডাঃ সুন ফো কম্যুনিস্টদের সংগে আপোষের বিরোধী হয়ে উঠেছেন। অপর দিক প্রেসিডেণ্ট লী এবং তাঁর অনুগামীরা যে কোন প্রকারে হোক কম্যুনিস্টদের সংগে শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী। প্রেসিডেণ্ট লী অনেক চেষ্টা করেও ডাঃ সুন ফো ও তাঁর অনুবর্তী গভর্নমেণ্ট সদস্যদের ক্যাণ্টন থেকে নানকিং-এ ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। ফলে এমন গুজবও রটেছিল যে ডাঃ সুন ফোর মন্ত্রিসভা ভেংগে দেওয়া হবে এবং নতুন মন্ত্রিমণ্ডলী গড়ে তোলা হবে। সর্বশেষ সংবাদে দেখা যায় যে, এই লী-সুন ফো বিরোধের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হয়েছে এবং ডাঃ সুন ফো তাঁর অনুবর্তীদের নিয়ে নানকিং-এ ফিরে এসে শান্তি প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ফলে চীনে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা আবার প্রবলতর হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। যুদ্ধমান উভয় পক্ষ থেকে পরস্পর বিরোধী অভিযোগ প্রত্যাভিযোগ চললেও চীনের রণাঙ্গন বর্তমানে শান্ত। কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে জাতীয় গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে আর একটা সন্দেহের কারণ ছিল এই যে তাঁরা শান্তি প্রচেষ্টার আড়ালে দক্ষিণ চীনে কম্যুনিস্ট-বিরোধী সমরায়োজন করছেন। কম্যুনিস্টদের ধারণা এই যে, চিয়াং কাইশেক চিরদিনের মত প্রেসিডেণ্ট পদ ত্যাগ করেন নি। তিনি শুধু আপোষ আলোচনার সুবিধার জন্যে সাময়িক-ভাবে প্রেসিডেণ্ট লীর উপর কার্যভার অর্পণ করে নিজের জন্মস্থান ফেংহুয়াতে ছুটি উপভোগ করছেন। সময় এবং সুযোগ পেলে তিনি আবার জাতীয় গভর্নমেণ্টের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে কম্যুনিস্টবিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। এইদিক থেকে কম্যুনিস্টদের সন্দেহ নিরসনের জন্যেও জাতীয় গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। চীন ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে চিয়াং কাইশেকের উপর ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুন ফো ২৬শে তারিখে ঘোষণা করেছেন যে জাতীয় গভর্নমেণ্টের অধীন সেনাবাহিনীর সংখ্যাশক্তিও অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, চীনের জাতীয় বাহিনীর সংখ্যা বর্তমানে ৬৩ লক্ষ থেকে কমিয়ে ৪২ লক্ষ করা হয়েছে। চীনের জাতীয় গভর্নমেণ্ট যে যুদ্ধের বদলে শান্তিই চান, এর দ্বারা সেই কথাই প্রমাণিত হয়।

অন্য আর একটি দিক থেকেও শান্তির সম্ভাবনা অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সাংহাই-এর অদলীয় নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে যে শান্তি প্রতিনিধি দল পিপিং-এ কম্যুনিস্ট-দের সংগে শান্তির সর্তালোচনা করতে গিয়েছিলেন তাঁরা একপক্ষকাল আলাপ আলোচনা করার পর ফিরে এসেছেন। এই প্রতিনিধি দল সম্প্রতি নানকিং পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং প্রকাশ যে, কম্যুনিস্টদের প্রদত্ত শান্তি-সর্তাদি সম্বন্ধে তাঁরা যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তাতে প্রেসিডেণ্ট লীর মনে শান্তি সম্বন্ধে নতুন করে আশা দেখা দিয়েছে। কম্যুনিস্ট পক্ষ থেকে নাকি দাবী করা হয়েছে যে, কুওমিনটাঙ গভর্নমেণ্টকে শান্তির সর্তাদি সম্বন্ধে একটি খসড়া কম্যুনিস্টদের কাছে পেশ করতে হবে এবং তারই ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। ডাঃ সুন ফোর একটি ঘোষণা থেকে জানা গেল যে, এই খসড়া প্রণয়নের জন্যে প্রেসিডেণ্ট লী সুং জেন ১০ জন সদস্য সমন্বিত একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির মারফৎই শান্তি আলোচনাও চলবে। কবে এবং কোথায় কম্যুনিস্টদের সংগে শান্তি-আলোচনা আরম্ভ হবে তা অবশ্য আজও স্থিরীকৃত হয় নি। তবে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, এই মার্চ মাসেরই শেষে কম্যুনিস্ট অধিকৃত উত্তর চীনের কোথাও এই আলোচনা বৈঠক বসবে।

সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতি

মস্কো বেতারের সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা হয়েছে। পররাষ্ট্র সচিবের পদ থেকে এম মলোটোভ্ অপসারিত হয়েছেন এবং পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হয়েছেন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব এম আঁদ্রে ভিসনস্কি। বৈদেশিক বাণিজ্য সচিবের পদ থেকে এম্ সিকোয়ানকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর স্থলবর্তী হয়েছেন এম সেনসিকভ্। সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের এই রদবদল যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে কথা না বললেও চলে। এত আকস্মিকভাবে এই পরিবর্তনের সংবাদ ঘোষিত হয়েছে যে, বিশ্ববাসীরা তার ফলে বিস্মিত না হয়ে পারে নি। বিশেষ করে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে তো এ নিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়েছে। হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন করা হল মার্কিন ও বৃটিশ ওয়াকিবহাল মহল তা যেন খুঁজেই পাচ্ছেন না। তাই নানা জনে নানারূপে গুজব সৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছেন। কোন কথা স্পষ্ট করে বলা সোভিয়েট কর্মনীতির অন্তর্ভুক্ত নয় বলে এ ধরণের গুজব সৃষ্টি অত্যন্ত স্বাভাবিক। সোভিয়েট কর্মকর্তারা যা করার নিঃশব্দে করে যান। তাঁদের অনুসৃত কার্য-ক্রমের দরুণ তাঁরা কোন জনমতের তোয়াক্কা রাখেন না বলেই নিজেদের কাজের সংগে কোন-রূপ টিকা জুড়ে দেবার প্রয়োজনও তাঁদের হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইংল্যাণ্ডে এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটতে পারে না। এসব দেশের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে যখন কোন পরিবর্তন ঘটে তখন সংগে সংগে তার হেতু নির্দেশ করে জনমতের সংশয় নিরসনও করা হয়ে থাকে। এই তো কিছুদিন পূর্বে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জর্জ মার্শাল পদত্যাগ করলেন এবং তাঁর স্থলবর্তী পররাষ্ট্র সচিব হলেন মিঃ ডীন্ অ্যাকেসন্। কিন্তু তা নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন সোরগোলের সৃষ্টি হয় নি।

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা আরও মুশকিলে পড়েছেন এই জন্যে যে, সাম্প্রতিক রদবদলের পিছনে সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির কোন মূলগত পরিবর্তন আছে কি না—তা তাঁরা ধরতে পারছেন না। এম মলোটোভকে যদি গভর্নমেণ্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হত তা হলে আর কিছু না হোক এইটুকু বোঝা যেত যে পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে তিনি যে নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন ঊর্ধতন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের তা মনঃপুত হয়নি বলেই তাঁর এ বিড়ম্বনা এবং অতঃপর আমরা সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতিতে একটা বড় ধরণের পরিবর্তন দেখতে পাব বলে আশা করতে পারি। কিন্তু কার্যত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এম মলোটোভ পররাষ্ট্র

সচিবের পদ থেকে অপসারিত হলেও উপ-প্রধান মন্ত্রীর পদে ঠিকই উপবিষ্ট রইলেন। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সোভিয়েট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বড় ধরণের কোন মতভেদ হয় নি। তা যদি না হয়ে থাকে তা হলেই প্রশ্ন ওঠে—তাঁর মত নামজাদা একজন পররাষ্ট্র সচিবকে সহসা এভাবে বদলানোর কি প্রয়োজন হল? গত ১০ বৎসর ধরে তিনি সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির কর্ণধাররূপে বিরাজমান ছিলেন। এম লিটভিনফকে সরিয়ে যখন মলোটোভকে পররাষ্ট্র সচিবের পদে বসানো হয়েছিল তখন রুশ পররাষ্ট্র নীতির একটা বড় ধরণের পরিবর্তন হয়েছিল। গোটা যুদ্ধকালের পররাষ্ট্র নীতির ঝুঁকি গেছে মলোটোভের উপর দিয়ে। সম্প্রতি অবশ্য দুটি ব্যাপারে সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতি ধাক্কা খেয়েছে। তার একটি হল পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংগঠন ও অপরটি হল নরওয়ের পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান। রুশ পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন আজ বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে প্রতিবেশী নরওয়ের মত ক্ষুদ্র রাজ্যকেও সোভিয়েট রাশিয়া নিজের দিকে টেনে আনায় ব্যর্থ হয়েছে। নরওয়ে যাতে পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ না দেয় তার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া একটা পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তির লোভ তুলে ধরেছিল নরওয়ের সামনে। কিন্তু নরওয়ে এই সোভিয়েট প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান শুধুই করে নি—স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, সে পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করে। মলোটোভের এই অপসারণ কি এই দুটি ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত? তাই যদি হয়, তবে বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে আঁদ্রে ভিসনস্কি কি অধিকতর কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন? ভিসনস্কির কার্যক্রমের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করবেন না। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে সোভিয়েট প্রতিনিধিরূপে ভিসিনস্কির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। তাঁর মুখের কথায় তীব্রতা যতই থাক, সেই পরিমাণে তাঁর গঠনমূলক কর্মক্ষমতার কোন পরিচয় আমরা পাই নি। যাই হোক, এ সম্বন্ধে অনাবশ্যক জল্পনা কল্পনা করে ততটা লাভ নেই। কার্যক্ষেত্রে সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির গতি সাগ্রহে লক্ষ্য না করলে বর্তমান পরিবর্তনের গুরুত্ব পুরোপুরি বোঝা যাবে না।

ডারবান তদন্তের প্রহসন

ডারবানে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক ভারতীয়-বিরোধী দাঙ্গার কারণ নির্ণয়ের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যালান গভর্নমেণ্ট শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের নিয়ে গঠিত যে তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন—সেই কমিশন রীতিমত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় সম্প্রদায় এবং আফ্রিকাবাসীরা এই তদন্ত কমিশনকে বর্জন করেছে। বর্জন না করে তাদের পক্ষে উপায় ছিল না। দাঙ্গা বেধেছিল ভারতীয় এবং আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে—ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারাই। অথচ তদন্ত কমিশনাদি গঠন ব্যাপারে তাদের কোন মতামত নেওয়া হয়নি, তবু তারা তদন্ত কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করার চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বিচারকদের অন্যায় জেদের ফলে তাদের এ শুভ প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। কমিশনের শ্বেতাঙ্গ বিচারকরা প্রথমেই রায় দেন যে, কমিশনের কাছে যারা সাক্ষ্য দেবে, তাদের শুধু সাক্ষ্য দানের অধিকারই থাকবে—তারা কাউকে কোন জেরা করতে পারবে না। জেরা করতে না পারলে প্রকৃত ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারিত হবার সম্ভাবনা যে অত্যন্ত কম একথা না বললেও চলে। এই নিয়ে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ভারতীয় কংগ্রেস ও আফ্রিকান কংগ্রেস সম্মিলিতভাবে শ্বেতাঙ্গ তদন্ত কমিশনকে বর্জন করেছে। ফলে কমিশনের কাজ একটা প্রহসন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিশনের বিচারকদের উদাত্ত আহ্বান সত্ত্বেও বে-সরকারী কোন ব্যক্তি তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্যে উপস্থিত হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানও এই কমিশনকে বর্জন করেছে। ডারবানে একদিকে এই তদন্ত কমিশনের অভিনয় চলেছে—অপরদিকে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে চলেছে আফ্রিকাবাসীদের নির্যাতন। চলন্ত ট্রেন থেকে একাধিক ভারতীয়কে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং ভারতীয়দের বাস প্রভৃতিও আক্রান্ত হয়েছে। শান্তি রক্ষার জন্যে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ ও সৈন্যরা আগ্রহান্বিত হলে এই ধরণের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারত না। এইসব দেখে-শুনেই দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম ভারতীয় নেতা ডাঃ দাদু ইংল্যাণ্ড থেকে ঘোষণা করেছেন যে, এ দাঙ্গা পুরোপুরি আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের কারসাজি প্রসূত। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের তাড়িয়ে দেওয়া ফ্যাসিস্ট ম্যালান গভর্নমেণ্টের মূল লক্ষ্য। সহজভাবে এ কাজ করতে গেলে তাঁদের দুর্নাম রটবে। তাই তাঁরা অশিক্ষিত ও সরল আফ্রিকাবাসী জুলুদের লেলিয়ে দিয়েছেন ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। ভয় পেয়ে ভারতবাসীরা দলে দলে স্বদেশে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করবে—এই হল শ্বেতাঙ্গ শাসকদের মনোগত অভিপ্রায়। তদন্ত কমিশনের কাছে ভারতীয় ও আফ্রিকাবাসীরা সাক্ষ্য দিচ্ছে না বলে শ্বেতাঙ্গ সাক্ষীরা মিথ্যা ভাষণের চরম সুযোগ পেয়েছে এবং তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। ম্যালান গভর্নমেণ্টের মিঃ নেল্ নামক একজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী বলেছেন যে, ভারতীয়দের সঙ্গে আফ্রিকাবাসীদের স্বার্থসংঘাতই নাকি এই দাঙ্গার কারণ। তাঁর কাছে অনেক আফ্রিকাবাসী নাকি এই বলে অভিযোগ করেছে যে, ভারতীয়দের প্রভুত্ব তারা মেনে নেবে না। তারা নাকি এমন দাবীও জানিয়েছে যে, গভর্নমেণ্ট যদি জাহাজ ঠিক করে দেন, তবে ভারতীয়রা যাতে সেই জাহাজে উঠে দেশে ফিরে যায় তার ব্যবস্থা তারাই (আফ্রিকাবাসীরা) করবে। এসব কি সরল অশিক্ষিত ও নির্যাতিত আফ্রিকাবাসীদের কথা—না তাদের বনামে আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের কথা? একই শ্বেতাঙ্গদের হাতে ভারতবাসী ও অফ্রিকাবাসীরা সমান শোষিত ও লাঞ্ছিত। সুতরাং শ্বেতাঙ্গদের প্রতি দরদ ও ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ থাকার কোন হেতু নেই কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকাবাসীদের। সে বিদ্বেষ যদি তাদের মনে জন্মে থাকে তবে সেটা সৃষ্টি করেছে জাতিবিদ্বেষী ম্যালান গভর্নমেণ্ট। যেখানে গভর্নমেণ্টেরই বিচার হওয়া উচিত, সেখানে সেই গভর্নমেণ্টের গঠিত তদন্ত কমিশনের রায় বিশ্ববাসীদের মেনে নিতে হবে। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের কারণ আর কি হতে পারে?

৬-৩-৪৯

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস "সূর্যমুখী" 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বাহির হইবে।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 5th March, 1949 [১৮শ সংখ্যা

বিপদের সঙ্কেত

ভারত গভর্নমেণ্ট রেল, ডাক, তার ও টেলিফোন, বিদ্যুৎ, আলো, জল সরবরাহ, প্রভৃতি জনসাধারণের কল্যাণের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জাম নির্মাণ, মজুত ও বণ্টনাদি কার্যে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং প্রধান প্রধান বন্দরে মাল উঠানো নামানো, মজুত করা বা চলাচল-ব্যবস্থায় নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট করা বে-আইনী বিধান করিয়া একটি আইন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই আইন জরুরী ব্যবস্থাস্বরূপেই গৃহীত হইবে এবং ১৯৫০ সালের মার্চ মাস পর্যন্তই ইহা বলবৎ থাকিবে। বস্তুত একদল লোক কিছুদিন হইতে দেশের শাসন-ব্যবস্থাকে যে-কোনভাবে বিপর্যস্ত করিবার দুরভিসন্ধিতে মাতিয়া উঠিয়াছে। শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই, নিছক রাজনীতিক উপদলীয় স্বার্থের দ্বারা ইহারা প্রভাবিত হইয়া চলিয়াছে। ইহাদের চক্রান্তজাল ইহার মধ্যেই বহুদূরে বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ ঘটিয়াছে। রাশিয়ার মতবাদে প্রভাবিত এই কমিউনিস্ট দল চীন এবং ব্রহ্মদেশেরই মত এদেশের স্বাধীন শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া এখানে রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ইহাদের দৌরাত্ম্য এবং দুঃসাহস কতদূর গিয়া উঠিয়াছে, গত ১৪ই ফাল্গুন শনিবার কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী দমদম বিমান-ঘাঁটি, দমদমস্থ গোলা-বারুদের কারখানা, জেসপ কোম্পানীর কারখানা, গৌরীপুরের পুলিশের ফাঁড়ি এবং বসিরহাট মহকুমার সদর থানা, কোষাগার ও জেলখানার উপর সশস্ত্র আক্রমণে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে হানা দিয়া ইহারা লোকজন খুন-জখম করিয়াছে, অস্ত্রাগার ও থানা হইতে বন্দুক লুঠ করিয়াছে, বিমানঘাঁটিতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশী বিজেতাদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ বা অভিযান নয়। যদি তাহা হইত, তবে এমন কাজেও প্রশংসনীয় কিছু থাকিত; ইহাকেও বীরত্ব বলা চলিত; কিন্তু ইহা ঘৃণিত কাপুরুষতা। দেশকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইহাদের এমন দুঃসাহস প্রদর্শিত হয় নাই। এদেশের স্বাধীনতা ধ্বংস করিয়া বিদেশীর গোলামি কায়েম করিবার উদ্দেশ্যেই ইহাদের দৌরাত্ম্য মারমুখো হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। ভারতের আশেপাশে কমিউনিস্টদের দৌরাত্ম্য যেভাবে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, তাহাতে দেশের স্বাধীনতা, জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং শান্তিরক্ষা করিতে হইলে গভর্নমেণ্টকে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিতেই হইবে। স্বাধীনতাপ্রিয়, দেশপ্রেমিক এবং শান্তিকামী মাত্রেই এই ধরণের দুষ্কৃত ও দৌরাত্ম্য দমন করিবার কাজে গভর্নমেণ্টকে যে সমর্থন করিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য। কার্যত কঠোর হস্তে ইহাদিগকে দমন করা ব্যতীত অন্য উপায় কিছুই নাই। দলীয় পরিকল্পনা এবং নির্দেশই ইহাদের কাছে বড়; ইহারা নীতি মানে না, উপদেশ বোঝে না। যুক্তির ধার ইহারা ধারে না। সর্দার প্যাটেল সেদিন ইহাদিগকে দৌরাত্ম্য ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি এ পর্যন্তও বলিয়াছেন যে, যদি ইহারা অতঃপর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এবং হিংসার পথ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি ইহাদের যত কুকার্য, এমন কি, হায়দরাবাদে এই সব কমিউনিস্টদের হাতে দুইশত কংগ্রেস-কর্মী নিহত হইবার কথাও ভুলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, কমিউনিস্টরা সর্দার প্যাটেলের এই উপদেশ [illegible] করেও যে কানে [illegible] না, ইহা বেশই [illegible] যায়। [illegible] বলিয়া কোন বস্তু যে ইহাদের নাই, এ পরিচয় আমরা যথেষ্টই পাইয়াছি। ১৯৪২ সালে ইহারা দেশের প্রতি যে নির্মম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা আমরা ভুলি নাই। দেশের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের গুলীতে যখন প্রাণ দিয়াছে, তখন ইহারা ঘাতকদেরই বলবৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাদের মন্ত্রদাতা গুরু রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে যোগ দিয়াছিল, এজন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরাও ইহাদের গুরুবর্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এদেশকে যাহারা পশুবলে পিষ্ট করিয়াছে, তাহারাই হয় ইহাদের বন্ধু এবং আত্মীয়। রাশিয়ার ইঙ্গিতক্রমে ইহারা যে এদেশের স্বাধীন গভর্নমেণ্টকে ধ্বংস করিতে অবতীর্ণ হইতে দ্বিধাবোধ করিবে না, ইহা একরূপ নিশ্চিতই বলা চলে। এমন অবস্থায় ইহাদের উপদ্রব দলন করিবার জন্য কার্যকর এবং কঠোর ব্যবস্থাই গভর্নমেণ্টকে অবলম্বন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি ধুয়া তুলিয়া গভর্নমেণ্টকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা নিতান্তই অনিষ্টকর এবং ইহাদের পৃষ্ঠ-পোষকতাই তেমন প্রচারকার্যের মূলে রহিয়াছে মনে করিতে হইবে। দেশের স্বাধীনতাই যদি বিপন্ন হয়, তবে জনসাধারণের স্বার্থ বা অধিকারের মূল্য কি থাকে? বৈদেশিক প্রভুত্বের যূপকাষ্ঠে যাহারা দেশ ও জাতিকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহারা দেশের শত্রু। আমরা এই কথাই বলিব। এই সব দেশদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতকদিগকে উৎখাত করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যদি অবিলম্বে ইহাদের উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা কঠোর হস্তে দমিত না হয়, তবে দেশের সর্বনাশ হইবে। দেশের জনসাধারণকে এক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্বে সচেতন হইতে হইবে। জাতির প্রতি, রাষ্ট্রের

প্রতি এবং জনসমাজের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি নিজ নিজ কর্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সক্রিয়ভাবে সমজ ধ্বংসকারী এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, এ শত্রু সামান্য নয়, কারণ, শক্তিশালী বিদেশীর প্ররোচনা এবং প্রশ্রয় ইহাদের পিছনে রহিয়াছে। ইহারা সংঘশক্তিসম্পন্ন ও কূটনীতি প্রয়োগে সুদক্ষ। ইহাদের চাতুরীপূর্ণ প্রচারপদ্ধতি সুদূরপ্রসারী। সংঘবলেই ইহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। দেশ এবং জাতির স্বার্থকে ত্যাগ এবং সেবার পথে জাগ্রত করিয়া তুলিয়া ইহাদের অনিষ্টকর প্রচারকার্য ব্যর্থ করিতে হইবে। বিপদের সঙ্কেত আসিয়াছে। সতর্কতা অবলম্বন করা সকল দিক হইতে প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

বাজেটের ঘাটতি কিছুদিন হইতে বাঙলার মামুলী ব্যাপার ছিল। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর উত্তরাধিকার সূত্রে ঘাটতির জের চলিয়া আসিবে, ইহা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার অনেক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। বাঙলা বিভক্ত হইবার ফলে এখানকার ভূমি, ভূসম্পদ এবং রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ইহার উপর আশ্রয়-প্রার্থীদের পুনর্বসতি বিধানের প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যাও উপেক্ষার বিষয় নয়। এ অবস্থায় বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বেশ মোটা করেই দাঁড়াইবে, অনেকের মনে এমন আশঙ্কাই দেখা দেয়। কার্যত বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে, সে তুলনায় খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সমস্যা যেরূপ জটিল, তাহাতে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা তেমন বেশী নয়। অর্থসচিবের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বাজেটের একটি বৈশিষ্ট্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অবিভক্ত বাঙলার তুলনায় আলোচ্য বাজেটে বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অবিভক্ত বাঙলার শেষ বাজেটে কৃষি বাবদ বরাদ্দ ছিল মোট বরাদ্দের শতকরা ৬.২ ভাগ। আলোচ্য বাজেটে এই বরাদ্দ মোট বরাদ্দের শতকরা ৮.৬ ভাগ। চিকিৎসার খাতে অবিভক্ত বাঙলায় মোট ব্যয়ের শতকরা আট ভাগ পড়িত, আলোচ্যবর্ষে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩.৪ ভাগ, এজন্য খরচ করা হইবে। রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ বাবদ অবিভক্ত বাঙলায় ব্যয় ছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ৩.৪ ভাগ, বর্তমান বাজেটে এজন্য ৬.৪ ভাগ বরাদ্দ হইয়াছে। ইহা ছাড়া, পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য এবং পুনর্বসতি বিধানের জন্য দুই বৎসরে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। অবশ্য আশ্রয়-প্রার্থীদের সংখ্যার অনুপাতে অর্থের এই পরিমাণ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট হইতে যত টাকা পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সবটাই পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব এজন্য ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন; সুতরাং পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ এতদ্দ্বারা অনেকটা নিরাকৃত হইয়াছে। নিগৃহীত রাজনীতিক এবং তাঁহাদের পরিবার-বর্গের সাহায্যের জন্য আর্থিক ব্যবস্থার কথা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সাহায্যের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা যে যৎসামান্য, অর্থসচিব নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, আলোচ্য বাজেটে এই প্রদেশের যে আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা মোটেই সন্তোষজনক নয়। পুলিস বিভাগের ব্যয় এখনও সব ছাড়াইয়া বরাদ্দের বেশী অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। করভারে দেশের লোকে পূর্ব হইতে পীড়িত রহিয়াছে। এমন অবস্থায় নূতন কর বসাইয়া ঘাটতি পূরণ করিবার প্রস্তাব তাহাদের আশ্বস্তির কারণ বাড়াইবে না। বিক্রয়-কর প্রদেশবাসীর সমর্থন লাভ করে নাই, ইহার পরিবর্তন একান্ত বাঞ্ছনীয়। উচ্চহারে বিদ্যুৎকর স্থায়ী করার প্রস্তাবও জনমতের অনুকূল নয়। আয়কর এবং পাট শুল্ক সম্বন্ধে পশ্চিম বাঙলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সুবিচারের অভাব এখনও রহিয়াছে। এই অবস্থায় পড়িয়া অর্থসচিব নূতন কর বসাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শাসনবিভাগে ব্যয়-বাহুল্য এখনও অনেকক্ষেত্রে আছে, সেগুলি হ্রাস করিলে উল্লিখিতরূপ কর বৃদ্ধি না করিয়াই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

পাকিস্থান—ইসলাম রাষ্ট্র

পাকিস্থানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হোক্, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই দাবী পুনরায় উপেক্ষিত হইয়াছে। পাকিস্থান গণপরিষদের অন্যতম প্রতিনিধি অধ্যাপক শ্রীযুত রাজকুমার চক্রবর্তী পাক-পরিষদে এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে সে প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইতে হয়। জনাব ফিরোজ খান নূন এবং সর্দার আবদুর রব নিস্তার এমন দুইজন জাঁদরেল নেতা যে প্রস্তাবের বিরোধী, তাহা পণ্ড হইবে, ইহা তো জানা কথা। প্রস্তাবের বিরুদ্ধতাকারীরা এক্ষেত্রে তাঁহাদের মামুলী যুক্তিই উপস্থিত করিয়াছেন এবং ইসলামের মৌলিক নীতির উদার আদর্শের দোহাই দিয়া প্রতিপক্ষকে এক রকম ধমকাইয়াই নিরস্ত করিতে চাহিয়াছেন। জনাব ফিরোজ খান এই যুক্তি দেখান যে, ইংলণ্ড খৃষ্টান রাষ্ট্র; কিন্তু সেজন্য ইংলণ্ডে যে গণতন্ত্র পদ্ধতি ব্যর্থ হইয়াছে, একথা কেহই বলে না; শুধু পাকিস্থানের ক্ষেত্রেই ইসলাম রাষ্ট্র বলিলেই আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং এই অভিযোগ করা হয় যে, তাহাতে এখানে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকতা ব্যাহত হইবে। বলা বাহুল্য, নূন সাহেবের এমন যুক্তি একান্তই নিরর্থক। ইংলণ্ড শুধু নামে খৃষ্টান রাষ্ট্র, এবং শুধু এই হিসাবেই খৃষ্টান রাষ্ট্র যে, এ রাষ্ট্রের বেশীরভাগ অধিবাসীই খৃষ্টান; কিন্তু ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে খৃষ্টান ধর্মের কার্যত কোন সম্পর্ক নাই। কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে ইহা সত্য নয়। মোসলেম লীগ পুরাদস্তুর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং এই লীগই প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানের সমগ্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। সাম্প্রদায়িকতার মধ্যযুগীয় সংস্কারে সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রভাবিত করিয়া লীগই তাহাদিগকে নাকে দড়ি দিয়া চালায়। লীগের আদর্শ এবং ঐতিহ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া উদার জাতীয়তামূলক মনোভাবের কোন স্থানই নাই। লীগের ডাকে পাকিস্থানের মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িকতা-বোধই স্থূলভাবে সাড়া দেয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বৈষম্যই বড় হইয়া তাহাদের নজরে পড়ে। ইসলামে সাম্যের মৌলিক আদর্শের মূল্য যতই থাকুক, ইসলামের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের বিচারেই পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাকে মর্যাদা দিতে উন্মুখ হয়। অ-মুসলমান সম্প্রদায়কে তাহারা বড় জোর অনুকম্পার দৃষ্টিতেই দেখিতে পারে, সমান অধিকারের মর্যাদায় নয়। পাকিস্থান পাকিস্থানীদের সকলের জন্য, সর্দার আবদুর রব এই কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আদর্শের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়-বিশেষের সংস্কার যতদিন প্রশ্রয় পাইবে, ততদিন রাষ্ট্রনীতিতে তাঁহার এই উক্তি সত্যে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, রাষ্ট্রের নীতি এবং ব্যক্তির মত এক জিনিস নহে। রাষ্ট্রীয় আদর্শে সাম্প্রদায়িকতার ভাবকে বিশেষ স্থান দিলে রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য পরিস্ফুট হইবে, ইহা অনিবার্য। জনসাধারণ ধর্মের স্থূলে নীতিই বড় বলিয়া বোঝে এবং মৌলিক সূক্ষ্ম আদর্শ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সার্থক হওয়া সম্ভব। বস্তুত গণতান্ত্রিক পথে রাষ্ট্রের সমুন্নতি এবং সাম্প্রদায়িকতা এক সঙ্গে চলে না। এই দিক হইতে আধুনিক প্রগতিশীল কোন স্বাধীন রাষ্ট্রেই সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম-সম্প্রদায়-বিশেষের মতবাদের কোন স্থান নাই। প্রকৃতপক্ষে

আবির্ভাব

কানাই সামন্ত

ওগো কে এলে কে এলে আমার
বনের অংগনে
সিন্ধুপারের পথিক? আমার
শিরীষ-চাঁপায় রংগনে
আনন্দেরই দোলা লাগাও,
জনে জনে ডেকে জাগাও—
সে কি তোমার নাই মনে?
যে রাতে হিম-আলয় ছাড়ি
দখিণ-মুখে দিলে পাড়ি
সব খসাবার খোয়াবারই
ডাক দিলে, হাঁক দিলে 'আমার
সংগ নে'।
এলে আবার, এলে আমার
বনের অংগনে!

ঝ'রে গেল, খ'সে গেল
আচম্বিতে
সব আবরণ সব আভরণ
তুহিন-বরন তীব্র শীতে।

রিক্ত কাঙাল ডালে ডালে
আজ কি তবে একই কালে
সাজবে পর্ণপ্রসূনজালে?
করতালির তালে তোমার
কংকণে
জাগাবে গান? জাগাবে প্রাণ
শিরীষ-চাঁপায় রংগনে?
কে এলে কে এলে আমার
বনের অংগনে!

তুমি

গোবিন্দ চক্রবর্তী

আকাশ অসীম আর
অকূল সাগর ঃ
তুমি বুঝি তারও চেয়ে আরো মনোহর।
আকাশের, সাগরের, অসীমেরো সীমা
থাকে যদি;
তবু তুমি গূঢ়-গূঢ় নিবিড় নীলিমা
আর কোনো আশ্চর্যের—
যে আশ্চর্য সীমায় নিঃসীম।

সীমায় নিঃসীম
আরো কোনো বিপুল বিস্ময়
বুঝি আছে মনে হয়।

শান্তন-ধারার রিমিঝিম ঃ
তুলসীতলার বুকে একটি পিদিম—
তারাও ত' কেউ মিছে নয়।
একটি নিগূঢ় নীল শিখা
পার হতে পারেনাক কঠিন পরিখা
আদিগন্ত আঁধারের;

তবু ঢের
দিকভ্রান্ত নাবিকেরে চেনায় ত' তীরঃ
পথিকেরে খুঁজে দেয় একটি কুটীর।

তবে আর
কেন, বলো, দিগন্ত-শিকার!
কি বা হবে সুদূর অগাধ ঃ
দিশাহারা পথের সে সাধ
কেন আর
মন যদি অবিরাম পিয়াসী কূলায়?

কূলায়-পিয়াসী সারা মনঃ
তোমাতেই খুঁজুক না অরণ্য-গহন।
আকাশ-সাগর তার
কূলহারা সকল উৎসবঃ
এ জীবনে তুমিই ত' সব।

তারপর কোনো কালে
আপন খেয়ালে
দীপ যদি উদ্ভাসিত সূর্য-রশ্মি হয়—
জানি তারে চিনে নেবে নিশ্চয় হৃদয়।

জরৎকারু ও কারুণী

যাযাবর বংশের সকলেই অতি বৃদ্ধ হয়েছেন। দ্বিতীয় পুরুষ বা সন্তান বলতে বংশের মধ্যে মাত্র একজন, জরৎকারু। কিন্তু জরুৎকারুও বৃদ্ধ হইতে চলেছেন। আজ পর্যন্ত বিবাহ করে গৃহী হলেন না। অতিবৃদ্ধ পিতৃসমাজের এই এক দুঃখ।

যাযাবর বংশের গৌরব জরৎকারু, পরম জ্ঞানী, বিদ্বান ও তপস্বী। পরম প্রতাপী রাজা জনমেজয় তাঁকে ভক্তিনম্র শিরে অভিবাদন করেন। এক তপস্বীর ব্রত ছাড়া সংসারে ও সমাজে আর কোন কর্তব্য গ্রহণ করতে চান না জরৎকারু। রাজা জনমেজয়ও এ-সংকল্প ঘোষণা করে রেখেছেন, যদি ঋষি জরৎকারু কোনদিন গৃহী জীবন গ্রহণ করেন, যদি তাঁর পুত্র হয়, তবে যাযাবরবংশজ জরৎকারুর সেই পুত্রকেই তিনি তাঁর মন্ত্রগুরুরূপে গ্রহণ করবেন।

কিন্তু এই গৌরব ও সম্মান সত্ত্বেও যাযাবর পিতৃসমাজের মন বিষণ্ণ হয়ে আছে। জরা বা বার্ধক্যের জন্য নয়, বংশলোপের আশঙ্কায়। একমাত্র বংশধর জরৎকারু ব্রহ্মচর্যে ব্রতী হয়ে আছে, এই তাঁদের দুঃখের কারণ। জরৎকারুর তপোবল ও বিদ্যার জন্য তাঁরা গৌরব অনুভব করেন ঠিকই, কিন্তু যখন চিন্তা করেন যে, জরৎকারুর পরে যাযাবর কুলের প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে কেউ থাকবে না, তখনি তাঁদের মনের শান্তি নষ্ট হয়। মনে হয়, তপ ও বিদ্যার পরিবর্তে যদি মূর্খ থেকেও জরৎকারু এক সংসারসঙ্গিনী নিয়ে গৃহী হতেন, সন্তানের পিতা হতেন, তাও শ্রেয় ছিল। জরৎকারুর উগ্র তপস্যা, শুদ্ধতা, সংযম ও তীর্থ-পরিক্রমার পুণ্য, এসবের জন্য হয়তো পৃথিবীতে যাযাবর বংশের নাম থাকবে, কিন্তু যাযাবর বংশ আর থাকবে না। পিতৃপুরুষের বিদেহী সত্তাকে তৃষ্ণার জল দিয়ে তর্পণ করতে কেউ থাকবে না। দুঃখ না হয়ে পারে না।

পিতৃসমাজের দুঃখের কারণ একদিন শুনতে পেলেন জরৎকারু। তাঁরা জরৎকারুকে বললেন—আমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, তোমার গৌরব নিয়ে আমরা সুখে মরবো, কিন্তু শান্তি নিয়ে মরতে পারবো না। তোমার ব্রহ্মব্রতের জন্য আমাদের বংশ লুপ্ত হতে চলেছে।

জরৎকারুর মত তপস্বীর কঠিন মনে কিন্তু এই কথায় কোন সমবেদনার আভাসও লাগে না। পিতৃসমাজ বলেন—তোমার কাছে অনুগ্রহ বা সমবেদনার প্রার্থী আমরা নই। তোমার কর্তব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বংশরক্ষার জন্য যখন আমাদের সমাজে দ্বিতীয় আর কেউ নেই, শুধু তুমি আছ, তখন এ-দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার। সমাজের প্রতি, পিতৃপুরুষের প্রতি কর্তব্য অবহেলা করে তপস্বী হওয়ার অধিকার তোমার নেই। তুমি নিজে কর্তব্যবাদী, বিবেকবান ও বিদ্বান, তুমি জান আমরা যা বলছি, তা তোমারই ধর্মসংগত নীতি।

জরৎকারু কিছুক্ষণ চিন্তা করেন—আপনারা ঠিকই বলেছেন। আপনাদের দ্বিতীয় পুরুষে যখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই, তখন বংশধারা রক্ষার কর্তব্য একান্তভাবে আমারই ধর্ম। কিন্তু আমি যেভাবে আমার জীবন গঠন করে ফেলেছি, তাতে আমার পক্ষে গৃহীজীবন যাপন করা সম্ভব নয়। পতি হওয়া বা পিতা হওয়ার আগ্রহ বোধ হয় আমার শেষ হয়ে গেছে। সংসার অন্বেষণ করে কোন নারীকে জীবনে আহবান করবার রীতি নীতি আমি ভুলে গেছি। আমি বিষয় উপার্জনের পদ্ধতিও জানি না।

পিতৃসমাজ বলেন—কিন্তু উপায় কি? যেভাবেই হউক, তোমাকে বংশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে।

জরৎকারু বলেন—আমি একটা প্রতিশ্রুতি আপনাদের দিতে পারি। আমার জীবনে স্বেচ্ছায় যদি কোন নারী এসে শুধু পুত্রবতী হতে চায়, তবে আমি তার ইচ্ছা পূর্ণ করবো। নিজের ইচ্ছা নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের মনের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি, সম্ভোগের বাসনা আমার তিলমাত্র নেই।

অতিবৃদ্ধ পিতৃসমাজ খুশি হয়ে বলেন—তোমার কাছ থেকে এই আশ্বাসও যথেষ্ট। তুমি ভার্যা গ্রহণে রাজি আছ, এইটুকু সত্য জেনেই আমরা শান্তিতে মরতে পারবো। মরবার আগে আমরা প্রার্থনা করে যাব, এমন নারী তোমার জীবনে সুলভ্যা হোক, যে স্বেচ্ছায় এসে তোমার সাহচর্যে মাতৃত্ব লাভ করবে।

* * * *

ব্রহ্মচারী জরৎকারু, যিনি শুধু আকাশের বাতাসকে ভোজ্যরূপে গ্রহণ করে শরীর ক্ষীণ করে ফেলেছেন, তিনিও পরিণত বয়সে দার গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন—জনসমাজে, দেশে ও দেশান্তরে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। রাজা জনমেজয় শুনে সুখী হলেন।

শ্রদ্ধেয়রূপে, সর্বজনবরেণ্যরূপে যিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে কিন্তু বরমাল্য লাভ করার কোন লক্ষণ বা ঘটনা দেখা দিল না। নিঃসম্পদ এক তপস্যাপরায়ণের সংসারভাগিনী হওয়ার মত আগ্রহ হবে, এমন কন্যা দুর্লভ বৈকি।

কিন্তু আশ্চর্য, দেশান্তরে এক রাজ-প্রাসাদের অভ্যন্তরে এই সংবাদ একজনের বিষণ্ণ মনের চিন্তায় একটা সাড়া সৃষ্টি করে। নাগরাজ বাসুকির মনে।

নাগরাজ বাসুকিও কুলক্ষয়ের আশঙ্কায় বিষণ্ণ হয়ে আছেন। তাঁর পুরুষপরম্পরা বংশ-ধারার ক্ষয় নয়, তার চেয়েও ভয়ানক। সমগ্র নাগ জাতিকেই ধ্বংস করার জন্য রাজা জনমেজয় পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। পরাক্রান্ত জনমেজয়ের রাজনৈতিক বৈরিতা ও আক্রমণের সম্মুখে দুর্বল নাগ-সমাজ আত্মরক্ষা করতে পারে, এমন উপায় আজও আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি বাসুকি। সূক্ষ্ম, কূট ও প্রচ্ছন্ন, সকল রকম প্রয়াস ও উপায়ের এক-একটি পরামর্শ নাগপ্রধানেরা একে একে দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কোনটিকেই জাতি রক্ষার উপযোগী পন্থা বলে বিশ্বাস করতে পারছেন না বাসুকি। বিশ্বাস হয় না, পরাক্রান্ত জনমেজয়ের শক্তিকে এই সব সূক্ষ্ম কূট বা প্রচ্ছন্ন কোন রকমেরই আঘাত দিয়ে পরাভূত করা সম্ভব হবে।

জাতি রক্ষার জন্য এই দুশ্চিন্তার মধ্যে আজ কেন জানি বাসুকি বার বার জরৎকারুর কথা স্মরণ করছিলেন। জনমেজয়ের শ্রদ্ধাস্পদ জরৎকারু, যে জরৎকারুর পুত্রকে ভবিষ্যতে জনমেজয় মন্ত্রগুরুরূপে নির্বাচিত করে রেখেছেন, সেই জরৎকারু পরিণত বয়সে ব্রহ্মব্রতীর রীতি ক্ষুণ্ণ করে বিবাহের সংকল্প করেছেন। স্বজাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা, আর জরৎকারুর বিবাহের সঙ্কল্প—দুটি ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন প্রশ্ন, ভিন্ন ঘটনার সমস্যা। তবু এই দুটি প্রশ্নকে এক করে নিয়ে বাসুকি আজ তাঁর চিন্তার গহনে যেন একটা উদ্ধারের পথ খুঁজছিলেন।

যা খুঁজছিলেন, তারই ইঙ্গিত চিন্তার মধ্যে একটু স্পষ্ট হয়ে উঠতেই, আবার বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন বাসুকি। বড় নির্মম এই উদ্ধারের পথ, বড় কঠিন এই পরিকল্পনা। এক নিরীহা তরুণীর জীবনকে উৎকোচ রূপে বিলিয়ে দিয়ে জাতিকে বাঁচাতে হবে, এমন পরিকল্পনা মুখ খুলে বলতেও মনের মধ্যে শক্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না বাসুকি। কিন্তু উপায় নেই, বলতেই হবে।

হঠাৎ কক্ষান্তর থেকে বাসুকির সম্মুখে এসে দাঁড়ালো কারুণী, বাসুকির ভগিনী। বাসুকি চমকে উঠলেন। যে নির্মম পরিকল্পনার সঙ্গে মনের গোপনে আলাপ করছিলেন বাসুকি, কারুণী কি তাই শুনতে পেয়েছে?

বাসুকির ভগিনী কারুণী আজও অনূঢ়া, কিন্তু এই কারণে বাসুকির বা কারুণীর মনে কোন দুশ্চিন্তা নেই। রূপান্বিতা যৌবন-রুচিরা এমন তরুণীর বরমাল্য গলায় তুলে নিতে আগ্রহ হবে না, হেন পুরুষ নেই সংসারে। কত কান্তিমান যশস্বী ও গুণাধার কুমার কারুণীর পাণিপ্রার্থী হয়ে আছে, কিন্তু কুমারী কারুণীর মনে তার জন্যে কোন উৎসাহ নেই; আনন্দও নেই। দেশান্তরে রাজমহিষী হয়ে জীবন যাপন করার পথ খোলা পড়ে আছে, ইচ্ছে করলেই স্বয়ংবরা হয়ে আজই সেই পথে চলে যেতে পারে কারুণী। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, তারই ভ্রাতৃসমাজ জনমেজয়ের আক্রমণে অচিরে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। নাগ জাতির সংকট, তার পিতৃকুল ও ভ্রাতৃকুলের সংকট। এর মধ্যে কি তার কোন কর্তব্য নেই?

আজ এতদিন পরে যেন একটা কর্তব্যের সন্ধান পেয়েছে কারুণী। সেই কথা জানাবার জন্যেই ভ্রাতা বাসুকির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কারুণী বলে—ভ্রাতা, মহাতপা জরৎকারু পিতৃসমাজের অনুরোধে কুলরক্ষার জন্য পত্নী গ্রহণের সংকল্প করেছেন, একথা তুমি নিশ্চয় শুনেছ?

বাসুকি—হ্যাঁ।

কারুণী—রাজা জনমেজয় জরৎকারুর পুত্রকে ভবিষ্যতে মন্ত্রগুরু রূপে গ্রহণ করবেন, একথাও নিশ্চয় জান।

—হ্যাঁ।

—জরৎকারুকে যদি আমি স্বামীরূপে বরণ করি, তবে?

বাসুকি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—তবে কি?

—তুমি কূটনীতিক, তুমি সমাজবিশারদ, তুমি ভেবে দেখ, তবেই জনমেজয়ের আক্রমণ থেকে নাগজাতিকে বাঁচাবার উপায় হতে পারে।

হ্যাঁ, নিশ্চয় হতে পারে। বাসুকির মনকে এই কল্পনাই এতক্ষণ নির্মমভাবে পীড়িত করে রেখেছিল। ভবিষ্যতের যে জরৎকারু-পুত্রকে জনমেজয় মন্ত্রগুরু রূপে নির্বাচিত ক'রে রেখেছেন, সেই জরৎকারু-পুত্র যদি বাসুকির ভাগিনেয় হয়, তবে উপায় হতে পারে। কারুণীর ক্রোড়ে লালিত সেই জগৎকারু-পুত্র তার নিজের মাতৃকুল ধ্বংসের পরিকল্পনায় কখনই জনমেজয়কে সমর্থন করবে না, বরং এবং অবশ্য সেই একমাত্র জনমেজয়কে নিবৃত্ত করতে পারে। হাঁ, উপায় হতে পারে।

বাসুকির কণ্ঠস্বর বেদনায় গভীর হয়ে ওঠে—আমার ভেবে দেখা না-দেখার কথা ছেড়ে দে কারুণী, তুই নিজের ওপর এতটা নির্মম হোস্ না।

—কিসে নির্মম?

—জরৎকারু নিতান্ত দরিদ্র, প্রায়-বৃদ্ধ, সংসারবিমুখ তপস্বী। তোর মত মেয়ের পক্ষে......।

কারুণী বাধা দিয়ে বলে—সমাজকে বাঁচাবার আর কোন উপায় যখন নেই, তখন আমার মত মেয়ের পক্ষে যা করা কর্তব্য, আমি তাই করছি। তোমার সম্মতি আছে কি না বল?

—আছে। এই একটি উপায় আছে। কিন্তু এতক্ষণ তোর কাছে মুখ ফুটে বলবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না কারুণী। আশীর্বাদ করি......।

—আশীর্বাদ কর, নাগজাতি যেন রক্ষা পায়।

* * * *

বনপথে একা যেতে যেতে হঠাৎ নাগরাজ বাসুকিকে দেখতে পেয়ে আদৌ বিস্মিত হননি জরৎকারু, নাগরাজের অভিনন্দন বাণী শুনে একটু বিস্মিত হলেন, সবচেয়ে বিস্মিত হলেন নাগরাজের অনুরোধ শুনে।

জরৎকারু বলেন—আমার মত বিষয়সম্পদ-হীন বয়োবৃদ্ধ পুরুষের জীবনে অযাচিত দানের মত কুমারী তরুণীর জীবন আত্ম-সমর্পণ করতে চাইছে, শুনে বিস্ময় হয় নাগরাজ।

বাসুকি—বিস্মিত হলেও বিশ্বাস করুন ঋষি, আমার ভগিনী কারুণী স্বেচ্ছায় আপনার মত তপস্বীকেই পতিরূপে বরণ করার জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছে।

জরৎকারু—আমার কিন্তু ভার্য্যা পোষণের উপযোগী বিষয়সম্পদ অর্জনের কোন সামর্থ্য নেই।

বাসুকি—জানি, সে ভার আমি নিলাম।

জরৎকারু—আমি কিন্তু সম্ভোগ সুখের জন্য আদৌ স্পৃহাশীল নহি।

বাসুকি—জানি, সে তো আপনার জীবনের আদর্শ।

জরৎকারু—মাত্র পিতৃসমাজের কাছে প্রতি-শ্রুত সত্য রক্ষার জন্য আমি কুলরক্ষার সংকল্প গ্রহণ করেছি।

বাসুকি—জানি, সে তো আপনারই কর্তব্য।

জরৎকারু—তবু, আশংকা হয় নাগরাজ। এভাবে পত্নী গ্রহণ করার মধ্যে একটা দীনতা আছে। আমার কুলরক্ষার ব্রতে সহচরীরূপে যিনি আসতে চাইছেন, তিনি আমার সঙ্গে আচরণে প্রিয়তা ও সম্মান রক্ষা করতে পারবেন কি?

বাসুকি—আমি আশ্বাস দিতে পারি ঋষি, আমার ভগিনীর আচরণে আপনি কোন অপ্রিয়তার প্রমাণ পাবেন না।

জরৎকারু—আমি নিজেকে জানি বলেই একটা কথা জানিয়ে রাখি। আপনার ভগিনীর আচরণ যেদিন আমার কাছে অপ্রিয় বোধ হবে, সেদিনই আমি চলে যাব, এবং আর ফিরে আসবো না।

বাসুকি—তাই হবে।

* * * *

বিবাহ হয়ে গেল। তপস্বী জরৎকারু ও রাজকুমারী কারুণীর বিবাহ। এ বিবাহে বরমাল্য বিনিময়ের সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের কোন প্রশ্ন ছিল না। লগ্নক্ষণে শঙ্খধ্বনিতে বরবধূর অন্তর ধ্বনিত হবার কোন কথা

ছিল না। মাঙ্গলিক বৌদিকা আলিম্পনে রঙীন হলেও তার মধ্যে অনুরাগের রঙ ছিল না। একজনের উদ্দেশ্য পিতৃকুলরক্ষা, আর একজনের উদ্দেশ্য ভ্রাতৃকুল রক্ষা, তারই জন্য এই বিবাহ। সমাজনীতির মর্যাদা রাখবার জন্য এক তপস্বী তাঁর ব্রহ্মব্রত ক্ষুণ্ণ করে এক সুযৌবনা নারীকে গ্রহণ করলেন। রাজনীতির মর্যাদা রাখবার জন্য এক রাজকুমারী তরুণী এক বয়োবৃদ্ধ তপস্বীকে গ্রহণ করলেন।

নাগপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এক রমণীয় পুষ্পাকুল উদ্যান, সৌরভপূরিত বাতাস আর পাখীর কলকূজন। তারই মধ্যে এক সুশোভন নিকেতনে জরৎকারু ও কারুণীর অভিনব দাম্পত্যের জীবন আরম্ভ হলো।

চোখের জল কঠোর হস্তে আগেই মুছে ফেলে এই ঘটনাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিল কারুণী। সে জানে এই দাম্পত্যে হৃদয়ের স্থান নেই। এক বয়োপ্রাপ্ত তপস্বীর সাহচর্য বরণ করে তাকে শুধু পুত্রবতী হতে হবে। এ ছাড়া এই দাম্পত্যের আর কোন তাৎপর্য নেই।

জরৎকারুও জানেন, তাঁর কর্তব্য কি; সংকল্প কি? যাযাবর পিতৃসমাজের কাছে প্রদত্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি মাত্র তাঁকে রক্ষা করতে হবে। কারুণী নামে নাগরাজ ভগিনী পুত্রবতী হবে, এক তরুণীর জীবনে মাত্র এইটুকু পরিণতি সফল করার প্রয়াস ছাড়া আর কোন অভীপ্সা তাঁর নেই। সংকল্প অনুসারে এই বিবাহিত জীবনকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিত, জরৎকারু ঠিক সেইভাবেই গ্রহণ করলেন। কুলরক্ষার আগ্রহ ছাড়া আর সব আগ্রহ তাঁর মনে অবান্তর হয়েই রইল।

মমতা এখানে নিষিদ্ধ, অনুরাগ অপ্রার্থিত, হৃদয়ের বিনিময় অবৈধ। স্পৃহাহীন সম্ভোগ, কামনাহীন মিলন। কারুণীর দেহটুকুই শুধু জরৎকারুর প্রয়োজন, তার বেশী কিছু নয়। শুধু প্রাণিবৎ দেহগত সাহচর্য। বিবাহের পর জরৎকারু নিরন্তর এবং প্রতি মুহূর্তে কারুণীকে বক্ষোলগ্ন করতে চান, বক্ষোলগ্ন করে রাখেন।

কারুণীর মনে হয়, এক বিরাট পাষাণের পুত্তলিকা যেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, যে বুকে আগ্রহের কোন স্পন্দন নেই। জরৎকারুর এই কঠোর আলিঙ্গনে কারুণীর অধর শীতাহত কমলপত্রের মত শিউরে ওঠে। কোন আবেগের স্পর্শে নয়, একটা প্রতিবাদ যেন স্ফুরিত হতে চেষ্টা করেও থেমে যায়।

দুঃসহ বোধ হলেও একটা আশা ধরে রেখেছে কারুণী, একদিন না একদিন জরৎকারুর এই প্রেমহীন পৌরুষের অবসান হবে, পতিধর্মের আবির্ভাব হবে। কারুণীর দেহের স্পর্শকে সহধর্মিণীর স্পর্শ বলে অনুভব করার মত হৃদয় লাভ করবে জরৎকারু।

জরৎকারুকে পতির সম্মান দিয়ে আপন করে নেবার আশা রাখে কারুণী। সুযোগ পায় না, তবু সুযোগের অন্বেষণ করে। নিতান্ত শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার আহ্বান ছাড়া জরৎকারুর কাছ থেকে আর কোন সহব্রতের আহ্বান আসে না, তবু কারুণীর অন্তরাত্মা প্রতীক্ষায় থাকে। জরৎকারু যদিও কোনদিন বলেন না, তবু তাঁর পাদ্য অর্ঘ্যের আয়োজন করে রাখে কারুণী। জরৎকারুর এই তৃষ্ণাহীন কামনা, আগ্রহহীন লালসা ও আকুলতাহীন সম্ভোগের প্রতিজ্ঞা মেঘাবৃত দিনের অন্ধকারের মত একদিন মিথ্যা হয়ে যাবে। নিজের ইচ্ছায় আহৃত শোভাহীন ভাগ্যকে নতুন করে সাজিয়ে তুলবার চেষ্টা করে কারুণী। মাত্র কুলরক্ষার সংস্কার ছাপিয়ে জরৎকারুর আচরণে স্বামীর মন বড় হয়ে উঠবে, নিজেকে জরৎকারুর ধর্মপত্নীরূপেই বিশ্বাস অটুট রেখে, ভবিষ্যতের জন্য আশা ধরে রাখে কারুণী।

সেদিন সন্ধ্যে হয়ে আসছিল, পশ্চিম আকাশের রক্তিম আলোকের অবশেষটুকুও আর ছিল না। কারুণীর মনে পড়ে, স্বামী এখন সন্ধ্যা-বন্দনায় বসবেন। কোথায় আসন করে দিতে হবে, কি কি উপকরণ সংগ্রহ করে রাখতে হবে, সেই কথাই ভাবছিল কারুণী। কিন্তু জরৎকারু হঠাৎ উপস্থিত হয়ে কারুণীর হাত ধরলেন। কারুণীর বুক একটা অস্পষ্ট শংকায় দুরু দুরু করে উঠলো। পরমুহূর্তে আর কোন অস্পষ্টতা রইল না। জরৎকারু কারুণীকে বুকে জড়িয়ে ধরে অক্ষণে অবিন্যস্ত কুসুম-মাল্য দলিত করে অরচিত শয্যায় উপবেশন করলেন।

কোনদিন যা করেনি কারুণী, আজ বাধ্য হয়ে তাই করতে হলো। জরৎকারুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। নম্রস্বরে প্রতিবাদ করে—আপনি ভুল করছেন ঋষি, এখন আপনার সন্ধ্যা-বন্দনার সময়।

জরৎকারু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখে এক নিদারুণ লজ্জা ও অপমানের জ্বালা রক্তময় আভার মত ফুটে ওঠে।

জরৎকারু বলেন—একথা স্মরণ করিয়ে দিতে তোমার এত আগ্রহ কেন?

কারুণী—আমি আপনার স্ত্রী, আপনাকে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার আগ্রহ আমারই থাকবে ঋষি।

—তোমাকে সে অধিকার আমি দিই নি।

—তবে আমার অধিকার কি?

—শুধু আমার আচরণের সাহায্য করা, বাধা দিয়ে আমাকে অপমান করা নয়।

—মাপ করবেন ঋষি, কারুণীর দেহ-মন আপনার ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে। আপনারই নিত্যদিনের ধর্মাচরণের জন্য আপনার সন্ধ্যা-বন্দনার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। আপনাকে অপ্রিয় মনে করি না ঋষি, আপনি প্রিয় বলেই, এইটুকু বাধা দিয়ে ফেলেছি। বলুন আমি কি অন্যায় করেছি?

—তোমার ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয় কারুণী। মহাতপা জরৎকারুকে আজ তোমার কাছ থেকে কর্তব্যের উপদেশ শুনতে হলো, সেটা তিরস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। আমারই ভুলে জীবনে এই তিরস্কার করবার সুযোগ তুমি পেয়েছ। তপস্বী জরৎকারুর জীবনে এই প্রথম তিরস্কারের আঘাত। কিন্তু এই ভুলকে আর প্রশ্রয় দিতে পারি না, আমি যাই।

আর্তনাদ করে ওঠে কারুণী—ঋষি!

জরৎকারু—বৃথা আমাকে ডাকছো কারুণী।

কারুণীর দুটি বেদনায় সজল হয়ে ওঠে—আপনার স্ত্রী, আপনার সুখ-সহচরী জীবন-সঙ্গিনী, আপনার ধর্মভাগিনী কারুণী আপনাকে ডাকছে, আপনি যাবেন না।

জরৎকারু—এত বড় সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দিই নি কারুণী, আমার জীবনে এসবের কোন প্রয়োজন নেই। তবু ধন্যবাদ তোমাকে, তুমি আমার ভুলের গ্লানি স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।

জরৎকারু চলে যাচ্ছিলেন। কারুণী কিছুক্ষণ পলকহীন দৃষ্টি তুলে সেই নির্মম অন্তর্ধানের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নারীত্ব কোন মূল্য পেল না, তাঁর পত্নীত্ব কোন মর্যাদা পেল না। যাক, জেনে শুনে এই নিয়তির কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিল কারুণী।

হঠাৎ মনে পড়ে, তার ভ্রাতৃকুল রক্ষার প্রতিজ্ঞা ও পরীক্ষাকে ব্যর্থ করে দিয়ে এক মমতাহীন পৌরুষ যেন সদর্পে চলে যাচ্ছে।

লুণ্ঠিত লতিকার মত কারুণীর কোমল মূর্তি হঠাৎ অদ্ভুত এক আবেগে সর্পিণীর মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। মোহ নয়, মমতা নয়, কর্তব্য। কারুণীও স্মরণ করে তার কর্তব্যের কথা, তার প্রতিশ্রুতি ও সংকল্পের কথা। ত্বরিতপদে ছুটে এসে কারুণী জরৎকারুর পথরোধ করে দাঁড়ায়। জরৎকারুর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকে—ঋষি।

লজ্জানম্রা নারীর দৃষ্টি নিয়ে নয়, পতি-প্রেমিকা সহজীবনপ্রার্থিণী ভার্যার সেবাকুল দৃষ্টি নিয়ে নয়, এক অসম্বৃত নারীদেহ যেন শুধু পুরুষকামিকারূপে জরৎকারুর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

কারুণী বলে—আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছেন ঋষি।

—প্রতিশ্রুতি? কার কাছে?

—আমার কাছে নয়, আপনার পিতৃসমাজের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে প্রতিশ্রুতি সফল না হওয়া পর্যন্ত আমার আলিঙ্গনের মধ্যে আপনাকে থাকতে হবে।

সন্ধ্যাদীপের আলোকে সেই মূর্তির দিকে

তাকিয়ে জরৎকারু তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে কারুণীর হাত ধরলেন।

* * * * *

জরৎকারু কখন চলে গেছেন, কেন চলে গেলেন, নাগরাজ বাসুকি প্রথমে কিছুই জানতে পারেন নি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে জাগরিত নাগ-প্রাসাদের এক কক্ষে বসে দূতমুখে যখন সংবাদ শুনলেন, কারুণীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে জরৎকারু চলে গেছেন, তখন কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনে হলো, জনমেজয়ের আঘাত আসবার আগেই এ নাগপ্রাসাদ যেন নিজের লজ্জায় অপমানে ও ব্যর্থতায় চূর্ণ হয়ে গেছে।

কারুণী কই? বাসুকি উঠলেন। প্রাসাদের অলিন্দ চত্বর পার হয়ে, উপবন-বীথিকার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে এক নিকেতনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। দগ্ধ ও নির্বাপিত সন্ধ্যাদীপের আধার কালিমাখা হয়ে পড়েছিল, তারই পাশে নিঃশব্দে বসেছিল কারুণী।

বাসুকি ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করেন—জরৎকারু কেন চলে গেলেন কারুণী?

কারুণী—আমার ভুলে।

বাসুকি হতাশায় আক্ষেপ করে ওঠেন—সব ব্যর্থ করে দিলি কারুণী।

কারুণী—না, সব সার্থক হয়েছে।

বাসুকির চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—সার্থক? তার অর্থ?

কারুণী—তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, আমিও আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। জরৎকারুর সন্তানের মাতা হওয়ার দায় আমার জীবনে এসে গেছে, আশীর্বাদ কর।

হর্ষে ও আনন্দে বাসুকির চিত্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কারুণীকে আশীর্বাদ করে বলেন —সমাজকে ধ্বংস থেকে তুই বাঁচালি কারুণী, তোর এ গৌরব অক্ষয় হবে।

বাসুকি খুশি হয়ে চলে যান। কিছুক্ষণ পরে কারুণীও তার অবসন্ন দেহভার তুলে উঠে দাঁড়ায়। এই সার্থকতা ও গৌরবকে ভাল করে বুঝবার জন্যেই চারদিকে একবার তাকায়।

বোধ হয়, তার নিজের জীবনের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো কারুণী। দেখতে পায়, স্বামীহীন নিস্তব্ধ এক সংসারের নিকেতনে আজীবন শূন্যতা, আর সন্ধ্যা-দীপের আধারে লাঞ্ছিত নারীত্বের কালিমাখা অপমান। ব্যর্থতা ও অগৌরব।

বক্সা ক্যাম্প • অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্মৃতি হইতে অনেক বড় বড় ঘটনা সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু বকসা ক্যাম্পের একটি ভোরের স্মৃতি এখনও মন ধরিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাই।

দুর্গের ঘণ্টায় সাতটা বাজিলে তবে আমার ঘুম ভাঙ্গে, ইহার আগে জাগিবার কোন প্রয়োজনই বোধ করি না। ভোরের বাজার নাই, স্কুল-কলেজের পড়া নাই, অফিসের চাকুরী নাই, কারও খাইও না পরিও না, অর্থাৎ সপ্তাহে সাতটাই রবিবার। পুণ্যের জোর ছিল, তাই "ডেটিনিউ" হইয়াছি, এক কথায়--চুটাইয়া পেন-সন ভোগ করিতেছি।

সেদিন যথাসময়ে ভোর হইয়াছে, তেমনি আমার যথাসময়ে ঘুমও ভাঙ্গিয়াছে এবং জাগিয়া যথানিয়মে আবার ঘুমাইতেছিলাম। মানে, পাশ ফিরিয়া পাশ বালিশটা টানিয়া লইয়া চোখ বুজিয়া আরাম করিতেছিলাম।

চোখ বুজিয়া দৃশ্য বন্ধ করা চলে এবং ইচ্ছা হইলে চোখ বন্ধ করাও চলে, কিন্তু কর্ণেন্দ্রিয়ের উপর মানুষের তেমন কোন অধিকার নাই। ইচ্ছা হইলেই কর্ণ বন্ধ করা তো পরের কথা, ইচ্ছা হইলে যে পশুদের মত কানটা নাড়িব, মানুষ হইয়াও আমাদের সে সুবিধাটুকু নাই। মানুষ হওয়া মানেই যে বেশী সুবিধা পাওয়া, ইহা যেন কেহ মনে না করেন।

কাজেই, বিছানায় শুইয়াই বারান্দায় গলার আওয়াজ শুনি। ব্রাহ্মমুহূর্তে-জাগারদল ভোরের বাতাস হইতে অগস্ত্যটানে স্বাস্থ্য শুষিয়া লইবার জন্য বাহির হইয়াছেন বুঝিলাম। ব্রাহ্মমুহূর্তের ব্রহ্মচারী দলের আওয়াজ কানে আসে, একবার ভাবি উঠিয়া পড়ি, খানিকটা পাহাড়ী বাতাস গিলিয়া আসি, কিন্তু আত্মাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইল না, অর্থাৎ আরামের শয্যা কিছুতেই রেহাই দিতে চাহিল না।

এমন সময়ে কানে আসে বারবেলের শব্দ, ডাম্বেলের ঠংঠাং, মুগুরের সোঁ-সোঁ, বৈঠকের দুপদাপ। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কম্বলের ঘরে বিজয় দত্তের দল ঢুকিয়াছে।

কম্বলের ঘর মানে ব্যায়ামশালা। ব্যারাকের ঘরের মধ্যেই খানিকটা জায়গা কম্বলে ঘিরিয়া লইয়া বিজয় এই ব্যায়ামাগার বানাইয়াছে। দেয়ালে দুই দুইখানা বৃহৎ আয়নাও টানাইয়াছে, সম্মুখে দাঁড়াইলে পায়ের নখ হইতে চুলের ডগা পর্যন্ত তামাম শরীরটাই দেখিয়া লওয়া চলে। কয়েক জোড়া মুগুর, বারবেল, ডাম্বেল ইত্যাদি সাজসরঞ্জামও সে সংগ্রহ করিয়াছে।

আর সংগ্রহ করিয়াছে স্বাস্থ্যান্বেষী একটি দল, যাঁহারা বিজয়ের তত্ত্বাবধানে এই কম্বলের ঘরে স্বাস্থ্যের সাধনা করিয়া থাকেন। বিরানব্বই পাউণ্ড ওজনের একটি শরীর ও বগলে একটি ল্যাঙ্গোটী লইয়া পান্নাবাবু (মিত্র) পর্যন্ত দুইবেলা এই কম্বলের ঘরে নিয়মিত প্রবেশ করিয়া থাকেন।

কম্বলের ঘরের দুপদাপ, সোঁ-সোঁ, ফোঁস-ফোঁস কানে আসিতে লাগিল। হঠাৎ ভয়ানক একটা আওয়াজে চমকাইয়া উঠিলাম, ভারী একটা বস্তু পতনের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ফণীর (মজুমদার) আর্তচীৎকার—'বাবারে গেছিরে।'

ফণীর চীৎকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কে একজন ছুটিয়া আসিয়া মশারির মধ্যে আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল। বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, কমাণ্ডাণ্ট ব্যাটা বাঁশডলা দিতে ব্যারাকে ঢুকিল না তো?

কহিলাম, "কি উপেনবাবু (দাস) কি হোল? ব্যাপার কি?"

উপেনবাবু বলিলেন, "দৈত্য মুগুর ছুড়ে মেরেছে। কপাল ঘেঁষে ফসকেছে, কিন্তু বুকের অর্ধেকটা রক্ত শুষে নিয়ে গেছে।"

বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম এবং অকুস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নিক্ষিপ্ত গদা যথাস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে-দৃশ্য দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না।

বলির পাঁঠা নিশ্চয় দেখিয়াছেন, কাজেই আপনাদের বুঝিতে কোন অসুবিধা হইবে না। মরা ছাগলের চোখ যদি আপনাদের দেখা থাকে, তবে দৃশ্যটি ষোল আনাই আন্দাজ করিয়া লইতে পারিবেন। ফণী তেমনি চোখমুখ লইয়া তাহার লোহার খাটিয়ার একটা পাশ চাপিয়া ধরিয়া আছে এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। চোখে চোখ পড়িতেই সানুনাসিক সুরে, ফণী নস্য ব্যবহার করিত, যাহা বলিল, তাহার চেয়ে ক্রন্দনও ভালো ছিল।

আমাকে দেখিয়াই ফণী বলিয়া উঠিল, "বাবা বলতেন, এত লোক মরে, আর এ ব্যাটা একেবারে অমর হয়ে জন্মেছে, যমেরও অরুচি। এত সয়েও টিকে গেছি। শেষে কিনা এখানে

এ-ব্যাটা আস্ত যম হয়ে ঢুকেছে, আমাকে সাবাড় না করে ছাড়বে না।"

"কার কথা বলছিস?"

"আর কার কথা? তোমার গুণধর বন্ধুর কথা।"

কহিলাম, "কে? বিজয়?"

উত্তর হইল, "এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়।"

এখানে উল্লেখ থাকে যে, বিজয় শুধু আমারই নহে, ফণীরও গুণধর বন্ধু, স্কুলের ক্লাশ থ্রি হইতেই আমাদের বন্ধুত্বের আরম্ভ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে?"

চটিয়া গিয়া উত্তর দিল, "কি হয়েছে?" আজ যে গদার চোটে চ্যাপটা হইনি, সে আমার বরাত। এখানে আর একদণ্ডও নয়। আজ ফসকেছে বলে যে কালও ফসকাবে, তার কি গ্যারাণ্টি আছে শুনি? অভ্যাসে হাতের তাক আরও পাকা হবে না?"

সম্মুখে দণ্ডায়মান ঘরের চাকরটির উপর দৃষ্টি পড়িতেই ফণী বলিল, "ও বাবা লালজী, তুম উধার খাড়া হ্যায় কাঁহে? এধারে আসতে নেহি পার? ধর না ব্যাটা, খাটটা ও কোণামে নিয়ে যাই।"

বলিয়াই আমার দিকে ফিরিল এবং কহিল, "আর তুইই বা ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে আছিস কোন আক্কেলে? গদা মারবার বেলা যত বন্ধু। ধর—"

কহিলাম, "কোথায় যাবি?"

"এঘর ছেড়ে যেতে পারলেই ভালো হত। আবার পার্টি অনুযায়ী ঘর ভাগ করে বসেছে, কোন্ ঘরেই বা নেবে? কারো সঙ্গে তো আর সুবাদ রাখনি যে, অসময়ে জায়গা দেবে। ধর—"

খাটিয়া ধরিয়া কহিলাম, "কোথায় যাবি, তা তো বল্লি না?"

—"চল, ঐ কোণায় যতীন দাশের সীটের পাশে যাই, ওর মুগুর ভাঁজার রোগ নেই। শোন, এখনই একটা চিঠি পাঠিয়ে দে।"

বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, "চিঠি? কাকে?"

"কমাণ্ডাণ্টকে। লিখে দে, ঘরের মধ্যে ডন বৈঠক কি? এটা তো খোট্টার খোঁয়াড় নয়, ভদ্দরলোকের থাকবার জায়গা।"

এমন সময় খোট্টার খোঁয়াড় মানে কম্বলের ঘর হইতে বিজয় বাহির হইয়া আসিল। সারা গায়ে ঘর্মের গঙ্গোত্রীধারা, হাতে একটা টাওয়েল।

কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "গদা ছুড়লি কেন?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনিলাম, "ছুড়িনি, ফসকে গেছে।"

শুনিয়াই ফণী খাটিয়া ছাড়িয়া দিয়া খ্যাঁকাইয়া উঠিল, "ফসকে গেছে! এ কি গরু পেয়েছ যে, বুঝিয়ে দিলেই হোল? অন্যের মাথা তাক করে ফসকায় কেন? হাতের কাছে নিজের মাথাটা পছন্দ হয় না? ফসকে গেছে—"

বলিয়া আমাকে ধমক দিল, "ছেড়ে দিলি কেন? ধর—"

বিজয় কহিল, "এতো আর হামেশা হয় না। আজ accidentally—"

শেষ করিবার সুযোগ না দিয়া ফণী পূর্ববৎ খ্যাঁকাইয়া উঠিল, "অহো, কত দুঃখ যে, হামেশা হয় না, accidentally—, আজ যদি accidentally একটা accident হোত?"

বিজয় উত্তর দিল, "তাতে কি, মরতে তো একদিন হবেই।"

ফণী আনন্দে নাচিয়া উঠিল, "ওহো হো, একেবারে তপোবনের ঋষি-উবাচ, একদিন তো মরতেই হবে! এতই যদি টনটনে জ্ঞান, তবে আর ও হাঙ্গামা কেন? দড়ি দিচ্ছি, ঝুলে পড় না, আপদ যাক্।"

শুনিয়া বিজয় হো হো হাসিয়া উঠিল। উপস্থিত সকলেও হাসিতে ফাটিয়া পড়িল।

ফণী কহিল, "আবার হাসিস্ কোন্ আক্কেলে, লজ্জা করে না?"

বিজয়ের কিন্তু লজ্জার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। হাসিতে হাসিতেই স্থানত্যাগ করিল।

ফণীকে কহিলাম, "খাট সত্যি সরাবি?"

প্রশ্নটায় ঘৃতাহুতি পড়িল, সেকেণ্ড কয়েক তেরছা দৃষ্টিতে আমাকে দেখিয়া লইয়া তারপর চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল, "কেন, ঠাট্টা বলে মনে হচ্ছে? যা কাজে যা। এই লালজী ধর।"

উপেনবাবুও খাটের একধার ধরিয়া বলিলেন —"না, সরাই ভালো। কে জানে, আবার যদি ছোটে।"

ফণী কহিল, "এর মধ্যে যদি নেই, যে পর্যন্ত আমার মাথাটা ছাতু না হয়, সে পর্যন্ত রোজ ফসকাবে, তুই দেখে নিস। প্রাণ নিয়ে জেল থেকে বেরুতে পারলে হয়।"

ফণীর খাটটা যথাস্থানে সরাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেই বিজয়ের মুখোমুখি পড়িয়া গেলাম।

জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মাঠের গেট কটায় খুলবে জানিস?"

—"সাড়ে ছয়টায়।"

—"যাই মাঠে বেড়িয়ে আসি।" বলিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইল।

কহিলাম, "এই, কমলা পেলি কোথায়?"

টাওয়েলের মধ্যে কয়েকটি কমলা জড়ানো, তাহার লাল রংটা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

উত্তর দিল, "তোকে তিনটে করে হাসপাতাল থেকে দিচ্ছে দুদিন যাবৎ।"

"কই, আমি তো জানি না।"

"ডাক্তারকে বলে আদায় করেছি। দুদিনের ছয়টা জমেছিল। মাত্র পাঁচটা নিলাম।"

কহিলাম, "মাত্র পাঁচটা নিলি কেন, মাত্র ছ'টা নেনা। বাকী কয়টাতেই আমার চলবে।"

শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। বুঝিলাম, রসজ্ঞান আছে। ফণী যে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, টের পাই নাই। বিজয় তখন দরজায় পা দিয়াছে, পিছন হইতে ফণীর গলা শোনা গেল —"চোর। তোকে জেলে দেওয়া উচিত।"

বিজয় দরজা হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "থাবি?"

ফণী কিন্তু সত্যই জবাব দিল, "থাবি? ক্যান, দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পার না?"

বিজয় টাওয়েল হইতে একটা কমলা লইয়া ফণীকে ছুড়িয়া দিল এবং দক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ন্যায় কমলাটাকে ফণী ক্যাচে লুফিয়া লইল। উপেনবাবুও হাত বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু পিছনে ছিলেন বলিয়া হাতটা ততদূর পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।

ফণী কহিল, "ছটার মধ্যে মাত্র পাঁচটা তো নিয়েছিস, উপেনকে একটা দে।"

"ওটাই দুজনে ভাগ করে খা," নির্দেশ দিয়া বিজয় বারান্দা ধরিয়া অদৃশ্য হইল।

সেদিনের মুষলপর্বটা ভালোয় ভালোয়ই শেষ হইয়াছিল, অর্থাৎ ফলপর্বে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সর্বত্র শেষটা একপ্রকার হয় না। অনেক শুভ আরম্ভই অপঘাতে শেষ হয়, অনেক জাতকই সূতিকাগারে প্রথম ও শেষ নিঃশ্বাস দুইই টানিয়া থাকে। প্রমাণস্বরূপে একটি শোচনীয় ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমরা হরেক রকমের লোক ছিলাম এবং হরেক রকম প্রতিভা লইয়াই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলাম। অতএব, আমাদের মধ্যে সাহিত্যিক থাকিবে, ইহা মোটেই বিচিত্র বা অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বরং সাহিত্যিকের সংখ্যাটা যেন একটু বেশীই ছিল। আর, বাঙ্গালী মাত্রেই কবি, একথা তো প্রবাদবাক্যেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বাহিরে থাকিতে কর্মের ঘানিতে ঘুরিয়া ঘর্ম ব্যয় করিতেই সময়টা খরচ হইয়া যাইত, জেলে আসিয়া প্রতিভা প্রয়োগের প্রচুর সময় এবার আমরা পাইয়া গেলাম। প্রকাশ্যে যাঁহারা সাহিত্যচর্চা করিতেন, খোঁজ লইলে দেখা যাইত যে, তাঁহাদের চেয়ে তুলনায় গুপ্ত-সাধকদের সংখ্যাটাই সমধিক ছিল।

যাঁহারা সাহিত্যিক বলিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র লজ্জা বোধ করিতেন না, তাঁহারা প্রায়ই একত্রিত হইয়া আড্ডা জমাইতেন। শাস্ত্রেই আছে যে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, অর্থাৎ গেঁজেল গেঁজেলকে চিনিয়া লয়। তারপর যাহা হয়, তার নাম গাঁজাখোরের আড্ডা।

তেমনি আড্ডা একদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের সীটে বসিয়াছিল। পঞ্চাননবাবু ও

আমার দুইজনের দুই খাট যুক্ত অবস্থাতেই থাকিত, কারণ তাদের নিয়মিত আড্ডার এটি ছিল স্থায়ী আসর।

সেদিন আসরে উপস্থিত ছিলেন অতীন রায়, সুরপতি চক্রবর্তী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, নলিনী বসু, প্রমথ ভৌমিক এবং আমরা তিন বন্ধু—কালীপদ, পঞ্চানন ও আমি। সিগারেট ও চায়ের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মস্তকগুলির মধ্যে প্রেরণা পাক দিয়া উঠিল এবং হৃদয়ে উৎসাহ গা মোড়ামুড়ি দিয়া জাগ্রত হইল।

এক সময়ে কে একজন প্রস্তাব করিলেন যে, এভাবে সময় নষ্ট করা আমাদের অকর্তব্য।

আমরা মাথা নাড়িয়া অভিমতটা সমর্থন করিলাম। প্রস্তাবক অতঃপর বলিলেন যে, আমাদের আটজনে মিলিয়া একটি উপন্যাস রচনা করা কর্তব্য।

নলিনী বসু সঙ্গে সঙ্গে অ-জাত উপন্যাসের নামকরণ করিলেন, "নামটা হবে অষ্টবজ্র"।

ভাবী উপন্যাসের নামও সমস্বরে সমর্থিত হইয়া গেল। রাম না হইতে রামায়ণ হইয়াছিল, কাজেই আমরা নূতন বা অদ্ভুত কিছু করিলাম না। মাত্র আদি কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম।

সমস্যা দেখা দিল উপন্যাসের আখ্যানবস্তু লইয়া। অবশেষে আমি প্রস্তাব করিলাম যে, একটি জারজ ছেলেকে সংসারে ও সমাজে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, দেখি অষ্টবজ্রের অষ্ট-আঘাতে তিনি কোন অষ্টবক্র মূর্তি পরিগ্রহণ করেন।

সুরপতি চক্রবর্তী উল্লাসের সহিত ঘোষণা করিলেন, "বহুৎ আচ্ছা। আমিই ব্যাটাকে প্রথম আসরে আনয়ন করিব।"

সুরপতিবাবুর সাহসে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এখানে একটি খবর দিয়া রাখি। ডেটিনিউদের মধ্যে যে কয়জন লেখকের লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত, তন্মধ্যে সুরপতিবাবুর কলমটাই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার মনে হইয়াছে।

সুরপতিবাবু আরম্ভ করিবার ভার নিলেন। তাঁহার পর কে কে লিখিবেন, তাহাও সাব্যস্ত হইয়া গেল। এখন শুধু এইটুকু স্মরণে আছে যে, সপ্ত মহারথীর হাতের মার খাইয়া নায়ক যখন মুমূর্ষু অবস্থায় পরিত্যক্ত হইবেন, তখন আমি আসিয়া অষ্টম আঘাতে অর্থাৎ মড়ার উপর খাড়ার ঘা দিয়া তাহাকে খতম করিব। নিজের উপর এই বিশ্বাসটুকু ছিল যে, মড়াকে চেষ্টা করিলে নিশ্চয় মারিতে পারিব।

আসর ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিতেই টের পাইলাম যে, খবরটা ইতিমধ্যেই ক্যাম্পে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বীরেনদা বারান্দাতেই ছিলেন, লণ্ঠন জ্বালিয়া লোহার খাটিয়াতে দাবার আসর বসিয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া বীরেনদা বলিলেন, "এই যে অষ্টবজ্র।"

আমরা খুব গোপনে আলাপ করি নাই এবং আমাদের বক্তব্য বেশ উঁচু গলাতেই আমরা আসরে পেশ করিয়াছিলাম। গোপন মন্ত্রণাটাও দেয়ালের কানে যায়, আর আমাদের প্রকাশ্য সংকল্প সর্বত্র ঘোষিত হইবে, ইহাকে অধিক কিছু বলিয়া আমরা মনে করিলাম না। অর্থাৎ, খবরটা সকলে জানিয়াছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিতই হইলাম।

নির্দিষ্ট দিনে আসর বসিল, সুরপতি চক্রবর্তী উপন্যাসের প্রথম কিস্তি আসরে পেশ করিলেন, মানে পড়িয়া শুনাইলেন। উপন্যাস যাঁহার নিজেকে শেষ করিতে হইবে না, শুধু আরম্ভ করিবার দায়িত্বটুকুই যাঁহার উপর ন্যস্ত, তাঁহার সুবিধা নিশ্চয় অধিক। সুরপতিবাবু নিশ্চিন্ত মনে বেপরোয়াভাবেই উপন্যাসের আদি পর্ব রচনা করিলেন।

দ্বিতীয় পর্বের দায়িত্ব কাহার উপর ছিল ঠিক মনে নাই। এইটুকু মনে আছে যে, সন্তোষবাবু, পঞ্চাননবাবু, প্রমথবাবু এবং অতীনবাবুও নিজ নিজ পর্ব রচনা করিয়াছিলেন এবং আসরে তাহা পঠিতও হইয়াছিল।

অষ্টপর্বের পঞ্চপর্ব শেষ হইল, কিন্তু একটা "কিন্তু" আসিয়া দেখা দিল। আমরা আবিষ্কার করিলাম যে, রচনা অগ্রসর হইয়াছে অর্ধেকের অধিক, কিন্তু আখ্যায়িকা বা ঘটনা মোটেই অগ্রসর হয় নাই এবং নায়ক তাহার ভ্রূণাবস্থার মধ্যেই একটি একাকার মূর্তি-হীনতায় অপেক্ষা করিতেছে।

ডিমে পক্ষিণীমাতা তা দেয়, ফলে খোলার তরল পদার্থটুকু শনৈঃ শনৈঃ বিহগমূর্তি গ্রহণ করিতে থাকে এবং একদিন ঠোঁট, পালক, ঠ্যাং ইত্যাদি লইয়া একটি শাবক খোলা ভাঙ্গিয়া বহির্গত হইয়া আসে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে প্রকৃতির এই নিয়ম লঙ্ঘিত হইল। আমাদের পঞ্চতপার উগ্র মানসতাপে উপন্যাসের খোলার মধ্যেকার বাষ্পীয় পদার্থটুকু বাষ্পীয়ই রহিয়া গেল, একটি সর্বাঙ্গ মূর্তি তো দূরের কথা, একটা মাংসস্তূপ বা কবন্ধ মূর্তিতে পর্যন্ত তাহা দানা বাঁধিল না।

আমরা অষ্টবজ্র ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। অষ্টবজ্র সম্মেলনের এই পরিণতি দর্শনে আমাদের উৎসাহ একেবারে দমিয়া গেল। উপন্যাসের নায়ক বা কাহিনী সম্বন্ধে আমরা আশা ত্যাগ করিলাম।

'অষ্টবজ্র' আমাদের হাতযশে 'অষ্টরম্ভা'তেই অবশেষে শেষ হইল। আমরা 'হরিবোল' দিয়া অসমাপ্ত উপন্যাসের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়াছিলাম। (ক্রমশ)

বিজ্ঞমুখের কথা

সংসারের ঝামেলা যতই পোহাতে হোক আর পারিবারিক অশান্তি যতই তীব্র হোক, বংশ-গৌরব আমরা সহজে ছাড়তে পারি না এবং ছাড়তে চাই না। মনের কোণে, অলক্ষিতে এই গৌরববোধ কাজ করতে থাকে।

অথচ কত মিথ্যে আর ঠুনকো এই কৃত্রিম আভিজাত্য। আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন যে কোনও কোনও লোক এই আভিজাত্যের মোহে নিজের এবং সন্তানদের পরকাল ঝরঝরে করে দেন। "কত বড় ঘরের ছেলে আমি,' 'কত বড় বংশে জন্মেছি' ইত্যাদি উক্তিগুলো খুবই পরিচিত এবং যখন শুনি, তখন মনে মনে হাসি। চাকরি করার মতন ছোট কাজ কিংবা দোকান দিয়ে জীবিকানির্বাহ করা সত্যি এঁরা অত্যন্ত অপমানজনক বিবেচনা করেন। অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চেয়ে চিন্তে হয়তো সংসার চালাতে হচ্ছে। কিন্তু সে দীনতা সহ্য করবার মতন ধৈর্য থাকলেও কষ্ট করে কাজ করতে অথবা কাজ খুঁজে নেবার জন্য আর পাঁচজনের কাছে এগুতে তাঁদের বিরক্তি আর অধৈর্য আসে। বড় বংশে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁদের দায়িত্ব সবশেষ হয়ে গেছে এবং অসুস্থ ও জীর্ণ ধমনীতে নীল রক্তের ক্ষীণ স্রোতটুকু বাঁচিয়ে রাখাতেই যেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

আসল কথা হচ্ছে—এটা আলস্য। দেহের তো বটেই, মনেরও। দেহের আলস্য তবু জয় করা যায় বিপদে আপদে, কষ্ট স্বীকার করেও বাধ্য হয়ে দেহটাকে কখনও খাটানো সম্ভব। কিন্তু যে মন ঘুণ-ধরা শরীরের জীর্ণ তক্তে একবার চড়ে বসেছে, উপোসী ছারপোকার মতন সে মন কি করে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে সেইটেই আশ্চর্য। মনের আলস্যটাই প্রধান রোগ। কিছু না করে, কিছু না ভেবে—শুধু অতীতের ছেঁড়া গদির ফাঁকে নিজেকে সে লুকিয়ে রাখে—পাছে কেউ তাকে টেনে বার করে। পাছে কিছু কাজ করতে হয়—এই মানসিক ভয়টাই হল আসল প্রতিবন্ধক। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন—এমন লোক আছেন যাঁরা পরের কাজে ফোঁপর দালালি করে বেড়ান কিংবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে মোড়লী করতে বেশ ভালোবাসেন, অথচ নিজের এবং সংসারের উদরান্নের সংস্থান করবার জন্য যেটুকু ন্যায্য পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেটুকু স্বীকার করতে তাঁরা নারাজ। যদি মাথার ওপরে কোনও অভিভাবকগোছের কেউ থাকেন, তাহলে তাঁর স্কন্ধে নির্বিবাদে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে এঁরা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ান। যদি শ্বশুর থাকেন, তাহলে কথাই নেই। কন্যা যখন তাঁর, কন্যার অসুখ অথবা প্রসবের খরচটাও তাঁর। রোজগারের চিন্তা না থাকলে আর অন্য ভাবনা কিসের? দরকার হলেই স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যায়। আর কন্যাটি যখন বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠে, সে সময়ে হঠাৎ বৈরাগ্য হয়ে কিছুদিনের জন্যে নিরুদ্দেশ হলে সঙ্কট উদ্ধার হয়। এই রকম কয়েকটি ঘটনা শুধু আমিই দেখি নি। অনেকেই শুনেছেন বা দেখেছেন। "আমাদের বংশে কেউ কখনো চাকরি করে নি," এই মনোভাব নিয়ে মানিয়ে কাজ করা সত্যি মুশকিল। এক ভদ্রলোককে জানি যিনি শ্বশুর প্রদত্ত একটি ভালো কাজ এমনিভাবে হারিয়েছেন এবং তারজন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন। বরঞ্চ গর্বিত এবং তৃপ্ত। এবং শ্বশুর-মশায় দরকার ও দাবী অনুসারে রসদ না জোগাতে পারলে স্ত্রীকে কথা শুনিয়ে এবং বেশ খানিকটা অপমান করে পৌরুষ দেখান।

পুরানো একটা চলতি কথা আছে—ঘটি ডোবে না, নামেই তালপুকুর। জল কবে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু তার অতল স্মৃতির আলস্য স্বপ্নটাই মারাত্মক।

কথাটা শুধুই পুরুষদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। মেয়েদের কথাবার্তায় হাবেভাবে অনেক সময়ে এই মনোভাবটা ধরা পড়ে। "বড় ঘরের মেয়ে হয়ে কোথায় পড়েছি"—মনের এই অপ্রসন্ন ভাব থাকলে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায় না, একথা বলা বাহুল্য। আর্থিক বৈষম্যের ফলে যে অসুবিধা, সেটা বোধ হয় মানিয়ে নেওয়া চলে যদি অবশ্য অন্য দিকে তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ থাকে। মেয়েরা যে আশ্চর্যভাবে মানিয়ে নিতে পারেন, সেটা মানি। কিন্তু নীরবে মানিয়ে নেওয়া এক, আর চুড়ির অর্থপূর্ণ ঝনৎকারে দগ্ধ ললাটের জন্য আক্ষেপ জানিয়ে মানিয়ে নেওয়া আর এক জিনিস। "কম্প্রমাইজ"-এর মূলসূত্রই হল কথা কম বলা। আর বংশ গৌরবের যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা, সেটা বেশির ভাগই বাক্যবহুল। বংশ আর আভিজাত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতীতের বস্তু। বর্তমানের অভাব বা অসুবিধা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করবার প্রয়োজন ঘটলেই অতীতের বিস্তারিত উল্লেখ না হলে চলে না। পুরুষরা বিনা আপত্তিতে কথা না বাড়িয়ে যদি পূর্ণচ্ছেদ টানতে চান, তাহলে সে বংশের কাল্পনিক গৌরব মেনে নেবেন। কিন্তু মেয়েরা মেয়েদের মুখে ঝাল খেতে রাজি নন। প্রশ্ন আছে, শ্লেষবিদ্রূপ আছে, সংশয়ের অবকাশ আছে। তাই বক্তাকে বোঝাবার জন্য আর বিশ্বাস করবার জন্য নানা খুঁটি-নাটি দিয়ে সরস ও সালঙ্কার বর্ণনা করতে হয়।

আপনারা হয়তো বলতে পারেন—এতে ক্ষতিটা কি? বংশ থাকলেই তার গৌরব আসে আর সে গৌরববোধটা কিছু খারাপ জিনিস নয় যে ইনিয়ে-বিনিয়ে তার এতখানি সমালোচনা করতে হয়। আমার কিন্তু মনে হয়, গৌরব-বোধটা খারাপ নয়, অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু সেটা যদি অনবরত এবং প্রচ্ছন্নভাবে "মেনটাল রিজরভেশ্যন" অর্থাৎ মানসিক কুণ্ঠা অথবা অপ্রসন্ন সঙ্কোচের ভাব সৃষ্টি করে—যেটা হামেশাই দেখা যায়—তাহলে বংশ-গৌরবকে নিতান্তই অলীক স্বপ্নের মতন একটা ক্ষতি-কর বিলাসিতা বলতে হবে। অলস এবং নিষ্কর্মা পুরুষের মিথ্যা দম্ভ আর মুখরা স্ত্রীলোকের ঈর্ষ্যা মিশ্রিত অদৃষ্ট ধিক্কারেই নয়, আরও নানাভাবে ও কাজের মধ্য দিয়ে এই মনো-ভাবের প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। হাজার সত্যবাদী হলেও ছেলেমেয়ের বয়স চুরি করার মতই এই প্রকাশ অনিবার্য।

* * * *

বংশ-গৌরবের কথা বলতে গিয়ে আর একটা খুব সাধারণ ত্রুটির কথা মনে পড়ে গেল যেটা শতকরা নব্বই জনের মধ্যে আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। সেটা হল সন্তান গৌরব। এটা সত্যিই ক্ষতিকর মৌখিক ভদ্রতা-বশে অনেকে এটা চেপে রাখবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। ছোট বয়সের ছেলে-মেয়েদের সামনেই অনেক সময়ে এটা অশোভনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সামাজিক আলাপ-পরিচয়ের প্রসঙ্গে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা, গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা না করাই ভালো। কিন্তু কেমন যেন এসে যায়। কার ছেলে কোন্ স্কুলে পড়ে, সে স্কুল ভালো না মন্দ, ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালন করতে কার কি খরচ হয়, কার ছেলে পাঁচ বছরেও একটা অক্ষর চিনতে পারল না, অথচ তিন বছরের মিনির কি আশ্চর্য প্রতিভা যে 'হিকরি ডিকরি ডক" ছড়াটা কি সুন্দর ভঙ্গীতে আবৃত্তি করতে পারে, এসব কথা কিভাবে এসে পড়ে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি না। ছেলেদের পড়াশুনো আর মেয়েদের বিয়ে নিয়ে এত অকারণ মিথ্যা, এমন কি মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়ে যায়, যে আশ্চর্য হতে হয়। আমার মেয়ে দেখতে ভালো, রং ফরসা আবার নাচ-গান জানে। এ অবস্থায় তোমার ধাড়ী কালো মেয়ের চেয়ে তার বিয়ে যে ভালোই হবে—এতে বিস্মিত হবার বা ঈর্ষা-কাতর হবার কিছু নেই। আসল কথা এই, সন্তান-গৌরব আত্মগৌরবেরই নামান্তর। ওর মধ্যে নিজেদের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থতা, ব্যর্থতা সব কিছুই প্রতিফলিত হয়ে আছে। গাড়ী-বাড়ী ফার্নিচারের মতই আমাদের সন্তান তাদের বেশ-ভূষা, শিক্ষাদীক্ষা আর চেহারা নিয়ে আমাদের আত্মপ্রসাদের ইন্ধন জোগায় মাত্র।

জমিদার জগৎনারায়ণ রায়ের প্রতাপ ছিল অসাধারণ, তাঁহার ভয়ে বাঘে-গরুতে একঘাটে তৃষ্ণা নিবারণ করিত কিনা জানা যায় না। তবে তাঁহার বেতনধারী ভদ্র অভদ্র মানবসন্তান এবং আশ্রিত বহু আত্মীয়-স্বজন এমন কি সন্তানগণও তাঁহার গম্ভীর বদন এবং আরক্ত নয়নে ভীত হইত। কেবলমাত্র তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা গৌরী কখনও ইহার বৈষম্য আনিত। কন্যার দুর্দান্ত স্বভাব-বিদ্রোহী ভাব তাঁহার ভাল লাগিত। হয়ত এই কন্যার মধ্যেই পিতা আপন সত্তা অনুভব করিতেন।

গ্রামটি ছোট। কিন্তু স্বয়ং জমিদার গ্রামে থাকেন, তাই বর্ধিষ্ণুও বটে।

বৈশাখ মাস। জমিদার কন্যা এগার বছরের গৌরী পুকুরধারে আমগাছের নীচে দাঁড়াইয়াছিল। সূর্যাস্তের সময় তাই পুকুরে তখন ছিল স্ত্রীজাতির ভীড়। নীচু ঝোপড়া আমগাছের নীচে আপনাকে সযত্নে লুকাইয়া সে গভীর মনোযোগের সহিত স্নানার্থিনীদের লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার হাতে ছিল কাজললতা, আর পরিধানের লালপাড় শাড়ী ছিল হলুদে ছোপান। হাতের কাজললতা তলোয়ারের ভঙ্গীতে ধরিয়া আমের পাতা সংহারে মন দিয়াছিল।

ভিজা কাপড়ে দশমবর্ষীয়া কণা ছুটিয়া আসিতেছিল। গৌরীকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্বর তুলিয়া কহিল, "ওমা—গৌরী—তুই।"

গৌরী কণাকে তাচ্ছিল্য করিতেই যেন একটি কচি আমের পাতা দাঁতে কাটিতে লাগিল। উদাস দৃষ্টি ঊর্ধ্বে তুলিয়া কহিল—"আর কে স্নান করছে রে কণা, এত সোরগোল কিসের?"

কণার বিস্ময় যেন বাড়িয়া গেল—"সবাই। কিন্তু তোকে আসতে দিলে যে।"

এবার আর গৌরী আপনার স্থৈর্য গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিল না—"কে আমাকে বেঁধে রাখবে শুনি? জিজ্ঞেস করলাম পুকুরের জল এমন তোলপাড় ক'রে স্নান করছে কে না—"সবাই।" সত্য কথা, গৌরী ছাড়া পুকুরের শান্তজলে এমন বিপ্লব বাধাইবে কে?

একটি ঢোক গিলিয়া কণা গৌরীর ভর্ৎসনা সামলাইয়া লয়—"স্নান করছে কে? রেবা, লীলা, মীনা আর বড়রা। তোকে বকবে না ভাই?" এবার বিস্ময় নয় বিনীত প্রশ্ন।

জগতের সকল অবজ্ঞা মুখে মাখাইয়া গৌরী ঠোঁট উল্টাইল "বকুক্ গে। তোর ছেলের বুঁঝি মুন্ডু ভেঙ্গে গ্যাছে?"

কাতর করুণ কণ্ঠে কহিল কণা—"দেখ না ভাই—তোর দিদির মেয়েটা বড় অলক্ষুণে। বিয়ের পর একমাস না যেতেই আমার ছেলের মাথা খেলো, কি সুন্দর আমার ছেলে ছিল ভাই। তোকে অত ক'রে সাধলাম—তোর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দে—তুই দিলি না। অমন সুন্দর কাল চুলওয়ালা জামাই আর পাবি না।"

'ধ্যাৎ, আমি কি পুতুল খেলি নাকি? ওসব মেয়েলি খেলা আমার ভাল লাগে না। মেজমাসীমা ত আমায় জানতেন না, তাই আমার জন্মদিনে পুতুল দিয়েছিলেন। ঐ থেকে ত আলমারীতে রয়েছে পড়ে, তোর ইচ্ছে হয় তুই নিগে। আমার ওসব ভাল লাগে না। দেখেছিস কণা, কি সুন্দর কচি আম," গৌরীর লুব্ধ দৃষ্টি আমে পড়িল। কোমরে কাপড় জড়াইয়া কাজললতা মাথায় গুঁজিয়া সে আমগাছে চড়িতে আরম্ভ করিল।

কণা সাতঙ্কে চীৎকার করিয়া কহিল—"ও মা—কাল তোর বিয়ে আর আজ তুই গাছে চড়ছিস—" কণা জ্ঞান হারাইয়া ছুটিল।

"এই কণা, আয়। তোকেও আম দেব। বয়ে গেল, বলে দিগে। আমি কাউকে কেয়ার করি না।" কেয়ার না করা দেখাইতেই উঁচু আমের ডালে পা ঝুলাইয়া বসিল গৌরী—কোমর হইতে একটি ঘষা ঝিনুক বাহির করিয়া আম ছাড়াইতে লাগিল। দূরে কণার সহিত একদল শিশু ও নারীকে আসিতে দেখা গেল। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সকলকে দেখিয়া লইল সে। তারপর

গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল ' "ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল" এবং নির্বিকারভাবে আমের কুচি মুখে ফেলিয়া দুলিয়া দুলিয়া চিবাইতে লাগিল।

"ওমা কি হবে গো!" "একেবারে মেয়ে মদ্দা", "লোকে শুনলে বলবে কি গো!" নানা কণ্ঠে খেদোক্তি ও ধিক্কার একসঙ্গে ধ্বনিয়া উঠিল।

গৌরীর কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। ব্যাকুল আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতি যেন তাহাকে জানান হয়নি। যখন সকলে ঠিক গাছের নীচে আসিল—তখন বহুদূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া থু থু করিয়া আম চিবাইয়া সকলের মাথার উপর ফেলিল। নির্বিকারভাবে দুলিয়া গান গাহিয়া তাল রাখিতেছিল ঠিকই! নানা কণ্ঠে আবার কোরাস বর্কুনি জুড়িবার পূর্বেই একটি লাবণ্যশ্রীমণ্ডিতা নারী আগাইয়া আসিলেন এবং ধীরকণ্ঠে কহিলেন, "আপনারা সকলে বাড়ী যান। আমি ওকে নামিয়ে আনছি।"

একটি শিশু (বোধ হয় ভবিষ্যতে সে "অপব্যয় নিবারণী" সভার সভ্য হইবে) এমন দুর্লভ জিনিসের অপচয় সহিতে পারিল না। নিজে মাথা এবং মাটি হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া আম-চর্বিত খাইতে লাগিল। একটি বৃদ্ধা আমের ছিবড়ে এবং সকলের ছোঁয়া বাঁচাইয়া অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন,—"চল গো, তাই সব চলো। ভর সন্ধ্যেবেলা হলুদ গায়ে—হে মা মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গল করো মা। বৌমার মেয়ে—বৌমাই পারবে ওকে সায়েস্তা করতে। খবরদার বৌমা! মার ধোর করো না বাছা!"

সকলে নানারকম মন্তব্য করিতে করিতে চলিয়া গেল। গেল না শুধু একজন। তার বয়েস ষোল। দেহের পুষ্টি ত্রিরিশ বছরের যুবকের। মুখে দশ বছরের শিশুর সারল্য। উজ্জ্বল দুটি বৃহৎ চোখে মেষ-শাবকের মত নিরীহ দৃষ্টি।

গৌরীর মা উপরে তাকাইলেন—"গৌরী নেমে এসো।"

গৌরীর দুলিয়া গান এবং আম চিবানো বন্ধ হইয়াছিল—চেহারা বাধ্য হইয়া উঠিল। কিশোরটির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইল। যেন ঐ কিশোরই একমাত্র তাহার নামিবার অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

কিশোর তার হাতের সদ্য ভাঙ্গা আম্র-পল্লব শূন্যে আস্ফালন করিয়া আপনার বীরত্ব জাহির করিল—"নেমে আয় না। এর দাগ থাকবে আজ তোর পিঠে।"

"ওপরে উঠে এসে দাগ করে দাও না দেখি একবার। ভোঁদা কুমড়ো।"

কিশোর ক্রোধে তোতলাইতে লাগিল "ভোঁদা! কুমড়ো। বটে! আচ্ছা নাম্ না।"

বোঝা গেল—ঐ দুইটা নামে কিশোরের অত্যন্ত আপত্তি। নামকরণ যেই করুক গৌরী সময় বুঝিয়া তাহার সুবিধা লইত।

গৌরীর মুখে বিদ্রোহীর ভাব আবার জাগিয়া উঠিল। উপরে চাহিয়া পা দোলাইয়া পুনরায় গানের সুর ভাঁজিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

মাতা তীব্রদৃষ্টিতে কিশোরের প্রতি চাহিয়া ডাকিলেন "খোকা।"

বিরাট বপু খোকা ভয়ে পিছনে সরিতে লাগিল "আমি......আমি ত......ঐ পাজী মেয়ে যে আমায় কুমড়ো, ভোঁদা বল্‌লে তার কিছু না—কাল ওর বিয়ে আর আজ ধিঙ্গীপনা। গাছে চড়তে পারলে—তুমি যদি না থাকতে...... ঠাকুমা ত বলেই ওর কপালে—হ্যাঁ!" নানারূপ অসংলগ্ন অর্ধ সমাপ্ত কথা বলিয়া চলিল খোকা।

গৌরী নামিতে লাগিল। মা কহিলেন "গৌরী লোকে ভীষণ নিন্দা করবে।"

"করুক গে।"

"নিন্দে ত তোমার হবে না। হবে আমার। কুকথা বলবে লোকে আমাকে।"

"বা রে! আমি দোষ করবো আর নিন্দে হবে তোমার!" গৌরী বিস্ময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মা সস্নেহে কন্যার পিঠে হাত রাখিলেন. "কাল তোর বিয়ে যে মা—তাই আজ গাছে চড়তে নেই!"

ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটি সজোরে ঝাঁকাইল. গৌরী কহিল—"কেন নেই?"

খোকার আর সহ্য হইল না—ভ্যাংচাইল, "কেন নেই? পাজী মেয়ে! মেয়ে মদ্দা? বাবা বল্‌বেন কেন নেই!"

গৌরীর চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্তে পরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—"বেশ ত আমিও বলবো বাবাকে গাছে চড়তে জানে না। জানিয়ে দেব তোমার বন্ধুদেরও ভয় নেই! সবাইকে বলবো যে আমি মেয়ে মদ্দা—আর আমার দাদা পুরুষ মেয়ে। অনেক দুয়ো—আর হাততালি পাবে!"

পিতার সামনে যে শিশুরূপী যৌবনাগত খোকা দাঁড়াইতে অক্ষম তাহা খোকা ভালভাবেই জানে এবং এই দুর্দান্ত কনিষ্ঠাই যে তাঁর একমাত্র প্রিয়পাত্রী তাহাও কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। পিতার গম্ভীর মুখে অবজ্ঞা করুণা যে কেমন হইয়া ফুটিয়া উঠিবে—এবং বন্ধুদের উচ্চ হাসি তাহাকে কিভাবে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবে তাহাও খোকার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। নিরীহ করুণ চোখ দুটি তাই সে মাতার মুখে ধরিল একবার।

মাতার মুখে মৃদু শান্ত হাসি দেখা গেল, তিনি নিষ্পত্তি করিলেন,—"একথা তাঁকে কেউ বলবে না। পরশু গৌরী শ্বশুর বাড়ী যাবে—আজ ভাই-বোনে ভাব করে ফেল।"

"আয় ভাই গৌরী।" খোকা ভরসার কূল খুঁজিয়া পাইল। হাত বাড়াইয়া বোনের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ভাই-বোনে মাতার আগে চলিল।

বৈশাখের সূর্যাস্ত। সারাদিন অসহ্য গরমের পর ক্ষিপ্ত ঝড়ের হুটোপাটি শুরু হইল। মাতার মনে হইল তাঁহার গৌরীও যেন প্রকৃতি দেবীর একটি অংশ। তাঁহারই মত রহস্যময়ী উদাসীনা এবং সর্বদা যা হয় কিছু করিতে তৎপর। শুক্ল পক্ষের চতুর্থীর চাঁদের বাঁকা হাসি মেঘের আড়ালে লুকাইল। দুরন্ত শিশুকন্যার আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় মাতার বক্ষ মথিত করিয়া একটি নিঃশ্বাস বহিতে চাহিল—তিনি তাহা চাপিলেন। প্রকৃতির দীর্ঘনিশ্বাস কিন্তু চাপা রহিল না। বুকফাটা আর্তনাদে হু হুঁ শব্দে পৃথিবী তোলপাড় করিয়া চলিল। ঊর্ধ্বমুখে দম্ভে ভরা গাছগুলি পরস্পরের উপর আছড়াইয়া লুটাইয়া পড়িল। নিকটবর্তী গর্বিতা কাশের বন যেন আরও মর্মান্তিক হইয়া উঠিল, তাহাদের ভাবুক শুভ্র তন্বী দেহ একসঙ্গে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া চাপা মৃদু আর্তনাদ তুলিল "উঁ-উঁ-উঁ......"

খোকা সরিয়া মাতার হাত ধরিল। অজানা আশঙ্কায় মাতা কন্যার হাত ধরিতে গেলেন। কন্যা হাত ছাড়াইয়া আগে চলিল। বিপদে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে না। কারণ, বিপদে তাহার ভয় নাই।

পরদিন দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইল। গৌরীর ক্ষুদ্র মস্তকে যে আশিষ বর্ষিত হইল—তাহার প্রতিটি যদি দূর্বা সমান বোঝাও হইত তবে গৌরীর মাথা মাটিতে নুইয়া পড়িত। আশিষের শক্তি নাই, তাই গৌরী রহিল নিরাসক্ত। অন্তরীক্ষে হয়ত বিধাতা আসক্তিহীন পুতুলের হাসি হাসিলেন।

গোধূলি লগ্নে বিবাহ। সুসজ্জিতা বেণারসীতে জড়ান গৌরীর চন্দনপরান শেষ হইয়াছে যবে। গৌরী শান্ত। দুরন্ত ঝড় স্নিগ্ধ হাওয়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এমনকি ঠাকুমা আসিয়া যখন "আজ আমরা সোণার গৌরী দান করবো" বলিয়া বক্ষে চাপিয়াছিলেন, তখনও গৌরী চঞ্চল হয় নাই। মাথার স্বর্ণাভরণ, কানের দুল ঠিক মত আছে কিনা শুধু হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিল। একটি কথাও বলে নাই।

খোকা আসিয়াছিল। সাদা পাঞ্জাবীর উপর একটা লাইট ব্লু রঙের সিল্কের চাদর জড়াইয়া তাহার বিরাট বপুর আরও বৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল। অঙ্গের কালো রঙের উপর স্নো-পাওডার ঘামে ভিজিয়া যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল। তাহার উপর নিষ্প্রয়োজনে বিশেষ প্রয়োজনের ভাণে তৎপর হইয়া কনিষ্ঠার বিবাহের কি পরিমাণ ঝক্কি যে অগ্রজের বহন করিতে হয় বুঝাইবার জন্যে হাঁক-ডাক করিয়া

বেড়াইতেছিল—এবং আড়চোখে গৌরীর সপ্রশংস দৃষ্টি দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল—তখনই মাত্র গৌরী হাসিয়াছিল হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। ক্রুদ্ধ-লজ্জায় খোকা তৎক্ষণাৎ অগ্রজের সকল দাবী ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছিল। পর মুহূর্তেই ধীর শান্ত হইয়া বসিয়াছিল গৌরী। পূর্ণিমা-তিথি ক্ষণে গঙ্গার দুকূলভাঙ্গা মুহূর্তের জোয়ার। পরক্ষণেই শান্ত স্তব্ধ গঙ্গা।

শুভ শঙ্খধ্বনি করিয়া বরের আগমন সংবাদ প্রচার করিল। সকলে ছুটিয়া বাহির হইল। কণা প্রবেশ করিল,—"বর এসেছে রে। তুই যাবি না বর দেখতে?"

"না—শুভদৃষ্টির আগে আমায় দেখতে নেই। মা বারণ করেছেন।"

"তোকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই!" কণার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি।

"বিয়ের ক'নেকে ত সুন্দর দেখায়ই রে! তোকেও দেখাবে। খুব শান্ত হয়ে থাকিস!" গম্ভীর মুখে বড়র দাবী লইয়া উপদেশ দিল গৌরী।

"শান্ত হয়ে ত থাকতেই হয় ভাই! তোর দিদির মেয়ের বিয়েতেও কত ধুম করেছিলাম রে! এমনি করেই সাজিয়েছিলাম। ছেলে আমার বাঁচলো না। না বাঁচুক! বৌকে আর আমি দিচ্ছি না। বিধবা বৌ কি কারু ঘরে থাকে না। আহা রে! আমার কি সুন্দর ছেলে! কেমন কালো ঝাঁকড়া চুল!" পুতুল পুত্রের শোকে কণা অস্থির হইয়া পড়িল।

"কণা, তোর ঠাকুমার মত কথা শুনলে আমার যা হাসি পায়!"

"তোমার আর কি ভাই! নিজের হলে বুঝতে! যাট্! যাট্! আজকের দিনে কি বললাম রে।" অনুতপ্ত মুখে ধীর পদে কণা বর দেখিতে চলিয়া গেল। বিধাতা দ্বিতীয়বার হাসিলেন। হয়ত বালিকার কথায় কৌতুক বোধ করিলেন।

খোকাদাদার বন্ধু নিমাইদা আসিল। দাদার বন্ধুরা সকলেই গৌরীর বন্ধু। "আরে—তোর বর। আর তুই গেলি না বর দেখতে? চল্ আমি নিয়ে যাই তোকে।"

ধীরে মাথা নাড়িয়া বেণারসীর আঁচলটা ঠিক করিতে করিতে কহিল গৌরী "না—আমায় যেতে নেই নিমাইদা! মা মানা করেছেন।"

"কবে থেকে এমন বাধ্য রে! কালই যে হলুদে শাড়ীতে কাছা মেরে আমাদের সঙ্গে গাছে উঠেছিলি।" নিমাই হাসিল।

মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিল গৌরী "তা উঠেছিলাম। কিন্তু বাধ্য না হলে যে লোকে মা বাবার নামে নিন্দে রটাবে কিনা! আর শুধু পাঁচটা দিন ত শুধু আমায় ঘোমটা দিয়ে থাকতে হবে—তারপরেই আবার আমি এখানে আসবো। আর আমি যাবো না। মা বলেছে যতদিন আমার যেতে ইচ্ছে না করবে—আর বলবেন না যেতে।"

নিমাই বুঝিল দুর্দান্ত বালিকাকে শান্ত করিতে তিনি নিজেদের অপবাদের ভয় দেখাইয়াছেন। "হ্যাঁরে গৌরী তোর মার জন্যে মন কেমন করবে না। কান্না পাবে না?"

অপ্রতিভ হাসি হাসিল গৌরী "নাঃ! কান্না আমার আসে না। আর মন আবার কেমন করবে কেন? মেজদা সঙ্গে যাবে যে।"

নিমাই বিশেষভাবে জানিত গৌরীর কান্না কতখানি অসম্ভব। কহিল, "তোর বরের সঙ্গে কি গল্প করবি রে! কোন্ গাছে সে চড়তে জানে, একডুবে কতক্ষণ থাকতে পারে এবং কতদূর যেতে পারে, পাঞ্জা লড়তে জানে কিনা এই সব গল্প করবি ত?"

"না—কথা কবো না ঘোমটা দিয়ে থাকবো শুধু। তারপর এখানে ফিরে এসে আবার তোমাদের সঙ্গে খেলবো। আমায় আটকাবে কে?"

তাহা নিমাই খুব ভালভাবেই জানিত এবং বিশ্বাস করিত তাহাকে আটকানো কোন-ক্রমেই সম্ভব নয়। এই বালিকা বন্ধু বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তাই তার মনের কোণে ব্যথা বোধ করিতেছিল। এতক্ষণে ভরসা পাইয়া হৃষ্টমনে কহিল—"বেশ ভাই! তুই আমাদের অনেক বিপদে সাহায্য করেছিস, অনেক বকুনির হাত থেকে বাঁচিয়েছিস্ তাই মনে লাগছিল তোর বিয়ে হওয়া। তুই যখন আর যাবি না তখন আর ভয় কি! গ্রাম্য কিশোর তাহার কিশোরী বন্ধুর বিবাহে না দেখা মনের অকপট ব্যথা প্রকাশ করিয়া বাঁচিল। আর একবার গৌরীর দিকে চাহিল। হাসিল। চলিয়া গেল।

ঊনিশ বছরের বরের পাশে বেনারসী জড়ান গৌরীকে তাহার পরিচিত যে কেহ দেখিল একবার মনের মধ্যেকার সমবেদনা বোধ না করিয়া পারিল না। খোকা আসিয়াছিল বোনের ঘোমটার মধ্যে মুখ দিয়া তাহাকে দেখিয়াছিল। ঘর্মাক্ত মুখ। চোখ দুটি অস্বাভাবিক করুণ। বন্য সিংহ পশুরাজকে খাঁচায় পোরা হইয়াছিল। গৌরী হাসিয়াছিল। খোকার ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি গিয়া পড়িয়াছিল বরের নত মুখে। ব্যথিত মনে খোকা সরিয়া পড়িয়াছিল। একবারও তাহার মনে পড়িল না নিজের দুর্গতির কথা! গৌরীর বেনারসী খুলিয়া লইলেই যে সে নিজ মূর্তি ধরিবে এবং খোকাকে নাকাল করিতে এতটুকু দ্বিধা করিবে না, তাহা খোকার স্থূল অন্তঃকরণে পৌঁছিল না।

প্রায় দশদিন পরে গৌরী শ্বশুর বাড়ী হইতে ফিরিল। রাত্রে মাতার বুকে মাথা দিয়া অনেক কথা বলিয়া চলিল,—"আমার জ্বর হয়েছিল মা—তাই আরও পাঁচ দিন থাকতে হলো। আমি ঘোমটা দিয়েই থাকতাম। ওরা খুব ভালবাসতো। ওদের বাড়ীতে আমার একটু কষ্ট হয়নি। খুব বাধ্য হয়েছিলাম। ওরা দুধ দিয়েছিল তাও খেয়েছিলাম। তোমাদের একটুও নিন্দে হবে না মামণি, খুব ভাল বলবে তোমাদের। আর ওখানে একটা বাতাপী লেবুর গাছ আছে। মস্ত বড় লাঠি দিয়ে ওরা লেবু পাড়ে। কেউ গাছে চড়তে জানে না মা। তাও আমি কিছু বলিনি মা।"

মাতা সস্নেহে কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন—"আমার সোণার গৌরী! আমি জানি তুমি ইচ্ছে করলে সব হতে পার! জামাইয়ে সঙ্গে কথা বলেছিলে কি?"

এবার দুইহাতে মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া অনুতপ্তকণ্ঠে কহিল গৌরী—"হ্যাঁ মা বলেছিলাম। অনেক কথা বলেছিল। একটি কথাও বলিনি।" কিন্তু শেষে বললো যে, "ফুলশয্যার রাতে কথা না বললে বর মরে যায়" তাই বললাম। অনেক কথা বললো—কি পড়ি, তোমার জন্যে মন কেমন করছে কিনা—ওদের ওখানে ভাল লাগছে কিনা—তারপর অনেকগুলো খাম দিয়েছে—চিঠি লিখতে। আমি বলেছি—পড়তে আমার ভাল লাগে না। চিঠি আমি লিখতে পারবো না। আর ওদের ওখানেও যাবো না।"

মাতা আশঙ্কায় কণ্টকিত হইলেন—"এই জন্যেই আমি বলেছিলাম কথা বলো না।"

আবার অন্তরীক্ষে বিধাতা হাসিলেন। কন্যার সরল সত্য কথায় মাতার আশঙ্কা দেখিয়া হয়ত!

কিছুদিন পর পুকুরে স্নান করিতেছিল গৌরী। সেই সময় মেজদা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল। গৃহে আসিয়া সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। শান্ত ধীর মাতা তাহার আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল। আত্মীয়-স্বজন ঠাকুমা, দাদা, দিদি একসঙ্গে কোলাহল করিয়া কাঁদিতেছিলেন। পিতা যে কোন দিন মাটিতে বসিয়া এমন করিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে পারেন, তাহা নিজের চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন হইত। মাতা-পিতার অমন ব্যাকুল বেদনায় তাহার কান্না পাইতে লাগিল—কিন্তু অনভ্যাসের দরুণ পারিল না। সে বুঝিল তাহার বর জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল তাহার। অতো বড়ো ছেলে সাঁতার জানে না!! সত্যই শহরের লোকেরা সব অদ্ভুত। বি এ পড়িত অথচ সাঁতার জানে না।

দূর সম্পর্কের এক পিসিমা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে লইয়া আসিলেন বাড়ীর বাহিরে। শাঁখা ভাঙ্গিতে গিয়া তিনি কাঁদিয়া ভাসাইলেন। হতবুদ্ধি গৌরী এতক্ষণে যেন কথা খুঁজিয়া পাইল—"আমি শাঁখা ভেঙ্গে দিচ্ছি পিসিমা। শাঁখা পরতে আমার একটুও ভাল লাগে না। দিদির শ্বশুর ত সেদিন মারা গেলেন—এমন করে ত কান্না হলো না। এক-সঙ্গে জোট্ করে কোনো কিছু করা আমার ভাল লাগে না। বিয়ের সময় একসঙ্গে উলু

দেওয়াটা এমন খারাপ—একটু মন কেমনও করে তাতে। তোমরা বললে নিয়ম। গাছে উঠেছিলাম একজোটে বকেছিলে। বুঝলাম তোমাদের রাগ হয়েছিল। বর মরে গ্যাছে ভালই 'ত! কণা বলেছিল—"অলক্ষণা মেয়ে।" তা আমি অলক্ষণা আর আমার কেমন শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে না। না দুষ্টুমি আর আমি সত্যি করবো না। আর পিসিমা—সত্যি অতো বড়ো ছেলে সাঁতার জানে না? হরে ত ঐটুকুন! ওকে ত আমরা সাঁতার শিখিয়েছি। ওদের লজ্জা—আমাদের আর কি বল? ক'খানা থাম নষ্ট হবে। তা বাবা অন্য কোথাও লিখে দেবেন এখন! আমার সংগে বিয়ে হয়েছিল বলেই না তোমরা কাঁদছো। আগে মরলেই পারতো বাপু! এতো কাঁদতে হতো না মা, বাবার! না—বিয়ে করে তবুও অনেক জিনিস পেয়েছে বেচারা মরবার আগে। সে ভাল। কিন্তু এমন কান্না! উঃ! আমার কেমন গা শির্ শির্ করে বাপু! অনেকক্ষণ কথা কহিতে না পারায় অনেক কথা কহিয়া বাঁচিল গৌরী!

সেদিন ছিল একাদশী। মা কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। ঠাকুমা ফল মিষ্টি সাজাইয়া রাখিলেন। সকলে প্রতি মুহূর্তে গৌরীর আবির্ভাব স্মরণ করিয়া কোন রকমে খাইয়া উঠিল। মাতা মুখে জলও দিলেন না। উমা ছুটিয়া আসিল—"মা, গৌরী আজ আমার পুতুল নিয়ে খেলছে!"

মাতা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উমার সংগে গেলেন। উপবাসী বক্ষের স্পন্দন সবলে দুই হাতে রোধ করিয়া গৌরীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দেখিলেন গৌরী উমার পুতুলের সীমন্তের আলতা মুছাইবার চেষ্টা করিতেছে। অস্ফুট কণ্ঠ শোনা গেল "ছিঃ সিঁদুরে পরে না। লোকে মা-বাবার নামে নিন্দে করবে। একাদশীর দিনে খেতে নেই। মনু পিসি বললে খাওয়ার কাছে গেলে তাকালে মা কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। তাই না আমি যাইনি। গাছে চড়ে ক'টা পেয়ারা খাব। খিদেও পাবে না। মাও কাঁদবে না।"

মাতা দৃঢ়হস্তে বক্ষ চাপিয়া টলিতে টলিতে সরিয়া গেলেন।

বিধাতা অন্তরালে এবার হাসিলেন অথবা কাঁদিলেন বলা সুকঠিন!

মানুষের শত্রু

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

যুদ্ধোত্তর বিশ্বের প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে খাদ্য। কারণ, এ জগতের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যে পরিমাণ বিভিন্ন ধরণের আহার্যের প্রয়োজন তার অভাব রয়েছে একান্ত। কোন দেশই খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোন দেশে খাদ্যশস্য পাওয়া গেলে পরিমিত মাংস পাওয়া যায় না, মাংস পাওয়া গেলে দুধ পাওয়া যায় না। কোন স্থানে ডিমের অভাব আবার কোথাও বা ফলের। এই অভাবের ফলে কেবলমাত্র বিশ্বের নরনারীর জীবনীশক্তিই যে হ্রাস পাচ্ছে তা নয়, খাদ্যাভাব দরুণ নানা অসন্তোষও ধূমায়িত হয়ে উঠছে। তা রাজনৈতিক রূপ নিয়ে গৃহযুদ্ধ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে। তাই এই সংকট এড়াবার জন্যে নানা দেশে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে খাদ্য নিয়ে। অভিজ্ঞ মহল ভাবছেন কি করে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা যায়, কি করে সুষ্ঠুভাবে তা বণ্টন করা যায়, বিভিন্ন ধরণের লোকের অভিরুচি অনুযায়ী খাদ্য দেওয়া যায়, সর্বোপরি কি করে অপচয় নিবারণ করা যায়। রাষ্ট্র নানাভাবে তাঁদেরকে সাহায্য করছেন। খাদ্যের এদিকটা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। তাছাড়াও খাদ্যাভাবের যে আরেকটা কারণ আছে তা অভিজ্ঞগণের দৃষ্টি ততটা আকৃষ্ট করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। সে হচ্ছে নানাজাতীয় কীট দ্বারা আমাদের আহার্যের ক্ষতিসাধন। অর্থাৎ এমন অনেক জাতীয় কীট পতংগ আছে যা নানাভাবে আমাদের খাদ্য সরবরাহের ক্ষতিসাধন করে। যেমন, পংগপাল। ওগুলো যখন যে শস্যক্ষেত্রে হানা দেয় তখন সেখানে আর কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া রয়েছে আরও নানা ধরণের পোকা মাকড় যা আমাদের গৃহপালিত পশুর ক্ষতিসাধন করে মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির সরবরাহের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটায়।

বিযাক্ত কীটপতংগ ও নানাবিধ রোগোৎপাদক জীবাণু বৎসরে কত টাকার খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতিসাধন করে তার সঠিক পরিমাপ সম্ভবপর নয়, যেমন সম্ভবপর নয় পোকামাকড় দ্বারা কত পরিমাণ খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয় তা' বের করা। তবে বিষাক্ত জীবাণু, পরজীবী কীট প্রভৃতি দ্বারা গৃহপালিত পশুসমূহের কতখানি ক্ষতিসাধিত হয়, কোন কোন দেশ থেকে তার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। যেমন, ব্রিটেনের কথা ধরা যাক্। সেখানে মাংস, পোলট্রি ও ডায়েরী শিল্প থেকে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ হয়, গৃহপালিত গোমেষাদির অসুখের ফলে তার শতকরা দশ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। তার মানে বৎসরে প্রায় ৯ কোটি পাউণ্ডের খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়। গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল ভেটেরিনারী মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মতে এ হিসাব ঠিক নয়। তাঁরা বলেন, গোমেষাদির যে প্রধান চারিটি ব্যাধি হয় তাতে বৎসরে ২ কোটি পাউণ্ডের খাদ্যদ্রব্য বিনষ্ট হয়; এর মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের দুধ নষ্ট হয় বলে তাঁরা মনে করেন। এর সংগে আমরা আমেরিকার পশু শিল্প ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত হিসাব তুলনা করতে পারি। তাঁদের মতে যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে ৪১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলারের খাদ্যদ্রব্য বিনষ্ট হয়। অবশ্য এ হিসাবও নাকি ঠিক নয় বলে কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানিয়েছেন। মিঃ হ্যাগান বলে জনৈক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন যে, ঐ ক্ষতির হিসাবের সংগে নির্বিঘ্নে আরও ১০০ কোটি ডলার যোগ করা যেতে পারে।

হ্যাগান এবং আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন যে, বিষাক্ত কীটপতংগ গৃহপালিত পশুকে রোগগ্রস্ত করে কেবলমাত্র যে খাদ্য সরবরাহ হ্রাস করে তা নয়, তারা পশুর প্রজনন শক্তিও বিনষ্ট করে দিতে পারে। রুগ্ন পশুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হয় এবং বিশেষ যত্ন নিতে হয়। ফলে তাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ দুধ, ডিম ইত্যাদি পাওয়া যেত তা পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এভাবে অপচয়ের পরিমাণও নগণ্য নয়। এর সংগে খাদ্যশস্যের ক্ষতি যোগ করলে যা দাঁড়াবে তা সত্যি ভয়াবহ।

এখন কথা হচ্ছে কোন শ্রেণীর কীটাদি থেকে গৃহপালিত পশুর ক্ষতি সাধিত হয় বেশী। অবশ্য এর জবাব দেওয়াও খুব সহজ নয়। কারণ কোন দেশে হয়ত রোগোৎপাদক জীবাণু দ্বারা আবার অন্য দেশে পরভোজী কীটপতংগাদি দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয়। তাছাড়া স্থানীয় মহামারীর ফলেও বহু পশ্বাদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই কে বেশী ক্ষতিকারক তা বলা খুব শক্ত। কারণ হচ্ছে, সত্যিকারের কোন রোগ সৃষ্টি না করেও পরভোজী জীব গৃহপালিত গোমেষাদির স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এর আক্রমণে গোমেষাদির স্বাস্থ্যের এত অবনতি হতে পারে যে, তাদের দেহে রোগোৎপাদক

জীবাণু ঢুকলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার মত জীবনীশক্তিও তাদের থাকে না। অপর দিকে বিষাক্ত জীবাণুগ্রস্ত হলে গো-মহিষাদি এত বেশী রুগ্ন হয়ে পড়তে পারে যে, পরভোজী কীটের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতা তাদের থাকে না। তাই মনে হয়, ঐ দুটোই আমাদের গৃহপালিত পশু তথা খাদ্য সরবরাহের ক্ষতির কারণ। তবে এখানে আমরা প্রধানত পরভোজী কীটপতঙ্গ সম্পর্কেই আলোচনা করব।

পরভোজী কীটপতঙ্গকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা (১) প্রোটোজোয়া (Protozoa)। এগুলি এককোষ জীব। অনেকটা ম্যালেরিয়া জীবাণুর মত। (২) ফিতা কৃমি, (৩) কেঁচো জাতীয় জীব এবং (৪) অন্যান্য কীটপতঙ্গ, কুকুরের গায়ের মাছি (ticks) প্রভৃতি। তাছাড়া আছে উষ্ণ-প্রধান দেশে জোঁক এবং কয়েক ধরণের রক্তচোষা বাদুড়। এই সব কৃমি ও কীটপতঙ্গ বৎসরে কত টাকার খাদ্যদ্রব্য বিনাশ করে তার হিসাব যদি আমরা নিই তবে দেখব খাদ্যাভাবের কারণ তারাও। সুতরাং, খাদ্যবৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করলে বা কেবলমাত্র গবেষণা করলেই চলবে না। এই সব ধ্বংসকারী পরজীবী পোকামাকড়ের হাত থেকে খাদ্যদ্রব্যকে কি করে রক্ষা করা যায় তাও চিন্তা করতে হবে।

বিভিন্ন ধরণের প্রোটোজোয়া থেকে মার্কিন দেশে প্রায় ১ কোটি ডলারের খাদ্যদ্রব্য বিনষ্ট হয়। এর মধ্যে হাঁস মুরগি ইত্যাদির রোগে ক্ষতি হয় অর্ধেক টাকার। প্রোটোজোয়া এবং তারই জ্ঞাতিভাইদের আক্রমণের হাত থেকে গরুঘোড়াও বাদ পড়ে না। তা থেকেও খাদ্য-দ্রব্যের লোকসান বাৎসরিক কম দাঁড়ায় না।

যে সব জন্তু থেকে আমরা মাংস পাই কৃমি ও ফিতা কৃমি তাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। এ প্রসঙ্গে আমরা যকৃৎ কৃমির কথা বলতে পারি। এরা সাধারণত গোমেষাদির যকৃতে গিয়ে বাসা বাঁধে। তারপর ওগুলোর এমন-ভাবে ক্ষতিসাধন করে যে, হয় পশুগুলি মরে যায় নয়ত ওদের কাছ থেকে অতি অল্প পরিমাণ দুধ বা মাংস পাওয়া যায়। ইংলণ্ড ও ওয়েলসে কসাইখানায় ৭৩ হাজার গোমেষাদির রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ঐ পর-জীবী প্রাণী বৎসরে ২ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের যকৃতের ক্ষতিসাধন করে। মার্কিন মুল্লুকে এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে সেখানে ১৪ লক্ষ গরুর ও ৬০ হাজার ৫ শত বাছুরের যকৃৎ রোগগ্রস্ত বলে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল কারণ ওগুলো যকৃৎ-কৃমি আক্রান্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছিল। ফলে ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড ওজনের যকৃৎ নষ্ট হয়ে যায়। গরুর দুগ্ধদান ক্ষমতাও শতকরা ২৬ ভাগ কমে গিয়েছিল। তাছাড়া তাদের প্রজনন ক্ষমতাও প্রচুর হ্রাস পায়। আমেরিকার পশুশিল্প ব্যুরো এ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে বলেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে যকৃৎ কৃমি ও ফিতা কৃমি যে ক্ষতি সাধন করে তার মূল্য হবে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ ডলার। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন স্থানে যকৃৎ কৃমি আক্রান্ত বলে শতকরা ৫০টি জন্তুর যকৃত নষ্ট করে ফেলতে হয়েছিল। সাধারণত স্যাঁতসেঁতে দেশে এ রোগের আধিক্য দেখা যায়।

তারপর কেঁচো জাতীয় পোকা। এর হাত থেকে পৃথিবীর কোন দেশেরই জীবজন্তু রেহাই পায়নি। নানাভাবে এ শ্রেণীর পরজীবী প্রাণী গবাদি পশুর ক্ষতি সাধন করেছে। এরা যে কেবল জীবজন্তুরই ক্ষতিসাধন করে তা নয় খাদ্যশস্যেরও প্রচুর ক্ষতি করে এরা। আলু, রাই, টমেটো, যব, ওট ইত্যাদি সব কিছুরই এরা নির্বিচারে ধ্বংস সাধন করে।

হুক্ওয়ার্ম ঐ জাতীয় পরজীবী প্রাণীরই একটি শ্রেণী। এরা রক্তচোষা। খাদ্যনালির মধ্য দিয়ে যে সব কৃমি জন্তুদেহে প্রবেশ করে তারা ভিতরে গিয়ে রক্ত চুষে খায়। তাই এ ধরণের কৃমি দ্বারা আক্রান্ত জন্তু প্রায়ই রক্তাল্পতায় ভোগে। এরা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই ৪৫ হাজার টন মাংসের ক্ষতি সাধন করে বলে হিসাব পাওয়া গেছে।

সর্বশেষ যে পরভোজী শ্রেণী আমাদের খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি করে তা হচ্ছে পোকামাকড়, এঁটুল আর চাঁঠা। প্রথমত এরা নিজেরাই মানুষের খাদ্য খেয়ে ফেলতে পারে। যেমন, পঙ্গপাল। যে ধানক্ষেতে এরা হানা দেয় সেখানে ধূসর প্রান্তর ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তারপর আমাদের দেশের গুবরে পোকা, ঝিঁঝিঁ পোকা, ধানের অন্যান্য কীট যে ক্ষতি করে প্রতি বৎসর তার হিসাব নিলে অবাক হতে হয়।

তারপর এঁটুল, চাঁঠা প্রভৃতি পরজীবী প্রাণী গবাদি পশুর গায়ের উপর সেঁটে থেকে প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। অন্ততঃ তিনভাবে এরা জীবজন্তু ও পক্ষীর ক্ষতি করেঃ (১) এরা পশুপক্ষীর গায়ে বসে ওদেরকে এমনভাবে বিরক্ত করে যে, সেটাই একটা রোগ হয়ে দাঁড়ায়; (২) তাদের শুককীট পশুপক্ষীর আভ্যন্তরীণ পেশীতে আস্তানা নেয়; (৩) এরা জন্তুদেহে অন্য ধরণের বিষাক্ত পরজীবী প্রাণীর প্রবেশের পথ করে দেয়, যার ফলে মারাত্মক ধরণের রোগের সৃষ্টি হয়। মশা, মাছি বা উকুন যদি কোন জন্তুকে বা পাখীকে অবিরত কামড়ায় তবে ওগুলো কেবল যে রক্তই খায় তা নয়। ওদেরকে এগুলো এমনভাবে বিরক্ত করে যে, ওদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি তাতে ব্যাহত হয়। তারপর আর এক ধরণের মাছি আছে (warble flies), এরা গবাদি পশুকে কামড়ায় না। শুধু মাত্র গবাদি পশুর দেহের উপর ডিম পেড়ে রাখে। তা থেকেই ওদের দেহের ভিতরে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। এই বাচ্চাগুলো ওদের পেশীতে ঠাঁই করে নিয়ে এমন যন্ত্রণার সৃষ্টি করে যাতে ওরা পাগলের মত ছুটাছুটি করতে শুরু করে দেয়। ফলে ভাল করে তারা খেতে পারে না। দুধ বা মাংসও তাই ঐসব অপরিপুষ্ট গবাদি পশু থেকে পাওয়া যায় না। এভাবে খাদ্য সরবরাহের যা কমতি হয় এক যুক্তরাষ্ট্রেই তার মূল্য হবে ৮৫০ লক্ষ ডলার।

সুতরাং আমরা দেখলাম, পরজীবী প্রাণী বা কীটপতঙ্গ কি মারাত্মকভাবে আমাদের খাদ্যশস্যের অপচয় সাধন করছে। এ বন্ধ করা প্রয়োজন। কারণ, পৃথিবীর খাদ্যশস্যের প্রধান তিনটি অর্থাৎ গম, ধান্য ও যবের উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ধান্য যা উৎপন্ন হয় তাতে পৃথিবীর অন্নভোজী অধিবাসীবৃন্দের ছয়মাসও চলে কিনা সন্দেহ। গম ও যবের বেলাতেও তাই। এই অভাব পূরণ করা চলে মাংস, মাছ, ডিম, দুধ, তরিতরকারী ও ফলাদি দিয়ে। কিন্তু তা-ই যদি এমনিভাবে বিনষ্ট হয় তবে শীঘ্রই অবস্থা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। এই সর্বনাশা পরজীবীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ করা দরকার এং সেজন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। আশা করা যায়, অচিরেই তা আরম্ভ হবে।

অন্ধ ভাস্কর মূর্তি গড়লো

জার্মানীর বিখ্যাত ভাস্কর্য-শিল্পী আর্থার স্নাইডার গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশ সীমান্তে যুদ্ধ করতে গিয়ে অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু অন্ধ হয়েও তাঁর ভাস্কর্য শিল্পের অনুরাগটুকু

অন্ধের কৃতিত্ব!

ছাড়তে পারেন নি। সম্প্রতি তিনি অন্ধ চোখেই তাঁর ছেলে ম্যানফ্রেড্ স্নাইডারের মূর্তিটি ব্রঞ্জে গড়ে তুলে জার্মান শিল্প-সমালোচকদের পর্যন্ত অবাক করে দিয়েছেন।

চোরের ওপর বাটপাড়ি

কেন্টাকির নিউপোর্ট অঞ্চলের অধিবাসী মার্ভিন কুলসন—থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে জোর গলায় নালিশ জানিয়ে বলেন—পথে আসবার সময় গুণ্ডারা তার কাছ থেকে ৪০ ডলার কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু এই মামলার তত্ত্ব-তল্লাসী হওয়ার পর জানা গেছে যে,

কুলসন—এল্‌মার ক্যাটরনের ৪৩ ডলার চুরি করে পালাবার সময় তার থেকেই ৪০ ডলার কেড়ে নিয়েছে গুণ্ডারা।

প্রাথমিক চিকিৎসার উপযুক্ত রোগী

আমেরিকার পিটসবার্গের বিমান-পোতাশ্রয়ের মাইকেল ফিডর নামে এক মিস্তিরী মইয়ের উপর চেপে পোতাশ্রয়ের প্রাথমিক চিকিৎসার ঘরের মধ্যে যখন কিছু কারিগরী করছিলেন ঠিক সেই সময় মই থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর উরু ভঙ্গ হয়। তিনি এসেছিলেন প্রাথমিক চিকিৎসার ঘরটি মেরামত করতে, এখন কিন্তু এ প্রাথমিক চিকিৎসার ঘরেই তাঁর উরুটি মেরামত করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। প্রাথমিক চিকিৎসার উপযুক্ত রোগী এ'কেই বলা চলে।

হিসেব কষে শাস্তি দেওয়া

সম্প্রতি আমেরিকার স্যাভানা বলে জায়গাটিতে জে এইচ অ্যালেন নামে একটি লোক উইলিয়াম হেনসন বলে আর একটি লোককে ছুরির আঘাতে জখম করার অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু তার সাজাটা হয়েছে ভারী অদ্ভুত—বিচারক রায় দিয়ে বলেছেন—ছুরির আঘাতের ফলে হেনসন দেহের ক্ষত জুড়তে তিন শো ফোঁড় সেলাই দিতে হয়েছে—অতএব সেলাইয়ের প্রত্যেক ফোঁড়ের দরুণ এক ডলার হিসাবে আসামীকে মোট ৩০০ ডলার জরিমানা দিতে হবে। ফিলাডেলফিয়াতে ডেনিস ক্যালাহামকেও আর এক ছুরিমারা মামলায় ২৬ বার ব্যাটারীর সাহায্যে বিদ্যুতাঘাত করা হয়েছে—কারণ, সে যাকে আক্রমণ করেছিল, তার দেহের ক্ষত জুড়তে হাসপাতালে ২৬টি সেলাইয়ের ফোঁড় দিতে হয়েছে। এমন সাজাকে বেহিসাবী সাজা বলা যায় না।

অদ্ভুত ঘড়ি যা ভেবেচিন্তে কাজ করে

এ বছর মে মাসে একই সঙ্গে লণ্ডনের আর্লস কোর্টে, অলিম্পিয়ায় এবং ক্যাস্‌ল্ ব্রামউইচে যে শ্রমশিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে—তাতে একটি নূতন ধরণের বিদ্যুৎ-চালিত ঘড়ি দেখানো হবে। ঘড়িটির নাম দেওয়া হয়েছে—"রেডিও প্রি-সেট-ক্লক"। এই ঘড়িটির সাহায্যে মানুষের অনেক অসুবিধা দূর হবে। কারণ যে কোন বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রকে এই ঘড়ি সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে ইচ্ছামত সময়ে সেটিকে চালু করা যাবে ও বন্ধ করা যাবে। যেমন ধরুন, আপনি চান যে, আপনার রেডিওটা পাঁচটার সময় চালু হয়ে ছটা বেজে পনের মিনিটে বন্ধ হয়ে যাবে। এই ঘড়িটির কাঁটা সেই মত ঘুরিয়ে রেডিওর সুইচের সঙ্গে লাগিয়ে রাখলেই যথাসময়ে আপনা থেকে রেডিও খোলা এবং বন্ধ হবে। আপনার বাড়ির আলো নেভানো, ফ্যান চালানো ইত্যাদির ব্যাপারেও ঠিক ঐ রকমই কাজ দেবে। ঘড়িটি দেখতে যে সাধারণ ঘড়ির মতই তা সঙ্গের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন।
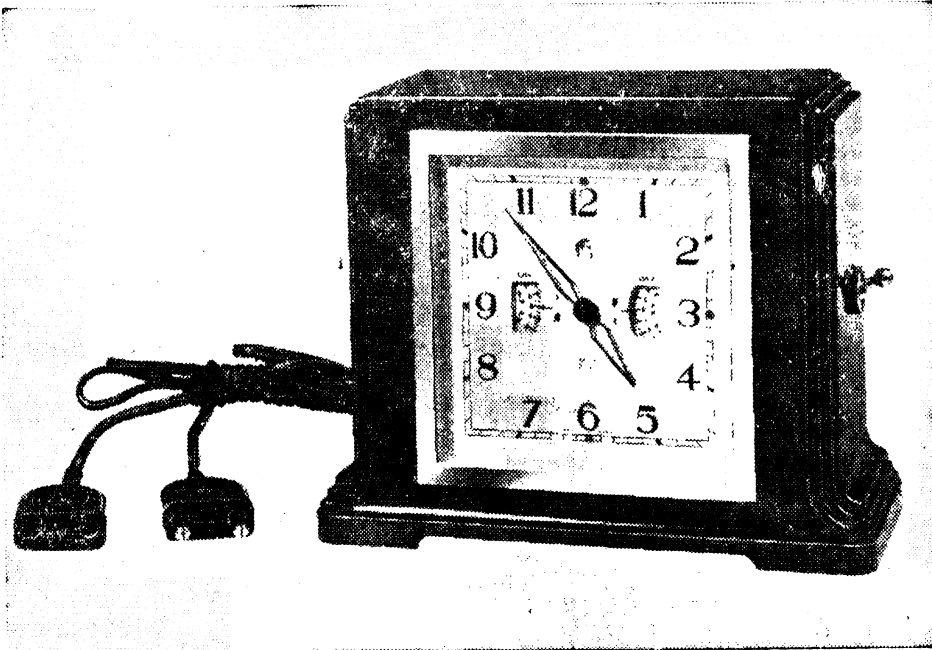
রেডিও প্রি-সেট-ক্লক। যে কোন বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রকে এই ঘড়ির সঙ্গে যুক্ত করে তাকে চালু করা যায়।

রেলওয়ে বাজেট প্রসঙ্গে

শ্রীমনকুমার সেন

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে ভারত সরকারের রেল ও যানবাহন সচিব শ্রীযুত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ১৯৪৯—৫০ সালের রেলওয়ে বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে, আলোচ্য বাজেটটি পুনঃ পুনঃ পাঠ ও বিশ্লেষণ করিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। রেলওয়েকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিন্যাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার ও দেশের জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি নিরপেক্ষ হইয়া রেলওয়ে বাজেট প্রণয়ন করিবার যে অবৈজ্ঞানিক ও অদূরদর্শী মনোভাব এতাবৎকাল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, শ্রী আয়েঙ্গারের বর্তমান বাজেট তাহার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। শ্রী আয়েঙ্গার বলিয়াছেন,

"As railways touch the life of the community more intimately than perhaps any other single economic agency, their management should know as precisely as they can its changing needs, so that the service they render it is adjusted to what is desired. For this there should be a continuous study in relation to railway working of current trends in industry, agriculture and domestic and foreign trade—"

অন্য যে কোন আর্থিক সংযোগসংস্থা অপেক্ষা সমাজ-জীবনের সঙ্গে রেলওয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর বলিয়াই সমাজের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনগুলি যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের জানা উচিত, যাহাতে রেলওয়ের প্রচেষ্টাকে উহাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইজন্য রেলওয়ের কার্যকলাপের সমসাময়িকরূপে দেশের কৃষি, শিল্প, আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের গতিবিধি সম্পর্কে ধারাবাহিক অনুশীলন হওয়া কর্তব্য।

আলোচ্য বাজেটে শ্রী আয়েঙ্গার চলতি বৎসরে রেলওয়ের মোট আয় প্রাথমিক বরাদ্দ অপেক্ষা ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে এবং ১৯৪৯—৫০ সালে উহা অপেক্ষা আরও ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। চলতি বৎসরের মোট উদ্বৃত্ত হিসাব করা হইয়াছে ১৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা; প্রাথমিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দে যে উদ্বৃত্তের হিসাব করা হইয়াছিল ইহা তদপেক্ষা আনুমানিক ৬ কোটি টাকা অধিক। ১৯৪৯—৫০ সালে রেলওয়ের রাজস্ব বৃদ্ধির আভাস সত্ত্বেও উক্ত বৎসরে উদ্বৃত্তের পরিমাণ মাত্র ৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। প্রধানত রেলকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দরুণই উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

শ্রী আয়েঙ্গার তাঁহার বাজেট-বক্তৃতার প্রারম্ভেই পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দ তথা দেশের জনসাধারণকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী বৎসরের জন্য রেলওয়ের যাত্রীভাড়া বা মালচলাচলের মাশুল বৃদ্ধি করা হয় নাই। প্রথমে বাজেট প্রসঙ্গের সকল যুক্তি তথ্য প্রকাশ করিয়া তারপর এই নতুন খবরটি ঘোষণা করিলেন না কেন, গোপালস্বামী নিজেই এই প্রশ্ন তুলিয়া তাহার জবাবে বলিতেছেন,

"If I reserved it to a later stage of my speech its surprise value might get discounted"—

অর্থাৎ, পরে বলিলে এই ঘোষণার চমৎকারী মূল্যেটুকু কমিয়া যাইত! শ্রী গোপালস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন; বৎসরের পর বৎসর ভাড়া বৃদ্ধির যে চলতি 'রীতি'র সহিত আমরা অভ্যস্ত তাহাতে ভাড়া না বাড়াইবার এই আশ্বাস একটি পরম সুখবর বলিতে হইবে বৈকি! এই আশ্বাসপূর্ণ ঘোষণাটি প্রথমে না পাইলে বাজেটের আগাগোড়া পাঠ করিবার মত উৎসাহ অনেকেরই থাকিত কিনা সন্দেহ! বাস্তবিকপক্ষে, যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধির, বিশেষরূপে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের (বর্তমান মধ্যম শ্রেণীর লোপ হওয়ায় লোক্যাল ট্রেনের দৈনিক যাত্রীদের প্রায় সকলেই এই অধম শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন!) ভাড়া বৃদ্ধির কোনই অবকাশ ছিল না। প্রাক্ স্বাধীনতা বৎসরগুলিতে অন্যখাতের যত ঘাটতি, যাত্রীদের উপর বাড়তি ভাড়া চাপাইয়া তাহা পূরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রী আয়েঙ্গার বোঝার উপর শাকের আঁটি না তুলিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন!

বাজেটের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে আয় হইবে আনুমানিক ২০৫·৮৫ কোটি টাকা। রেলওয়ের বিভিন্ন খাতের সাধারণ ব্যয় বাবদ ধরা হইয়াছে ১৫৯·০৩ কোটি টাকা। ইহার সহিত অন্যান্য ব্যয়ের হিসাব বাদবাকী রেলওয়ের নীট লাভ হইবে ৩২·৩২ কোটি টাকা। এই টাকা হইতে সুদ বাবদ দেয় ২২·৮৮ কোটি টাকা বাদ দিলে যে ৯·৪৪ কোটি অবশিষ্ট থাকে তাহাই আলোচ্য বৎসরের উদ্বৃত্ত। আমরা পূর্বেই এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

রেলওয়ের উদ্বৃত্ত আয় অংশত বরাবরই ভারত সরকারের সাহায্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান রেল রাষ্ট্রায়ত্ত বলিয়া রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যয় সংকুলানের ব্যাপারে এই বিভাগের একটা স্বাভাবিক দায়িত্ব রহিয়াছে। বিশেষরূপে ভারত-বিভুক্তি ও তজ্জনিত বিপর্যয়ের ফলে ভারত-সরকার নানান সমস্যায় বিব্রত। রেল-বিভাগ সত্ত্বেও একটা অপরিহার্য 'পাব্লিক সার্ভিস' বলিয়াই রেলওয়ের রাজস্ববৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু ভারত সরকারের অন্যান্য অনেক বিভাগকেই গুরুতর অর্থ সংকটের মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। শ্রী আয়েঙ্গার বলিয়াছেন যে, ভারত সরকারের সাধারণ তহবিলে প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমান বর্ষের উদ্বৃত্ত ১৫·৮৩ কোটি টাকার মধ্যে ৭·৩৪ কোটি টাকা ভারত সরকারের সাধারণ তহবিলে প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৪৯—৫০ সালের আনুমানিক উদ্বৃত্ত ৯·৪৪ কোটি টাকা হইতে ৪·৭২ কোটি টাকা ভারত সরকারের সাধারণ তহবিলে এবং অবশিষ্ট ৪·৭২ কোটি টাকা রেলওয়ে তহবিলে প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। এই আর্থিক সহযোগিতার ফলে ভারত সরকারের সাধারণ তহবিলে শক্তি বৃদ্ধি হইল ইহা বলাই বাহুল্য। নানা কারণে রেল-বিভাগের পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যাত্রী ও মালচলাচলের আধিক্যবশতঃ রেলওয়ের লাভ করা সম্ভব হইয়াছে এবং এই যাত্রী ও মালের সহিত অন্যান্য যে সকল বিভাগ বিভিন্ন কার্যকারণে সংশ্লিষ্ট ও ইহাদের সুব্যবস্থা করিতে খরচান্ত, রেলওয়ের উদ্বৃত্ত মুনাফা তাহাদের সুবিধার্থে ব্যয়িত হওয়াই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক চাপের ফলে ভারতীয় রেলওয়ের বহন-ক্ষমতাই শুধু হ্রাস পায় নাই, গাড়িগুলিরও গুরুতর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। সুতরাং রেলওয়ের চলাচল ক্ষেত্রের প্রসার ত দূরের কথা, যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থার সুযোগ সুবিধার পুনরুদ্ধার করাও একটা বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ভারত-বিভুক্তি ও তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ রেলওয়ে-বিভুক্তি ভারতীয় রেল বিভাগকে এঞ্জিন, ড্রাইভার প্রভৃতির তীব্র টানাটানির মধ্যে পাড়িতে হয়। এই কারণে ১৯৪৭ সাল একটি অতি দুর্বৎসররূপে অতিক্রান্ত হইয়াছে। বর্তমানেও পর্যাপ্ত এঞ্জিন ও গাড়ির অভাবই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও রেলযাত্রিগণের প্রধান দুর্ভাবনার বিষয়। বিশেষরূপে সুবার্বন ট্রেনের যাত্রীদের যে বর্ণনাতীত ক্লেশ ভোগ করিতে ও বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। যানবাহন-সচিবের সংশোধিত হিসাবে যেসব বিরাট পরিকল্পনা খাতে ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে তন্মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে অবস্থিত মিহিজামের (ইহার নূতন নাম 'চিত্তরঞ্জন'।) এঞ্জিন নির্মাণ কারখানা অন্যতম। ইহা ছাড়া, ধাতু নির্মিত হাল্কা গাড়ি নির্মাণকল্পে একটি কেন্দ্রীয় গাড়ি নির্মাণের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও

জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে রেলওয়ে কারখানাসমূহে (চার চাকা হিসাবে) ১৭২ খানা গাড়ি তৈয়ার সম্পন্ন হয় এবং ঐ বৎসরের এপ্রিল হইতে দেশরক্ষা দপ্তর এযাবৎ ২৫১ খানি 'ব্রড গেজের' গাড়ি ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। রেলওয়ে কারখানায় নির্মাণরত গাড়ীর সংখ্যা হইতেছে ২৭২ খানি। হিন্দুস্থান বিমান কোম্পানীর নিকট বৈদ্যুতিক পাখাসম্বলিত দশ ফিট চওড়া ধাতু নির্মিত উন্নত ধরণের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এঞ্জিনের হিসাবে দেখা যায়, যে সকল এঞ্জিন তাহাদের স্বাভাবিক জীবনের সীমারেখা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে তাহাদের সংখ্যা হইবে ১২৯১। বহির্ভারত হইতে ব্রডগেজের জন্য ৬৪০ খানি, মিটার গেজের জন্য ২০৩ খানি এবং ন্যারো গেজের জন্য ২০ খানি—সর্বসমেত ৮৬৩ খানি এঞ্জিনের জন্য বিদেশে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত বহির্ভারত হইতে ব্রডগেজের ১৯ খানি ও মিটার গেজের ৩৩ খানি এঞ্জিন আসিয়া পেণীছিয়াছে এবং বর্তমান ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে ১২০ খানি ব্রডগেজের এঞ্জিন আসিয়া পেণীছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এঞ্জিনগুলি ডেলিভারী দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ১৯৪৯—৫০ সালের মধ্যে মোট ৩৩৭ খানি ব্রড গেজ ও ১৭০ খানি মিটার গেজের এঞ্জিন আসিয়া পেণীছাইবে। এঞ্জিনের জন্য বরাবর ভারতকে বিদেশী শাসক নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের অভিসন্ধিতে স্বধর্মী বৈদেশিক এঞ্জিন নির্মাণকারী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখার ফলেই বর্তমানে আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা। এই দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে এবং স্থায়ীভাবে পরনির্ভরশীলতার গ্লানি ও বিপদ ঘুচাইতে হইলে দেশীয় কারিগর ও অর্থের সাহায্যে স্বদেশের মধ্যেই পূর্ণোদ্যমে এঞ্জিন প্রস্তুত করা প্রয়োজন। অবশ্য কিছু কিছু উপকরণ ও বিশেষজ্ঞদের জন্য আরও কিছুকাল বিদেশের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। তথাপি বর্তমানে রেল বিভাগ এঞ্জিন ও গাড়ি নির্মাণের যে প্রচেষ্টা চালাইতেছেন তাহাতে সমস্যার আংশিক সমাধান হইবে সন্দেহ নাই। এ সম্পর্কে তাঁহাদের অধিকতর তৎপরতার অবকাশ রহিয়াছে তাহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

রেলওয়ের সুপরিচালনা ও জাতীয় সম্পত্তিরূপে উহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে রেলকর্মী ও রেলযাত্রী সাধারণের মধ্যে একটা আন্তরিক সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। রেলকর্মীদের এক অংশ যেমন দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য কুখ্যাত, রেলযাত্রীদেরও একটি বৃহৎ অংশ বিনা টিকেটে মনে হয় না। বাজেট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে চোরাবাজার হইতে মাল ক্রয় করিয়া রেলওয়ে মারফৎ তাহা মফঃস্বলে নিয়া উর্ধতর চোরাবাজারী হারে বিক্রয়, অকারণ রেলকর্মীদের উপর বীরত্ব প্রকাশ প্রভৃতি সদাচারের জন্য খ্যাতিমান! স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সমাজ-চেতনার যে স্বাভাবিক স্ফূর্তি সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের কল্যাণ, সংহতি ও মর্যাদার জন্য একান্ত আবশ্যক, অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই বলিতে হয় আমরা সে বিষয়ে নির্বিকার ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতা এখনও আঁকড়াইয়া রহিয়াছি! রেলওয়ে একটা ব্যবসায়িক সংগঠন মাত্র নহে, দেশের বৃহত্তম সংখ্যক নাগরিকের পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাব-সম্পর্কের ইহা প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। রেল কর্তৃপক্ষ, রেলকর্মী বা রেলযাত্রী কেহই যে এবিষয়ে অবহিত আছেন মনে হয় না। রেলের কোঁচ, আলো প্রভৃতি নাশ করিয়াও এক শ্রেণীর যাত্রী আমোদ অনুভব করিয়া থাকেন। ইহারা একদিকে জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতিকারক, অপরদিকে বৃহত্তর যাত্রী মহলে দুর্নীতিপূর্ণ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আবহাওয়া বিস্তারের মূল কাণ্ডারী। রেলওয়ের 'পাবলিক রিলেশনস্ দপ্তরটি'র যে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে তাহাদের কার্যকারিতা দেখিয়া আমাদের ইহা মনে হয় না! প্রাচীরপত্রের বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রের স্তম্ভে চিঠিপত্র বা বিবৃতি প্রকাশই যে 'পাব্লিকের' সহিত রিলেশনস রক্ষার একমাত্র পথ নহে এই দপ্তরের কর্মকর্তাদের তাহা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। রেলকর্মী ও রেলযাত্রীদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপনের প্রধান দায়িত্ব এই দপ্তরটির উপরই অর্পিত বলিয়া আমরা মনে করি। তজ্জন্য এবং গাড়িগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও সমগ্রভাবে যাত্রীসাধারণের জাতীয় রেলপথের প্রতি মমতাসম্পন্ন হওয়ার জন্য উন্নত আধুনিক প্রণালীতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচারকার্য চালান প্রয়োজন। রেলওয়ের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অবহিত না হইলে প্রকারান্তরে নানা অহেতুক বিভ্রাটের হাত হইতে তাঁহাদের নিস্তার পাইবার উপায় নাই। নিম্নতন সহযোগী রেলকর্মীদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইলে এই প্রচার অভিযান ও অনুরূপ অন্যান্য জনসেবামূলক কার্যে তাঁহারা সাফল্য লাভ করিতে পারেন।

রেল শ্রমিকের প্রতি আন্তরিক দরদ ও সহানুভূতি শ্রীআয়েঙ্গারের ভাষণে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,

"The right of workers to combine for the protection of their interests is undoubted. But on combining together., Unions and Federations of workers should realise that nothing could be to the real interest of the workers themselves unless it is in Union with the interest of the community as a whole. To exploit trade unions for political party ends merely is a crime, whoever may resort to it—"

"অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার অবিসম্বাদিত। কিন্তু সংঘবদ্ধ হওয়ার পর শ্রমিক ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশনগুলির ইহা বুঝা উচিত যে, সমাজের স্বার্থের সহিত যাহার সংগতি নাই এমন কিছুতেই তাহাদের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত নহে। যে বা যাহারাই ইহা করুক রাজনৈতিক দলগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শোষণ করা গুরুতর অপরাধ।" শ্রী আয়েঙ্গার কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট, রাজাধ্যক্ষ কমিটির সুপারিশ, শ্রমিক ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিলের মতামত ও সিদ্ধান্ত সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন ও শ্রমিকদের অধিকতর সুযোগ সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমরা জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম, রেলধর্মঘটের প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইয়াছে। দেশের বর্তমান সংকটপূর্ণ সময় বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য আমরা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও নিখিল ভারত রেলওয়েমেনস ফেডারেশনের অন্যান্য সকল কর্মীদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাইব। যানবাহনসচিব ও ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় এই বাঞ্ছিত মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে ইহাতে আমরা খুসী হইয়াছি। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া ফেডারেশনের ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের দূরদৃষ্টি ও কর্তব্যবোধেরই পরিচয় দেয়। বস্তুত, বর্তমানে দেশের সকল কর্মক্ষেত্রেই যুদ্ধকালীন বিপর্যয়ের জের পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যদি আমরা সত্যই অন্তরে পোষণ করি, তাহা হইলে নিজেদের দাবী-দাওয়া ন্যায্যপথে আদায়ের চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করত এখনও কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া নিজেদিগকে সংহত করিতে হইবে। কারণে অকারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া দলীয় ষড়যন্ত্র সার্থক করার জন্য এক শ্রেণীর লোক প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় হইয়াই রহিয়াছে। রেলকর্মীদের মধ্যেও যে ইহারা বিভেদের অপচেষ্টায় তৎপর রহিয়াছে তাহা শ্রীজয়প্রকাশের বিবৃতেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীজয়প্রকাশ বলিয়াছেন, শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা ইহাদের কাজ নহে, যে কোন প্রকারে বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। রেলকর্মী ও রেলযাত্রী উভয়ের সংহতি ও সংঘবদ্ধ শক্তিই শুধু এই ষড়যন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। রেল বাজেটের আলোচনায় এই বৃহত্তর ক্ষেত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

খনিজ তৈলের কথা

শ্রীশান্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত

[কূপ খনন]

তৈল-সম্ভব জমিতে প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পরে শুরু হয় কূপ খনন করা। পরীক্ষার জন্য অনেক সময় একটির পরে একটি কূপ খনন করিয়া যাইতে হয়। যদি কোন কূপে ব্যবসার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈল অথবা তাহার আভাস পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার কাছাকাছি গভীর কূপ খননের কাজ শুরু হয়। কতকগুলি কূপ কতটা জমির উপরে খনন করা হইবে, কি ধরণের হইবে তাহাদের পারস্পরিক দূরত্ব সে সব নির্ভর করে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ও বিষয়ের উপর।

এই প্রবন্ধ-মালার প্রথমে বলা হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ড্রেক মাত্র ৬৯½ ফিটের একটি কূপ খনন করিয়া আধুনিক তৈলযুগের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এযুগে শুধু তৈলের জন্য কূপ খনন তিনিই প্রথম করেন। সেই দিন হইতে বর্তমান সময়ের দূরত্ব প্রায় ১০০ বৎসর হইতে চলিল। ইহার ভিতর তৈল-শিল্প ও কূপ খননের কায়দা এত বেশী অগ্রসর হইয়াছে যে, ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আজ পৃথিবীর গভীরতম কূপ ১৭,৮২৩ ফুট গভীর—অর্থাৎ ড্রেকের প্রথম কূপের ২৯৭ গুণ। কূপের দৈর্ঘ্য ও মাটির উপর হইতে তৈল স্তরের দূরত্ব পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। এখন পর্যন্ত প্রতিবার মানুষেরই জয় হইয়াছে। যক্ষের মত, প্রকৃতি যে সম্পদ মাটির কোন অতল গভীরে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সন্ধানী মানুষ সেই পাতালপুরীতে হানা দিয়া সে সম্পদ নিয়া আসিয়াছে মাটির উপরে তাহার সুখ সুবিধার জন্য। এই দস্যুবৃত্তিতে তাহার সবচেয়ে বড় সহায় কূপ খননের অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী সকল।

কূপ খননের কয়েকটি পদ্ধতি আছে। তাহার ভিতর দুইটি পদ্ধতিই সাধারণতঃ অবলম্বন করা হয়। সংক্ষেপে এই দুইটি পদ্ধতি আলোচনা করা হইতেছে। পদ্ধতি দুইটির নামঃ—1. Cable Tool method for Drilling, 2. Rotary Drilling ইহার বাঙলা হইতে পারে (১) কূপ খননের দা-হাতুড়ি প্রণালী এবং (২) ঘূর্ণমান অস্ত্র দ্বারা খনন।

প্রথম পদ্ধতি দড়ি-হাতুড়ি। তৈলশিল্পের প্রথমাবস্থায় এই প্রথাই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইত। এখনও যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়। প্রথমতঃ যে জায়গায় কূপ খনন করা হইবে ঠিক তাহার উপরে একটি বিরাট লোহার খাঁচা তৈয়ার করা হয় ইহার ইংরাজী নাম "ডেরিক"। বাঙলাতেও ডেরিক বলিলে ক্ষতি নাই। কারণ "ডেরিক" কথাটির বয়স খুব বেশী নহে। এই কথাটি চয়ন করা হইয়াছে সপ্তদশ শতাব্দীর ডেরিক নামক এক বিখ্যাত জল্লাদের নামানুসারে। ফাঁসির খাঁচার বিশেষজ্ঞ ডেরিকের নাম অমরত্ব লাভ করিল তৈলের খাঁচায়!

এই ডেরিক বা খাঁচা হইতে খনন কার্যের সংশ্লিষ্ট সমস্ত ভারী জিনিস ওঠানো নামানো হয়। কূপ খননের পরেও বহু ক্ষেত্রে কূপের উপরের ডেরিক ভাঙিয়া ফেলা হয় না। কারণ একটি কূপের "জীবিত"কালে নানা রকমের

ক- কূপটি একটি বক্র কূপ পথের নমুনা
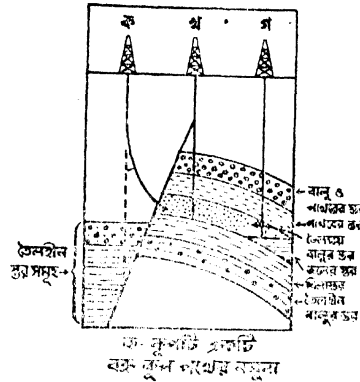
দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। কূপটির প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে তাহার ভিতরকার লোহের পাইপ ইত্যাদি টানিয়া বাহির করিতে হয়। এই সমস্ত কাজের পক্ষে ডেরিকের প্রয়োজন অপরিহার্য। আজকাল অবশ্য "পোর্টেবল ডেরিক" বা চাকার পরে স্থিত একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া যায় এইরূপ ডেরিকের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। সেই জন্য কূপ খননের পরে ডেরিক অনেক ক্ষেত্রে ভাঙিয়াও ফেলা হয়। প্রয়োজন হইলে পোর্টেবল ডেরিকের আশ্রয় লওয়া হয়। খননের কার্যে ডেরিকের কাজ বহুবিধ। ইহা নানা ধাপে বিভক্ত। ইহার উপর হইতেই নানা ধরণের ভারি ভারি জিনিস, নানা মাপের পাইপ ইত্যাদি কূপের ভিতর নামাইয়া দেওয়া হয়। যে হাতুড়ি বা ঘূর্ণমান অস্ত্র মাটির নীচে বাধা ভাঙিয়া বা কাটিয়া কূপের পথ সৃষ্টি করিয়া চলে, তাহারও পরিচালনা হয় এই ডেরিকের উপর হইতে। তৈল ক্ষেত্রের ছবিতে যে বিরাট বিরাট কাঠাম দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদেরই বলে ডেরিক। এই ডেরিকের উপরে তৈলশ্রমিকদের অতিরিক্ত শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষা হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও থাকে।

ডেরিকের সবচেয়ে উপরে থাকে কয়েকটি পুলি। প্রত্যেকটি পুলির উপর দিয়া মোটা শক্ত লোহার তার (যাহাকে আমরা এই ক্ষেত্রে দড়ি বলিতেছি) ভারি ভারি বোঝা ধারণ করিয়া চলা ফিরা করিতে পারে। সমস্ত মিলিয়া খনন করিবার যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জামকে বলা হয় ড্রিলিং রিগ—আমরা বলিতে পারি খনন যন্ত্রাবলী। সংক্ষেপে ইহার বর্ণনা এইরূপ।

১। ডেরিকের সর্বনিম্ন ধাপের পাশে থাকে একটি ইঞ্জিন অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক মোটর। এই ইঞ্জিন খননের সমস্ত শক্তি সরবরাহ করে। বেল্ট দিয়া ইহার সহিত কয়েকটি চাকার যোগাযোগ আছে।

২। প্রধান চাকাটি ইঞ্জিন হইতে গতি সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য চাকায় বেল্টিং-এর সাহায্যে বেগ সঞ্চার করে ইহার নাম Band wheel বা ব্যাণ্ড চাকা।

৩। ব্যাণ্ড চাকার সামনাসামনি আর একটি চাকা থাকে, তাহার নাম "বুল হুইল"। বাঙলায় বুল চাকা বলিতে বাধা নাই। এই চাকায় জড়ান থাকে খুব লম্বা লোহার তারের দড়ি এই দড়ির এক প্রান্ত থাকে চাকায় জড়ান, আর অন্য প্রান্ত ডেরিকের উপরের একটি পুলির উপর দিয়া নীচে নাবিয়া আসিয়া কয়েকটি আটকাইবার যন্ত্র-কৌশলের ভিতর দিয়া বিরাট একটি হাতুড়ির সহিত যুক্ত হয়। বুল চাকার দড়ি ফুরাইয়া গেলে আবার নূতন দড়ি যোগ করা হয়। এই চাকাটি ঘুরিবার শক্তি পায় ব্যাণ্ড চাকা হইতে বেল্টিং-এর সাহায্যে।

৪। ব্যাণ্ড চাকার ঠিক পিছনে থাকে "স্যাণ্ড রীল" অথবা বালু চাকা—অর্থাৎ কূপের ভিতর বালু, পাথর প্রভৃতি যাহা কাটিয়া কূপের পথ তৈয়ার হয়, এই চাকার সাহায্যে তাহা কূপের ভিতর হইতে উপরে তুলিয়া আনা হয়। এই চাকাও ঘুরিবার শক্তি ব্যাণ্ড চাকার নিকট হইতে পায়। বালু-চাকার উপরে জড়ান থাকে একটি খুব বড় পাকানো লোহার তারের দড়ি। এই দড়ির মুক্ত প্রান্ত ডেরিকের উপরের একটি পুলির উপর দিয়া ডেরিকের ভিতরে নামিয়া আসিয়া একটি ১০।১৫ ফুট
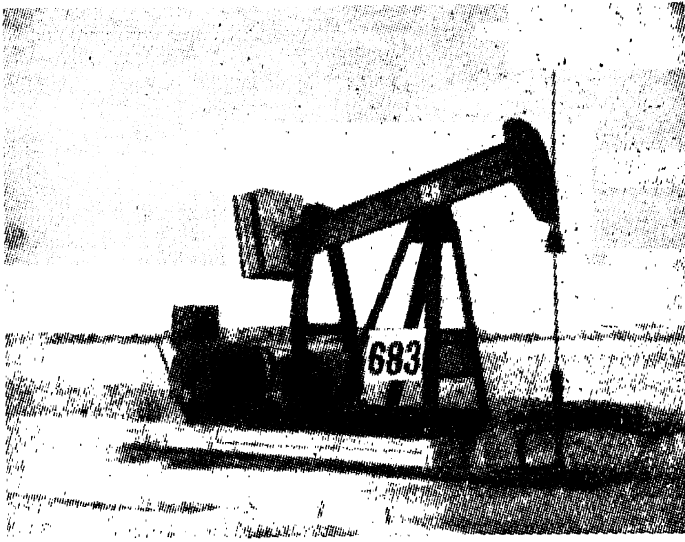
ডেরিক তুলিয়া লইবার পরে একটি তৈল-কূপের চেহারা।

লম্বা পাইপের ভার বহন করে। এই পাইপের দুই মুখই খোলা। তবে ইহার নিচের দিকে একটি ভাল্‌ভ থাকে। এই ভাল্‌ভযুক্ত পাইপ-টির নাম "বেইলার"। আমরা সাধারণ গর্ত খুঁড়িবার সময় গর্তের আল্‌গা মাটি হাত দিয়া উপরে তুলিয়া আনি। তাহার পর আবার খুঁড়িতে শুরু করি। গভীর কূপ খননের বেলায় এই বেইলারের সাহায্যে আল্‌গা মাটি, বালু, পাথর প্রভৃতি উপরে তুলিয়া আনা হয়। খানিকটা খননের পরে বেশ জোরে বালু-চাকা ও তাহাতে জড়ানো দড়ির সাহায্যে "বেইলার"-টিকে গর্তের ভিতর নামাইয়া দেওয়া হয়। নামিবার সময় নীচের ভাল্‌ভটি খোলা থাকে। সুতরাং পাইপের ভিতরটা আল্‌গা মাটি ও পাথর প্রভৃতিতে ভরিয়া যায়। উপরে টানিয়া তুলিবার সময় ভাল্‌ভটি বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং পাইপের ভিতরের জিনিস পড়িয়া যাইতে পারে না, তাহারা পাইপের সহিত কূপের উপরে চলিয়া আসে।

৫। উপরে যাহাকে হাতুড়ি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইংরেজীতে তাহাকে বলে "বিট" (bit) যাহার এক অর্থ a small tool for boring। এই যন্ত্রটি একটি বিরাট লৌহের হাতুড়ি বিশেষ। ইহার প্রান্ত থাকে বেশ ধারালো। ডেরিকের ভিতর ঠিক কূপ খননের জায়গার উপরে এই হাতুড়িটি খননের প্রথমে তারের সঙ্গে ঝোলান থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই তারের অপর প্রান্ত জড়ানো থাকে বুল চাকায়। ব্যান্ড চাকার সঙ্গে এমন একটি দণ্ডের যোগ থাকে, যাহা চাকা ঘুরিবার সময় ওঠা-নামা করিতে থকে। এই দণ্ডটির ইংরাজী নাম "ওয়াকিং বিম"। এই দণ্ডটি যান্ত্রিক কৌশলের দ্বারা যে হাতুড়ি খনন করে, তার উপরের দড়িটি একবার তুলিয়া পর মুহূর্তে প্রচণ্ড বেগে ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে নীচের বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া হাতুড়িটি ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে। এই প্রবেশের সময় দড়ির ঘূর্ণন শক্তি ছাড়া হাতুড়িটি অল্প-বিস্তর ঘুরিতেও থাকে যাহার ফলে লম্বায় ক্রমবর্ধমান একটি গোল কূপ সৃষ্টি হইতে থাকে। খানিকটা পথ কাটা হয় আর বেইলারের দ্বারা আল্‌গা মাটি ও পাথর বাহিরে টানিয়া তোলা হয়।

৬। ইহার পরে কাঁচা গর্তকে লোহার পাইপের ঘের দিয়া পাকা করিবার পালা। গর্তকে পাকা না করিলে ইহার পার ধসিয়া যায়, ফলে অনেক পরিশ্রম নষ্ট হইয়া যায়। এই সব পাইপকে বলা হয় "কেসিং পাইপ"। এই সব পাইপ প্রথমে ডেরিকের উপর হইতে পুলির উপর দিয়া ঝোলান আলাদা দড়ির সাহায্যে তোলা হয়। এই দড়ির অপর প্রান্ত থাকে ডেরিকের নীচে অন্যান্য চাকার পাশে বসান আর একটি চাকায়। এই চাকার নাম "কাফ্ চাকা"। হাতুড়িটি ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য কূপের ভিতর অল্প-বিস্তর জলের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—ঘূর্ণমান অস্ত্র দ্বারা খনন

এই পদ্ধতি কূপ-খননের ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়াছে। এই পদ্ধতিতে খুব দ্রুত খননের কাজ অগ্রসর হয়, আর ইহার সাজ-সরঞ্জাম ফিট করিতে অথবা তাহা গুটাইয়া স্থানান্তরিত করিতে প্রথম পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম সময় লাগে। আর এই পদ্ধতির দ্বারা খুব গভীর কূপ খুব অনায়াসে খনন করা যায়। প্রথম পদ্ধতিতে ডেরিকের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ ফুটের ভিতর থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ডেরিকের উচ্চতা হওয়া প্রয়োজন ১২৫, আর ইহার সর্বনিম্ন ধাপের আয়তন ২৪ ফুট×২৪ ফুট। ইহা মোটামুটি হিসাব। প্রয়োজনানুসারে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। ডেরিকের সর্বোপরে ক্রাউন ব্লকের ভিতর থাকে অন্তত পাঁচটি পুলি, অনেক সময় প্রয়োজনানুসারে বেশীও থাকে। ইহার প্রত্যেকটির উপর দিয়া খননকার্যের নানা দিক সংক্রান্ত মোটা পাকানো লোহার তারের দড়ি ওঠা-নামা করে। প্রত্যেকটি তারের বা দড়ির অপর প্রান্ত ডেরিকের পাশে রক্ষিত কোন না কোন একটি চাকায় জড়ানো থাকে। খোদাই সরঞ্জামের সর্বনিম্ন থাকে "বিট" বা ধারালো যন্ত্র যাহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাথর বা মাটি কাটিয়া নীচে প্রবেশ করিতে থাকে। একটি কলারের দ্বারা এই যন্ত্রকে খোদাই পাইপের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই পাইপের কিছু উপরে থাকে চৌকা ধরণের একটি পাইপ। ইহার নাম 'কেলি'। কেলিটি ডেরিকের উপরে রক্ষিত একটি টেবিলের চারি কোণ বিশিষ্ট ছিদ্রপথে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এই ছিদ্রপথের ভিতর কেলি আটকানো থাকিলেও উপরে নীচে ওঠা-নামা করিতে পারে। টেবিলটি ডেরিকের উপরে নানা গতিতে ঘুরিতে পারে, সেই সঙ্গে, কেলি, পাইপ, খননযন্ত্র সব কিছু ঘুরিতে থাকে, আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচে চলিয়া যায়। কেলি নিজেই যখন অনেকটা নীচে চলিয়া যায় তখন সমস্ত সরঞ্জাম টানিয়া উপরে তোলা হয়। নীচের গোল পাইপের সঙ্গে যুক্ত কেলি তখন খুলিয়া ফেলা হয়। সেই সঙ্গম স্থানে জুড়িয়া দেওয়া হয় নূতন পাইপ, তাহার পরে আবার সমস্তটা নীচে নাবাইয়া দেওয়া হয়। যে নূতন পাইপ জোড়া হইল তাহার অপর প্রান্তে আবার কেলি জুড়িয়া দেওয়া হয়, এবং পূর্বের মত কেলিকে টেবিলের ছিদ্রপথে যুক্ত করিয়া খনন-কার্য চালান হইতে থাকে। এইরূপে পাইপের পরে পাইপ জুড়িয়া ক্রমাগত কূপের পথ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া চলে। খননের সময় মুক্ত মাটি, পাথর ও বালি ইত্যাদি এই পদ্ধতিতে উপরে তুলিয়া আনিবার কায়দা ভিন্ন রকমের। খোদাই লাইনটি এই প্রণালীতে একেবারেই ফাঁপা। এমন কি, কাটিবার যন্ত্রটিও ভিতরে ফাঁপা। কেলির উপরে পাইপের সঙ্গে একটি রাস্তায় জল দিবার পাইপের মত হোস্ পাইপ যুক্ত থাকে। এই পাইপের দ্বারা ফাঁপা খোদাই লাইনের ভিতর দিয়া জোড়ালো পাম্পের দ্বারা

ক্রমাগত জলমিশ্রিত তরল কাদা বেগের সহিত কূপের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। পাইপের ভিতর দিয়া আসিয়া কাটিবার যন্ত্রের ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া এই কাদা কূপের দেয়াল ও পাইপের ভিতর যে জায়গা থাকে তাহার ভিতর দিয়া আবার উপরে উঠিয়া আসে। আসিবার সময় ভিতরের আলগা মাটি, পাথর ইত্যাদি সব সঙ্গে করিয়া আনে।

এই কাদার গুরুত্ব ঘূর্ণমান যন্ত্র দ্বারা খননের কাজে অত্যন্ত বেশী। এই কাদার গঠন কিরূপ হইলে খননের কাজ আরও ভালভাবে চলিতে পারে সে বিষয়ে নিয়তই গবেষণা চলিতেছে। বার্মা অয়েল কোম্পানীর সহিত সহযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ জে এন মুখার্জি ও তাঁহার ছাত্রবৃন্দ এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ করিয়াছেন। এই কাদা বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত করিয়া চৌবাচ্চার ভিতর রাখিতে হয়। এই কৃত্রিম কাদা পরে পাম্প করিয়া ব্যবহারে আনা হয়। এই কাদার সহিত যে সব বালু, পাথরের টুকরা ইত্যাদি উঠিয়া আসে তাহা পরীক্ষাগারে রাসায়নিক ও অন্যান্য ভাবে পরীক্ষা করা হয়। এই সব পরীক্ষা হইতে কোন কোন স্তরের ভিতর দিয়া খোদাই-পাইপ নাবিয়া চলিয়াছে তাহার খবর যথার্থভাবে পাওয়া যায়। আর তৈলময় বালুকার দেখা মিলিলে বলা হয় ইউরেকা— পাইয়াছি— তৈলস্তরের সন্ধান মিলিয়াছে।

সাধারণতঃ তৈল খনির উপরে এই ধরণের উপর-কাঠামো থাকে এবং ইহারই সংলগ্ন মোটর ইঞ্জিন বা পাম্প থাকে, যাহাদ্বারা তৈল নীচের স্তর হইতে উপরে তোলা হয়

সুদীর্ঘ কূপ খননের সময় অনেক সময় পথ সোজা না হইয়া বাঁকিয়া যায়। একজনের জমির সীমান্তের কূপ বাঁকিয়া গিয়া অন্যের তৈলস্তরে হানা দিতে পারে। সে-সব ক্ষেত্রে শুরু হয় নানা গোলমাল, মামলা মোকর্দমা ইত্যাদি। সেইজন্য কূপের পথ যাহাতে একেবারে সোজা থাকে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় হয়ত তৈলময় বালুর স্তর মিলিতেছে না, অথবা যে পথ কাটিয়া তৈলের পাইপ ভিতরে প্রবেশ করিতেছে সে পথ অনেক দূরের বিশেষ স্থানে প্রায় দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইচ্ছা করিয়াই কূপের পথের গতি বদলাইয়া দেওয়া হয়। নূতন পথ পূর্বের পথের সহিত একটি কোণ সৃষ্টি করিয়া নীচের দিকে চলিতে থাকে। মাত্র গত বৎসর আমেরিকার পশ্চিম টেকসাসে প্লিমাথ অয়েল কোম্পানীর (Plymouth Oil Co.) একটি সুগভীর কূপ খনন করিবার সময় কূপের দিক্ পরিবর্তন করিয়া আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছে। প্রথমে কূপটি সোজাভাবে প্রায় ১১ হাজার ফিট পর্যন্ত খোঁড়া হয়। কিন্তু তৈলের সহিত দেখা নাই। তাহার পরে কূপের পাইপ টানিয়া তুলিয়া ৮,৪০০ ফিট গভীরে রাখা হয়। কূপের নীচটা সিমেণ্ট দিয়া বন্ধ করিয়া পূর্ব পথের সহিত সাত ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করিয়া বাঁকা পথে আবার খনন শুরু হইল, বাঁকা পথের পাইপ ৮,৪০০ ফিট গভীর হইতে শুরু করিয়া হানা দিল ১২,০০০ হাজার ফিট গভীর বালুর স্তরে—যে স্তর তৈলে টইটম্বুর। বহু পরিশ্রম, বহু অর্থব্যয় সফলতায় আসিয়া শেষ হইল। এই কূপটি গত বৎসর টেকসাস অঞ্চলে বিশেষ আর্থিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়াইয়া দিয়াছিল ইহার চতুর্দিকের জমির দাম। এই কূপের নাম দেওয়া হইয়াছে **Alford No. I.** ইহার নিকটবর্তী জমিতে আরও কূপ খননের কাজ চলিয়াছে।

আসামের ডিগবয় অঞ্চলে বহু কূপসম্পন্ন তৈলভূমি

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, খননের সঙ্গে সঙ্গে কেসিং পাইপ বসাইয়া কূপের দেয়াল পাকা করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে বাহিরের মাটির দেয়াল ও কেসিং-এর ভিতরে যে জায়গা থাকে তাহা সিমেণ্টের কাদা দিয়া ভরিয়া

জমাট করিয়া দিতে হয়। এই কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা ভালভাবে না করিলে উপরের জলের অথবা শুষ্ক বালুর স্তর হইতে জল এবং বালু আসিয়া কূপটিকে অকর্মণ্য করিয়া দিতে পারে।

খননকার্য চালাইবার সময় একাধিকবার কাটিবার যন্ত্র বদলাইতে হয় বা মেরামত করিতে হয়। এই কাজের জন্য সমস্ত পাইপ টানিয়া বাহির করিতে হয়। আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে অনেক সময় শুধু কাটিবার যন্ত্রটিকে আলাদা করিয়া তুলিবার ও ভিতরে প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নির্ভর করে কূপের দৈর্ঘ্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের উপর।

খননকার্য শেষ হইলে তাহার ভিতর অনেক সময় বিস্ফোরক ফাটাইয়া, অথবা হিসাব মত এ্যাসিড (হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড) ঢালিয়া কূপকে চালু করিতে হয়। বিস্ফোরক অথবা এ্যাসিড তৈলের চলাচলের পথে যে সব বাধা থাকে তাহা দূর করিয়া তৈল-প্রবাহে গতি আনিয়া দেয়। সাধারণত কেসিং-এর ভিতর আর একটি সরু পাইপ থাকে তাহাই তৈলের উপরে উঠিবার পথ। এই পাইপের নীচে একরকমের ছিদ্রসম্পন্ন ছাকনি থাকে। ইহা বালু ও পাথর কণার গতি প্রতিরোধ করিয়া তৈলের পথ খোলা ও পরিষ্কার রাখে।

তৈল সাধারণত খনিগ্যাসের সহিত একত্রে মিশিয়া থাকে। তৈল যে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে তাহার মূলে রহিয়াছে মাটির ভিতরকার গ্যাসের চাপ। তৈলবিদ জানেন যে, এই গ্যাসের চাপ যতটা সম্ভব ও যতদিন সম্ভব উচ্চ হারে রাখিতে হয়। তাহা হইলে পাম্প না করিয়াই তৈল উত্তোলন করা সম্ভব। এই চাপ ফুরাইয়া গেলে পাম্প করিয়া তৈল বাহির করিতে হয়। তৈলের টিউবের ভিতর পাম্প গলাইয়া দিয়া, তাহার পর উপর হইতে সেই পাম্পের রড চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। অনেক তৈল-জমিতে গ্যাসের পরিবর্তে তৈলস্তরের চতুর্দিকে যথেষ্ট জলের চাপ থাকে। এই চাপ গ্যাসের চাপ হইতে অধিকতর স্থায়ী, কারণ গ্যাস তৈলের সহিত উপরে উঠিয়া আসিয়া চাপের মাত্রা ক্রমাগত কমাইতে থাকে। কিন্তু তৈল-স্তরকে চাপ দেয় যে-জল তাহা তৈলের সহিত উপরে উঠিয়া আসে না বরং ক্রমাগত তৈলকে তাড়া করিয়া কূপের মুখে নিয়া আসে। অবশ্য তৈলের ভাগ কমিতে থাকিলে অথবা তৈল ও জলের পারস্পরিক পরিবেশ পরিবর্তন হইলে তৈলের সহিত অনেক ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ জল যে উপরে উঠিয়া না আসে এমন নহে।

এই সব গ্যাস তৈলেরই মত মূল্যবান। ইহা শূন্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। ইহাকে উচ্চ চাপে গ্যাসের পিপার ভিতর বন্দী করিয়া রাখা হয়। ইহা পাইপে করিয়া জ্বালানী গ্যাস হিসাবে ব্যবহার হয়। ইহা হইতে নানারকমের রাসায়নিক, প্ল্যাসটিক, কৃত্রিম রাবার প্রভৃতি তৈয়ার হইতে পারে। কোন গ্যাসের সব চাইতে কি ভাল ব্যবহার হইতে পারে তাহা নির্ভর করে সেই গ্যাসের উপাদান-সমূহের রাসায়নিক গুণাবলীর উপর।

যে সব কূপ হইতে তৈল আপনা হইতে উপরে উঠিয়া আসে না—তাহাদের কয়েকটিকে একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় পাম্পিং স্টেশন হইতে চালান হইয়া থাকে।

কূপের ব্যাস কি হইবে তাহা নির্ভর করে জমির তৈল সম্পদের উপর। যেখানে তৈলের পরিমাণ বেশী নহে সেখানে বড় ব্যাসের কূপ খনন করিয়া কোন লাভ নাই। আবার একই কূপ যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একই মাপের হইবে এমন কোন কথা নাই। ক্যালিফোনিয়া অঞ্চলে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম ১২০০ ফুট ২৭ ইঞ্চি চওড়া কাটিবার যন্ত্র দ্বারা বানান হইল, এবং তাহাতে দেওয়া হইল ৮½ ইঞ্চি মাপের খনন বা ড্রিল পাইপ। ইহার পরের ৪৫০০ ফুট কাটিবার সময় ব্যবহার করা হইল ১৮ ইঞ্চি পরিমাপের কাটিবার যন্ত্র ও সেই হিসাবে অল্প ব্যাসের খনন পাইপ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কাটিবার যন্ত্র বদলাইবার সময় সমস্ত পাইপ খুলিয়া আবার বসাইতে হয়। পাইপের মাপ বদলাইতে হইলেও এই পন্থাই অবলম্বন করিতে হয়।

কূপের ভিতর হইতে যে তৈল উঠিয়া আসিল তাহাকে সরাসরি পাঠাইয়া দিতে হয় শোধনাগারে। অনেক সময় হাজার হাজার মাইল পথ জমির উপরের পাইপ-এর ভিতর দিয়া এই তৈলকে শোধনাগারে নিয়া আসা হয়। কখনও বা জাহাজে করিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে অপরিস্রুত তৈলকে লইয়া গিয়া সেখানকার শোধনাগারে পরিস্রুত ও নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়।

[এই প্রবন্ধের ছবিগুলি বার্মা শেল কোম্পানীর প্রচার-বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

অন্য দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমরের খেয়াল হয়, এ সব ব্যাপার নিয়ে মিথ্যে তর্ক করা—যা হয় হোক, ার কি! দেশ গোল্লায় গেলেও ার কিছু যাবে আসবে না। সব মুভমেণ্ট নিয়ে তার লাভ কি। চৌধুরীর ব ব্যাপারে মন্তব্য করা চাই। না, ভালই রেছে, বাণীকে বিয়ে করতে চৌধুরী রাজী য়নি!

রাজনীতিটা তেমন জমে না। সমর উঠে ড়ে। দ্বিতীয়বার অনুরোধ করবার মত তার নের অবস্থা নয়। বাবার কথাই ঠিক, এসব র তাদের মত অবস্থার লোকের বোনের বিয়ের থা তোলা ধৃষ্টতা! রাস্তায় বেরিয়ে সমরের ন হলো, চৌধুরীর কাছে বড় দীনতা প্রকাশ রে ফেলেছে—এর পর বন্ধুত্বের আলাপ বজায় খা অসম্ভব। সব দিক থেকে নিজেকে বড় রাজিত মনে হয়। একটা সান্ত্বনা থাকে, াগিস্ চৌধুরীর বোনের কাছে নিজেকে ছোট রে বলেনি। সেদিনকার রাত্রের দুর্বলতা কাশ হয়ে পড়েনি! সমরের নিশ্চিত বিশ্বাস য়, রেবা তাকে প্রত্যাখ্যান করতো। মৃদু হেসে লতো, sorry, I am engaged!

চৌধুরীদের বাড়ির গেট থেকে সমর একরকম ছুটে পালিয়ে আসে—পিছন ফিরে না াকিয়ে তার মনে হয়, বাইরের ঘরে বসে ধুরী আর চৌধুরীর বোন এতক্ষণ তাকে ন করে হাসাহাসি করছে। কিন্তু বাণীকে যে করার কথা চৌধুরীর পক্ষে ভাবা কি ক্ষরে অসম্ভব?

কি ভেবে সমর হিসেব করে দেখে, আজ য়ে মাত্র ষোল-সতের দিন সে দেশে ফিরেছে। বু এই পক্ষকাল যেন তার কাছে কতদিন, ত কাল মনে হয়েছে! দিনের গণনায় সময়টা র্ঘ না হলেও মনের হিসেবে এত দীর্ঘ সময় ন আর কখনো সে অতিবাহিত করেনি—এর ছে যুদ্ধক্ষেত্রে কাটান গত ছ বছরটা হ্রস্বই, ই সেদিনের ব্যাপার! ঘটনাবহুলতা জীবনের রিধি বিস্তৃত করে না সংকুচিত করে? ঠাৎ সমরের এই দীর্ঘসূত্রতা উপলব্ধির ারণ কি?

সমর স্পষ্ট মনে করতে পারে, দেশে ফেরবার পূর্ব পর্যন্ত গত ছ বছরের স্মৃতিটা দীর্ঘ আর ভারি ছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে দেশের গাড়িতে পা দিল সেই মুহূর্তে সে-স্মৃতির বিলুপ্তি ঘটলো—ছ বছরটা ছ'দিনের স্মৃতি মাত্র হয়ে রইল। তার পর দেশে ফিরে সময় যেন আর কাটতে চায় না, আশাভঙ্গের বেদনায়, নতুন অভিজ্ঞতায় ছুটির মেয়াদ যেন ফুরতে চায় না। এক মাসের ছুটী পেয়ে মনে হয়েছিল এত অল্প সময় তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কত সম্ভাবিত সুখের স্পর্শে এ'কদিনের আয়ু নিঃশেষ হয়ে যাবে, সমর বুঝতেই পারবে না—ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাকে ফিরে আসতে হবে। বিয়োগব্যথায় সুখস্মৃতির বেদনাময়তা পরবর্তী দিনগুলোকে ভারি করে রাখবে। স্মৃতির রোমন্থনে বর্তমানের মুহূর্ত-গুলো অকারণে দীর্ঘসূত্রতা করবে। কিন্তু কই? সময়কে ধরে রাখা যায় না বলে যারা আক্ষেপ করে সমর আজ তাদের দলে নয়, সময়ই আজ তাকে ধরে রেখেছে!......

আশা সমর কিছু করে না, ভেবেও পায় না, মনের কোণে কোন প্রত্যাশা এখনো আছে কিনা। অলকার চিঠি পেয়ে তাই যেন বিব্রত হয়ে পড়ে। এ আবার কি? আনন্দিত পুলকিত হবার কথা সমর যেন ভুলে যায়। অনেকক্ষণ চিঠিটা খুলতে পারে না—ভাবটা, যাক্, সময় মত দেখলেই হবে, এমন তাড়া কিছু নেই। আশ্চর্য, মনের এই আগ্রহহীনতা! তবে কি সমর সত্যিই অলকা সম্বন্ধে হাত ধুয়ে-মুছে ফেলেছে? কোন অজুহাতে পূর্ব সম্বন্ধ স্থাপনের আর ইচ্ছে নেই? ফিরে দেখার হৃদয়াবেগ!

চিঠিটা অনেকবার হাতে তুলে খুলতে গিয়ে খুলতে পারে না। কেমন যেন একটা অজানা সংশয় জাগে। কি লিখেছে কে জানে—ভাল কিছু মন এখন শুনতে চায় না, তবু মন্দ কিছুর ভয় করতেও মন ছাড়ে না। কিন্তু আর কি মন্দ হতে পারে?

অলকা লিখেছে : শুনলুম, আজ দশ পনের দিন তুমি দেশে ফিরেছ। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না করার কারণটা বুঝলুম না। হঠাৎ কি করে বর্জনীয় হলুম? আত্মীয়স্বজন আর পাঁচজনের মত তুমিও কি আমাকে সন্দেহ করে দূরে ঠেলে দিলে? কিন্তু অপরাধটা আমার কি? আমি সিনেমা করে রোজগার করি বলেই কি আর সকলের মত তুমিও বিরূপ হয়েছ? স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা কি দোষের? আর যে যাই মনে করুক, তুমি কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। কেন তুমি আসবে না?

কিছুদিন আগেও সমর নিজেকে এই প্রশ্ন করেছে : কেন অলকা আসেনি? স্বাবলম্বী হয়েছে বলে প্রেমাস্পদকে মনে রাখার দরকার হয়নি?...... আশ্চর্য, কৈফিয়তের বদলে অলকা উল্টো অনুযোগ করেছে, যেন সমরই অপরাধ করে বসে আছে। যতটা খুশি হবার কথা সমর সে-পরিমাণে খুশি হতে পারে না, অলকার চিঠিটা কিছুতে ভাল মনে নিতে পারে না। এখন অলকা যা খুশি করলেও যেন তার কিছু যায় আসে না। হৃদয়ের তন্ত্রীতে মান-অভিমানের আর সে-সুর বাজে না। অলকা চিঠি লিখলে কি হবে, অলকা সে-অলকা নেই! যে করেই হোক, যে কারণেই হোক পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগের অনাবিলতা আর নেই! আমার বলে হাত বাড়িয়ে অলকাকে বুকের মধ্যে টেনে নেওয়া সমরের পক্ষে আর সহজ নয়। সমরের মনে হয়, চিঠিটা ফাঁকি! চৌধুরীর বোনের নিমন্ত্রণ করার মত। এই প্রথম মনে হলো চিঠি মনের কথা কয় না—চিঠির ভাষায় মনকে পড়া যায় না।

কিন্তু 'কেন তুমি আসবে না?' কি বোঝায় এতে? সমর যে যাবে না অলকা এ কথা ভেবে নিলে কি করে? সে যে বর্জনীয় জানলে কি করে? আজ স্বাবলম্বনের কথা বলছে, এতদিন চেপে গিয়েছিল কেন? সমরের মতামতের দরকার হয়নি তখন? চিঠিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় গর্ব যেন ফুটে বেরোচ্ছে। অলকা অনেক অহঙ্কারী হয়েছে! বাণীর মত প্রবীরের মত যদি তার বিশেষত্ব মানতে মনে মনে দ্বিধা করে? সমরের কেমন মনে হয়, অলকা নিজের কাজের কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছে, ভালবাসার কথা মনে করবার জন্যে চিঠি লেখেনি। অলকা কতদিন অভিনয় করছে? এখন যেন সমরের খেয়াল হয়, তার দীর্ঘ পত্রের অলকা অতটুকু জবাব দিত কেন? ঠকে যাওয়ার জন্যে নিজের গালে নিজের চড় লাগাতে ইচ্ছে করে এখন। না, না, কিছুতেই অলকার সঙ্গে দেখা করবে না—নিজেকে আর ছোট করবে না। দরকার হয় অলকা নিজে এসে দেখা করুক—বলুক, যে যাই ভাবুক, যে যাই বলুক আমি তোমার, আমাকে তুমি গ্রহণ কর। নিজ মূল্য সম্বন্ধে সমর বড় সচেতন হয়ে পড়ে।

চিঠিটা চোখের ওপর আলগোছা ধরা থাকে, এমনি নাড়াচাড়া করে' সমর ভাবতে থাকে, সত্যিই কি আর কোনদিন আগের মত মেলা-মেশা করা যাবে না, অলকাকে বধূ করে' ঘরে আনা যাবে না? সম্বন্ধটা এমন হয়ে গেল কেন? কি বাধা আছে এখন অলকার আহ্বানে সাড়া দিতে? হঠাৎ নিজের আর্থিক অবস্থার

কথা মনে হয় সমরের—কোন্ উন্নতিই ক'রতে পারেনি সে, কোন স্বচ্ছলতাই আনতে পারেনি! সে-তুলনায় অলকা যেন সহস্রগুণ কৃতী। এখন অলকার কাছে যাবে কোন মুখে?' অলকাকে বিমুগ্ধ করবার কোন্ গুণ আছে তার—অর্থ, পদ, মান? অলকাকে কি দিয়ে এখন সে আকর্ষণ করবে? কি আছে তার? ছ' বছর দেশ ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে কি রত্ন সে আহরণ করে' এনেছে? যুদ্ধে গিয়ে কার মাথা কিনেছে? সব যেন কেমন গুলিয়ে যায়—মনের সংবেদনশীলতায় সমর নিজেকে হারিয়ে ফেলে। অলকার চিঠির কোন অর্থ থাকে না। আশ্চর্য হ'য়ে সমর লক্ষ্য করে, অন্যমনস্ক হ'য়ে হাতের চাপে কখন চিঠিটা নিষ্পিষ্ট হ'য়ে দলা পাকিয়ে উঠেছে।......

তিন চার দিন যে কিভাবে কেটে যায় সমর বুঝতে পারে না—কিভাবে কি করে কিছুই যেন খেয়াল থাকে না। এমনভাবে চলাফেরা করে যেন সংসারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হ'য়ে গেছে। বাণী লক্ষ্য করেছে, কিন্তু সাহস করে কিছু জিগ্যেস করতে পারেনি। যোগানন্দবাবু প্রশ্ন করে, কেবল জেনেছেন, ছেলে তার আর দু'পাঁচ দিন পরে কর্মস্থলে ফিরে যাবে। বিয়ের কথা পাড়তে হয়নি—সমরই নিজে থেকে বাপকে বলেছে, এবার যখন ফিরে আসবে তখন সম্বন্ধ দেখবেন, এবারের মত থাক। কাত্যায়নী দেবী কিছুতে বুঝতে পারেননি—যুদ্ধ যখন শেষ হয়েছে, তখন ছেলে তাঁর বিদেশে বিভুঁইয়ে পড়ে থাকবে কেন। সমর মৌখিক আশ্বাস দিয়েছে যাতে চিরকালের জন্য দেশে ফিরে আসতে পারে, এবার তার চেষ্টা করবে। হয়তো এবার গিয়েই ছাড়া পাবে। আজকাল প্রবীর বড় একটা বাড়ী থাকে না, সব সময় মল্লিকপুরেই থাকে। শোনা যায়, 'হোমটার' একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করবার জন্যে সে আজকাল বড় ব্যস্ত। যাবার আগে একবার প্রবীরের সঙ্গে দেখা হলে যেন ভালো হতো—সে যাই করুক সে যে তার এই যুদ্ধবৃত্তির চেয়ে বড় কাজ—এখন সমর স্বীকার করতে চায়। অনেক অমূল্য প্রাণ-সম্পদ নষ্ট হয়েছে, এখন ওরা যদি আবার দয়া দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে, মহত্ত্ব দিয়ে ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনায় প্রাণের শতদল ফোটাতে পারে ভালই। ওরাই হয়তো পারবে। নিজে থেকে একদিন মল্লিকপুরে যাবার কথা সমরের মনে হয়—গেলেই বা দোষ কি? কিন্তু অলকা আবার ওদের মধ্যে কেন? শুধুমাত্র দয়া করে না, মহৎ আদর্শের প্রেরণায় প্রবীরদের দলে মিশেছে? চৌধুরীর মন্তব্যটা বিদ্রূপের মত মনে হয় প্রবীরবাবু কাজের লোক! চৌধুরীর মত নির্বোধ লোক যেন সমর আর জীবনে দেখেনি—কাজটা কার? প্রবীরের নিজের না, আর কারো? মোটা টাকা চাঁদাই ওরা দিতে জানে, প্রবীরদের কাজের মূল্য ওরা কি বুঝবে? বড় লোকের ছেলে বলেই মেজর হয়েছে না হলে এতদিন ঘসতে হতো। একটা যেন জাতক্রোধ হয় লোকটার ওপর। একের নম্বর "হামবাগ"! বোনটাকে আহ্লাদী করে রেখেছে। সমর বড় জোর বেঁচে গেছে ওদের হাত থেকে।......

বাণীর মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না। আর এ কথার কি উত্তরই বা সে দেবে—ভাবতে পারেনি কোনদিন দাদা উপযাচক হয়ে তার সঙ্গে অরবিন্দর সম্বন্ধে কোন কথা জিগ্যেস করবে। দাদা তিরস্কার করবার জন্যে জিগ্যেস করছে কি না, কে জানে।

সমর জিগ্যেস করলে, অরবিন্দবাবুকে ছেড়ে দিয়েছে না, এখনো হাজতে আছেন?

বাণী কিছু না জানার মত চুপ করে থাকে।

মেজর চৌধুরী কিছু করতে পারলে না, না? সমর পুনরায় জিগ্যেস করে।

বাণী দেখলে দাদা যখন সব খবরই পেয়েছে তখন গোপন করে লাভ নেই, বললে, বেল দিয়েছে কাল।

কিন্তু এ খবর দাদার জেনে লাভ কি।

সমর বললে, চৌধুরীর কাছে না গেলেই ভাল করতিস—এতে অরবিন্দকে ছোট করলি।

হঠাৎ দাদার মুখে এসব কি কথা!

সমর বলে যায়ঃ ছাড়া পাবার সুপারিশের কথা যদি ওরা কোনদিন ভাবতো তাহলে পুলিশের গুলীর সামনে কোনদিন এগিয়ে যেতে সাহস করতো না, অন্ততঃ তোর এ কথাটা বোঝা উচিত ছিল। সবার চেয়ে তুই তো তাকে বুঝিস।

দাদা বলে কি! বাণী মনে মনে বোধ হয় অপরাধ স্বীকার করে। চুপ করে মাথা নীচু করে সমরের কথা শোনে। সমর বলে, অরবিন্দর কাজের দায়িত্ব কি তোর, না চৌধুরীর? ভাল-বাসার খাতিরে তুই তা বলে তাকে নীচে নামিয়ে আনতে পারিস না।

চৌধুরীর কাছে সেদিন ছুটে যাওয়াটা অন্যায় কিনা বাণী বুঝে উঠতে পারেনি, তবে সেদিন চৌধুরী বাড়ী থেকে ফিরে তার মনে হয়েছিল—না-গেলে সে ভাল করতো। দাদার কথায় এখন মনে হচ্ছে, হঠাৎ অত উতলা হয়ে কাজটা বড় অন্যায় করে ফেলেছে। অরবিন্দ শুনলেও বোধ হয় ক্ষুণ্ণই হবে।

ভাই-বোন চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। এর পর কি জিগ্যেস করবে সমর যেন মনে মনে তারই মহলা দেয়। বাণীর বিস্ময়ের অবধি থাকে না, দাদা হঠাৎ অরবিন্দর সম্বন্ধে উৎসুক কেন আজ। দাদা এখন আরো কিছুদিন থাকলে ভাল হয়। আশ্চর্য আর ধরা পড়ার লজ্জা নেই বাণীর—অরবিন্দকে দাদা স্বীকার করে নিয়েছে।

হঠাৎ সমর জিগ্যেস করে বসেঃ অরবিন্দ-বাবুকে কি তুই সত্যিই ভালবাসিস? অরবিন্দ-বাবু জানেন সে কথা?

বাণী লজ্জা পায় না, চোখ তুলে এমন ভাবে সমরের দিকে চায়, সমরই নিজের প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এ কি জিগ্যেস করে চলেছে সে ছোট বোনকে—ছিঃ ছিঃ, কাণ্ডজ্ঞান তার লোপ পাচ্ছে দিন দিন।

বাণী কোন জবাব না দিয়ে নিঃসাড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সমর ঘরের বাইরে চেয়ে দেখে দালানের রেলিং ছুঁয়ে একফালি রোদ্দুর সিমেণ্টের লাল মেঝেয় লুটোপুটি খাচ্ছে। দালান মাড়িয়ে চলে যাবার সময় রোদ্দুরটা মেঝ ছেড়ে বাণীর কাঁধে মাথায় উঠে এল যেন—সারা অঙ্গে আলো ঝলমল করে উঠলো।

ভিতরটা বড় অন্ধকার—চোখ ফিরিয়ে সমরের মনে হলো। এরি মধ্যে বাক্স বিছানা গুছবার কি দরকার ফিরে যাবার এখনো তো দেরী আছে। আজ নবেম্বরের পনের তারিখ এখনো এক সপ্তাহ আছে। বাণী হয়তো ঠিক সময়ে গুছিয়ে রাখবে!...

টেবিলে এসে বসে তখনও সমরের মনে দ্বিধা থাকে—অলকাকে চিঠি লেখা ঠিক হবে কি না। না-গিয়ে চিঠির জবাবে মনটাকে ব্যক্ত করা যাবে কি না। মূল্য তারও তত কম নয়, অলকা বুঝুক না। অনেক কথা লেখাবার ইচ্ছেয় কার্যতঃ চিঠিটা কিন্তু ছোটই হলোঃ—

সুচরিতাষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। ভুল বোঝাটা কোন দিকে সেটা এখনো বুঝতে পারলুম না। যেই ভুল বুঝুক, মনে হয় এই-ই যেন হয়েছে। তোমার লজ্জা পাবার কি আছে? আমরা মিলিটারী লোক, অত তলিয়ে দেখার বুদ্ধি আমাদের নেই। সিনেমা করছো তাতে হয়েছে কি? ভালই ত, আর আমি বিরূপ হতে যাব কেন? এটা তো সুখের কথা, তুমি কারো গলগ্রহ হওনি, বরং নিজেকে প্রচার করবার সুবিধে গ্রহণ করেছো। তোমার উন্নতি এবং উত্তরোত্তর খ্যাতি কামনা করি। তোমাকে অপরাধী করে নিজের অপরাধ বাড়াতে চাই না—সত্যিই তো দুর্দিনে তোমাকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। আমাদের মনে করাকরি নিয়ে অত ভেবো না, নিজের ক্ষতি হবে। এ পর্যন্ত অনেক ক্ষতি তো স্বীকার করেছো আর কেন? বিশ্বাস কর, তোমার বর্তমান অবস্থায় আমার এতটুকু অসূয়া নেই। যাওয়া হয়ে উঠলো না তার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত। দু'একদিনের মধ্যে যদি ফিরে না যেতে হতো তাহলে সময় করে একদিন নিশ্চয়ই দেখা করে আসতুম। এতদিন কেন যাইনি সে কথা আর নাই বা জিগ্যেস করলে—এমনিই যাওয়া হয়নি। ভালবাসা জেনো। ইতি—

চিঠিটা বার কয়েক পড়ে খামে ভরে দিলে। এখনও ঠিক করতে পারে না, চিঠিটা এখনি

ডাকে দেবে কি না। একবার মনে হয় যাবার দিনে পথে ছেড়ে গেলেই হবে, আবার মনে হয় চিঠির প্রতিক্রিয়াটা দেখবে না, এমনি চলে যাবে? তা হলে চিঠি লিখে লাভ কি? যুক্তি দিয়ে অলকার দোষ কিছু খুঁজে না পেলেও সমর কিছুতে তাকে নির্দোষ মনে করতে পারে না। আপন মর্যাদায় কোথায় যে লাগে তাও ভেবে ঠিক করতে পারে না। 'কেন তুমি আসবে না' ও অলকার মুখের কথা। কেনর খবর অলকার জানা উচিত ছিল না কি? ভালবাসার গভীরতাটা এত অগভীর হলো কি করে? যাকে একদিন এত আপনার মনে হতো অবস্থান্তরে কেন তাকে এত পর মনে হয়? ক্ষমায় অলকাকে গ্রহণ করা যায় না কি? কি অপরাধ করেছে সে।

খ্যাতি, অর্থ, পদ, মানের লোভ ভালবাসাকে তুচ্ছ করতে পারে? এখন সব ছেড়ে দিয়ে অলকা কি সমরের জীবন-সঙ্গিনী হতে পারবে? অলকাকে সমরের এত ভয় কেন? কি আশ্চর্য মনের সে উত্তাপ গেল কোথায়। সমর কি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে বলে এই অবিশ্বাস দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

চিঠিটা ডাকে দেবার জন্যে সমর বেরিয়ে পড়ে। গলির মুখে এসে কি ভেবে একবার পিছন ফিরে তাকায়। ছাদের আলসেয় একটা অশথ শিশুর কচি পাতায় সকালের রোদ্দুর চুমো খায়—অদৃশ্য বাতাসে একটা কচি পাতা থরথর করে কাঁপে—গলিত তামার মত কি অদ্ভুত রঙ। ওখানে ও গাছটার আয়ুকাল আর কতদিন? হাত-পা নেড়ে উদ্বেলিত প্রাণরসে জীবনের জয়গান গাইছে না, কঠিন মাটির প্রেমে জড়িয়ে পড়ে কলহাস্য করছে? অরবিন্দর জেল হলে বাণী কি খুব দুঃখ পাবে?

যোগানন্দবাবু এবং যতীনবাবুর মধ্যে বন্ধুত্বটা কি সূত্রে, কোথায় এবং কবে হ'য়েছিল সে খবর এখন না রাখলেও চলবে। তবে দুজনের মধ্যে একদা হৃদয়ের সম্পর্কটা যে গভীর ছিল এ কথা জেনে রাখতে হ'বে। যোগানন্দবাবু আজন্ম কোলকাতায় মানুষ, তার ওপর পৈতৃক পাকা বাড়ির মালিক। যতীনবাবুর ওসব কিছুর বালাই ছিল না, জ্ঞান হওয়া থেকে চাকরি করেছেন, ভাড়া বাড়িতে শহরবাস করছেন আর মধ্যে মধ্যে ছুটী ছাটা পেলে দেশে-ঘরে ঘুরে এসেছেন। কোলকাতায় নিজের বাড়ি করবার হয়তো স্বপন দেখেছেন মাঝে মাঝে। সারা জীবন আয়ু ফুরিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফসল হিসেবে নেওয়ার আগে একটা পাকা ইমারৎ খাড়া দেখবার দুরাশা হয়তো তাঁর ছিল—কুড়িয়ে বাড়িয়ে, ভেঙে-চুরে যে কোরেই হোক। (যতীনবাবুর এ মনের কথা যতীনবাবু ছাড়া হয়তো আর কেউ জানতো না,—আমরা এটা তাই আন্দাজ করে নিচ্ছি।) আর্থিক মর্যাদায় এবং ব্যক্তি পর্যায়ে দু'জনে এক ছিলেন না, তবুও দুজনের মধ্যে অনুরাগের সৃষ্টি হ'য়েছিল—যোগানন্দবাবুকে যতীনবাবুর ভাল লেগেছিল আবার যতীনবাবুকে যোগানন্দবাবুর পছন্দ হ'য়েছিল। ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে ওঠে। সামাজিক সুখদুঃখ বোধটা আর উভয় পরিবারের মধ্যে অস্পষ্ট থাকেনি। কালক্রমে যোগানন্দবাবুর বড় ছেলে এবং যতীনবাবুর বড় মেয়ের মধ্যে অকপট মেলামেশাটা পরম রমণীয়তায় পরিণত হয়। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী এং হাফ প্যান্ট বাতিল করে' ধুতি পরে উভয়ে একদিন উভয়ের জন্য বিশেষ সতর্ক এবং সচকিত হ'য়ে পড়ে—অবাধ মেলামেশাটা সময় সময় কপটতা আশ্রয় করে। একটা অব্যক্ত সম্বন্ধের কথা কিভাবে কোথায় যেন জানাজানি হ'য়ে গিয়েছিল। সমর এম-এ পাশ ক'রতে যোগানন্দবাবুর চেয়ে যতীনবাবুর আনন্দটা যেন বেশীই প্রকাশ পেয়েছিল আর নিজের মেয়ের চেয়ে অলকাকে যোগানন্দবাবু যেন একটু বেশীই আমল দিতেন। যতীনবাবুকে প্রায়ই বলতেন, তোমার মেয়েটি বেশ লক্ষ্মী, শোন তো মা শোন! শুনে যতীনবাবুর চোখে গর্বের সঙ্গে আরো একটা কিছুর সম্ভাবনা জ্বলজ্বল করে' উঠতো। উভয় পরিবারের মধ্যে এই ভাললাগালাগি, এই আত্মীয়তাবোধ, এই সৌজন্য এবং সৌহার্দ্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে স্পষ্ট করে' কেউ কাউকে কিছু না-বললেও মনে মনে সবার যেন জানা ছিল। কিন্তু ছেলে বড় হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছলতাটা যত অচল অবস্থায় পৌঁছতে লাগল যোগানন্দবাবুর বন্ধুত্বপ্রীতিটা কেমন যেন রুদ্ধ হ'য়ে এল। এই আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কাকে তিনি দায়ী করলেন—ছেলেকে না বন্ধুত্বকে, বোঝা গেল না। লেখাপড়া শিখে ছেলে সময় মত রোজগার করে না, এর জন্যে দোষ দিলেন কাকে? তিনি বিরক্ত হ'য়ে একদিন যতীনবাবুকে বললেন, মেয়েকে অত লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ কি। দেখে শুনে একটা বিয়ে দিয়ে দাও এবার।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, তবুও যতীনবাবু বুঝতে পারেননি—জিগ্যেস করলেন, কেন লেখাপড়া শিখলে দোষ কি? তুমি লেখাপড়া পছন্দ কর না?

যোগানন্দবাবু বললেন, কেন করবো না? কিন্তু বেশী শিখে হ'বে কি, সেই তো ঘরকন্নাই করতে হ'বে শেষে—লেখাপড়া শিখেচে বলে তো কেউ আর তোমার মেয়েকে মেমসাহেব করে রাখবে না, যথেষ্ট শিখেচে!

হয়তো সাদাসিদে মানুষ বলে যতীনবাবু তখনো বোঝেননি, বললেন, বেশ! তুমি যখন বলচো, কলেজ ছাড়িয়ে দেব।

যোগানন্দবাবু কেবল বললেন, তাই দিও।

বন্ধুর কথাবার্তার ধরণটা সেদিন ঠিক না বুঝতে পারলেও যতীনবাবুর মনে খট্‌কা রয়েই গেল। হঠাৎ অলকার বিয়ের জন্যে উনি অত ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন কেন—বন্ধুর অবস্থার দিকে চেয়ে ঐ পরামর্শ দিলেন, না, আরো কিছু অন্য-কিছু ভেবে ও-কথা বললেন? তার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখতে হ'বে কেন। দু'একদিন পরে ব্যাপারটাকে সহজ করে' নেবার জন্যে যতীনবাবু উপযাচক হ'য়ে যোগানন্দবাবুকে জিগ্যেস করলেন, হঠাৎ সেদিন অলকার বিয়ের কথা বললে কেন ভাই, আমি তো ভেবেচি—

তাড়াতাড়ি ও প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে যোগানন্দবাবু বললেন, না, এমনি বলছিলাম—বিয়ে-থা দিতে তো হ'বে, এখন থেকে চেষ্টা করলে ভাল, শেষে—

যতীনবাবু মনে মনে ক্ষুন্ন হ'লেন, বললেন, কেন, তোমার বড় ছেলে আর আমার বড় মেয়ে—

কথাটা যোগানন্দবাবু যেন বুঝতেই পারেননি। যেন নিজেকে নিজে শুনিয়ে যোগানন্দবাবু বললেনঃ ছেলের বিয়ে এখনি আমি দিচ্ছি না। রোজগারপাতি আগে করুক, তারপর ওকথা। সেদিন বন্ধুর মনোভাবটা বুঝতে যতীনবাবুর দেরী না হ'লেও নিজের কাছে নিজেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলেন—নির্লজ্জ বেহায়াপনার ধিক্কারে নিজেকে ধমক দিয়েছিলেন। চাঁদ ধরতে না পারার অকৃতকার্যতায় বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে কেমন একরকম অনর্থক হাসি হেসেছিলেন। যতীনবাবু মেয়েকে কিন্তু কলেজ ছাড়িয়ে নেননি—অলকা যথারীতি পড়াশোনা করে' আই-এ পাশ করলে। বন্ধুর মনোভাব জানার পরও যতীনবাবু পূর্ব হৃদ্যতা বজায় রাখবার চেষ্টা করেন, মেলামেশাটা ঠিক রাখেন। যতীনবাবুর স্ত্রী বরং অনেকবার এ বিষয়ে সমরের মতামতটা গোপনে জানবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন, কিন্তু যতীনবাবু বার বার নিষেধ করলেন, কি ভেবে করলেন তিনিই জানতেন কেবল।

তারপর সমরের যুদ্ধে যাওয়ার পর থেকে যতীনবাবু মেলামেশাটা কমিয়ে দেন। পূর্ব সম্বন্ধে যোগানন্দবাবুর সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রাখবার মত মনের স্থৈর্য যেন তাঁর নষ্ট হ'য়ে যায়। যোগানন্দবাবুও বন্ধুর অন্তর খুঁজে দেখবার জন্যে বড় বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেননি। দুই বন্ধুর মনের সহসা এই পরিবর্তন অলকা বা সমর কেউ জানেনি। অলকা হয়তো ভাবতো যুদ্ধাবস্থায় সংসারের ভাবনায় বাবা বড় বেশী আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠেছেন—এর বেশী কোন কিছু জানারও তার উপায় ছিল না। সবচেয়ে আশ্চর্য, যতীনবাবুর স্ত্রী, তিনিও স্বামীর সঙ্গে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, যোগানন্দবাবুর মত যাই থাক্ সমরের মতটাই শেষ পর্যন্ত খাটবে, সুতরাং এ ব্যাপারে বেশী উৎসাহী হ'য়ে ঘাঁটাঘাটি করা উচিত হ'বে না। এরপর নিষ্ঠুর যুদ্ধের সংঘাতে স্বার্থসর্বস্ব

অস্তিত্বরক্ষার চেষ্টায় মানুষের সব মানসিক বৃত্তিগুলো যেন খোয়া গেল, কোথায় রইল জন্ম-বিবাহের উৎসব আয়োজন, কোথায় রইল তার ভাবনা-কামনা! যতীনবাবু মেয়েকে পাত্রস্থ করার কোন চেষ্টাই করেন নি। ভবিষ্যতের দিকে চেয়েছিলেন। এদিকে দিনে দিনে যোগানন্দবাবুর সংসার যত স্বচ্ছল হ'য়ে উঠতে লাগল, অপরদিকে যতীনবাবুর অবস্থা তেমন চরমে উঠলো। দু'জনে অনিবার্যভাবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লেন। অপমানের গ্লানিটা যতীনবাবু যতই ভুলে থাকবার চেষ্টা করুন, দুই বন্ধুর মধ্যে অবস্থার পার্থক্যটা ততই মনে বাজতে লাগল—অভিমানটা পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠলো। একদিন স্ত্রীর কাছে দুঃখ করলেন, এই সময় আমার যদি একটা উপযুক্ত ছেলে থাকতো তা হ'লে এত কষ্ট হ'তো না। অলকা পড়া ছেড়ে চাকরি নিলে।

অলকার মনে আছে, দুর্ভিক্ষের সময় প্রতিদিন মুখের গ্রাসের সংস্থান নিয়ে তাদের সংসারে সে কি দুর্ভাবনা! আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের কাছে চাল সংগ্রহের জন্যে কি আকুলতা। সমর চলে যাবার পর অলকা অনেকদিন যোগানন্দবাবুর বাড়ি আসে নি। এমনিই। সেদিন নিজেদের দুর্ভাবনার সান্ত্বনা পেতে কি সাহায্য নিতে যোগানন্দবাবুর বাড়ি এল। অলকা লক্ষ্য করলে, তাকে দেখে কেমন যেন একটা থতমত ভাব যোগানন্দবাবুর ব্যবহারে প্রকাশ পেল। অলকা হেঁট হয়ে প্রণাম করতে যোগানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন, ভাল তো? বাবা ভাল আছে?

অলকা মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। কিছুতেই বেশীক্ষণ যোগানন্দবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। সেদিন সমরদের সংসারে সকলের সঙ্গে দেখা করে পূর্বের মত আনন্দ পেল না। সমরদের বাড়িতে নিজেকে অলকা নতুন করে উপলব্ধি করলে। অবারিত দ্বারে অন্তরের প্রবেশ হয়তো সব সময় সম্ভব নয়। কাত্যায়নী দেবীও সেদিন কেমন স্তব্ধ জড়সড় ছিলেন। কারণটা কি? এ কি দুঃসময়ের জন্যে, না অন্য কিছু? সাধারণ গৃহস্থ প্রত্যেকে প্রত্যেককে কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। সমরকে এবার জানাবার ইচ্ছে হয়েছিল অলকার: "ফিরে এসে তুমি আর কাউকে চিনতে পারবে না। যে যার সে তার নিয়ে মানুষ আজ বড় ব্যস্ত।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কথাই জানায় নি অলকা। কোলকাতার আগস্ট আন্দোলনের মানুষ দেখেছে অলকা, আর দুর্ভিক্ষের মানুষও দেখছে—যে মানুষ প্রাণ দিতে অকুতোভয়ে ছুটে যায়, আর যে মানুষ শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখতে আঁকপাঁক করে, দুজনের মধ্যে কি তফাৎ! একটা কিছু হ'য়ে যাবার প্রার্থনা করেছে অলকা বার বার। শুধু কি খাওয়া-পরার কষ্ট? মানুষ কি হয়ে গেল দিন দিন—অনেক পরিচিতরা অনেক দূরে সরে গেল। কতদিন অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে কারো সঙ্গে কথা কইতে পর্যন্ত বিরক্তি লেগেছে। মনে হয়েছে এই ভাল না লাগা মুহূর্তের বোধ হয় আর শেষ হবে না। হাত-মুখ না ধুয়ে কাপড়চোপড় না ছেড়েই অলকা সেই যে বিছানা নিত, তারপর কখন একবার মা'র ডাকে উঠে এসে কোনরকমে রাতের খাওয়া শেষ করতো—না খেলে বাঁচবে না বলেই যেন প্রতিদিনের আহারটা সে মুখে তুলতো। খেতে খেতে অবসাদের ঘুম টুটে গেলে অলকার মনে আক্ষেপের হতাশার গুঞ্জন উঠতো:—

শুধু দিন যাপনের
শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,
নিশি নিশি রুদ্ধদ্বারে
স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি—
সহে না সহে না আর।

হায়, এখন যদি রবি ঠাকুর বেঁচে থাকতেন? প্রায়ই অলকার মনে হ'তো—তিনিই যেন এই তিলে তিলে মরা থেকে তাদের বাঁচাতে পারতেন। নিশ্চয়ই তিনি এমন কথা বলতেন, যাতে নিজেকে ফিরে দেখতে জাতটা হয়তো চেষ্টা করতো। "একি হলো? অলকাও কি বদলে গেল?

দুর্ভিক্ষের পরের বছর যতীনবাবু রক্তের চাপে মারা যান। অলকা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল তার বাবার রক্তের চাপ হলো কি করে? দুর্ভাবনায় কি মানুষের ও রোগ হয়? আজকের সব ব্যাপারের মত বাবার মৃত্যুটাও তার কাছে আশ্চর্যের? দু'একদিনেই অলকা বুঝতে পারে মস্ত একটা সহায় সে হারিয়েছে—বাবা পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকলে এ দুঃসময়ে অলকা মনে অনেক বল পেত। যোগানন্দবাবু দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধুর শেষ কাজ করেছিলেন—কিন্তু কাজ চুকে যেতে ওদিকে আর এক পাও মাড়ান নি। অতঃপর অলকাদের কি হ'লো, কোথায় রইল কোন খোঁজই রাখার দরকার বোধ করেন নি। অলকা হয়তো কিছু ভেবে থাকবে, কিংবা অভিমান করেই সমরকে কোন কথাই জানায় নি। যোগানন্দবাবুর ব্যবহারটা তাকে ব্যথাই দিয়েছিল। সমরকে জানাতে গেলে তাঁর কথাও তো জানাতে হয়—তাছাড়া লাভ কি? দুঃখে পড়ে অলকা যেন মনে মনে বড় শক্ত হয়েছিল। সমরের জন্যে সে অপেক্ষা করবে, কিন্তু নিজের দুঃসংবাদ দিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে যায় নি। সমর হয়তো ভাল মনে সংবাদটা নেবে না। অলকা আরো ভাবলে, বাপের মৃত্যুতে তারা অকূলপাথারে পড়েছে জানালে নিজেকে ছোট করা হবে—সমর নিশ্চয়ই ভাববে অলকা সাহায্য চাইছে।

সংসারের সব দায়িত্বই অলকাকে নিতে হয়, এই শোকাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে অলকা দেখতে পায় নন্তুর লেখাপড়া, তাদের গ্রাসাচ্ছাদন—সব ভার এখন তার ওপর। যতীনবাবুর মেয়ে বড় না হয়ে ছেলেই যদি বড় হতো, এর চেয়ে অল্প বেশী কি করতো? সংসারটাকে বাঁচাবার জন্যে প্রথম প্রথম অলকা কেমন উৎসাহ পেত, পিতৃশোকটা কঠিন কর্তব্যপরায়ণতায় ভুলে যেত। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তার জীবনটা কিভাবে কোথায় চলেছে। মাঝে মাঝে সমরের চিঠি পেয়ে মনটা বড় উদাস হয়ে যায়: কোনদিন হয়তো সে দিনগুলো আর ফিরে আসবে না। সমর এসে খুব অবাক হয়ে যাবে?

এ যেন দুঃখের তপস্যা। নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করা। উত্তরোত্তর সংসারের শ্রীবৃদ্ধির করে ভাবে নি—পয়সা রোজগারের এত আগ্রহ জন্যে অলকা এর আগে আর কোনদিন এমন বোধ করে নি। নিজের মাপাজোখা আয়ে তাই কিছুতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এই সামান্য কটা টাকায় তাদের চলা অসম্ভব। নন্তুর একটা মাস্টার চাই—মায়ের হাতের কাজের সাহায্য করবার জন্যে একটা ঝি চাই। এই সামান্য একশো টাকায় কুলোয় কখনো? অলকা দু-তিনটে টুইশানি নেয়—কেমন আচ্ছন্নের মত সারা দিনরাত কাজ করে যায়। প্রথম চাকরি করতে যে অবসাদ আসতো, এখন তা আর হয় না। একটা ঝোঁকের মাথায় একটা জেদে অলকা দিনগুলোকে ঠেলে ঠেলে যেন এগিয়ে নিয়ে যায়। দায়িত্ববোধে অর্থের প্রাচুর্যের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। এ কটা টাকায় কি হবে? আরো পয়সা চাই।

কিন্তু এ ছাড়া রোজগারের পথ আর কি ভেবে পায় না। এটা ঠিক, চাকরিতে এর চেয়ে বেশী সে কোনদিনই পাবে না। সময় সময় উঞ্ছবৃত্তির মত মনে হয় এই চাকরি—তাদের চাকরি করায় ট্রামে-বাসের যাত্রীরা বিস্ময় বিস্ফারিত হলেও এই জীবিকার অকিঞ্চিৎকরতায় একঘেয়েমীতে অলকারা বিমর্ষ হয়ে থাকে। আশপাশের লোকগুলো তাদের যোগ্যতায় বিস্মিত না হয়ে কোনদিন যদি করুণা করতে আরম্ভ করে? চাকরি করাটা আর তত অহমিকাপূর্ণ মনে হয় না: আড়ষ্ট জড়সড় হয়ে রোজ ট্রামে ওঠা, ভীত সংকুচিত ত্রস্ত অবসন্ন হয়ে ট্রাম থেকে নামা। এই তো তাদের চাকরি!

সেদিন ছাত্রীর বাড়ি থেকে বেরুতে একটু রাত হয়ে গেল। ব্ল্যাক-আউটের কলকাতার নিত্য-নূতন বিভীষিকাময় খোয়াওঠা নোংরা রাস্তাগুলো যেন বোবা হয়ে আছে। এ দিকটা বড় একটা কেউ হাঁটে না সন্ধ্যের পর, কয়েক বছর আগে শেয়ালের ডাকে প্রহর গোণা যেত। এখন সামনের সেই শেয়ালডাকা মাঠটায় একটা কিসের কারখানা উঠেছে—প্রথম শীতের কুয়াশায় পাণ্ডুর চাঁদের মুখে কারখানার অস্থায়ী টিনের

চালাটা ভৌতিক ছায়ার মত থমথমে। নিজের পায়ের শব্দে অলকা নিজেই ভয় পেতে লাগল। পিছনে কেউ আসছে না তো? হঠাৎ নিজের টুল টল যৌবনের কথা মনে পড়ে যায় অলকার—ভয়ের মাঝখানে একি উপলব্ধি! পায়ের গতি ক্ষিপ্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অলকা হাত দুটো তুলে আড়াআড়িভাবে বুকটাকে চেপে ধরে। ভয়ের মধ্যে নিজের স্তনদ্বয়ের স্পর্শে বারকয়েক তার রোমাঞ্চ হয়। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বোধ যেন জাগে ঐ দুটিকে আশ্রয় করে—বুকের মধ্যে হাত দুটো জড় হয়ে কাঁপতে থাকে ঠক ঠক করে, অলকা এক সময় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে—শিথিল গতি কঠিন ক'রে নিজেকে সংযত করে। অনেকক্ষণ ঠায় পিছন ফিরে তাকিয়ে থাকেঃ কোথাও কেউ নেই, আশপাশের বাড়িগুলো শবযাত্রীর মত নিশ্চুপ, বাঁহাতি পার্কটা পোড়ো অনাবাদী জমির মত মাথা গুঁজে খাঁ খাঁ করছে। অলকা ইতস্তত করে সামনের কোন রাস্তাটা ধরে বাড়ি পৌঁছবে—অনেকগুলো রাস্তার শুরু ও শেষ জট পাকিয়ে আছে।

ল্যান্সডাউন রোডে পড়তে ভয়টা ভেঙে যায়। আশ্চর্য লাগে চেনাশোনা পথকে এত ভয় করলো কেন। বুকের ওপর থেকে জড়করা হাত্রাবাস ঠিক করতে অলকার সমরের কথা মনে হয়। আজ যদি কেউ তাকে ধরে নিয়ে যেত, তার শ্লীলতাহানি করতো? নিজেকে রক্ষা করতে কেবল স্তনদ্বয় ঢাকা দিলেই হবে? লজ্জায়, ভয়ে, অনুরাগে হাত দুটো কেবল বুকের ওপরই ওঠে কেন? অলকার বুকটা থর থর করে এখনো কাঁপে।

অলকা আর কি ভাবছিল মনে নেই, তবে পায়ের গতিটা যে নিশ্চিন্ততায় অনেক মন্থর হয়ে এসেছে, অলকা টের পেয়েছে। আর ভয়ের কোন কারণ নেই—ধীরে সুস্থেই বাড়ি যেতে পারবে এখন।

পিছন থেকে নিজের নাম শুনে অলকা দাঁড়িয়ে গেল। চারিদিক চেয়ে দেখলে, কিন্তু সামনে যে কখন একটা মোটর থমকে দাঁড়িয়েছে, তার খেয়াল ছিল না।

অলকাকে এদিক ওদিক চাইকে দেখে হিরণ গাড়ি থেকে নেমে এল। সামনে এসে বললেঃ আমি ডাকছিলুম।

অলকা নিষ্পলক চোখে লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করলে—কে ইনি?

ভদ্রলোক হেসে বললে, খুব ভয় পেয়েছেন দেখচি! চিনতে পারলেন না?

মনে করে চেনবার এখন অলকার মনের অবস্থাই বটে! স্থানকালটাও আলাপ পরিচয়ের অনুকূল। অলকা ভয়-বিহ্বলতায় এখন কি করবে ভেবে পেলে না—সামনের গলিটা এখন কোনরকমে পার হ'তে পারলে নিজের এলাকার মধ্যে এসে পড়বে। এক ছুটে বেলতলায় পৌঁছন যায় না?

অলকাকে ইতস্তত করতে দেখে হিরণ হেসে বললে, তা না চেনবারই কথা, অনেককাল তো দেখাসাক্ষাৎ নেই! কথার ধরণটা অলকার ভাল লাগে না, কতকালের চেনা লোক উনি! ইচ্ছে করে মুখের ওপর কটু বলে—বেহায়াপনার একটা সীমা আছে। কুমারী জীবনে এর চেয়ে বড় বিপদ অলকার আর কোনদিন আসে নি।

লোকটি নাছোড়বান্দাঃ আমার নাম হিরণ সান্যাল, কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী ছিলুম। আরো সামনাসামনি এসে দাঁড়াল লোকটি।

নামটার সঙ্গে গলার স্বরটা অলকা এবার চিনতে পারে। কিন্তু এই রাতদুপুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কলেজ ইউনিয়নের একদা-সেক্রেটারীকে চেনা দিতে হবে নাকি? গায়ে পড়ে আলাপ করতে তার রুচিতে বাধে—আচ্ছা মুশকিলে পড়েছে অলকা? বুকের ভেতর হাতদুটো অবশ হয়ে গেছে বোধ হয়।

হিরণ জিগ্যেস করে, আজকালকার দিনে এমনি একলা একলা চলাফেরা করতে আপনার ভয় করে না? তাছাড়া রাতও এখন বেশ হয়েছে।

অলকার বলবার ইচ্ছে ছিল, তাতে আপনার কি—আমার ভয় করে কি না করে জেনে আপনার লাভ কি? কিন্তু কিছু না বলে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

কোলকাতায় কি আর সেদিন আছে? মিলিটারী কুকুরগুলো হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—রাস্তা রক্ষার ভার এখন ওদের হাতে। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। হিরণের ব্যবহারটা বেশ সপ্রতিভ। এই এগিয়ে দেবার প্রস্তাবে অপমানিত বোধ করে অলকা, উনি এসেছে গায়ে প'ড়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে—সাবধান করতে—কচি খুকি, ও'র মনোগত ভাবটা যেন আর বুঝতে পারি নিঃ হিরণ কিন্তু সত্যি সত্যিই গাড়ির দরজা খুলে অপেক্ষা করছে।

মৃদুস্বরে অলকা বললে, আমি একলাই যেতে পারবো।

এগিয়ে যাবার জন্যে অলকা পা বাড়ালে। হিরণ গাড়িতে উঠে বসে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, সাবধানে যাবেন কিন্তু, দিনকাল বড় খারাপ।

হিরণের গাড়িটা চোখের ওপর দিয়ে মূর্ছিত শহরের তন্দ্রা ভেঙে এগিয়ে গেল—আশেপাশে ঠুলিপরান আলোগুলো বড় বেশী কাঁপতে লাগল—ছায়ায় অন্ধকারে সামনের রাস্তাটা থেই-হারান, ভয়টা আবার পেয়ে বসে—অলকা পা চালাতে চালাতে ছোটবার উপক্রম করে। বাড়ির দোরগোড়ায় এসে কড়ার ওপর কিন্তুতে হাতটা স্থির রাখতে পারে না—ডান হাতটা হঠাৎ এত অস্থির হচ্ছে কেন, কে জানে।

সে রাত্রে অনেকক্ষণ অলকার চোখে ঘুম এল না। কোথায় ছিল হিরণ সান্যাল, এদ্দিন পরে হঠাৎ ধূমকেতুর মত দেখা দিলে। অলকা মনে করতে পারে না, কলেজে পড়বার সময় কোনদিন ওর সঙ্গে আলাপ ছিল কিনা। লোকটা একটু বেশী চটপটে, মাতব্বর গোছের ছিল। অন্য সব মেয়েরা বলাবলি করতো ওর যোগ্যতা সম্বন্ধে। অনেকের সঙ্গে আবার ওর চাক্ষুষ পরিচয় ছিল। সহপাঠিনীদের কথাবার্তা শুনে অলকা লোকটির সম্বন্ধে একটা ধারণা করে রেখেছিল। আশ্চর্য, লোকটার স্মরণশক্তি, কলেজের প্রায় সব মেয়েরই নাম জানতো। কতদিন রাস্তাঘাটে অলকাকে দূর থেকে দেখে মাথা নেড়েছে—কখনো কখনো বা এগিয়ে এসে আলাপ করতে চেয়েছে, অলকাই বড় একটা আমল দেয় নি। মনেই পড়ে না, নিজের এ ব্যবহারের জন্যে অলকা পরে কোনদিন অস্বস্তি ভোগ করেছে কি না। আজ ঘুম না আসা পর্যন্ত এমনি অনেক কথা মনে হচ্ছে লোকটার সম্বন্ধেঃ সামনে এসে দাঁড়ানর ভঙ্গি থেকে শুরু করে কথা কয়ে' গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত, প্রতিটি ভাবভঙ্গী এখন স্পষ্ট মনে আসছে। বড় মাতব্বর হয়ে গেছে। অলকা একটু মুশকিলে পড়ে, সত্যিসত্যি হিরণ সান্যাল আজ তাকে ঘুমতে দেবে না নাকি? এক সময় অলকা নিজের মনে ক্ষুণ্ণ হয়ঃ লোকটা অত কথা বললে, কিন্তু কই তাকে পৌঁছে দেবার জন্যে পেড়াপীড়ি করলে না তো? এতটা অসহায় যদি ভেবেই ছিল জোর করে গাড়িতে তুলে কেন পৌঁছে দিলে না। অবাক হয়ে অলকা ভাবে, এ সব সে কি ভাবছে, কেন ভাবছে,—শুধু শুধু। আর কোনদিন লোকটার সঙ্গে হয়তো দেখাই হবে না—আজকের রাতের মত লোকটির স্মৃতি শেষ হয়ে যাবে, কাল তার কোন চিহ্নই থাকবে না।

অলকা উঠে আলো জেলে সমরকে চিঠি লিখতে বসে। কি লিখবে সমরকে? ভাবতে অনেকটা সময় যায়—এত তাড়াতাড়ি আবার চিঠি পেলে কি ভাববে? অলকা লিখলেঃ

জানি চিঠিটা পেয়ে একটু অবাক হবে—না খুলেই ভাববে, এত শিগ্গীর আবার চিঠি কেন? ভালমন্দ অনেক কিছুই একসঙ্গে ভাববে। হঠাৎ ব্যাপার কি? সত্যি ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছে আজ। হিরণ সান্যালকে চিনতে? —সেই যে যার কথা তোমাকে কলেজে যখন পড়তুম বলেচি বোধ হয়। একটু গায়ে-পড়া মতন। আজ হঠাৎ রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে কি পেড়াপীড়ি—এমন বেহায়াপনা লজ্জায় মরি, শেষটা পালিয়ে এসে বাঁচি—যেমন করে পথ আগলে ছিল, ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। বলে রাস্তায় মিলিটারীর ভয়—আমি তো দেখি এ'দেরই ভয় আজকাল বেশী—কোলকাতায়

নিষ্প্রদীপে এ'দেরই ঘোরাফেরা বেশী। ভাল করি নি, ভদ্রলোকের গাড়িতে' না উঠে? ভদ্রলোককে প্রত্যাখ্যান করে? আমার সংগে অত খাতির কেন?

চিঠিটা অলকা শেষ করে নি, ডাকেও দেয় নি। সকালবেলায় এত সামান্য কারণে চিঠি লেখাটা ছেলেমানুষী মনে হয়েছিল। চিঠিটা পেলে সমর নিশ্চয়ই হাসতো। লজ্জার একশেষ।

কিন্তু হিরণ সান্যাল ধূমকেতু নয়, স্থায়ী জ্যোতিষ্কের মত রোজই উদয় হতে লাগল। নিমরাজী হয়েও অলকাকে দু-একদিন তার গাড়িতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। লোকটাকে যতটা খারাপ ভেবেছিল, ততটা খারাপ মনে হয় নি অলকার। ব্যবহারটা বেশ ভদ্র এবং সৌজন্যপূর্ণ। অলকার আর যেন কোন আপত্তিই নেই, ভয়ও নেই হিরণ সান্যালকে। এখন প্রায়ই হিরণের গাড়ি থেকে নেমে নিজের ঘরে এসে টেবিলের দেরাজ খুলে হ্যান্ডব্যাগটা রাখতে রাখতে অলকার মনে হয় ভাগ্যে সেদিন চিঠিটা ডাকে দেয় নি—একটা মস্ত বড় লজ্জার হাত থেকে বেঁচে গেছে। হাতটা কেমন অবশ হয়ে এসেছে।

কদিন এই ভাবে চলে। হিরণ সান্যালের ওপর অলকার মনটা অজান্তে কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। নিজের ওপর অলকার আর কোন কর্তৃত্ব থাকে না। তা ছাড়া শুধু শুধু একজন মানুষকে অপছন্দ করবার কি আছে? বাঘ ভাল্লুক তো নয়!'

নিজের প্রশ্নে অলকা নিজেই ভারি লজ্জা পায়। একদিন অলকা জিগ্যেস করলে, আপনি আর কতদিন এমনিভাবে পেণছে দেবেন?

হিরণ উত্তর দিলে, যতদিন আপনি টিউশনীটা করবেন!

অলকা থমকে ওঠেঃ সে কি!

হিরণ কোন উত্তর না দিয়ে অলকাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। উত্তরটা সে কালও দিতে পারে, পরশুও দিতে পারে, কিংবা কোন দিন নাও দিতে পারে। অলকা মাঝখান থেকে বড় লজ্জায় পড়ে—অথচ মুখ ফুটে প্রত্যাখ্যান করবারও মুখ নেই আর। কৃতজ্ঞতা-বোধে একি কুণ্ঠা, একি জড়তা আসে? যা হয় হোক, অলকা যেন আর কিছু ভাবতে পারে না।

দিন পনেরকুড়ি পরে হিরণ একদিন বললে, টিউশনী করে আর কটা পয়সা পান! আমার তো মনে হয় ও উঞ্ছবৃত্তি কারো না করাই ভাল। বদারেশন—

অলকা উত্তর দেয়নি। না পড়িয়েই বা সে কি করতে পারে! এর চেয়ে সৎ উপায়ে আর কি করে রোজগার হয়? অলকার ইচ্ছে হলো জিগ্যেস করে, এ ছাড়া উপায় কি? কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বেরোয় না।

উপায়ের সন্ধান হিরণই নিজে থেকে একদিন দিলে। অসম্ভব অবাস্তব কিছু নয় তবু অলকা ভয় পেয়ে যায়। এই জন্যেই কি হিরণ এতদিন তার পিছু নিয়েছে? অপমানিতও বোধ করে অলকা, ইচ্ছে করে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে—চীৎকার করে আশেপাশের লোকজন জড় করে জানিয়ে দেয় কি সাংঘাতিক লোক তার পিছু নিয়েছে—তোমরা আমাকে রক্ষা কর।

অলকাকে চুপ করে থাকতে দেখে হিরণ বলে, আজকাল তো সবাই করছে। আর ভদ্রলোকেরা এগিয়ে না এলে এ ব্যবসাটাও ভদ্র হবে না কোনদিন। আপনার আপত্তির কারণ কি?

আপত্তির কারণ কি অলকা সঠিক জানে, না, তবু সিনেমা করে অর্থ রোজগারের কথা ভাবতে পারে না। স্বভাবতঃই একটা নোঙরামির মত মনে হয়—ছি, ছি, লোকে কি বলবে! অলকা চুপ করে থাকে।

হিরণ বলে, আমরা একটা বই তুলবো ঠিক করেছি, আপনাকে পেলে আমাদের সুবিধেই হবে। আসুন না কেন!

অলকা বললে, ওসব আমার আসে না। মাপ করবেন, আর সবাইএর কথা আলাদা। কথাটা বলে অলকা ম্লান হাসলে—হয়তো বন্ধুবিচ্ছেদের কথা ভেবে থাকবে। শুনে হিরণ শুধু বললে, সেতো নিশ্চয়ই, আর সবার সংগে আপনার তুলনা করবো কেন।

অলকাকে পেণছে দিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হিরণও বোধ হয় হেসেছিল। তারপর কয়েকদিন দুজনের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। টিউশানীর সময়টা অলকা বদলে নিয়েছিল—উপস্থিত একটা ফাঁড়া কেটে যাওয়ার জন্যে অলকা ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল কি না কে জানে। সমরকে কিন্তু কোন কথা জানায়নি।

ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ অলকার বেশী দিন থাকে না। এক ঘেয়ে দুঃখকষ্ট ভোগে বর্তমান জীবনযাত্রার ওপর কেমন বিতৃষ্ণা আসে। এই পুতু-পুতু করে মেপেজুপে জীবনকে ভোগ করা, এই সমাজ-বোধ, সুখ-দুঃখের হিসাব কোনই মানে হয় না। সমরের কথা মনে হলে একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা হাহাকার করে ওঠে। মনটা সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে যা খুশী করতে চায় কাউকে সে গ্রাহ্য করে না। সংসারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ববোধটা তাকে বড় বেশী আত্মসচেতন, অসহিষ্ণু, অতৃপ্ত করে রাখে,—তার মূল্য সে কিন্তু পেলে না। এর চেয়ে বেশী কিছু, বড় কিছু কি সে করতে পারে না? কেন?

এতবড় ঘরটার এক কোণে এক রকম আচ্ছন্নের মত অলকা বসে থাকে। একটু যেন ঝিমুনী আসে—হাত-পা খেলিয়ে আয়েশ করে বসারও কি সুখ! ভিতরে ভিতরে একটা না-পাওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে মনটা কেমন করে ওঠেঃ অর্থ থাকলে কি না হয়! নিজের মত করে বাঁচতে পারবে। কে জানে এটা লোভ কি না। সুসজ্জিত ঘরটার স্বপ্ন চোখে মায়ার ঘোর আনে—এমনি করে সে যদি ঘর সাজাতে পারতো এমনি হাতপা ছড়িয়ে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে পারতো? একটা বৃহৎ জীবনের কথা মনে হয়। নিজের গণ্ডিটাকে এখন বড় ছোট আর তুচ্ছ মনে হয়।

হিরণ খুশীই হলোঃ আপনারা এ লাইনে যোগ দিলে দেখবেন এর চেহারাই বদলে যাবে—ওদেশের তুলনায় দেখুন না কোথায় আমরা পড়ে আছি। কিছু নয় মনের ভুল—চলুন আপনাকে আমাদের বইএর গল্পটা বলি; দেখবেন কি ইণ্টারেসটিং ব্যাপার। সেলুলয়েডে প্রাণ সঞ্চার যত সোজা ভাবেন অত সোজা নয়। আসুন—

কিসে অলকা আকৃষ্ট হয়? টাকা, বৃহত্তর জীবন না খ্যাতি? না, ওসব কিছুই নয় একটা সাময়িক উত্তেজনা! কে জানে কি, একসঙ্গে অতটাকা যোগ্যতার মূল্য হিসেবে পাওয়া অলকার কল্পনার অতীত ছিল। নিজেকে যেন নতুন করে অলকা উপলব্ধি করলে। এত সহজে অর্থ ও খ্যাতির কথা অলকা ভাবতে পারেনি—তার কুমারী জীবনে প্রথম প্রেমের চেয়ে এ কম রোমাঞ্চকর নয়। নিজেকে যেন অলকা ধরে রাখতে পারে না। কতবার মনে হয়েছে তার জীবনে এই অভাবনীয় ঘটনার কথা সমরকে জানায়। সমর নিশ্চয়ই খুশী হবে।

কিন্তু দু-এক দিনে অলকা নিজের ভুল বুঝতে পারে। তার সিনেমা করার সংবাদ পাড়ায় জানাজানি হতে অনেক কানাকানি আরম্ভ হয়, অনেক বিরুদ্ধ মন্তব্য অলকার কানে আসে। একরকম একঘরে করে রাখার মত সকলে ব্যবহার আরম্ভ করলে। ঘোঁটটা বেশী পাকালেন রজনীবাবু। হেঁটে চলাই দায় হলো, পাড়ায় এত অকালপক্ক মেয়ে ছিল অলকার জানা ছিল না—যখনি কোন কাজে রাস্তায় বেরোয় মেয়েগুলো জোটপাকিয়ে তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে কি যেন বলাবলি করে। অলকা সমরদের বাড়ীতে ছুটে আসে—যোগানন্দবাবু একেবারে চুপ, এস-বস কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বেরোয় না, কাত্যায়নী-দেবীও এবারে যেন আরো নিস্পৃহ। গত দুর্ভিক্ষের সময় একান্ত অসহায়ের মত আপনাকে ভেবে এ'দের বাড়ীতে ছুটে এসে যেন এর চেয়ে ভাল ব্যবহার পেয়েছিল অলকা। তখন সে ব্যবহার মনে তার যত ব্যথাই দিক তাকে সহ্য করা ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না। এখন আত্মীয়স্বজনের এ বিরূপতার ফল হলো উল্টো; অলকা ক্ষেপে গেল, কেন কি দোষ করেছে সে? কাউকে সে গ্রাহ্য করে না।

তার ধারণা হলো আত্মীয়স্বজনের এ ব্যবহার তার পয়সার, তার খ্যাতির জন্যে ঈর্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। কিছুতেই সে এদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না—না, না কোন অন্যায়, কোন দোষই সে করেনি। ও'রা না কথা কইলেন, না মিশলেন তার বয়েই যাবে!

শেষ পর্যন্ত সমরকে অলকা কোন কথাই জানালো না—এ'দের পাঁচজনের মত সেও যদি তাকে সমর্থন না করে? এত বিরুদ্ধতার মধ্যে তাই ঐ মাত্র আশ্রয়টিকে যাচাই করে নিতে অলকা দ্বিধাবোধ করেছিল—ফিরে এসে সমরের যা ইচ্ছা হয় ভাবুক, করুক। দোষ সে তো কিছু করেনি! চিঠিটা খোলা পড়ে আছে—অনেকটা অন্যায় স্বীকারের মত : * *তুমি হয়তো রাগ করবে, আমি সিনেমা করছি বলে!......অনেকেই কিন্তু আজকাল করছে। এতে খারাপ কিছু নেই বিশ্বাস করো* * এত অল্প পরিশ্রমে এত অর্থলাভে আপত্তি থাকবে কেন?...ভাবচো অভিনয় করচি কি করে? এলে দেখবে কি দারুণ অভিনয় করতে শিখেচি। বিশ্বাস হচ্ছে না? গানও গাইতে পারি। ও তোমার যে-সে গান নয়—সিনেমা-সংগীত! আসচে মাসে রেকর্ড পাঠাব, বাজিয়ে শুনো। না, না, তোমার রাগ হয়েছে বেশ বুঝতে পারছি—ভাবচো, ছি ছি অলকা একি করলে কিছু জিগেস না করে? দেখবে আমি একটুও বদলাইনি—যেমন অলকা ছিলুম তেমনিই আছি। * * নিজের সম্মান বজায় রেখে করতে পারলে জীবিকাটা মন্দ নয়। আমার তো তাই মনে হয়। তোমার কি মনে হয় জানিও। * * তুমি কিছু বলবে বলে আগে জানাইনি—

বিরুদ্ধ সমালোচনায় অলকার মন বিষিয়ে উঠলেও কি ভেবে চিঠিটা নষ্ট করে ফেলেনি। কিন্তু সেই দিনই নিজেকে সম্পূর্ণ হিরণের হাতে ছেড়ে দিলে—খ্যাতির আনন্দে না, কুৎসা, বিরুদ্ধ সমালোচনার সংঘাতে বলা যায় না। তার মনে হলো অনেক কৃতজ্ঞতা হিরণের পাওনা আছে,—আজই তা পরিশোধের সময়।

হিরণ গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে অলকার যেন খেয়াল হয়, একি করছে সে! কোথায় চলেছে? এক ঝটকায় হিরণের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে অলকা সেদিনের মত পালিয়ে বাঁচে—ছি, ছি! একি দুর্বলতা! তারপর সমরকে লেখা চিঠিটা বার করে কুটি কুটি করে ছি'ড়ে ফেলে। কে জানে, কার ওপর অলকার রাগ হয়! বারবার মনে হয় আমি একটুও বদলাইনি, যেমন অলকা ছিলুম তেমনিই আছি—তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? কিন্তু আজ এ কি করলে সে? এতেই এত উতলা হয়ে পড়লো? সত্যি কি সে বদলায়নি? অপ্রত্যাশিত খ্যাতির উচ্ছ্বাসটা কেটে গেলে অলকা অনেকটা নিজেকে সামলে নেয়—ব্যবহারে অনেক সংযত হয়ে ওঠে। হিরণ সান্যাল রোজই আসে যায়, কিন্তু অলকা আর তেমন দুর্বলতা প্রকাশ করে না। লোকটাও বড় নিরুপদ্রব, কাজের কথা ছাড়া বড় বেশী একটা কথা বলে না, কিছু একটা সে চায় হয়তো কিন্তু সেটা বোঝাবার তার তত আগ্রহ নেই—অলকারও জানবার তাড়া নেই। দুজনের মধ্যে একটা উত্তাপহীন বন্ধুত্বই কেবল থেকে যায়। কৃতজ্ঞতায় হয়তো আর কিছু সম্ভব নয়। অলকা নিজেকে প্রশ্ন করে সদুত্তর পায় না, লোকটা কি চায়? আর যা চায় তা সে ওকে কোন দিন দিতে পারবে কি? নিজে মুখে একদিন বলুক না কেন! সেদিনের আত্ম-সমর্পণের লজ্জাটা আজো অলকা ভুলতে পারে না।

কিন্তু তার খ্যাতির মূলে, স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে ঐ লোকটা, ওকে এড়িয়ে অলকার চলবে কি করে? ইচ্ছে করলেও অলকা ওকে বাদ দিতে পারবে না। অলকা ভাবতে পারে না, সেদিন ওর কথায় রাজী হয়ে যদি এ পথে না আসতো তা হলে আরো কত কষ্ট ভোগ তাদের কপালে ছিল। এসবই তো ওর। অলকা অস্বীকার করতে পারে? খ্যাতি চাইলে হিরণকে সে ফেলে দেবে কি করে? ভদ্রলোক নেহাৎ ভদ্র বলেই অলকা এখনো পার পেয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে ভালমন্দ খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করলে হিরণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে; একি, হঠাৎ? ব্যাপার কি?

অলকা বলে, এমনি। কেন, খেতে নেই?

হিরণ মাথা গু'জে খেতে খেতে বলে, খুব আছে—আপনি রোজ খাওয়ান আমার কোনই আপত্তি নেই। ভাল লাগায় যার লোভ নেই সে মানুষই নয়।

বড় যত্ন করে অলকা হিরণ সান্যালকে খাওয়ায়। হিরণ লক্ষ্য করে অলকার নিমন্ত্রিতের মধ্যে সে ছাড়া বড় একটা দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ থাকে না। বড় খুশী মনে হিরণ খাবারগুলো গোগ্রাসে গেলে—চিবিয়ে খাবার মত মনের স্থৈর্য তার সাময়িকভাবে লোপ পায়।

সমরকে অলকা প্রায়ই চিঠি লেখেঃ আরো কতদিন তুমি বিদেশে থাকবে? যারা যুদ্ধ করে তাদের কি ছুটীও নেই? আমার বড় ভয় করে, ছুটী নিয়ে একদিন চলে এসো।

হিরণ সান্যাল অপেক্ষা করে' থাকে। উত্তরোত্তর খ্যাতির আনন্দে অলকার সমরের জন্যে দিন গোনাটা অসহ্য বোধ হয় না। নিজেকে ছাড়া আর কারো কথা ভাববার হয়তো এখন সে সময় পায় না। হিরণ সান্যালের কাছে সে যে কৃতজ্ঞ এ কথা ভাবতেও তার আজকাল সময় সময় বিরক্ত লাগে। আরো নাম হোক তার, এই একমাত্র কাম্য হ'য়ে উঠলো অলকার।

কোন কোনদিন আরাম শয্যায় গভীর রাত্রে অলকার ঘুম ভেঙে যায়—মনটা কেমন যেন ভারি মনে হয়। এত স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাধীনতার মধ্যেও নিজেকে কেমন বন্ধ এবং অসহায় বোধ করে। হাত পা ছড়িয়ে বাঁচার বিস্তৃতিতে যেন সুখ নেই। স্বোপার্জিত অর্থলব্ধ আসবাবপত্রগুলো চোখে কি বিশ্রী লাগে—এগুলো যেন তার নয়, পড়ে-পাওয়া দানের মত মনে কুণ্ঠা আনে! কি ক্ষতি ছিল, এই বিভব-বৈভব যদি তার না হ'তো,—সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সে ছোট হ'য়েই বেঁচে থাকতো? নিজেকে বড় লোভী মনে হয়। যা পেয়েছে, যা পেতে চায়, তার তুলনায় অতি তুচ্ছ! এই নিস্তব্ধ রাত্রে ঘুমভাঙা শয্যায় উঠে বসে অলকা নিজেকে খু'জে পায় না। কি মর্মান্তিক এই উপলব্ধি! এই খ্যাতি, এই গাড়িবাড়ি, এখন এর কোন অর্থ থাকে না অলকার কাছে! একটা শূন্য রিক্ততায় ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। অভিভাবকহীন জীবনের একক অস্তিত্ব অন্ধকারে চোখ চেয়ে থাকার মত। অলকার জীবনে আজ রাতের সঙ্গে কাল সকালের কোন মিল নেই।

অলকা উঠে এসে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ায়—গভীর রাতের আকাশটা মুখের কাছে মুখ এনে হঠাৎ থমকে যাওয়ার মত। অলকার এমনি এখন মনে হয়, তাকে যদি কেউ না জানতো—এই রাসবিহারী এভিনিউ-এ তার নতুন ঠিকানা না থাকতো? তার পরিচয় শুধু যতীনবাবুর মেয়ে থাকতো? সত্যিই কি সে ভাল অভিনয় করে? ইচ্ছে করলে এখন কি না করতে পারে সে?

অনেকক্ষণ অলকা চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকে—জানালার গরাদে হাতের মুঠোটা শিথিল হ'য়ে আসে। অনেক দূরে মাঝে মাঝে নিশার যানবাহনের শব্দ ওঠে; অশ্বখুরে মোটরের হর্নে মাটি কাঁপে, শহর পরিবেশ চমকে ওঠে। অলকার জানালার সামনে আমগাছটার মাথার ওপর দিয়ে একটা রাতজাগা বুকের আর্ত কণ্ঠ-স্বর ভেসে যায়। অলকার খেয়াল হয়, তার বাড়ির দু'চারখানা বাড়ি পরে মিলিটারীদের ছাউনীটায় আজ কোন সাড়া শব্দ নেই। এ পাড়ার লোকের অভিযোগ তাহ'লে কর্তৃপক্ষের কানে পে'ছৈছে এতদিনে?

কাল থেকে আবার একটা নতুন বই-এর মহড়া শুরু হ'বে। অনেক টাকা আগাম পাওয়া গেছে—কিন্তু কি বিরক্তিকর এই মহড়া দেওয়া! একঘেয়ে ন্যাকামি! কিছুদিন অবসর নেওয়া যায় না? এরা তাকে ছুটী দেয় না? এখন প্রচুর ছুটীর দরকার অলকার—বড় ক্লান্ত সে। কেবল স্টুডিও বাড়ি কনট্রাক্ট—জীবনে আর যেন কোন কাজ নেই, জীবনের আর কোন মানে নেই। অলকা ভাবে, তার জীবনে এই দেড় বছর আগের উনিশটা বছরকে কেমন আড়াল করে আছে—আজকের দিন আর সে-দিন যেন অনেক দিন, অনেক কাল, অনেক যুগ। হঠাৎ বড় বিমনা হ'য়ে যেতে হয়।

হিরণ সান্যালকে অলকা একদিন বললে, দেখুন, আমি আর সিনেমা করবো না। হিরণ অবাক হ'য়ে জিগ্যেস করলে, কেন ভাল লাগছে না?

অলকা বললে, না।

আমার মনে হয়, আরো কিছুদিন করে তারপর ছেড়ে দিন। কোন জিনিসই কারো বেশী দিন ভাল লাগে না, কিন্তু উপায় কি, বাঁচবার জন্যে অনেক জিনিসই ভাল লাগাতে হয় যে!

হিরণ কি বলতে চায় অলকা বুঝতে পারে না। বলে, আপনিই আমাকে এনেছিলেন তাই পরামর্শ করচি!

হিরণ হেসে বলে, বেশ তো, ছেড়েই না হয় দেবেন! এখনি তো নয়!

অলকা ছেলেমানুষের মত জেদ করেঃ না, এখনি আমি ছেড়ে দেব—আজই।

হিরণ একটু যেন অবাক হয়ঃ একেবারে ঠিক করে' ফেলেছেন? ঠিক নামের সময়টা ছাড়বেন? কিন্তু যে সব কনট্রাক্ট করেছেন তার কি হ'বে? অনেক টাকার ব্যাপার! ভেবে দেখেচেন?

অলকা নিজেকে সামলাতে পারে না, রুদ্ধ-কণ্ঠে বলে, আমার টাকা চাই না, আমার নাম চাই না, আর কিছু চাই না।

হিরণ সান্যাল ভেবে পায় না এর পর অলকাকে কি করে সান্ত্বনা দেবে। আজ হঠাৎ অলকা দেবী এমন করছেন কেন? আশ্চর্য, কিছুতে ও'র মনের তল পাওয়া যায় না। আজ দেড় বছর ও'র জন্যে কি না করলে সে, একটু কৃতজ্ঞতাও কি সে আশা করতে পারে না? এমন অদ্ভুত মেয়ে হিরণ জীবনে দেখেনি। সেদিনের মত—

শেষ পর্যন্ত অনেকক্ষণ চুপ করে' থেকে হিরণ অলকাকে ভাবতে দিয়ে উঠে চলে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে মনে মনে হাসলে।

অলকা কিন্তু সিনেমা-করা ছাড়েনি। হিরণ সান্যালও প্রতিদিন পূর্বের মতই নিয়মিত আসাযাওয়া বন্ধ করেনি। নিত্য নতুন আসবাব-পত্র কিনে ঘর গুছিয়ে অলকার দিন কেটে যেতে লাগল—ঘরসাজান একটা নেশার মত হ'য়ে দাঁড়াল। হিরণ মাঝে মাঝে বলে, করছেন কি, এত জিনিস রাখবেন কোথায়? অলকা হেসে জবাব দেয়, তা না হ'লে ঘরগুলো যে খাঁ খাঁ করে—দেখতে বিশ্রী লাগে!

হিরণের বিশ্বাস অলকার এ সখ বেশী দিন থাকবে না। মিথ্যে বলে লাভ নেই!

* * *

অলকাকে লেখা চিঠিটা ডাকে না দিয়ে সমর চিঠিটা পকেটে করে' অলকার বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হয়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ইতস্তত করেঃ চলে যাবার আগে এভাবে দেখা করা উচিত হ'বে কিনা—আর দেখা করেই বা লাভ কি? কি করে' যে পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে' এখন এতদূর এগিয়ে এল সমর ভাবতেই পারে না। মত পরিবর্তনের কারণ কি ঘটলো? একবার ভাবলে, পকেট থেকে চিঠিটা বার করে' লেটার বাক্সে ফেলে দিয়ে ফিরে যায়, নাইবা ডাকে চিঠিটা অলকার কাছে পে'ছিল; আর একবার ভাবলে, তাতে অলকা ভাববে এসে দেখা না পেয়ে সমর চিঠিটা রেখে গেছে। সে যে তাকে উপেক্ষা করেই দেখা ক'রতে আসেনি একথা ভাববে না অলকা। বাড়ি বয়ে যখন আনতে পারলে তখন চিঠিটা রেখে গেলে কি আর মর্যাদা বাড়বে? সমর যে বিশেষ সন্তুষ্ট নয় একথাই বা বোঝাবে কি করে? অলকাকে সে ঘৃণা করে, অবহেলা করে, অপছন্দ করে—সে কথাই বা জানাবে কি করে? তার চিঠির মানে তো অলকা অন্য করে' নিতে পারে! তা ছাড়া তার সম্বন্ধে অলকার এখনো কি মত আছে সেটাও তো জেনে যাওয়া দরকার। পয়সা হ'য়ে, নাম হ'য়ে সে ভুলে যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু উপেক্ষা করবে কেন? বোঝাপড়া হোক একটা আজ! সে জেনে যাবে, দেখে যাবে অলকা তাকে কিভাবে গ্রহণ করে। সে উপযাচক হ'য়ে আসেনি, অলকাই ডেকে পাঠিয়েছে! তার লজ্জার কি কারণ আছে? দেখা হ'লে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করবে না।

তবু সমর বড় বিহ্বল হ'য়ে পড়ে—হঠাৎ যেন সামনের মানুষটাকে সে চিনতে পারছে না। অলকাকে কেমন যেন দেখতে হ'য়েছে! রোগা-রোগা শুকনো মেয়েটা শাঁসে জলে কেমন ফল ফলে হ'য়ে উঠেছে—উচ্ছল স্বাস্থ্যের মায়াবিক পরিবর্তনটা বেশ কমনীয়। শঙ্কিত চিত্তে সমর অলকাকে দেখে নতুন করে' নতুন রূপে—কে জানে কেন ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। তার মন যেন বলে, এ তো তোমার নয়—এ তো সে অলকা নয়!—একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, দুর্জ্ঞেয় লজ্জা কামনার উৎসমুখ রুদ্ধ করে দেয়। সমর যদি ছুটে গিয়ে বাহুপাশে অলকাকে নিষ্পেষিত করতে পারতো! জবুথবুর মত সমর দাঁড়িয়ে থাকে, অলকা সমরকে দেখে ভয় পায় কি না বলা যায় না। তারও যেন এগিয়ে এসে সমরকে অভ্যর্থনা করে' নিতে সময় লাগে। সমর কেন অমন করে' আছে?—প্রথম দর্শনের হাসিটা অলকার মুখে অনেকক্ষণ মিলিয়ে গেছে, এ কি হঠাৎ এত চিত্ত-বিক্ষোভ হয় কেন? সমর অমন করে কি দেখছে তার? লজ্জার পরিবর্তে অলকাও যেন বড় সংশয়ে পড়ে। এত চেনা-শোনায় এত বাধা আসে কেন? মিলনটা স্বাভাবিক হয় না কেন?

এগিয়ে এসে অলকা বলে, এস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? অমন করে' কি দেখচো?

সমরের যেন খেয়াল হয়—স্বপ্নে একদিন অলকাকে দেখার কথা মনে পড়ে, এ কি সেই—কিন্তু সে পরিবেশ কই? রূপ সেই আছে বটে কিন্তু সে চটুলতা? সমর মৃদুস্বরে বলে, কই কিছু না—চল।

অলকা এসে হাত ধরে। স্পর্শটা অভূত-পূর্ব মনে হয় সমরের। সে উত্তাপ তো নেই—তাড়াতাড়ি মাথা থেকে টুপিটা খুলতে সমর হাতটা সরিয়ে নেয়। অলকা বুঝতে পারে না। ঘরের ভেতর দিয়ে অন্য ঘরে যেতে যেতে অলকা বলে, তুমি কিন্তু বড় রোগা হ'য়ে গেছো!

অলকার কথায় পূর্বের সে অনুরাগ সমর টের পায় না। প্রশ্নটা আন্তরিক কিনা সে সম্বন্ধেও যেন মনে সংশয় থাকে। সমর বলে, আর তুমি খুব মোটা হ'য়েচো!

অলকা হেসে বলে, সত্যি? মোটা কোথায় দেখলে!

চোখে।—বড় নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরটা।

অলকা ঘুরে দাঁড়াল। সমরের কথাটা সে তার নারীজীবনে এই প্রথম শুনে অবাক হ'লো—সারা অঙ্গে একটা শিহরণ বয়ে গেল। জড়িত কণ্ঠে জিগ্যেস করলে, দেখতে বিশ্রী লাগছে, না?

সমর নিজেকে সামলে নিলে, বললে, না, বেশ তো!

অলকা যেন কিসের প্রতীক্ষা করলে। আবার হাত বাড়িয়ে সমরকে স্পর্শ করতে গিয়ে হাতটা কিছুতে উঠলো না। দ্বিধা কেন? একটু আগে স্পর্শে কি আশানুরূপ সাড়া পায়নি সে?

সমর বললে, চল দাঁড়ালে কেন!

অলকা বললে, এস।

এটা অলকার নিজের বাড়ি? বেশ সাজিয়েছে তো! সমরের হঠাৎ একটা প্রশ্ন মনে ধক্ করে' ওঠে: কার জন্যে? বাড়ি কিনে ঘর সাজিয়ে অলকা তার কথা কি কোনদিন ভেবেছিল? ছি, ছি, একি প্রত্যাশা! নিজেকে এত ছোট করে ফেলছে কেন সে। যতই অলকার নাম হোক, পয়সা হোক সমরের তাতে কি আসে-যায়!

(আগামী বারে সমাপ্য)

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

সকলেই আমার প্রতি অতি সদয় ছিলেন। যখন তাঁরা জানতে পারলেন আমি ব্যাঘ্র শীকারে আসিনি বা কিছু কিনতে বা বেচতে আসিনি—এসেছি শুধু কিছু শিখতে, তখন তাঁরা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। আমি হিন্দুস্থানী শিখতে চাই জেনে তাঁরা খুশি হয়ে আমার জন্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিলেন। বই ধার দিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁদের ক্লেশ ছিল না। আপনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

আমি জবাব দিলাম—"অতি সামান্যই।"

আমার ধারণা ছিল, আপনার এ বিষয়ে কৌতূহল আছে। বিশ্বজগতের আদি নেই অন্ত নেই, অনন্তকাল ধরে সৃষ্টি থেকে ভারসাম্যের পথে, ভারসাম্য থেকে ক্ষয়, ক্ষয় থেকে ধ্বংস আবার ধ্বংস থেকে সৃজনের পথে অনন্ত লীলা চলেছে—এর চাইতে বিরাট ও চমকের পরিকল্পনা আর কি হতে পারে?

আমি বল্লাম, "আর এই অন্তহীন পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধে হিন্দুদের কি ধারণা?

"আমার মনে হয়, ওঁরা বলবেন—পরমাত্মার এই লীলা। আত্মার প্রাক্তন জীবনের কর্মফলের শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করার জন্যই জীবাত্মার সৃষ্টি করা বিধাতার উদ্দেশ্য, এই তাদের বিশ্বাস।"

"জন্মান্তর-পরিগ্রহ সম্পর্কিত বিশ্বাসই তদ্দ্বারা অনুমিত হচ্ছে।"

"সমগ্র মানবজাতির দুই-তৃতীয়াংশের এই বিশ্বাস।"

"বহুসংখ্যক লোকে কোনো কিছু বিশ্বাস করে বলেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয় না।"

"না, তা নয়, তবে বিষয়টি বিবেচনা-যোগ্য করে তোলে। অধিকাংশ নব্য প্লাতোনীয় মতবাদ খৃস্টবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে বিজড়িত; এটা হয়ত খৃস্টবাদকে সমগ্রভাবেই গ্রাস করত, আর প্রকৃতপক্ষে একদল প্রাচীন খৃস্টপন্থীরা নব্য প্লাতোনীয় মতবাদে বিশ্বাসীও ছিলেন, কিন্তু সে কার্য পাষণ্ডতা বলে ঘোষিত হল। এ ছাড়া খৃস্টানরা খৃস্টের পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে যেমন বিশ্বাসী তেমনই বিশ্বাস করতে পারেন।"

"তাহলে আমার এ কথা ভাবা কি ঠিক হবে যে, অনন্তকাল ধরে আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে রূপ নেয় পূর্ব জীবনের কৃতকর্মের ফলাফলের জন্যই?"

"আমার ত তাই মনে হয়।"

"কিন্তু দেখ, আমি ত শুধু আত্মা নই, দেহী—প্রাণী, কে বলতে পারে ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার দৈহিক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী? বায়রনের পা যদি খোঁড়া না হত, তাহলে কি তিনি বায়রন হতেন, না, দস্তয়েভস্কী তাঁর এপিলেপসী না থাকলে দস্তয়েভস্কী হতেন?"

"ভারতীয়েরা এই সব দৈহিক দুর্ঘটনার কথা বলেন না! তাঁরা বলেন যে, বিগত জীবনের কর্মফলের ওপর আপনার আত্মার নিখুঁত বা অঙ্গহীন দেহে বিরাজ করা নির্ভর করে। লারী টেবিলের ওপর অলসভাবে ঢাক বাজানোর মত ভঙ্গীতে আঙুল নেড়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর মৃদু হেসে চিন্তাকুল চোখে আবার বলে—"আপনার কি মনে হয় না জন্মান্তর পৃথিবীর কলুষ সম্পর্কে একসঙ্গে একটা যুক্তি ও কৈফিয়ৎ? আমাদের গত জীবনের দুষ্কৃতির ফলে যদি আমরা কষ্টভোগ করি, তাহলে তা এই আশায় সহ্য করব যে, এই জীবনে সৎ কাজ করে পুণ্য সঞ্চয় করলে ভবিষ্যৎ জীবন অপেক্ষাকৃত কম কণ্টকর হবে। আমাদের নিজের পাপভার বহন করা সহজ, প্রয়োজন কিছু পুরুষত্বের, শুধু যে পাপের ভার বিনা কারণে অপরের ওপর এসে পড়ে তা অসহনীয় ঠেকে। মনকে প্রবোধ দিতে পারেন যে, এসব পূর্বজন্মের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল—তাহলে করুণা প্রকাশ করতে পারেন, তার বেদনা উপশমের চেষ্টা করতে পারেন—করাও উচিত। কিন্তু তাতে রুষ্ট হওয়ার কোনো হেতু নেই।"

"কিন্তু বিধাতা কেন সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই আদিকালে দুঃখ, দুর্দশা ও ক্লেশহীন করে জগৎ সংসার সৃষ্টি করলেন না কেন, তখন ত আর ব্যক্তিবিশেষের দোষ বা গুণের ওপর তার কর্মফল নির্ভর করত না?"

"হিন্দুরা বলবেন আদি নেই। ব্যক্তিগত আত্মা, বিশ্বজগতের যা সমকালিক তা চিরন্তন কাল ধরেই আছে, আর প্রাক্তন জীবনের ওপরই তার বর্তমান প্রকৃতি নির্ভরশীল।"

"আর যারা জন্মান্তরে বিশ্বাসী তাদের জীবনে কি এই বিশ্বাসের কোনো ব্যবহারিক প্রতিক্রিয়া ঘটে? যাই হোক, সেই ত পরীক্ষা!"

"মনে হয় হয়ত তা আছে, আমি একজনের কথা আপনাকে বলছি, তার জীবনে এর ব্যবহারিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই ঘটেছে। আমি ভারতবর্ষে প্রথম দু-তিন বছর দেশী হোটেলেই থাকতাম। তবে মাঝে কেউ কেউ তাদের সঙ্গে থাকার নিমন্ত্রণ করতেন, আর দু-একবার রাজা-মহারাজার অতিথি হিসাবে খুবই আড়ম্বরের সঙ্গে থাকা গেছে। আমার বারাণসীস্থ এক বন্ধুর খাতিরে উত্তরাঞ্চলের একটি ছোট-খাটো দেশীয় রাজ্যে থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। রাজধানীটি চমৎকার—'গোলাপ রঙিন শহর-কালের মতই প্রাচীন।' অর্থ সচিবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তিনি ইউরোপে শিক্ষা পেয়েছেন, অক্সফোর্ডে ছিলেন। তার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে একজন প্রগতিশীল, উন্নতমনা, জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে হল। অত্যন্ত দক্ষ মন্ত্রী ও সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ভদ্রলোকটি বেশ সুপুরুষ, ইউরোপীয় পোষাক পরতেন, ভারতীয়েরা মধ্যবয়সে কিঞ্চিৎ স্থূল হয়ে পড়েন তিনিও স্থূলাঙ্গ হয়ে উঠছেন, গোঁফগুলি ছোট করে ছাঁটা। প্রায়ই তিনি আমাকে ওঁর বাড়ী যেতে বলতেন। তাঁর বাগানটি ছিল প্রকাণ্ড, আমরা বিরাট গাছের ছায়ায় বসে নানাবিধ আলোচনা করতাম। ভদ্রলোকের দুটি বয়স্ক ছেলে ও স্ত্রী আছে। তাঁকে দেখলে সাধারণ ইংরেজী ঘেঁষা ভারতীয় বলেই মনে হবে, কিন্তু শুনলাম যে, এক বছরের ভিতরই তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স হবে তখন তিনি তাঁর এই লাভজনক কাজ ছেড়ে দিয়ে—বিষয়-সম্পত্তি স্ত্রী ও ছেলেদের হাতে দিয়ে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করবেন, তখন আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। সবচেয়ে আশ্চর্য যে, তাঁর বন্ধুবর্গ, স্বয়ং মহারাজা সকলেই এই ব্যাপারটি স্থির সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করলেন, বিষয়টি যেন বিস্ময়কর কিছু নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

"একদিন আমি তাঁকে বল্লাম: আপনি এত উদারচেতা, পৃথিবী আপনার পরিচিত, এত পড়েছেন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন—বলুন ত অন্তর থেকে কি আপনি জন্মান্তরে বিশ্বাসী?

"তাঁর সমস্ত মুখের ভাব পরিবর্তন হল, সে মুখে স্বপ্নলোক-বিহারীর মত আবিষ্ট ভাব।

"তিনি বল্লেন, বন্ধু—যদি এটুকু বিশ্বাস না রাখি তাহলে আমার কাছে জীবনটাই নিরর্থক।"

আমি প্রশ্ন করলাম: "লারী তোমারও কি এই বিশ্বাস নাকি?

"এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আমার ত মনে হয় না পূর্বদেশীয়রা এই ব্যাপারটি যেরকম অখণ্ড ভাবে বিশ্বাস করে আমাদের মত পশ্চিমদেশীয়দের সে ভাবে বিশ্বাস রাখা কঠিন। আমি বিশ্বাসও করি না আবার অবিশ্বাসও করি না।"

লারী কয়েক মুহূর্ত থেমে রইল, তার গালে হাত দিয়ে টেবলের পানে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে, পুনরায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

"আমি আপনাকে আমার জীবনের একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা বলব। আমি একদিন আমার ঘরে বসে আশ্রমের ভারতীয় বন্ধুদের প্রদর্শিত পথে যোগাভ্যাস করছি, একটা বাতি জেলে তার শিখার দিকে আমার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি, তারপর হঠাৎ সেই অগ্নিশিখার ভিতর আমি কতকগুলি প্রাণী দেখতে পেলাম, একটির পিছনে আর একটি সার বেঁধে আসছে। সামনের স্ত্রীলোকটি বয়স্কা, মাথায় ওড়না, আর কানে দুল। গায়ে আঁটসাঁট বডিস, পরনে কালো স্কার্ট—সপ্তদশ শতাব্দীতে লোকে এই জাতীয় পোষাক পরত—আমার মুখের পানে সলজ্জ ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছেন, আমার দিকে হাত দুটি তুলে আছেন। তাঁর রেখাঙ্কিত মুখের ভঙ্গিমা বেশ করুণামণ্ডিত, মধুর এবং মোহন। তাঁর ঠিক পিছনেই পাশের দিকে ঘন কালো রঙের চুলে হলদে রঙের টুপি পরা, হলদে রঙের গ্যাবার্ডিনের পোষাক পরা বেশ গোলগাল ইহুদী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখে পাণ্ডিত্যের ও গাম্ভীর্যের ছাপ, আবার তপশ্চর্যার কাঠিন্যও মাখানো আছে। তাঁর পিছনেই, অথচ ঠিক আমার সামনেই, (যেন আমাদের উভয়ের মধ্যে আর কেউ নেই) একজন ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ যুবক প্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে। পায়ে ভর দিয়ে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে তাঁর বেশ সাহসিক ও উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গী। পোষাকটা সবই লাল রঙের, যেন রাজ-দরবারের পোষাক, পায়ে ভেলভেটের জুতা, মাথায় চৌকস ভেলভেটের টুপি। এই তিনজন ছাড়াও পিছনে অন্তহীন জনতার প্রতিচ্ছবি, যেন চিত্রগৃহের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের অস্পষ্ট দেখাচ্ছে, কি রকম যে দেখতে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাদের সেই আবছা আকৃতি ও গ্রীষ্ম-বাতাসে দোদুল্যমান গমের গাছের মত দৈহিক আন্দোলনটুকু শুধু বোঝা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে, এক মিনিট পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট পরে জানিনা তাঁরা ধীরে রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন, শুধু সেই প্রজ্জ্বলন্ত দীপশিখা ভিন্ন আর কিছুই রইল না।"

লারী মৃদু হাসল।

"অবশ্য এমন হতে পারে আমি ঈষৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম বা স্বপ্ন দেখেছিলাম। এমন হতে পারে যে সেই ক্ষীণ দীপশিখায় মনঃসংযোগ করার ফলে সম্মোহনশক্তি প্রভাবে আমার অবচেতন মনের গহনে সংরক্ষিত এই সব ছবি দেখেছিলাম। আবার এমনও হতে পারে আমার জন্ম-জন্মান্তরের প্রতিমূর্তি। হয়ত কিছুকাল পূর্বে নিউ ইংলণ্ডের ঐ বুড়ি ছিলাম, তার পূর্বে হয়ত ইহুদী ছিলাম, তারপর সেবাস্তিয়ান ক্যাবট যখন ব্রিস্টল থেকে সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন তার কিছু পরেই হেনরী প্রিন্স অব ওয়েলসের তরুণ সভাসদ ছিলাম।"

"সেই গোলাপ রাঙা শহরের ভদ্রলোকটির কি হল শেষটায়?"

"দু বছর পরে দক্ষিণাঞ্চলে মাদুরা শহরে ছিলাম। একদিন রাত্রে মন্দিরের ভিতর কে যেন আমার বাহু স্পর্শ করল, আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি একজন দাড়িওলা কৌপীন-পরা লোক দাঁড়িয়ে, পরনে তাঁর কৌপীন ভিন্ন আর কিছু নেই। হাতে সাধুজনের মত দণ্ড ও ভিক্ষা পাত্র। কথা বলার পূর্বে তাঁকে আমি ঠিক চিনতে পারিনি। আমার সেই বন্ধুটি। আমি এতই বিস্মিত হয়েছিলাম যে, কি যে বলব ভেবে পাইনি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি করছি, আমি তাঁকে জানালাম, কোথায় যাব জিজ্ঞাসা করায় বল্লাম ত্রিবাঙ্কুর যাব। তিনি আমাকে শ্রীগণেশের সঙ্গে দেখা করতে বল্লেন, তিনি বল্লেন, "তুমি যার সন্ধান করছ তিনি তা দেবেন।" আমি তাঁর বিষয় বলার জন্য অনুরোধ করলাম, তিনি শুধু হেসে বল্লেন, আমার যা কিছু জানার সবই তাঁর সঙ্গে দর্শন হলেই জানতে পারব। আমার তখন বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেছে, তাঁকে তখন প্রশ্ন করলাম, মাদুরায় তিনি কি করছেন। তিনি বল্লেন যে, পদরজে তীর্থ পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। আমি প্রশ্ন করলাম, কি ভাবে আহার ও নিদ্রা চলছে। তিনি বল্লেন, যখনই কেউ আশ্রয় দিয়েছে তখন তিনি তাদের বারান্দায় শোন, নতুবা গাছের তলায় বা মন্দির-প্রাঙ্গণে রাত কাটান। আর আহার যদি কেউ দিত, তাহলেই জুটত নইলে অনাহারেই কাটত। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বল্লাম: "আপনার শরীরের ওজন কমেছে।" তিনি হেসে জবাব দিলেন—"ভালোই হয়েছে, তাতে স্বস্তি পাচ্ছি। তারপর তিনি বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। কৌপীন-পরা কেউ "well so long, old chap"—বলছে শুনলে কেমন মজা লাগে। তারপর মন্দিরের যে অংশে আমার যাওয়া সম্ভব নয়, তার ভিতর চলে গেলেন।

"আমি কিছুকাল মাদুরায় রইলাম, আমার মনে হয় ভারতবর্ষের এই একমাত্র মন্দির যেখানে ইউরোপীয়রা শুধু যেখানে বিগ্রহ আছেন সেই জায়গাটুকু ছাড়া সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারেন। রাতে মন্দিরটি অসংখ্য লোকের ভীড়ে বোঝাই হয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ ও ছোটদের ভীড়। পুরুষদের কোমর পর্যন্ত নগ্ন, পরনে ধুতি, আর তাঁদের কপাল এবং বাহুমূলে ঘুটের ছাইয়ে চিহ্নিত। একটা না একটা মন্দিরে ওরা প্রার্থনা জানিয়ে বেড়ায়, কখনও ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানায়, প্রার্থনা করে, স্তোত্র আবৃত্তি করে। পরস্পরকে ডাকাডাকি করে, অভিনন্দন জানায়, কলহ করে, কখনও বা প্রচণ্ড উৎসাহভরে তুমুল তর্ক জুড়ে দেয়। চারিদিকে একটা অ-দৈব হট্টগোল, তবু কেমন মনে হয় দেবতা কাছেই কোথায় রয়েছেন।

"প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চারিদিকে স্তম্ভে গায়ে খোদিত ভাস্কর্য, তার তলদেশে এক একটি সাধু বসে আছেন, প্রত্যেকের সামনে একটি করে ভিক্ষাপাত্র, কারো বা সামনে ছোট একখানি মাদুর পাতা, তার ওপর ভক্তিমানরা একটি করে তামার পয়সা মাঝে মাঝে ফেলছে। কারো পরিধানে কাপড় আছে, কেউবা প্রায় নগ্ন। কেউ আপনার পানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কেউ পাঠ করছেন, নীরবে বা সরবে—প্রবহমান জনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার সেই বন্ধুটিকে তাদের ভিতর সন্ধান করলাম, তাঁকে আর দেখতে পাইনি। আমার মনে হয় তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করার বাসনায় তীর্থপথে বেরিয়ে পড়েছেন।"

"সেটি কি বস্তু?"

"পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে মুক্তি, তার নাম মোক্ষ। বৈদান্তিকদের মতে আত্মা আমরা যাকে বলি "soul", দেহ ও অনুভূতি থেকে পৃথক মন ও প্রজ্ঞা থেকে পৃথক। আত্মা পরমের অংশ নয়, কেননা তিনি অনাদি অনন্ত, তাঁর কোনো অংশ নেই, আছেন শুধু সেই অনাদি নিজে তিনি স্বয়ম্ভূ, চিরন্তন কাল ধরে আছেন অজ্ঞানতার সপ্তস্তর ছিন্ন হলে আবার অনন্তে তাঁর উদ্ভব সেখানেই বিলীন হবেন যেমন সমুদ্রের জলকণা সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়ে বৃষ্টিধারার সঙ্গে বদ্ধ জলাশয়ে পড়ে তারপর নালায় পড়ে, নালা থেকে স্রোতের মুখে পড়ে নদীতে মেশে, তারপর পাহাড় উপত্যকা অতিক্রম করে সর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে, পাথর ও জলে ভেসে আসা গাছে আঘাত পেয়ে যে সমুদ্র থেকে তার উদ্ভব একদিন সেই সাগর জলেই গিয়ে মেশে।"

"কিন্তু ঐ বেচারা জলকণা যখন সমুদ্রে গিয়ে মেশে, তখন ত' তার ব্যক্তিত্ব থাকে না।" লারী দন্ত বিকশিত করল।

"আপনি চিনি খেতে চান, চিনি হ'তে চান না। ব্যক্তিত্বটা ত' আমাদের অহং বৈ আর কিছু নয়। আত্মার ভিতর থেকে অহমের শেষতম চিহ্নের অবসান না হলে আত্মা সেই পরমের সঙ্গে অনন্তে বিলীন হতে পারে না।"

"লারী, তুমি ত' বেশ স্বচ্ছন্দে অনাদি, অনন্তের কথা বলছ, কথাগুলিও বেশ ভালো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার কাছে এর অর্থ কি!"

"বাস্তবটা ঠিক বলতে পারা যায় না সেটা কি, শুধু কি যে নয় তা বলা যায়,—অনির্বচনীয়। ভারতীয়েরা বলেন, ব্রাহ্মণ। তিনি কোথাও নেই অথচ সর্বত্র বিরাজমান। সব কিছুই তাঁর ওপর ফলিত এবং নির্ভরশীল। তিনি কোনো দ্রব্য বা ব্যক্তিবিশেষ ন'ন, কারণও নন, তিনি নির্গুণ। চিরস্থায়িত্ব ও পরিবর্তনকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন; অখণ্ড বা খণ্ড, সসীম ও অসীম। তিনি সনাতন কারণ তাঁর সম্পূর্ণতা ও সংসিদ্ধির সঙ্গে কালের যোগ নেই। তিনি সত্য, শিব ও সুন্দর।

মনে মনে বল্লাম, "ভগবান।" কিন্তু লারিকে বল্লাম, "কিন্তু এই বিদগ্ধজনের পরিকল্পনা কি করে নিপীড়িত মানব সমাজের অন্তরে শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী এনে দেবে! মানুষ চিরদিনই ব্যক্তিগত দেবতা খুঁজে এসেছে, তাঁর কাছেই তারা ক্লেশ লাঘবের প্রার্থনা জানিয়েছে, স্বস্তি ও উৎসাহের বাণী কামনা করেছে।

"হয়ত সুদূর কালে মহত্তর অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে তারা বুঝবে যে, উৎসাহ ও স্বস্তির বাণীর জন্য নিজের আত্মার কাছেই প্রার্থনা জানানো উচিত। আমার নিজের ত' মনে হয়, নিষ্ঠুর দেবতাকে সন্তুষ্ট রেখে বেঁচে থাকার জন্যই প্রার্থনার প্রয়োজন—আর কিছু নয়। আমি বিশ্বাস রাখি, দেবতা আমার অন্তরে বিরাজমান, নইলে কোথাও নেই। তাই যদি হয় কাকে, কোন দেবতাকে পূজা করব,—নিজেকে? মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন স্তরে রয়েছে, তাই ভারতীয় পরিকল্পনায় সেই অনাদি পুরুষের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও আরো একশো নাম আছে। অনাদি যিনি তিনিই ঈশ্বর, পৃথিবীর সৃষ্টি ও পালন কর্তা, তাই সামান্যতম প্রতীকের সামনে দীন কৃষক রৌদ্রতপ্ত মাঠে তার পুষ্পাঞ্জলি দেয়। ভারতবর্ষের অসংখ্য দেব-দেবী এই সত্যেরই নির্দেশ দেয় যে, জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ।"

আমি তার পানে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তাকালাম। বল্লাম, "সবিস্ময়ে ভাবি, এই তপশ্চর্যায় কি'করে তোমার বিশ্বাস আকর্ষিত হল।"

"মনে হয়, আপনাকে বলতে পারব, আমি চিরদিনই মনে করেছি, ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারা মুক্তির সন্ধান দেওয়ার ভিতর একটা সর্ত রেখেছেন যে, তাঁদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। এ'রা সেই প্যাগান দেবতাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেন, ভক্তের ভস্মীভূত অঞ্জলি না পেলে তাঁরা পাংশু ও অজ্ঞান হয়ে যেতেন। অদ্বৈত আপনাকে কিছুই বিশ্বাস করতে বলেন না। তিনি চান, শুধু সত্যকে জানতে হবে; তিনি বলেন, আনন্দ ও বেদনা ভোগের মত ঈশ্বরকেও স্পষ্টভাবে ভোগ করা যায়। আর ভারতবর্ষে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন—(আমার জানা শত শত ব্যক্তি আছেন—) যাঁদের মনে এটুকু নিশ্চয়তা আছে যে, তাঁরা তা করেছেন। জ্ঞানের দ্বারা সত্যের শিবের সন্ধান মেলে জেনে আমার অপূর্ব তৃপ্তি হ'ল। পরবর্তী যুগে ভারতীয় সাধকরা মানবীয় অক্ষমতা মেনে নিয়ে স্বীকার করেছেন যে, প্রেম ও কর্মের ফলে জীবের মুক্তি সম্ভব। কিন্তু তাঁরা কোনোদিনই অস্বীকার করেন নি যে, কঠিন হলেও মহৎ পথ হল—জ্ঞানের পথ, কারণ মনুষ্যজীবনের মূল্যবান শক্তি হল তার যুক্তি।" (ক্রমশঃ)

দুর্গম পথের যাত্রী—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য; প্রকাশকঃ ক্যালকাটা বুক এজেন্সী, ৭নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা; পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮২, মূল্য ১৷০ আনা।

অজানাকে জানিবার আগ্রহ মানুষের অপরিসীম। এই আগ্রহই মানুষকে পটাসিয়াম সায়নাইড খাইতে প্ররোচিত করে, দুরন্ত বনজন্তু পূর্ণ আফ্রিকার জঙ্গলে যাইতে প্রলুব্ধ করে, তুষারাবৃত হিমালয়ের নিশ্চিত মৃত্যুর কঠিন পথ আরোহণ করিতে আকর্ষণ করে, চির-অন্ধকারময় সমুদ্র গর্ভে অবতরণ করিতে উত্তেজিত করে এবং অসম্ভব জানিয়াও চাঁদের রাজ্যে অভিযান চালাইতে অনুপ্রেরিত করে। মানুষ জানে এই অজানার সন্ধানে যাত্রার ফলে তাহাকে যে চরম মূল্য স্বীকার করিতে হইতে পারে, দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতে হইতে পারে তাহা সে জানে এবং জানে বলিয়াই সে আরও দুর্দমনীয় হইয়া ওঠে। মানুষ যাত্রা করে অজানা পথে, আবিষ্কৃত হয় নূতন দেশ, নূতন ভোগবিলাস দ্রব্য, নূতন নূতন তথ্য। সভ্যতার অগ্রগতি আজ তাই সম্ভব হইয়াছে।

অজানার সন্ধানে মানুষ যতবার যাত্রা করিয়াছে তারই দুঃসাহসিক কাহিনী লেখক সহজ সরল ও কৌতূহলোদ্দীপক ভাষায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য পরিবেশণ করিয়াছেন। ইহাতে আছে মেরু অভিযান, মহাসাগরের অতল গহ্বরে, এভারেস্ট অভিযান প্রভৃতি সাতটি কাহিনী। প্রত্যেকটি কাহিনী যেমন চাঞ্চল্যকর, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। যাহাদের জন্য বইটি লিখিত তাহারা যে এক নিঃশ্বাসে উহা পাঠ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

যারা মানুষ নয়—মৌমাছি রচিত; সমর দে বিচিত্রিত। প্রকাশক—নিরালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা বারো আনা।

বাঙলার শিশুমহলে মৌমাছি সুপরিচিত ব্যক্তি। শিশুদের জন্য গল্প, রূপকথা, রূপনাটিকা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই তিনি যাহাই লিখিয়াছেন, শিশুদের নিকট তাহাই বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। আলোচ্য বইটি একটি রূপ-নাটিকা। বইটির নাম থেকেই উহার ভিতরের কথা বুঝিতে পারা যায়। মানুষ যারা নয়, সেই পাখপাখালি ইঁদুর, শেয়ালপণ্ডিত প্রভৃতিকে কুশীলব করিয়া লেখক শিশুদের উপভোগের জন্য রসের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন। নাটিকাটিতে কয়েকটি গান ও পরিশিষ্টে তাহাদের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে। শিশুরা উহা পড়িয়া এবং সম্ভব হইলে অভিনয় করিয়া বিশেষ আমোদ পাইবে। শ্রীসমর দে'র চিত্রালঙ্করণ বইটিকে সুদৃশ্য করিয়াছে। ২৮৮।৪৮

বেলাভূমি—প্রভাতকুমার গোস্বামী প্রণীত। প্রকাশক—কারবার-ই-হিন্দ লিঃ, ১১, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা আট আনা।

পদ্মা নদীর ভাঙনে ঘরবাড়ি ভাসিয়া যাওয়ায় পরেশ তার স্ত্রী ইন্দুকে নিয়া কলিকাতায় বন্ধু বিপিনের বাসায় আসিয়া ওঠে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর বিপিনের স্ত্রী নন্দরাণীর সঙ্গে তাহাদের সংঘাত বাধে। এদিকে সংসারে অপরিসীম দৈন্যের দরুণ পরেশ ও ইন্দু সমধিক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। একদিন ঐ বাড়িরই ভাড়াটে রায়গিন্নির প্ররোচনায় ইন্দু পরেশের অনুপস্থিতিতে ছেলে মাণিককে ঘরে রাখিয়া চাকুরীর খোঁজে বাহির হয়। রায়গিন্নি কৌশলে ইন্দুকে এক দুষ্টপ্রকৃতির নারী-ব্যবসায়ীর হাতে দিয়া আসে। ইন্দু সৈনিকদের ঘাঁটিতে নীত হয় এবং অসৎ জীবন যাপনে প্ররোচিত হয়। ইন্দু নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় পরেশও বিশেষ মর্মপীড়া ভোগ করে। একদিন পরেশ তার ইন্দুকে কোন এক রাস্তায় মোটরগাড়িতে সুসজ্জিতা অবস্থায় শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের পাশে হাস্যলাস্যলীলা-ময়ী অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সব কিছু বুঝিতে পারিল এবং সেই দিনই পুত্র মাণিককে লইয়া নাগরিক সভ্যতার প্রতি শেষ নমস্কার জানাইয়া আবার পল্লীতেই প্রস্থান করিল।

লেখকের উদ্দেশ্য সাধু। লেখায় তেমন কোন কলাকৌশলের পরিচয় না থাকিলেও লেখকের আন্তরিকতা আছে। এজন্য বইটি পাঠকদের ভালই লাগিবে। ১৯০।৪৮

সংস্কৃতি সমস্যা—শ্রীআনন্দ লাহিড়ী প্রকাশিত প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০নং

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।, মূল্যের উল্লেখ নাই।

৩৮ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা। আর্য ঋষিগণের রচিত গ্রন্থাদির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংস্কৃতির সমস্যাদি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। ২৮২।৪৮

আমার লেখা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। প্রাপ্তিস্থান—রীডার্স কর্নার (গ্রন্থবিহার), ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য—সাড়ে চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ও রস-রচনার একখানি সংগ্রহ পুস্তক। গল্প ও রসরচনাগুলিকে শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত করিয়াছেন। রস-সাহিত্যিক শিবরামের বাছা বাছা রচনাসমূহ খ্যাতনামা শিল্পীর রূপ-সৃষ্টি সহযোগে এই ৩৫৮ পৃষ্ঠার বইখানাকে আগাগোড়া লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ২০১।৪৮

রুধিরে যাদের লাল হয়ে গেল—শ্রীধর্মদাস মিত্র প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে দেশব্যাপী যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে বাঙলাদেশে মেদিনীপুর জিলা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বৃটিশ শাসনবিরোধী পূর্ব পূর্ব আন্দোলনসমূহেও এই জিলার লোকেরা, বিশেষ করিয়া কৃষকশ্রেণী অপরিসীম দুঃখ দুর্দশা ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যেদিন রচিত হইবে, মেদিনীপুর তাহাতে যে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্যগ্রন্থে মেদিনীপুর সদর, কাঁথি ও তমলুক মহকুমার আগস্ট বিপ্লবের রক্তাক্ত বিবরণ একটি গল্পের আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ তরুণদের মনে প্রেরণার উদ্রেক করিবে, দেশের জন্য ত্যাগ ও দুঃখ বরণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত করিবে। ২০৮।৪৮

কাল পুরুষের কারসাজি—শ্রীহৃষীকেশ হালদার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সিটি বুক সোসাইটি, ৬৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

"কাল পুরুষের কারসাজি" রহস্য উদ্ঘাটন শ্রেণীর বই। গ্রন্থের শুরু হইতে রহস্যের চাবি-কাঠী গোপন রাখিয়া শেষ মুহূর্তে উহা উদ্ঘাটন করিয়া পাঠকদিগকে চমকিত করার বাহাদুরীর মধ্যেই এই শ্রেণীর পুস্তকের সার্থকতা। আলোচ্য পুস্তকের লেখক সেদিক দিয়া তাঁহার বইটিকে সার্থকনামা করিয়াছেন। যাঁহারা এ জাতীয় বই ভালবাসেন তাঁহারা এই কালপুরুষের কারসাজি পরখ করিয়া দেখিতে পারেন। ২৪৬।৪৮

মহাভারতীয় উপাখ্যান—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মহাজাতি প্রকাশক, ১০।২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

মহাভারতের কয়েকটি উপদেশপূর্ণ অথচ কৌতূহলোদ্দীপক গল্প চয়ন করিয়া লেখক সরল ভাষায় ছেলেদের জন্য বিবৃত করিয়াছেন। গল্পগুলি অতিশয় মহৎ ভাব ও উচ্চ আদর্শের দ্যোতক। ছেলেদের চরিত্র গঠনে এই সকল গল্প বিশেষ সহায়ক হইবে। এই সমস্ত গল্পের অন্তর্নিহিত ত্যাগ ও মহৎ ভাবের দৃষ্টান্ত সুকুমারমতি শিশুদের মনে যে সত্যিকার মনুষ্যত্বের প্রেরণা জাগাইতে সাহায্য করিবে, একথা বলাই বাহুল্য। আমরা বইটির প্রতি শিশুদের অভিভাবক ও শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ২৪১।৪৮

বাসর—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

তোতলা গণশা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গের পরিচয় ইতিপূর্বেই বিভূতিবাবুর কোনো কোনো গল্পে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য 'বাসর' বইখানা ১৪১ পৃষ্ঠার বড় একটি হাসির গল্প। এই গল্পে গণশা এক বিচিত্র ধরণে চিত্রিত হইয়াছে। নাবালিকা প্রতিবেশিনী পুটুরাণীর সহিত গণশার পরিণয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যে পুটুর মনে গণশার প্রতি পূর্ব-রাগ ও অনুরাগ অঙ্কুরিত করিবার জন্য গণশার বন্ধুরা নানা কৌশলজাল বিস্তার করে এবং গণশাকে নিরুদ্দিষ্টভাবে কোনো এক স্থানে লুকাইয়া রাখে। কিন্তু তাহাতেও উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয় না। শেষে গণশা নিজেই গৃহত্যাগ করে। পরে তারকেশ্বরে সাধুবেশে তাহাকে বন্ধুরা আবিষ্কার করে এবং নানা হাস্যকর কার্যকলাপের মধ্যে দিয়া পুটুরাণীর সহিত গণশার বিবাহ সংঘটিত হয়। গণশার দলের বিচিত্র কার্য-কলাপ বেশ উপভোগ্য। অনেকগুলি রেখাচিত্র দ্বারা গল্পটি চিত্রিত। ১৯১।৪৮

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র—শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক—এন এম রায় চৌধুরী কোং লিঃ, ৭২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—চারি টাকা।

এই গ্রন্থ অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের পর্যালোচনা। নৃতত্ত্ব, মানুষের আদি সভ্যতার বিকাশ, আর্থিক প্রয়োজনে তথা জীবনধারণের সৌকর্যার্থে পরিবার ও গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া এবং রাষ্ট্রসচেতন হওয়ার বিষয় বিস্তৃতভাবে এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। এ সকল বিষয় সাধারণত মোটা মোটা কষ্টসাধ্য ইংরেজি গ্রন্থেই লেখা থাকে। সাধারণ লোকে এ সকল বিষয় পড়িয়া জ্ঞানলাভের সুযোগ পায় না; আর সুযোগ পাইলেও দুঃখের বিষয়, নাটক নভেলে অভ্যস্ত পাঠকগোষ্ঠীর এদিকে অনুরাগ বড় কম। যাহা হউক, বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের এই প্রয়োজনীয় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থখানি অতি সহজ ভাষায় সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়াই লিখিত। এ বিষয়ে সরকার মহাশয়ের যে অগাধ পাণ্ডিত্য আছে এবং যাহা তিনি গ্রন্থে অকাতরে পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিলে পাঠকগণ সমাজতত্ত্বের নানা বিষয়ক জ্ঞান লাভে সক্ষম হইবেন। ২৪৪।৪৮

বুনিয়াদি শিক্ষা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ এম-এ, বি-টি প্রণীত। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা।

"বুনিয়াদি শিক্ষা" গ্রন্থের লেখক স্বয়ং একজন শিক্ষাবিদ—বাঙলার শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার বিশ্লেষণ ও পরিচয় দান বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থ যে প্রকৃত তথ্য-সমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হইবে, একথা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বুনিয়াদি শিক্ষার উৎপত্তির কথা, উহার উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং পাঠ্যতালিকা প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে এই গ্রন্থখানা শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষা-উন্নতিকামীদের নিকট বিস্তারিত প্রামাণ্য গ্রন্থরূপেই গৃহীত হইবে। ২৪৩।৪৮

গান্ধী-দর্শন—কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান কংগ্রেস পুস্তক প্রচারকেন্দ্র, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা, আট আনা।

গান্ধী-দর্শন গান্ধীজীকে বুঝিবার একখানা দিগদর্শন বিশেষ। গান্ধীজী বলিয়াছেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী।' অন্যদিকে লোকে দেখিতেছে গান্ধীজীর বাণীই তাঁহার জীবন। আমরা যখনই তাঁহার বাণী নিষ্ঠা, পবিত্রতা, একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতার সহিত চিত্তের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে পারিব, তখনই আমরা গান্ধীজীর পরম সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের মধ্যে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। 'গান্ধী-দর্শনে' গান্ধীজীর বহু সংখ্যক বাণী বাংলা ভাষাতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ের বাণী শিরোনামা সংযুক্ত করিয়া সাজানোর দরুণ পাঠকদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। আমরা গ্রন্থখানার বহুল প্রচার কামনা করি। ২০১।৪৮

গান্ধী-বাণী কণিকা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত। প্রকাশক—নিরীক্ষা প্রকাশনী, বহরমপুর, পশ্চিম বঙ্গ। মূল্য দেড় টাকা।

মহাত্মা গান্ধীর কতকগুলি বাণী নির্বাচন করিয়া সুললিত ছন্দে সেগুলিকে কাব্যের রূপ দেওয়া হইয়াছে। গান্ধীজীর বাণী সর্বাবস্থায় মানুষের জীবনপথের দিগদর্শনস্বরূপ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির হাতে সে সব বাণীর ছন্দোবদ্ধরূপ মুখস্থ করিয়া রাখার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। গান্ধীজীর বাণী অমূল্য। পুস্তকের মূল্য নির্ধারণ দ্বারা সে বাণীর মূল্য নির্ধারণ হয় না, একথা সত্য। কিন্তু একটা অন্য-দিকও রহিয়াছে, সেই দিক বিবেচনায় ৪৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটির আরও কম মূল্য ধার্য হইতে পারিত। বইখানা সুদৃশ্য। ২১৫।৪৮

Sri Aurobindo and Indian Freedom:—By Sisir Kumar Mitra. Sri Aurobindo Library, 369, Esplanade, Madras, G.T. Price Re. 1-8.

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের নিকট এক চিরস্মরণীয় দিন। বিদেশীর নাগপাশ মুক্ত হইয়া এই দিন ভারতভূমি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এই স্বাধীনতার জন্য সহস্র সহস্র কর্মী যেমন দুঃখ ও নির্যাতন বরণ করিয়াছে, তেমনি বহু মনীষী কর্ম, চিন্তা ও ভাবধারাযোগে গণমনে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত করিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সহজাত বিপ্লবপন্থী। তাঁহার বাল্যকাল ইংলন্ডে কাটিয়াছে। কিন্তু সেইখানেই ছাত্রাবস্থাতেই তিনি এক নূতন বিশ্বের স্বপ্নে বিভোর হইতেন এবং পৃথিবীতে এক স্বর্ণযুগ আগমনের আভাস নিজের মধ্যে অনুভব করিতেন। তাঁহার পিতা ভারতে ইংরাজের দুষ্কীর্তির বিবরণ সহ খবরের কাগজের চিরকুট-সমূহ তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতেন; তখন তাঁহার নববিশ্ব দর্শনের তেজোময় কল্পনা পতিত ভারত-ভূমির মুক্তির পথে বিবর্তিত হইতে থাকে। অতঃপর ভারত-মুক্তির বিপ্লবে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙালীর নিকট তাহা সুবিদিত। আলোচ্য গ্রন্থে সংক্ষেপে এবং সুচারুভাবে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের মূলে শ্রীঅরবিন্দের অবদান বর্ণনা করা হইয়াছে। অরবিন্দ-জীবনের এক বিশিষ্ট ও বন্দনীয় রূপ লেখকের হাতে এই পুস্তকখানাতে বর্তিকার ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। ১৮৭।৪৮

ক্তিদিগের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে। সুতরাং বিষয়ে সরকারের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য কি, াহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

কৃষি বিভাগের সচিবকে আমরা জিজ্ঞাসা রি, এ অভিযোগ কি সত্য যে, সরকার শ্রমিক-গকে যে হারে পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত, াহাতে শ্রমিক পাওয়া দুষ্কর? যুদ্ধের পূর্বে মিকরা যে পারিশ্রমিক পাইত, এখন যে াহাতে তাহাদিগের অভাব মিটিতে পারে না, াহা বলা বাহুল্য। সরকার কি সে হারের াবশ্যক পরিবর্তন করিয়াছেন? সুন্দরবন ঞ্চলে কয়টি বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইলে বাঁধ ুনর্গঠনের প্রস্তাবে এই বিষয় আলোচিত ইয়াছিল। নির্মাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ল্পদিনের মধ্যে বারাকপুরে গান্ধীজীর যে ্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাইয়াছেন, তাহাতে মিকদিগকে কি হারে পারিশ্রমিক দিতে ইয়াছে, তাহা তিনি প্রকাশ করিবেন কি? াহা প্রকাশ পাইলে লোক সেই হারের সহিত ুষ্করিণী সংস্কারের জন্য সরকার যে হার তে চাহেন, তাহার তুলনা করিয়া দেখিতে ারে। অনেক স্থলে যে পুষ্করিণী সংস্কারের ার স্থানীয় সমিতি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানকে দিয়া রকারী কর্মচারীদিগকে পরিদর্শন ভার দিলে াজ সহজসাধ্য হইতে পারে, তাহা বলা হুল্য। সরকারী বিভাগীয় কাজে যে ব্যয় ধিক হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ই। বাঙলার লোক শ্রমবিমুখ নহে। ডেনমার্কে হল্যাণ্ডে সমবায় প্রথায় উন্নতি সাধিত ইয়াছে বলিয়া লোককে সদুপদেশ না দিয়া চবগণ যদি এদেশে সমবায় বিভাগের ত্রুটি ংশোধনের ব্যবস্থা করেন, তবে ভাল হয়।

বিহার সরকারের বাঙ্গালী ও বাঙলা দ্বেষ পরিচয় সমভাবেই পাওয়া যাইতেছে। হারে—বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বাঙলাভুক্ত িরবার আন্দোলনের জন্য লোকের উপর দৃষ্টি রাখিতে পুলিশকে যে নির্দেশ ওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত • হওয়ায় হার সরকার যে কর্মচারীর অসতর্কতায় উহা না গিয়াছে, তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছেন। কিন্তু সরকার ঐরূপ নিন্দনীয় নির্দেশ প্রদান রেন, সে সরকারের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা ওয়া সঙ্গত? ইংরেজ সরকার—মুলভেনী পোর্টের ও হ্যালহেড সার্কুলারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন—বিহার সরকার কি ই সরকারের পদাঙ্কানুসরণ করিবেন? আবার ুলিয়ার সাপ্তাহিক পত্র "সংগঠনের' ম্পাদক স্বামী অসীমানন্দের বিরুদ্ধে সদর ুকুমা হাকিম আদালত অবমাননার অভিযোগ িয়াছেন। উত্তরে স্বামী অসীমানন্দ িয়াছেন—

"আমি স্বাধীন ভারতের একজন স্বাধীন ারিক এবং স্বাধীনভাবে আমার মন্তব্য বিবৃত করিবার এবং ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করিবার অধিকার আমার আছে।"

তিনি আমাদিগের শাসকদিগকে ইংরেজের আমলের মনোভাব বর্জন করিয়া "সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়বিচার ও স্বাধীন চিন্তাপুষ্ট ভারতীয় আদর্শের অনুপ্রেরণায় স্বাধীন ভারতের ধর্মাধিকরণের ও বিচারাসনের মর্যাদা রক্ষায়" অবহিত হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি মনে রাখেন নাই যে, এখনও ইংরেজী আমলের আইন হইতে সকল প্রথা পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়—"ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত লাগায়েৎ বিলাতী কক্কুর" বিলাতী সকলেরই ভক্ত। কাজেই ইংরেজের আমলের মনোভাব বর্জন করা সহজসাধ্য নহে। এই কারণেই আমরা ইংরেজের আমলের ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের চাকরীয়াদিগকে পরিবর্তিত রাজনীতিক অবস্থায় অবসর দিতে বলি। ইংরেজের আমলের কথায় অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন—

"As a rule the foreign Government can rely on the 'Native' civilian to be more zealously oppressive than even the average Anglo-Indian official".

স্বভাব সর্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও কম প্রবল নহে। সেই অভ্যাস বর্জন কি সহজসাধ্য হইতে পারে?

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী "ইউনাইটেড প্রেস" তমলুক হইতে সংবাদ পরিবেষণ করিয়াছেনঃ—

"স্থানীয় পুলিশ মেদিনীপুর সদর হাসপাতালের একজন নারী নার্সকে তমলুক হাসপাতালের পুরুষ নার্স কেরামত আলীর গৃহ হইতে উদ্ধার করিয়াছে।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা" মন্তব্য করিয়াছেন,—

"পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মফঃস্বলের নানাস্থান হইতে এই শ্রেণীর নারী হরণের সংবাদ প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে দুই একটা দেখা যায়। কিন্তু তমলুকের এই সংবাদটি সকলকে ছাড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও পুলিশ এ বিষয়ে একটু প্রখর দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়।"

প্রখর দৃষ্টি রাখা পরের কথা। আপাততঃ এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহারা কি কৈফিয়ত দিবেন? আমরা আশা করি, ঘটনাটি "ধামাচাপা" দেওয়া হইবে না।

গত সপ্তাহে হুগলী জেলার কোন গ্রামে পুলিশের সহিত গ্রামবাসীদিগের যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যে স্ত্রীলোকেরাও লিপ্ত ছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কিষাণ সভার সংবাদে প্রকাশ, পুষ্পবালা মাঝি, পাঁচুবালা ভৌমিক, দাসীবালা মাল ও বিদুমলের পত্নী পুলিশের গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছে। পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয় নাই বটে, তবে ৬ জন স্ত্রীলোক আহত হইয়াছিল। সরকারী বিবৃতিতে দেখা যায়, পুলিশ কম্যুনিস্টদিগের সন্ধানে গ্রামে প্রবেশ করিতে বাধা পায় এবং সংঘর্ষে পুলিশ গুলী চালায়। ইহার কিছুদিন পূর্বে ২৪ পরগণা জিলায় কাকদ্বীপ অঞ্চলে যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতেও হতাহতের মধ্যে স্ত্রীলোক ছিল। তাহারও সম্পূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু একপক্ষে বন্দুকধারী পুলিশ আর অপর পক্ষে হয়ত সম্মার্জনী প্রভৃতি ধারী স্ত্রীলোক—এই অসম যুদ্ধে যে বহু গ্রামবাসীর হতাহত হওয়া অনিবার্য, তাহা অবশ্যই অনুমান করা যায়। সরকার কি বলিতে চাহেন যে, কম্যুনিস্ট মত সুদূর পল্লীগ্রামে কৃষক বা শ্রমিকদিগের পরিবারে—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও ব্যাপ্তিলাভ করিয়া তাহাদিগকেও পুলিশের কার্য প্রতিরোধে প্রণোদিত করিতেছে? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার প্রতিকারের উপায় কি?

সমাজে যে শৃঙ্খলার অভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা অন্ততঃ এদেশে অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব যদি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহার নিদান নির্ণয় ব্যতীত আবশ্যক বিধান কখন সম্ভব হইবে না।

ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তনের পূর্বে মাদ্রাজে বিশাখাপত্তনে সিন্ধিয়া স্টীমার কোম্পানীর বৃহৎ নৌ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত হইবার পরে ভারত সরকার মাদ্রাজে ঐ কারখানার বিস্তার সাধনের এবং বাঙলায় ও বোম্বাইয়ে ২টি কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন। বাঙলায় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে যে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, সরকার বোর্ড ট্রাস্টের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার স্থান স্থির করিবেন, কথা ছিল। প্রথমে যে পরিকল্পনা হইয়াছিল, তাহার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছিলাম। এখন জানা যাইতেছে যে, বঙ্গোপসাগরের সান্নিধ্যে গঙ্গার কূলে গেঁয়োখালীতে ঐ নৌ-নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচিত হইতেছে। গেঁয়োখালী স্থলপথে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের পাঁশকুড়া স্টেশন হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত—মেদিনীপুর জিলার তমলুক ও মহিষাদল হইতে তথায় যাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, পূর্বে তমলুক (পুরাতন তাম্রলিপ্ত) সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল—এখন সমুদ্র সরিয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঁশকুড়া হইতে গেঁয়োখালী পর্যন্ত প্রায় ৩০ মাইল রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাবও করিয়াছেন। তাহাতে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ঐ রেলপথে ও প্রস্তাবিত নৌ-নির্মাণ কারখানায় মোট আনুমানিক ব্যয় ১৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা হইবে।

বাঙলা এক সময়ে নৌ-নির্মাণ শিল্পে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। সে পুরাতন কথা। তাহার পরে এ দেশে ইংরেজ প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠিত হইলেও কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুরে জাহাজ নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে কারণে এ দেশে নৌ-নির্মাণ শিল্প অবজ্ঞাত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু কেন্দ্রী পরিষদে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে নৌ-নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিশ্চয়তার অভাব। বলা হইয়াছে, ফ্রান্সের কোন নৌ-নির্মাণ বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ অল্পদিন মধ্যেই গ্রহণ করিবেন। কলিকাতার নিকটে কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি মত দিবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ও বোম্বাই প্রদেশের সরকারের রিপোর্ট বিচারার্থে তাঁহাকে প্রদান করা হইবে। কলিকাতার উপকণ্ঠে পূর্বে জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে পূর্বে অধিক জাহাজ নির্মিত হইত। বোম্বাই প্রদেশের জাহাজ নির্মাণের কারখানার ইতিহাস লিপিবদ্ধও হইয়াছে। সেইজন্য ভয় হয়, হয়ত বোম্বাইএর দাবীই প্রবল হইবে। বলা বাহুল্য, বোম্বাই সমুদ্রতীরে অবস্থিত থাকায় তাহার এক হিসাবে সুবিধা আছে। কিন্তু কলিকাতা যদিও সমুদ্রকূলে অবস্থিত নহে—এমন কি গেঁয়োখালীও সমুদ্রতীরে বলা যায় না, তথাপি তাহাতে যে কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে না, তাহা বৃটেনে ক্লাইড তীরবর্তী কারখানায় প্রতিপন্ন হয়। তথায় বড় বড় জাহাজ ঐ সকল কারখানায় নির্মিত হয় এবং তথা হইতে সমুদ্রে প্রেরিত হয়। মাদ্রাজের সুবিধা এই যে, বিশাখাপত্তনের পার্শ্বে একটি অনুচ্চ পাহাড় সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে 'ডলফিন্‌স্ নোজ' বলে। সেই পাহাড়ের পার্শ্বে সমুদ্রের জল যে খাঁড়িতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে জলে সমুদ্রের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য নাই। তথায় সিন্ধিয়া কোম্পানী জাহাজ নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সরকার এখন তাহারই বিস্তার সাধন করিবেন। কলিকাতার সান্নিধ্যে ডায়মণ্ডহারবারেও কারখানার সুবিধা হইতে পারে। ভারত সরকার কেন যে ফরাসী বিশেষজ্ঞকে আনিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। কতদিনে যে কাজ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা, তাহাও বলা হয় নাই। সুতরাং সে বিষয়ে এখন অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় তাঁহাদিগের যাত্রিবাহী বাসের সংখ্যা বর্ধিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহারা দুইশত বাসের ফরমাইস দিয়াছেন—এ পর্যন্ত প্রায় দেড়শত পাওয়া গিয়াছে—অবিলম্বে আরও ৩০ খানি পাওয়া যাইবে। এপর্যন্ত ইহার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে—বৃটেন হইতে যে বিরাট বাস আমদানী করা হইয়াছে, তাহার মূল্য ৬৭ হাজার টাকা। সরকারের কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী কিনিয়া লইবার কোন কথা শুনা যাইতেছে না। সরকার যে বিরাট ব্যয় বিভাগ সৃষ্টি করিলেন, লাভে তাহার খরচ কুলাইয়া যাইবে ত? কলিকাতার লোকসংখ্যা যেরূপ বর্ধিত হইয়াছে, তাহাতে যানের সংখ্যা আরও না বাড়াইলে উপায় নাই। বিশেষ কলিকাতার উপকণ্ঠে বাস চলাচলের সুবিধা করিয়া না দিলে ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না। আমরা এমন অভিযোগও পাইয়াছি যে, কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন কোন ক্ষেত্রে বাস চলাচলের অনুমতি দিতে অযথা বিলম্ব হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। কলিকাতায় যানজনিত দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এ জন্য যে অনেক ক্ষেত্রে পদাতিক যাত্রীরা দায়ী তাহা বলা বাহুল্য। যে সকল পথে ফুটপাথ আছে, সে সকলে ফুটপাথ ত্যাগ করিয়া গমনাগমন জন্য রাস্তা ব্যবহার দণ্ডনীয় করা প্রয়োজন। আর পথ পার হইবার নির্দিষ্ট স্থান না থাকিলে দুর্ঘটনা হ্রাস পাইবে না। বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে বিশেষ ব্যবস্থা করা যেমন প্রয়োজন—যাহাতে সিনেমার সম্মুখে জনতা বিপদ বৃদ্ধি করিতে না পারে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও তেমনই—বা ততোধিক প্রয়োজন। এ সকল বিষয়ে যে কলিকাতা পুলিশের আবশ্যক দৃষ্টি আছে, তাহার পরিচয় আমরা পাই নাই।

কংগ্রেসের সভাপতি ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া আগামী ৭ই মার্চ কলিকাতায় আসিবেন এবং ৪।৫ দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিবেন। সেই সময় কেহ কেহ তাঁহার সহিত বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার বিষয় আলোচনা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু বিহার সরকারের সে বিষয়ে মনোভাব কাহারও অবিদিত নাই। ডক্টর সীতারামিয়া ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের পক্ষপাতী এবং তিনি এখনও সেই মতে অবিচলিত আছেন। কংগ্রেসের সেই মত যে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট বিহার সম্বন্ধে অবজ্ঞার যোগ্য তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এমন কি তিনি বিহারের বংগ-ভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দী ভাষাভাষী করিতে যে পরামর্শ দিয়াছেন, বিহার সরকার তাহা নির্দেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইতোমধ্যেই তাঁহারা বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলে বিদ্যালয়ে বাংলায় বাঙালীদিগের শিক্ষা প্রদান নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগামী বর্ষের বাজেট ব্যবস্থা পরিষদে পেশ হইয়াছে। বাজেট সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বোধ হয় পরিষদে হইবে। মোট কথা, এ বাজেট দরিদ্রদের জন্য নহে; ইহা ধনীর বাজেট। নূতন কর ধার্য করিয়া ঘাটতি পূরণের চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু নূতন কর যে দরিদ্রের পক্ষে কষ্টদায়ক হইবে, তাহা বিবেচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যয়-সংকোচের অনেক উপায় ছিল—সে সকল অবজ্ঞাত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা-ব্যবস্থা "ঢালিয়া সাজিবার' যে ব্যবস্থা হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা নানা অভিযোগ পাইতেছি। সহসা বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজনও প্রতিপন্ন হয় নাই। আমরা অভিযোগ পাইয়াছি, বাঁকুড়া জিলায় কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বৃত্তি বর্ধিত হয় নাই বটে, কিন্তু স্থানীয় স্কুলের এক শিক্ষকের বৃত্তি অনেক বর্ধিত হইয়াছে—তাহার কারণ জানা যায় নাই। নবদ্বীপের পণ্ডিত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ বন্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্থানে বাঁকুড়ার সূর্যনারায়ণ তর্কতীর্থের বা মেদিনীপুরের রাজেন্দ্র তর্কতীর্থের নিয়োগ কি বিবেচিত হইতেছে? পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সমাজ যে নবদ্বীপের ও ভট্টপল্লীর ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়—কোটালিপাড়া প্রভৃতি কেন্দ্রের ব্যবস্থায় নহে, তাহাও বিবেচ্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কোন কর্মচারী সহসা টোলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এমন কথাও শুনা যাইতেছে। আমরা এই সকল দিকে শিক্ষা সচিবের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছি।
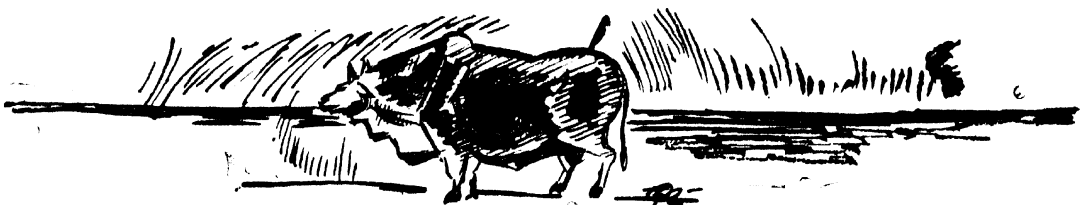
স্বতন্ত্র চিত্র-নির্মাতা বাঁচবে কিসে?

ছবির বাজারে আজকে সবায়ের চেয়ে দুরবস্থা হচ্ছে, ছবি যারা দেখায় তাদের নয়; ছবি যারা পরিবেশন করে তাদেরও নয়—দুরবস্থা হচ্ছে ছবির যারা মালিক অর্থাৎ ছবি যারা তৈরী করে। এখন ছবির রাজ্যে অধীশ্বর হচ্ছেন প্রদর্শকরা অর্থাৎ চিত্রগৃহের মালিকরা। আর এ রাজত্ব হ'লো, কিছুদিন আগেও যেমন ছিলো, সেই সব নেটিভস্টেটের রাজাদেরই মতো—কারুর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ষোল আনাই নিজের ভাগে টেনে নেওয়ার মতোই। এখন নেটিভস্টেটগুলি একে একে বিলীন হয়ে যেতে বসলে কি হবে, তার ভূত-গুলো এসে ভর করছে এখনকার প্রদর্শকদের ওপর।

অবশ্য এ রাজত্বের সূত্রপাত হয়েছে যুদ্ধের বাজার থেকেই। চিত্রগৃহের বিপুল আমদানীর জোরে প্রদর্শকরা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় ক'রে নেয়, তবে তখন বেশী প্রতাপ তারা খাটাতে পারেনি; কারণ ছবি সংখ্যায় ছিলো নিতান্তই অপ্রচুর। চিত্রনির্মাতাদের তাই তখন খাতির ছিলো; তাদেরও হাতে ছবির দরুণ মোট আমদানীর একটা মোটা অংশই পোঁছে যেতো। কিন্তু যেই তখনকার বাজারের চেয়ে ছবির সংখ্যা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেড়ে গেলো, অর্থাৎ পর্দার সংখ্যার তুলনায় ছবি সংখ্যায় হয়ে দাঁড়ালো অনেক বেশী, ছবিঘরের মালিকরাও সুযোগ বুঝে কোপ মারতে আরম্ভ করে দিলেন এবং দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এমনি নির্মমভাবে তাঁরা বাঁশ দিয়ে চলেছেন যে, ছবির সমস্ত বাজারটাই তার জন্যে ধ্বসে যেতে বসেছে। আঘাতটা সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ছবির মালিকদের ক্ষেত্রে আর তার জের গিয়ে পড়েছে ছবি তোলার ব্যবসার ওপরে—ছবি তোলার জন্যে পয়সা খরচ করছে ছবির মালিকরাই; কিন্তু এ পয়সাও না খাটিয়ে উপরন্তু লোকসানের বিরুদ্ধে খেসারৎ পাবার চুক্তিতে সে ছবি দেখিয়ে লাভ করে যাচ্ছে প্রদর্শকরা বেশীটা, আর খানিকটা পরিবেষকরা। ছবির মালিক লাভ তো পায়ই না বরং বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রেই খুব জনপ্রিয় ছবির ক্ষেত্রেও তোলার খরচটা তোলাই দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে উপরন্তু প্রদর্শকের লোকসানের খেসারতও দিতে হয়েছে ঘর থেকে টাকা এনে। এ ব্যাপারটা আর একটু খুলে বলা দরকার।

ছবি তৈরী হ'লেই তা দেশের বিভিন্ন স্থানের চিত্রগৃহে দেখাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে কোন-না-কোন বিতরক বা ডিস্ট্রিবিউ-টার্সের হাতে ছেড়ে দিতেই হবে। বিতরক অবশ্য একাজ করে দেবার জন্যে ছবির মালিকের কাছ থেকে একটা কমিশন লাভ করে থাকে, যার পরিমাণ বিতরকের হাতে ছবির দরুণ আমদানী টাকার চার আনা পর্যন্তও হয়ে থাকে। বিতরকের আমদানী মানে চিত্রগৃহগুলি থেকে যে টাকাটা তার হাতে আসে, যা পরিমাণে হচ্ছে প্রমোদকর বাদে চিত্রগৃহে মোট টিকিট বিক্রীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্ধেক। অর্থাৎ কোন ছবি প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করার জন্যে যদি ছয় লক্ষ টাকা টিকিট বিক্রীর দরুণ আমদানী করতে সক্ষম হয় তো তার মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকাই চলে যাচ্ছে প্রমোদকর দিতে। (নতুন বাজেটে দিতে হবে প্রায় তিন লক্ষ) বাকী ৪॥ লক্ষের থেকে চিত্রগৃহ কেটে নিচ্ছে ২। লক্ষ এবং বাকীটা তুলে দিচ্ছে বিতরকের হাতে। বিতরক তা থেকে কমিশন নিয়ে নিচ্ছে সওয়া ৩১ হাজার টাকা এবং চিত্রনির্মাতাকে দিচ্ছে মাত্র এক লক্ষ পৌণে ১৮ হাজার টাকা—এটাও সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় ছবির ক্ষেত্রেই। অথচ চিত্রনির্মাতার সে জায়গায় খরচ করতেই হচ্ছে, ছবি তৈরী, তার নয় দশ-খানা প্রিণ্ট, পাবলিসিটি প্রভৃতি বাবদ খুব কম করেও ওর প্রায় ডবল টাকা। আজকাল স্টুডিও-গুলি ক্রমশই অচল হয়ে পড়ার কারণ এরপর আর বুঝতে অসুবিধে হয় না। এ অবস্থা থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে শুধু সেই সব চিত্র-নির্মাতারাই যাদের বিতরণ ও প্রদর্শন ব্যবস্থা নিজেদেরই হাতে আছে। এখন ছবি তোলার কাজ যা কিছু টুকটাক চলেছে তা এইসব নির্মাতাদেরই হয়ে। এর মধ্যেও আবার আর এক কথা।—

অনেক প্রদর্শক-বিতরক বা শুধু বিতরক নিজেরাই ছবি তৈরী করাটা ব্যবসার দিক থেকে অসুবিধার কারণ দেখে তেমন তেমন ক্ষেত্র বুঝে স্বতন্ত্র চিত্রনির্মাতাদের অগ্রিম টাকা কিছু কিছু দিয়ে থাকে। এতে চিত্রনির্মাতাকে অপেক্ষাকৃত কম পয়সা ঢালতে হয় বটে, যেহেতু খানিকটা খরচ সে চালিয়ে নিতে পারছে বিতরকের কাছ থেকে পাওয়া ঐ টাকা থেকে, কিন্তু তার কোন সুবিধেই হচ্ছে না তাতে। প্রদর্শক-বিতরক একই সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সুবিধে মাত্র এই যে, ছবিখানি মুক্তি দেবার জন্যে দাঁড়াতে হয় না কোথাও; তা নয়তো প্রদর্শক হিসেবে যে শতকরা পঞ্চাশ, তা তারা কাটবেই, বিতরকের কমিশনও দিতে হবে ঐ হারেই বরং টাকা আগাম নেওয়ার জন্যে একটু বেশী হারেই। তারও পর পুরো টাকা নিজের হলে যত সামান্যই হোক, কিছু টাকার মুখ খয়রাতি ঘরে তো দেখতে পেতো, লাভ না হয় নাইবা হলো। কিন্তু আগাম টাকা নিলে বিতরক ঐ টাকা পুরিয়ে নিয়ে কবে . যে চিত্রনির্মাতাকে টাকা দিতে আরম্ভ করবে এবং আদপেই চিত্র-নির্মাতা কোনদিন চলে-যাওয়া টাকার একটিও ফেরৎ পাবে কি-না সেইটেই হলো সন্দেহের বিষয়। চিত্র ব্যবসার ময়দানে নির্মাতাদের আসন আজ দর্শকদের গ্যালারীতে—শুধু দেখে যাওয়া কি করে তারই টাকায় তোলা তারই ছবি থেকে প্রদর্শক আর বিতরকরা হাজার হাজার টাকা অর্জন করে যাচ্ছে আর তার হাতে এসে পোঁছাচ্ছে প্রদর্শক ও বিতরকের লাভের নজীর—সেল-স্টেটমেণ্ট—কাগজের গায়ে কটা আঁকিড় যার বাজার দাম এক কাণা কড়িও নয়। স্বতন্ত্র চিত্রনির্মাতাদের আজ এই হলো প্রকৃত অবস্থা।

মজার কথা আরও আছে। খরচের টাকাটা তোলাই চিত্রনির্মাতার একমাত্র দুশ্চিন্তা নয়, সেই সঙ্গে প্রদর্শকের যাতে লাভটা অক্ষুন্ন থাকে সে বিষয়েও তাকে গ্যারাণ্টী দিয়ে চুক্তি করতে হয়—বিক্রীর টাকা থেকে সে অংকটা তোলা যায় তো ভালই, নয়তো চুক্তি রাখবার জন্যে ঘর থেকে টাকা দিতে হয় প্রদর্শকের হাতে তুলে। এর নাম হলো প্রটেকশন।

ছবি দেখাতে গেলেই প্রদর্শকের স্বার্থ রক্ষার জন্যে চিত্রনির্মাতাকে দুটো সর্ত করতে হয়। একটি হলো মিনিমাম গ্যারাণ্টী বা এম-জি বা হোল্ড-ওভার আর অপরটি ঐ প্রটেকশন। এ এক উদ্ভট সর্ত। প্রথম সর্ত হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার টিকিট বিক্রী হবেই ব'লে গ্যারাণ্টী দেওয়া—বিক্রী সে অংকে না পোঁছালে ছবি তুলে নিতে তো হবেই তার ওপর যত টাকা কম হবে, সেটার জন্যে প্রদর্শককে খেসারৎও দিতে হবে। আর প্রটেকশন হচ্ছে ছবিঘরের সাপ্তাহিক নির্ধারিত খরচ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার রক্ষা-কবচ—চিত্রনির্মাতাকে সেটাও তুলে দেবার গ্যারাণ্টী দিতেই হবে। কিন্তু কি বিচিত্র বিরোধী সর্ত দেখুন।—কোন চিত্র-গৃহের প্রতি প্রদর্শনী হাউস ফুল গেলে সাপ্তাহিক বিক্রী হয়তো দাঁড়ায় ২০ হাজার টাকায়। তার এম-জি বা হোল্ড-ওভার অর্থাৎ যে টাকার বিক্রী না হলে ছবি তুলে নিয়ে চিত্র-নির্মাতাকে ঘর থেকে বাকী কমটা পুরিয়ে দিতে হবে তা হয়তো বাঁধা ১২ হাজারে—তা ছাড়া চিত্রগৃহ তার প্রটেকশন চেয়ে বসছে আট হাজার। এখন চিত্রগৃহের সঙ্গে প্রমোদকর বাদে বিক্রীর ওর আধাআধি বখরার সর্ত থাকলে ঐ রক্ষাকবচ বা প্রটেকশনের আট হাজার টাকা তুলতে কর বাদে টিকিট বিক্রীর টাকা দরকার

হয় ১৬ হাজার। তার মানে প্রটেকশনের জন্যে যে সর্ত, তা পূরণ হতে একদিক থেকে ১৬ হাজার টাকার বিক্রী গ্যারাণ্টী দিতে হচ্ছে, আবার ওদিকে কিন্তু এম-জি থাকছে ১২ হাজারে। অর্থাৎ প্রদর্শক এম-জি সর্তে ১২ হাজার টাকার বিক্রী পর্যন্ত ছবি চালাতে রাজী থাকছে, আবার একই মুখে প্রটেকশন সর্তে ১৬ হাজার টাকা বিক্রী না হলেই চিত্রনির্মাতার কাছ থেকে খেসারৎ আদায় করছে। তার সোজা অর্থ এই যে, সাপ্তাহিক বিক্রীর পরিমাণ (প্রমোদকর বাদে) ১৬ হাজার থেকে ১২ হাজার থাকবে চিত্রনির্মাতা যদি ছবি চালাতে চায় তো প্রটেকশন বাবদ ১৬ হাজারের চেয়ে যে টাকাটা কম উঠবে তা তাকে ঘর থেকে এনে প্রদর্শককে রক্ষে করতে হবে। শেষে আবার বিক্রী ১২ হাজারের চেয়ে কমে গেলে এম-জির সর্ত পালন করতে আর একবার তাকে ঐ ঘাটতিটা ঘর থেকে এনে পূরণ করে দিতে হবেই। ছবি তৈরী করা তাই আজ এতো বিড়ম্বনা। স্বতন্ত্র নির্মাতাদের তাই আজ এতো পিছিয়ে পড়া। তাই আজ স্টুডিও-গুলির অচল অবস্থা এবং হাজার লোকের বেকারত্ব সমুপস্থিত। খুব জমাটি ছবিরই এই অবস্থা যেকালে দাঁড়াচ্ছে, সাধারন ছবির অবস্থা যে কি, সহজেই অনুমেয়। অথচ আমাদের এখানে অল্প কিছুকাল আগেও এমন ব্যবস্থা ছিলো, যাতে ছবি একেবারে রদ্দি এবং এতটুকু জমতে না পারলেও একটা নির্দিষ্ট কাল সব জায়গায় চালানোর পর পয়সা উঠে আসতোই—সে সম্ভাবনার আজ আর কোন লেশই নেই।

এখানকার চিত্রশিল্পকে একেবারে উচ্ছন্নের পথে ঠেলে দেওয়ার জন্যে আজ প্রদর্শকরাই দায়ী সবচেয়ে বেশী। চিত্রগৃহটি ছাড়া এক কপর্দকও মূলধন না খাটিয়েই তারা দিব্যি চিত্রনির্মাতার পর চিত্রনির্মাতাকে বধ করে চলেছে এবং এমনি পরিমাণে যে, বছর দুয়ের মধ্যে চিত্রগৃহের পিছনে খাটানো ছ-আট লাখ টাকার মূলধনও তুলে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে—আর পুরণো চিত্রগৃহগুলি তো কেবল লাভই ঘরে তুলে যাচ্ছে অবিরাম।

বিতরকেরও টাকা মারা যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। তার প্রটেকশন এই যে, চিত্রগৃহ থেকে টাকাটা আসে তারই হাতে এবং তার পরিমাণ যাই হোক তা থেকে তার চুক্তিমতো কমিশন ফস্কে যাওয়ার কোন আশঙ্কাই নেই। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া, তারাও আগেকার দিনের মতো আজকাল চিত্রনির্মাতাদের দাদন দিয়ে ছবি তোলায় না। আর যেখানে তা দেয় সেসব ক্ষেত্রেও তাদের নিজেদের টাকাটা একটা অসম্ভব রকমের বেশী না হলে সহজেই তুলে নেয়।

পড়ে পড়ে মার খাবার পালাটা শুধু চিত্রনির্মাতার। ছবির ব্যবসার মধ্যে তারই ঝুঁকি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তার বেলাই কোন প্রটেকশনই নেই, উল্টে তাকে দোহন করাটাই হয়েছে নীতি। তার ফলও সেই রকমই হচ্ছে। —ছবিও যেমন খারাপ হচ্ছে তেমনি ব্যবসার অবস্থা চলেছে নীচের দিকে ক্রমাগত নেমে। চিত্রনির্মাতার ওপর অবিচার রোধ না হলে এ বাজার ভালো হবার কোন আশাই দেখা যায় না। সে ভারটা নেবে কে?—বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতি, না রাষ্ট্র, না চিত্রনির্মাতারা নিজেরাই? —দেখা যাক কতদূরে গিয়ে কি দাঁড়ায়।

বোম্বেতে টিকিট বিক্রির নতুন আইন

বছর আন্টেক আগে গুণ্ডাদের দ্বারা চিত্রগৃহের বাইরে টিকিট বিক্রী নিয়ে এখনকার পত্র-পত্রিকায় খুব আলোচনা চলতে দেখা গিয়েছিলো। সে সময়ে কারুর প্রস্তাব ছিলো যে, টিকিট বিক্রেতার ওপর লাইসেন্স করে দেওয়া হউক। এবং যেহেতু সে লাইসেন্স চিত্রগৃহের নিয়োজিত কর্মচারী ছাড়া আর কারুর পক্ষে পাওয়া সম্ভব হবে না, সে কারণ বাইরেতেও টিকিট বিক্রী বে-আইনী হতে বাধ্য হবে। এখন টিকিট বিক্রী করা আইনবিরুদ্ধ নয় বলে গুণ্ডাদের ঐ রকম অপরাধে ধরা যায় না। লাইসেন্স হলে ধরে সাজা দেওয়াটা সহজ ও আইনসিদ্ধ হতে পারবে। তারপর থেকে কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্তও বহুবারই রঙ্গ-জগতে এ প্রস্তাবের পুনরুত্থান হয়েছে, কিন্তু তাতে ফল কিছুই পাওয়া যায়নি। টিকিট বিক্রী ব্যাপার নিয়ে কেলেঙ্কারিও হয়েছে অনেক, কিন্তু কেউ কোন উন্নততর উপায়ের কথা ভেবেও দেখেছে বলে মনে হয় না। বরং বছরখানেক ধরে নতুন ব্যবস্থায় যে টিকিট বিক্রী চলেছে তাতে ক্রেতাদের, বিশেষ করে কমদামের টিকিট যারা কেনে, তাদের তো আর কষ্টের অবধি নেই, অথচ গুণ্ডার উপদ্রবও যে একেবারে কমে গিয়েছে তাও নয়। এখন টিকিট কেনাটা এতই ঝকমারিতে দাঁড়িয়েছে যে, লোকে ভাবতে আরম্ভ করেছে যে, এই রকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে গুণ্ডাদের কাছ থেকে কেনা ঢের আরামের ছিলো,—তার জন্যে সিনেমা দেখতে যাওয়ায় সহজে বিরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কম লোক নয়।

এ রকম অবস্থা কলকাতাতেই শুধু নয়, বম্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য শহরেও একই কথা। তবে তফাৎ এই যে, ওরা এ নিয়ে মাথা ঘামায়, আর আমাদের এখানে লোকের সুবিধে আরাম সম্পর্কে চিত্রব্যবসায়ীরা যেমনি, তেমনি রাষ্ট্রও একেবারেই উদাসীন। গুণ্ডাদের টিকিট বিক্রী রোধ করতে চিত্রব্যবসায়ীরা কোন উপায় উদ্ভাবনে অক্ষম দেখে সম্প্রতি বম্বের কমিশনার এ ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তিনি আইন করে দিচ্ছেন যে, পরের মাস থেকে টিকিট বিক্রীর জন্যে লাইসেন্স নিতে হবে বছরে পঞ্চাশ টাকা ফী দিয়ে—যে প্রস্তাবটা আট বছর আগে থেকে এখানের জন্যে করে আসা হচ্ছে। লাইসেন্সের পরেও বাইরে টিকিট বিক্রী হলে তখন তা বন্ধ করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুলিশের এবং পুলিশও সে বিষয়ে তৎপর হতে বাধ্য হবে। শুধু তাই নয়, যাতে কোন ফাঁকি না চলে তার জন্যে যারা পাস সই করবে, তাদেরও ঐ রকম পঞ্চাশ টাকা দিয়ে লাইসেন্স করতে হবে, নয়তো পাস দেওয়াও চলবে না। এর দ্বারা সরকারী তহবিলে বছরে কয়েক হাজার টাকা আয় বাড়বে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও সাধারণ টিকিট ক্রেতাদের সুবিধে হবে অনেক বেশী।

সাহিত্য-সংবাদ

বেহালা যুবসম্প্রদায় অনুষ্ঠিত সত্যেন্দ্র স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফলঃ—বিষয় ১। "রান্নাঘর"—প্রথম স্থান অধিকার করেছেন শ্রীমতী নীলিমা রায়, দিনাজপুর। ২। "বিজ্ঞানের গতি"—শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, জামালপুর। ৩। "পুতুল খেলা"—শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায়, বড়িষা। ৪। "অতীত ও বর্তমান"—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়াদিল্লী। শ্রীবিমলচন্দ্র বাগ সাহিত্য সম্পাদক—যুব-সম্প্রদায়, বেহালা।

ফুটবল—

বাঙলার ফুটবল পরিচালকমণ্ডলী অর্থাৎ আই এফ-এর পরিচালকমণ্ডলী সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া খেলাধুলার এই বিভাগে যাঁহারা পাণ্ডাগিরি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই নির্বাচনে বিজয়ী হইয়াছেন।

এইবারের নির্বাচন নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী হইয়াছে। অনেকে এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া মনে মনে আশা করিয়াছিলেন নূতন নূতন ব্যক্তিকে পরিচালকমণ্ডলীতে দেখিবেন, কিন্তু তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। হইবেই বা কি করিয়া? যাঁহারা দীর্ঘকাল এই বিভাগের পাণ্ডা, তাঁহারা সব দিক ঠিকঠাক না করিয়া কখনও কি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন? যে বিভাগের প্রতিনিধির জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, তাহা তাঁহারা নীরবে ও গোপনে করিয়াছেন। লোকচক্ষুর আড়ালে কি উপায়ে আবেদনপত্র নাকচ করিতে হয়, তাহাতে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত। সুতরাং যত প্রকার বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন, তাহা পার হইবার ব্যবস্থা ঠিকমতই করিয়াছেন। এই জন্য স্কুল প্রতিনিধি ও জেলা প্রতিনিধি নির্বাচন লইয়া ভীষণ আন্দোলন হইয়াও কোন কিছু হইল না। আপত্তি পুরাতন পরিচালকমণ্ডলীর সভায় তুলিয়া বলা হইল "অধিকার নাই"। নূতন পরিচালকমণ্ডলী করিবে। অর্থাৎ নূতন পরিচালকমণ্ডলী গঠনের যে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে ধামা চাপা দিয়া নিজেদের পথ পরিষ্কার করিয়া লওয়া হইল।

তাহার পর সাধারণ সভায় হিসাবপত্র লইয়া যে গোলমাল হইল তাহাও পরিচালকমণ্ডলী গঠনে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিত। কিন্তু সেটা ধামা চাপা দেওয়া হইল এই বলিয়া যে, হিসাবপত্র ঠিকমত রাখিবার জন্য উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা হইবে। বুদ্ধিমানের চাল, নির্বোধ বিরোধী দলকে একেবারেই বোকা বানাইয়া দিল। এই সকল ঘটনা যে হইবে, তাহা অন্য কেহ ধারণা করিতে না পারিলেও আমরা জানিতাম। সেইজন্য আই এফ-এর নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের কথা শুনিয়া আমরা মোটেই চঞ্চল হই নাই। পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের দিন কোনরূপ হাঙ্গামা হইতে না দেখিয়া কোন একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী বলিয়াছেন, "এটা কি হইল—দুদিন আগে এত গোলমাল আর তৃতীয় দিনে নির্বিঘ্নে সব সুসম্পন্ন।" এই সময় একজন দীর্ঘকালের ক্রীড়া সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তির উক্তির উত্তরে বলিলেন, "সকলেই যে দলের লোক।"

আই এফ-এর পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকলাপে সাধারণ ক্রীড়ামোদী যে সন্তুষ্ট নহেন, তাহা তাঁহাদের আলাপ আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং নবগঠিত মণ্ডলীর সভ্যদের নাম দেখিয়া সকলেই হতাশ হইবেন, কিন্তু উপায় কি আছে? পুরাতনের অপসারণ ও নূতনভাবে গঠন করিবার কল্পনা করিলেই কার্যসিদ্ধি হয় না—ইহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়। আর সে ব্যবস্থায় একমাত্র আদালতই উপযুক্ত সাহায্য করিতে পারে। এইবারের নির্বাচন ব্যাপারে যে সকল গলদ হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছে, তাহা বিচারের জন্য যদি আপত্তিকারিগণ আদালতের সাহায্য গ্রহণ করেন, তবেই প্রতিকার হইতে পারে, নতুবা কিছুতেই হইবে না।

হকি

আন্তঃ প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা শীঘ্রই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে। বাঙলার দল গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বাঙলা দল বেশ শক্তিশালীই হইয়াছে। বিশ্ব অলিম্পিকের লণ্ডনের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ভারতীয় দলের পাঁচজন খেলোয়াড় বাঙ্গলার পক্ষ সমর্থন করিবেন। ইহাতে আশা হয়, বাঙলা প্রতিযোগিতায় ভালই ফলাফল প্রদর্শন করিবে। পোর্ট কমিশনার্স দলের জানসেন দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। নিম্নে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম প্রদত্ত হইল ঃ—

ডবলিউ স্কট (ইষ্টবেঙ্গল), কেশব দত্ত (যুথ-ভ্রষ্ট), ডি পাল (মোহনবাগান), ক্লডিয়াস (পোর্ট কমিশনার্স), প্রকাশ (পাঞ্জাব স্পোর্টস), ডালুজ (মেসারার্স), সি এস দুবে (মোহনবাগান), জি সিং (পোর্ট কমিশনার্স), গ্ল্যাকেন (পোর্ট কমিশনার্স), জানসেন (পোর্ট কমিশনার্স, অধিনায়ক), রাজকাপুর (মোহনবাগান)।

অতিরিক্ত ঃ—পিটার্স (রেঞ্জার্স), ডি ব্যানার্জি (মোহনবাগান), এস চক্রবর্তী (মোহনবাগান), ইন্দরজিৎ রায় (মোহনবাগান) ও এস গুরুং (ভবানীপুর)।

আন্তঃ কলেজ ও আন্তঃ স্কুল হকি

বাঙ্গলার হকি খেলোয়াড়দের তালিকার প্রতি দৃষ্টি দিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে অ-বাঙ্গালী খেলোয়াড়গণের সংখ্যাই অধিক। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার হকি খেলার মাঠে অ-বাঙ্গালী খেলোয়াড়গণই অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। ইহার জন্য দায়ী বাঙ্গলার হকি পরিচালকগণ। ইহারা কোনদিনই উৎসাহী বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। এমন কি কলেজ ও স্কুলে নিয়মিতভাবে হকি খেলা হয় ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাহার ব্যবস্থাও করেন নাই। কোন দিন করিবেন তাহারও সম্ভাবনা খুবই কম। এইজন্য আমাদের মনে হয় আন্তঃ স্কুল হকি খেলার সমস্ত ব্যবস্থাভার স্কুলের শিক্ষকগণ মিলিত হইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া তাঁহারাই গ্রহণ করুন। অপর দিকে কলেজের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা হউক। বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের দিকে তাকাইয়া থাকিলে কোনদিনই কোন ব্যবস্থা হইবে না।

ব্যাডমিণ্টন

মালয়ের ব্যাডমিণ্টন দল আন্তর্জাতিক টমাস কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম বারের অনুষ্ঠানে বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়া সত্যই বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। মাত্র দুই বৎসর পূর্বে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন দল কোন দেশের খেলোয়াড়—এই আলোচনা লণ্ডনে শুরু হইলে পৃথিবীর সকলেই জানিতে পারিল মালয় ব্যাডমিণ্টন খেলিতে জানে তবে তখন কেহই বিশ্বাস করে না যে, মালয়ই শ্রেষ্ঠ। তখন সকলেরই ধারণা ছিল ডেনমার্কের তুল্য খেলোয়াড় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই জন্য ঐ সময় মালয় ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের সম্পাদক যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন কেহই তাহাতে কর্ণপাত করেন না। কিন্তু টমাস কাপ প্রতিযোগিতার পর সকল দেশের ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়কেই স্বীকার করিতে হইল "মালয় শ্রেষ্ঠ।" এশিয়াবাসী হিসাবে মালয়ের সাফল্য সত্যই আনন্দদায়ক। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে এশিয়া-বাসী হিসাবে সর্বপ্রথম জাপান বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে সন্তরণে ও এ্যাথলেটিকসে গৌরব প্রতিষ্ঠা করে। ইহার পর ভারতবর্ষ হকি খেলায় বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। মালয় এশিয়ার তৃতীয় দেশ হিসাবে ব্যাডমিণ্টন খেলায় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করিল। ইহা পরম সুখের ও গৌরবের বিষয়। ফাইনাল খেলায় মালয় দল ৫—৪ খেলায় ডেনমার্ক দলকে পরাজিত করিয়াছে।

মুষ্টিযুদ্ধ

বোম্বাইর বিভিন্ন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠান একত্র মিলিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে নিখিল ভারত মুষ্টিযুদ্ধ ফেডারেশন গঠনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের সম্পাদক এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে অস্থায়ীভাবে নিখিল ভারত মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে এবং সেই প্রতিষ্ঠান মুষ্টিযোদ্ধা নির্বাচন করিয়া বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে দল প্রেরণ করে। সুতরাং বোম্বাইর সম্মেলন আহ্বানের অধিকার নাই। বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের সম্পাদক যে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন তাহাতে আমরা খুবই সুখী হইয়াছি। তবে এই সঙ্গে তিনি আরও জানাইয়া দিতে পারিতেন বাঙ্গলা এখনও মুষ্টিযুদ্ধে ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। দীর্ঘ ৩০ বৎসর বাঙ্গলার মুষ্টিযোদ্ধাগণই সারা ভারতে লড়িয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গলাই নিখিল ভারত ফেডারেশন গঠনের একমাত্র অধিকারী।

দেশী সংবাদ

২১শে ফেব্রুয়ারী—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, এ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় এক হাজার কম্যুনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত রেল ও ডাক ধর্মঘট রোধ করিবার জন্য এইরূপ ধরপাকড় আরম্ভ করা হইয়াছে। কম্যুনিস্টরা সাফল্যের সহিত ধর্মঘট করিতে না পারিলেও আংশিকভাবে ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া যানবাহন চলাচলে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করা হয়। ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত বরাবর বর্মী কম্যুনিস্টদের সহিত ভারতীয় কম্যুনিস্টদের যোগাযোগ রহিয়াছে।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কিত বিতর্কের জবাব দিতে গিয়া রেলওয়ে সচিব শ্রীযুত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার বলেন যে, কেন্দ্রীয় এডভাইসরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই যাত্রীবাহী গাড়ীগুলির নূতন করিয়া শ্রেণী বিন্যাস করা হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য কি কি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন, তাহা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহাতে সে সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

গত শনিবার হুগলী জেলার ধুঁধীরভেরী গ্রামে লাঠি, দাও ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক জনতার উপর পুলিশের গুলীচালনার ফলে ৪ জন কিষাণ রমণী নিহত এবং অপর ৬ জন নারী আহত হইয়াছে।

আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বিগুণিত করিবার উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শক্তি-উৎপাদন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারগণ অদ্য নয়াদিল্লীতে এক সম্মেলনে সমবেত হন।

ডাক ও তার কর্মচারী ইউনিয়নসমূহের সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতি প্রসঙ্গে কর্মীদিগকে বর্তমানে ধর্মঘট না করিতে পরামর্শ দেন।

আজ প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ কলিকাতা ডেণ্টাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ভারতে দন্তচিকিৎসা শিক্ষার অগ্রদূত খ্যাতনামা দন্তচিকিৎসক ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ আর আমেদের শ্বেত পাথরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী—ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরকালে দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিংহ বলেন যে, দেশরক্ষা দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত বৈজ্ঞানিক সংস্থায় আনুমানিক ৪০ জন প্রবীণ বৈজ্ঞানিক এবং ১০০ জন অপেক্ষাকৃত নবীন বৈজ্ঞানিক নিয়োগ করা হইবে। সম্প্রতি ভারত সরকার পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনী সংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণার কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে উক্ত সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—মাদ্রাজে কংগ্রেসকর্মী ও মাদ্রাজ আইনসভার সদস্যদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, একটি দৈত্য যেন আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। যদি ইহাকে দমন করা না যায়, তাহা হইলে দেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা বা স্বাধীনতা কিছুই রক্ষা পাইবে না।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরকালে শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন যে, কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে একটি নূতন জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের উপযোগিতা সম্পর্কে পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার শীঘ্রই ফ্রান্সের একটি নৌশিল্পে দক্ষ প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করিবেন। জাহাজ নির্মাণ কারখানাটি সরকারী তত্ত্বাবধানে গঠিত হইবে।

নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত শক্তি-উৎপাদন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, বিদ্যুৎ শক্তির উন্নয়ন বা জাতির অন্যান্য সকল কার্যে সমাজের পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল জীবনধারার সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রাখিয়া চলিতে হইবে। ভারতের পল্লী অঞ্চলে এবং ছোট ছোট সহরে যে বৃহৎ জনসমাজ রহিয়াছে, তাঁহাদের কথাই বেশী চিন্তা করিতে হইবে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—আজ পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট উত্থাপন করেন। বাজেটে চলতি বৎসরে ২৩ লক্ষ ও আগামী বৎসর ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে। বাস্তুহারাদের জন্য চলতি বৎসরে সাড়ে ৩ কোটি টাকা ও আগামী বৎসর ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সিন্ধুর প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ খুরো বিশ্বাসভঙ্গ এবং চোরাই সম্পত্তি রাখার অভিযোগের প্রত্যেকটিতে ২ বৎসর কারাদণ্ড এবং ১,০০০্ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—রেল ও ডাক ধর্মঘট হইলে যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহার সম্মুখীন হইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এ জাতীয় ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করিয়া এক আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন। অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রধান গবর্ণমেণ্ট হুইপ শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ অত্যাবশ্যক কার্য-পরিচালনা (ধর্মঘট নিরোধ) বিল নামক একটি বিল উত্থাপন করেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য মধ্যাহ্নের দিকে দমদম বিমান ঘাঁটি, দমদমস্থ সরকারী গোলাবারুদের কারখানা, জেসপ্ এণ্ড কোম্পানীর বিরাট কারখানা, গৌরীপুর পুলিশ ফাঁড়ি এবং বসিরহাট মহকুমার সদর থানা, কোষাগার ও কারাগারে কয়েক দল যুবকের দুঃসাহসিক যুগপৎ সশস্ত্র আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আক্রমণকারীরা ট্যাক্সিতে করিয়া স্টেনগান, রিভলবার ও বোমা লইয়া এই সব স্থানে অতর্কিতভাবে হানা দেয়। বিভিন্ন স্থানে আক্রমণকারীদের আক্রমণের ফলে মোট ৬ জন নিহত হয় এবং আরও প্রায় ১০ জন আহত হয়।

জেসপ এণ্ড কোম্পানীর কারখানায় আক্রমণের ঘটনায় জনৈক ফোরম্যান নিহত হন এবং আরও দুইটি মৃতদেহ কারখানার চুল্লীতে পাওয়া যায়।

বসিরহাটে পুলিশের সহিত আক্রমণকারীদের সংঘর্ষের ফলে জনৈক পুলিশ ইনস্পেক্টর ও দুইজন কনেস্টবল নিহত হয়।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার আজ রাত্রে এক বিজ্ঞপ্তিতে কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারী করেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—গতকল্য দমদম বিমানক্ষেত্রে সশস্ত্র আক্রমণ সম্পর্কে এ যাবৎ ভারত-পাকিস্থান সীমান্তের সন্নিকটে বসিরহাট অঞ্চলে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে, আক্রমণকারীদের মধ্যে কয়েকজন ইতিন্দাঘাটে ইছামতী নদী পার হইয়া সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বিভিন্ন স্থানে তল্লাস করিতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ববঙ্গের পুলিশও তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৬টি রাইফেল, একটি রিভলবার এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র পুলিশ আক্রমণকারীদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছে। আক্রমণকারিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত গাড়ীর সবগুলিই উদ্ধার করা হইয়াছে।

হাওড়া শহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত মসিলা গ্রামে এক হাঙ্গামায় পুলিশের গুলী চালনার ফলে দুইটি স্ত্রীলোক সহ ৬জন নিহত এবং দুইজন আহত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২০শে ফেব্রুয়ারী—ডারবানে আফ্রিকান ও প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে আজ রাত্রিতে আবার দাঙ্গার ফলে বহু ভারতীয় আহত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেককে হাসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী—কারেন ও কম্যুনিস্ট বিদ্রোহীদের সম্মিলিত বাহিনী মধ্য ব্রহ্মের পিনমানা, ইয়ামেথিন ও মিকটিলা শহর দখল করিয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—রেঙ্গুণের সংবাদে প্রকাশ, মান্দালয় অভিমুখে অভিযানকারী কারেন বিদ্রোহিগণ নগরীর উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত রেলওয়ে শহরসমূহ দখল করিয়াছে। কারেন বিদ্রোহিগণ মান্দালয়ের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মাইনাগিয়ান ও ৩০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মেমিও দখল করিয়াছে।

ব্রহ্ম সরকারের এক ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, সরকারী সৈন্যদল আকিয়াব বন্দরের উপর কম্যুনিস্টদের দ্বিমুখী আক্রমণ হঠাইয়া দিয়াছে। বহু কম্যুনিস্ট হতাহত হইয়াছে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—রোড্‌সে মিশরীয় ও ইহুদিগণ একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সাধারণ যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া প্যালেস্টাইনে ৯ মাসের যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়াছে।

শ্যামে এক রাজকীয় আদেশে সমগ্র শ্যামে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—মিশরে নিযুক্ত ভারতীয় দূত ডাঃ সৈয়দ হোসেন অদ্য কায়রোতে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু অদ্য প্রকাশ করেন যে, বিদ্রোহের ফলে ব্রহ্মদেশে ৩০ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 26th February, 1949. [১৭শ সংখ্যা

সুসমীচীন সিদ্ধান্ত

রেলওয়ে শ্রমিক সঙ্ঘ রেলে ধর্মঘট করিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তে সমগ্র দেশে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িয়াছে। কারণ বর্তমানে দেশের সর্বত্র নানা-রকম সঙ্কট চলিতেছে, এই সময় রেলপথে ধর্মঘট ঘটিলে দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশার আর অন্ত থাকিত না। বিশেষত, বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, তাহাতে রেল ধর্মঘট সার্থক হইত কিনা, এ বিষয়েও সন্দেহ আছে। কারণ ধর্মঘটের পিছনে দেশের লোকের সমর্থন এবং অনুকূলতা থাকিলেই তাহা সহজে সফল হইতে পারে, কিন্তু রেল ধর্মঘটের মত ব্যাপক এবং বিপর্যয়কর অবস্থা সৃষ্টিতে দেশের লোকের সমর্থন নিশ্চয়ই থাকিত না। নানা-রকম অর্থনীতিক সঙ্কটে দেশের অবস্থা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে কথায় কথায় যদি ধর্মঘট ঘটে, তবে দেশের লোকেও সহজেই এমন সব ব্যাপার উপদ্রবস্বরূপেই দেখিবে এবং ধর্মঘটকারীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে ইহা স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, রেলওয়ে শ্রমিকদের কোনরূপ অভাব-অভিযোগের কারণ যে নাই এবং ধর্মঘট তাঁহারা করিতে পারেন না, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। পক্ষান্তরে অভাব-অভিযোগের কারণ তাঁহাদের আছে এবং বিধি-বিহিতভাবে ধর্মঘট পরিচালনা করিবার অধিকারও তাঁহাদের রহিয়াছে; কিন্তু অভাব-অভিযোগের প্রতিকার সাধনের জন্য ধর্মঘট শেষ অস্ত্রস্বরূপেই গৃহীত হওয়া উচিত। দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন-কার কথা স্বতন্ত্র ছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তিকে কিসে দুর্বল করা যায়, তখন স্বাধীনতাকামী স্বদেশপ্রেমিকদের সেই দিকেই ছিল প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শাসকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সর্বপ্রকার সংহতিমূলক আন্দোলন তখন সমর্থন করিতেন। আমরাও তাহা করিয়াছি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের দুঃখ-কষ্টের কথাও বড় করিয়া দেখি নাই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সিদ্ধ করা, স্বাধীনতা লাভে দেশের সব শক্তি সংহত করিয়া তোলাকেই তখন আমরা বড় করিয়া দেখিতাম এবং নিজেদের দুঃখকষ্ট এবং দুর্দৈবের আশঙ্কার মধ্যেও সে দিককার সব উদ্যমে উৎসাহ বোধ করিতাম। কিন্তু সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এখনকার গভর্নমেণ্টের নীতি পরি-চালনের কর্তৃত্ব জনসাধারণের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য আমলাতান্ত্রিকতার সুদীর্ঘ সংস্কার শাসন-ব্যবস্থা হইতে একেবারে যে অপসারিত হইয়াছে, ইহা নয়। সুদীর্ঘ দুই শত বৎসরকাল আমাদের রাষ্ট্র-জীবনে যে পাপ জমিয়াছে, এত সহজে তাহা যায় না; কিন্তু জনশক্তি যদি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তবে অচিরেই যে এই অবস্থার প্রতিকার হইবে ইহা সুনিশ্চিত। রেল শ্রমিক সঙ্ঘ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়া কার্যত তাঁহাদের দাবীকে শিথিল করেন নাই; পক্ষান্তরে জনসাধারণের স্বার্থের বিষয় এক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার মধ্যে আনিয়া এবং তৎসম্বন্ধে সমীহ হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের শক্তিকে দৃঢ়ই করিয়াছেন। আমরা জানি, একদল লোক যে কোনভাবে দেশে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উপদলীয় স্বার্থ সিদ্ধ করিতে চায়। ইঁহারা রেল শ্রমিকদের এই সুসংগত সিদ্ধান্ত প্রীতির চোখে দেখিবে না। কমিউনিস্টরা এই ব্যাপার লইয়া শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিবে। রেল শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আপোষ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র তাহার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদে ইঁহাদের কণ্ঠ মুখর হইয়া উঠে। বস্তুত ইঁহারা দেশের লোকের স্বার্থও বোঝে না, দেশের স্বাধীনতার কোন তোয়াক্কা রাখে না। রাশিয়া ইঁহাদের প্রভু, কর্তা এবং নিয়ন্তা। দেশের শাসন-ব্যবস্থা কোন রকমে এলাইয়া পড়িলে ইঁহাদের প্রভুপক্ষের স্বৈরাচারের প্রভাবই এদেশেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; সুতরাং যাহারা তেমন আত্মঘাতী অনর্থ ঘটাইতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে ইহারা কিভাবে অপদস্থ এবং লাঞ্ছিত করিবে, ইহাই খোঁজে। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ সেদিন সঙ্ঘের সাধারণ সভায় ইঁহাদের সম্বন্ধে শ্রমিক-মণ্ডলীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কমিউনিস্টদিগকে শ্রমিক সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত করিবার যে সংকল্প তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আরও সুখের বিষয়। এদেশের শ্রমিকদিগকে ভাঙাইয়া কমিউনিস্ট নেতাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করিবার দুরভিসন্ধি অতঃপর আর খাটিবে না। ভারতের সব শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে রেল শ্রমিক সঙ্ঘের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইবে, আমরা ইহাই আশা করি। ডাক এবং তার বিভাগের শ্রমিক সঙ্ঘের ধর্মঘট না করিবার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত এই আশাকে দৃঢ় করিয়াছে। কমিউনিস্টরা সহজে নিবৃত্ত হইবার নয়, আমরা জানি। রেল শ্রমিক পরিষদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করিয়া ৯ই মার্চ হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করিবার জন্য তাহাদের উস্কানি ইহার মধ্যেই শুরু হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকেরা দেশের স্বার্থের প্রতি অবহিত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের এমন অপচেষ্টায় তাঁহারা শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সাড়াই পাইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থা

১৯৪৯-৫০ সালের রেলওয়ে বাজেটে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

আশার চেয়েও ইহা নাকি বেশি, যানবাহন সচিব শ্রীযুত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া এমন কথাই বলিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এই ভরসা দিয়াছেন যে, রেলের ভাড়া কিংবা মাশুল কিছুই বৃদ্ধি করা হইবে না। বলা বাহুল্য, আয়েঙ্গার মহাশয়ের এই উক্তিতে আমাদের উল্লসিত হইবার কিছুই নাই, কারণ পর পর কয়েক বৎসর রেলের ভাড়া এবং মাশুল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া এখন যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাহা বাড়াইবার আর কোন সুবিধাই নাই; পক্ষান্তরে ভাড়া বা মাশুল বাড়াইতে গেলে আয়ের হিসাবের দিকে লোকসানই দেখা দিবে। বস্তুতঃ রেলের ভাড়া এবং মাশুল কিছু কমে, দেশের লোকে ইহাই চায়। বর্তমান বাজেটে সে সম্বন্ধে কোন ভরসা আমরা পাই নাই। তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রীদের দুঃখকষ্টের লাঘব করা হইবে বা হইতেছে, এই ধরণের কথা আমরা কর্তৃপক্ষের মুখে অনেকদিন হইতেই শুনিতে পাইতেছি; কিন্তু এ পর্যন্ত কার্যত তাহা কিছুই ঘটে নাই। সম্প্রতি রেলের নূতন শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহাতে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের কিছু সুবিধা ঘটিলেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থার কোন পরিবর্তনই ঘটে নাই। অথচ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুর্দশার অন্ত নাই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কার্যতঃ এদেশে যে ব্যবহার পাইয়া থাকে, তাহাকে নিষ্ঠুর, নির্দয় এবং বিবেকহীন বর্বরতা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। স্থানাভাব তো আছেই ইহার উপর অনেক সময়ই গাড়িগুলিতে জল এবং আলো থাকে না। মানুষ দাঁড়াইবার জায়গা নাই, আবার লটবহরেই গাড়ীর অধিকাংশই ভর্তি থাকে। আয়েঙ্গার মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করিতেছেন, জানা গেল; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলিতে এই ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া দরকার। আসল কথা এই যে, গাড়ির সংখ্যা না বাড়াইতে পারিলে যাত্রীদের দুঃখকষ্টের কিছুতেই লাঘব হইবে না। বর্তমানে সব শ্রেণীতেই ভিড়; তৃতীয় শ্রেণীতে প্রাণের ঝুঁকি লইয়াই চলাফেরা করিতে হয়। বিশেষ পুণ্যের জোর থাকিলে তবে তৃতীয় শ্রেণীর রেল ভ্রমণের প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়। স্থানাভাবে পা-দানীর উপর দাঁড়াইয়া যাইবার ফলে মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কিছুদিন আগে পাটনার কাছে এইরূপ একটি দুর্ঘটনায় বহু লোক মারা গিয়াছে। লোকে অবশ্য সাধ করিয়া এইরূপ জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করে না। উপায়ান্তর না দেখিয়াই তাহাদিগকে এমন বিপজ্জনকভাবে রেলের পা-দানীতে এমন কি, ছাদের উপর উঠিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হয়। গাড়ির সংখ্যা অবশ্য ইচ্ছা করিলেই বাড়ানো যায় না, ইহা আমরা বুঝি। মিহিজামে গাড়ি তৈয়ারীর জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম দিয়া একটি কারখানা খোলা হইতেছে, এই কারখানার কাজ আরম্ভ হইলে অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটিবে, আশা করা যায়। কিন্তু তৎপূর্বে বাহির হইতে যেসব গাড়ি তৈয়ার হইয়া আসিবার কথা আছে, সেগুলি যাহাতে তাড়াতাড়ি আসিয়া পৌঁছে, সেজন্য কর্তৃপক্ষের তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

পুনর্বসতি বিধানের দায়িত্ব

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ বা পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের নীতির স্বরূপ এবং তাহার গতি ও পরিণতি অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ পাইয়াছে যে, আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য এবং পুনর্বসতি বিধানের জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট ১৯৪৮ সালের শেষভাগ পর্যন্ত ২২ কোটি টাকার উপর ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু এই টাকার শতকরা সাত ভাগ মাত্র পূর্ববঙ্গের আশ্রয়-প্রার্থীদের ভাগে পড়িয়াছে। বস্তুত প্রয়োজনের অনুপাতে এই টাকা নিতান্তই সামান্য। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিধানের কার্যক্রম নির্ণয়ের সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন, অর্থাৎ এ পর্যন্ত হতভাগ্য পূর্ব-বঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য এবং পুনর্বসতি বিধানের জন্য কার্যত কোন কার্যক্রমই অবলম্বিত হয় নাই। কারণ কি? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই অনেকের মনে উঠিবে। কর্তৃপক্ষ বোধ হয় এই ভরসায় বসিয়া আছেন যে, ইঁহাদের অধিকাংশ পুনরায় পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিবে। কিন্তু অবস্থাতে এখন আর ইতস্তত করিবার কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা ফিরিবার, তাঁহারা ফিরিয়াছেন। যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও বিশেষ কম নয়। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল সেদিন স্পষ্ট ভাষাতেই একথা বলিয়াছেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিবেন না, ভারত গভর্নমেণ্টকে অবশ্যই তাঁহাদের পুনর্বসতি বিধানের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং এজন্য কার্যক্রম অবলম্বন করাই ইতিমধ্যে উচিত ছিল। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন কার্যক্রম যে অবলম্বিত হয় নাই, ইহা তো চোখের উপরই দেখিতেছি। আমরা যতদূর জানি, এতৎসম্পর্কিত কার্যক্রম নির্ণয়ের দায়িত্ব প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর রহিয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের মারফতেই কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দায়িত্ব প্রতিপালনে যে কিঞ্চিৎ শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছেন, একথা বলিতেই হয়; বলা বাহুল্য, এজন্য আশ্রয়প্রার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষের ভাবও ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলিতে দেওয়া উচিত নয়, উহাতে নানারূপ অনর্থ সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা আছে। আশ্রয়-প্রার্থীরা যাহাতে পুনরায় পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতে উৎসাহী হন, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার চেষ্টা চালাইতে থাকুন, মন্দ নয়; কিন্তু সেজন্য প্রস্থে প্রস্থে উপদেশ প্রচার করিবার কোন প্রয়োজন এখন আর আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বস্তুত আশ্রয়প্রার্থীরা ভিখারী নয়, অবস্থার চাপে পড়িয়া তাঁহাদিগকে নিঃস্ব জীবন বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। ভারত গবর্নমেণ্ট কিংবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের কেহই নহেন, কিংবা ইঁহারা এই সব নিঃস্ব জনশ্রেণীর জন্য কিছুই করিতে পারেন না এমন ধারণা লোকের মনে জন্মিতে দেওয়া কিছুতেই সমীচীন হইবে না। কার্যত ইঁহাদের এই অবস্থার প্রতিবিধানের দায়িত্ব ভারত সরকারের রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সরকারেরও আছে। গৃহহীন এই জনশ্রেণীর পুনর্বসতি বিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহাদের উভয়ের পক্ষে কর্তব্য।

পাকিস্থানী নীতির মৌলিকতা

সাম্প্রদায়িক বিভেদবাদের নীতির উপর পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত। এ-নীতি ক্ষুণ্ণ হইলে পাকিস্থানের সংহতি নষ্ট হয়। পাকিস্থানের নিয়ামকগণ ইহাই স্থির বুঝিয়া লইয়াছেন এবং কথায় তাঁহারা যাহাই বলুন, তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের মৌলিক নীতির প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য কাঁটায় কাঁটায় ঠিক রাখিয়াই তাঁহারা চলিতেছেন। ইহার ফলে তাঁহাদের কার্য নানা রকমের উদ্ভট এবং উৎকট পথে প্রধাবিত হইতেছে। পাকিস্থানের সর্বত্র আরবী হরফ প্রচলনের সাম্প্রতিক বাতিকটি এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাকিস্থানের শিক্ষাসচিব মিঃ ফজলুর রহমান তাঁহার পেশোয়ারের বক্তৃতায় আরবী ভাষার স্বপক্ষে আরজ পেশ করেন। পরে পাকিস্থানের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা সমিতি সে প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব অনুসারে যদি পাকিস্থানের শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যুগাগত সংস্কৃতির উপর নিদারুণ আঘাত আসিয়া পড়িবে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংস্কৃতি, সৌহার্দ্য এবং ঘনিষ্ঠতা তাঁহাদের নষ্ট হইবে। পাকিস্থানের নিয়ামকগণের হয়ত তাহাই অভিপ্রেত। সম্ভবতঃ তাঁহারা এইভাবেই পাকিস্থান রাষ্ট্রের পূর্ব ও

পশ্চিম অংশকে দৃঢ়বদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্র বা সমাজ-জীবনের উন্নতিই কি সম্ভব হইবে? পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরক্ষরতা এখনও অপরিমেয়। সুদীর্ঘকাল হইতে বাঙলা ভাষা এবং বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁহাদের মানসিক চিন্তার ধারা সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছে আজ তাহাদের মধ্যে আরবী হরফের প্রচলন করিতে গেলে নিরক্ষরতা কিছুই কমিবে না বরং দীর্ঘদিনের জন্য সে আশা একেবারে খতম হইবে। মোল্লা-মৌলবীদের মাহাত্ম্য এপথে বাড়িবে ইহা সত্য, কিন্তু শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সংহতি জনসাধারণের দৈন্য দারুণ হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ বাঙলা ভাষা যদি আরবী হরফে লিখিত হইতে থাকে, তবে আরবী শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানের মুসলমানদিগকে বাংলাও শিখিতে হইবে। আরবী মুসলমানদের শাস্ত্রীয় ভাষা, সুতরাং পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের পক্ষে আরবী হরফের জন্য বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে না, এমন যুক্তির কোন মূলাই নাই। সুতরাং পূর্ববঙ্গে বাংলার পরিবর্তে আরবী হরফ প্রচলিত হইলে শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদেরই সাংস্কৃতিক সর্বনাশ সাধিত হইবে না, সেখানকার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনেও ইহার ফলে এক অস্বাভাবিক উৎকট অবস্থার সৃষ্টি হইবে। ভাষা এবং সাহিত্যের মতই অক্ষরের একটা স্বাভাবিক গতি এবং পরিণতি আছে। সুদীর্ঘ সংস্কৃতির পথে সুগঠিত বর্ণমালাকে ইচ্ছা করিলেই বদলাইয়া ফেলা যায় না; কারণ জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশের সঙ্গে তাহা বিজড়িত হইয়া থাকে। জাতির ঐতিহ্য তাহার সবচেয়ে বড় সম্পদ। যে জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য নাই, সে জাতি কোনদিনই বড় হইতে পারে না। হিন্দুদের কথা না হয় ধর্তব্যের মধ্যেই আনা না গেল; কারণ পাকিস্থান মুশ্লিম রাষ্ট্র। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজই কি বাংলার পরিবর্তে সেখানে আরবী হরফ প্রচলন সমর্থন করিবেন, তাঁহারা গৌরবময় অতীতের ঐতিহ্য হইতে জাতিকে বঞ্চিত করিতে চাহিবেন? পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তরুণদের উপর এখনও আমাদের আস্থা আছে। আমরা জানি, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা বুদ্ধি তাহাদের সুদৃঢ় আছে। আত্মমর্যাদাবোধ তাঁহারা হারান নাই। জনমতকে পিষ্ট করিয়া পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতির পক্ষে ভয়াবহ এই যে উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহারা ইহাকে ব্যর্থ করিয়া নিজেদের সাংস্কৃতিক মর্যাদা এবং স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে প্রস্তুত হইবেন আমরা ইহাই আশা করি। বস্তুতঃ এই সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ যদি দূর না হয়, তবে পূর্ববঙ্গে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিবে, ইহা একরকম অনিবার্যই বলা চলে।

গুণ হইতে দোষ

পুরুলিয়া জিলা স্কুলে বাঙলা মাধ্যমের পরিবর্তে হিন্দী মাধ্যম প্রবর্তনের সূত্রে তথায় যে অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, গত সপ্তাহে তৎসম্বন্ধে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সেখানকার অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই, বরঞ্চ অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে বলা যায়। ইহার পরে মানভূমের অন্তর্গত আদ্রা শহরের প্রায় ৭ শত ছাত্রছাত্রী বিহার সরকারের এই জবরদস্তিমূলক প্রচেষ্টার প্রতিবাদে ধর্মঘট করে। বিহার সরকারের আদেশের প্রতিবাদে জেলাব্যাপী ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। বিহার সরকার তাঁহাদের অসঙ্গত ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা দূরের কথা, যেন প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তিতেই তাঁহারা দৃঢ় হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহাদের একগুঁয়েমি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। সিংভূম জেলার অন্তর্গত মনোহরপুরের দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী বাঙালী ছাত্রদের অভিভাবকগণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলের পাঠ্য বিষয় হইতে বাঙলা ভাষাকে বাদ দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য, বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে বিহার সরকারের এই অভিযান কংগ্রেসের আদর্শের বিরোধী এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দেশিত নীতিরও তাহা স্পষ্টতঃই পরিপন্থী। কিন্তু বাঙলার অদৃষ্টেরই দোষ যে, অকারণ আজ তাহার বিরুদ্ধে নানাদিক হইতে প্রাদেশিকতামূলক অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। অথচ এই ধরণের অনাচার রুদ্ধ করিয়া কংগ্রেসের আদর্শ এবং নীতির মর্যাদা রক্ষার তাগিদ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যথারীতি উপলব্ধি করিতেছেন না। বাঙলা আজ ব্যবচ্ছিন্ন, বাঙলা আজ দুর্বল এবং নেতৃহীন ও অসহায় অবস্থায় পতিত। তাহার আবেদন-নিবেদনে কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। যে বাঙলার সন্তানেরা অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার আদর্শকে জীবনদানের অগ্নিময় সাধনায় উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, বর্তমানে সেই বাঙলার বিরুদ্ধে একান্ত অনুচিতভাবে এবং অনেকটা ধৃষ্টতাভরে প্রাদেশিকতার অভিযোগ উত্থাপন করা হইতেছে। বাঙলার মনস্বী সন্তানগণের সাধনা বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের ভাষা এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে সামান্য নয়। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই বিহারের স্কুল ইন্সপেক্টরস্বরূপে তথাকার শিক্ষা বিভাগে ও আদালতসমূহে স্থানীয় ভাষাকে প্রচলিত করেন। উড়িয়া ভাষাও সাহিত্যের মূলে বাঙলার অবদান যে কত ইতিহাস সুস্পষ্টভাবেই সে সাক্ষ্য দিবে। আসামের সম্বন্ধেও সে সত্যের অন্যথা হইবে না। কিন্তু বাঙালীর এই সব গুণ আজ দোষ হইতে বসিয়াছে। ইহার মূলে কোন যুক্তি নাই, নীতি নাই, আদর্শ নাই। সমগ্র ভারতের কল্যাণ-দৃষ্টির দিক হইতে বাঙলা ভাষাও সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই অসঙ্গত উদ্যম কোনক্রমেই সমর্থন করা চলে না। জাতীয়তাবোধ বাঙলার সংস্কৃতিতে অস্থি-মজ্জাগত, বাঙালী প্রাদেশিকতা কোনদিনই একান্ত করিয়া লইতে পারে নাই; কিন্তু আত্মমর্যাদা তাহারও আছে। বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উপর ক্রমাগত এইরূপ আঘাত বাঙালী জাতির অন্তরে দারুণ বিক্ষোভ জমাইয়া তুলিতেছে। এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে এখনও এসব অভিযোগের প্রতিবিধানে কার্যকর নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বরূপ

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃত ব্যাপারটা কি, এ সম্বন্ধে অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতিস্বরূপে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ পাটনার ছাত্রদের একটি সভায় বিষয়টি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিতে ইহা বুঝায় না যে, এখানকার অধিবাসীদিগকে শুধু পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পূজারী হইতে হইবে। ধর্ম বলিতে মানুষের সংসার ত্যাগ বুঝায় না, ধর্মের অর্থ এই যে, মানুষ ধর্মের আদর্শসমূহ বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য জীবনধারণ করিবে। ভগবৎ গীতায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূল নীতিসমূহ বিবৃত হইয়াছে। গীতা এই শিক্ষা দেয় যে, ধর্ম মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে না, গীতার নির্দেশ এই যে, রাষ্ট্রকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক আদর্শসমূহ আগ্রহপূর্ণভাবে সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। কিছুদিন আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা নাস্তিকতা নয় এবং অধ্যাত্ম-সম্পর্ক-বিবর্জিত বস্তুও তাহা নহে। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টির উদারতাই ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে বোঝায়। বস্তুতঃ গীতার আদর্শ আমাদের দৃষ্টিকে এমনই উদার করিয়া তোলে। নবীন ভারত সে আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবে, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

পরলোকে কিরণশঙ্কর রায়

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীকিরণশঙ্কর রায় গত ৮ই ফাল্গুন, রবিবার সকাল ৯-২০ মিনিটের সময় ৮নং থিয়েটার রোডস্থিত সরকারী বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীযুত রায় কিছুকাল কঠিন রোগের আক্রমণে শয্যাগত ছিলেন। তিনি যে গুরুতর রোগে পীড়িত আছেন জনসাধারণ ইহাই মাত্র জানিত; কিন্তু সংবাদপত্রে সময় সময় তাঁহার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইত, তাহাতে তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিবেন, এমন আশাই জনসাধারণ অন্তরে পোষণ করিতেছিল। এই অবস্থায় তাঁহার মৃত্যুসংবাদ দেশবাসীকে কতকটা আকস্মিকভাবেই গভীর বেদনায় আহত করিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে, দেশগৌরব যতীন্দ্রমোহনকে জাতি এমনভাবেই হারাইয়াছিল। তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রতিভা এবং দেশসেবার জ্বালাময় প্রেরণা জাতির পক্ষে যখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই তাঁহারা লোকান্তরিত হন। কিরণশঙ্করের অভাব জাতির পক্ষে সেই দিক হইতে তীব্র এবং নিদারুণ। ২৫ বৎসরের অধিককাল শ্রীযুত রায় কর্মসাধনার প্রভাবে জাতীয় জীবনে যে আসন অধিকার করিয়াছিলেন তাহা শূন্য দেখিয়া দেশবাসী সত্যই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে।

কিরণশঙ্কর ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত তেওতার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষিত কিরণশঙ্কর প্রথমে প্রেসিডেন্সী পরে সংস্কৃত কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি ব্যারিস্টারী পড়িবার জন্য পুনরায় বিলাতে যান। ব্যবহারাজীবসুলভ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি কিরণশঙ্করের বিশেষভাবে ছিল এবং ব্যবহারাজীব হিসাবে যথেষ্ট বিত্তসম্পত্তি অর্জন করিতেও তিনি সমর্থ হইতেন। কিন্তু অর্থকে তিনি বড় করিয়া দেখিতে পারেন নাই। দেশসেবকের ত্যাগময় জীবনের আদর্শের সঙ্গে অর্থোপার্জনের আপোষ করিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিরণশঙ্কর বিলাত হইতে ফিরিয়া দেশবন্ধু দাশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সুভাষচন্দ্রের সহকর্মীস্বরূপে রাজনৈতিক কর্মসাধনাকে জীবনের ব্রতস্বরূপে অবলম্বন করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত কিরণশঙ্কর নিষ্ঠার সঙ্গে কংগ্রেসের সেবা করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিক জীবনে তিনি বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছেন; কিন্তু কোন বিরোধিতা তাঁহার সুসংস্কৃত ব্যক্তিত্ব ও বিবেচনাকে অভিভূত কিংবা বন্ধুত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যমর্যাদা তিনি সব ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেন। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ অভিজাত পরিবারের সন্তান কিরণশঙ্করের জীবনে ধনমত্ততার লেশ মাত্রও ছিল না; কিন্তু সাংস্কৃতিক আভিজাত্য তাঁহার প্রখর ছিল। সঙ্ঘ গঠনে তাঁহার অসামান্য শক্তি, দূরদর্শিতা এবং অচঞ্চল অধ্যবসায় তাঁহার চরিত্রে নেতৃত্বের যোগ্যতা সঞ্চার করিয়াছিল। কিরণশঙ্কর কথা

অপেক্ষা কাজ বড় বলিয়া বুঝিতেন। বড় বড় ফাঁকা কথার ব্যবসায়ে নাম যশ কিনিবার দৈন্য তাঁহার জীবনে কোনদিন দেখা যায় নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সারল্যে, শুদ্ধতায় এবং সৌজন্যে মণ্ডিত ছিল। নৈতিক মহিমা তাঁহার জীবনকে সুন্দর করিয়াছিল। অকলঙ্ক চরিত্রের গৌরব, তীক্ষ্ণ মনীষা এবং নির্মল বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহার আচরণকে উদ্দীপ্ত করিত।

সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সম্পদে সম্পন্ন কিরণশঙ্কর স্বাধীন ভারতে দেশসেবার নূতন অধ্যায়ে নূতন উৎসাহে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রেও তাঁহার মনে একটা সঙ্কল্প ছিল। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সময় তিনি নিজে একটা লক্ষ্য সম্মুখে লইয়া কাজে হাত দিয়াছিলেন। বহু কাজ তাঁহার করিবার ছিল এবং দেশবাসীও তাঁহার কাছে বহু আশা রাখিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সেসব পূর্ণ হইল না।

কিরণশঙ্করের রাজনীতিক জীবন দেশবাসীর দৃষ্টিতে সমধিক সুস্পষ্ট। কিন্তু সুসাহিত্যিকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্রথমে 'সবুজ পত্রে' কিরণশঙ্করের বাঙলা লেখা দেশবাসীর চিত্তকে আকৃষ্ট করে। দেশবন্ধু দাশ সম্পাদিত 'বাঙলার কথা', 'আত্মশক্তি' এবং 'প্রবাসীতে'ও তাঁহার মূল্যবান কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সুমার্জিত, প্রতিভার তীক্ষ্ণতায় উদ্দীপ্ত তাঁহার এই সব গল্প এবং নিবন্ধনিচয় সাহিত্য-সমাজে একটা নূতন সাড়া জাগায়। বস্তুতঃ কিরণশঙ্করের প্রকৃতিতে শিল্পীসুলভ রস-সম্ভাবিত সৃজনী-প্রতিভা স্বাভাবিক ছিল। দুঃখের বিষয়, এ দিকে তাঁহার প্রতিভার এই উদ্দীপ্তি বলিতে গেলে নিতান্তই সাময়িক। কিরণশঙ্কর রাজনীতিক কর্মপ্রাবল্যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনাকে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। রাজনীতিক ক্ষেত্রে দেশমাতৃকার আহ্বানই তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠে এবং বঙ্গবাণী সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হন। এইভাবে স্বদেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে তিনি তাঁহার দুর্লভ সাহিত্য-প্রতিভাকেও উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অথচ কিরণশঙ্করের প্রতিভা সাহিত্য যে সাহিত্য-সাধনার পক্ষেই সমধিক উপযুক্ত ছিল এ কথা অনেকেরই মনে হইবে। বস্তুত রাজনীতিক সাধনা হইতে নিজেকে সাহিত্যিকের সমাহিত জীবনে তিনি যেন ইচ্ছাসত্ত্বেও ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজনীতি, সাহিত্য, অথবা সমাজের সকল ক্ষেত্রে কিরণশঙ্কর তাঁহার সঙ্কল্প এবং সাধনার প্রভাবে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্যই তিনি দেশজননীর অন্যতম অনন্যসাধারণ কৃতী সন্তানস্বরূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও আন্দোলনের কর্মী কিরণশঙ্করের একটি স্বপ্ন সফল হইয়াছে, তিনি স্বাধীন ভারতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সকল আশা তিনি সার্থক দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। নূতন সংগঠন-ব্রতে জাতীয় শক্তিকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া সুখী এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাঙলার স্বপ্ন কিরণশঙ্কর দেখিতেন। তাঁহার সে স্বপ্ন সফল হোক, এই প্রার্থনার দ্বারা আমরা পরলোকগত কিরণশঙ্করের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গ স্বজন এবং সহকর্মীদের প্রতি সান্ত্বনা জানাইতেছি।

ঘর শিল্পীঃ শ্রীপূর্ণেন্দু পাল
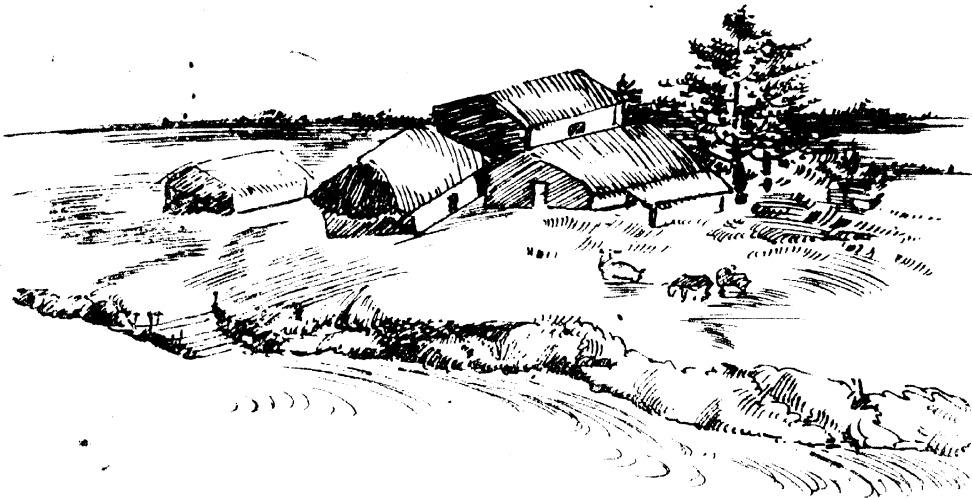
বাহির শিল্পীঃ শ্রীঅন্নদা মজুমদার

একটি সংবাদে প্রকাশ প্যাকিস্তান হইতে অনেক মোল্লারা নাকি কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিতেছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বুঝলাম এদের দৌড় শুধু মসজেদ পর্যন্ত নয়,—গণভোট পর্যন্ত!"

* * *

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ প্যাকিস্তান পার্লামেণ্টে পূর্ববঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিতর্ক উত্থাপন করিতে দেওয়া হয় নাই।—"একেই বুঝি বলে অখাদ্য নীতি"—বলে শ্যামলাল।

* * * *

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এক সভায় পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন—
There is a great scope for more serious sport.

তারপর তাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—
Some of you may be rich and others poor. It does not matter.
"ছেলেরা হাততালি দিয়ে বলে উঠেছে বাঃ কি মজা, বেশ খেলা"—ছেলেদের মন্তব্যের খবরটা অবশ্য বিশুখুড়োই সংগ্রহ করিয়াছেন।

* * * *

কাণপুর শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে এক সভায় শ্রীমতী সরোজিনী ক্রোড়পতিদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"আপনারা শ্রমিকদের জন্য কি করেছেন জানতে পারি কি? জেনে রাখুন এ কথার জবাব এখন না দিলেও ভগবানের কাছে দিতেই হবে।" বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা ভগবানের কাছে জবাব দিবেন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া একটি অসমর্থিত সংবাদ পাওয়া গেল!

"FREE love now frowned upon in Soviet"—
একটি সংবাদ। "সোভিয়েটের পিসতুতো ভায়ের বেয়াইরা যারা এ দেশে আছেন তারা এ
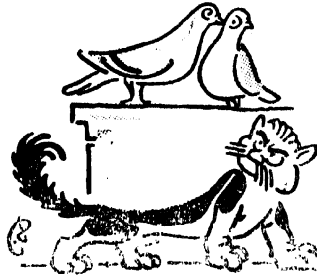
সংবাদটি শুনে কাজে কাজেই একটু বিচলিত হয়ে পড়বেন বৈ কি"—এই মন্তব্যও খুড়োর।

* * *

আমাদের সরবরাহ সচিব মহাশয় বেতার মারফতে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাবের বিস্তৃত কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। "অতঃপর ক্ষিদে পাওয়ার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না বলেই আমাদের বিশ্বাস"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

ক কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ এ ডি খাঁ রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—কলিকাতাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ব্যাপারে শুধু কর্পোরেশনকে দোষ দিলে চলিবে না, নাগরিকদেরও এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। —"খুবই সত্যি কথা এবং সত্যি বলেই ভাগের মা'র গঙ্গা পাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ অনেকখানি"—মন্তব্য অন্য এক সহযাত্রীর।

* * *

মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট সেখানকার মিউনিসিপ্যাল কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়াছেন তাঁহারা যেন গান্ধীজীর নামে কোন রাস্তার নামকরণ না করেন। খুড়ো বলিলেন—"খুব ভালো কাজ করেছেন, Gandhian wayতে চলার অসুবিধে অনেক।

* * * *

পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রায় তাঁর সঙ্গীদের লইয়া সম্প্রতি একটি নূতন ডাবল্‌-ডেকার বাসে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। স্টেটস্‌ম্যান কাগজে তার একখানা ছবিও দেখিলাম। আমরা বলি—বাসেই যখন চড়িলেন তখন অফিসের বেলায় চড়িলেই পারিতেন, "আ-রাম"ও হইত, আর্টের দিক হইতে ছবিখানাও হইত মনে রাখিবার মত!

* * *

শুনিলাম বর্মার তন্তুবায়রা নাকি পণ্ডিত জওহরলালকে একটি কম্বল উপহার দিয়াছেন। "ভাগ্যিস তারা ঐ সঙ্গে একটি লোটা দেন নি"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ সুদৃঢ় করার নাকি ব্যবস্থা হইতেছে।—"অবশ্যি অন্যান্য যোগাযোগ ছিন্ন করার চেষ্টারও কোনরকম ত্রুটি হচ্ছে না"—বলিল শ্যামলাল।

* * * * *

অস্ট্রেলিয়া হইতে জনৈক গণৎকার ঘোষণা করিয়াছেন—আর কুড়ি বৎসরের মধ্যে হেইলির ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর মানুষ প্রায় সব ধ্বংস হইয়া যাইবে।
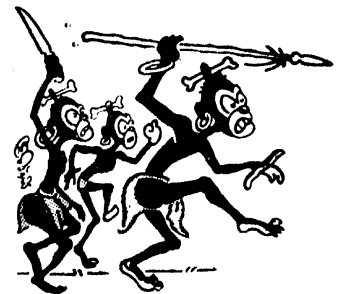
যারা বাঁচিয়া থাকিবে তারা আবার নরখাদকের স্তরে ফিরিয়া যাইবে।—"অবশ্যি আফ্রিকায় তার আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে এবং নরমাংসের হজমী হিসেবে জংলীরা "মাল-আন" "মাল-আন" বলে চেঁচাচ্ছে"—মুখখানা ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

মহর্ষি ভৃগু ডাকছিলেন—পুলোমা!

স্বামী ডাকছেন, মহাতপা আর্য ভৃগু, পুলোমার স্বামী। পুলোমা ব্যস্ত হয়ে, অন্য কাজ ফেলে রেখে ভৃগু ঋষির সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। স্বামীর আহ্বানে এমনি করে সাড়া দেওয়াই ধর্মপত্নীর কর্তব্য। আর্য সমাজে বিবাহিতা নারীর এই রীতি।

ঋষির সংসারে কর্তব্যই সবচেয়ে বড় বিধান। বেদবিধিমতে মন্ত্রোচ্চারণের সংগে পুলোমার জীবন ভৃগু ঋষির জীবনের সংগে মিলিত হয়েছে। এ সংসারে দুজনের কেউ কখনো কর্তব্য বিস্মৃত হয় না। ঋষি জীবনের প্রতিটি কর্তব্যে ভৃগু পুলোমাকে স্মরণ করেন, পুলোমাও ভৃগুর প্রতিটি অনুরোধ ও আহ্বানে সাড়া দেয়, ঋষিজীবনের আদর্শকে সফল করে তুলতে সাহায্য করে।

শুধু পুত্রার্থে ভার্যা গ্রহণ করেছেন ঋষি ভৃগু। তাঁর সেই সংস্কার সফলও হতে চলেছে, কারণ পুলোমা এখন অন্তঃসত্ত্বা। পুলোমার জীবনে মাতৃত্বের আবির্ভাব আসন্ন হয়ে উঠেছে।

পুলোমাও তার জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করে। সমাজে ভৃগুজায়ারূপে পুলোমা যে গৌরব অনুভব করে, ভৃগুসন্তানের মাতারূপে তার সেই সামাজিক গৌরব আর কিছুদিনের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। যিনি আর্য ঋষির ধর্মপত্নী, তাঁর পক্ষে জীবনে এই তো ধন্য হওয়ার মত ঘটনা।

পুলোমা কাছে এসে দাঁড়াতেই ভৃগু বলেন, —আমি স্নানে চললাম পুলোমা।

পুলোমা বলে—আসুন।

ভৃগু চলে যাবার পর, ঠিক পূর্বের মত আবার গৃহকাজে মন দিতে পারে না পুলোমা। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু আজ নয়, ভৃগুর ক্ষণিক অদর্শনের জন্য নয়, মাঝে মাঝে হঠাৎ এই রকম আনমনা হয়ে থাকে পুলোমা। আজ পুলোমা নিজেই এর অর্থ বুঝতে পারে না।

পুলোমার এই ক্ষণিকের বিমনা আবেশ লক্ষ্য করেন একজন, বৃদ্ধ হুতাশন। ভৃগুর কুটীরে গৃহরক্ষকরূপে রয়েছেন হুতাশন। পুলোমাকে তিনি শিশুকাল থেকেই চেনেন। পিতার আলয়ে যতদিন যেভাবে কুমারী জীবন যাপন করেছে পুলোমা, তার সকল ইতিহাস জানেন হুতাশন। আজ স্বামীগৃহে ঋষির বধূ হয়ে যেভাবে জীবনযাপন করছে পুলোমা, তাও প্রত্যক্ষ করেন হুতাশন। তাই, আর কেউ নয়, শুধু বৃদ্ধ হুতাশন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন, পুলোমা মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায়।

—পুলোমা!

নাম ধরে কে যেন আবার ডাকছে মনে হয়। এ কণ্ঠস্বর ধর্মপতি ভৃগুর নয়, বৃদ্ধ হুতাশনের নয়। তবু মনে হয়, অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। অতীতের এক বিস্মৃত স্বপ্নলোক থেকে যেন এই আহ্বান ভেসে এসে পুলোমার চেতনার দুয়ারে আঘাত করছে, সমাজ সংস্কার ও কর্তব্যের বাইরে থেকে বুকভরা আকুলতা নিয়ে একটা তৃষ্ণাতুর অনিয়ম যেন পুলোমাকে সারা জগতে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এতদিনে সে এসে পৌঁছেছে।

বুঝতে পারে পুলোমা, আর কেউ নয় সে-ই এসেছে। সেই কৈশোরের নর্ম-সহচর, প্রথম যৌবনের প্রণয়াস্পদ এক অনার্য তরুণ, তারও নাম পুলোমা। সনাম সখা অনার্য পুলোমা তার প্রথম প্রেমের দাবী নিয়ে আজ পুলোমার পতিব্রত জীবনের দ্বারে এসে কঠিন পরীক্ষার মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছে।

তরুণী পুলোমার অনুভবের জগতে যেন বহুদিনের একটা চাপা ঝড় হঠাৎ পথ পেয়ে আবার জেগে ওঠে। ঋষির সংসারে কর্তব্যচারিণী নারীর মূর্তিকে এক নির্বাসিত বসন্ত দিনের বাতাস মুক্তির পুলক নিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে। সুন্দরী পুলোমার দেহ পুষ্পান্বিতা বল্লরীর মত সে স্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে

তরুণ অনার্য পুলোমা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার প্রথম প্রণয়ভাগিনী জীবনবাঞ্ছিতা পুলোমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

অনার্য পুলোমা স্পষ্ট আহ্বান জানায়—এস।

আর্যা পুলোমা সন্ত্রস্তভাবে বলে—কোথায়?

—আমার সংগে, আমার জীবনে।

তরুণী পুলোমা তার চিত্তব্যাপী চাঞ্চল্যকে সংযত করে বলে—কোন্ অধিকারে তুমি আজ এই দাবী করছো?

তরুণ পুলোমা বলে—তোমায় ভালবেসেছি এই অধিকারে।

তরুণী পুলোমা—কিন্তু আমি কোন্ অধিকারে তোমার কাছে যাব?

তরুণ পুলোমা—প্রেমিকা হয়ে বেঁচে থাকার অধিকারে।

অনার্য পুলোমার ক্লান্ত মুখচ্ছবি যেন দুঃসহ এক জ্বালাময় আবেগে ঝলসে ওঠে। পুলোমার কাছে আরও এগিয়ে এসে স্পষ্টতর ভাষায় বলে—আমি ঋষি নই, আর্য নই, তপস্বী নই। আমি শুধু প্রেমিক। আমি পুত্রার্থে তোমাকে চাই না, তোমারই জন্য তোমাকে চাই।

ভক্ত পূজারীর স্তবসংগীতের মত শোনায় এই অভিনব ভালবাসার তত্ত্ব, এই ভয়ানক

আবেদন। অনার্য পুলোমা যেন অদ্ভুত এক অহেতুক প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে সারা সংসারের মধ্যে শুধু তরুণী পুলোমার অহমিকাকে মহীয়সী করে তুলছে। যেন জগতের জন্য পুলোমা নয়, পুলোমার জন্যই এই জগৎ। কন্যা নয়, বধূ নয়, মাতা নয়, শুধু নারীরূপে তরুণী পুলোমার ভিন্ন একটা সত্তা যেন আছে এবং উপেক্ষায় অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। অনার্য পুলোমা আজ সেই নারীর কাছেই জীবনব্যাপী সমাদরের উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দুর্বার এক শক্তি আছে এই আবেদনের।

তরুণ পুলোমা বলে—আমার আদর্শ তোমার মধ্যেই সম্পূর্ণ, তোমার বাইরে নয়, তোমার অতিরিক্ত নয়। আমার সমাজ সংসার জগৎ—সবই তুমি। তুমি আমার প্রেমের প্রথমা, তুমি আমার প্রেমের অন্তিমা।

তরুণী পুলোমার মনে হয়, এ ঋষির কুটীরে যেন তার আত্মা বন্দিনী হয়ে আছে। মাত্র পুত্রার্থে ভার্যারূপে, সংসারের প্রয়োজনে একটা উপচাররূপে সে স্থান লাভ করেছে। তার বেশী কোন গৌরব এখানে নেই। এ জীবন শাস্ত্রসম্মত ও সমাজসম্মত, কিন্তু হৃদয়সংগত নয়।

আর্যা তরুণী, ঋষিবধূ পুলোমার সব প্রতিবাদের শক্তি যেন এই আবেদনের টানে দূরান্তরে ভেসে যায়। তবু শেষবারের মত নিজেকে সংযত করে পুলোমা। ভীতা অথচ প্রলুব্ধা বিহঙ্গীর মত যেন আকাশভরা খোলা হাওয়ার ঝড়ের দিকে তাকিয়ে বলে—না পুলোমা, আমাকে ধর্মের বাইরে যেতে বলো না।

অনার্য পুলোমা বিস্মিত হয়—ধর্ম কি?

তরুণী পুলোমা—এ প্রশ্নের উত্তর দেবার সাধ্য নেই আমার।

তরুণ পুলোমা—কিন্তু আমি আজ এই প্রশ্নের উত্তর জেনে যাব পুলোমা, ধর্ম কি?

পুলোমা বিব্রতভাবে বলে—আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। বৃদ্ধ হুতাশন রয়েছেন, তাঁর কাছে এ প্রশ্নের উত্তর শুনে নাও।

তরুণ পুলোমা—বেশ, চল, সংসারের সব ইতিহাসের সাক্ষী হুতাশনের সম্মুখে গিয়ে তুমি আমার পাশে একবার দাঁড়াও। তারপর আমি তাঁকে প্রশ্ন করবো।

বৃদ্ধ হুতাশনের সম্মুখে গিয়ে দুজনে দাঁড়ায়। অনার্য তরুণ পুলোমা প্রশ্ন করে—হুতাশন, আপনি একদিন আমাদের দুজনকে দেখেছেন, জীবনের প্রভাত বেলায় আমরা দুজনে যখন খেলার সাথীরূপে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম।

হুতাশন শান্তস্বরে বলেন—হ্যাঁ।

তরুণ পুলোমা—আজ আবার অনেকদিন পরে আমরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি। আপনি বলুন, এর মধ্যে বিসদৃশ কিছু দেখছেন কি? এর মধ্যে অন্যায় কোথায়? আপনি বলুন ধর্ম কি?

হুতাশন—যা সত্য, তাই ধর্ম।

তরুণ পুলোমা—সত্য কি?

হুতাশন—যা ঘটনা, তাই সত্য।

তরুণ পুলোমা—তবে বলুন, আপনার সম্মুখে এই যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটি জীবনের মূর্তি, এর মধ্যে কি কোন সত্য নেই? প্রথম ভালবাসার অধিকার কি মিথ্যা? যাকে চিরজীবন ধরে অন্বেষণ করে বেড়াই, তাকে কাছে পাওয়ার দাবী কি মিথ্যা?

হুতাশন—না, মিথ্যা নয়।

তরুণী পুলোমা বিস্মিতভাবে তাকায় হুতাশনের মুখের দিকে। মুগ্ধভাবে তাকায় তার কৈশোরের সখা অনার্য তরুণ পুলোমার মুখের দিকে।

অনার্য পুলোমা আর্যা পুলোমার হাত ধরে বলে—চল।

হুতাশনের সান্নিধ্য থেকে দুজনে ধীরে ধীরে চলে এসে একবার দাঁড়ায় ঋষি কুটীরের নিস্তব্ধ আঙিনায়। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। অন্তঃসত্ত্বা ধর্মপত্নীর মূর্তি যেন মুহূর্তের মধ্যে মুছে গেছে। তরুণী পুলোমার স্বপ্নলোক থেকে হঠাৎ জাগরিতা এক চিরকালের প্রেমিকা অনার্য পুলোমার হাত ধরে সংস্কার ও সমাজের বাইরে চলে যায়।

* * * *

বনোপান্তে এক কুটিরে অনার্য তরুণের সহচরী প্রেমিকা পুলোমা আবার একদিন আনমনা হয়ে যায়। সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। পাখীর প্রভাতী কলরব জাগে, পাখীর সান্ধ্য কূজন স্তব্ধ হয়। অরণ্যপুষ্পের সৌগন্ধ্য বাতাসে ছুটোছুটি করে, কিন্তু তরুণী পুলোমা আনমনা হয়ে থাকে।

অনার্য পুলোমা অনেকবার প্রশ্ন করেছে—কি ভাবছো পুলোমা? তরুণী পুলোমা উত্তর দেয়নি। তবু বুঝা যায়, কোথা থেকে যেন বাস্তব সংসারের একটা সংশয় তার অবাধ প্রেমিকতার জীবনে কঠিন প্রশ্নরূপে দেখা দিয়েছে।

অনার্য পুলোমার প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পুলোমা একদিন বলে—তুমি জান, আমি অন্তঃসত্ত্বা।

তরুণ পুলোমা—জানি।

তরুণী পুলোমা—ভৃগুঋষির সন্তানকে আমি ধারণ করছি, তা'ও নিশ্চয় জান?

তরুণ পুলোমা—জানি।

তরুণী পুলোমা—কিন্তু সেই সন্তানের জীবনে তার পিতৃ পরিচয় চিরকাল অজানা হয়েই থাকবে।

তরুণ পুলোমা সান্ত্বনার সুরে বলে—কিন্তু পিতৃস্নেহ তার কাছে অজানা হয়ে থাকবে না পুলোমা। তাকে পালন করবার জন্য রয়েছি আমি, তার জন্যে দুঃখ করো না পুলোমা।

পুলোমার কণ্ঠস্বর রূঢ় হয়ে ওঠে—না, সে অভাগা পৃথিবীতে অনার্য পুলোমার সন্তান রূপে পরিচয় বহন করবে, আমি তাকে এভাবে মিথ্যা ক'রে দিতে পারবো না।

অনার্য পুলোমার বুকের ভেতর যেন বেদনায় দীর্ণ হয়ে ওঠে—পুলোমা?

তরুণী পুলোমা—পারবো না, এত ভয়ঙ্কর ধর্মহীন হতে পারবো না। সন্তানের পরিচয় মিথ্যা করে দিতে পারবো না। সংসারের ভার্গবকে পৌলমেয় ক'রে দিতে পারবো না। এ নারীর ধর্ম নয়।

অসহ এক অপমান যেন আকস্মিক বজ্রপাতের মত অনার্য পুলোমার সব প্রেমিকতার গর্ব গৌরব ও প্রসন্নতাকে চূর্ণ করে দেয়। অনার্য! অনার্য! আর্যা পুলোমার কাছে সে আজ হীনশোণিত প্রাণী ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেমের চেয়ে বংশ গোত্রকেই জীবনের বেশী পূজনীয় বলে আজ নতুন ক'রে উপলব্ধি করতে পেরেছে পুলোমা।

অনার্য পুলোমা নিঃশব্দে মাথা হেঁট ক'রে বসেছিল। তরুণী পুলোমার সারা দেহ মন্থিত ক'রে এক অভিনব বেদনার ঝড় আকুল হয়ে উঠতে চাইছে। সে বেদনায় আর্যা তরুণীর কমনীয় দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অনার্য পুলোমা ব্যগ্রভাবে আর্যা পুলোমার একটি হাত ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

যেন পবিত্র মুহূর্তে অশুচি এক স্পর্শের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য হাত সরিয়ে নিয়ে পুলোমা ব'লে ওঠে—আমার কাছ থেকে দয়া ক'রে একটু দূরে সরে যাও পুলোমা। ভৃগু ঋষির সন্তান আসছে, জন্মলগ্নের প্রথম মুহূর্তে তাকে আমি অপিতার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে পারবো না।

অনার্য পুলোমা ধীরভাবে তারই প্রণয়াস্পদা নারীর এই ভয়ানক ধিক্কার শুনতে থাকে। কিন্তু এতক্ষণে তার সব প্রশ্নের উত্তর জানা হয়ে গেছে, আর কোন সংশয় নেই। তরুণী পুলোমা তার জীবনের সকল আগ্রহ দিয়ে আবার তার সমাজ ও সংস্কারকে ফিরে পেতে চাইছে। ভৃগুপত্নী পুলোমার সম্মুখে অনার্য প্রেমিক পুলোমার অস্তিত্ব একেবারে অর্থহীন ও ভিত্তিহীন হয়ে গেছে।

অনার্য পুলোমা দূরে সরে যায়। সেদিন সূর্য অস্ত যাবার আগেই এক রক্তিম মুহূর্তে আর্যা পুলোমার সন্তান জন্মলাভ করে। শিশু ভার্গবের ক্রন্দন ধ্বনি ছাড়া সে কুটীরে আর কোন সাড়া ছিল না। সদ্যোজাত আর্য শিশুর প্রথম কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ পুলোমা তার অপমানাহত অনার্য জীবন

...ার ব্যর্থ প্রেমের দুঃসহতা নিজেই অবসান ...রে দিয়েছে, আত্মহত্যা ক'রে।

* * * *

তরুণী পুলোমা এক নবজাত শিশুকে ...কালে ক'রে ভৃগু ঋষির কুটীরের প্রবেশ দ্বারে ...াঁড়িয়েছিল। আর দাঁড়িয়েছিলেন ভৃগু ঋষি, ...ন প্রবেশপথে অটল নিষেধের প্রতিমূর্তি'র ...ত।

ভৃগু বলেন—আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ... ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করো না পুলোমা।

পুলোমা—বলুন।

ভৃগু—বল, কেনই বা তোমার চলে যাওয়া, ...ার কেনই বা তোমার ফিরে আসা?

পুলোমা কোলের শিশুর মুখের দিকে ...াকিয়ে উত্তর দেয়—এর জন্য।

ভৃগু—তার মানে?

পুলোমা—ঋষির ছেলেকে ঋষির ঘরে ...াখবো। এ অধিকারে আপনি বাধা দিতে ...পারেন না।

ভৃগু—নিশ্চয় না। ঋষির ছেলেকে ...ঋষির ঘরে রেখে দাও, তার স্থান এখানে আছে। ...কিন্তু তোমার স্থান নেই পুলোমা।

পুলোমা আর্তঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে —ঋষি, এত বড় শাস্তি আমায় দেবেন না।

ভৃগু—শাস্তি নয়, তোমার কর্তব্য তোমাকে ...স্মরণ করিয়ে দিলাম। স্বেচ্ছায় ঋষি-পত্নীর ...র্ম বর্জন ক'রে তুমি চলে গিয়েছিলে, তেমনি ...স্বেচ্ছায় ঋষি-মাতার ধর্ম বর্জন ক'রে তুমি চলে ...ও।

পুলোমা অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত জীবনে স্বেচ্ছায় সে অনেক কিছু করেছে। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে স্বেচ্ছায় এক অনার্য তরুণকে ভালবেসেছে, স্বেচ্ছায় ...বিবাহিত জীবনের সংস্কারকে তুচ্ছ ক'রে ...প্রেমিকের আহবানে চলে যেতে পেরেছে। ...স্বেচ্ছাচারের শক্তি তার আছে। কিন্তু এই ...মুহূর্তে শিশু পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে আজ প্রথম উপলব্ধি করে পুলোমা, স্বেচ্ছা-চারের শক্তি তার নেই। ঋষি-মাতা হওয়ার সম্মান সৌভাগ্য ও সুযোগকে হেলায় তুচ্ছ করে চলে যাবার শক্তি তার নেই। আজ প্রথম মনে হয়, সন্তানহীন শূন্য বক্ষ নিয়ে চলে গেলে তার নারীত্বই চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। না, যেতে পারবে না, চলে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। সব অভিশাপ স্বীকার ক'রে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও তার জীবনে ঋষি মাতা আর্যনারীর পরিচয় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুধু পুত্রার্থে, অন্য কিছুর জন্য নয়।

পুলোমা বলে—আমি স্বেচ্ছায় যাইনি, এক অনার্য আমাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। ক্ষমা করুন আর্য, আমি সন্তানকে সকল অপবিত্র সংস্পর্শ থেকে রক্ষা ক'রে আপনার কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।

ভৃগু বিস্মিত হন—আশ্চর্য, বিশ্বাস হয় না পুলোমা। হুতাশন ঘরে থাকতে তোমাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যেতে পারে, কোন্ দুরাত্মার এত শক্তি আছে?

পুলোমা—হুতাশনের সম্মতি ছিল।

ভৃগুর বিস্ময় ক্ষমাহীন ক্রোধ হয়ে জ্বলে ওঠে—হুতাশনের সম্মতি ছিল?

পুলোমা—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে তারপর শান্ত স্বরে ভৃগু বলেন—এস পুলোমা।

পুলোমাকে সঙ্গে নিয়ে ভৃগু বৃদ্ধ হুতাশনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

রূঢ় ক্রোধাক্ত স্বরে ভৃগু বলেন—আপনি এত বড় বিশ্বাসহন্তা ও অধর্মচারী?

হুতাশন উত্তেজিত হন না। শান্তভাবেই উত্তর দেন—না।

ভৃগু—আমি পুলোমার ধর্মপতি, পুলোমা আমার ধর্মপত্নী; এ সত্য কি আপনি জানেন না?

ভৃগু ও পুলোমা, দুজনেরই মুখের দিকে বৃদ্ধ হুতাশন একবার তাকিয়ে দেখেন, তারপর বলেন—হ্যাঁ, সত্য।

ভৃগু—তবে আপনি কেন দুরাত্মা অনার্যকে ঋষিপত্নী অপহরণে সম্মতি দিলেন?

হুতাশন—তাও সত্যের জন্য।

ভৃগু ভ্রূকুটি করেন—সত্যের জন্য?

হুতাশন—হ্যাঁ, ভালবাসার সত্য।

পুলোমার মাথা হেঁট হ'য়ে পড়ে, তার চোখের দৃষ্টি যেন মাটির ধূলায় লুকিয়ে পড়বার পথ খুঁজছে।

হুতাশন বলেন—জীবনের প্রথম প্রণয়, জীবনব্যাপী এক প্রেমিকতার তৃষ্ণা পুলোমাকে অপহরণ করেছিল ঋষি। সে ইতিহাস আমি জানি, আমি তার সাক্ষী, তাকে নিতান্ত মিথ্যা মনে করতে পারি না। আপনাদের মত শিক্ষা-গুরু নই, আপনাদের তত্ত্ব দিয়ে সত্য-মিথ্যার বিচার করি না। আমার কাছে ঘটনাই একমাত্র সত্য। ঘটনাকে আমি বাধা দিই না। যারা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তাদের আমি বাধা দিই না। তাই আমি সম্মতি দিয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন হুতাশন। তার পরে রূঢ়ভাবে একেবারে স্পষ্ট ক'রেই বলেন—আপনি পুত্রার্থে পুলোমাকে চেয়েছেন, আর সে পুলোমার জন্যই পুলোমাকে চেয়েছে। এই দুই চাওয়ার দ্বন্দ্বে তিনটি জীবনের জয়-পরাজয়ের পরীক্ষা হ'য়ে গেল। কোন্ সত্য বড় আর কোন্ সত্য ছোট, ঘটনায় তারই নির্ণয় হ'য়ে গেল। সংসারে তারও সাক্ষী হ'য়ে রইলাম আমি।

হুতাশন চুপ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দেখতে পেলেন ভৃগু ঋষি রুষ্টভাবে প্রখর দৃষ্টি তুলে যেন তাঁকে বাচালতা সম্বরণ করার জন্য সাবধান করে দিচ্ছেন।

হুতাশন আরও মুখর হ'য়ে যেন প্রত্যুত্তরের মতই শুনিয়ে দিলেন।—আপনি শুধুই শাস্ত্র, এই তরুণী পুলোমা শুধুই অহমিকা, আর সেই অনার্য শুধুই প্রেমিকতা। আপনি হৃদয়ের ধর্ম বুঝতে পারেননি, তরুণী পুলোমা সমাজের ধর্ম বুঝতে পারেনি, আর সে অনার্য তরুণ নারীত্বের ধর্মকে বুঝতে পারেনি। আপনারা জীবনের এক একটা ফাঁকি রেখেছেন, ঘটনা তারই প্রতিশোধ নিয়েছে। আমি ঘটনার সাক্ষী মাত্র, যা দেখি তাই বলি। যা দেখেছি তাই বলে দিলাম, এর জন্যে আমার এতটুকু দুঃখ নেই।

ভৃগু ঋষি পাথরের মত স্তব্ধ ও নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সকল রহস্য ভেদ ক'রে সমস্ত ঘটনার স্বরূপ যেন এতক্ষণে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, নিষ্পলক চক্ষে তাই দেখছেন ভৃগু।

ঝড়ের ফুলের মত তরুণী পুলোমা যেন উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে হঠাৎ ভৃগুর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। একটু বিচলিত হন ভৃগু। শান্ত স্বরে বলেন—কি বলতে চাও পুলোমা?

পুলোমা—আপনি ক্ষমা করুন।

ভৃগু—আমি কে?

পুলোমা—আমার সমাজ, আমার স্বামী।

ভৃগুর মুখ সুস্মিত হ'য়ে ওঠে—তুমি কে?

পুলোমা—আপনার ধর্মপত্নী।

নিবিড় দৃষ্টি তুলে ভৃগু ঋষি পুলোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন পুলোমাকে নতুন ক'রে চেনবার চেষ্টা করছেন, চিনতে পারছেন। এই সুন্দর বিম্বাধরে ও ভ্রূলতায় রচিত মুখচ্ছবি, যৌবনে ললিত অঙ্গ, সদ্যো-মাতৃত্বে কমনীয় দেহ, ভার্গবের জন্মদাত্রী, ভৃগু-গৃহের গৌরবে গরবিনী, পুলোমাই তাঁর ধর্ম-পত্নী। পুলোমাকে বুঝতে কোথায় যেন একটু ভুল থেকে গিয়েছিল, আজ সেই ভুল ঘুচে গেল। পুলোমাকে চেনা যেন এত দিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। ভৃগুর মনে হয়, এ পুলোমা অপহৃত হয়নি। অপহৃত হয়েছিল পুলোমার অপচ্ছায়া।

যেন হৃদয়ের সকল আগ্রহ নিয়ে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভৃগু ঋষি পুলোমার হাত ধরলেন।—হ্যাঁ, তুমিই আমার ধর্মপত্নী।

বৃদ্ধ হুতাশনের দৃষ্টি আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। কৃতার্থভাবে বলেন—আপনার শাস্ত্রসংগত সংসারে এই হৃদয়সংগত দৃশ্য দেখবার জন্যই বোধ হয় আপনার কুটীরে এতদিন ছিলাম ঋষি। আমার সে আশা সফল হলো। এখানে আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে, এবার আমিও যাই।

পুলোমাকে সঙ্গে নিয়ে ভৃগু ঋষিও চলে আসছিলেন, কিন্তু হুতাশনের কথা শুনে কি ভেবে নিয়ে একবার থামলেন। তারপর বলেন

—আপনি সংসারের সাক্ষী, সত্য কথা শুনিয়ে দেন, আপনার এ মহত্ত্ব স্বীকার করি হুতাশন। কিন্তু আপনিও একটা ভুল করেছেন। আপনি আমার গৃহের রক্ষক ছিলেন, গৃহের আলোক রূপে আপনাকে আমি স্থান দিয়েছিলাম; কিন্তু আপনি গৃহদাহকের কাজ করেছেন। আপনার এই ভুলের জ্বালা আপনার জীবনে লাগবেই। লোকে আপনাকে গৃহদাহকরূপে ভয় পাবে আর ঘৃণা করবে, সম্মান কখনো করবে না।

হুতাশন—আপনাকেও আমি অভিশাপ দিতে পারি ঋষি...........।

হুতাশনের হঠাৎ চোখে পড়ে, পুলোমা তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে। পুলোমার সুন্দর মূর্তির মধ্যে শুধু একজোড়া বেদনার্ত চোখের দৃষ্টি যেন নীরবে আবেদন করছে—আমার স্বামীকে অভিশাপ দেবেন না। যৌবনপ্রগল্ভা আনমনা প্রেমিকা নারী নয়, সারা জগতের সত্য-মিথ্যার পরীক্ষা পার হয়ে স্বামীর পাশেই চিরকালের ঠাঁই ক'রে নিতে চাইছে, সেই পরিণীতা নারীর আবেদন।

হুতাশন বলেন—কিন্তু আমি অভিশাপ দেব না ঋষি। আমি যাই।

পুলোমা এগিয়ে এসে হুতাশনকে প্রণাম করতে গিয়েই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে। একটা পাথর চাপা ঘটনার বেদনা যেন হঠাৎ বাধা ভেদ ক'রে চোখের জলের ঝরণার মত প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে।

হুতাশন বলেন—শেষ পর্যন্ত কাঁদতেই হ'লো পুলোমা। আমি জানতাম, একদিন তোমাকে কাঁদতে হবে। কেন, তাও জানি। জীবনে এইভাবে ভুলের প্রায়শ্চিত্তও সত্য।

এই চোখের জলের নাম বধূসরা। ভুল করেছিলেন ঋষি ভৃগু, ভুল করেছিল অনার্য পুলোমা। কিন্তু সব চেয়ে বেশী ভুল হয়েছে বোধ হয় ঋষিবধূ পুলোমার। সংসারে পুলোমার মত ভুল যাদের হবে, তাদের জীবনকে বোধ হয় এই চোখের জলের বধূসরা নদী হ'য়ে চিরকাল অনুসরণ ক'রে ফিরবে। ভৃগুকুটীরের আঙিনা পার হয়ে বাইরে এসে পথের ওপর দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবছিলেন হুতাশন।

বার বার মনে পড়ে ঋষিকুটীরে মিলনান্ত আনন্দের এই সুন্দর দৃশ্যের মধ্যেও পুলোমার জীবনে যেন একটা বেদনার দাগ রয়েই গেল। দূর বনোপান্তের নিভৃতে এক কুটীর হ'তে অনার্য তরুণের শেষ দীর্ঘশ্বাস গোপন দাহিকার মত পুলোমাকে যেন ক্ষণে ক্ষণে জড়িয়ে ধরছে। দুঃখ বোধ করেন হুতাশন, একটা জীবনকেই বোধ হয় তিনি পুড়িয়ে দিয়ে এসেছেন। ভৃগুর অভিশাপের জ্বালা যেন মনে মনে অনুভব করেন হুতাশন।

পরক্ষণেই মনে হয়, ঐ চোখের জলের ধারায় স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠছে পুলোমার জীবন। জীবন পুড়ছে না, ভুল পুড়ে যাচ্ছে। সংসারের সব পুলোমা এইভাবেই যেমন অনুতাপে পুড়ে শুদ্ধ হবে, তেমনি চোখের জলের ধারায় স্নিগ্ধ হ'য়ে সান্ত্বনাও পাবে। সত্য-সাক্ষী হুতাশনের মনে হয়, সত্য কথা ব'লে ভুল ধরিয়ে দিয়ে তিনি ভুল করেননি। অনুভব করেন, ভৃগুর অভিশাপের জ্বালা তাঁর গায়ে যেন আর লাগছে না, আর লাগবেও না।

বক্সা ক্যাম্প

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

ইঞ্জিন ঘরের সম্মুখে ছোটখাটো একটি ভীড়। কোন বস্তুকে কেন্দ্রে রাখিয়া ভীড়ের এই বেষ্টনী, দেখিবার জন্য দৃষ্টিটা উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল, কিন্তু ভীড়ের বহির্ভাগেই ধাক্কা খাইয়া দৃষ্টি প্রতিবারই প্রতিহত হইতেছিল।

একবার একটু ফাঁক পাইয়া গেলাম, দৃষ্টিটা সে-পথে সোজা কেন্দ্রে গিয়া শলাকার মত যে বস্তুটিতে বিদ্ধ হইল, তাহা একটি টুপি। ধূম হইতে অগ্নি অনুমানের ন্যায় টুপি হইতে আমাদের কমান্ডান্ট কোট্টাম সাহেবকে পাইয়া গেলাম।

তাঁহার সম্মুখে দেখিলাম, বিরাট দেহ লইয়া বিজয় (দত্ত) ও ভূপেনবাবু (দত্ত) দণ্ডায়মান, কোট্টামের মুখের সম্মুখে বিপজ্জনকভাবে হাত নাড়িয়া উত্তেজিতভাবে বাক্য বাণ বর্ষণ করিতেছেন। আর সকলেও যে চুপ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু এই দুই বক্তাই বিশেষভাবে কোট্টামকে লইয়া পড়িয়াছেন।

সাহেবের আরদালী কালো টুপি মাথায় অদূরে দাঁড়াইয়া নাটোর অগ্রগতি লক্ষ্য করিতেছে, সময় বুঝিলেই বাঁশী বাজাইয়া দিবে। তারপরের কাজটুকু যাহাদের উপর, তাহারাও অদূরে দুই ধারে পাহাড়ের উপর রাইফেল হাতে প্রস্তুত হইয়া আছে।

ভয় পাইয়া গেলাম। যে-ভাবে ইঁহারা কোট্টাম সাহেবের কৈফিয়ৎ তলব করিতেছেন, তাহা হাতাহাতিতে পরিণতি লাভ করিতে বেশী সময় লইবে বলিয়া মনে হইল না। তাহার পরে কি ঘটিতে পারে, তাহা আর অনুমান করিয়া দরকার নাই।

ভয় পাইবার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল—বিজয়। আমার এই বন্ধুর একটু পরিচয় দিলেই বুঝিবেন যে, ভয় হওয়াটা উচিত কি অনুচিত।

আপনারা জানেন যে, ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারেরা স্বভাবে একটু গুণ্ডা প্রকৃতির হইয়া থাকে। না হইয়াও উপায় নাই। মানুষের জ্যান্ত ও মরা দুই রকম শরীর কাটা-ছেঁড়া লইয়াই একের কারবার, তাই দেহে ও মনে দয়া মায়া ইত্যাদি দুর্বলতা এদের থাকেও না। আর, দ্বিতীয়টির কারবারও প্রায় ঐ একই গোছের। লোহা পোড়াইয়া হাতুড়ী পিটাইয়া গঠন দেওয়া, পাহাড় ফাটাইয়া পথ বাহির করা, বাঁধ বাঁধিয়া নদীকে নিয়ন্ত্রিত করা ইত্যাদি। অর্থাৎ বিশ্বকর্মার বিরাট হাতুড়ী ইহাদের হাতে, হাতুড়ীতে একদিক দিয়া ভাঙেও যেমন, গড়েও তেমন। এই ভাঙা-গড়ার কাজে ইহাদেরও দেহ ও মন হইতে দুর্বলতার ক্লেদটুকু মার্জিত হইয়া স্বভাবে একটি নির্মম কাঠিন্য সঞ্জাত হয়।

বিজয় ছিল ইঞ্জিনীয়ার। ছাত্র-জীবনে কলেজে শারীরিক শক্তির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "হিরো অব দি ডে"-এর লরেল কয়েকবারই সে পাইয়াছিল। শরীরে অসুরের শক্তি। শরীরটাও অসুরের। লোকে বিজয় দত্ত না বলিয়া বলিত বিজয় দৈত্য।

সালটা ঠিক মনে নাই, বোধহয় ১৯২৯ সালই হইবে। মাদারীপুরের যে সরকারী রাস্তাটা কোর্টের দিক হইতে থানার অভিমুখে গিয়াছে, বিজয় সেই রাস্তা ধরিয়া আগাইতেছিল; সময় তখন অপরাহ্ণ। বিপরীত দিক হইতে পুলিশ সুপার হলম্যান সাহেব ছ'ফুট তিন ইঞ্চি শরীর লইয়া আরদালী সহ লম্বা পায়ে আসিতেছিলেন।

বিজয় মনে করিল যে, সাহেব পাশ কাটাইয়া যাইবে, সাহেব মনে করিলেন যে, বাঙ্গালীবাবু পাশ কাটাইয়া যাইবেন। অর্থাৎ উভয়েই মিলিটারী। একের মনোভাব, নিজের দেশে নিজের সহরের রাস্তায় ঐ ব্যাটাকে পথ

ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ানো চলিতে পারে না। অপরের মনোভাব, রাজার জাতি, তদুপরি পুলিশের বড়কর্তা, সহরের রাস্তায় তাঁরই অধিকার এবং নেটিভকে পথ ছাড়িয়া দেওয়া, সে কি একটা কথা হইল! ফলে, বিপরীত দিক হইতে দুই দৈত্য একে অপরের মারাত্মকভাবে মুখোমুখী হইয়া পড়িল, পরমুহূর্তেই কলিশন।

মিঃ হলম্যান ধাঁ করিয়া এক ঘুঁষি মারিয়া বসিলেন। বিজয় প্রত্যুত্তরে দিল দুই ঘুঁষি, চোট সামলাইতে না পারিয়া সাহেব পুঙ্গব মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

আরদালী বাঁশী বাজাইয়া দিল, পাশেই ছিল পুলিশ ব্যারাক, লাঠিসোঁটা হাতে পুলিশের দল বাহির হইয়া আসিল। এদিক হইতে আসিল ক্লাবের ছেলেরা, তাদেরও হাতে লাঠি। সে এক হুলস্থুল কাণ্ড, ছোট্ট সহরের ডোবায় বিজয় যেন সমুদ্রের তুফান জাগাইয়া বসিয়াছে।

ব্যাপারটা অবশ্য ভালোয় ভালোয় শেষ হইয়াছিল। সাহেব বলিলেন, "তোমার বয়স কত?

বিজয় বলিল, ছাব্বিশ।"

"আমার সাতাশ। আমরা সমবয়সী। আমি ঘুষি মেরেছি, তুমিও মেরেছ, চুকেবুকে গেল। নেও This is a present for you," বলিয়া নিজের ছড়িটা বিজয়কে উপহার দিল।—এই সেই বিজয় দত্ত।

আর ভূপেনবাবু (দত্ত), তাঁহারও এই বিষয়ে সুনাম আছে। শুনিয়াছিলাম যে, সাহেব দেখিলেই নাকি তাঁহার মাথায় রক্ত চড়িয়া বসে, এবং তখন ইংরেজীতে যে বকুনী নির্গত হয়, তাহা প্রায় লাভা-স্রোতেরই সামিল। এই দুই দত্তের পাল্লায় কোট্রাম সাহেব নিপতিত হইয়াছেন। ইহার পরিণামটা যে নির্ঘাত রোমহর্ষক, তাহা দিব্য চোখে দেখিয়া ফেলিলাম।

রোগা পাতলা মানুষ আমি, ভীড়ের ফাঁকে অলিঘুঁজি গলিয়া একেবারে কেন্দ্রের অকুস্থানে উপস্থিত হইলাম। যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইব না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ কোট্রাম সাহেব বংশপত্রের মত কম্পিত হইতেছেন। সাহেবও ভয়ে কাঁপেন, ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছেন! অন্ততঃ আমি পারি নাই।

সাহেবের সার্টের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গুটানো, হাতে একটা ঝাড়ন, তাহাতে ও সাহেবের দুই হাতে কালির দাগ। বুঝিলাম, বিগড়ানো ইঞ্জিনটাকে মেরামত করিতে নিজেই হাত লাগাইয়াছেন। সেই ঝাড়ন হাতে আমাদের সাহেব কাঁপিতেছিলেন। ভূপেনবাবু যত প্রশ্ন করিতেছেন, তাহার উত্তরে তিনি শুধু তো-তোই করিতেছেন। ভয়ে জিভে জড়তা আসিয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য দর্শনে হৃদয়ে দয়া উপজিল।

বিজয়কে কহিলাম, "কি আরম্ভ করেছিস? যা, স্নান করতে যা।" বাক্যে ফল দিল, বন্ধু আমার স্থান ত্যাগ করিল।

যাইবার সময় সাহেবকে একটী সদুপদেশ দিয়া গেল, "ভদ্রলোকের মত ব্যবহার কর, নইলে অদৃষ্টে তোমার দুখ আছে।"

ভূপেনবাবু বয়স্ক ব্যক্তি, তদুপরি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহাকে কিছু বলা আমার পক্ষে শোভা পায় না। তাই কোট্রাম সাহেবকে লইয়াই পড়িলাম।

বলিলাম, "এস," বলিয়া হস্ত ধারণপূর্বক তাঁহাকে ভীড় হইতে বাহির করিয়া উভয়ে ইঞ্জিন ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। ইঞ্জিনের একটা লোহার ডান্ডার উপর নিতম্ব স্থাপনপূর্বক আমি হাফ-উপবিষ্ট হইলাম, মিঃ কোট্রাম সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

নিজের ইংরেজী বিদ্যায় যতটা কুলাইল, তাহাতে সাহেবকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিলাম। উপদেশগুলি খুব সারগর্ভ ও ভালো ছিল, কারণ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু তোমার নাম?"

বুঝিলাম ভস্মে ঘৃত ঢালিয়াছি। ব্যাটা এক কান দিয়া শুনিয়াছে, অন্য কান দিয়া তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে, অর্থাৎ উপদেশে কর্ণপাত করে নাই। এখন তাহার হৃদয়ে বোধহয় কৃতজ্ঞতার ঢেউ চলিতেছে, তাই রক্ষাকর্তার নাম জানাটাই হইয়াছে তাঁহার প্রথম কর্তব্য।

কহিলাম, "আমার নাম দিয়ে তোমার কোন কাম নাই। যা বলি শোন। ক্যাম্প চালাতে হলে এবুদ্ধি ও মেজাজ দুই তোমাকে ছাড়তে হবে। ক্যাম্পের যাঁরা ম্যানেজার তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে যদি চল, তবে কোন হাঙ্গামাই তোমাকে পোহাতে হবে না, নইলে প্রতি পায়ে তুমি বিপদে পড়বে।"

শুনিয়া কোট্রাম সাহেব বলিলেন যে, তিনি এই পরামর্শ মনে রাখিবেন। তারপর বলিলেন, "বাবু, তোমার নামটি বল।"

কি বিপদ, আমার নাম কি এমনই বস্তু যে, স্মৃতিতে কবচ করিয়া রাখিলেই সমস্ত মুশকিল আসান হইয়া যাইবে। যাক, এমন ধন্না দিয়া ধরিয়াছেই যখন, দেই না কেন নামটা ফাঁস করিয়া। নামটা আমার জিহ্বা হইতে সাহেবের কর্ণে চালান করিয়া দিলাম।

মিঃ কোট্রাম যে অত্যন্ত নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ, এই প্রথম পরিচয়েই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দুদিন না যাইতেই তিনি ক্যাম্পে একটা হৈ-হৈ তুলিয়া দিলেন।

এতদিন আমাদের রোলকলের তেমন কোন হাঙ্গামা ছিল না। ফিনী সাহেবের আমলে মিঃ লিউলিন আই সি এস ছিলেন এডিসন্যাল কমাণ্ডাণ্ট, একটা খাতা বগলে তিনি সারা ক্যাম্পে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম মিলাইয়া দাগ দিয়া যাইতেন। এই জন্য কখনও রান্নাঘরে, কখনও স্নানের ঘরে, এমনকি, পায়খানার মহল পর্যন্ত তাঁহাকে ধাওয়া করিতে হইত। অর্থাৎ রোলকলের নির্দিষ্ট একটা সময় থাকিলেও আমরা সেই নির্দিষ্ট সময়ে স্ব স্ব স্থানে থাকিতে অভ্যস্ত ছিলাম না।

কোট্রাম সাহেবের এই অবস্থা মোটেই মনঃপূত বোধ হইল না, তিনি একদিন ব্যবস্থা দিলেন যে, ভোর আট ঘটিকার সময় প্রত্যহ সকলকে ক্যাম্পের বাহিরে খেলার মাঠে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, তখন রোলকল বা নাম-ডাকা হইবে। হুকুম শুনিয়া, আসলে পাঠ করিয়া আমরা ভাবিলাম, ব্যাটা বলে কি!

তিন পার্টির তিন সভা বসিয়া গেল, বিবেচনার বিষয় হইল—কিং কর্তব্যং। আমাদের পার্টির সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন মাস্টার মশায় (যতীশ ঘোষ)। সভায় বয়স্কেরা মন্তব্য করিলেন যে, আমরা এতকাল সুযোগের অপব্যবহার করিয়াছি, লিউলিন ভালো মানুষ বলিয়া রোলকলের সময়টা সীটে না থাকিয়া যদৃচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তাই আজ এই সমস্যা।

কে একজন বলিলেন, "তাতো বুঝলাম, এখন কি করবেন, তাই বলুন।"

কি করা যায়, কাঁচা পাকা সব মাথাতেই এই প্রশ্নটার নাড়াচাড়া চলিতেছিল। স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করায় সকলেই সাময়িকভাবে চুপ করিয়া গেলেন। কোট্রাম সাহেব যে অত্যন্ত গোঁয়ার মানুষ, ঢাকার লোকেরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই রিপোর্ট সভায় পূর্বেই পেশ করিয়াছিলেন। সর্বোপরি হিজলী বন্দিনিবাসে গুলীবর্ষণের কথাটা তখনও আমাদের স্মৃতি হইতে লোপ পায় নাই।

এক প্রবীণ ব্যক্তি পরামর্শ দিলেন, "সাহেবের সঙ্গে একটা আপোষের চেষ্টা করা যাক।"

একজন প্রশ্ন করিলেন, "সাহেব শুনবে কেন?"

যতদূর মনে পড়ে এই সময়ে খাঁ সাহেব প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, "কি সর্তে আপনারা আপোষ করতে পারেন?"

আপোষের প্রস্তাব যিনি তুলিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "রোলকলের সময়টা আমরা যে-যার সীটে থাকব।"

খাঁ সাহেব বলিলেন, "তা নয় রাজী হওয়া গেল, কিন্তু কাল ভোর থেকেই যে মাঠে যাবার অর্ডার দিয়ে বসেছে। আপোষের কথা শুনবে বলে তো মনে হয় না।"

আমরা ভাবিত হইয়া পড়িলাম, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গিয়াছে! সভার আলোচনা হইতে এইটুকু বুঝা গেল যে, ইহা যে আমাদের কৃতকর্মের ফল, সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

সভাপতি মাস্টার মশায় এক সময়ে

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল?"

এতক্ষণ চুপ করিয়া বুদ্ধিমানের মত সভার শোভাবর্ধন করিতেছিলাম, কিন্তু মাস্টার মহাশয় ধরাইয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ ভাষণের বিপদে তিনি আমাকে ফেলিলেন।

বলিলাম, "কোট্রামকে সোজা জানিয়ে দিন যে, তাঁর এ-প্রস্তাব মানতে আমরা অক্ষম।"

নাম বলিব না, এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একেবারে মারমুখী হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এর পরিণাম কি হবে, ভেবে দেখেছেন?"

কহিলাম, "সাধ্যমত দেখেছি।"

ধমকের সুরে বক্তা প্রশ্ন করিলেন, "কি দেখেছেন?"

"দেখেছি যে, এর পরে রোলকলের সময় আমাদের সীটে থাকতে হবে।"

বক্তা যেন আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় পাইয়াছেন, এমনই মনোভাবে প্রশ্ন করিলেন, "জানেন, এ-প্রস্তাব দু নম্বর কিচেন থেকে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল, তৎসত্ত্বেও কোট্রাম এই অর্ডার দিয়েছে।"

কহিলাম, "জানি।"

"তবে কেমন করে বলেন যে, সীটে থাকতে আমরা রাজী হলেই কোট্রাম রাজী হবে।"

এই প্রশ্নেরও উত্তর দিলাম, "কোট্রাম যাতে রাজী হয়, সেজন্যই তো জানাতে বলেছি যে, তার অর্ডার মানতে আমরা অক্ষম।"

ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে অনেক কিছু বলিলেন, তার নির্গলিতার্থ যে, আমি অপরিণামদর্শী, ক্যাম্পকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছি। কিন্তু আমার বক্তব্য শ্রবণের পর সভার অধিকাংশই সাব্যস্ত করিলেন যে, আমার প্রস্তাবিত পন্থাই আপোষে পেঁছিবার সহজ রাস্তা। আপোষের কথাটা কোট্রামের দিক হইতে না-আসা পর্যন্ত আপোষের যখন সম্ভাবনা নাই, তখন ব্যাটাকে অপোষের পথে নামাইতে হইলে নিজেদের ঠিক বিপরীত পথে আক্রমণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সাব্যস্ত হইল যে, এ হুকুম আমরা মানি না।

যাহা ভাবা গিয়াছিল, তাহাই হইল, কিছু টানা-হ্যাঁচড়ার পর কোট্রাম সাহেব আপোষে আসিতে বাধ্য হইলেন। ঠিক হইল যে, রোল কলের পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমরা সীটে থাকিব।

কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেও কোট্রাম সাহেব দু'দিনের মধ্যেই খুঁত বাহির করিলেন। রোল কলের সময়ে তাঁহাকে দেখিয়াও বিজয় দত্ত উঠিয়া বসে নাই, টান হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়াছিল, এই অপরাধে এক সপ্তাহ তার চিঠি পাওয়া ও দেওয়া বন্ধ হইল। আরও কয়েক-জনের ক্ষেত্রেও এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিলেন।

ব্যাপার এখানেই শেষ হইল না। ঢাকায় কোট্রাম সাহেব স্বদেশী পরিবারগুলির উপর যে নির্যাতন করিয়াছেন, সে-জ্বালা অনেকেরই মনে ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হইল ক্যাম্পের এই বিরক্তিজনক ও অপমানকর ব্যবহার। ক্যাম্পের বাতাসে একটা সম্ভাবনা ঘুরাফিরা করিতে লাগিল যে, হয়তো কিছু একটা শীঘ্রই ঘটিবে।

কিছুটা ঘটিয়াও গেল। একদিন দুপুরে-বেলা খবর আসিল যে, অফিসে ধীরেনবাবু (মুখার্জী) কোট্রামকে জুতা ছুড়িয়া মারিয়াছেন এবং তাঁহাকে সেলে আবদ্ধ করা হইয়াছে। পরদিন শোনা গেল যে, পূর্ণানন্দবাবুও (দাশগুপ্ত) পূর্বদিনের ন্যায় অফিসে কোট্রামকে জুতা মারিয়াছেন এবং তিনিও সেলে আবদ্ধ হইয়াছেন।

পূর্ণানন্দবাবু অনুশীলন পার্টির লোক, তেজস্বী ব্যক্তি, তাঁহারই নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটে। কাজেই অনুশীলন পার্টির এই কাজটিকে সমর্থন করা কোন কোন মহলে স্বভাবতঃই সম্ভব হয় নাই, এমন কি নিন্দাই শোনা গেল। নিরপেক্ষ মহল হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মন্তব্য করিলেন যে, কাজটা ভালো হয় নাই।

ক্যাম্পে জনমত গঠনের এই চেষ্টাটা আমার ভালো লাগিল না। বন্ধুবর পঞ্চাননবাবু এবং আমিও প্রকাশ্যে এই কাজ সমর্থন করিয়া বলিলাম যে, ব্যাটার প্রাণ যাওয়াই উচিত ছিল, জুতার উপর দিয়া গিয়াছে, ইহা কোট্রামের ভাগ্যই বলিতে হইবে।

জলপাইগুড়ি কোর্টে পূর্ণানন্দবাবু ও ধীরেনবাবুর বিচার হইল, বিচারে উভয়ের ছয় মাস জেল হইল। কোট্রাম সাহেবকে জুতা মারার অপরাধে তাঁহারা ডেটিনিউ-স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া কয়েদীর ভূতলে পতিত হইলেন, জলপাইগুড়ি হইতে কলিকাতার জেলে তাঁহারা চালান হইয়া গেলেন।

কোট্রাম সাহেব ইহার পরে যেন কতকটা শান্ত হইলেন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু স্বভাব যাইবে কোথায়? কোট্রাম সাহেবের স্বভাবদোষে ও বুদ্ধির ত্রুটিতে তিনি কিছুকাল পরেই বক্সা ক্যাম্পে ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ও সেই সঙ্গে শ'খানেক বন্দীরও জীবন যে সেদিন শেষ হয় নাই, সেটা নেহাৎ দৈবের দয়া। আমরা বক্সা ত্যাগ করার পরেই ঘটনাটি ঘটে।

সুরপতি চক্রবর্তীর নাম আপনাদের স্মরণ আছে কিনা জানি না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে এবং জানিলে জীবনে কেহ ভুলিতে পারিবেন না। দীর্ঘকায়, রোগা মানুষ; সারা মুখে খাড়ার মত একটা নাক ঝুলিয়া আছে, আর আছে দুইটি চোখ, যাহা শিশুর চোখের মত পরিষ্কার। আসল খবরটাই বলা হয় নাই, রংটি ব্রাহ্মণের কিন্তু আবলুস কালো। ডেটি-নিউদের মধ্যে যদি প্রতিভাবান ও মেধাবী বলিয়া কাহাকেও গ্রহণ করিতে হয়, তবে এই সুরপতিবাবু। এম এস-সি পরীক্ষার আগে ধরা পড়েন। ফরাসী ভাষাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। পরিচয় আরও একটু বাকী আছে। পুলিশের হাত এড়াইবার জন্য রেল স্টেশনে চায়ের দোকানে চাকর হইয়াছেন, কলিকাতাতে কোন এক গৃহস্থ বাড়িতেও কিছুদিন বাসন-মাজা চাকরের চাকুরী করিয়াছেন। চেহারাটা এই দিক দিয়া তাঁহার কাজে লাগিয়াছিল।

কয়েকদিন যাবৎ রোল কলের সময় সুরপতিবাবুকে পাওয়া যাইতেছিল না। অফিসররা অবশ্য অন্য সময়ে দেখিতে পাইতেন যে, তিনি ক্যাম্পেই আছেন। চতুর্থ দিনে কোট্রাম চিঠি দিয়া তাঁহাকে অফিসে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সুরপতিবাবু এই নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু তিনি একটি ভুলও এই সঙ্গে করিয়া ফেলিলেন। বিকালে গেট খুলিলে তিনি আর সকলের সঙ্গে খেলার মাঠে গিয়া হাজির হইলেন।

খেলার মাঠটির উত্তরেই উঁচু স্থানে কম্যাণ্ডান্টের বাংলো। আরদালী সহ কোট্রাম সাহেব বাংলো হইতে বাহির হইয়া উত্তরের গেট দিয়া মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অফিসে যাইবার ইহাই একমাত্র পথ। মাঠের মধ্যভাগে আসিতেই সুরপতিবাবুকে দেখিতে পাইলেন। আগাইয়া গিয়া সুরপতিবাবুর হাত ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "you are under arrest." অর্থাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল।

কোট্রাম সাহেবের স্থান ও সময় নির্বাচনে অত্যন্ত ভুল হইয়াছিল। বন্দীরা খেলা ফেলিয়া সাহেবকে বেষ্টন করিয়া লইল, এক ঝটকায় সুরপতিবাবুকে ছাড়াইয়া লইল এবং কোট্রাম সাহেবের হস্ত চাপিয়া ধরিল।

বাংলো হইতে মেম সাহেব বাহির হইয়া আসিয়া ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। আর এদিকে দক্ষিণে হাত তিশ চল্লিশ উপরে ক্যাম্পের সীমানায় রাইফেল হাতে সিপাহীরা স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। হাবিলদার অর্ডার দিল, "বন্দুকে গুলী ভর"। পঁচিশটি রাইফেলে গুলী ভরা হইয়া গেল। পরে অর্ডার দিবে—"ফায়ার।"

ঠিক এই সময়েই এডিসন্যাল কম্যাণ্ডাণ্ট ক্যাডম্যান আই-সি-এস-এর উচ্চ চীৎকার শোনা গেল—"stop." দৌড়াইয়া আসিয়া সাহেব সিপাহীদের উদ্যত বন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

সুরপতিবাবুকে লইয়া কয়েক বন্ধু ইতি-মধ্যেই পাহাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া ক্যাম্পে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। তখন বন্দীরা কোট্রামকে কহিলেন, "তুমি এখন যেতে পার।"

ছাড়া পাইয়া কোট্রাম সাহেব আবার রাস্তা ধরিয়া অফিসের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন পর্যন্ত পা তাঁহার ঠিকমত পড়িতেছিল না, ক্যাডম্যান দৌড়াইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া কোট্রামের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

মেম সাহেবও বাংলোতে গিয়া ঢুকিলেন।

(ক্রমশ)

গোধূলির দিল্লী

পরিমল দত্ত

আহমদ আলির "দিল্লীতে গোধূলি" নামে একখানি ইংরেজি উপন্যাস আছে। উপন্যাস হিসাবে সেখানি তেমন অনবদ্য নয়। তবে রোমান্টিকতা ও বিগতদিনের দিল্লীর নানা স্মৃতির টুকরো, কবি ও শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের লেখা বিষণ্ণ বয়েৎ আর তাঁর শোকাবহ পরিণতি, আঠারশ সাতান্নের বিদ্রোহের কালো ছবি, রাজসভার মুশায়েরার ঝোঁক আর গালেবের কবির লড়াই, পায়রা-ওড়ানো বোশেখ-জষ্ঠির নিদারুণ গর্মি, লু-আঁধি এবং তৃষিত দিনের শেষে প্রথম নতুন বর্ষা, মুসলমানী দিল্লীর সামাজিক রীতিরেখাব ও উৎসব মকবেরা, স্মৃতিস্তম্ভ মসজিদ, মিনার আর কবরগাহ—কবরের স্মৃতি আর স্মৃতির কবর—এর ধূসর ভূমিকায় বিছানো দিল্লীর গোধূলির মায়াময় হাতছানি শূন্য মুহূর্তে আমাকে প্রায়ই উন্মনা করে তোলে। যারা দিল্লী ভালবাসেন বা দিল্লীর রোমান্টিক ভালবাসায় পড়তে চান, ঐ উপন্যাসখানি পড়তে অনুরোধ করি। দিল্লীতে অনেকদিন না থাকলে রকমারি মসজিদ আর মিনারের উপর থেকে গ্রীষ্মে-বর্ষায়, শীতে-বসন্তে দিল্লীকে না দেখলে, দিল্লীর মন পাওয়া মুশকিল। এ ব্যাপারে আমি নিজে বিশেষ উৎসাহী বা উৎসুক নই। হৃদয় জয় সে নারীরই হ'ক বা নগরীর তা একটি হৃদয়ই যথেষ্ট। কোনো ঘুঘু জিগ্‌গো কবি বলেছেন একটির বেশী মেয়ের সঙ্গে জানাশোনা নিবিড় হ'লে, কোনো মেয়েকে নিয়ে ঘর বেঁধে সুখী হওয়া মুশকিল। নগরী সম্পর্কেও ঐ কথা। সচ্চরিত্র আধাবয়সী বিবাহিত ভদ্রলোক, স্ত্রীর শ্যেন দৃষ্টির প্রহরার ছায়ায় সুন্দরী যুবতী যেমন দেখেও দেখেন না কিম্বা হঠাৎ দেখে ফেললে চোখ ফিরিয়ে নেন,—দিল্লী দেখা আমার অমনি চোখ ফেরানো। আমার মন অন্যত্র বাঁধা। তার উপর আমি প্রান্তীয়, বাঙালী এবং পুরবীয়া। পরবর্তী মুঘলদের আমলে, বিশেষ করে সম্রাট ফিরুক শাহের রাজত্বকালে—দিল্লী পুরবীয়াদের ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখেনি আর আজো বোধহয় দেখে না। আরবী ও ফার্সি উৎকীর্ণলিপি পড়তে না পারার দরুণ, এ বিশ্বাস আমার আরো বদ্ধমূল হয়েছে যে, ভারতীয় হয়েও যেন বিদেশী দিল্লীর আমি কেউ নই। না আমি জাতিস্মর, না জন্মান্তর বিশ্বাসী, তবুও কেমন মনে হয়, জন্মান্তরে কোথাও যদি জন্মে থাকি, তা বোধহয় বাঙলাদেশেই, এ অঞ্চলে নয়। পুরীর নরেন্দ্র সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী ম'শায়ের মনে হয়েছিল তিনি যেন সেই পুকুরের ধারে গতজন্মে বাস করতেন। পুরোনো সারনাথে এক সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে গিয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কেমন এক অদ্ভুত সংজ্ঞা intuition জেগেছিল, তিনি কোনো জন্মে ওখানে থাকতেন আর তাঁর পেশা ছিল পুতুলগড়া। আমার মনের গতি ঠিক উল্টো, যেখানে থাকি বিগত জন্ম ত' দূরের কথা ইহ জন্মেই সেখানে মন থাকে না।

দিল্লীতে আমি যে অঞ্চলে থাকি তার সদর রাস্তার অপরপারের জঙ্গলে শাহী আমলের এক বাড়ি, নাম হ'ল বিস্তাদরী ইমারত। কেবল জঙ্গলের মধ্যে নির্জনতা উপভোগ করার জন্য সময়ে সময়ে, আমি ওখানে বেড়াতে যাই। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে সেখানে এক কাঠের ফলক লটকানো আছে, তাতে বলা হয়েছে সেটা হ'ল ফিরোজ শাহ তুঘলগের শিকারমঞ্চ বা hunting box, তাঁর সময় হ'ল চতুর্দশ শতক, তিনি চসার আর চণ্ডীদাসের সমসাময়িক। গরমের দিনে শিরীষ ও নিম-ফুলের গন্ধেভরা ভোরবেলায় অনেকবার একলা একলা ওখানে বেড়াতে গেছি, ফিরোজ শাহের জন্মমৃত্যুর সনওয়ালা ফলক দেখে যাঁদের বেশী করে মনে পড়ে তিনি ফিরোজ শাহ নন, চসার ও চণ্ডীদাস—চসারের ইংল্যাণ্ড আর চণ্ডীদাসের বাঙলা। চণ্ডীদাস সম্ভবত সম্রাট ফিরোজ শাহের নাম শুনে থাকবেন, কিন্তু কবির বাণী ও অস্তিত্ব সম্রাটের নিকট নিশ্চয়ই অজানা ছিল, তিনি কি জানতেনঃ

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য,
তাহার উপর নাই।

একমাত্র রোম বাদ দিলে, দিল্লীর মতোন পুরোনো স্মৃতি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক নগরী পৃথিবীতে আর দুটি নেই। দিল্লীর ঐতিহাসিক জাদু কেবল শিক্ষিত রুচিবাগীশ কল্পনাপ্রবণ ভদ্রলোকদের জন্য। নাপিত হরদুয়ারী রোজ সকালে আমার দাড়ি কামাতে আসে আর তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে আমার দিনের শুরু। সে যেমন ফাঁকিবাজ, তেমনি গপ্পে লোক, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ব্যাপারে তার বেজায় উৎসাহ। খবর কাগজের কথা উঠলেই, সে দাড়ি কামানো বন্ধ রেখে উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনে—আর দৈনন্দিন কাগজের রাজনীতিক কার্টুনের মানে রোজ বুঝিয়ে নেওয়া তার চাই-ই। এক কথায় সে আঠারো' আনা সাম্প্রদায়িক। সেদিন আমার টেবিলে অ্যালবামেতে কুতুবমিনারের ফোটোগ্রাফ দেখে বললেঃ "আমরা একে কুতুবমিনার বলি না—বলি মেহেরোলীকা লাট (মেহেরোলীর স্তম্ভ) —আর আপনি নিশ্চয় জানেন এটা বানিয়েছিলেন পৃথিবিরাজ চৌহান, আর পরে গোলাম বাদশা কুতুবউদ্দীন তা আত্মসাৎ করেন। কেবল সে নয়, অনেক শিক্ষিত লোক চাই কি পণ্ডিতদের মধ্যেও এইজাতীয় পক্ষপাত আর উগ্র হিন্দুত্ব আছে। কোনো কোনো পাঞ্জাবী বন্ধুর মুখে শুনেছি দিল্লীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর্টের নমুনা নাকি বিড়লা মন্দির! সুন্দরকে সুন্দর বলার মধ্যে বিচারবুদ্ধি যদি সাম্প্রদায়িক হয়—তবে সৌন্দর্য যাচাইয়ের প্রহসন না করাই ভাল।

দিল্লীর মুনিসিপ্যালিটির শেষ বিদায়ী সভায় লর্ড ওয়াভেল বলেছেন, সব ঠিক থাকলে ঘুমভাঙা এশিয়ার প্রভাতী রাষ্ট্রসভায় দিল্লী আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে। সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। দিল্লীর ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে গোধূলি যেমন মানায় তেমন আর কিছুই নয়। কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, ভাঙাগড়া বারে বারে দিল্লীতে হয়েছে তার ঠিকানা নেই। এখানকার প্রবাদ বলে, নয়ে দেহলী, সাত বাদলী, কিলা বনে উজীরাবাদ! মধ্য যুগের ভারতীয় ইতিহাস পড়তে গেলে হাঁফ ধরে যায়, মনে করি এইখানে শেষ, কোথায় বা এর শেষ! ফেরিস্তার রক্তাক্ত অভিযানের নিখুঁৎ বর্ণনা, নখদন্তে রক্তিম রাজকীয় জয়পরাজয়ের কাহিনী, রাজা-রাজড়া বেগম বাদশা, আমীরওমরা রূপোজীবিনী, হীরামাণিক্যের তলায় হিন্দুস্থানের সাধারণ মানুষ চাপাপড়ে মারা গেছে। তার সুখদুঃখের কাহিনী, আশা আকাঙ্ক্ষার গল্প তার বিদ্রোহের ইতিকথা কি ইতিহাস কোনোদিন বলবে না? দিল্লীকে কেন্দ্র করে প্রাচীন হিন্দুস্থানের কাহিনী বিশেষ করে মুলসূত্রটির অভিব্যক্তি, হাতের কাছে খুঁজে না পাওয়ার দরুণ মনে মনে বড়ই নিরাশ হতে হয়। আর এই কারণে দিল্লীর এই রাজকীয় তামাসা প্রাক্‌-শেকস্‌পিরীয় যুগের কীডের মেলোড্রামাকেও ছাড়িয়ে যায়। ভারতীয়ের কাছে, বিশেষ করে হিন্দুদের কাছে ইতিহাস কোনোদিন শ্রদ্ধা পায়নি; কাজেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বা বিচারবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা আমাদের রক্তে নেই।

রবীন্দ্রনাথের লেখা রাজসিংহের সমালোচনা পড়তে পড়তে যে সমগ্র ছবি আমার মনে আসে তা একটি রৌদ্রখচিত, আরামপ্রদ বাদশাহী ঐশ্বর্যমণ্ডিত শীতকালের দুপুরবেলার ছবি। লরেন্স বিনিয়নের ফতেপুর-সিক্রিতে আকবরের

রাজসভায় বর্ণনা, সকাল গড়িয়ে হঠাৎ ভরা-দুপুরে এসে থেমে যাওয়ার মতো তাতে যেন দুঃসহ পীনবক্ষ যৌবনের ভাব আছে। সে ছবি একমাত্র সিনেমার আঁকিয়েরা আঁকতে সক্ষম—সেই আলো, সেই রঙ, সেই অপার্থিব বলিষ্ঠতা। দিল্লীর সমৃদ্ধি আর গৌরবময় যুগের সঙ্গে ভরা যৌবনের অচঞ্চল সৌন্দর্যালোক চিরন্তন দুপুর বেলার দিবাস্বপ্ন মনে আসা স্বাভাবিক, কিন্তু দিল্লীর ইতিহাসের অলিগলি আর দিল্লীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটলে রাজধানী দিল্লী সম্পর্কে যে প্রতিমা (image) মনে আসে, তা দুপুর নয়, বিকেলও নয়, একেবারে গোধূলি। ঐতিহাসিক স্মৃতির পরাগ আঁকা দিল্লীর নিভৃত প্রাণের সুর হ'ল বিষণ্ণ পূরবী। আমার একথা অনেকের মনঃপূত হবে না জানি, চাইকি অবান্তরও ঠেকবে—জানি আমার নাপিত হরদুয়ারী, গুজর নওয়োয়ান যারা দিল্লীর আশেপাশে গোরু চরায়, ইমারত মিস্ত্রির সহায়ক বাঘেড়ী কুলিকামিন, পুরানো আমলের এনট্রেন্স পর্যন্ত পড়া (এনটেরেনচো কী মুখের কথা, পেটের বুদ্ধি বের করে সাহেবের সামনে নিখতে হয়!) কেরানী থেকে প্রমোশন পাওয়া অফিসার কুলতিলক, এ'রা—ও'রা আরো অনেকের কাছে অনর্থক প্রলাপ বলে মনে হবে।

মকবেরা-ই-হুমায়ুং, হৌসখাশ, পুরানা কিলা, শেরশাহী মসজিদ, ফিরোজ শা কোটলা, নিজাম উদ্দীন ছুটির দিনে একা একা বহুবার ঘুরে দেখেছি। পুরানো ক্লাসিক্স, স্কচ হুইস্কী ও নারীদেহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে মন ভরে ওঠা দূরে থাকুক বরং বিমর্ষ হয়ে মনে মনে ভাবিঃ ওমা এই, এরই এত নামডাক! পুরানো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সৌধাবলী সম্পর্কেও সেই কথা, প্রথম সাক্ষাতে কেউ কোনোদিন খুশি ও পরিতৃপ্ত হয় না। আস্বাদনের মতো রসাস্বাদনও আবৃত্তি-সাপেক্ষ, তাও অর্জন করতে হয়।

মকবেরা-ই-হুমায়ুনের সিংহদেউড়িতে যে শুভ্রকেশ ও শ্মশ্রুবহুল বর্ষীয়ান বৃদ্ধ দিল্লীর ছবি ও উর্দু ফার্সি কবিতার বই বিক্রী করে, তার সঙ্গে অবন্তীর নগর চত্বরে উদয়নের গল্প-বলা সেই বৃদ্ধের কোথাও মিল আছে। অনেক-দিন আপিস পালিয়ে, ছুটির দিনে ব্রিজের আড্ডার মায়া কাটিয়ে, বহুদিন এই অশীতিপর বৃদ্ধের পদপ্রান্তে এসে বসেছি। কবি আমীর খসরুর গল্প আর সরস এপিগ্রাম, বিশেষ করে পরবর্তী মুঘলদের কাহিনী, জান্দা শাহ ও তাঁর প্রাকৃত প্রণয়িনী লালকুনার সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের পরাজয়, সুন্দরী বেগম জিন্নৎমহল, মিউটিনি আর ফিরিঙ্গির গল্প—তার মুখে যেমন অপূর্ব শোনায়, তেমন আর কারুর নয়। দিল্লী সম্পর্কে সে জীবন্ত বিশ্বকোষ। বৃদ্ধকে খুশি করার জন্য, সমবেত উর্দু ও ফার্সি কবির কাব্য সংগ্রহ কিনেছি, কবে তার পাতা উল্টে অর্থ ও শব্দের ঝংকার উদ্ধার করব জানি না—বিশ্বাস আছে আমার গলায় তা একদিন গান হয়ে উঠবে।

নীল চিনেমাটির পুরানো বাসন, পারস্যের রঙিন গালচে, সতরো শতকের মধুর পরিপক্ক ইংরেজি কবিতা, গুলমার্গের বরফগলা সবুজ বসন্ত, প্রথম বিরহ যদি কখনো উপলব্ধি করে থাকেন তবেই বুঝবেন দিল্লীর অস্ত-সূর্যের ম্লানায়মান বিষণ্ণ আলো আর গোধূলির মায়া।

ব্যাধির পরাজয়

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্লেগ পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক মৃত্যু ঘটিয়েছে। ১৮৯৬ সালে ভারতবর্ষে প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। একটা হিসেবে জানা যায় যে ১৮৯৮ সালের মধ্যে শুধু ভারত-বর্ষে এক কোটি লোক প্লেগে মারা যায়। পাস্তুরের একজন শিষ্য ও জাপানের একজন বিজ্ঞানী প্লেগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। দেখা গেল এই জীবাণুর বাহক হল ইঁদুরের গায়ের পোকা। এই পোকা যখন প্লেগ রুগীকে কামড়ে ইঁদুরকে কামড়ায় ইঁদুরের প্লেগ হয় ইঁদুর মারা যায়। ইঁদুরের গায়ের পোকাটা যখন ইঁদুরের গা থেকে গিয়ে মানুষকে কামড়ায় মানুষের প্লেগ হয়। তাহলে মাঝে রইল ইঁদুর আর ইঁদুরের গায়ের পোকা। এই পোকা নির্মূল করতে পারলে ইঁদুর ও বাঁচে মানুষও বাঁচে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। বাকি রইল ইঁদুর। এরা ভারি চালাক জাত, সহজে ধরা দেয় না, আর এদের বংশবৃদ্ধিও খুব বেশি। যতটা পারা যায় এদের বধ করতে হবে।

হ্যাফকিন্স ছিলেন রাশিয়ার অধিবাসী। তিনি পাস্তুরের ছাত্র হন, তারপর ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরি নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৯৬ সালে তিনি প্লেগের টিকা আবিষ্কার করেন।

প্লেগ আবার কলকাতায় উঁকিঝুঁকি মারছে। একে আটকাতে হলে আমাদের টিকা নিয়ে থাকতে হবে আর ইঁদুরকে ধ্বংস করতে হবে। ইঁদুরের পোকা মারতে ডি, ডি টি বেশ কাজ করে। পোকারা বেশি উপরে লাফিয়ে ওঠতে পারে না, সাধারণত পায়ে কামড়ায়। সেজন্য মোজা পরে থাকা ভাল।

জীবাণুর আকৃতি

একজন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর অনুচরদের ডেকে বলেছিলেন, নিজেদের চেয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্যকে ভাল করে চিনে রেখো, যুদ্ধজয়ের অর্ধেক সেখানেই। যে চিকিৎসক ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে চলেছেন, তাঁকে এই কথাটা ভাল করে মনে রাখতে হবে। মানুষের সকল শত্রুর মধ্যে বড় শত্রু হল, ওই সব জীবাণু, তারা চোখের আড়ালে থাকে, অনেক তোড়জোড় করে তাদের খুঁজে বের করতে হয়, তাদের রীতিনীতির পরিচয় পেতে হয়, তাদের ধ্বংসের উপায় ঠিক করতে হয়। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সব জীবাণুই যে মানুষের শত্রু তা নয়, মিত্র জীবাণুও আছে। দুধকে দই করে এক রকমের মিত্র জীবাণু।

বিজ্ঞানী বিভিন্ন জীবাণুর সন্ধানে চললেন। প্রতিপদে নতুন নতুন বাধা আসতে থাকল, আর বিজ্ঞানী সেগুলি কাটিয়ে কাটিয়ে এগোতে থাকলেন। জীবাণুদের কোন রং নেই, সেজন্য অণুবীক্ষণে তাদের টের পাওয়া কঠিন। দেখা গেল, এক-এক শ্রেণীর জীবাণু এক-এক রং পছন্দ করে। যে যা রং ভালবাসে, তাই দিয়ে তাকে রঙিয়ে দেওয়া হল। অবশ্য কতক শ্রেণীর জীবাণু একেবারে কোন রংই নিতে চায় না। তাদের উপর জবরদস্তি চালাতে হল। দেখা গেল, আস্তে আস্তে গরম করলে তারাও নির্দিষ্ট রকমের রং নেয়।

জীবাণুরা আকারে কত বড়? মাপজোখ হল। কিন্তু খালি চোখে যাদের দেখা যায় না, ইঞ্চি সেণ্টিমিটার দিয়ে তো তাদের মাপ চলে না। এক নতুন মাপকাঠি ঠিক করা হল। এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগকে একক ধরা হোল, তার নাম দেওয়া হল মাইক্রন। দেখা গেল, একটি সাধারণ জীবাণুর ব্যাস এক, দুই, তিন বা তার কিছু বেশি মাইক্রন, কারও কারও ব্যাস একেরও কম। অন্য দিকে একশ' বা তার বেশি মাইক্রন ব্যাসের জীবাণুও দেখা গেল।
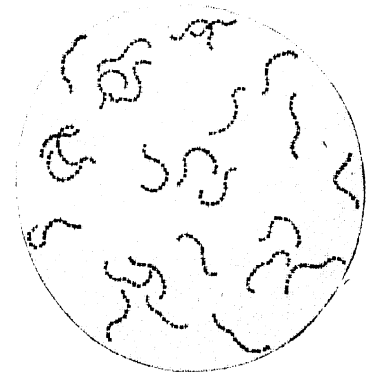
জীবাণুদের আকৃতিও বিভিন্ন। মোটা-মুটি তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর জীবাণুর আকৃতি গোল। বেশির ভাগ জীবাণু এই শ্রেণীতে পড়ে। এরা আবার ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থান করে। কেউ কেউ একা একা থাকে। এদের শুধু ককাই বলা হয়। নিউমোনিয়া মেনিনজাইটিস প্রভৃতি রোগের

জাপানের চিকিৎসকেরা প্লেগ জীবাণুর অনুসন্ধানে রত

স্ট্রেপ্টোককাই জীবাণু

জীবাণু সব সময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এদের বলা হয়, ডিপ্লো ককাই। আবার আঙুরের থোলোর মতো দল বেঁধে কতকগুলি থাকে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে স্ট্যাফিল ককাই। মুক্তামালার মুক্তার মতো কারও কারও অবস্থিতি, এদের নাম স্ট্রেপ্টো ককাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবাণুর মতো শরু শরু কাঠির মতো। টাইফয়েড, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি

অণুবীক্ষণ সাহায্যে মানবের কয়েকটি অদৃশ্য শত্রুর আকৃতি দেখানো গেল। (১) কলেরা জীবাণু, (২) যক্ষ্মা জীবাণু, (৩) টাইফয়েড জীবাণু, (৪) ধনুষ্টংকার জীবাণু

রোগের জীবাণুগুলি এই রকমের। এরা দল বেঁধে থাকে। এদের ব্যাসিলি বলা হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর জীবাণুরা পেঁচালো ধরণের স্ক্রুপের প্যাঁচের মতো পাক খেয়ে থাকে। এদের স্পাইরিলি বলা হয়। মোটামুটি এই তিনটি

একটা অ্যামিবা ভেঙে ভেঙে চারটায় দাঁড়াল

শ্রেণী থাকলেও দুই শ্রেণীর মিশানো জীবাণুও দেখা যায়।

সাধারণত একটা জীবাণু ভেঙে দুটো হয়, আর এরকম ভাঙতে ভাঙতে অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। এমনও দেখা গিয়েছে যে, অনুকূল

একটা জীবাণু ভেঙে ভেঙে চারটায় দাঁড়াল

অবস্থায় একটা জীবাণু ভেঙে ভেঙে চব্বিশ ঘণ্টায় এক কোটি সত্তর লক্ষ জীবাণুতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করতে থাকলেন, কিসের মধ্যে এই বৃদ্ধি বেশি হয়, কিসের মধ্যেই বা কমে, আর কি করে তাদের বিনাশ করা যায়।

মানবের অদৃশ্য শত্রুর তালিকা এখানেই শেষ হল না, যাদের কথা বলা হল, তাদের চোখে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তারা অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে। কিন্তু ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না, এমন জীবাণুরও কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া গেল। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, কর্ণমূল প্রভৃতি রোগ এই শ্রেণীর জীবাণুর জন্য ঘটে। এদের বলা হয় ভাইরস। সম্প্রতি বিজ্ঞান যে ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ তৈরি করেছে তার সাহায্যে ভাইরসও ধরা পড়ছে। কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে একটি ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ বসানর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। ভারতবর্ষে আর কোথাও ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ নেই।

ভাইরস যে কত ছোট, একটা হিসেব থেকে দেখা যাবে। সবচেয়ে ছোট যে ভাইরস, তার ব্যাস এক মাইক্রনের লক্ষ ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। যে বিশেষ ছাঁকনি দিয়ে সাধারণ জীবাণুকে পৃথক করা যায়, এই ভাইরস তাতে আটক পড়ে না, তার ভিতর দিয়ে চলে যায়। অথচ এরাই মানুষের এত বড় শত্রু! জীবের সংস্পর্শে এলে তবে এরা বাড়ে; এদের চাষ করতে হলে জড়ের উপর করলে চলবে না। আমরা ভাইরসকে জীবাণু বললুম। সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে, এরা জড় না জীব। এদের একদল দানা বাঁধতে পারে—তাই থেকে সন্দেহ জেগেছে। জীবতত্ত্ববিদ্ অবাক হচ্ছেন, ভাইরস যদি জীবাণু হয়, তবে তারা দানা বাঁধে কি করে। আবার রসায়নবিদ্ গালে হাত দিয়ে বসেছেন, এরা যদি অণু হয়, তবে এরা ভাঙছে কি করে।

এ-প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা আজও হয়নি, কোন-দিন হবে বলেও মনে হয় না। তবে মোটামুটি বলা যায় যে, ভাইরস জড় ও জীবের মধ্যে এক সেতু। সেতুর একদিকে রইল তামাক ব্যাধির ভাইরস আর অন্য দিকে টাইফস রোগের ভাইরস। ভাইরস জড় না জীব, এ-প্রশ্ন যিনি করছেন, তাঁকে উল্টো প্রশ্ন করা যায়, জীব ঠিক কাকে বলে? আজও বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের কথা স্মরণ করছে, প্রকৃতিতে জড় ও জীবের মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে, কোথাও একটা পরিষ্কার রেখা টেনে দুটোকে ভাগ করা চলে না।

তিন-চার দিনের বাসি রুটি, কাটা আলু, ফল প্রভৃতিতে ছাতা পড়তে দেখা যায়। যারা এই রকম ঘটায়, তাদের শ্রেণীর কয়েকটি দল মানুষের শরীরে বিশিষ্ট রকমের রোগ জন্মায়। গায়ের চামড়ার উপর দাদ, চুলকণা প্রভৃতি রোগ এই শ্রেণীর জীবাণুর জন্যে হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কয়েকটি দল আছে, যারা মানুষের শত্রু তো নয়ই, পরম মিত্র। এদের কথা পরে আলোচনা করা হবে।

প্রোটোজোয়া শ্রেণীর জীবাণু মানুষের আর এক শত্রু।

প্রোটোজোয়াদের একদল ম্যালেরিয়ার কারণ, আর একদল কালাজ্বর ঘটায়, অন্য একদলের জন্য আম রোগ হয়।

এরা তো হল মানুষের অদৃশ্য শত্রু। কিন্তু বড় বড় কীটও মানুষের রোগ ঘটায়, যেমন ক্রিমি, উকুন প্রভৃতি।

অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম

মানুষের দেহে জীবাণু আসে মানুষ থেকে, অন্য প্রাণী থেকে। মানুষ থেকেই বেশি আসে। মানুষই মানুষের বড় শত্রু।

রোগ ঘটাতে হলে সব প্রথম জীবাণুকে মানুষের দেহে আড্ডা গাড়তে হবে। আর শুধু আস্তানা পেলে হবে না, আশপাশের অবস্থা এমন হওয়া চাই, যাতে সে হু-হু করে বেড়ে যেতে পারে। জীবাণুর শক্তি তো তার সংখ্যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের শরীর গোড়া থেকে হার স্বীকার করে চুপচাপ থাকে না, সেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যে জীবাণু আসবে, প্রথমত, তাকে বেশ জোরালো হতে হবে, তারপর তাকে বেশ দল ভারি করে

আসতে হবে, তবেই তার জয়ের সম্ভাবনা থাকবে। অন্য দিকে মানব দেহের ত্বক আর তার দেহের ভিতরকার শ্লেষ্মঝিল্লি আত্মরক্ষার প্রথম সারিতে অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। আগন্তুক জীবাণু যদি বেশি জোরালো না হয়, তবে এই প্রথম বাধাতেই তার বিনাশ। জীবাণু কোন্ পথ দিয়ে শরীরে ঢুকছে, সেও একটা বড় কথা। ত্বকের উপর না এসে সে যদি সোজাসুজি রক্তের মধ্যে ঢুকতে পারে, তবে তার অনিষ্ট করবার শক্তি খুব বেশি হবে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ত্বকের সামান্য আঁচড়ে যদি স্ট্রেপ্টোককস জীবাণু এসে পেঁছয়, তবে সেখানে বড়জোড় একটা ফোঁড়া হবে। কিন্তু এই স্ট্রেপ্টোককস জীবাণু যদি একেবারে সোজাসুজি রক্তস্রোতের মধ্যে পেঁছতে পারে, তবে মারাত্মক সেপ্টিসিমিয়া রোগ জন্মায়। প্রসবের পর অনেক রমণী এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতো।

সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে বিভিন্ন জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। যক্ষ্মার জীবাণু নিঃশ্বাসের ভিতর দিয়ে যায়, কলেরা, টাইফয়েড, আম রোগের জীবাণু খাওয়ার মধ্য দিয়ে ঢোকে, আর চামড়া ভেদ করে মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেয়।

যে জীবাণু মানবদেহে এসে জেঁকে বসল, সে নানা রকমে দেহকে আক্রমণ করতে থাকে। দেহতন্তুকে, রক্তকণিকাকে ধ্বংস করে, আবার এমন সব বিষ প্রস্তুত করে যা দেহতন্তুকে ক্ষয় করে যায়।

অন্যদিকে মানবদেহও বেশ সজাগ আছে। বাইরে থেকে জীবাণু যেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করল, অমনি রক্তের শ্বেত কণিকা তাদের দিকে ছুটে গেল, যুদ্ধ আরম্ভ হল। অণুবীক্ষণ দিয়ে এ-যুদ্ধের পদ্ধতি ভাল রকম দেখা যায়। শ্বেত কণিকা জীবাণুর দিকে ছুটে এল, তাকে গ্রাস করল, ধ্বংস করল। আর একটা মজার ব্যাপার আছে। জীবাণু এসে যে বিষ তৈরি করল, রক্তের মধ্যে তার প্রতিষেধক বিষেরও সৃষ্টি হতে আরম্ভ হল। কথক ঠাকুরের মুখে শোনা গিয়েছিল, রাবণ যেই অগ্নিবাণ ছোঁড়েন, অমনি রামচন্দ্র বরুণ বাণ ছুঁড়ে আগুন নেবান। এখানকার যুদ্ধও অনেকটা সেই রকমের।

বিজ্ঞানীর আসবার অনেকদিন আগে থেকেই তো মানুষ পৃথিবীতে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে আসছে। চারদিকে তো অসংখ্য জীবাণু ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে কি করে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। কথাটা হল এই। সাধারণত প্রত্যেক মানুষের বাহিরের জীবাণুকে বাধা দেবার একটা সহজাত শক্তি থাকে। সুস্থ সবল অবস্থায় সে অধিকাংশ জীবাণুর আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। একটা চলতি কথা আছে, শক্ত মাটি বেড়ালে আঁচড়াতে পারে না। তবে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, অত্যধিক পরিশ্রমে যখন তার এই রোধশক্তি কমে আসে, তখন বাইরে থেকে জীবাণু এসে তার দেহের মধ্যে জেঁকে বসে হু-হু করে বেড়ে যায়, আক্রমণ চালায়। তাছাড়া সকলের মধ্যে সকল রকম জীবাণুর বাধা দেবার শক্তি থাকে না। বয়সেরও একটা কথা আছে। হাম, ডিপথেরিয়া, হুপিং-কাশি শিশুদেরই বেশি ধরে, আবার বেশি বয়সে রোধশক্তি কমে যাওয়ার ফলে নিউমোনিয়া ও অন্যান্য রোগ বৃদ্ধদেরই বেশি হয়। অন্যদিকে দেখা যায়, এক-এক শ্রেণীর প্রাণীর এক-এক রকমের জীবাণু রোধ করার ক্ষমতা খুবই প্রবল। ইঁদুরের ডিপথেরিয়া হয় না, কুকুর, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়ার যক্ষ্মা হয় না, পায়রার নিউমোনিয়া হয় না, কুমীর-গিরগিটির ধনুষ্টংকার হয় না। মানুষের মধ্যে দেখা যায়, যক্ষ্মা রোগ বাধা দেবার শক্তি ইহুদীদের খুব বেশি, কাফ্রীদের খুব কম।

বিজ্ঞান বাইরে থেকে মানবের এই বাধা দেবার শক্তি বাড়াবার নানারকম ব্যবস্থা করতে থাকল। টীকা বা ভ্যাকসিন ও সিরাম আবিষ্কৃত হল। ভ্যাকসিন ও সিরাম কি, আর মোটামুটিভাবে ওরা দেহে গিয়ে কি করে দেখা যাক। নির্দিষ্ট রোগের কতকগুলি জীবাণু নিয়ে তাদের উপযুক্ত খাবার দিয়ে তাদের সংখ্যা বাড়ান হল, অর্থাৎ সেই জীবাণুদের চাষ করা হল। এখানে দেখা যায়, অধিকাংশ জীবাণুকে অল্প একটু গরমে রাখলে মানুষের দেহের যে উষ্ণতা, মোটামুটি সেই উষ্ণতায় রাখলে, তারা ফুর্তিতে বেড়ে যায়। তখন তাদের কতকগুলিকে নিয়ে লবণ জলে রেখে একটু বেশি গরম করা হল, মোটামুটি ৬০ ডিগ্রি উত্তাপে তারা মরে যাবে। না পচে সেজন্য কয়েক ফোঁটা ফিনাইল বা ওই রকম রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া হল।

এখানে একটা কথা আছে। জীবাণুরা মরে গেল বলা হল, কিন্তু জীবাণুদের দেহের কাঠামো ঠিক রইল। সেগুলি রক্তের মধ্যে গিয়ে সেই জাতীয় জীবাণুর প্রতিষেধক বস্তু তৈরি
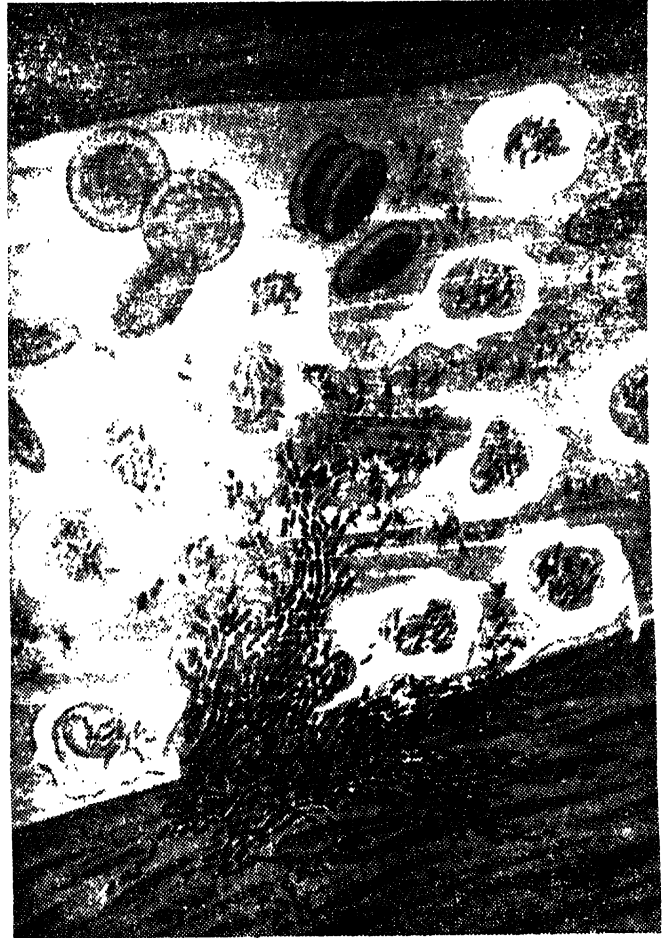
শ্বেতকণিকা জীবাণুর দিকে ছুটে আসছে, তাকে ধ্বংস করছে

করতে শ্বেত কণিকাকে উত্তেজিত করল। কলেরা, প্লেগ, টাইফয়েড প্রভৃতির টীকা এই রকমে তৈরি করা হয়। এই হল ওই জীবাণুর টীকা বা ভ্যাকসিন। উত্তেজনার ফলে শ্বেত কণিকার শক্তি বেড়ে গেল, পরে বাইরে থেকে যখন বলবান শত্রু আসবে, সে তাকে ঠেকাতে পারবে। টীকার একটা মাত্রা ঠিক করে নিতে হয়। টীকা যদি না দেওয়া থাকত, প্রথম থেকে যদি প্রবল শত্রু আসত, তবে শ্বেত কণিকা নিজেকে অক্ষম জেনে কোন চেষ্টাই করত না। আগে একবার রোগ হয়ে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তের শ্বেত কণিকারা প্রস্তুত হয়েই থাকে, তখন দ্বিতীয়বার সেই রোগ আর ধরে না। বসন্ত, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি এই রকমের রোগ। তাই জেনারকে গয়লানী যে কথা বলেছিল—আমার একবার বসন্ত হয়েছে আর হবে না, দেখা যায়, সে কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। বসন্তের টীকা কিন্তু জ্যান্ত জীবাণু গোরু থেকে নেওয়ায় শক্তি খুব মৃদু হয়ে গিয়েছে।

সিরাম বাইরে থেকে প্রতিরোধক বস্তু নিয়ে চলল। এখানে দেহের রক্তকণিকাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না, যা করবার ওই সিরামই করবে। সিরাম তৈরি করা হয় এই রকমে। ঘোড়ার দেহে বিশিষ্ট জীবাণু অল্প পরিমাণে ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হল মাত্রা বাড়িয়ে যাওয়া হতে থাকল, রক্তে প্রতিরোধক বস্তু তৈরি হতে চলল। যে মাত্রা গোড়ায় দিলে ঘোড়া মরে যেত, সে মাত্রা যখন অনেক গুণ ছাড়িয়ে গেল, অথচ দেখা গেল, ঘোড়া বেশ সুস্থ সবল রইল, তখন বোঝা গেল, ঘোড়ার রক্তে অত্যধিক পরিমাণে প্রতিরোধক বস্তু তৈরি হয়েছে।

এখন ঘোড়ার শরীর থেকে রক্ত বের করে নিয়ে তার থেকে রক্ত রস পৃথক করা হল, এই হল সিরাম। এখন একে জীবাণুশূন্য কাচের পাত্রের মধ্যে পুরে একেবারে বন্ধ করে রাখা হল। একজন লোকের যখন ওই রোগ দেখা দিল, সেই সিরাম ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হল, তৈরি প্রতিরোধক বস্তু বাইরে থেকে এসে যুঝতে থাকল। সিরামের কাজ হবে শিগগির শিগগির, তবে ওর ক্ষমতাও শিগগির ফুরিয়ে যাবে, তাই বারে বারে সিরাম দিয়ে যেতে হবে। যে রোগের জীবাণু দেহের ভিতর গিয়ে অনবরত বিষ ছড়াতে থাকবে, তাদের দমন করতে সিরাম ব্যবহার করতে হবে। ডিপথেরিয়া ধনুষ্টংকার প্রভৃতি রোগে সিরামই দিতে হয়।

জীবাণুর আর এক শত্রু হল ফাজ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে জীবাণু, তার তুলনায়ও এই ফাজ অতি ক্ষুদ্র। ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণ দিয়েও একে দেখা যায় না, ফিল্টারে একে পৃথক করা যায় না। একে সহজে বিনাশ করা যায় না, আর এর ক্ষমতা অনেকদিন পর্যন্ত থাকে। এরা পাশের জীবাণুকে দমন করে। দেহের অন্ত্রের মধ্যে যে ফাজ জন্মায়, কলেরা আম রোগের জীবাণু এলে এই ফাজ তাদের বাড়তে দেয় না, রোগ সেরে যায়। যে অন্ত্রে ফাজ নেই, সেখানে বাইরে থেকে এনে দিলে সুফল পাওয়া যায়। এক জাতের জীবাণুকে সেই জাতেরই ফাজ খেয়ে ফেলে।

দেখা যায়, গঙ্গার জলের, অনেক পুকুরের জলের কলেরা প্রভৃতি জীবাণু রোধ করবার ক্ষমতা আছে। বিজ্ঞানী মনে করেন, ফাজ থাকার জন্য ওই সব জলের ওই ক্ষমতা। তবে ফাজ সম্বন্ধে এখনও বিজ্ঞানীকে অনেক পরীক্ষা করতে হবে, তবেই তিনি একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন।

দু রকম অদৃশ্য শত্রুর পরিচয় পাওয়া গেছে—ব্যাকটেরিয়া আর প্রোটোজোয়া। দেখা গেল, ভ্যাকসিন সিরাম ফাজ প্রভৃতি দিয়ে ব্যাকটিরিয়া জীবাণুদের দমন করা যায়, কিন্তু প্রোটোজোয়া জীবাণুদের বেলায় ভাবতে হল বিভিন্ন রাসায়নিক বিষদ্রব্য, যা ওই জীবাণুকে মারবে অথচ যা মানুষের কোন ক্ষতি করবে না। অনুসন্ধান চলল। ম্যালেরিয়ার জন্য বেরল কুইনিন, মেপাক্রিন, প্যালুড্রিন ইত্যাদি, অ্যামিবা —আম রোগের জন্য এমেটিন, স্টোভারসন, কারবারসন প্রভৃতি আর কালাজ্বরের জন্য ইউরিয়া স্টিবামিন। এই প্রোটোজোয়া শ্রেণীর জীবাণুকে টীকা দিয়া দমন করা যায় কিনা, এখন বিজ্ঞানী সেই চিন্তা করছেন।

দৃশ্য শত্রুকে মারতে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হল, ডি ডি টি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান এসব ব্যাপারে কি পেরেছে বলা হল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কি পারেনি, তা বলতে হয়।

ফাইলেরিয়া জীবাণুজনিত রোগ এটা জানা গিয়েছে, কিন্তু ওই জীবাণুকে বধ করার কোন বিশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য আজও আবিষ্কৃত হয়নি। কুষ্ঠ রোগের জীবাণু দেখা গিয়েছে, কিন্তু ওই জীবাণুকে চাষ করার কোন উপায় আজও বেরল না, সুতরাং টীকা দিয়ে ওর হাত এড়ানোর কোন ব্যবস্থা হল না। পৃথিবীর একটা বড় ব্যাধি হল যক্ষ্মা। এই রোগ বেড়েই চলেছে। এর জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল, কিন্তু রোগের আক্রমণ রোধ করা যায় কি করে? সম্প্রতি এর যে টীকা বেরিয়েছে, সেই বি সি জি টীকা দিয়ে নরওয়ে সুইডেনে পঁচিশ বছরে মৃত্যুহার ১৬ থেকে ১-এ নেমেছে।

বি-সি-জি টিকার আবিষ্কার এই রকম। যক্ষ্মার জীবাণু যখন পাওয়া গেল তখন সেই জীবাণুর চাষ করে, তাদের মেরে ফেলে কলেরার টিকার মতো মরা জীবাণু দিয়ে টিকা তৈরি হল। কিন্তু এ টিকায় কোন ফল হল না। ফরাসি দেশে ক্যালমেট ও ল্যারিন জ্যান্ত জীবাণুর টিকা তৈরি করতে লেগে গেলেন। গোরুর যক্ষ্মার জীবাণু নিয়ে বিশেষ রকম খাদ্যে ওই জীবাণুর চাষ করে যেতে থাকলেন। প্রতিবারে ওর শক্তি মৃদু হতে লাগল। ২০০ বারের বেশি এই রকম প্রক্রিয়ার পর জীবাণুর শক্তি অত্যন্ত মৃদু হয়ে এল তখন ওই টিকা ব্যবহারের উপযোগী হল। কিন্তু একটা কথা রইল। যাকে তাকে এই টিকা দিয়ে গেলে চলবে না।

এসম্বন্ধে একটা কথা আছে যা শুনলে আমাদের স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। পরীক্ষায় জানা যায় আমাদের মধ্যে শতকরা প্রায় আশি-জন লোকের কোন না কোন সময়ে যক্ষ্মা হয়েছে, আবার সেরেও গেছে, হওয়াও আমরা টের পাইনি, যাওয়াও জানতে পারিনি। জীবাণু এসেছে, আর দেহের রোধশক্তি তাকে হঠিয়েছে। এখন যে লোকের শরীরে এই রোধশক্তি আছে, তাকে ওই টিকা দেওয়া চলবে না। পরীক্ষায় দেখতে হবে রোধশক্তি আছে কি না, আর এর জন্য বিশেষ পরীক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছে। ওই সব দেশে নবজাত শিশুকে ওই টিকা দেওয়া হয়, তখন তার রোধশক্তি আছে কিনা পরীক্ষার দরকার হয় না। টিকা দেবার পর আর একটা বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান হতে হবে, নচেৎ সমূহ বিপদ ঘটতে পারে। যাকে টিকা দেওয়া হল প্রায় ছ মাস পর্যন্ত তার কোন রোধশক্তি থাকবে না, সে একেবারে অসহায়। এই সময় সাবধান হতে হবে, বাইরে থেকে কোন যক্ষ্মা জীবাণু না এসে পড়ে, এলে একেবারে মারাত্মক অবস্থা।

টিকা তৈরি কথাটায় আসা যাক। এখানে জ্যান্ত জীবাণু নিয়ে কারবার, আর নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। কোন সময় মৃদু জীবাণুর মধ্যে যদি তীব্র জীবাণু এসে যায়, তবে সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একবার এই রকম হয়েও ছিল। তখন টিকা মুখ দিয়ে খাওয়ানো হত। ১৯৩০ সালে জার্মানীর লিউবেক সহরে ২৫০টি শিশুকে এই ভ্যাকসিন খাওয়ানো হয়। কয়েক মাসের ভিতর ওদের মধ্যে ৭২টি শিশু যক্ষ্মায় মারা গেল। ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। অনুসন্ধানে দেখা গেল পরীক্ষাগারে কর্মীদের অসাবধানতায় মৃদু জীবাণুর মধ্যে তীব্র জীবাণু চলে গিয়েছিল। এখন সরকারি ব্যবস্থায় টিকা তৈরি হয় আর এ সম্বন্ধে বিশেষ নজর রাখা হয়।

আবিষ্কারকদের নাম অনুসারে এই টিকাকে বি-সি-জি ভ্যাকসিন বলা হয়। বি-সি-জি অর্থাৎ ব্যাসিলস ক্যালমেট গ্যেরিন।

এই টিকার ব্যবহার ভারতবর্ষে সবে আরম্ভ হল।

কতকগুলি রোগ আছে, বাইরের কোন শত্রু যাদের ঘটায় না—যেমন ক্যানসার। দেহ-তন্তুর এমন একটা পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে ওই রোগ হয়; কিন্তু পরিবর্তনটা ঠিক কি জানা নেই। রেডিয়ম, সাপের বিষ দিয়ে ক্যানসার চিকিৎসা চলছে, কিছু কিছু ফলও

পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু চিকিৎসাটা এখনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়ায়নি।

মানুষের দেহে নিয়তই ভাঙাগড়া চলেছে। সেই প্রক্রিয়ার এদিক-ওদিক হওয়ার জন্য অনেক ব্যাধি দেখা দেয়, যেমন বহুমূত্র, রেনাল কলিক, রক্তের চাপ, সহজ রক্ত চলাচলের ব্যতিক্রমজনিত রোগ, হৃদযন্ত্রের রোগ, হাঁপানি প্রভৃতি শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ, নার্ভ ঠিক-মতো কাজ না করার জন্য রোগ ইত্যাদি। জীবাণুর জন্য এসব রোগ ঘটে না।

সীসা, তামা, অভ্র প্রভৃতির কারখানায়, কয়লার খনিতে যারা কাজ করে, তাদের বিশেষ বিশেষ রকম রোগে ভুগতে দেখা যায়। এসবও জীবাণুজনিত রোগ নয়। জীবাণু ব্যতিরেকে ঘটে থাকে এরকম রোগ সারাতেও বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে। এইবার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্য একদিকে একটা কৃতিত্বের কথা বলা হচ্ছে।

মানুষের অদৃশ্য মিত্র

ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙবার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধকালে রাজনীতিজ্ঞরা এই নীতি অবলম্বন করেন। দেখা গেল, রোগের সঙ্গে যুদ্ধেও এই নীতি অবলম্বন করা যায়।

ধরা যাক, নিউমোনিয়া রোগ। এক রকম বিশিষ্ট জীবাণু থেকে এই রোগ হয়। আচ্ছা, হরেক রকম জীবাণুর মধ্যে সন্ধান করা যাক, কে এই নিউমোনিয়ার শত্রু আছে। যদি থাকে, তবে তাকেই লাগিয়ে দেওয়া যাবে নিউমোনিয়া জীবাণুর বধ কার্যে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই উপায় অবলম্বন করে আমরা সফলকাম হয়েছি, এখানে পারব না? কাঠে কাঠে লেগে যাক, আমরা মজা দেখি, অবশ্য দূরে দাঁড়িয়ে নয়, কারণ আমাদের দেহ হল এই যুদ্ধক্ষেত্র।

যে সকল স্ট্যাফিলককসের জন্য মানবদেহে চর্মরোগ, ফোঁড়া প্রভৃতি জন্মায়, তাদের সম্বন্ধে সেণ্ট মেরি হাসপাতালে ফ্লেমিং অনুসন্ধান করছিলেন। একটা ফোঁড়া থেকে কিছু পুঁজ নিয়ে ফ্লেমিং একটা কাচের পাত্রের উপর রেখে দিলেন। জীবাণুদের পুষ্টির জন্য আগার নামক জেলির উপর ওটা ছড়ান ছিল। জীবাণুরা সংখ্যায় বাড়তে থাকল। এক-এক জায়গায় কিভাবে তারা জমায়েৎ হতে থাকে, ফ্লেমিং মাঝে মাঝে তা লক্ষ্য করছিলেন। পাত্রে নানা স্থানে তারা দলবদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু ফ্লেমিং দেখলেন, একটা জায়গায় একটা নীলাভ ছাতা পড়েছে। ওই জায়গাটা তত পরিষ্কার ছিল না, এই রকম তো মনে হবার কথা। কিন্তু ফ্লেমিং ওটাকে ফেলে না দিয়ে সরিয়ে রাখলেন, পরে দেখবেন ওখানে কি ঘটে। এখানেই রইল ভবিষ্যৎ কালের চিকিৎসাজগতের এক যুগান্তরকারী আবিষ্কার। কেবলমাত্র কৌতূহল বশে ফ্লেমিং ওটাকে রেখে দিলেন। কিন্তু শেষ অবধি এই কৌতূহলই তাঁকে পুরস্কৃত করল।

ফ্লেমিং দেখলেন যে, যেখানে ওই ছাতা পড়েছে তার চারদিকের জীবাণুগুলি পাত্রের অন্যস্থানের জীবাণুর মতো সবল ও সতেজ নেই। মনে হয় যেন ওই ছাতা ওই জায়গার জীবাণুগুলিকে ভাঙছে গলাচ্ছে। ফ্লেমিং চিন্তা করতে লাগলেন। তবে কি ওই ছত্রক বা ছত্রক হতে উৎপন্ন কোন দ্রব্য যে জীবাণু তার সংস্পর্শে আসছে, তাকে ধ্বংস করে ফেলছে। তা যদি হয়, তবে শুধু কি আগার পূর্ণ ওই পাত্রে এই রকম হবে, মানুষের দেহে কি এই রকম ঘটবে না? ফ্লেমিংয়ের কাছে এ যেন একটা স্বপ্ন! তিনি একটা নতুন আলো দেখতে পেলেন। অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান চলতে থাকল। স্ট্যাফিল ককসের বদলে এক এক করে অন্য শ্রেণীর জীবাণু আনা হতে থাকল, দেখা গেল কেউ স্ট্যাফিল ককসের মতো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হল, কারও কারও বাড় কমে গেল, আবার অন্য দলের কিছুই হল না। দেখা গেল এই ছত্রক সকল জীবাণুর শত্রু নয়। কিন্তু এক শ্রেণীর শত্রুকেও যদি নাশ করতে পারে, তবে তো ও মানবের এক অচিন্তনীয় পরম মিত্র।

এবার ছত্রক থেকে ওই মূল বস্তুকে বিশুদ্ধ আকারে পাবার চেষ্টা হল। এই কাজে ফ্লেমিং-এর সঙ্গে রসায়নবিদেরাও যোগ দিলেন। শেষ অবধি ওকে বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া গেল। আর পেনিসিলিয়ম নোটেটম জাতীয় ছত্রক থেকে পাওয়া যাওয়ায় ফ্লেমিং ওর নাম দিলেন পেনিসিলিন।

১৯২৮ সালে সেণ্ট মেরি হাসপাতালে এই এই যে যুগান্তরকারী আবিষ্কার হল, ঘটনাচক্রে তা আর বেশি দূর এগুলো না। এ নিয়ে লোকের বেশি মাথা না ঘামাবার কারণ এই, সে সময়ে জার্মানীতে প্রণ্টোসিন নামে এক নতুন ওষুধ বেরিয়েছে, আর এই প্রণ্টোসিনের রোগ সারাবার ক্ষমতা দেখে পৃথিবীর চিকিৎসকগণ স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। এই প্রণ্টোসিন একটি রাসায়নিক দ্রব্য, পশমি কাপড় রং করতে যে অ্যানিলিন জাতীয় রং ব্যবহার করা হয়, এ তার থেকে তৈরি! দেখা গেল, ককাই জাতীয় জীবাণু ধ্বংস করতে এর ক্ষমতা অসাধারণ। আরো সুবিধার কথা এই যে, কয়েকটি সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে একে তৈরি করা যায়, সে জন্য দামেও খুব সস্তা। জার্মানির এই আবিষ্কারের পর ইংলণ্ডের রসায়নবিদ্‌গণ এবিষয়ে মন দিলেন, আর তাদের চেষ্টার ফলে সলফনামাইড নামে এই শ্রেণীর ওষুধে বাজার ছেয়ে গেল। এই কারণে পেনিসিলিনের কথা লোকে ভুলে গেল, তা ছাড়া ওর তৈরি খুব শ্রমসাধ্য ব্যাপার, আর ওর দামও বেশি।

যা হোক দশ বছর পরে বিজ্ঞানীরা পেনিসিলিন সম্বন্ধে সজাগ হলেন। একটা ব্যাপার দেখা গেল। পেনিসিলিন সোজাসুজি জীবাণুকে মেরে ফেলে না, এ-কাজ শেষ অবধি শ্বেতকণিকার উপর রয়ে গেল। শ্বেতকণিকারা পেরে উঠছিল না, কারণ জীবাণুরা দ্রুত বেড়ে গিয়ে দলে ভারি হচ্ছিল। এখন পেনিসিলিন ও শ্বেতকণিকা বন্ধুভাবে মিলল। পেনিসিলিন জীবাণুদের বৃদ্ধি বন্ধ করল, তাদের নিস্তেজ করল, তখন শ্বেত-কণিকারা সহজেই তাদের ধ্বংস করল।

পেনিসিলিয়ম নোটেটম থেকে পেনিসিলিন পাওয়া গেল, অন্য ছত্রক থেকে জীবাণুধ্বংস-কারী পদার্থ পাওয়া যায় কি না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলল। এক রকম ছত্রক থেকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কৃত হয়েছে। যক্ষ্মারোগে এ একটা খুব ভাল ওষুধ। সম্প্রতি প্লেগ রোগে স্ট্রেপ্টোমাইসিন ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেছে বলে শোনা যায়।

আমাদের বাঙলাদেশে একটা চেষ্টা চলেছে। সহায়রাম বসু আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে ছত্রক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করে আসছিলেন। বিশেষভাবে পলিস্টিকটস্ স্যানগুইনস নামক ছত্রক তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর ১৯৪৪ সাল থেকে, তিনি সন্ধান করতে থাকলেন পেনিসিলিনের ন্যায় দ্রব্য ওই ছত্রক থেকে পাওয়া যায় কিনা। অনেক পরীক্ষার পর তিনি অনুরূপ পদার্থ পেলেন, তার নাম দিলেন পলিপরিন।

পলিপরিন সম্বন্ধে এখনও অনেক পরীক্ষা চাই, আর সেজন্য ওকে প্রচুর পরিমাণে তৈরী করতে হবে। আশা করা যায় ভারত সরকার এ সম্বন্ধে অবহিত হবেন, আর একদিন এই ওষুধ সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন করবে।

জয়-পরাজয়

টাটার লোহার কারখানা দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। কি ব্যাপারই চলছে ভিতরে! রসায়নবিদের পরীক্ষাগার এক বিস্ময়ের বস্তু। সামান্য সামান্য উপাদান থেকে কত রকমের জিনিস তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কোন বিজ্ঞানীর এমন কোন যন্ত্র নেই যাতে চারটি ভাত, একটু দুধ বা একটা সন্দেশ দিলে তারা রক্তের খাদ্যে পরিণত হয়। কি অদ্ভুত কারখানা এই মানবদেহ!

তিন শ বছর আগে হার্ভে যখন বললেন যে, মানুষের হৃদয়যন্ত্র একবার কোঁচকাচ্ছে আবার ফুলে উঠছে, আর তার ফলে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচল হচ্ছে, তখন লোকে সে কথাটা কিভাবে নিয়েছিল তা এই ঘটনাটা থেকে বোঝা যাবে। একটা সভায় হার্ভে এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন, পরীক্ষায় রক্ত চলাচল দেখিয়ে দেবেন। হার্ভে সভায় উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, সভার সভাপতি আছেন, আর কেউ নেই। যে মুটে জিনিসপত্র বয়ে এনেছিল হার্ভে তাকে থাকতে

বললেন, যাতে সভাপতি ছাড়া অন্ততঃ একজন শ্রোতা থাকে। তবে বেশি দিন গেল না, হার্ভের মত লোকে নিল। আর এই তিনশ বছরের মধ্যে বিজ্ঞান কতদূর এগিয়ে গেল!

একটার পর একটা দেহের বিভিন্ন অংশের কাজ সম্বন্ধে অনেক কথা মানুষ জানতে থাকল। অনেক ব্যাধির উৎপত্তির কারণ বেরুল, তাদের নিবারণের উপায় স্থির হল। এ-সব এক বিরাট কাহিনী।

দেহের মধ্যে কতকগুলি নলহীন গ্রন্থি আছে। এদের অনেকগুলি সম্বন্ধে সেদিন অবধি মানুষের ধারণা ছিল যে তারা একেবারে অকেজো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে এদের থেকে হরোমোন বলে যে সূক্ষ্মবস্তুর ক্ষরণ হয় তা দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ সম্বন্ধে এক আশ্চর্যজনক সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। এসম্বন্ধে কিছু কিছু আমরা জেনেছি, কিন্তু অনেক কথা আমাদের জানতে বাকি। থাইরয়েড ক্ষরণ ব্যবহারে বেঁটে অদ্ভুত চেহারার হাবাগোবা লোক একেবারে সহজ মানুষ বনে গিয়েছে। আর ১৯২৬ সালে রসায়ণবিদ্ এই বস্তুকে তাঁর পরীক্ষাগারে তৈরি করলেন। তবে কি আমাদের মনের ভাব, আমাদের চরিত্রের বল, আমাদের পাপকাজ পুণ্যকাজ করবার প্রবৃত্তি কতকগুলি গ্রন্থির ক্ষরণের উপর নির্ভর করছে, আর সেগুলি কি রসায়ণবিদ্ তাঁর পরীক্ষাগারে তৈরি করবেন? অ্যাড্রিনালিন তো মানুষের ভয় দূর করে! তবে কি একদিন খিট্‌খিটে বদমেজাজের লোককে কয়েকটা বড়ি খাইয়ে, বা দুএকটা ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে আমুদে হাস্যরসিক করে তোলা যাবে! কল্পনায় তো এসব অসম্ভব বলে মনে হয় না।

ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে মানব জয়ী হল। কিন্তু তার এই জয়ের ইতিহাস ছোট। বিজ্ঞান মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু তাকে অনেক দূর যেতে হবে, নানা দিকে চলতে হবে। আজও ডাক্তারের কাজ হল রোগের চিকিৎসা করা। সময়, শক্তি ও অর্থকে অন্যদিকে ব্যয় করতে হবে। রোগ হলে তবে তো সারানোর কথা উঠবে। রোগ হবে কেন? পৃথিবীকে শত্রুশূন্য করতে হবে, সব রোগের কারণ জানতে হবে, রোগ হওয়া বন্ধ করতে হবে। বিজ্ঞান তা যখন পারবে, ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে, তখনই হবে তার পূর্ণজয়। কিন্তু তখনও একটা বড় কথা থেকে যাবে। মানুষের যোঝবার শক্তি বাড়াতে হবে, আর সেজন্য তার পুষ্টিকর আহার, উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে বিজ্ঞান পথ দেখিয়ে দেবে বটে, কিন্তু ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র।

একটা ভয়ের ব্যাপার দেখা দিয়েছে। এক এক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিজ্ঞান যেই একরকম জীবাণু মারবার উপায় বের করছে, অমনি সেই শ্রেণীর আর একরকম জীবাণু দেখা দিচ্ছে, যারা আগে কোনদিন ছিল না, আর যাদের উপর ওই মারণাস্ত্র ব্যর্থ হচ্ছে। এদের আবার বধ করতে হবে, বিজ্ঞানকে নতুন উপায় খুঁজে বের করতে হচ্ছে, আর যেই তা বেরুল অমনি তৃতীয় দলের আগমন, এইরকম চলেছে। মরিয়া না মরে, মানবের এ কি রকম বৈরী! প্রকৃতিতে কি এইরকম বরাবর চলতে থাকবে? কে জানে! কিন্তু তা যদি চলে তবে অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম কোনদিন শেষ হবে না।

[সমাপ্ত]

গগার মোহনায় কাছাকাছি দুটি দ্বীপ,—ব্যবধান পাঁচ সাত মাইলের বেশী নয়। খানিক দূরে সমুদ্রের নীল জল মিশে গেছে, আকাশের সংগে, ঢেউএর দোলা লাগে আকাশের বুকে, পৃথিবীর বার্তা গিয়ে পেণছে স্বর্গের কোণে। দুই দ্বীপের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে দুখানি মাত্র দেশী নৌকা। জোয়ার ভাঁটার যাত্রী, জলের কলরোলে নৌকায় সাড়া পড়ে যায়। দ্বীপের লোকসংখ্যা বেশী নয়। বড়-মান্দায় বসতি স্থাপন করেছে মাত্র পঞ্চাশ ষাট ঘর গৃহস্থ, অবস্থা সকলের ভালর মধ্যেই। ছোট মান্দায় থাকে কয়েক ঘর জেলে। মাছের ব্যবসা সকলের নয়। সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য কয়েকজনের উপর পুলিশের প্রখর দৃষ্টি আছে।

বড়মান্দায় অভাব কিছুরই নেই,—থানা, একটা ইস্কুল, ছোটখাট বাজার। দ্বীপবাসীরাও সভ্য মানবজীবনের পর্যায়ভুক্ত। পুরুষেরা মিহি ধুতির উপর পাঞ্জাবী গায়ে দেয়, মেয়েদের পোষাকও ফ্যাসানদুরস্ত। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায় প্রজাপতির মত রঙীন ছন্দে। আহার-বিহারে সকলে মিহি, জীবন কেটে যায় নেশার মাদকতার মত।

ছোট মান্দার জেলেদের অবস্থাও মন্দ নয়। মাছের ব্যবসায় হঠাৎ বরাত খুলে গেছে, দৈনিক আয় তিন চার টাকা, কিন্তু টাকা থাকে না। বড় মান্দার বাজারে সব নিঃশেষ হয়ে যায়। জেলেরা শেষবেলায় নিঃশব্দ প্রেতের মত ছোট মান্দার ঘাটে নেমে যায়, রাত্রির অন্ধকারে জীর্ণ কুটীর গাত্রে যেন নিঃশব্দে মিশে থাকে। সভ্য-সমাজ বহির্ভূত এদের জীবন, বড়মান্দার অধি-বাসীরা এদের কাছে পরম বিস্ময়কর। অবশ্য সভ্যসমাজে এদের সংগে সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। তাই এক একদিন রাত্রে ছোটমান্দার অধিবাসীরা তীব্র হুইসলের শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে, জল-পুলিশ এসেছে। কুটীরে কুটীরে বধূরা কেঁপে ওঠে দুরুদুরু বুকে, ছেলে-মেয়েরা আশংকায় মায়ের বুকে মিশিয়ে যায়। সে রাত্রে ছোটমান্দার একজন অধিবাসী চালান হয় বড়মান্দার থানায়।

গোলমাল বড় একটা বাধে না। অপরাধীরা নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করে পুলিশের কাছে, ততোধিক নিঃশব্দে বিদায় নেয় অবগুণ্ঠিতা বধূর কাছে, তারপর দ্রুতপদে হাজির হয় জল-পুলিশের নৌকায়। বে-আইনী মদের কলসী মাথায় নিয়ে পুলিশ নৌকায় ওঠে।

গত বিশ বৎসর যাবত এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে। বড়মান্দার অধি-বাসীরা এ সম্বন্ধে গবেষণা করেছে অনেক, কিন্তু থানা-পুলিশের ভয়েও মানুষের অপরাধ-প্রবণতা নিবৃত্ত না হওয়াতে তারা রীতিমত শঙ্কিত হয়েছে। বাজারে চৌধুরীরা সবে ব্যবসা ফেঁদেছে,—তেল নুন থেকে আরম্ভ করে মায় কাপড় পর্যন্ত। চারখানা ঘরে থাকে থাকে সাজান মালপত্র। মজুত মালপত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বড় চৌধুরী একদিন থানায় পদার্পণ করলেন।

থানার দারোগাটি বয়সে নবীন, অল্প কয়েকদিন পুলিশে কাজ পেয়েছেন। যৌবনের রোমাণ্টিক স্বপ্নে মন এখনও ভরপুর, সাগর-সঙ্গমে এই জনবিরল দ্বীপে সখ করে চাকরী করতে এসেছেন। চৌধুরীকে দেখে দারোগা খাতিরে ভেঙ্গে পড়লেন। আপ্যায়নের পালা শেষ হলে চৌধুরী বলল,—কিন্তু, মশাই, এতো বড় ভয়ের কথা। ছোট-মান্দায় রোজ রাত্রে চোর ধরা পড়ছে।

একটু হেসে দারোগা উত্তর দিলেন,—আপনার অনুমান ঠিক হল না চৌধুরী মশায়। ছোটমান্দায় চুরি করবার কিছু নেই। যারা ধরা পড়ে তারা সব মাতাল; লাইসেন্স ছাড়া মদের ব্যবসা করে আর বেহুঁস হয়ে ধরা পড়ে।

চৌধুরী বলল,—কিন্তু মশাই, আপনার চোর অর্থাৎ বে-আইনী মদের ব্যবসাদারদের চেহারায় বেশ জৌলুষ আছে। তেলপাকানো বাঁশের মত দেহ।

—কিন্তু বুদ্ধিতে একেবারে ঢেঁকি! দারোগা বিদ্রূপের হাসি হাসলেন।

বিদায়ের প্রাক্কালে চৌধুরী বলল,—কিন্তু মশাই, কোন অঘটন না ঘটলেই হল।

শেষ পর্যন্ত বড় চৌধুরীর আশঙ্কাই একদিন সত্যে পরিণত হল।

জোয়ার শেষে ভাঁটা আরম্ভ হয়েছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ ছায়াবিহানো ধরিত্রী, দূর-সাগরের জলে স্বপ্নের লুকোচুরি। বড়মান্দায় জাগ্রত মানুষের সাড়া এখনও পাওয়া যায় না; তালপত্রের সরসর শব্দ আর বনান্তরালে পক্ষিকুলের বিচিত্র কলরব নতুন দিনকে সানন্দে অভিনন্দন করছে।

বড়মান্দার খেয়াঘাটে একটিমাত্র প্রাণী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে খেয়ানৌকার জন্য। ছোটমান্দার নৌকা ভাঁটায় ছেড়েছে, জেলেরা আসছে মাছ নিয়ে। বাজারে পৌঁছবার পূর্বে কিছু মাছ হস্তগত হওয়া দরকার। নাতির অন্নপ্রাশন, বড় চৌধুরী সারারাত হিসেব করছে খরচের মাত্রা কি পরিমাণ কমান যায়। ভোরের আলো না ফুটতেই চৌধুরী সরাসরি হাজির হয়েছে খেয়াঘাটে। দৃষ্টি তার নিবদ্ধ বৃক্ষপত্র সমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের দিকে, ছোটমান্দার নৌকা ছেড়েছে।

নৌকা আসছে, ভাঁটার টানে তীরবেগে। গতিবেগে জলরাশি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে, সফেন ঢেউ নৌকার গায়ে আছড়ে পড়ছে ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত। চৌধুরী এক পা বাড়াল জলের দিকে। খেয়া নৌকাই বটে, কিন্তু খাকী ইউনিফর্মপরা লোকও রয়েছে। চৌধুরী বিস্মিত ও বিরক্ত হল। মাছের মধ্যে পুলিশ কেন? নৌকার যাত্রীরাও নির্বাক, অন্যদিন নদীবক্ষ থেকে তাদের কলকোলাহলের ধ্বনি চৌধুরীর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছায়। যাত্রীদের সম্মিলিত উচ্ছ্বাসে বক্ষ স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়, সিন্ধুক আগলে বসে থাকে যক্ষের মত। আজ প্রভাতের ব্যতিক্রম চৌধুরীর সত্যই বিচিত্র মনে হল।

নৌকা তীরে ভিড়তেই প্রথম নামল পুলিশের লোক। চারজন আর্মড্ পুলিশ, গ্রেপ্তার করে এনেছে দুটি জীবন্ত প্রাণীকে,—পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক। দৃশ্য দেখে চৌধুরী শিউরে উঠল। এরূপ ভীষণদর্শন নরনারীর সাক্ষাৎ আবির্ভাব তার জীবনে এই প্রথম। বলিষ্ঠ পুরুষ ও সবলদেহা নারী ইতিপূর্বে তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু শক্তি ও ভীষণতার সমন্বয়ে গঠিত মানবদেহ ছিল তার কল্পনার অতীত।

মেয়েটির রুক্ষ কেশের দীর্ঘ রাশি সারা মুখের উপর যেন লুটিয়ে পড়েছে, দীঘল দেহে তন্বীর কমনীয়তা লেশমাত্র নেই, চোখ দুটিতে মাখান বনহরিণীর সচকিত মায়া।

চৌধুরী দৃষ্টি ফেরাল পুরুষের দিকে। মেয়েটির উপযুক্ত সঙ্গী বটে! তালবৃক্ষপ্রমাণ দেহ, হাতে ডবল হাতকড়া। চোখের চাহনি হিংস্র বন্যপশুর মত ক্ষুধিত।

আসামী সমেত পুলিশের প্রস্থানের পর চৌধুরীর চমক ভাঙ্গল। দূর পথপ্রান্তে ছজোড়া পায়ে উঠেছে ধূলিকণার ঢেউ, প্রভাতের অরুণ আবরণ কালিমালিপ্ত হয়েছে আকস্মিক এক ইতিবৃত্তের নগ্নতায়। ব্যাপারটা আগা-গোড়া স্বপ্ন বলে ধারণা হল চৌধুরীর। এই অসাধারণ নারী-পুরুষের দর্শন তার কল্পনার অতীত। মহাভারতের ভীম অথবা দ্রৌপদীও যেন অনেকটা নিষ্প্রভ মনে হয়। পৌত্রের মাঙ্গলিক উৎসবের আনন্দ চৌধুরীর অনেকটা ম্লান হয়ে গেল। হাতকড়াই থাক আর শিকলই থাক, এ টাইপের লোক বড়মান্দায় আমদানী করা থানা-অফিসারের উচিত হয়নি।

কল্পনারাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে এল চৌধুরী। কোন রকম দরদাম না করে সে যখন মৎস্য ক্রয় শেষ করল, সূর্য তখন সবে আকাশের কোণে দেখা দিয়েছে।

দু' একদিন পরে চৌধুরী দ্বিতীয়বার থানায় হাজিরা দিল। আদর আপ্যায়নের পালা শেষ হলে চৌধুরী দারোগাকে একরকম জেরা শুরু করে দিল।

জেরার মুখে দারোগাকে স্বীকার করতে হল, ইতিপূর্বে থানার লক-আপ্-এ এ ধরণের আসামীর আবির্ভাব আর হয় নি। ছোটমান্দায় যে গ্যাংটি আবগারী বিভাগকে এতদিন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আসছিল, এরা তাদেরই নেতা।

চৌধুরী প্রশ্ন করল,—স্বামী-স্ত্রী তাহলে অবাধে ব্যবসা চালিয়ে এসেছে আপনাদের ফাঁকি দিয়ে?

বিস্ময়ের সুরে দারোগা বলল,—স্বামী-স্ত্রী কাদের বলছেন?

—ওই ওরা, যাদের কথা হচ্ছে এতক্ষণ!

—স্বামী-স্ত্রী নয় মশায়, ঐখানেই ওদের বিশেষত্ব। একেবারে জংলী, মেয়েটা ওর সঙ্গে থাকত।

চৌধুরী চীৎকারের সুরে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। কপাল কুঞ্চিত করে শুধু বলল,—সমাজবহির্ভূত জীব!

দারোগা বলল,—বিশেষণটি আপনার ঠিকই হয়েছে, সত্যিই সমাজের বাইরে বাস করত ওরা। ছোটমান্দার জেলেরা অনেকেই ওদের চেনে না। কবে কোন সময় ছোটমান্দার তালবনে ওরা ডেরা বাঁধল, তাও সকলের অজ্ঞাত। তারপর দুজনে আরম্ভ করে দিল তালের তাড়ির বে-আইনী ব্যবসা। আমার আগে যিনি ইনচার্জ ছিলেন, তিনি ত ওদের পাত্তাই করতে পারলেন না। তখন সরকার থেকে পাঠাল আমাকে, ফল দেখতেই পাচ্ছেন।

চৌধুরীর চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি, দারোগার মুখে সাফল্যের হাসি।

একটু বিরক্তির পর দারোগা আবার বলতে আরম্ভ করল,—আমাদের লোক ওদের ধরে ফেলেছে অনেক কায়দা করে। সন্ধ্যার সময় থেকে ওৎ পেতে বসেছিল ওদের ঘরের পাশে জঙ্গলের মধ্যে। শ্রীমতী ওদিকে ঘরের মধ্যে রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত, মধ্যে মধ্যে বাইরে এসে অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন আর ওদের দুর্বোধ্য ভাষায় গুণ্ গুণ্ করে গান করছেন। একেবারে পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে, গীতগোবিন্দের রাধিকার অবস্থা। পড়েননি বোধ হয়? আমার লোকজনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন, নেহাত পুলিশের লোক, নইলে—। যাক্, শ্রীমান্ সেদিন এলেন অনেক রাত্রে। দুজনে পাশাপাশি খেতে বসেছে সোহাগে গদগদ হয়ে, এমন সময় আমাদের লোক গিয়ে—তারপর বুঝতেই পারছেন, অবশ্য সকলের কাছেই আর্মস্ ছিল। কিন্তু ধরা কি সহজে দিতে চায়! মেয়েটি ভাতের থালা ছুড়ে মারল আমাদের জমাদারের দিকে, ভাগ্যিস্ সে সরে গিয়েছিল, নইলে তার মাথাটা সেদিন ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেত! তার পরেরকার ব্যাপার তো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন।

নিবিষ্টচিত্তে এই কাহিনী শুনতে শুনতে চৌধুরীর মনের মধ্যে কি একটা পুরোনো স্মৃতি নাড়া দিয়ে উঠল। চৌধুরী তখন তেইশ বৎসরের যুবক, গ্রামের এক আড়তদারের অধীন সামান্য বেতনের কর্মচারী। আড়তের কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হত তার, আর কুটীরের দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করত সদ্যবিবাহিতা তরুণী বধূ। তারপর রান্নাঘরে প্রদীপের আলোয় দুজনে একসঙ্গে খাওয়া; প্রথম প্রথম বধূর সে কী লজ্জা!

চৌধুরীর বুকের মধ্যে কী একটা ব্যথা খচ্ খচ্ করতে লাগল।

দারোগা চৌধুরীর ভাবান্তর লক্ষ্য করেনি। গুরুগম্ভির সুরে বলল,—ওদের সেই ডেরাটি দেখে সদরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। চলুন না, দুজনে একবার ঘুরে আসি ছোটমান্দায়।

ব্যস্তভাবে চৌধুরী বলল,—এখন, এই অবেলায়?

বেলা তখন সত্যিই বেশী ছিল না। থানার সম্মুখের মাঠ তালগাছের সুদীর্ঘ ছায়ায় ধুসর হয়ে গেছে। সাগর সঙ্গমে ঢেউএর চূড়ায় কনক কিরীটের শোভা, গঙ্গার পঙ্কিল জলরাশি অকস্মাৎ এক ভাস্বর দীপ্তিতে মহীয়ান হয়ে উঠেছে।

দারোগা বলল,—জোয়ার আরম্ভ হয়েছে, বেশ যাওয়া যাবে, একজন উইটনেসও আমার দরকার। তার উপর নদীতে সূর্যাস্তের এই শোভা, সত্যিই বিচিত্র! এইজন্যই তো লোকালয় ছেড়ে আপনাদের এই পান্ডববর্জিত দেশে এসে গেছি।

* * * *

বড়মান্দার ঘাট থেকে পারাপারের খেয়া ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ছোটমান্দার দৈনিক যাত্রীর দল নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বে নৌকায় ভিড় জমিয়েছে। মাছ বেচা টাকার অধিকাংশ নিঃশেষিত হয়েছে বড়মান্দার শৌণ্ডিকালয়ে, বাকী টাকায় পান, তামাক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল ছাড়া আর কিছু কেনা হয়ে ওঠেনি। এর মধ্যে একটু সাবধানী যাত্রীরা কিছু জামা-কাপড়ও কিনে ফেলেছে। নানাবিধ কলরবে খেয়াঘাট মুখরিত।

'ও শ্যাম খুড়ো, শাড়ী কিনলে কার লেগে?'

'রাধার লেগে।'

উচ্চ হাসির হিল্লোলে নৌকা একপাশে কাত হয়ে পড়ল।

তিরস্কারের সুরে মাঝি বলল,—একটু সবুর করগো তুমরা, ডাঙ্গায় নৌকো ডুবাবা নাকি!

একজন তখন গান ধরেছে,—শ্যাম সে বেসরে, শ্যাম বেশ মোর, শ্যাম শাড়ি পরি সদা!

আর একটি কণ্ঠস্বর এই সুরকে ছাপিয়ে উঠল,—গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা, রাধাময় সব দেখি!

শ্যামনামধারী ব্যক্তি এইবার নীরবতা ভঙ্গ করে গম্ভীর সুরে বলল,—তোদের গানের পিরিত্তিকে বলিহারী যাই। ছোটমান্দার শ্যাম-রাধা দ্যাখ্‌গে বড়মান্দার থানায় আটকান।

আশ্চর্য। এ কথাটা কারুরই স্মরণ ছিল না, মাত্র একবেলার পুরাতন কাহিনী তলিয়ে গেছে আবগারীর দোকানে। শ্যামের এই উক্তি ঝরণা-ধারার উৎসমুখে যেন একটা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড চাপিয়ে দিল।

মাঝির উদ্দেশে শ্যাম বলল,—নৌকো ছাড়তে দেরী কেন গা?

তীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মাঝি চুপ করে গেল। যাত্রীদের সম্মিলিত দৃষ্টি ভেদ করে দারোগা সদলে নৌকায় আরোহণ করল। প্রস্তরখণ্ড যেন আরও চেপে বসল তাদের বুকের উপর।

নৌকো ছেড়ে দিতেই দারোগা বলল চৌধুরীকে,—কিছু কষ্ট হবে না চৌধুরী মশায়, গরমের রাত, দিব্যি আরামে কাটিয়ে দেব ওদের সেই ডেরাতে। অভাব কিছুরই হবে না, রাত কাটানোর উপকরণও সঙ্গে আছে।

চৌধুরী নিম্নস্বরে বলল,—কিন্তু মশায়, দোকানে অত মালপত্তর, সিন্দুকে টাকাও মন্দ নেই, অবশ্য চাবি সঙ্গে এনেছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে চৌধুরী তাকাল বড়মান্দার তীরভূমির দিকে। নৌকা তখন চলে এসেছে নদীর মাঝামাঝি, তটভূমি ধুসর হয়ে আসছে। পশ্চিমাকাশে একখণ্ড কালো মেঘ দিকচক্রবালের আরক্ত পটভূমিকায় সূর্যের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। নৌকারোহীরা নিথর, নিস্পন্দ, কিন্তু তাদের চোখমুখে প্রকট হয়েছে একটা বিজাতীয় ঘৃণা।

দারোগা বলল,—এরা আমাদের ভাল চোখে দেখে না চৌধুরী মশায়। কিন্তু কি করব, সরকারকে অনেক টাকা ফাঁকি দেয় এরা। আজকাল রোজগারও এদের ভাল, কিন্তু স্বভাবের দোষ যাবে কোথায়।

চৌধুরী চোখ ফিরিয়ে বসেছিল ছোট-মান্দার দিকে। ছোট ছোট কুটীর দেখা যাচ্ছে তালগাছের অন্তরালে। চৌধুরী যেন কল্পনায় অনুভব করতে লাগল কুটীরের শুভ্রতা। বধূরা গৃহকার্যে ব্যাপৃত। ধূলিধূসরিত ছেলেমেয়েরা আঙ্গিনায় তুলেছে কলরব। ভালমন্দ মিশান ছোটমান্দার এই জগত, বড়মান্দার সঙ্গে তুলনায় খুব খারাপ মনে হল না।

চৌধুরী মশায় জপ করছেন নাকি! দারোগার বিদ্রূপকণ্ঠে চৌধুরীর চমক ভাঙ্গল। ছোটমান্দার তীরে নৌকা কখন ভিড়েছে, চৌধুরী আনমনা অবস্থায় বাস্তবিক টের পায়নি। চারিদিকে চেয়ে দেখে নৌকা আরোহী-শূন্য, শুধু বসে সে একা।

তীরে নামতে নামতে চৌধুরী বলল,—জপতপ নয় মশায়, নদীর হাওয়ায় একটু ঘুমের মত এসেছিল।

রাত তখন অনেক। কুটীর প্রাঙ্গণে পুলিশের লোক ঘুমে অচেতন। ভিতরে একটা ভাঙ্গা তক্তপোষে পাশাপাশি দুটি বিছানা, একটিতে নাসিকাগর্জনরত দারোগা, অপরটিতে বিনিদ্র চৌধুরী। বাইরে জ্বলছে একটা উজ্জ্বল ডেলাইট, অনেকখানি আলো কুটীরের ভিতরে এসে পড়েছে।

চৌধুরী বিছানায় বসে চারিদিকে তাকাল। ছোট্ট একটুখানি ঘর, ছাঁচের বেড়া দিয়ে ঘেরা। অস্ত্রের মধ্যে এককোণে হেলান দেওয়া দুটি বর্শা, ধারালো ফলা অন্ধকারেও চকচক্ করছে। আর এক কোণে রান্নাবাড়ির সরঞ্জাম, হাঁড়িতে সিদ্ধ ভাত শুকিয়ে গেছে। আবগারী বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে আসছে, কিন্তু অর্থ-সামর্থ্যের নিদর্শন কোথায়? চৌধুরী ঘরের বাইরে দাঁড়াল।

নিস্তব্ধ গভীর রাত, একটা ঝিঁঝির ডাকও শোনা যায় না। শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ কখন অস্ত গেছে, অন্ধকার জগতে জাগ্রত শুধু তারকার মালা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে চৌধুরী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কুটীরের দিকে।

তালপাতার ছাউনি,—রৌদ্রতাপে বিবর্ণ। তালগাছের খুঁটি উইপোকায় খেয়ে গেছে, ছাঁচের বেড়া স্থানে স্থানে ভাঙ্গা। ঘরে সিন্দুক নেই, মালপত্রের বালাই নেই। এরি মধ্যে বাস করত দুটি বিদ্রোহী মানবাত্মা,—সভ্য জগৎ থেকে বহুদূরে।

কিন্তু একি সম্ভব? বে-আইনী মদ্য বিক্রয়ের বিপুল অর্থ গেল কোথায়? কোন গুপ্তস্থান আছে নিশ্চয়। চৌধুরী জোরালো টর্চের সাহায্যে অন্বেষণ শুরু করে দিল।

নিশিতে পাওয়ার মত জঙ্গলের মধ্যে চৌধুরী চলেছে। চারিদিকে অন্ধকারের আবেষ্টনী ভেদ করে টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়ছে শিশুর মুক্তকণ্ঠ হাসির মত। মৃত্তিকার স্পর্শ কোথাও নরম নয়—চৌধুরী বিশেষভাবে পরখ করছে তালবৃক্ষের নিম্নস্থিত ভূমি। কঠিন শক্ত মাটি, তালগাছের শিকড় পৃথিবীর বুক থেকে স্নেহের শেষবিন্দুটুকু নিঃশেষে লুণ্ঠিত করেছে।

কি একটা জিনিসে হোঁচট খেয়ে চৌধুরী থেমে গেল। সাগ্রহে জিনিসটা তুলে নিল সে—চামড়ার থলে একটা। সাফল্যগর্বে চোখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। থলের মুখ খুলতে সাহস হল না, ভিতরে ঝনঝম শব্দ। কী মিষ্টি সুর, চৌধুরীর বুকের মধ্যে যেন বাজনা বাজতে লাগল।

কাজ শেষ হয়নি এখনও—পুলিশকে ফাঁকি দিতে হবে। চৌধুরী থলেটা অনেক কায়দা করে লুকিয়ে ফেলল কাপড়ের ভিতর, তারপর ফিরে চলল ফেলে আসা কুটীর প্রাঙ্গণে।

আবার সেই পথ তালবনের ভিতর দিয়ে। পথচলতি চৌধুরী শুধু ভাবছে, এত টাকার মায়া ওরা কেমন করে ত্যাগ করে গেল। অব-হেলায় ফেলে গেল পথের ধূলায়, এই জন-বিরল দ্বীপে গুপ্তস্থানের অভাব তো ছিল না। কী সাংঘাতিক প্রাণ এই মেয়েপুরুষের, কোমলতার লেশমাত্র নাই।

* * * *

পরদিন সকালবেলা ছোটমান্দার যাত্রীবাহী নৌকা বড়মান্দার তীরে ভিড়তেই চৌধুরী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ডাঙার উপর উত্তেজিত-ভাবে অপেক্ষা করছে কয়েকজন পুলিশের লোক, দারোগাও যেন একটু বিচলিত হল। নদীতীর জনশূন্য হতেই জমাদার ভাঙা গলায় সংবাদ দিল,—আসামী ভেগেছে।

যুগপৎ প্রশ্ন করল দারোগা ও চৌধুরী—কোন্ আসামী?

—কালকের, হুজুর! পালিয়েছেও ভারী চালাকি করে। আমার তো এত বরষ চাকরি হল, এমনটি আর দেখি নাই। মেয়েটার মাথায় ছিল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লম্বা চুল, সব কেটে ফেলে কাপড়ের পাড় দিয়ে দড়ি পাকিয়েছে। তারপর বেঁধেছে দরজার সঙ্গে আর লক্-আপের ফোকরের গরাদের সঙ্গে। এর পর গরাদ ভেঙে পালাতে আর কতক্ষণ। ওসব বুনো জানোয়ার আটকান ভারী কঠিন হুজুর। স্বাধীন থাকতে না পারলে টাকা-পয়সার মায়াও ওরা ভুলে যায়।

চৌধুরীর মাথার মধ্যে হঠাৎ ঘুরে উঠল। তার দোকান-ভাড়া মালপত্র, সিন্দুকে যথা-সর্বস্ব। মনে মনে দারোগা ও জমাদারকে অভিসম্পাত করতে করতে চৌধুরী ছুটল বাজারের দিকে। পিছন থেকে শুনতে পেল দারোগার চীৎকার,—সময়মত একবার থানায় আসবেন, একজন উইটনেস্ দরকার।

খেয়াঘাট থেকে সোজা পথে বাজারের দূরত্ব এক মাইল। ঘন এক জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গেলে পথের পরিমাণ অর্ধেক কমে যায়। চৌধুরী সবেগে প্রবেশ করল এই জঙ্গলের ভিতর। তার অবস্থা তখন উন্মাদের মত। দু হাতে লম্বা ঘাস সরিয়ে পথ রচনা করে চলেছে। পায়ে চলা পথ হয়ত একটা আছে, কিন্তু তার নিশানা চৌধুরী হারিয়ে ফেলেছে। পথ আর ফুরোয় না। চারিদিকে শুধু ঘাস আর জংলী গাছের সমারোহ। বনের মধ্যে দিনের আলো তখনও ভাল ফোটেনি, পায়ে-চলা পথের সন্ধান কোথায়। এতক্ষণে চৌধুরীর হুঁস হল,—সে পথ হারিয়েছে। ভগবান আছে দেখছি,—ওদের টাকা আমি পেলাম, ওরা এদিকে নিশ্চয় আমার সিন্দুক ভেঙেছে। কাল রাতে থানা থেকে পলাতক, সারা রাত চুপ করে বসে থাকেনি নিশ্চয়।

চিন্তামগ্ন চৌধুরীর বুক ছাপিয়ে হাসির একটা ঢেউ বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু শব্দ একটা আসছে কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে। সমুদ্রের গর্জন নয় ত! খানিকক্ষণ পরে চৌধুরীর মনে হল শব্দটা যেন কান্নার। ভয়ে কুণ্ঠিত হয়ে গেল চৌধুরী, ওঃ দারোগার জন্যই তার এই দশা! শেষ পর্যন্ত অবশ্য মানুষের কৌতূহলই হল জয়ী।

চৌধুরী অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হল অরণ্যের গভীরতম প্রদেশের দিকে। সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় ঠিক মধ্যাহ্নের সময়। বিহঙ্গের কাকলী সেখানে নিস্তব্ধ, চারিদিক জুড়ে শুধু একটা বিরাট ব্যাকুলতা। অরণ্যের ক্ষুধাতুর আহ্বানের সঙ্গে মিশে গেছে সমুদ্রের হুঙ্কার। আর এক অনিবার কান্নার শব্দে বনের হাওয়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

সম্মুখের দৃশ্যে চৌধুরী থমকে দাঁড়াল স্ট্যাচুর মত বিশালদেহ এক পুরুষ মূর্তি-কার উপর মুদ্রিত নেত্রে শয়ান, তার পাশে একটি সাপ পড়ে আছে খণ্ড বিখণ্ড অবস্থায়, আর এক মুণ্ডিতকেশা নারী পুরুষের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে; কান্না বোধ হয় তার কোনদিনই থামবে না।

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—**শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়**

(পূর্বানুবৃত্তি)

গীতকালের ভিতর ফাদার এনসীমকে আমি বুঝে নিলাম। তিনি এক পূর্ব ব্যক্তি। কখনও তাঁকে বিরক্ত হতে ‍খিনি। সুমধুর তাঁর প্রকৃতি, করুণ স্বভাব, প্রত্যাশিতভাবে উদার চিত্ত আর আশ্চর্য তাঁর হিষ্ণুতা। তাঁর পাণ্ডিত্য অপরিসীম। তিনি শ্চয়ই জানতেন আমি কত অজ্ঞ, তবু মার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন যেন মি পাণ্ডিত্যে তাঁরই সমতুল। আমার পর্কে তাঁর অসীম ধৈর্য, আমার জন্য কিছু রাতেই তাঁর আনন্দ বেশী। একদিন কেন নিনা আমি লাম্বাগোয় আক্রান্ত হ'লাম, ড়িওয়ালীর মেয়ে ফ্রাউ গ্রাবাউ জোর করে ম জলের বোতল দিয়ে আমাকে বিছানায় ইয়ে দিলেন। আমি শয্যাশায়ী শুনে পারের পর ঘুরে আমাকে দেখতে লেন। শুধু ভীষণ যন্ত্রণা ছাড়া মোটামুটি মি ভালোই ছিলাম। জানেন ত' যারা গ্রন্থ-টি হয় তাদের কি স্বভাব, তারা সর্বদাই বই ম্বন্ধে কৌতূহলী, তাই উনি আস্‌তেই মি যে বইখানি নামিয়ে রেখেছিলাম সেখানি লে নিলেন, শহরের একটি বইয়ের দোকান কে মিস্টার লকহার্ট সম্পর্কিত এই বইটি নেছিলাম। আমি কেন এই বইটি পড়ছি নি প্রশ্ন করাতে আমি তাঁকে কোস্‌তির থা বললাম, সেই আমার মনে মরমী সাহিত্যের তূহল জাগিয়ে তুলেছিল, আমি কিছু রিমাণে তাই মরমী সাহিত্য পড়ছি। তিনি র সেই সুস্পষ্ট নীল চোখ দিয়ে আমার নে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, সেই দৃষ্টিতে কটা খুশিভরা কোমলতার আমেজ মেশানো ল। আমার মনে হ'ল যে, তিনি আমাকে ভুত মনে করছেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর নই করুণা মাখানো মমতা যে, তার জন্য র ভালোবাসা হ্রাস পায় না। যাই হোক্, কেউ দ আমাকে কিঞ্চিৎ নির্বোধ ভাবে সে বিষয়ে মি কোনোদিনই মাথা ঘামাইনি।

তিনি আমাকে বল্লেনঃ "এই সব বই-এর ভতর কিসের সন্ধান করছ?"

জবাবে আমি বল্লামঃ "তা যদি জান্‌তাম, তাহ'লে তা পাওয়ার পথে পৌঁছতাম।"

"তোমার মনে আছে, একবার তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তুমি প্রোটেস্টাণ্ট কিনা? তুমি বলেছিলে, তাই ত' মনে হয়—কি তার অর্থ?"

আমি বল্লামঃ "সেইভাবেই মানুষ হয়েছি।"

তিনি প্রশ্ন করলেন, "ভগবানে বিশ্বাস কর?"

আমি ব্যক্তিগত প্রশ্ন ভালোবাসি না, তাই প্রথমটা বলব মনে করেছিলাম—সে বিষয়ে ওঁর মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটা মহানুভবতা ছিল যে তাঁকে কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হ'ল। কি যে বলি ভেবে পেলাম না। হ্যাঁ বলারও ইচ্ছা নেই, না বল্‌তেও চাইনা, হয়ত আমার বেদনার জন্যই বল্লাম, বা তিনিই বলালেন। যাই হোক্, তাঁকে আমার কথা বল্‌লাম।"

লারী এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল, তার-পর যখন বলতে শুরু করল, তখন বুঝলাম আমার কাছে নয়, সে সেই বেনিডিকটিন তাপসের কাছেই কথা বলছে। সে আমাকে ভুলে গেছে, এতকাল প্রকৃতিগত দ্বিধায় যা সে অকথিত রেখেছে আজ স্থান বা কাল কি যে তাকে আমার বিনা প্রশ্নেই কথা বলাচ্ছে তা জানি না।

"বব নেলসন খুড়ো অত্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ডেমোক্রাট ছিলেন, মারভিনের হাই স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, শুধু লুইসা ব্রাডলীর জেদে তিনি আমায় চোদ্দ বছর বয়সে সেণ্ট পলে পাঠিয়েছিলেন,—আমি কোনো বিষয়েই তেমন ভালো ছিলাম না, খেলাধূলো বা পড়াশোনা কোনোটিতেই নয়, কিন্তু ঠিক মানিয়ে নিয়েছিলাম। মনে হয় আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছেলেই ছিলাম। বিমান চালনার দিকে আমার অতিশয় ঝোঁক ছিল। তখন বিমানের প্রাথমিক যুগ, বব খুড়োও আমার মতই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন; তাঁর কয়েকজন বৈমানিকের সঙ্গে জানাশোনা ছিল, আমার আগ্রহ দেখে তিনি ব্যবস্থা করে দিতে রাজী হ'লেন। বয়সের অনুপাতে আমি লম্বা ছিলাম, ষোলো বছরেই আঠারোর মত দেখাত। ববখুড়ো কথাটি গোপন রাখতে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন আমাকে এভাবে যেতে দিলে সবাই তাঁর ওপর চট্‌বে। কিন্তু তিনি ক্যানাডায় পরিচিত একজনের নামে চিঠি দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, ফলে সতের বছর বয়সেই আমি ফ্রান্সে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌লাম।

"তখনকার কালে অতি ভয়ংকর বিমানে আমরা ঘুরে বেড়াতাম, ওপরে ওঠার সময় একরকম প্রাণটা হাতে করেই উঠে পড়তে হ'ত। এখনকার মানানুসারে তখন আমরা যত দূরে উঠতাম তা অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আমরা এর বেশী জানতাম না, আর অতি অদ্ভুত মনে হ'ত। আমি উড়তে ভালোবাসতাম। এতে যে কি অনুভূতি হয়েছিল তা বলতে পারব না। এইটুকু শুধু জানি আমি অত্যন্ত সুখী ও গর্বিত বোধ করতাম। ওপরে উঠলে মনে হত আমি একটা বিরাট ও অতি সুন্দর কিছুর অংশবিশেষ। সে যে কি তা জানতাম না। তবে শুধু জানতাম আমি আর একা নই, আমি ঊর্ধ্বলোকের প্রাণী। বোকার মত কথা মনে হলে আমি আর কি করব। যখন আমি মহাশূন্যে মেঘলোকে বিচরণ করতাম আর নীচেকার সব কিছু মেষপালের মত মনে হত, তখন মনে হত আমি অনন্তে মিশে গেছি—অসীমের মাঝে।"

লারী থাম্‌ল। তার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হেনে আমাকে একবার দেখে নিল, কিন্তু আমাকে দেখতে পেল কিনা কে জানে? তারপর বল্লেঃ

"হাজার হাজার লোক মারা যায় আমি জানি, কিন্তু কখনো তাদের কাউকে মরতে দেখিনি, তাই সেই দৃশ্যে আমার মন অপরিসীম লজ্জায় ভরে উঠ্‌ল।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে ফেল্লামঃ "লজ্জা?"

"হ্যাঁ, লজ্জা এই কারণে যে, যার মৃত্যু হল আমার চাইতে সে ছেলেটি বয়সে মাত্র তিন চার বছরের বড়, কি তার উৎসাহ, কি সাহস, এক মুহূর্ত পূর্বেও যে ছিল প্রাণরসে উচ্ছল, এত সৎ, সে এখন মাংসপিণ্ড মাত্র, দেখে মনে হয় যেন কোন দিনই তার প্রাণ ছিল না।"

আমি কিছু বল্লাম না। চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নকালে আমি অনেক মৃত মানুষ দেখেছি, যুদ্ধের সময়েও অনেক দেখ্‌লাম, আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবতাম কি অদ্ভুত ওদের দেখায়। এতটুকু মান মর্যাদা নেই। যেন অবহেলায় ফেলে দেওয়া পুতুল নাচের পুতুলের দল।

"সে রাতে আমার ঘুম হ'ল না, আমি কাঁদলাম। তারই নির্মমতায় আমি

ভেঙে পড়লাম। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল বাড়ি ফিরে এলাম। চিরদিনই যন্ত্রপাতির ব্যাপারে আমার ঝোঁক ছিল। তাই ভাবলাম যদি এরোপ্লেনের কাজ না থাকে তাহ'লে কোনো একটা মোটর কারখানায় ঢুকে পড়ব। আমি আহত হয়ে পড়েছিলাম। সারতে কিছুদিন গেল। তারপর সবাই বল্ল আমাকে কাজে ফিরতে। ওরা যা চেয়েছিল সে কাজে যোগ দিতে আমি পারলাম না। সব কেমন যেন নিরর্থক মনে হল। আমার চিন্তা করার অনেক অবসর ছিল। মনে মনে প্রশ্ন করতাম—জীবনটা কিসের জন্য—যাই হোক্ নেহাৎই ভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে আছি; জীবনটা দিয়ে কিছু একটা করতে চাই, কিন্তু কি যে করব ভেবে পাইনি—ঈশ্বর সম্বন্ধে আগে তেমন ভাবিনি কখনও, এখন তাঁর কথা চিন্তা করতে লাগলাম। পৃথিবীতে কেন এত কলুষ ভাবতাম, জানতাম আমি অতি অজ্ঞ; কারো কাছে গিয়ে যে সব জেনে নেব, এমন কেউ আমার ছিল না, আমার জানার বাসনা প্রবল, তাই যেমন তেমন—যা পেলাম তাই পড়তে শুরু করলাম।

"ফাদার এনসীমকে যখন এই কথা বল্লাম, তিনি বল্লেনঃ 'ও তুমি তাইলে চার বছর ধরে পড়ছ? কোথায় পেঁছেচ?'

আমি বল্লাম "কোথাও নয়!"

"তিনি আমার মুখের দিকে এমন এক মহান ভঙ্গীতে তাকালেন যে, আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। তাঁর মনে এমন ভাব জাগিয়ে তোলার মত কি যে আমি করেছি তা আমি জানতাম না, তিনি টেবলে অতি মৃদুভাবে তাঁর আঙ্গুল ঢাক পেটার ভঙ্গীতে ঠুকতে লাগলেন, যেন মনে মনে একটা সুর ভাঁজছেন।

তিনি তারপর বল্লেনঃ "আমাদের প্রাচীন চার্চ আবিষ্কার করেছেন যে, বিশ্বাস মত যদি তুমি কাজ কর, তাহ'লেই বিশ্বাস মিলবে। যদি সন্দেহযুক্ত হয়ে প্রার্থনা কর অথচ মনে আন্তরিকতা থাকে, তাহ'লেই তোমার সন্দেহের ঘোর কেটে যাবে। যে উপাসনা মন্ত্রের বল যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে শক্তি এনেছে, যদি তুমি তার কাছে নতি স্বীকার কর, তাহলেই তোমার মনে শক্তি আসবে। আমি কিছুকালের ভিতরেই আমাদের মঠে ফিরব, আমার সঙ্গে গিয়ে দু চার সপ্তাহ কাটিয়ে এস না কেন? আমাদের কর্মীদের সঙ্গে মঠে কাজ করবে। কয়লার খনি বা জার্মান খামারে কাজ করার চাইতে এ তোমার কম অভিজ্ঞতা হবে না।"

আমি বল্লামঃ "এ প্রস্তাব করছেন কেন?"

তিনি বল্লেনঃ "আমি গত তিন মাস ধরে তোমাকে লক্ষ্য করছি, হয়ত তুমি নিজেকে যা জানো তার চেয়ে বেশী করেই আমি তোমাকে জানি। ধর্মবিশ্বাস থেকে তোমার মনের ব্যবধান সিগারেটের কাগজের চাইতেও স্থূল নয়।"

"আমি তাতে কিছু বল্লাম না—এতে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হ'তে লাগল, যেন কে আমার জীবনতন্ত্রীতে টান দিচ্ছে। পরিশেষে মনে করলাম ভেবেই দেখা যাক বিষয়টা। উনি এ বিষয়ে আর কিছু বল্লেন না। 'বনে'তে ফাদার এনসীমের অবস্থানকালে আমার আর কখনো ধর্ম সম্বন্ধে কোনো কথা হয়নি, কিন্তু উনি যাওয়ার সময় ও'র মঠের ঠিকানা আমাকে দিয়ে বল্লেন, যদি আমি মঠে যাওয়া সম্বন্ধে মন স্থির করি তাহলে তাঁকে লিখলেই তিনি সব বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখবেন। বছর ঘুরে এল, গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, 'বনে'তে গ্রীষ্মকাল বেশ ভালো লেগেছিল—গ্যয়টে, শীলর, ও হাইনে পড়ে ফেললাম। হোলডারলীন ও রীলকেও পড়লাম। তবু যেন কোথাও পেঁছিতে পারলাম না। ফাদার এনসীম যা বলেছিলেন সেই বিষয়ে প্রচুর চিন্তা করে অবশেষে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করলাম।

স্টেশনেই উনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আলসা'সে মঠটি প্রতিষ্ঠিত, চমৎকার দেশ। ফাদার এনসীম মঠাধ্যক্ষের কাছে আমাকে হাজির করলেন ও আমার জন্য যে কুঠুরীটা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটি দেখালেন। ঘরে একটি সংকীর্ণ লোহার খাট, দেয়ালে একটি ক্রস চিহ্ন ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু'চারটি জিনিসপত্র ছিল। ডিনারের ঘণ্টা বাজল—আমি ভোগমণ্ডপে গেলাম, খিলানকরা প্রকাণ্ড ঘর। দরজায় মঠাধ্যক্ষ ও দ'জন খৃষ্টীয় সাধু দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের একজনের হাতে একটি জলপাত্র অপরের হাতে তোয়ালে, মঠাধীশ প্রত্যেকের হাতে কয়েক ফোঁটা জল দিলেন হাত ধোওয়ার জন্য—আর তোয়ালে নিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন। আমি ছাড়া আরো দুজন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। দুজন ভ্রমণকারী সাধু ডিনারের জন্য এসেছেন আর একজন ফরাসী ভদ্রলোক, এখানেই বাস করেন।

"মঠাধীশ ও সাধু দুজনে ঘরের গোড়ার দিকে বিভিন্ন টেবলে বসলেন, ফাদাররা দেয়ালের দুইপাশে, আর যাঁরা শিক্ষার্থী, ও চেনা এবং অতিথি তাঁদের আসনের বন্দোবস্ত হয়েছে মাঝের টেবলে। প্রার্থনাবাক্যের পর আমরা খেলাম। একজন শিক্ষার্থী দ্বারপ্রান্তে আসন নিয়ে একঘেয়ে সুরে একখানি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে লাগলেন। আমাদের আহার শেষ হওয়ার পর পুনরায় প্রার্থনা হল। মঠাধীশ, ফাদার এনসীম, অতিথিরা এবং তাঁদের ভারপ্রাপ্ত সাধু একটি ছোট ঘরে গেলেন, সেইখানে কফি পান করা হ'ল আর অপ্রাসঙ্গিক নানা কথাবার্তা হল। তারপর আমি আমার কুঠুরীতে ফিরে এলাম।

"আমি তিন মাস সেখানে ছিলাম। অতি সুখেই ছিলাম। এখানকার জীবন আমার ভারী সয়ে গিয়েছিল—লাইব্রেরীটা খুব ভালো, আমি খুব পড়লাম। ফাদাররা কেউ কোনোভাবে আমাকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলতে আনন্দিত হতেন। তাঁদের পাণ্ডিত্য, ধর্মনিষ্ঠা ও সংসার বিমুখতায় আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হলাম। উপাসনাদি আমার খুবই ভালো লাগত, কিন্তু বিশেষ করে ভালো লাগত প্রভাতী উপাসনা। ভোর চারটার সময় এই প্রভাতী উপাসনা হ'ত। রাত্রির অন্ধকারে ঘেরা গীর্জায় বসে এইভাবে সাধুদের পুরুষালি কণ্ঠে উচ্চারিত সরল স্তোত্রাবলী ভারী চমৎকার শোনাত। প্রতিদিনের এই নিয়মিত অনুষ্ঠান, চিন্তার সক্রিয়তা ছাড়াও মনে একটা অপরূপ প্রশান্তি এনে দেয়।"

লারী ঈষৎ খেদভরে হাসল।

"রলাঁর মত, আমিও অতি প্রাচীন পৃথিবীতে অতি দেরীতে এসে পড়েছি। মধ্যযুগে ধর্মবিশ্বাস যখন অবশ্যম্ভাবী ছিল তখন আমার জন্মান উচিত ছিল, তখন আমার পথ পরিষ্কার থাকত আর আমিও যে কোনো সম্প্রদায়ে ঢুকে পড়তে পারতাম। আমি কিছুতেই বিশ্বাস আনতে পারি না—বিশ্বাস করতে চাই,—কিন্তু যে বিধাতা সাধারণ ভদ্রলোকের মত নয়, তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস নেই। খৃষ্টীয় সাধুরা আমাকে বলেছিলেন যে, ঈশ্বর স্বীয় গরিমা প্রকাশের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমার কাছে তা বিশেষ করণীয় ব্যাপার বলে মনে হয় না—বীটোফেন কি তাঁর গরিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে সিম্ফনী রচনা করেছিলেন। আমার ত তা বিশ্বাস হয় না, আমি বিশ্বাস করি যে অন্তরের সুর মূর্চ্ছনা একটা অভিব্যক্তি চেয়েছিল, আর তাই তিনি স্বীয় শক্তি অনুসারে সার্থক সুরসৃষ্টি করেছিলেন।

"সাধুরা ঈশ্বরের প্রার্থনা করতেন আমি শুনতাম—সবিস্ময়ে ভাবতাম কি করে ওরা বিনা সংশয়ে পরমপিতার কাছে প্রতিদিনের জন্য রুটি প্রার্থনা করেন, শিশুরা কি তাদের প্রাণধারণের জন্য জাগতিক জনককে রুটি দেওয়ার জন্য অনুনয় করে? তারা আশা করে তিনি তার ব্যবস্থা করবেন, এই কাজ করার জন্য তারা কৃতজ্ঞতা বোধ করে না, করার প্রয়োজনও নেই, আর আমরা সেই সব মানুষকে নিন্দা করি যারা পৃথিবীতে সন্তানের জন্ম দিয়ে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারে না। আমার মনে হয়েছিল যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা যদি তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের আত্মিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে না পারেন তাহলে সেই স্রষ্টা প্রাণ সৃষ্টি না করলেই ভালো করতেন।"

আমি বল্লাম, "ভায়া লারী, আমার মনে হয় মধ্যযুগে না জন্মে তুমি ভালোই করেছ। এ কথার বিপাকে পড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে।"

লারী হাসল।

সে বলে চলে, "আপনার ত' প্রচুর সাফল্য য়েছে, আপনি কি আপনার মুখের ওপর শংসা শুনতে চান।"

"তাতে আমি কুণ্ঠিত হই।"

"আমিও ত' তাই মনে করি। আমার ত' শ্বাস হয় না ভগবানও অন্য কিছু চান। ামারও বিমান বাহিনীতে কম্যাণ্ডিং াফিসারকে তোষামোদ করে যদি কেউ তার াকুরীর সুবিধে করে নিত তাহলে খুশি হতাম া। আমার পক্ষে একথা বিশ্বাস করা কঠিন া বিধাতা তোষামোদে সন্তুষ্ট হয়ে মুক্তির াপায় করে দেবেন। আমার ত মনে হয় সেই াপাসনাই তাঁর কাছে সবচেয়ে আনন্দের যা াীয় জ্ঞানানুসারে মানুষের শ্রেয় বলে মনে হয়।

"কিন্তু শুধু এই ব্যাপারটাই আমাকে যে াীড়া দিতে লাগল তা নয়, আমার ত যতদূর নে হয় সাধুদের চিন্তায় পাপের কথাটাও নেকখানি অস্বীকার করে যাকে এই কথাটা মামি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না,—বমান বাহিনীতে আমি অনেককে জানতাম, ারা অবশ্য সুবিধে পেলেই মদ খেত, যখনই ম্ভব হত স্ত্রীলোক সংগ্রহ করত আর অশ্লীল াষা প্রয়োগ করত। আমাদের ভিতর দু তিনটি সৎ লোক ছিল, জাল চেক দেওয়ার ফলে কজনের ছ' মাসের জেল হয়েছিল। সবটাই শ্য তার অপরাধ ছিল না, পূর্বে কখনও সে াকার মুখ দেখেনি, যখন সে কল্পনাতীত অর্থ পল তখন তার মাথা ঘুরে গেল, আরো নেককে আমি জানতাম—তবে অধিকাংশ লেই তাদের অসাধুতার জন্য বংশক্রমই দায়ী, যখানে তাদের পক্ষে বিচার করে বেছে নেওয়ার মতা ছিল না। সমাজ যে তাদের অপরাধের ন্য কম দায়ী তা আমি মনে করি না। আমি দি বিধাতা হতাম তাহলে তাদের কাউকেই পরাধী করতে পারতাম না, তাদের অনন্ত রকের ব্যবস্থাও করতাম না। ফাদার এনসীম বেই উদারচেতা; তাঁর ধারণা ছিল নরক ঈশ্বর-বরহিত অঞ্চল, কিন্তু সেই শাস্তি যদি সহনীয় হয়, তাহলে কেউ কি বলতে পারে রমকারুণিক ঈশ্বর পাপীকে সেই চরম াস্তি দেবেন? যাই হোক, মানুষ তাঁরই সৃষ্ট প্রাণী, তিনি যদি তাদের পাপপ্রবণ ক'রে সৃষ্টি রে থাকেন, তাহ'লে বলতে হবে পাপ তারা রুক, এও তাঁর বিধান। আমি যদি আমার কুরকে এমনভাবে শিক্ষিত করি যে, আমার খড়কিতে যে আসবে সে তার টুঁটি টিপে রবে, তাহলে সে কার্য করলে তাকে প্রহার রাটা আমার পক্ষে ন্যায়সংগত হবে না।

যদি সর্বমঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান বিধাতা পৃথিবী সৃষ্টি করে থাকেন, তাহ'লে কেন তিনি পাপের সৃষ্টি করেছেন? খৃষ্টীয় সাধুরা বলেন যে মানুষ তার অন্তর্নিহিত পাপ প্রবৃত্তি জয় করে, লোভ দমন করে, বেদনা, ক্লেশ ও শোক সহ্য করে, বহুবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে নিজেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের জন্য যোগ্য ও পবিত্র করে তুলবে। আমার মনে হল এ যেন একটা বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়ার ভার দিয়েছি একজনকে। কিন্তু তার কর্তব্য কঠোর করে তোলার জন্য পথে একটি গোলক-ধাঁধা তৈরী করলাম—তার ভিতর দিয়ে তাকে যেতে হবে, তারপর একটা খাল কাটলাম, সাঁতরে পার হতে হবে, পরিশেষে একটা পাঁচিল তুলে দিলাম, সেটি বেয়ে উঠে ওপাশে যেতে হবে। সর্ব জ্ঞানবান ভগবানের যে সাধারণ বুদ্ধিটুকুও নেই একথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি ত' ভেবে পাই না কেন আমরা এমন ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করব না, যাঁকে মন্দের ভিতর থেকে যেটুকু ভালো তাই করতে হয়, কারণ তিনি সাধারণ মানুষের চাইতেও বিরাট, জ্ঞানবান ও শক্তিমান, যে কলুষ তাঁর সৃষ্ট নয়, তার সংগে যুঝতে হচ্ছে, পরিণামে তাকে জয় করার আশায়। কেন যে এ বিশ্বাস করবেন তাও বলতে পারি না।

"যেসব প্রশ্ন আমাকে ধাঁধাগ্রস্ত করে তুলেছিল ওখানকার সজ্জন ফাদাররা তার কোনো জবাব দিয়ে আমার হৃদয় বা মনকে জয় করতে পারলেন না। আমার স্থান তাঁদের কাছে নয়। আমি যখন ফাদার এনসীমের কাছে বিদায় জানাতে গেলাম তখন তিনি তাঁর ধারণানুসারে অভিজ্ঞতা লাভ করে আমি লাভবান হলাম কিনা সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানতে চাইলেন না। অব্যক্ত করুণাভরে তিনি আমার দিকে তাকালেন—

আমি বল্লাম "ফাদার, আমি আপনার হতাশার কারণ হ'লাম।"

তিনি বললেন, "না, তুমি ঈশ্বর অবিশ্বাসী পরম ধার্মিক। ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে সন্ধান করে নেবেন। তুমি ফিরে আসবে। তবে এখানে কি অন্যখানে তা শুধু ঈশ্বরই জানেন।"

"বাকী শীতটুকু আমি প্যারীতেই রয়ে গেলাম। বিজ্ঞানের কিছুই আমার জানা ছিল না—ভাবলাম ও বিষয়ে অন্ততঃ কিছু জানার সময় হয়েছে। প্রচুর পড়লাম। আমি যে খুব বেশী শিখলাম, তা বলতে পারি না, শুধু জানলাম আমার অজ্ঞতা অপরিসীম। কিছু পূর্বেও ত' তাই জানতাম। বসন্তকালে আমি একটা পল্লী অঞ্চলে গিয়ে নদী প্রান্তে ছোট এক সরাইয়ে উঠলাম, প্রাচীনকালের মনোরম ফরাসী শহর, জীবন সেখানে দু'শ' বছর থেমে দাঁড়িয়ে আছে।

অনুমান করলাম এই বসন্তকালটাই লারী ফজোল রুভায়ারের সংগে কাটিয়েছে, তবে ওর কাজায় বাধা দেওয়ার বাসনা আমার ছিল না।

তারপর আমি স্পেনে গেলাম। ভ্যালাস-কুয়েজ ও এল গ্রেচো দেখার বাসনা ছিল, ভাবছিলাম ধর্ম আত্মাকে যা দিতে পারল না শিল্প তার সন্ধান দিতে পারবে কিনা। এদিক ওদিক কিছু ঘুরে সেভাইলে এলাম। আমার বেশ ভালো লাগল, ভাবলাম—শীতকালটা এখানেই কাটিয়ে দিই।

যখন তেইশ বছর বয়স, তখন আমিও সেভাইলে গিয়েছিলাম, আমারও জায়গাটা খুব ভালো লেগেছিল। ওখানকার শাদা ঘোরালো রাস্তাগুলি, গীর্জা, গুইদাল কুইভিরের প্রশস্ত উপত্যকা, আমার ভালো লেগেছিল; কিন্তু আন্দালুসিয়ান মেয়েদের বড় ভালো লেগেছিল, তাদের ভঙ্গীমার মনোহারিত্ব, উজ্জ্বল কালো চোখ, চুলের ওপর গোঁজা লাল কারনেশন ফুল বর্ণবৈচিত্র্যের এক অপূর্ব সমাবেশ সৃষ্টি করে, ঠোঁটে তাদের আমন্ত্রণের ইসারা। তখনকার তারুণ্য স্বর্গতুল্য। লারী যখন ওখানে গিয়েছিল তখন আমার চেয়ে তার বয়স সামান্য বেশী ছিল, তাই মনে মনে একথা না ভেবে পারলাম না যে, সেই সব মায়াবনবিহারিণীদের সম্পর্কেও সে উদাসীন থেকে প্রলোভন এড়িয়ে গেছে। আমার অকথিত প্রশ্নের লারী জবাব দেয়।

"প্যারীতে পরিচিত একজন ফরাসী চিত্র-শিল্পীর সংগে দেখা হয়ে গেল, তার নাম অগস্তে কটেট, এককালে সুজার রুভায়ার তার রক্ষিতা ছিল। সেভাইলে সে ছবি আঁকার জন্য এসেছিল, এখানে পরিচিত একটি স্ত্রীলোকের সংগে থাকে। একদিন ইরেটানিয়ায় গিয়ে ফ্লেমেনকো গায়কের গান শোনার জন্য আমাকে ওরা এক সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করল। সেই সংগে ওরা একজন বান্ধবীকে সংগে নিয়ে এসেছিল, অমন অপরূপ সুন্দরী কদাচিৎ চোখে পড়ে—মাত্র আঠার বছর বয়স, একটি ছেলের সংগে প্রণয়ের ফলে মেয়েটি বিপদে পড়ে, এবং সন্তান সম্ভাবনা হ'তে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। ছেলেটি সৈন্যদলে কাজ করত, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে একজন নার্সের কাছে রেখে মেয়েটি একটি তামাকের কারখানায় কাজ নিল। আমি তাকে নিয়ে বাড়ি এলাম। ভারী চমৎকার ও চপল স্বভাবের মেয়েটি, কয়েকদিন পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার সংগে থাকতে তার আপত্তি আছে কিনা, সে রাজী হয়ে গেল, তাই Casa de' huespedes-এ দুটি কামরা-ওয়ালা একটি বাসাবাড়ি নিলাম, একটি শোওয়ার ঘর, একটি বসার ঘর, বাথরুম। আমি ওকে তামাকের কারখানার কাজ ছেড়ে দিতে বল্লাম, কিন্তু সে রাজী হল না, আমারও তাতে সুবিধা হ'ল, কারণ দুপুর বেলাটা একা একা নিজের কাজকর্ম করা যেত। রান্নাঘর ব্যবহার করা যেত, ও সকালে আমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরী করে দিত, দুপুরে এসে লাঞ্চ তৈরী করত, রাত্রে ডিনারটা একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে নিতাম, সেখান থেকে সিনেমায়, বা নাচের জন্য কোথাও যেতাম। আমাকে ও পাগল মনে করত কারণ

আমি প্রতিদিন প্রভাতে ঠাণ্ডা জলে গা মুছে নিতাম। ওর শিশু সন্তানটি সেভাইল থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকত, রবিবার দিন গিয়ে আমরা তাকে দেখে আসতাম,—ওর সেই পুরুষ বন্ধুটির সামরিক বিভাগের চাকরী শেষ হলে একটা বাসা বাঁধার জন্যই যে অর্থের প্রয়োজনে আমার কাছে আছে সে কথা সে গোপন রাখত না। মেয়েটি ভারী চমৎকার, তার সেই পুরুষ বন্ধুটির যে সে উপযুক্ত স্ত্রী হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। মেয়েটি আনন্দময়ী, শোভন স্বভাবা ও করুণাপরায়ণ। আপনারা যাকে সূক্ষ্মভাবে যৌনসংগম বলেন—সে কার্য সে দেহের অপরাপর স্বাভাবিক ক্রিয়া বলে মনে করত, তাতে সে আনন্দ পেত, আনন্দ দিতেও খুশি হত। মেয়েটি ছোট হলে কি হয়, ভারী সুন্দর, আকর্ষণময়ী, গৃহপালিত পশুর মত মনোরম।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় ও আমাকে জানালো যে, তার সেই পুরুষ বন্ধুটি সামরিক কাজ থেকে মুক্তি পেয়েছে, তার কর্মস্থল স্প্যানীশ মরক্কো থেকে চিঠিতে এই সংবাদ পাঠিয়েছে। দু-একদিনের ভিতরই সে কাদিজে আসছে। পরদিন প্রাতেই সে নিজের জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে তৈরী হ'ল, মোজাতে টাকাকড়ি রাখল, তারপর আমি তাকে স্টেশনে নিয়ে গেলাম, আমাকে চুম্বনে আপ্যায়িত করে ও ট্রেনে উঠল। কিন্তু তার প্রেমিকের পুনরায় দর্শন সম্ভাবনায় সে এতই উত্তেজিত হয়েছিল যে, ট্রেন স্টেশন ছাড়ার পূর্বেই সে আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে বলেই মনে হল।

আমি সেভাইলে থেকে গেলাম, তারপর আবার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম,—সেই যাত্রাতেই ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলাম।"

যে ওয়েটার আমাদের পরিবেশন করছিল তার ছুটি হয়ে গেল, তাই সে বখশিষের জন্য বিল এনে হাজির করল। আমরা দাম দিয়ে কফি আনতে বল্লাম।

আমি বল্লামঃ "তারপর—?"

অনুভব করলাম লারী এখন বলার মেজাজে আছে আর আমারও শোনার মেজাজ আছে—।

সে বল্লঃ "আপনার বিশ্রী লাগছে না ত?"

"না।"

"তারপর আমি ত' বোম্বাই পৌঁছলাম। ভ্রমণকারীদের বেড়াবার ও দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার সুবিধা দেওয়ার জন্য জাহাজ ওখানে তিনদিনের জন্য থামল। তৃতীয় দিনে বিকালে ছুটি পেয়ে আমি বেড়াতে বেরুলাম। জনতার দিকে লক্ষ্য রেখে বেড়াতে লাগলাম, কি অপূর্ব সম্মেলন! চীনা, মুসলমান, হিন্দু, টুপীর মত কালো তামিলি,—তারপর গাড়ীটানা পিঠে কুজওয়ালা বিরাট বলদ, এ্যালিফ্যাণ্টায় গুহা দেখতে গেলাম।—একজন ভারতীয় আলেক-জান্দ্রিয়ায় আমাদের সংগে এসে হাজির হয়েছিলেন বোম্বাইএ আমার জন্য, ভ্রাম্যমাণের দল তাঁর ওপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত ছিলেন। মোটা সোটা বেঁটে মানুষটি, বাদামী রঙের গোল মুখ, পোষাকে ধর্মযাজকের চিহ্ন। একদিন রাত্রে আমি ডেকে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছি উনি এসে পাশে দাঁড়ালেন, কথা বল্লেন। সেই সময় কারো সংগে কথা বলার আমার বাসনা ছিল না, একা থাকারই ইচ্ছা ছিল। উনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন, আমিও সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলাম। যাই হোক বলেছিলাম—আমি একজন ছাত্র, আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার পাথেয় অর্জন করছি।

তিনি বল্লেন—"ভারতবর্ষে আপনার কিছুদিন থেকে যাওয়া উচিত। পশ্চিম যা ভাবতে পারে না পূর্বদেশ তার চেয়ে ঢের বেশী শেখাতে পারে।"

আমি বল্লাম—"ও, তাই ত'।"

উনি বল্লেন, "যাই হোক, অন্ততঃ এলিফ্যাণ্টায় গিয়ে গুহাগুলি দেখে আসবেন, ঠকতে হবে না।" লারী কথা থামিয়ে আমাকে প্রশ্ন করল—"আপনি কি ভারতবর্ষে গিয়েছেন নাকি?"

"না, কখনো যাইনি।"

"আমি ত' এলিফ্যাণ্টার তিন মাথাওয়ালা প্রকাণ্ড মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আছি, ভাবছি ব্যাপারটা কি, এমন সময় আমার পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "আমার পরামর্শ নিয়েছেন দেখছি যে?" আমি পিছন ফিরে তাকালাম, কে যে কথাটি বল্লেন তা বুঝে নিতে আমার এক মিনিট সময় গেল। সেই যাজকের পোষাক পরা বেঁটে ভদ্রলোকটি—কিন্তু এখন আর তাঁর সে পোষাক নেই, পরনে গেরুয়া পোষাক, পরে জেনেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের স্বামীজীদের এই পোষাক, পূর্বের সেই হাস্যকর আকৃতির পরিবর্তে এখন তাকে বেশ মর্যাদামণ্ডিত সৌম্য পুরুষ বলে মনে হচ্ছে। আমরা দুজনেই সেই বিরাট মূর্তির পানে তাকিয়ে রইলাম।

উনি বল্লেন, "সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু, আর ধ্বংসকর্তা শিব। পরমতত্ত্বের চরম অভিব্যক্তি।"

আমি বল্লাম, "আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

জবাবে তিনি বল্লেন, "আমি এতে আশ্চর্য হইনি।" চোখে তাঁর মৃদু হাসির ঝলক। যেন তিনি আমাকে মৃদু পরিহাস করছেন। "যে দেবতাকে বোঝা যায়, তিনি দেবতাই নন। অনন্তকে কে ভাষায় বোঝাতে পারে?" তিনি দুটি হাত যুক্ত করে অভিবাদনের ভংগী জানিয়ে বিদায় নিলেন। আমি সেই তিনটি রহস্যজনক মাথার পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, হয়ত তখন আমার গ্রহণ করার মত অবস্থা—আমার চিত্তে বিস্ময়কর আন্দোলন জাগল। জানেন ত' তখন কারো নাম স্মরণ করার চেষ্টা করেন, জিভের গোড়াতেই নামটা রয়েছে অথচ স্মরণ করতে পারেন না, তখন যে মনোভাব হয়, আমারও তখন সেই অবস্থা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আমি সমুদ্রতীরে কতক্ষণ বসে সমুদ্রপানে তাকিয়ে রইলাম। ব্রহ্মণ্যধর্ম সম্বন্ধে আমি শুধু ইমার্সনের কবিতার সেই ক'টি কথা জানতাম, সেই কথাগুলি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। কিছুতেই স্মরণ করতে না পেরে অধৈর্য হয়ে উঠলাম। বোম্বাই ফিরে গিয়ে একটা বই-এর দোকানে সন্ধান করতে লাগলাম, কোনো কাব্যগ্রন্থে সেই লাইন ক'টি পাই কি না। Oxford Book of Verse-এ কবিতাটি আছে। আপনার মনে পড়ে .....?

"They reckon ill who leave me out;
When me they fly, I am the wings;
I am the doubter and the doubt,
And I the hymn the Brahmin sings."

একটা দেশীয় ভোজনশালায় আহার করলাম, দশটার পূর্বে আমার জাহাজে ওঠার প্রয়োজন ছিল না, তাই তারপর ময়দানে ঘুরে সমুদ্র দেখতে লাগলাম। মনে হল আকাশে এত অগণন তারা আর কখনো দেখিনি। দিনের উত্তাপের পর এখনকার শীতলতা অতি মনোরম। একটা সরকারী উদ্যানে গিয়ে বেঞ্চে বসলাম। ভিতরে অতি অন্ধকার, নিস্তব্ধ শ্বেত মূর্তি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে—সেই অপূর্ব দিনটি উজ্জ্বল সূর্যালোক, বহুবর্ণের কলরবময় জনতা, প্রাচ্যদেশের সৌরভ, উগ্র ও সুরভিত গন্ধ, আমাকে যেন অভিভূত করে তুলল,—তারপর সেই ত্রিমূর্তির প্রকাণ্ড মাথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল,—আমার অন্তর উন্মাদের মত নৃত্য করতে থাকে—সহসা আমার কেমন ধারণা হ'ল যে, ভারতবর্ষ আমাকে এমন এক সম্পদ দেবে, যা আমার প্রয়োজন। মনে হ'ল এই এক সুযোগ আমার সামনে এসেছে এখনই তা গ্রহণ করা উচিত, নতুবা তা কোনোদিন ফিরে পাব না। তাড়াতাড়ি মন স্থির করে ফেল্লাম, স্থির করলাম জাহাজে ফিরব না—আমি জাহাজে দু-চারটি সামান্য জিনিস ভিন্ন আর কিছু রেখে আসিনি—ধীরে ধীরে দেশী পাড়ায় ঢুকে একটা হোটেল খুঁজে বার করলাম,—কিছু পরে একটা হোটেল পেলাম—সেইখানে একটি ঘর নিলাম। যে পোষাক পরা ছিল সেই পরিচ্ছদ মাত্র, কিছু খুচরা টাকা, আমার পাসপোর্ট আর ব্যাঙ্কের কাগজ—; এতেই মুক্ত স্বাধীন মনে হতে লাগল যে, আমি অট্টহাস্য করে উঠলাম।

"জাহাজ এগারটায় ছাড়ে, নিরাপত্তা হিসাবে সেই সময় পর্যন্ত আমি ঘরে বসে রইলাম,—তারপর জাহাজঘাটায় গিয়ে দেখলাম জাহাজ ছেড়ে গেল—তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে যে স্বামীজী আমার সঙ্গে এলিফ্যাণ্টা গুহায় কথা বলেছিলেন তাঁকে খুঁজে বার করলাম—তাঁর নাম জানতাম না, বল্লাম যে স্বামীজী আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁকে বল্লাম, আমি ভারতবর্ষে থাক্‌ব স্থির করেছি, এখন আমার কি কি দেখা উচিত। আমাদের দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা চলল, অবশেষে তিনি বল্লেন,—সেই রাত্রে তিনি বারাণসী যাচ্ছেন, আমি তাঁর সঙ্গে যেতে পারি কিনা। আমি এ প্রস্তাবে লাফিয়ে উঠ্‌লাম। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হলাম। গাড়িটিতে অসংখ্য যাত্রীর ভীড়, তারা কথা বলছে, পানাহার করছে, আর অসহ্য গরম। একটুও ঘুমাতে পারিনি, আর সকালে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু স্বামীজী যেন ফুলের মত তাজা—আমি বল্লাম, কি করে এলেন, তিনি বলেন,—"নিরাকারের ধ্যান করলাম, অনন্তের চিন্তাতে স্বস্তি পেয়েছি। কি যে ভাবি তা ভেবে পাই না,—তবে স্বচক্ষে এটুকু দেখ্‌লাম—তিনি বেশ সজাগ ও সতর্ক, যেন সারারাত বেশ শান্তিতে আরামদায়ক বিছানায় ঘুমিয়েছেন।

"অবশেষে যখন বারাণসী পেঁৗছলাম তখন আমার সমবয়সী একজন যুবক আমার সঙ্গীকে নিতে এসেছিলেন, স্বামীজী তাকে আমার জন্য একখানি ঘর ঠিক করে দিতে বল্লেন, তাঁর নাম মহেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন অধ্যাপক। চমৎকার ভদ্রলোক, বুদ্ধিমান ও সদয় প্রকৃতি, আমার প্রতি তার একটা আগ্রহ পড়ে গেল, আমারও তাঁকে ভালো লাগল। সেই সন্ধ্যায় তিনি আমাকে গঙ্গার ওপর নৌকায় নিয়ে বেড়ালেন। আমার জীবনে সে এক অপূর্ব শিহরণ, সারা শহরের জনতা যেন নদীতে এসে মিশেছে, কেমন একটা শ্রদ্ধা জাগে, কিন্তু পরদিন প্রাতে তিনি আরো চমৎকার ও অপূর্ব দৃশ্য দেখালেন। রাত্রি প্রভাতের পূর্বে আমাকে হোটেল থেকে তুলে পুনরায় গঙ্গায় নিয়ে এলেন। এমন এক অপূর্ব দৃশ্য দেখ্‌লাম—যা জীবনে দেখিনি, সম্ভবপর বলে মনে করিনি। দেখলাম হাজার হাজার প্রাণী প্রভাতী স্নানের ও উপাসনার জন্য নদীতে সমবেত হয়েছে। দেখ্‌লাম এক বিরাট পুরুষ, মাথায় জটা, প্রকাণ্ড দাড়ি, আর নগ্নতা নিবারণের জন্য পরণে সামান্য একটু কৌপীন—দীর্ঘ দুটি বাহু শূন্যে উত্তোলন করে মাথা তুলে উচ্চরবে মন্ত্রপাঠ করে উদীয়মান সূর্যের ধ্যান করছেন—এতদ্দর্শনে আমার মনে যে কি ভাবের সঞ্চার হ'ল তা আপনাকে বলতে পারি না। আমি ছ' মাস বারাণসী ছিলাম, আর বার বার এই অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য গঙ্গার ঘাটে যেতাম। এই বিস্ময়ের ঘোর আমি কখনই কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

এইসব প্রাণী ঈশ্বরে বিশ্বাসী সংশয় সংকুচিত মন নিয়ে নয়, সে বিশ্বাসে এতটুকু কুণ্ঠা বা অবিশ্বাস বা সন্দেহের লেশ নেই—তাদের অন্তরের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে ঈশ্বরের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ফুটে উঠ্‌ছে।" **(ক্রমশঃ)**

দেখা যাইতেছে, কত হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় সন্ধানে আসিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও সঠিক সংবাদ পাইবার উপায় নাই। এই হিন্দুদিগকে ২ দলে বিভক্ত করা যায়; এক দল বাঙলা বিভক্ত হইবার পূর্বেই নোয়াখালী ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে অত্যাচারের সময় ও তাহার পরেই চলিয়া আসিয়াছিলেন, আর এক দল বাঙলা বিভক্ত হইবার পরে পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক সময়ে বাস্তুত্যাগীদিগের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ বলিয়াছিলেন। এই ৩০ লক্ষ, বোধ হয়, উভয় দল ধরিয়া। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় অল্প দিন পূর্বে "বাস" ব্যবসায়ীদিগের নিকট কলিকাতার লোক সংখ্যা বৃদ্ধির যে হিসাব দিয়াছিলেন, তাহাতে পূর্ববঙ্গ হইতে মোট প্রায় ৩০ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আগমনই সমর্থিত হয়। একান্ত পরিতাপের বিষয়, বাঙলা বিভাগের পরে যাঁহারা আসিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদিগের কোন হিসাব রাখেন নাই। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে মুসলিম লীগ সরকার অনাহারে মৃতের কোন হিসাব রাখেন নাই, বলিয়াছিলেন—সে হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা সরকারের ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন যে আগন্তুকদিগের হিসাব রাখেন নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহারা হিসাব না রাখাতেই পূর্ব পাকিস্থানের সরকার তাঁহাদিগের উক্তি অত্যুক্তি বলিবার সুযোগ পাইতেছেন।

গত ২৩শে মাঘ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহারা অবগত হইয়াছেন, দিল্লীতে কোন কোন সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাব অনুসারে পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগন্তুকদিগের সংখ্যা—এক কোটি ২৫ লক্ষ; আর এক হিসাবে তাহাদিগের সংখ্যা ৩০ লক্ষ। এতদুভয়ের কোন হিসাবই নির্ভুল নহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যতদূর জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগের সংখ্যা ১৫ হইতে ১৬ লক্ষ।

কেন কোন কোন পত্রে এক কোটি ২৫ লক্ষের কথা বলা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এখনও এক কোটি ২৫ লক্ষ হিন্দু যে পূর্ব পাকিস্থানে রহিয়াছেন, তাহাই ভুলক্রমে আগন্তুকসংখ্যা বলা হইয়াছিল।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রী সরকারের আশ্রয়প্রার্থী ও পুনর্বসতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সাকসেনা কেন্দ্রী পরিষদে পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগীরা কোন্ কোন্ প্রদেশে ও সামন্ত রাজ্যে কিরূপ সংখ্যায় গিয়াছেন, তাহার একটা আনুমানিক হিসাব দিয়াছেন—

পশ্চিমবঙ্গে—১৫ লক্ষ ৬০ হাজার
আসামে—২ লক্ষ ৫০ হাজার
ত্রিপুরা রাজ্যে—৪৫ হাজার
কুচবিহার রাজ্যে—১০ হাজার ১ শত ৬৫
মধ্যপ্রদেশে—৫ শত ৯১
বিহারে—২ হাজার ২ শত ৩৪
যুক্তপ্রদেশে—২ হাজার
উড়িষ্যায়—৫ শত ৪৮

এই হিসাবে মোট ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৫ শত ৩৫ জনের বিষয় ভারত সরকার জানিতে পারিয়াছেন। এই হিসাব যে নির্ভুল নহে, তাহা বলা বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের লোকসংখ্যা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের জানা নাই। কলিকাতার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির যে হিসাব প্রধান সচিব দিয়াছেন, তাহাতেই মনে করা সঙ্গত—মোট ১৫ হইতে ১৬ লক্ষের অনেক অধিক হিন্দু পূর্ব পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা যে হিন্দু, তাহা বলা বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপদেশ দিয়া হিন্দুদিগের আগমন নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই; তাঁহারা শিয়ালদহ প্রভৃতি ষ্টেশনে আগন্তুকদিগের আশানুরূপ ব্যবস্থা করিতে না পারাতেও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই।

সহকারী হাই কমিশনার হইয়া পূর্ব পাকিস্থানে গমনকালে শ্রীসন্তোষকুমার বসু বলিয়াছিলেন—বহু হিন্দু যে পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন, তিনি তাহার কারণ নির্ধারণ করিবেন এবং সে সম্বন্ধে কিছু করা যায় কিনা দেখিবেন। তিনি তাঁহার অনুসন্ধানফল ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। সে বিবরণ পাইবার পরে প্রধান মন্ত্রী পূর্বোক্ত কথা বলিয়াছেন কিনা, তাহাও জানি না। তবে আমরা জানি, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যখন মোহনলাল সাকসেনার পদে ছিলেন, তখন নবদ্বীপে তিনি বলিয়াছিলেন, ভারত সরকার পাঞ্জাবের বাস্তুত্যাগীদিগকে লইয়াই বিব্রত বাঙলার লোকের সম্বন্ধে কিছু করিতে পারিবেন না।

পণ্ডিত জওহরলালের য়ুরোপে স্থিতিকালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছিলেন—পূর্ব পাকিস্থান সরকার যদি তথায় হিন্দুদিগকে নাগরিকের অধিকার লাভের সুযোগ দিতে না পারেন, তবে ভারত সরকার তাঁহাদিগের নিকট ঐ সকল হিন্দুর জন্য আবশ্যক ভূমি দাবী করিবেন। পণ্ডিত জওহরলাল প্রত্যাবৃত হইয়া বলিয়াছিলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উক্তিতে ভীতি প্রদর্শনের ভাব আরোপ করা অসংগত হইবে। তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন—উভয়রাষ্ট্রে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে সুফল ফলিয়াছে। পাকিস্থানের পরিচালকদিগের উক্তিই তাঁহার এই বিশ্বাসের ভিত্তি কিনা, তাহা আমরা জানি না। তবে ঐ সকল আলোচনার পরেই পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুদিগের দুর্দশার যে পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহাতে মনে করিবার কারণ আছে—সুফল ফলার বিশ্বাস চোরাবালুতে সৌধের মত প্রতিপন্ন হয়।

পাকিস্থানের বড়লাট খাজা নাজিমুদ্দীন গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা হইতে যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন—হিন্দুরা ভয় ত্যাগ করিয়া পাকিস্থানের অনুগত প্রজা হিসাবে পাকিস্থানে বাস করুন—সে অধিকার তাঁহাদিগের আছে। কিন্তু সেই দিনই ঢাকায় পূর্ব পাকিস্থান জমিয়াত-উল-উলেমা ইসলাম সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, পাকিস্থানের শাসন পদ্ধতি সরিয়ৎ অনুসারে রচিত হউক। এই সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্থানের নানা স্থানের প্রতিনিধিদিগের মত নানা স্থানের মুসলমান ধর্মাচার্যগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পাকিস্থান সরিয়তের অনুমোদিত শাসন প্রবর্তনের দাবী করিয়াছেন। খাজা নাজিমুদ্দীনও বলেন নাই যে, পাকিস্থান—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইবে। তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে পাকিস্থান—ইসলাম রাষ্ট্র। আমরা ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারি না। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, খাস মুসলমান দেশসমূহেও অতি অল্প দিন সরিয়তানুমোদিত শাসন প্রচলিত ছিল। তাহার পরে এক নায়কের স্বৈর শাসন প্রবর্তিত হয়। তুর্কীতে শেষ খিলাফতের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কামালপাশা সুলতানকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন।

সে যাহা হউক, পাকিস্থান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নহে; তাহা ইসলাম রাষ্ট্র। সুতরাং তাহাতে মুসলমানাতিরিক্ত অধিবাসীরা কেবল অনুগ্রহে ধর্মাচরণ-স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন। সে অনুগ্রহ লাভ করা যে দুষ্কর, তাহার প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে। বাঙলা বিভাগের পরে যখন সরকারের অনুমতি লইয়া হিন্দুরা চিরাচরিত জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির করিয়াছিলেন, তখন মুসলমানরা তাহাতে বাধা দেয়। তখন খাজা নাজিমুদ্দীন বলিয়াছিলেন—ঐ মিছিল শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল বাহির হয়। কিন্তু মুসলমান জনতা উত্তর দেয়—তখন পূর্ববঙ্গে পাকিস্থান ছিল না—পাকিস্থানে উহা সহ্য করা হইবে না। সেই উত্তরে খাজা নাজিমুদ্দীন নিরুত্তর হইয়াছিলেন। হিন্দুর গৃহে নিত্য-পূজার শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি হয়। ইংরেজদের শাসন-

কালেও মুসলমানরা তাহাতে আপত্তি করিতে স্বিধানুভব করে নাই। পাকিস্থানে কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দুর পক্ষে যে পূর্ব পাকিস্থানে ধর্মাচরণ ও বিবাহাদির অনুষ্ঠান অঙ্গহীন হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। সে অবস্থায়ও কি ভারত রাষ্ট্রের ও পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধারগণ পূর্ববঙ্গের গৃহত্যাগী হিন্দুদিগকে বলিবেন—ভারত সরকারের সাহায্যদান ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুরা যেন সেই সাহায্যলাভের আশায় পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া ভারতবর্ষকে বিব্রত না করেন! আর যাঁহারা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে বাঙলা বিভাগে সম্মতি দিতে প্ররোচিত করিবার সময় বলিয়াছিলেন, বাঙলা বিভক্ত হইলে পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুরা বাসভূমি পাইবেন, তাঁহারা কি আজ নির্বাক থাকিবেন? তাঁহাদিগের কোন কোন সমর্থক এমনও বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যখন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, বাঙলা বিভক্ত হইলে পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু রাষ্ট্রের অংশ হইবে—ভারত রাষ্ট্র যে হিন্দুস্থান না হইয়া ধর্মনিপেক্ষ রাষ্ট্র হইবে, তাহা তাঁহাদিগের কল্পনাতীত ছিল। যদি সেই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে জিজ্ঞাস্য—তাঁহারা কি পূর্ব প্রতিশ্রুতি পদদলিত করিয়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন? গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে এ পর্যন্ত পাকিস্থানের অধিবাসীরা ২ শত ৩৪বার ভারত রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া উপদ্রব করিয়াছে; ঐ সকল উপদ্রবে ৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে—৪৪জনের জীবনান্ত হইয়াছে; আর পাকিস্থানীরা ৭জন স্ত্রীলোককে ও ৪৭ জন পুরুষকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—আজও তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করে নাই। দিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনার পরে কতবার উপদ্রব হইয়াছে, তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে তাহা যে নিবৃত্ত হয় নাই, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি।

ঢাকা হইতে সংবাদ পরিবেসিত হইয়াছে—দিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার সর্ত পালনের বিষয় আলোচনার জন্য এবার পূর্ব পাকিস্থানের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবদ্বয় মিলিত হইবেন। এবার মিলনস্থল—পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকা। চেষ্টায় দোষ নাই।

বিহারী বাঙ্গালী বিতাড়নের যে নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তথায় সরকারী ও সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত বা কর্তৃত্বাধীন বিদ্যালয়সমূহে বাঙালী ছাত্রদিগের পক্ষেও বঙ্গ ভাষায় শিক্ষা প্রদান নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যে প্রতিশ্রুতি ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেস দিয়া আসিয়াছেন, বিহারে তাহাও যেমন অবজ্ঞাত হইতেছে—মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিও বিহারে তেমনই অবজ্ঞাত হইতেছে। বিহারের বাঙালীদিগকে মাতৃভাষা ভুলাইবার এই চেষ্টা "মাস কনভারশানের"—রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। আজ বিহারে বাঙালীদিগের উপর এই অত্যাচারে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ও নীতি পালনে বিহার সরকারের অসম্মতিতে কেন্দ্রীয় সরকার চিত্রার্পিতপ্রায় অবস্থা লক্ষ্য করিতেছেন মাত্র।

সম্প্রদায়ভেদে এই ব্যবহারভেদের কারণ কি? পশ্চিমবঙ্গে যে ইহার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, তাহা কি ভারত সরকারের মন্ত্রীরা মনে করিতে পারেন না?

রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ভাষা সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ নহেন। কিন্তু তবুও তিনি রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে মত প্রকাশে বিরত থাকেন নাই। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন—হিন্দুস্থানীই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া সঙ্গত। আমরা তাঁহার মাতৃভাষানুরাগের প্রশংসা করি; কিন্তু তাঁহার উক্তি যুক্তিপূর্ণ বলিতে পারি না। হিন্দুস্থানী ও হিন্দী এক নহে। অথচ পূর্বে যখন হিন্দুস্থানী বনাম হিন্দী আলোচনা হয়, তখন গান্ধীজীর সমর্থন ও কংগ্রেসের পরিচালক সঙ্ঘে হিন্দুস্থানীকে জয়যুক্ত করিতে পারে নাই। হিন্দুস্থানীতে বহু মুসলমানী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে—হিন্দী সংস্কৃতজ। যখন দেশ বিভক্ত হয় নাই, তখনই হিন্দীর জয় হইয়াছিল। তাহার পরে পাকিস্থান সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুস্থানীর দাবী আরও দুর্বল হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণর ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজুর মত—সংস্কৃতই ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হওয়া সঙ্গত। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রচলিত ভাষাসমূহে মধ্যে বাঙলার সাহিত্যই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এবং বাঙলাই সর্বভাব প্রকাশক্ষম। কিন্তু বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার বিষয় বিবেচনা করিতে বলিলে তাহা সাম্প্রদায়িকতার পরিচায়ক "অপরাধ" হয়। কিন্তু অন্য কোন প্রদেশে যদি বাঙালী ও বাঙলা উচ্ছেদের চেষ্টা ও ব্যবস্থা হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় হয় না! ডক্টর পট্টভী সীতারামিয়া যে আজও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুত নীতির সমর্থন করিতেছেন, সেজন্য তাঁহাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে অপরাধী করা হইবে না কেন?

কলিকাতায় আসিয়া কুমার স্যার জগদীশ প্রসাদ যে সুচিন্তিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, যদি পূর্ববঙ্গের এক কোটি ২৫ লক্ষ লোককে হিন্দুস্থানে স্থান দিতে হয়, তবে যখন অধিবাসী বিনিময় অনিবার্য হইবে, তখন পশ্চিমবঙ্গেই তাহা করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মত বিহারে ও উড়িষ্যায়ও তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু সে দিন বিহারের মুসলমান সচিব কলিকাতায় আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন—বিহার পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদিগকে স্থান দিতে পারিবে না। কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্থান হইতে হিন্দুদিগের পশ্চিমবঙ্গে আগমন প্রায় বন্ধ হইয়াছে। আর যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের গবর্নর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু পশ্চিমবঙ্গের কয়টি জেলার পল্লীগ্রাম পরিদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন—

(১) কলিকাতার সহিত তুলনায় পল্লীগ্রামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

(২) যে দেশে পূর্বে প্রভূত পরিমাণ খাদ্যোপকরণ উৎপন্ন হইত, সেই দেশকে আজ খাদ্যোপকরণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

বাঙলা এখনও পল্লীপ্রধান, পল্লীপ্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পল্লীগ্রামগুলির সর্বনাশ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এদেশে পল্লীগ্রামেই ইংরেজ শাসকদিগের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়াছে। ১৯৩৩ খৃঃ ব্রেন স্বীকার করিয়াছিলেন—গ্রামের সমস্যাই এদেশের সর্বপ্রধান সমস্যা। পল্লীগ্রামের সর্বনাশ সমগ্র দেশের সর্বনাশদ্যোতক। ইংলণ্ডের লোক বহুদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাহা বুঝিতে পারিয়াছে—

"After a century of industrial development in England, largely at the expense of agriculture and of the village ....a change of outlook is beginning to be apparent...."

"The more thoughtful of our town people have begun to realise that the decay of the countryside must in the end spell the senew of the whole country."

সেইজন্য বৃটেনে গ্রামকে তাহার উপযুক্ত মনোযোগ প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এদেশে তাহা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে লোকের দুর্দশায় অল্পদিনের মধ্যে দুইবার গ্রামের উন্নতি সাধনের সুযোগ আসিয়াছিল—একবারও তাহা গৃহীত হয় নাই—তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করা ত পরের কথা। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে যে-মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে পশ্চিমবঙ্গের (পূর্ববঙ্গেরও) লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাতে অনেক গ্রাম নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরে যদি সরকার আদর্শ গ্রাম রচনার ব্যবস্থা করিতেন, তবে বিশেষ উপকার হইত, কিন্তু মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ দুর্ভিক্ষের জন্য আপনাদিগের দায়িত্ব গোপন করিতে ব্যস্ত ছিলেন—পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেন নাই।

দ্বিতীয় সুযোগ এইবার আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবের স্বীকৃতি মতে (বাঙলা বিভাগের পরে) ১৫ হইতে ১৬ লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে

আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের বাসের, চাষের ও শিল্পের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রী সরকার যে ব্যবস্থা করিতেন, তাহা অবজ্ঞাত হইয়াছে। এই বহু লোকের আগমন সহজেই পূর্বাহ্নেই অনুমান করা যাইত—পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমিও যে না, এমন নহে। কাজেই সরকারের পক্ষে প্রথমাবধি গ্রাম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা দূরদৃষ্টি ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইত।

ইহার পূর্বেও যে বাঙলা পল্লীগ্রাম উন্নয়ন কার্যে উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা স্ট্রীক্‌ল্যাণ্ডের পুস্তিকায় বুঝিতে পারা যায়। উহাতে যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতির কথা থাকিলেও বাঙলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা—পূর্ব ভারত বলিয়া বর্ণিত হয় এবং শান্তিনিকেতন, ঊষাগ্রাম, গোসাবা, অ্যাণ্টিম্যালেরিয়ান সমিতি ও সরোজনলিনী সমিতির উল্লেখই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল! ইহাতে বুঝা যায়, অখণ্ড ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন জন্য ইংরেজের শাসনকালে যে চেষ্টা হইয়াছিল, বাঙলায় তাহাও হয় নাই। ইংরেজ তাহার দেশের অভিজ্ঞতাফল ভারতে—বিশেষ বাঙলায় প্রযুক্ত করিতে চাহে নাই। ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া লর্ড লিনলিথগো বলিয়াছিলেন—বহু শতাব্দীর জাড্য ও দুর্দশা যদি দূর করিতে হয়, তবে সরকারের যে সকল বিভাগের সহিত পল্লীজীবনের সম্বন্ধ আছে, সে সকল বিভাগকেই প্রচেষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু শিক্ষা, সেচ, স্বাস্থ্য, শিল্প—কোন বিভাগই বাঙলায় গ্রামের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হয় নাই। পুরাতন লোকশিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারের অভাবে নষ্ট হইয়াছে—নূতন কোন পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হয় নাই। সেচ বিষয়ে বাঙলা অত্যন্ত অবজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। গ্রামের স্বাস্থ্যাভাব শোচনীয় হইয়াছে। উটজ শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রামের অধিবাসিগণের মনও গ্রামের পুষ্করিণীর মত সংকীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগের সেই সংকীর্ণতা সর্ববিধ উন্নতির বিরোধী হইয়াছে। লোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিতেছে—গ্রাম দুর্দশার লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়িতেছে। গ্রামের উন্নতিসাধনের চেষ্টা যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের ও ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। আর উলার (বীরনগর), নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁহাদিগের মনোভাবের অভাব অপেক্ষাও কর্মীর অভাব প্রবল। তাহার কারণও যে নাই, তাহা নহে। এখন সরকার চেষ্টা করিলে অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে। যদি লোকশিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, গ্রামে উটজ শিল্প দেখা দেয়, সেচের জন্য পাম্প প্রভৃতির ব্যবহার সুলভ করা যায়—তবে গ্রামের উন্নতি সহজেই হইতে পারে।

ডক্টর কাটজু যে অতীতের সহিত তুলনা করিয়া বর্তমানে খাদ্যোপকরণের অভাবহেতু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিকার করিতে তাঁহার সরকারের কৃষি বিভাগ কি করিয়াছেন, তিনি সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন কি? পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির কি উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হইয়াছে? কৃষিকার্যে উন্নতি দীর্ঘকাল সাপেক্ষ নহে। আমাদিগের মনে হয়, বিক্রয় কর ও আয় কর অবিচারিতভাবে আদায় করায় কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা কার্যের ক্ষতি হইতেছে এবং খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির পক্ষে বিঘ্নবহুল হইতেছে। সময়ে আবশ্যক বীজ ও সার না পাওয়ায় যথাকালে চাষও হইতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব হইয়াই ডক্টর বিধানচন্দ্র বলিয়াছিলেন, মৎস্য বিভাগের প্রয়োজন, কার্য ও গুরুত্ব এত অধিক যে, তাহা কৃষি বিভাগ সংশিলষ্ট না রাখিয়া স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত করা প্রয়োজন। তিনি তাহা করিয়াছেন। তাহাতে ব্যয়বৃদ্ধি অবশ্য অনিবার্য, কিন্তু তিনি সে বিভাগের যে উন্নতি আশা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছে কি?

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

যোগানন্দবাবু বলেন, সম্বন্ধ ভালই। কিন্তু শুধু ছেলের মত জানলেই হবে না, ওদের বাড়ির মতামতটা জানা দরকার। তাছাড়া—

সমর তাড়াতাড়ি বলে, সেসব আমি ঠিক করবো, এখন আপনাদের মত আছে কিনা বলুন।

যোগানন্দবাবু বলেন, আমাদের মত না থাকার তো কোন কারণ দেখি না—ছেলে তোমার বন্ধু, তার ওপর অবস্থাপন্ন, তুমি বলছো। অমত করবো কেন? হলে তো ভালই হয়। এ-সংসারে একটা মস্ত উপকার করবার জন্যে সমর যেন আজ বদ্ধপরিকর। আর সে যে একটা উপকার করতে যাচ্ছে, এটা সকলে বুঝুক। নিজের যুদ্ধে যাওয়ার চেয়ে এটা কম দুঃসাধ্য কাজ নয়। বেচারা অরবিন্দের জন্যে বোধ হয় একটু দুঃখ হয়—বাণীর চিত্ত জয়ে পাণি প্রার্থনা করেছিল কি সে এ-বাড়িতে? নিজের কথা ভেবে সমরের আবার মনে হয়, না, এই ঠিক—এই-ই রীতি, যার তার সংগে তো আর বোনের বিয়ে দেওয়া যায় না! ওরা যা মনে করুক, যা ভেবে থাকুক, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে তার কর্তব্য আছে। চৌধুরীর সংগে বিয়ে হলে ভবিষ্যতে বাণী অনেক খুশি হবে, সুখে থাকবে। প্রবীরের বন্ধু আর কত বড়দরের লোক—চ্যাংড়া ছাড়া ওরা আর কি!

কিন্তু চৌধুরীর দুর্বলতা কি স্পষ্ট জানা গেছে? যে পরিবারের ছেলে ওরা তার ঐতিহ্যে ওদের আন্তরিকতা টের পাওয়া কি সহজ? চৌধুরী হয়তো তার বোনের সম্বন্ধে এমনিই ইণ্টারেস্টেড হয়েছে। রেবার মনের খবর কি সে তাই জানতে পেরেছে? কখন লীলায়, কখন গাম্ভীর্যে রহস্যময়ী। রাহাকে হয়তো কোনদিন বিয়েই করে বসবে তার ঠিক কি?

হঠাৎ সমরের যেন খেয়াল হয়, তার প্রস্তাবে যদি চৌধুরী রাজি না হয়, তাহলে গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়ার অপমানের জ্বালা সে জীবনে ভুলতে পারবে না। সে শুধু নিজেকেই অপমান করবে না, সেই সংগে তার পরিবারের চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক আনবে—বামন হবার অপবাদ। কিন্তু এরকম খেলা করবার কি অধিকার আছে চৌধুরীর? তাকে রাজি হতেই হবে, চালাকি নাকি!......

কথাটা তুলতে সমর অনেকক্ষণ ইতস্তত করে। হঠাৎ কি করে জিগ্যেস করবে, চৌধুরী, তুমি আমার বোনকে বিয়ে করবে? এর চেয়ে মুখে দুটো 'অসভ্য' কথা বলা যেন সহজ। চৌধুরীর বিয়ে করার ইচ্ছে থাক না থাক, কথাটা কিভাবে পাড়বে, সমর মনে মনে অনেক ভাঙাগড়া, বোঝাপড়া করতে থাকে। অনেকবার বলি বলি করেও চুপ করে গেল। আজ কিন্তু চৌধুরীকে খুব নিরিবিলি পাওয়া গেছে, রেবা মাঝে মাঝে ঘরে এসে আবার চলে যাচ্ছে, রেবা আজ খাতির করবার জন্যে যেন বিশেষ সচেষ্ট। একেবারে বাণীর দ্বিতীয় সংস্করণ। এটা কি করে সম্ভব হলো, সমর বুঝতে পারে না। কিন্তু এখনি যদি রাহা বা অন্য কেউ মেজর-ক্যাপ্টেন এসে পড়ে, তাহলেও কি রেবা নিজের স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারবে? মেয়েদের আকর্ষণটা কিসে? দৈহিক সৌন্দর্যে, না

প্রসাধন পারিপাট্যে? সরলতায়, না চটুলতায়? এই ভাল লাগাটা প্রকৃত কি কারণে? সমরের মনে হয় সমগ্রভাবে কোন একটাকে কারণ ভাবা যায় না। আজ রেবার এই সাদাসিধে ভাবটা খুবই ভাল লাগছে; কিন্তু প্রথম দিনের চটুলতা আদৌ ভাল লাগে নি—আবার সেদিন পার্টিতে রেবার পোষাক পারিপাট্যের আতিশয্য এবং আড়ম্বরটা যেন ভাল লেগেছিল। একই মেয়েকে কোন এক সময়ে ভাল লাগে, কোন এক সময়ে আবার ভাল লাগে না—যে কারণে ভাল লাগছে, সে কারণে আবার ভাল লাগতে না পারে। ভাল লাগাটা কি শুধু সৌন্দর্যের, না, আরো অন্য কিছুর?

এক সময় সমর জিগ্যেস করলে, পরশু ওদের 'শো'টা কেমন দেখলেন?

চৌধুরীর অন্যমনস্কতা যেন ভাঙল—বললে, চমৎকার আপনার বোনের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলাম!

সমরের মনে হলো এই সুযোগ, কিন্তু এখন জিগ্যেস করাটা নেহাৎই বেনিয়া ব্যক্তির মত হবে নাকি? চৌধুরী হয়তো ভাববে, সমর এই জন্যেই 'শোর' কথা পেড়েছে। চৌধুরীর চালাকি যদি তার চালাকি ধরে ফেলে? তাছাড়া রেবা অনবরত ঘরে আসা-যাওয়া করছে।

সমর বললে, আমি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারিনি, বড় মাথা ধরেছিল—মাঝখানেই উঠে এসেছি।

চৌধুরী বললে, আপনার কিন্তু আমাদের বলা উচিত ছিল, আমাদের তাহলে খামকা খুঁজতে হতো না। রেবা ঠিকই বলেছিল, আপনি কাউকে না জানিয়েই চলে গেছেন।

তার নিঃশব্দে চলে আসাটা এত কাণ্ড বাধাবে, সমর ভাবতে পারেনি। এখন যেন চৌধুরীর মুখে অভিযোগটা শুনে মনে মনে খুশিই হলো। কিন্তু রেবা কি করে জানলে, সে চুপিসাড়ে উঠে গেছে। চোখটা চৌধুরীর বোনের তাহলে সজাগ ছিল? সমর দেখলে, রেবা হাসছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মত সমরের ইচ্ছে করে, এখনি চৌধুরীর কাছে রেবার পাণি প্রার্থনা করে বসে। রেবাকে বলে, তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি? বেপরোয়া হয়ে যাহোক একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সমর চৌধুরীর অভিযোগের জবাব দেয়, I am sorry Major Chowdhury—আমি সত্যিই খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম।

রেবা বললে, আপনার ভায়ের নাটকটাও চমৎকার। আপনার বোনের 'অপজিটে' যিনি অভিনয় করছিলেন, তাকে চেনেন নাকি? তিনিও চমৎকার করেছেন সেদিন।

চৌধুরী বললে, সকলেই বেশ শিক্ষিত, I mean well trained and adept!

রেবা বললে, নাটকের মাঝ থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ ভাল হয়েছে, বিশেষ করে Orphanage-এর দৃশ্যগুলো। লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ভোলা যায় না!

চৌধুরী বাধা দিয়ে বলে, ওতো হবেই—ও যে প্রফেশনাল। মেয়েটির নাম কি?

রেবা বললে, অলকাদেবী?

এই মুহূর্তে দুই জনের কেউ যদি চেয়ে দেখতো, তাহলে দেখতে পেতো সমরের মুখটা কঠিনতায় কালো হয়ে উঠেছে। কে জানে, চৌধুরীর 'প্রফেশন্যাল' কথাটায় ব্যথা পেয়েছে কিনা। পেশাদার বলেই অভিনয়টা ভাল হয়েছে। এই-ই চৌধুরীর নামকরা এ্যাকট্রেস তাহলে? কি অদ্ভুত বিড়ম্বনা জীবনের। ভাগ্য কি অদ্ভুত পরিহাস করছে তার সংগে।

রেবা বলে, বাণী বলছিল, প্রবীরবাবুর সংগে জানাশোনা ছিল বলে অলকাদেবীকে পাওয়া গিয়েছিল। এদিকে ভদ্রমহিলার খুব আগ্রহ আছে কিন্তু এসব ব্যাপারে।

রেবার শেষের কথাটা একটু বিদ্রূপের মত শোনায়। চৌধুরী হেসে বলে, পাঁকে পদ্মফুল—প্রবীরবাবু কাজের লোক আছেন।

রেবা বলে, ওরা নাকি অনেকদিন এক পাড়ায় ছিলেন।

চৌধুরী বলে, তার জন্যেই ভাল হবার দরকার করে না—

She could easily forget her past! It's good of her to remember her old acquaintances now.

সমর কেমন জবুথবু মেরে চুপ করে বসে থাকে। এদের ভাই-বোনের কথাবার্তা যেন কিছু বুঝতে পারছে না—বোবার সামনে হাত-মুখ নেড়ে কথা বলার মত। অভিনেত্রীর হৃদয়-বৃত্তির ভাল-মন্দ বিচার করবারই বা এখন দরকার কি? প্রবীর কাজের লোক না, অলকা অত্যন্ত ভাল সহৃদয়? খ্যাতি কি মানুষকে অতীত ভুলিয়ে দেয়? পরশু যদি অলকা এসে ছিল, তার খোঁজ করলে না কেন? প্রবীরের সংগে যখন দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তখন তার খোঁজ-খবর নিতে পারতো? না, এখন অলকার কথা ভাবা তার কোনমতে উচিত নয়। 'প্রফেশন্যাল অভিনেত্রী', তার সংগে আবার সমরের এমন কি সম্বন্ধ থাকতে পারে—ছি ছি! শুধু নামের জন্যে প্রবীরদের 'শো'তে অভিনয় করতে এসেছিল—যে সংগে পড়েছে, ভাল কখনোই থাকতে পারে না। সমর বাজী রেখে বলতে পারে, কেউ অস্বীকার করতে পারে?

শেষ পর্যন্ত কে ভাল অভিনয় করেছে, এই নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে মতদ্বৈধ থেকে যায়। চৌধুরীর মত, বাণী অভিনয় না করলে সেদিন নাটকটা অত মর্মস্পর্শী হতো না; রেবার মত, অলকাদেবী যদি না ওদের সংগে যোগ দিতেন, তাহলে নাটকই হোত না। অলকার নামই অভিনয়ের সাফল্য। সমর যদি সেদিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকতো, তাহলে না হয় এ-তর্কের মীমাংসা করতে পারতো। ভাল-মন্দ সম্বন্ধে একটা মতামত দিতে পারতো। চেষ্টা করলে চৌধুরীর পক্ষপাতিত্বটা না হয় বোঝা যায়, কিন্তু রেবার প্রশংসাটা বোঝা যায় না; পেশাদার অভিনেত্রীর জন্যে এত কেন? আপাতত এ আলোচনা বন্ধ করলে হয়। দিনে দিনে চৌধুরী বড় সস্তা হয়ে উঠছে—ভারি অভিনয়, তার আবার আলোচনা। সকাল বেলায় ওদের আর কোন কাজ নেই।

কিন্তু মল্লিকপুরের আতুরালয়ের সাহায্য-কল্পে অলকার অভিনয় করাটা সমরের পক্ষে এদের চেয়ে কম বিস্ময়ের নয়। শুধু নাম নয়, আরো কিছুর বিবেচনায় প্রবীরদের কাজে অলকা যোগ দিয়েছে। কি সে? সে না এলেই বা কে কি করতে পারতো? খাতিরে অলকাকে পাওয়া গেছে না, প্রবীরের কাজে সমর্থন আছে বলে অলকা নিজে থেকে ছুটে এসেছে? জোর করে নিরপেক্ষ সাজা মনোভাবের সংগে কিছু পরিমাণে কৌতূহল বোধ যেন থেকে যায়। এই আলোচনায় অলকার চারিত্রিক পরিবর্তনের কোন আন্দাজ পাওয়া যাবে নাকি? মনে হয়, চৌধুরীর বোন 'একট্রেসটির' সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন—এমন কি, কি দিয়ে ভাত খায়, তাও জানেন। কিন্তু অত জেনে লাভ কি, দরকার কি, প্রয়োজনই বা কি। চুলোয় যাকগে, ওরা যা খুশি বলুক।

অভিনয়ের আলোচনার পর অনিবার্যভাবে প্রবীরের কাজের কথা উঠে পড়ে—এত বড় কাজ ইতিপূর্বে যেন কেউ আর করেনি। শুধু প্রশংসায় নয়, শ্রদ্ধায় ভাই-বোন উভয়েই মাঝে মাঝে রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে। সমর কোনরূপ মন্তব্য করে না, কেন জানি না, এ-আলোচনা তার ভালই লাগে না। প্রবীর এমন কিছু করছে না, যার জন্যে চৌধুরীদের মত লোকেদেরও অত বাড়াবাড়ি করতে হবে। গোটাকতক অনাথ ছেলেকে ভিক্ষে করে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করলেই একেবারে মস্ত কাজ হয়ে গেল। একে আবার দেশের কাজ বলে।

আলোচনার মাঝখানে চৌধুরী সমরের দিকে লক্ষ্য করে বললে—Your brother is Great.

কথাটা এমন শোনাল যেন সমর তুলনায় অত্যন্ত ছোট—এটা চৌধুরীর স্তুতি, না প্রকারান্তরে সমরকে নিন্দা, ঠিক বুঝতে পারলে না। তার ভাই বড়, বোন রত্ন, বার বার তাকে একথা শুনিয়ে লাভ কি। ভাই-বোনের গর্বে সে তো উল্লসিত হতে পারছে না; এদের কাছে সম্মানিত হচ্ছে কিনা, তাও জানে না। তাছাড়া অমন সম্মান ও চায় না।

রেবা বললে, প্রবীরবাবু বলেছেন একদিন তাঁর 'হোম' দেখিয়ে নিয়ে আসবেন।

সায় দিয়ে চৌধুরী বললে সবার যাওয়া উচিত! দেখবার জিনিস!!

সমর ভাবলে, প্রবীর আচ্ছা স্নবদের পাল্লায় পড়েছে, একটুতেই একেবারে গলে যাচ্ছেন। না, এর পর কোন মতেই চৌধুরীকে আর বিয়ের কথা জিগ্যেস করা চলে না। পাল্লা

হিসেবে চৌধুরী একেবারে অযোগ্য। লোকটার কোন পদার্থই নেই! আর রেবা? মনে যেটুকু দুর্বলতা জমেছিল, তার জন্যে সমর এখন নিজেকে ধিক্কার দিলে—ঐ আন্দামড়া খুকীর প্রেম! ভাবতেও গাটা কেমন করে ওঠে। মুখটা পেকে ঝামা হয়ে গেছে। প্রবীর-বাবুর সঙ্গেই মানাবে ভাল!

কেমন জবুথবু হয়ে সমর বসে থাকে। অনেকবার চৌধুরীকে একলা পেয়েও মনের কথাটা বলতে পারে না। কোন ছুতোয় এখন উঠে পড়তে পারলে বাঁচে। রেবার আপ্যায়নটা আজ বাড়াবাড়ি রকমের, তবু মনে ধরছে না। কোন কিছুতে আর তেমন আগ্রহ নেই।

আশ্চর্য, অলকাও এদের চিত্ত জয় করেছে! সিনেমা করে' নাম ক'রলে কি হবে, এখনো ভারি ভাল মেয়েটি আছে! গোল্লায় যায়নি? সেদিন অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত থাকলে হ'তো, নিজের চোখে দেখা যেত—অলকার কি পরিবর্তন হ'য়েছে। সত্যিই অলকা কি জানে না, সে দেশে ফিরেছে—প্রবীর কি কিছু বলেনি? কোন আগ্রহ নেই সমরের সম্বন্ধে? যদি তাদের সম্বন্ধ ভুলেই যেতে চাইবে তাহ'লে প্রবীরদের অনুষ্ঠানে যোগ দিলে কেন? উনি আবার নামকরা 'আর্টিস্ট' আজকাল! দেখা হ'লে যেন ভাল হ'তো, বোঝা যেত! যাবার আগে দেখা হয় না একদিন?

উঠে আসবার সময় চৌধুরী একটু নীচু স্বরে জিগ্যেস করলে, বাই দি বাই, কাল বাণী এসেছিল, দেখে মনে হোলো সে খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছে।

হঠাৎ এ আবার কি কথা! সমর বিস্ময়ে আতঙ্কে কিছুক্ষণ থ হ'য়ে থাকে, বাণীর বিপদ মানে কি? আর এত লোক থাকতে চৌধুরীকেই বা সে-কথা জানাতে এল কেন? এত আপনার লোক হ'য়ে গেছে চৌধুরী পরিবার? বিপদের কারণটা জিগ্যেস ক'রতে সমরের কেমন সংকোচ বোধ হয়—নিজেকে অপমানিত মনে করে।

চৌধুরী বললে, খবরের কাগজে দেখেছো বোধ হয় পরশুদিন বজবজে মিল অঞ্চলে একটা হাঙ্গামা হয় এবং পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়।

সমর ভেবে পায় না পুলিশের গুলিচালনার সঙ্গে বাণীর বিপদের সম্পর্ক কি! চৌধুরীর মুখের দিকে আরো বিহ্বল হ'য়ে চেয়ে থাকে।

চৌধুরী বলে, যুদ্ধ লাগার পরে এই প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট! বাণীর জানাশোনা একজন এ্যারেস্ট হ'য়েছেন এবং সেই নাকি ধর্মঘটের পরিচালক। পুলিশের সিরিয়স্ চার্জেস আছে।

সমর জিগ্যেস করলে, কে? বুঝতে পারছি না তো ব্যাপার কি!

চৌধুরী বললে, আমিও বুঝতে পারিনি। কি করে ও এই সব লোকদের পাল্লায় গিয়ে পড়ল। এদিকে বাবাকে বলবার জন্যে বলে' গেছে।

লোকটির নাম কি? সমর প্রশ্ন করে।

অরবিন্দ ঘোষ! কেন, তুমি তাকে চেনো না কি? চৌধুরী সমরের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চায়।

সমর চুপ করে' থাকে—অরবিন্দ ঘোষকে চিনলেও সে চিনতে পারে হয়তো। বাণীর স্বেচ্ছাচারিতা যে এতদূর পর্যন্ত যাবে সে ভাবতে পারেনি। ছোকরাকে পুলিশ গুলি করলে না কেন?

চৌধুরী বলে, আমি বলেচি, I would try. But she must be warned for the future—those fellows are very dangerous! পুলিশ ছাড়বে না, তার ওপর যদি জানে—

সমর হঠাৎ উন্মত্তের মত বলে, না, আপনাকে আর চেষ্টা করতে হবে না। ও হতভাগার জাহান্নামে যাওয়াই ভাল। এখন উপায়?

চৌধুরী বলে, বোনকে সাবধান করে দাও। ও দলে মিশতে দিও না আর। ডোমেস্টিট্যুট হোমই তো ভাল!

মুহূর্তের জন্যে সমর কি যেন ভেবে নেয়—হাতের ইঁট ফসকে যাওয়ার মত বলে বসেঃ চৌধুরী তুমি আমার বোনকে বিয়ে ক'রবে? We are in trouble!

হঠাৎ কি যেন একটা হ'য়ে যায়—চৌধুরী স্তব্ধ হ'য়ে সমরের কথার প্রতিধ্বনি অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। সমর চুপ করে' বাইরে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—প্রস্তাবটা কি বড় নির্লজ্জের মত করা হ'য়েছে? চৌধুরী আর কিছু বলে না, ঘরের সিলিং-এ দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করে। সমরের মনে হয়, চৌধুরী বড় লজ্জা পেয়েছে তাই চুপ করে আছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর সমর যেন মারমুখী হ'য়ে ওঠেঃ চৌধুরী কিছুতেই ও ছোকরার জন্যে চেষ্টা করো না। যত সব scoundrel জুটেছে, একবার ঘানি টেনে আসুক! আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বাণীকে ওদের সঙ্গে মিশতে দেব না।

মনে হ'লো সমরের কথা শুনে চৌধুরী যেন হাসলে। হাত দুটোকে দৃঢ়বদ্ধ করে একরকম শব্দ করে' জিগ্যেস করলে, কিন্তু এই ছোকরাটি কে? আশা করি, তোমাদের কোন আত্মীয় সে নয়।

না, না আমাদের কেউ নয়। বাণীর মাস্টার ছিল সেই সূত্রে আলাপ। কৈফিয়তের সুরে সমর জবাব দেয়।

চৌধুরী বলে, দেখি, কি করা যায়। সর্বঘটেই দেখছি তোমার বোন রয়েছে।

কথাটা বিদ্রূপ কিনা সমর ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। বোনের জন্য এত লজ্জা আর এত অপমান কুড়াতে হবে সে ভাবতে পারেনি। চৌধুরী কি তার প্রস্তাবটা কানেই তোলেনি, না সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছে বলে ও সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করছে না? ছি, ছি, একি অবিমিশ্রকারিতার পরিচয় দিয়ে বসেছে সে। সহসা মনটা বড় কঠিন হ'য়ে ওঠে—চৌধুরীকেও দোষারোপ করতে চায়—বলে, তা হ'লে তুমি বাণীর সম্বন্ধে এত উৎসুক ছিলে কেন? ইচ্ছে করে মাঝে গোটাকতক কড়া-কড়া কথা শুনিয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত সমর কিছুই বলতে পারে না, চৌধুরীর কথায় বোনের গৌরবে হাসতে চেষ্টা করে বোধ হয়। চৌধুরী রাজনীতি আলোচনা করতে চেষ্টা করেঃ ওদিকে আই-এন-এ, এদিকে লেবার মুভ্মেণ্ট আরম্ভ হ'য়েছে বেশ! I can assure you, peace will be greatly disturbed!

দেশের শান্তির জন্যে চৌধুরীর মত সমরের অত মাথাব্যথা নেই। আর শান্তি কথাটার ঠিক মানে কি বুঝতে পারে না। ছ বছর আগে দেশ যা ছিল, এখন সেরকম নেই—মানুষ-জন কার্যকলাপ সব বদলে গেছে, একি শান্তির লক্ষণ? আর এই যে হুজুক একি অশান্তির কারণ? দুর্যোগের মধ্যে যে অবস্থাকে মানুষ ফেলে আসে, ঠিক সেই অবস্থাকে কি মানুষ ফিরে পায় দুর্যোগ কেটে গেলে? শ্রমিক আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন যদি না থাকতো তা হ'লে কি বলা যেত দেশে পূর্বের শান্তি বজায় আছে? এক টাকায় আট সের চাল তো আর পাওয়া যাবে না কোনদিন!

সমর বলে, ও দু চার দিন, হুজুক বৈ তো নয়!

চৌধুরী বলে, মনে তো হয় না। বেশ ঘনিয়ে তুলেছে,. শেষটা কিছু একটা না হ'য়ে বসে!

সমর বলে, দেশের লোকের সে 'মোরেল' নেই, চোরাবাজার আর চাকরি করে দেশ অন্তত দশ বছর পিছিয়ে গেছে—কোন মুভ্মেণ্টই এখন চলবে না।

চৌধুরী মাথা নাড়ে—সমরের কথা বিশ্বাস করতে পারে না। সমর বলে, গোটা যুদ্ধে দেশের কেউ কংগ্রেসকে মানলে না এখন আবার মানবে? ছেলেমানষী যত সব।

আজ চৌধুরীর কি হ'লো কে জানে, শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সরকারের কড়া শাসনের ওপর বিশ্বাস যেন কিছু শিথিল হ'য়ে গেছে! কেন? নিজেই বুঝতে পারে না। দেশের লোক কংগ্রেসকে মানুক আর নাই মানুক, একটা কিছু যেন হ'বেই।

চৌধুরী বললে, সেদিন বাবার কাছে শুনছিলুম গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটি মেজার নাকি খুব কড়া করছে। ইতিমধ্যে তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

(ক্রমশ)

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

প্র·না·বি·.....

রোহিণী

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা স্থায়ী অভিযোগ আছে, তিনি নাকি রোহিণীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালেই এ অভিযোগ উঠিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন :—"অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন রোহিণীকে মারিলেন কেন? অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, আমার ঘাট হইয়াছে। কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যামাত্র, একথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।"

আধুনিক কালে শরৎচন্দ্র নূতনভাবে প্রশ্নটা তুলিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের মুখে এ প্রশ্ন বিস্ময়কর, কারণ তিনি নিজে প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক, কল্পনারাজ্যের নরনারীর চরিত্র কোন্ উপাদানে সৃষ্ট হয়, কেন তাহারা একটা বিশেষ পরিণামে গিয়া পেঁাছায়, শরৎচন্দ্রের না জানিবার কথা নয়। শরৎচন্দ্রের প্রশ্নের অনুষঙ্গরূপে আরও অনেকে সমস্যাটি লইয়া কলমবাজি করিয়াছেন। কিন্তু এক বিষয়ে সকলে অভিন্ন মত,—বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। যাঁহারা ইহার বিপক্ষে বলিয়াছেন—তাঁহারাও পরোক্ষে অভিযোগটা গ্রহণ করিয়াছেন। অভিযোগ অস্বীকার করিলে বিচারে নামিবার আবশ্যকই হয় না।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবার আগে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, রোহিণীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি ও কল্পনা মমত্বের অভাব ছিল না, কৃষ্ণকান্তের উইলের সংস্করণান্তরে উত্তরোত্তর রোহিণীর প্রতি লেখকের আকর্ষণ বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

"বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী ও গোবিন্দলাল চরিত্র পরবর্তী কালে পুস্তক প্রকাশের সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের ক্রমোন্নতি আছে। বঙ্গদর্শনের রোহিণী দুশ্চরিত্রা, লোভী। প্রথম সংস্করণের রোহিণী প্রায় তাই, দুশ্চরিত্রতা ও লোভ একটু কম দেখানো হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে রোহিণী আশ্চর্য রকম বদলাইয়া গিয়াছে; চরিত্রে সংযম ও দৃঢ়তা নাই বটে, কিন্তু দুশ্চরিত্রা নয়, লোভী মোটেই নয়। শেষ পর্যন্ত রোহিণী তাহাই আছে।"

(কৃষ্ণকান্তের উইল, ব-সা-প সংস্করণ)

এই বিশ্লেষণে বোঝা যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রতি অকরুণ ছিলেন না। কিন্তু ইহাতে আসল প্রশ্নের উত্তর হইল না। প্রশ্নটার উল্লেখ আগেই করিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্র কি রোহিণীর প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন। দুইপক্ষেই লোক আছে, স্বভাবতই রোহিণীর পক্ষেই সংখ্যার আধিক্য। কিন্তু আমি প্রশ্নটাকেই অস্বীকার করি, আমি বলি এই যে, কোনো সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত বিচার অবিচারের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। যখনই একটি সার্থক চরিত্র সৃষ্ট হইল সেই মুহূর্তেই সে লেখক-নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। রোহিণী কোনক্রমেই বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে নিম্নতর স্তরের জীব নহে, যদিচ সে বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি—ইহাই সৃষ্টিরহস্য, ইহাই শিল্পরহস্য, ইহাই সার্থক শিল্পসৃষ্টির রহস্য। রোহিণী যদি সজীব, স্ব-নিষ্ঠ, স্বকীয় ব্যক্তিত্বশালিনী জীব না হইয়া একটা বাক্যরচিত পুতুল মাত্র হইত, তবে লেখকের বিচার অবিচারের প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারিত। কিন্তু সার্থক কল্পনা লেখকের হাত হইতে মাটিতে নামিবামাত্র সে লেখকের হাতের বাহিরে চলিয়া যায়—তখন লেখক ইচ্ছা করিলেও আর তাহাকে স্বেচ্ছামত চালনা করিতে পারেন না, বিচার অবিচারের প্রশ্ন তো দূরবর্তী।

বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রতি অবিচার করিবেন কিরূপে? তাঁহাদের জগৎ তো এক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব জগতের লোক, রোহিণী অধিবাসী শিল্পজগতের। একটা গাছের ডাল মাথায় ভাঙিয়া পড়িলে বলি না যে, গাছটা আমার প্রতি অবিচার করিল, কিন্তু ঝড়ে চাল উড়িয়া গেলে তাহার প্রতি অবিচারের দায়িত্ব তুলি না। উদ্ভিদ জগৎ ও প্রকৃতির জগতের সহিত আমার মানব জগৎ যে এক নয়। শিল্পজগতের এক ব্যক্তি শিল্পজগতের অপর ব্যক্তির প্রতি অবিচার করিলে করিতে পারে—কিন্তু ভিন্ন জগতে বাস করিয়া অবিচার করা কিরূপে সম্ভব? মঙ্গলগ্রহের কোন অধিবাসীর ইচ্ছা থাকিলেও তো পৃথিবীর অধিবাসীর উপরে অবিচার করিবার উপায় নাই।

তবে এ কথা বলিতে পারি যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি অবিচার করিয়াছে, কিম্বা কৃষ্ণকান্ত তাহার প্রতি সুবিচার করে নাই। এ অভিযোগ সত্য না হইলেও সম্ভব, কেননা তাহারা সকলেই একই শিল্পলোকের অধিবাসী। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অভিযোগ তুলিয়াছেন—কিন্তু এ অভিযোগ কবিগুরু বাল্মীকির বিরুদ্ধে উঠিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। একই কারণে অনুরূপ অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে ওঠা সম্ভব নয়।

বিচারের প্রশ্ন আদৌ যদি ওঠে তবে বলিতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রতি অবিচার করেন নাই, কেননা তাহা অসম্ভব, এই কাহিনীতে একজনের প্রতি সত্যই অবিচার হইয়াছে, সে গোবিন্দলাল, আর সে অবিচারের কর্তা রোহিণী। রোহিণীকে পাইবার উদ্দেশ্যে গোবিন্দলালকে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার তুলনায় রোহিণী কি ত্যাগ করিয়াছে? রোহিণীর সংসারে সুখ ছিল না কাজেই সংসার ত্যাগ করিয়া তাহার দুঃখিত হইবার কথা নয়। সতীধর্ম বলিয়া তাহার কিছু ছিল না। যাহা নাই তাহা ত্যাগ করা যায় না। তবে অনেকে নারীধর্মের তর্ক উঠাইতে পারেন—সে উত্তর পরে দিতেছি। রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত গোবিন্দলালের অন্তর হইতে বাহির হইয়াছে, গোবিন্দলাল বলিতেছে—"রজার ন্যায় ঐশ্বর্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম? তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য ভ্রমর, জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম?"

এত ত্যাগের মর্যাদা কি রোহিণী বুঝিয়াছিল? বুঝিলে রাসবিহারীকে একবার দেখিবামাত্র অভিসারে ধাবিত হইত না! রোহিণীর অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে তাহার নিজের বাক্যই সন্দেহভঞ্জন করিবে।

"নিশাকর বলিল—আমি রাসবিহারী
রোহিণী বলিল—আমি রোহিণী
নিশা—এত রাত্রি হ'ল কেন?

রোহিণী—একটু না দেখেশুনে তো আসতে পারিনে। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হ'য়েছে।

নিশা—কষ্ট হোক না হোক, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী—আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তাহলে আমার এমন দশা হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে ভুলিতে না পারিয়া এখানে আসিয়াছি।"

ইহার পরে আর কাহারো সংশয় থাকা উচিত নয় যে, সে রসবিহারীর নিকটে হরিদ্রাগ্রামের সংবাদ লইতে আসিয়াছিল। রোহিণীকে কুলটা বলিলে কুলটার অমর্যাদা হয়, কারণ তাহারও আচরণের একটা অলিখিত নিয়ম আছে। রোহিণীর আচরণ যদি অবিচার না হয় তবে অবিচার আর কাহাকে বলে? ইহার পরে গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিণীকে হত্যা অবিচারও নয় সুবিচারও নয়। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। সংসারে এমনি হইয়া থাকে—

ইহার উপরে বঙ্কিমচন্দ্র দূরের কথা বিধাতারও হাত নাই।

এবারে মাতৃত্বের তর্কে প্রবেশ করা যাইতে পারে। অনেকে বলেন, রোহিণীর সংসার-সুখ বলিয়া কিছু ছিল না, তাহার বৈধব্যের জন্য সে দায়ী নয়—অথচ দণ্ড তাহাকেই একাকী ভোগ করিতে হইতেছে, তাঁহারা বলেন রোহিণীর নারীত্ব বা নারীজীবন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছিল। কিন্তু যে-জীবন সে বাছিয়া লইল তাহাতেই কি নারীত্বের সার্থকতা! নারীত্ব বলিতে মাতৃত্বের চেয়ে ব্যাপকতর সংজ্ঞা বোঝায়। বিধবা রোহিণীর মাতৃত্বের আশা ছিল না সত্য এবং নিশ্চয়ই সে আশায় কুলটা জীবন সে অবলম্বন করে নাই। মাতৃত্ব নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে, যে হতভাগিনী কোন কারণে সে সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইল নারী জীবনের অন্যান্য বৃত্তির চর্চা করিয়া সার্থকতা অর্জন করিতে তাহার বাধা নাই। রোহিণীরও বাধা ছিলনা। আসল কথা তাহার অপরূপ সৌন্দর্যে গোবিন্দলাল মুগ্ধ হইয়াছে এবং সমালোচকের দলও কম মুগ্ধ হয় নাই। ইহাতেই যত বিপত্তি! পাঠকেরও মোহের কারণ তাহার সৌন্দর্য। কোন পাঠিকা রোহিণীর প্রতি অবিচারের তর্ক মনে পোষণ করে কিনা জানিনা, কারণ নারী নারীর পদস্খলন কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না, বিশেষ সে হতভাগিনী যদি রোহিণীর ন্যায় রূপশালিনী হয়। *

মনোরমা

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী উপন্যাসের মনোরমা চরিত্র অনন্যসাধারণ। মনোরমার চেয়ে অধিকতর সজীব ও বাস্তবতর চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অনেক আছে, মৃণালিনীর আগেও আছে, পরেও আছে, কিন্তু ঠিক মনোরমার মত, চরিত্রসৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্র আর করেন নাই, মৃণালিনীর আগেও করেন নাই, পরেও করেন নাই। এই চরিত্রের গঠন প্রণালী আর সকলের হইতে স্বতন্ত্র। মনোরমার চরিত্র বিষম ধাতুতে গঠিত। সে একই সঙ্গে বালিকা এবং প্রৌঢ়া, সে একই সঙ্গে বালিকার সরলতায় এবং প্রৌঢ়ার অভিজ্ঞতায় মিশ্রিত। আগের মুহূর্তে বালিকার সরলতায় মুগ্ধ করিয়া পরের মুহূর্তে প্রৌঢ়ার অভিজ্ঞায় সে বিস্মিত করিয়া দেয়। মনোরমা একই দেহে দ্বৈত ব্যক্তিত্বশালিনী। পাঠকের বোধসঙ্গতির উদ্দেশ্যে কতক কতক অংশ উদ্ধার করিয়া আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

হেমচন্দ্র জনার্দন গৃহে মনোরমাকে প্রথম দেখিতেছেন।

"হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্মিতা দেবী প্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব, তৃতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্মাণ কৌশল সীমারূপিনী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী। বালিকা না তরুণী? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।"

প্রথম সাক্ষাতে হেমচন্দ্রের সহিত তাহার যে কথোপকথন হইল তাহাতে হেমচন্দ্র বুঝিল মনোরমা বালিকা। কিন্তু মনোরমার সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্টতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনোরমার প্রকৃতি হেমচন্দ্রের কাছে "অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তাঁহার বয়ঃক্রম দুরুপমেয়. সহজে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু কখন কখন তাঁহাকে অতিশয় গাম্ভীর্যশালিনী দেখিতেন।"

আগের মুহূর্তে হেমচন্দ্রের সহিত বালিকার ন্যায় আলাপ করিয়া পর মুহূর্তে মনোরমা যবনযুদ্ধে তাহার পথপ্রদর্শক হইতে চাহিল। হেমচন্দ্রের হতবুদ্ধি ভাব দেখিয়া মনোরমা বলিল—"আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ?" হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিল—"মনোরমা কি মহিষী?"

মনোরমার সম্বন্ধে এই সংশয় কেবল অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ হেমচন্দ্রকে আশ্রয় করে নাই, তীক্ষ্নদর্শন রাজমন্ত্রী পশুপতিকেও অবলম্বন করিয়াছিল। তাহার অকস্মাৎ ভাবান্তর দেখিয়া পশুপতি বলিতেছে—"তোমার দুই মূর্তি, এক মূর্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা, সে মূর্তিতে কেন আসিলে না? সেই রূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্তি গম্ভীরা তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রখরবুদ্ধিশালিনী—এ মূর্তি দেখিলে আমি ভীত হই।"

মৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হেমচন্দ্রকে প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে মনোরমা যে উপদেশ দিয়াছে তাহা কোন বালিকাতে সম্ভব নয়, এমন কি কোন প্রৌঢ়াতেও সম্ভব নয়—কেবল অসামান্য মানবমনোজ্ঞা প্রতিভাশালিনী নারীতেই তাহা সম্ভবে। সে নিজের দুর্নিবার প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বলিতেছে—"আমি অবলা, জ্ঞানহীনা। বিবশা, আমি ধর্মাধর্ম কাহাকে বলে তাহা জানি না। আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।"

এখানে এক নিশ্বাসে কথিত উক্তির মধ্যে মনোরমার দ্বৈতব্যক্তিত্ব প্রকাশিত। প্রথম বাক্যটিতে সে বালিকা। দ্বিতীয় বাক্যটি তত্ত্বদর্শী অভিজ্ঞা ব্যতীত কে বলিতে পারিত। ক্ষুব্ধ হেমচন্দ্র তাহাকে কিছু সদুপদেশ দিল—এমন সময়ে মনোরমা তাহার হাতের ঢালখানি লক্ষ্য করিয়া শুধাইল—"ভাই হেমচন্দ্র, তোমার এ ঢাল কিসের চামড়া? হেমচন্দ্র হাস্য করিলেন। মনোরমার মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা।"

মনোরমা পশুপতির পূর্ব পরিণীতা পত্নী। পশুপতির মৃত্যু হইলে স্বামীর চিতায় সে সহমৃতা হইল।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এই দ্বৈতব্যক্তিত্বের ভাণ কি মনোরমার একটি মনোরম ছলনা মাত্র? কিন্তু কি উদ্দেশ্যে, কাহাকে ভুলাইবার উদ্দেশ্যে সে ছলনা করিতে যাইবে? ঘটনার তাগিদ এমন নহে যে, তাহাকে দ্বৈতব্যক্তিত্বের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে বাধ্য করিবে। আর এমন কোন ছলনা আছে যে, সারা জীবনে ধরা পড়ে না? আর সারা জীবনে যদি ধরাই না পড়িল তবে তাহাকে ছলনা বা ছদ্মাভিপ্রায় বলিতে যাইব কেন? অতএব দ্বৈতব্যক্তিত্বকে তাহার প্রকৃতিগত বলিয়া ধরিয়া লওয়াই উচিত।

আগে বলিয়াছি যে, এমন দ্বৈতব্যক্তিত্বশালী চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আর সৃষ্টি করেন নাই। কপালকুণ্ডলা চরিত্রে ইহার একটা আভাস আছে। কিন্তু সে আভাস মাত্র। কাপালিক আশ্রমের কপালকুণ্ডলা বালিকা। নবকুমারের পত্নী আর বালিকা নয়—সে অচিরে পূর্বতন স্বভাব ও সরলতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে-দ্বৈত চরিত্র অঙ্কণের প্রথম, ক্ষীণ এবং অনিশ্চিত চেষ্টা কপালকুণ্ডলা চরিত্রে—তাহারই পূর্ণ পরিণতি মনোরমায়। পূর্ণ পরিণতিকে পূর্ণতর করিবার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র করেন নাই—সুবুদ্ধির কাজই করিয়াছেন। শিল্প জগতে পুনরাবৃত্তির ন্যায় দোষ অল্পই আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অনেক উপন্যাসে একজোড়া করিয়া প্রধান স্ত্রী-চরিত্র আঁকিয়াছেন স্বভাবে যাহাদের প্রায় বিপরীত বলা যায়। তাহাদের একজন গম্ভীরা, অপরা সরলা, একজন কোমল তরল, অপরা আপনাতে আপনি বিধৃত, একজন সংসার বিষ-বৃক্ষের কম্পমান পত্রশীর্ষে সদ্যঃপাতী শিশির বিন্দু, অপরা সংসারের হিম নিঃশ্বাসে, শিশিরবিন্দুর কঠিনীভূত রূপ; দুটিই সুন্দর, কিন্তু দুটির সৌন্দর্যে প্রভেদ আছে, একজন সংসারের আঘাতে মুমূর্ষু, অপরজন মরিবার আগে শেষবারের জন্য সংসারকে চরম আঘাত করিয়া লইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা ও আয়েষাকে এবং কপালকুণ্ডলার কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী, আনন্দমঠের কল্যাণী ও শান্তি, সীতারামের নন্দা ও শ্রী সকলেই উক্ত রীতির উদাহরণস্থল।

মৃণালিনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বতন্ত্র রীতি অবলম্বন করিয়া একটি চরিত্রের মধ্যেই দুটি ধারাকে মিলাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাই মনোরমাকে দেখি একাধারে বালিকা ও প্রৌঢ়া, সরলা ও অভিজ্ঞা, অবোধ ও প্রতিভাশালিনী। তাই সবশুদ্ধ মিলিয়া সে রহস্যময়ী। হেমচন্দ্র ও পশুপতির নিকট সে যেমন

* কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রহেলিকাময়ী, পাঠকের কাছেও তেমনি প্রতিভাত হোক—ইহাই বোধ করি লেখকের অভিপ্রায় ছিল। যদিচ বাস্তবের মাধ্যমে দেখায় এবং শিল্পের মাধ্যমে দেখায় অনেক প্রভেদ। বাস্তবের মাধ্যমে কেবল অংশকে দেখি, শিল্পের মাধ্যমে দেখি পূর্ণকে, বাস্তবের মাধ্যম প্রকাশ করে রূপকে, আর শিল্পের মাধ্যম প্রকাশ করে স্বরূপকে। বাস্তবের মাধ্যমে হেমচন্দ্র ও পশুপতি কেবল মনোরমাকেই দেখিয়াছে, শিল্পের মাধ্যমে পাঠক মনোরমা চরিত্রের পরিপূরকভাবে তাহার স্রষ্টার অভিপ্রায়কেও দেখিতে পায়। কাজেই হেমচন্দ্র ও পশুপতির দৃষ্ট মনোরমার চেয়ে পাঠকের দৃষ্ট মনোরমা পূর্ণতর।

আগে যে-সব যুগ্ম নায়িকাদের উল্লেখ করিয়াছি—তাহাদের হৃদয়ে কোন দ্বন্দ্ব নাই, পথ যতই কঠিন হোক্ সেই পথকেই তাহারা বাছিয়া লইয়াছে, সূর্যমুখী জানে, কোন্‌টি তাহার পথ, আবার কুন্দনন্দিনীর পথ স্বতন্ত্র হইলেও কিন্তু সেই পথের শেষ শিলাখন্ড পর্যন্ত তাহাকে যে যাইতে হইবে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই। শান্তি ও শ্রী দুজনেরই পথ দুর্গম, সেই দুর্গমতার পাথেয় তাহাদের চরিত্রে সুপ্রচুর, দ্বন্দ্বাতীত তাহাদের সংকল্প, তাহাদের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ নাই। মনোরমা এত সৌভাগ্যবতী নহে। সে পশুপতির কাছে ধরা দিতে চায়, কিন্তু একটা বিশেষ অবস্থা ঘটিবার আগে ধরা না দিতে সে বদ্ধপরিকর। পতিপরায়ণতা এবং পতির যথার্থ মঙ্গল কামনা এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্যে হতভাগিনী নারী নিষ্ঠুর অদৃষ্ট হস্তনিক্ষিপ্ত মাকুর মতো পুনঃ পুনঃ চালিত সঞ্চালিত হইয়া পাঠকের মর্মকোষ বিনির্গত অণিমময় সমবেদনা সূত্রের যে দিব্য বসন বুনিয়া তুলিয়াছে তাহা স্বয়ং বীণাপাণির অবগুণ্ঠন হইবার যোগ্য। কিন্তু তজ্জন্য তাহাকে সামান্য মূল্য দিতে হয় নাই। তাহাকে আত্মভেদ ঘটাইতে হইয়াছে—তাই সে এক দেহে বালিকা ও প্রৌঢ়া, সরলা ও অভিজ্ঞা, অবোধ ও প্রতিভাময়ী। খুব সম্ভব এই বিচিত্র দ্বন্দ্ব বীজাকারে তাহার প্রকৃতিতে গোড়া হইতেই নিহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আত্মরক্ষার তাগিদে অভ্যাসের দ্বারা তাহাকে সযত্নে লালন করিয়া বনস্পতি হইয়া উঠিতে সে সাহায্য করিয়াছে। বিপদকালে সেই বনস্পতি তাহাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছে—আবার যেদিন ঝড় আসিল সেই বনস্পতি চাপা পড়িয়াই সে অন্তিম নিশ্বাস ফেলিয়াছে।*

* মৃণালিনী

উত্তর আয়র্ল্যান্ডের নির্বাচন

সম্প্রতি উত্তর আয়র্ল্যান্ডের পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই নির্বাচনের কিছুটা গুরুত্ব আছে বলে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। সম্প্রতি আয়ার বৃটিশ কমনওয়েলথের বাইরে গিয়ে স্বাধীন রিপাব্লিকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করেছে এবং আগামী ১৮ই এপ্রিল আয়ার সর্বপ্রথম নিজেকে স্বাধীন রিপাব্লিকরূপে ঘোষণা করবে। বিভক্ত আয়র্ল্যান্ডের স্বাধীনতা নিয়ে আইরিশ জনগণ যে সন্তুষ্ট নয়—গত ২৬ বৎসরের আইরিশ ইতিহাস তার প্রমাণ দেবে। ঘটনাচক্রে পড়ে ভারতবাসীদের যেমন বৃটিশদের কাছ থেকে বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা গ্রহণ করতে হয়েছে, তেমনই ঘটনাচক্রে পড়েই একদিন আয়র্ল্যান্ডবাসীদের দেশ বিভাগ মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্টের স্নেহ-ছায়ায় পুষ্ট উত্তর আয়র্ল্যান্ডের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আইরিশদের মনে কাঁটার মতই বিঁধে আছে। ইদানীং বিভক্ত আয়র্ল্যান্ডকে একীভূত করার প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে আয়ারের কস্টেলো গভর্নমেণ্টের মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট। ডি ভ্যালেরার স্থলবর্তী হবার পর থেকেই প্রধান মন্ত্রী কস্টেলো দাবী তুলেছেন আয়ার ও উত্তর আয়র্ল্যান্ডকে একীভূত করতে হবে। ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ডি ভ্যালেরা এ দাবীর সমর্থনে খাস ইংল্যান্ডে প্রচারকার্য করে চলেছেন। আয়র্ল্যান্ডের এ একীকরণ সম্ভবপর হতে পারে নিম্নোক্ত পন্থায়—(১) আয়ার সামরিক আক্রমণের দ্বারা উত্তর আয়র্ল্যান্ড জয় করে নিলে, (২) বৃটেন উত্তর আয়র্ল্যান্ডের উপর অধিকার ত্যাগ করলে কিংবা (৩) সাধারণ নির্বাচনের পথে উত্তর আয়র্ল্যান্ডের পার্লামেণ্টে বিভাগ বিরোধী সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

করলে। প্রথমোক্ত দুটি পথে উত্তর আয়র্ল্যান্ডকে আয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। বৃটেন উত্তর আয়র্ল্যান্ডের উপর থেকে তার অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে না আর সামরিক অভিযানের দ্বারা উত্তর আয়র্ল্যান্ডকে দখল করতে গেলে আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা। তাই এই তৃতীয় পথই আপাতত একমাত্র ভরসা। সেই তৃতীয় পথেরই পরীক্ষা হয়ে গেল বর্তমান সাধারণ নির্বাচনে।

সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল আইরিশ জাতীয়তাবাদী ঐক্যপন্থীদের পক্ষে আদৌ সন্তোষজনক নয়। এই নির্বাচনে বিভেদপন্থীরা শুধু বিজয়ীই হয় নি—পূর্ববর্তী পার্লামেণ্টে তাদের যে সংখ্যাশক্তি ছিল, বর্তমান পার্লামেণ্টে তাদের সে সংখ্যাশক্তি আরও বেড়েছে। প্রধান মন্ত্রী স্যার বেসিল ব্রুকের ইউনিয়নিস্ট দল উত্তর আয়র্ল্যান্ডের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকার পক্ষপাতী। পার্লামেণ্টের মোট ৫২টি আসনের মধ্যে তাঁর দলই দখল করেছে ৩৮টি আসন। বাকী ১৪টি আসন বিরোধীদল পেলেও তার মধ্যে দুজন সদস্য আবার আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারে স্যার বেসিল ব্রুকের কর্মনীতির বিরোধী হলেও উত্তর আয়র্লান্ডের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একমত। সুতরাং বিরোধী দলের মাত্র ১২ জন সদস্য আয়ারের একীকরণ দাবীর সমর্থক। বিগত পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ জন আর স্যার বেসিল ব্রুকের সরকারী দলের সংখ্যা শক্তি ছিল ৩৫ জন। এবারের নির্বাচন হয়েছে স্পষ্টত একটি প্রশ্নের উপর—উত্তর আয়র্ল্যান্ড বা আলস্টারের নরনারীরা বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকার পক্ষপাতী, না আয়ারের সঙ্গে যোগ দিয়ে বৃটিশ কমনওয়েলথের বাইরে যাবার পক্ষপাতী। এই বিরাট প্রশ্নের সম্মুখে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির অন্যান্য সব ছোটখাটো প্রশ্ন চাপা পড়ে গেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান অবস্থায় নির্বাচনের পথে যে উত্তর পাওয়া সম্ভব সে উত্তরও পাওয়া গেছে। লন্ডনস্থিত আয়ারের হাই কমিশনার মিঃ জন্ ডুলান্টি এই নির্বাচন উপলক্ষে স্যার বেসিল ব্রুকের গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন যে, এ নির্বাচন আদৌ নিরপেক্ষ হয় নি। তাঁর মতে ভোটদাতাদের মধ্যে বারো ভাগের এক ভাগ এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহের বিষয়। গভর্নমেণ্ট নিজেদের সমর্থনে ভোট পাবার জন্যে সরকারী সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছেন, ভোটদাতাদের রেজিস্টারীর রদবদল করেছেন। স্যার বেসিল ব্রুক অবশ্য এইসব দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু কার কথা যে সত্য আমাদের পক্ষে তার বিচার করা কঠিন। এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা হলে কিছু সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। তবে আমাদের মতে এই ধরণের নির্বাচনের পথে উত্তর আয়র্ল্যান্ডকে কোনদিনই আয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। উত্তর আয়র্ল্যান্ডের জাতীয় জীবন যদি পুরোপুরি বৃটিশ প্রভাবমুক্ত হত—তবু কিছুটা আশার কারণ থাকত। কিন্তু সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আয়ারের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ঈমন ডি ভ্যালেরা নিউ ক্যাসেলে একথাটা স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি উত্তর আয়র্ল্যান্ডের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন

যে, আয়ারের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাগ্য সংযোজিত করতে আয়ার তাদের বাধ্য করতে পারে না, কিন্তু ইংরেজরা তাদের বর্তমানে যে সাহায্য দিচ্ছে সে সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে তারা উত্তর আয়র্ল্যান্ডবাসীদের ঐক্যপন্থী করে তুলতে পারে। কথাটা মর্মান্তিক সত্য। কিন্তু এ বিষয়ে ইংল্যান্ডের দিক থেকে আয়ার কোন সহযোগিতাই প্রত্যাশা করতে পারে না। তাই আয়ার অন্যদিক থেকে বৃটেনের উপর চাপ দেবার চেষ্টায় আছে। সম্ভাবিত কোন নতুন বিশ্বযুদ্ধে বৃটেনের আত্মরক্ষার জন্যে আয়ার অপরিহার্য। আয়ারের নিরপেক্ষতার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটেন কতটা অসুবিধায় পড়েছিল আমরা জানি। আয়ার পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিক, অতলান্তিক চুক্তিতে সই করুক—বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের পক্ষেই এটা কাম্য। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ আগ্রহাধিক্য দেখে আয়ারের প্রধান মন্ত্রী কস্টেলো বসেছেন বেংকে। তিনি নাকি বলেছেন যে, উত্তর আয়র্ল্যান্ডকে যদি আয়ারের সঙ্গে একত্রীভূত হতে দেওয়া হয়, তবে তিনি পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতেও রাজী আছেন—অতলান্তিক চুক্তিতেও সই করতে রাজী আছেন। তাঁর এই সর্তারোপে সম্ভাবিত ফল লাভ হবে কিনা জানার জন্যে আমরা আগ্রহান্বিত হয়ে রইলাম।

আমেরিকা কি জাপান ছেড়ে যাবে?

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাপান ত্যাগের ব্যাপার নিয়ে বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রচুর জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। খবরটা প্রথম বেরোয় জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে। এর পিছনে কোন সরকারী সমর্থন ছিল না—বে-সরকারী সূত্র থেকেই সংবাদটি প্রচারিত হয়েছিল। মার্কিন সেনাসচিব মিঃ কেনেথ রয়্যাল সম্প্রতি সুদূর প্রাচ্য পরিভ্রমণে বেরিয়ে জাপানে গিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি জাপানস্থিত মার্কিন সেনাধ্যক্ষদের একটি গোপন বৈঠক আহবান করেছিলেন এবং সে বৈঠকে কয়েকজন মার্কিন সাংবাদিক ছাড়া বাইরের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। প্রকাশ এই গোপন অধিবেশনে মিঃ রয়্যাল ঘোষণা করেছিলেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে রক্ষার জন্যে বিশেষ কোন প্রয়াস করবে না এবং শীঘ্রই জাপান থেকে দখলকারী মার্কিন সেনাদল সরিয়ে নেয়া হবে। তিনি নাকি আরও ঘোষণা করেন যে, আগামী যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের চেয়ে ইউরোপীয় অঞ্চলের উপর জোর দেবেন বেশী। বৈঠকে নাকি সাংবাদিকদের একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা ইচ্ছা করলে সূত্র প্রকাশ না করে বৈঠকে ঘোষিত নীতি সাধারণ্যে প্রচার করতে পারেন। সংবাদটি প্রচারিত হয়েছে এই সূত্র থেকেই এবং তার সম্বন্ধে জাপানের জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। হবারই কথা। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাপান বর্তমানে ৩ বৎসরাধিক কাল ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণেই আছে এবং জাপানের যে সামরিক শক্তি ছিল তার প্রধান ভরসা তাকেও নিষ্ক্রিয় ও নির্বীর্য করে তোলা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে জাপানে যে নতুন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার অন্যতম ধারা হল এই যে, জাপান 'আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মরক্ষার জন্যে বলের আশ্রয় নেবে না। এ অবস্থায় জাপান যদি শোনে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদূর ভবিষ্যতে জাপান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভাবী বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট আক্রমণের হাত থেকে তাকে রক্ষার চেষ্টা করবে না, তবে তার পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কিত হয়ে ওঠার কথা। এই সংবাদ ঘোষিত হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য সরাসরি সরকারীভাবে এ সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করেছে। নতুন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ডীন অ্যাকেসন বলেছেন যে, এ সংবাদ আদৌ সত্য নয়। জাপান সম্বন্ধে অনুসৃত মার্কিন কর্মনীতি বদলানোর কোন প্রশ্নই ওঠে নি। যে মিঃ রয়্যাল বিবৃতি দিয়েছেন বলে সংবাদদাতারা ঘোষণা করেছিলেন তিনিও বলেছেন যে, এ ধরণের কোন বিবৃতি তিনি দেননি। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান একটি বিবৃতিযোগে এ সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, জাপান সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মনীতি বদলায় নি এবং অদূর ভবিষ্যতে বদলানোরও কোন সম্ভাবনা নেই। তাই যদি হবে, তবে এ ধরণের সংবাদ রটল কোথা থেকে এবং কেন? এ সংবাদ রটায় জাতীয়তাবাদী জাপানীরা বিপদে পড়েছে এবং সুবিধা যদি কারও হয়ে থাকে, তবে হয়েছে কম্যুনিস্টদের যারা সোভিয়েট রাশিয়া ও কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্যে তৈরী হয়ে আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। জানুয়ারী মাসে জাপানের পার্লামেন্টে যে নতুন নির্বাচন হয়ে গেল তার ফলাফল দেখে বোঝা যায় যে, জাপানে কম্যুনিস্টরা ইতিমধ্যেই বেশ শক্তি সঞ্চয় করেছে। যুদ্ধোত্তর জাপানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট দলের মাত্র ৪ জন সদস্য জয়ী হয়েছিলেন এবং কম্যুনিস্ট দল মোট ভোট পেয়েছিল ১০ লক্ষ। আর সাম্প্রতিক নির্বাচনে তাদের দলের ৩৫ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং কম্যুনিস্ট দল মোট ভোট পেয়েছে ৩০ লক্ষ। আপাতত তারা বামপন্থী অন্যান্য দলকে একত্রিত করে প্রধান মন্ত্রী যোশিদার ডেমোক্রাটিক লিবারেল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োগ করার চেষ্টায় আছে। তারা বলতে আরম্ভ করেছে যে, একমাত্র কম্যুনিস্ট দলই অর্থনৈতিক দিক থেকে জাপানে পুনরুজ্জীবন আনতে পারে। কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের অধিনায়ক প্রধান মন্ত্রী যোশিদা বলেছেন তাঁর গভর্নমেন্ট নিষ্ঠার সঙ্গে ওয়াশিংটনে ঘোষিত নয় দফা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করে তুলবেন এবং কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োগ করে সংগ্রাম চালাবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে, জাপানকে নির্ভর করতে হবে সম্পূর্ণরূপে নিজের পায়ের উপর—বিদেশের মুখাপেক্ষী হলে তার চলবে না। প্রধান মন্ত্রী যোশিদার এ উক্তি যে সাম্প্রতিক জল্পনা কল্পনা প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত সে কথা ন বললেও চলে।

কালোছায়ার কাহিনী সম্পর্কে

গত সপ্তাহে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত সুসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন ঃ

সবিনয় নিবেদন,

'ভূতের মতো অদ্ভুত' নামে আমার একটি ছোটোদের ডিটেকটিভ উপন্যাস ছ-সাত বছর আগে দেব সাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত হয়; তার মূল কাহিনীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন ফিল্ম 'কালো ছায়া'র সাদৃশ্য খুবই উল্লেখযোগ্য। আমার বইতেও এক ভাই আর এক ভাইকে হত্যা ক'রে মৃতদেহ নিজের চেহারায় সাজিয়ে নিজে নিহত ব্যক্তির ছদ্মবেশ নেয়; আমার বইতেও হত্যাকারী নিহতকে সম্পত্তি ব্যাপারে ঠকিয়েছিলো; দাড়িগোঁফ কানাচোখটি পর্যন্ত আমার বইয়ের। 'ভূতের মতো অদ্ভুত'-এর রহস্য-উদ্ঘাটনকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর রণজিৎকে ফিল্মে দেখা যাচ্ছে সুরজিৎ নামধারী প্রণয়প্রবণ প্রাইভেট ডিটেকটিভরূপে। বস্তুত, অনেকেরই মনে হয়েছে—আমি সে মর্মে অপরিচিতের চিঠিও পেয়েছি—যে 'কালো ছায়া' ফিল্ম 'ভূতের মতো অদ্ভুত' অবলম্বনেই রচিত; আমারও তাই মনে হ'লো।

এই চিঠি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করলে বাধিত হব।

৯।২।৪৯ বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসুর লেখার মতো চিঠির মর্মটাও অত্যন্ত অদ্ভুত লাগলো আমাদের। পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্রের তিনি সমব্যবসায়ী সাহিত্যিকই শুধু নন, বিশিষ্ট বন্ধু ব'লেও জানতাম আমরা—চিঠিখানির সুরে কিন্তু তার প্রমাণ কিছুই নেই। শুধু তাই নয়—ঐ চিঠি পড়বার পর উৎসুক হ'য়ে 'ভূতের মতো অদ্ভুত' পড়ি এবং তা থেকে বুঝতে পারলুম যে, নিতন্তই একটা ভুয়ো ব্যাপার নিয়ে বুদ্ধদেববাবু কেমন যেনো একটা বিদ্ঘুটে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। 'কালো ছায়া' ও 'ভূতের মতো অদ্ভুত'-এর মধ্যে মিল কেবলমাত্র এই যে, দুটিতেই এক ভাই আর এক ভাইকে খুন ক'রে মৃতদেহ নিজের চেহারায় সাজিয়েছে। এ বিষয়ে আমরা প্রেমেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে যে চিঠিখানি পেয়েছি বুদ্ধদেববাবুর চিঠি সম্পর্কে সেইটেই যথেষ্ট। প্রেমেন্দ্রবাবুর চিঠিখানি নীচে দেওয়া গেলো ঃ—

সবিনয় নিবেদন,

কয়েকটি কাগজে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠি ছাপা হয়েছে দেখলাম। এ চিঠির জবাব দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু দিতে সত্যই লজ্জা বোধ করছি। স্বাভাবিক অবস্থায়, সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ যে, বন্ধু দূরের কথা, সমব্যবসায়ী কোন সাহিত্যিককে এরকম হীনভাবে অযথা অপদস্থ

করবার চেষ্টা করতে পারে, এ আমার ধারণার অতীত। তবে আজীবন মৌলিক রচনা লিখে যিনি বাঙলা দেশকে চমৎকৃত করে এসেছেন, ও বাঙলা জানলে মাইকেল আরলেন, আলডস হাক্সলি প্রমুখ ইংরাজি লেখকেরা যাঁর লেখা পড়ে লজ্জায় অধোবদন হতেন, সেই বুদ্ধদেবের পক্ষেই অপরের মৌলিকত্বে সন্দিহান হয়ে এরকম চিঠি লেখা বোধ হয় সম্ভব।

বুদ্ধদেবের 'ভূতের মত অদ্ভুত' নামে একটি ছোটদের বই আছে। সে বই-এর একটি ঘটনার সঙ্গে কালো ছায়ার একটি ঘটনার মিল দেখে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি আমায় আক্রমণ করেছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর যে কোন বই বার হওয়ামাত্র আপামরসাধারণ সকলে তা পড়তে বাধ্য, নিজের সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের এইরকম ধারণা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'কালো ছায়া' রচনা ও পরিচালনা করবার সময় বুদ্ধদেবের এ বইটি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে, নামকরা ইংরাজি বই থেকে, শুধু গল্প নয়, সংলাপ ও বর্ণনা পর্যন্ত লাইনের পর লাইন যাঁর লেখায় স্বীকৃতিহীন অনুবাদরূপে দেখা দেয়, কোন একটি ঘটনা, তাঁর বই চোখে না দেখেও কেউ যে স্বাধীনভাবে নিজ থেকে উদ্ভাবন করতে পারে, একথা বিশ্বাস করা অবশ্য তাঁর পক্ষে কঠিন।

বুদ্ধদেবের অভিযোগ শোনবার পর তাঁর বইখানি আমি পড়ে দেখলাম। তাঁর ও আমার গল্পে যে আকাশ পাতাল তফাৎ, যে কোন শিশুর পক্ষেও তা সহজবোধ্য বলে আমি মনে করি। খুনজখমই ডিটেক্‌টিভ গল্পের উপাদান এবং বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত আক্রোশ অধিকাংশ সময়ে তার মূলে থাকে। এ বিষয়ে পৃথিবীর অনেক ডিটেক্‌টিভ গল্পের সঙ্গেই আমার পার্থক্য সত্যিই নেই।

কিন্তু ডিটেক্‌টিভ গল্পের আসল কৃতিত্ব নির্ভর করে, তার গল্প সাজাবার ওপর। দ্রুতগতি ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে পাঠক বা দর্শকের কৌতূহল সদাজাগ্রত রেখে, সন্দেহকে শেষ সমাধানের মুহূর্তের আগে পর্যন্ত ভুল পথে চালানোতেই ডিটেক্‌টিভ গল্পের বাহাদুরী। বুদ্ধদেব যে সব চরিত্র নিয়ে যে সব ঘটনার সাহায্যে যেভাবে তাঁর গল্প সাজিয়েছেন, তার সঙ্গে আদ্যোপান্ত আমার গল্পের কোথাও বিন্দুমাত্র মিল নেই। যে ঘটনাটির উল্লেখ তিনি করেছেন, একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবেন, যে দুটি গল্প, সে ঘটনাটিও সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কল্পিত হয়েছে। তার প্রকার ও পদ্ধতি দুটি গল্পে সম্পূর্ণ আলাদা।

ডিটেকটিভ গল্পে অপরাধীর পরিচয় গোপন রাখবার জন্যে যে সমস্ত কৌশল ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে একটি আমি ব্যবহার করেছি। কৌশল হিসাবে এটি নতুন কিছু নয়, অত্যন্ত মামুলি এবং বুদ্ধদেব যাই বলুন, এ কৌশলের মৌলিকত্ব আমি অন্তত দাবী করি না। বহু বিলাতী গল্পে এ ধরণের কৌশল আছে ও গল্পের প্রয়োজনে এ কৌশল উদ্ভাবন করা কোন বুদ্ধিমান লেখকের পক্ষে যে অসম্ভব নয়, নিতান্ত ঈর্ষাকাতর না হলে বুদ্ধদেব নিজেই তা বুঝতে পারতেন। বুদ্ধদেবের গল্পে এ কৌশলের যে রূপ ও প্রয়োগ আছে তা নিতান্ত আকস্মিক ও অবান্তর কিনা পাঠকেরাই তা বিচার করবেন। আমার গল্পে এ কৌশলের উপযুক্ত ভূমিকা রচনা করে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে অনিবার্যরূপে তা উপস্থিত করা হয়েছে কিনা তাও তাঁদের বিচার্য। আসলে এ কৌশলটির নিজস্ব কোন দাম নেই, কিভাবে, কিরকম গল্পে তা ব্যবহৃত হয় তার ওপরই তার মূল্য নির্ভর করে।

বুদ্ধদেব কতখানি যে কান্ডজ্ঞানশূন্য হয়েছেন, তাঁর বই-এর পুলিশ ইন্সপেক্টর রণজিৎ ও আমার গল্পের ডিটেক্‌টিভ সুরজিতের নামে মিল দেখিয়ে দেবার চেষ্টা থেকেই তা বোঝা যায়। নামের মিল থাকাটাই যে তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় প্রমাণ এটুকু বোঝবার ক্ষমতা থাকলে কাগজে কাগজে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে পত্রাঘাত তিনি বোধ হয় করতেন না। তাঁর গল্প যে আত্মসাৎ করতে পারে, সামান্য একটা নামের মিল ঘুচিয়ে দেবার মত বুদ্ধিও কি সে রাখে না!

কিন্তু এত কথা লেখা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। 'ভূতের মত অদ্ভুত' ও উপন্যাসান্তরিত 'কালো ছায়া' দুটি বই-ই আশা করি বাজারে পাওয়া যায়। দুটি বই পড়ে সত্যাসত্য বিচার করবার ভার আমি পাঠকসাধারণের ওপরই ছেড়ে দিলাম। ইতি—

বিনীত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তিই কি অদৃষ্ট আমাদের ?

ইতিহাসের এ যেন পুনরাবৃত্তি। ভারতের বন্দরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ এসেছে মসলা আর মর্সালিন নিয়ে যেতে। দেশের লোককে কত তোয়াজ কত তারিফ। নিশ্চিন্ত দিল্লী দরবার। বিদেশী বণিক সনদ পেলে বাণিজ্য করবার। উমিচাঁদ, জগতশেঠেরা বখরাদারিতে বিদেশীর সঙ্গে বাণিজ্যে নেমে পড়ল।

তারপর সেই দরবারের নিস্পৃহতা, সেই আতিথেয়তাপ্রবণ প্রাচ্য মনের বিদেশী তোষণ, আর সেই একই প্রকার দেশের একদল মহাজনের অর্থগৃধ্নুতার ভুল শোধরাতে লেগে গেলো দু'শো বছর আর লক্ষ লক্ষ জীবনাহুতি।

ওপরের এই ছবিটাই একটু বদল করা যাক। সালটা যদি ধরা হয় ১৯৪৯; ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জায়গায় যদি বসানো হয় র‍্যাঙ্ক-কর্ডা-মেট্রো ইউনাইটেড আর্টিস্ট আর মসলামসলিনকে বদলে যদি ধরা হয় সিনেমার ছবি তো দুশো বছর আগেকার সেই ইতিহাসকে একেবারে অতি আধুনিক চেহারায় দেখা হ'য়ে যায়। গত সপ্তাহে প্রকাশিত ভারতীয় চিত্রশিল্পে বিদেশীদের অভিযান থেকে এই ছবিই যেন চোখে ভেসে ওঠে।

আতঙ্কটা একটু বেশী বাড়াবাড়ি মনে হ'তে পারে, কিন্তু উপমাটা বড়ো সুন্দর খাপ খায়—সব দিকেরই কেমন চমৎকার মিল! তাহ'লে আর একটা দুশো বছরি অনুতাপের পালাও নাকি আসছে আবার? সেও তো আরম্ভ হয়েছিলো সামান্য বাণিজ্য নিয়ে, তারপর কোথা দিয়ে যে কি হ'য়ে গেলো বুঝতে না বুঝতেই দেখা গেলো যে, সমগ্র দেশ বিদেশীর দাস হয়ে গিয়েছে। এবারেও আরম্ভ ঐ রকমই কিন্তু তার পরের ব্যাপারও কি ঐ রকমই হ'য়ে দাঁড়াবে? তা না হলে এবারেও দিল্লীর একেবারে নিঃশঙ্কতার লক্ষণ কেন? সেটা কি সিনেমার ব্যবসা বলে? কিন্তু জানা উচিত যে, মসলা-মসলিনের চেয়ে সিনেমার ব্যবসা অনেক মারাত্মক—এটা সম্পূর্ণ তাঁবেদারীতে এনে ফেলতে পারলে সৈন্য দিয়ে দেশ দখল করার দরকারও হয় না, কারণ ওরই সাহায্যে ভাতের একেবারে মনের জমিটাকেই সহজেই দখল ক'রে নেওয়া সম্ভব। বিদেশীদের এবারের চেষ্টা ঐ দিক থেকেই—এবারে তাদের জমিদারী বসছে দেশের শিক্ষা, কৃষ্টি ও জ্ঞানবুদ্ধির ওপরে। আমরা তো সত্যিই দর্শক মাত্র। দিশী লোকের তোলা দিশী ছবি দেখছি, না হয় দেখবো বিদেশী লোকের তোলা দিশী ছবি—ধুতি যেমন। আগে পরতুম দেশের তৈরী; ইংরেজও ধুতিই পরতে দিলে, কিন্তু সেটা তৈরী ওদের দ্বারা। তফাৎ এই যে, সে ধুতি জন্মাতো ম্যানচেস্টারে, আর এখনকার ছবির জন্ম অন্ততঃ কিছু পরিমাণ হবে এই দেশেই—পলিসির এই আধুনিক সংস্কারটুকুর দরকার বৈকি! দিল্লী কি সত্যিই এতে সায় দিচ্ছে, না তারা এ ব্যাপারে একেবারে নিরুপায়? দেশের শিক্ষা ও কৃষ্টির ওপরে বিদেশীর এই অভিযান অনেক বেশী ক্ষতিকর, এ ক্ষতও অনেক বেশী দুরপনেয় হবে, যদি না সরকার ও চিত্রব্যবসায়ীরা সচকিত হয়।

জনরুচির আসল প্রকৃতি

চিত্রনির্মাতা মহলে সম্প্রতি একটা হাওয়া বইতে শুরু ক'রেছে। তারা প্রচার করছেন যে, দেশের লোকের রুচির মান বহু ডিগ্রী নীচে নেমে গিয়েছে। ফলে, সত্যিকারের পরিচ্ছন্ন, ও যাকে বলা হয় 'সিরীয়স' ছবি তার আর কদর নেইকো মোটেই। অনেক চিত্রনির্মাতা তাই অ-সিরীয়স ছবি তুলতেই মন দিয়েছেন এবং অনেকে একেবারে অপরিচ্ছন্ন ছবিও তুলতে আরম্ভ করেছেন।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এই মন্তব্য যাঁরা করছেন, অর্থাৎ আমাদের দেশের চিত্রনির্মাতারা, তারা এদেশের চলচ্চিত্রশিল্প ইতিহাসের সমগ্র কালের মধ্যে এমন কিছু অসাধারণ প্রতিভা দেখাতে পারেননি যে-প্রতিভা জনসাধারণের প্রতিভার চেয়ে বিশেষ উঁচু ধাপে বসার যোগ্য। পরন্তু চিত্রনির্মাতাদের যে কেউ যখনই এতটুকু কোন প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তার স্বীকৃতি সর্বসময়েই জনসাধারণেরই মুখাপেক্ষী থেকেছে। আমাদের চিত্ররাজ্যে দুর্ভাগ্যের বিষয় মনিষী-শ্রেণীর প্রতিভা একেবারেই উদিত হয়নি। যে প্রতিভা এসেছে তা জনপ্রতিভারই সমস্তরের, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার চেয়েও কয়েক ধাপ নীচু স্তরেরই। তাই বেশীরভাগ ছবিই লোকের অপছন্দ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। জনসাধারণের জ্ঞানবুদ্ধি, রসগ্রাহী ক্ষমতা ও বিচারশক্তিকে ছাপিয়ে যেতে না পারলে জনসাধারণের মন ও মগজকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। আর সেটা না সম্ভব হলে লোকের পছন্দের ওপরেও কোন প্রভাব বিস্তার করা যায় না। সেই প্রভাববিহীন জনমন কাজেই ছবির বিচারে বেপরোয়া হওয়াই স্বাভাবিক। বিদেশী ছবিগুলো সাধারণত কেন প্রশংসা লাভ করে, এই থেকে তা অনুধাবন করা যেতে পারবে। ওদের মতো নতুন রুচির সৃষ্টি ক'রতে পারে, নতুন ধারার প্রবর্তন ক'রতে পারে এ দাবী আমাদের দেশের চিত্রনির্মাতাদের মধ্যে কে পূরণ করতে পেরেছেন?

আর একটা কথা হ'চ্ছে যে, চিত্রনির্মাতাদের যে-ধারণাটির বিষয় নিয়ে এই আলোচনা সেটা ব্যাপক হয়েছে খুবই সম্প্রতি—ছবির পর ছবি দর্শকদের মনোতুষ্টিতে ব্যর্থ হবার পর, যার ফলে ছবির বাজারই গিয়েছে কাবু হ'য়ে। দর্শকদের সমাদরলাভে কোনক্রমেই সফলকাম না হতে পারায় নিজেদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকে ঢেকে দেবার জন্যেই চিত্রনির্মাতারা জনসাধারণেরই রুচির দোহাই দিয়ে অপরিচ্ছন্ন ছবি তোলার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। এইটেই হ'লো একমাত্র সম্ভাব্য যুক্তি। এটা ধারণা নয়, এইটেই হলো আসল সত্যি।

কিছুদিন আগে বম্বের খ্যাতনামা চিত্রনির্মাতা 'লাল-হাভেলী' "সম্রাট অশোক" ও "লাল দোপাট্টা"র প্রযোজক শ্রী কে বি লাল এখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া আলোচনায় এই রকমই একটা বিপরীত কথা শোনান। তিনি যা বলেন তার ভাবটা এই দাঁড়ায় যে এখন লোকেরই রুচি গিয়েছে খারাপ হ'য়ে এবং তারা পছন্দ করছে কেবলমাত্র হাল্কারসের ও যৌন আবেদনভরা উপাদান—শিক্ষা ও নীতিমূলক, দেশ ও জাতি গঠনমূলক সামাজিক বা জীবনসমস্যামূলক অথবা বীর আদি ও শৃঙ্গার রস ব্যতিরেকে অন্য যে কোন রসপুষ্ট পরম নাটকীয় উপাদানও লোকের কাছে আজ শ্রদ্ধা হারিয়েছে। এটা তার ধারণা শুধু নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও।

জনসাধারণের রুচি সম্পর্কে এর পর আমরা অনুরূপ মন্তব্য পাই বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম কর্ণধার স্বনামধন্য শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। গত ৩১শে জানুয়ারী বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশনের এক সাংবাদিক-বৈঠকে ছবির পড়তি বাজার সম্পর্কে কথা ওঠে। তাতে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটা শ্রীলালকেও ছাপিয়ে যায়। তিনি বলেন যে, লোকে ভালো ছবি নিতে চাইছে না শুধু তাই নয়, তারা দেখতে চাইছে যত সব "filthy" ও "vulgar" ছবি। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আজ প্রায় ২৭ বছর চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে এবং প্রদর্শন, পরিবেষণ ও প্রযোজনা তিনটি ব্যাপারেই। বাঙলার বৃহত্তম চিত্রব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তিনি কর্ণধার। তাঁর মন্তব্যও নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূতই বলতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য! চিত্রনির্মাতাদের এ ধারণার কোন ভিত্তি কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না অনেক খুঁজেও। এটা সত্যিই ওদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত, না ঐ যা বলেছি, নিজেদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতা ঢাকবার জন্যে লোকের রুচির ওপরে দোষ চাপিয়ে দেওয়া?—বোঝা শক্ত। আমরা বিশ্লেষণ করে যা পাচ্ছি তা চিত্রনির্মাতাদের মতের সমর্থক তো নয়ই বরং ঠিক তার উল্টো অভিমতই ব্যক্ত করে। রুচি-বিগর্হিত অপরিচ্ছন্ন ও হাল্কারসের যৌন-আবেদনভরা অথবা "filthy" ও "vulgar" ছবির দিকে যাঁরা ঝুঁকেছেন, বিশেষ করে তাঁরাই যেন আমাদের বিশ্লেষণটা বিচার ক'রে দেখেন।

সাম্প্রতিক বাজারে স্বয়ংসিদ্ধা ছবিখানি বাঙলা ছবির মধ্যে জনপ্রিয়তার একটি রেকর্ড স্থাপনে সমর্থ হয়। কলাকৌশলাদির অধিকাংশ বিষয়ে ছবিখানির প্রয়োগনৈপুণ্য অত্যন্ত জঘন্য, কিন্তু লোকে তা গ্রাহ্যেই আনেনি। লোকে যা গ্রহণ করেছিলো তা হাল্কারসেরও নয় মোটেই, filthy ও vulgar তো নয়ই। লোকের কাছ থেকেই বিপুল সমাদর পেয়ে "স্বয়ংসিদ্ধা" সব প্রতিরোধ ঠেলে দাঙ্গাকালের মতো বিশৃঙ্খল অবস্থাতেও জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে এবং শ্রীচট্টোপাধ্যায়েরই পরিবেষণায়, তাঁরই চিত্রগৃহে।

আরও সাম্প্রতিক দুটি সাফল্য হলো "ভুলি নাই" ও "সমাপিকা"। খুবই হাল্কা রসের 'রঙ-বেরঙ' অথবা কিছুটা যৌন আবেদন ছোঁয়ানো "নারীর রূপ" লোকের কাছ থেকে ওদের পঞ্চমাংশ সমাদরও লাভ করতে পারলো না কেন? লোকের রুচি বিকৃত হয়ে যাবার লক্ষণ তাহলে কিসের থেকে পাওয়া গেলো?

একটু অতীতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে, বাঙলার শুধু নয়, সমগ্র ভারতীয় চিত্র-জগতে যেসব কৃতিত্ব আজও পরিচ্ছন্ন প্রমোদ হিসেবে উৎকর্ষে ও গরিমায় ধ্রুবতারারূপে পরিগণিত তার প্রায় সব ক'খানিই জনপ্রিয়তার দিক থেকেও উত্তুঙ্গ শিখরে অধিরোহণ করে আছে—যেমনঃ বড়দিদি, জীবন-মরণ, ডাক্তার, পরিচয়, প্রতিশ্রুতি, উদয়ের পথে, মানে-না-মানা, শহর থেকে দূরে, কাশীনাথ, রামের সুমতি প্রভৃতি—এর মধ্যে filth ও vulgarityর ছিটেও কি আছে কোনটিতে? এরা প্রত্যেকটি সমাজ ও জীবন সমস্যামূলক সিরিয়স ছবিই নয় কি? অথচ এই ছবিগুলিরই প্রত্যেকটির ব্যবসা সাফল্য ভারতীয় চিত্র-জগতের ইতিহাস।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত দশ বছরে জনসাধারণ থেকে মোটামুটি ব্যবসা সাফল্য ছবিগুলির নামও দিচ্ছি—এর মধ্যে কোন কোন ছবিকে শ্লীলতা বর্জিত বা খেলো উপাদান সম্পৃক্ত বলে অভিহিত করা যায়। ওপরের প্যারাতেই দশখানি ছবির নাম দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়ঃ অধিকার, সাপুড়ে, রজত জয়ন্তী, রিক্তা, চাণক্য, পরশমণি, ঠিকাদার, শাপমুক্তি, কুমকুম, প্রতিশোধ, বাংলার মেয়ে, রাজনর্তকী, নর্তকী, বন্দী, গরমিল, পরিণীতা, জীবন-সঙ্গিনী, শেষ উত্তর, সহধর্মিণী, প্রিয় বান্ধবী, সন্ধি, বিরাজ বৌ, সংগ্রাম, মাতৃহারা, অভিনয় নয়, দুই পুরুষ, ভাবীকাল, গৃহলক্ষ্মী, চন্দ্রশেখর, নার্স সি সি, পথের দাবী, স্বপ্ন ও সাধনা, স্বয়ংসিদ্ধা, প্রিয়তমা, ভুলি নাই, স্মরণীয়া, দৃষ্টিদান, প্রতিবাদ, অঞ্জনগড়, নন্দরাণীর সংসার, কালোছায়া, সমাপিকা প্রভৃতি। তালিকাটি সম্পূর্ণ বলে ধরা ভুল হবে; প্রথম চোটেই যে ছবিগুলির কথা মনে আসে তাদেরই নামগুলো শুধু দেওয়া হয়েছে। টাকা-আনার হিসেব না তুলে ধরলেও এই তালিকার ছবিগুলির জনপ্রিয়তা লোকের মনে খুবই স্পষ্ট আছে। এর মধ্যে সাফল্য সত্ত্বেও কয়েকখানি ছবির নির্মাতা লাভবান হয়নি জানি, কিন্তু তার কারণ ছবি তুলতে অর্জন-ক্ষমতা ছাপানো খরচ আর নয়তো প্রদর্শন পরিবেশক নীচে থেকে এতো বেশী ভাগ মেরে নিয়েছেন যে, নির্মাতার হাতে শেষ পর্যন্ত ছোবড়া ছাড়া আর কিছু পৌঁছায়নি। কিন্তু সে দোষ কী জনসাধারণের?

আমাদের মনে হয় যে, হঠাৎ ব্যবসা পড়ে যাওয়ার জন্যেই ব্যবসাদাররা বিচলিত হয়ে আসল কারণ সন্ধান করার পথ খুইয়ে যতসব ভ্রান্ত উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়েছেন। তাদের সামনে তাই জুগনু-খিড়কি-সানহাইয়ের দলই হয়ে উঠছে জনপ্রিয়তার আদর্শ। কিন্তু সেটাও তাদের মস্ত ভুল। এ ছবিগুলি নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, সাময়িকভাবে খানিকটা দর্শক মহলে হুটোপুটিও হয়েছে, কিন্তু স্মরণীয় সাফল্যলাভ এর কোনটির দ্বারাই সম্ভব হয়নি। জুগনু দেখানো হয় ম্যাজেস্টিক সিনেমাতে—এখন ওখানে পরিচ্ছন্ন এবং ঘর-গৃহস্থালী নিয়ে অতি সিরিয়াস যে 'গৃহস্থী' ছবিখানি দেখানো হচ্ছে তার তুলনায় ওর ব্যবসা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। 'সানাই' যা সাফল্যলাভ করেছে তার চেয়ে 'সিঁদুরের' সাফল্য অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য। নিউ সিনেমায় রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপক সাংসারিক জীবনের সিরিয়াস প্রতিচ্ছবি 'দেবর'এর ব্যবসা ওখেনেই দেখানো মাত্র আট সপ্তাহ চলা 'খিড়কী'র চেয়ে বেশী নয় কী? আজও ভক্তিমূলক ছবি 'জয় হনুমান' সমগ্র দেশে যে সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে তাতে কি লোকের হাল্কা ও শ্লীলতা-বর্জিত ছবির প্রতি রুচি প্রমাণ করে? ব্যবসার মাত্রা নির্ভর করে জন-সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার ওপরে, সুতরাং জনসাধারণ কী ধরণের ছবি বেশী পছন্দ করে এই সব থেকে তা বুঝতে না পারার কোন কারণ নেই। ভারতের চেয়ে পরিচ্ছন্নরুচি দর্শক পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ।

আমাদের চিত্র ব্যবসায়ীরা তাদের দৃষ্টিটা যদি দেশের গণ্ডীর বাইরেও নিয়ে যান, তাহলেও বুঝতে পারবেন যে তারা কি ভুল ধারণাই না পোষণ করে আসছেন। তাঁরা বোধ হয় শুনে থাকবেন যে আজ আন্তর্জাতিক বাজারে আমেরিকার একচেটিয়াত্বকে চুরমার করে দিচ্ছে বৃটেনের তৈরী ছবিগুলি, আর সে ছবি-গুলির রকম হচ্ছেঃ হ্যামলেট, অলিভার টুইস্ট, গ্রেট এক্সপেক্টেশন, প্রিন্স এনকাউণ্টার প্রভৃতি অতি সিরিয়াস ছবি—এদের সামনে আমেরিকার বেদিং বিউটি, ব্রডওয়ে মেলোডি, ওন এন আইল্যান্ড উইথ ইউ'এর দল ব্যবসার দিক থেকে কোন পাত্তাই পাচ্ছে না আজ।

বাজার খারাপ হয়ে গিয়েছে হয়তো সত্যিই, কিন্তু তার দোষটা জনসাধারণের ওপর চাপাবে কেন? চলচ্চিত্র ইতিহাসের গোড়া থেকেই দেখতে পাওয়া যায় যে, লোকে বরাবরই সিরিয়াস ও পরিচ্ছন্ন ছবিকেই বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে এবং একটি ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এইটেই হলো ঐতিহাসিক সত্য—আগেও যেমন আজও তেমনি। গলদটা হচ্ছে এই যে, যাঁরা ছবি তৈরী করছেন এবং যাঁদের জন্যে ছবি তৈরী হচ্ছে এদের বোধশক্তির ব্যবধান—প্রথমোক্ত দল ওবিষয়ে শেষোক্তদের চেয়ে অনেক পিছিয়েই আছেন—নিজেদের চেয়ে উঁচু স্তরের ধী-শক্তিসম্পন্ন দর্শকদের তৃপ্তি
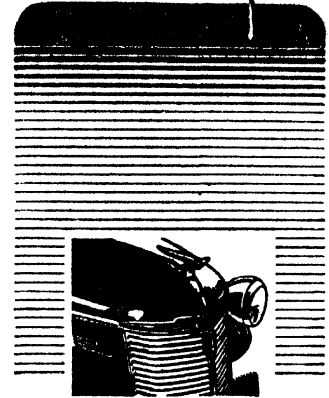
দেওয়া চিত্রনির্মাতাদের প্রতিভাতে কুলোচ্ছে না। চাটুজ্যে মহাশয় বা লাল সাহেবেরা তারা যাদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভর করছেন সেই জনসাধারণের রুচির অহেতুক দোষ না দিয়ে তাদের রুচির আসল প্রকৃতিটা ধরবার চেষ্টা করলেই শিল্পের মঙ্গল হবে এবং ছবি তো উন্নত হবেই। তারা পরিষ্কার ভাবেই দেখতে পাবেন যে, হাল্কা জিনিস যা সামান্য বলে তা শুধু এই কারণেই যে লোকে ফাঁকো জিনিসে ফাঁকি সহ্য করতে রাজী আছে, কিন্তু সারবস্তুর আবরণে এতটুকুও অসারত্বের তারা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। কারণ ওটা যে ওদেরই প্রতিভার ওপরে চ্যালেঞ্জ করা—সে ক্ষেত্রে তারা পরাজয় মানতে প্রস্তুত নয়, যদি না সত্যিই পরাক্রান্ত শক্তির সামনে পড়ে। আজও পৌরাণিক ও ধর্মমূলক ছবির কাটতি যে দেশে সবচেয়ে সুনিশ্চিত সে দেশের দর্শকদের রুচি আর যাই হোক filthy ও vulgar নিশ্চয়ই নয়।

খুচরো খবর

আমরা যা অনেক আগেই ইঙ্গিত করেছিলাম, এখন সত্যিই ঠিক হয়েছে যে, অমর মল্লিকের তোলা "স্বামী বিবেকানন্দ" সেন্সরের ছাড়পত্র পাচ্ছে নাম বদলে "স্বামীজী" নামে।

* * * *

শান্তারামের বাংলা ছবিতে সুরযোজনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এখান থেকে দু'একজন অভিনয় শিল্পী নিয়ে যাবার কথা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন কবির ঠাকুরঝি।

* * *

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবি রঙ্গশ্রী কথাচিত্রের "কিষাণ"।

বসুমিত্রের পরবর্তী ছবি "সাংহাই" পরিচালক অমর বসু।

* * *

প্রমোদকর বাড়ানোর প্রস্তাবে আতঙ্কিত বি-এম-পি-এ, অর্থসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের কাছে ধর্না দেবে বলে ঠিক করেছে।

* * *

সংযুক্ত চিত্র প্রতিষ্ঠানের হয়ে পরিচালক বিমল রায় বনফুলের লেখা বাস্তুহারাদের নিয়ে একটি কাহিনীর চিত্ররূপ দেবেন বলে জানা গেলো।

* * *

গত সপ্তাহে পর পর দুদিন "কবি" ও "শক্তি"র বিশেষ প্রদর্শনীতে যোগদান করা দেখে মনে হয় ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন শেষে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের স্থানটা দখল করেই নেবে।

এ্যাথলেটিকস

নিখিল ভারত এ্যাথলেটিক স্পোর্টস অনুষ্ঠান সম্প্রতি দিল্লীতে সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাতিয়ালার প্রতিনিধিগণ পুনরায় অধিকাংশ বিষয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়াছে। ভ্রমণ বিষয় বাঙলার প্রতিনিধিগণকেই নিখিল ভারত অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জন করিতে দেখা যাইত; কিন্তু দিল্লীর অনুষ্ঠানে পাতিয়ালার প্রতিনিধিগণই সেই গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। এমন কি ১০০০০ মিটার ভ্রমণে নূতন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহিলা বিভাগে বোম্বাইর মহিলা এ্যাথলিটগণ পূর্বাপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পুনরায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে পাতিয়ালা ও বোম্বাইর এ্যাথলিটগণই যে মনোনীত হইবেন ইহা একরূপ দিল্লীর মাঠেই প্রমাণিত হইয়াছে। আন্তরিক সাধনা ব্যতীত এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের কোন বিষয়েই গৌরবের অধিকারী হওয়া যায় না। সুতরাং পাতিয়ালা ও বোম্বাইর প্রতিনিধিগণ যে সাধনার বলেই সাফল্যলাভে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য বাঙলার এ্যাথলিটগণ কবে আন্তরিকভাবে সাধনায় লিপ্ত হইবেন? দিল্লীর অনুষ্ঠানে যে শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন ইহার পরেও কি নিজেদের শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না? বাঙলার প্রতিনিধিগণ একমাত্র শিক্ষার অব্যবস্থার জন্যই এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন ইহাও কি স্পষ্ট ভাষায় সর্বসাধারণকে জানাইয়া দিবার মত সৎসাহস বাঙলার এ্যাটলীটদের এখনও হইবে না?

মিস রোসনারা মিস্ত্রী (বোম্বাই) ইনি নিখিল ভারত এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে ১০০ মিটার, ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হইয়াছেন।

পাতিয়ালার এ্যাথলীটরা প্রকৃত এমেচার নহেন

বাঙলার এ্যাথলীটদের মধ্যে অনেক সময় আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতে শোনা যায় "পাতিয়ালা কেন পারিবে না তাহারা সকলেই একরূপ পেশাদার। কেবল স্পোর্টস করিবার জন্যই পাতিয়ালার মহারাজা ইহাদের রাখিয়াছেন ও সর্ব-বিষয় সাহায্য করিতেছেন।" এই উক্তির পশ্চাতে যদি সত্যতা থাকে বাঙলার এ্যাথলীটদের উচিত সমবেতভাবে ইহার প্রতিবাদ জানান নিখিল ভারত এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের নিকট। পাতিয়ালা মহারাজা ফেডারেশনের সভাপতি সুতরাং প্রতিবাদ জানাইয়া কোনই ফল হইবে না ইহা ধারণা করা ভুল। ফেডারেশন প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিলে জনসাধারণের মধ্যে এই বিষয় লইয়া যদি তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করা যায় নিশ্চয় এই অবিচার ধামা চাপা থাকিতে পারে না?

এশিয়ান গেমস ফেডারেশন

নিখিল ভারত এ্যাথলেটিক স্পোর্টস অনুষ্ঠানের সময় এশিয়ান গেমস ফেডারেশন গঠিত হইয়াছে। ফিলিপাইন, বর্মা, পাকিস্থান, নেপাল ভারত, সায়াম, ইন্দোএশিয়ান প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ এই ফেডারেশন গঠনের সময় উপস্থিত ছিলেন। ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র ঠিক আন্তর্জাতিক অলিম্পিক এসোসিয়েশন আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়াই গঠিত হইয়াছে। কেবল মাত্র এমেচার বা সৌখীন এ্যাথলীট বা ব্যায়ামবীরগণ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবেন। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ মাসে সর্বপ্রথম উক্ত নবগঠিত ফেডারেশনের প্রথম স্পোর্টস অনুষ্ঠান দিল্লীতে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহার পর ১৯৫৪ সালে দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে হইবে। নিম্নলিখিত প্রতিনিধিদের লইয়া ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে: সভাপতি—পাতিয়ালার মহারাজা, সহ-সভাপতি—মিঃ জর্জ ভার্গাস (ফিলিপাইন), সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—মিঃ জি ডি সোন্ধী।

ফেডারেশন একটি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে সুতরাং এই বিষয় আমাদের কিছু বলিবার নাই। তবে এই ফেডারেশনের মধ্যে জাপানকে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য প্রচেষ্টা হইতে দেখিলে খুবই আনন্দ হইত। এই প্রসঙ্গে আমেরিকান এমেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়নের সভাপতির সম্প্রতি প্রচারিত বিবৃতি সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন আন্তর্জাতিক স্পোর্টসের যে উদ্দেশ্য তাহা অক্ষরে অক্ষরে মানিতে হইলে জাপান ও জার্মানীকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে বাদ দেওয়া অন্যায় হইবে।

মিস বি গাজদার (বোম্বাই) ইনি নিখিল ভারত এ্যালেটিক স্পোর্টসে উচ্চ লম্ফন; দৈর্ঘ লম্ফন, বর্শা ছোড়া প্রভৃতি বিষয় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

নিখিল ভারত এ্যাথলেটিক স্পোর্টস অনুষ্ঠানে "মার্চ পাস্টের" একটি দৃশ্য।

দেশী সংবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারী— ভারতের দেশরক্ষা সচিব আজ ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে পাকিস্থানের সেনা ও পুলিশ শ্রীহট্টের পার্শ্ববর্তী ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকায় প্রবেশ করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল, ফলে ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা সাময়িকভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছিল। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে জানান হয় যে, কাশ্মীর যুদ্ধে সর্বসমেত ১,৭৯৫ জন নিহত এবং ৪,১০৯ জন আহত হইয়াছে।

গান্ধী হত্যা মামলার শঙ্করকৃষ্ণায়া ব্যতীত অন্য সকল আসামী বিশেষ আদালতের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পূর্বপাঞ্জাব হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে।

তমলুকের এক সংবাদে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার গোপালচকের এক গৃহে হানা দিয়া কম্যুনিস্ট বলিয়া অভিহিত প্রায় কুড়ি জন লোককে পুলিশ ঘেরাও করিয়া ফেলে।

১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কয়েকজন পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। প্রকাশ, ধৃতব্যক্তিগণ সকলেই ধান্য লুঠ ও গৃহদাহের সাম্প্রতিক ঘটনা-সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—ভারতীয় পার্লামেণ্টে ভারত গভর্নমেণ্টের রেল ও যানবাহন সচিব শ্রীযুত এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ১৯৪৯-৫০ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন। চলতি বৎসরে মোট ১৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। রেলওয়ে সচিব ঘোষণা করেন যে, আগামী বৎসর রেলওয়ে ভাড়া বা মাশুল বৃদ্ধি করা হইবে না।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—পাটনা হইতে পাঁচ মাইল দূরে দানাপুরে শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণের সভাপতিত্বে নিঃ ভাঃ রেলওয়েমেনস্ ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সভায় ওয়ার্কিং কমিটির সুপারিশ বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া স্থগিত রাখিতে সুপারিশ করেন।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেন যে, গত ১লা ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুণের শহরতলী ইনসিনে বর্মী ও কারেনদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সময় ৪ হাজার ভারতীয়কে নিরাপদে রেঙ্গুণে স্থানান্তরিত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী-দের সাহায্যদান সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরকালে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, সাহায্যদান ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হইবে না।

শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ অদ্য শিলং গভর্নমেণ্ট হাউসের দরবার হলে আসামের গবর্ণররূপে শপথ গ্রহণ করেন।

গত সোমবার দুর্নীতি দমন বিভাগ ২৪ পরগণা জেলার পাণিহাটির বঙ্গোদয় কটন মিলস লিমিটেডের সীমানার মধ্যে খানাতল্লাস চালাইয়া প্রায় ৪০ হাজার বস্তা সিমেণ্ট ও একশত টন লোহ ও ইস্পাত দ্রব্য ও অন্যূন ১ হাজার মণ মিহি চাউল হস্তগত করিয়াছে। মিলের ডিরেক্টর জে দুতিয়া ও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, বৃহত্তর রাজস্থান প্রদেশ আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে গঠিত হইবে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—পাটনায় নিঃ ভাঃ রেল-ওয়েমেন্‌স ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিলের অধিবেশনে রেলকর্মীদের ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। কাউন্সিল ১২৩—১০ ভোটে ধর্মঘট ব্যালটের ফল অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন স্থগিত রাখার এবং যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার উদ্দেশ্যে পরবর্তী আলোচনার ফলাফলের প্রতীক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাউন্সিল আপত্তিকর কার্যকলাপের জন্য কম্যুনিস্ট প্রভাবিত তিনটি ইউনিয়নকে ফেডারেশন হইতে বহিষ্কৃত করেন।

পাঁচ দিন আলোচনার পর অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে ব্যাঙ্কিং বিল গৃহীত হইয়াছে। অর্থ-সচিব বলেন যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উন্নতিতে এই বিল প্রভূত সাহায্য করিবে।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরকালে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন যে, উপনিবেশ স্থাপন সংক্রান্ত ও উন্নয়ন-মূলক কোন পরিকল্পনা বিবেচনা করিবার পূর্বে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তাহা পরীক্ষা করাইয়া লওয়া প্রয়োজন বলিয়া গভর্নমেণ্ট মনে করেন।

ভারতের শিক্ষা সচিব মৌলানা আজাদ আজ ঘোষণা করেন যে, ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্কদের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য শিক্ষা বিভাগ একটি সর্বভারতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য মিঃ ইউসুফ হারুণ সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

গত বুধবার চলন্ত ট্রেনে মহিলাগণের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় দুইটি সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটি ক্ষেত্রে হাওড়া স্টেশনে মহিলা যাত্রীদের সাহায্যকারিণী এক মহিলা গাইডের হাতব্যাগ এবং অপর ক্ষেত্রে এক মহিলা যাত্রীর এট্যাচিকেস কাড়িয়া লওয়া হয়। হাওড়া স্টেশন হইতে ট্রেন ছাড়ার পর মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ও দিল্লী মেলে উপরোক্ত দুইটি ঘটনা ঘটে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে, বিশেষতঃ ৯ই মার্চের প্রস্তাবিত রেল ধর্মঘটে লিপ্ত সন্দেহে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের পুলিস বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়া প্রায় তিন শত কম্যুনিস্ট কর্মীকে নিরাপত্তা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। হায়দরাবাদ রাজ্যে শান্তিভঙ্গকারী কম্যুনিস্টদের গ্রেপ্তার করার জন্য ব্যাপক আয়োজন করা হইয়াছে। কলিকাতায় ৩০টি স্থানে তল্লাসী করিয়া পুলিশ ২০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৬০ জন।

ভারত সরকারের নির্দেশানুযায়ী শিরোমণি আকালী দলের সভাপতি মাস্টার তারা সিংহকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ১লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য লইয়া ভারতের আঞ্চলিক সেনা-বাহিনী গঠিত হইবে বলিয়া চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় অদ্য সকাল ৯টা ২০ মিনিটের সময় ৮নং থিয়েটার রোডস্থিত সরকারী বাসভবনে পরলোকগমন করেন। সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল তিনি বাঙ্গলার সমাজ-জীবনে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় আড়াই মাস রোগ ভোগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই ফেব্রুয়ারী—ব্রহ্মের সরকারী বাহিনী কারেন বিদ্রোহীদের সহিত ১৪ দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর রেঙ্গুণের ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ইনসিন ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে পুনরায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

জার্মান ভাষায় প্রকাশিত মার্কিন সরকারী সংবাদপত্র "দি নু জেতুং"-এ প্রকাশ, জার্মানীর রুশ এলাকায় ব্যাপকভাবে রুশ সৈন্য চলাচল আরম্ভ হইয়াছে এবং বাল্টিক উপকূল বরাবর সোভিয়েট বিমানবহর ও সাবমেরিন বহরের সম্মিলিত মহড়া চলিতেছে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—চীনের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সানফো অদ্য বলেন যে, তিনি পদত্যাগ করেন নাই। তবে সাংহাই ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস, শীঘ্রই তিনি পদত্যাগ করিবেন; কারণ ক্যাণ্টনে গভর্নমেণ্ট স্থানান্তরিত করা ব্যাপারে তিনি সমর্থন পান নাই।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—শ্যামের প্রধান মন্ত্রী পিবুল সংগ্রাম অদ্য ঘোষণা করেন যে, ক্রমবর্ধমান কম্যুনিস্ট উপদ্রব দমনের জন্য আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শ্যামে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইবে। তিনি আরও বলেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের অনুরোধ ক্রমে শ্যাম-মালয় সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিতে শ্যাম সম্মত হইয়াছে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য ডারবান দাঙ্গার তদন্ত আরম্ভ হইলে ডাঃ জি এস লোয়েন এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের উস্কানির ফলেই দক্ষিণ আফ্রিকায় দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত হয়।

ডাঃ লোয়েন বলেন যে, সাক্ষীদের জেরা করিবার সুযোগ পাওয়া গেলে দাঙ্গার মূল কারণ উদ্ঘাটিত হইবে; এই হেতু তিনি সাক্ষীদিগকে জেরা করিতে দিবার সুযোগ দিতে কমিশনকে অনুরোধ করেন। কমিশনের সভাপতি তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—ডারবানের সাম্প্রতিক দাঙ্গা হাঙ্গামা সম্পর্কে যে তদন্ত কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, অদ্য দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস সেই কমিশন বর্জন করিয়াছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—রেঙ্গুণের সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কারেন ও কম্যুনিস্ট বিদ্রোহীরা রেঙ্গুণ হইতে প্রায় ২৭৫ মাইল উত্তরে মান্দালয় রেলপথের পার্শ্বে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ শহর ইয়মেথিনে প্রবেশ করিয়াছে।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 19th February, 1949. [১৬শ সংখ্যা

গডসের প্রাণদণ্ড

গত ২৮শে মাঘ মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার মামলার যবনিকাপাত হইয়াছে। নয়জন আসামীর মধ্যে নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ দত্তাত্রেয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। পাঁচজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আজ্ঞা লাভ করিয়াছে। শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর বেকসুর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী মহামানব। জগতে এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব সব যুগে সব সময় ঘটে না; সুতরাং এ মামলা স্বভাবতঃই সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক্ষেত্রে আইন তাহার স্বাভাবিক পথে কাজ করিয়াছে। আইন ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। আসামীরা রাষ্ট্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদিগকে দণ্ডভোগ করিতে হইল, সব দেশেই হয়। কিন্তু এই সম্পর্কে এ কথাটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, উন্মার্গগামী নাথুরাম এবং তাহার অপরাপর সঙ্গীরাই শুধু অপরাধী নয়। তাহারা যে অপরাধ করিয়াছে, সে সঙ্গে আমরাও জড়িত রহিয়াছি। ইহারা আমাদেরই দেশবাসী এবং আমাদের সমাজেরই লোক। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় তো নাই। গান্ধীজীর ন্যায় মহামানবের হত্যার মত অপরাধ আমাদের মানসিক অসুস্থতা এবং নৈতিক দুর্গতিকেই আজ জগতের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছে। ভারতের মহান্ সংস্কৃতি এবং সভ্যতার আদর্শ বিশ্ব মানব-সমাজে অবনমিত হইয়াছে। বস্তুত ভারতের সমগ্র ইতিহাসে এত বড় দুষ্কৃত পূর্বে কোনদিন অনুষ্ঠিত হয় নাই। ফলতঃ মানবপ্রেমিক, সাধক এবং মহাপুরুষগণ এদেশে সার্বজনীন শ্রদ্ধা এবং সম্মানই লাভ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে ভারত জাতি, ধর্ম এবং বিশেষ মতবাদের অন্ধ বর্বরতায় কোনদিন বিভ্রান্ত হয় নাই। ভারতের সেই সনাতন

আদর্শের বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। সত্যই ইহা আশঙ্কার বিষয়, আমাদের পক্ষে এ পরম বেদনার কথা। গডসে এবং তাহার সঙ্গীরা মহাত্মাজীর উদার আদর্শকে ভুল বুঝিয়াছিল; কিন্তু আমরা যাঁহারা মহাত্মাজীর আদর্শকে ঠিক বুঝিয়াছি বলিয়া স্পর্ধা করি, আমরা যাঁহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এবং ভক্তি প্রদর্শনে অগ্রণীর আসন অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হই, তাঁহারাই কে কতটা গান্ধীজীর আদর্শকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে চলিতেছি? আজ এই প্রশ্নই মনের কোণে জাগিতেছে। গান্ধীজী লোকোত্তর পুরুষ। মৃত্যুর তিনি অতীত। আততায়ীর গুলী তাঁহার জড় দেহকেই আঘাত করিতে পারে; কিন্তু তাঁহার আদর্শ বিমলিন হয় না; বরং মৃত্যুর ভিতর দিয়া মহামানবের জীবন-সাধনার মহিমা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে; কিন্তু গান্ধীজীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা মুখে বলিয়া আমরা যাঁহারা নিজেদের জীবনে মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিতেছি, তাহাদের অপরাধের গুরুত্ব, বিবেকের মূল্য এবং মানবতার মর্যাদার দিক হইতে কোন অংশে সামান্য বলিতে পারি কি? আমাদের কাজে গান্ধীজীর জীবন-সাধনার একান্ত আদর্শই মলিন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু গান্ধীজীর জীবনকে তাঁহার আদর্শ হইতে ভিন্ন করিয়া দেখা চলে না। পক্ষান্তরে গান্ধীজীর নিজের কাছে তাঁহার জীবনের চেয়ে তাঁহার আদর্শের মূল্যই বেশী ছিল। আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি জীবন দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, জাতির জনকের প্রতি এই অকৃতজ্ঞতা, এই গুরুদ্রোহিতার অপরাধ হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইব না। আমাদের আত্ম-চৈতন্য বোধ যদি এখনও জাগ্রত না হয়, তবে বিশ্ববিধাতার রুদ্র ন্যায়ের দণ্ড আমাদের উপরও আসিয়া পড়িবে। জাতির প্রত্যেক নরনারীর এই সত্যটি অনুধাবন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ দিল্লীর বিড়লা ভবনের প্রাঙ্গণে আততায়ীর গুলী বাপুজীর মর্তদেহকেই আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। এই হিসাবে আমরা তাঁহাকে হারাই নাই, কিন্তু বাপুজীর জীবনের মহান্ আদর্শ যদি আমাদের আচরণে অজ পরিম্লান হয়, তবে সত্যই আমরা তাঁহাকে হারাইব এবং বিশ্বমানবসমাজকে আমরা তাঁহার মহদাদর্শ হইতে বঞ্চিত করিব। ভগবান এমন অপরাধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন; জাতিকে রক্ষা করুন।

পুলিশের কার্যের ত্রুটি

গান্ধী হত্যা মামলার বিচারপতি শ্রীআত্মারাম তাঁহার রায়ে একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সে কথা সকলকেই বেদনা দিবে। বিচারপতির মতে মদনলাল গ্রেপ্তার হইবার পর যে বিবৃতি দেয়, তাহাতে বোম্বাই এবং দিল্লীর পুলিশের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী এবং ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে তদন্ত কার্যে পুলিশ যদি একটু সজাগ হইত, তবে খুব সম্ভব এমন শোচনীয় ব্যাপার ঘটিতে পারিত না। পুলিশের কাজের এত বড় নিন্দা আর কিছু থাকিতে পারে না। বস্তুত ২০শে জানুয়ারী মদনলাল পাহওয়া গ্রেপ্তার হইবার পর যে বিবৃতি প্রদান করে, তাহার সূত্র ধরিয়া তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ যদি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত, তবে ষড়যন্ত্রকারীরা সকলে বোধ হয় আগেই ধরা পড়িয়া যাইত। বলা

বাহুল্য, গান্ধীজী নিজে পুলিশের রক্ষণাবেক্ষণ চাহিতেন না, এই ধরণের যুক্তিতে এ সম্পর্কে পুলিশের দায়িত্ব লঘু হয় না। বিচারপতি শ্রীআত্মারামের এই মন্তব্যের পর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পুলিশের কাজের সম্পর্কে অধিকতর সজাগ হইবে, ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু বাহিরের ঘটনাপরম্পরার এসব বিচার সত্ত্বেও এ সম্পর্কে একটা সত্যকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। বস্তুত মহাত্মাজীর জীবনের আদর্শকে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দান করিবার জন্য একটা মহতী শক্তি সাক্ষাৎ-সম্পর্কে কাজ করিয়াছিল। তাঁহার অমর মরণের পথে সেই শক্তিই জয়যুক্ত হইয়াছে। আমাদের মতে সে শক্তির গতি রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল না। পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেখানে চলে না। গান্ধীজী ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্রস্বরূপেই পরিচালিত হইয়াছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়া গান্ধীজীর জীবনের সাধনার অন্তর্নিহিত সত্যই অমোঘ বীর্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের মতো তাঁহাদের তিরোধান-লীলা এমনই অবিচিন্ত্য রহস্য এবং সংকটময় প্রতিবেশের প্রাণপূর্ণ ছটায় দীপ্তি লাভ করিয়া থাকে। গান্ধীজীর পক্ষেও সে সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

পূর্ব পাকিস্থানে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য

পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার বেতার কেন্দ্র হইতে তাঁহার ১৩ দিনব্যাপী পূর্ববঙ্গ শফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। খাজা সাহেব পূর্ববঙ্গের যেখানেই গিয়াছেন, সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য এবং সৌহার্দ্যের ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কেও তিনি এতৎসম্পর্কে দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের সফরকালীন বক্তৃতাগুলি আমরা মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করিয়াছি। আমরা জানি, তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং সৌহার্দ্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ যেমন মুসলমানদের, তেমনই হিন্দুদেরও মাতৃভূমি, পাকিস্থানী হিসাবে রাষ্ট্রে সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে, তাঁহার মুখে এ সব কথা শুনিয়া আমরা সত্যই আশ্বস্ত হইয়াছি। তিনি বাঙালী। একজন বাঙালী আজ পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল এজন্য আমরা গর্ব বোধ করি। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিস এমনই ব্যাপক এবং তীব্র যে, সংখ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে যদি একবার এই বিষ ব্যাপ্ত হয়, তবে ধর্মের মূলীভূত নৈতিক উদার আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ বিশেষ কোন কাজে আসে না; পক্ষান্তরে রাষ্ট্রনেতাদের মুখে বিশেষ ধর্মের উদারতার অজস্র উপদেশ, জনগণের মনে সাম্প্রদায়িক গোড়ামীকেই কার্যত দৃঢ় করিয়া তোলে। সাধারণ লোকে ধর্মের সার ছাড়িয়া খোসা লইয়া টানাটানি করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাষ্ট্রনীতিকে ধর্মের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলাতে পূর্ববঙ্গে এমনই একটা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। পাকিস্থান ইসলাম রাষ্ট্র এই মতবাদ লইয়া বাড়াবাড়ি করিবার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাধারণের মনের মূলে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিরই পাক পড়িয়া চলিয়াছে। খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব, যখন উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য কামনা করিয়াছেন, তখন অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানীতে রাষ্ট্রকে ষোল আনা ইসলামী করিবার জিগীর আমরা শুনিয়াছি। পূর্ব পাকিস্থান জমিয়ত-উল-উলেমা সম্মেলনে সমবেত হইয়া মোল্লা-মৌলবীরা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে মোল্লা করিয়া তুলিবার শুভেচ্ছা প্রচার করিয়াছেন। ইহার কিছুদিন আগে পাকিস্থানের শিক্ষাসচিব মিঃ ফজলুর রহমান ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে পেশোয়ারে অভিভাষণ প্রদান করেন। পাকিস্থানের সর্বত্র আরবী হরফ চালাইবার পক্ষে তিনি যুক্তি দেখান। বিশেষ ধর্মের প্রতি রাষ্ট্র পরিচালকেরা এইভাবে ক্রমাগত জোর দেওয়াতে পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে একটা নৈরাশ্য এবং অবসাদের ভাব দৃঢ় হইয়া উঠিবে ইহা স্বাভাবিক। ফলতঃ পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে যদি আরবী হরফে বাঙলা আয়ত্ত করিতে হয়, তবে তাহাদের পক্ষে কতটা উৎকট অবস্থার সৃষ্টি হইবে, বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। এইভাবে সেখানকার হিন্দুদের মনে নিজেদের সংস্কৃতি এবং অধিকারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারকম সংশয়ের সৃষ্টি হইতেছে। সাম্য, সৌভ্রাত্র্য এবং সুবিচারই ইসলাম ধর্মের মূল নীতি; সুতরাং পাকিস্থান যদি ঐসলামিক আদর্শে শরিয়ত অনুসারে শাসিত হয়, তাহাতে হিন্দুদের আশঙ্কার কোন কারণ নাই, এ সব কথা অবশ্য শুনানো হইতেছে। কিন্তু বিশেষ ধর্মকে ভিত্তি করিয়া আধুনিক রাষ্ট্রে সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন নজীর পাওয়া যায় না। ইসলামের ইতিহাসও এই সাক্ষ্যই দেয় যে, স্বয়ং হজরত মহম্মদ এবং সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাঁহার চরিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত চারজন খলিফার শাসনেই সাম্য এবং মৈত্রীর আদর্শ কতকটা রক্ষিত হয় বটে; কিন্তু সেক্ষেত্রেও অন্য ধর্মাবলম্বীরা রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে কোন অধিকার লাভ করে নাই, অনুগত প্রজা হিসাবে তাহাদিগকে চলিতে হইয়াছে। খোলেফায়ে রাশেদীনের শাসন-নীতির সেই যে উদার আদর্শ, কিছুদিন পরেই তাহাও লুপ্ত হইয়া যায়। দেখিলাম, পাকিস্থানের শিক্ষাসচিব তাঁহার পেশোয়ারের অভিভাষণে এই ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কথা হইতেছে এই যে, তখন যাহা সম্ভব হয় নাই, এখন তাহা হইবে কি? বলা বাহুল্য, বর্তমানে জগতের সর্বত্র নৈতিকবোধ বিপর্যস্ত হইয়াছে। সাধক-জীবনে অনুভূত সার্বজনীন সত্য রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনে এখন জীবন্তভাবে কাজ করিতে পারে না। এই অবস্থায় ধর্মের কথা রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তুলিতে গেলে নানা রকমের সমস্যারই সৃষ্টি হয়। লোকে এক বলিতে অন্য রকম বোঝে। ধর্মের নীতিকে স্বার্থ এবং সংকীর্ণতার পথেই খাটাইতে চেষ্টা করে। তাহারা ত্যাগ এবং সেবাকে বড় বলিয়া না বুঝিয়া সংকীর্ণ স্বার্থগত বৈষম্যের পথই কার্যত অবলম্বন করে। এ অবস্থায় বিশেষ ধর্মের কথা বারংবার উত্থাপন না করিয়া মানবসংস্কৃতি এবং সমাজ-জীবনের সার্বজনীন সংস্কৃতির উদার আদর্শ লইয়া রাষ্ট্রনীতিকে পরিচালিত করাই প্রকৃষ্ট পথ। বস্তুত ধর্মের মৌলিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবারও তাহাই একমাত্র পথ। পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিকদের এই নীতিই গ্রহণ করা উচিত। আমরা জানি, বর্তমানে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, তাহা সাময়িক। ইহা স্থায়ী হইবে না। বাঙলার সংস্কৃতি এখনও জীবন্ত আছে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ত্যাগ, আত্মদান এবং তপস্যার পথে সেখানে যে সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবচ্ছেদ এবং ব্যবধানের বিচার ভুলিয়া উভয় বঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য নিশ্চয়ই সত্য হইয়া উঠিবে।

পশ্চিমবঙ্গের দাবী

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বাঙলার বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদকে সর্বদা শত্রুর দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। বাঙলা দেশকে দুর্বল করিবার জন্য তাহারা নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের এই নীতির ফলে বাঙলার কতকগুলি অঞ্চল বিহার এবং আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাঙালী এই অবিচারের বিরুদ্ধে বহুদিন সংগ্রাম চালাইয়াছে, কিন্তু ইংরেজ থাকিতে ইহার প্রতীকার হয় নাই, হইতেও পারে না। কারণ তখন বাঙলাকে শক্তিশালী করিলে তাহাদের নিজেদেরই যে বিপদ ঘটে। কংগ্রেস বাঙলার এই দাবী সমর্থন করিয়াছে; গান্ধীজী স্বয়ং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সেই দাবীর যৌক্তিকতা দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীন ভারতে বাঙলার এই সঙ্গত দাবী রক্ষিত হইবে কি? পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি স্মারক-লিপিতে ভারত

গবর্ণমেণ্টের নিকট এই দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা অকাট্য যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শুধু ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতার দিক হইতেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সুসংস্থিত করিবার জন্যও বাঙলার সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে অবিচার চলিয়া আসিতেছে, অবিলম্বে তাহার প্রতীকার হওয়া প্রয়োজন। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের কথা অনেকদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, পশ্চিমবঙ্গের এই দাবীকে যাঁহারা দোষ-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাঁহারা প্রাদেশিকতার অন্ধ সংস্কারের দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের দাবী মানিয়া লইলে ভারতীয় রাষ্ট্রের সংহতি ক্ষুণ্ণ হইবে, প্রাদেশিকতা বাড়িবে, এ সব যুক্তি আমাদের মতে নিতান্তই অনর্থক, অযৌক্তিক; অধিকন্তু সত্যকে চাপা দিবার অপকৌশল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ক্ষুদ্রতম প্রদেশে পরিণত হইয়াছে, অথচ পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি বিধানের প্রয়োজন এখানে গুরুতর। ইহা ছাড়া, র‍্যাড-ক্লিফ সিদ্ধান্ত মতে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পতিত, উত্তরের কতকটা অঞ্চল দক্ষিণ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন। শাসনকার্য সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে এই উভয় অংশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা নিতান্তই প্রয়োজন; কিন্তু বিহার কতকটা অঞ্চল যদি পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়িয়া দেয়, তবেই ইহা সম্ভব। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, পশ্চিমবঙ্গ আজ বিহারের নিকট যে দাবী করিতেছেন তাহা কোন দিক হইতেই অসঙ্গত নয়। এই সব অঞ্চল প্রধানতঃ বাঙলা ভাষাভাষী; অধিকন্তু ঐ অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়িয়া দিলে বিহারের আর্থিক দিক হইতে বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠনের প্রশ্ন সম্বন্ধে এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সীতারামিয়া এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত শঙ্কররাও দেও কংগ্রেস গৃহীত পূর্ব সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছেন; কিন্তু সে প্রশ্ন হয়ত অধিকতর ব্যাপক। পশ্চিমবঙ্গের দাবীর যৌক্তিকতা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের দিক হইতেই রহিয়াছে, ভারতের স্বার্থের জন্যই এই প্রশ্নের সমাধান হওয়া প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পথে এই প্রশ্নের সমাধান বিলম্বিত হইলে জটিলতাই শুধু বৃদ্ধি পাইবে। ভারত রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে এই সম্বন্ধে বিচার এবং বিবেচনা করিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইবেন, আমরা এখনও এই আশা করিতেছি।

কংগ্রেসের আদর্শ উপেক্ষিত

মানভূম জেলা পুরাপুরি বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চল। এই জেলার শতকরা ৯৫ জনের অধিক লোক বাঙলা ভাষায় কথা বলে। কিন্তু বিহার গভর্নমেণ্ট এই অবস্থা চলিতে দিবেন না। তাঁহারা বাঙালীদিগকে হিন্দী-ভাষাভাষী করিবেন, তবে ছাড়িবেন; এই সঙ্কল্প লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাঙালীর ছেলে-মেয়েদিগকেও মাতৃভাষা বাঙলার পরিবর্তে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যমস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, কর্তৃপক্ষের এই সঙ্কল্প। বিহার গভর্ন-মেণ্টের এমন অন্যায় জবরদস্তির প্রতিবাদে পুরুলিয়ায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এমন আন্দোলনের পক্ষে সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। বালক-বালিকাদিগকে তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কংগ্রেসের ইহাই নির্দেশ। ভারতীয় গণপরিষদেও এই নীতি গৃহীত হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল সেদিনও এই নির্দেশের যুক্তিযুক্ততার প্রতি জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর একটি প্রবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে পণ্ডিতজী লিখিয়াছেন, "বোম্বাই, কলিকাতা অথবা দিল্লী যেখানেই হোক না কেন, যদি বিদ্যালয়ে তামিল-ভাষাভাষী ছাত্রের সংখ্যা যথেষ্ট থাকে, তবে তাহাদিগকে তামিল ভাষাতেই শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। এইরূপ যদি ভারতের অন্য অংশে উর্দু যহাদের মাতৃভাষা, তেমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশী থাকে, তাহাদিগকে উর্দু অক্ষরের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। বর্তমানে এই বিষয় লইয়া অনেক সমস্যা দেখা দিয়াছে, দুইটি প্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল-গুলিতে এই সমস্যা সমধিক। অন্যান্য স্থানের চেয়ে এই অঞ্চলগুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া বিশেষভাবে উচিত।" বলা বাহুল্য, বিহার গভর্নমেণ্ট বহু দিন হইতেই পণ্ডিত জওহরলালের ব্যাখ্যাত কংগ্রেসের দ্বারা গৃহীত এই নীতিকে প্রত্যক্ষ-ভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাঙলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলি যে প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ভাষা-ভাষী নয়, জবরদস্তির পথে ইহাই প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাই তাঁহাদের অবলম্বিত এই নীতির মূলে কাজ করিতেছে। আসামও এ বিষয়ে বিহারের কোন অংশে পিছনে নাই। আসামের বিদ্যালয়গুলিতে বাঙলা ভাষাভাষী বালক-বালিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রেও অসমীয়াকে মাধ্যম করিবার অসঙ্গত উদ্যম পুরাদস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। তেজপুরের কথা এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের আদর্শের দোহাই দিয়া যাঁহারা সে আদর্শের এমন করিয়া ব্যত্যয় ঘটাইতেছেন, ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যাঁহারা সে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি এবং সংহতির পথে এইভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে-ছেন, তাঁহাদের মনে সুবুদ্ধি বিধানের জন্য ভারত সরকারের অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে কালবিলম্ব করিবার অবসর আর নাই। সাম্প্রদায়িকতার বিষ হইতে দীর্ঘ দিন পরে জাতি অনেকটা মুক্তিলাভ করিয়াছে, প্রাদেশিকতার বিষকেও উৎখাত করা এখন দরকার।

নীতি ও জীবন—

আমাদের নৈতিক আদর্শ জীবনের ধারার সঙ্গে যুক্ত হইতেছে না। আমরা অনেকেই মুখে বড় বড় কথা বলি; কিন্তু কাজের বেলায় ব্যক্তি-গত স্বার্থপুষ্টির পথেই আমাদের মন ও বুদ্ধি প্রযুক্ত হয়। লক্ষ্ণৌতে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশনের উদ্যোগ উপলক্ষে পণ্ডিত জওহর-লাল নেহেরু জাতির দৃষ্টি সম্প্রতি এইদিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর মতে সামাজিক রীতি-নীতির নিরন্তর পরিবর্তন ঘটিতেছে। আমাদের নৈতিক আদর্শকে ইহার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া আমাদের চলিতে হইবে। মৌলিক সভ্যতা এবং সংস্কৃতির নৈতিক ভিত্তি সনাতন। ঘটনার গতির সঙ্গে সে ভিত্তি বিপর্যস্ত হইলে সমাজজীবন ভাঙ্গিয়া পড়ে। পণ্ডিতজীর এই উক্তির গুরুত্ব বর্তমানে খুব বেশী। বস্তুত আমাদের জীবনের মূলে নৈতিক সত্যকে অবলম্বন করিয়া না চলিলে মনুষ্যত্বের কোন দাবী আমাদের মিটিবে না। দেখিতেছি, অশ্রদ্ধা এবং অসংযম এদেশের সমাজ জীবনকে বিধ্বস্ত করিতে বসিয়াছে। কথায় কথায় ট্রামে বাসে আগুন লাগানো, সভা সমিতিতে বোমা পটকা ছুঁড়িয়া বীরত্বের বাহাদুরী। মানুষের জীবনের যেন কোন মূল্যই নাই। ধর্ম না হয় সঙ্কীর্ণতা বলিয়া গণ্য হইতে বসিয়াছে। ধর্মের কথা না হয় কুসংস্কার; কিন্তু গুণ্ডামী যদি প্রাণবলের পরিচায়ক হয়, দেশের লোকের শান্তি, সোয়াস্তি এবং নিরাপত্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন দৌরাত্ম্য যদি বৈপ্লবিক প্রেরণা বা প্রগতির মর্যাদা লাভ করে, তবে আরণ্য জীবনের হিংস্রতার আঘাত চারিদিক হইতে আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ অত্যাচার এবং নির্যাতন-নিপীড়নের পথে জাতির যে অনিষ্ট করিতে পারে নাই, আত্মঘাতী তেমন অনাচারে জাতির অদৃষ্টে তাহাই ঘটিবে। আমাদের স্বাধীনতার শত্রুদের প্ররোচনায় পড়িয়া যাহারা এসব কাজ করিতেছে, তাহাদের সংস্রব সর্বাংশে পরিত্যাজ্য।

কারেণ বিদ্রোহ

ইতিপূর্বে কারেণ বিদ্রোহ সম্বন্ধে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন এই বিদ্রোহ যে এতটা ব্যাপক ও গুরুতর আকার ধারণ করবে তা বোঝা যায়নি। এখন দেখা যাচ্ছে যে, এ বিদ্রোহ ব্রহ্মের জাতীয় জীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে যাবে। ব্রহ্ম আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলেও সেখানে কি ঘটছে না ঘটছে তা স্পষ্টভাবে পুরোপুরি বোঝার উপায় নেই। উত্তর ও মধ্য ব্রহ্মের যে অঞ্চলে বিদ্রোহ চলেছে সে অঞ্চল থেকে সব খবর ভালভাবে পাবার উপায় নেই। দীর্ঘ এক বৎসরকাল স্থায়ী কম্যুনিস্ট ও পি ভি ও বিদ্রোহ উপলক্ষে থাকিন নু-র ব্রহ্ম গভর্নমেণ্ট বাইরে প্রেরিত সংবাদ সম্বন্ধে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে কম্যুনিস্ট ও পি ভি ও বিদ্রোহ কিছু পরিমাণে প্রশমিত হওয়ায় এই সব বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কারেণ বিদ্রোহের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সম্বন্ধে সরকারী বিধিনিষেধ পুনরায় আরোপিত না হলেও বে-সরকারীভাবে বাইরে সংবাদ পাঠানো সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কঠোরতা বেড়েছে।

বর্তমানে কারেণ বিদ্রোহের স্বরূপ দেখে বোঝা যায় যে, থাকিন নু-র গভর্নমেণ্ট বিদ্রোহের অগ্রগতি বন্ধ করতে পেরেছেন। কিন্তু যে বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তাকে পুরোপুরি বিদ্রোহীদের কবলমুক্ত করে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গভর্নমেণ্টের দীর্ঘদিন সময় লাগবে বলে মনে হয়। কারেণ উপজাতি ব্রহ্মের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্থান দখল করে আছে। কারেণদের মনে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সৃষ্টির মূলে ছিল ব্রহ্মে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ভেদনীতি। বৃটিশ আমলে ভারতের জাতীয় জীবনে এই ভেদনীতিকে আমরা হিন্দু মুসলিম সমস্যারূপে দেখেছি। ব্রহ্মে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সৃষ্টির অবকাশ ছিল না বলেই সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি সেখানে অন্যভাবে ভেদপন্থার আশ্রয় নিয়েছিল। সে হল খাস ব্রহ্মবাসী ও ব্রহ্ম উপজাতিদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির প্রয়াস। কারেণ বিদ্রোহ এই বৃটিশ ভেদনীতির সুস্পষ্ট ফল। কিন্তু কারেণ বিদ্রোহের এই আকস্মিক বহিঃপ্রকাশে ব্রহ্মের জাতীয় নেতারা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। কারেণদের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ থাকলেও তা যে এভাবে ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়বে এ ছিল জাতীয় নেতাদেরও কল্পনাতীত। এই বিদ্রোহের পিছনে সরকারীভাবে বৃটিশ কারসাজি না থাকলেও বে-সরকারীভাবে বৃটিশ কারসাজি কিছু পরিমাণে আছে এরূপ একটা ধারণা ব্রহ্মের জনমানসে .২। কিছুকাল পূর্বে ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টের অনুরোধে ভারত গভর্নমেণ্ট কলিকাতা থেকে একজন বৃটিশ অফিসারকে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করাতে বাধ্য হয়েছিলেন। এঁর বিরুদ্ধে ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টের অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি গোপনে কারেণদের বিদ্রোহাত্মক প্রচেষ্টায় ইন্ধন জোগাচ্ছেন। ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টের এ অভিযোগ আজও একেবারে মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। বৃটিশ শ্রমিক গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে ব্রহ্ম জাতীয় গভর্নমেণ্ট সর্বপ্রকার সাহায্য পাচ্ছেন—একথা থাকিন নু স্বয়ং স্বীকার করলেও ব্রহ্মের জাতীয় জীবন থেকে চার্চিলীয় ষড়যন্ত্র সমূলে উৎপাটিত হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। প্রকাশ যে, কারেণ, বিদ্রোহীদের সঙ্গে কিছুসংখ্যক বিদেশীও ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। এই বিদেশীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইংরেজ থাকা খুবই স্বাভাবিক। স্বাধীন ব্রহ্ম রিপাব্লিকরূপে একেবারে বৃটিশ কমনওয়েলথের বাইরে চলে এসেছে—এ জিনিসটি চার্চিলপন্থী রক্ষণশীল ইংরেজদের পক্ষে হজম করা শক্ত। পার্লামেণ্টের বৃটিশ শ্রমিক সদস্য মিঃ উড্রো ওয়াট বর্তমানে রেঙ্গুনে আছেন। বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং কারেণদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন যে, বৃটিশদের দিক থেকে তাদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় তারা কোনপ্রকার সাহায্য পাবে এ প্রত্যাশা যদি তারা করে থাকে, তবে তারা ভুল করেছে। ব্রহ্মস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূতও বলেছেন যে, কারেণ বিদ্রোহের পিছনে বৃটিশদের কোন সমর্থন নেই। এঁদের উক্তিকে অসত্য বলে ধরে নেবার কোন হেতু নেই। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমগ্র ইংরেজজাতি বৃটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের সমর্থক নয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কোন কোন ইংরেজ যদি কারেণ বিদ্রোহে ইন্ধন জোগানোর চেষ্টা করে থাকে, তবে তাকে অস্বীকার করার উপায় কোথায়?

কারেণ বিদ্রোহীরা কি চায় সে কথাও স্পষ্ট করে বোঝার উপায় নেই। কিছুদিন পূর্বে বিদ্রোহীদের কয়েকটি দাবী প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্রোহীদের অন্যতম দাবী হল স্বতন্ত্র কারেণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। স্বতন্ত্র কারেণ রাষ্ট্র বলতে সম্পূর্ণ স্বাধীন কারেণ রাষ্ট্র বোঝায় কিনা জানি না। এ দাবীতে যদি বৃহত্তর ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত কারেণ রাষ্ট্র বোঝায়, তবে থাকিন নু তাদের সে দাবী মেনে নিয়েছেন। কয়েকদিন পূর্বেই তিনি ঘোষণা করেছেন যে, কারেণদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে—তবে ব্রহ্ম ইউনিয়নের বাইরে চলে যাবার কোন অধিকার থাকবে না সে রাষ্ট্রের। কিন্তু থাকিন নু-র এ প্রস্তাবে কারেণ সমাজ যে সন্তুষ্ট হয়নি তার বড় প্রমাণ হল এই ঘোষণার পরেও বিদ্রোহের তীব্রতা বৃদ্ধি ও প্রসার। বিদ্রোহীদের আর একটি দাবী ছিল কম্যুনিস্ট ও বিদ্রোহী পি ভি ওদের সঙ্গে জাতীয় গভর্নমেণ্টকে আপোষ করতে হবে। কিন্তু কি সর্তে আপোষ করা হবে তার কোন উল্লেখ নেই। ইতিপূর্বে আপোষের জন্যে থাকিন নু গভর্নমেণ্টকে আমরা অনেক প্রয়াস করে ব্যর্থ হতে দেখেছি।

কারেণ বিদ্রোহ দমনে থাকিন নু গভর্নমেণ্ট শেষ পর্যন্ত সকল শক্তি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু তাঁদের এই সর্বাত্মক বিদ্রোহ দমন প্রচেষ্টা যদি বিলম্বিত না হত তবে কারেণ বিদ্রোহ এতটা ভয়াবহ হয়ে ওঠার সুযোগ পেত না বলেই আমরা মনে করি। রেঙ্গুনের ১১ মাইল দূরবর্তী ইন্‌সিন্‌ পুরোপুরি বিদ্রোহীদের কবলে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকিন নু গভর্নমেণ্ট এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারেণ বিদ্রোহ আরম্ভ হবার কয়েকদিন পরে পর্যন্ত যিনি ব্রহ্মী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন সেই জেনারেল স্মিথ্‌ ডান নিজে একজন কারেণ। কারেণ সৈন্যরা ব্রহ্মের সেনাবাহিনীর একটা বড় শক্তিস্তম্ভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইদানীং অবশ্য ব্রহ্মী বাহিনীর সকল কারেণ সৈন্যকে নিরস্ত্র করার নীতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তার আগেই অনেক কারেণ সৈন্য অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে যোগ দিয়েছে স্বজাতি বিদ্রোহীদের দলে। ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। এই সঙ্গে আবার কম্যুনিস্ট ও পি ভি ও বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দেওয়ায় বিদ্রোহের অবস্থা জটিল হয়ে উঠেছে।

নানাদিক থেকে ব্রহ্মের জাতীয় রাষ্ট্র আজ যে গভীর বিপদের সম্মুখীন সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। জাতীয় জীবনের ক্রমিক বিশৃঙ্খলার ফলে ব্রহ্মে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্ম গভর্নমেণ্ট দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন, এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে তাঁরা সে নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। ব্রহ্মের আগামী বৎসরের বাজেটে ১০ কোটি টাকা ঘাটতি হবে বলে প্রকাশ। ব্রহ্ম গভর্নমেণ্ট শেষপর্যন্ত কারেণ বিদ্রোহ দমন করতে পারবেন এ বিষয়ে আমাদের মনে কোন সংশয় নেই। কিন্তু ব্রহ্মের জাতীয় জীবন থেকে এই মারাত্মক ক্ষতের চিহ্ন বিলুপ্ত হতে অনেক সময় লাগবে।

নরওয়ের বিপদ

সোভিয়েট রাশিয়া বনাম ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের বিরোধ যত বেড়ে চলেছে ততই পৃথিবীর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির বিপদও চলেছে বেড়ে। এই পরস্পর-বিরোধী কূটনীতির চাপে পড়ে ইউরোপ ইতিমধ্যেই দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলস্থিত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ছোট ছোট দেশকয়টি এতদিন এই টানা পোড়েনের বাইরে ছিল। এইবার স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র নরওয়েকে নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু হয়েছে। প্রকাশ যে, নরওয়ে ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের অতলান্তিক চুক্তিতে সই করে পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে আগ্রহান্বিত হওয়ার ফলেই এই পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে। নরওয়ের, মানসিক আগ্রহের সংবাদ পেয়ে সোভিয়েট রাশিয়া আর চুপ করে থাকতে পারেনি। সেও সঙ্গে সঙ্গে চাপ দেওয়া আরম্ভ করেছে নরওয়ের উপর। নরওয়ে অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী জাতিপুঞ্জের সঙ্গে যোগ দিক--এটা কোনক্রমেই জেনারেলিসিমো স্টালিনের মনঃপূত হতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সুমেরু অঞ্চলে নরওয়ে ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে প্রায় ৭০ মাইলব্যাপী সাধারণ সীমান্তের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ভাবী কোন বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে নরওয়ের গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ছোট ছোট দেশ এতকাল ইউরোপের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ নীতি নিয়েই চলে এসেছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে নীতি হিসাবে নিরপেক্ষতাও যে কত বিপদ্জনক তার তিক্ত আস্বাদ নরওয়ে পেয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। জার্মানীর সেনাবাহিনীর দখলে কয়েক বছর থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতা সে ভোলেনি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামান্য সম্ভাবনা চোখের উপর দেখে আজ যদি সে পূর্ব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর হয় তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। অতলান্তিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেবার আগ্রহ যদি নরওয়ের হয়ে থাকে, তবে তার মূল কারণ হল এই।

নরওয়ের এই অবস্থা দেখে সোভিয়েট রাশিয়ারও ভয় পাবার কারণ আছে। অতলান্তিক চুক্তির পিছনে কোন যুদ্ধমূলক উদ্দেশ্য নেই--একথা যতই ঘটা করে প্রচার করা হোক না কেন, এ যে ভাবী যুদ্ধের প্রস্তুতি মাত্র একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যদি নতুন কোন যুদ্ধ হয়, তবে সে যুদ্ধে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবে ইঙ্গ-মার্কিন ও সোভিয়েট পক্ষ। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের কূটনীতি সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার যেমন সন্দেহ সংশয়ের অন্ত নেই, তেমনই সোভিয়েট কূটনীতি সম্বন্ধেও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের রাষ্ট্রনেতাদের মনে সমান সংশয় সন্দেহ বর্তমান। আর এই স্বার্থ সংঘাতের ফলে নরওয়ে আজ পড়েছে বেটানায়। নরওয়ে যে পক্ষে যোগ দেবে, সে পক্ষ আগামী যুদ্ধে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে বেশ কিছুটা বেশী সুযোগ সুবিধা পাবে। বিরুদ্ধ পক্ষে নরওয়ে যাতে যোগ না দেয় সে জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া ইতিমধ্যে তার উপরে চাপ দিয়েছে। কিন্তু সে চাপে কাজ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। নরওয়ের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ল্যাঙ্গে ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন এবং সেখানে অতলান্তিক চুক্তির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পাল্টা চাল চেলেছেন স্টালিন। তিনি নরওয়েকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের জন্যে আহ্বান করেছেন। কিন্তু এ আহ্বানে নরওয়ের জাতীয় জীবনে ততটা সাড়া জাগেনি, বলে শোনা যায়। যুদ্ধের সময় এ জাতীয় অনাক্রমণ চুক্তি যে কত অর্থহীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েট রাশিয়ার ফিনল্যান্ড আক্রমণ ও নাৎসী জার্মানীর সোভিয়েট রাশিয়ার আক্রমণ থেকে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। উভয় ক্ষেত্রেই সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যান্ড ও জার্মানীর অনাক্রমণ চুক্তি ছিল। সতরাং নরওয়ে এ বিষয়ে খুব উৎসাহী হবে বলে মনে হয় না। যাক, দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের চাপে পড়ে নরওয়ে শেষপর্যন্ত কোন পক্ষ নেয়, তা জানার জন্যে বিশ্ববাসীরা উদ্বিগ্ন থাকবে।

ইরাণের শাহ আক্রান্ত

তেহরাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চদশবার্ষিকী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সময় ইরাণের শাহ মহম্মদ রেজা পহলবী গোপন আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। আততায়ীর নিকট থেকে শাহের উপর গুলী ছুঁড়লেও তিনি সৌভাগ্যক্রমে সামান্য আহত হয়ে বেঁচে গেছেন এবং তাঁর আক্রমণকারী নিহত হয়েছে। মাত্র মাস দুয়েক পূর্বে মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরাশি পাশা আততায়ীর হাতে যেভাবে নিহত হয়েছেন--ইরাণের এ ঘটনাও তদনুরূপ এবং এদুটি ঘটনার কারণও অনুরূপ। মধ্য-প্রাচ্যে দৃঢ়মূল বিদেশী স্বার্থের বিরুদ্ধে জনমানসে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জেগেছে এ দুটি ঘটনা তার প্রত্যক্ষ ফল—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আক্রমণকারী ইরাণের চরম বামপন্থী তুদে পার্টির সমর্থক—এই সন্দেহে তুদে পার্টিকে সঙ্গে সঙ্গে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, সরকারী নীতির সমালোচক বহু পত্র-পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে এবং তেহরাণে সামরিক আইন জারী করা হয়েছে। এই ঘটনার গুরুত্ব যে কম নয়—সরকারী কার্যক্রম থেকে সেটা সহজেই বোঝা যায়।

শুধু মিসর বা ইরাণ নয়—সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে জনমানসে আজ বিক্ষোভ ও অসন্তোষ। এই বিক্ষোভ ও অসন্তোষের কিছুটা অংশ হয়তো রাজনৈতিক। কিন্তু এর বেশীর ভাগই হল অর্থনৈতিক। জনগণের আর্থিক দুঃখ দুর্দশা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে—কিন্তু যে বিদেশী অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা এর জন্যে দায়ী দেশীয় শাসকরা তার অবসান ঘটানোর জন্যে কোন চেষ্টাই করছেন না, বরং তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতায় বিদেশীদের অর্থনৈতিক শোষণের চক্রান্ত দিন দিন বেড়েই চলেছে। উদাহরণস্বরূপ ইরাণের কথাই ধরা যাক। ভৌগোলিক দিক থেকে ইরাণের সামরিক গুরুত্ব তো আছেই--তা ছাড়া তার তৈল সম্পদও পাশ্চাত্যের শক্তিপুঞ্জের পক্ষে পরম আকর্ষণের বস্তু। ইঙ্গ-মার্কিন তৈল স্বার্থ ইরাণের বুকে গভীর শিকড় গেড়ে বসেছে। এ বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার আগ্রহও যে কম নয়—আজেরবাইজানের বিপ্লব থেকে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছিলাম। ইরাণের শাহ যেদিন আক্রান্ত হয়েছিলেন তার আগের দিন তেহরাণে বিরাট ছাত্রবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। বিক্ষোভকারীদের দাবী ছিল ইরাণের বুক থেকে বিদেশী অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। এই বিক্ষোভ ও শাহের উপর আক্রমণের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই এমন কথা বলা চলে না। সামরিক আইন জারী করে, পত্রপত্রিকার কণ্ঠ রুদ্ধ করে কিংবা রাজনৈতিক দল বিশেষকে বেআইনী ঘোষণা করে ইরাণের জাতীয় জীবনের দুর্দৈবের অবসান ঘটানো যাবে না। ইরাণের জাতীয় নেতাদের যদি রাজনৈতিক শুভ বুদ্ধি থাকে, তবে শাহের উপর এই আক্রমণ থেকে তাঁরা জ্ঞান সঞ্চয় করতে ভুলবেন না এবং ইরাণের জাতীয় জীবন থেকে বিদেশী বণিক স্বার্থের অবসান ঘটিয়ে তাঁরা সর্বপ্রযত্নে জাতীয় জীবনের দুঃখ দুর্দশা ঘোচানোর চেষ্টা করবেন। ইরাণের জাতীয় জীবনে দৃঢ়ভিত্তিতে শান্তি স্থাপনের এই হল একমাত্র পথ।

১৩-২-৪৯

পূর্ব পাকিস্থানের এক সভায় জনাব তমিজুদ্দীন খাঁ বলিয়াছেন—
"There is no quick road to progress."
"শ্রোতারা নিশ্চয় বলেছে, পরোয়া নেই, quick
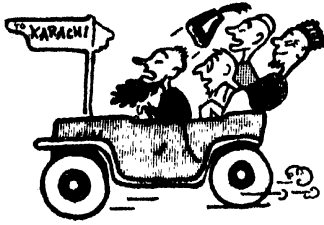
road to Karachi হলেই আমরা খুশী"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খাজা নাজিমউদ্দীনকে Doctor of Law উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের তুলনায় এই উপাধিটির প্রাচুর্য পাকিস্থানে বেশী নাই। তবে কোন গভর্নমেণ্টই এই ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন নাই বলিয়া আশা করা যায়, পাকিস্থান অচিরেই হিন্দুস্থানের সংগে Parity রক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারিবে।

* * * *

EVERY body who is engaged in producing coal is doing work of first rate national importance—
বলিয়াছেন বাঙলার প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু। খুড়ো বলিলেন—"অনেকে কিন্তু প্রদেশ পালনকেই first rate work বলে মনে করেন, হয়ত বা মনে মনে কামনাও করেন।"

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ বৃষ্টির জন্য মাদ্রাজে নাকি একটি সম্মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "Dry Madras বুলি তবে সত্যি সত্যি সবার সহ্য হচ্ছে না" মন্তব্য করিতে করিতে জনৈক সহযাত্রী ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন।

* * * *

মাদ্রাজের অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানকার প্রধান মন্ত্রী নাকি সারের জন্য গোবর বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়াছেন। "মাথা খুঁজলে এ দ্রব্যটির অভাব না হওয়ারই কথা"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

শুনিলাম দুর্নীতির অভিযোগে কমিউনিস্ট পার্টির অনেক হোমরাচোমরা সভ্যকে নাকি দল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—"কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে না তো"—বলিল আমাদের শ্যামলাল।

* * * *

International Bank কি কি সর্তে টাকা ধার দিতে প্রস্তুত সে কথা প্রকাশ করিতে ডাঃ মাথাই অস্বীকার করিয়াছেন।—"সুতরাং কাবুলী ব্যাঙ্ক ছাড়া আমাদের আর গতি নেই" বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

PAKISTAN Premier promises labour a rosy dawn—
একটি সংবাদের শিরোনামা।—বুঝিলাম করাচীর "Dawn" দিয়া কাজ চলিবে না!

* * * *

মীরাটের এক ছাত্র সভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন—
"Leadership will be in your hands",

শ্যামলাল একটি অসমর্থিত সংবাদ উল্লেখ করিয়া বলিল—"ছাত্ররা বলেছে তার জন্যে ভাবনা নেই, শুধু মন্ত্রিত্ব হাতছাড়া না হলেই হলো।"

* * * * *

"চিদম্বরম" জাহাজ ভাসান উপলক্ষে রাষ্ট্রপাল রাজাজী বলিয়াছেন—
"সমুদ্রের সংগে আমাদের পরিচয় নূতন নহে।" খুড়ো বলিলেন—খুবই সত্যি কথা, সমুদ্রে তো আমরা বহুদিন থেকেই হাবুডুবু খাচ্ছি।

* * * * *

কলিকাতা কর্পোরেশন নাকি শীঘ্রই একটি শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন। খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—"বড় হয়ে কোলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হলে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা থেকেই শুরু করা ভালো।"

* * * * *

মণিলাতে এক ব্যক্তির নাকি দুইটি শিঙ্ গজাইয়াছে। অনেক ব্যক্তির লেজ গজাইবার সংবাদ আমরা বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। এবারে শিঙ্
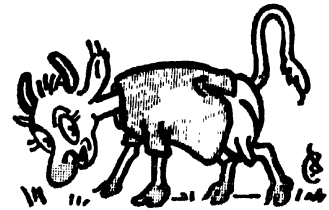
গজাইতে আরম্ভ করিলেই ঝামেলা চুকিয়া যায়, মনের আনন্দে চরিয়া বেড়াইতে পারি।

* * * *

দিল্লীর ব্যবসায়ীরা নাকি মহাত্মাজীর নামে শপথ করিয়াছেন—তারা আর চোরা-কারবার করিবেন না। "খদ্দেরদের পক্ষে লাড্ডু এবারে সহজলভ্য হবে"—এ মন্তব্যও খুড়োর।

* * * *

অস্ট্রেলিয়াতে একধরণের নূতন উনান আবিষ্কার করা হইয়াছে; ইহাতে নাকি এক মুহূর্তের মধ্যে রুটি সেঁকা যায়। অনুরূপ উনান, আমরাও আবিষ্কার করিয়াছি, আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই শুধু রুটি!

নিধিরামের প্রত্যাবর্তন

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

রাধানাথের প্রতিজ্ঞা—বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দিবেন না। হিতৈষীদের সমস্ত চেণ্টা ব্যর্থ হইল, কিছুতেই কিছু হইল না। অগত্যা শেষ পর্যন্ত নিধিরামকে উলুবেড়িয়ায় যাইতেই হইল। জমি জায়গা যায় যাক কিন্তু বাস্তুবাড়িটা পর্যন্ত পরহস্তগত হইয়া যাইবে ইহা তাঁহার কোনোমতেই সহ্য হইল না। পাড়ার মধ্যে দুইটা দল হইয়াছিল। একদলে ছিলেন নিষ্কাম পরাপকারী হারু চাটুজ্যে প্রভৃতি কয়েকজন বৃদ্ধ, কেনারামের পুত্রকে পথে বসিতে দেখিলেই তাঁহাদের আনন্দ, সময়ে অসময়ে কেনারামের দ্বারা উপকৃত বা অপকৃত হইয়াছেন এইরূপ কয়েকজন প্রতিবেশী পূর্ব ঋণ শোধ করিবার জন্য রাধানাথের পক্ষ লইয়া বলিলেন, কেনারাম মৃত্যুকালে অবাধ্য পুত্র নিধিরামকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া গিয়াছেন ঃ আর একদলে ছিলেন শয্যাশায়ী বৃদ্ধ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নিধিরামের কয়েকজন হিতৈষী এবং বন্ধু। তাঁহারা পরামর্শ দিলেন, মামলা করো। উলুবেড়িয়ার লক্ষপতি ব্যবসায়ী জয়কৃষ্ণ পাল তাঁহাদের গ্রামের লোক সেদিন পর্যন্ত জয়কৃষ্ণের পিতা রাধাকৃষ্ণ পাল নিধিরামের পিতা কেনারামের প্রজা ছিলেন। জয়কৃষ্ণ ব্যবসায় উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় উলুবেড়িয়ায় থাকিলেও তাঁহার পরিবার গ্রামেই থাকে। বন্ধুরা ভরসা দিলেন তাঁহাকে গিয়া ধরিলে নিশ্চয়ই তিনি একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জমির দলিলপত্র একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগে ভরিয়া নিধিরাম ভোররাত্রে রওনা হইলেন। আমতা হইয়া তিনি যখন হাঁটিতে হাঁটিতে উলুবেড়িয়ায় পৌঁছিলেন, তখন বেলা প্রায় বারোটা।

নিধিরামের বিশ্বাস ছিল, জয়কৃষ্ণ পালকে উলুবেড়িয়ার আবালবৃদ্ধবণিতা একডাকে চিনিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ভদ্রলোক শহরের সর্বত্র সেরূপ সুপরিচিত নয়। পথে লোকচলাচল বেশি ছিল না, নিধিরাম বাজারে ঢুকিয়া অপর দিক হইতে থলি হস্তে এক ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, জয়কেণ্টবাবুর দোকানটা কোন দিকে বলতে পারেন?"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "পটোল কিনবেন?"

নিধিরাম বলিলেন "আমি জয়কেণ্ট বাবুর দোকানটা খুঁজছিলুম। তিনি কি পটোলের কারবার করেন? তবে যে শুনেছিলুম তাঁর গুড়ের আড়ৎ আছে?"

ভদ্রলোক মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "পটোলের কারবার তিনিও করেন না, আমিও করি না। আমার নাম শ্রীদ্বিজপদ ভট্টাচার্য, পেশা পৌরোহিত্য এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা। বাড়ীতে টোল আছে, পাঁচটি ন্যায়দর্শনের ছাত্র আছে।"

নিধিরাম নমস্কার করিয়া বলিলেন "তাহলে পটোলের কথা কি বলছিলেন?"

দ্বিজপদ হাতের থলিটি দেখাইয়া বলিলেন, "কার্যোপলক্ষে গেছলুম রামরাজাতলায়। আমাদের এখানে তিন আনা পটোলের সের সেখানে দেখি এগারো পয়সা ক'রে সের বিক্রি হচ্ছে। কিছু টাকা হাতে ছিল, আধমণ কিনে ফেলেছি। ভাবলুম নিজেরও লাগবে, তা ছাড়া সের পিছু এক পয়সা কম দামে পেলে প্রতিবেশীদেরও সাহায্য হবে। তা' হাত ব্যথা করছে, আর বইতে পারছি না। আপনি যদি পাঁচ সাত সের নেন তো আমার বোঝাটা হাল্কা হয়। এখনও একক্রোশ যেতে হবে। খাসা পটোল কিন্তু, এমন টাটকা জিনিস উলুবেড়ের বাজারে পাবেন না, তা' ব'লে দিচ্ছি।"

নিধিরাম বলিলেন "আপনার যদি উপকার হয় তা হ'লে সেরখানেক নিতে পারি, তবে উপস্থিত প্রয়োজন ছিল না। দুপুরে কোথায় ভাত জুটবে তারই ব্যবস্থা নেই তো পটোল। দেবেন দিন।" বলিয়া তিনি ব্যাগ খুলিয়া গামছার খুঁটে বাঁধা তহবিল হইতে এগারোটি পয়সা বাহির করিয়া দ্বিজপদ ভট্টাচার্য মহাশয়কে দিলেন। ভট্টাচার্য আন্দাজী যে পটোলগুলি থলি হইতে বাহির করিয়া দিলেন তাহাদের ওজন দেড় সেরের কম হইবে না। তারপর আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আপনি বিদেশী লোক, না। তা দুপুরে আহারের জন্য চিন্তা কি? আমার বাড়ি চলুন। না।" নিধিরাম বলিলেন "তারচেয়ে আপনি যদি জয়কেণ্ট বাবুর বাড়ীটা"—

ভট্টাচার্য বলিলেন তার জন্যে কি হ'য়েছে? আমি আপনাকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে আসছি। আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাড়ীতে মোটটা ফেলেই এলুম বলে"—

নিধিরাম হতাশ হইয়া বলিলেন, "সেটা কি সুবিধে হবে; শুধু শুধু দু ক্রোশ পথ ছুটোছুটি করবেন এই রৌদ্রে? আপনি আর ফিরবেন কেন? পথটা দেখিয়ে দিলে আমি নিজেই যেতে পারতুম।"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "পথ কি আমিই জানি ছাই? খুঁজে বার করব। আপনি বিদেশী লোক, একা খুঁজতে আপনার কণ্ট হবে, আমি সঙ্গে থাকলে"—

"নাঃ, তা হ'লে আর আপনাকে কণ্ট দেব না। আপনি বাড়ি যান।" বলিয়া নিধিরাম পটোলগুলি গামছায় বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া আবার অগ্রসর হইলেন। ভট্টাচার্য "আমার আর কণ্ট কিসের, আপনিও যেমন" প্রভৃতি বলিতে বলিতে পটোলের বোঝা কাঁধে তুলিয়া কিছুদূর তাঁহার সঙ্গে আসিয়া শেষে নিধিরামের নির্বন্ধাতিশয্যে ফিরিয়া গেলেন। কতরকমেরই পাগল আছে সংসারে।

অদূরে এক বৃদ্ধা বালিকা কন্যার হাত ধরিয়া আসিতেছিলেন, নিধিরাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ মা, জয়কেণ্ট বাবুর দোকানটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?"

বৃদ্ধা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার নাম কি বাছা? এই দুপুর রোদে কোথা থেকে আসছ? একটা ছাতা কিনতে পারোনি, মাথা যে ফেটে গেল?" নিধিরাম বলিলেন "আমার নাম নিধিরাম মুখুজ্যে। বাড়ী নারীট। এখানে জয়কেণ্ট বাবুর দোকানে যাব।"—

বৃদ্ধা বলিলেন, "কি ব'ললে বিধিরাম? তা তোমার নামটি তো বেশ। ফয়কেণ্টর বাড়ি যাবে কোন্ ফয়কেণ্ট? আপিং খায়?

নিধিরাম বলিলেন, "ফয়কেণ্ট নয়, জয়কেণ্ট। আপিং খান কিনা তাতো জানি না।"

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "ওই হ'ল! ও নাম যে আমার ধরতে নেই মাণিক। আমার খুড়-শ্বশুরের নাম ছিল ফয়ন্ত। ফজকোটের সেরেস্তাদার ছিলেন, ভারী মানী লোক। তা তুমি ঐ মুখপোড়ার কাছে কি করতে এসেছ? ওকে আবার চিনি না? খুব চিনি। খুড়ীমা খুড়ীমা করে, আপিং চেয়ে চেয়ে খায়। একের নম্বর আনাড়ী, আমার সঙ্গে বিন্তি খেলতে আসত আগে। রং চিনত না, ফোটা চিনত না, সব শেখালুম। শেষে একদিন খেঁড়ি হ'য়ে ব'সে আমার সব্বনাশ করলে! জিতে এসেছি, এমন সময় রং না দিয়ে রুইতনের নওলা ফেলে সেদিন আমার তিরি ছক্কাটা মাটি করে দিলেগো। সেই থেকে বলেছি, খেলার কথা মুখে আনবি তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধা সকন্যা অগ্রসর হইলেন, নিধিরাম তাঁহার পিছন পিছন চলিলেন। খানিক পথ আসিয়া বৃদ্ধা পথের দক্ষিণে একটা দোকান দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ নাও তোমার ফয়কেণ্টর দোকান। এখনও খোলেনি দেখছি, একটু বোসো। আমি তাহলে আসি।" ছক্কা নণ্ট করার জন্য ফয়কেণ্টকে শাপ দিতে দিতে বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন।

রাস্তার ধারে এক ফুলুরিওয়ালা ফুলুরি ভাজিতেছে, তাহার খোলার চালের ঘরখানিরই এক অংশে কাঠের ফ্রেমে আঁটা করোগেটের আয়রণের একটি দরজায় তালা বন্ধ রহিয়াছে। উপরে আলকাতরামাখা কেরোসিন কাঠে সাদা অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে,—আসুন জয়হিন্দ দেখুন

ভারতমাতা মার্কা জগদ্বিখ্যাত রসসিন্ধু বিড়ির একমাত্র আড়ৎ। পাতায় রস আসল নেপালী তামাকে প্রস্তুত—ধোঁয়ায় রস।

প্রোঃ শ্রীজয়কৃষ্ণ ভোঁড়, উলুবেড়িয়া বাজার।

এই চিত্তাকর্ষক সাইনবোর্ডের আকর্ষণে রসিক বিড়িপিপাসু কিন্তু দ্বারে আসিয়া হতাশ হইবেন, কারণ বন্ধ দরজার উপর বড়ো বড়ো অক্ষরে খড়ি দিয়া লেখা আছে, দোকানদারের পেটের অসুখ হওয়ায় দোকান বন্ধ রহিল। অসুখ সারিলেই খুলিবে।

নাঃ, এ দোকান লক্ষপতি জয়কৃষ্ণ পালের হইতেই পারে না, তা ছাড়া স্পণ্টই তো সাইনবোর্ডে লেখা রহিয়াছে জয়কৃষ্ণ ভোঁড়। দূর হউক, আর যায় না এইখানেই কোনো দোকানে কিছু খাবার কিনিয়া খাইয়া বিশ্রাম করা যাক। কিন্তু মামলার ব্যবস্থা, তদ্বির তদারক, তাহার কি হইবে? নিরুপায় হইয়া নিধিরাম আর দুই তিনজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শেষে একজন দোকানদারের কাছে সন্ধান পাওয়া গেল। গঙ্গার কাছেই পাল মহাশয়ের বিরাট আড়ৎ। দোকান ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড লোহার কাঁটাপাল্লা শিকলযোগে ছাদের

কড়ি হইতে ঝুলিতেছে, পিছনের দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরের গুদাম ঘরের সারি সারি গুড়ের নাগরী দেখা যাইতেছে। ফরাসপাতা তক্তপোষের উপর বসিয়া তিনজন কর্মচারী ছোটো ছোটো ডেস্ক সম্মুখে রাখিয়া হিসাবপত্র লিখিতেছে, ফরাসের ঠিক কেন্দ্রস্থলে টানা পাখার নীচে বসিয়া একটি সিন্দুরচর্চিত ক্যাসবাক্স সম্মুখে রাখিয়া আড়ৎদার জয়কৃষ্ণ পাল মহাশয় একজন কর্মচারীর নিকট হইতে কয়েকটা টাকা গণিয়া লইতেছিলেন। নিধিরাম ঘরের ভিতর পদার্পণ করিতেই একজন কর্মচারী (বোধহয় খাজাঞ্চি হইবেন) কলম তুলিয়া ধরিয়া সন্দেহভরে প্রশ্ন করিলেন "কি চান?"

বাহিরে সাইনবোর্ড ছিল তবু নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন "এইটে আমাদের নারীটের পাল মহাশয়ের আড়ৎ তো? আমি তাঁর দেশের লোক। তাঁর সঙ্গে একটু কাজ ছিল।" নিস্তব্ধ ঘরে কথাগুলো বেশ স্পষ্টই শোনা গেল তথাপি গণনারত পাল মহাশয়ের টাকা গণনা বন্ধ হইল না, নাকের ডগার কাছাকাছি লম্বমান চশমার উপর দিয়া তাঁহার দৃষ্টি একবারমাত্র নিধিরামের উপর পতিত হইয়াই ফিরিয়া আসিল : সেই চকিতের দৃষ্টি-বিনিময়ে নিধিরামের প্রতি তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। নিধিরাম কমপক্ষে পাঁচ মিনিটকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কর্মচারিরা মাঝে মাঝে তাঁহার দিকে সন্দেহভরে তাকাইতে লাগিল এবং সশব্দে কলম চালাইতে লাগিল, পালমহাশয় নিঃশব্দে একটা জাবদা খাতা দেখিতে লাগিলেন। একজন বৃদ্ধ কর্মচারী শেষটা বোধহয় দয়াপরবশ হইয়াই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন, বলিলেন "ঐতো কর্তা রয়েছেন, কি বলবেন বলুন না?"

নিধিরাম অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিলেন, অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "বলি পাল মশায় কি চিনতে পারছেন না?"

এতক্ষণে জয়কৃষ্ণ পালের টনক নড়িল। তিনি খাতা বন্ধ করিয়া ক্যাস-বাক্সে চাবি দিয়া চশমা খুলিয়া বেশ গম্ভীর মুখে বলিলেন, "কে ঠাকুর-মশাই? আপনি এখানে কবে এলেন? পাল মহাশয়ের কণ্ঠস্বর ভাবলেশহীন, তথাপি নিধিরাম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া খুশি হইয়া বলিলেন, "আজই অসাছি দাদা। অনেক দিন দেশে ছিলুম না, জানেন তো? ফিরেই এক মিথ্যে মামলায় পড়েছি। রাধানাথ আমার সর্বস্ব গ্রাস করবার চেষ্টায় আছে। তা আপনারা আমার আপনার লোক থাকতে আমার ভাবনা কি? আপনার ভরসাতেই এসেছি এখানে—জয়কেষ্ট বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন একটু ব্যস্ত আছি। এখন আছেন তো দু চার দিন? দেখা হবে খন পরে। ওহে চিনিরাম মতি হাজরার হিসেবটা বার করো তো দেখি।"

দোকানে খরিদদারের বিশেষ ভিড় ছিল না, জয়কেষ্টবাবুকেও বিশেষ ব্যস্ত বলিয়া বোধ হইল না। পাল মহাশয় তৎসত্ত্বেও দ্বিতীয়বার ফিরিয়া তাকাইলেন না, আর একখানা খেরো বাঁধানো মোটা খাতা খুলিয়া বসিলেন। নিধিরাম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেশের লোক, পিতামহের প্রজা, পিতার খাতক,—এ সমস্তই চুলায় যাক্; বিপন্ন প্রতিবেশী বলিয়া আশ্রয়প্রার্থী মানুষ বলিয়াও কি একটু দয়া হইল না? ট্রেনে আসার সুবিধা নাই তিনি জানেন, সুদীর্ঘ ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যে পরিচিত মানুষটা আসিয়াছে, বেলা একটার সময় ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে এক পা ধুলা লইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে পৌঁছিয়াছে—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে,—সে কোথায় উঠিয়াছে, কিছু খাওয়া হইয়াছে কিনা দেশের লোকের নিকট প্রতিবেশী লক্ষপতি জয়কৃষ্ট পাল তাহা একবার খোঁজ লওয়া প্রয়োজন বোধ করিলেন না। নিধিরাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। দোকানের বাহিরে রাস্তায় আড়তের মাল ওজনকারী ভৃত্য ভোলা একটা গরুর গাড়িতে গুড় বোঝাই করাইতেছিল। নিধিরাম বাহিরে আসিতেই সে গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আগাইয়া আসিল, নিধিরামের পদধূলি লইয়া বলিল, "দাদাবাবু বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেন নি। একসঙ্গে হাডু-ডু-ডু খেলেছি ছোটবেলায়, আমি গয়লাদের ভোলা।" নিধিরাম নিজের প্রতি প্রতিবেশীর অবিচারে বিচলিত হইয়াছিলেন, আর একজন বাল্য সহচর যে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার অবিচারে ক্ষুব্ধ হইতে পারে তাহা এতক্ষণে তাঁহার ধারণায় আসে নাই। তিনি প্রথম দৃষ্টিতে চিনিতে না পারার অপরাধ ক্ষালনের জন্য কি করা যায় একবার ভাবিলেন, পরমুহূর্তে সংকোচ বিসর্জন দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন, বুকের জ্বালাটা কমিল। আহা করেন কি? করেন কি? বলিতে বলিতে ভোলা তাঁহার বাহু পাশ মুক্ত হইল, চুপি চুপি বলিল, "একটা কথা আছে। একটু এদিকে আসুন তো?" কি কথা ভাই? বলিয়া নিধিরাম তাহার অনুসরণ করিয়া আড়তের দক্ষিণে সরু গলির মধ্যে একটা দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। ভোলা আড়তের সংলগ্ন সেই ঘরটিতে সপুত্র বাস করে, সে নিমেষ মধ্যে শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া এক বালতি জল এবং একটা ঘটি বাহির করিল। তাহার ছেলে বিষ্ণুপদ একটা মোড়া আনিয়া নিধিরামকে বসিতে দিল। হাত পা ধোয়াইয়া মুছাইয়া ভোলা শেষ পর্যন্ত একটি পিতলের সরায় করিয়া এক সরা মুড়ি একটু গুড় এবং এক ঘটি গঙ্গা-জল হাজির করিল। নিধিরাম সসঙ্কোচে বলিলেন, "আর কেন ভোলা। খুব খুশি হয়েছি এইবার ছেড়ে দে। একটা দোকানে কিছু কিনে খাব এখন। ভোলা হাসিয়া বলিল, "ঐ চামারের পয়সায় কেনা বলে খাবেন না দাদা ঠাকুর? তা পয়সার তো জাত নেই, আর পয়সা ওর নয়, আমার গায়ের রক্ত জল করা রোজগারের পয়সা। একদিন না হয় দেশের লোকের ভোগে লাগল। যান আপনি ঠাণ্ডা হয়ে স্নান করে আসুন, বিষ্ণু জোগাড় দিচ্ছে, দুটি ভাতে ভাত আজ ফুটিয়ে নিন। বিকেলে অন্য ব্যবস্থা যা করবার করবেন।

নিধিরাম আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। মুড়ি গুড় খাইয়া জল খাইলেন। বিষ্ণুপদর পাখার হাওয়ায় শরীর শীতল হইলে তাহার কাছে তেল চাহিয়া মাখিলেন, তারপর ব্যাগটি তাহার কাছে রাখিয়া পটোলগুলি তাহাকে উপহার দিয়া গঙ্গা-স্নানে গেলেন। ভোলা রান্নার জোগাড় করিয়া দিয়া তৎপূর্বে কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

গঙ্গায় স্নান সারিয়া উঠিতেই নিধিরামের কানে গেল, "তুই একটা ল্যাবেণ্ডিস, কোথাও কিছু নেই, আগে থেকে বিজ্ঞাপন দিতে গেলি কেন? লোকের কাছে আর মুখ দেখাবার উপায় রইল না?"

সম্বোধিত যুবক বাইসাইকেল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "আমার দোষ হল? সমস্ত তৈরি, স্টেজ খাটানো হয়ে গেছে বিজ্ঞাপন দেবো না? পেঁচো হতভাগা যে এমন করে ডোবাবে তা কে জানত? কাল প্রফুল্ল অভিনয় আজ যোগেশ গেল মাসির বিয়ের নেমতন্ন খেতে এলাহাবাদ। আক্কেলকে বলিহারী যাই, একবার বলেও গেল না? সরু গলি নিধিরামকে আসতে দেখিয়া যুবকদ্বয় পথ দিতেছিল, নিধিরাম প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা বড়ো বিপদে পড়েছেন মনে হচ্ছে, আমি কিছু কাজে লাগতে পারি?" যুবকেরা কুণ্ঠিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, শেষে একজন বলিল, "আপনি আর কি করবেন? আমাদের এক বন্ধু মুখ পুড়িয়েছে আমাদের।"

নিধিরাম বলিলেন, "অর্থাৎ অভিনয়ের দিনে যার মেন পার্ট তিনিই ফেরার? তা আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তবে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।" যুবকেরা সন্দেহ ভরে বলিল, পারবেন? গিরিশবাবুর 'প্রফুল্ল' অভিনয় কাল, যোগেশের পার্ট করতে হবে। বড়ো শক্ত পার্ট কিন্তু, এক-দিনের মধ্যে তৈরী হবে কি? নিধিরাম বলিলেন, "তৈরি এক সময়ে ছিল, একবার দেখে নিলেই হবে বোধ হয়।" যুবকদ্বয় বয়সের তারতম্য ভুলিয়া দুই দিক হইতে আসিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিল। বলিল, বাঁচালেন। কিন্তু আপনার কাজের কোনো ক্ষতি হবে না তো? আর আপনার পারিশ্রমিক।

নিধিরাম বলিলেন, কাজ এখনও আরম্ভ হয়-নি সুতরাং ক্ষতি হবে না। আমি একটা মামলা রুজু করতে এসেছি এখানে। আমার এক আত্মীয় আমাকে ঠকিয়ে পথে বসাবার চেষ্টা করছেন, সেজন্য মামলা করা দরকার। একজন বিচক্ষণ উকিলের সন্ধান করে দেবেন আপনারা, আর কয়েক দিন একটু থাকবার জায়গা দেবেন। খাওয়া দাওয়া আমি হোটেলে বা দোকানে সেরে নেব—রাত্রে মাথা গোঁজবার স্থান একটু হলেই চলবে। খরচ যা লাগে আমিই দেব।"

যুবকেরা বলিল, "সে কি কথা? থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থাই হবে। আপনি আজ আমাদের মুখ রক্ষা করলেন। আমরা এটুকু আপনার জন্যে করব না।" একজন যুবক বলিল, "তা ছাড়া আমার দাদা ক্লাবের সেক্রেটারী, তিনি নিজে খুব বড়ো উকিল, তিনিই আপনার মামলা রুজু করে দেবেন। কিছু ভাবতে হবে না।"

* * *

চৌদ্দ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় নিধিরাম যতই অতি আধুনিক হইয়া থাকুন না কেন কয়লার খনিতে অভিনয় করিতে গিয়া গিরিশ ঘোষের এবং দ্বিজেন্দ্রলালের যুগে তাঁহাকে ফিরিতে হইয়া-ছিল। নিজে যখন যাঁহার ভূমিকায় নামিতেন তখন সেই ব্যক্তির সহিত নিজেকে অভিন্ন কল্পনা করিয়া লইতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার অভিনয়ও মর্মস্পর্শী হইত। সেই রাত্রে ড্রেস রিহার্সালে তিনি ক্লাবের সভ্যদের মুগ্ধ করিলেন। ছেলেদের কয়েকজনকেও মধ্য রাত্রি পর্যন্ত তালিম দিয়া খানিকটা ভদ্রলোকের পাতে দিবার যোগ্য করিয়া তুলিলেন। পরদিন মহাসমারোহে অভিনয় হইয়া গেল, দেশশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করিল। মেয়ে পুরুষ অনেকেই কাঁদিয়া ভাসাইল, চিকের আড়ালে এক ভদ্রমহিলা ফিট হইয়া গেলেন, আত্মীয়েরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাড়ি লইয়া গেল।

অভিনয় শেষে নিধিরাম সাজঘরে মুখের ও হাতের রং ঘষিয়া তুলিতেছেন এমন সময় একজন অভিনেতা আসিয়া খবর দিল, "এস ডি ওর চাপরাসী আপনাকে ডাকছে। নিধিরাম লজ্জিত-ভাবে বাহিরে আসিতেই চাপরাসী সেলাম করিয়া প্রশ্ন করিল, "আপনার নাম নিধিরাম মুখুজ্যে? নিধিরাম বলিলেন, হ্যাঁ, কেন বলতো? বাড়ি নারীটে? হ্যাঁ ঠিক মিলছে? পরোয়ানা আছে নাকি অ্যারেস্ট করবে? চাপরাসী হাসিয়া বলিল, এ্যারেস্ট করব, কিন্তু পরোয়ানা নেই। এস ডি ও সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়েছেন। কৃত্রিম ক্রোধের ভাব দেখাইয়া নিধিরাম বলিলেন, "ওয়ারেণ্ট নেই, এ্যারেস্ট করবে কি রকম? মগের মুল্লুক পেয়েছ?

নিধিরামের বিশ্বাস ছিল কোনো গুরুতর অপরাধ না করিলে তাহার মতো সামান্য ব্যক্তির দিকে কোনো রাজপুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। চাপরাসীর পিছন পিছন বাহিরে আসিয়া তিনি তাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। একটা ঝকঝকে মোটরকার দাঁড়াইয়া আছে, তাহার বাহিরে দাঁড়াইয়া এক মুণ্ডিত গুম্ফ শ্মশ্রু-যুবক আর ভিতরে বসিয়া এক প্রৌঢ়বয়স্কা ভদ্রমহিলা তাঁহার পূর্ব পরিচিত বিন্দু দিদি। বিন্দু দিদি ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "বেশ লোক যাহোক? এখানে এসেছেন একটা খবরও দিতে নেই। ভাগ্যিস আজ অভিনয় দেখতে এসেছিলুম তাইতো। মুখের ওপর বললে ভাববেন, খোসামোদ করছি, কিন্তু সত্যি এ রকম অভিনয় আমি জীবনে দেখিনি। আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গেছি, না! ও সব আমার আসে না। এটি আমার দেওর তরুণ, সম্প্রতি এখানে বদলী হয়ে এসেছে, আর ইনি নিধিরামবাবু, ওঁর কথা তোমায় আগে বলেছি। যাক এখন চলুন আমাদের বাড়ি। এখানে আজ রাত্তিরটা কাটিয়ে কাল আমার বাপের বাড়ি যাবেন। বাবার সংগে আলাপ করে তবে আপনার ছুটি।" তরুণ রায় আই সি এস ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত নব্য যুবক নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমার বৌদি পূর্বেই আপনার ভক্ত ছিলেন এখন আমিও ভক্ত হয়ে পড়েছি। আপনি কেবল সাহসী নন, সত্যিকারের গুণী লোক। সত্যি আপনার অভিনয় আজ আমাদের বড্ড ভালো লেগেছে। তা' এদের সংগে আলাপ হ'ল কি করে?" বলিতে বলিতে গাড়ীর দরজা খুলিয়া নিধিরামকে পাশে বসাইয়া লইয়া গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন। সংগে সংগে ছেলের দল আসিয়া গাড়ি ঘিরিয়া ফেলিল "সে হবে না, কাল আমাদের 'ফিস্ট' আছে, ওঁর এখন যাওয়া চলবে না। শেষ পর্যন্ত ক্লাবের সেক্রেটারী বিভাসবাবুর সংগে বহু কষ্টে সন্ধি হইল। কথা রহিল পরদিন রাত্রে ভোজ আরম্ভ হইবার পূর্বেই নিধিরামকে ক্লাবে পেঁৗছাইয়া দেওয়া হইবে। এই সময় নিধিরাম সসংকোচে নিবেদন করিলেন, "স্যর, আপনি স্নেহ করে ডেকেছেন মাও সংগে রয়েছেন, আপনাদের কথা অমান্য করতে আমি পারব না, খেয়ে আসব আজ। তবে কাল ভোরেই আমি ফিরে আসতে চাই। আপনি দুঃখিত হবেন না। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, উপস্থিত জ্ঞাতির চক্রান্তে সর্বস্বান্ত, রাজগৃহে থাকার মতো পোষাক পরিচ্ছদও আমার নেই, মনের অবস্থাও এখন তেমন নয়। মধ্যবিত্ত ঘরেই আমার থাকার সুবিধে, বিশেষ করে বিভাসবাবুর সংগে আমার মামলার পরামর্শ আছে। যদি অপরাধ না নেন, তাহলে থেকেই যাই, ভেবে দেখুন আমাকে ঝোঁকের মাথায় নিয়ে গিয়ে আপনিও পদে পদে বিড়ম্বিত হবেন আপনার পদস্থ বন্ধুদের কাছে, আমিও মিথ্যে লজ্জা পাব। তার চেয়ে—"

তরুণ রায় হাসিয়া বলিলেন, "আজ বেরিয়েছি, আর ফেরা হয় না। রাত্রে ভেবে দেখব। আমার ওখানে সত্যিই আপনার অসুবিধা হতে পারে, তবে দাদার শ্বশুর বাড়িতে হবে না। তাঁরা প্রাচীনপন্থী লোক, গো ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি। বৌদি'কে দেখেই বোধ হয় খানিকটা টের পেয়েছেন। কই বৌদি, পান জরদা বার করুন।" পথে মামলার বিবরণ সমস্ত শুনিয়া তরুণ রায় হাসিয়া বলিলেন, "লোকটা বোকা বদমাইস। আপনি জানবেন ওর বন্ধু কেউ নেই, দু' টাকা পাবার লোভে সবাই ওকে নাচাচ্ছে। আপনি নির্ভয়ে থাকুন। বিভাসবাবু একা না পারেন, আমি ব্যবস্থা করে দেব। জিত আপনার হবেই।"

ইহার পরবর্তী কয়দিনের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কাজ এবং ভোজ এক সংগেই চলিল, জমিদার বাড়ির এবং এস ডি ওর মোটরে ছাড়া দুই পা চলার উপায় রহিল না। রাধানাথকে উকিলের চিঠি দেওয়া হইল, মোকদ্দমার ব্যবস্থা কিরূপে কি হইবে তাহাও স্থির হইয়া গেল। বিভাসবাবু 'ফি' লইবেন না, বলিলেন—"এ আমার নিজের কাজ। আপনাকে দাদা বলেছি, ছোটো ভাইয়ের দ্বারা যদি এটুকু উপকার না হয় তবে আমার ওকালতি শেখাই বৃথা।" কয়দিন মহানন্দে কাটাইয়া নিধিরাম বাড়ি ফিরিবার জন্য নৌকা ভাড়া করিলেন। যাত্রার পূর্বে ভোলার সংগে একবার দেখা করা কর্তব্য বোধ হইল। জয়কৃষ্ণ পালের আড়তের পাশে ভোলার ঘর তখন তালা বন্ধ, ভোলা নিশ্চয়ই ছেলেকে লইয়া কাজে গিয়াছে। দোকান ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া নিধিরাম একবার ইতস্ততঃ করিলেন, তাহার পর 'ভোলা আছ' বলিয়া হাঁক দিয়া ভিতরে ঢুকিলেন।

নিধিরামকে দেখিয়াই আজ জয়কৃষ্ণ পাল ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, করজোড়ে বলিলেন, "কদিন ধরে আপনার সন্ধান করছি! কোথায় উঠলেন, কি করছেন কিছুই জানি না। বলি, শরীর গতিক ভালো তো? পাল মহাশয় বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখিতে গিয়া নিধিরামের সম্মান নিজ চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছেন তারপর পথে ঘাটে বিভিন্ন মোটরকারে বিভিন্ন মহাজন সংসর্গে তাহাকে দেখিয়া থাকিবেন, তাই হঠাৎ এই ভদ্রতার বাহুল্য। নিধিরাম মনে মনে হাসিলেও মুখে কিছু ভাঙ্গিলেন না বলিলেন, "শরীর নারায়ণের কৃপায়, মন্দ নেই, কদিনে একটু মোটাই হয়েছি মনে হচ্ছে। কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলুম, এদিকে তাই আসতে পারিনি। এবারকার মতো কাজ 'মিটল,' আজই বাড়ি ফিরব ভাবছি।"

জয়কৃষ্ণ বিগলিত হইয়া বলিলেন, "এ আপনার কিন্তু ভারি অন্যায় হ'ল ঠাকুর মশায়। আমি ধরতে গেলে আপনার লোক—দেশের লোক থাকতে আপনি ক'দিন ধরে এর তার বাড়ি ভেসে ভেসে বেড়ালেন—এটা ঠিক হ'ল না, ধরতে গেলে এ এক রকম আমাকেই অপমান করা। তা' এবার যা হ'বার হয়ে গেছে, আসছে বার কিন্তু এলে আগে আমার বাড়ি উঠতেই হবে। আমি কোনো কথা শুনবো না।"

নিধিরাম ভদ্রতা করিয়া বলিলেন, "বেশ তো, সে তখন দেখা যাবে। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, আজ তা হলে আসি।" জয়কৃষ্ণ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন, তারপর আব্দারের সুরে বলিলেন "একটা কিন্তু আরজি ছিল ঠাকুর মশাই। আমার মেয়েটার বড়ো অসুখ শুনেছি। তার জন্যে কিছু সাবু বার্লি, লেবু এই সব পাঠাব ভাবছিলুম আর গিন্নীর বত্ত উথযাপনের জন্যে কিছু ফল পাকড়ও ছিল। তা' লোকাভাবে পাঠাবার সুবিধে হচ্ছিল না। যেতে আসতে তিনদিনের পথ, খরচ দিয়ে পাঠালেও চাকরদের তো বিশ্বাস নেই, অর্ধেক জিনিস হয়তো পথেই মেরে দেবে। তা' আপনি দেশের লোক, ব্রাহ্মণ মানুষ, যেমন সদাচারে নিয়ে যাবেন সেকি আর অন্যের দ্বারা হবে? আপনার তো বাড়ির দরজায়, বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলে করে যদি পেঁৗছে দেন তো বড্ডো উপকার হয়। ওহে, ঐ নারীটের জন্যে যে গাঁঠরিটা বাঁধিয়ে রেখেছি, এদিকে নিয়ে এসতো কেউ।"

গাঁঠরি আসিল। দুইটি ঝুড়ি মুখোমুখি করিয়া সেলাই করা, তাহার উপর চট দিয়া মুড়িয়া আবার সেলাই করা। একটা মুটের মাল, কম পক্ষে দশ বারোসের হইবে। এইজন্য এত খোসামোদ? নিখরচায় এই বস্তাটি কাঁধে করিয়া কয়েক ক্রোশ পথ গিয়া জয়কৃষ্ণের বাড়িতে পেঁৗছিবে, তাহার মূল্য অগ্রিম শোধ হইল একটা কপট প্রণামে! কর্মচারী পাঠাইলে, কাজের ক্ষতি, পয়সার ক্ষতি, জিনিসেরও ক্ষতির সম্ভাবনা। জয়কৃষ্ণ শেষে তাঁহাকে এতই বোকা মনে করিলেন? নিধিরাম মনে মনে হাসিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না। প্রথমে একবার মনে হইল স্পষ্ট বলিয়া দিই আমার দ্বারা আর কিছু হইবে না। পরক্ষণেই মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলিয়া গেল, বলিলেন—"বেশ তো, তাতে আর কি হয়েছে? একটু ভারী আছে। তা' খালধারে আমার নৌকো আছে, ভোলা যদি পৌছে দেয় তো ভালো হয়, আমার একবা'র এস ডি ওর সংগে দেখা করে যেতে হবে কি না, এ বস্তা কাঁধে করে তো যেতে পারব না।"

জয়কৃষ্ণ হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞে, আমি খাল ধারেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। কোনখানে নৌকোটা আছে ভোলাকে বুঝিয়ে দিন। আর আপনি 'বস্তা' বলছেন কেন ঠাকুর মশাই, একি আর একটা মোট হ'ল পাছে রাস্তায় খুলে যায় তাই ভালো করে বেঁধে দিয়েছি। অনেক পথ যাবেন তো?" নিধিরাম হাসিয়া বলিলেন, "তা ঠিকই করেছেন তবে এখন আসি পাল মশাই। আয়রে ভোলা।" নিধিরাম বাহির হইয়া পড়িলেন, ভোলা মোট কাঁধে তাঁহাকে অনুসরণ করিল। সহসা জয়কৃষ্ণ পাল পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওদের বলবেন একটা প্রাপ্তি সংবাদ যেন আজই দেয়, বিকেলের ডাকে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ব'লব। আপনার কোনো ভাবনা নেই।"

জয়কৃষ্ণের গদি দৃষ্টি-বহির্ভূত হইলে ভোলা বলিল, "আবার এই চামারের পাল্লায় পড়লেন কেন? এই মুটের বোঝা বইতে হবে তো?" "তুইও যেমন!" নিধিরাম বলিলেন—"পাল মশাইকে এবার একটু শিক্ষা দেব। একি আর পেঁৗছোবে ভেবেছিস?" ভোলা শঙ্কিতভাবে বলিল, "সেটা কি ভালো হবে?" নিধিরাম হাসিলেন, বলিলেন—"ঝুড়িতে কি আছে জানিস?" ভোলা বলিল, "জানি বই কি। আম আছে, সন্দেশ আছে, কমলা-লেবু আছে, আরও কত কি আছে। পাল মশাই কাল কেলাবের ছোঁড়াদের কাছে খোঁজ পেয়েছে আপনি আজ যাবেন, তাই সকালে উঠেই বাজারে বেরিয়েছিল। এই তো ফিরে বাঁধা ছাঁদা করলে।" নিধিরাম বলিলেন, "সন্দেশ খাবি ভোলা?" ভোলা সম্মত হইল না, বলিল "চামার বলি যা বলি মনিব তো বটে! তার সঙ্গে কি বিশ্বঘাতকতা করতে পারি?"

"তুই কেন বিশ্বঘাতক হবি? পাঠিয়েছে তো আমার সংগে?"

ভোলা বিনীতভাবে বলিল, "ঐটি মাপ করবেন দাদাঠাকুর। আমার দ্বারা ও কাজ হবে না।"

খাল ধারে ক্লাবের কয়েকটি ছাত্র বিদায় দিতে আসিয়াছিল, তাহাদের সাহায্যে ঝুড়ি খোলা হইল। হাঁড়ি ভরা নূতন গুড়ের সন্দেশ, লেবু, অসময়ের আম, বিস্কিট লজেঞ্চ, এলাচ দানা প্রভৃতি সেইখানে কিছু বিতরিত হইল, কিছু ভবিষ্যতের জন্য নিজের ক্যাম্বিসের ব্যাগে সঞ্চিত হইল। সাড়ী কাপড় দুইখানি সযত্নে কাগজে মুড়িয়া ঐ সংগে দেওয়া ছিল, নিধিরাম সেইগুলি কেবল জয়কৃষ্ণের বাড়িতে পেঁৗছাইয়া দেওয়া কর্তব্য বিবেচনা করিলেন, সেই সংগে এক কৌটা বার্লি পাঁচখানি মাটির মালসা, একখানি নূতন গামছা এবং একখানি কুশাসন পাল গৃহিণীর ব্রত উদ্যাপনের জন্য নিধিরাম নিজের পয়সায় কিনিয়া লইলেন, ছেলেরা কিছু কলার পাতা এবং কলার পেটো বিনামূল্যে জোগাড় করিয়া আনিল, সেইগুলি

দিয়া ঝুড়ি ভর্তি করিয়া দড়ি দিয়া সেলাই করিয়া ফেলিলেন। চট মুড়িয়া দ্বিতীয় বার সেলাই করাটা ফেরার পথে নৌকায় বসিয়াই শেষ হইল। নৌকায় আট মাইল খাল বাহিয়া আসিয়া নিধিরাম পানপুরে ট্রেন ধরিলেন এবং আমতা হইতে হাঁটিয়া বেলা দুইটা নগাদ নারাইট পৌঁছিলেন, মনটা লঘু ছিল, সুতরাং পকেটের ভার লঘু করিতে দ্বিধা হইল না। মুটিয়ার মাথায় মোট চাপাইয়া নিধিরাম সোজা জয়কৃষ্ণ পালের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন।

* * *

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর পাল গৃহিণী উঠানে মাদুর পাতিয়া চুল শুকাইতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বড়ি পাহারা দিতেছিলেন। একটা দুষ্ট কাক বড়ি খাইবার চেষ্টায় কেবল সামনের ঘরের ছাদ হইতে ওঠানামা করিতেছিল এবং ঘন ঘন 'কাকা' রবে চীৎকার করিতেছিল। পাল গৃহিণী ততোধিক চীৎকার করিয়া তাহাকে ধমক দিতেছিলেন। "আ মলো যা, আমি ডাল বেটে ফেটিয়ে মরনু আর উনি এসেছেন বড়ি খেতে? বড়ি

"মিন্সে কি পিণ্ডি দেবার জন্যে"

করতে তো পয়সা লাগে না? দূর হ' দূর হ', এত যদি খাবার সখ তাহ'লে বড়ি দিতে পারিসনি? খালি পরের জিনিসে নজর, সাধে কি কাগজন্ম হয়েছে? ঘেন্না নেই, পিত্তি নেই গু খাচ্ছেন গোবর খাচ্ছেন, উনি এসেছেন আমার বড়িতে মুখ দিতে! আস্পদ্দা দ্যাখো না! ফের যদি এদিকে আসবি তো ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো। আমাকে চেনোনি, না?"

এমন সময় দরজা হইতে নিধিরাম হাঁক দিলেন, "বাড়িতে কে আছেন একবার এদিকে আসবেন? জয়কেষ্ট বাবু কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়েছেন, নিয়ে যান।"

বাড়িতে 'নিত্য'ঝি ভিন্ন দ্বিতীয় লোক ছিল না, জ্যেষ্ঠপুত্র কালীকৃষ্ণ পল্লীভ্রমণে বাহির হইয়াছে, কন্যা টেঁপি পাশের বাড়ি খেলিতে গিয়াছে, অগত্যা গৃহিণী বিপুল বপুখানিকে কোনোরূপে ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতে করিতে হাঁক দিলেন, "ও নেত্য, কে দ্যাখ তো? বাড়ির ভেতর আসতে বল্, মিন্সে আবার কি পাঠালে দেখি।"

নিত্য নিধিরামকে দেখিয়া বলিল "এ যে আমাদের দাদাঠাকুরগো, কেনারাম ঠাকুরের ব্যাটা! তা আপনি একটু সামলে সুমলে বোসো, আমি এনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

নিধিরাম বিলাসমণির সম্মুখে পৌঁছিয়া মুটেকে বোঝা নামাইতে বলিলেন, পরে বিনাবাক্য ব্যয়ে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া দড়ি কাটিলেন এবং চট ও ঝুড়ি খুলিয়া জয়কৃষ্ণের তথাকথিত প্রেরিত দ্রব্যগুলি থাক্ লাগাইয়া সাজাইয়া দিলেন।"

বিলাসমণি অবাক হইয়া বলিলেন "মরেছে রে! এসব কি কাণ্ড? এত কলাপাতা কি হবে, আর এই মালসা? মিন্সে কি পিণ্ডি দেবার জন্যে সব জোগাড় যন্তর করে পাঠিয়েছে নাকি?"

নিধিরাম কষ্টে অশ্রু বিসর্জন বন্ধ রাখিয়া বলিলেন "কতকটা সেই রকমই ব্যাপার। আমাকে আজই এগুলো দিতে বারণ করেছিলেন; পাল-মশয়ের খুব অসুখ যাচ্ছে। ভালোমন্দ একটা কিছু হ'য়ে গেলে সেই খবর পেলে এগুলো আপনাদের দেবার কথা ছিল। পাছে আপনারা চিকিৎসার জন্যে কতকগুলো খরচ করেন তাই খবর দিতে বারণ করে দিলেন। তা ধরুন আমার তো খবরটা চেপে রাখা ঠিক নয়। শেষে দেখা না হ'লে চিরদিন একটা আফসোস থাকবে তো আপনাদের? তাই ভাবলুম দূর হোকগে, জানিয়েই দি। দু'টাকা খরচ ক'রে শান্তি পায় পাক।"

বিলাসমণি মেদ ভারাক্রান্ত দেহ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "কি অসুখ ঠাকুর মশাই? অসুখ আবার কবে থেকে হ'ল? কিছু শুনিনিতো?"

নিধিরাম অম্লানবদনে, অবশ্য মুখভাব যতদূর সম্ভব ম্লান রাখিয়া,—বলিলেন "জয়কেষ্টদা'র আজ দু'দিন হ'ল ডবল নিমোনিয়া, তার সঙ্গে ব্রঙ্কাইটিস। ঈশ্বরের মনে কি আছে জানি না, তবে ডাক্তাররা তো বড়ো ভরসা দিচ্ছে না। তাই কি ডাক্তার ডাকতে চান? আমি গাঁঠের কড়ি দিয়ে ডাক্তার দেখাই। চোখে দেখে তো থাকতে পারি না?"

বিলাসমণি সহসা হাঁউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো আমার কি সর্বনাশ হ'ল গো? ওগো আমি কোথায় যাব গো? ওগো আমার কি হবে গো? ওগো মাগো! ওগো তুমি কোথায় গেলে গো? ওগো আমায় এমন করে পথে বসিয়ে গেলে কেন গো?" বলিতে বলিতে তিনি বসিয়া পড়িলেন, সুর ধাপে ধাপে চড়িতে লাগিল।

নিধিরাম আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "এখনি অমন মুষড়ে পড়লে তো চলবে না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। যান্, শেষ দেখা করবার ইচ্ছে থাকে তবে ছেলেকে নিয়ে আজ এখনি বেরিয়ে পড়ুন।" নিধিরাম প্রস্থান করিবার পূর্বেই প্রতিবেশিরা পিলপিল করিয়া সদরের এবং খিড়কির দরজা দিয়া ঢুকিতে লাগিল। দূর হইতে পাল গৃহিণীর সুর কানে আসিতে লাগিল "ওগো, মুখপোড়া বামুন একি সর্বনেশে খবর দিয়ে গেল গো? ওগো যখনই দুপুরবেলা পোড়ারমুখো কাগ ঐখানে বসে কা, কা করে ডাকতে আরম্ভ করেছে তখনই আমি বুঝেছি আমার কপাল ভেঙেছে গো! ওগো, আমার যে শত্রুপুরীতে বাস গো! ওগো আমি রাঁড় হ'লে পাড়ার শতেক খোয়ারীরা যে হরির নুট দেবে গো? ওগো আমার একগা গয়না দেখে যে পোড়ার-মুখীরা জ্বলে পুড়ে মরে গো।" নিধিরাম দ্রুত-পদে পাড়া ছাড়াইয়া গেলেন।

সেই রাত্রে কালীকৃষ্ণ মাতাকে এবং গ্রামের বিচক্ষণ বৈদ্য 'গাজন কবিরাজ'কে লইয়া কি করিয়া উলুবেড়িয়া পৌঁছিয়াছিলেন সে কাহিনী নারাইট গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা জানেন, সুতরাং তাহার আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। কালীকৃষ্ণকে কোনোদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জন করিতে হয় নাই, সুতরাং বাপের উপার্জনের পয়সা উড়াইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। কেবল মাতা বিলাসমণি পদে পদে বাধা দিয়া তাঁহার খরচের স্পৃহাটা দমাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে মাতার সম্মতি এবং পিতার সহিত শেষ দেখার জন্য তাঁহার আগ্রহ কালীকৃষ্ণকে বেপরোয়া করিয়া দিল, তিনি এক টাকার জায়গায় চার টাকা দিয়া পাল্কী ভাড়া করিলেন, দুই টাকার জায়গায় দশ টাকা দিয়া নৌকা ভাড়া করিলেন। কালীকৃষ্ণের নিজের ভয় ছিল পাছে পিতার হঠাৎ মৃত্যু হয় এবং তাহাদের অনুপস্থিতির সুযোগে কর্মচারীর দল তাঁহার বহু কষ্টার্জিত টাকাগুলি লোহার সিন্দুকের চাবি খুলিয়া সরাইয়া ফেলে। যাহা হউক, উলুবেড়িয়ার বাসাবাড়ির বারান্দায় জয়-

"তোমরা হঠাৎ?"

কৃষ্ণকে নির্বিকারচিত্তে একটি টুলে বসিয়া তামাক টানিতে দেখিয়া কালীকৃষ্ণ এবং তাঁহার জননী যত না বিস্ময়াপন্ন হইলেন, জয়কৃষ্ণ ততোধিক বিস্মিত হইয়া গেলেন। বিলাসমণি ভাড়া পাল্কী হইতে নামিতেই তিনি অবাক হইয়া বলিলেন, "তোমরা হঠাৎ!" বিলাসমণি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "যম নিলে নে? আ আমার মরণ, তুমি আবার মরবে? তাহ'লে যে আমার হাড়ে বাতাস লাগবে, তাহ'লে যে আমি দু'পয়সা হাতে পাব, তাহ'লে যে দেশের লোকের শাপমন্যি থেকে বাঁচব,—পোড়া বিধাতার বুঝি তা প্রাণে সইলুনি? তা হ্যাঁগা, বলি আমাদের সঙ্গে ন্যাকরা করছিলে নাকি? তোমার নাকি বড্ড অসুক! তুমি নাকি খাবি খাচ্ছ? আমরা পড়ি-কি-মরি করতে করতে এই তেপান্তরের পথ আসছি, আর তুমি পায়ে পা দিয়ে বসে তামাক খাচ্ছ? বলি, যত বয়েস বাড়ছে তত রস বাড়ছে যে দেখছি? এমন রসিকতা কার কাছে শিখেছিলে? লজ্জাও করে না, আবার মাথা চুলকুনো হচ্চে? মাথায় কি চুল আছে যে চুলকুচ্চো? সবতো শণের নুড়ি? নুড়ো জেলে দিতে হয় অমন চুলে"—

কালীকৃষ্ণ পিতাকে মুমূর্ষু না দেখিয়া খানিকটা হতাশ হইয়াছিলেন, তথাপি মুখে মাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "বাবা ভালো আছেন, এতো ভালোই হ'ল মা। মরে গেলে কি লাভটা হ'ত? নাও এখন ভেতরে চল, রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে। তাছাড়া কবরেজ মশাই রয়েছেন, উনি কি ভাবছেন বল দেখি?"

বিলাসমণি হাত নাচাইয়া মুখ নাড়িয়া বলিলেন "ওরে আমার ভাবুনি রে, ভেবে আমার সব করবে! আমাকে শূলে দেবে। লোক দাঁড়িয়েছে তো হয়েছে কি? আমার ভাতার,—আমি ন্যাজে কাটব, কার কি ব'লবার আছে? যখন জোচ্চুরি ক'রে মিথ্যে খবর পাঠিয়েছিল তখন সে কথা মনে হয়নি? ওঃ, লোকের ভয়ে তো আমি ম'রে গেনু?

এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করা ভালো। সারা-রাত্রি ধরিয়া তর্কাতর্কি করিয়া শেষ পর্যন্ত জয়কৃষ্ণ বিলাসমণিকে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝাইলেন, তাহার রাগ স্বামীর উপর হইতে তখন 'বিট্‌লে বামুনের' উপর গিয়া পড়িল। জয়কৃষ্ণও ইহার একটা বিহিত করা প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন। অগত্যা পরদিন সকলে একত্রে বাড়ি ফিরিলেন।

* * *

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শয্যাশায়ী হইলেও নিরপেক্ষ বিচারক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। পূর্বের প্রতাপ না থাকিলেও এখনও গ্রামের অর্ধেক লোক তাঁহাকে মানে। একদিন তিনি ছিলেন সকলের সার্বজনীন দাদা। প্রথম যৌবনে নিধিরাম-দের কয়েকজনকে আর একবার তাঁহার কাছে আসামীরূপে হাজির হইতে হইয়াছিল। দক্ষিণ-পাড়ার মেঘনাদ চক্রবর্তী, ওরফে মেঘাখুড়ো বৃদ্ধ বয়সে গ্রামান্তর হইতে একটি নাতনীর বয়সী বালিকাবধূ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। কন্যার পিতা খুড়ো মহাশয়ের খাতক, অর্থলোভে বিবাহ দিয়া থাকিবেঃ কিন্তু গ্রামের যুবকসমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিল, বালকরাও তাহাদের দলে ভিড়িয়া ঢিল ছুঁড়িয়া ছড়া গাহিয়া খুড়োকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। যুবকদের পাণ্ডা ছিলেন নিধিরাম। তিনি প্রতিদিন নিশুতিরাত্রে গিয়া বৃদ্ধের শয়নঘরের জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া 'মিউ মিউ' করিয়া ডাকিতেন। মেঘনাদ গালিগালাজ করিলেন, লাঠি লইয়া তাড়া করিলেন, অনুনয় বিনয় করিলেন, কিছুতেই ডাক বন্ধ হইল না, শেষ পর্যন্ত তিনি হরিহরদা'র শরণ লইলেন। বলিলেন—"যা হ'বার সে তো হয়েই গেছে, এখন তো আর বিয়ে ফিরবে না? তা' এই ফচকেদের জ্বালায় রাতের পর রাত আমরা স্বামী স্ত্রীতে ঘুমেতে পারি না এর একটা বিহিত করো।" হরিহর নিধিরামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নিধিরাম নতমুখে প্রণাম করিয়া বসিতেই বলিলেন, "আমি তোমায় সৎ ছেলে বলে জানতুম নিধিরাম। এ সব কি কথা শুনছি? হাজার হোক তোমার বাপের বয়সী, সম্পর্কে কাকা হন। এটা কি উচিত হচ্ছে? নিধিরাম বলিলেন, "ঠাকুরদা, মেঘা খুড়োর ভীমরতি হয়েছে, কার নামে কি শুনেছেন, আমাকে জড়াচ্ছেন মিছিমিছি"—

হরিহর এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করিলেন, "তুমি মেঘনাদ খুড়োর জানলার নীচে রোজ রাত্রে মিউ মিউ করো কি না?"

নিধিরাম আর মিথ্যা বলিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ করি?"

মেঘনাদ বলিলেন, "শুনছো বাবা, ছোঁড়া নিজের মুখে স্বীকার করছে? কি বেআদব ছোকরা? জুতিয়ে"—

হরিহর বলিলেন—"এটা কি তোমার ভালো কাজ হয়েছে নিধিরাম?"

নিধিরাম বলিলেন, "আজ্ঞে তা ঠিক হয়নি। উনিও তো কাজটা ভালো করেননি। একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছেন"—

মেঘনাদ গর্জিয়া উঠিলেন, "তবে রে হারামজাদা, আমার হাতে পড়ে তোর খুড়ীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে। তোর মতো বওয়াটে বাউণ্ডুলের হাতে পড়লে রাণীর হালে থাকত? আমার সত্তর বিঘে ধানজমি, তিনটে পুকুর, তিন জোড়া বলদ"—

নিধিরাম বলিলেন—"চারটি ছেলে, সাতটি মেয়ে, আশি বছর বয়েস—চুলে কলপ, বাঁধানো দাঁত"—

মেঘনাদ লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আজ তোকে খুন করব—"

হরিহর বাধা দিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দিলেন। বলিলেন—"ছেলে ছোকরার কথায় রাগ করতে আছে খুড়ো, তুমি ক্ষেপে যাও বলেই তো ওরা ক্ষেপায়। তা নিধিরাম, তুমি কাজটা ভালো করোনি, স্বীকার করছ?

নিধিরাম ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—"কোনো মন্দ অভিপ্রায় আমার ছিল না।"

হরিহর গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"কোন্ সদভিপ্রায়ে তুমি ওঁর জানলার তলায় মিউমিউ করতে শুনি?"

নিধিরাম বলিলেন—"আজ্ঞে আমার যদি মন্দ অভিপ্রায়ই থাকবে, তাহ'লে আমি অমন আস্তে আস্তে 'মিউ মিউ করে ডাকব কেন ঠাকুরদা? তাহ'লে তো এই রকম চড়া 'গলায় 'ম্যাও, ম্যাও' করে ডাকতে পারতুম।"

সভা শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল। হরিহর বলিলেন—"নিধিরাম যুক্তিযুক্ত কথাই বলেছেন, অসদভিপ্রায় থাকলেই উনি 'ম্যাঅ্যাও, ম্যাঅ্যাও' করে ডাকতেন। উপস্থিত একটু নির্দোষ আমোদ উপভোগের জন্যই 'মিউ, মিউ ক'রেছেন। যাই হোক, আমি বলি কি নিধিরাম, ভালোমন্দ কোনো উদ্দেশ্যেই তোমার আর ও'র বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। উনি যখন পছন্দ করছেন না, তখন 'মিউ, মিউটাও ছেড়ে দাও।" নিধিরাম বিনীতভাবে বলিলেন, "যে আজ্ঞে।" হরিহর বলিলেন—"আর তোমার দলটিকেও বারণ করে দিয়ো।" "যে আজ্ঞে।"

সে সব বহুদিনের কথা। এখন হরিহরের অর্থবল গিয়াছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনুরক্ত বয়স্য দলও গিয়াছে। অধিকাংশ সময় বৈঠক-খানায় একা বসিয়া চণ্ডীপাঠ করেন। নিধিরাম তাঁহার বাড়িতে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিবার পর ইদানীং কদাচ কখনও তাঁহাকে হাসিতে দেখা যায়, দুই চারিজন ছেলে ছোকরাও যাতায়াত করে। আজ কিন্তু জয়কৃষ্ণের আমন্ত্রণে গ্রামের ছোটোবড়ো কয়েকজন মাতব্বর হরিহরের বাড়ি সমবেত হইয়াছেন। জয়কৃষ্ণ সর্বসমক্ষে করজোড়ে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন—"আমি জজ ম্যাজিস্ট্রেট বুঝি না, আপনারাই আমার জজ, আপনারাই আমার ম্যাজিস্ট্রেট। দেশের লোক ব'লে বিশ্বাস করে আমি কিছু না হবে তো দুশো টাকার মাল দিয়েছি ঠাকুরকে, তার দশ টাকার জিনিস আমার বাড়ি পৌঁছোল না! তার ওপর মিথ্যে খবর দিয়ে আমার স্ত্রীপুত্রকে সেই রাত্রে পাঁচ গুণ খরচ করিয়ে উলুবেড়ে পাঠানো,—এগুলো ওঁর মতো ভদ্র সন্তানের উচিত হয়েছে কি না আপনারাই বিবেচনা করুন।"

হরিহর ডাকিলেন, "নিধিরাম।" "আজ্ঞে।" "তোমার কিছু বলবার আছে?"

"আজ্ঞে ভোলাকে জিজ্ঞেস করুন সকলের সামনে ঝুড়িতে কি আছে উনি বলেছিলেন? ঘর শুদ্ধ কর্মচারী সাক্ষী ছিল, যাকে ইচ্ছে ডাকাতে পারেন। বলেছিলেন মেয়ের অসুখের জন্যে বার্লি, লেবু আর গিন্নীর ব্রত উদ্যাপনের জিনিস আছে। তা' সে সব ঠিক পৌঁচেছে কি না খোঁজ নিন। মালসা, কুশাসন, গামছা, কলার পেটো পাছে না পাওয়া যায় সেইজন্যে আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে যোগ করে দিয়েছি। মুটে খরচটাও আমি দিয়েছি ঠাকুরদা।"

হরিহর বলিলেন, "জয়কেষ্ট কি বল?"

জয়কৃষ্ণ বলিলেন—"পাছে ওঁর নিয়ে যাওয়ার মত না হয় সেই জন্যে মেয়ের অসুখের কথা বলেছিলুম, কেবল ও'র দয়া হবে ব'লে। ঝুড়িতে টাকায় দুটো করে কেনা অসময়ের আম ছিল, চার আনায় একটা করে কেনা 'আবার খাব' সন্দেশ ছিল, ফরমাসী নতুন গুড়ের সন্দেশ ছিল,—ঐ রাক্কোশ সব একলা খেয়েছে ঠাকুরদা। আমাকে ধনে প্রাণে মেরেছে!"

নিধিরাম বলিলন—"একা খাইনি, অনেককে দিয়ে খেয়েছি। তাহ'লেই বুঝতে পারছেন ঠাকুরদা, জয়কেষ্টবাবু কি রকম সত্যবাদী লোক। উনি ভাজেন উচ্ছে, তো বলেন পটোল। বিশ্বাস যে উনি আমাকে করেননি, ওঁর যে গোড়া থেকেই ভয় ছিল আমি খাবার জিনিস আছে জানলে ভাগ বসাব—তা এই থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। মোটটিকে চটের সেলাইয়ে যে মোক্ষম বাঁধন দিয়েছিলেন—কার বাবার সাধ্যি খোলে? বিশ্বাস না করলে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ টেঁকে না।"

হরিহর বলিলেন, "যাই হোক, কাজটা ঠিক করোনি। গ্রামের লোক, বন্ধু"—

, নিধিরাম বলিলেন—"দুপুরে রোদে মানুষটা ছ'ক্রোশ রাস্তা হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল গাঁয়ের লোক, বন্ধু, ব্রাহ্মণ। তেষ্টায় প্রাণ টাটা করছে। অন্য কাউকে চেনে না, উনিই ভরসা। উনি একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন না আধঘণ্টা, তারপর এক কথায় তাড়িয়ে দিলেন—একবার খোঁজ নিলেন না, লোকটা খাবে কি, যাবে কোথায়। তারপর যখন দেখলেন পিতৃ পুণ্যে আমার সহায় সম্পদ জুটেছে, হাকিম-জমিদারের সঙ্গে মাখামাখি, তখন ফেরবার মুখে ভদ্রতা করে একটি আধমণি বোঝা কাঁধে চাপিয়ে দিলেন, ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে। আমি ও'র বিনা পয়সার মুটে! নিজের লোক পাঠালে দু' টাকা খরচ হবে, দু'দিন সময় নষ্ট হবে তাই ব্যাগার ধরলেন আমাকে। অনেকের রক্ত শুষে পয়সা করেছেন পাল মশাই, পয়সা ছাড়া তো কিছু চেনেন না, তাই দমকা কিছু খরচ করিয়ে দিলুম, বৌছেলেকে দিয়ে। হ্যাঁ, বাপের ব্যাটা বটে কালীকৃষ্ণ! একদিনে একশ টাকা খরচ করে উলু বেড়ে গেছে; কবরেজ নিয়ে। পাল মশায়ের সম্পত্তি ওই ওড়াতে পারবে। পুত্র পুণ্যে ওঁর ব্রহ্ম শাপটা খণ্ডে গেল। এতে ভালো হ'ল, না মন্দ হ'ল আপনারাই বিচার করুন।"

হরিহর হাসিয়া বলিলেন—"তুমি আবার শাপ দিতে শিখলে কবে হে? অনেক দেশ ভ্রমণ করেছ শুনছি, ও বিদ্যেটা কি কোনো ঋষির আশ্রমে গিয়ে শেখা হয়েছে, নাকি? পাল মশাই, এ যাত্রা আপনি বেঁচে গেছেন তাহ'লে ব্রহ্ম পাশ লাগেনি—জয়কৃষ্ণ মনে মনে গজরাইতেছিলেন। এই লোকটাকে তিনি নির্বোধ মনে করিয়াছিলেন, সে যে এমনভাবে তাঁহাকে সকলের সম্মুখে অপদস্থ করিতে পারিবে তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই! অনন্যোপায় হইয়া রাগ করিয়া বলিলেন—"নিধিরামের আবার শাপ! ঠাকুর তো আপনার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, সে যা বলবে তাই সত্যি! আপনার বাড়িতে যখন উঠেছে তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। আপনার

কাছে বিচার চাওয়াই ভুল হয়েছে। যাক আমার একটা শিক্ষা হয়ে গেল! মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই।"

নিধিরাম হাসিয়া বলিলেন, "বিশ্বাস করলে ঠকতেন না পাল মশাই।"

* * *

নিধিরাম বাড়ির ও সম্পত্তির দখল পাইয়া যেদিন গৃহে প্রবেশ করিলেন সেদিন ভুরিভোজে গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা কেহ বাদ পড়ে নাই। জয়কৃষ্ণ উলুবেড়িয়ায় ছিলেন, নিমন্ত্রণ পাইয়াও আসেন নাই। তাঁহার পত্নী নিধিরামের 'বৌদিদি' সম্বোধনে এবং সনির্বন্ধ অনুরোধে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। শোনা যায়, তিনি বাড়ি ফিরিয়া পুত্রকে বলিয়াছিল, "মুকুজ্যে মুখ পোড়ার আমাদের পোড়ার মুখের মতো টাকা না থাকলে কি হবে নজর আছে। থাইয়ে দাইয়ে পাল্কী ভাড়া করে পাঠিয়ে দিয়েছে,—পাল্কীতে উঠে দেখি এই গরদের সাড়ী। আমি বলি, 'এ আবার কি?' বলে কি না, 'বৌদিদি বাড়িতে এলে মান্য দিতে হয়।' আমি বল্লুম, সে হয় না। আমরা শূদ্দুর, তুমি বামুনের ছেলে। মান্য আবার কি দেবে?' তাতে বলে কি, 'মান্য বলে না নাও, পাপের পাচিত্তির বলেই নাও। অপরাধী আছি, মাপ করতে চেষ্টা কোরো।' শোনো কথা! বলি মরণের কথা রটলে যে মিনষেদের পেরমাই বেড়ে যায়, তুমি তো আমার ভালোই করেছ। মুখ পোড়া বামুন কিছুতেই ছাড়লে না, সাড়ীখানা নিতে হ'ল। তেত্তু বাবাকে বলিস নি যেন, আমি গেছনু, তাহ'লে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড করবে। কালীকৃষ্ণ উদ্গত উদ্গার দমন করিয়া বলিলেন, "পাগল! আমি পরের কথায় থাকি না।" তিনি মাতাকেও বলিলেন না, গোপনে নিমন্ত্রণে গিয়া তিনি একটি মূল্যবান ফাউণ্টেন পেন উপহার পাইয়াছেন।

প্রতীক্ষা

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বিদ্যুৎ শিখার মত দেখা দিয়ে তুমি
চলে গেছ বহুদূরে আস নাই ফিরে,
"শবরী প্রতীক্ষা" করি আজো হেথা আমি
আজো রয় মন মোর তব স্মৃতি ঘিরে।

যৌবন মদির লগ্ন বৃথা যায় বহি
বসন্ত ঘুরিয়া ফেরে দ্বারে বার বার,
বিরহ বৃশ্চিক জ্বালা নির্বিবাদে সহি
ফুলেরা উৎসব করে স্বপ্ন দেখি তার।
ভ্রমর গুঞ্জন করি কাণে কাণে কয়
চন্দ্রিমার দেখা যদি পায় কুমুদিনী
ভরসা রাখিও মনে তোমার কি ভয়
তোমারো প্রভাত হবে কাটিবে যামিনী।

আশ্বাস তাইতো মনে নিরন্তর জাগে,
জীবন উঠিবে ভরি নবছন্দ রাগে।

সেদিন

চৌধুরী ওস্‌মান

অযাচিত দিনগুলি ভেসে চলে ছাপাইয়া কূল,
আয়েসী স্বপন কতো সুদূরের অলস ছায়ায়
ভরে তোলে অনুরাগে সুবাসিত যৌবন মুকুল
কতো না বসন্ত-স্বপ্ন জীবনের শূন্য-পশরায়।
আশার কাকলি ভরা মুখরিত আমার সে-দিন
মসৃণ আলোর বুকে উচ্চকিত—মাথা তুলে হাসে,
দিকে দিকে বাজে যেন নিরবধি অনাহত বীন—
সুর তার ভেসে আসে মর্মরিত দখিনা বাতাসে।

ভেবেছিনু এই মতো কেটে যাবে প্রতিটি নিমেষ
রৌদ্রালস ছায়ালোকে গেয়ে গেয়ে জীবনের গান,
বাসনারে ঢেলে ঢেলে নানা ভাগে অঢেল অশেষ
ফেনায়িত উগ্রগন্ধ প্রাণাসব করে যাব পান।
সহসা আসিলো নেমে লেলিহান দুরন্ত ঝটিকা,
ভগ্ন স্বপ্ন-সৌধ পরে' নাচে আজ ভস্ম মরীচিকা।

ইতিহাস

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

ইতিহাসের ছাত্রটি একমনে পড়ে চলেছে :
...তারপর সমুদ্র স্রোতের মত পাঠানরা এগিয়ে এলো
তারপর মোগলের তরবারী বিদ্যুতের মত কেঁপে গেলো
মারাঠা বর্গী তাতার
ইংরেজের অসির ঝনৎকার
শেষ নেই!

ইতিহাসের ছাত্রটি একমনে পড়ে চলেছে ॥
আমি সাহিত্যের ছাত্র।
মন ফিরিয়ে নিলাম অন্যদিকে
সেখানেও দেখি কি বিরাট অভিযান!
চর্যপদ থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস
মানিক গাঙ্গুলী, মালাধর বসু
আলাওল, কৃত্তিবাস
জেবুন্নিশা, কাশীরাম দাস...
সুরের স্রোত ব'য়ে চলেছে।
একদিকে যুদ্ধ—অন্যদিকে শান্তি।
একদিকে ঝঞ্চা—অন্যদিকে সংগীত॥

এখানেও মাঠের দিকে কতদিন তাকিয়ে দেখেছি :
এসেছে কাল-বৈশাখীর করাল ঝড়
এসেছে শ্রাবণের অবিশ্রান্ত জল
কিন্তু তবু তার পেছনে দেখেছি :
অপরাজিত ফুল আকাশে সাতরংএর রামধনুক
শরতের মাঠেঘাটে লাল-কমল নীল-কমল
সোনার ধানের কবিতায় ভরা নতুন অঘ্রান
মাঠে মাঠে চাষীদের ভাটিয়ালী গান ॥

বক্সা ক্যাম্প

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

আপনারা জানেন যে, চিরদিন কারো সমান যায় না, আমাদেরও যায় নাই। তাই দুঃখের দিন আমাদের দেখা দিতে লাগিল। তারিখটা এখন আর ঠিক স্মরণে নাই, তবে যতটুকু মনে পড়ে সেটা বোধ হয় এই বছরেরই প্রথম ভাগে, প্রথম বিপদটা দেখা দিয়াছিল। ঠিক দেখা না দিয়া দূরে হইতে দাঁত দেখাইয়া অথবা ভ্যাংচি কাটিয়া গেল বলিলেই সত্য ভাষণ হইবে।

বেলা তখন গোটা নয়েক হইবে, পূবের পাহাড় ডিঙ্গাইয়া সূর্য আকাশের অনেকখানি হামাগুড়ি দিয়া আগাইয়াছে, আমরা ব্যারাকের বারান্দায় বসিয়া জটলা করিতেছিলাম। এমন সময় জনপঁচিশেক সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া মার্চ করিয়া গেটের পথে ক্যাম্পে ঢুকিয়া পড়িল।

তিন নম্বরের সামনের মাঠটুকুর কথা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে। সেখানে আসিতেই হাবিলদার অর্ডার দিল, হল্ট। সিপাহীরা থামিয়া পড়িল। তারপর কি অর্ডার দিল তাহা হাবিলদারই জানে, আমরা দেখিলাম সিপাহী পঁচিশজন অর্ধোপবিষ্ট হইয়া বিশেষ একটা ভঙ্গীতে সঙ্গীনমুখো বন্দুক কয়টি আমাদের ব্যারাকের অভিমুখে বাগাইয়া, যাকে বলে তাক করিয়া রাখিল। আমরা ভাবিলাম, ব্যাপার কি!

বীরেনদা একটা চেয়ারে ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলিয়া গড়গড়ায় তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন, "ইয়ং বেঙ্গল গরম সীসার জন্য রেডি হও।" গরম সীসা মানে গুলী।

সে নয় বুঝলাম, কিন্তু হঠাৎ কেন এই যুদ্ধং দেহি ভাব, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। আর, ঐ নাকবোঁচা সিপাহীদের মুখের ভাব দেখিয়া আমাদের কারো মনে কোন সন্দেহ রহিল না যে, শুধু হুকুমের অপেক্ষা, তাহা হইলেই কারণে বা অকারণে হাসিতে হাসিতে উহারা গরম সীসা বর্ষণ করিতে পারে। অনেকের ধারণা যে, ইহাদের হৃদয় বলিয়া কোন দৈহিক যন্ত্র আদৌ নাই, যেমন মাকুন্দদের বা মেয়েদের গোঁফ দাড়ি নাই।

উপেন দাস বলিলেন, "নে বাবা, এখন বন্দুকের মুখগুলো শূন্যের দিক রাখ না, তাক করবার যথেষ্ট সময় পাবি।"—ব্যারাকের ভিতরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা একে একে সকলেই বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, "ব্যাপার কি?"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ব্যাপারটা মালুম হইল। ব্যাপার আর কিছু নয়, সেই যাকে বলে, —হিং টিং ছট্। অপরিচিত কয়েকটি লালমুখো সাহেব গেট দিয়া ক্যাম্পে ঢুকিলেন, সঙ্গে ক্যাম্পের অফিসারগণ, পরে জানা গেল যে, হোমমেম্বর প্রেণ্টিস সাহেব ক্যাম্প পরিদর্শনে আসিয়াছেন। তাই এই সতর্ক আয়োজন

যাক্ ব্যাপারটা সে-যাত্রা ভ্যাংচির উপর দিয়াই গেল। কিন্তু বিপদের ভ্যাংচি, কাজেই মনের নিশ্চিন্ত ভাবের গোড়াতেই একটা কামড় বসাইয়া দিয়া গেল।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থাটা আপনাদের একটু স্মরণ করিতে হইবে, স্মরণে আমিই সাহায্য করিতেছি। আইন অমান্য আন্দোলনের পর 'অর্ধনগ্ন ফকির'-এর সঙ্গে গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট হইয়া গিয়াছে, বড়লাট আরুইন বিদায় হইয়াছেন এবং মাস চারেক হয় লর্ড উইলিংডন দিল্লীর গদিতে আসিয়া বসিয়াছেন। দেশের মনের ভাব, লড়াইতে আমরা প্রায় জিতিয়াছি; আর বিলাতের চার্চিল কোম্পানী এবং এ-দেশে তাদের সরকারী বে-সরকারী জাতভাইরা 'গেল রাজ্য গেল মান' ভাবনায় ম্রিয়মান হইয়া আছেন। নূতন বড়লাট বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়া গান্ধীজীকে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যাইতে সম্মত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গান্ধীজী ১৯৩১ সালের ২৯শে আগস্ট বোম্বাই হইতে লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

গান্ধীজী ভারতবর্ষের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তো বিলাতে রওয়ানা হইয়াছেন, আর এদিকে ব্রিটিশ সরকারী বে-সরকারী দল এই সুযোগে ভারতে বসিয়া ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কাজটা পূর্বাহ্নেই সারিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একটা দিন বাদ গেল, তারপরেই ইংরেজগণ মাঠে নামিয়া পড়িলেন। গান্ধীজী বোম্বে ত্যাগ করিয়াছেন ২৯শে আগস্ট, ৩০শে আগস্ট চট্টগ্রামে পুলিশ ইনস্পেক্টর খান বাহাদুর আশানুল্লাকে নিজাম পল্টন ময়দানে সন্ধ্যাবেলা খেলার জনতার মধ্যে হরিপদ ভট্টাচার্য নামক ১৬ বছরের একটি ছেলে পিস্তলের গুলীতে হত্যা করে। খানবাহাদুর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা তদন্তের তত্ত্বাবধানের চার্জে ছিলেন, বিপ্লবীর হাতে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও শহরের অপরাপর ইংরেজগণ আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন যে, এবার মুসলমান সমাজ ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ও বিদ্বেষ বেশ পাকা ও প্রগাঢ় হইবে এবং ফলে বিলাত হইতে 'অর্ধনগ্ন ফকিরকে' খালি হাতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু সেদিন ও সে-রাত্রে চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে কোন বিক্ষোভই দেখা গেল না। তবে কি হিসাবে ভুল হইল?

বাধ্য হইয়া হিসাব ঠিক করিতে ইংরেজের গোপন হস্ত সক্রিয় হইল। গ্রামে গ্রামে নিমন্ত্রণ গেল যে, লাঠিসোঁটা লইয়া দলে দলে সকলে যেন শহরে আসে, কারণ খানবাহাদুরের শব লইয়া শোভাযাত্রা করা হইবে। পরদিন পঞ্চাশ হাজার মুসলমন জনতা শব-শোভাযাত্রার জন্য সহরে সমবেত হইল, হাতে তাদের লাঠিসোঁটা।

তারপরের সংবাদ সংক্ষিপ্ত। সিগন্যাল দেওয়া হইল—চট্টগ্রাম শহরে হিন্দুর দোকান বাড়ি-ঘর লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ, অত্যাচার, নির্যাতন ইত্যাদিতে নরকের মুখের ঢাকনী খুলিয়া গেল। বে-সরকারী ইংরেজ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও পুলিশবাহিনী এই দানবীয় উৎসবে বীভৎস উল্লাসের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। শহর হইতে মফস্বলেও এই নারকীয় অগ্নি বহন করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

বক্সা ক্যাম্পে আমাদের মনের আকাশেও মেঘ জমিল, আমরা কোথায় চলিয়াছি এবং এ-দেশের কপালে না জানি আরও কি ভয়াবহ দুঃখ ও দুর্গতি লেখা আছে! ইংরেজের চরিত্রের আর নূতন করিয়া বিচার বা সমালোচনা আমরা করিলাম না। আমরা ভাবিত হইলাম অন্য কারণে।

চট্টগ্রামে মুসলমান সমাজের যে মনোভাব ও চরিত্র সেদিন ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই আমাদের বিশেষভাবে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতা কোন স্তরে ও কত অন্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে যে, এত অনায়াসেই বিদেশীদের হাতে অগ্নি-ইন্ধন হইয়া দেশের ঘরেই আগুন লাগাইতে পারে! জাতীয়তা ও স্বাধীনতার কত বড় বিপজ্জনক শত্রু যে দেশের ঘরেই কুণ্ডলী পাকাইয়া গুপ্ত রহিয়াছে, সেদিন আমরা বুঝিতে পারিলাম। কোন ভয়াবহ ভবিষ্যতের প্রথম ও পূর্ণ রিহার্সেল যে সেদিন চট্টগ্রামে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে অবশ্য ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত দেশকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

আমাদের ভাগ্যের আকাশে ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। বে-সরকারী ইংরেজ মহলে প্রকাশ্যে অভিমত ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, বিপ্লবীদের শায়েস্তা করা অশু প্রয়োজন। 'ভারত-বন্ধু' স্টেটসম্যান পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পরামর্শ দিলেন যে, বন্দিশিবির হইতে নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের বাছিয়া লইয়া দেয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড় করানো হউক। তারপর? তারপর আর বিশেষ কিছু নহে, গুলী করিয়া ইহাদের একটি একটি করিয়া হত্যা করা হউক। লাভ? লাভ হইবে এমন শিক্ষালাভ যে, জীবনে এদেশে কেহ আর কখনও বিপ্লবী হইবার কথা মনে আনিতেও সাহস পাইবে না, বিপ্লব তো অনেক দূরের কথা।

আমরা বাঁচিয়া আছি দেখিয়া মনে করিবেন না যে, এই পরামর্শ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। চট্টগ্রামের আগুন ভালো করিয়া নেভেও নাই, চট্টগ্রামের দিন পনর পরেই এই পরামর্শ বাস্তবে কার্যকরী করা হইয়া গেল।

১৭ই সেপ্টেম্বর পত্রিকার খবর পড়িয়া বক্সা ক্যাম্পে মৃত্যুর কালো ছায়া নামিয়া আসিল। খবরে প্রকাশ যে, আগের দিন রাত্রে হিজলী বন্দিশিবিরের মধ্যে ঢুকিয়া সিপাহীরা বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করিয়াছে। রাত্র তখন সাড়ে নয়টা হইবে, কেহ কেহ আহার করিতে-ছিল, কেহ কেহ বা শয়ন করিয়াছিল, কেহ কেহ পড়াশুনা বা গল্পগুজব করিতেছিল, এই সময়ে এই আক্রমণ। সন্তোষ মিত্র শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিতেই তাঁহাকে তলপেটে গুলী করিয়া মারা হয়, আর তারকেশ্বর সেনকে কপালে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। গুলী ও বেয়নেটের চার্জে পঁচিশজন বন্দী মরণাপন্ন ভাবে আহত হয়।

খবরে সমস্ত ক্যাম্প ম্রিয়মান ও স্তব্ধ হইয়া গেল। আমারও এক ভাই যে হিজলী ক্যাম্পে বন্দী, এই কথাটা নিজের মনে আনিতেও ভয় পাইতেছিলাম। আমাদের আহার বন্ধ হইয়া গেল। হিজলী গুলীবর্ষণের তদন্তের প্রতি-শ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা অনশন আরম্ভ করিলাম। সাতদিনের মধ্যেই খবর আসিল যে, এই ঘটনার তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা অনশনব্রত ভঙ্গ করিলাম।

ক্যাম্পের নেতৃস্থানীয়দের আশঙ্কা ছিল যে, এই ঘটনায় বক্সা ক্যাম্পে বন্দীদের প্রতি-হিংসা প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে, হয়তো এখানেও ভয়ানক কিছু ঘটিতে পারে। কিন্তু তেমন কোন হঠকারিতা এখানে বন্দীদের পক্ষ হইতে কেহই দেখায় নাই। বঙ্গের বিপ্লবী দল-গুলির নায়কগণ প্রায় সকলেই বক্সা-ক্যাম্পে থাকায় শিবিরে শৃঙ্খলা বস্তুটি ছিল, তাই হিজলীর পুনরাবৃত্তি আমাদের অদৃষ্টে দেখা দিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের বন্দিজীবন হইতে আনন্দ ও সহজ ভাবটুকু হিজলীর ঘটনায় লোপ পাইয়া গেল। সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইতে আমাদের বেশ কিছুদিন লাগিয়াছিল।

দুঃখের দিন আমাদের শেষ হইল না। ক্যাম্পের কম্যান্ডান্ট হইয়া আসিলেন ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ সুপার কোট্রাম সাহেব। এই বেঁটে খাটো লোকটি, যাঁকে আমাদের সন্তোষ-বাবু বা রবিবাবু এক চপেটাঘাতে সাবাড় করিতে পারেন, তিনিই ঢাকাতে এত অত্যাচার করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। ইঁহার হাতে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইয়াছেন, এমন অনেকেই বক্সা ক্যাম্পে তখন ছিলেন। তাঁহাদের কথার সত্যতা দুদিন না যাইতেই আমরাও স্বীকার পাইতে বাধ্য হইলাম। এতবড় পাজী মানুষ জেলদারোগাদের মধ্যেও আমরা খুব কমই দেখিয়াছি।

কোট্রাম সাহেবের ছবি বা কীর্তি স্মরণে উদিত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা বড় বিশেষ করিয়া আমার মনে জাগে। কথাটি এই, দুর্বল ব্যক্তির হাতে কদাচ ক্ষমতা দিতে নাই, দিলে সর্বনাশ অনিবার্য। বিশেষ করিয়া যাহারা অতি সহজেই বিচলিত হয়, বিপদের সম্ভাবনাতেই যাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়, তেমন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেওয়ার মত বিপজ্জনক ব্যবস্থা আর হইতে নাই।

টাকার যেমন একটা গরম আছে, শক্তিরও তেমনি একটি গরম আছে। শক্তিকে যাহারা সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে বহন করিতে পারে না, তাহারা বহুর ক্ষতি তো করিবেই, নিজেরও ক্ষতি তাহারা করিয়া বসে। শক্তি পাওয়াই যথেষ্ট নহে, শক্তির উপর আধিপত্য অর্জিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।

এইজন্যই ভারতীয় সাধক সমাজে শক্তি অর্জন যেমন সিদ্ধি বলিয়া পরিগণিত হয়, শক্তি বর্জন তাহার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর সিদ্ধি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। শক্তি বর্জন মানে শক্তিকে নিজের স্বভাবের মধ্যে সংহরণ করিয়া গোপন করা। যে-শক্তি নিয়ন্ত্রিত ও সংযত নহে, সে-শক্তির স্বভাবে প্রলয় ও অকল্যাণ নিহিত আছে, ইহার দৃষ্টান্ত ভারতীয় পুরাণের দৈত্য ও অসুরগণ। শক্তির সিদ্ধি তাহাদের ছিল, কিন্তু সে শক্তিকে শান্ত করিয়া দেবশক্তির কল্যাণ স্বভাবটুকু আয়ত্তগত করিবার কৌশলটুকু তাহারা জানিত না। আমার বহুদিনের বদ্ধমূল বিশ্বাস, সৃষ্টিতে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান, যার চিত্ত সর্বাবস্থায় শান্ত ও সমাহিত।

কোট্রাম সাহেবের প্রসঙ্গে শক্তির এই তথ্যটুকুর কথাই আমার বার বার মনে হইত এবং এখনও লিখিতে গিয়া আবার মনে পড়িতেছে। লোকটি অত্যন্ত নার্ভাস্ প্রকৃতির, অল্পেই বিচলিত হইয়া পড়া ছিল তাঁহার স্বভাব। তাই আমরা ভয়ে ভয়ে থাকিতাম যে ব্যাটা না জানি কখন কি কাণ্ড ঘটাইয়া বসে।

কোট্রাম সাহেব যে কি প্রকৃতির মানুষ, তাহা তাঁহার আগমনের দিন কয়েকের মধ্যে টের পাওয়া গেল।

দুর্গের পশ্চিম পাদমূলে ঘেঁষিয়া যে ঝরণাটি প্রবাহিত ছিল, তাহা হইতেই আমাদের স্নানাহার ইত্যাদির প্রয়োজনীয় জল সঞ্চয় করা হইত। একটা ইঞ্জিন ঘর ছিল, তাহার সাহায্যেই পাম্প করিয়া জল আনিয়া প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে মজুত করা হইত। ইঞ্জিন ঘরের মুখোমুখী ঝরণার অপর তীরে বকসার পোস্ট অফিস, মাঝখানে কাঠের একটা চওড়া পুল, দুর্গ হইতে এই পথেই বক্‌সা স্টেশনে যাইবার রাস্তা।

ভোরের দিকেই ইঞ্জিনটা বিগড়াইয়া গেল। ক্যাম্পে জলাভাব দেখা দিল। ছুটিয়া কুলীরা টিনে করিয়া জল আনিয়া রান্নাবান্নার প্রয়োজন-টুকু নির্বাহ করিয়া দিল। সমস্যা দেখা দিল স্নানের জলের। তিন চৌকার তিন ম্যানেজার চিঠি দিলেন যে, ঘণ্টা দুয়েকের জন্য খিড়কীর গেটটা খুলিয়া দেওয়া হউক, আমরা ঝরণার জলে স্নান সারিয়া আসি।

প্রস্তাবটা মোটেই অযৌক্তিক বা আদৌ নূতন ছিল না। একবার এই ঝরণাটা প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছিল, পাম্পের সাহায্যে যে-জলটুকু পাওয়া যাইত, তাহা রান্নাবান্না ইত্যাদি গৃহস্থালীতেই ব্যয় হইয়া যাইত। তখন এই খিড়কীর দরজাটা ঘণ্টা কয়েকের জন্য খোলা হয়, আমরা দল বাঁধিয়া নীচের বড় ঝরণাটায় স্নানাবগাহন ক্রিয়া দিনকতক করিয়াছিলাম। কিন্তু কোট্রাম সাহেব তিন ম্যানেজারের চিঠির কোন প্রত্যুত্তরই দিলেন না।

ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পার হইল, সূর্যও আকাশের তুঙ্গে স্থির হইয়া তপ্ত-রৌদ্র বর্ষণ করিতেছিল। কাজেই বাবুদেরও মাথার তাপ সর্বোচ্চ পয়েন্ট স্পর্শ করিয়া বসিল। আমরা অধিকাংশেই বাঙ্গাল, জলের দেশের মানুষ, আমাদিগকে জল ও স্থল উভ-চরই বলা চলিতে পারে। বর্ষার দুইটা মাস তো আমরা ঘরবাড়ী সমস্ত কিছু লইয়া জলেই ভাসমান জীবন যাপন করিয়া থাকি। স্নানটা আমাদের চাই-ই। তাপটা তাই আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র ধর ধর হইল, তার কিছু উত্তাপ অফিস পর্যন্ত পৌঁছিল।

সাহেব অবশেষে অর্ডার দিলেন, দশজনের এক একটি দল ছাড়া হইবে, তাহারা ফিরিয়া আসিলে আবার দশজন স্নানার্থে নির্গত হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সাহেবের ভুল ভাঙ্গিল যে, এই ব্যবস্থায় সকলের স্নান শেষ হইতে সায়াহ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কাজেই খিড়কীর গেট দেড় ঘণ্টার জন্য খুলিয়া রাখার অর্ডারই শেষে প্রদত্ত হইল।

কোট্রাম সাহেব দুই কারণে গেট খুলিতে রাজী হন নাই। প্রথম, বন্দীদের বাহিরে আনা বড়ই বিপজ্জনক ঝুঁকি, এই পাহাড়ের কোন পথে কে সরিয়া পড়ে, তাহার কোন স্থিরতা

নাই। দ্বিতীয়, ইঞ্জিনটাকে একটু ঠুকিয়া-ঠাকিয়া লইলেই সে আবার চলৎশক্তি ফিরিয়া পাইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

কাপড়-গামছা লইয়া খিড়কীর পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তা ধরিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। দুই ধারে পাহাড়ের উপরে এখানে সেখানে রাইফেল হস্তে সিপাহীরা সামরিক ঘাঁটি আগলাইয়া আছে। ইঞ্জিন ঘরের কাছা-কাছি আসিয়া পঁড়িলাম।

দেখিলাম, পুলের রেলিং দুইটা আলনার কাজ দিয়াছে, বাবুদের কাপড়, গেঞ্জি, সার্ট ও টাওয়েল সেখানে ঝুলিতেছে। আর একটু আগাইতেই দেখি যে, ঝরণার জলে বাবুরা চীৎ হইয়া আছেন, মাথাটা পাথরের উপাধানে রক্ষিত।

অবশেষে স্থানে পৌঁছিয়া গেলাম। গিয়াই থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলাম, ব্যাপার গুরুতর।

(ক্রমশঃ)

সর্দির কারণ ও তাহার প্রতিকার

ডাঃ ট্রেভর আই উইলিয়ামস্‌

মানুষের নানা অসুখের মধ্যে সর্দি একটি সমস্যা। এর সঠিক চিকিৎসাও নেই। অনেকে তাই বিরক্তির সংগে বিদ্রূপ করে বলে থাকেন যে ডাক্তারী চিকিৎসায় সর্দি সারতে যদি এক সপ্তাহ লাগে ত বিনা চিকিৎসায় লাগবে সাতদিন। দুঃখের বিষয় কথাটি সত্য। সর্দির উপদ্রব নিবারণের জন্য এতকাল অনেক ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে এবং এই অসুখের ফলে প্রতি বছর দেশের উৎপাদন প্রচেষ্টায় কাজের সময়ও কম নষ্ট হয়নি।

গত আড়াই বছর ধরে বৃটেনে স্যালিসবারীর "হার্ভার্ড হাসপাতালে" এই সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে। যদিও রোগের চমকপ্রদ প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, তবু মেডিক্যাল রিসার্চ 'কাউন্সিল' এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী দপ্তরের কর্তৃত্বাধীনে যে 'ইউনিট'টি সেখানে কাজ করছে তাদের গবেষণার ফলাফল আশাপ্রদ।

এই গবেষণার কাজে একটা সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, শিম্পাঞ্জি ছাড়া অন্য কোন জন্তুর মধ্যে এই রোগ জন্মানো যায় না, আবার এই অসুখও এমন কিছু কঠিন নয় যে, রোগীকে হাসপাতালে বা ক্লিনিকে রেখে সময় নিয়ে যত্নের সংগে পরীক্ষা করা সম্ভব। তার ফলে গবেষণার কাজও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। স্যালিসবারীতে এইবারই প্রথম মানুষের উপর ব্যাপক গবেষণা করা সম্ভব হয়েছে, গত আড়াই বছরে প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক দশদিন ধরে হাসপাতাল থেকে এই কাজে সাহায্য করেছেন।

হাসপাতালে আসার পর তাদের মধ্যে যাতে বাইরে থেকে রোগ সংক্রমণ না হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, কারণ তাহলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। এমনি করে মানুষের উপর দিয়ে গবেষণার কাজ চললেও রোগপ্রবণ জন্তুর সন্ধান বন্ধ রাখা হয়নি যদিও তা অসাধ্য। সজারু, বাঁদর, নকুল, ইঁদুর এবং আরও অনেক রকম জন্তু নিয়ে কাজের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কারো মধ্যে এই রোগ জন্মানো সম্ভব হয়নি, এরা সবাই মানুষের এই বিরক্তি-কর অসুখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পরীক্ষার সময় দেখা গিয়েছে যে, রোগ প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা আগেই মানুষের মধ্যে রোগের বিষ ঢুকে রয়েছে। অনেককে বাইরে থেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হলেও তারা আসলে হয়ত রোগের বিষ বহন করে বেড়াচ্ছে।

নাকের শ্লেষ্মার মধ্যে যে বীজাণু থাকে, তার কাজ করার শক্তি অত্যন্ত বেশী। এই শ্লেষ্মাকে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে পারলে তার সংক্রমণ ক্ষমতা দু'বছর বা তারও বেশী দিন পর্যন্ত থাকতে পারে, অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে এবং সেদিকেও তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

মুরগীর ডিমের মধ্যে একবার সর্দির বীজাণু প্রবেশ করিয়ে বীজাণু অনুশীলনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। যে বীজাণু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পরম স্বাস্থ্যবান লোককেও কাবু করতে পারে তা মুরগীর ভ্রূণের কোমল কোষ-সংস্থার মধ্যে কোন কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

সাধারণতঃ মানুষের সর্দির কারণ সম্বন্ধে প্রচলিত কতকগুলি ধারণা আছে—অনেকের মতে যারা সর্দিতে ভুগছে তাদের কাছে থেকেই সর্দি সংক্রামিত হয়, আর একদল মনে করেন যে, পায়ে ঠাণ্ডা লাগলে বা বাইরের হাওয়ার ঝাপটায় সাধারণতঃ সর্দি হয়ে থাকে। স্যালিস-বারীতে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে উপরের দুই রকমের মতই প্রায় ঠিক।

সর্দির কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে সর্দির বীজাণুর কথাই প্রথম মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সর্দি তখনই হয় যখন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা সাময়িক ভাবে কমে যায় বা কেউ যদি যে-লোকটি সর্দিতে ভুগছে এবং অনবরত হাঁচছে তার সংস্পর্শে আসে।

এই সব লোক সর্বঘটে বর্তমান। রুমালও রোগ সংক্রমণের আর একটা বড় কারণ। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, রোগের বিষ এবং বীজাণু সমান ভাবে রুমালে বাহিত হয়ে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংক্রমণের এই বিপদ এড়ানো খুবই সহজ যদি রুমালে সব সময় প্রয়োজনীয় রোগ-বিনাশক ঔষধ লাগিয়ে রাখা যায়।

সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সকলের মধ্যে সমানভাবে নেই, তা ছাড়া প্রত্যেক বছরে মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতার তারতম্য দেখা যায়। স্যালিসবারীতে পরীক্ষার সময় স্বেচ্ছাসেবকদের দেহের মধ্যে হাজার হাজার গুণ বেশী শক্তি-সম্পন্ন রোগের বিষ প্রবেশ করিয়ে দেখা গিয়েছে যে, তাতে পাঁচজনের মধ্যে দু'জনের সেই সময়ের মত কিছুই হয়নি, তাদের মধ্যে অবশ্য অনেকেই আবার সারা বছর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারেনি।

অনেকের ধারণা, একবার সর্দিতে ভোগার পর কিছুদিন আর রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে না, কিন্তু পরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে যে, স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে কেউ কেউ একবার রোগ-ভোগের পর পনের দিনের মধ্যে আবার রোগাক্রান্ত হয়েছে।

অনেকের আবার বিশ্বাস যে, সর্দি একান্ত ভাবে শীতকালীন রোগ, কারণ ঠাণ্ডার মধ্যেই তার জন্ম। স্যালিসবারীর গবেষকরা অবশ্য তা স্বীকার করতে রাজী নন। 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজে' ডিসেম্বর মাসে যখন মধ্য গ্রীষ্মের তুলনায় তাপ সামান্য কম থাকে, তখনও সর্দির ব্যাপক আক্রমণ হতে দেখা গিয়েছে। অন্যান্য দেশেও বর্ষারম্ভে সর্দির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। অতএব রোগ সংক্রমণের ভয় গ্রীষ্মকালেও বর্তমান, তখন তার পরিমাণ কম হওয়ার কারণ এই যে, মানুষে সাধারণতঃ সেই সময় বন্ধ ঘরের মধ্যে ভীড় করে থাকে না, বাইরের মুক্ত হাওয়ায় তাদের বেশীর ভাগ সময় কাটে এবং মুক্ত হাওয়ায় রোগ সংক্রমণের ভয় অনেক কম।

স্যালিসবারীর গবেষণাগারে যাঁরা আজ এই নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা করছেন, তাঁরা হয়ত এখনও সর্দির প্রতিষেধক সম্পর্কে সঠিক কিছু নির্ণয় করতে পারেননি, কিন্তু তা হলেও তাঁদের এই গবেষণার ফলাফল যে অদূর ভবিষ্যতে একদিন নূতন পথের সন্ধান দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতের স্বাধীনতা ও তাহার পর

শ্রীঅবনীনাথ রায়

আজি এখানকার সাহিত্য সভায়* একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। প্রবন্ধটি ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে। যে সভায় প্রবন্ধটি পড়ি সেখানেই আলোচনা প্রসঙ্গে তর্ক তুমুল হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তী সভায় এই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আরো প্রবন্ধ পড়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা বোঝা যায় বিষয়টি সম্বন্ধে অনেকে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের অবশ্য কোন মিল নাই। বরঞ্চ মনে হয় তাঁহাদের মনোভাবের মধ্যে অনেক গলদ (confusion) রহিয়াছে। সুতরাং বিষয়টির ব্যাপকতর আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

আমার প্রবন্ধে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং যাঁহারা এই যুদ্ধের পুরোভাগে নেতৃ-স্থানীয় হইয়া এই স্বাধীনতালাভকে সম্ভব করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আনুগত্য জানাইয়াছিলাম। সেই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দই আজ দেশরক্ষার এবং দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম যে দেশে দারিদ্র্য, দুঃখ, অস্বাস্থ্য, চোরাবাজার, নিত্য ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্যের এবং বস্ত্রের মূল্য-স্ফীতি প্রভৃতি সব রকম অসুবিধাই রহিয়াছে ইহা একেবারে স্বীকার্য, কিন্তু তবু রাষ্ট্রের কর্ণধারদিগকে সময় দিতে হইবে। নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত চাপ রাষ্ট্রের মাথার উপর নিক্ষেপ করিয়া রাষ্ট্রপতিদিগকে অযথা বিব্রত করিবার সময় এ নহে।

এই মতের প্রতিবাদ হইয়াছিল। যাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে দুইটি লক্ষণ চোখে পড়ে—(১) দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে মূল্য নিরূপণের পার্থক্য এবং (২) দেশের নেতৃবৃন্দের উপর আস্থা এবং সহানুভূতির অভাব।

দেড়শত পৌণে দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ আধিপত্যের পর তাহার যে অবসান হইল, ভারতবর্ষ যে তাহার পূর্ব-গৌরব ফিরিয়া পাইল, সে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এই ঘটনা উপরোক্ত সমালোচক শ্রেণীর নিকট যেন বিশেষ কোন অর্থপূর্ণ ব্যাপারই নহে। ইহা যেন প্রতিদিনকার ডাল-ভাত খাওয়ার মতই একটা সাধারণ ঘটনা। এইরূপ মনোভাব যাঁহাদের হয় তাঁহাদের মনের অন্তস্তল খুঁজিলে দেখা যাইবে দেশের পরাধীনতার আমলে তাঁহারা ইহার তিক্ততা, ইহার অযৌক্তিকতা, ইহার সর্বগ্রাসী নাগপাশ আদৌ অনুভব করেন নাই। এখনো এমন অনেক লোকের সন্ধান পাইয়াছি যাঁহারা বলিয়াছেন ব্রিটিশ রাজত্বের আমলেই তাঁহারা ভাল ছিলেন, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন। তখন চোরাবাজারও ছিল না, জিনিসও অগ্নি-মূল্য ছিল না, চারিদিকে এমন ঘুষ লওয়া প্রভৃতি অনাচারও ছিল না। হয়ত ছিল না, কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ দুর্ভাগ্যকে যাঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না, বিজাতীয় শক্তির নিকট পরাভবকে যাঁহারা বিছার কামড়ের মত সর্বাঙ্গে অনুভব করেন না, তাঁহাদের নিকট ভারতের স্বাধীনতা লাভের বার্তা কোন আনন্দই বহন করিয়া আনিবে না, এ কথা সত্য। তাঁহারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকাকেই জীবনের চরম থাকা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন,

সাহেব প্রতিদিন অপমান করিয়াও যদি মাসে এক হাজার টাকা বেতন দেয় তবে তাহা হাসিমুখে গ্রহণ করাকেই তাঁহারা পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। কাজেই এই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার ব্যতিক্রমকেই তাঁহারা মন্দভাগ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট ভারতের স্বাধীনতা লাভ নামক রাষ্ট্রীয় উত্থানকে মূলধন করিয়া কোনরূপ উল্লাস প্রকাশ করিতে যাওয়াই বৃথা—কেননা মানুষকে আর যে জিনিসই দেওয়া যাক না কেন, গৌরব-বোধ করিবার শক্তি দেওয়া যায় না, দেহে ইনজেক্ট (inject) করিয়া দিবার বস্তু এ নহে—ইহাকে অর্জন করিতে হয়। দেশ মাতৃকার ভাগ্যবশে ভারতবর্ষে অধুনাতন সময়ে বেশির ভাগ লোক (majorty) এই শ্রেণীর নহে—কেননা সেরূপ হইলে দেশকে জড়তার চিরান্ধকারে নিদ্রামগ্ন হইয়া থাকিতে হইত—তাহাকে জাগরিত করা সম্ভব হইত না।

দ্বিতীয় কথা দেশের নেতৃবৃন্দের উপর আস্থা এবং সহানুভূতির অভাব। অনেকে এরূপ ভাবে কথা বলেন যেন জবাহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল বা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাদের ইয়ার—তাঁহাদের সমতুল্য। বিদেশী শক্তির রাষ্ট্র-নায়কদের সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে এই অতি পরিচয়ের (Familiarity) ভাব ছিল না—সেখানে প্রতিপদে বিজাতীয় ভাষা, বর্ণ, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি পরস্পরের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিত। কিন্তু জবাহরলাল বা প্যাটেলকে ঘরের লোক মনে করার পক্ষে কোন বাধাই নাই। যাঁহারা আবার জবাহরলাল বা প্যাটেলকে তাঁহাদের প্রাক্ জীবনে দেখিয়াছেন অথবা তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে দেশ-সেবা করিয়াছেন কিংবা এক সঙ্গে জেলে ছিলেন তাঁহাদের ত কথাই নাই। তাঁহারা মনে করেন জবাহরলাল, প্যাটেল প্রভৃতি বরেণ্য দেশনায়ক তাঁহাদেরই সম-শ্রেণীর—বুদ্ধির, হৃদয়বৃত্তির এবং দক্ষতার পর্যায়ে তাঁহাদের গোত্র-সামঞ্জস্য আছে। নিজেদের বদলে উঁহারা যে দেশনায়ক হইয়াছেন ইহা কেবল ভাগ্যের ক্রূর পরিহাস মাত্র। এই শ্রেণীর আত্মম্মন্যতাকে ঠেকাইয়া রাখা শক্ত—কেননা ইহার মধ্যে মানুষের খানিকটা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিবার তৃপ্তি আছে। শরৎচন্দ্রের "গৃহদাহে" একটা লাইনের কথা মনে পড়িতেছে। সুরেশ অচলাকে বলিতেছে যে সময় দিয়া মহিমকে পরিমাপ করা যায়, সুরেশকে করা যায় না। এক মুহূর্তের মধ্যে সুরেশের মনে একটা খণ্ড প্রলয় হইয়া যায়—সময়ের হিসাব তার সঙ্গে তাল রাখিতে পারে না। জবাহরলাল, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি মনীষীদের সম্বন্ধেও সেই কথা। তাঁহাদের জীবনে যে খণ্ড প্রলয় হইয়া গিয়াছে আমরা তাহার খবর রাখি না। আমরা তাঁহাদের যে কালে জানিতাম তখন যে অবস্থায় ছিলাম এখনো সেই অবস্থায় আছি। আমাদের মন স্থাণু—আমরা কালের গতিবেগের সঙ্গে গতি-সম্পন্ন হই নাই। দুইজনেরই মন যুগপৎ সচল না হইলে একে অন্যের বিচার করিতে পারে না। এই কথাটাই উক্ত সমালোচকবর্গের নিকট সবিনয় উপস্থাপিত করিতে চাই।

তবে এই দুই শ্রেণীর মনোভাবাপন্ন লোকের সঙ্গেও কোন ঝগড়া ছিল না। কেননা দেশের সব লোকই যে এক মনোভাবাপন্ন হইবেন এমন ত কোন কথা নাই। কিন্তু যখন তাঁহারা এই বিষয় লইয়া সমালোচনা করেন তখন এ কথা তাঁহাদের স্মরণীয় যে এই সমালোচনায় তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। ইহা মানসিক ডিসিপ্লিনের অভাব বা এক প্রকারের ব্যাধি। দেশের কল্যাণ অকল্যাণে যাঁহাদের কিছু আসে যায় না, দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তিতে যাঁহাদের কোন গৌরববোধ নাই, তাঁহারা দেশের ভালমন্দ সম্বন্ধে কোন পরামর্শ দিতে পারেন না—দিলেও তাহা গ্রহণীয় নয়। আগে তাঁহারা দেশকে মাতৃভূমি বলিয়া চিনিতে শিখুন দেশ-বাসীর দুঃখে দুর্দশায় অপমানে একাত্মতা বোধ করুন, তারপর তাঁহাদের সমালোচনা করিবার কিংবা পরামর্শ দিবার অধিকার জন্মিবে। নয়ত এই পরামর্শ কেবল নিন্দুকের বাগ-বিতণ্ডায় পরিণত হইবে।

---

* 'দেশ' ১৪ই আগস্ট ১৯৪৮ (স্বাধীনতা সংখ্যা)

দেশনায়কদের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নাই তাঁহারা তাঁহাদের প্রবর্তিত কর্মপন্থায় কোন গুণ দেখিতে পাইবেন না—কেবল দোষই তাঁহাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করিবে। কারণ শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতিই মানুষকে সত্য-দৃষ্টি দিয়া সত্য দেখিতে সাহায্য করে। অতএব দেশনায়কদের কার্যের বা চিন্তাধারার যথাযথ বিচার করিতে সক্ষম হইবার জন্য আগে তাঁহাদিগকে নেতৃবৃন্দের উপর আস্থা স্থাপন করিতে এবং মনে শ্রদ্ধা পোষণ করিতে শিখিতে হইবে।

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই আমরা একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। আমরা হাতে হাতে স্বর্গ পাইতে চাই, যদিচ সেজন্য আমরা বিন্দুমাত্রও সাধনা করি নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমগ্র য়ুরোপে যে আর্থিক শোচনীয়তা আরম্ভ হইয়াছে সেদিকে আমাদের বিন্দুমাত্র খেয়াল নাই—ভাবিতেছি একমাত্র আমরাই বুঝি নানা-ভাবে কষ্ট পাইতেছি। ইংরেজ চলিয়া গেলেও মন আমাদের কিছুমাত্র বদলায় নাই—বিচারের মানদণ্ড সেই আমলের মতই আছে। এখনো পথেঘাটে দেখিতে পাই কোট-প্যাণ্ট পরিহিত মানুষই ধুতি-চাদরের চেয়ে বেশি সমাদর লাভ করে। ইংরেজি ভাষার এখনো একাধিপত্য রহিয়াছে—ইংরাজি সংবাদপত্রের প্রচলন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের চেয়ে বেশি। বিদ্যায়তনে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো ইংরাজি ভাষায় বেশি কথাবার্তা বলিতে শুনিতে পাই। আমরা মনের দিক দিয়া, ব্যবহারের দিক দিয়া বিন্দুমাত্র বদলাইব না, অথচ প্রত্যাশা করিব জগৎ আমার সর্ববিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া দিক—ইহা কি ন্যায্য?

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন জবাহরলালের প্রশংসা করিয়াছেন শুনিয়া জনৈক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন যে উভয়ে পরস্পরের পিঠ চুলকানি সভার সভ্য—আজ ইনি ওঁর প্রশংসা করিতেছেন, কাল উনি এঁর প্রশংসা করিতেছেন। ইহাকেই আমি ইতিপূর্বে মানসিক ডিসিপ্লিনের অভাব বা ব্যাধি নাম দিয়াছি—এই না ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবার অভ্যাস। আমাদের তথা-কথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার এই দোষ বেশিমাত্রায় বর্তমান—কেন না তাঁহারা জানেন তাঁহারা অকুতোভয়ে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। দেশে বিদেশে রাজদূত (Ambassador) নিয়োগ করা সম্বন্ধেও জবাহরলাল পক্ষপাতদোষে দুষ্ট এমন কথা কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছি। এই সব উক্তির মধ্যে এমন একটা কদর্থ করিবার প্রয়াস আছে যে ইহার উত্তর দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু এই ধরণের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কথাবার্তা সমাজজীবনে অপূরণীয় ক্ষতি বহন করিয়া আনে বলিয়া উত্তর দিবার প্রয়োজন হয়। নচেৎ ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, যিনি নিজে যেমন অপরকেও তিনি সেই মানদণ্ডে বিচার করিয়া থাকেন।

অপরিমিত ভোগ-সুখের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও যিনি ভোগলালসাকেই জীবনের কাম্য বলিয়া মনে করেন নাই, ধনীর একমাত্র দুলাল হইয়াও যিনি যৌবনে তপস্বীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের পারম্পরিক তপশ্চর্যার অমিত প্রভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সূর্যের মুখ দেখিতে সক্ষম হইয়াছে—তাঁহার কার্যের বিচার আমরা বিনা চিন্তায় এক লহমায় করিয়া ফেলি। যিনি এখনো দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা সুকঠিন পরিশ্রমের দ্বারা দেশসেবায় নিরত রহিয়াছেন, যাঁহার সুদূরপ্রসারী চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাপরিসর (imaginative) আন্ত-র্জাতিক নীতির (Foreign policy) বলে আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, যিনি ভারতবর্ষ আজ জগতের সভায় সম্মানের উচ্চ রাশিয়ার সর্বাধ্যক্ষ (Dictator) জোসেফ স্ট্যালিন এবং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হ্যারি ট্রুম্যানের দ্বারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ (greatest Statesman of the World) বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন, আমাদের ধারণা তাঁহার চেয়ে আমরা দেশকে বেশি ভালবাসি বা তার মঙ্গল অমঙ্গল বেশি বুঝি।

কিছুদিন পূর্বে অমৃতবাজার পত্রিকায় জবাহরলাল সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য লাইন ছাপা হইয়াছিল। লাইনটি গান্ধীজী সম্বন্ধে —The master whom he never bowed but always obeyed—গুরু যাঁহার পদধূলি তিনি (জবাহরলাল) কখনো গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু যাঁহার আদেশ তিনি সর্বদা পালন করিয়াছেন। জবাহরলালের চরিত্রে যাঁহারা কিছু কিছু স্বতঃবিরোধ দেখিতে পান এই লাইনটি জবাহরলালের চরিত্র উদ্ঘাটনে তাঁহাদের পক্ষে চাবিকাটির সাহায্য করিবে। জবাহরলাল নিয়মিত চরকা কাটেন কিনা জানি না, তিনি অহিংসায় যে পুরাপুরি বিশ্বাস করেন না তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি যে মহাত্মাজী প্রবর্তিত সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই তাহার প্রমাণ আছে। সংবাদপত্রে সকলে দেখিয়া থাকিবেন যে য়ুরোপীয় সভ্যতায় মদান্ধতার জন্য আজ এক মহাসংকট উপস্থিত হইয়াছে। সভ্য জগৎ এখন প্রধানত দুইভাগে (Democratic and Communist blocks) বিভক্ত—একদিকে ইংরাজ, আমেরিকা এবং অন্যান্য পরাজিত জাতি, অপরদিকে রাশিয়া। উভয়ের মাঝখানে Atom Bombএর ভীতি বর্তমান। উভয় পক্ষই ভারতবর্ষের সহযোগিতা কামনা করিতেছেন। সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষকে এই উভয়ের মধ্যে এক দলকে আশ্রয় করিতেই হইবে। নচেৎ তাহার নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই নিদারুণ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সজাগ হওয়া সত্ত্বেও জবাহরলাল কোন পক্ষকে আশ্রয় করেন নাই। একপক্ষকে গ্রহণ করিলে সেই পক্ষ যে কাজ করিবে তাহাতেই তাঁহাকে সায় দিতে হইবে। তাহাতে তিনি রাজী নহেন। তিনি প্রতিটি ঘটনা বা প্রস্তাব সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখিবেন। যখন যে পক্ষ ন্যায়-সঙ্গত কাজ করিতেছে বলিয়া তিনি বোধ করিবেন তখন সেই পক্ষকে তিনি সমর্থন করিবেন। ইহাই কি প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা নয়? সত্যের জয় নিশ্চিত এবং অবধারিত এই চরম এবং পরম বিশ্বাস না থাকিলে কি জবাহরলাল এত বড় গুরুদায়িত্ব লইতে পারিতেন?

সম্প্রতি কংগ্রেসকে তথা নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করিবার একটি কারণ জুটিয়াছে। সেটি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা-গোপালাচারির অত্যধিক বেতন। অনেকেই বলিতেছেন যে মহাত্মা গান্ধী যে সর্বোচ্চ বেতন পাঁচ শত টাকা নির্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা এখন কোথায় গেল। বলা বাহুল্য, এই সকল সমালোচকবর্গ গান্ধীজী যখন পাঁচ শত টাকার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে সাধুবাদ দেন নাই। তবে আজ তাঁহার মতটা এঁদের কাজে লাগিতেছে।

এই প্রশ্নের সম্যক বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার গোড়াকার কথায় ফিরিয়া যাইতে হয়। ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ, প্রতিপত্তি, ভোগ কোন দিনই সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত ছিল না। এখানে সর্বোচ্চ ছিল জ্ঞান এবং ত্যাগ। তাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন ব্রাহ্মণ (সন্ন্যাসী) যাঁর বিত্ত, সম্পত্তি, ক্ষমতা কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁর আসন ছিল দেশের রাজারও ঊর্ধ্বে। তিনি দেশের রাজাকে এক কথায় সিংহাসনে বসাইতে বা রাজ্য ত্যাগ করাইতে পারিতেন। এ কেবল কথার কথা বা উপমা নয়—রামায়ণে এবং মহাভারতে ইহার বহু উদাহরণ রহিয়াছে। এই ব্রাহ্মণেরা দেশের নরপতিকে কখনোই সত্য-ভ্রষ্ট হইতে দিতেন না। রাজা দশরথ প্রাণাধিক পুত্র রামকে সত্যরক্ষারক জন্য বনে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন—তাহাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল, কিন্তু তবু তিনি রামকে কাছে রাখিতে পারিলেন না। রামও প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে অগ্নি দ্বারা পরিশুদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন, যদিচ তিনি জানিতেন, জানকী স্বতঃই পূতচরিত্রা। রাজা হরিশ্চন্দ্রকে স্বীয় পত্নী শৈব্যাসহ রাজ্য ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এ সমস্ত ব্যাপারই ব্রাহ্মণদের নির্দেশে এবং পরামর্শে সম্পন্ন হইত। ব্রাহ্মণেরা তখন নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের মত ছিলেন না—তাঁরা ছিলেন সমাজের সত্য নিয়ন্তা এবং শাস্তা। সত্যের মর্যাদা তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না, সমগ্র রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনী এই কথাই বারে বারে প্রমাণিত করিতেছে।

মহাত্মাজীর পাঁচশো টাকা বেতন নির্ধারণ সেই সনাতন আদর্শের দিকে ফিরিয়া যাইবারই ইঙ্গিত। সে আদর্শ যদি আজ সমাজে সত্যই গৃহীত হইত, তবে রাজাগোপালাচারীর বেতন পাঁচ শত টাকার বেশি প্রয়োজন হইত না। কিন্তু আজ এখানে পাশ্চাত্যের আদর্শ পুরোমাত্রায় রাজত্ব করিতেছে—মুখে বলিলে কি হইবে? মোটর জুড়িগাড়ির আদর, হীরা জহরতের আদর, বিড়লা ডালমিয়ার আদর, Atom Bombএর আদর চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। রামকৃষ্ণ মিশন কি করিতেছে, শ্রীঅরবিন্দ, মহর্ষি রমণ বা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কি করিতেছেন, সে খবর কয়জন রাখা প্রয়োজন মনে করেন? সত্যের এবং ত্যাগের আদর্শ আজ ভারতবর্ষে অনাদৃত। সভ্যতার এই প্যাটার্নের ছকে পাঁচ শত টাকার আদর্শ খাপ খাইবে কোথায়? আজ যদি রাজাগোপালাচারীর বেতন পাঁচ শত টাকা করিয়া দেওয়া হয় তবে বেচারাকে আর গভর্নর জেনারেলগিরি করিতে হইবে না। আমার চেয়ে মাহিনা কম জানিয়া আমিই তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিব। আর অবাঞ্ছিত সুবিধা যে কত লোকে কত ভাবে লইতে চেষ্টা করিবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই অনবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই উচ্চ বেতনের কৃত্রিম বেড়া তাঁহার চারিপাশে খাড়া করিতে হইয়াছে। প্রার্থনা করি ভারতবর্ষের সেই শুভ দিন শীঘ্র ফিরিয়া আসুক, কিন্তু তৎপূর্বে প্রাচীর ভাঙিয়া দেওয়ার প্রস্তাব সমীচীন হইবে না।

স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া চেঁচাইলেও স্বাধীনতার অর্থ কি ইহা সকলের নিকট সুস্পষ্ট নয়। স্বাধীনতা মানে অনেকেই বোঝেন ভাল খাইব, ভাল পরিব এবং ভাল বাড়িতে বাস করিব। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ মাত্র ঐখানেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বাধীনতার অর্থ মাত্র ঐটুকু হইলে ব্যক্তি (individual) বা ব্যষ্টি হয় রাষ্ট্রের উপর ভার বা বোঝাস্বরূপ। রাষ্ট্র যত সমৃদ্ধই হউক এইরূপ অকর্মণ্য এবং আব্দারপরায়ণ লোকসংখ্যা লইয়া কোনদিন গৌরববোধও করে না এবং তাহাদের পোষণ করিতেও পারে না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল এই যে, আমি ন্যায়সঙ্গত সমস্ত কার্য করিতে পারিব এবং আমার আইনসঙ্গত অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে ব্যক্তিকে আগে কাজে নামিতে হইবে, পরে রাষ্ট্রের সাহায্য চাহিতে হইবে। তখন সাহায্য রাষ্ট্র হইতে অবশ্যই আসিবে। আগে দায়িত্ব, তারপর অধিকার। আমাদের দেশে হইয়াছে ঠিক তাহার উল্টা। দায়িত্ব লইবার বালাই কাহারো নাই, অথচ অধিকার সকলেই চাহিতেছে। না পাইলে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু স্বাধীন দেশের অধিবাসী হইতে হইলে সেই স্বাধীনতাকে বজায় রাখিবার দায়িত্বও যে তাঁহাদের একথা কেহ স্মরণে রাখিতেছেন না। এই কথা ঠিক ঠিক স্মরণ হইলে মায়াহীন কথাবার্তা কমিয়া যাইবে এবং নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে দেশের ব্যাপকতর কল্যাণের দিকে নজর পড়িবে।

রাষ্ট্র সকলের চেয়ে বড় আজিকার দিনে ইহাই সবচেয়ে বড় কথা।

পুরানো গরম জামা টুপি খেতে হবে!

শিরোনামাটা দেখে চমকে ওঠারই কথা বটে, কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার একদল

বোটে নিন-পি চেয়ে দেখছেন

বৈজ্ঞানিক বহু বৎসরের গবেষণার ফলে পুরানো ছেঁড়া, ফেলে-দেওয়া, ফেল্ট হ্যাট ও জামা পোষাক ইত্যাদি পশমকে পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত করার পন্থা আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা এই পদার্থটির নাম দিয়েছেন বোটেনিন-পি (Botanein-P)। এবস্তুটি পায়েস বা চাটনীতে মাখিয়ে দিব্যি খাওয়া যাবে, শুধু তাই নয় এই জিনিসটি কোনও কিছুকে জোড়বার কাজে—বা রঙচঙে করে তোলার ব্যাপারেও বিশেষ কাজে লাগবে বলে জানানো হয়েছে। এই খাদ্যটির কিছু নমুনা সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে এসে পেঁাছেছে—সেখানকার বৈজ্ঞানিকরা এটি এখন চেখে দেখছেন। আমাদের দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধানে এই বস্তুটি আমদানী করা হোক না!

সৌখিন পোষাকের অদ্ভুত স্রষ্টা

সৌখিন এবং অদ্ভুত পোষাক পরে ও রকমারী সেজে বিভিন্ন উৎসবে যোগ দেওয়া—নাচানাচি করাটার রেওয়াজ পাশ্চাত্য দেশে খুবই যে আছে তাতো জানেনই। কিন্তু এইরকম উৎসবের উপযুক্ত অদ্ভুত পোষাক তৈরীর চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে ওদেশের পোষাক ব্যবসায়ী ও দরজীরা কিছুদিন ধরে আর ক্রেতাদের কিছুতেই খুশি করতে পারছিলেন না। সম্প্রতি ক্রিশ্চিয়ান দিওর

সৌখীন পোষাক একেই বলে!

বলে এক ফরাসী পোষাক শিল্পী এক ভয়ঙ্কর পোষাক তৈরী করে সেইটা গায়ে দিয়ে ক্যোৎ দ্য বোমোঁর এক নাচের উৎসবে সবাইকে অবাক তো করেছেনই—রীতিমত কয়েকজন মূর্চ্ছিত হয়েও পড়েছিলেন। পোষাকটা কেমন ছবিতেই দেখে নেবেন।

ব্যাঙ ধরাই তার সখ

পানামায় আমেরিকার যে রাষ্ট্রদূত থাকেন তাঁর বাইশ বছরের ছেলে টম ডেভিসের সখ হচ্ছে দেশ বিদেশের রকমারী ব্যাঙ সংগ্রহ করা—সম্প্রতি এই যুবকটি তাঁর সংগৃহীত নানা ধরণের জীবন্ত ব্যাঙগুলিকে ওয়াশিংটনের চিঁড়িয়াখানায় উপহার দিয়েছেন। চিঁড়িয়াখানায় ব্যাঙ দেখবার জন্য রীতিমত ভীড় হচ্ছে। সবচেয়ে ভীড় হচ্ছে পানামার ব্যাঙগুলোর খাঁচার কাছে। সেগুলি ভারী অদ্ভুত। হলদে রঙের ওপর কালো ফুট্‌কী থাকায় খুব নাকি খোলতাই দেখতে। তার ওপরে এই ব্যাঙগুলো দিনরাত খালি তিড়িং তিড়িং করে নাচে। আমেরিকানরা নাচিয়ে জাত—ওরা ব্যাঙের নাচন তারিফ করছে খুবই।

পানামার ব্যাঙগুলো ভারী নাচিয়ে!

ব্যাধির পরাজয়

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

পাস্তুরের পরবর্তিগণ

দুটো কথা চলতি আছে, একটা হল,—রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান জিতল লর্ড লিস্টারের জন্যে। অপরটা হল,—পাস্তুর পানামা খাল কাটলেন।

কিন্তু কথা দুটো কেমন হলো? লর্ড লিস্টার হলেন ইংলণ্ডের লোক, আর জাপানের প্রতি ইংলণ্ডের যে কোনদিন দরদ ছিল তা নয়। অন্যদিকে পাস্তুরের মৃত্যুর অনেক পরে পানামা খাল কাটা হয়, সুতরাং পাস্তুর পানামা খাল কাটলেন, এই বা কি রকম কথা!

পাস্তুর ছিলেন ফ্রান্স দেশের লোক, কিন্তু তাঁর কাজে তাঁর শিষ্যত্ব নিলেন ইংলণ্ডের লিস্টার আর জার্মানির কক।

ক্লোরোফরম যখন বের হল, তখন শস্ত্র চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে রুগীর ভয় অনেকটা কমল, শস্ত্র চিকিৎসার সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকল। এই ক্লোরোফরম আবিষ্কারে একটা মজার ব্যাপার ছিল। সিম্পসন বিখ্যাত রসায়নবিদ ডুমাকে দিয়ে এক বোতল ক্লোরোফরম তৈরি করালেন, এর ফলাফল পরীক্ষা করবেন। রাতে দুই বন্ধুকে খেতে বলেছেন। তারা উপস্থিত, সামনে খাবার সাজান। ঠিক হল, ক্লোরোফরম শুঁকলে কি হয় আগে দেখা হবে। তিনটে গেলাসে ক্লোরোফরম ঢেলে তাঁরা শুঁকতে থাকলেন। এলোমেলো কথা, মাথা ঘুলিয়ে গেল, তারপর কি হল তাঁরা জানেন না। ধপাধপ শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে মিসেস্ সিম্পসন ছুটে এসে দেখেন তিন বন্ধু মেঝেতে পড়ে অজ্ঞান। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের জ্ঞান হল। মিসেস্ সিম্পসনের তখনও ভয় যায়নি, সিম্পসন কিন্তু আনন্দে অধীর, শস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রণা থেকে তিনি মানুষকে মুক্তি দিতে পেরেছেন। সে যাক, দেখা গেল রুগীর সংখ্যা যত বাড়ছে, মৃত্যুসংখ্যাও তত বেড়ে চলেছে, কাটাকুটির পর স্থানটা ফুলে ওঠে, ঘা সারতে চায় না, জায়গাটা পচতে আরম্ভ হয়, রুগী মারা যায়।

পাস্তুর পরীক্ষায় দেখিয়েছেন, চিনি গেঁজে ওঠে, দুধ ছিঁড়ে যায় বাতাসের জীবাণুর জন্যে। লিস্টার ভাবলেন, ওই রকমের জীবাণুই কি ক্ষতস্থান পচায়। লিস্টার ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ শস্ত্র-চিকিৎসাবিদ্। তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। লিস্টার দেখলেন, কার্বলিক অ্যাসিড় ওই জীবাণুদের মেরে ফেলে। তিনি ক্ষতস্থানে কার্বলিক অ্যাসিড দিলেন, বাতাসে কার্বলিক অ্যাসিডের বাষ্প ছড়ালেন, কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে হাত ধুলেন, যন্ত্রপাতি মুছলেন, এই রকম করে তিনি আশ্চর্য রকম ফল পেতে থাকলেন। তিনি দুটো ব্যাপারকে পৃথক্ করলেন। যেখানে জীবাণু আসায় ক্ষতস্থান দুষ্ট হয়েছে সেখানে ওই জীবাণুদের মারতে হবে, আর যেখানে অক্ষত জায়গাকে কাটতে হবে, সেখানে জীবাণু যাতে না আসে তার ব্যবস্থ করতে হবে। তিনি তাঁর ছাত্রদের ডেকে বলতেন,—মনে কর চার-

লর্ড লিস্টার

দিকে কাঁচা রং লেগে রয়েছে, তোমাকে যেমন সন্তর্পণে চলতে হবে, এখানেও মনে রাখবে চারদিকে জীবাণু ছড়িয়ে রয়েছে, ক্ষতস্থানে তারা না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পাস্তুরের মূল কথাগুলি লিস্টার শস্ত্রবিদ্যায় লাগালেন, শস্ত্রবিদ্যা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হল। জীবাণু ধ্বংস করবার বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হতে থাকল। আজ এমন সব শস্ত্র চিকিৎসা চলছে লিস্টারের আগে যার সম্ভাবনার কথা লোকে ভাবতেই পারত না।

রয়াল সোসাইটির অধিবেশনে লিস্টারকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, তাতে আমেরিকার দূত লিস্টারকে সম্বোধন করে বলেন,—শুধু চিকিৎসক সম্প্রদায় নয়, কেবলমাত্র একটি জাতি নয়, সমগ্র মানব-সমাজ নতমস্তকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এই জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানীর আর একদিন আনন্দের সীমা ছিল না। হাসপাতালে একটি ছোট মেয়ের হাতের অর্ধেকটা কেটে ফেলতে হয়। লিস্টার প্রত্যহ তার হাত ধোয়ানো ওষুধ লাগানোর ভার নিলেন, যদিও এ কাজ করবার লোক হাসপাতালে অনেক ছিল। মেয়েটি মুখ বুজে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে যেত। একদিন মেয়েটি তার ফ্রকের ভিতর থেকে একটি পুতুল বের করে লিস্টারের হাতে দিল, পুতুলের পা এক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে, সেখান থেকে কাঠের গুঁড়ো বেরুচ্ছে। লিস্টার গম্ভীরভাবে পুতুলটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, তারপর ছুঁচ সুতো দিয়ে পুতুলের পা সেলাই করতে বসে গেলেন, সেলাই করে পুতুলটিকে মেয়েটির হাতে দিলেন। সেদিন মেয়েটির মুখের হাসির রেখা এই কোমলপ্রাণ বিজ্ঞানীকে যে আনন্দ দিয়েছিল, পৃথিবীতে তা সচরাচর মেলে না।

১৮৯২ সালে পাস্তুরের বয়স যখন সত্তর হল, তখন তাঁকে অভিনন্দন দেবার জন্য পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরা সমবেত হলেন। ইংলণ্ড পাঠালেন লিস্টারকে। সভায় মানবজাতির প্রভূত কল্যাণকারী দুই মহাপুরুষের মিলন হল।

লিস্টারের উদ্ভাবিত পদ্ধতি কাজে লাগাতে ইউরোপ দেরী করল, আর ইউরোপ যাকে বিদ্রূপ করত, হীন চক্ষে দেখত, সেই জাপান অবিলম্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে নিয়ে নিল। এই কারণে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের সৈন্যক্ষয় হল খুব কম, আর সেইটে হল জাপানের জয়লাভের প্রধান কারণ।

ফরাসী পাস্তুর যে পথ আবিষ্কার করলেন সেই পথে এগিয়ে চললেন জার্মানীর কক্। কক্ কলেরা ও যক্ষ্মারোগের জীবাণুর পরিচয় পেলেন। কলেরার জীবাণু আবিষ্কার এক বিস্ময়কর কাহিনী। ১৮৮৩ সালে কি রকম করে ইজিপ্টে কলেরা দেখা দিল। হঠাৎ ভীষণ আকার ধারণ করল। সকালে রোগে ধরে, সন্ধ্যার মধ্যে জীবন শেষ হয়, রাস্তাঘাটে মড়ার ছড়াছড়ি। পাশে ইউরোপে দারুণ আতঙ্ক দেখা দিল। পাস্তুর ও কক্ কলেরার কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কক্ একজন সহকর্মী ও অণুবীক্ষণ প্রভৃতি নিয়ে আলেকজেণ্ড্রিয়া শহরে এসে পৌঁছলেন। পাস্তুর তখন জলাতঙ্ক রোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তিনি রাউকস্ ও থুইলিআরকে পাঠালেন। দুদলই কাজ আরম্ভ করল। কিন্তু কলেরা যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি প্রায় হঠাৎ চলে যাবার মতো হল। প্রত্যেকেই যে যার দেশে ফিরব ফিরব করছেন, এমন সময় একদিন থুইলিআরের কলেরা হল, আর তিনি

জাপানের অস্ত্র চিকিৎসকগণ লিস্টার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে আহত সৈনিকের উপর অস্ত্রোপচার করছেন

তাতেই মারা গেলেন। এ দিকে কক্ কলেরা রোগীর পাকস্থলীতে ইংরেজি চিহ্ন কমা (,)র মতো একটা নতুন রকমের জিনিস লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তারাই যে কলেরার কারণ সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। ইজিপ্টে কলেরা থেমে যাওয়ায় আর অনুসন্ধানের সুযোগ মিলল না। কক্ বার্লিনে ফিরে এসে কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে আরও পরীক্ষার দরকার, আর সেজন্য তিনি ভারতবর্ষে যেতে চান, ভারতবর্ষে কলেরা লেগেই আছে। ককৃকে ভারতবর্ষে পাঠান স্থির হল। থুইলিআরের মৃত্যু চোখের উপর দেখেও এক অজানা ব্যাধি-সঙ্কুল দেশে কক্ চলে এলেন। এসেই কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি সুনিশ্চিত হলেন যে, এই কমা (,) জীবাণুরাই কলেরার কারণ। দেশে ফিরে গিয়ে জোর করে জানালেন, যে-কোন সুস্থ লোকের কলেরা হতে পারে না, যদি না তার পেটের মধ্যে ওই জীবাণু চলে যায়। কলেরা কিসে হয় জানার পর টিকা দিয়ে কি করে এর আক্রমণ রোধ করা যায় তাও জানা হল। এখন এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের একটা মস্ত দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে। প্রধানতঃ ভারতবর্ষে এই রোগের উৎপত্তি। এখানেই এর সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হলে তবেই সমস্ত পৃথিবী থেকে ওই রোগ চলে যাবে।

জীবাণুকে রক্ত থেকে পৃথক করা, তাদের বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা, এসব ব্যাপারে ককের দান অসাধারণ। এই জন্য ককেকে জীবাণু বিদ্যার জনক বলা হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা বড় কৃতিত্ব হল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বিশিষ্ট ব্যাধিগুলির কারণ নির্ণয় করা আর সেগুলি দূর করবার উপায় বের করা। এই ব্যাধিগুলির মধ্যে প্রধান হল ম্যালেরিয়া। এই রোগ কত বছর ধরে কত লোককে যে শেষ করে ফেলেছে, আর তার চেয়ে কত বেশী লোককে যে অকর্মণ্য করেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই।

ইংরেজিতে ম্যালেরিয়া কথাটার মানে হল খারাপ বাতাস। কিন্তু লাভেরান প্রথম দেখালেন যে, খারাপ বাতাস ম্যালেরিয়ার কারণ নয়, জলা জায়গাও নয়, ম্যালেরিয়ার কারণ হল এক রকমের জীবাণু।

আগে যে জীবাণুদের কথা বলা হয়েছে তারা আর এই ম্যালেরিয়ার জীবাণু একবারে ভিন্ন শ্রেণীর। আমরা জীবকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করি উদ্ভিদ ও প্রাণী। উদ্ভিদ শ্রেণীর

রবার্ট কক

জীবাণুকে বলা হয় প্রোটোজোয়া, তবে তাদের ক্লোরোফিল থাকে না। আর প্রাণী শ্রেণীর জীবাণুকে বলা হয় ব্যাক্টিরিয়া। উভয়েই জীবাণু।

ব্যাক্টিরিয়াদের চেয়ে এই প্রোটোজোয়ারা কিছু বড় হলেও খালি চোখে এদেরও দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে হয়। এরা দেহের রক্তে হু হু করে বেড়ে চলে, রক্তে লাল কণিকা ধ্বংস করে, আর যে বিষ তৈরি করে তার জন্য জ্বর দেখা যায়। ম্যানসন এ সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করলেন, আর তার কাজ উৎসাহিত করল রনাল্ড রসকে। রস ভারতবর্ষে এসে মশার দেহে যে জীবাণুর কথা লাভেরান বলেছিলেন, তার সন্ধান করতে থাকেন। সেকেন্দরাবাদ শহরে তিনি এক রকম মশা দেখতে পেলেন যা সাধারণ কিউলেক্স শ্রেণীর মশা নয়। ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়েছে এই রকম এই জাতীয় কয়েকটি মশা নিয়ে রস অণুবীক্ষণে তাদের পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রত্যহ আট ঘণ্টা করে অণুবীক্ষণ নিয়ে কাজ চলেছে। নতুন কিছুই পান না। আর মাত্র দুটো মশা বাকি, চোখ ক্লান্ত, দেহ অবসন্ন। হঠাৎ একটা মশার পাকস্থলীতে একটা রকমারী কিছু দেখলেন, যে রকম তিনি পূর্বে দেখেননি। কিন্তু এর মূল্য তখন তিনি বুঝলেন না, বাড়ি ফিরে গেলেন, ঘণ্টা খানেক ঘুমলেন। ঘুম থেকে উঠে প্রথম কথা তাঁর মনে হল যে একটা বিরাট সমস্যার সমাধান হয়েছে। এই জাগরণে রসের জীবনে এক স্মরণীয় মুহূর্ত এল, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এক শুভমুহূর্ত দেখা দিল।

কোন্ পথ দিয়ে চলে ম্যালেরিয়া বিষ লক্ষ লক্ষ মানুষকে আক্রমণ করছে, রস তা দেখিয়ে দিলেন। একজন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে বিশেষ রকমের জীবাণু জন্মায়। এরা কোন রকমে যদি অপর একজন সুস্থ লোকের রক্তে গিয়ে পৌঁছতে পারে তবে তাকে ম্যালেরিয়ায় ধরবে। কিন্তু কি করে ওরা পৌঁছবে, কে ওদের বয়ে নিয়ে যাবে। রস-এর পরীক্ষায় দেখা গেল যে অ্যানোফেলিস্ জাতীয় মশা এই কাজ করছে। এই মশা একজন ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়াল, রক্তের সংগে জীবাণু মশার শরীরে চলে গেল। রস দেখলেন যে, মশার শরীরে এসে ওরা হু হু করে বেড়ে যেতে থাকল। এখন এই মশা যদি একজন সুস্থ লোককে কামড়ায়, তবে সেই লোকের শরীরে জীবাণু চলে যাবে, তার ম্যালেরিয়া হবে। সুতরাং একজন লোকের ম্যালেরিয়া হতে গেলে, প্রথম, আর একজন লোকের ম্যালেরিয়া হওয়া চাই, তারপর অ্যানোফেলিস্ জাতীয় মশা ঐ ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ে তারপর সুস্থ লোককে কামড়াতে হবে। এর কোন জায়গায় একটি ছেদ হলে ম্যালেরিয়া হবে না। অর্থাৎ ধরা যাক,

অ্যানোফেলিস্ মশা আছে, কিন্তু আশে-পাশে কোন ম্যালেরিয়া রোগী নেই। তাহলে কারও ম্যালেরিয়া হবে না। আবার মনে করা যাক, ম্যালেরিয়া রোগী আছে, কিন্তু একটিও অ্যানোফেলিস্ মশা নেই। তাহলেও অন্য কারও ম্যালেরিয়া হবে না।

রস যেদিন তাঁর আবিষ্কার সম্পূর্ণ করলেন, সেদিন তিনি আনন্দে একটি কবিতা রচনা করেন। তার শেষের দু-লাইন এই—

রনাল্ড রস

I know this little thing a myriad men will save. O Death! where is thy sting? thy victory, O Grave!

ম্যালেরিয়া কি করে আসে যখন জানা গেল তখন তাকে ঠেকানো আর শক্ত রইল না। প্রথম, কুইনিন খাইয়ে যতটা পারা যায় ম্যালেরিয়া রোগীর রোগ সারান হতে থাকল, তারপর ওই বাহক অ্যানোফেলিস্ মশাকে নির্মূলে করার ব্যবস্থা হল। এদের ভাল করে চেনা হল, এদের জীবন ইতিহাস জানা হল। এদের মারফতে কামান দাগা হল না বটে, কিন্তু ডিম থেকে আরম্ভ করে কীট অবধি, বিভিন্ন অবস্থায় এদের শেষ করে ফেলতে নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হল। ফলাফল কি হল, কয়েকটি জায়গার ইতিহাস থেকে তা বোঝা যাবে। রসের প্রবর্তিত পথে কাজ করে, ইটালীতে, যেখানে বছরে মৃত্যুর হার ছিল ষোল হাজার, সাত বছরে তা কমে এসে চার হাজারে দাঁড়াল। গ্রীসের ম্যারাথনে মৃত্যুর হার শতকরা ৯৮ থেকে দুইতে নামল। পৃথিবীর বহুস্থানে স্বাস্থ্য-নিবাস গড়ে উঠল যে স্থানগুলি আগে ছিল 'সাদা মানুষের কবর'।

কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী। এখানে বছরে বহু লক্ষ লোক জ্বরে মারা যায়, আর সে জ্বর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া। মারা যায় যত লোক তার ৭।৮ গুণ লোক জ্বরে ভোগে। যারা ভোগে তাদের কর্মশক্তি কমে যায়, জীবনে অবসাদ আসে। শুধু মানবতার দিক থেকে নয়, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করতে স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রধান কাজ হবে দেশ থেকে এই রোগকে একেবারে দূর করা। রস-এর আবিষ্কার এই ভারতবর্ষেই হয়েছিল, তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি অবলম্বন করে অন্য দেশ এগিয়ে গিয়েছে, ভারতবর্ষ পেছিয়ে থাকতে পারে না।

নতুন পৃথিবীতে একটা রোগ ছিল, পীতজ্বর। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে আমেরিকার বহু সৈন্য এই রোগে মারা যায়। যুক্তরাজ্যের সভাপতি কিউবা দ্বীপে পীতজ্বরের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য ওআলটার রীডের নেতৃত্বে পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। তাঁরা অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। কয়েকটি ঘটনা দেখে তাঁরা অনুমান করলেন যে, এক রকমের মশা দিয়েই এই রোগ চালিত হয়। লাজিয়ার এই দলের একজন ছিলেন। একদিন লাজিয়ার হাসপাতালে কাজ করছেন, একটা মশা তাঁর হাতে এসে বসল। লাজিয়ার তা দেখলেন, কিন্তু মশাটাকে তাড়ালেন না, বললেন,—কামড়াক, দেখাই যাক না শেষ অবধি কি হয়। কিন্তু শেষ অবধি যা ঘটল তাতে জ্ঞান লাভ করলেন রীড। লাজিয়ার মারা গেলেন। কিন্তু আরও পরীক্ষা চাই।

কিসেনজার নামে একজন সৈন্য আর সেনা বিভাগের একজন কেরানী, নাম মোরান, রীডের কাছে এসে বললে, আমাদের ওপর পরীক্ষা হোক। রীড তাঁদের বিপদের কথা বললেন, জানালেন যে, প্রাণহানিও ঘটতে পারে। তারা বললে, আমরা জানি, আর জেনেই এসেছি। তাদের প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে রীড

কিসেনজার নামে একজন সৈন্য আর সেনা বিভাগের একজন কেরাণী, নাম মোরান, রীডের কাছে এসে বললে—আমাদের উপর পরীক্ষা হোক। রীড তাঁদের বিপদের কথা বললেন, জানালেন যে, প্রাণহানিও ঘটতে পারে। তারা বললে—আমরা জানি, আর জেনেই এসেছি। তাঁদের প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে, রীড বললে। লোক দুজন ফিরে চলল, বলল, পুরস্কারের লোভে আমরা আসিনি। রীড তাঁদের ডাকলেন, আর নত হয়ে বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করি।

বললেন। লোক দুজন ফিরে চলল, বলল, পুরস্কারের লোভে আমরা আসিনি। রীড তাদের ডাকলেন, আর নত হয়ে বললেন,—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করি।

কিন্তু পীতজ্বর কি অন্য রকমে ছড়িয়ে পড়ে, রীড চিন্তা করতে লাগলেন। শেষে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করলেন যা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু যাতে ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। রীড দুটো ঘর তৈরি করালেন। একটা ঘর অত্যন্ত অপরিষ্কার, আর সে ঘরে পীতজ্বরে মারা গিয়েছে এই রকম লোকের বিছানাপত্র ছড়ান, তবে সে ঘর তারের জাল দিয়ে ঘেরা, কোন মশা ঢুকতে পারবে না। অপর ঘর বেশ পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে, কিন্তু সে ঘরে একটি জালের বাক্সে কতকগুলি স্টেগোমায়া জাতীয় মশা আছে, তারা আগে পীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীকে কামড়েছে, রাত্রে লোক শোবার পর ওই মশাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। রীড বললেন, আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তবে প্রথম ঘরে যে শোবে তার কিছু হবে না, আর দ্বিতীয় ঘরে যাকে মশা কামড়াবে তার নিশ্চয়ই পীতজ্বর হবে। তিনজন সৈন্য প্রথম ঘরে গিয়ে শুতে থাকল, তাদের একজন মৃতের পায়জামা পরে শুতো। পর পর কুড়ি রাত্রি তারা ওই ঘরে বাস করল। তাদের কিছুই হল না। আর যে দুজন সৈন্য পরীক্ষার জন্য রীডের কাছে এগিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে মোরান বললেন,—আমি ওই দ্বিতীয় ঘরে শোব। তিনি সেই ঘরে গেলেন, গিয়ে মশার বাক্সের দরজা খুলে দিলেন। মশারা বেরিয়ে এসে তাঁকে কামড়াল। কয়েকদিনের মধ্যে মোরান দারুণ পীতজ্বরে আক্রান্ত হলেন। শেষ অবধি তিনি বেঁচে উঠলেন। রীডের আনন্দের সীমা রইল না।

সত্য আবিষ্কৃত হল। পীতজ্বরের জীবাণু থেকে টিকা তৈরি হল, আর তা দিয়ে ওই রোগের আক্রমণ রোধ করা হতে থাকল। এই অনুসন্ধানে লাজিয়ার প্রাণ দিলেন, কয়েকজন প্রাণ দিতে এগিয়ে গেলেন। লোকে এঁদের কথা ভুলল, কিন্তু এরা পৃথিবীর অসংখ্য লোকের জীবনরক্ষা করে গেলেন। আজ পৃথিবীতে পীতজ্বর নেই বললেই হয়।

শেষ অবধি বিজ্ঞানী দেখল যে, দু রকমের মশা তাদের দেহের মধ্যে লুকিয়ে রাখে দু রকমের জীবাণু, আর তারা এতদিন পৃথিবী থেকে বছর বছর লক্ষ লক্ষ লোক সরিয়ে দিয়ে আসছিল।

পানামা খাল কাটার প্রয়োজন হল। ফরাসীরা ভার নিল, লোকজন পাঠাল। কিন্তু কাজ হবে কি, যে যায় বিছানা নেয়, কাউকে ম্যালেরিয়া ধরে, কাউকে ধরে পীতজ্বরে। কুড়ি হাজার লোকক্ষয়ের পর ফরাসীরা ফিরে এল। কিন্তু ঐ খাল কাটায় যুক্তরাজ্যের গরজ খুব বেশী ছিল। প্রয়োজনের সময় নৌবহর দেশের পূব থেকে পশ্চিমে নিয়ে যাবার জো নেই। নিয়ে যেতে হলে হয় উত্তর আমেরিকার উত্তর দিয়ে, না হয় দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে তো কোনও কাজের কথা নয়। পানামার কাছে জায়গাটা খুব সরু হয়ে এসেছে, সেখানে একটা খাল কাটতে পারলে জাহাজ সহজেই সেই খাল দিয়ে দেশের এধার ওধার যাতায়াত করতে পারবে।

ফরাসীরা চলে যাবার পর যুক্তরাজ্য ঐ খাল কাটার ভার নিল। কিন্তু ফরাসীদের দশা দেখে যুক্তরাজ্য সরকার বিজ্ঞ হয়েছে। তারা সব প্রথম এঞ্জিনিয়ার না পাঠিয়ে পাঠাল ডাক্তার। ডাক্তারেরা আগে সেই স্থানে বড় বড় রাস্তা করল, জল নিকাশের জন্য ভাল ভাল ড্রেন তৈরি করল, খানা ডোবা সব ভরাট করল, বড় বড় বাড়ি তুলল, মশামাছি তাড়াল। তখন এঞ্জিনিয়াররা গেল, খাল কাটা হল। অনেক আগে পাস্তুর যে পথ খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পথ ধরবার পর পানামা খাল কাটা সম্ভব হল। তাই তো বলা হয়, পাস্তুর পানামা খাল কাটলেন।

কিন্তু পাস্তুর শুধুই কি পানামা খাল কাটলেন। আজ পৃথিবীতে যেখানেই একটি হাসপাতাল খোলা হচ্ছে সেখানেই তো পাস্তুরের বিধান অনুসারে কাজ চলছে। আর কেবল কি হাসপাতালে।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের এক জায়গায় আছে,—

দলের মধ্যে নন্দ সকল প্রকার খেলায় ও ব্যায়ামে দলের সেরা ছিল। সেই নন্দর পায়ে কয়েকদিন হইল একটি বাটালি পড়িয়া গিয়া ক্ষত হওয়ায় সে খেলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। আজ প্রভাতেই বিনয়কে সঙ্গে করিয়া গোরা ছুতার পাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

'নন্দদের দোতলার খোলার ঘরের দ্বারের কাছে আসিতেই ভিতর হইতে মেয়েদের কান্নার শব্দ শোনা গেল। নন্দর বাবা বা অন্য পুরুষ অভিভাবক বাড়িতে নাই। পাশে একটি তামাকের দোকান ছিল তাহার কর্তা আসিয়া
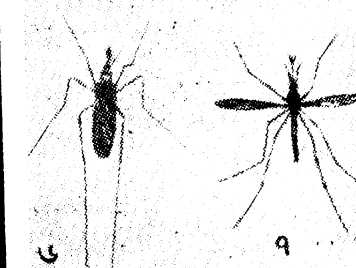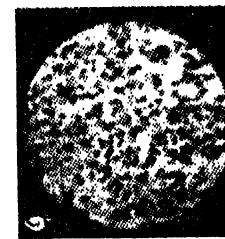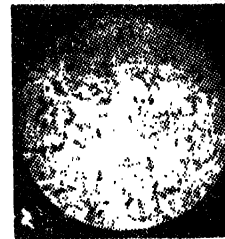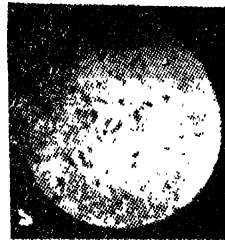
১। প্লেগ জীবাণু, ২। যক্ষ্মা জীবাণু, ৩। ম্যালেরিয়া জীবাণু, ৪। প্লেগের জীবাণু বহনকারী ইঁদুরের গায়ের পোকা, ৫। জীবাণু বহনকারী মাছির পা, ৬। ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী অ্যানোফিলিস মশা, ৭। পীতজ্বর জীবাণু বহনকারী মশা

কহিল,—নন্দ আজ ভোরের বেলায় মারা পড়িয়াছে, তাহাকে দাহ করিতে লইয়া গেছে।"

'নন্দ মারা গিয়াছে! এমন স্বাস্থ্য, এমন শক্তি, এমন তেজ, এমন হৃদয়, এত অল্প বয়স —সেই নন্দ আজ ভোর বেলায় মারা গিয়াছে। কী করিয়া মৃত্যু হইল খবর লইতে গিয়া শোনা গেল যে, তাহার ধনুষ্টংকার হইয়াছিল।

এটা উপন্যাসের কথা হলেও এ রকম ঘটনা তো আগে অনেক ঘটেছে। কিন্তু আজ তো এ রকম বড় একটা হয় না। আজ প্রতি গৃহস্থ জানে যে, শরীরের কোন স্থান কেটে গেলে সেই জায়গাটা ধুয়ে ফেলে সেখানে টিঞ্চার আয়োডিন দিতে হবে, বেশি কাটলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে টিটেনস-বিরোধী সিরমের ইনজেকসন দিইয়ে নিতে হবে। অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পেতে গৃহস্থ এই যে ব্যবস্থা নিচ্ছে তার মূলে তো রইল পাস্তুরের দান।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আর একটা ব্যাধি ছিল কালাজ্বর। ছিল বলা হল এই কারণে যে, ওই রোগ এখন আর বড় 'নেই'। গেল যে সকল বিজ্ঞানীর আবিষ্ক্রিয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় একজন বাঙালী বিজ্ঞানীর।

কালাজ্বর কতক বিষয়ে ম্যালেরিয়ার মতো হলেও ম্যালেরিয়া থেকে এ একেবারে স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষে আসাম ও বাঙলাদেশে এর আক্রমণ ছিল খুব প্রবল, আর এর মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৯৫। কালাজ্বরে ধরলে আর রক্ষে নেই এই ছিল লোকের ধারণা। আন্দাজে চিকিৎসা চলত, ফল কিছুই হত না, রোগ ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিজ্ঞানী এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করলেন। লিশম্যান ও ডনোভান প্রথমে ওই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। তাদের নাম

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

অনুসারে ওই জীবাণুকে লিশম্যান-ডনোভান বড়ি বলা হয়। এরা প্রোটোজোয়া শ্রেণীর জীবাণু। প্রোটোজোয়ার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এক বিভাগে আছে ম্যালেরিয়া অন্য এক বিভাগে কালাজ্বর। ম্যালেরিয়া জীবাণুকে বহন করে নিয়ে যায় অ্যানোফেলিস, এই কালাজ্বর জীবাণুর বাহক কে? অনুসন্ধান চলল। কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের নেপিয়ার, নোলস, স্মিথ দেখালেন যে, স্যান্ডফ্লাই বলে এক রকমের ছোট মাছি রোগীর দেহ থেকে সুস্থ লোকের দেহে ওই জীবাণু বহন করে নিয়ে যায়। সাদা সাদা উনকি পোকা হল এই স্যান্ডফ্লাই। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান চলছে।

এখানে একটা কথা আছে। মানুষের কালাজ্বর রোধ করবার সহজাত শক্তি খুব প্রবল। স্যান্ডফ্লাই একজন কালাজ্বর রুগীকে কামড়ে একজন সুস্থ লোককে কামড়ালো; তখনই ওই সুস্থ লোকের কালাজ্বর দেখা দেবে না। জীবাণু সুস্থ লোকের শরীরে অনেক দিন ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল, ওত পেতে থাকল কখন ওই লোকের শরীর খারাপ হবে, তখন আক্রমণ চালাবে। এমন কি কয়েক বছর ধরে তারা চুপ করে থাকবে, তারপর একদিন সেই লোকের ম্যালেরিয়া বা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্য কোন রোগে যেই শরীর খারাপ হল, রোধশক্তি কমে এল অমনি ওই জীবাণু তার আক্রমণ শুরু করল।

এখন এই জীবাণুকে কি করে ধ্বংস করা যায়। রজার্স অ্যান্টিমনি ইনজেকসন আরম্ভ করলেন বিভিন্ন অ্যান্টিমনি লবণ ব্যবহৃত হতে থাকল। বোঝা গেল অ্যান্টিমনি এর ঠিক ওষুধ বটে, কিন্তু অ্যান্টিমনি ঘটিত যে সকল ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছিল, দেখা গেল অনেক রুগী তা সহ্য করতে পারে না, অন্য নতুন উপসর্গ দেখা দেয়, অনেক সময় চিকিৎসা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ইউরিয়াস্টিবামিন নামে অ্যান্টিমনির এক যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন। এ ব্যবহারে আর কোন ভয় রইল না। পৃথিবীর চিকিৎসকেরা একে কালাজ্বরের এক অব্যর্থ ওষুধ রূপে নিয়ে নিল।

ব্রহ্মচারীর এই আবিষ্কারের কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে কালাজ্বর রোগ একেবারে চলে যাবার মতো হয়েছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

প্রেত

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

নতুন একটা বাস-রুটের কাজ শুরু হ'য়েছে এই অঞ্চলে ঃ এই সিকদারের চর বরাবর ঢালু দক্ষিণে।—

জমিদার আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মধ্যস্থতায় কাজ। আমিনের জরিপ শেষ হয়েছে, কাজে বহাল হ'য়েছে প্রায় দেড়শো কুলি, রাস্তার এখানে ওখানে বসে শক্ত হাতুড়ি দিয়ে স্তূপাকারে ইঁট ভেঙে খোয়া ক'রছে ভাড়াটে কামিন আর দিন-মজুরাণীর দল। তাদের মধ্যেই তাদের সুখ-দুঃখের কথা চ'লেছে, সস্তা খিস্তি চলেছে ঠারে-ঠুরে, গানের সুর জাগছে মুখে মুখে, আর তার তালে তালে হাতুড়ির শক্ত ঘা প'ড়ছে পি বি এস মার্কা খণ্ড খণ্ড ইঁটের বুকে। ব্যাগে করে জল ছিটিয়ে রাস্তা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ব্যাচের পর ব্যাচ্ কুলি, ওয়ার্কার্স রেজিস্ট্রারে এদের নাম প'ড়েছে ব্যাগ-ম্যান। জল ছিটিয়ে মাটিকে ভিজিয়ে দেওয়াই এদের কাজ। তারপর চুণ আর সুরকির উপরে পড়ে 'দুরমুশের' ঘা। এরপর আছে রোলার রোলিং। —কাজের হিসেব আর পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্‌চার্জ রাখা হ'য়েছে দুপক্ষ থেকে দুজন ঃ একদিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, আর একদিকে সিক্‌দার জমিদার। চরের অংশটার জন্য বোর্ডের সংগে বাৎসরিক খাজনা পাবার চুক্তিনামা হ'য়েছে সিক্‌দার জমিদারের। পুরো জমিটাকে বোর্ডের কাছে স্বত্ব বিক্রী ক'রে দেবার প্রস্তাব উঠেছিল চেয়ারম্যানের ফাইল থেকে, কিন্তু জমিদারের ফাইলে তার এ্যাপ্রুভাল-নোটে সই পড়েনি। ফলে এই ব্যবস্থা,—এই খাজনাদারী সম্বন্ধ। না হ'য়ে উপায় নেই, চর আর্টিকেলে 'পাবলিক কনভেনিয়েন্স' বন্ধ করবার অধিকার নেই জমিদারের, 'পাব্‌লিক ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড্ এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের' পাতা উল্টিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তা বোর্ড। অগত্যা—

কাজ চ'লেছে পুরো দস্তুর ঃ সকাল থেকে ভর সন্ধ্যা। 'দুরমুশের' ঘা পড়ছে সুরকির বুকে, তার সাথে তালে তালে ইঁটের বুকে ঘা প'ড়ছে ভাড়াটে কামিন আর দিন-মজুরাণীদের হাতের শক্ত হাতুড়ীর। ঠিন্ ঠিন্ ক'রে রুপোর কঙ্কনে কাঁচের চুড়ীর আওয়াজ হ'চ্ছে মতিয়ার হাতে। তির্যক্ দৃষ্টি এসে বিদ্ধ হ'চ্ছে সেখানে—সেই নরম শ্যাম্‌লা হাতের কব্জি দু'খানিতে জগনের। অমনি হাতুড়ির কাঠের হাতল একটু একটু ক'রে শিথিল হ'য়ে আসে জগনের হাতে। বুকের মধ্যে অনুভব করে কেমন একটা চাঞ্চল্য, কেমন একটা উদ্ভ্রান্তি এসে উড়িয়ে নিয়ে যায় তার মনকে। মিহিসুরে আধ-মিশেলী দেশোয়ালী ভাষায় ব'লতে যায় ঃ 'এ কাজ তোমায় মানায় না মতিয়া, তুম্ রাণী হ্যায়, চাঁদকা মাফিক্ তুমারি সুরৎ হ্যায়। এমন শক্ত হাতুড়ি কি মানায় তোমার হাতে !'

অপাংগে জগনের দিকে একবার লক্ষ্য ক'রে বসে বসে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে মতিয়া। তখনও সমানে তার হাতের শক্ত হাতুড়ি চ'লতে থাকে ইঁটের বুকে। সব চাইতে বেশী 'খোয়া'র স্তূপ জমিয়েছে সেইই। কাজে এতটুকুও ফাঁকি নেই তার, ফাঁকি নেই তেমনি তার রূপেও। জগনের মতো পুরুষদের কাছে সত্যিই সে রাণী, রূপের চাঁদ। যত মরণও হ'য়েছে তার এই রূপ নিয়েই। স্বামী রূপলাল একটি ক্যাবলা, ঘর ছেড়ে নড়ে বস্‌তে চায় না কোথাও। স্ত্রীর উদয়াস্ত পরিশ্রমের উপরে তার জীবন এবং জীবিকা নির্ভর ক'রে আছে। উপরন্তু রাগ আছে ষোল আনা। যদি কখনও কাজ শেষ ক'রে দিনের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে ঘরে ফিরতে দু'দণ্ড দেরী হয় মতিয়ার, মারমুখো হ'য়ে ওঠে রূপলাল ঃ অন্য সময় আহ্লাদ ক'রে বলে ঃ 'মেরা জীবন, মেরা আস্‌মান, মেরা আউরৎ মেরা প্রেম কি রাণী।' আহ্লাদিসুরে তখন মতিয়া বলে ঃ 'তব গোসা হুয়া কাহে ?—মতিয়ার দিকে নীরবে তখন দু'বাহু এগিয়ে আসে রূপলালের, আলিঙ্গন করে গদগদ কণ্ঠে বলে, 'নেহি, নেহি, কোউন্ গোসা কিয়া !'

একটু একটু ক'রে রক্তিম আভায় মুখখানি উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তখন মতিয়ার। কিন্তু এতো গেল স্বামী সোহাগ। বাইরে কাজে বেরিয়ে কম উৎপাত সহ্য ক'রতে হয় না তাকে। চারদিক থেকে অজস্র তৃষিত চোখ অনবরত গ্রাস ক'রতে চায় মতিয়াকে,—জগনের মতো ক'রে সোহাগ ছুঁড়ে দেয় তাকে লক্ষ্য করে। মাঝে মাঝে মন বিচলিত হয় বৈ কি মতিয়ার ! নানা ব্যাধির প্রকোপে প্রায় বুড়িয়ে গেছে রূপলাল ঃ গিঠে বাত, কোমর দরদ, বদহজম; অল্প বয়সেই কানের দু'পাশ দিয়ে চুলগুলো শাদা হ'য়ে উঠেছে। দাওয়াখানা থেকে কত অষুধ এনে দিয়েছে মতিয়া, কিন্তু কাজ হ'লো না, সব ঝুটো, বেমালুম পানি।

মুখের মুচ্‌কি হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে মতিয়ার।

ওদিক থেকে জগন আরও খানিকটা মুখর হ'য়ে ওঠে।

অলক্ষ্যে কটাক্ষপাত ক'রে দাঁড়ায় এসে কুলি-কামিনদের সুপারভাইজিং ইন্‌চার্জ নরেন মুন্সী ঃ 'এই, কেয়া হোতা হ্যায় উল্লুক, ঠিক্‌সে কাম করো।'

নিজের মধ্যে সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে জগন, হাতুড়িটাকে আবার শক্ত ক'রে ধরতে চেষ্টা করে হাতের মুঠোয়।

শম্বুকগতিতে একটু একটু ক'রে পা এগোতে থাকে সামনের দিকে নরেন মুন্সীর। বার বার ক'রে ঘুরতে থাকে তার বাঁকা চোখের চাউনি। মতিয়ার রূপ কি দৃষ্টি এড়াতে পাবে কারুর? একুশজন মজুরাণী খাটচে ইঁট ভাঙার কাজে। কারুর সংগে মতিয়ার তুলনা হয় না। মতিয়ার তুলনায় তাদের সবাইকে মনে হয় বিকৃত, বিসদৃশ, বিকলাঙ্গ।

চক্রাকারে ঘুরে এসে আবার খানিকটা পায়চারী শুরু ক'রে দেয় নরেন মুন্সী মতিয়ার সামনে দিয়ে; পকেট থেকে পাসিংশো'র প্যাকেট বার ক'রে ঠোঁটের একপাশে কায়দা ক'রে ধরিয়ে নেয় একটা।

—'বাবু, শুনিয়ে।'—মতিয়ার গলা।

কি বল ?' মুখ দিয়ে একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আগ্রহসহকারে কাছে এগিয়ে আসে নরেন মুন্সী।

—'মুঝে মালুম হ্যায় কি, আপ্‌কো গদিমে একঠো আচ্ছি দাবাখানা হ্যায়।'

—'কেউ কি দাবা খেলে যে দাবাখানা থাকবে !' মুখে মৃদু হাসি টেনে তক্ষুনি আবার সেটুকু চেপে নেয় নরেন মুন্সী।—

'দাবার চাল পছন্দ করেন না খোকাবাবু, শুনলে ধরে নিয়ে সাজা দেবে তোকে।'

মতিয়া বুঝতে পারলো—কথাটা ধ'রতে পারেন নি ইন্‌চার্জবাবু। 'ই তো ভারী তাজ্জবকা বাত।' থেমে মতিয়া বলেঃ 'মুঝে মালুম হ্যায় কি, আপ্‌কো এক্‌ঠো ডাগ্‌দরখানা হ্যায়। মেরী মরদকাওয়াস্তে হুঁয়াসে কোই দাওয়াই মিলে গি ?'

আর একবার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে নেয় নরেন মুন্সী ঃ 'ও—এই বাত্, ওষুধ চাই তোর ?' কিন্তু তক্ষুনি খচ্ করে ওঠে মনের ভিতরটা। মতিয়ার তবে মরদ আছে, স্বামী আছে তবে মতিয়ার !

—না থাক্‌লেই যেন মতিয়াকে আর ভালো মানাতো, অন্ততঃ কথাটা না জানলেও ভালো লাগ্‌তো নরেন মুন্সীর। খানিকক্ষণ ধ'রে নীচের ঠোঁটটাকে দু'পাটি দাঁতের মধ্যে নিয়ে কাম্‌ড়াতে লাগ্‌লো সে।

হাতের চলন্ত হাতুড়িটাকে থামিয়ে কতকটা উচ্ছল হ'য়ে উঠ্‌লো মতিয়া ঃ হাঁ, হাঁ, ওষুধ মাঙ্‌তা, উতো দাওয়াইই হ্যায়—মগর শুনিয়ে বাবু, গরীব আদ্‌মি পয়সা দেনে নেই সেক্‌তী হাম।'

মনে মনে হাস্‌লো একবার নরেন মুন্সী ঃ যাওনা খোকাবাবুর কাছে, বিনে পয়সাতেই দাওয়াই মিল্‌বেখন। চাই কি মোহরও মিলে যেতে পারে সেই সংগে। খোকাবাবুর কীর্ত্তি জানে না, এমন লোকও আছে নাকি এই সিকদারের চরে!—মনে মনে নিজের কল্পনাকেই কেমন যেন সহ্য করে উঠ্‌তে পারলো না নরেন মুন্সী। সত্যিই মতিয়া গিয়ে শেষ পর্যন্ত খোকাবাবুর সামনে উপস্থিত না হয়। ক্ষেপিয়ে নেবে তবে সে সমস্ত শিকদার বাড়ীটাকে। খানিকটা ঈর্ষ্যাকাতর দৃষ্টিতে একবার তাকালো সে মতিয়ার চোখে চোখে—'পয়সার ব্যাপার সে আমি জানি কি, দাওয়াইওয়লার মর্জি।''

হঠাৎ পিছন থেকে একখানি হাত এসে মৃদুভাবে নুয়ে পড়ে নরেন মুন্সীর ঘাড়ের উপর ঃ 'চলুন ওদিকে, ব'সে গল্প করি; কাজ ক'রতে দিন ওদের।

গণেশ কাঞ্জিলাল ঃ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড তরফের সুপারভাইজার। দক্ষিণ হাউলীর দেড় মাইল দূর থেকে হঠাৎ তার ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব।

খানিকটা হক্‌চকিয়ে 'এ্যাবাউট্‌টার্ন' হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো নরেন মুন্সী। নিজের সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্‌স্‌ নিয়েই মুখ উঁচিয়ে তাকালো সে। শিক্‌দার জমিদার তরফের এ্যাপয়েন্টেড্‌ ইন্‌চার্জ সে—এ সম্বন্ধে আগাগোড়া সচেতন নরেন মুন্সী। ব'ললো, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ এই ঝাঁ ঝাঁ রোদের মধ্যে—'

গণেশ কাঞ্জিলাল বল্‌লো, 'দক্ষিণ-পুরে টার্মিনাশ চর্কাদিঘীর সার্ভে শেষ ক'রে এলাম। ওখানে কুলি লাগিয়ে দিয়েছি সতেরজন, মিড্‌ল্‌ওয়েতে খাট্‌চে ফিমেল ত্রিশজন আর মে'ল পঁয়ষট্টি জন। আপনার চরের এদিকটায় আরও র‍্যাপিড্‌ ওয়ার্ক্‌ হবার দরকার।"

সামনের দিকে এগোতে থাকে দুজনে।

—'কুলি-মজুরাণীদের দু'একদিন পর-পর অল্টারনেট্‌ এরিয়ায় ওয়ার্ক ক'রতে দেওয়া দরকার, এ সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?'—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় গণেশ কাঞ্জিলাল।

নরেন মুন্সী বলে ঃ 'তাতে কাজ হ্যাম্পার ক'রবে না কি?'—মনে মনে একবার মতিয়াদের স্থান পরিবর্তনের কথাটা ভেবে দেখ্‌লো নরেন মুন্সী। বিশেষ ক'রে মতিয়া এ এরিয়া ছেড়ে চ'লে গেলে সত্যিই যেন কেমন হবে!

জবাব দেয় গণেশ কাঞ্জিলাল ঃ 'কাজের পিছনে বরং আরও জোর চাপ পড়বার ভয় থাক্‌বে।'

—'এ্যাজ ইউ থিঙ্ক্‌ বেটার।'—এক রকম নৈর্ব্যক্তিকভাবেই কথাটা ব'লে প্রসঙ্গটা শেষ ক'রতে চায় নরেন মুন্সী।...

সশব্দে মুখর হ'য়ে উঠেছে চারপাশ। চ'লেছে ইঁটের বুকে হাতুড়ির শক্ত ঘা, ব্যাগের পর ব্যাগ জল ছিটিয়ে দিচ্ছে ব্যাগ-ম্যান, তারপর সুর্‌কি, চুণ আর খোয়া মিলিয়ে অনবরত পড়ছে 'দুরমুশের' দুমদাম ঘা।

নতুন বাস-রুটের কাজ ঃ উত্তর-পশ্চিম মোহনপুর থেকে সিকদারের চর হ'য়ে দক্ষিণ-পূবে চর্কাদিঘি পর্যন্ত বিস্তৃত রুট। মোহনপুরটা এই সিকদার চরের সিকদারদেরই অংশ। এ অঞ্চলে সিকদারদের প্রতিপত্তি আজকের নয়, দীর্ঘকালের। আজ বরং কালের পরিবর্তনে পূর্বের সে ঐতিহ্য, সে প্রতিপত্তি ক্রমে বিলুপ্ত হ'তে বসেছে। সাম্প্রতিক দিনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সিক্‌দারদের গোড়ার দিকের ইতিহাস সম্পর্কে আধুনিককালের মানুষদের কৌতূহল থাকা তাই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গতঃ সেই দিকেই বরং একবার দৃষ্টি ঘুরাই।—

বুরুল না রঙিণী—কি একটা শাখা নদী মজে গিয়ে চর জেগেছিল অনেককাল আগে। নদীর জলায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তখন বনমালী সিকদারের। কুমীরের কঙ্কাল পিঠের মতো চরটা জেগে উঠ্‌লে সম্পূর্ণ এলাকাটাই তাই বনমালীর হাতে এসে গেল। এতকালের মাঝিমাল্লা যারা ছিল, একে একে যে যার মতো স্বতন্ত্র নদীর দিকে ভাগ্‌লো। যে সমস্ত জেলে ছিল সিকদারের মাইনে-করা, তাদের কেউ কেউ কাঁধের উপর জাল ফেলে খাল-বিলের গাঁয়ের উদ্দেশ্যে পুত্রপরিবার নিয়ে ছুট্‌লো, কেউ কেউ লাউশাক, মুলোশাক, কুম্‌রোডাটা বে'চে নতুন পদ্ধতিতে জীবন আরম্ভ ক'রলো। বনমালী সিকদার জমিদারী তহবিল থেকে তাদের জন্য মাসিক তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকা হারে ভাতার' ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। মেজাজ ভালো থাক্‌লে কেউ কোনো আবেদন নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালে ফিরতো না। ঘরের তাক ভর্তি সাজানো থাক্‌তো স্কচ্‌ থেকে শুরু ক'রে ফ্রেঞ্চ্‌...স্কাণ্ডানাভিয়ান পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের মদের বোতল। যখন যেটা খুশি ছিপি খুলে ঢেলে নিতেন গ্লাসে, তারপর চল্‌তো প্রাণোৎসব। এই সময়টাতেই মেজাজে থাক্‌তেন বনমালী। কালীদিঘীর পানু গোঁসাই এমনি একটা মুহূর্তেই বাবা সিদ্ধেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার নাম ক'রে নগদ সাত হাজার টাকা হাত করে নিয়ে যায় বনমালী সিকদারের কাছ থেকে। জড়িতকণ্ঠে বনমালী শুধু একবার বলেছিলেন, "ও ছাই বাবার মন্দিরই করো, আর মার মন্দিরই করো, মাঝে মাঝে প্রসাদ কিছু পাঠিয়ো বাপধন, বুঝেছ?' —'আজ্ঞে কর্তা' বলে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে এসেছিল সেদিন পানু গোঁসাই। তারপর একদিন এসে পাথরের থালায় ক'রে দু'পাঁইট মদ উপহার দিয়ে গেছে সিকদার-কর্তাকে বলেছে—'হুজুরের জন্য যৎসামান্য প্রসাদ এনেছি।'—বনমালী সিকদার তাতেই খুশি। এমনি করে কম লোক লুটে নেয়নি বনমালীর অর্থ। শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত সম্পত্তির উপর জে'কে ব'সলো এসে ডোমচাঁ'র বিখ্যাত নর্তকী কৃষ্ণকুমারী। প্রথম প্রথম সারারাত্রি ধ'রে নাচতো কৃষ্ণকুমারী, সংগে চল্‌তো ক্লারিওনেট আর তবলার সংগত। বনমালীর মুখ দিয়ে গড়িয়ে প'ড়তো স্কচের ফেনা। একদিনেই যথাসর্বস্য তাকে দান করে বসতে গিয়েছিলেন বনমালী, কিন্তু হিতে বিপরীত ভেবে জমিদার বাহাদুরকে ধীরে ধীরে খেলিয়ে নিতে লাগ্‌লো নর্তকী। শেষ পর্যন্ত একটা মারাত্মক লোমহর্ষক ব্যাপার। একটা গুরুতর রক্তক্রিয়া। হঠাৎ একদিন গভীর নিশিতে দ্বারবদ্ধ ঘর থেকে বাঘের মতো তীব্র হুংকার শোনা গেল বনমালী সিকদারের। থেমে গেল ঘুঙুর, থেমে গেল ক্লারিওনেট আর তবলার বোল। বিষধর গোখ্‌রোর মতো বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো বনমালীর মদ-সিক্ত জিহ্বা ঃ 'হারামজাদী, হারামীর যায়গা পাসনি, কুকুর লেলিয়ে দেবো তোকে নিজের হাতে গুলী করে মারবো তোকে, জানিস?" মুহূর্তের মধ্যে কেঁপে উঠলো সমস্ত সিকদার বাড়িটা। কেউ কোনো কারণ বুঝলো না, শুধু যে যার মতো বিছানায় বসে বসে কাঁপলো। —দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল কৃষ্ণকুমারী দৌড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐ চরের বুকে। কিন্তু শিকার জানতো বনমালী সিকদার। জীবনে হাতীর পিঠে চ'ড়ে, গাছের ডালে বসে বহু বাঘ, ভালুক আর বন্য শূকর মেরেছেন তিনি তাক্‌ ক'রে ক'রে। কৃষ্ণকুমারী তো সামান্য শিকার। সেই অন্ধকার নিশুতি রাত্রির মাঝে চরের বুকে বার দুয়েক শোনা গেল বন্দুকের শব্দ আর সেই সংগে নারীকণ্ঠের একটা কাতর আর্তনাদ। ভোরে কাক ডাকতেই বিষয়টা পরিষ্কার হ'য়ে গেল চরের মানুষদের কাছে ঃ নর্তকী কৃষ্ণকুমারী মৃতাবস্থায় পড়ে আছে চরের বুকে। তার বুকের তাজা রক্তে লাল হয়ে গেছে চরের বেলে মাটি।—কিছুক্ষণ কেমন মোহাবিষ্টের মতো ব'সে ছিলেন বনমালী সিকদার, হঠাৎ আবার তিনি সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তচনচ করে দিতে লাগলেন ঘরের জিনিসপত্র, ভেঙে ফেলতে লাগলেন যা কিছু পেলেন হাতের কাছে। কড়ি-বর্গায় ঝোলানো স্তরে স্তরে ঝাড়-লণ্ঠন, কৌচ, শোফা, কাচের-আলমারী, অর্গান, ঘরের দেয়াল, দরজা, জান্‌লা—। দু-সাহসে এতক্ষণে বাধা দিয়ে দাঁড়ালেন এসে বসন্ত সিকদার ঃ বনমালীর ঔরসজাত ছেলে, এই সিকদার-জমিদারীর একমাত্র বংশধর।—'ছিঃ বাবা, এ কি করছেন, এমনটা আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না।'—পিতা-পুত্রে একটা জোর কুস্তিই এক রকম। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হ'য়ে লুটিয়ে পড়লেন বনমালী। ডাক্তার এসে ব'ল্‌লেন, 'হঠাৎ একটা মানসিক চাঞ্চল্য থেকেই এই

অবস্থা, এমন কেস বড় একটা আমাদের হাতে পড়ে না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেণ্ট হওয়া দরকার।' কিন্তু তার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন বনমালী সিকদার।

এক লাখ টাকা সম্পত্তির শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েক হাজার টাকা অবশিষ্ট পেলেন হাতে বসন্ত সিকদার। বাকীটা সমস্ত নিঃশেষ করে গেছেন শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌বার আগে বনমালী।...

সেই থেকে চরটা আর বড় একটা কেউ মাড়াতো না। সবাই বল্‌তো—'ওখানে নর্তকী কৃষ্ণকুমারীর প্রেত ঘুরে বেড়ায়।' সেই থেকে মরুভূমির মতো দীর্ঘকাল প'ড়েছিল চরটা। দীর্ঘকালেরই ঘটনা বটে। সে সব ঘটনা আজ জনশ্রুতিতে পর্যবসিত হ'য়েছে মাত্র।

কিন্তু পুরোনো স্মৃতি প্রতিমুহূর্তে কাঁটার মতো বেঁধে শুধু বসন্ত সিকদারের মনে। মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যান তিনি—বনমালীর ছেলে হ'য়েও কেমন ক'রে স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ হলেন তিনি! শুদ্ধাচারী জীবনে নৈতিক চরিত্রের মানুষ বসন্ত সিকদার। কিন্তু এরই মধ্যে আর একটি ব্যতিক্রম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে খোকা ঃ বঙ্কিম,—বসন্তের ছেলে। এলোপ্যাথিক ডাক্তারী শিখতে গিয়ে হয়ে এসেছে হোমিওপ্যাথ। স্বভাবে চরিত্রে দাদুরই দ্বিতীয় সংস্করণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরের দুয়োরে দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে দয়াবতার হ'তে গিয়ে নিজেকে একটি সারমেয়ে পরিণত ক'রে বসলো খোকা। রোগিনীদের তরফ থেকে একদিন নালিশ উঠলো সদরে। বসন্ত সিকদার কাছে ডেকে ছেলেকে বলে দিলেন আমাকে তোর বাপ বলে পরিচয় দিয়ে ঘরে বসে কোনো রকম কেলেঙ্কারী ঘটাতে পারবিনে। আমার সমস্ত কিছু গেছে, যেতে হয় তুইও যাবি; কিন্তু যতদিন আমি বেঁচে আছি, আমার জমিদারীর উপর বিন্দুমাত্র কলঙ্ক আনতে দেবো না।'

—এমনিতর কঠিন নৈতিক আদর্শের মানুষ বসন্ত সিকদার। বাপ আর ছেলের মাঝখানে একটা খাপছাড়া জীবন নিয়ে অনবরত শ্বাস টানছেন, চেষ্টা করছেন বাপের স্বেচ্ছাকৃত নষ্ট লুপ্ত জমিদারী ঐশ্বর্যকে আবার তিল তিল করে বাড়িয়ে তুলতে, চেষ্টা করছেন সত্যিকারের মানুষের মতো সম্মান আর ঐতিহ্য নিয়ে বাঁচতে। কিন্তু বড় ভয় তার খোকাকে ঃ বঙ্কিমকে।...

সিকদার অঞ্চলে নতুন লোক বাড়তে শুরু ক'রেছিল কিছুদিন ধরে। একদিন তারা এসে আবেদন নিয়ে দাঁড়ালো বসন্তের সামনে ঃ 'এদিকে কিছু একটা হাট-বাজার না বসালে আমাদের যে জীবনান্ত অবস্থা! এ অঞ্চলের রাজা আপনি, আপনি হুকুম করুন, কাল থেকেই সমস্তটা চর জুড়ে আমরা বাজার বসাই। আপনি শুধু দয়া করে আমাদের কিছু কিছু চালাঘর আর ছাপরা বেঁধে দিন। দোকান পিছু খাজনা দেবো আমরা সবাই।'

মন্দ নয় প্রস্তাবটা। এ কথাটা এতদিন ধরে ঘুণাক্ষরেও মাথায় আসেনি বসন্ত সিকদারের। নতুন খাজনা আসবে, জমিদারী রাজস্ব ফেঁপে উঠবে ধীরে ধীরে। বুবুল না রঙ্গিনী—সে-তো কবেই মরে গেছে; নতুন আর একটা জলার ব্যবস্থা। হ'লে আরও চমৎকার হতো। বঙ্কিম—মানে খোকা তার বিকৃত মস্তিষ্কে কিছুতেই বুঝতে পারছে না—কী ক'রে যেতে চান... কী রেখে যেতে চান তিনি তার জন্য!—হতভাগা।

কাগজের পর কাগজ টেনে নিয়ে ক'টা দিন ধরে কেবল প্ল্যান ক'রে কাটালেন বসন্ত সিক্‌দার। এখানে বসবে মনিহারী দোকান, মাছ আর দুধের বাজার বসবে ওখানে, ফ'রে ব্যাপারীদের ঢালাই তক্ত বসবে দক্ষিণের ঐদিকটায়...। নতুন একটা গঞ্জের মতো ঝল্‌মল্‌ করবে সমস্তটা চর। সব মানুষের আশীর্বাদ এসে জড়ো হবে সিকদার বংশের ভাগ্যে। আঃ—ভাবতেও আরামে চোখ বুজে আসে। প্রাণ চাঞ্চল্যে খানিকটা উচ্ছল হয়ে উঠ্‌লেন নিজের মধ্যে বসন্ত সিকদার।

•

ইতিমধ্যে এক রকম আকস্মিকভাবেই ঘটে গেল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাথে বাস-রুটের এই কন্ট্র্যাক্ট। চরের একটা নির্দিষ্ট অংশের জন্য বোর্ডের সাথে বার্ষিক খাজনা ব্যবস্থা। এতকাল মরুভূমির মতো পড়ে ছিল সমস্তটা চর; বাতাসে ধুলো উড়ে আকাশকে মলিন করে দিত, রৌদ্রতাপে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলন্ত হ'য়ে উঠ্‌তো এক একটি বালুকণা—যেমন ক'রে এখনও হয়। চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কার সাধ্য এ পথ দিয়ে হাটে! বন্ধই ছিল এক রকম লোক চলাচল। নর্তকী কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ও তার একটা প্রধান কারণ। সেই চরে একটু একটু করে আজ জীবন-সঞ্চারের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। এখানে পুরোপুরি মানুষের বাস হবে। কিলবিল করবে অজস্র জীবন, ভরে উঠবে সমস্ত জমিদারীটা। নিজের মধ্যে স্বপ্নাতুর হয়ে উঠ্‌লেন বসন্ত সিকদার। নায়বকে অর্ডার দিয়ে দিলেন তিনি চরে বাজার বসাবার ব্যবস্থা করতে। আগে থেকেই সহর হতে ইংরেজিনবিশ একজন ট্যাক্স-কালেক্টর এনে নায়েবের দপ্তরে কাজ দেওয়া হলো। সেই ট্যাক্স কালেক্টার নরেন মুন্সীর অতিরিক্ত কাজ পড়েছে আজ বাস-রুটের সুপারভাইজিং ইনচার্জগিরিতে। তাতেই সে পরিতৃপ্ত আপ্যায়িত, অনুগৃহীত। অন্ততঃ মতিয়ার মতো সুন্দরী মজুরাণীর রূপ দেখে দেখে মন না হোক চোখ দুটো পরিতৃপ্ত হয়তো বটেই।

কাজ শুরু হয়েছে রোলার-রোলিংয়ের। প্রাণপণে রোলারের দাঁড় ধরে স্যামনের দিকে টেনে চলেছে পুরো পঁচিশ জন কুলি-কামিন। এতদিনে ইঁট ভাঙায় হাতের কাজ কিছুটা কমেছে মজুরাণীদের। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো কিছুটা মতিয়াও। কিন্তু এ বাঁচাই তাদের বাঁচা নয়। অনবরত কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে চায় তারা। কাজই মতিয়াদের জীবন। দিনান্তে পয়সা চাই হাতে, নইলে দুপয়সার ছাতু কিম্বা ভুট্টার সঙ্গে একটা কাঁচা লঙ্কাও জুটবে না। তার উপর ঘরে মরদ রূপলালের আধি-ব্যাধির অন্ত নেই। দুদিন ধরে আবার একটা নতুন উপদ্রব জুটেছে, দিনের মধ্যে তিনবার করে বমি করে সমস্ত উঠোনটা ভাসিয়ে দেয়। রীতিমত জ্বালা হয়েছে তাকে নিয়ে এখন মতিয়ার। ভালো জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে সুখে থাকতে তারও কি ইচ্ছে করে না? অন্ততঃ মানুষ তো সে!

কাজের অবসরে নিভৃত সন্ধ্যায় একসময় পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায় মতিয়া বঙ্কিমের ডিস্‌পেন্‌সিং-রুমের সামনে। ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে একবার ডাকেঃ "ডাগ্‌দর বাবু?"

—"কে?" জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায় এসে বঙ্কিমঃ খোকা।

—"হাম মতিয়া।" —বলে সলজ্জে মাথা নীচু করে নেয় সে। পরিচয় দেয়—এখানে কর্তাদেরই অধীনে ইঁট ভাঙার কাজ করে সে।

খানিকটা ইতস্ততঃ করতে থাকে বঙ্কিম।

রূপলালের রোগের বৃত্তান্ত দিয়ে মতিয়া বলে, "গরীব আদ্‌মিকো মেহেরবাণী করকে কুছ্ দাওয়াই দি জিয়ে ডাগ্‌দর বাবু। ভগ্‌মান আপ্‌কো যাস্তি দেগা, পুরা কর্ দেগা আপ্‌কো ভগ্‌মান।"

সংকীর্ণ জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল বঙ্কিম মতিয়াকে আর শুনছিল তার মিঠে মিঠে কথা। ভালো লাগছিল। তার চরিত্রে এই জায়গাটিতেই সবচাইতে বেশী দুর্বলতা। পিতা বসন্ত সিকদারের কথায় সে নিজেকে বাপের অনুগামী করতে পারেনি, পেরেছে বরং দাদু বনমালী সিকদারের আদর্শকে বরণ করে নিতে। —নিঃশব্দে পাশের দরজাটা খুলে দিয়ে বঙ্কিম বল্‌লো, "ভিতরে এস।"

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে মতিয়া এসে ঘরে প্রবেশ করলো, দেখ্‌লো—কাঁচের আলমারীতে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে ক্ষুদে ক্ষুদে শিশি ভর্তি ওষুধ। মনে মনে কতকটা খুশী বোধ করলো মতিয়া।

ভিতর থেকে দরজাটা পুনরায় বন্ধ করে দিয়ে বঙ্কিম এসে এবারে নিজের চেয়ারটাকে খানিকটা সামনের দিকে টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসলো মতিয়ার।

—"কেওয়াস্তি কাহে বন্ধ্ কিয়া বাবু?"

—"রাত্রে বাইরের কোনো রুগি দেখি না। পাছে কেউ এসে গণ্ডগোল করে, শুধু এই জন্যেই—"

—'ও'—নিজেকে কেমন একটা অপ্রস্তুত বোধ করলো এবারে মতিয়া। —"তব্ তো মেরী বহুৎ কসুর হো গিয়া।"

—"নেহি, নেহি, কসুর হবে কেন! সবার দরকার তো আর সমান নয়।" বলে সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে দুফোঁটা নিছক এ্যাল্‌কহল মিশিয়ে ছোট দুটি পুরিয়া করে নিল বঙ্কিম। —অনেক সময় ডাক্তারের উপর বিশ্বাসেই রুগী রোগ সেরে যায়। ভাবটা এই যে, শুধু এই দুফোঁটা এ্যাল্‌কহলেই কাজ হয় কিনা, পরখ করতে চায় সে। বললো, "আবার যদি বমি হয়, তবে দুটো কাগজি লেবু খাইয়ে দেবে, তারপর এই থেকে এক "পুরে" ওষুধ।"

ওষুধ হাতে পেয়ে যেমন খুশী হলো মতিয়া, লেবুর কথাটা শুনে তেমনি মনটা তার দমে গেল। এ সময়ে এ অঞ্চলে কাগজি দুষ্প্রাপ্য, যাও-বা পাওয়া যাবে, দাম হাঁকবে হয়তো চার আনা! ঐ চার আনায় স্বামী-স্ত্রী দুজনের পুরো একটা দিনের খোরাকী হয়ে যায়। কিছুটা ইতস্ততঃ করলো মতিয়াঃ "কাগ্‌জি—, কাগ্‌জি তো আব্‌ভি বহুৎ মাঙ্গা হ্যায় ডাগ্‌দর বাবু!"

"মাঙ্গা তো হ্যায়।" —উঠে দেরাজ খুলে একটা টাকা বার করে দিল বঙ্কিম, বললো, "এই নাও, এই দিয়ে লেবু কিনে নিও।"

কিন্তু তক্ষুণি হাত পেতে টাকাটা নিতে পারলো না মতিয়া। হাতখানি কেমন সন্ত্রস্ত কচ্ছপের মতো আঁচলের আড়ালে সেঁধিয়ে যেতে লাগলো। লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠলো মুখখানি। বললো, "নেহি, নেহি, ই কেয়া বাৎ, ই হাম্ নেই লেউঙ্গা।"

—"ভালোবেসে কেউ দিলে নিতে হয়। নাও ধরো।" বলে এক রকম জোর করেই মতিয়ার হাতে টাকাটা গুঁজে দিল বঙ্কিম। মনের মধ্যে কেমন একটা গোপন শিহরণও বোধ করলো সেই সঙ্গে।

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে রইল মতিয়া। মুখ দিয়ে সহসা কোনো কথা বেরোলো না। ডাক্তারবাবু তবে সত্যিই ইতি-মধ্যে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে! "ভালোবাসা" শব্দটা মতিয়া শুনেছে এর আগে। শব্দটা বাংলা হলেও অর্থ জানে সে। তাই আরক্তিম মুখে আরও কিছুক্ষণ সে অভিভূতের মতো বসে রইল।

বঙ্কিম বললো, "দিন কত করে রোজগার করো?"

—"কুছ্ ঠিক নেহি। যেইসা হাতুড়ী চল্‌তা হ্যায়, ওইসি। কোই দিন রূপেয়া ভি পূরা হো যায়, কোই কোই দিন আউর কম্‌তি।" —বলে কতকটা সহজ হতে চেষ্টা করে মতিয়া। তারপর স্বল্পক্ষণ থেমে বলেঃ "আব্‌ভি উঠনে চাঁতে হু। নেহি তো মেরী মরদ বহুৎ গোসা হো যায়গা।"

—'আচ্ছা।' মতিয়ার মুখের উপর আর-একবার একাগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চেষ্টা করে বঙ্কিম।—'ফিন্ কাল আও। রুগীর জন্য চিন্তায় থাক্‌বো।'

—'হাঁ, জরুর আউঙ্গা।'—ব'লে বেরিয়ে এলো মতিয়া।

বেশ কিছুটা তখন রাত হ'য়েছে। নরেন মুন্সীর তাই ব'লে কিছু দৃষ্টি এড়াল না। যেটা সে ভয় ক'রছিল, সেটাই হ'য়ে গেল। কেমন একটা অবচেতন ঈর্ষায় মনে মনে জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌লো নরেন মুন্সী।

বঙ্কিম ততক্ষণে তার সামনের খোলা জানলাটাও বন্ধ ক'রে দিয়েছে। বাড়িটার এক-পাশে কোণাকুণি ঘর তার। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট, নিরিবিলি। বসন্ত সিকদার থাকেন ভিতরের দিকে আর-একপ্রান্তে। এখান থেকে কোনো আওয়াজ গিয়ে সচরাচর সে-অব্দি পৌঁছায় না। তার ডাক্তারী শাস্ত্র নিয়ে স্বর্গরাজ্য রচনা করে এখানে বঙ্কিম।

চাকর নিঃশব্দে পাশে তার শোবার ঘরে এসে খাবার দিয়ে গেল। নিঃশব্দে গিয়ে খেতে ব'সলো বঙ্কিম।

ততক্ষণে রূপলালের হাতে একটা প্রচণ্ড রকম মার খেয়ে উঠেছে মতিয়া।—'কাহে এত্‌না রাত কিয়া? কুত্তি, বৎতমিজ, তু রাণ্ডি হো গই।'—রোগক্লান্ত কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষিত শব্দ।

যতবার বলতে যায় মতিয়া যে, ডাক্তারের কাছ থেকে তারই জন্যে ওষুধ আনতে গিয়েছিলো, জমিদার বাড়ির দয়ালু-হৃদয় ডাক্তারবাবু একটা টাকা পর্যন্ত তাদের সাহায্য করেছেন,—ততবারই আরও বেশি মারমুখো হ'য়ে ওঠে রূপলাল। কোনো কথাই সে শুনতে চায় না মতিয়ার।

পরদিন কাজে বেরিয়ে দেখ্‌লো মতিয়া—বাস-রুটকে পাশে রেখে বাকী সমস্তটা চর জুড়ে নতুন বাজার ব'সে গেছে। কেউ চারপাশে চারটে নড়বড়ে কঞ্চি পুঁতে তার উপর দিয়ে ছেঁড়া চট টানিয়ে নিয়েছে, কেউ কেউ সংযুক্ত-ভাবে গোলপাতার ছাউনি ক'রে নিয়েছে অনেকটা জায়গা মিলে। তরিতরকারী, মাছ দুধ, চাল, ডাল, জোড়া জোড়া নারকেল, বড় বড় মানকচু—নানা জিনিসে ভরে গেছে সিক্‌দার-চরের বাজার। মতিয়াও সওদা ক'রে নিল কিছু এক ফাঁকে। বেশ লাগছিল তার নতুন বাজারটা দুচার পয়সার সওদা মতিয়ার, তবু দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে দাম যাচাই ক'রে ফিরলো সে বাজার থেকে। এদিকের রাস্তার কাজ একরকম শেষই হ'য়েছে, আবার নতুন যায়গায় কাজ দেখতে হবে। একটা মস্তবড় চিন্তা র'য়ে গেছে মাথায়। দিনগত পাপক্ষয় জীবন, কখন্ এই দু'চার পয়সার সওদাও বন্ধ হ'য়ে যায়, ঠিক্ কি! মনে মনে ডাক্তারবাবুর প্রতি একটা অসীম শ্রদ্ধায় মাথা আপনি থেকেই নত হ'য়ে এলো মতিয়ার। দয়ালু ডাক্তারবাবু, তাঁর কৃপার তুলনা নেই। সংসারে কে এমন নিজে থেকে টাকা দিয়ে পরকে সাহায্য করে!

সন্ধ্যায় গিয়ে আবার সে ডাকলো—'ডাগ্‌দর বাবু!'

আজও কালকের মতই জানলায় এসে মুখ বাড়ালো বঙ্কিম সিক্‌দার। মতিয়ার জন্যেই যেন অপেক্ষা ক'রছিল সে।—'আইয়ে, ভিতরমে আইয়ে। আমার রুগী কেমন আছে?'

—'থোরা আচ্ছা।' পাশের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ব'সলো মতিয়া।

রুগী ভালোর দিকে জেনে ডাক্তার নিশ্চিন্ত। দু'ফোঁটা এ্যাল্‌কহলেই তবে কাজ হয়! একেই বলে ধন্বন্তরী। মনে মনে হাসলো একবার বঙ্কিম। ক্রমে তার শিকার তার আয়ত্তের মধ্যে এসে প'ড়ছে। বলে, 'তোমাদের দেশ কোথায় মতিয়া?'

—'মজঃফরপুর।'

—'বাঙলা মুলুকে কবে এসেছ?'

—'দশ বারো বরষ হুয়া।'

—'সাদি হ'য়েছে ক'বছর?'

—'পাঞ্ ছ' বরষ তো হো গিয়াই!'

—'পাঁচ ছ' বছর!' থামলো একবার বঙ্কিম।

মতিয়া বলে, 'আজ দোস্‌রা দাওয়াই মিলে গি?'

—'জরুর।' থেমে চোখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে বঙ্কিম বলেঃ 'আউর কুছ্?'

—'কেয়া?' বোকার মতো চোখ দুটো তুলে ধরে মতিয়া।

নীরবে একবার ঘুরে ব'সে দেরাজটা খুলে ফেলে বঙ্কিম, হাতের মধ্যে উঠে আসে পাঁচ টাকার একখানি কর্‌করে নোট। বলেঃ 'এই দিয়ে একটা নতুন পিরান কিনে প'রে আসবে, কেমন?'

ভয়ে রুদ্ধ হ'য়ে যায় মতিয়ার। অবাক চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে মতিয়া নোটখানির দিকে। জীবনে কোনোদিন এতবড় একখানি নোট হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রবার সৌভাগ্য হয়নি তার। হাতখানি তাই নিস্‌পিস্ ক'রছিল ঔৎসুক্যে, জ্বালা ক'রছিল ভয়ে।

বঙ্কিম হাতের মধ্যে সেখানি গুঁজে দিল মতিয়ার। কেমন একটা বলিষ্ঠ চাপ বোধ ক'রলো হাতে মতিয়া। মনে মনে একবার তুলনা ক'রে দেখলো—রূপলালের হাত কি কড়া, কি শক্ত শক্ত আঙুলগুলি তার।

অবস্থাটা আজ আর এতটুকুও চোখ এড়াল না নরেন মুন্সীর। অন্ধ ঈর্ষায় সে হিংস্র হ'য়ে উঠেছিল নিজের মধ্যে। এতক্ষণ নেপথ্যে থেকে পরিষ্কার সে দেখেছে সব কিছু। খোকা-বাবুর এ টাকার জাল বড় কঠিন; একবার যে জড়িয়ে পড়ে নিষ্কৃতি পায়না সে বড় একটা।

—তেমনি ক'রেই নিঃশব্দে গা ঢাকা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো নরেন মুন্সী বাজার-পট্টিতে। রাত এমন একটা বেশী হয়নি। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখলো সে একবার জগনকে—চোখ ঠেরে প্রথম যাকে কথা ব'লতে দেখেছিল মতিয়ার সঙ্গে। তাকে পেলেই সব কাজ সিদ্ধি। দলের লোক, নিশ্চয়ই মতিয়ার মরদকে চেনে জগন। সময় থাকতে কথাটা তার কানে তুলে দেওয়া ভালো।—দুষ্ট ক্রিমির মতো অনবরত একটা অন্ধ ঈর্ষা দংশন ক'রছে নরেন মুন্সীকে। সেই দংশনে অনবরত জ্বলছে নরেন মুন্সী।

আজ আর শুধু এ্যালকহলের ফোঁটা ঢেলে ফাঁকি দিল না বঙ্কিম। গ্লোবিউলসের বড়িতে দু'ফোঁটা ইউপেটার পার্ফ—ত্রি-এক্স ঢেলে 'পুরিয়া' ক'রে হাতে তুলে দেয় মতিয়ার। বলে, 'কাল আবার এসে জানিয়ো, কেমন আছে! পিরান কিনে প'রতে কিন্তু তাই ব'লে ভুলো না।'

—'নেহি।' উঠতে উঠতে মতিয়া বলে, 'আউঙ্গি, ফিন্ কাল সাঁঝমে আউঙ্গি। আপ্‌কো দিল্‌মে বহুৎ প্রেম হ্যায় ডাগ্‌দের বাবু, ভগ্‌মান আপ্‌কো পুরা কর্ দেগা।'

এ প্রেম যে বঙ্কিমের ভালোবাসার কথা নয়, সেটুকু হয়ত বুঝলো না বঙ্কিম। শুধু অপলক নেত্রে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আজও কালকের মতই জানলাটাকে ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে কল-ঘরের দিকে চ'লে গেল সে।...

বাস-রুটে রোলার রোলিং চ'লেছে দু'দিন ধরে। পথের এপাশে ওপাশে দুটো লাল বাতি জেলে বোর্ড থেকে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেঃ রোড ক্লোজড্। বাজারটা গমগম করছে পুরোদমে। সকাল থেকে বিকেলের দিকটাতেই বাজারটা জমে উঠছে বেশি। দিনে সূর্যতাপে চরের বালি থেকে আগুনের গোলা ছুটতে থাকে। বিকেলে ক্রমে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে সমস্ত চরটা। এই সময় থেকেই শুরু হয় লোকসমাগম। অনেক রাত অবধি তাই বাজারে আলো দেখা যায়। তখনও সওদা করে ফেরে অনেকে। পাশে দাঁড়িয়ে আধবুড়োমতো এক দেশোয়ালী গলায় দড়িতে ঝোলানো ঢোলকে চাঁটি দেয়, আর সঙ্গের ছোট্টমতো একটি কিশোর তালে তালে গান করে—

হায় ভগ্‌মান্, দুনিয়া তেরা
লুঠ্ লিয়া সব বেইমান,
শত্রু নিধনকেয়াস্তে আ যাও
আ যাও দয়াল ভগ্‌মান্।...

দেখতে দেখতে চক্রাকারে লোক দাঁড়িয়ে যায় অনেক, পয়সাও দেয় বা কেউ কেউ দু'একটা। সেলাম জানিয়ে সবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে কল্যাণ কামনা করে দেশোয়ালীটি আর তার বাচ্চা কিশোর।

তেমনি ক'রে মতিয়াও মনে-প্রাণে কল্যাণ কামনা করে ডাক্তার বাবুর। পরদিন যথাসময়েই আবার এসে ব'সলো সে বঙ্কিমের ডিসপেন্সিং রুমে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। রূপলালের রোগের কথা আজ প্রধান নয়, প্রধান আজ মতিয়ার নিজের অদৃষ্টের কথা। বলে, 'মেরী ওয়াস্তে ই দুনিয়া নেহি ডাগ্‌দেরবাবু, লাখ্‌পতি—কেওয়াস্তে দুনিয়া। বিল্‌কুল পয়সাকো খেল্, আউর কুছ্ নেহি।'

—'কেন নেই মতিয়া? পয়সা তো সংসারে অনেকেরই থাকে, কিন্তু তুমি? তোমার মতো এমন রূপ, এমন সুরৎ ক'জনের আছে দুনিয়ায়? নিজেকে চেনো না তুমি তাই—। যার এমন রূপ, সংসারে তার কিসের অভাব?' —একটা কামার্ত বন্য জানোয়ারের মতো ঘোলাটে চোখ দুটো স্থিরভাবে নিবদ্ধ ক'রতে চেষ্টা করে বঙ্কিম মতিয়ার মুখের দিকে।

মাথা নিচু ক'রে নিয়ে মতিয়া বলেঃ 'ই সরম্‌কী বাত্। আউর বলিয়ে মত্। বহুৎ সরম লাগ্‌তি মুঝে, দাগ্‌দের বাবু।'

নীরবে মতিয়ার হাতের মধ্যে আজ একখানি পুরো দশ টাকার নোটই গুঁজে দেয় বঙ্কিম।

সেই মুহূর্তে বাইরে কার অসহিষ্ণু কণ্ঠের একটা চাপা আর্তনাদ শোনা যায়।

পাশের দরজাটা এক সময় খুলে যায়। ত্রস্তে বেরিয়ে আসে মতিয়া। কিন্তু তক্ষুণি কেমন একটা যাদুক্রিয়া ঘ'টে যায় বারান্দার সামনে। মতিয়ার চোখে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে রূপলাল। আজ আর ঘরের মেঝেয় প'ড়ে সে কাতরাচ্ছে না, তার সমস্ত শরীরে এসেছে নতুন ক'রে রক্তের জোয়ার। যে হাতে হাতুড়ি ধ'রে ইঁট ভেঙে খোয়া করে মতিয়া, সেই হাতের কব্জিখানি কখন্ রূপলালের বজ্রমুষ্টিতে এসে ধরা পড়ে—যেমনি ক'রে এসে ধরা পড়ে সাপের মুখে ব্যাঙ্। সশব্দে ফেটে পড়ে রূপলালঃ 'আচ্ছি দাওয়াইকাওয়াস্তে হরদফে তু ঘুম্‌তী হ্যায় ইধার। রাণ্ডি, কুত্তি, শুয়োরকা বাচ্চি, হারামী, হামারা তু খেইল্ দেখাতা?—'

সাথে সাথে ভয়ে, দুঃখে, লজ্জায় নিজের মধ্যে আর্তনাদ ক'রে ওঠে মতিয়া। কি করবে, কি জবাব দেবে, কিছু বুঝতে পারে না সে।

রূপলালের কণ্ঠ ততক্ষণে বজ্রনির্ঘোষে সমস্ত চরটাকে ছেয়ে ফেলেছেঃ 'হামারা আউরৎ কো লিয়ে হারামী ডাগ্‌দের রাণ্ডিখানা খুল্ দিয়া ইধার, বল্‌তা—বেমারী সারতা, দাওয়াই মিল্‌তা হ্যায় হি'য়া। শালা, কুত্তা—'

এক একটা স্প্লিণ্টারের মতো এসে শব্দগুলো বিদ্ধ হ'তে থাকে বঙ্কিমের বুকে। ইচ্ছে হয়—এক্ষুণি সে ঘরের বড় বন্দুকটাকে নিয়ে সামনে দাঁড়ায় গিয়ে ঐ উল্লুকটার। কিন্তু অসম্ভব। লক্ষ্য করে দেখে—সামনের দরজায় তার জন-সমুদ্রের বন্যা ব'য়ে যাচ্ছে। বাজারের দোকানীরা যে যার মতো দোকান ফেলে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়েছে কুলি, কামিন, মুটে, ঝাড়ুদার—দলে দলে সবাই। সবার মুখে তাদের এক কথা ঃ 'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!'

তখনো একইভাবে চ্যাঁচায় রূপলাল ঃ 'হাম বিচার মাঙতা, কাহে হামারা আউরৎকো রুপেয়া দে কে হাত কর্‌তা শালা ডাগ্‌দের?

বিষয়টা এতক্ষণে সবার কাছে একেবারে জলের মতো পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। বাজারের সমস্ত দোকানী, কুলি, কামিন, মুটে, ঝাড়ুদার—দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রত্যেকেই রূপলালের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ায়। বিচার চায় তারাও।

বাধ্য হ'য়ে এসে সামনে দাঁড়াতে হয় বসন্ত সিকদারকে। মনে হয়—সমস্ত আকাশ যেন উল্কার মতো এসে ফেটে প'ড়েছে তাঁর দু'চোখে। এভাবে এমন ক'রে কোনোদিন দাঁড়াতে হয়নি তাঁকে। তাঁর সমস্ত অধীন প্রজা আজ সম্মিলিতকণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে বিচারের। কিন্তু কার বিচার করবেন বসন্ত সিকদার? মজুরাণী ঐ মতিয়ার, বঙ্কিমের, না তাঁর নিজের? বাপ হ'য়ে ছেলেকে তিনি যেখানে শাসন করতে পারেন নি, সেখানে জমিদার হ'য়ে কী শাসন করবেন তিনি প্রজাদের? আজ তাই প্রজারা এসে উল্টো শাসিয়ে দাঁড়িয়েছে বিচারের কঠিন জিজ্ঞাসা নিয়ে। সিকদার-জমিদারী আজ একদিনে ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল চিরদিনের মতো। বৃথা চেষ্টা করা তাকে বাঁচিয়ে তুলতে, বড় ক'রে তুলতে। আজ সমস্ত রাজস্ব ঢেলে দিয়েও এই কঠিন অপমান, এই কঠিন বিচার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।—এ বিচার কি শুধু এরাই চাচ্ছে? নিজের মধ্যে বার বার করে শিউরে উঠেন বসন্ত সিকদার ঃ বিচার চাচ্ছে আজ চরের ঐ মাটির বুক থেকে নর্তকী কৃষ্ণকুমারীও। তার প্রেত অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানকার আকাশে, দীর্ঘশ্বাসে অভিশাপ দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে তাঁর সমস্ত জমিদার বংশকে। তা থেকে মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই। ইতিহাস বার বার ক'রে ঘুরে আসে; তার বিঘূর্ণিত চক্রফলকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় কত জনপদ, কত রাজত্ব। অনবরত সেই চক্রের মতো ঘুরচে বসন্ত সিকদারের মাথাটাও। 'হাঁ, বিচার করবো, অপেক্ষা করো তোমরা, বিচার ক'রবো আমি, নিখুঁত চুলচেরা বিচার।—বল্‌তে ব'লতে অন্দর-মহলে গিয়ে নিজের ড্রয়ার খুলে হাতে তুলে নিতে গান রিভলবারটাকে। কিন্তু বিচারের শেষ দণ্ডটাও আজ হঠাৎ যেন ফাঁকি দিয়ে বসে বসন্ত সিকদারকে। অসাবধানে যন্ত্রটা মেঝেয় গড়িয়ে প'ড়ে হঠাৎ একটা কঠিন বিস্ফোরণের মতো শব্দ হয়ে ওঠে, ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে সমস্তটা সিকদার মহলা।

দূরে বাস-রুটে দাঁড়িয়ে তখন নতুন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয় নরেন মুন্সী ঃ সুপারভাইজিং ইনচার্জ।

বিক্রমুখের কথা

সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে, নারী যে ব্যবস্থাবিধি অনুসারে গৃহধর্ম প্রতিপালন করেন, গৃহকর্ম পরিচালনা করেন,—সেটা অধিকাংশই শাশুড়ী অথবা মা-পিসিমা-ঠাকুমার কাছ থেকে পাওয়া। যেটা বহু দিন ধরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, যে জিনিসটা বরাবর চলে আসছে এবং বিনা বিতর্কে যে বস্তুর প্রতিষ্ঠা—তাকে অস্বীকার করতে কিংবা তার অদল-বদল করতে নারীর মন স্বভাবতই অনিচ্ছুক। ঝি-চাকর নিয়ে তাঁরা যে নিত্য কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করে থাকেন এবং সে দুর্ভোগের সবিস্তার বর্ণনা করেন প্রতিবেশিনী অথবা বান্ধবীর কাছে, তার একটা কারণ বোধ হয় যে তাঁরা বর্তমান কালের দাবীকে এবং যুগোচিত অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে এক কথায় মুখ বুজে মেনে নিতে রাজি নন। যদি সমরোত্তর কালের সামাজিক রূপান্তরকে অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতেন, তাহলে সংসারের ও পরিবারের কিছু কিছু সমস্যা অযথা জটিল হয়ে উঠত না।

এ ছাড়া, ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালনে, শিক্ষাদানে মানুষ করবার রীতিতে তাদের সাজ-সজ্জায়, চাল-চলনে—এমন কি স্নানাহার, বেশ-ভূষার মতন দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনায় এবং খুঁটি-নাটির মধ্যেও মেয়েরা খোঁজেন তাঁদেরই আবাল্য-সঞ্চিত অভ্যাস, তাঁদের নিজস্ব পরিবেশে পুষ্ট এবং অর্জিত অভিমত ও অভিরুচির প্রতিচ্ছবি। এইখানে, আধুনিক যুগ-ধর্ম এবং সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিয়ে সাংসারিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বোধ হয় কিছু দেরি হয়। অথচ মজা এই যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভিন্ন পরিবারে, একান্নবর্তী সংসারের নতুন আবেষ্টনীতে এসে প্রতিকূল অবস্থায় পড়েও মেয়েরা নিজেদের চমৎকার মানিয়ে নিতে জানেন এবং পেরেও থাকেন। কিন্তু যেসব ধারণা তাঁদের বদ্ধমূল হয়ে আছে, যেসব সংস্কার তাঁরা বহু দিন ধরে আচরণ করে এসেছেন, সেগুলিকে নতুন কালের পরিবর্তিত অবস্থায় না পারেন ছাড়তে, না পারেন কিছুটা বদলাতে। সবাই কিছু বিশ্বেশ্বরী বা আনন্দময়ী নন। তবে সুখের কথা এই যে, অনেক তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যেও রক্ষণশীলতার প্রভাব লুকিয়ে থাকে। অতএব মেয়েরাই শুধু এ বিষয়ে পিছিয়ে আছেন, তা নয়।

কিন্তু সামাজিক মেলা-মেশায় মেয়েদের সব চেয়ে নির্মম, সজাগ সমালোচক হলেন মেয়েরাই। কতোটুকুর নড়-চড় হলে মেয়েদের আচরণে আতিশয্য-দোষ এসে পড়ে; কতোখানি আবরু সরে গেলে তাকে বে-সরম বলা চলে; সরল ও সপ্রতিভ কথাবার্তার কতোটুকু সীমা লঙ্ঘন হলে সেটা বাচালতার পর্যায়ে পড়ে, আবার নীরব গাম্ভীর্যের কতোটুকু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটা সম্ভ্রমহীন দাম্ভিকতায় পরিণত হতে পারে —এসব সূক্ষ্ম সংবাদ পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি জানেন। সমালোচনা-প্রক্রিয়ার আনুষঙ্গিক যে বিশেষণগুলির সুনিপুণ ও শ্লেষাত্মক প্রয়োগ হয়ে থাকে, সেগুলি বোধ হয় শুধু মেয়েলি অভিধানেই মেলে। যেসব সমস্যার সঙ্গে নারীর স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সেসব ক্ষেত্রেও—স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, নারীর আইন-অধিকার প্রভৃতি জরুরী সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টাতেও মেয়েরা অনেক স্থলে স্বজাতির বিরোধিতাই করেছেন।

সামাজিক আচরণে, পারিবারিক জীবনে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা, নৈতিক আদর্শ থেকে এতোটুকু স্খলনও তাঁরা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন। পুরুষের চরিত্র-গত ত্রুটিকে, বিশেষ করে আত্মীয়-স্থলে, তাঁরা স্নেহান্ধতা বশে মার্জনা করে নিলেও স্বজাতীয় ক্ষুদ্রতম বিচ্যুতিকে তাঁরা নির্মম চোখেই দেখেন। একজন বয়স্থা মহিলা আর এক অল্পবয়সী বিধবার আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা, আহার-নিদ্রা এবং মেলামেশাকে যেমন তীর সন্দিগ্ধ এবং শাণিত দৃষ্টিতে দেখেন, একজন পুরুষ একজন ভাবী গাঁটকাটাকেও তেমন চোখে দেখেন না। তাই মনে হয়—দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ নারীর মনোভাবে আর আচরণে যে রক্ষণ-বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণ পুরুষের স্বভাবে বোধ হয় ততোখানি প্রগতি-বিরোধিতা নেই। না থাকার অবশ্য একাধিক সামাজিক কারণ রয়েছে। কিন্তু সে কারণ মুখ্য হলেও, স্বভাব এবং সহজাত প্রবৃত্তির চাপটাও নিতান্ত গৌণ নয়।

কি পুরুষ আর কি স্ত্রীলোক—আমাদের সামাজিক ব্যবহারে অনেক কিছু গলদ আর আড়ষ্টতা আছে। সেগুলো আমাদের অবদমিত সামাজিক সত্তারই প্রতিফলন। কিন্তু তার দোহাই দিয়ে সেগুলিকে আর পুষে রাখা চলে না। যদি সেইসব তুচ্ছ সংকীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এখনও আঁকড়ে থাকি, তাহলে নবলব্ধ রাষ্ট্র-স্বাধীনতা সত্ত্বেও মনের স্বাধীনতা আমাদের অপূর্ণই থেকে যাবে। মন যেখানে উদার হল না, প্রসারিত হল না, সমগ্র মানব-সমাজের বৃহত্তর পটভূমিকায় আপনাকে আয়ত ও বিস্তৃত করে ধরতে শিখল না, সেখানে রাষ্ট্র-স্বাধীনতা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। যখন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বড়াই করি, ভারতের অথবা বাঙলার বিশিষ্ট দানের কথা স্মরণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, তখন চোখ দুটো ভেতর দিকে ফিরিয়ে দেখলে বোধ হয় লাভবান হতে পারি। আত্ম-বিশ্লেষণের ফলে যেসব 'বেন্যালিটিজ' এখনও আমাদের সমাজ আর মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সেগুলো ধরা পড়তে পারে। আর একটু উদ্যোগী হলেই সেই সব ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতার আগাছাগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করা যায়। কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে অবশ্য খারাপ লাগে। কেন না বহু দিন ধরে যে সমস্ত অভ্যাস, আত্ম-তৃপ্তি আর আত্মবঞ্চনার উপকরণ আমাদের মনকে মুড়ে ঘিরে আছে পুরানো মাকড়সার জালের মতন, তাতে খোঁচা লাগলে মন খারাপ হবারই কথা। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন—কেউ কেউ অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকতে ভালোবাসেন। একটা ঘরেই শোয়া-বসা-খাওয়াপরা চলছে কিন্তু অন্য ঘর পড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়। কেউ গুছিয়ে জিনিসপত্র সরিয়ে রাখলে তিনি খেপে যান। টেবিলে রাশীকৃত বাজে কাগজ, ঘরের কোণে বাসি কাপড়, ভিজে তোয়ালে, কমলা-লেবুর খোসা আর পানের বোঁটা পড়ে আছে। কিন্তু আর কেউ যদি আবর্জনা সরিয়ে ঘরটা একটু বাসযোগ্য করে তোলেন, ঘরের মালিক রীতিমত অসন্তুষ্ট হন। অবশ্য দরকারী কাগজগুলো যদি যেখানে থাকবার সেখানে না থাকে, কিংবা জামা-কাপড়গুলো পরিচিত জায়গায় হাতের কাছে না পাওয়া যায় সুনিপুণ গৃহিণীপনায়, তাহলে অবশ্য অনেকেই চটে যান এবং আমিও অধীর হয়ে উঠি, স্বীকার করছি। কিন্তু মলিনতার সংস্কার-সাধনে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হন, তাহলে সে অপরিচ্ছন্নতার শিকড় মনের মধ্যে গভীরে প্রবেশ করে আছে, বুঝতে হবে। আমি একজন ভদ্রলোককে দেখেছি যিনি ধোপা এলে অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। লুকিয়ে কিংবা জোর করেই তাঁর জামা-কাপড় কাচা হয়। এসব 'কেস' অবশ্য প্যাথলজিক্যাল। সমাজে ও সংসারে যেসব অতি সাধারণ ত্রুটি বা মনের গলদ লক্ষ্য করি, সেগুলো অনেকটা এই জাতের। পুরানো ক্ষতের শুকনো আবরণের মতন সেগুলো গা-সওয়া হয়ে গেছে।

পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দুদিগের সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান হইতেছে না। ৩রা ফেব্রুয়ারীর সংবাদ, গলাচিপা অঞ্চলে কোন হিন্দুর বাড়ির বেড়ায় 'জয় হিন্দ' লেখা দেখিয়া স্থানীয় মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহারা লেখাটি মুছাইয়াই নিবৃত্ত না হইয়া গৃহটি অবরুদ্ধ করে এবং গৃহের অধিকারীকে ও হিন্দু পথচারীদিগকে লাঞ্ছিত করে। নারায়ণগঞ্জের ব্যবহারাজীবীর প্রাক্তন সভাপতি শ্রীরোহিণীকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্য যে সকল হিন্দু হাঙ্গামা নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাও নিগ্রহ ভোগ করেন।

আমরা এই ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ বাহুল্য বলিয়া বিবেচনা করি।

লক্ষ লক্ষ লোক যে আশ্রয়, সম্পত্তি সব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে, ইহা সত্য। কিন্তু কেন এমন হইতেছে? পশ্চিম পাকিস্থান হিন্দু ও শিখ শূন্য হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা মনে করেন, উভয় রাষ্ট্রে আলোচনার ফলে পাকিস্থানে হিন্দুদিগের আশঙ্কার কারণ দূর হইয়াছে, তাঁহাদিগের ভ্রান্তি যে অসাধারণ, তাহা করাচী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীশ্রীপ্রকাশ পাকিস্থানে ভারত সরকারের প্রতিনিধি—'হাই-কমিশনার'। তিনি আসামের গবর্ণর মনোনীত হইয়াছেন। করাচীতে গান্ধীজীর যে মূর্তি আছে, তিনি গত ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজীর মৃত্যুদিনে তাহাতে শ্রদ্ধা নিদর্শনরূপে মাল্য প্রদানের ইচ্ছা করিয়া সেজন্য পাকিস্থানের পররাষ্ট্র কার্যালয়ে অনুমতি চাহিয়াছিলেন। ২৯শে জানুয়ারী রাত্রিকালে তাঁহাকে জানান হয়, তিনি সে অনুমতি পাইবেন না; কারণ মূর্তিতে মাল্যদান পৌত্তলিকতাগন্ধী এবং পৌত্তলিকতা ইসলামের মতবিরুদ্ধ। বিস্ময়ের বিষয়, এই সংবাদ লইয়া ভারত সরকারের কর্তারা শ্রীশ্রীপ্রকাশজীকে প্রতিবাদ করিতে বলেন। সুখের বিষয়, তিনি তাহা করেন নাই, কারণ, যে পররাষ্ট্র বিভাগ শ্রদ্ধা নিবেদন নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট প্রতিবাদ করা নিস্ফল। অতঃপর যদি সংবাদ পাওয়া যায়, মানুষের মূর্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামের মতে নিষিদ্ধ বলিয়া গান্ধীজীর মূর্তি সোমনাথের মন্দিরে শিবলিঙ্গের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে বা শাহজাহানের দৃষ্টান্তে কোন মসজেদের সোপানে পরিণত করা হইয়াছে, তবে কি তাহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকিবে? শ্রীশ্রীপ্রকাশের মত পদস্থ ব্যক্তি যে ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, ইসলাম রাষ্ট্র পাকিস্থানে হিন্দুর বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর ধর্মাচরণ-স্বাধীনতা অস্বীকৃত।

আজ আমরা ভারত সরকারকে ও পশ্চিম-বঙ্গ সরকারকে জিজ্ঞাসা করি, করাচীতে শ্রীশ্রীপ্রকাশ যে ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহার পরেও কি তাঁহারা পূর্ববঙ্গত্যাগী হিন্দুদিগকে—স্বধর্মাচরণ যে রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ, সেই রাষ্ট্রে ফিরিয়া যাইতে বলিতে পারেন?

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব বলিয়াছেন—প্রদেশের খাদ্য-সমস্যার আশু সমাধান-সম্ভাবনা নাই। তাঁহার উক্তিতে আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিলেও পশ্চিমবঙ্গের লোকের অন্নাভাবজনিত দুঃখের অন্ত নাই। কিন্তু খাদ্যোপকরণ বর্ধিত করিবার কি চেষ্টা সরকার করিয়াছেন? সেদিন কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে বলা হইয়াছে—খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির অনুষ্ঠান ইংরেজ আমলের—ভারত সরকার তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছেন। ইংরেজ এদেশে খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির জন্য সত্য সত্য কোন চেষ্টা করেন নাই, সেই জন্য সে অনুষ্ঠান ব্যর্থ হইয়াছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

পশ্চিমবঙ্গের লোক আজ জানিতে চাহিতেছে, যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে কৃষি বিভাগের জন্য যে টাকা ব্যয় জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কত টাকা কেবল বিভাগের ঠাট রক্ষায়—বেতনাদিতে—ব্যয়িত হইয়াছে, আর কত টাকা খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হইয়াছে? বিহারে কৃত্রিম সারের কারখানায় সার উৎপন্ন হইলেই সব দুঃখ ঘুচিবে বলিয়া লোকের ক্ষুধা নিবারণ করা যায় না।

কৃষিবিভাগ বলেন, সেচের ব্যবস্থার অভাবেই খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধি অসম্ভব হইতেছে: আর সেচসচিব বলেন, বহু বিলম্বসাপেক্ষ ও বহুব্যয়সাপেক্ষ গঙ্গাগতি নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত কিছুতেই কিছু হইবে না। ২৪ পরগণা জিলায় কতকগুলি স্থানে কি বর্ষায় জলনিকাশের উপায়াভাবে চাষ হয় না? কোন কোন স্থানে লক্ষ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা না করিয়া স্বল্প ব্যয়ে 'স্লুইস গেট' বসাইলেই অনেক জমিতে ফসল ফলিতে পারে। সে সকল অবস্থা কি তুচ্ছ বলিয়া সরকারের মনোযোগ লাভে বঞ্চিত হইতেছে? ঈশপের উপকথার তারাদর্শক যেমন ঊর্ধ দৃষ্টি হইয়া চলিতে চলিতে কূপে পতিত হইয়াছিলেন, ইঁহারা কি তেমনই কেবল গঙ্গার, দামোদরের ও ময়ুরাক্ষীর জল-নিয়ন্ত্রণের সময়সাপেক্ষ তথা ব্যয়সাধ্য পরি-কল্পনা লইয়া ব্যস্ত থাকায় ছোট ছোট ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারেন না? কিন্তু এবার কেন্দ্রী সরকার যে ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহা ছোট ছোট ব্যাপারের জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি তাহার সুযোগ গ্রহণও করেন নাই? গঙ্গার, দামোদরের ও ময়ুরাক্ষীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি দেশের—বিশেষ স্থানীয় লোকের সহযোগে সেচের ও সঙ্গে সঙ্গে জলনিকাশের ব্যবস্থার কোন কোন পরিকল্পনা করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করেন, তবে কি তাঁহারা সে ব্যবস্থা করিবেন?

পশ্চিমবঙ্গের স্থানাভাব সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই। আর যিনি যাহাই কেন বলুন না, পূর্ববঙ্গ হইতে বহু হিন্দুর পশ্চিমবঙ্গে আসা অনিবার্য। সে অবস্থায় একথা যদি সত্য হয় যে, র‍্যাডক্লিফের নির্ধারণানুসারেও পশ্চিম-বঙ্গকে নদীয়া জিলায় ছয় শতেরও অধিক বর্গ-মাইল প্রাপ্য স্থানে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তবে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের ও ভারত সরকারের সেই ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করা অবশ্যই প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন, স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকে বাঙলার যে মানচিত্র দেওয়া হইয়া-ছিল, তাহাতেই ভুল ছিল। অর্থাৎ যাহাকে 'গোড়ায় গলদ' বা 'বিসমিল্লায় গলতি' বলে, তাহাই হইয়াছিল। কে তাহা করিয়াছিল, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য তখন মানচিত্র করিবার কাজ মুসলিম লীগ সরকারের হস্তে ছিল এবং সে সরকার কলিকাতা পর্যন্ত পাকি-স্থানভুক্ত করিতে বিশেষ আগ্রহই প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল, তখনও যে মানচিত্র দাখিল করা হইয়াছিল, তাহার ত্রুটি আছে, এমন কথা শুনা গিয়াছিল। আজ যদি প্রতিপন্ন হয়, ত্রুটিপূর্ণ মানচিত্রই দাখিল করা হইয়াছিল, তবে ভারত সরকারের পক্ষে তাহার সংশোধনে তৎপর হওয়া কর্তব্য। ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী দুই রাষ্ট্রে আলোচনায় আস্থাবান। তিনি কি এই বিষয়ে সেই আলোচনার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইবেন?

বিহারে যে সরকার বিদ্যালয়সমূহে হিন্দী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করিতেছেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে মানভূমে বাঙালী ছাত্রগণ ধর্মঘট করিয়াছে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে ওয়ার্ধায় শিক্ষা সম্মেলনে স্থির হয়—শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাই তাহার শিক্ষার মাধ্যম হইবে। ইহার পরে হরিপুরায় কংগ্রেসে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানই সঙ্গত বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক বাঙালী-বিহারী সমস্যা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার ভার পাইয়া-ছিলেন। তিনি তখন যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়। তাহা এইরূপ—

"বিহারের যে সকল অঞ্চলে বাঙলা কথ্য ভাষা, তথায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষাই শিক্ষার বাহন হইবে। ......উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে প্রদেশের ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া সংগত। কিন্তু যে জিলায় অন্য কোন ভাষা কথিত হয়, সে জিলার অধিবাসীরা যদি সেই কথ্য ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দাবী করেন, তবে সরকারকে তাহাই করিতে হইবে।"

এখনও যদি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেই মতে অবিচলিত থাকেন, তবে পুরুলিয়া জিলা স্কুলে তিনি কিরূপে বাঙলার স্থানে হিন্দীতে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারেন? এই স্কুলে শতকরা ৭৫ জন ছাত্র বঙ্গ ভাষাভাষী। স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তি' বিহার সরকারের নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—ইহা কেবল সমস্ত "শিক্ষানীতির বিরোধীই নয়, ইহা অমানুষিক। অমানুষিক এই জন্যই যে, একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জোর করিয়া যেটা মাতৃভাষা, তাহা উঠাইয়া দিয়া অন্য ভাষা চাপাইয়া দেওয়া হইলে হয় তাহাদিগকে লেখাপড়া ছাড়িতে হইবে, নয় শিক্ষার দিক দিয়া পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে।......কংগ্রেসী গভর্নমেণ্টের শিক্ষানীতি এই জিলাতে যে পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা শুধু সর্ব-সভাসমাজবহির্ভূত অন্যায়ই নয়, তাহা কংগ্রেসের আদর্শবিরোধী, স্বাধীনতার আদর্শ-বিরোধী, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির বিরোধী, স্বাধীন নাগরিকের মৌলিক অধিকারের বিরোধী, গান্ধীজীর আদর্শবিরোধী এবং সর্বোপরি মানবতার বিরোধী।"

কেন্দ্রী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন—"এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই হইতে পারে।" এখন জিজ্ঞাস্য, বিহার সরকারের এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি কি বলিবেন?

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বাঙলাকে প্রদান করা সম্বন্ধে কংগ্রেসের ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যেভাবে পদদলিত করা কংগ্রেসের বর্তমান পরিচালকদিগের পক্ষে সম্ভব হইতেছে, তাহাতে অবশ্য মনে হয়, মানুষ ক্ষমতা পাইলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও দ্বিধানুভব করে না। কাজেই বিহারে বাঙলা ভাষার উচ্ছেদ সাধনের প্রতিবাদও যে সফল হইবে, এমন মনে করা যায় না। সে অবস্থায় কি প্রস্তাব করা অসংগত হইবে—

(১) পশ্চিমবঙ্গে সরকারী বা মিউনিসিপ্যালিটির কোন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাঙলা ব্যতীত আর কোন ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হইবে।

(২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা করিবেন—পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া যাইবে। সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতেও পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আজ বিহারে হাসপাতালেও বাঙালী রোগীর প্রবেশলাভ দুষ্কর—বিহারের কোন কলেজে বাঙালী ছাত্রের প্রবেশ-দ্বার প্রায় রুদ্ধ। সে অবস্থায় বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে যদি বিদ্যালয় হইতে বাঙালী ছাত্রেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারে, তবে সে সকল অঞ্চলে বাঙালীদিগের বিশেষ অসুবিধা দূর হয়।

বিহার সরকার বাঙালীদিগের সম্বন্ধে যে উৎকট প্রাদেশিকতার পরিচয় দিতেছেন—তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে তিক্ততা বৃদ্ধি কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না। কিন্তু বাঙালীর প্রতি যদি রাষ্ট্রের অন্য কোন অংশে অবিচার হয়, তবে রাষ্ট্র-পরিচালকগণ তাহার প্রতিকার সাধনে সচেষ্ট হইবেন, এ আশা বাঙালী অবশ্যই করিতে পারে। সে আশা কি সংগত নহে?

ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ভারত সরকার করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ায় বহু লোক অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম, যে কয়টি ব্যাঙ্ক পুনর্গঠন সম্ভব, সেই কয়টিকে সম্মিলিত করিয়া একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার সাফল্য সকলেই কামনা করিবেন।

স্বারাজ্যাখ্য বিশ্ব সৌহার্দম্—পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ পাঠক প্রণীত। প্রকাশক—সংস্কৃত বুক ডিপো। ২৮/১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থ সংস্কৃত শ্লোকমালায় রচিত এবং প্রতি শ্লোকের সহিত বাঙলা ও ইংরেজি ভাষার অনুবাদ সংযুক্ত। লেখক সুপণ্ডিত এবং বহু জ্যোতির্বাদ গ্রন্থ প্রণেতা। লীগ শাসনে বঙ্গের হিন্দুদের দুর্গতি, সাম্প্রদায়িকতা দানবের মুখে হিন্দুর অসহায়তা ও ক্ষয়ক্ষতি এবং হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার আবশকতা লেখক অর্থ ও ভাবপূর্ণ সংস্কৃত পদ্যে বিবৃত করিয়াছেন। রচনায় তিনি সংস্কৃত কাব্যের নানাবিধ ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দুর গৌরবময় যুগের পুনরাবর্তন। তদুপরি কবিত্ব ও ছন্দোবৈচিত্র্যে শ্লোকগুলি সুখপাঠ্য। সংস্কৃত ভাষার প্রতি এই অমনোযোগিতার দিনে সাম্প্রতিক অবস্থাবলী নিয়া এইরূপ সুললিত ও সহজ পদ্যতিকাদি রচনা দ্বারা সংস্কৃতের প্রতি হিন্দুর অনুরাগ উদ্রিক্ত করার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

২১৩/৪৮

পারুল দিদির গল্প—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি-এল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ঃ সিটি বুক সোসাইটি; ৬৪নং, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা দশ আনা।

"পারুল দিদির গল্প" দশটি রূপকথার সমষ্টি। বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত ঠাকুমা ঠানদিদের রূপকথার মতই এই 'পারুল দিদি'র গল্পগুলিও খুবই মনোরম। লেখক মিষ্টি ভাষায় ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া গল্পগুলি লিখিয়াছেন। সবগুলি গল্পই মনোরম রেখা চিত্রে সুশোভিত। শিশু-সাহিত্যে রূপকথার স্থান সর্বোচ্চে। ছেলেদের বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী শুনাইবার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি তাহাদের শিশুমনকে কল্পনার উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য উপভোগ্য রূপকথার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। আলোচ্য বইয়ের গল্পগুলিতে তরুণ পাঠকেরা সাহস, কল্পনা, কৌতূহল ও আমোদ প্রভৃতি সব বস্তুরই সন্ধান পাইবে। ছাপা কাগজ ভাল; কিন্তু বাঁধাই ভাল নয়; তবে মলাটের রঙিন ছবিখানা সুন্দর হইয়াছে।

২৪৫।৪৮

ইনসাফ (প্রথম খণ্ড)—নেশাদ বানু প্রণীত। প্রকাশক সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের লেখিকার উপন্যাস 'বোরখা' সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। "ইনসাফে"র প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা বোরখারই অনুরূপ কল্পনার বলিষ্ঠতা, চরিত্রাঙ্কনে নিপুণতা এবং প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতার পরিচয় পাইলাম। ঝরঝরে জোরালো ভাষা এবং ভাব প্রকাশের দক্ষতা পাকা কথাশিল্পীর রচনার মতই আগাগোড়া পাঠকের মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখে। মুসলিম চরিত্রকে তিনি যতখানি উদারতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে মুসলিম জীবনের সুখ দুঃখের কথাগুলি গণ্ডি ছাড়াইয়া সার্বজনীন রসের সাহিত্য হইয়াছে, এইটি লেখিকার সবচেয়ে বড় সার্থকতা। 'ইনসাফে'র জয়নুল, খানসাহেব, সেলিমা প্রভৃতি চরিত্রগুলি একথার সাক্ষ্য দিবে।

১৮৪।৪৮

১৪ই ডিসেম্বর—রচনা দিমীত্রি মেরেঝোস্কী। অনুবাদ—শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় ও শ্রীঅশোক ঘোষ। প্রকাশক রীডার্স কর্নার (গ্রন্থ বিহার), ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

"১৪ই ডিসেম্বর" রুশীয় উপন্যাস। জাতি ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগ রাখিয়া রসমধুর কথাসাহিত্য সৃষ্টি রুশ সাহিত্যে যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে পৃথিবীর অপর কোনো দেশের সাহিত্যে ততখানি সম্ভব হয় নাই। বস্তুত রুশ সাহিত্যের সার্থকসৃষ্টি উপন্যাসগুলি কথা-সাহিত্যের আকারে রুশ জাতির প্রাণধর্মের ইতিহাস ব্যতীত অপর কিছুই নহে। "১৪ই ডিসেম্বর" উপন্যাসে সেই ইতিহাসেরই স্রোতোধারা সবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। উহা ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের পরবর্তী পতন-সময়ের সমসাময়িক ঘটনা। ভাবীকালের প্রলয়ঙ্কর জাতীয় বিপ্লবের উৎসমুখ এই কাল হইতেই উৎসারিত হইতে থাকে ফল্গুর আকারে। আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীজগদিন্দু বাগচী গোড়াতে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকায় '১৪ই ডিসেম্বরের' কাহিনীর যে পশ্চাৎপট রচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে। পাঠকগণ উহা আগে পড়িয়া নিলে, তৎসমসাময়িক রুশের পূর্বাপর অবস্থা ও বিপ্লবাঙ্কুরের সঙ্গে পরিচিত হইয়া উপন্যাসটির রস গ্রহণের অধিকতর সুবিধা পাইবেন। অনুবাদ বেশ ঝরঝরে হইয়াছে। বইখানার মুদ্রণ-পারিপাট্যও প্রশংসনীয়। ২০৪।৪৮

দশাননের গল্প—শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

'দশাননের গল্প' মোট দশটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি দশানন এই ছদ্ম নামযুক্ত হইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন নানাবিধ কার্টুন চিত্র সংযুক্ত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলিতে নানাদিক দিয়া বৈশিষ্ট্য আছে। যে সকল সমস্যা ও ঘটনা আমাদেরই আশে পাশে অতি সহজভাবে জমিয়া আছে, লেখক তাহা হইতেই বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন এবং অতি সহজ অনাড়ম্বর ভাবেই তাহা বিবৃত করিয়াছেন। রচনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেদনা মিশ্রিত বিদ্রূপ পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। কোন কোন রচনায় বর্তমান নাগরিক জীবনের দুঃখ দুর্দশা পরিস্ফুট হইয়াছে। তেমনি কোন কোন গল্পে নানা ধরণের 'টাইপ' সৃষ্টি করা হইয়াছে। নিছক হাসির গল্প নয়, এগুলিতে প্রায় ষড়রসের সমন্বয় ঘটিয়াছে এবং পাঠ শেষে পাঠকের মনকে সূক্ষ্ম মধুররসে প্লাবিত করে। বইখানার ছাপা কাগজ বাঁধাই পরিচ্ছন্ন, মলাটের ছবি সুদৃশ্য। ২৬৫।৪৮

ভারতীয় রাজনীতি ও ডায়েলেকটিক—প্রণেতা শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক—বর্মন পাবলিশিং হাউস, ৭২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

প্রধানত এখানি সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস গ্রন্থ। ভারতের বৈদিক যুগ হইতে মানুষের সমাজ ও চিন্তাধারা কিভাবে বিবর্তিত হইয়াছে প্রথমে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া লেখক মানবের কোম গঠনের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন এবং তাহারই সমসূত্রে ভারতের স্বাধীনতা-পূর্ব রাজনীতির আলোচনা তথা সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনায় অনেকে হয়ত লেখকের সঙ্গে একমত হইতে পারিবেন না; কিন্তু তিনি যে যথেষ্ট পড়াশোনা করিয়া বইটি লিখিয়াছেন তাহার পরিচয় পাইবেন।

২৬৩।৪৮

ছন্দোবিজ্ঞান—শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য এম এ, পি আর-এস প্রণীত। প্রকাশক—বি ডি প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ৮০।৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

গ্রন্থকার ছন্দকে যথার্থ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং ছন্দ সম্বন্ধে সুগভীর গবেষণার ফলস্বরূপই যে এই ছন্দশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে একথা গ্রন্থদৃষ্টে সকলেই স্বীকার করিবেন। 'সংজ্ঞা', 'সৌন্দর্যতত্ত্ব', 'ছন্দের গঠন', 'ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য', 'বাঙলা উচ্চারণ', 'বাঙলা ছন্দের জাতি-ভেদ', 'পদ্যছন্দের জাতিবিষয়ক মতবাদ', 'গদ্যছন্দ', 'মাত্রাবৃত্ত', 'বলবৃত্ত' 'অক্ষরবৃত্ত', 'ছদ্মবেশী বৃত্ত ও বৃত্তসংকর, 'কবিতায় পদ্য ছন্দের স্থান ও ছন্দ-মুক্তি' প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়াঙ্কিত অধ্যায় সমূহে ভাগ করিয়া লেখক তাঁহার এই বিস্তৃত ছন্দশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। ছন্দ বিষয়ে প্রচলিত মতবাদসমূহকেও লেখক নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে সমালোচনা করিয়াছেন।

বাঙলা কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে এক সময়ে বেশ একটা আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছিল এবং বাদানুবাদও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাতে অনেক 'ছান্দসিক' কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন। ইহার ফলে নানা প্রবন্ধে ও খানকতক পুস্তকে ছন্দ সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ছন্দ সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদের সমালোচনা নাম উল্লেখে একটু কঠোরভাবেই করিয়াছেন। তাহাতে পুনরায় একটা ঝড় উঠিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। তবে লেখকের স্বমতের বনিয়াদ পাকা বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

২৬৬/৪৮

রেল-কলোনী—শ্রীঅমর দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

'রেল-কলোনী' ৩২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি সুদীর্ঘ উপন্যাস। উহাতে লেখক রেল-কলোনীর হুবহু বাস্তব চিত্র অংকনের চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুত রেল-কলোনী অন্য দশজনের সমাজ হইতে যেন স্বতন্ত্র আর এক সমাজেরই জগৎ। সেখানে আছে শ্রমিকের দৈন্য এবং রোগশোকপীড়িত গ্লানিময় জীবন—তার উপর আছে যাহারা শ্রমিক খাটায় তাহাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, তাহাদের হাতে নিপীড়িত মানবতার অবমাননা। বাঙলা বিহারের সীমানার কাছাকাছি কোন স্থানে রেল-কলোনীকে কল্পনা করিয়া নিয়া লেখক তাহাই পশ্চাৎপটে রাখিয়া তাঁহার উপন্যাসের কাঠামো খাড়া করিয়াছেন এবং উহাতে শ্রমিকদের বাস্তব জীবন ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। নূতন পরিবেশে রচিত এই বইটি পাঠকদের ভালই লাগিবে। বিস্তীর্ণ বালুকাপ্রান্তরে নূতন এক বিরাট উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত নানা স্তরের সব বিচিত্র মানুষের সমাগম ঘটিয়াছে। কলোনীর প্রান্তসীমায় থাকে কুলী মজুরের দল, আর উন্নত অংশে বাস করে 'অভিজাত গোলাম' অর্থাৎ অফিসারবৃন্দ। এই বিরাট অসাম্যের পরিপ্রেক্ষিতেই নানা প্রেমপ্রণয়ের হাসিকান্নার মধ্যে গল্প আগাইয়া চলিয়াছে। তবে ভাষা যথেষ্ট জোরালো নয় এবং অনেক ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। ২৫৬।৪৮

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(এক)

পাঠকবর্গকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যে তাঁরা এই পরিচ্ছেদটি অবলীলাক্রমে ছেড়ে যেতে পারেন, তাতে আমার কাহিনীর সূত্র থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন না, কারণ এই পরিচ্ছেদের অধিকাংশই লারীর সঙ্গে আমার কথোপকথনের বিবরণী। তবে, এই কথা এই সঙ্গে বলে রাখি যে, এই আলোচনা না ঘটলে হয়ত কোনদিনই এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা আমার মনে জাগত না।

(দুই)

এলিয়টের মৃত্যুর মাস দুই পরে, সেই বছর শরৎকালে ইংলণ্ড যাওয়ার পথে আমি সপ্তাহখানেক প্যারীতে কাটালাম। ইসাবেল ও গ্রে ইতালী থেকে ফেরার পর ব্রিটানীতে ফিরে এসেছিল, কিন্তু এখন আবার রু সেণ্ট গুই-লায়ুমের বাসাতেই থিতু হয়েছে। ইসাবেল আমাকে এলিয়টের উইলের বিস্তৃত বিবরণ জানালো। এলিয়ট তার স্বপ্রতিষ্ঠিত গীর্জায় স্বীয় আত্মার মঙ্গলকামনায় প্রার্থনাদি অনুষ্ঠানের জন্য কিছু অর্থ ও তার সংরক্ষণার্থে আরো কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছিল। নীসের বিশপের নামে দাতব্য ব্যাপারে বণ্টনার্থে বেশ মোটা টাকা দিয়েছে। ওর অষ্টাদশ শতাব্দীর অশ্লীল গ্রন্থরাজির সংগ্রহ ও ফ্রাগোনার্দের আঁকা একখানি ছবি আমাকে দান করেছে। যে কার্য সাধারণতঃ গোপনেই সংঘটিত হয়ে থাকে ছবিটির সেইটাই বিষয়বস্তু। ছবিটি এতই অশ্লীল যে, দেওয়ালে টাঙ্গানো যাবে না, আর তাকে গোপনে টাঙ্গিয়ে রেখে উপভোগ করব সে ব্যক্তিও আমি নই। দাস-দাসীদের জন্যও এলিয়ট ভালো বন্দোবস্তই করেছে, দুটি ভাগনে দশ হাজার ডলার করে পাবে আর বাকী সম্পত্তি সমস্তই ইসাবেলকে দান করেছে। তার পরিমাণ যে কত সে কথা ইসাবেল আমাকে বলেনি, আমিও জানতে চাইনি। তার ভঙ্গী দেখে বুঝলাম যে, তার পরিমাণ যথেষ্ট বেশী।

স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার পর থেকেই গ্রে আমেরিকায় ফিরে গিয়ে কাজে নামার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, ইসাবেল অবশ্য প্যারীতে বেশ আরামে থাকলেও গ্রের অস্বস্তিতে আকুল হয়ে উঠেছিল। কিছুকাল ধরে গ্রে তার বন্ধুদের সঙ্গে এই বিষয় লেখালেখি করছিল, কিন্তু সব কিছুই তার তরফ থেকে একটা মোটা টাকা মূলধন হিসাবে ফেলার ওপর নির্ভর করছিল। সে টাকা ওর ছিল না, কিন্তু এলিয়টের মৃত্যুর ফলে ইসাবেল যে সম্পদ পেয়েছিল তা প্রয়োজনের চাইতে বহুগুণে বেশী। এখন ইসাবেলের সম্মতিক্রমে গ্রে এমনভাবে কথাবার্তা চালাচ্ছে যে, সকল ব্যবস্থা ওর মনোমত ও অনুকূল হলে প্যারী ছেড়ে গিয়ে গ্রে নিজেই সব বুঝে পড়ে নেবে। কিন্তু সে সব করার পূর্বে এদিকেও অনেক কিছু করণীয় আছে। ফরাসী রাজকোষের সঙ্গে উত্তরাধিকার কর সম্পর্কে একটা গ্রহণীয় বন্দোবস্ত করতে হবে। এ্যানটিবে ও রু সেণ্ট গুইলায়ুমের বাড়ি দুটির বিলি বন্দোবস্ত করতে হবে। হোতেল ব্যুরোতে রক্ষিত এলিয়েটের আসবাবপত্র, ছবি প্রভৃতি বিক্রী করতে হবে। সে সব বহুমূল্য সম্পদ, গ্রীষ্মকালে সঙ্গতিপন্ন সংগ্রাহকরা প্যারীতে আসেন, ততদিন অপেক্ষা করা তাই প্রয়োজন। ইসাবেল প্যারীতে আর এক শীত কাটাতে দুঃখিত নয়; মেয়েরা এখন ইংরাজীর মতই অবলীলাক্রমে ফরাসী বলতে পারে, ফরাসী স্কুলে আরও কয়েকমাস ওদের রাখতে পারবে বলে ইসাবেল খুসী। তিন বছরে ওরা অনেক বড় হয়ে গেছে, লম্বা পা হয়েছে, রোগা ও দুষ্টু হয়েছে, আর সৌন্দর্যের কম অংশ পেলেও সুন্দর সহবৎ শিক্ষা হয়েছে, মনে অদম্য কৌতুহল জেগেছে।

এই বিষয়ে এই পর্যন্ত।

(তিন)

লারীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ইসাবেলকে তার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলেছিল লা বল থেকে ফেরার পর ওর সঙ্গে আর তেমন দেখাই হয়নি। ইতিমধ্যে গ্রে আর ইসাবেলের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, বন্ধুত্ব হয়েছে, ওদের যুগের মানুষ তারা—আমরা চারজনে যখন একত্রিত হতাম তার চাইতে এখন অনেক বেশী ওরা ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। একদিন সন্ধ্যায় থিয়েটার ফ্রাঙ্কেতে "Berenice" দেখতে গেলাম, আমি বইটি অবশ্য পড়েছিলাম, কিন্তু কোনদিন অভিনয় দেখিনি, আর কদাচিৎ এই অভিনয় হয় বলে আমার এই সুযোগ ছাড়ার বাসনা ছিল না। এই নাটকটি অবশ্য রেসিনের শ্রেষ্ঠ নাটকাবলীর অন্যতম নয়, কারণ বিষয়বস্তু পঞ্চাঙ্কের পক্ষে অতি ক্ষীণ, কিন্তু হৃদয়স্পর্শী ও এমন অনেক কথা আছে যা বিখ্যাত। প্যালেস্টাইনের রাণী বেরেনিসের প্রেমিক টাইটসের গভীর প্রেমের কাহিনীতে নাটকের ভিত্তি, টাইটস তাকে বিবাহ করতে পর্যন্ত ইচ্ছুক ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রীয় কারণে নিজের এবং বেরেনিসের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে রোম থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ সেনেট এবং রোমকগণ একজন বিদেশিনী রাণীর সঙ্গে তাদের সম্রাটের প্রণয়ের তীব্র বিরোধী ছিলেন। প্রেম ও কর্তব্য নিষ্ঠার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব টাইটসের বুকে প্রবল হয়েছিল তার ওপর নাটকটি রচিত, যখন তিনি ইতস্তত করছেন তখন বেরেনিসে নিজেই চিরদিনের জন্য টাইটসের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন।

আমার ধারণা শুধু ফরাসীর পক্ষেই রেসিনের পূর্ণ মাধুর্য ও ছন্দের সুরঝঙ্কার উপভোগ করা সম্ভব, কিন্তু তাঁর রচনা কৌশল সম্পর্কে অবহিত বৈদেশিকের পক্ষেও রেসিনের রচনার অপূর্ব কোমলতা ও ভাবাবেগের মাধুরী আস্বাদন করা অসম্ভব নয়। মানুষের কণ্ঠস্বরে নাটকীয়তা আছে তা রেসিন জানতেন। এই সব আলেকজান্দ্রীয়দের ভূমিকা তাই আমার কাছে নাটকীয় সংঘাতের সমতুল্য। প্রত্যাশিত চরমত্বের পথে দীর্ঘ বক্তৃতাবলী আমার কাছে রোমাঞ্চকর ছায়াছবির চাইতেও আকর্ষণময়।

তৃতীয় অঙ্কের পর বিরতির যবনিকা পড়ে, আমি ধূমপানের উদ্দেশ্যে বাইরে দেউড়িতে গেলাম। হুদোঁর দন্ডহীন ভলটেয়ার মূর্তি এইখানে প্রতিষ্ঠিত, মুখে তার গম্ভীর হাসির রেখা। কে যেন আমার কাঁধে হাত দিল। হয়ত কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েই আমি ফিরে তাকালাম, কারণ ঐ সুরেলা বাচনভঙ্গীর মাধুর্য নিরালায় আস্বাদন করাই আমার বাসনা ছিল—দেখলাম লোকটি লারী। চিরদিনের মত ওকে দেখে আমার আনন্দ হল। এক বছর হ'ল ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তাই প্রস্তাব করলাম যে, অভিনয়ান্তে একত্রে মিলে একপাত্র করে বীয়র পান করা যাবে। লারী বলল ও ক্ষুধার্ত, ডিনার খাওয়া হয়নি, সে মন্ত্মাতারে যাওয়ার প্রস্তাব করল। যথাকালে উভয়ের পুনরায় দেখা হ'ল, আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। থিয়েটার ফ্রাঙ্কের একটা নিজস্ব ভ্যাপসা গন্ধ আছে। যে-সব অপরিশ্রুত অসংখ্য পরিচারিকা

আসন দেখিয়ে দিয়ে বখশিসের লোভে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের গায়ের গন্ধেই জায়গাটা ভরপুর। মুক্ত বাতাসে ফিরে এসে তাই ভালো লাগে, চমৎকার রাতটি তাই আমরা হাঁটতে লাগলাম। এ্যাভিন্যু দ্য ওপেরার আলোগুলি এমন উদ্ধত-ভাবে জ্বল্ছিল যে, প্রতিযোগিতায় যোগ না দিয়ে দম্ভভরে সুদূর আকাশের তারাগুলি তাদের অসীমত্বের অন্ধকারে ঔজ্জ্বল্য ঢাকা দিয়েছে। পথ চল্‌তে আমরা সদ্য দেখা নাটকটির সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলাম। লারী হতাশ হয়েছে। সে আরো স্বাভাবিক ভঙ্গী পছন্দ করে, পাত্র-পাত্রীর সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে কথা বলা উচিত ছিল, ভঙ্গিমায় নাটকীয়ত্ব কম থাকলেই ভালো হত। আমি ভাবলাম ওর দৃষ্টিকোণ ভ্রান্ত। আলঙ্কারিক নাটক, অপূর্ব আলঙ্কারিক আঙ্গিক আমার তাই ধারণা ছিল আলঙ্কারিক বাচনভঙ্গী হওয়াই উচিত। ছন্দের ঝঙ্কার, ভাবভঙ্গী, আর্টসঙ্গত বলেই আমার মনে হয়েছিল। রেসিন স্বয়ং যে তাঁর নাটক এই-ভাবেই অভিনীত হওয়াই সঙ্গত মনে করতেন এই আমার ধারণা। সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে অভিনেতৃবৃন্দ যেভাবে নিজেদের ভূমিকা অভিনয়ে মানবীয় ও আবেগাত্মক ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন আমি তার প্রশংসা করেছি। নিজস্ব প্রয়োজনের যন্ত্র হিসাবে আর্ট যেখানে রীতিকে ব্যবহার করতে পারে সেইখানেই তার আসন বিজয়ীর।

আমরা এ্যাভিন্যু দ্য ক্লিসিতে পেঁছে গ্রাসিয়ের গ্রাফে গেলাম। মধ্যরাত্রি সবে অতি-ক্রান্ত হয়েছে তবু ভীড় কমেনি। আমরা একটা টেবল সংগ্রহ করে বসে ডিম আর বেকনের অর্ডার দিলাম। লারীকে বল্লাম ইসাবেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

সে বল্‌ল ঃ "গ্রে আমেরিকায় ফিরে গেলে খুসী হব। এখানে ওর জলছাড়া মাছের অবস্থা। কাজ না পাওয়া পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই। আমার ত' মনে হয় ও এবার প্রচুর টাকা রোজগার করবে।"

"তা যদি করে তাহলে তোমার দৌলতেই করবে। শুধু দেহে নয় ওকে মনের দিক থেকেও তুমি নিরাময় করেছ। আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছ।!"

"আমি আর কি করেছি, আমি শুধু কিভাবে ও নিজেকে সুস্থ করতে পারবে তাই দেখিয়ে দিয়েছি।"

"ঐটুকুই বা শিখলে কি করে?"

"ঘটনাচক্রে শিখেছি। আমি তখন ভারত-বর্ষে,—অনিদ্রায় ভুগ্‌ছিলাম, একজন পরিচিত যোগীকে বলতে তিনি বল্লেন, অচিরেই ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি গ্রের জন্য যা করেছিলাম তিনিও আমার জন্য ঠিক তাই করেছিলেন, সেই রাত্রে আমার এমন ঘুম হল যা দীর্ঘকাল হয়নি। তারপর, এক বছর পরে একজন ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি এমন সময় একদিন তাঁর পায়ের গোড়ালি মচ্‌কে গেল। ডাক্তার পাওয়া যায় না, অথচ তাঁর যন্ত্রণা অতি তীব্র হয়ে উঠ্‌ল। ভাব্‌লাম যোগী যা করেছিলেন তাই করি, তাই করে ফলও হল। বিশ্বাস্ করুন আর নাই করুন তাঁর বেদনার উপশম হল।" লারী হাস্‌লে "আপনাকে সত্যি বলছি, আমি নিজেই সবচেয়ে বিস্মিত হ'লাম। এর ভিতর আর কিছুই নেই, শুধু রোগীর মনে ভাবটুকু জাগিয়ে তুলতে হ'বে।"

"করার চাইতে বলা সহজ।"

"নিজের চেষ্টা ব্যতিরেকে যদি আপনার হাত ওপরে ওঠে আপনি আশ্চর্য হবেন?"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু উঠবে। আমার সেই ভারতীয় বন্ধুটি সভ্য সমাজে ফিরে এসে আমার ক্রিয়া-কলাপের কথা বলতে লাগলেন, আমাকে দেখানোর জন্য অনেককে নিয়ে এলেন। এ কাজ করতে আমার ভালো লাগ্‌ত না, কারণ আমিই ঠিক বুঝতাম না ব্যাপারটি কি, কিন্তু তাঁরা জেদ ধরলেন। যে কোনো ভাবেই হোক, আমি তাদের ভালোই করেছিলাম—দেখলাম যে শুধু মানুষের বেদনা নয়, তাদের ভয়ও দূর হচ্ছিল। কত লোকের যে এই কষ্ট ভাবতেও বিস্ময় লাগে মনে। বদ্ধপরিসর বা উচ্চতার ভয় নয়, মরণের এমন কি জীবনেরও ভয়। অনেক সময় এমন লোক আস্‌ত যাদের দেখ্‌লে বেশ স্বাস্থ্যবান, সমৃদ্ধিশালী ও উদ্বেগহীন মনে হ'ত, তবু তারা ক্লেশ ভোগ করত। মাঝে মাঝে ভাব্‌তাম, মনুষ্য চরিত্রের এই এক রহস্যকর দিক, এক সময় মনে হয়েছে আদিম কালে যা সর্বপ্রথম প্রাণীর প্রাণে জীবনের স্পন্দন জাগিয়েছিল, মানুষ হয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে সেই প্রকৃতি পেয়েছে।"

প্রত্যাশাভরা মন নিয়ে লারীর কথা শুন-ছিলাম, কারণ সে কদাচিৎ সুদীর্ঘ আলোচনা করত, কেমন মনে হল আজও কিছু বল্‌বে। হয়ত আমাদের সদ্য-দেখা নাটকের সুরেলা সংলাপ ও ছন্দোময় ঝঙ্কার ওর প্রতিরুদ্ধ মনের গাম্ভীর্যকে লঘু করে দিয়েছে। অনুভব করলাম আমার হাতে যেন কি হচ্ছে, লারির সেই লঘু-ভাবে বলা প্রশ্ন সম্পর্কে আমি আর একটুও ভাবিনি। বুঝলাম আমার হাত আর টেবলের ওপর রাখা নেই, আমার ইচ্ছা না থাক্‌লেও চেয়ার থেকে এক ইঞ্চি ওপরে উঠেছে। আমি ত অবাক। আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখি হাতটি ঈষৎ কাঁপছে। আমার বাহুর স্নায়ু শিরায় অদ্ভুত একটা অনুভূতি, স্বল্প কম্পন জাগল, তারপর দেখি আমার হাত আপনি ওপরে উঠে গেছে। আমার বিশ্বাস অনুসারে আমি হাতটা তুলিনি বা নামিয়ে রাখার চেষ্টা করিনি। টেবল হ'তে কয়েক ইঞ্চ্‌ ওপরে উঠে গেছে তারপর সম্পূর্ণ ওপরে উঠে গেল। তারপর দেখি সব হাতটাই কাঁধ ছাড়িয়ে ওপরে উঠেছে।

আমি বল্‌লাম—"এ ভারি বেয়াড়া কাণ্ড!"

লারী হাস্‌ল,—আমি সামান্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতেই আমার হাত আবার টেবলে পড়ে গেল।

সে বল্‌ল ঃ "এটা কিছু নয়, এ বিষয়ে মাথা ঘামাবেন না।"

"তুমি ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসেই আমাদের কাছে যে যোগীর কথা বলেছিলে তাঁর কাছেই এইসব শিখেছ?"

"না-না, এসব করবার তাঁর সময় ছিল না, অন্যান্য যোগীরা যেসব শক্তির অধিকারী বলে ঘোষণা করেন, সে সব শক্তি তাঁর ছিল কি না জানি না। তবে থাকলেও তা প্রয়োগ করতে তিনি নিশ্চয়ই অন্যায় ভাবতেন।"

আমাদের ডিম আর বেকন এসে গেল, বেশ তৃপ্তির সঙ্গে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে ক্ষুধা নিবারণ করা গেল। বীয়র পান করা হল। উভয়ে কেউই কোনো কথা বল্লাম না। ও যে কি ভাবছিল জানি না আর আমি ওর কথাই ভাবছিলাম। আমাদের খওয়া শেষ হল। আমি একটি সিগারেট ধরালাম, ও পাইপ জ্বালাল।

আমি সহসা প্রশ্ন কর্‌লাম—"হঠাৎ তুমি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে গেলে কেন?"

"ঘটনাচক্র—অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল,—এখন ভাবি দীর্ঘকাল য়ুরোপে কাটানোর এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যে সব লোকজনের ওপর আমার কোনো আকর্ষণ আছে, তাদের সঙ্গে আমার এমনই ঘটনাচক্রে দেখা হয়েছে, তবু পিছন পানে তাকিয়ে ভাবলে মনে হয় ওদের না দেখেও আমার চলত না। যেন আমার প্রয়োজন মত সামনে আসার আহ্বানের অপেক্ষাতেই ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম শান্তি কামনায়। কিছুকাল ধরে কঠিন কাজ করছিলাম তাই ভাবলাম বিশ্রাম নেওয়া যাক্, চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করা যাবে। আমি একটা বিলাস বহুল বিশ্বভ্রমণের যাত্রীজাহাজের ডেক কর্মচারীর কাজ পেয়ে গেলাম। জাহাজটি প্রাচ্য দেশে যাচ্ছিল, পানামা ক্যানাল হয়ে ন্যু ইয়র্ক ঘুরে। পাঁচ বছর আমেরিকা যাইনি, তাই দেশের জন্য মন চঞ্চল হয়েছিল। একটু অবসাদ-গ্রস্ত—আপনি ত' জানেন সেই সর্বপ্রথম যখন আপনার সঙ্গে সিকাগোয় দেখা হয়েছিল তখন আমি কত অজ্ঞ। য়ুরোপে আমি খুব পড়েছি, দেখেছিও খুব—কিন্তু তবু আমি যার সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম তার কাছাকাছিও পেঁছতে পারিনি।"

সে বস্তুটি যে কি তা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভাবলাম যে ও শুধু হাসবে, কাঁধ নাড়বে ও বলবে ওসব কিছু নয়।

আমি বললামঃ "কিন্তু তুমি ডেকেখ কর্মচারী হয়ে গেলে কেন? তোমার ত' টাকা ছিল।"

"অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল, যখনই আমি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে জড়ীভূত হয়ে পড়তাম তখনই যা পেতাম তার ভিতর ডুবে পড়তাম, এইরকম একটা কিছু করার সুফল পেতাম। যে বছর শীতকালে ইসাবেল আর আমি বিচ্ছিন্ন হলাম, সেই বছর লেনসের কাছে এক কয়লার খনিতে ছ'মাস কাজ করেছিলাম।"

এই সময়েই লারী আমাকে যেসব কথা বলেছিল তা আমি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি।

"ইসাবেল যখন তোমাকে ত্যাগ করল তখন কি তোমার মনে কষ্ট হয়েছিল।"

জবাব দেওয়ার পূর্বে লারী তার সেই অপূর্ব কালো চোখ মেলে আমার পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, সেই দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী, বাইরে যেন তার লক্ষ্য নেই। তারপর বলেঃ

"হ্যাঁ, আমার তখন বয়স অতি অল্প। বিবাহ করব মন স্থির করেছিলাম, উভয়ে যে জীবন-যাপন করব তাও কল্পনা করে নিয়েছিলাম, আশা করেছিলাম চমৎকার হবে।" লারী ম্লান হাসল— "কিন্তু বিয়ে করতে দুজন লাগে, যেমন ঝগড়া করতেও দুজন লাগে, আমার কোনোদিন মনে হয়নি যে আমি যে জীবনের ছবি সামনে ধরে-ছিলাম তা ইসাবেলের অন্তর নিরাশায় ভরে দেবে। আমার যদি কোনো বুদ্ধি থাকত তাহলে কখনই এমন প্রস্তাব করতাম না। ইসাবেলের বয়স ছিল অতি কম, অন্তর উদ্দীপনায় ভরপুর। আমি ওকে দোষ দিতে পারি না; কিন্তু আমিও ওর কথা মেনে নিতে পারিনি।"

পাঠকের হয়ত স্মরণ আছে যে সেই জার্মান জোতদারের বিধবা পুত্রবধূর সঙ্গে সেই বীভৎস কাণ্ডের পর লারী 'বোনে' চলে গিয়েছিল। ও আরো বলে যাক এই আমার বাসনা ছিল, কিন্তু যথাসম্ভব সোজাসুজি প্রশ্ন যতটা না করা যায় সেদিকে আমি সতর্ক ছিলাম।

লারী বলে, "আমি আগে কখনও 'বোনে' যাইনি, ছাত্রাবস্থায় হিডেলবার্গে কিছুকাল কাটিয়েছিলাম, মনে হয় আমার জীবনের সেই সবচেয়ে আনন্দের কাল।

"আমার 'বোন' জায়গাটা ভালো লাগে, আমি সেখানে এক বছর কাটিয়েছি, য়ুনিভার্সিটির এক প্রফেসারের বিধবা ভগ্নীর বাড়িতে আমি থাকতাম, তিনি দু-চারজনকে বাসায় রাখতেন। তাঁর দুটি মধ্যবয়স্কা মেয়ে ছিল, তারাই রান্না ও গৃহকর্মাদি করত। দেখলাম আমার সহবাসী ভদ্রলোকটি ফরাসী, প্রথমে একটু হতাশ হলাম, কারণ জার্মান ভিন্ন আর কিছু বলার আমার বাসনা ছিল না, কিন্তু তিনি এলসেসিয়ান ছিলেন। জার্মান বলতে পারতেন, খুব তাড়াতাড়ি না বল্লেও তাঁর ফরাসীর চাইতেও ভালো উচ্চারণ করতেন। তিনি জার্মান পাদ্রীর মত পোষাক করতেন, কিছুদিন পরে জেনে অবাক হলাম যে, তিনি বেনেডিকটিন সম্প্রদায়ের তাপস। য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে গবেষণার জন্য তাঁকে মঠ থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁকে তেমন দেখায় না, যেমন আমার ধারণানুযায়ী তাপসের মতও দেখায় না। তাঁর দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ আকৃতি, ধূসর চুল, দর্শনীয় নীল চোখ আর গোলাকার লালমুখ। তিনি লাজুক ও গম্ভীর, আমার সঙ্গে বেশী কিছু ঘনিষ্ঠতা করতে চান না, তবে তিনি অতি মাত্রায় ভদ্র, আর টেবলের আলাপ-আলোচনায় নম্রভাবে কথাবার্তা বলতেন। সেই সময়েই শুধু তাঁর সঙ্গে দেখা হত, ডিনার শেষ হলেই তিনি আবার লাইব্রেরীতে পড়তে যেতেন। আর সাপার খাওয়ার পর যখন দু-বোনের মধ্যে যেটির অবসর থাকত তাঁর কাছে জার্মান পড়তাম, তখন তিনি শুতে চলে যেতেন।

"প্রায় এক মাস ওখানে অবস্থানের পর উনি যেদিন ওর সঙ্গে একটু বেড়াতে যেতে পারি কিনা জানতে চাইলেন, সেদিন আমি বিস্মিত হলাম। তিনি বল্লেন এমন সব জায়গা আমাকে দেখাতে পারেন যা সহজে আমার পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। আমি বেশ হাঁটতে পারতাম, কিন্তু তিনি আমাকে হারিয়ে দিতে পারেন। প্রথম দিনের ভ্রমণে আমরা বোধ হয় পনের মাইল হেঁটেছিলাম। তিনি জানতে চাইলেন আমি 'বোনেতে' কি কাজে এসেছি, আমি বল্লাম আমি জার্মান শিখতে এসেছি, আর সেই সঙ্গে জার্মান সাহিত্যের যতটুকু পারি জেনে নেব। তিনি বেশ জ্ঞানীর মত কথা বলতেন, তিনি বল্লেন যথাসম্ভব আমাকে তিনি সাহায্য করবেন। তারপর আমরা সপ্তাহে দু-তিন দিন এমনই হেঁটে বেড়াতে যেতাম। জানলাম তিনি কয়েক বছর ধরে দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপনা করছেন। প্যারীতে থাকার সময় আমি কিছু স্পীনোজা, প্লেটো ও দেকার্তে পড়েছিলাম, কিন্তু খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিকদের কিছুই আমি পড়িনি, এই বিষয়ে আলোচনা করাতে আমি ভারী আনন্দ পেলাম। একদিন আমরা যখন রাইনের ধারে একটা "বীয়র উদ্যানে" বসে বীয়র পান করছিলাম, তখন তিনি প্রশ্ন করলেনঃ আমি প্রোটেস্টাণ্ট কিনা।

"আমি বল্লামঃ 'আমার ত' তাই মনে হয়।'

"তিনি তৎক্ষণাৎ আমার পানে তাকালেন, মনে হল তাঁর চোখে হাসির রেখা খেলে গেল। তিনি এসকাইলাস সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। আমি গ্রীক ভাষা শিখছিলাম, জানেন ত, আর উনি সেই প্রখ্যাতনামা ট্রাজেডিয়ানদের সম্পর্কে এমন সব কথা বল্লেন যা আমি কোনোদিন জানতে পারব আশা করিনি। তাঁর কথা শুনে উৎসাহিত হলাম— মনে প্রেরণা জাগল। তিনি সহসা আমাকে এই প্রশ্ন কেন করলেন ভাবতে লাগলাম,—আমার অভিভাবক নেলসন খুড়ো ছিলেন নাস্তিক, কিন্তু তিনি প্রতি রবিবার গীর্জায় যেতেন তাঁর রোগীদের খাতিরে, আর সেই কারণেই আমাকে সানডে স্কুলে পাঠাতেন। আমাদের বাড়ির পরিচারিকা মার্থা ছিল গোঁড়া ব্যাপটিস্ট, বাল্যকালে সে আমাকে পাপীরা কিভাবে অনন্ত-কাল নরকের আগুনে জ্বলে মরবে তার বিবরণ দিয়ে আতঙ্কিত করত। গ্রামের বিভিন্ন লোক যাদের প্রতি যে কোনো কারণে মার্থার বিতৃষ্ণা হত তারা কিভাবে এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে তার বর্ণনা করে সে প্রকৃত আনন্দ পেত।

(ক্রমশঃ)

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী

নয়াদিল্লী থেকে ব্রেজিল যাত্রার পূর্বে আমি কয়েক দিনের জন্য শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়েছিলাম। শান্তিনিকেতন ভারতের এক অপূর্ব স্থান। এর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। এখানকার লোকজনের মধুর সাহচর্যও ভুলবার নয়। এরই জন্যে শান্তিনিকেতনকে আমার দ্বিতীয় বাসভূমি বলেই মনে করে আসছি। তারপর করাচীতে আমার আদি বাসস্থান পাকিস্থান হওয়ার দরুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শান্তিনিকেতনকেই আমার একমাত্র নিকেতন বলে জেনেছি। কাজেই ব্রেজিলের রিও ডি জেনেরোর দিকে পাড়ি দেবার আগে এখানকার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম।

সেখানে একদিন শুনতে পেলাম আমি ব্রেজিল যাচ্ছি শুনে স্কুলের ছেলেরা শিক্ষককে বলছে, "তিনি কি সেই দেশেই যাচ্ছেন, যেদেশে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস গিয়েছিলেন?" কে এই কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করাতে আমার এক বন্ধু জানালেন, তিনি একজন দুঃসাহসী বাঙালী যুবক ছিলেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে গৃহত্যাগ করে তিনি এক সার্কাসের দলের সঙ্গে ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এই দলে তাঁর কাজ ছিল সিংহের সঙ্গে খেলা করা। শেষে তিনি ব্রেজিল যান এবং সেইখানেই বসবাস করতে থাকেন। সেখানে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে তিনি দেশের সাধারণতন্ত্রের পক্ষে লড়াই করে সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর ব্রেজিলের জীবনযাত্রার কোনো সঠিক বিবরণই ভারতের লোকেরা জানে না। তবে একথা স্বাভাবিক যে, তাঁর সাহসের কাজগুলোর অতিরঞ্জিত বিবরণ বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়ে থাকবে—বিশেষ করে তরুণদের কাছে, যাদের কল্পনানেত্রে এঁর নাম রূপকথার রাজপুত্রের মতই চমক লাগায়।

এইজন্যই কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস ব্রেজিলে কিভাবে জীবনযাপন করে গিয়েছেন, তার প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য আমার মনে কৌতূহল জেগেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমি কতকটা সন্দিগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম; এমন কি, এরূপ কোনো ব্যক্তি যে আদৌ ব্রেজিলে এসেছিলেন, তাতেও আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল। ব্রেজিলবাসী যাকেই আমি তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করেছি সেই বলেছে, এই নাম সে কখনো শোনেনি; তাই, কি করে যে তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান ব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভাগ্যক্রমে সুযোগটে গেল। রিও ডি জেনেরোতে প্রথমেই যেজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, ঈন বাঙালী ভদ্রলোক তাঁদের অন্যতম। নাম অশেক মুখুজ্জ্যে। গত বিশ বৎসরক তিনি রিও ডি জেনেরোতে বাস করছেন্দূরবর্তী এই মহাদেশে একজন বুদ্ধিজীবীসংস্কৃতিবান ও অমায়িক ভারতীয়বেয়ে আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল। তপর, দীর্ঘকাল প্রবাস যাপনের দরুণ ভারজন্য তাঁর মনে অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল রমণীয় ও বিভ্রান্তিকর নগরীর চালচলন, ভাষা সব কিছুই আমার কাছে নতুন; ৰে পরিবেশের মধ্যে তিনি এবং তাঁর ভত্রিস্ত্রী শত রকমে আমাকে সাহায্য করেছেন.। দরুণ এখানে আমার কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। মুখুজ্জোমশাইয়ের জীবনও যদি বলি ঠিক রোমান্সের মতো শুনাবে। শতকের গোড়াতে দুজন অসমসাহসী বাইসিকেলে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেছিদেখুজ্জ্যে মশাই এই দুজনার অন্যতমক, এখানে আমাদের কর্ণেল বিশ্বাসেহনী বলতে হবে বলে মুখুজ্জ্যে মশাইয়ো বাড়িয়ে দরকার নেই।

(২)

এবুখুজ্জ্যের সঙ্গে কর্ণেল বিশ্বাসের সম্বন্ধে হল। গল্প করতে করতে তিনি লেন। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখছি, তিনি বালি ঝেড়ে একতাড়া কাগজ বার করলেসটা খবরের কাগজ থেকে কাটা টুকরো বাণ্ডিল। কাগজগুলো সবই সুরেশস সম্বন্ধে। এই কাগজপত্রগুলোর উপর করে সুরেশ বিশ্বাসের দুর্গমযাত্রা নিম্নে দেওয়া গেল।

খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন তারিখে 'A নামক রিও ডি জেনেরোর বিখ্যাত সান্ধপত্রে কলিকাতার মিঃ ইউ কে বোস নামক ব্যক্তির একখানি পত্র প্রকাশিত হয়।খক জানান যে, কর্ণেল সুরেশ বিশ্ব মাতুল ছিলেন। মাতুল মশাইয়ের পরিখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন, জানা পত্রখানিতে অনুরোধ জানান হয় অনুসন্ধানের প্রত্যুত্তরে ১৪ই এবং ১৫তারিখের 'A Noite' পত্রে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী সম্পর্কে কয়েক কলমব্যাপী চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির স্থানীয় রিপোর্টারদের অনুসন্ধানের ফলেই এ সকল তথ্য প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছিল। রিপোর্টার তাঁর রিপোর্টে যে কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা স্পষ্টই বোঝা যায়; তিনি তাঁর অনুসন্ধানের পাত্রকে কোনো রাজপরিবারের উন্নতমনা উত্তরাধিকারিরূপে বর্ণনা করে বলেছেন যে সুখান্বষণের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি সহসা রাজপ্রসাদ, ধনরত্ন ও বিলাসবাসন পশ্চাতে রেখে গৃহত্যাগ করেন এবং সামান্য একজন পর্যটকের বেশে প্রকৃত সুখের সন্ধানে ভ্রমণ করতে থাকেন।

(৩)

কর্ণেল বিশ্বাসের স্ত্রীর সম্বন্ধে রিপোর্টার যে সকল সংবাদ সরবরাহ করেছেন, সেগুলিও বেশ চিত্তাকর্ষক। সংবাদ প্রকাশের সময়ে কর্ণেল বিশ্বাসের স্ত্রী জীবিত ছিলেন এবং রিপোর্টার তাঁকে খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কর্ণেল বিশ্বাসের স্ত্রীর নাম ডোনা ম্যারিয়া অগস্টা ফার্ণাণ্ডিজ বিশ্বাস। রিও ডি জেনেরোর শহরতলী-অংশে একখানি সামান্য গৃহে তিনি বাস করতেন। রিপোর্টার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তিনি তখন 'পয়ষট্টি বৎসরের শুভ্রকেশ, কমনীয় কান্তি এবং সদয়ান্তঃকরণা বৃদ্ধা।' পত্রিকায় তাঁর যে ফটোগ্রাফ বেরিয়েছিল, তা দেখে মনে হয়েছিল যে, যৌবনে তিনি সত্যি সুদর্শনা কান্তিযুক্তা রমণী ছিলেন। তাঁর বিবরণ যা বেরিয়েছিল, তাতে তিনি নিজে এই কথা বলেছেন, "আমি তখন ষোলো কি সতেরো বৎসরের বালিকা। রিও ডি জেনেরোতে একদিন খুব বড়ো একটা সার্কাসের দল এলো। সুরেশকে আমি সেই দলেই প্রথম দেখেছিলাম। সার্কাস দেখে ফিরে এসেও তাঁকে আমি ভুলতে পারি নি। জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত সাহসের খেলা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।" কয়েক মাস পরে এক বন্ধুর গৃহে কর্ণেল বিশ্বাসের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তারপর থেকে তাঁদের মধ্যে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকে এবং ক্রমে প্রেম অংকুরিত হয়। তিনি আরো বলেছেন, "সুরেশ তখন সার্কাস করা ছেড়ে দিয়েছে। তার কয়েক মাস পরে সে ইউরোপ চলে গেল; যাবার সময় আমাকে বলে গেল, সেখানে সে 'বসকো' নামে একটা হাতীর সঙ্গে খেলা দেখাতে যাচ্ছে। তারপর ফিরে এসে সে মিলিটারী পুলিশ বিভাগে কাজ নিল। তখন আমার তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়। এর আগেই তাঁর কর্পোরেল পদবী ছিল। আমার কাছে সে বিবাহের প্রস্তাব তুলল। আমার পরিবারের লোকেরা তাতে মত দিতে রাজি হল না। তারা বলল, "সে একজন সৈনিক, তারপর জন্তু-জানোয়ার নিয়ে খেলা

করে, তার সংগে আমার কিরূপে পরিচয় হতে পারে। স্বামী হিসাবে সে তো এক সাংঘাতিক ভয়ের পাত্র।"

যাই হোক, পিতামাতার সম্মতির অপেক্ষা না করেই তিনি কর্ণেল বিশ্বাসকে বিয়ে করলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তারিখে তাঁরা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। কর্ণেলের স্ত্রী বলেছেন, "স্বামী হিসাবে সুরেশকে আমি সর্বোৎকৃষ্ট বলতে কুণ্ঠিত নই। নারীরা সর্বোত্তম সংগী হিসেবে যেমন লোককে পেতে চায়, সুরেশ ঠিক তেমনটিই ছিল।" তাঁদের সবশুদ্ধ ছয়টি সন্তান হয়েছিল। বিধবা যখন রিপোর্টারকে তাঁর কাহিনী শুনান, তখনো তিনটি সন্তান জীবিত—দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা। তাদের নাম—সুরেশ (পিতৃনামেই তাঁর নামকরণ হয়েছিল), হার্মেজ এভারিস্টো, এবং স্টেলা। রিপোর্টারের মতে স্টেলা বিশেষ লজ্জাশীলা মেয়ে—তাঁর চেহারা উজ্জ্বল। পিতামাতার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সে সবই পেয়েছে।

কর্ণেল বিশ্বাস তাঁর আগেকার জীবন সম্বন্ধে সেখানে কিছুই বলেন নি, একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। স্ত্রীকেও বোধ হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানান নি। রিপোর্টার অতঃপর এক বৃদ্ধ পুলিশের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর নাম জোয়াও মার্টিনস। তিনিও এক সময়ে জন্তু-জানোয়ারদের পোষ মানাতেন। জোয়াও মার্টিনস কর্ণেল বিশ্বাসকে জানতেন। তিনি বলেছেন, "কর্ণেল বিশ্বাস মিলিটারী পুলিশের ক্যাপ্টেন ছিলেন, কর্ণেল নয়। মিলিটারী পুলিশে যোগ দেবার আগে সুরেশ কার্লস ব্রাদার্সের সার্কাস দলে কাজ করতেন। তাতে ...্গো নামে হস্তীর সংগে ক্রীড়া করাই তাঁর কাজ ছিল। এই হস্তীর দেহ এখন ন্যাশনাল মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।" তাঁর পত্নী ছিলেন সৈন্যদলের একজন ক্যাপ্টেনের কন্যা। ক্যাপ্টেনের নাম ম্যারিওলিনো রড্রিগস ড কোস্টা। তিনি সামরিক কাজ ছাড়াও কৃষি-মন্ত্রীর দপ্তরে উচ্চ কর্মচারী পদে কাজ করেছিলেন।

(৪)

এর পর রিপোর্টার যাঁর কাছ থেকে খবর আদায় করেছেন, তাঁর নাম হেনরী লিওনার্ডোস। তিনি যখন মিলিটারী পুলিশের কর্মচারিরূপে কাজ করতেন, সেই সময়ে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের সংগে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে জানা-শোনা ছিল। হেনরী লিওনার্ডোস যেসব খবর দিয়েছেন, তাতে জানা যায়, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর যে হাংগামা হয়েছিল, সুরেশ তাতে জড়িত হয়েছিলেন। ব্রেজিলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এই গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। সুরেশ এই সংগ্রামে ফ্লোরিয়ানো পেকসোটোর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। ফ্লোরিয়ানো পেসোটো পরে ব্রেজিল সাধারণতন্ত্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। অসমসাহসিক কাজের জন্য কর্ণেল বিশ্বাসকে সার্জেণ্টের পদে উন্নীত করা হয়। "কিন্তু সুরেশ যদিও একজন সৈনিক মাত্র ছিলেন, তবু জ্ঞান ও মার্জিত রুচির জন্য তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ছয়টি ভাষাতে অনর্গল কথা বলতে পারেন। এই গুণের দরুণ তিনি যে ব্যাটেলিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার সেক্রেটারিয়েটে তাঁকে কাজ দেওয়া হয়।

মার্শাল হার্মেজ ডা ফনসেকো (পরবর্তী-কালে ইনি ব্রেজিল সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন), যখন মিলিটারী পুলিশের কম্যাণ্ডার, তখন তিনি তাঁর দুই ছেলেকে ইংরেজি ও ফরাসী পড়াবার জন্য সুরেশকে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি সুরেশকে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত করেন। সুরেশের বিয়ের পর যখন তাঁর সন্তান হয়, সেই সময়ে মার্শাল হার্মেজ ও তাঁর স্ত্রী একটি সন্তানের ধর্মপিতা ও ধর্মমাতা ছিলেন। সুরেশ ভদ্রাশয় লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি এরূপ স্বল্পভাষী ছিলেন যে, ভারতের বড়-লোকের ঘরের যে মর্যাদা তাঁর ছিল, তিনি কোথাও জাহির করেন নি। কে জানে হয়ত তিনি নিজের জাতীয়তাকেই গোপন করে চলতেন।" হেনরী লিওনার্ডো আরো বলেছেন, "মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নানায় সুরেশের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তিনি লণ্ডনের মনস্তত্ত্ববিষয়ক বিদ্যায়তন একাডেমি অব সাইকিক স্টাডিজের তিনি ব্রেজিলস্থ একজন সংবাদদাতা ছিলেন। ব্রেজিলের বিখ্যাত লেখক ও সমাজতত্ত্ববিদ্ ইউক্লাইডিস ডা কুনহার সংগেও তাঁর নিবিড় অন্তরংগতা ছিল। কানহার লিখিত 'রেবিলিয়ন ইন দি ব্যাকল্যাণ্ড' ব্রেজিল সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

রিপোর্টার সর্বশেষে যে ব্যক্তির সংগ সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁর নাম টেন অ্যাস্টল্‌ফো ফেরেরা ডা পিনহো। কর্ণেল বিশ্বাসের সংগে তাঁর প্রগাঢ় অন্তরংগতা ছিল বলে তিনি দাবী করেছেন। ক্যাপ্টেন অ্যাস্টলফো যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, সুরেশের প্রিয় হস্তী বসকো মারা যাবার পর তাঁর জীবিকার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়েই ঘটনাক্রমে ক্যাপ্টেনের সংগে সুরেশের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁদের বন্ধুত্ব জন্মে। সুরেশ যে একজন বিদেশী, ক্যাপ্টেন তা জানতেন না—না জেনেই তিনি মিলিটারী পুলিশে চাকুরী পেতে তাঁকে সাহায্য করেন। একদিন ফরাসী রাজদূত হেড কোয়ার্টার পরিদর্শনে আসেন। তাঁকে গিয়ে অভ্যর্থনা করতে হবে এবং তাঁর নিজের ভাষাতে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে হবে। সুরেশকে এই কাজের ভার দেওয়া হল। তিনি গিয়ে তাঁকে ফরাসী ভাষায় সম্বর্ধনা জানালেন এবং তাঁর মনে এমন ভাল ধারণার সৃষ্টি করলেন যে, রাজদূত প্রকাশ্যেই এই যুবকের বুদ্ধি ও শিষ্টাচারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সেই ঘটনার অনেক দিন পর সুরেশ তাঁর জাতির কথা ক্যাপ্টেনের নিকট প্রকাশ করায় ক্যাপ্টেন জানতে পারেন যে, তিনি ভারতীয়। তবে তিনি তাঁর অতীত জীবনের কথা কাউকে কখনো বলতেন না। তাঁর বন্ধুকে তিনি এই-টুকু মাত্র বলেছিলেন যে, তাঁর বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, সেই সময়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তার কারণ, পিতামাতা তাঁকে এমন এক ধর্মে দীক্ষা নিতে বলেছিলেন, যার প্রতি তাঁর আদৌ বিশ্বাস ছিল না।

ক্যাপ্টেন তাঁর বন্ধুর সম্বন্ধে যে স্মৃতি কথা বর্ণনা করেছেন নানাদিক দিয়ে তা চিত্তাকর্ষক। এখানে আমি তাঁর নিজের কথায় সে বিবরণের আরো খানিকটা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। ক্যাপ্টেন অতঃপর বলছেনঃ "আমি সুরেশ বিশ্বাসের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সংগে ছিলাম, তথাপি তাঁর জীবনী সম্বন্ধে তেমন কিছু জানতে পারিনি। আমরা উভয়ে যতদিন অবিবাহিত

ছিলাম, ততদিন আমরা দুজনাতে এক সঙ্গে কাল কাটিয়েছি। তাঁর চালচলনে আমরা অনেক নূতনত্ব দেখেছিলাম, যা নাকি প্রথমে নিতান্ত কৌতূহলবশেই অনুসরণ করেছিলাম, পরে অবশ্য অন্তরঙ্গতার দরুণ সে-সব আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মদ্য বা ধূমপান একেবারেই এড়িয়ে চলতেন। মাংস প্রায় খেতেনই না। প্রায় সর্বদা নিরামিষ আহার করতেন। রিও ডি জেনেরোর চারপাশের অরণ্যভূমিতে বিচরণ করতে খুব আগ্রহ ছিল। সেখানে কোনো বৃক্ষছায়ায় কোনো ঝরণার পাশে, কিংবা যদি দেখতেন কোনো বৃক্ষপত্রের চতুর্দিকে কীটপতঙ্গ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তার নিকটে বসে বা দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। একদিন এইরূপ বেড়িয়ে বেড়াবার সময় দেখলুম, তিনি একটি ঝরণার ধারে বসে কাঁদছেন। এর কারণ প্রথম তিনি কিছুই আমায় বলতে চাননি। পরে যখন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন জেনেছিলাম, প্রকৃতির উপাসনায় তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, প্রকৃতির ধ্যানে তাঁর ভাবসমাধি উপস্থিত হয়। আমাদের ফকির-সন্ন্যাসীদের মতো সুরেশ পাখী, সর্প প্রভৃতিকে বশ করতে পারতেন। জঙ্গলে বেড়াতে বেড়াতে একটি সর্প আমার দৃষ্টিপথে পড়েছিল, সেইদিন সুরেশ তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রমাণ আমার চোখের সামনেই দিয়েছিলেন। প্রথমত, তিনি সর্পটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর শিস্ দিতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সাপটি তাঁর পায়ের কাছে চলে এল এবং তাঁর পায়ের চার-দিকে গড়াতে লাগল। সুরেশ তাকে বাহুর উপরে তুলে ধরলেন। পরে একদিন তিনি চিড়িয়াখানার ভিতরে এক মারাত্মক জাতের পাখীর সঙ্গে এইরূপ খেলা খেলেছিলেন।

"সুরেশ আমাকে দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে অদ্ভুত ক্ষমতা পরিচালনার বিষয়টি শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। একজনের কাছ থেকে দূরবর্তী আর একজনের কাছে চিন্তা কিভাবে প্রেরণ করতে হয়, তাও তিনি শেখাতে চেয়ে-ছিলেন। আমি তাতে তেমন সাফল্যলাভ করতে পারিনি, কেননা, এই কার্যে যথেষ্ট ত্যাগ ও সংযমের প্রয়োজন। এর কৌশল আয়ত্ত করাও যথেষ্ট শক্ত। তবু তাঁর সাহায্যে আমার নিজের মধ্যে একদিন আমি এক অপূর্ব অলৌকিক শক্তির বিকাশ উপলব্ধি করেছিলাম। আমি বাড়িতে চাবি ফেলে এসেছিলাম। আমার সহকারীর হাতে চাবিটা আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, এই ইচ্ছা আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে চালনা করে দিয়েছিলাম। আমার সহকারী কয়েক ঘণ্টা পরেই চাবি নিয়ে উপস্থিত হয়ে জানিয়েছিল যে, আমার স্ত্রী ঐ চাবি তাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুরেশ সত্যি অসাধারণ লোক ছিলেন। আমি অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস করি না, ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এই সকলের রহস্য ভেদ করতে হয়ত সক্ষম হবে, তা জেনে শুনেও আমি কোনক্রমেই এসবে আস্থা স্থাপন করি না। তবু যা জানতে পেরেছি, তাকে অস্বীকারও করতে পারছি না।"

এই অদ্ভুত ভ্রমণকারীর গল্প আমাদের এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। ভারতীয়দের মধ্যে সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম ব্রেজিলে বসতি স্থাপন করেন। আশা করি, তাঁর এই কাহিনী ভারতীয় পাঠকদের চিত্তাকর্ষণ করবে। কেবল কাহিনীর যোগ্যতা বলেই নয়, আরো এক কারণে ভারতীয় পাঠকের মন এতে আকৃষ্ট হবে। আগে ব্রেজিল ভারতবর্ষ থেকে যতটা দূরে মনে হত, এখনকার দিনে আর ততটা দূরে মনে হয় না; এই স্থান আগের মত এত অপরিচিতও বোধ হয় না। দুটি দেশই এক-একটা মহাদেশ সদৃশ বৃহৎ; কালক্রমে দুটি দেশ অন্তরের দিক থেকে পরস্পর নিকটবর্তী হবে। তারপর ব্রেজিল সম্বন্ধে জ্ঞান ভারতে যতই বৃদ্ধি পাবে, ভারতবাসী জানতে পারবে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিদেশে এসে ব্রেজিলে কেন বসতি স্থাপন করেছিলেন।

দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

সিলভিয়া, তোমার রঙ যে গেলো হয়ে,
এখানে সবুজ মাঠে, শুধু
ধোপারা ঠাঁস বুনোনীর লীনেন দিত
আর ক্যাথলিক চার্চের পিনাকেলে বসত
বে-ঠিকানা লার্কের ঝাঁক।
ক্লাইভ-হাউসের চিমনী থেকে
সকালের সূচনা হতো।
বেলা দশটার আকাশ এখানে
থম্ থমে আর ভেজাল।
ধোবাপুকুরের চারদিকে গাধার
আর মিষ্টি মিষ্টি বারুদের গন্ধ

সীমান্তের খবর আসে না তো
সার্জেণ্ট-মেজর স্টেপ্‌ল্টন আর ফিরবে না।
স্মারকস্তম্ভের শেলট পাথর কেটে
লেখা হবে সার্জেণ্ট মেজরের
কাবুল যুদ্ধের কাহিনী কি ম্রিয়মান
সিলভিয়া,
মিষ্টি মিষ্টি বারুদের গন্ধে কান্না পায়।

সিলভিয়া, ডিগ্‌লা রোডের টেরাসে
নীলচে গাউন পরে,
তুমি কী স্বপ্ন দেখ।
চেয়ে দেখ, বটগাছের তলায়
অষ্টাদশ শতাব্দীর ছায়া এসে পড়েছে।
মাটীর তলায় কামনগুলো
যে ইংল্যাণ্ডের স্বপ্ন দেখছে
সেখানকার কফি-হাউসে বসে
তোমার কথা কি কেউ ভেবেছে!
যাদের ভারী বুটের চাপে,
ডিগলা রোডের সুরকি হলো মিহি
তারা এসেছিলো প্যামেলার কাউণ্টি থেকে,
তোমার কথা কি ভেবেছে—

সিলভিয়া, এই আকাশে কাণ পেতে,
নবজাতকের গান শোনো,
এশিয়ার শোণিত মোক্ষণ হচ্ছে
পূবে পশ্চিমে।
সেই শোণিতে লেখা হবে নবজাতকের জন্মপত্র।
সেই শোণিতে লেখা হোক
তোমার আমার ইতিহাস।

মহাভারত

অ-ম-ব

মহাভারত গ্রন্থ শুধু ভারতীয় প্রতিভার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি নহে, ইহা বিশ্ব-সাহিত্যেরই এক বিস্ময়। এক বিরাট জাতির বহুযুগব্যাপী সাংস্কৃতিক সাধনার পরিণত রূপ ও ইতিহাস এই গ্রন্থে যে সাহিত্যিক ও কাব্যগত পারদর্শিতার সহিত সংকলিত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ নাই। ইহা একাধারে পুরাণ, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক অভিধান। ইহাকে আর এক দিক দিয়া সমাজ বিজ্ঞানের গ্রন্থও বলা যায়, কারণ মানবিক সমাজের সকল প্রকার মনস্তত্ত্ব, সম্পর্ক ও পরিণতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের অন্যতম বিষয়। যে সকল নীতির আশ্রয়ে মানুষের সামাজিক ক্রমবিকাশ সম্ভব হইয়াছে, তাহারই আবিষ্কার ও পরীক্ষার এক বিরাট বিবরণ এই গ্রন্থ। হেন সামাজিক বিষয় ও সমস্যা নাই যাহা মহাভারতে বিশ্লেষণ করা হয় নাই। ভারত ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণের রাষ্ট্রগত অন্তর্দ্বন্দ্বের বিবরণ মাত্র বলিলে মহাভারতের মহত্ত্বকে ছোট করা হইবে। ইহা মানুষেরই চিন্তার পরীক্ষার ইতিহাস, যে চিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, কূটনীতি, বাণিজ্য ইত্যাদি সামাজিক জীবনের রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহ ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হইয়া মহাভারতের নিকট হইতে জাতি বহু নীতিসূত্র ও প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছে। সুন্দরের পরিকল্পনা, শত শত ধ্যান স্তোত্র ও স্তব দ্বারা মহাভারত জাতিকে ছন্দ অলঙ্কার ও রসের উপহার দিয়াছে।

মহাভারতের আর একটি বৃহৎ বৈশিষ্ট্য হইল ইহার উপাখ্যানের ঐশ্বর্য। কথা-সাহিত্যের প্রাচীনতম উদাহরণ মহাভারত। মানবিক জীবনের সকল সমস্যা সম্পর্কে কাহিনীর এত ব্যাপক উদ্ভাবন ভঙ্গী পৃথিবীর কোন সাহিত্য গ্রন্থে নাই। মহাভারতের মূল আখ্যানের যাঁহারা নায়ক নায়িকা, তাঁহারা তো ক্লাসিক চরিত্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে কীর্তিত হইয়া রহিয়াছেন। তাহা ছাড়া আছে, শত শত উপাখ্যান, যাহা এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী। বিভিন্ন সমস্যার রূপ লইয়া বিভিন্ন চিন্তা হৃদয়াবেগ ও আদর্শের প্রতিনিধিরূপে এই সকল উপাখ্যানের নায়ক ও নায়িকা ঘটনা ও পরিণাম সৃষ্টি করিতেছেন, সত্য ও মিথ্যার যাচাই হইয়া যাইতেছে। এই উপাখ্যানগুলি বস্তুতঃ এক একটি নাটকীয় ঘটনা সংঘাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। অপত্য, মাতৃত্ব, পতিত্ব, বন্ধুত্ব, পিতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি মানুষী হৃদয়-বৃত্তি, অনুভব ও সমাজ চেতনার উত্থান

ভারত প্রেমকথা

'দেশ' পত্রিকায় আগামী সংখ্যা হইতে মহাভারতে বর্ণিত এক একটি প্রেমোপাখ্যান গল্পাকারে প্রতি সংখ্যায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে। লেখক—আধুনিক বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষ।

আগামী সংখ্যার গল্প

'ভৃগু ও পুলোমা'

পতন ও সংগ্রামের কাহিনী এক একটি উপাখ্যানে রূপায়িত হইয়াছে। পৃথিবীর আধুনিক কথা-সাহিত্যে বর্ণিত এমন সামাজিক বিষয় খুব কমই পাওয়া যাইবে যাহার আখ্যানগত প্রতিরূপ ও 'প্লট' মহাভারতে না পাওয়া যাইবে। কত বড় সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া প্রাচীন ভারতের কথা-সাহিত্যিক মানব জীবনের সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সকল ক্ষেত্র হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য-নিষ্ঠা ভারতীয় কাহিনীকারের কল্পনা গুণে যুধিষ্ঠির রূপ লাভ করিয়াছে, ভাগ্যের অকতা ও নির্মমতা কর্ণের রূপ লইয়াছে। বির বিনয় আজও আছে, দুঃসাহসিক অার ভুলরূপে দুর্যোধন আজও বহু মার জীবনের পথ বিভ্রান্ত করিতেছে। শা অশুভের সংঘাতের ভিতর দিয়াই ঈসর মানুষ তাহার পথ করিয়া লইতেছে এাহারই মধ্যে যুগে যুগে আবিষ্কৃত হই সত্যের পথ, যাহা ধর্মরূপে পরি-চিহা সংসারকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া সু শোভা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে পরিণত কছি। মহাভারত গ্রন্থ তাহারই পা

ভারতে বর্ণিত উপাখ্যানসমূহের ম... আপ্রেমকাহিনীগুলিই অভিনব সৌন্দ... মণি অতীত বা আধুনিক পৃথিবীর কথাত্যে এমন কোন প্রেমকাহিনী পাওয়া যায় যাহার মূল পরিকল্পনা মহাভারতে নাই সমাজ-জীবনে নরনারী সম্পর্কের প্রশে সমস্যা ও ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মহা-ভার প্রেমকাহিনীগুলি বর্ণিত হইয়াছে। কাহিলির মধ্যে মনস্তত্ত্বের দিকটাই সব চেরে করিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে—ব্যক্তি-মনোতন্ত্র্য ও সামাজিক কর্তব্যের সংঘাত। সমস্থর মধ্যে খুবই বেশী পরিমাণে বাস্তা বা রিয়্যালিজমের স্পর্শ আছে, অথাাহার বর্ণনায় অতিরঞ্জন এবং অলেতার মাত্রাও বেশী। মনে হয়, প্রাচারতীয় কাহিনীকারের কাছে অতি-রঞ্জন অলৌকিকতার আরোপণ প্রকাশ-ভঙ্গালংকাররূপেই বিবেচিত হইত।

রত গ্রন্থ ইতিপূর্বে কয়েকটি বৈদেভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি রুশভাষাতেও এই গ্রন্থ অনুবাদিত হই ক্লাসিক কল্পনা ও ক্লাসিক চরিত্র-সাষ্ঠ ভাণ্ডাররূপে মহাভারত গ্রন্থ পৃথ শিক্ষিত সমাজে সমাদর লাভ করিে এবং দেখা যায় যে, বর্তমান যুরো বহু বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক ভারতচন্তাধারার সহিত পরিচয় লাভ করিয়াহাদের সাহিত্যকে নূতন রূপ ও তাৎপর্য করিতেছেন।

র্ষেও চিরসমাদৃত মহাভারত গ্রন্থের নূতনাদরের প্রয়োজন আছে, কারণ আধুভারতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্যই মহাভাইতে ঐশ্বর্য গ্রহণ করিতে হইবে।

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

আলো জবলে উঠতে বেশ বোঝা যায় অভিনয়ের বিষয়বস্তুর বাস্তবতায় সকলে বেশ চঞ্চল হ উঠেছে। বাস্তবচিত্র এত মর্মস্পর্শী বড় এ হয় না। দর্শকদের এ ধরণের উৎসাহ প্রব সমরের ভাল লাগে না। অভিনয় শেষ হ ভুলে যাবে বলে এত ড়াবাড়ি! প্রবীরদে ডেস্টিটট্যুট হোমে'র রবস্থার কথা এদে জনের মনে থাকবে? তঃপর বিনা উসুলে র স্বাক্ষর পাওয়া যাবে কি? সমরের রে পড়ে, মঞ্চের মাথায় লাল কাপড়ের ও সাদা অক্ষরে লেখাঃ মল্লিকপুর আতুরালয়ের সাহায্যকল্পে সাহায্য রজনী।

তারপর কি হলো ই শিশু-নরকংকালে প্রাণ জাগলো কি? সেই লোটি মেয়েটি আর মিলিত হলো কি? নগরে যদি লোভ থাকে, প্রতারণা থাকে, গ্রামে হাহাকার থাকে তাহলে এইসব ভাঙা জোড়া লাগবে কি করে? প্রান্তরের দৃশ্যটা বীভৎস্য, শকুনের ডানা-ঝাড়ায় মৃত্যু-বিভীষিকায়! সমরের মনে হয়, আশ-পাশের সকাই যেন মরে গেছে, কিছুক্ষণের জনে বুকচাপা একটা দুঃস্বপ্নের রেশ মনকে আঁকড়ে রাখে। এই পরিবর্তনের কথা কি প্রবী বোঝাতে চেয়েছিল? কিন্তু প্রত্যক্ষ দু মানুষের শুভবুদ্ধি যদি না আসে, দুঃ অভিনয় দেখিয়ে কি মানুষকে জাগান স কি লাভ? মল্লিকপুর আতুরালয়ের ড়ন্ত হবে? ছেলেমানষী ধারণা যত সব!

অন্ধকারে এক সময় নিঃশব্দে উঠে আসে। একটা দুর্বোধ্য প্রশ্নে কেমন ভার হয়ে থাকে। এখানে আজ ন যেন ভাল করতো। প্রবীরের তুলনায় নি এখন ছোটই মনে হয়—বুঝতে না চাইলেও যা করছে তার প্রকাণ্ডত্ব মন মেনে নেয়। বে কাজের যেন তুলনা হয় না। উদরান্নের যুদ্ধ করা আর পিছনে থেকে সেই যুদ্ধে কুড়িয়ে নিয়ে সেবা করা, দুটো কাজের চারিত্রিক পার্থক্য সমর যেন এই ভাল মনেও বুঝতে পারে। বারে বারে যুদ্ধে প্রবীরদের কাজ ব্যর্থ হলেও তার মান কখনো ব্যর্থ হবার নয়। সেই করে মানুষ পাশবিক উন্মত্ততায় পরস্পর হ কাটাটির মধ্যে নিজেকে হঠাৎ দেখেছিল, হিংস্র রক্তের স্বাদে করুণা বিগলিত ছিল—পশুত্বে মানবত্ব দেখা দিয়েছিল! এখন কি মানুষ পশুরও অধম হয়ে গেছে? প্রবীরদের কাজে তা হলে এত বাহবা দেই কেন? কিন্তু কতক্ষণ। চৌধুরীদের দুঃখবিলাসের মত অদ্য রজনীতেই এর শেষ! দান করার বিলাসিতাতেই গ্রহিতা আজো বেঁচে আছে!

রাস্তায় বেরিয়ে সমরের একবার মনে হলো এভাবে নিঃশব্দে ওঠে আসাটা পালিয়ে আসারই সামিল। ভালই যদি না লাগছিল, চৌধুরীকে বলে এলেই হতো—এমন চুপি চুপি চলে আসার কি মানে হয়। আর সভার ভাল-লাগলে তার ভাল লাগবে না কেন? একটা সমস্যায় পড়ে সমরঃ সত্যিই সে এমন চুপি-সাড়ে উঠে এল কেন? ভয় পেয়েছিল না, বিরক্তি লাগছিল? অসহ্য লাগলো তার কি কারণে! মনে করেছিল, সোজা বাড়ী যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়ীমুখো না হয়ে সামনে যে ট্রামটা পেলো সমর উঠে বসল। যখন হোক বাড়ী ফিরলে হবে এত তাড়া কি? এখনো তো বাবুদের নাটক হচ্ছে! এমনি মনে হয়—Life's a stage... All our yesterdays have lighted fools the way to dusty death—out, out... ...স্মৃতিশক্তির গণ্ডগোল হয়ে যায় ট্রামটা বড় শব্দ করে। হঠাৎ ইংরেজী নাটকের ঐ কথাগুলো এখন মনে হ'লো কেন ভাবতে গিয়ে সমর মনে মনে হেসে ফেলে—অদ্ভুত, আশ্চর্য এই আবোল-তাবোল ভাবনা। পাগল হয়ে যাবে না তো সে! সব কটা কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে না? It's a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing প্রবীরের কাজের কোন মানে হয় না। কিছু হবেও না ওতে—অদ্যই শেষ রজনী!

মানসিক উত্তেজনা যেন ক্রমশই বেড়ে চলে। কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পারা যায় না, যেন মস্ত একটা ঘা খেয়েছে এই মাত্র। মাথার ঘায়ে পাগলা কুকুরের মত নিজেকে নিজে চক্রাকারে বেষ্টন করে মরে। চৌধুরীর নাম করা "এ্যাকট্রেস্"টা কই দেখলুম না তো! অল্ বোগাস! বাণীও শেষ পর্যন্ত অভিনেত্রী হ'য়ে উঠলো? অরবিন্দ ছোকরা তো কই অভিনয় করলে না? He is off the board now? প্রবীরকে তো দেখা গেল না! রেবা could act well! উপযাচক হয়ে ওর এত মুড়ুলি করবার কি দরকার ছিল? Are war and famine the same thing? ওঁরা যদি যুদ্ধে না যেত তা হলে কি ঐ দুর্ভিক্ষ ঠেকান যেত? আর দুর্ভিক্ষ যে হ'য়েছিল এখন তার প্রমাণ কি? It haunts weak mind and its remembrance exploits the fashionable and snobs, who cares? যুদ্ধে গিয়ে সে এমন কিছু মহামারী অপরাধ করেনি—তার ইচ্ছে মত খুসী মত কোন কিছু ঘটে নি! Events follow a natural course—তাকে দায়ী করা কেন? নিজের জীবনে এই ছ বছরে এ পর্যন্ত যা ঘটলো তাও স্বাভাবিক অবধারিত কোন্ রীতি অনুযায়ী? কোন কিছু অস্বাভাবিকতা ঘটেনি—এমনটা হ'বে সমরের জানা ছিল? অভিনয় করাটা আজকাল ফ্যাশন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! Is it natural to forget and to be known? চৌধুরীর বোনের মাথায় কিছু নেই—বড় ছেলেমানুষী করে, বলে সময় সময়। কিন্তু হঠাৎ রেবার সম্বন্ধে এত সচেতনতা আসে কেন? আজ রেবার পাশে বসে' যদি দুর্ভিক্ষের অভিনয়টা দেখতে পেত তা হলেও কি মনের এই পবিত্রতা থাকতো? না, তার বিপর্যস্ত মানসলোকে স্থৈর্য আসতো, মন ভরে উঠতো? সত্যি কি হ'লে সে খুশী হয়? কাকে চায় সে এখন?

ট্রামে ট্রামে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সমর বৌবাজার কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে নেমে পড়ে—এরপর কোথায় যাবে ঠিক করতে যেন অনেকক্ষণ দেরী হয়। মনে মনে খুঁজে দেখে তাকে এই মুহূর্তে বোঝবার, সমাদর করবার মত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কোথায়! একজন কাউকেও খুঁজে পাওয়া যায় না, একজন কারো নাম এখন মনে পড়ে না! আশ্চর্য, গত তিরিশটা বছর এত অনাত্মীয় নির্বান্ধব হয়ে বেঁচে আছে সে? তার কেউ নেই? নিজেকে নির্বান্ধব উপলব্ধির মত অসহায়তা যেন আর নেই। অনেক দুঃখে কষ্টে এইটাই বোধ হয় মানুষের সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। সে ঠিক না জানলেও, আশা না-করলেও তাকে বোঝবার কেউ না কেউ কোথাও যেন আছেই। এ বোধ না-থাকলে দুঃখকষ্ট, মান-অভিমান, উপেক্ষা-অপমান বোঝার মতই জগদ্দল হয়ে থাকতো আর তাকে নির্বিবাদে বহন করার ক্ষমতা কোন মানুষের কোনদিন হতো না।

বহুবাজার স্ট্রীট দিয়ে সোজা পূব মুখো হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ সমরের নজরে পড়ে, হাঁটুর ওপর দকদকে ঘায়ের মত ফরডাইস লেনের সংকীর্ণ প্রবেশপথটা হাঁ হয়ে আছে—নিবোন উনুনের ছাই-এ, ছেঁড়া চুলের পাজে, আনাজের খোলায় গলির মুখটা মাখামাখি। পোকাধরা, ছেৎলাপড়া পানের কসলাগা দাঁত ছিরকুটে থাকার মত। সমর থমকে দাঁড়িয়ে যায়, গায়ের ভেতরটা শিরু শিরু করে ওঠে...

লোহাপট্টীর দালালটার কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন একটা অবলম্বন পেয়ে বড় খুশী হয়। এই নোংরা সংকীর্ণ পরিবেশ আশ্চর্য রকমে ভাল লাগে।

গলির ভিতর ঢুকে কয়েক পা এগুতে খেয়াল হয়, তাইতো কোথায় চলেছে সে! ঠিকানা না-জানলে ভদ্রলোককে খুঁজে বের করবে কি করে। বহুবাজারের ফরডাইস লেনে অমন অনেক লোক তো বাস করে যাদের ঠিকানা তারা নিজে ছাড়া দুনিয়ার কারো জানবার দরকার হয় না। অজ্ঞাতবাস নয়, অবজ্ঞাত অবস্থান আমৃত্যু পর্যন্ত! তবু সমর যে কিসের টানে এগিয়ে যায় বোঝা যায় না,—যেন আজ ভদ্রলোককে তার বিশেষ প্রয়োজন! গলির অন্ধকার রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে পা টিপে টিপে এগুতে এগুতে এদিক ওদিক ব্যগ্র উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে সমরের মনে হয়, এই দিশাহারা পরিক্রমায় যার সন্ধান মিলবে সে কি তাকে চিনবে। সেদিনকার সেই সকালে মাটির ভাঁড়ে চা এগিয়ে দেওয়ার মত আত্মীয়তা প্রকাশ করবে? এ বিশ্বাসের কি মানে হয় সমরের?

একটা বাড়ির সামনে এসে সমর থমকে দাঁড়িয়ে যায়। বাড়িটার সামনে একটু তফাৎ-এ একটা গ্যাস পোস্টের মাথায় বরাদ্দ আলোটা ব্ল্যাক আউটের বেড়া ডিঙিয়ে বাড়িটার গায়ে হঠাৎ চলকে পড়েছে। গলির ওপর দাঁড়িয়ে বাড়িটার নীচে চোখ রাখলে হঠাৎ মনে হয়, বাড়িটা যেন অনেকখানি ভূগর্ভে নেমে গেছে—আরো কিছু দিনে যেন গোটা একতলাটা ভিতের কাজ করবে। বাইরে থেকে জানালায় তারের জাল আঁটা একটা ঘরের মধ্যে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে হুটোপাটি করছে, এক কোণে একজন যেন কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের আলোর নিষ্প্রভতায় ছেলেমেয়েগুলোর মুখ দেখা যায় না, তবে তাদের মুখরতা গলিতে দাঁড়িয়ে টের পাওয়া যায়। হঠাৎ সমরের আলোবাতাসের কথা মনে হয়। ঐ ঘরে কোনদিন উদয়-অস্ত বৈদ্যুতিক আলো না জ্বালিয়ে ঐ ছেলেমেয়েগুলো পরস্পরকে দেখতে পেয়েছিল কি? ধোঁয়ার কণে বাল্বটার মুখটা রগড়ে ঘসে দেওয়ার মত। সমর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখে ছেলেগুলো বাড়িটাকে আরো বসিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপণ দাপাদাপি করছে। ওপর-তলায় কারো (বাড়িওয়ালা বোধ হয়) পোষা কাকাতুয়াটা দাঁড়ে বসে তারস্বরে সমানে তাল দিচ্ছেঃ কিঁয়া—র্যাঁ—র্যাঁ,—ওঁ—ওঁ—আঁ! কিঁয়া—কানের মধ্যে খোঁচা লাগিয়ে দেওয়ার মত পাহাড়ী পাখীটার শব্দ। কে জানে এরা সেই দালালের ছেলেমেয়ে কিনা! এদের দেখতে—বুঝতে অকারণে সমরের আজ ভাল লাগে।

বাড়িটার সামনে থেকে সরে আসতে বেশ কষ্ট হয় সমর বুঝতে পারে, আশ্চর্য! অথচ কষ্ট কেন, সমর [illegible] কষ্টের কারণ কি? ঐ ক্রীড়ারত মানব শিশু? ভূগর্ভস্থ অন্ধকূপ? পোষা কাকাতুয়ার তীক্ষ্ম চীৎকার? না, আর কিছু? যত সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে পিছন থেকে বাড়িটা যেন তত টানতে থাকে—হঠাৎ মায়াজালে আটকে যাওয়ার মত দুর্বার সে আকর্ষণ। এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কারো সন্দেহ হতে পারে। সমর সামনে পানবিড়ি দোকানটার তলায় এসে দাঁড়ায়, পাকা বাড়ির গায়ে আবের মত দোকানটা ক্ষিপ্ত। সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে উঁকি মেরে সমর নিজের মুখটা একবার আয়নায় দেখে নেয়। পানবিড়ির দোকানে অনিবার্য মূলধনের মধ্যে আরশির আবশ্যকতার কথা ভাবে হয়তো। চোখ ফেরাতে ওবাড়ির তারের জাল দেওয়া জানালার ভিতর আলোটা হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল—ছেলেগুলোর গলা যেন টিপে বন্ধ করে দেওয়া হল।

গলির বাইরে এসে সমরের মনে হলো এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। নিশিতে পাওয়ার মত এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছিল যার স্মৃতি চিরকাল মনে থাকবে, কিন্তু যার সন্ধান কোনদিন মিলবে না। এমন মুহূর্ত আসবে যখন পড়ে-পাওয়া আত্মীয়তার জন্যে মনটা সব কিছু ফেলে ছুটে যেতে চাইবে। এমনি দুর্লভ মনে হবে অজ্ঞাতকুলশীল ফরডাইস লেনের কোন একজনকে। পিছন থেকে কাকাতুয়াটার তীক্ষ্ম চিংকার শোনা গেল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে সমরের মনে হলো, অনন্ত অন্ধকারের অতল স্পর্শ—পাশ ফিরলে যেন এমন জায়গায় পড়বে যেখান থেকে পুনরুত্থানের আর শক্তি থাকবে না। মনের ধারাবাহিকতা যেন বিলুপ্ত হয়েছে—কেবল এই ঘুম ভাঙা মুহূর্ত ছাড়া আর কিছু মনে করা যায় না। আশ্চর্য এই ভ্রান্তি, মুহূর্তের জন্যে পূর্বাপরের বিস্মৃতি! হঠাৎ নিজেকে আর নিজে মনে হয় না।

অন্ধকারে কিছুক্ষণ চোখ দুটো নিমীলিত স্থির রাখলে আবার যেন সব মনে করতে পারা যায়, কিন্তু কখন কি অবস্থায় বাড়ী ফিরেছে সমর কিছুতে মনে করতে পারে না। কিছু খেয়ে শুয়েছে কি না, তাও মনে পড়ে না। বাণী কি তার আগে ফিরে এসেছে? না এখনো তাদের অভিনয় হচ্ছে? এখন রাত কটা? একলা একলা চলে আসা উচিত হয়নি, অভিনয় শেষে বাণী কার সংগে ফিরবে? জানালা দিয়ে তারা ভরা আকাশের কিছুটা দেখা যায়—অন্ধকারটা যেন ঘরের ভিতরেই বেশী, আকাশে তেমন অন্ধকার নেই।

কিছুক্ষণ ঘুম ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে থাকতে সমরের কেমন যেন ধারণা হয়, সে এই রকম অসহায় পঙ্গু হয়েই চিরকাল থাকবে—শুধু চোখ চেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে কেবল দেখে যাবে, ভেবে-যাবে। কোন কিছু করবার তার ক্ষমতা নেই। আশ্চর্য অদ্ভুত ভাবনা!.... এক সময় বিছানা ছেড়ে সমর উঠে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে আসে—হয়তো মনে করে জেগে-জেগে বিছানায় পড়ে থাকলে সে সত্যিই জড় পঙ্গু হয়ে যাবে। বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সদর রাস্তার অনেকটা দেখা যায়—আলো আঁধারে রাস্তাটা যেন ঝিম্ মেরে পড়ে আছে। আকাশে মুখ ফেরালে অনেক তারার দপ্দপানি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। সমর কিছুক্ষণ চুপ কর দাঁড়িয়ে থাকে—হঠাৎ মনটা যেন বোবা হয়ে যায়। এরকমভাবে যেন অনেকক্ষণ—বহুক্ষণ—চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকা যায়।—এই মুহূর্তের আর যেন শেষ না হয়—এই নিজেকে দেখার, অভূতপূর্ব কিছু একটা ঘটে যাবার প্রতীক্ষা।

একটা মাদকতা যেন ধীরে ধীরে মস্তিষ্কটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একটা অস্পষ্ট অব্যক্ত বাসনা ব্যক্ত হতে চায়। একটা পাবার আগ্রহ বড় অধীর হয়ে উঠে। এরকম-ভাবে কামনার গভীরতা যেন আর কখনো উপলব্ধি করা যায়নি। নিজেকে সমর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়—চৌধুরীর বোন রেবাকে আপন পুরুষত্বের সবটুকু দান করতে মনে এতটুকু দ্বিধা সংকোচ বা আপত্তি থাকে না। তারাভরা আকাশের নীচে অন্ধকার উন্মুক্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে শূন্য উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে অনুভূতির তীব্রতায় সমর কাঁপতে থাকে—পেতে চাই, পাওয়া চাই! আর ব্যর্থতার আক্ষেপ নয়, অনুরাগের হর্ষ-পুলক আকুলতা! এ[illegible] কামনা? সমর শূন্য হাত বাড়িয়ে চৌধুরী[illegible] বোন রেবাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ করতে চায়। তারায় তারায় সে কামনায় কানাকানি। *

* * * *

প্রথমটা যোগানন্দবাবু বিশ্বাস করতে পারলেন না। সমরের মুখের দিকে কেমন একরকম করে চেয়ে রইলেন। সমর বললে[illegible] প্রস্তাবটা অবিশ্বাস্য। কিছুক্ষণ পরে সামলে নিয়ে স্বরটা নীচু করে বললেন, এ কি তুমি নিজে বলচো, না ওদের দিক থেকে কিছু শুনেচো? মেজর চৌধুরী তো শুধু তোমার বন্ধু নয়, নামকরা আই সি এস-এর ছেলে; বন্ধু হিসেবে যেমে যে কথা ভাবা যায়, [illegible] বংশ হিসেবে মর্যাদা হিসেবে সে কথা [illegible] বড় একটা আমলই দেয় না। তোমার বন্ধুর বাবার মতটা জান কি?

সমর ফাঁপরে পড়ে। প্রস্তাবটা ছেলে-মানষী এখন যেন নিজের কাছে ধরা পড়ে। বন্ধুর বাবা কেন, বন্ধুর মতটাও তার স্পষ্ট জানা নেই—যাঁর প্রতি অনুরাগটাই সে কেবল লক্ষ্য করেছে। হঠাৎ সমর কিছু উত্তর দিতে পারে না, চুপ করে থাকে।

(ক্রমশঃ)

পশ্চিমবঙ্গে প্রমোদকর বৃদ্ধি সম্ভাবনা

ভারতবর্ষে কামধেনু একটি আছে তার নাম চলচ্চিত্র শিল্প। কোন প্রাদেশিক সরকারের বাজেটে ঘাটতি ধরলেই এই চলচ্চিত্র-ধেনুটিকে দোহনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু ধেনুর কাছ থেকে দুধ পেতে গেলে তাকে যে খাওয়ানোও দরকার, সরকার সেইটেই যাচ্ছে ভুলে, ফলে ধেনুর অবস্থা হ'য়ে পড়েছে একেবারে কাহিল।

বিহারে গত অক্টোবর থেকে প্রমোদকর শতকরা পঞ্চাশটাকাতে চড়িয়ে দিয়ে ওখানকার চিত্রব্যবসাকে অনেকখানি কাহিল ক'রে ফেলা হয়েছে। ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে প্রধান প্রধান শহরের চিত্রগৃহগুলিতে যে পরিমাণ আমদানী ছিলো অক্টোবরের পর থেকে তা কমে যেতে বাধ্য হয়েছে। তার কারণ প্রমোদ-কর বৃদ্ধি পেলে সেটা চড়ে টিকিটের দামের ওপরে—ন্যায়তই চিত্রব্যবসায়ীরা সরকারী কর ব'লে ওটা দর্শকদের ঘাড়ের ওপরে চাপিয়ে দেন। কিন্তু দর্শকদেরও করের বোঝা বইবার ক্ষমতা অপরিসীম নয়—যতটা পারে তারা সহ্য করে, সীমা পার হ'লে তারা টিকিট কেনা বন্ধ ক'রে দেয়—চিত্রব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই। নয়তো প্রমোদ-কর বাড়লে চিত্রব্যবসায়ীদের ক্ষতি নেই মোটেই, যদি দর্শকরা বোঝার ভারে নুইয়ে না পড়েন। দেখা যাচ্ছে যে, বিহারের দর্শকদের কাছে করের বোঝাটা বেশী ভারী হ'য়ে পড়েছে, তাই টিকিট বিক্রী গিয়েছে কমে। সেইটেই হয়েছে চিত্রব্যবসায়ীদের লোকসানের কারণ। বিহারে বিক্রী এতটা কমে গিয়েছে যে, আগে কম প্রমোদকর থাকায় যা বাবদ সরকারী তহবিলে যে আয় ছিলো এখন তার পরিমাণ গিয়েছে কম হ'য়ে। এখানেই সরকারী হিসেব পরাস্ত হয়েছে—তারা কর বাড়িয়ে দিয়ে আয় বাড়িয়ে নেবার মতলবে ছিলেন, কিন্তু বিক্রী কমে গিয়ে তাদের সে মতলবটাই গেছে ব্যর্থ হয়ে। এতো একদিক থেকে হ'লো প্রাদেশিক সরকারেরই লোকসান, অপরদিকে আয়কর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকেও যথেষ্ট লোকসানের সামনে পড়তে হচ্ছে। কারণ বিক্রী কম হ'লে চিত্রব্যবসায়ীদের আয়ও যায় কম হ'য়ে—ওদের আয় কমে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়ী আয়করও যায় কম হয়ে।

শোনা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তার বর্তমান বাজেটে প্রমোদ-কর বাড়িয়ে দেওয়া স্থির করেছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারকে খানিকটা লোকসান খেতে হবে। কারণ এখানেও এমনিতেই বাজার মন্দা, তার ওপর কর আরও বাড়িয়ে দিলে লোকের ছবি দেখার ক্ষমতা আরও ক্ষীণ হয়ে যাবেই, তার মানে ব্যবসাদারদেরও যাবে আয় কমে। ছাড়া ভাববার দিক আরও আছে। ব্যবসা পড়ে গেলে চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন ব্যাপারে নিযুক্ত কতশত লোককেও যে অন্ন হারাতে হবে তা ও ইয়ত্তা নেই।

রংজগৎ

চলচ্চিত্র [illegible]সার প্রসারকে ব্যাহত করার জন্যে সরকার কেন উঠে পড়ে লেগেছে তা বোঝা ভার। [illegible] রয়েছে, লোক টাকা খাটাতেও রাজী [illegible] তবুও নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। ছবি-সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে যেতে গিয়েছে কিন্তু কাঁচামাল আমদানীর অসুবিধে ঘটিয়ে তাকে রুখে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসা যখন বাড়তে চাইছে তখন প্রমোদ-কর এবং আরও নানা কর চাপিয়ে ব্যবসাকে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোন্ বলে অবলম্বনে সরকার যে এইরকম সমস্ত নীতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রণোদিত হয়েছে আমাদের তা বোধগম্যের বাইরে। ভারতে চলচ্চিত্র ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডী যে রাষ্ট্রীয় সরকার এ থেকে শুধু নিজের [illegible] গণ্ডাটাই হিসেব ক'রে টেনে নেন, শিল্পের সুবিধে অসুবিধে ব্যাপারে জানেন না কিছু, জানতে চানও না তারা—সাহায্য করা তো দূরের কথা।

আমরা ভেবেছিলাম এই শিল্পটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য ক'রে পুষ্ট ক'রে তোলার দিকেই সরকারী যত্ন [illegible] হবে। যাতে শিল্পটা বড়ো হ'লে ব্যবসা এতোটা প্রসারিত ক'রে দেওয়া যায় যে অনুপাতে সরকারী তহবিলে আয়ও বাড়তে বাধ্য হবেই। তা না ক'রে শুধু [illegible] আর বাধানিষেধের গণ্ডি টেনে শিল্প বর্তমানে সারশূন্য ক'রে তোলার দিকেই [illegible] নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। কিন্তু 'ধেনু' [illegible] প্রয়োজন, সে সুস্থ ও পুষ্ট থাকলে তার দুধ দেবার ক্ষমতা হবে। শুধু [illegible] দোহনে চিত্রশিল্পের অবস্থা আজ [illegible] কাহিল। প্রমোদ-করের আরও বেড়ার ক্ষমতা চিত্রশিল্পের আর নেই।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের সর্বনাশ সমুপস্থিত নয়?

আমাদের রাজস্ব বিভাগ অধিক প্রমোদ-কর বাড়িয়ে চলচ্চিত্রশিল্পকে কাবু ক'রে ফেলার ব্যবস্থা তো ক'রছেনই, অপর দিকে শিল্পটিকে বাইরের আক্রমণ থেকে র[illegible]

ব্যাপারেও সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে আছেন। বিদেশী টাইকুনদের এদেশের শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এসে নামার আভাস আমরা ইতিপূর্বে একটু আধটু দিয়েছি এবং ভারতীয় শিল্পপতিদের বহুবার সাবধানও ক'রে দিয়েছি কিন্তু তাঁরা তা গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু আজ এমন কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা পাওয়া যাচ্ছে যা থেকে আমাদের ঐসব সন্দেহকে সত্য ব'লে মেনে নেবার কারণ হ'য়েছে। ব্যাপারসব এমন যে বিশ্বাস ক'রতে হ'চ্ছে, বিদেশীদের আসাটা এখন আর সম্ভাবনা মাত্র নয়, ভারতীয় চিত্রশিল্পের সর্বনাশ যে, তারা ইতিমধ্যে এসেই গিয়েছে।

বিদেশী মানে হ'চ্ছে আমেরিকা ও বৃটেন অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে যারা জড়িত রয়েছে। আমেরিকা ও বৃটেনে ওদের রাষ্ট্রের সমগ্র আর্থিক সংগতির একটা বিপুল অংশ ওদের চলচ্চিত্রশিল্পের পিছনে খাটানো রয়েছে। আমেরিকাতে তো চলচ্চিত্রশিল্প দেশের পাঁচটি বৃহত্তম শিল্পের অন্তর্ভুক্ত; বৃটেনেও ঠাঁই তার চেয়ে নীচে নয়। কিন্তু বর্তমানে ও দুদেশেই চলচ্চিত্রশিল্পের অবস্থা টলমলো হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দুদেশেই স্টুডিওর পর স্টুডিও বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে এবং ছবি তৈরীর সংখ্যা বছর বছর কমেই চলেছে। ওদের চলচ্চিত্রে নিয়োজিত বিপুল অর্থ একেবারে বাঁধ হ'তে ব'সেছে যার প্রভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থক সংগতিই আহত হ'য়ে পড়ার সম্ভাবনা। ওদের এই দুরবস্থার কারণ—প্রথমতঃ, টেলিভিশন প্রতিযোগিতা যা লোককে সিনেমা থেকে সরিয়ে ঘরকুণো ক'রে দিচ্ছে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায়। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রায় সব দেশে নিজেদেরই ভাষায় তোলা ছবির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি যা বৃটিশ-আমেরিকার ছবির বাজারকে সংক্ষিপ্ততর ক'রে দিচ্ছে দিনদিনই। ইউরোপের বড় বড় যে যে রাষ্ট্রে নিজেদের শিল্প আছে তার প্রায় সবকটিতেই কোটার প্রবর্তন ক'রে বৃটিশ-আমেরিকান ছবির প্রবেশ তো [illegible] কমিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে নিজেদের ভাষায় তোলা ছবির সংখ্যা বেড়ে চলেছে আর সেই সংগে আমেরিকান ছবির সংখ্যা যাচ্ছে নীচের দিকে নেমে। ওদের বাজার এখন খোলা পড়ে রয়েছে মধ্য প্রাচ্য, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহে। এর মধ্যে জাপানের নিজস্ব শিল্প আছে এবং যুদ্ধের পর আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হ'চ্ছে। চীনেরও চিত্রশিল্প ছিল তবে বর্তমান রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে তার কার্য [illegible] খব। ভারতবর্ষে বিরাট স্টুডিওর [illegible]

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু বিদেশী ছবির আমদানীতে এখানে কোন বাধা নিষেধ নেই, উল্টে আমদানী করা বিদেশী ছবি অপ্রতিহত গতিতে বছর বছর বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষে বিদেশীদের ব্যবসা করার কোন অসুবিধে তো নেই, উপরন্ত এশিয়ার প্রায় সর্বত্র যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতা ব্যাপক হ'য়ে রয়েছে ভারত তা থেকে অনেক শান্ত জায়গা—টেলিভিসন বসতেও বহু বছর দেরী। সুতরাং আমেরিকা ও বৃটেনের ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষকেই যে তাদের প্রধান ব্যবসাক্ষেত্র বেছে নেবে তাতো সহজ কথা। ভারতে ব্যবসা প্রসারে বিদেশীরা আপাভতঃ দু'রকম উপায় অবলম্বন ক'রেছে। এক হ'লো, বাছা বাছা ইংরিজী ছবিকে ভারতীয় ভাষায় 'ডাব' করিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করা; আর অপরটি হ'লো ভারতবর্ষে এসে ভারতীয়দের সঙ্গে বখরাদারীতে ছবি তোলা। প্রথম উপায়টি ইতিপূর্বেই কার্যকরী হ'য়েছে যার একটি ধাপ হ'চ্ছে 'বাগদাদকা চোর'—যে ছবিখানি কয়েক মাস ধরে' ভারতের সর্বত্র দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাচার ক'রে দিচ্ছে এবং তাও এমনি সময়ে যখন বিদেশ থেকে স্টার্লিং ও ডলার আহরণ করা আমাদের অত্যাবশ্যক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রীয় আর্থিক সংগতিকে দৃঢ় করার জন্যে। তাছাড়া যখন চিত্রগৃহের অভাবে ভারতের নিজস্ব তোলা শত শত ছবিও মুক্তিলাভ ক'রতে না পেরে গুদামে পচছে—হিন্দীতে 'ডাব' করা বিদে[শী] ছবি আরও অনেকগুলিরই আগমনবা[র্তা] বিজ্ঞাপিতও হ'য়েছে। দ্বিতীয় উপায়ের বিষয়ে যে সাক্ষাৎ প্রমাণ আমাদের আশ[ঙ্কি]ত করেছে তা হ'চ্ছেঃ—

১। গত সপ্তাহের 'রঙ্গ-জগত'-এ হলি-উডের কোন প্রযোজক কর্তৃক এ[দেশে] ছবি তোলার যে খবর দেওয়া হ'য়েছিল [তা] সেটা সত্যি ব'লেই জানা গিয়েছে। হ[লিউ]ড থেকে সম্প্রতি কলকাতায় এসে অবস্[থান] ক'রছেন পৃথিবীবিখ্যাত ফরাসী পরিচালক [জাঁ] রেনোঁয়া, তাঁর সংগে আছেন 'গুড আর্থ' [ছবি]র অনন্য-সাধারণ কৃতী ক্যামেরাম্যান; [শব্]দযন্ত্রী ও অন্যান্য কলাকুশলীরা হলিউ[ড থে]কে শীঘ্রই এসে পড়ছেন। এখানে এ'রা [তুল]ছেন 'রিভার' নামক একখানি রঙীন ছবি[, যা]তে যার চিত্র-গ্রহণ আরম্ভ হ'তে অক্টো[বর] পৌঁছে যাবে। ইতিমধ্যে এ'রা শিল্পী নি[র্বাচ]নে ব্যস্ত আছেন এখানকারই এ্যাংলো ইণ্ডি[য়ান]দের মধ্যে থেকে, অবশ্য বড় শিল্পী হ[লিউ]ড থেকেই আমদানী হবে। এখানকার জি[...] মেহ্‌তাকে অপারেটিং ক্যামেরাম্যানরূপে নিয়[োগ ক]রা হ'য়েছে এবং মনে [...]নীয় লোককেও ভিন্ন [...] হবে। এ সম্পর্কে [...] কিন্তু সবচেয়ে মুখ্য দিক হ'চ্ছে টাকার দিকটা—আর্থিকর বিষয়, আমেরিকার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার এই ছবির নির্মাতা এবং তারা তা তুলছে ভারতীয়দের সঙ্গে বখরাদারীতে গঠিত ভারতের আমেরিকান [প্রতি]ষ্ঠান ওরিয়েণ্টাল ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্মসের [দ্বারা]য়ে।

২। জানা গেলো, হলিউড [ও] বৃটেনের বিখ্যাত ভারতী[য়] অভিনেতা সাবু ভারতে আসছে নিজের প্রযোজনায় একখানা ছবি তোলার জন্যে। ছবিখানির নাম 'দ রিটার্ন অফ এলিফেণ্ট বয়'; ওর নিজের [লো]কি লেখা এবং টাকাটা[ও] ঢালবে ও নি[জে]র থেকে। সকলেই জানেন যে, সাবু হ[লো] বৃটেনের দ্বিতীয় [বৃ]হৎ চিত্রব্যবসায়ী [আ]লেকজাণ্ডার কর্ডার [প]টোয়া। তাই সাবুর এই প্রচেষ্টা স্বপ্রণোদিত ব'লে সন্দেহ [হ]য়—আমাদের সরকারী বিভাগ এ ব্যাপারে কোন খবর রাখেন কি? এটা সাবুর [নি]জের ব্যাপারও হয় [ত] তাও হয়ে দাঁড়াচ্ছে [পূ]র্ণরূপে বৃটিশ স্বার্থপোষক।

৩। বিলেতের সবচেয়ে বড় চিত্রব্যবসায়ী জে. আর্থার র্যাঙ্ক গত [ক']বছর ধ'রেই [ভার]তে চিত্রব্যবসা জাঁকিয়ে [ফে]লবার অনেক দিক [থে]কে অনেক রকম চে[ষ্টা] ক'রছেন। এদেশে তাঁর সরাসরি অধীনে [কয়]টি শহরে কতকগুলি [...] কতকগুলি চিত্রগৃহ চিত্রগৃহ আছে। তা[...] র্যাঙ্ক-গ্রুপের ছবি দে[খা]তে যে রকম উৎসাহী দেখা যায় তাতে সে[ই] চিত্রগৃহের মালিকানা না হোক অন্য দি[ক থে]কে আর্থার র্যাঙ্কের করায়ত্তে আছে [...] সন্দেহ করা যায়। কিছুদিন আগে [...]দের একজন সুখ্যাত ক্যামেরাম্যান কথা[প্রসং]গ ব্যক্ত করেন যে, র্যাঙ্ক যখন কিছুকাল [আগে] বোম্বেতে আসেন তখন তিনি ভারতে ছ[বি ত]োলার জন্যে টাকা খাটাবেন ব'লে জানান এ[বং] ক্যামেরাম্যান ভদ্দরলোককে আগস্ট বিপ্[লব] অবলম্বনে একখানি ছবি তোলার জন্য [...]শ হাজার পাউণ্ড গ্যারাণ্টী দেন। যাই[হোক] শেষ পর্যন্ত এটা যে কে[ন] [...]কা হ'তে পারে নি। র্যাঙ্ক কারণেই হে[...] তালে অপেক্ষা ক'রতে থাকেন একটা সু[...]তে তিনি সে সুবিধেটা পেয়ে এবং শেষ[...] গেলেন [...]দরই বাংলাদেশের স্বনামধন্য পরিচাল[ক ...]রফৎ। তিনি বিলেতে নিজের স্বাস্থ্য[...] করার জন্যে গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন [...]য় চলচ্চিত্রশিল্পের স্বাস্থ্যোদ্ধারের পরিক[ল্পনা] নিয়ে, অবশ্য আর্থার র্যাঙ্কের সহায়[তায়]। গত মাসে এক পত্রিকা-প্রতিনিধির কা[ছে তি]নি তাঁর সেই পরিকল্পনাটি ব্যক্ত ক'[রেন]। তা থেকে জানা যায় যে, আর্থার র্যা[ঙ্ক তাঁ]কে দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে যান এবং [...] তাঁর নিজস্ব ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি [...] কতকগুলি পরিকল্পনা জানাতেই [...] অর্গানিজেশনও উৎফুল্ল হ'য়ে জানান যে, তাঁদেরও ঠিক অনুরূপ পরিকল্পনাই আছে। র্যাঙ্ক বিলেতের ১৬ মিলিমিটার শিক্ষামূলক চিত্র প্রচলনের পরিকল্পনাটি ভারতবর্ষেও কার্যকরী করতে এই পরিচালকের সহযোগিতার

[...]বাড়িটার সামনে[...] কতক [...] হয় সমর বুঝতে পারে, [...] কেন, সমর [...] চোখ [...]